দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

অগ্রহায়ণ ১৩৭৩

৫৪-তম বর্ষ
প্রথম খণ্ড
ষষ্ঠ সংখ্যা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

অগ্রহায়ণ ১৩৭৩

৫৪-তম বর্ষ
প্রথম খণ্ড
ষষ্ঠ সংখ্যা

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৭৩

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

বাৎসরিক ও ষান্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষান্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৯শে পৌষের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১২৲ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৭·৫ সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবে

চন্দ্রমল্লিকা

চিত্র - রামকিঙ্কর সি

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়া

আষাঢ়—১৩৭৩

প্রথম খণ্ড | চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

সৃষ্টিতত্ত্ব

ডক্টর রমা চৌধুরী

প্রারম্ভিক

বলাই বাহুল্য যে দর্শন-শাস্ত্রের মূলীভূত সমস্যা হল সৃষ্টিতত্ত্ব সমস্যা। বস্তুতঃ, দর্শনের আরম্ভ এই জগৎ থেকে। কারণ যা আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যাবলী, যা আমাদের প্রাত্যহিক পরিবেশের অতি সাধারণ ঘটনা—তাদের মধ্যে যখন আমরা পাইনা পরিপূর্ণ তৃপ্তি, পাইনা মানবমনের কোনো জিজ্ঞাসারই উত্তর, কোনো ঘটনারই যোগ্য ব্যাখ্যা, তখনই কি প্রথম আমাদের মনে এই কথাটাই জাগে না যে, এতদিন আমরা যা কিছু সত্য বলে জেনে এসেছি, তা' হয়ত ঠিক তা'ই নয়, আমরা এতদিন যা' সুখ বলে ভোগ করে এসেছি, তা ঠিক তা'ই নয়; যা আমরা এতদিন কাম্য বলে আকাঙ্ক্ষা করে এসেছি, তা' হয়ত ঠিক তাই নয়। তবে সত্য কি, তবে সুখ কি, তবে কাম্য কি? সাধারণ চিন্তা যখন আমাদের কোনো দিক্ থেকে এ সকল বিষয়ে কোনো সমাধান দিতে পারেনা, তখন কোন এক শুভ মুহূর্তে উদয় হয় আমাদের জীবনে এক নূতন অরুণালোক, যার অমল সম্পাতে বিমল হয়ে যায় এক মুহূর্তে আমাদের পূর্বের তমসাচ্ছন্ন জীবন, এবং সেইত হল আমাদের জীবনে দর্শনের প্রথম পরম মঙ্গলময় আবির্ভাব এবং যে প্রশ্নটি আমাদের মনে সেই সময়ে সর্বপ্রথম [illegible]

"কি"র প্রশ্ন

এই "কি"র মধ্যে সর্বপ্রথম "কি" হল :—আমাদের সৃষ্টি হল কি থেকে? কিন্তু এটা প্রথম "কি" কেন? কেনই বা নয়; মানব মনের সর্বপ্রথম আকূতিই হল কারণাবিষ্কারের আকূতি। বস্তুতঃ, কার্যকারণ সম্বন্ধে পার্থিব ও মানসিক উভয় দিক্ থেকেই একটা মূলীভূত সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের মূল কথা কি? এই সম্বন্ধের মূল কথা হল—পরস্পরের মধ্যে নিগূঢ়, শাশ্বত, অচ্ছেদ্য বন্ধন। বস্তুতঃ, কি বিশাল এই পৃথিবী, কি বিবিধ, কি বিচিত্র তার বস্তুজাত! কিন্তু প্রত্যেকটার সঙ্গেই প্রত্যেকটার সম্বন্ধ নিগূঢ়তম। কিন্তু এই সম্বন্ধ একতোমুখী। অর্থাৎ, একের থেকে অপরের উৎপত্তি—এইত হল সকল জাগতিক, সকল ব্যবহারিক, সকল সাধারণ সম্বন্ধের মূল কথা। একের থেকে অপরের উৎপত্তি? কিন্তু মাত্র একটি সূত্রেই কি বন্ধন করা যায় পৃথিবীর সকল বস্তুকে? নিশ্চয়ই যায়। তার প্রমাণ বিজ্ঞান, তার বলবত্তর প্রমাণ দর্শন। অন্যথায়, পৃথিবীতে যাকে বলা হয় "Law", বিজ্ঞানের, পার্থিব দিক্ থেকে অলঙ্ঘ্য নিয়ম; যাকে বলা হয় "Doctrine", দর্শনের দিক্ থেকে অকাট্য, তত্ত্ব, তা সম্ভবপরই বা হত কিরূপে?

সে জন্য, কার্য কারণ সম্বন্ধ আমাদের জীবনের ধারার, আমাদের চিন্তার ধারার এরূপ অস্থি-মজ্জাগত যে, যে কোনো বিষয়ে চিন্তা করতে গেলেই, সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করতে গেলেই, শান্তি-তৃপ্তি-দায়ক ভাবে চিন্তা করতে গেলেই, এই ধারাটিই আমাদের এসে পড়ে অনিবার্য ভাবেই। অন্য ভাবে সামান্য মাত্রও অবধারণ করতে গেলেই আমরা যেন "দিশাহারা" হয়ে পড়ি, এলোমেলো হয়ে পড়ে আমাদের চিন্তাপ্রণালী, খেই হারিয়ে যায় আমাদের স্বাভাবিক-স্বচ্ছলস্বচ্ছন্দ মানসিক-গতির।

এই কারণেই নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, কোনো প্রশ্নের প্রারম্ভেই এই কারণের প্রশ্নই আমাদের মনকে আলোড়িত করে।

সেজন্য আমাদের জীবন-জগৎ সম্বন্ধে সামান্য মাত্রও অবধারণ করবার প্রচেষ্টা করলেই প্রথমেই আমরা জানতে

"কেন"র প্রশ্ন

তারপর উঠে আরো কত কি প্রশ্ন—"কেন"র প্রশ্ন—আমাদের "কেন"র প্রশ্ন। অর্থাৎ, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যের প্রশ্ন। হয়ত এস্থলে কেহ কেহ বলতে পারেন যে, "কেন"র প্রশ্ন "কি"র প্রশ্নের অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই, একদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই। কারণ, মূল অপেক্ষা ফুল কি অধিক সুন্দর নয়—যেহেতু মূলই ত ফুলে পরিণত হয়—না হলে তার অস্তিত্বই বৃথা। কিন্তু অন্যদিক থেকে, মূল না থাকলে ফুল পাবে কোথা থেকে? সেদিক থেকে, মূল নিশ্চয়ই অধিক মূল্যবান, ফুল থেকে।

অবশ্য এ'কথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে মূলের অনুসন্ধান বিজ্ঞানের অনুসন্ধান, ফুলের, দর্শনের। প্রথমটি ব্যবহারিক বিষয়, দ্বিতীয়টী পারমার্থিক। সেদিক্ থেকে, দর্শন যেরূপ বিজ্ঞান থেকে উচ্চতর সেরূপ "কি"ও "কেন" থেকে।

বিজ্ঞানের "কি" এবং দর্শনের 'কি"

কিন্তু এস্থলে, বিজ্ঞানের "কি" এবং দর্শনের "কি"র মধ্যে প্রভেদ মূলীভূত। বিজ্ঞানের "কি"র উত্তর আমরা পাই পার্থিব বস্তুর মধ্যেই কেবল—কারণ, বিজ্ঞানের সীমা-রেখা পার্থিব জীবনের মধ্যেই কেবল। দর্শনের "কি" সেই সীমারেখা থেকেই আরম্ভ হয়। যথা, বিজ্ঞান হয়ত বলে যে, জড় অণু, অথবা তার মূলীভূত শক্তিই এই পার্থিব জগতের কারণ। কোনো কোনো তথাকথিত দর্শনও হয় ত তাই বলেছে মন্দবুদ্ধি বশতঃ।

কিন্তু প্রকৃত দর্শন তা' কোনোদিনও বলবেনা—তার বিশেষ কর্মই হল জড়জগতের ঊর্ধ্বে উঠে তবেই জড়জগৎকে ব্যাখ্যা করা। তার কারণ হল এই—কার্য-কারণ সম্পর্কে আশ্রিত-আশ্রয়ের সম্বন্ধ। অর্থাৎ কার্য কারণ থেকে সৃষ্ট বলে' স্বভাবতঃই কারণের আশ্রিত। আশ্রয় নিশ্চয়ই আশ্রিত থেকে উচ্চতর।

সেজন্যই বলা হয়েছে যে কারণ কার্য থেকে উচ্চতর এবং সে জন্যই বলা হয়েছে যে কার্যের ঊর্ধ্বে উঠেই তবেই কার্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়। এই কারণেই বলা হয়েছে যে কারণ কার্যাতিক্রমী।

এই কারণে, এক জড় বস্তু, অথবা, তার জড় শক্তি

ব্যাখ্যাকারক হতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন সুগভীর, সুনিপুণ, সুশৃঙ্খল, উচ্চতর চিন্তা, অথবা দার্শনিক চিন্তা।

এজন্যই "কি"র প্রশ্ন বিজ্ঞানের প্রশ্ন হলেও, এটা দর্শনের প্রশ্নও সূক্ষ্মভাবে। প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞানে এই প্রশ্নটার সমাধান করা হয় ব্যবহারিক দিক থেকে; দর্শনে পারমার্থিক।

"ঈশ্বর-কারণবাদ"

দর্শনশাস্ত্রে এই মূলীভূত বিষয়ে বহু বিভিন্ন মতবাদ আছে। তাদের মধ্যে একটা প্রধানতম মতবাদ হল "ঈশ্বর কারণবাদ"। এই মতবাদেরও বিভিন্ন রূপ আছে। এদেরই মধ্যে একটি সর্বজনখ্যাত রূপ হল "ঈশ্বর পরিণামবাদ।" এই মতানুসারে,—

স্রষ্টা বা কারণ ঈশ্বর স্বয়ং সৃষ্ট বা কার্য জীবজগতে সত্যই পরিণত হন; এবং সেজন্য জীব-জগৎ তার "স্বগত" "ভেদ"। অদ্বৈতবাদিগণ স্বভাবতই নানাভাবে এই মতবাদের সমালোচনা করেছেন। এ ব্যতীত, ব্রহ্মসূত্রেই এরূপ ঈশ্বরকারণবাদের বিরুদ্ধে সাতটি সম্ভাব্য আপত্তি উত্থাপিত ও খণ্ডিত হয়েছে। সেগুলি হল সংক্ষেপে এই:—

ঈশ্বর কারণবাদের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি

এই আপত্তি অতি ন্যায্য আপত্তি। এটা হল এই:—

উপাদান কারণ ও সৃষ্ট কার্য সর্বদাই সমস্বভাব হয়। যথা, উপাদান কারণ মৃৎপিণ্ড থেকে মৃন্ময় ঘট, মৃন্ময় পাত্র প্রভৃতির উদ্ভব হয়; স্বর্ণ ঘট, রৌপ্যপাত্র প্রভৃতির কোনোদিন নয়। তার কারণ হল এই যে, উপাদান কারণ কার্যে পরিণত হয়, এবং সেজন্য, কারণ ও কার্য সমস্বভাব, বা সমস্বরূপ। কিন্তু ঈশ্বরকারণবাদের ক্ষেত্রে, স্বয়ং ঈশ্বরই জীবজগতের উপাদান কারণ। সে ক্ষেত্রে অজড়, শুদ্ধ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে জড়, অশুদ্ধ জগৎ, এবং অশুদ্ধ, পাপ তাপক্লিষ্ট জীবের উদ্ভব হতে পারে কিরূপে?

ঈশ্বরকারণবাদের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তির খণ্ডন

এর উত্তরে ব্রহ্মসূত্রানুসারে পরিণামবাদিগণ এরূপ বলেছেন:—

"দৃশ্যতে তু" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৬)

অর্থাৎ এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে, কারণ ও কার্য যে সর্বদাই সমস্বরূপ, সে কথা বলা যায় না। যথা, অচেতন থেকে অচেতন কেশ-নখের উদ্ভব হয়। একই ভাবে; অজড়-শুদ্ধ-সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে জড়, অশুদ্ধ জগৎ এবং অশুদ্ধ পাপতাপক্লিষ্ট জীবের সৃষ্টি হতে বাধা কি?

মন্তব্য

কিন্তু উপরের উদাহরণ দুটা যে সম্পূর্ণ বিফল, সে জ্ঞান নিশ্চয়ই প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মসূত্রকারের ছিল। কারণ আমরা জানি যে, প্রাণিতত্ত্বের মূলীভূত নিয়মানুসারেই কেবল এক প্রাণী থেকেই অপর এক প্রাণীর উৎপত্তি হতে পারে, জড়বস্তু থেকে কোনো দিনও নয়। সেজন্য, জড়গোময় থেকে অজড় বৃশ্চিকের উদ্ভব অসম্ভব।

পুনরায়, জীবিত পুরুষের ক্ষেত্রেই কেশ-নখের উৎপত্তি হলেও, কেশ-নখ জড়দেহেরই অংশ, অজড় আত্মার নয়।

সেজন্য ঐ দুটী উদাহরণ এক্ষেত্রে অর্থহীন।

তাহলে, প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মসূত্রকার এবং তার পরবর্তী সকল ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যকার এরূপ সমাদরের সঙ্গে এদের উল্লেখ করেছেন কেন?

তার কারণ হল এই যে তাঁরা এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, কারণ ও কার্য যে সবদাই দৃশ্যতঃ সমস্বরূপ তা' নয়। বহু ক্ষেত্রেই, দৃশ্যতঃ তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেই বোধ হয়। যথা, একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজ থেকে যখন একটী উত্তুঙ্গ, অসংখ্য-শাখা-প্রশাখা-প্রসারী, অসংখ্য পত্র-পুষ্প ফল-শোভিত, অসংখ্য-মূল-বিস্তারী মহামহীরুহের সৃষ্টি হয়, তখন তার সঙ্গে তার কারণ স্বরূপ সেই বীজের সাদৃশ্য কতটুকু? কঠিন সর্ষপ বীজ থেকে যখন তরল সর্ষপ তৈলের সৃষ্টি হয়, তখন তার সঙ্গে সেই সর্ষপ বীজের সাদৃশ্য কতটুকু? তরল দুগ্ধ থেকে যখন অর্ধ তরল মাখন বা দধি, এবং কঠিন ছানার সৃষ্টি হয়, তখন তার সঙ্গে সেই দুগ্ধের সাদৃশ্য কতটুকু? উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। কারণ, আমরা প্রায়ই এরূপ দৃষ্টান্ত পাই, যে সব ক্ষেত্রে, কারণ ও কার্য দৃশ্যতঃ সমস্বরূপ ত নয়ই; উপরন্তু বিপরীত স্বরূপ।

বিশেষ করে, এই ব্যাপার ঘটে কয়েকটা কারণের সম্মেলনে একটী কার্য উৎপত্তিকালে। যথা অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সম্মেলনে জলের উৎপত্তি হলে, জলে এরূপ বহুগুণের আবির্ভাব দেখা যায়, যা' অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পৃথকভাবে নেই।

…কল বৈদান্তিকই (এমন কি শঙ্কর পর্যন্ত ব্যবহারিক দিক্ থেকে) যখন এই দুইটী উদাহরণের উল্লেখ করেছেন এরূপ যত্নের সঙ্গে, তখন তাদের ব্যাখ্যা একমাত্র এইভাবেই দেওয়া যায়। অর্থাৎ, এই কথাই বলতে হয় যে, তাঁরা সকলেই এই কথাটীই বিশেষ জোরের সঙ্গে বলতে চেয়েছেন যে দৃশ্যতঃ বহু ক্ষেত্রেই কারণ ও কার্য সমস্বরূপ নয়। কিন্তু তত্ত্বতঃ? কারণ ও কার্যকে সমস্বরূপ বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সৎকার্যবাদ

যেহেতু কার্যের দিক্ থেকে, সৎকার্যবাদানুসারে কার্য কার্যরূপে সৃষ্টি হবার পূর্বেই, প্রথম থেকেই কারণে অব্যক্তভাবে লীন, বা নিহিত হয়ে থাকে; পরে কোনো বিশেষ প্রণালীর সাহায্যে তা' কারণ থেকে স্বতন্ত্র কার্যরূপে প্রকাশিত হয়। যেমন দধি প্রথম থেকেই দুগ্ধে নিহিত বা লীন হয়ে আছে অব্যক্তভাবে। সুতরাং, সৃষ্টির পূর্বে, কার্য কারণের সমস্বভাব হতে বাধ্য, যেহেতু তখন কারণে অব্যক্তভাবে লীন কার্য কারণের বিপরীত স্বরূপ হতে পারে কিরূপে? তা' ত অসম্ভব। একই ভাবে প্রলয়ের পরেও কার্য কারণের সমস্বভাব। কারণ, তখনও কার্য তথাকথিত বিচিত্র স্বতন্ত্র কারণে পুনরায় লীন বা নিহিত হয়ে যায়। সেজন্য, সেক্ষেত্রে তা' কারণ থেকে বিপরীত স্বভাব থাকতেই পারে না, নিঃসন্দেহে।

এরূপে, কেবলমাত্র স্থিতিকালেই, অর্থাৎ, সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্তী কালেই হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে কার্য কারণ থেকে দৃশ্যতঃ বিপরীত স্বরূপ বলে' বোধ হতে পারে। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে এক্ষেত্রেও, সত্যই তা হতে পারে না; যেহেতু এক্ষেত্রেও, কারণই কার্যে পরিণত হচ্ছে; সেজন্য দৃশ্যতঃ যা'ই হোক্ না কেন, তত্ত্বতঃ কার্য ও কারণ সমস্বরূপ।

তাহলে, পরিণামবাদীদেরও এ'কথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, জড়জগৎ সত্যই জড় নয়—অজড়, তার কারণ স্বরূপ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরেরই ন্যায় অজড় শুদ্ধ ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

কিন্তু পরিণামবাদীরা কি সত্যই তা স্বীকার করবেন? বস্তুতঃ, পরিণামবাদীরা ত্রিতত্ত্ববাদী। তাঁরা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর,

(১) ব্রহ্ম বা ঈশ্বর—অজড়, শুদ্ধ, নিয়ন্তা।

(২) চিৎ বা জীব—অজড়, অশুদ্ধ, ভোক্তা।

(৩) অচিৎ বা জগৎ—জড়, অশুদ্ধ, ভোগ্য।

সেক্ষেত্রে জীব যে অশুদ্ধ নয়; জগৎ যে অজড়-অশুদ্ধ নয়, তা' কি ত্রিতত্ত্ববাদিগণ সত্যই স্বীকার করবেন, বা স্বীকার করতে পারেন স্বমতানুসারে?

যদি করেন, বা করতে পারেন, তাহলে তাঁদের মতবাদ আর 'খাঁটী নির্ভেজাল, নিখাদ' ত্রিতত্ত্ববাদ থাকবে না, একতত্ত্ববাদ হয়ে দাঁড়াবে।

সেজন্য, পরিণামবাদানুসারে জীব-জগৎও ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ন্যায়ই অজড় শুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর না থাকলেও পরিণামবাদিগণ খাঁটী নির্ভেজাল, নিখাদ, ত্রিতত্ত্ববাদী হওয়াতে, তা তাঁদের মনঃপূত হবে আর কি করে?

ঈশ্বর কারণবাদের দ্বিতীয় আপত্তি (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৩)

ঈশ্বরকারণবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি হল এই:—প্রথম আপত্তি খণ্ডন কালে দেখেছি যে, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন। পুনরায়, স্বয়ংব্রহ্মই জীব-জগতে লীন হয়ে আছেন। সেক্ষেত্রে, ব্রহ্মও জীব-জগতের ন্যায় অশুদ্ধ, অপূর্ণ, পাপতাপক্লিষ্ট; এবং জগতের ন্যায় জড় হয়ে পড়েন।

বিশেষ করে, ব্রহ্ম যখন অন্তর্যামী, জীবের আত্মা; তখন জীবের ন্যায় ব্রহ্মও ভোগাসক্ত ও তজ্জনিত সুখদুঃখাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

ঈশ্বরকারণবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তির খণ্ডন (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৩—২।১।১০) ত্রিতত্ত্ববাদী পরিণামবাদীরা সাধারণতঃ ভেদাভেদবাদী (রামানুজ-নিম্বার্ক-বল্লভ-শ্রীকণ্ঠ,) অথবা ভেদবাদী (মধ্ব)। সেজন্য, তাঁদের মতে, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন হলেও সম্পূর্ণ অভিন্ন নন, যেহেতু তাঁরা গুণতঃ ভিন্ন। সেজন্য, ব্রহ্ম যে জীব-জগতের ন্যায় অশুদ্ধ, অপূর্ণ, পাপতাপক্লিষ্ট; এবং জগতের ন্যায় জড় হয়ে পড়েন, এ কথা কোনোক্রমেই বলা চলেনা।

বস্তুতঃ, আমরা জানি যে রামানুজ-নিম্বার্ক-প্রমুখ ত্রিতত্ত্ববাদিগণ, স্বগতভেদবাদিগণ, পরিণামবাদিগণ অনমনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী (Individuatists) অর্থাৎ তাঁদের

মতে, জীব-জগৎ যতই ব্রহ্মস্বরূপ হোক্‌না কেন, শেষ পর্যন্ত, ব্রহ্ম ব্রহ্মই, জীবও না, জগৎও না ; জীব জীবই ব্রহ্মও নয়, জগৎও নয় ; জগৎ জগৎই, ব্রহ্মও নয় জীবও নয়। অতএব, ব্রহ্ম—জীব—জগৎ কোনোদিনও বন্ধ মোক্ষ কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ অভিন্ন নন।

মন্তব্য

রামানুজ-নিম্বার্কাদির স্বগতভেদবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধের বিষয় অদ্বৈতবাদিগণ নানাভাবে আলোচনা করেছেন।

তাঁদের মতে নূতন প্যাচ ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন কিন্তু গুণতঃ ভিন্ন বলে শেষ পর্যন্ত তাঁরা চিরকালই এক একটা স্বতন্ত্র সত্তা (Individual) থেকেই যাচ্ছেন—একথা বলে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বলতে হয় যে স্বরূপ অপেক্ষা গুণ বড় ; এবং কোনো বস্তু বা তত্ত্বের "ব্যক্তিত্ব" বা স্বাতন্ত্র্য নিহিত হয়ে রয়েছে স্বরূপে নয়, গুণে! নিঃসন্দেহে এ একটা অতি অযৌক্তিক মতবাদ। কারণ, স্বরূপ এবং গুণের কথাই যদি বলা হয়, তাহলে এ'ও বলতে হবে যে, স্বরূপই মূল, গুণ কেবল তার প্রকাশ, স্বরূপই আশ্রয়, গুণ কেবল তার আশ্রিত ; স্বরূপই বস্তুত্ব বা ব্যক্তিত্ব, গুণ কেবল তার অলঙ্কার।

সুতরাং স্বরূপ অপেক্ষা গুণই বড় ; এবং বস্তুর বস্তুত্ব, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব স্বরূপ ত্যাগ করে' কেবল মাত্র গুণকেই অবলম্বন করে' আছে—একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। রামের "রামত্ব" "মানবত্বে" নয়, কিন্তু "কৃশত্বাদিতে" ব্যাঘ্রের "ব্যাঘ্রত্ব" "প্রাণিত্বে" নয়, কিন্তু "পীতত্বাদিতে", পদ্মের "পদ্মত্ব" "পুষ্পত্বে" নয়, কিন্তু "রক্তত্বাদিতে"—এই কথা গ্রহণযোগ্য কিরূপে, এই হল অদ্বৈতবেদান্তবাদিগণের সুদৃঢ় অভিমত।

ঈশ্বর কারণবাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য অদ্বৈতবেদান্তবাদিগণের এবং অন্যান্যদের আপত্তির বিষয় পরে আলোচনা করা হবে।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পাদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

অদৃশ্যত্বাদি গুণকো ধর্মোক্তেঃ (২১)

পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা মুণ্ডকোপনিষদে কয়
পরাবিদ্যা সে শ্রেষ্ঠ অপরা বিদ্যা তাহা ত নয়।
"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে
যৎ তৎ অদ্রেশ্যম অগ্রাহ্যম অগোত্রম
অবর্ণম অচক্ষুশ্রোত্রম অপাণিপাদং
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং যদভূতযোনিং
পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ"
ইহার অর্থ অপরা বিদ্যা হইতে ভিন্ন হয়
পরাবিদ্যায় সেই অক্ষরে নিকটেতে পাওয়া যায়
দেখা যারে নাহি যায়
গ্রহণ নাহিক হয়
গোত্র বংশ বর্ণ যাহার চক্ষু কর্ণ নাই
হস্ত ও পদ নাহিক যাহার সেজন নিত্য ভাই
যিনি বিভু যিনি সর্ব্বগত ও যেজন সূক্ষ্মতম
সুধীজন জানে সব সৃষ্টিতে সেই জন আদিতম
অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ
তারো চেয়ে শ্রেয়তর
ইনিই ব্রহ্ম, সর্ব্বজ্ঞ যেজন যেজন ব্রহ্মবিদ্
শ্রুতিতে বলেছে তাহারেত তাই সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ।

বিশেষণ ভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ (২২)

ইতরৌ মানে "প্রকৃতি ও জীব" ইহাদের কথা নয়
শ্রুতি বলেছেন দিব্যো অমূর্ত্ত পুরুষঃ এজন হয়
ইনিই দিব্য ময়
অমূর্ত্ত পুরুষ হয়
জীব ইহা নয় অক্ষর হতে শ্রেষ্ঠ এজন হন
ব্যাপদেশ কথা বুঝায় যে ইনি প্রকৃতি কখন নন।

রূপোপন্যাসাচ্চ (২৩)

অক্ষর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে
"অগ্নি মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
(মুণ্ডকোপনিষদ্)
অগ্নি তাঁহার মস্তক জেন আঁখি দুটি শশিরবি
দিক সকলেতে কর্ণ তাহার বেদেতে বাক্য সবি
বায়ু তাঁর প্রাণ বিশ্ব হৃদয়
ধরণী সৃষ্ট পদ হতে হয়
সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা হয়ে সেইজন রয়
আমার তোমার সকলের জেনো পরমেশ্বর হয়।'

।।। বিমলা ।।।

(চক্ষুরুন্মীলিতং যেন)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ভূমিকা

অসিত ও তার শিষ্যা তপতী হুমেল যোগাশ্রম থেকে যায় আমেরিকায়। সেখানে ভক্তিমতী বাবারাকে অসিত বলে "অঘটন আজো ঘটে"-র ছয়টি কাহিনী। তারপরে দেশে ফিরে আসার পথে ইংলণ্ডে বার্বারার দিদি সোফিয়ার অতিথি হয়ে দুই বোনের কাছে বলে আরো নানা কাহিনী "অঘটনের ঘটা", "অঘটনের শোভাযাত্রা" "অঘটনের সূত্রপাত" ও "অঘটনের পূর্বরাগ"। পুনায় ফেরার পরেই ওরা চিঠি পায় সোফিয়া বিবাহ করেছে বাঙালী ডাক্তার রাজীবকে ও দুই বোনে বাংলা শিখেছে। ওদের অনুরোধে অসিত একবৎসর বাদে ওদের লেখে বাংলায়: "অঘটনে অশ্রুহাসি" ও "অঘটনে হাসিরাশি"। "অবিস্মরণীয়" পর্যায়ে আরো একবৎসর পরে অসিত ওদের বাংলায় লেখে ওর কয়েকটি চোখে দেখা ভক্ত—ভক্তিমতীর কাহিনী—ছোট গল্পের থাকে। এটি তার অন্যতম অবদান।

অনুক্রমণিকা

সোফিয়া লিখল তপতীকে: দিদি, আপনি দাদাকে যে বাধ্য করেছিলেন জ্ঞানেশের গল্পটি পাঠাতে তাতে আমার কী যে উপকার হয়েছে কী বলব? সত্যি, আমি রাজীবকে এবার তুড়ে শুনিয়ে দিয়েছি: "কেমন, বলবে কখনো এত জানো তত জানো? যত বলবে, মনে রেখো তত তোমার অজ্ঞানকেই জাহির করবে, সাবধান!" এই করে ওকে ধম্‌কালাম আধ ঘণ্টা ধ'রে। ওর মুখ একেবারে চুন! কারণ ও যতই দাপাদাপি করুক না কেন, জ্ঞানেশের কাছে তো ও কিছুই নয়—যার কত ডিগ্রি, তৎমা, ভক্ত, ধ্যান! এহেন জ্ঞানেশও যখন অবোধ সাব্যস্ত হ'ল তখন রাজীব কি আর মুখ তুলে কথা কইতে পারবে!

কিন্তু বাবারা আরো খুশী হয়েছে ছায়ার কথা প'ড়ে। তার গান আমরা গ্রামোফোনে শুনেই মুগ্ধ। জানেন—এখানে রেডিওতেও তার রেকর্ড সেদিন বাজিয়েছিল। এক সাহেব—ইনি আপনার বন্ধু—বলছিলেন আমাকে যে এমন গলা মেলে কালে ভদ্রে।

কিন্তু—বাবারা বলছিল—ছায়াকে সে ভালোবেসে ফেলেছে ওর গলার বা প্রতিভার জন্যে নয়। বাবারার মন টেনেছে ওর চরিত্র। "ছায়ার আলো" পড়তে পড়তে ও কতবারই যে চোখ মুছেছে। (চুপি চুপি বলছি দাদা, আমিও মুছেছি, কেবল রাজীব না জানতে পারে, বলবে: "সেন্টিমেন্টাল!") বাবারা বলছিল—এমন স্বচ্ছ শুভ্র হৃদয় যাকে বলে one in a million—রাজীব এর বাংলা করল কোটিতে গোটিক হয়। সত্যি কথা দাদা! তাই লক্ষ্মীটি, এই ভাবে ওর কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে আর একটি গল্প শোনান আমাদের। আমাদের ওর কথা ভাবতে আরো ভালো লাগে কেন জানেন? এই জন্যে যে, ছায়া যেন আমার ও বার্বারার বাংলা সংস্করণ। ও-ত কত প্রশ্নই না করত আপনাকে। নাই হ'ল ধর্মের প্রশ্ন। জানতে চাইত তো কিসে কী হয়? মানত তো যে, আপনি না জেনেও জানেন যেমন জ্ঞানেশ জেনেও জানে না? আপনার প্রতি ওর গভীর শ্রদ্ধা ভালোবাসা ওর কথায় কথায় ফুটে ওঠে এই জন্যেই আমরা ওকে ভালোবেসে ফেলেছি। আহা, এমন একটি নির্মলা সরলার, আশ্চর্য প্রতিভার হঠাৎ অকালমৃত্যু হ'ল—ভাবতেও বুকের মধ্যে কেমন যেন টন টন ক'রে ওঠে "Those whom good god loves die young"—এ প্রবচনে আমি মোটেই সান্ত্বনা পাই না। আমার মনে হয় কেবল কিং লিয়রের শোক কর্ডেলিয়ার জন্যে:

Why should a dog, a horse, a rat have life
And thou no breath at all ? thou'lt come
no more,
Never, never, never, never, never !

বলুন তো, এমন অপরূপার মৃত্যুতে স্নেহময় পিতার শোক কী অপূর্ব হ'য়ে ফুটেছে মাত্র এই তিনটি লাইনে—বিশেষ ক'রে ঐ never পাঁচবার উচ্চারণে ! আবেগ সবচেয়ে সহজে ফোটে ছন্দে—একথা আপনিই বলেছিলেন একদিন। সত্যি কথা। আমি আরো জুড়ে দিতে চাই : যে-শোক লিয়র পেয়েছিলেন তাকে অপরের মনে চারিয়ে দিতে হ'লে সব চেয়ে বড় সহায় কাব্যের ছন্দ।

ঐ দেখুন, কী থেকে কী কথা এসে গেল ! কিন্তু আর না। এবার আপনার পালা। বলুন ফের—যা প্রাণ চায়। কেমন ছায়াকে ফুটিয়ে—মানে, ওর জিজ্ঞাসার ব্যাকগ্রাউণ্ডে। কেমন ? লক্ষ্মীটি দাদা, না করবেন না। করলে আমরা দিদিকে ধ'রে পড়ব আপনাকে ফের চাপ দিতে। তখন ?

ইতি আপনার স্নেহের সোফিয়া

এক

তপতী বলল : "আমি সোফির দিকে। তুমি ফের লিখতে বসে যাও—কিন্তু কার কথা লিখবে ? ঠিক ঠিক, মনে পড়েছে : কয়েক মাস আগে তোমার একটা গল্প বেরিয়েছিল না—'বিমলা' ?"

অসিত বলল : "হ্যাঁ, গল্পটি আমি ছায়াকে বলেছিলাম বটে। কিন্তু যে-পত্রিকায় বেরিয়েছিল সেটি ভুমেলে ফেলে এসেছি মনে হচ্ছে।"

তপতী বলল : "না, ফেলে আসবে কেন ? আমি নিজে প্যাক করেছিলাম গল্পটি তোমার দপ্তরে—পরিষ্কার মনে আছে।—আরে দাদা, কোথায় যাবে ? আমি এনে দিচ্ছি। বোসো একটু।

* * *

"এই যে, নাও।"

"ধন্য ধন্য !"

"ধন্যবাদ পরে হবে—ওদের পাঠাও। এক্ষণি।"

অসিত হাসে : "তোমার সঙ্গে আর পেরে ওঠা গেল না। আচ্ছা, পাঠাচ্ছি। তবে আগে আনো এক কাপ চা। চা-য়ে চাঙ্গা, জানো তো ?"

* * *

চা খেয়ে চাঙ্গা হ'য়ে অসিত সুরু করে :

দিদিযুগল !

তোমরা ওকে ধরবার আগেই ও আমাকে যথাবিধি চাপ দিয়েছে। তারই ফল এ-ভূমিকা। আমার ভাগ্য ভালো যে, এ যাত্রা বেশি ভূমিকা করতে হবে না, লেখাটাও ছাপা হয়েছিল তাই নতুন ক'রে লিখতে হবে না।

ভূমিকায় শুধু এইটুকু বললেই হবে যে, আমার এক প্রিয় বন্ধু, বৈজ্ঞানিক রঙ্গলাল, আমাকে দারুণ আক্রমণ করেছিলেন আমি যোগকে "সত্যের সোপান" নাম দিয়েছিলাম ব'লে। বন্ধুটির আসল নাম বলব না। তিনি কোন্ পত্রিকায় আমাকে আক্রমণ করেছিলেন তার নামও অবান্তর। ধরা যাক তাঁর নাম রঙ্গলাল।

হয়েছিল কি, সেবার কলকাতায় গিয়ে কাব্য ও যোগ সম্বন্ধে এক ছাত্রসভায় কিছু বলেছিলাম। হবি তো হ রঙ্গলাল ছিলেন সে সভার প্রধান অতিথি। সভা শেষ হ'লে আমাকে বললেন ধমকে : "কেন যোগফোগ টেনে এনে ছাত্রদের বিপথে টানছেন বলুন তো ? গান গান—যা পারেন। অনর্থক কেন এ-সুস্থ 'সেকুলার' যুগে ফের রুগ্ণ ধর্মের ফাটা বেলুনকে জোড়ার চেষ্টা ?" ব'লেই প্রস্থান।

দু তিনদিন বাদে ছায়াদের ওখানে যেতেই দেখি ছায়া ম্লান মুখে একটি পত্রিকা পড়ছে।

"ঝংকারিকা ?"

বলতেই ছায়া ব'লে উঠল : "ব'লে ব'লে হায়রান হয়ে গেছি অসিদা, তা কিছুতেই কান দেবে না তো ! কেবল বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু ! এখন কেমন হয়েছে ? সামলাও ঠেলা। বন্ধুবর দিয়েছেন মোক্ষম খোঁচা।"

আমি "ঝংকারিকা"র ঝংকৃত পাতা উল্টিয়ে বললাম : "কিন্তু রঙ্গলালবাবু যে যোগফোগ একদম বিশ্বাস করেন না রে ! পরন্তু আমাকে বিষম ধমকে দিয়েছেন—আমি যেন আর ভুলেও যোগের ফাটা বেলুন জুড়তে না চাই। কেন মিথ্যে এ সব অপচেষ্টা এ বিংশ শতাব্দীতে ? এ-

সেকুলার যুগে যোগফোগের দিন গত—এ তো আমার অনেক বন্ধুরই ধারণা। তাই ওঁর দোষ কি?"

ছায়া রাগ ক'রে বলল: "দোষ নেই? যোগ কুসংস্কার বলেন বলুন? কিন্তু তোমাকে আক্রমণ করবেন তাই ব'লে? লিখেছেন কি—শোনো:

'আশ্রমে থেকে যাঁরা যোগ করতে কৃতসংকল্প তাঁরা বলতে পারেন তাঁরা যোগে বিশ্বাস করেন। যার যেমন মতি। কিন্তু তাই ব'লে কি তাঁদের বাজে লেখাও স'য়ে থাকতে হবে—যোগ ধর্ম গুরু এই সব ননসেন্স, মাম্বো জাম্বো? যোগ হ'তে পারে হয়ত নাস্তি ভগবানকে নিয়ে। কিন্তু ভোগ হয় শুধু অস্তি মানুষকে নিয়ে। জীবনকে জানতে হ'লে তার এলাকায়ই থাকতে হবে, জীবনকে এড়িয়ে পালিয়ে গিয়ে এক রোমন্থক আশ্রমে ব'সে নাক টিপে প্রাণায়াম করলে ফাঁকা মৌজ হ'তে পারে, কিন্তু এমন কোন সত্যিকার সৃষ্টি হ'তেই পারে না যা মানুষের কাজে আসে।' ব'লে ছায়া আমার দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বলল: -"একথাও মেনে নেবে তুমি 'দোষ কি' ব'লে?

আমি হেসে ফেলে বললাম: "কী মুস্কিল! রঙ্গলাল-বাবু কি আমাকে মানাবারজন্যে খাঁড়া উঁচিয়েছেন, না নিজের বিজ্ঞ মতামত জাহির ক'রে নাম কিনবার জন্যেই আমার উপর চড়াও হয়েছেন? ওরে ছায়া, বৈজ্ঞানিক হ'তে হ'লে চাই এ-বিজ্ঞতার ভড়ং—এই যার বিন্দু-বিসর্গও জানি না তার সম্বন্ধেও যা মুখে আসে তাই বলা। আমার মনে পড়ে প্রেমলের একটি চিঠি। সে লিখেছিল আমাকে যে আজকাল অনেকে ভারি বোকার মত কথা বলে—যে, সাধুরা রণছোড় হ'য়ে জীবন থেকে পালাতে চায় ব'লেই জীবন সম্বন্ধে জানার মত কিছুই জানতে পারে না। তার একটি লাইন আমার মনে গেঁথে গেছে: 'To practise yoga is to grasp the very heart and soul of life and to grasp it as no others do who rake about in its dead ash.'

ছায়া বলল: "একথার ঠিক মানেটা কী ভাই?"

আমি বললাম: "মানে, যোগ হ'ল সেই আলোর আলো যা এক্স-রে-র মতন পৌঁছয় মানুষের মনের তল পর্যন্ত, তাই দেখতে পায়—মনের অতলে কোথায় কী লুকিয়ে আছে। আর সে শুধু রোগের নিদান দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, চিকিৎসার বিধানও দেয়। তবে যারা কোন দিনই যোগ করেনি তারা কী ক'রে জানবে যোগশক্তির ক্রিয়ার কি মর্ম? এই জন্যেই বলছিলাম রঙ্গলাল সম্প্রদায়ের বালভাষে রাগ করতে নেই। একটা উদাহরণ দিই—এই সব ধনুর্ধর খেতাবীরা কী দারুণ অজ্ঞ! কিছুদিন আগে জ্ঞানেশ এই রঙ্গলাল বাবুরই একটা বইয়ের সমালোচনা করেছিল। তাতে সে লিখেছিল—রঙ্গলাল বাবু তীক্ষ্ণধী তাই ধ'রে ফেলেছেন যে, গুরুবাদ হ'ল আসলে অসহায় কান্নাকাটিবাদ। সাধুসন্ত-গুরুপুরুতরা শুধু একটি জিনিস জানেন—ভড়ং ওরফে ভাওতা। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের জনসাধারণ অতি কানপাৎলা—gullible—তাই গুরুবাদ আজো টিঁকে আছে। অতএব রঙ্গলাল বাবুকে ধন্যবাদ⋯ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছায়া রাগ ক'রে বলল: "আমি গুরুবাদ যোগ আশ্রম এসবের কিছুই জানি না অসিদা। কিন্তু আমার ভালো লাগে শরৎবাবুর একটি কথা: যে, বড় কিছুই মেলে না প্রণাম করতে না শিখলে।"

আমি হেসে বললাম: "ওরে! রঙ্গলাল জ্ঞানেশের দল যে প্রণামকে মনে করে স্রেফ কুসংস্কার। বলে—এযুগে মাথাকোটাকুটি, হাতজোড় করা, কেঁদে ভাসানো এসব অচল। তাছাড়া হয়েছে কি জানিস? এরা মেকি গুরুদের মেকিয়ানাকে নিশানা ক'রে তীরন্দাজি ক'রে ভুল না করলেও যখন সে-তীর ছোড়ে সদ্গুরুদের বিঁধতে তখন সত্যি হাসব না কাঁদব ভেবে পাই না। হাসি আসে এদের নিষ্ফলতার কথা ভাবতে, কান্না আসে এদের অজ্ঞতার তল না পেয়ে। মনে হয়—আহা বেচারীরা কী দুর্ভাগা! —পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মেও সাধুর শ্রেষ্ঠবিকাশ সদ্গুরু কী বস্তু জানল না!" প্রেমল এ-খেদ করত উঠতে বসতে।

ছায়া আর্দ্রকণ্ঠে বলল: "এলাহাবাদে প্রেমল বাবাজিকে দেখে আমার কী যে ভালো লেগেছিল অসিদা, বলতে পারি না। অতবড় বিদ্বান্! কেম্ব্রিজের ডিগ্রি—তার ওপর (চোখ বড় বড় ক'রে) একেবারে খাস সাহেব!—অথচ কী ভাবে তাঁর গুরুমা শান্তি দেবীর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতেন বলো তো! আমি কোনোদিনও ভুলব না

তাঁর একটি কথা। আমি তোমার শেখানো "মন তুমি কৃষি কাজ জানো না ? রামপ্রসাদী গানটি গাওয়ার পরে তিনি বলেছিলেন : 'মা, এ-গানটিতে যা গাইলে সেটি জীবনে ফলিয়ে তুলতে পারলে তবেই গাওয়া সার্থক হবে।' ব'লে শেষে বলেছিলেন : 'আর একবার গাও তো মা শেষ দুটি চরণ :

গুরুদত্ত বীজ রোপণ ক'রে ভক্তিবারি তায় সেঁচ না।
তুই আপনি যদি না পারিস মন রামপ্রসাদকে
সঙ্গে নে না!'

মনে আছে তোমার ?"

আমি ওকে আদর ক'রে বললাম : "আছে রে আছে। এ-চরণ দুটি যখন তুই গাস সত্যিই আমার বুকের রক্ত দুলে ওঠে যে! গা তো।"

ছায়া বলল : "সে পরে হবে। এখন শুনি একটু তোমার কথা, অসিদা।"

"কী শুনবি শুনি ?"

"গুরুবাদ বলতে ঠিক কী বোঝায় ? না, তার আগে আর একটা কথা : আচ্ছা, গুরু যে আশীর্বাদ করেন তার মধ্যে দিয়েও কি সত্যি এমন শক্তি আসে যাতে মানুষের জীবন বদলে যেতে পারে ?"

আমি বললাম হেসে : "না পারলে আমি এত বদলে গেলাম কেমন ক'রে ?"

ছায়া বলল : "আহা! তুমি যে কী, অসিদা! তুমি কি আমাদের মতন সাধারণ মানুষ ? তুমি যা পারো সবাই পারে ? আমি বলছি যারা দুর্বল অথচ শক্তি চায়, সত্য ভালোবাসে অথচ হাৎড়ে মরে—তারাও কি গুরুর আশীর্বাদে সত্যি শক্তি আলো পেতে পারে ?"

আমি বললাম : "আচ্ছা শোন্ তবে বলি বিমলার গল্প —যে কী ভাবে দুর্বলতা থেকে—না গোড়া থেকেই বলি যথাপর্যায়ে।

দুই

সেবার যখন বরোদা যাই গুরুবাদ ও যোগশক্তি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ রাখতে, তখন যোগাযোগটা হ'য়ে গেল আশাতীত। ফলে ধুমধাম হ'ল প্রচুর। গাইকবাড়ের নিজস্ব একটি মস্ত হল-এ বক্তৃত হ'ল। গাইকবাড় নিজে আসতেন কিন্তু সে সময়ে তিনি ছিলেন অসুস্থ। তবে এলেন তাঁর মন্ত্রী, সেনাপতি, সেক্রেটারি, নানা প্রফেসর—যাকে বলে the elite of the town—এ একটুও বাড়িয়ে বলছি না। এত 'রাজকীয়' ধুমধড়াক্কা এর আগে আর হয় নি। রঙ্গলাল বাবু দেখলে নিশ্চয়ই বিমর্ষ হতেন, জ্ঞানেশ সম্ভবতঃ ক্ষুণ্ণ হয়ে বিজ্ঞ বিদ্রূপের তীরন্দাজি করত : 'রাজারাজড়াদের কাছে আর কী আশা করা যেতে পারে ?'

কিন্তু হায় হায়, হরিষে বিষাদ! হঠাৎ এমন দারুণ কাশি আমাকে চেপে ধরল যে দমবন্ধ হবার জোগাড়! আর আরম্ভ হ'ল বক্তৃতার ঠিক দুদিন আগে।

দুমেলে তার করলাম। গুরুদেব আশীর্বাদ পাঠালেন টেলিগ্রামে। আশ্চর্য, তার পরেই কাশি ক'মে গেল। যে-গুজরাতী ডাক্তার—নানাভাই—আমাকে দেখছিলেন তিনি বলেছিলেন "Complete rest"- যা ডাক্তারদের বুলি। কিন্তু আমি পণ নিয়েছিলাম রণে ভঙ্গ দেব না কিছুতেই। তাই কেবলই জপতাম গুরুমন্ত্র। ডাক্তারকে বললাম : "বিশ্রাম নেব, কিন্তু গানের পরে, আগে নয়।"

নানাভাইয়ের, কেন জানি না, আমার প্রতি একটা মমতা হ'ল। বললেন : "যদি গান ও বক্তৃতা দুইই করেন পর পর তো বড় অত্যাচার হবে। হয়ত এ-ব্রঙ্কাইটিস নিউমোনিয়ার দিকেও মোড় নিতে পারে। তাই আমি বলি কি, বক্তৃতার পরে একটু জিরিয়ে নিন। শুধু গরম কফি খাবেন দশ পনেরো মিনিট ধ'রে। সে সময়ে আমার মেয়ে বিমলা নাচবে। সে এখানে খুব পপুলার। রসভঙ্গ হবে না। তারপরে আপনি গাইবেন, কেমন ?"

আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম : "খুব ভালো কথা, বহু ধন্যবাদ।"

তিন

ছায়া (সকৌতূহলে চোখ বড় ক'রে) : কেমন নাচল বিমলা!

আমি : সে এক হৈ হৈ কাণ্ড! ও নাচত সত্যিই ভালো। কিন্তু সেদিন ও যে-নাচ নাচল তেমন নাচ ও কখনো নাচে নি। নাচের দুতিন দিন আগে ও আমাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল গুরুদেবের আশীর্বাদ আমি আনিয়ে দিতে পারি কি না। এত জাঁকালো সভায় এর আগে কোনদিন নাচে নি তো! আমি খুশী হ'য়েই

গুরুদেবকে এক দীর্ঘ তার করলাম। উত্তরে তিনি তার করলেন সোজা বিমলাকে তাঁর আশীর্বাদ জানিয়ে। আশীর্বাদ এল আসরের আগের দিন বিকেলবেলা। ও তো আনন্দে আত্মহারা! এত আনন্দ যে, আমাকে বেশ একটু আশ্চর্য হ'তে হ'ল বৈ কি। কারণ ওর মতন মডার্ন মেয়ে যে কোনো গুরু ফুরুর তোয়াক্কা রাখতে পারে এ আমার মনে হয় নি একবারও। পনেরো বৎসর বয়সে ও বিলেত ঘুরে এসেছিল বাপের সঙ্গে। ষোল বছরেও ফ্রক পরত। আঠারো বছরের শাড়ী পরতে শিখেছিল বটে কিন্তু মাঝে মাঝেই হাঁটুখোলা স্কার্ট পরত। বলত শাড়ীকে ও "ম্যানেজ" করতে পারে না। নানাভাই মেয়ের বুদ্ধি ও প্রতিভার কথা বড় গলা ক'রেই সর্বত্র বলতেন। তা বলবেন না? যেমন সুন্দরী, তেমনি গুণবতী তথা বুদ্ধিমতী। ইংরাজি ও ফরাসি শিখেছিল মেম গভর্নেসের কাছে। তার উপর নাচে এত নামডাক। পিতৃগর্বকে দোষ দেওয়া যায় না তো।

এহেন মেয়ে—ভাব্‌রে ছায়া, ভাব্ একবার—কিনা নাচের আগের দিন গুরুদেবের আশীর্বাদে শুধু আহ্লাদে আটাত্তরখানা হওয়া নয়, তাঁর ছবির সামনে ব'সে প্রার্থনা সুরু ক'রে দিল—আর চোখে ধারা বইল প্রার্থনা করতে করতে! এ আমার স্বচক্ষে দেখা, একটুও বাড়ানো নয়।

ছায়া (ক্ষুণ্ণ): কিন্তু আমার তো কই কারুর কাছে প্রার্থনা করতে মন সরে না ভাই—এক তোমার কাছে ছাড়া।

আমি (ওকে আদর ক'রে): ওরে, ধাপে ধাপেই ওঠে মানুষ—তোরও একদিন না একদিন উন্নতি হবে—আমাকে ছেড়ে ধরবি সেদিন গুরুদেবকে—আশীর্বাদ করছি তোকে।

ছায়া (রাগতঃ): চাই না এমন আশীর্বাদ। গুরুদেবকে আমি ভক্তি করি সত্যিই। কিন্তু গান যখন করব তখন শুধু তোমার কাছেই প্রার্থনা করব—আর কারুর কাছে নয়, তাতে তুমি যতই কেন না রাগ করো। কিন্তু মরুকগে, তারপর কী হ'ল বলো।

আমি: তারপর আর কি—ঐ যে বললাম ও নেচে যাকে বলে ফাটিয়ে দিল। পরে ও চুপি চুপি আমাকে বলেছিল যে, নাচের আগের দিন ও গুরুদেবকে স্বপ্নে দেখেছিল আর তিনি ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। যাক, তারপর কী হ'ল বলি শোন্।

আমার গান বক্তৃতা আর বিমলার নাচ এই তিনে মিলে বরোদায় এক হিল্লোল ব'য়ে গেল যেন। বিমলার যে কী আনন্দ! বলল: "চলুন দাদা, আমাদের ওখানে—গাইকবড়ের অতিথিশালায় আর নয়। এখন আপনি আমাদের আপন জন, গাইকবড়ের অতিথিশালায় থাকা মানাচ্ছে না।"

ছাড়ল না কিছুতেই নাছোড়বান্দা মেয়ে। কাজেই যেতে হ'ল। ওদের ওখানে দশবারো দিন থেকে জিরিয়ে ভালোই হ'ল। আমার ব্রঙ্কাইটিস সেরে গেল।

এই দশবারো দিনে বিমলার কথা অনেক শুনলাম। বুঝলাম no rose withont a thorn প্রবচনটি আপ্তবাক্যের মতনই সত্য। বিমলা প্রতিভাবতী হ'লে হবে নি, যেমন নার্ভাস তেমনি ঝোঁকালো। কখন কী ক'রে বসে—নানাভাই তো ভেবে অস্থির। শেষে একদিন চুপি চুপি বললেন যে, বিমলার বহু অনুরাগী—যাকে বলে fan—তাই ভেবে ভেবে ওঁর রাতে ঘুম হয় না—কখন কী ফ্যাসাদে পড়ে! তাঁর বিশেষ ভাবনা হয়েছে কখন ব'লে একটি ছেলের জন্যে। বিমলা ক্রমশই তার দিকে ঝুঁকছে। অথচ সে যেমন অলস তেমনি গরিব—যদিও অত্যন্ত সুশ্রী ও বুদ্ধিমান। বলতে কি, এমন কন্দর্পকান্তি যুবক আমি বেশি দেখি নি। কাজেই বিমলাকে দোষ দেওয়া যায় না—বললাম নানাভাইকে। তিনি ভ্রূকুটি ক'রে বললেন: "বটে, কিন্তু তাই ব'লে তো আর অমন বাজে পাত্রের হাতে মেয়েকে সঁপে দিতে পারি না!"

শেষে আমার প্রস্থানের দুতিন দিন আগে নানাভাই আমাকে হঠাৎ অনুরোধ করলেন বিমলাকে দুমেলে আমাদের আশ্রমে চিরদিন রাখতে। বললেন: "কমল ছিনে জোঁক, ওর পিছু নিয়েছে—ছাড়বে না। তাই ওকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে দূরে পাঠানো ছাড়া পথ নেই।" আমি বললাম: "বিলেত পাঠালে কেমন হয়?" তিনি বললেন: "বিলেত যেতে ও নারাজ। তবে গুরুদেবের প্রতি ওর মন ঝুঁকেছে, তাঁর আশ্রমে যেতে ও রাজী আছে। তাঁর ছবির সামনে প্রার্থনা করে..." ইত্যাদি। অনেক বোঝাপড়ার পরে শেষে নানাভাই আমাকে কর-

জোড়ে বললেন: "ওকে আপনার সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান দাদা, আর নিজের তদারকেই রাখবেন আশ্রমে—নৈলে সেখানে যদি ফের আবার এক নতুন fan-এর ফ্যাসাদে পড়ে, কে জানে?"

আমি ভাবিত হ'য়ে পড়লাম। কিন্তু নানাভাই মেয়ের ম'তই নাছোড়বান্দা, বললেন—গুরুদেবকে তার না করলে শুনবেন না। শেষে এক দীর্ঘ তার করলাম ত্রিশ টাকা খরচ ক'রে—সব জানিয়ে। আমি ভেবেছিলাম গুরুদেব রাজী হবেন না, বিশেষ অষ্টাদশী মোহিনী আশ্রমে রাখার বিপদ সমূহ ব'লে—আরো এই জন্যে যে, মেয়ে যেমন রোখালো তেমনি ঝোঁকালো। আমি সবকথাই খুলে জানিয়েছিলাম তাঁকে।

কিন্তু গুরুদেবের চাল কে বুঝবে? তিনি তার করলেন বিমলাকে নিয়ে আসতে ও নানাভাইকে ভরসা দিতে যে, সে আমার কাছে আমার তদারকেই থাকবে।

আমি বিপন্ন হ'য়ে বিমলাকে বললাম সব কথা খোলাখুলিই—যে অনাত্মীয়া মেয়েকে আশ্রমে আমার কাছে রাখলে হয়ত নানা সাধক সাধিকা নানা কটাক্ষ করতে পারে—হাজার হ'লেও ও কুমারী মেয়ে তো···ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিমলা শুনে শুধু মুচকে হেসে বলল: "দাদু! আমি আপনার নাৎনির বয়সী। আপনাকে দাদু ডাকি। এহেন আপনার আমাকে নিয়ে দুর্নামের ভয়?" বিব্রত হ'য়ে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, দুর্নামের ভয় আমার চেয়ে ওরই বেশি। ও নিষ্পরোয়া সুরে বলল: "দাদু, আমার দুর্নাম রটেছে তেরো চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই ও আমার গা সওয়া হ'য়ে গেছে। কে কী বলছে? ফুঃ!

ছায়া: ধন্যি মেয়ে, অসিদা!

আমি: ধন্যি ব'লে ধন্যি। যে এক কথায় চ'লে আসে এক অনাত্মীয় সাধকের সঙ্গে সুদূর যোগাশ্রমে এক অচিন মানুষকে দেখতে!

চার

ছায়া: তারপর অসিদা?

আমি: তারপর আর কি? ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে হ'ল। গুরুদেব তার করেছেন স্বয়ং—আমার আপত্তি ফেঁশে না গিয়ে পারে?

ও থাকল আমার কাছেই অবশ্য। কিন্তু তারপরেই মহা মুস্কিল!—কত সাধক সাধিকাই যে আসা সুরু করল ওর নাচ দেখতে—কী বলি তাদের, যখন গুরুদেব অনুমতি দিলেন ও নাচতে পারে—তবে কেবল আমার ভক্তির গানের সঙ্গে। বললেন এতে ওর ভালোই হবে।

হ'লও তো দেখলাম স্বচক্ষে। আমার নানা ভজন কীর্তনের সঙ্গে নাচতে নাচতে মাস খানেকের মধ্যেই ওর মনে সত্যিই ভক্তি জেগে উঠল। সময়ে সময়ে নাচতে নাচতে ওর মুখের ভাবই বদলে যেত—মনে হ'ত যেন ও একেবারে অন্য মানুষ।

কিন্তু ফের সেই গোলাপে কাঁটা! ক্রমশঃ নানা সাধক সাধিকার মন্তব্য কানে এল যাকে বর্ণরোচক বলা চলে না। ভাবটা: নর্তকীর স্থান রঙ্গমঞ্চে—আশ্রমে নয়। গুরুদেবকে জানালাম। তিনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন, বললেন: "অপবাদে ভয় কি? মিথ্যা কুৎসায় ক্ষতি হয় না কখনো। উপনিষদে কি বলে নি খতিয়ে সত্যেরই জয় হয়। মিথ্যার নয়—সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্?···"

এমন সময় আমার নামে বেনামী চিঠি আসা সুরু হ'ল: পর পর তিন চারটি। প্রতিটিরই বাদী সুর এক: বিমলাকে আশ্রমে রাখলে আমার ভালো হবে না।

নানাভাইকে চিঠিগুলি পাঠিয়ে দিলাম। তিনি লিখলেন এসব চিঠি নির্ঘাৎ কমলের লেখা। তাই বিমলা আরো কিছুদিন থাকুক। কমলের আর এক জায়গায় বিয়ের কথা হচ্ছে। যদি বিয়ের ফুল ফোটে তাহ'লে বিমলাকে ফিরিয়ে আনা যাবে। শেষে অনুরোধ করলেন: অন্ততঃ আর দু-মাস ওকে রাখুন আপনাদের আশ্রমে—ওর মন এখানে বসেছে—এ এক মস্ত বাঁচোয়া···ইত্যাদি।

আমি বিষম ভাবনায় প'ড়ে গেলাম, যদিও সেই সঙ্গে যে একটু আত্মপ্রসাদের মিশোল ছিল না এমন কথা বলব না। যে-মেয়ের কোথাওই মন বসে না সে আমার কাছে পরমানন্দে আছে, গুরুদেবের সঙ্গ চায়, তাঁর ভাষা শোনে। তাঁকে প্রণাম ক'রে পুলকিত হয়—এ তো একটা অভাবনীয় ব্যাপার! এ কি সেই বিমলা যাকে দেখেছিলাম দু-মাস আগে নানা ছেলের সঙ্গে বলডান্স করতে—যে শত্রুমিত্র কারুর কথাই কানে না তুলে?

এর পরে হঠাৎ কমলের এক টেলিগ্রাম আমার নামে:

তার অসুখ, নিউমোনিয়া—বিমলা না এলে সে বাঁচবে না। গুরুদেবের কাছে গেলাম। তিনি বললেন বিমলাকে টেলিগ্রাম দেখাতে।

ও খানিকক্ষণ গুম্ হ'য়ে রইল। পরে বলল: এবার ওকে যেতেই হবে। ফের গুরুদেবকে জানালাম। তিনি বললেন আগে নানাভাইকে তার ক'রে খবর নিতে—কমলের সত্যি নিউমোনিয়া কিনা।

বিমলাকে বললাম। গুরুদেব বলেছেন শুনেই সে রাজী হ'ল অপেক্ষা করতে। এ আর এক অঘটন: যে মেয়ে কারুর কথা কানে তোলে না সে গুরুদেবের এক কথায় বাগ মানল!! যাহোক আমি নানাভাইকে তার করার দুদিন পরেই উত্তর এলো: কমলের অসুখ সামান্য। একশো এক জ্বর—নিউমোনিয়ার কোনো ভয়ই নেই।

ছায়া (হাততালি দিয়ে): বেশ হয়েছে। ধরা প'ড়ে গেল।

আমি: তা বটে। কিন্তু এবার একটু সত্যিকার মুস্কিল হ'ল: বিমলা বিশ্বাস করল না। বলল স্পষ্টই: "বাবা মিথ্যা কথা বলছেন। আমার মন নিচ্ছে ওর নিউমোনিয়াই হয়েছে। আমি যাব।" বলতে বলতে হঠাৎ সে কী কান্না! দেখা দিল—এক মুহূর্তে—সেই আগেকার ঝোঁকালো মেয়ে: "আমি যাব যাব যাবই—নৈলে ও বাঁচবে না···আমাকে যেতেই হবে।"

কাঁদতে কাঁদতে ওর প্রায়ই হিষ্টিরিয়া মতন হ'ত একথা নানাভাইয়ের কাছে শুনেছিলাম। এবার চাক্ষুষ করলাম: তিনি একটুও বাড়িয়ে বলেন নি তো। সে কী কান্না, হা হুতাশ···যেন একটা ঝড় ব'য়ে গেল আমার ওখানে।

শেষে কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা।

গুরুদেবকে জানাতে তিনি এলেন। ওর শিয়রে ব'সে ওর মাথায় হাত রেখে খানিকক্ষণ ধ্যান করতে ও চোখ মেলল।

গুরুদেব ওকে বললেন: "কী মা, যেতে চাও সত্যি?"

বিমলা গুরুদেবকে শিয়রে দেখে হকচকিয়ে গেল, বলল: "আপনি কী বলেন, গুরুদেব?"

গুরুদেব হাসলেন: "আমি তাদের কিছু বলি না যারা উপদেশ শোনেন, কিন্তু মানে না।"

ও চোখ বুঁজে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। চোখের ধারায় বালিশ ভিজে গেল। গুরুদেব স্বহস্তে ওর চোখ মুছিয়ে দিলেন, কিন্তু একটি কথাও না। একেবারে নিশ্চুপ।

একটুবাদে ও ফের চোখ মেলে বলল: "আমি শুনব আপনার কথা, গুরুদেব।"

গুরুদেব ওর চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন: "কথা দিচ্ছ?"

"দিচ্ছি, গুরুদেব।"

"পারবে কথা রাখতে?"

"যদি না পারি···আপনি শক্তি দেবেন···তাহ'লে পারবই পারব।"

গুরুদেবের চিন্তিত মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: "মেঘ কেটে গেছে। নানাভাইকে তার ক'রে দাও—ও যাবে না: কমলকে যেন তিনি জানিয়ে দেন।"

পাঁচ

ছায়া: তারপর অসিদা?

আমি: ও করল অসাধ্য সাধন: সত্যিই যাওয়াও আর নামও করল না। কমল পর পর তিন চার খানা ব্যাকুল তার করল কিন্তু ও রইল অচল অটল। শেষে হঠাৎ বলল আমাকে একদিন হেসে: "আমি পেরেছি কেন জানো, দাদু?"

"কেন?"

"গুরুদেবের একটি কথায় আমার মনে যে কী ভীষণ জোর এসে গেছে কী বলব? তোমাকে বলি নি। কদিন আগে তুমি যখন ধ্যান করছিলে আমার কাছে এক তার এল। টেলিগ্রামে ছিল: যদি আমি না আসি কমল বিষ খাবেই খাবে। আমার মনে কে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। মনে হ'ল—পারব না পারব না পারব না কথা রাখতে।

"সোজা চলে গেলাম গুরুদেবের কাছে। কেঁদে তাঁর পায়ে ভেঙে পড়লাম। তিনি সব শুনে বললেন যে, প্রতি 'পারি না'-র নিচেই লুকিয়ে আছে 'চাই না পারতে'—behind every can't, little mother, there is a won't in hiding, ব'লে হেসে 'ভয় নেই, কমল আত্মহত্যা করবে না—সব ভাঁওতা।'

"ব'লে তিনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা থেকে মেরুদণ্ড বেয়ে কী এক বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার মনে হ'ল আমি সব পারি। আমি তোমায় না ব'লেই তার ক'রে দিয়ে এলাম: "you are lying. I won't go.

ছায়া (চম্‌কে) বলো কি, অসিদা ?

আমি: আর বলি কি দিদি! এ আমার চাক্ষুষ করা ব্যাপার।

ছায়া: ও সত্যি পারল এমন…কী বলব…কঠিন তার করতে ?"

আমি: ও আমায় পরে বলেছিল—গুরুদেবের আশীর্বাদের শক্তি পেতে না পেতে ও টের পেয়েছিল যে কমল ওকে খেলাচ্ছে।

ছায়া: এ কি সত্যি হয় অসিদা ?

আমি (হেসে): একটি বিখ্যাত শ্লোকে আছে: অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। এর মানে এই যে, যে-গুরু তাঁর জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে শিষ্যের অন্ধ চোখে দিব্যদৃষ্টি দিতে পারেন তাঁকে প্রণাম।

ছায়া: শ্লোক তো অনেক আছে অসিদা। এমন শ্লোকও আছে শুনেছি যে বলে শূদ্র যদি বেদ পড়ে তবে তার মুণ্ডপাত না করলে পাপ হয়।

আমি: রামায়ণের উত্তরকাণ্ড তো? কিন্তু আমি কোনোদিন মানতে পারি নি।

ছায়া: আমিও তো তাই বলছি অসিদা। যে সত্যকে চায় সে জীবনে তাকে পায় কি না। যে শক্তি চায় সে জীবনে শক্তি পায় কি না—এই-ই ছিল আমার প্রশ্ন। শ্লোকে একথা আছে কি না আমি জানতে চাই নি, চাই না, চাইবও না কোনদিন।

আমি (হেসে): তোর কাছে বিমলার ভঙ্গির ছোঁয়াচ লেগেছে—বেপরোয়া বিদ্রোহের।

ছায়া (অনুতপ্ত): না না, অসিদা। লক্ষ্মীটি! আমাকে মাপ করো, আমি সত্যিই বিদ্রোহ ভালোবাসি না। বিশেষ তোমার সঙ্গে মুখোমুখি ক'রে বিদ্রোহ ? ছি ছি! বিশ্বাস করছ না? (ব'লেই দু হাতে মুখ ঢাকে)

আমি (ওকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে। ও কী রে? আমি কি তোকে বকেছি না কি ?

ছায়া (চোখ মুছে): তবে কেন বললে বিদ্রোহের কথা? আমি কী বুঝি অসিদা, যে বিদ্রোহ করব? বিমলার মতন বুদ্ধি, প্রতিভা, সাহস…

আমি: রোস রোস। মিইয়ে যাস নি তা ব'লে। সাহসের কথা বলতে পারি না—জানি না তুই কতটা পারিস আর কোথায় হার মানিস—কিন্তু বুদ্ধি বা প্রতিভায় তুই বিমলার চেয়ে একচুলও কম নোস একটুকু জানি।

ছায়া (খুশী হয়েও রাগত: সুরে): কী যে বলো তুমি অসিদা!

আমি: "কী যে বলি" মানে? যাকে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধি লিখে বাংলার নাইটিং গেল উপাধি দিয়াছেন—

ছায়া (অসিতের মুখ চেপে): তুমি কী যে অসিদা! দিয়েছেন তো তোমারই সুপারিশে।

আমি: মোটেই না।

ছায়া: যেতে দাও ওকথা। বলো বিমলার কথা, ধান ভানতে শিবের গীত ছেড়ে।

আমি (চোখ মিটমিট ক'রে): অতুলপ্রসাদের গান তোকে শেখাই নি ?

(সুর ক'রে)

"কী যাদু বাংলা গানে!
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে!
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা!"

আর যদি সে-চাষা শৈব হয় তবে সে শিবের গান গাইবে না তো কি জিভের গান গাইবে:

সন্দেশ বোঁদে গজা মতিচুর সয় ভাজা সরপুরিয়া
গড়েছ কী নিধি, দয়াময় বিধি, কত না বুদ্ধি করিয়া!

ছায়া (হেসে গড়িয়ে প'ড়ে): তুমি যে কী অসিদা! সব ভুলে গেলাম—বিমলার কথা। তুমিও নিশ্চয়ই খেই হারিয়ে ফেলেছ।

আমি: না। তুই জিজ্ঞাসা করেছিলি যে, গুরুর প্রসাদে যারা সত্য আর শক্তি চায় তারা জীবনে সে শক্তি ও সত্য পায় কি না ?

ছায়া: ঠিক ঠিক। বিমলা শক্তি তো পেয়েছিল

দেখছি। কিন্তু সত্যি পেয়েছিল তো? মানে বরাবরের জন্যে?

আমি: পেয়েছিল বৈ কি, কারণ সে দেখতে পেয়েছিল—মানুষ যাকে প্রেম প্রেম ব'লে এত উজিয়ে ওঠে তার মধ্যে সোনা যদি থাকে তিল পরিমাণ তবে খাদ থাকে তাল পরিমাণ।

ছায়া: রোসো রোসো অসিদা, অমন মেল ট্রেনের মতন দৌড়লে পেরে উঠব কেমন ক'রে? বিমলা এ-খাদের খবর পেল কবে—কোথায়?

আমি: মাসখানেক পরেই—বরোদায় ফিরে এসে—যখন শুনল কমল তার রূপের জোরে এক ক্রোরপতির মেয়েকে মজিয়ে পালিয়েছে বিলেত। বাপ সেখানে ধাওয়া ক'রে মেয়ের বিয়ে দেয়—মান বাঁচাতে।

ছায়া (গুম্ হ'য়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে): এখন বিমলা কোথায়, অসিদা?

আমি: আমেরিকায়। আজ সকালেই তার একটি চিঠি পেয়েছি অনেকদিন বাদে। দেখবি?

ছায়া (সকৌতূহলে): দেখব না? দেখি দেখি!

আমি (চিঠি বার ক'রে): এই দেখ্ লিখেছে এক পোষ্টকার্ডে।

দাদু! তোমাকে প্রণাম। বড় বাঁচিয়ে দিয়েছ। কমল লণ্ডন থেকে উড়ে এসে এখানে আর একটি মেয়ের সঙ্গে আছে—হলিউডের এক তারকা। আমি খুব নাচছি। নামও করেছি। কিন্তু গুরুদেবকে ভুলি নি। ফিরে প্রথমেই যাব তাঁকে প্রণাম করতে। বড় ব্যস্ত। তাই পোষ্ট কার্ডে লিখছি। জানোই তো আমেরিকায় তাদের কী ভাবে দিন কাটে যারা নাচতে কি গাইতে পারে। তবে আমি আর পড়ি নি দাদু। আর সে শুধু গুরুদেবেরই কৃপায়—নৈলে কে বলতে পারে আমার কী অবস্থা হ'ত? তাই শত শত প্রণাম গুরুদেবকে—আর তোমাকে, দাদু, যার প্রসাদে আমি গুরুবরণ করতে পেরেছিলাম।

দেখা হবে মাসখানেকের মধ্যেই।

তোমার স্নেহদুলালী

বিমলা।

ছায়া (হেসে সুর ক'রে) তোমারই একটি কীর্তন মনে প'ড়ে গেল অসিদা!

আমি: কী গান রে?

ছায়া (সুর ক'রে): কাশ্মীরে, শ্রীনগরে, আমাকে যে-গানটি শিখিয়েছিলে—শিকারায়—মনে নেই?

(সুর ক'রে)

ছিল না যাহার কোনো দাবিদাওয়া
তারে দিলে তব চিরন্তনে।
যা কিছু পেয়েছি—সবি প্রিয়, পাওয়া
তব চরণের অনুসরণে॥

আমি (ছায়ার মাথায় হাত রেখে): কী চমৎকার যে গাস তুই দিদি! আর ঠিক এম্‌নিই চমৎকার সে নাচত। জানিস সে প্রায়ই নাচতে ভালোবাসত আমার আর একটি গানের সঙ্গে:

(সুর ক'রে)

করুণার আঁখি কেমন তোমার, ভাষায় কেমনে বলি!
আলোয় যাহার যুগান্তরের আঁধার ওঠে উজলি'!...
যারা তব পথ চাহিয়া
থাকে নি বাসর জাগিয়া,
কেমনে বুঝিবে বিরহের পথে কী মিলন আলো ছলী?
বিষ কোন্ পথে হয় সুধা, গুরু, ভাষায় কেমনে বলি?

জন্মান্তরবাদী জন্মভূমি ভারতবর্ষ

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল

আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষের একটি নিভৃত অঞ্চলের একটি স্বল্পতম ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকে ভূমিষ্ঠ হইলেও, আমরা মনে করি,—সমগ্র ভারতবর্ষ, যাহার উত্তরভাগে কয়েক সহস্র যোজন বিস্তৃত "বাগার্থমিব-সংপৃক্ত" পার্বতী-পরমেশ্বরের লীলা নিকেতন, পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ সমন্বিত, তুষারকিরীটি দেবতাত্মা হিমালয় এবং অপর তিন দিকে বিশাল লবণাম্বুরাশি, যাহার তমাল-তাল-বনরাজীনীলা তটভূমিকে প্রতিনিয়ত বিধৌত করিয়া দিতেছে, সেই উপমহাদেশতুল্য দিগন্তপ্রসারিত ভূমিখণ্ডই আমার জন্মভূমি!

আমরা বাল্যকালে এক বিখ্যাত চিত্রকরের চিত্রিত ভারতমাতার যে আলেখ্য দেখিয়াছি, তাহা আমরা অনেকে জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারি না। ভুলিবার চেষ্টায় চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়, হৃদয়ে শূলাঘাতের তীব্র বেদনা, মস্তকে দণ্ডাঘাতের যন্ত্রণা বোধ হয়! ভুলিবার ব্যর্থ চেষ্টায় সর্বশরীর প্রকম্পিত হইতে থাকে! আমাদের সেই আলেখ্যে ভারতমাতা রক্তাম্বরা, আলুলায়িত-কুন্তলা। তিনি অন্তহীন জলরাশির উপর যুগ্মপদে দণ্ডায়মানা। তাঁহার নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কেশ-রাশি দিগন্তবিস্তৃত উচ্চাবচ হিমালয় পর্বতকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার দক্ষিণ অঞ্চলে শৌর্যে বীর্যে আত্মত্যাগে দীক্ষিত পাঞ্জাব-রাজস্থান, তাঁহার বামাঞ্চলে তদানীন্তন বৃহৎবঙ্গ, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসামের সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্যশ্যামলা, ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা গীতিগন্ধে সমাকীর্ণা চিরহরিৎ লাবণ্যময়ী ভূমি, ভূস্বর্গ কাশ্মীরে তাঁহার চির উন্নত শীর্ষদেশ, হৃৎপিণ্ডে উত্তর ও মধ্য ভারত ও গুর্জর প্রদেশ, কটিদেশে বিন্ধ্যপর্বতের মেখলা, আপদবিস্তৃত ক্রোড়দেশে তদানীন্তন দক্ষিণে ও বামে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্য। পদতলে একটি স্ফুটনোন্মুখ রক্তপদ্ম। গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী সরস্বতী-নর্মদা-সিন্ধু কাবেরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদনদী তাঁহার পরিহিত সাড়ীর পাড় রূপে সর্বশরীরে প্রবাহিত। স্বাধীন ভারতে ভারতমাতার সেই মহিমময়ী তেজোদৃপ্ত আলেখ্য আজ কোথায়? যে আলেখ্যে একবার দৃষ্টিপাত করিলে সকল ভারতবাসীর মস্তক শ্রদ্ধায় তাঁহার পদতলে অবনত হইত, মুখমণ্ডল তেজোময় হইত, গর্বে আশায় হৃদয়ে অসীম বল সঞ্চারিত হইত, আনন্দময়ী মৃতসঞ্জীবনী সেই মূর্তি আজ গৃহে গৃহে দেখিনা কেন? আজ ভারত-বাসী সংশয়াচ্ছিন্ন উত্তর পূর্ব পশ্চিম দিক হইতে আক্রমণের আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ কেন? এই সকল কেন প্রশ্নের উত্তর দিবার ক্ষমতা আজ আমার নাই—প্রতীকারের সহজ সরল পন্থা বলিবার সাধ্যও নাই। অপর কাহারো আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

তথাপি, আমাদের পরম গৌরব এই ভারতবর্ষই আমাদের জন্মভূমি! আজ সদর্পে, উদাত্তস্বরে স্বামীজীর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করি—সকল ভারতবাসী আমার ভাই-আমার প্রাণাধিক। সমগ্র ভারত আমার শিশুশয্যা, যৌবনের কর্মভূমি আনন্দ নিকেতন, বার্দ্ধক্যের অন্তিমশয়ন। সমগ্র ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আরো বলিতে ইচ্ছা করি—ভারতের দুঃখে আমার দুঃখ, ভারতের সুখে আমার সুখ—যতবার আমি পুনর্জন্মে বাধ্য থাকিব ততবার যেন আমি এই ভারতবর্ষেই জন্ম পরিগ্রহ করি। আমাকে যদি পশুপক্ষী এমন কি কীটপতঙ্গ-উদ্ভিদাদি রূপেও জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলেও যেন এই ভারতবর্ষের মৃত্তিকাই আমার সর্বপ্রথম ভূমিশয্যা হয়।

আমরা ভারতবাসী পুনর্জন্মে বা জন্মান্তরে বিশ্বাসী শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু-ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ (২।২৭)। জাত জীবের মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃতের পুনর্জন্মও তদ্রূপ নিশ্চিত। ইহার পূর্বে তিনি বলিয়াছেন, মানব যেরূপ জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্র

পরিধান করে, দেহী (আত্মা) তদ্রূপ জীর্ণশরীর ত্যাগ করিয়া নূতন শরীর ধারণ করেন (২।২২)। কিন্তু পুনর্জন্মে কিরূপ শরীর হইবে? তৎসম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন জীবের দেহত্যাগ সময়ে যে যে ভাবের স্মরণ হয়, পুনর্জন্মে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। রাজা ভরত, যাঁহার পবিত্র নামানুসারে আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ, সেই রাজা ভরত এক জন্মে তাঁহার লালিত এক মৃগশিশুর চিন্তার সময়ে দেহত্যাগ হওয়ায় পরজন্মে মৃগরূপে শরীর পরিগ্রহে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান আরোও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধেতু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান প্রতিপদ্যতে॥ (৪।১৪)
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গীষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ (১৪।১৫)

সত্ত্বগুণ পরিবর্ধিত হইলে দেহত্যাগে উত্তমলোক, রজোগুণ পরিবর্ধিত সময়ে দেহত্যাগে কর্মসঙ্গী মানবরূপে এবং তমোগুণাশ্রিত সময়ে দেহত্যাগে পশ্বাদি রূপে জন্ম হয়। আমাদের চারিদিকে যে অসংখ্য পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ-বৃক্ষ লতা গুল্মাদি আমরা দেখিতেছি তাহারা যে এক দিন আমাদের মত দেহধারী ছিলেন না তাহা কে বলিবে? আমাদের শ্রাদ্ধীয় মন্ত্রে "সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু" ইত্যাদি যে মন্ত্র আছে তাহাতে বর্ণিত আছে দশার্ণদেশে (বিন্ধ্যাচল নিকটবর্তী একটি স্থান) যে সপ্তব্যাধ বাস করিত, তাহারাই পরজন্মে কালাঞ্জির পর্বতে মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করে, তাহারাই তাহাদের মৃগলীলা শেষ করিয়া একটি দ্বীপে চক্রবাক্ পক্ষীরূপে জন্মলাভ করে। তাহারাই পরবর্তী জন্মে মানস সরোবরে হংস রূপে জন্মগ্রহণ করে। পরে তাহারাই বেদ পাঠক ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম লাভ করে। এরূপে আমরাও কত জন্ম অতিক্রম করিয়া এই দুর্লভ মানবজন্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাই বা কে বলিবে? ভারতধর্ম শাস্ত্র বলেন, মনুষ্যেতর যত জীবদেহ সমস্তই ভোগ দেহ। একমাত্র মানবদেহে ভোগদেহ ও কর্মদেহের সমন্বয়। অর্থাৎ মানব এই দেহে যেমন ভোগ সুখে শেষ করিতে পারে, তদ্রূপ-কর্মফল ক্ষয় করিতেও পারে। আমরা অহংবুদ্ধিতে যে সকল শুভ ও অশুভ কর্ম করিতেছি আমরা সেই শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগে বাধ্য। ঋষিগণ বলিয়াছেন—

মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্॥

কৃতকর্মের ভোগ ভিন্ন শতকোটি জন্মেও তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আমরা অবশ্যই আমাদের কৃত শুভ বা অশুভ সকল কর্মের ফলভোগ করিব। শুভকর্মের ফল সুখ, আর অশুভ কর্মের ফল দুঃখ। সাধারণভাবে বলা যায় পরহিতে কৃত কর্ম শুভ কর্ম এবং পরপীড়াদায়ক কর্ম অশুভ কর্ম। আমরা ইহজন্মে যে সকল শুভ বা অশুভ কর্ম করিতেছি তাহার সকল ফলভোগ আমরা ইহজন্মে নানা কারণে করিতে পারি না। তদ্রূপ পূর্ব পূর্ব জন্মে যাহা যাহা করিয়াছি তাহার সকল ফলভোগ করিতে পারি নাই। এ জন্য মনীষীগণ বলেন কর্ম ফলভোগ দুই প্রকার (১) প্রারব্ধ (২) সঞ্চিত। যে ফলভোগ জন্য আমরা ইহজন্ম গ্রহণে বাধ্য হইয়াছি তাহাই প্রারব্ধ। এই প্রারব্ধ ভোগ ভিন্ন খণ্ডিত হয় না। এবং সাধনপন্থী হইলে সঞ্চিত কর্মফল খণ্ডিত হয়। মানব ভিন্ন অন্য জীবদেহ শুধু প্রারব্ধ ভোগ নিমিত্ত। কিন্তু মানবদেহে প্রারব্ধ ভোগের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চিত কর্মফলকে খণ্ডন করা সম্ভব। এই জীবজগতে জীবগণের সুখ দুঃখের যে বৈষম্য তাহা এই প্রারব্ধ ভোগ জন্য। কোন জীব যেমন আজন্ম সুখভোগ করিয়াই তাহার এই জীবলীলা শেষ করিতেছে তদ্রূপ কোন জীব আজন্ম দুঃখভোগ করিয়া তাহার এই জীবলীলা শেষ করিতেছে কেহ বা সাময়িকভাবে সুখ ও দুঃখভোগ করিতেছে ইহা কি বিনা কারণে সংঘটিত হইতেছে? ভারতীয় ঋষিগণ বলেন—ইহার কারণ অহংবোধ কৃতকর্ম। যে সকল কর্ম অনাসক্ত মনে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়া ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত করা যায় তাহা ভর্জিত বীজের ন্যায় কোন ফলপ্রসূ হইতে পারে না। অন্যান্য কর্মের ফলভোগে আমরা বাধ্য।

ভারতবর্ষের পুনর্জন্মবাদ বা জন্মান্তরবাদের মূলে কর্মফল বাদ। সমস্ত বাদের মূলে এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মবাদ ব্রহ্ম বহুভাবে বহুরূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে লীলায়িত। তিনি লীলা স্বভাব, একভাবে লীলা সম্ভব নয়। এজন্য তাঁহার বহুভাব বহুরূপ—এজন্য প্রচ্ছন্নচৈতন্য জড়জগৎ এবং ব্যক্ত চৈতন্য জীবজগৎ। এই জীবজগৎ কর্মপরতন্ত্র। এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ঈশ্বরভাবে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া

আছেন। তিনি দ্রষ্টারূপে জীবের সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না দেখিতেছেন—আবার যে জীব অবিদ্যা প্রসূত অহংকার ত্যাগ করিয়া ভগবানে শরণাগতি লইতে পারিতেছেন, সেই জীবের সমস্ত কর্মফল খণ্ডিত করিয়া সুখ দুঃখ অতীত পরমানন্দময় অবস্থা লাভ করিবার সমস্ত ব্যবস্থা তিনিই করিতেছেন।

আমরা অহংকার পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ চরণে শরণাগতি গ্রহণ করিতে পারিতেছি না এজন্য জনন মরণ প্রবাহে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। সুখদুঃখের হাসিকান্নায় কখন ভাসিতেছি কখন ডুবিতেছি। রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—কারোর দোষ নয় মা শ্যামা, আমরা স্বখাদসলিলে ডুবে মরি।

আমরা পূর্বজন্মে কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম তাহা অনেকেই বলিতে পারি না। কদাচিৎ কোন দেশে জাতিস্মর মানবের আবির্ভাব হয়। প্রায় এক বৎসর পূর্বে "দি ইলাসট্রেটেড উইকলি"তে একটি ঘটনা প্রকাশিত হয়। তুরস্ক দেশে আদনার অন্তর্গত মাদিক জিলায় মেহেমৎ আলতিনক্লিস্ এর পুত্র ইসমাইল ১৯৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করে। ইস্মাইল তাহার নবম সন্তান। মেহেমৎ-এর ছিল মুদীর দোকান এবং এই সঙ্গে সে মাংসও বিক্রয় করিত। ইসমাইলের যখন দেড়বছর বয়স তখনই সে তার গত জীবনের কথা বলে। সে বলে গত জন্মে তার নাম ছিল আবিদসুজুলমাস্ এবং তাকে হত্যা করা হয় মাথায় আঘাত করে। তার জন্মের সময় থেকে মাথায় একটা ক্ষত চিহ্ন ছিল। মাদিক জিলায় বাহচেহেতি গ্রামে আবিদ-সুজুলমাস ছিল একজন ধনী চাষী। ইসমাইলের পিতা বালকের এসব কথায় কোন কান দিত না। শেষে ইস্-মাইলের পুনঃপুনঃ অনুরোধে ও কান্নায় তাহার পিতা তাহাকে আবিদের বাড়ীতে লইয়া যায়। ইসমাইল সেখানে যাইয়া তার দুই স্ত্রী পুত্র কন্যাগণকে চিনিতে পারে। আবিদের স্ত্রী ও পুত্র কন্যারাও নানা কথায় বুঝিতে পারে, ইসমাইলই তাহাদের স্বামী এবং পিতা। একদিন এক আইসক্রীমওয়ালা মেহেমেতের বাড়ী আসিলে ইসমাইল তাকে চিনিতে পারে। ইসমাইল বলে "তুমি তো আগে ফল ও আনাজপাতি বিক্রয় করতে।" এবং সে বুঝিতে পারে ইসমাইল পূর্বজন্মে আবিদ ছিল। যখন মেহেমৎ আইসক্রীমওয়ালাকে পয়সা দিতে যায়, ইসমাইল তাকে নিষেধ করে ও বলে—"ওকে পয়সা দিও না, ওর কাছে আমি তরমুজের জন্য পয়সা পাইব।" লোকটা সেই কথা স্বীকার করে। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইকোলজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীএইচ, এন, ব্যানার্জী নিজে এ ব্যাপারের অনুসন্ধান জন্য ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে আদনায় গিয়াছিলেন। মুসলমানগণ পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন না। তথাপি এই ঘটনা কি 'জন্মান্তর' প্রমাণ করে না? এরূপ আরো অনেক ঘটনা পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল জাতিস্মরের বর্ণনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশের স্থানাভাব।

ইহা ব্যতীত অনেক ঘটনা ঘটে যাহা পুনর্জন্ম প্রমাণ করে। কয়েকমাস পূর্বে বরিশাল জেলার এক ব্রাহ্মণ অম্লশূল রোগে মরণাপন্ন হইয়া ৺তারকেশ্বরের নিকট ধর্না দেন। দুই তিনদিন পরে তিনি ৺বাবার আদেশ পান—তিনি তাহার মাতৃদেবীকে একসময় পদাঘাত করিয়াছিলেন সেই মহাপাপের ফলস্বরূপ এই রোগ হইয়াছে। তাহার মাতৃদেবী গাভীরূপে বর্ধমান জেলার কোন গৃহস্থভবনে আছেন। যদি তিনি সেই স্থানে যাইয়া তাহার গাভীমাতাকে পূজার্চনা করিয়া তৃপ্তি পূর্বক আহারাদি করাইয়া তাহার সেই অন্ন-প্রসাদ ও পাদোদক গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলে ব্যাধিমুক্ত হইবেন। সেই ব্যক্তি সেই গ্রামে যাইয়া যথা-বিধি গাভীমাতাকে পূজা করিয়া ও তাহার প্রসাদাদি গ্রহণ করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছেন। [বিশেষ বিবরণ তারকেশ্বর মঠ হইতে প্রকাশিত পুণ্যভূমি পত্রিকায় (১৫।১০।৬৫ তাং ৪৩০ ও ৪৩১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য]

আমরা বর্তমানে পাশ্চাত্য ভোগবাদী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-বাদী সভ্যতায় জড়বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখিয়া মোহাচ্ছন্ন হইয়াছি। আমাদের অধিকাংশ রাষ্ট্রপ্রধানগণ এবং রাজনীতিজ্ঞগণ আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষের আদিভূত সভ্যতার ধারা কি ছিল তাহা জানিবার, বুঝিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিতেছেন না ইহা ভারতের পক্ষে পরম দুর্ভাগ্যের হেতু। ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইলেও অষ্টাদশ বৎসর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এখন পর্যন্ত স্কুলে কলেজে যে সকল পুস্তক ও ভাবধারার পঠন ও পাঠন হয় তাহা বিদেশী ভোগধর্মী মনীষীগণের চর্বিত চর্বণ। ভারতের উপনিষদের ভাবধারার সঙ্গে কোন সংস্রব তাহার নাই।

বিদেশী ভাবধারায় সৃষ্টজ্ঞান—নির্জীব, বিকৃত এবং অফলপ্রসূ হইতে বাধ্য। এই সকল ভাবধারার সঙ্গে ভারতবাসী অন্তরের স্পর্শ পাইতে পারে না এজন্য তাহাদের অন্তরের শক্তির উদ্বোধন সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছিল আমাদের দেশের ভাবধারার সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগ লক্ষ্য করিয়া নয়—বরং তাহার বিপরীত লক্ষ্যেই বিদেশীয় প্রভুগণের প্রশাসনের সুবিধার জন্য শিক্ষার ছিল প্রবর্তন। স্বাধীন ভারতের প্রশাসনের ধারা পরাধীন ভারতের প্রশাসনের ধারার একটি দেশীয় সংস্করণ মাত্র। ইহার সহিত ত্যাগধর্মী সমাজধর্মী ভারতীয় ভাবধারার অন্তরের যোগ কোথায়? ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ কি তাহা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কোথায়? যতদিন পর্যন্ত আমরা ভারতবর্ষকে মুখ্যভাবে সমস্ত ভোগবাদী জগৎ হইতে তুলনামূলকভাবে জানিতে না পারিব ততদিন ভারতবর্ষের কল্যাণ ও শিক্ষার উন্নতি সম্ভব নহে। আজ ভারতের সর্বত্র ভোগবাদের জয়গান—এ জন্য সর্বত্র স্বার্থবাদ—সর্বত্র আত্মকেন্দ্রিকতা। শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীগণের মধ্যে আজ যে উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার কারণ পাশ্চাত্য ভোগবাদের বিকার মাত্র।

আমরা সকলে সমান—"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এইসকল কথা মুখে প্রকাশ করিলেই আমরা সকলে সমান হইতে পারিব না বা স্বার্থবাদ অতিক্রম করিয়া পরার্থবাদী হইতে পারিব না। রাষ্ট্রপতি হইতে সকল রাজ কর্মচারী শিক্ষকবর্গ, বিধানসভা ও লোকসভার সভ্যগণকে "আপনি আচরিধর্ম" জনসাধারণ বিশেষ করিয়া কোমলমতি শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষার ধারাকে সম্পূর্ণভাবে বিদেশী ভোগবাদী সভ্যতার প্রভাব মুক্ত করিতে হইবে। অন্যথায় ভারতের কল্যাণ আকাশ কুসুমবৎ নিষ্ফল চিন্তা।

পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বহু ভারতীয় মনীষীগণের ধারণা ভারতীয় সভ্যতা শুধু পরমার্থ ও পরকাল লইয়াই চিন্তা করিয়াছে—কোনদিন ঐহিকজীবনযাত্রাকে প্রাধান্য দেয় নাই। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতার ধারা বর্তমান যুগে ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর হইতে পারে না এবং অতীতে ভারতের অকল্যাণ করিয়াছে। ইহা যে ভ্রমাত্মক ধারণা বা ভোগায়তন মনীষীগণের প্রলাপোক্তি তাহা প্রমাণ করিতে বেশীদূর যাইতে হয় না। শ্রীশ্রীগীতা আজ সর্বদেশে আলোচিত হইতেছে। ভারতের সকল উপনিষদের সার এই গীতা। এই গীতার কর্মবাদ ঐহিক জীবনকে কোনভাবেই অগ্রাহ্য করে নাই বরং সর্বতোভাবেই প্রাধান্য দিয়াছে। ঐহিক জীবনকে অধর্ম হইতে মুক্তি দিতে, ঐহিক জীবনের কর্তব্য সম্পাদনে ব্যক্তিগত বিষাদ, মোহ, দুর্বলতা অতিক্রম করিয়া ভ্রাতৃবধ, জ্ঞাতিবধ, গুরুবধ, এমন কি বৃদ্ধ পিতামহবধের প্ররোচনা গীতায় আছে। পাশ্চাত্য ভোগবাদীদের কর্মপ্রেরণা আদি মধ্য অন্ত আত্মতৃপ্তির বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য—ইহার মধ্যে ভগবানের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু ভারতশাস্ত্রের কর্মপ্রেরণা আদি মধ্য অন্ত ভগবানের প্রীতির জন্য ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত কর্তব্যবোধ ভিন্ন অন্য কোন তৃপ্তির অবকাশ নাই। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় চিন্তা না করিয়া যুদ্ধায় যুজ্যস্ব" (২।৩৮ শ্লোক) যুদ্ধ কর্তব্য জানিয়া যুদ্ধ করিবে ইহাই উপদেশ। ঐহিক জীবনকে মহামহিমান্বিত করিবার জন্য অসংখ্য শাস্ত্র ভারতবর্ষে বিদ্যমান—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত প্রভৃতি ঋষিগণের সংহিতা, কৌটিল্য, উশনা, বৃহস্পতি মহামনীষীগণের অর্থশাস্ত্র, চরকসুশ্রুতাদি চিকিৎসা শাস্ত্র, বাৎস্যায়নাদির কাম শাস্ত্র। ঐহিক জীবনের এমন কোন দিক নাই যাহা ভারতীয় মুনি ঋষিগণ চিন্তা করেন নাই এবং তাহাদের উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। কতিপয় পাশ্চাত্য ভোগবাদী মনীষীগণের একমাত্র চেষ্টা ছিল ভারতীয়গণকে হীনমন্যতা রোগে আচ্ছন্ন রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদের ও তৎসঙ্গে ভোগবাদের জয়গান। আজিও ভারতবর্ষে তাহাদের সেই চিন্তাধারার ধারক ও বাহকরূপে কোন কোন ব্যক্তি বর্তমান। তাহারা ভারতীয় কোন শাস্ত্র পাঠ করিতে অক্ষম এমন কি ভারতীয় মনীষী স্যর ব্রজেন্দ্র শীল, স্যর জগদীশ বসু, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও পড়িবার অবসর পান না। ভারতীয় শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন ভিন্ন ভারতবর্ষের কল্যাণ কোথায়?

অপরাধী

শ্রীঅনিল মজুমদার

অপরাধের সঠিক অর্থটা যে কি সেটি এখনও আমার ঠিক জানা নেই। তবে এইটুকু জেনেছি যে প্রায় সব অপরাধেই হয় ক্ষমা আছে, না হয় সাজা আছে; কিন্তু যার কোনটাই নেই আমি তার কথাটাই বলতে চাইছি আপনাদের।

আমি এমনি এক অপরাধেই অপরাধী।

কেন জানেন?

তার কারণ আমি একটি অপদার্থ।

বলতে পারেন সেটি আবার কি? বুঝলেনই বা কি করে?

খুব সত্যি কথা।

কিন্তু বোঝবার ত আমার দরকার নেই। ওপরেই আমায় তা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

ওপরটি আবার আমার বড় আপনার।

আরও না হয় একটু বুঝিয়ে বলি। মানে তিনি হচ্ছেন আমার শ্রীমতী, অর্থাৎ যাঁর হাতে আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছুই নির্ভর করছে।

কারণও আছে যথেষ্ট।

তোষামোদ জানি না, লোক বাগাতে পারি না। তার ওপর ঘোরাঘুরির চাকরি। আজ এখানে কাল সেখানে। তাছাড়া কপাল গুণে জায়গাগুলোও জোটে ভাল। হয় মশা, না হয় মাছি। কোথাও বাতে ধরে, কোথাও হজমের গোলমাল হয়। এ বাদে ত ঘর নেই, বাড়ী নেই, লোক নেই, এ সব ত আছেই।

আমি বাইরের লোক। শ্রীমতী ঘরের। অতএব সব ঝামেলা তাঁকেই পোয়াতে হয়, আর তার ঝালটুকু আমাকে।

অর্থাৎ সাত পাক ঘুরিয়ে তাঁকে যে এই বিরাট ঝামেলার মধ্যে এনে ফেলেছি, সেই অপরাধেই সবার চেয়ে আমি বড় অপরাধী।

আর এই অপরাধী হয়েই জীবনের অর্ধেকটা প্রায় কেটেই গেল।

সেদিন অনেক ঘুরে ফিরে যখন দার্জিলিংএ বদলি হয়ে এলাম ভাবলাম অপরাধের বোঝাটা হয়ত বা আরও একটু বাড়ল।

অনুমানটা অহেতুক নয়।

একে শীতের দেশ তার ওপর দারুণ খরচা।

কিন্তু পরে দেখি তা ঠিক নয়।

কি করে জানেন?

শ্রীমতীর মুখ দেখে।

মানে যে মুখ সারাক্ষণ অমাবস্যার অন্ধকারে ঢাকা থাকত সেখানে দেখি একটুখানি কাকজ্যোৎস্নার আলো ফুটেছে।

খুবই আনন্দের কথা!

খুশি না হয়ে থাকতে পারলাম না।

যাহোক বহুদিন বাদে আবার শ্রীমতীর মুখে একটু-খানি আলো ফোটাতে পেরেছি।

কিন্তু সেই সঙ্গে তার কারণটাও একটু খুঁজে দেখতে ইচ্ছে হোল।

কি হতে পারে!

বাড়ীটা সত্যিই বড় ভাল পেয়েছি। অনেকগুলো ঘরদোর। বেশ সাজানো গোছানোও বটে। লোকজন-গুলোও বেশ ভাল। মানে কথা বললে কথা শোনে। কাজে ফাঁকি দেয় না। একটা নতুন জিনিষ যা সচরাচর নজরে পড়ে না।

পরে আরো একটু তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম।

দেখি এসব কিছুই নয়।

আসলে শ্রীমতীর সম্মান বেড়েছে।

গোছা গোছা চিঠি আসছে শ্রীমতীর নামে। দিদি, বৌদি, মাসি, পিসি, রমা, রমলা, নানান সম্ভাষণে। ভাবনা চিন্তাও আছে আবার মান অভিমানও আছে।

'কতদিন গেছিস্. একটা চিঠিত দিবি। ভাবনা কি কম হয় নাকি' মনে হলো আমাদের চিন্তায় অনেকেরই রাতে ঘুম হচ্ছে না। 'বেশ যাহোক, একবার দেখাও করে গেলিনা। কবে যে আবার দেখা হবে কে জানে' প্রতি ছত্রে অভিমানের সুর মেশানো। 'কতদিন দেখিনি, দেখতে যে কত ইচ্ছে করে কি বলব' যাঁদের কখনও দেখিনি তাঁরাও সব আমাদের দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন।

ভাবলাম চিঠির ওপর দিয়েই যদি যায় তা মন্দ নয়।

কিন্তু সেত হবার নয়।

দুদিন বাদেই লোকের আনাগোনা শুরু হোল। একে নয়, দশে। তার পর বেশ কিছুদিন অবস্থান করে আবার আসব এই আশ্বাস দিয়ে তবে তারা বিদেয় হলেন।

বলবার কিছু নেই।

সবই ওপক্ষের লোক।

আর আমিও শ্রীমতীর সম্মান রক্ষার্থে এক রকম বদ্ধ-পরিকর। মুখে যে হাসি দেখেছি তাকে আমি কোন-মতেই মুছতে চাইনা।

এমনি ভাবেই চলল কিছুদিন।

শ্রীমতীরও সম্মান বাড়ল দিনে দিনে যদিও আমার দেনার খাতায় নাম উঠল।

তা হোক।

তার জন্যেও আমি রাজী ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমাকেও ছাড়ান দিতে হোল যখন আবার এ পক্ষ থেকেও হানাদার আসতে শুরু করলে।

ঘরে বসেই গ্রাম থেকে একদিন 'খুচরো' পণ্ডিতের চিঠি পেলাম। গ্রামে থেকে তিনি বায়ু রোগে ভুগছেন। ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছে স্থান পরিবর্তনের। অতএব আমার কাছেই তিনি আসতে মনস্থ করেছেন। কারণ পাহাড়ই নাকি বায়ু উপশমের উপযুক্ত স্থান।

ব্যবস্থা চমৎকার!

কিন্তু আমার মাথায় বজ্রাঘাত।

পণ্ডিত মশায় আমার বাবার চেয়েও বয়েসে বড়। তাঁকে আমি জ্যাঠামশায় বলে ডাকি। হাতে খড়ি এবং বিয়েটা তাঁর হাত দিয়েই হয়েছিল। অতএব সেদিক থেকে তাঁর খানিকটা দাবী থাকতে পারে। কিন্তু সে দাবী ত বিয়ে, অন্নপ্রাশন এবং শ্রাদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। তার মধ্যে যে আবার বায়ু পরিবর্তনও আছে সেটা আবার আমার জানা ছিল না।

মহা মুস্কিল।

ঠাকুরমশায়কে এই শীতের মধ্যে এনে কি শেষপর্য্যন্ত খুনের দায়ে পড়ব।

তখনই চিঠি লিখে তাকে আসতে নিষেধ করলাম।

চিঠির আর কোন উত্তর এলনা, কিন্তু তিনি এলেন!

অফিসে বসে শুনি কে একজন সাধু আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ডাকতেই উপস্থিত হলেন স্বয়ং পণ্ডিত মশায়। কপালে তিলক চন্দন, গায়ে একখানা মোটা কম্বল, হাতে ছড়ি, পায়ে একজোড়া ক্যাম্বিসের জুতো। দার্জিলিং এর শীতে তখন তিনি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন।

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পেন্নাম সেরে বলি ভাল আছেন ত জ্যাঠামশায়।'

'ভাল আর আছি কোথায় বাবা। বেঁচে আছি এই পর্য্যন্ত'।

তখনই উত্তর আসে!

ওপরে গিয়ে শ্রীমতীর হাতেই তাকে জেম্মা করে দিই। আমার শ্রাদ্ধ হলেও তাঁর প্রতি শ্রীমতীর কোন শ্রদ্ধার অকুলান হয়না। তখনই পাথরের থালা বাটি রেকাব, চাকর-বাকরের হাঁক ডাক আরম্ভ হয়, আমার কাছেও একটা মস্ত ফর্দ এসে হাজির হয়।

যাক, শ্রীমতী তাঁকে গ্রহণ করেছেন। আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত।

পণ্ডিতমশায়ও মহা খুশি।

খানদান আর ঘুরে বেড়ান। বায়ুর চাপটাও একটু একটু করে কমে কিন্তু শীতে ধরে।

একদিন কথায় কথায়, আমায় বললেন 'দেখ, বিশু, এখানে একটা অলেষ্টার না হ'লে ঠিক চলেনা। শীতটা বেশ কড়া ত।'

বললাম 'ঠিকই বলেছেন জ্যাঠামশায়' কিন্তু পরক্ষণেই

কি হলো জানিনা, বলে বসলাম 'একটা করাবেন নাকি?'

'তা বাবা তুমি যদি একটা করিয়ে দাও ত ভালই হয়। শুনেছি এখানে নাকি খুব সস্তাতেই হয়।' জানালেন তিনি।

শুনেত আমার মাথা ঘুরে পড়ার উপক্রম।

এ বৃদ্ধ বলে কি! খেয়ে দেয়েও মন উঠল না এর ওপর আবার অলেষ্টার।

শ্রীমতীকে বলতে তারও দয়া উথলে উঠল। বললেন আহা দিতে হবে বই কি বুড়োমানুষ বড়মুখ করে চেয়েছেন, নিরাশ করতে আছে! কত দুঃখু করবেন বলত!

দিতেই হোল।

পণ্ডিতমশায়ও সেটি গায়ে দিয়ে আরও কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরলেন। তারপর একদিন তাঁর উর্দ্ধ বায়ুকে নীচে নামিয়ে যাতায়াতের রাহা খরচাটুকু আদায় করে নিয়ে অসংখ্যবার আশীর্বাদের বুলি আউড়ে তবে তিনি বিদেয় হলেন।

ভাবলাম হয়ত বা বিপদ কাটল।

কিন্তু পরে সেটি আরও ঘোরালো হয়ে এল।

হঠাৎ একদিন গোলোক কাকা এসে হাজির হলেন।

গোলোক কাকা আমার কাকার বন্ধু। বয়েস হয়েছে। সুনাম দুর্নাম দুইই কিনেছেন জীবনে। সংসারীও নন আবার সন্ন্যাসীও নন। তবে দিলদরিয়া মানুষ। একহাতে যেমন ঘুস নেন অন্যহাতে তেমনি দান করেন। পান দোষও আছে তবে সেখানে তিনি খাঁটি স্বদেশী, কালী মার্কা ছাড়া আর কিছু চলেনা তাঁর। ভক্ত মানুষ কিন্তু বৈষ্ণব নন পুরোদস্তুর শাক্ত। নিরামিশ তার মুখে রোচেনা আমিষই তাঁর একমাত্র খাদ্য। গুরুদেবের ছবিখানি সব সময়ই সঙ্গে থাকে। সকাল সন্ধ্যে তাঁর পূজো হয়। ভোরের দিকে তাঁর পূজো সেরে তারই পদ-ধূলি গ্রহণ করে তবে তিনি কাজে বেরন আর রাত্রে ফিরে সেই পদেই দিনের সমস্ত কৃতকর্ম অঞ্জলিভরে নিবেদন করেন।

এখানে এসেই আমাকে জানালেন 'দেখ, বিশু, জানিস ত সব। আমার জন্যে কিন্তু একটা আলাদা ঘরের দরকার।'

বললাম তার জন্যে চিন্তা করবেন না, কাকা, আপনার জন্যে আলাদা ঘরেরই ব্যবস্থা হবে।

তাই করতে হোল।

বাড়ীর এককোণে একটা নিরিবিলি গোছের ঘর ছিল। সেইটেই তাঁর জন্যে ব্যবস্থা করে দিলাম।

বেশ গুছিয়েগাছিয়ে বসলেন গোলোক কাকা।

সকালে পূজো সেরে যথারীতি বেরিয়ে গেলেন আবার সন্ধ্যের আগেই ফিরে এলেন। সঙ্গে দুজন মুটে: মাথা ভর্তি বাজার।

বললাম 'একি করেছেন, কাকা'

জবাব এল 'বলিস কি, শুধু কি আমিই একা খাব নাকি। ছেলেপুলেরা সব খাবে না। রমাকে বল সব দেখেশুনে নিতে।'

বুঝলাম কাকার আজ বেশ কিছু হয়েছে। তবে সে নিয়ে আর কোন কথা তুললাম না।

দুদিনেই দেখি তিনি বেশ সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। শ্রীমতীও খুশি, ছেলেমেয়েরাও খুশি। রোজই গোছা গোছা বিস্কুট, টফি, চকলেট আসছে। চাকর-বাকরগুলোর কথা আর নাই বা বললাম। শুধু একবার ডাকের অপেক্ষায়। আসলে টাকা যে যাদুমণি সেইটেই দুদিনে সবাইকে শিখিয়ে দিলেন গোলোককাকা।

সেদিন রাত্রের দিকে তার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা কান্নার আওয়াজ এল কানে। দরজাটা ঠেসানোই ছিল, একটু ঠেলে উঁকি মেরে দেখি সে কান্না নয়, গোলোককাকা পূজোয় বসেছেন। সবে একটিমাত্র বোতল শেষ হয়েছে। খালি গা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল। দরদর করে গণ্ড বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। গলার স্বর ধরা ধরা, গোলোক কাকা গুরুদেবের ছবির পানে দুহাত তুলে বলছেন 'এই কি তোমার মনে ছিল, ঠাকুর, তাতো আমি জানতাম না। তুমি ত আমার মনের কথা সবই জান। তবে কেন আমায় আগে থাকতেই নিষেধ করে দাওনা। কেন আমায় মিথ্যে মিথ্যে অপরাধী কর। বল, ঠাকুর, বল এর কি সত্যিই কোন ক্ষমা নেই। চিরদিনই কি আমায় এই পাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে।'

তাজ্জব ব্যাপার।

দেখেশুনে আমিও কম অবাক হইনি।

কিন্তু বলবার কিছু নেই।

জগৎটাও যেমন বিচিত্র, মানুষও তাই। যা হোক, এমনি করেই দিনগুলো কাটছিল কোন রকমে কিন্তু তারপরই এল আর এক উৎপাত।

কোত্থেকে আমার এক পুরোণো বন্ধু পিল্লাই এসে একদিন হাজির। এক সঙ্গে এক জায়গায় অনেকদিন কাটিয়েছি। তাকে ফেরাতেও পারি না আবার তাকে রাখবারও জায়গা খুঁজে পাই না।

শেষ পর্য্যন্ত গোলক কাকারই শরণাপন্ন হলাম।

রাজী হলেন তিনি। বললেন 'দুদিনের ত ব্যাপার, একটু কষ্ট করে চলে যাবে এখন।

সেই ব্যবস্থাই হোল।

আমিও তখনকার মত নিশ্চিন্ত হলাম।

কিন্তু হবার কি যো আছে!

পরের দিন ভোরের দিকে অফিসে বসে আছি। মেয়েরা হঠাৎ ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে হাজির বললে 'এখুনি ওপরে চল বাবা, সর্বনাশ হয়েছে।'

'বলিস্ কি? কি হয়েছে! ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করি তাকে।

শুনি পিল্লাই নাকি 'সুইসাইড' করেছে আর তাতেই গোলোক কাকা মরা কান্না জুড়ে দিয়েছেন।

সর্বনাশ!

তখনই তাকে নিয়ে উপরে ছুটি।

ঘরের দরজাটা আধখোলা অবস্থাই ছিল। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই যা দেখি তাতে হাসিও পায় আবার দুঃখও হয়। মেয়ের আর দোষ কি। দেখে শুনে আমারই তাক লাগার অবস্থা।

দেখি পিল্লাই সাহেব একটি নেংটি পরে শীর্ষাসন হয়েছেন আর তারই সামনে বসে গোলোক কাকা তাঁর চিরাচরিত মন্ত্র আউড়ে চলেছেন 'তোমার মনে যদি এই ছিল, ঠাকুর, তবে আমায় আগে কেন বলনি। কি আমি অপরাধ করেছি তোমার কাছে। বল, বল, ঠাকুর'…

হাঁ করে দাড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। তারপর নীচে নেমে আসি।

থাক যথেষ্ট হয়েছে, আর না। এর চেয়ে অপরাধী হয়ে থাকাই অনেক ভাল।

আমি আবার বদলির দরখাস্ত করেছি।

জীবন-মৃত্যু

সলিল মিত্র

জীবন যেখানে, মৃত্যুর ছায়া নেমে আসে বারবার—
প্রভাত সূর্য হেসেছে এখানে? নামবে অন্ধকার!
জোয়ার এসেছে—আসবে ভাটাও
ফুটেছে কুসুম, ঝরে যাবে তাও—
সুখ-নীড় আজ গড়া হল, কাল নামবেই হাহাকার!
মৃত্যুর ছায়া জীবনকে ঘিরে কেঁপে ওঠে বার বার॥

কান্না-হাসির মালা গাঁথা হয় জীবনকে ঘিরে ঘিরে—
কতো জীবনের জাগে উচ্ছ্বাস নোনা সাগরের তীরে,—
তবু সেইখানে চিতার আগুন
বেদনায় ঢাকে মধু-ফাল্গুন:

মৃত্যু সে আনে ধু-ধু-শূন্যতা, জন্ম লগ্ন ফিরে
আসে জীবনেরই প্রতিশ্রুতিতে তবু পৃথিবীর ভীড়ে!

শুধু জীবনের দাম সে কোথায়—মৃত্যু যদি না আসে?
'শূন্য এ-বুকে' ব্যথা না জমলে কে-ই আর ভালবাসে
এই জীবনেরে? কে-ই মনে রাখে
আঁধার যদি না আলোকেরে ঢাকে
উজ্জ্বল সেই সূর্য-কে? আর হৃদয় তখনই হাসে
বিরহের শেষে প্রেমের জোয়ারে, জীবন যখনই ভাসে!
এ-জীবন শুধু আলো-আঁধারির খেলা—
কখনো ক্লান্তি, কভু প্রশান্তি, হাসি-কান্নার মেলা!

'তোমরা আমরা' কবিতায় কবিত্রয়ের ভূমিকা

(রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন)

জয়শ্রী চক্রবর্তী

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশতি বাংলার প্রথমার্ধে হাসির কবিতা রচনায় সমশ্রেণীভুক্ত তিনজন কবির নাম স্মরণে আসে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন। যদিও এঁরা তিনজন পরিহাস প্রিয়তায় সমতুল্য শ্রেণীভুক্ত তথাপি বিভিন্ন রসোপলব্ধির পার্থক্যে কেউই নিকটতম নন। লঘু গুরু হাস্যরস পরিবেশনে তিন জনেরই দক্ষতা প্রায় শীর্ষ-স্থানীয়। কিন্তু পারত পক্ষে আস্বাদনের আলাদা স্বকীয়তায় তিনজনেই—স্ব স্ব ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখেন।

তৎকালীন সময়ে—একটি সুবিখ্যাত কবিতা বিষয়ের ওপর ত্রি-মুখী অভিযান চালান—এই তিনজন প্রতিভাধর কবি। প্রাথমিক পালা নিলেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'তোমরা এবং আমরা' নামক অপূর্ব ছন্দে রচিত একটি গীতি কবিতা প্রকাশ করলেন—'সাধনা' নামক পত্রিকায়, ১২৯৯ সালে, পৌষ সংখ্যায়। নারী-পুরুষের চিরন্তন কলহের ওপর রচিত গভীর করুণ রসে এবং লঘু হাস্যরসে 'তোমরা এবং আমরা' কবিতার নাম হোল। কবিতাটি উপহাস এবং কটাক্ষ ছাড়া করুণ অনাবিল হাস্যরসের গভীরতায় পরিপূর্ণ তারই কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করছি :—

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলু কুলু কল নদীর স্রোতের মত
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত
আপনা আপনি কানাকানি কর সুখে
কৌতুক ছটা উছলিছে চোখে মুখে
কমল চরণ পড়িছে ধরণী মাঝে
কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে

... ...

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ
নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভরে
মোহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে ?

তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি
কোন সুলগনে হবনা কি কাছাকাছি ?
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলে যাবে
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে

কবিতাটির মর্মার্থটি করুণ রসে যেমন মধুর তেমনি অনাবিল পরিশুদ্ধ হাস্যরসে সুকোমল। উপরন্তু সমভাবাপন্নতার উদারতাও এই রসাত্মক ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি মুদ্রিত হবার পর ১৩০২ সালের কার্তিক মাসে উপরোক্ত 'সাধনা'তেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—'তোমরা আমরা' নামক হাসির কবিতাটি প্রকাশ করলেন—রবীন্দ্র ভাবের প্রত্যুত্তরে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত 'তোমরা আমরা' এই রকম :—

'আমরা' খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই গো,
আর 'তোমরা' বসিয়া খাও ;
আমরা দু'পরে আপিসে লিখিয়া মরি গো
আর তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে 'আমরা'ই পড়ে লড়ি গো,
'তোমরা' গহনা পত্র ও টাকা কড়ি গো
অমায়িক ভাবে গুছায়ে পাল্কী চড়ি গো
ধীরে ধীরে চম্পট দাও।

... ...

আমরা বেচারী ব্যবসা চাকরী করি গো
আর, তোমরা কর গো আয়েস।

আমরা সাহেব মুনিব বকুনি খাই গো
আর তোমরা খাও গো পায়েস,
তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত গো,
কার্য করিয়া না পুরাই মনোরথ গো,
অবহেলে চলি যাও নাড়ি দিয়া নথ গো,
অথবা মরিতে ধাও।
আমরা দাড়ির প্রত্যহ অতি বাড়ে গো
রোজ, জালাতন হ'য়ে মরি
তোমরা—সে ভোগ ভুগিতে হয়না থাক গো—
খাসা কেশ বিন্যাস করি;
আমরা দু'টাকা জোড়ার কাপড় পড়ি গো—
তোমাদের চাই সোনা, দশ বিশ ভরি গো
বোম্বাই বারাণসী বছর বছরই গো
তবু মন ওঠে নাও।

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত কবিতার উদ্ধৃতি থেকে হাস্যাত্মক শ্লেষের মধ্য দিয়ে এক শ্রেণীর পুরুষের স্বার্থান্ধতার গন্ধ মেলে। বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষে আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে নারীর শক্তি ও সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। কৌতুক রসের জালাময় তীর নিক্ষেপ করে—বিপক্ষকে যে ভাবে ধরাশায়ী করার চেষ্টা হয়েছে—তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই—চিরন্তন সেই শ্রেণীস্বার্থ বোধের নির্মম অভিব্যক্তি বলে। তাতে অসম ভাবাপন্নতারই মূর্ছনা বেশী। তা ছাড়া একটি নিকৃষ্ট রসের কলহে উচ্চ মানের অবস্থিতি কতকাংশে খর্বও হয়েছে। এবার তুলনামূলক বিচারে—পাঠকশ্রেণী অবহিত হোন।

ঠিক এর বছর কয়েক পরে, 'উৎসাহ' নামে মাসিক পত্রে রজনীকান্তের 'তোমরা আমরা' প্রকাশলাভ করলে —দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতার প্রত্যুত্তরে। তার আগে রজনীকান্ত সেন, হাসির কবিতা লিখতেন না বললেই চলে। হাসির কবি হিসেবে সুপরিচিত হবার সুযোগ পেলেন দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতা পড়ে এবং শুনে। ১৩০১ কিংবা ১৩০২ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন রাজসাহী যান এবং সেখানকার একটি সভায় হাসির গান বিতরণ কালে রজনীকান্ত সেন উপস্থিত থেকে তা শ্রবণ করেন। পরে গভীর আনন্দিত হয়ে এবং অনুপ্রেরণা লাভ করে, সেই সময় থেকে হাসির গান ও কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেন। ১৩০৪ সালে আশ্বিন মাসের উৎসাহে 'তোমরা আমরা' কবিতাটি মুদ্রিত হোল একটি উপভোগ্য কলহ পূর্ণ রসে। তিনি স্ত্রীকুলের পক্ষাবলম্বন করে—প্রবল বাক যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। নীচে তারও কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি:—

'আমরা' রাঁধিয়া বাড়িয়া আনিয়া দেই গো
আর 'তোমরা' বসিয়া খাও
আমরা হেঁসেলে ঘামিয়া মরি গো,
আর (খেয়ে দেয়ে) তোমরা নিদ্রা যাও;
আজ এ বিপদ কাল ও বিপদ করি গো
হাতের দু'খানা গহনা টাকা কড়ি গো
না দিলে পরম প্রমাদে প্রেয়সি পড়ি গো,
বলি, লয়ে চম্পট দাও।
... ...
আমরা মাদুরে পড়িয়া নিদ্রা যাইগো,
আর তোমাদের চাই গদি;
আমাদের শাক পাতাটা হলেই চলো গো;
আর তোমরা পোলাও দধি।
তথাপি যদি বা কোন কাজে পাও ত্রুটি গো,
স্বাস্থ্যে হালুয়া লুচি ও ব্যাধিতে রুটি গো,
না হলে আমরি! কর কি সু-ভ্রুকুটি গো,
কিংবা চড় চাপড়টা দাও।
আমরা একটি চুলের বোঝার ভরে গো
সদা জালাতন হয়ে মরি,
তোমরা সে জালা সহিতে হয়না থাক গো,
সদা এলবার্ট টেরী করি।
আমরা দু'খানা শাঁখা ও লোহার খাড়ুগো,
পেলেই তুষ্ট, কষ্ট হয়না কারু গো,
তোমাদের চটি, চুরুট ও চেন চারু গো
তবু খুঁতখুঁতি মেটে নাও।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতার প্রত্যুত্তর হিসেবে,—রজনীকান্তের কবিতাটিরও তুলনা হয়না। স্ত্রী পক্ষের কটাক্ষ ও উপহাস সুর মিশ্রিত হাস্যরসের এই অভিব্যক্তি বিপুল, প্রতিধ্বনিময়! উভয় পক্ষের কলহ দ্বন্দ্বে—রবীন্দ্রনাথকে মধ্যবর্তী করলে, একটি চমৎকার ক্লাইমেক্সের মধ্যে সমস্ত বিরোধটি শেষ হয়। এবার তুলনামূলক রসে—ত্রয়ীর অভিযান কতটা তাৎপর্যমূলক সে বিচার ভার তুলে দিলাম —বর্তমান পাঠকপাঠিকাদের হাতে।

সম্প্রতি আনন্দবাজারে "মশার দৌরাত্ম্য দুঃসহ" এই শিরোনামায় একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। আমরা পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্যে চিঠিখানি হুবহু নকল করে দিলাম :

"আমি কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে বাস করি। এলাকাটি দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে। এখানে ইদানীং মশার অত্যাচার ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্যাচার অবশ্য বারোমাসই সহ্য করতে হয়, কিন্তু কিছুদিন ধরে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তা সহ্যের অতীত। জানি, খাস কলকাতায় যাঁরা বাস করেন মশার কামড় আজকাল তাদেরও খেতে হচ্ছে। বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় মশা কম নয়। যে মধ্য কলকাতায় কখনো মশা দেখা যায় নি, সেখানেও শুনতে পাই মশা দেখা দিয়েছে। তবে দমদম ইত্যাদি এলাকার সঙ্গে তার কোনও তুলনাই চলে না। বিশ্বাস করা শক্ত, তবু অবিশ্বাসীরা এসে সচক্ষে দেখে যেতে পারেন (অর্থাৎ সচর্মে অনুভব করে যেতে পারেন), দিনের বেলাতেও এখানকার মশারা কী রকম অকুতোভয়ে তাদের অত্যাচার চালায়। সেক্ষেত্রে রাত্রির বিভীষিকা সহজেই কল্পনীয়। পড়াশোনা করা অসম্ভব, স্থির হয়ে বিশ্রাম করাও সম্ভব নয়, অগুণতি মশা সর্বদা সবাইকে ছেঁকে ধরে! গা বেয়ে যেমন পিঁপড়ে ওঠানামা করে, তেমনি মশাও সর্বাঙ্গে চলাফেরা করে বেড়ায়। হাঁ করলে মুখের মধ্যে মশা ঢুকে যায়। মশারি টাঙিয়েও নিস্তার নেই। তার মধ্যেও কি কৌশলে কে জানে, রাশি রাশি মশা ঢুকে পড়ে। নিরামিষ খাবার উপায় নেই। ভাতের সঙ্গে কিছু না কিছু মশা সবাইকেই খেতে হয়।

যে অঞ্চলে আমরা থাকি ঠিকানায় সেটা কলকাতা ২৮। জায়গাটাকে পাড়াগাঁর সঙ্গে তুলনা করা চলে না—শুধু এই জন্যে যে, সম্ভবত কোনো অজ পাড়াগাঁয়েও এত মশা নেই। পৃথিবীর আর কোনো সভ্য দেশের প্রধান একটি শহরের উপকণ্ঠে এত মশা আছে কিনা আমি জানিনে। থাকলে সে দেশ সভ্য হবার যোগ্য নয়। আমাদের দেশের কর্তারা কিন্তু সভ্যতার বড়াই করেন। মশার অত্যাচার থেকে নাগরিকদের যাঁরা রক্ষা করতে পারেন না, সভ্যতার বড়াই তাঁদের সাজে না। কিছুদিন

আগে কাগজে খবর দেখেছিলাম যে, মশা মারবার জন্যে রাজ্যসরকার একটি জরুরী প্রকল্পে হাত দিচ্ছেন। তার কাজ কতদূর এগোলো জানি নে! তবে এইটুকু জানি যে, এ কাজে আর কালহরণ করা উচিত নয়। যে করেই হোক মশা নির্মূল করতে হবে। মশা এখন কলকাতার কলঙ্ক। এই কলঙ্কের অবসান অবিলম্বে চাই। পৌর-সভাগুলিকে এ কাজে সর্বপ্রযত্নে হাত লাগাতে হবে। তাদের আর্থিক সামর্থ্য বেশী নয় জানি। কিন্তু যেটুকু সামর্থ্য আছে,—তারই কি সদ্ব্যবহার করা হয়? টাকার অপচয় ত' কম হয় না। সুতরাং অর্থাভাবের যুক্তি লোকে শুনবে কেন? এ ব্যাপারে টাকার চাইতেও বড় প্রয়োজন জিদের। 'আমাদের এলাকার করদাতাদের আমরা মশার হাত থেকে যেমন করেই পারি উদ্ধার করবো'—পৌর কর্তৃপক্ষের এমনি একটা জিদ থাকা চাই। মশার কামড় ত' তাঁরা নিজেরাও খান। নাকি তাঁদের চামড়া এতই পুরু যে, মশার হুল তাতে বসে না?"

জনৈক ভুক্তভোগী।

এই চিঠিখানি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সত্যি মৌচাকে ঢিল পড়ল।

ছাত্রসমাজ সচকিত হয়ে উঠল।

এমনিতেই ত' কেরোসিন তেলের অভাবে তাদের সন্ধ্যে বেলার পড়াশোনা এক রকম বন্ধ। তার ওপর এই মশার কামড়। চিঠিখানা পড়বার পর থেকে সবাই যেন নতুন করে সচেতন হয়ে উঠল।

সচেতন হবার পরই সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। একজনের চীৎকারে এ দেশে কোনো কাজ হবার নয়।

আর যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালু করতে হবে—তারা সংখ্যায় লাখো-লাখো, কোটি-কোটি।

ছাত্রদলের পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে। কাজেই তারা এই মশার ধ্বংসকার্যে অগ্রণী হল!

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কোন পরীক্ষার্থীই এক সঙ্গে আধঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে পারে না। মশার দল চারদিক থেকে চক্রব্যূহ করে এমনভাবে নিরীহ পড়ুয়াকে আক্রমণ করে যে, তার সাধ্য নেই যে বই খুলে পড়াশোনা চালিয়ে যায়, অথবা মনঃসংযোগ করে পাঠ্যপুঁথি পড়ে সেই কথা মনে রাখে।

সংবাদ সংগ্রহ করে আরো জানা গেল যে, প্রত্যেকটি পড়ুয়ার পাঠ্য বইয়ের পাতা মশকের রক্তে রঞ্জিত। এই রক্ত যে আসলে মশকের নয়, সেই পরীক্ষার্থীরই, এ কথা গবেষণা করে জানার প্রয়োজন করে না।

ছেলেদেরই বা দোষ কি দেয়া যায়? ওরা পড়াশোনা করবে—না মশা মারবে? এভাবে চলতে থাকলে পরীক্ষার্থীদের দেহে আর কতটুকু রক্ত অবশিষ্ট থাকবে? আসল পরীক্ষার লগ্ন যখন এসে উপস্থিত হবে—তখন অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই রক্তহীনতায় ভুগতে থাকবে। তখন কি তাদের স্ট্রেচারে করে পরীক্ষার হলে নিয়ে হাজির করা হবে?

ছাত্রপরিষদের উদাত্ত-আহ্বানে পড়ুয়ারা সবাই সমবেত হল।

অবিলম্বে সংগ্রামসংসদ সংগঠন করা হল। আলোচনা সভায় স্থির করা হল,—পরীক্ষা আছে এবং পরীক্ষা নেই এই উভয় শ্রেণীর ছাত্র সম্প্রদায়ই আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

মহাভারতের যুগে যেমন জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ সমাধা

হয়েছিল ছাত্রদল স্থির করল—প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন অঞ্চলে "মশক-মারণ-যজ্ঞ" সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যেক বাড়ীর ভাঙা খাট, পায়াহীন চেয়ার টেবিল, অকেজো আসবাবপত্র সংগৃহীত হতে থাকল। জালানি কাঠও বহু অঞ্চল থেকে না বলে গ্রহণ করা হল। অনেক উৎসাহী ছাত্র গভীর রাত্রে শ্মশান ঘাটে হানা দিয়ে বড় বড় কাঠের টুকরো জোগাড় করে ফেল্লে। এ ছাড়া পুরোনো ন্যাকড়া, খবরের কাগজ, পেট্রোল আর কেরোসিন তেল ত রইলই।

এই "মশক-মারণ যজ্ঞের" শুভ-উদ্বোধন করলেন কলকাতার জনপ্রিয় মেয়র। রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে উৎসবের সূচনা হল। ছাত্রীদল সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করলে, "আগুন আমার ভাই, আমি তোমারি জয় গাই—"

দিকে দিকে অগ্নির লেলিহান শিখা ঊর্দ্ধ আকাশে লক্ লক্ করে উঠল। তাতে মশককুল কত ভস্মীভূত হল তার সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও—কুলোকে বলে বেড়াতে লাগলো যে, বহু চতুর পরীক্ষার্থী অভিভাবকের চোক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে নিজেদের পাঠ্য-পুস্তকগুলিই "মশক-মারণ-যজ্ঞে" আহুতি দিয়ে এলো।

পরদিন বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এই মারণ-যজ্ঞের বিবরণী নানা ফটো যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হল। দেশের মধ্যে একটা দারুণ সাড়া পড়ে গেল। কলকাতার ছাত্রদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মফঃস্বল অঞ্চলেও "মশক-মারণ যজ্ঞ" সুরু হয়ে গেল। সেই আগুনের লেলিহান শিখায় আশে-পাশের কিছু কিছু খোড়ো বাড়ী ভস্মীভূত হয়ে গেল বটে, কিন্তু ছাত্রদল তাতে নিরুৎসাহ হ'ল না! বরং তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দিকে দিকে আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল। সেই সব বিবরণীও যথা সময়ে দেশের বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে সচিত্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে লাগ্‌লো।

দিকে দিকে একটা জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। সবাই বল্লে, এইবার ছাত্রদল আর ঘুমিয়ে নেই, ওরা সত্যি জেগেছে!

একদলের ঘুম যখন ভাঙে, তখন তারা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। আশে-পাশের নিদ্রিত মানুষগুলোকেও তারা জাগিয়ে তোলে। একা একা রাত জেগে লাভ নেই, ...সবাই মিলে নরক গুলজার করলে তবে ত' আসর সর-গরম হবে!

তাই ছাত্রদল এক দিকে প্রতি সন্ধ্যায় "মশক-মারণ-যজ্ঞের" আয়োজন করতে লাগ্‌লো এবং প্রতি দ্বিপ্রহরে বিরাট মিছিল বের করে তাদের অভাব অভিযোগ প্রচার করতে সুরু করল।

নানা রঙে প্রচার-পত্র অঙ্কন করা হল। ছাত্রদের মধ্যে উদীয়মান শিল্পীর অভাব নেই। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনাও আকাশস্পর্শী। কলেজ স্কোয়ারে একটা ঘর নিয়ে ছাত্রদের একটি প্রচার বিভাগ খোলা হল। সেইখানে সারাদিন ধরে বিচিত্র রঙে নানাজাতীয় প্রাচীর-পত্র অঙ্কিত হতে থাক্‌ল—!

"মশকের আক্রমণে ছাত্রগণের পাঠে বিঘ্ন"

—"কলিকাতা কর্পোরেশন নাসিকায় সর্ষপ তেল দিয়ে কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রামগ্ন!"

—"শিক্ষাবিভাগের বড় কর্তাদের কি মশকেরা দংশন করেনা?"

—"মশক-প্রুফ্ জামা আবিষ্কৃত হলে ছাত্রদল হাজার হাজার জামা ক্রয় করবে—"

—"কর্পোরেশনের মশক নিবারণী তৈল কোন গোপন গহ্বরে ঢালা হয়?"

—"ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত মশক-মারণ-যজ্ঞে দলে দলে যোগদান করুন।"

—"গত বৎসর পরীক্ষার হলে ভগ্ন চেয়ার টেবিলগুলি মশক-মারণ-যজ্ঞের সমিধ্ হিসাবে সংগ্রহ করুন।"

এই জাতীয় রঙ প্রাচীর পত্রে কল্‌কাতার দেয়ালগুলি কণ্টকিত হতে থাক্‌ল।

মিছিলের সঙ্গে সঙ্গেও প্রদর্শিত হতে থাকল এই জাতীয় প্রচার-পত্রগুলি।

মিছিলগুলি বিভিন্ন দিনে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে, রাজভবনের সন্নিকটে, রাইটার্স বিল্ডিংস অভি-মুখে যাত্রা করতে সুরু করল। এ ছাড়া তাদের পথ পরিক্রমাও অব্যাহত থাক্‌ল।

ফলে পুলিশের ছুটোছুটি বাড়ল। কোনো কোনো অঞ্চলে কাঁদুনে গ্যাস ছাড়া হল; কোনো পথ বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হল।

তবু ছাত্রদের সংগ্রাম পরিষদের অভিযান অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলো।

কল্‌কাতার ছাত্রদলকে অনুসরণ করে—বর্ধমান, আসানসোল, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলেও ছোঁয়াচে রোগের মতো ছাত্রদলের মিছিল, মারণ-যজ্ঞ ও সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে ছড়িয়ে পড়ল।

এর মধ্যে আবার বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে একটি নতুন খবর প্রকাশিত হয়ে দেশবাসীর মনে নতুন চমক এনে দিল।

"সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাসী দল"

বাঙলা দেশের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, মশকদল তাদের সাধন ভজনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মশক সাধু সন্ন্যাসীদের ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে দিচ্ছেনা। সেই জন্যে এই সন্ন্যাসী দল ছাত্রদলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসছে। এখন থেকে এই সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ও প্রত্যহ শোভাযাত্রা সহকারে সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করবে। কল্‌কাতার প্রতিটি পার্কে প্রতি সন্ধ্যায় "মশক-নিধন যজ্ঞের" আয়োজন করা হবে। দেশবাসীগণ দলে দলে যোগদান করুন। প্রত্যেকে দু'খানি করে লকড়ি আন্‌তে ভুল্‌বেন না। মশক-মারণযজ্ঞে আহুতি প্রদান করতে হবে।

তারপর দেখা গেল, প্রত্যেক কাগজেই এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অভিযান ও "মশক-মারণ যজ্ঞের" ছবি বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছে।

দেশবাসীগণ একটা নতুন কিছুর সন্ধান পেয়ে প্রতি সন্ধ্যায় পার্কে ভীড় জমাতে লাগলো।

দলে দলে হিন্দুস্থানী ভাইরা সেই "মশক মারণ যজ্ঞে" তাদের রাত্রের আহার রুটি সেকে নিতে উৎসাহিত হয়ে উঠল। রথ দেখা আর কলা-বেচা বিপুল জন সমাগমে ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে সম্পন্ন হতে থাকল।

"মশক-মারণযজ্ঞ" অব্যাহত গতিতে চলতে থাকল। ফলে—যজ্ঞের ধূমে পার্কের ঘাস পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কর্পোরেশন থেকে যে উদ্যান-রচনা করা হয়েছিল সেগুলো শুকিয়ে কুঁকড়ে ভস্মে পরিণত হল। আশেপাশের বাড়ী-গুলির বাসিন্দারা 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়তে লাগল। শহরের কাক-চিলেরা অতিষ্ঠ হয়ে দলবদ্ধভাবে ভিন্ন দেশে যাত্রা করল।

কিন্তু এই মশক মারণযজ্ঞে মশকের দল এতটুকু হ্রাস প্রাপ্ত হল না।

এইবার মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন বৈজ্ঞানিক দল। তাঁরা এক যোগে আলোচনা করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করলেন।

"—মশাকুল যদি এই ভাবে দেশের ছেলেমেয়েদের রুধির পান করতে থাকে তবে কয়েক বৎসর পর দেখা যাবে সমগ্র দেশের সন্তানগণ রক্তহীনতায় ভুগে ভুগে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। দেশের বৈজ্ঞানিকগণ এই অবস্থায় চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ এই গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চাইছে আমরা অবিলম্বে সে কথা জানতে চাই—"

বৈজ্ঞানিকগণের এই বিবৃতি পাঠ করে দেশের আইনজীবিগণও আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেন না। বিভিন্ন বার এসোসিয়েশন তীব্রকণ্ঠে সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের নিন্দা করতে লাগলেন।

তাঁরা সরকারকে সরাসরি এই কথা জানিয়ে দিলেন যে, সরকার যদি মশককুল ধ্বংসের আশু কোনো ব্যবস্থা না করেন তবে আইনজীবীরা এমন আন্দোলন আরম্ভ করবেন যে, বর্তমান সরকার গদী ত্যাগ করতে বাধ্য

হবেন। সেই স্বদেশীযুগ থেকে সুরু করে আইনজীবীরাই সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। এই মশকমারণ আন্দোলনেও তাঁরা পিছিয়ে থাকবেন না।

ব্যবহারাজীবীদের আস্ফালন দেখে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে এলেন। এই মৌকায় যদি কিছু নাম করা যায়—আর সেই সঙ্গে খবরের কাগজে ছবি ছাপানো চলে তবে মন্দ কি?

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, পুস্তকপ্রকাশকগণ, দুগ্ধ ব্যবসায়ী সঙ্ঘ, মাংস সরবরাহ সংস্থা, সর্ব কলিকাতা বাজার সঙ্ঘ, মৎস্য সরবরাহ সমিতি, অল বেঙ্গল কন্‌ফেক্‌শনার্স এসোসিয়েশন, স্বর্ণশিল্পী সম্প্রদায়, অধুনা পরলোকগত ছানাপট্টি ব্যবসায়ী কেন্দ্র, নিখিলবঙ্গ ফল ফেরীওলা সমিতি, সারা বাঙ্‌লা যাত্রা পার্টি, প্রগতি নাট্য সংস্থা, সর্ববিধ সম্প্রদায় সবাই একে একে এগিয়ে এসে বিবৃতির বিশাল বাত্যা ও ঝটিকার সৃষ্টি করে ফেল্লেন। মহিলা সমিতিও পিছিয়ে থাকল না!

এখন কাগজে কাগজে আর কোনো রকম আন্দোলনই পাত্তা পায় না।

শুধু মশক-মারণ যজ্ঞের বিবরণী, মিছিল ও যজ্ঞের বিশেষ চিত্রাবলী।

দেশ-বিদেশ থেকে সংবাদদাতারা বিমান যোগে সোজা দমদমে এসে অবতরণ করতে লাগলেন। প্রত্যেকের হাতে মশক-মারণ-যজ্ঞের সমিধ। নিজ নিজ দেশ থেকে সংগ্রহ করা। সেই গুলি প্রদর্শন করে তাঁরা যজ্ঞ ভূমে প্রবেশাধিকার লাভ করতে লাগ্‌লেন।

আমেরিকা এসে টেলিভিশনের ব্যবস্থা করে ফেল্লে। সোভিয়েট রাশিয়া বৈজ্ঞানিক বারি সিঞ্চন করতে লাগলো। দেশ-বিদেশের সিনেমাদল এসে রঙীন চিত্র তুল্‌তে সুরু করে দিলে।

সারা পৃথিবীতে ভারতের "মশক-মারণ যজ্ঞের" চিত্রাবলী প্রচুর ঢক্কা নিনাদে প্রকাশিত হতে থাক্‌ল।

এই সব ব্যাপারে সারা কলকাতা শহর যখন টলমল, সেই সময় সরকারের নিদ্রাভঙ্গ হল।

বিধান সভায় দারুণ উত্তেজনা!

সরকার পক্ষ বল্লেন, এই মশ্‌ককে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীতে ভারতের নাম ছড়িয়ে পড়ছে। এতে আমরা বিনামূল্যে প্রচারের কাজ করে নিচ্ছি, তা ছাড়া এই যজ্ঞের জন্যে আমরা প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারছি।

সেই কথা শুনে বিরোধী দল হুঙ্কার দিয়ে উঠল। আমরা মশা তাড়াতে পারি না এই কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে কি সরকারের মাথা হেঁট হচ্ছে না? অবিলম্বে এর জন্যে একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হোক।

বহু বাদানুবাদ, অনেক তর্কবিতর্ক, নানা উচ্চকণ্ঠের আস্ফালনের পরে সরকার অনুসন্ধান সমিতি গঠন করতে বাধ্য হলেন।

স্থির হল,—সেই অনুসন্ধান সমিতি সরকারী ব্যয়ে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন। তাঁরা জানবেন,—কেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই মশক বহু আগে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে, তবু কল্‌কাতা ও আশে পাশে তাদের এত প্রাধান্য কেন?

অনুসন্ধান সমিতি বিরাট আড়ম্বরে একদিন দমদম বিমান কেন্দ্র থেকে আকাশে উড্ডীন হল, স্বয়ং রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন।

জনতারা জয়ধ্বনি দিল, ক্যামেরায় বহু ফটো তোলা হল। সেদিন কলকাতার শহরে ফুল ও মালার দাম বেড়ে গেল।

পরদিন সেই বিবরণী পাঠ করবার জন্যে হাজার হাজার কাগজ বেশী বিক্রী হল।

ইতিমধ্যে জানা গেল যে, যজ্ঞের ফলে দমদম, পাতিপুকুর, বেলেঘাটা, কসবা, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ অঞ্চলে মশকদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

আগে মশকদল শুধু পড়ুয়াদের রক্ত শোষণ করত, এখন নাকি তাদের উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

এই ঘটনা নিয়ে দেশের বৈজ্ঞানিক দলের মধ্যে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি হল।

তাঁরা সজ্ঞবদ্ধ হয়ে আর একটি সম্মেলনের আহ্বান জানালেন।

সাতদিন ধরে আলোচনার পরে তাঁরা বিবৃতি দান করলেন যে, এই ভাবে চলতে থাকলে পাঁচ বছরের মধ্যে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষদের দেহে আর বিন্দুমাত্র রক্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। তজ্জন্য আমাদের এখন থেকেই সচেতন হতে হবে।

এক বৈজ্ঞানিক এই সময়ে একটি "ট্যাবলেট" আবিষ্কার করলেন। মশকদল যে পরিমাণ রক্ত দেহ থেকে শোষণ করে নেবে—এই ট্যাবলেট সেবনে সেটা পূরণ হয়ে যাবে।

দলে দলে লোক এই ট্যাবলেট সেবন করতে সুরু করে দিলেন।

অভিভাবকেরা, মায়েরা, ছেলেমেয়েদের হাত-পা খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখতে লাগলেন। কি জানি, মশককুল যে ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে তাতে কখন কোন বাড়ীর ছেলে-মেয়ে ওরা উড়িয়ে নিয়ে যায় কিছু বলা যায় না।

ঘরে-ঘরে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। বাড়ীর বয়স্ক ব্যক্তিরা থিয়েটার সিনেমা দেখা বন্ধ করে দিয়ে ছেলে-মেয়ে পাহারা দিতে লাগলেন।

এতে আবার আর এক বিপত্তির সৃষ্টি হল। থিয়েটার ও সিনেমার লোকেরা আন্দোলন সুরু করে দিল—"দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জিত হতে চলেছে। এর আশু প্রতিকার করা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।"

এই উপলক্ষ্যে কয়েকটি প্রতিবাদ মিছিলও বহির্গত হল।

এমন সময় সকলকে সচকিত করে সংবাদ-পত্রে ঘোষিত হল—সেই মশক অনুসন্ধান সমিতি সারা বিশ্বে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ছয় মাস বাদে ভারতে ফিরে আসছে।

এই 'সন্দেশ' শ্রবণে চারদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। দেশের বাঘা-বাঘা ব্যক্তিদের নিয়ে একটি শক্তি-শালী অভ্যর্থনা সমিতি সংগঠন করা হল।

পথের দুই পাশে কাতারে-কাতারে মানুষ। দমদম বিমান ঘাঁটিতে তিলধারণের ঠাঁই নেই। হেলিকেপ্টার যোগে তার সিনেমা তোলা হল।

অবশেষে সেই বিখ্যাত ও অভিজ্ঞতা-পুষ্ট অনুসন্ধান সমিতি দমদম বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করলেন। দেশের সর্বস্তরের লোক ও প্রতিষ্ঠান তাদের মাল্যভূষিত করতে লাগলেন। এই মাল্যদানের কাজে একটা পুরো বেলা লেগে গেল। পথে যান-বাহন বন্ধ। কলকাতা বন্ধ। বিমানঘাঁটিতে অন্য কোনো বিমানের অবতরণ বন্ধ।

এমন দৃশ্য নাকি কেউ কখনো দেখেনি!

সাতদিন পর তাঁদের নাগরিক-সম্বর্ধনা জানানো হল মনুমেণ্টের পাদদেশে।

এ অনুষ্ঠানে কে সভাপতিত্ব করবেন—তাই নিয়ে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা ও মন-কষাকষি সুরু হয়ে গেল।

মেয়র বল্লেন, এ ব্যাপারে আমিই প্রধান,—রাজ্যপাল ফতোয়া জারি করলেন, আমার রাজ্যে আমিই দলের গোদা,—অতএব…

মুখ্যমন্ত্রী অঙ্গুলি হেলন করে বল্লেন, এই প্রদেশে আমিই মুখ্য ব্যক্তি,—সুতরাং……

বিরোধী দলের নেতা এগিয়ে এসে উত্তর করলেন আমি থাকতে আর কারো কোনো অধিকার নেই আমার প্রস্তাবেই এই অনুসন্ধান সমিতি সংগঠিত হয়েছিল কাজে কাজেই…

প্রায় সংগ্রাম সুরু হবার অবস্থা…এমন সময় দেখা গেল এক দল লোক একটি ছোট ছেলেকে চ্যাং-দোলা করে নিয়ে আসছে—

ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?

খানিক বাদেই আসল খবর জানা গেল।

এই ছেলেটিকে মশকদল দমদম অঞ্চল থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। একটি জেলে তার ক্যাপ্‌লা জাল ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেটিকে মশার হাত থেকে রক্ষা করে। কাজেই মশকের আক্রমণ সম্বন্ধে ছেলেটির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং এই ছেলেটিই আজকের সম্বর্ধনা সভায় সভাপতি হবার যোগ্য ব্যক্তি—

সমবেত জনতা জয়ধ্বনি করে তাদের সকলের সমর্থন জ্ঞাপন করলে।

তারপর সভাপতিকে মাল্যদান করার জন্যে এক বিরাট মিছিল এগিয়ে এলো—

মাল্যদান, চন্দন-তিলক ধারণ, উদ্বোধন সঙ্গীত, বহু বিচিত্র স্বস্তিবচন, বহুতর বক্তৃতার পর মশক অনুসন্ধান সমিতির দলপতি পঞ্চানন্দ পাকড়াশী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানের সারমর্ম সবাইকে জ্ঞাত করাবেন—

উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, বন্ধুগণ, জানি আপনারা অনুসন্ধানের আসল খবর জানবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন। আমিও আপনাদের প্রকৃত রহস্য জানাবার জন্য কম ব্যাকুল নই। দেশবাসীগণ, বন্ধুগণ, কমরেডগণ ···তবে শুনে রাখুন, আসল কারণ হচ্ছে ব্যাঙ···

সমবেত জনতা আকুল আগ্রহে চীৎকার করে উঠল, ব্যা—ঙ?

সভা থম্ থম্ করতে লাগল।

দীর্ঘকাল সভার ওপর একটা অসহ্য নীরবতা বিরাজ করতে লাগ্‌লো।

একজন অসহিষ্ণু শ্রোতা হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, —ব্যাঙ? কিন্তু মশার মধ্যে ব্যাঙ কোথা থেকে এলো?

সবাই তখন হাত উঁচু করে জিজ্ঞেস করলে, তাই ত! মশার মধ্যে ব্যাঙ!

এমন তাজ্জব কথা কেউ কখনো শোনেনি! সরকারের এত অর্থ অপচয় করে অনুসন্ধান সমিতি বিশ্বভ্রমণ করে এলো। এখন শোনাচ্ছে কিনা ব্যাঙ?

একদল লোক চীৎকার করে উঠ্‌ল,—ওকে বসিয়ে দাও। ওর মাথা খারাপ হয়েছে—

আর একদল সমস্বরে বল্লে, মাথায় ঘোল ঢালো ওর, —মাথা গরম হয়ে গেছে।

কেউ কেউ ছাতা তুলে বল্লে, চাঁদা তুলে রাঁচি পাঠিয়ে দাও। আমরা চাঁদা দিতে রাজি আছি।

সভায় তুমুল হট্টগোল সুরু হয়ে গেল!

তখন দলপতি পঞ্চানন্দ পাকড়াশী, উদাত্ত কণ্ঠে আবার বল্লেন, বন্ধুগণ, আপনারা অধৈর্য হবেন না। আসল কারণ আমি এক্ষুনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এটা বিজ্ঞানের যুগ। কার্য থাকলেই কারণ আছে—একথা জানবেন। এই মশককুল বৃদ্ধির জন্যে দায়ী ভার সরকার—

—বসে পড়ো—বসে পড়ো···

—গলায় গামছা দিয়ে ডায়াস্ থেকে নামিয়ে দাও—

—আধখানা মাথা কামিয়ে, গাধার পিঠে চাপিয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে,—সারা কলকাতা শহর ঘুরিয়ে নিয়ে এসো—

কিন্তু দলপতি পঞ্চানন্দ পাকড়াশী নির্বিকার।

তিনি আবার বল্‌লেন, বন্ধুগণ, শুনুন, ভারত

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্যে কল্‌কাতার আশে পাশের সকল ডোবা-নালা-পুকুর-ভেরীর ব্যাঙ ধরে ধরে বিদেশে চালান দিয়েছেন। কমরেড্‌গণ, আপনারা জানেন, এই ব্যাঙেরা সারা বছর ধরে মশা খায়। কিন্তু বিদেশে চালান করে দেবার জন্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্যাঙের দল আর মশা খেতে পাচ্ছে না। তার ফলে কল্‌কাতার আশে-পাশে লাখো লাখো মশা জন্মাচ্ছে। ভারত সরকারের অতি লোভের জন্যই এই কাণ্ড ঘটছে! আপনারা এর পর দেখতে পাবেন, মশকরা দলবদ্ধ হয়ে আপনাদের আকাশ পথে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে! তখন আপনারা বিনা ব্যয়ে বিমান ভ্রমণের সুযোগ সুবিধে লাভ করবেন এবং দ্রুতগতিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবেন।

দলপতি পঞ্চানন্দ পাকড়াশীর এই বিপ্লবাত্মক বৈজ্ঞানিক ঘোষণার পর সভাস্থ লাখো লাখো লোক স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

তাদের কারো মুখ দিয়ে দলপতির উদ্দেশ্যে একটি জয়ধ্বনি পর্যন্ত বহির্গত হল না।

সবাইকার মুখে যেন কে বোবা-কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে!!!

চাষী

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

আমি চাষী।
আমার খবর নিয়ে
তোমাদের কী হবে?
আমি চাষ করি,
আকাশের মেঘ যবে
ধরা বক্ষে নামে
আমি মোর গরু
আর লাঙ্গলটি নিয়ে
নামি মাঠে।
ধরিত্রীরে চষি।
বীজ বুনি।
অজস্র শস্যের লাগি
প্রার্থনা জানাই
যথাশক্তি দিয়ে,
সেই শস্যে কত হবে লাভ
কেবা খাবে তায়
এ কথা তো মোর মনে ঠাঁই নাহি পায়।
আমি তো পারি না
তোমরা সব শিক্ষকের মত
বলতে কখনও
পরীক্ষা নোব না পরীক্ষার কালে,
পড়াবো না বিদ্যা যেথা
একান্ত দুর্লভ।
আমি তো পারি না বলতে
তোমাদের ডাক্তার নার্সের মত
হাসপাতালে যাব নাকো
দাবী না মিটালে
দেখব না রুগী
এত ভিজিট না দিলে!
উকীলবাবু চাইতে পারেন যা খুশী তাঁর ফি,
কেস নেওয়া-না-নেওয়া সবি তার খুশী।
আমার তো ভাই নেই কো অবসর
চাষ করা আর বসে থাকার মাঝে
একটা বাছাই করে নেবার,
আমাকে তো চাষই করতে হয়।
কেরাণীরাও ধর্মঘট করে
বেতন বাড়াতে,
ব্যবসায়ী ব্যবসা বদল করে
ব্যবসায়ে লাভ না হলে বেশী
বলতে পারে—বেচব না চাল
বেচব না তেল,
লাভের লোভ তার কত কারসাজি।
মিলের মালিক তালা লাগায় মিলে
মজদুরদের দুটি পয়সা বেশী দিতে হলে।
রাজা উজীর পীর ফকির
সবাই পারে আপন কাজে
করতে অবহেলা।
কিন্তু আমি?
আমি তো ভাই লাঙ্গলে হাত দিয়ে
দাঁড়াতে পারিনে এক পল
হট হট লাঠি মারি বলদের পিঠে,
আমি চাষ করি
আমি নিত্য শস্যের প্রত্যাশী
আমি চাষী।

বিশ্বভাষা-পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

র্মান দার্শনিক-সাহিত্যিক হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) লতেন: ভাষা জাতির আত্মা এবং জাতি ভাষার ভিত্তিতে গঠিত। তাঁর মত অনুসারে—যতগুলি ভাষা, ততগুলি জাতি। তিনি ভাষা অনুসারে জাতি এবং জাতি অনুসারে রাষ্ট্র গঠনের সমর্থক ছিলেন। যতগুলি ভাষা ততগুলি জাতি আর ততগুলি রাষ্ট্র—এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। তাঁর জীবন-দর্শন অনুযায়ী যদি বর্তমান পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের সীমারেখা আবার আঁকা যায়, তা হলে সমস্ত দুনিয়ার মানচিত্র বদলে যাবে। তাঁর মতবাদ আমরা সমর্থন করি বা না করি, এ-কথার মার নেই যে, জাতিগঠনে ভাষা একটা মস্ত বড় উপাদান, যদি একমাত্র উপাদান নাও হয়।

ভাষা অনুযায়ী জাতি আর রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠলে কি হতে পারে না পারে, সে-আলোচনা করার আগে একবার বর্তমান জগতের ভাষাগুলির সংখ্যা, নাম, ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক পরিচয় সংক্ষেপে পর্যালোচনা রা দরকার।

প্রসঙ্গত ব'লে রাখা হ'ল যে, এই আলোচনায় কেবল ১৯৬৫ সালের লোকসমাজে লৈখিক ও মৌখিক কাজে ব্যবহৃত জীবন্ত ভাষাগুলোর উল্লেখ করা হবে। সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলির অতীত প্রচলন ও বর্তমান সাংস্কৃতিক মর্যাদা যাই হোক না কেন, এখন জাতি ও রাষ্ট্র গঠনপ্রসঙ্গে সেগুলির নামোল্লেখ মোটামুটি নিষ্প্রয়োজন। কেবল উৎপত্তিবিচার ও সূক্ষ্ম সাংস্কৃতিক পার্থক্য নিরূপণের জন্যে ভাষাসমূহের আলোচনায় ঐ সব প্রাচীন তথা জনসাধারণের জীবনে অব্যবহৃত ভাষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হবে। যে কোন এলাকায় জনসাধারণ যখন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ বা রাজ্য বা স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে চায়, তখন প্রাচীন গ্রিক, চৈনিক বা লাতিন ভাষার ভিত্তিতে করতে চেষ্টা করে না, ঐ সব ভাষার বর্তমান বংশধর আধুনিক গ্রিক, পাইহুআ বা রুমানীয় ভাষার ভিত্তিতেই করার কথা ভাবে।

হার্ডারের অভিমতকে প্রভূত গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। বিশুদ্ধ বুদ্ধি, গভীর প্রজ্ঞা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, মৌলিক দার্শনিক চিন্তা, নিখুঁত যুক্তি আর অনতিক্রান্ত প্রমাণের যে সমন্বয় তাঁর রচনায় হয়েছে, তার তুলনা নেই। জগৎবাসী তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সসম্মানে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। পণ্ডিতেরা তাঁকে তুলনামূলক সাহিত্যবিচারের জন্মদাতা ব'লে মেনে নিয়েছেন। ভাষা ও সাহিত্যের গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে এত বড় দার্শনিক আবির্ভাব আগে বা পরে আর কখনো হয় নি। স্বয়ং গোটে হার্ডারকে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভয় করতেন। তীক্ষ্ণ মননসামর্থ্যের দিক থেকে গোটে হার্ডারের সমকক্ষ ছিলেন না। বাঙালি পাঠকের কাছে তাঁকে পরিচিত করার জন্যে পরলোকগত আচার্য বিনয়-কুমার সরকার, সুবোধ কৃষ্ণ ঘোষাল প্রভৃতি কয়েক জন লেখক এক কালে কিছু চেষ্টা করেছিলেন।

ভাষার ভিত্তিতে বিশ্বপরিক্রমার আগে, অপরিচিত ভাষাগুলির অপরিচয়ের রহস্যময় যবনিকা উন্মোচনের প্রয়াসে ব্রতী হবার আগে হার্ডার সম্বন্ধে দু একটি তথ্য দিয়ে রাখা ভালো।

ইওআন্ গটফ্রিট ফন্ হার্ডার ১৭৪৪ সালের ২৫শে অগস্ট জন্ম গ্রহণ করেন। বাঙালি জাতির ক্ষেত্রে রাম-মোহন থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত মনীষী নেতৃপরম্পরার যে গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব জার্মান জাতির ক্ষেত্রে হার্ডার থেকে হিটলারের। যারা হিটলারকে নাৎসি দানব, বর্বর, অসুর ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে জার্মানদের জাতীয় চেতনায় তাঁর প্রাধান্যকে অস্বীকার করতে চায়, সেই সাংস্কৃতিক বালখিল্যদের উপেক্ষা করাই স্থিতধী পাঠকের অবশ্য কর্তব্য। জার্মান জাতির গঠনে হার্ডার

থেকে হিটলার পর্যন্ত জাতীয় নেতৃগোষ্ঠীর অবিচ্ছিন্ন দান ও সুবিন্যস্ত পরিকল্পনাবদ্ধ কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিনয়কুমার একটি গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। (পোলিটিক্যাল ফিলজফিজ সিন্স নাইন্টিন হাণ্ড্রেড এ্যাণ্ড ফাইভ।) মাত্র ৫৯ বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বসংস্কৃতিতে হার্ডার অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন তাঁর চার খণ্ডে সমাপ্ত (১৭৮৪-৯১) মহাগ্রন্থ Ideen zur philosophie der geschichte der menschheit (ইডেন্ টুস্থর ফিলজফি ডর্ গেশিখ্‌টে ডর মেন্‌শহাইট) বা "মানব জাতির ইতিহাসের দার্শনিক ধারণাসমূহ" রচনায়। লেসিং (১৭২৯-৮১) আর ক্লপস্টক (?—১৮০৩) যেমন জার্মানিতে রোমান্টিক আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন, তেমনি ঐ আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ Sturm und Drang বা "আন্দোলন ও আকর্ষণ" প্রবর্তনার পুরোধা ছিলেন হার্ডার স্বয়ং। কম্প্যারাটিভ লিটারেচার বা তুলনামূলক সাহিত্য-বিচারের জনক তাকে তো বলা যায়ই, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বা কম্প্যারাটিভ ফিললজির ক্ষেত্রেও সার্ উইলিয়ম জোন্সের মতো তাঁর নাম সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে স্মরণীয়। বিশেষ ক'রে এই উক্তিটির জন্যে তাঁকে সাধুবাদ দিতেই হয় :—

If it is incomprehensible to others how a human mind could invent language, it is as incomprehensible to me how a human mind could be what it is without discovering language for itself ("ভাষার স্ফুরণ"-১৭৭২ সাল।)

"অন্যদের কাছে যদি এ-ব্যাপারটা দুর্বোধ্য মনে হয় যে, কেমন ক'রে মানব-মন ভাষার উদ্ভাবন করতে পারল, তা হ'লে আমার কাছেও এটা সমান দুর্বোধ্য যে কেমন ক'রে মানব-মন নিজস্ব ভাষা আবিষ্কার না ক'রে তা হতে পারে, যা সে হয়েছে।"

যাঁরা ভারতে ঐক্যের অনুরোধে সব ভাষাকে একটি ভাষার মধ্যে লুপ্ত একাকার ক'রে দিতে চান, তাঁরা এই মহাসত্যটি ভুলে যান যে, মানব-মনের বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টিশক্তি ভাষাগত বিশেষত্ব ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। বিভিন্ন ভাষাভাষী যদি নিজেদের আলাদা আলাদা মাতৃভাষা পরিত্যাগ ক'রে একটিমাত্র ভাষায় কথা বলে তা হলে তার অর্থ হবে, মানব-মনের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের অবসান। সৃষ্টির মূল কথা unity in diversity বা বহুর মধ্যে এক নয়, diversity in unity বা একের মধ্যে বহু। এক বীজকে বহুধাবিভক্ত করেই ভগবানের সৃষ্টি-লীলা সচল, একোঽহং বহু স্যাম্ সৃষ্টির অন্তর্লীন তত্ত্ব, এই সত্য উপনিষদের ভারতীয় আর্য ঋষি ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। হার্ডারও এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮০৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তিনি মারা যান মানবজাতির ক্রমবিকাশের যে বিশ্লেষণ রেখে, মার্কস্ বা শ্রীঅরবিন্দও পরবর্তী কালে Das Kapital বা Life Divine-এ তাকে অস্বীকার বা অতিক্রম করতে পারেন নি।

শ্রেষ্ঠ বাঙালি চিন্তাবীর বিনয় কুমার সরকার হার্ডারের মহত্ত্ব স্বীকার ক'রেও তাঁর প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদটি ভালো, যুক্তিপূর্ণভাবে করার চেষ্টা করা হয়েছে, যে-গুণ এ-যুগের পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। উপস্থিত রচনায় আমরা হার্ডার ও বিনয়কুমারের প্রতিপাদ্য নিয়ে আলোচনা ক'রে একটি সংশ্লেষণী সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করবো। সুতরাং বিনয়বাবুর বক্তব্য পাঠকের সুবিধের জন্যে আদ্যোপান্ত তুলে দেওয়া হ'ল : -

"অনেক দিন ধ'রে আমি হার্ডারের গুণগান ক'রে আসছি। নানা বিদ্যার ক্ষেত্রে হার্ডার, হার্ডার বকা আমার দস্তুর। কিন্তু হার্ডারের একটা বড় কথার বিরুদ্ধে আমি লাঠি নিয়ে থাকি। হার্ডারের মতে প্রত্যেক জাতির একটা আত্মা বা প্রাণ আছে, আর সেই প্রাণ দেখতে পাই ভাষায়। অতএব তাঁর বয়েৎ—জাতিমাফিক রাষ্ট্র, ভাষা হিসাবে রাষ্ট্র, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র। এই বাণী হ'ল দুনিয়ার জাতীয় স্বাধীনতা আর জাতীয়তার মন্তর। হার্ডার চান—যতগুলি জাতি, ততগুলি রাষ্ট্র—যতগুলি ভাষা, ততগুলি রাষ্ট্র। বিভিন্ন ভাষাভাষী নর-নারীর সম্মেলনে রাষ্ট্রগঠন হার্ডারদর্শনে অসম্ভব। হার্ডার-মত অনুসারেই একালের লোকেরাও—পোল, চেক, লিথুআনিআন, হাংগারিআন, বুলগার, আরব, ভারতীয় ইত্যাদি—দেশবিদেশে ভাষামাফিক জাতীয় রাষ্ট্রের নেশায় মাতাল।

এই মত আমার পক্ষে বরদাস্ত করা অসম্ভব। অন্যান্য ভারত সন্তানের মতন আমিও এই মত নিয়েই জীবন সুরু করেছিলাম। কিন্তু স্বদেশি যুগেই ১৯১০-১১ সনের আব-

হাওয়ায় "ইতিহাসবিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা" প্রবন্ধে তাঁর বিরুদ্ধে মত প্রচার করতে সুরু করেছি। পরে নানা ঠাঁইএ এ-মতটার বিরুদ্ধে নিজের মত কথঞ্চিৎ পুষ্ট আকারে প্রকাশ করেছি। পলিটিক্স্ অব বাউণ্ডারিজ্ বইএ (১৯২৬) তার কিছু পরিচয় আছে।

আমার বিবেচনায় রাষ্ট্র একটা কৃত্রিম সংঘ ও শাসন-যন্ত্র। এর ভেতর প্রাণ, আত্মা ইত্যাদি বস্তু দেখবার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নানা ভাষাভাষী নরনারী—হরেক রকমের সংস্কৃতিওয়ালা নরনারী—এক সঙ্গে জীবন চালাতে সমর্থ। এই হিসাবে আমি হার্ডারের এবং হার্ডারপ্রবর্তিত দেশি-বিদেশি চিন্তাধারার উল্টা। জগৎ প্রসিদ্ধ মায় ভারতপ্রসিদ্ধ জাতীয়তাদর্শনের বিরুদ্ধে চলে আমার রাষ্ট্রদর্শন। আমি হার্ডারপ্রচারক বটে, কিন্তু কোনো-কোনো বিষয়ে আমি হার্ডারের চাই নই—বরং হার্ডারবিরোধী।" (২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২—বিনয় সরকারের বৈঠকে।)

বিনয়কুমারের রাষ্ট্রদর্শনের দুবলতা শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়-লিখিত "ইতিহাসচর্চায় বিনয় সরকার" গ্রন্থের সমালোচনায় ১৮৮০ শকাব্দের কার্তিক সংখ্যার "বিংশ শতাব্দী" মাসিকপত্রে বর্তমান প্রবন্ধলেখক কর্তৃক এইভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয় (১৯৫৮):—

"ইতিহাস চর্চায় বিনয় সরকার বইএর ৮৬ পৃষ্ঠায় হরিদাসবাবু লিখেছেন: তথাকথিত জাতিগত বা ভাষাগত ঐক্য অনুসারে "পৃথিবীর কোনো মুল্লুকে রাষ্ট্র কায়েম করা অসম্ভব।" উদ্ধৃতিচিহ্ন দিয়ে তিনি বিনয়কুমারের কথা উল্লেখ ক'রে যা বলেছেন তার প্রতিবাদ প্রয়োজন।

ভ্যার্সাই-চুক্তি অনুসারে প্রথম মহাযুদ্ধের পর বা বর্তমানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে যে-সব রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠেছে সে-সবে একভাষী তথা একজাতি জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। যুদ্ধজয়ের পুরস্কারস্বরূপ বিজয়ী ও অনুগৃহীত জাতিকে অন্যভাষী তথা অন্য জাতির এলাকা উপহার দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে প্রমাণ করা যায় না যে, সেটা না করে রাষ্ট্র গঠন করা যেত না, কিম্বা সেটাই সুষ্ঠুতর ব্যবস্থা। বস্তুত, একভাষী তথা একজাতি রাষ্ট্র গঠন না ক'রে মূলত একভাষিক এলাকার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অন্যভাষী এলাকার কিছু সংলগ্ন অংশ মিশিয়ে মিশ্র-জাতিক রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে ব'লেই ইউরোপের অশান্তি দুটি মহাযুদ্ধেও দূর হয় নি। ফ্রান্সের কথা ধরা যাক। ফ্রান্স মূলত ফরাসিভাষী ফরাসি জাতির রাষ্ট্র; এই রাষ্ট্র যুদ্ধ জয়ের সুযোগে ও অন্য নানা কারণে কেবল পরস্পর সংলগ্ন ফরাসি এলাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে নি; ঐ ফরাসি এলাকাই রাষ্ট্রের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ আর তা অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতও বটে; সুতরাং ৬০ লক্ষ ফরাসি জাতীয় লোক-জন নিয়ে বিশুদ্ধ ফরাসি ফ্রান্স গঠনে কোন বাধা নেই। কিন্তু জার্মানির কাছে আলসাস-লোরেন, ইতালির কাছে কর্সিকা-নিচে প্রভৃতি ফরাসি জাতির বাসভূমির বাইরে থেকে নিয়ে ফ্রান্সকে পুষ্টতর করা হয়েছে। তাই জার্মানি, ইতালি, স্পেন প্রভৃতির সঙ্গে ফ্রান্সের সীমানা নিয়ে ঝগড়াও আছে। ঐ সব এলাকা নিয়ে ফরাসি রাষ্ট্র কাজ করছে বটে, কিন্তু ঐ সব এলাকা বাদ দিয়ে তার কাজ আরো ভালো চলতে পারে। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিআ প্রভৃতি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিনয়কুমারের বক্তব্য প্রমাণিত হয় না, খণ্ডিত হয়। পোল্যাণ্ডে মাত্র ৫২৭ জন পোল ছিল বলেই তো সে-রাষ্ট্র টি'কল না; হিট্লার-স্টালিনের উদ্যোগে জার্মান, ইউক্রেনীয় ও শ্বেত রুশেরা বেরিয়ে গিয়ে ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশল। জাতি বা ভাষা হিসাবে রাষ্ট্র ইউরোপে প্রায় কোথাও নেই ব'লেই ইউরোপের ভাষাভিত্তিক বিন্যাস অসম্ভব, এ-সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। গ্রামকে একক ধ'রে ইউরোপকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করলে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই অন্যভাষী সংখ্যালঘুর সংখ্যা হবে মাত্র দু-এক হাজার ক'রে। তাদের আপোষমূলক বিনিময়ও সহজেই সম্ভব। বহুভাষী তথা বহুজাতিক রাষ্ট্রের তুলনায় একভাষী একজাতি রাষ্ট্রের শাসন-পরিচালনা সহজতর। ইউরোপে তেমন দৃষ্টান্ত আছে; আরো ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়। সুতরাং বিনয়কুমার এ-প্রসঙ্গে গুরুতর ভুল করেছেন। হার্ডারের প্রতিবাদে যা বলা হয়েছে, তাও যুক্তিহীন।"

বিনয়কুমার নিজেকে রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে হার্ডারবিরোধী ব'লে প্রচার করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাষ্ট্রদর্শন অন্যত্র সব ক্ষেত্রে হার্ডারকেই একনিষ্ঠভাবে কতটা অনুসরণ করেছে তা বহু উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বিপুল রচনাবলী থেকে সহজে প্রমাণ করা যায়। ভৌগোলিক বা ধর্মীয় গুরুতর বিচ্ছেদে

কারণ থাকলে একভাষী রাষ্ট্র একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়তে পারে বটে, কিন্তু তা ব'লে কোথাও একাধিকভাষী রাষ্ট্র জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয় না। একভাষী রাষ্ট্র একাধিক খণ্ডে ভৌগোলিক ব্যবধান বা ধর্মীয় বিসংবাদের জন্যে আলাদা হলেও প্রতি খণ্ড আবার স্বতন্ত্রভাবে একভাষী রাষ্ট্রই থাকে।

পক্ষান্তরে একাধিকভাষী একাধিক জাতির রাষ্ট্র যে কেমন ভাবে কাজ করে, স্বয়ং বিনয়কুমারের রচনা থেকে তার প্রমাণ সঙ্কলন করা হ'ল :—

"সুইট্‌সারল্যাণ্ডের এই অঞ্চলকে এক কথায় জার্মানিরই জের বলা যেতে পারে। এই জনপদে আগাগোড়া জার্মান ভাষারই রেওয়াজ : সুইট্‌সারল্যাণ্ডের নিজের কোন ভাষা নেই। তার উত্তর আর পূর্ব অঞ্চলটা জার্মান ভাষাভাষী নরনারীর দেশ। পশ্চিম জনপদে চলে ফরাসি ভাষা। যে-অংশে লোকেরা ফরাসি বলে, সে-অংশটা আয়তনে খুবই ছোট। দক্ষিণবর্তী জনপদটা প্রায় আগাগোড়াই ইতালিয়ান, এই অংশকে উত্তর ইতালির শেষ সীমানা বললেই চলে। মজার কথা, মুসোলিনির আমলে ফাশিস্তরা এই অংশটাকে ইতালির উদরস্থ করবার জন্যে মাঝে-মাঝে লাঠির আওয়াজ শুনিয়ে থাকে। সুইস গবর্ণমেণ্টকে এই জন্য অনেক সময় ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছে।

ভাষার টানে, রক্তের টানে, লেনদেনের টানে সুইস নরনারী বাস্তবিকপক্ষে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক। ফরাসি অঞ্চলের সুইসরা ফরাসি ভাষায় কথা কয়, তাদের কেহ জার্মান ভাষা একপ্রকার জানে না বললেই চলে। আর ইতালিআন তাদের জানা তো নাই-ই। জার্মান সুইট্‌সারল্যাণ্ডের নরনারী জার্মান ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না। আর ইতালিআন জনপদের লোকেরা জার্মানও জানে না, ফরাসিও জানে না। সুইট্‌-সারল্যাণ্ডে তথাকথিত সার্বজনিক ভাষা অথবা জাতীয় ভাষা ব'লে কোনো ভাষা নেই। প্রত্যেক জনপদেই ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় লেখাপড়া শিখে থাকে। জার্মান জনপদের ইস্কুলে ফরাসি ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষার ব্যবস্থায় ফরাসি ভাষা বাধ্যতামূলক বটে, তথাপি ফরাসি এখানে একটি মামুলি দ্বিতীয় ভাষা মাত্র। অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে বুঝেছি যে,তারা ইস্কুল ছাড়বার পর ফরাসি ভাষার সঙ্গে মোলাকাৎ খুব কমই করে। আমাদের দেশের ইস্কুলে ৫।৭ বৎসর সংস্কৃত পড়বার পরও সংস্কৃত ভাষায় আমাদের অভিজ্ঞতা নেহাৎ কম থাকে। বস্তুত তাদের সঙ্গে ফরাসিতে কথাবার্তা চালাতে চেষ্টা ক'রে দেখেছি, অনেকেই তা পারে না। ফরাসি সুইট্‌সারল্যাণ্ডে জার্মান পড়াবারও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের কথা, এই অঞ্চলের সুইস মহলে জার্মান ভাষার সঙ্গে অসহযোগ যেন একটা বাঁধা কথা। জার্মান সুইট্‌সারল্যাণ্ডের লোকেরা যতটুকু ফরাসি বলতে পারে, ফরাসি সুইট্‌সারল্যাণ্ডের লোকেরা ততটুকু জার্মান বলতে পারে না মনে হয়েছে। ইতালিআন সুইট্‌সারল্যাণ্ডের ইস্কুলেও জার্মান অথবা ফরাসি পড়াবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু লোকেরা না জানে ফরাসি, না জানে জার্মান। সুইস জনসাধারণ বাস্তবিকপক্ষে মূলত এক ভাষাভাষী আর সেই এক ভাষাও জনপদ হিসাবে বিভিন্ন। দেশটা এরূপ ত্রিধা-বিভক্ত হ'লে ইহার মধ্যে ঐক্য কোথায়? বাস্তবিকপক্ষে কোনো প্রকার ঐক্য নেই। আমি সুইট্‌সারল্যাণ্ডের তিন জনপদকে তিন-তিনটা স্বাধীন দেশ বিবেচনা করতে অভ্যস্ত। ঐক্য এখানকার সবই আইনবিষয়ক, শাসন-বিষয়ক, রাষ্ট্রবিষয়ক।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে।)

অন্যত্র বিনয়কুমারের সঙ্গে তাঁর ছাত্রদের প্রশ্নোত্তরেও বিনয়কুমারের হার্ডারনিষ্ঠা ধরা যায় :—

"প্রশ্ন—আজকাল চারি দিকেই ঐক্যগ্রথিত ভারতীয় রাষ্ট্রের কথা শোনা যাচ্ছে। এই সময় বাঙালির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কথা ব'লে দেশটাকে কি আপনি পিছিয়ে দিতে চাচ্ছেন না?

বিনয়কুমার—আমি চাচ্ছি মগজের খেলা। যুক্তির লড়াই। আমি ভারতখানাকে তামাম ইয়োরোপের মতন একটা মহাদেশ বা নিম্ন-মহাদেশ সমঝে থাকি। এটা ফ্রান্স, ইতালি বা স্পেনের মতন ছোটোখাটো মামুলি দেশ নয়। ফ্রান্স, ইতালি ইত্যাদি দেশের মতন দেশ পাঞ্জাব, বাংলা, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ইত্যাদি জনপদ। এ-সব হচ্ছে যুক্তির কথা। সদিচ্ছামাফিক চিন্তার মামলা নয়। কেঠো নীরস তথ্য বা বস্তু।

প্রশ্ন—সারা ভারত একটি ঐক্যগ্রথিত রাষ্ট্রের অন্তর্গত হবে, এরূপ আপনি বিশ্বাস করতে রাজি নন?

বিনয়কুমার—না। এটা বস্তুনিষ্ঠ কল্পনার অতীত জিনিস। ভারতের মতোই ইয়োরোপেরও অবস্থা। ইয়োরোপে কোনো দিন ঐক্যবদ্ধ ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র খাড়া হতে পারবে না। বাঙালিরা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা এক-একটা প্রদেশে যথাসম্ভব স্বতন্ত্রতা রক্ষা ক'রে চলুক। বাঙালির বঙ্গস্বাতন্ত্র্যের মতন পাঞ্জাবিদের হোক পাঞ্জাব-স্বাতন্ত্র্য আর মাদ্রাজিদের মাদ্রাজ স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি। বাংলাকে ভারতবর্ষের ভিতরকার স্বতন্ত্র জনপদ ভাবা উচিত। এইটাই আমি এখন জোরের সঙ্গে প্রচার করতে চাই। ইয়োরোপ ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি ইত্যাদি দেশ যা, ভারতে বাংলা, পাঞ্জাব, গুজরাত, মাদ্রাজ ইত্যাদি দেশ তা। আমি আগে বাঙালি, তার পর ভারতবাসী।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে।)

এই সব মতামত থেকে বোঝা যায় যে, বিনয়কুমারের হার্ডারবিরোধিতা বিশেষ দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। নানা জাতি ও ভাষার লোক নিয়ে রাষ্ট্র গঠন করা গেলেও তার মধ্যে যে প্রকৃত ঐক্য থাকে না, সে-কথা তিনি সুইট্সারল্যাণ্ড ও ভারতপ্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন। শিথিলবিন্যস্ত বা গায়ের জোরে একীভূত রাষ্ট্রের তুলনায় যে ঐক্যবদ্ধ একজাতিক একভাষী রাষ্ট্র অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ-ক্রিয়, এ-কথা বিনয়কুমারকে অন্যত্রও স্বীকার করতে হয়েছে। অন্যান্য অবস্থা সমান সমান হলে বহুভাষী বহুজাতিক রাষ্ট্রের তুলনায় একভাষী একজাতি রাষ্ট্র অনেক বেশি দৃঢ়-সংবদ্ধ ও শক্তিশালী হবেই। সুতরাং হার্ডারের মতবাদ খণ্ডিত হচ্ছে না। যিনি ভারতের অখণ্ডতায় বিশ্বাস না ক'রে বাংলা, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা ইত্যাদি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা ভেবেছেন, তিনি যে নিজের অজ্ঞাতসারে হার্ডারের ভাষা-ভিত্তিক জাতি ও রাষ্ট্রের তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাঙালি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি জাতিবাচক শব্দগুলি অবশ্যই ভাষাভিত্তিক।

এর পর সমগ্রভাবে বিশ্বের এবং বিশেষভাবে বাংলা-দেশের ভাষাপরিক্রমা আরম্ভ করা যেতে পারে। [ক্রমশঃ

একমেবাদ্বিতীয়ম্

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

একখানি গান সারাটি জীবন
 গেয়ে চলি ভিন্ সুরে,
একটি কথাই কহিবারে চাই
 বারে বারে ঘুরে ঘুরে?
কী সে গান আর কিবা
 সেই কথা?
কী মহান্ ক্ষুধা আর আকুলতা?
কোন্ সুস্বাদু চির অতৃপ্তি জাগিছে হৃদয়-পুরে!
কেন নাহি জানি কোন্ ছায়াখানি
 করি শুধু ধরি ধরি,
আমি যতো ধাই সে যেন সদাই
 যায় শুধু সরি' সরি'।
সেই ব্যর্থতা-আতক্রন্দন
ছন্দে ছন্দে করি বন্ধন;—
কবিতাকমলগন্ধে চিত্ত
 ভরপুর মরি মরি।

একটি তৃষায় রহিয়াছে হায়,
 চিত্ত-চকোর জাগি',
কাঁদিছে শুক্তি একটি বিন্দু
 স্বাতীর সলিল লাগি'!
নানা ইঙ্গিতে, নানান ভাষায়
ফোটাই কেবল একটি আশায়;
চাহি না—চাহিনা কোনো কিছু আর—
 কেবল একটি মাগি।
কোন্ সেই নিধি খুঁজি নিরবধি
 হাট-বাট, অলি-গলি,
রিক্ত জীবন—কোন্ সে স্বপন
 সফল হয় নি বলি'!
একটি সুরেই বসি' নিদহারা
বাঁধি এ আমার ছোটো একতারা;
নহে—নহে বহু, একটি দেবতা—
 দিই তারে অঞ্জলি!

মাশুল

(ও, হেনরী)

অনুবাদ ঃ নির্মলগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

রীতিমত বিত্তবান্ ব্যক্তি জেরোম ওয়ারেণ লক্ষ ডলার মূল্যের বাটীতে বাস করতেন। তিনি দালালি করতেন। নিছক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রত্যহ সকালে তিনি কিছুটা হাঁটতেন এবং তারপর একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে কার্যালয়ে যেতেন।

এক বন্ধুর পুত্র গিলবার্ট নামক একটি ছেলেকে তিনি পোষ্য নিয়েছিলেন। ছেলেটি চিত্রশিল্পের চর্চা করত এবং তাতে তার সাফল্য নাকি অবধারিত ছিল। ঐ পরিবারে আরও একজন ছিল—সে হচ্ছে বারবারা রস। জেরোমের নিজের কোন পরিবার নেই বলেই তিনি অপরের বোঝা স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন।

ঠিক একই ভাবে এক সঙ্গে গিলবার্ট ও বারবারা রস্ মানুষ হতে লাগল। কোন এক শুভদিনের এক শুভ মুহূর্তে এরা দুজনে যে ছাঁদনাতলায় এসে দাঁড়াবে একথা সকলেই জানত। বৃদ্ধ জেরোমের বিপুল সম্পত্তি ছড়িয়ে দেওয়ার মালিকও যে এরা, সে সম্বন্ধেও কারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ঠিক এমনই সময় এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হল।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে বৃদ্ধ জেরোম যখন যুবক ছিলেন তখন ডিক্ নামে তাঁর এক ভ্রাতা ছিলেন। ভাগ্য পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি পশ্চিমে চলে যান।

এতদিন পর তার সংবাদ পাওয়া গেল। সৌভাগ্য অর্জন করতে অক্ষম হলেও দুর্ভাগ্যের কবলে পড়তে তাঁর বিলম্ব হয় নি মোটেই। দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে তিনি এমন মুমূর্ষু। পত্রে তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর এই দীর্ঘজীবনের অক্লান্ত প্রয়াসের একমাত্র সুফল ও সম্পদ হচ্ছে তাঁর উনিশ বৎসর বয়স্কা একমাত্র কন্যা। তাকেই তিনি দেশে জেরোমের নিকটে প্রেরণ করছেন। তার তত্ত্বাবধান, প্রতিপালন, শিক্ষাদীক্ষা, মঙ্গলামঙ্গল—সবকিছুরই দায়িত্ব তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন জেরোমের হাতে।

এইটুকু ভার বহন করা বৃদ্ধ জেরোমের পক্ষে আদৌ কঠিন কাজ নয়। তাঁর কাঁধ অতিশয় শক্ত ও মজবুত। বাসুকির ফণার উপর ভর করেই তো রয়েছে এই সসাগরা বিপুলা পৃথ্বী! কিন্তু সেই বাসুকি কিসের উপর ভর করে দণ্ডায়মান থাকবে? কেন—সেজন্য তো বৃদ্ধ জেরোমের ন্যায় দৃঢ় মানুষদের বিস্তৃত স্কন্ধই রয়েছে।

মানুষ অমরত্ব লাভ করতে পারে কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছা হয়, বৃদ্ধ জেরোমের ন্যায় মানুষেরা কখন তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য লাভ করে থাকেন!

নেভাদা ওয়ারেণকে এগিয়ে গিয়ে নিয়ে আসার জন্য ওঁরা সকলেই স্টেশনে গেলেন। ছোট মেয়ে নেভাদা। রৌদ্রে পুড়ে বর্ণ তামাটে হয়েছে, কিন্তু সুন্দর তার স্বাস্থ্যশ্রী। তার হাবভাব সম্পূর্ণ সরল ও নিঃলাজ। জিনিসপত্রে পরিপূর্ণ চামড়ার ভারী ব্যাগটা সে অনায়াসেই তার হাতে ঝুলিয়ে নিল। উর্দিপরা মুটেরা তার হস্ত থেকে ওটা ছিনিয়ে নেওয়ার বৃথাই চেষ্টা করল।

: তুমি আজ থেকে আমার বন্ধু হবে। বারবারা তার শক্ত আর তাম্রাভ কপোল চাপড়ে বলল।

: আমিও তাই আশা করি। নেভাদা বলল।

: এটা যেন তোমার বাবার নিযজরই বাড়ী, একথা

ভেবে নিশ্চিন্তে এখানে থাকবে তুমি। বৃদ্ধ জেরোম ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বললেন।

: তোমাকে ধন্যবাদ। নেভাদা বলল।

: আর আমি তোমাকে ডাকব বোন বলে। গিলবার্ট বলল। মুখে তার নয়ন-মুগ্ধকর হাসি।

॥ দুই ॥

নরনারী সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সাধারণতঃ ত্রিভুজাকারে সৃজিত হয়। তিনজন মানুষের ঐ ত্রিভুজ। ঐ ত্রিভুজে থাকে একজন পুরুষ আর দু'জন নারী অথবা একজন নারী ও দু'জন পুরুষ। নেভাদা ওয়ারেণের আগমনের পর গিলবার্ট, বারবারা এবং তাকে নিয়েও গড়ে উঠল অনুরূপ একটি ত্রিভুজ। আর বারবারা রস্ গুল সেই ত্রিভুজের অস্তিত্ব।

প্রাতরাশ সমাপনান্তে বৃদ্ধ জেরোম প্রভাতী সংবাদ পত্রের উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। তারপর তিনি কাজে বেরিয়ে যাবেন। নেভাদার উপর তাঁর খুবই স্নেহ পড়ে গিয়েছে। মৃত ভ্রাতার চরিত্রের নীরব স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা আর সন্দেহাতীত সারল্যের বহুলাংশ পেয়েছে নেভাদা।

কুমারী নেভাদা ওয়ারেণের নামে একখানা পত্র নিয়ে একজন পরিচারিকা এল।

: একটা ছেলে এই চিঠিখানা দিল, সে বিনীতভাবে জানাল : উত্তরের জন্য ছেলেটি বাইরে অপেক্ষা করছে।

নেভাদা বসে বসে গুন্ গুন্ করে একটা চটুল গানের সুর ভাঁজছিল আর তাকিয়ে দেখছিল বাইরের গাড়ী-ঘোড়ায় চলাচল।

নেভাদা তার হাত থেকে খামখানা নিল। পত্রের উপরে বামদিকে ছিল সোনালী রঙের ছোট একটি মোহর। তাই অবলোকন করে সে বুঝতে পারল গিলবার্ট লিখেছে ওটা।

খামটা ছিঁড়ে ফেলে আভ্যন্তরীন চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর গম্ভীর মুখে কাকার নিকটে গিয়ে দাঁড়াল।

: আচ্ছা কাকা, গিলবার্ট নিশ্চয়ই একটা ভাল ছেলে, তাই নয় কি?

: নিশ্চয়ই সে একজন ভাল ছেলে। সশব্দে কাগজখানা ভাঁজ করে ফেলে বলে উঠলেন জেরোম।—আমি নিজের হাতে মানুষ করেছি তাকে।

: সকলে জানতে পারবে না বা পড়তে পারবে না কারো কাছে এমন কিছু লেখা তার পক্ষে উচিত হবে না, তাই নয় কি কাকা? এই চিঠিটা পড়ে দেখতো তুমি। এইমাত্র সে পাঠিয়েছে আমাকে। ঠিক ঠিক সব কিছু লেখা হয়েছে কিনা একবারটি দেখে দাও। শহরের মানুষ আর তাদের আদব-কায়দা সম্বন্ধে কিছুই যে জানা নেই আমার।

বৃদ্ধ জেরোম হাতের খবরের কাগজটা মেঝেয় ফেলে দিয়ে তারই উপরে পা রাখলেন। হিংস্রভাবে গিলবার্টের পত্রখানা কেড়ে নিয়ে পড়লেন সেটা একবার দু'বার তিনবার।

: তুমি তো আমায় পাগল করে তুলেছিল খুকু। জেরোম বললেন: অবশ্য ভাল ছেলে বলেই জানি তাকে। ওর স্বভাবটা হয়েছে ঠিক ওর বাবার মত। এক টুকরো হীরে ছিল ওর বাবা। বিকেল চারটেয় তুমি আর বারবারা মোটরে করে ওর সঙ্গে লং দ্বীপে বেড়াতে যাবে কিনা সেই কথাই কেবল জানতে চেয়েছে গিলবার্ট। শুধু ঐ চিঠির কাগজখানা ছাড়া এতে খারাপ কিছুই দেখছিনা আমি। আমি কোন দিনই ঐ ফিকে নীল রঙটা পছন্দ করি না।

: তাহলে আমাদের যাওয়া ঠিক হবে? নেভাদা বেশ আগ্রহের সঙ্গেই প্রশ্ন করল।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন যাবে না! নিশ্চয়ই যাবে। তোমাকে এতটা সরল ও সতর্ক দেখে খুবই খুশি হলাম। আমি বলছি, যাও।

: আমি জানতাম না। বিনয়-নম্র স্বরে নেভাদা বলল। : আমি ভাবলাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিৎ। আমাদের সঙ্গে তুমি যাবে কাকা?

: আমি? না, না, না। একবার কেবল চড়েছিলাম ওর গাড়ীতে। ও ই চালাচ্ছিল। বাপরে বাপ! তারপর আর চড়িনি। তবে তোমার আর বারবারার পক্ষে যাওয়া ঠিকই হবে। হ্যাঁ, তোমরা যাও। আমি কিন্তু যাচ্ছি না বাপু। না, না, কিছুতেই না।

নেভাদা ছুটে গেল দরজার কাছে। পরিচারিকাকে বলল: বলে দাও আমরাও যাব। কুমারী বারবারার হয়ে আমিই বলছি। ও যেন মিঃ ওয়ারেণকে একবার জানিয়ে দেয়। আমরা যাব।

: নেভাদা! আহ্বান করে বৃদ্ধ জেরোম বললেন: কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি, ওকে একটু লিখে উত্তর দিলে ঠিক হ'ত না? শুধু একটা লাইনই যথেষ্ট হত।

: না, তার দরকার নেই। উৎফুল্ল-স্বরে নেভাদা বলল। : গিলবার্ট ঠিক বুঝতে পারবে। আমি কখনও মোটর গাড়িতে চড়িনি। তবে ডিঙ্গি নৌকা আমি বেশ বাইতে পারি। কোন্‌টা বেশী মজার জানতে ইচ্ছা করছে।

তিন

প্রায় দু' মাস অতিবাহিত হয়েছে।

ঐ লক্ষ ডলার মূল্যের বাটীর পাঠাগারে উপবিষ্ট ছিল বারবারা। তার পক্ষে এইটাই ছিল সর্বোত্তম স্থান। উদ্বেগ-কাতর কিংবা চিন্তাক্লিষ্ট মানুষের কাছে নিভৃত-নির্জন পড়বার ঘরই হচ্ছে চমৎকার একটা আশ্রয় স্থল।

অতিভুজ যে ত্রিভুজের দীর্ঘতম বাহু সেটা উপলব্ধি করতে তার সাধারণতঃ দীর্ঘ সময় লেগে যায়। তার সুদীর্ঘ-রৈখিক জীবনে মোড় ঘোরার ব্যাপার ঘটে না যে কখনও!

সেখানে বারবারা একাই ছিল। বুড়ো জেরোম ও নেভাদা থিয়েটারে গিয়েছে। সে ইচ্ছা করেই যায়নি—বসে বসে বই পড়বে বলেই স্থির করেছে।

গ্রন্থাগারে টেবিলের উপর ডান হাতখানা রেখে চুপ-চাপ বসেছিল বারবারা। দ্বিধাগ্রস্ত অঙ্গুলি দিয়ে একখানা পত্র নাড়াচাড়া করছিল। নেভাদা ওয়ারেণের নামে চিঠিখানা এসেছে। খামের উপরে বাঁ দিকে গিলবার্টের সেই ক্ষুদ্র সোনালী রঙের শীলমোহর। চিঠিখানা এসেছে রাত্রি ন'টায়, নেভাদা চলে যাওয়ার ঠিক পরেই।

পত্রের ভিতরে কি আছে তা অবগত হওয়ার জন্য বারবারা তার কণ্ঠের মুক্তার হারটিও খুলে দিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিল। জলে ভিজিয়ে অথবা চুলের কাঁটা, কলমের ডগা কিংবা ঐ ধরণের জিনিস দিয়ে সে পত্রখানা খুলবার প্রয়াস পেল না। সেটা করতে তার সামাজিক মর্যাদায় বাধল। অতি জোরালো আলোর সামনে খামখানা ধরে চিঠির অন্ততঃ কয়েকটি ছত্র পড়বার চেষ্টা করল বারবারা। কিন্তু গিলবার্টের কাগজ নির্বাচনে সুবিবেচনার ফলে তা সম্ভব হল না।

এগারটায় ওঁরা থিয়েটার হতে প্রত্যাবর্তন করলেন। সুন্দর এক শীতের রজনী। গাড়ী হতে অবতরণ করে বাড়ীর দুয়ার পর্যন্ত আসতে না আসতেই চূর্ণ তুষারের পুরু আস্তরণে তাঁদের দেহ ঢাকা পড়ে গেল। রাস্তার ভীড় ও ভাড়া গাড়ীর অব্যবস্থার জন্য বৃদ্ধ জেরোম মৃদু অসন্তোষ জানাচ্ছিলেন। আর নেভাদা একটানা বকে যাচ্ছিল। পাহাড়ের উপর তার পিতার কোজণয় চতুর্দিকে শীতের ঝড়ো রাতের বর্ণনা দিচ্ছিল সে। বারবারা এসব কথাবার্তায় যোগ দেয় নি। তার অন্তরটাই যে শীতল হয়ে গিয়েছে। সে বসে বসে কাঠ চেলা করছিল। তদ্ব্যতীত অন্য কোন কাজের কথা তার মনেই আসে নি।

গরম জলের বোতল আর কুইনাইনের সন্ধানে বুড়ো জেরোম তৎক্ষণাৎ উপরতলায় চলে গেলেন।

নেভাদা গ্রন্থাগার কক্ষে প্রবেশ করল। হাতলযুক্ত চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিল। দস্তানার বোতাম খুলতে খুলতে মুখ-ভঙ্গীতে একটা বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলল। নাটকটা তার মোটেই ভাল লাগে নি।—হ্যাঁ মিঃ ফিল্ডসের অভিনয় তো এক-এক সময় দস্তুরমত হাস্যকর বলে মনে হল আমার কাছে।

গাম্ভীর্য বজায় রেখে বারবারা বলল: তোমার একখানা চিঠি আছে ভাই! তুমি চলে যাবার পরই এটা এসেছে।

: কার কাছ থেকে এসেছে ওটা? বোতাম খুলবার চেষ্টা করে নেভাদা জিজ্ঞাসা করল।

: আমি কেবল অনুমান করে বলতে পারি। বারবারা হেসে বলল: চিঠির এককোণে একটা অদ্ভুত জিনিস লাগান রয়েছে, গিলবার্ট ওটাকে শীলমোহর বলে।

: আমি ভেবে পাই না আমার কাছে সে কি লিখতে পারে? নেভাদা কোনরূপ আগ্রহ ন দেখিয়ে বলল।

: আমরা মেয়েরা সবাই একরকম। বলে চলল বারবারা: ডাকঘরের ছাপ দেখেই চিঠির ভিতরে কি আছে আমরা তা বুঝবার চেষ্টা করি। শেষ অবধি কাঁচি চালাই আর পড়তে শুরু করি একেবারে নীচের থেকে। নাও তোমার চিঠি।

বারবারা টেবিলের উপর দিয়ে চিঠিখানা এগিয়ে দিচ্ছিল।

: কি জ্বালা! বলে উঠল নেভাদা। : দস্তানার এই

বোতামগুলো দেখছি একটা উৎপাত বিশেষ! এবার থেকে বাক্‌স্কিনের দস্তানা পরব। দয়া করে খামটা ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়না, বারবারা! হাত থেকে এগুলো খুলতে দেখছি আমার অনেক রাত হয়ে যাবে!

: এই চিঠি আমার খুলতে বলো না লক্ষ্মীটি! এ-চিঠি তোমার। গিলবার্ট তোমার কাছেই শুধু লিখেছে। অপর কাউকে ওটা পড়তে দেওয়া তোমার উচিত নয়।

দস্তানা থেকে দৃষ্টি অপসারণ করে নেভাদা তার স্থির-শান্ত নীল চোখ তুলে তাকাল। : আমার কাছে কেউ এমন কিছু লেখে না যা' অন্যে পড়তে পারবে না। তুমি খুলে পড় বারবারা। হয় তো ও তার গাড়ী করে আবার আমাদের বেড়াতে যাওয়ার কথা লিখেছে।

: তুমি যখন এত করে বলছ, তখন চিঠি পড়ছি। বারবারা বলল। খামটা কেটে নিয়ে দ্রুত সমস্ত পত্রটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর পুনর্বার ভাল করে পড়ল। এক ফাঁকে আড়চোখে নেভাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করল। নেভাদা তখনও তার দস্তানা নিয়ে ব্যস্ত। তার অন্য কোন দিকে নজর দেওয়ার সময় নেই।

একটু তির্যক হাসির রেখা ফুটল বারবারার মুখে। : সত্যই নেভাদা, রীতিমত বিব্রত-ভাব প্রদর্শন করে সে বলল : এটা আমাকে দিয়ে খোলানো তোমার উচিত হয় নি; অপর কেউ জানুক এই ভেবে এই চিঠি লেখা হয় নি।

মুহূর্তের জন্য নেভাদা দস্তানার কথা বিস্মৃত হল।

: তাহলে বেশ জোরেই চিঠিখানা পড়। সে বলে উঠল, : যখন পড়েই ফেলেছ তখন অসুবিধার কি আছে! গিলবার্ট যদি আমার কাছে এমন কিছু লিখে থাকে যা অন্যের জানা বাঞ্ছনীয় নয় তাহলে সে কারণে আরও বেশী করে সকলের সেটা জানা প্রয়োজন।

: বেশ, তাহলে শোন এবার, বারবারা বলল। : প্রিয়তমা নেভাদা, আজ রাত বারটায় আমার ষ্টুডিয়োয় চলে এস। অবশ্যই আসবে কিন্তু।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল বারবারা। নেভাদার কোলের উপর পত্রখানা ফেলে দিল। : আমি জেনে ফেলেছি বলে খুব দুঃখিত। গিলবার্টের এরকম লেখা উচিত হয়নি। কোথাও কিছু একটা ভুল হয়ে থাকবে। আমি যেন কিছুই জানি না, তুমি এইটাই ধরে নিও, বুঝলে লক্ষ্মীটি! আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, আমি এখনই শুতে যাব। সত্য কথা বলতে কি, আমি ঐ চিঠিটার অর্থ এখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। তুমি গেলে গিলবার্ট তোমাকে নিশ্চয়ই সব বুঝিয়ে বলবে। শুভ-রাত্রি!

চার

পা টিপে টিপে গিয়ে নেভাদা হল-ঘরে প্রবেশ করল। সেখান থেকে শুনতে পেল উপরতলায় বারবারা তার কক্ষে দ্বার বন্ধ করে দিল। পাঠাগারের ঘড়িতে তখন বারটা বেজে পনর মিনিট হয়েছে। সামনের দরজা দিয়ে নেভাদা ত্বরায় বাইরে তুষারঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। বেশ কিছুটা দূরে গিলবার্ট ওয়ারেণের ষ্টুডিও।

দুরন্ত তুষারের ঝড়। রাস্তার উপর এক ফুট তুষার জমেছে। তুষারের পুরু আস্তরণ বাড়ীগুলোর দেওয়ালে পড়েছে। জনমানব শূন্য নিস্তব্ধ বীথিকা-পথ। মাঝে মাঝে দু'চারখানা এক-ঘোড়ার গাড়ী ছুটে চলেছে।

তুষারাবৃত ঐ ছুটন্ত ঘোড়াগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল যে জ্যোৎস্না-স্নাত রূপালী সমুদ্রের বক্ষের উপর দিয়ে কতিপয় শ্বেত-পক্ষ বিহঙ্গ উড়ে যাচ্ছে। ঐ উদ্বেল তুষার-তরঙ্গের মধ্য দিয়ে দু-একখানা মোটরও যাচ্ছিল। নেভাদার মনে হচ্ছিল সাগরের তলা দিয়ে ডুবোজাহাজরা যেন উল্লাসে শুরু করেছে এক বিপজ্জনক যাত্রা!

বাত্যা-তাড়িত ঝড়ো-পক্ষীর ন্যায়ই নেভাদা পথে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'ধারের উঁচু উঁচু বাড়ীগুলোর দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। দেয়ালের গাত্রে থাপে-থাপে তুষারের স্থূল আস্তরণ জমে উঠেছে। তার স্মৃতিতে জাগ্রত হল শীত-কালীন তুষারাচ্ছাদিত হিমগিরির এক পরিচিত দৃশ্য। এক দুর্দান্ত ঝড়ের নিশায় সে যেন অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে পশ্চিমাঞ্চলে পিতার সেই পার্বত্য আবাসে। তার সর্বাঙ্গে একটা তৃপ্তিকর স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দের হিল্লোল জাগল। লক্ষ ডলার মূল্যের অট্টালিকায় নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে বাস করেও সে কখনও এবম্প্রকার পুলক-স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে নি।

এক সময় পুলিশ তাকে থামতে বাধ্য করল।

: আমি···আমি যাচ্ছি ডাক্তারখানায়। জবাব দিল নেভাদা। তারপর পুনরায় পথে দ্রুত পদচারণা করে

অজুহাত হিসাবে এটা একটা চমৎকার উক্তি। অতি সন্দেহজনক ব্যক্তির পক্ষেও এতে ছাড়পত্র পেতে কোন অসুবিধা হয় না।

ঝড় ঠেলে সোজা সামনের দিকে অগ্রসর হতে নেভাদার অনেক সময় লাগছিল। সেই হেতু সে এঁকে-বেঁকে চলতে লাগল, কিন্তু তথাপি মুহূর্তের জন্যও সে তার চলার গতি মন্থর করল না।

সহসা ষ্টুডিও-বাড়ীটা তার দৃষ্টিগোচর হল। ঐ একই বাড়ীতে ব্যবসায় চলে আর চিত্রশিল্পের চচাও চলে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশীর সহ-অবস্থান। অন্ধকারাচ্ছন্ন উচ্চ বাড়ীটা তখন সম্পূর্ণ নিথর-নিস্তব্ধ ছিল। এলিভেটর অর্থাৎ উত্তোলনকারী যন্ত্র রাত দশটার সময়ই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

উঁচু উঁচু সিঁড়ির ধাপ ভেঙ্গে নেভাদা আটতলায় উঠে ৮৯ নম্বর ঘরের দ্বারে জোরে জোরে ঘা দিতে লাগল। সে এখানে অনেকবারই এসেছে, অবশ্য তার সঙ্গে থাকত জেরোম আর বারবারা।

গিলবার্ট দুয়ার খুলে দিল। তার হাতে ছিল স্কেচ অর্থাৎ নকশা অঙ্কনের পেন্সিল আর মুখে ছিল তামাকের পাইপ। তার মুখ থেকে পাইপটা নীচে মেঝেয় পড়ে গেল।

: আমার কি বিলম্ব হয়ে গেল? নেভাদা প্রশ্ন করে। : যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ছুটে এসেছি। কাকার সঙ্গে আমি সন্ধ্যাবেলায় থিয়েটারে গিয়েছিলাম। আমি এসেছি, গিলবার্ট।

গিলবার্ট বিরাট রকমের এক অভিনয় করে ফেলল। বিস্ময়ে একেবারে পাষাণ বনে গিয়েছিল সে, কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল। শান্ত আর স্বাভাবিক ভাবেই সে সমস্যার সম্মুখীন হল।

নেভাদাকে অভ্যন্তরে নিয়ে এল। একটা বুরুশ এনে তার জামার উপর থেকে তুষার-কণা ঝেড়ে ফেলতে লাগল।

: তুমি আসতে বলেছ। নেভাদা সরলভাবে বলল: আর এই এসেছি আমি। চিঠিতে তুমি তাই লিখেছিলে। আমাকে কি জন্য ডেকে পাঠিয়েছ, গিলবার্ট?

: তুমি আমার চিঠিখানা কি পড়েছিলে? জিজ্ঞাসা করল গিলবার্ট। কথাটা বলে সে একটু দম নিল।

: বারবারা আমায় পড়ে শুনিে [illegible] অবশ্য পরে দেখেছি। ওটাতে ছিল—[illegible] চলে এস আমার ষ্টুডিয়োয়, অবশ্যই এস কিন্তু [illegible] আমি [illegible] ছিলাম তোমার কোন অসুখ করেছে, কিন্তু [illegible]ন দেখছি তা নয়।

: আঃ! একটা অদ্ভুত বেখাপ্পা আওয়াজ গিলবার্টের মুখ হতে নির্গত হল। : কেন তোমাকে আসতে বলেছি তা এখনই বলছি। আমি চাই তুমি আমাকে বিয়ে করবে —এখুনি—আজকের রাত্রিতেই। এ সামান্য নীহার-ঝড় আর কি করবে! বল করবে কি?

: আমি বহুদিন পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছি গিলবার্ট, নিশ্চয়ই তা তোমার নজর এড়িয়ে যায় নি! তোমার এই ঝটিকা-বিভাবরীর পরিকল্পনাটা আমার চমৎকার লাগছে। দ্বিপ্রহরে সজ্জিত হয়ে ফুলের ছড়াছড়ি করে গির্জায় গিয়ে বিয়ে করাটা সত্যই এক বিরক্তিকর ব্যাপার। এমতাবস্থায় তুমি যে এই প্রস্তাব করতে পার তা আমার ধারণাতীত ছিল। এস সবাইকে নাড়া দিয়ে যাই আমরা। এই দুর্যোগপূর্ণ ভয়ঙ্কর-সুন্দর শর্বরীতে আমাদের অন্তিম অভিসার হবে। তাই নয় কি, গিলবার্ট?

: নিশ্চয়ই। গিলবার্ট উত্তর দিল: কোথায় যেন এরকম কথা শুনেছি। মনে মনে বলল সে। : এক মিনিট অপেক্ষা কর নেভাদা। আমি একটা ফোন করে আসছি।

সে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে গিয়ে প্রবেশ করল। : হ্যালো, জ্যাক্, হ্যালো। কুম্ভকর্ণ কোথাকার! হাঁ, হাঁ, আমিই বলছি—আমি—আমি। এখনই আমার বিয়ে হচ্ছে। তোমার বোনকেও জাগিয়ে তোল, ওকেও আসতে হবে। এগ্‌নেসকে স্মরণ করিয়ে দিও যে, আমি একবার তাকে জলে ডোবা থেকে রক্ষা করেছি। নেহাতই ছোট-লোকের মত কথাটা বললাম। সে যাই হোক্, ও অবশ্যই তোমার সঙ্গে আসবে। হাঁ, নেভাদা এখানেই অপেক্ষা করছে। অল্পক্ষণ আগে আমাদের কথা পাকাপাকি হল। আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে রয়েছেন। আমরা এই ভাবেই বাধা দূর করতে চাই। তোমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করছি! এগ্‌নেস্ যেন তোমাকে

আবার কথায় না হারিয়ে দেয়। তাকেও নিয়ে এস। আসবে? গাড়ী পাঠাচ্ছি। তারপর জ্যাক্ ভাল আছ তো?

গিলবার্ট নেভাদার সমীপে প্রত্যাগমন করে। ঃ জ্যাক্ পেটন হচ্ছে আমার এক পুরাতন বন্ধু। বুঝিয়ে বলে গিলবার্ট: ও আর ওর বোনের পোনে বারটায় এখানে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু জ্যাক্ হচ্ছে একজন কুড়ের বাদশা। ওদের তাড়াতাড়ি আসবার জন্যে ফোনে বলে দিলাম। কয়েক মিনিটের ভিতরেই ওরা এসে যাবে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুখী ব্যক্তিটি কে জান, নেভাদা? সে হচ্ছে আমি, আচ্ছা আমি তোমাকে যে চিঠিখানা পাঠিয়েছিলাম, সেখানা কোথায়?

: সেটা আমার সঙ্গেই রয়েছে। বলে ওভার-কোটের ভিতর-পকেট থেকে পত্রখানা বার করল।

গিলবার্ট খাম থেকে চিঠিখানা খুলে নিল। সাবধানে একবার ওর উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর কিঞ্চিৎ চিন্তিতভাবে নেভাদার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

: মধ্যরাত্রে তোমাকে আমার ষ্টুডিওয় আসতে বলছি, এটা খুবই অদ্ভুত বলে তোমার মনে হয় নি? সে প্রশ্ন করল।

: কেন? না। চোখ দু'টো বড় বড় করে নেভাদা বলল: আমরা যখন পশ্চিমে থাকতাম তখন কেউ আমাদের তাড়াতাড়ি আসবার কথা বললেই আমরা প্রথমে সেখানে ছুটে যেতাম। ব্যাপারটা মিটে যাওয়ার পরই হত সে সম্পর্কে আলোচনা। প্রায়ই তো হিমানী পড়ে সেখানে। আর তারই মধ্যে ঘটত নানারকমের ঘটনা। কাজেই আমি কিছু মনে করি নি।

গিলবার্ট সে স্থান হতে সত্বর চলে যায়। একটু পরেই ওভার-কো[illegible] বোঝা নিয়ে ফিরে আসে। ঝড়-বৃষ্টি[illegible]ওগুলোর উদ্দেশ্য।

[illegible]। নেভাদার হস্তে একটা বর্ষাতি তুলে [illegible] বলল: আমাদের সিকি মাইল পথ যেতে হ[illegible] মিনিটের মধ্যেই জ্যাক আর তার

: তোমরা পশ্চিমে যেখানে থাকতে, নেভাদা, আজকের কাগজে সেখানকার অনেক সংবাদ রয়েছে। সন্ধ্যার খবরের কাগজখানা দেখ টেবিলের উপরই রয়েছে। তুমি একবার শিরোনামাগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিতে পার নেভাদা। দেখবে ভাল লাগবে তোমার।

ওভারকোট পরিধানের ছল করে গিলবার্ট পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করে তারপর তাকাল নেভাদার দিকে। নেভাদা কিন্তু স্বীয় স্থান থেকে এক পা'ও নড়ে নি। অদ্ভুত এক চিন্তা-কাতর দৃষ্টিতে নেভাদা সোজা তাকিয়ে ছিল। একটা রক্তিম আভা তার দু'টি নিটোল গণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু দৃষ্টি তার স্থির, অচঞ্চল।

: আমি সবই তোমাকে খুলে বলছি। নেভাদা ধীরে ধীরে বলল: আমাদের পরিণয়ের পূর্বেই সব কিছু বলব। একদিনের জন্যও বাবা আমাকে বিদ্যালয়ে পাঠান নি। একটি শব্দও পড়তে কিংবা লিখতে আমি শিখিনি। এখন যদি তুমি—

ঠিক এমনই সময় সোপান-শ্রেণীতে শ্রুত হল জ্যাক্ ও এগনেসের পদধ্বনি। এলোমেলো ভাবে পা ফেলতে ফেলতে তারা দ্রুত উপরে উঠে আসছিল।

পাঁচ

সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে শুভ উদ্বাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল। মিষ্টার এবং মিসেস গিলবার্ট ওয়ারেণ গৃহে প্রত্যাগমন করছে। গাড়ীর কপাট ভিতর দিক থেকে বন্ধ।

: আজ রাতে তোমাকে যে চিঠি দিয়েছিলাম তাতে কি লেখা ছিল সত্যই তুমি তা জানতে চাও, নেভাদা?

: নিশ্চয়ই। আগ্রহে উন্মুখ হয়ে উঠে নেভাদা। এখুনি বল না, লক্ষ্মীটি!

: অবিকল এই রকম—গিলবার্ট বলল—আমার প্রিয় মিস ওয়ারেণ, পুষ্পটি সম্বন্ধে তুমি যা বলেছিলে তাই ঠিক। ওটা হচ্ছে হাইড্রান্জিয়া, লাইল্যাক্ নয়।

: ঠিক আছে—নেভাদা বলল—আমাদের এখন ওটা ভুলে যাওয়াই উচিত। বারবারাকেই তার পরিহাসের মাশুল দিতে হল।*

বর্ষার বাংলা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

অবিরাম ধারে বাদল ঝরেছে
কয়দিন নিরবধি ;
ডোবাটি কখন হোলো সরোবর,
নালাটি হোলো যে নদী !
জলে থৈ থৈ করে খাল-বিল,
মাঠ-ঘাটও একাকার ;
যৌবনময়ী বরষার রূপে
বিমোহিছে চারিধার।

(২)

নিটোল পাতায় শ্যাম সুষমায়
শোভাময় শাখীগুলি ;
রূপসী লতার আহা কী বাহার !
ঝোপে-ঝাড়ে ওঠে দুলি'
ভুলি' বিহ্বল ভরা যৌবন ;
পল্লী-পথের পাশে
পুষ্পিত যত কেতকী-কদমও
পথ ভরে মৃদু বাসে।

(৩)

ঢল-ঢল জলে কুমুদে-কমলে
দীঘি ওঠে উল্লাসি'
চপল চটুল চালিতার ফুলে
উছলিয়া পড়ে হাসি ;
বিচিত্র যত বৈঁচী-বনেও
বিচক ফলের শোভা ;
বঙ্গ-পল্লী-বরষার রূপ
মোহময় মনোলোভা।

(৪)

পথ-বাঁকে-বাঁকে দাদুরীর ডাকে—
ডাহুকের কলরোলে
বরষা-মুখর চারু চরাচর
সুর-ঝঙ্কার তোলে।
বাদল-ফুল্ল ভরা-যৌবন
প্রাণে-মনে দেয় দোলা ;
হাঁস-চিল-বক-বলাকা-চাতক
সুখে হোলো আলাভোলা।

(৫)

বাদল-সোহাগী পল্লী-প্রকৃতি
হোলো যে শ্যামাঙ্গিনী ;
ডাঙায়—জলায় রূপ উছলায় ;
রূপে লয় প্রাণ জিনি'।
দেয়া দেয় দোল্—তোলে কল্লোল
বুকেরও গহিন গাঙে ;
মৌসুমী কোন্ মিলনোচ্ছ্বাসে
রাঙা ঢেউ কূলে ভাঙে !
রূপাতুর রস—রসাতুর রূপ—
এই তো পরম সুধা ;
নিদাঘ-তাপিত তৃষিত মাটির
মিটিল এবার ক্ষুধা।

মহীয়সী মোগলমহিষী

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(কাব্যকাহিনী)

১

সামুগড়ের যুদ্ধে দারা হেরে গেলেন আলমগীরের কাছে,
পালান্ পাঞ্জাবে যদি প্রাণটা তাঁহার বাঁচে !
ঔরংজেব আগ্রা দুর্গ করেন অধিকার,
বন্দী করেন বাপ্জান্‌কে তাঁর !
বৃদ্ধ বাপের চিন্তা লাঘব করার জন্য পরে
আগ্রার দুর্গেতে তাঁকে রাখেন ভক্তিভরে
যাবজ্জীবন পিতৃভক্ত ছেলে !
তাড়াতাড়ি সকল কার্য্য ফেলে
অনুরক্ত ভাইকে তাহার, মদ্যপায়ী ওই
মুরাদকে শেষে
বন্দী করে' রাখেন ভালোবেসে !

২

র্বশেষের চেষ্টাতে হায়, দারাশিকোর ঘট্‌লো পরাজয়,
এইখানে শেষ নয়,
াকলো বাকী এখন প্রাণের ভয়!
তনটি বেগম, শিপার শুকো, জানি বেগম নিয়ে,
কান্দাহারের পথে ভাগতে গিয়ে,
পথিমধ্যে বন্দী হলেন সবাই!
রংজেবের হত্যাদেশে অশেষ নির্য্যাতনে
নিতান্ত কুক্ষণে
জ্যষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো হলেন শেষে জবাই।

৩

রটি হাতীর পীঠের উপর ছিলেন বন্দীদল।
থকভাবে দারা ছিলেন একান্ত দুর্ব্বল।
শস্ত্র সৈন্যেতে ছিলো বেষ্টিত সব হাতী,
চল্লিশ দিন চললো দিবস রাতি,
দিল্লী এসে পৌছালো শেষ কালে ;
ঘট্‌লো হেথায় যা-ছিল তার ভালে!

৪

ী নাদিরা বেগম ভয়ে হয়ে কম্পমান
লহন করে আংটি হীরের বিসর্জ্জিলেন প্রাণ।
দীপুরী বেগম ছিলেন খৃষ্টানের এক মেয়ে,
ালমগীরের আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন যেয়ে,
াদশাহী হারেমে ঠাঁই পেয়ে গেলেন তিনি.
লেন সেথা ছোট ভাইয়ের বেগম সোহাগিনী!
াণাদিল্ এক সতী বেগম বাদশাজাদা দারার,
তেজস্বিতা যায় না ভোলা তার।
লোকের চোখে ছিলেন তিনি নীচ জাতীয়া নারী,
দিল্লীতে নর্ত্তকী এক ছিলেন পথচারী,
রূপে মুগ্ধ হলেন দারা, বেগম হলেন তাই,
এমন নসীব দেখতে কোথায় পাই!

৫

ঔরংজেবের আমন্ত্রণে সতী ওঠেন রেগে,
লোক মারফত তুরুক জবাব পাঠান দ্রুতবেগে,
"জাহাপনা, আজকে আমি রিক্ত ও দুর্ব্বল।
আপনাকে হায়, দেবার মতো নেই কিছু সম্বল!"
ঔরংজেব বলে' পাঠান তাঁকে পুনর্ব্বার!
"চারু চিকণ চুল যে চমৎকার!
অন্তরে মোর আনন্দের ঢেউ তোলে।
কেশের শোভায় মন যে আমার ভূত ভবিষ্যৎ ভোলে!
অবিলম্বে রাণাদিল্ তাঁর কোকিল-কালো চুল,
কেটে-কুটে করলেন নির্ম্মূল!
পাঠিয়ে দিয়ে বলে' পাঠান্—"এই নিন্ সেই কেশ!
রূপ লালসা এইখানে হোক্ শেষ!
আল্লার নামে শান্তিতে আজ থাকতে আমায় দিন্!
ফতুর আমি নেহাৎ অর্ব্বাচীন!"

তবু কিন্তু নিরস্ত হায়, হলেন না সম্রাট্
ঘটালেন বিভ্রাট!
তুরন্ত ফের্ বলে পাঠান্, "ওগো অনিন্দিতা!
হচ্ছ কেন ভীতা!
হুরী-পরীর মতন তোমার অতুল্য ওই দেহ!
এই দুনিয়ায় পায়নি তো আর কেহ।
আমি তোমায় করতে সাদী হয়েছি উন্মনা!
তুমিই হবে সম্রাজ্ঞী এক শ্রেষ্ঠ সুলোচনা!"

৭

গর্জ্জে উঠি বীর্য্যবতী তীক্ষ্ণ ছুরী নিয়ে।
কপোল কাটেন, কপাল কাটেন ছুরির ফলা দিয়ে!
তাজা রক্তে ভিজিয়ে ন্যাকড়াখানি
পাঠিয়ে দিয়ে বলে পাঠান্ হয়ে যুক্তপাণি,—
"আপনাকে যেই রূপ করেছে এতটা উন্মাদ,
তাকেই আমি করেছি বরবাদ ;
আমার রক্তে তৃষ্ণা য'দি থাকে সম্রাটের,
রক্তরাঙা বস্ত্রে যেন তৃপ্তি লভেন তিনি!
আর কভু না টানেন যেন জের্!"

৮

সাবাস্ সাবাস্, যাচ্ছি বলিহারি!
হয় তো ইনি রাজপুতানী ছিলেন হিন্দুনারী!
সতীত্বকে রক্ষিতে তার তাই তো এত কঠিন খবরদারি!
ঔরংজেব হার মেনেছেন তাই,
পবিত্রতা নিরাশ্রয়ার নাই তুলনা নাই!
গভীর শোকে জীবন যাপন করি'
বেহেস্তে আজ আছেন সুখে অপূর্ব্ব অপ্সরী!
তাঁর মাজারে কাব্যকুসুম দিলাম তাঁকে স্মরি'!

শ্রাবণ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

অনেক দিনের ভালবাসা জানি তোমার সঙ্গে,
তোমার রঙের কস্ লেগেছে আমার সারা অঙ্গে।
তোমার আঁধার আলোর বাড়া
মধুর আলোর ঝরণা ধারা,
পড়ে নাকো ভাটা তোমার যৌবন তরঙ্গে।

২

জলময়ী পৃথ্বী তোমার, জুড়ায় আমার মন হে,
ভালবাসি বিরাম-বিহীন নিবিড় বরিষণ হে।
তোমার আলো-ছায়ার খেলা,
গন্ধ এবং গীতের মেলা,
তুমিই কর ঘরকে আমার পুণ্য তপোবন হে।

৩

এক করে দাও অদূর-সুদূর নগর ভূধর গ্রামকে
ঊষর ধূসর ভূমি কর দুর্ব্বাদল শ্যাম হে।
গগনে রামধনু আঁকা
হরির শিরে শিখীপাখা
তুমি আমার চিরদিনের নয়ন অভিরাম হে।

৪

শ্রাবণ চির উৎসবময়, আতিথেয় বড্ড,
অফুরন্ত দেখি তোমার নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ।
সপ্ত সাগর তের নদী,
অজয়েতে মিলাও যদি—
তবু তোমার খেদ মেটে না—আমরা যে হই হদ্দ।

৫

শ্রাবণ তুমি, খেয়াল তোমার বুঝি শ্রমণ গড়তে—
বাধ্য কর গ্রামবাসীকে গৈরিক বাস পরতে।
উপবাসকে ডেকে আনো,
ভালবাস অর্দ্ধাসনও
শুকিয়ে দাও শরীর—কচ নির্ব্বাণ পথ ধরতে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও দুর্গেশনন্দিনীদের

জ্যোতির্ময়ী দেবী

সাগর মন্থন করি কবে সত্যযুগে
উঠিলা কমলা ধরি সুধাভাণ্ড বুকে;
উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, শশী,—নিরুপমা
উর্বশী উঠিল।
কিন্তু নহে তিলোত্তমা।
সে আসিল কত দিনে ত্রেতা ও দ্বাপর
শেষ হ'ল আরো কত যুগ-যুগান্তর
আজো পৃথিবীতে আছে পর্বত সাগর
শুধু নাই সুরাসুর বাসুকী মন্দর।
কারে লয়ে হিয়া সিন্ধু করিয়া মন্থন,
লভেছিলে তিলোত্তমা আয়েষা রতন।
কপালকুণ্ডলা শান্তি ভ্রমর রোহিণী
কুন্দ-হীরা সূর্যমুখী, শৈ শৈবলিনী।
—মহাভারতের নহে নব ভারতের—
নন্দিনী! হে কবি তব হৃদয় দুর্গের।

২

হে কবি, কোথায় তারা কোন্ দেশে গ্রামে
ছিল কাত্যায়নী কালী নিস্তারিণী নামে
গুজরী পঞ্চম নথ বাউটীর সাজে—
উঁচু খোপা চন্দ্রহারে। পায়ে মল বাজে!
অকস্মাৎ অন্তঃপুরে রূপান্তরিতা
আধুনিকা রূপে এলো লবঙ্গ ললিতা,—
শ্রীজয়ন্তী, ভীরু রমা, নন্দা রাজেন্দ্রাণী।
প্রফুল্লে সাগর বৌ ডাকে হাতছানি!
কালাদিঘী কূলে বসা ইন্দিরা ক্রন্দসী—
সুন্দরী নাপিতবধূ, দলনী রূপসী!
দরিয়া ও রাধারাণী; অন্ধ-পুষ্প নারী!—
মধুর ললিত নামে এলো সারি সারি।
সাহিত্য উদয়াচলে আদি চিত্র লিখা!—
অমরী উর্বশী সম—অনন্ত নায়িকা।

"প্রাচ্যবাণীর" সাংস্কৃতিক সফর

পণ্ডিত শ্রীঅনাথশরণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

"প্রাচ্যবাণী" প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য, সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক, কবি ও নাট্যকার মহামাতৃক্রোড়-প্রাপ্ত ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হইল। তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী সুবিখ্যাত লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের সর্বজনপ্রিয় অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যমে—আমরা নেপাল সফর করিয়া ফিরিয়া আসিলাম পরম গৌরবে। কিন্তু সেই পরমানন্দ-জনক বিবরণ আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিবার পূর্বে, তাহার পূর্বের কয়েকটি গৌরবজনক সফরের বিষয় অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি—

ছাপরাতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

বিগত ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৬৫, ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি, পরমশ্রদ্ধেয় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের শুভাবির্ভাব দিবসে ছাপরার "অখিল ভারতীয় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্মৃতি সমিতির" উদ্যোগে ছাপরায় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের পুণ্য-জীবনী অবলম্বনে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত সংস্কৃত নাটক "ভারত-রাজেন্দ্রম্" দশ সহস্রাধিক অধ্যাপক-ছাত্র-জনসাধারণ-মণ্ডলীর সম্মুখে ছাপরাস্থ রাজেন্দ্র কলেজে "প্রাচ্যবাণী"-নাট্যসঙ্ঘ কর্তৃক অতি সুন্দরভাবে অভিনীত হয়। সভান্তে অভিনেতৃবর্গের ভূয়সী প্রশংসাপূর্বক আশী-র্বাদ জ্ঞাপন করেন রাজেন্দ্র কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীভোলাপ্রসাদ সিংহ মহাশয়।

তৎপরে ৪ঠা ও ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৫, পাটনা ও ছাপরার সংস্কৃত নাট্য পরিষদের উদ্যোগে সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈত বেদান্তাচার্য শ্রীশঙ্করের পুণ্য জীবনী গাথা- মূলক অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত সংস্কৃত নাটক "শঙ্কর-শঙ্করম্" এবং ডাঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী বিরচিত স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যজীবনীমূলক সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্" প্রাচ্যবাণী নাট্যসঙ্ঘ কর্তৃক অতি সুন্দরভাবে অভিনীত হয়। ডাঃ রমা চৌধুরীর সময়োপযোগী ও উদ্দীপনাময় ইংরাজী ভাষণেও সকলে পরমতৃপ্ত হন।

সভান্তে অভিনেতৃবর্গকে হার্দিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন বিহারের সুবিখ্যাত পণ্ডিত আচার্য শ্রীকপিলদেব শর্মা, অধ্যক্ষ শ্রীভোলাপ্রসাদ সিংহ ও কুমার শ্রীপশুপতি সিংহ।

এই প্রসঙ্গে, আমাদের চিরবান্ধব পণ্ডিত শ্রীজ্ঞান সাহার উৎসাহ, উদ্দীপনা ও স্নেহ ভালবাসার কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য এবং তাহা কোনদিনও বিস্মৃত হইবার নহে।

পায়রাডাঙ্গায় সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

আমাদের পরমপ্রিয় পায়রাডাঙ্গা গ্রামে এই আমাদের দ্বিতীয়বার গমন। সর্বজনপ্রিয় স্বামী সেবানন্দ পুরীর সস্নেহ আহ্বানে তাঁহার পরম পবিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব-উপলক্ষ্যে বিগত ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৬৬ অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরী বিরচিত বহুবার অভিনীত, জনপ্রিয় সংস্কৃত নাটক "শঙ্কর-শঙ্করম্" দ্বিসহস্রাধিক, অতি আগ্রহশীল দর্শকের সম্মুখে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। প্রারম্ভে ডাঃ রমা চৌধুরীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সুমিষ্ট ভাষণও সকলকে মুগ্ধ করে। সভাপতিত্ব করেন নৈহাটি কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাঃ সুধীরঞ্জন দাসগুপ্ত। পরমস্নেহঘন স্বামী সেবানন্দ পুরীর অতুল স্নেহ ভালবাসা চিরস্মরণীয়।

এলাহাবাদে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

এইবার একটি বিশেষ আনন্দের বার্তা—শুভ পূর্ণকুম্ভ-যোগ উপলক্ষ্যে পুণ্যভূমি এলাহাবাদে একটি অতিসুন্দর ও

অতিবৃহৎ বিশ্ব-ধর্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাহাতে আমরা সাদরে আহূত হই ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর শতাধিকবার অভিনীত সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্" অভিনয় করিবার জন্য।

এই অভিনয় হয় ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৬৬ সঙ্গমের নিকটবর্তী সুবিস্তৃত বিশ্ব-ধর্ম-সম্মেলন প্রাঙ্গণে সমগ্র পৃথিবী হইতে আগত পঁচিশ হাজার বিদগ্ধ ও বিমুগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে। কি পরম সৌভাগ্য আমাদের! রাত্রি নয়টা হইতে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আমাদের অভিনয় হইল—কিন্তু কেহই স্থান ত্যাগ করিলেন না বা বিন্দুমাত্র অধৈর্য হইলেন না। পরমশ্রদ্ধেয়া ডাঃ রমা চৌধুরী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ললিতমধুর ইংরাজী ভাষণ দ্বারা এই উচ্চ আধ্যাত্মিক সুরটিরই সুরে সুর মিলাইয়া সকলকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করিলেন। সভান্তে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীকপিলদেব শর্মা সকলের পক্ষ হইতে ডাঃ রমাকে নারিকেল ও পুষ্পমাল্য সহ পাঁচশত টাকা আশীর্বাদস্বরূপ দান করিলেন সানুগ্রহে প্রাচ্যবাণীর জন্য। তাঁহাদের সু-উচ্চ উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী শ্রবণে নিজেদের পরমধন্য বোধ করিলাম।

এলাহাবাদে আমাদের দ্বিতীয় সংস্কৃত অভিনয় হয় পরের দিন ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬৬ সুবিখ্যাত রোটারী ক্লাবের উদ্যোগে। সেইদিন ডাঃ রমা বিরচিত সংস্কৃত নাটক "শঙ্কর-শঙ্করম" পঞ্চশতাধিক গণ্যমান্য, পণ্ডিতাগ্রগণ্যের সম্মুখে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি শ্রীধায়ান। তাঁহাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা, অভিনন্দন ও আশীর্বাদে আমরা কৃতকৃতার্থ হইলাম। রোটারী ক্লাবের সবজনপ্রিয় সভাপতি ও সুবিখ্যাত হুইলার কোম্পানীর সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য-স্নেহ সহানুভূতি সত্যই অবিস্মরণীয়।

ডাঃ রমার মামীমা মমতাময়ী শ্রীযুক্তা প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অতি সুন্দর সুবৃহৎ বসতবাড়ীটা আমাদের বসবাসের জন্য ছাড়িয়া দিয়া আমাদের চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান হাবুল (গৌতম) বসু আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়।

ধানবাদে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

"ধানবাদে সংস্কৃত অভিনয় করিতে সাহসী হইবেন না—কয়লা ছুঁড়িয়া সকলে আপনাদের মারিবে"—এই সহাস্য উক্তি শুনিতে শুনিতে আমরা সাহসভরে আসিয়া পড়িলাম ধানবাদের সুবিখ্যাত "সেণ্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ইনস্‌টিটিউটে," পরমোৎসাহী শ্রীতারক লাহিড়ীর সাদর আহ্বানে। এই ইনস্‌টিটিউটের উদ্যোগে ধানবাদে সর্বপ্রথম সংস্কৃত অভিনয় হইল ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬—যথাক্রমে ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত "ভারত-বিবেকম্" ও ডাঃ রমা চৌধুরী বিরচিত অভিনব দেশাত্ম-বোধক সংস্কৃত নাটক "দেশ-দীপম্"। সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রীএন. জি. বসাক ও ডিরেক্টর ডঃ এ. লাহিড়ী, এবং দুদিনই সহস্রাধিক দর্শক আমাদের সংস্কৃত অভিনয় ও ডাঃ রমার মনোরম বাংলা ভাষণকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন, কয়লা ছুঁড়িয়া নহে, স্নেহ-বাণ, প্রশংসাবাণ ছুঁড়িয়া। সত্যই, ধানবাদের ন্যায় "ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল সেণ্টারে" অধ্যাত্মভাবমূলক সংস্কৃত অভিনয় যে এরূপ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিবে, তাহা আমাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ মজুমদার ও শ্রীশৈবাল সান্যাল একঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হইয়া আমাদের প্রহসন দৃশ্যটিকে সার্থকতম করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

সোদপুরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

আরেকটী "অজ পাড়াগা"—পূর্বে কোনদিনও সংস্কৃত অভিনয় হয় নাই। অথচ, সপ্তশতাধিক দর্শকবৃন্দ কি আনন্দের সঙ্গেই না আমাদের ডাঃ যতীন্দ্রবিমল বিরচিত "ভারত-বিবেকম্" নামক সংস্কৃত নাটকটি দর্শন করিলেন, ৩০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সভার শেষে। প্রারম্ভ সুরটি ধরাইয়া দিলেন ডাঃ রমা তাঁহার স্বভাবজ, উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাষণ দ্বারা; এবং তিনঘণ্টা পরে সেই সুরটাই বাজিয়া চলিল ছন্দপতনহীনভাবে। কি সৌভাগ্য আমাদের! আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সোমানন্দ পুরীর স্নেহভালবাসা সত্যই তুলনাবিহীন।

দুর্গাপুরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

দুর্গাপুরে ভারতের আরেকটি সুপ্রসিদ্ধ "ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল

সেণ্টার"—জ্ঞানিগুণিজন সমৃদ্ধ। এই স্থানেও পূর্বে সংস্কৃত অভিনয় হয় নাই। সেজন্য আমরা একটু ভয়ে-ভয়েই "The Advancement of Scientific and Ethical Thinking and Services" নামক বিদগ্ধজন পরিচালিত সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সংস্কৃত অভিনয় করিবার জন্য উপস্থিত হইলাম। প্রধান অতিথিরূপে ডাঃ রমা তাঁহার জ্ঞানগর্ভ অথচ সুললিত ইংরাজী ভাষণে বিজ্ঞান ও নীতিতত্ত্বের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী, অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা অতি সুন্দরভাবে সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন। তাহার পর ১লা ও ২রা এপ্রিল, ১৯৬৬, ডাঃ রমা বিরচিত "শঙ্কর-শঙ্করম্" ও ডাঃ যতীন্দ্রবিমল বিরচিত "ভারত-বিবেকম্" বিশেষ সাফল্য ও প্রশংসার সহিত অভিনীত হয়। সভাপতিত্ব করেন রেসিডেণ্ট ডিরেক্টার শ্রীপি. সি. নিয়োগী ও ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীএ. এন. লাহিড়ী।

দুর্গাপুর সফরের এই আশাতীত সাফল্যের জন্য আমরা বিশেষভাবে ঋণী আমাদের পরমবান্ধব ডাঃ জি, পি, চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ বি, পি, সেনের নিকট।

বৃন্দাবনে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

অত্যল্প সময়ের মধ্যে পরের পর কতই না সুবিখ্যাত সংস্থা আমাদের সংস্কৃত অভিনয়ের জন্য সাদরে আহ্বান করিয়া আমাদের ধন্য করিতেছেন! সুতরাং, বৃন্দাবনে নিখিল-ভারত-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের একচত্বারিংশৎ অধিবেশনে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল বিরচিত "অমর-মীরম্" নামক সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিবার আমন্ত্রণ পাইয়া আমরা স্বভাবতঃই পরম পুলকিত হইলাম।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৬৬, ডাঃ রমা এই সম্মেলনের দর্শন শাখায় "গৌড়ীয় দর্শনের মর্ম কথা" সম্বন্ধে উদ্দীপ্ত ভাষণ দ্বারা সকলকেই তৃপ্ত করিলেন। তাহার পরে সেইদিনই "অমর-মীরম্" নাটকটি শ্রীরঙ্গজীর পবিত্র মন্দির সংলগ্ন সুন্দর ও সুবিস্তৃত উদ্যানে বিদ্বদ্জনমণ্ডলীর সম্মুখে অপূর্বভাবে অভিনীত হয়। শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গীত, সংস্কৃতে রূপান্বিত মীরা-ভজনাবলী সকলেরই মনোহরণ করে। সমাগত জনগণের অসংখ্য সস্নেহ প্রশংসাবাণী আমরা মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইলাম।

বৃন্দাবনে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাদির জন্য আমরা বিশেষভাবে ঋণী শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী, শ্রীনৃসিংহবল্লভ গোস্বামী ও শ্রীদেবেশ দাসের নিকট।

সভান্তে "যুগান্তর" পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী, শ্রীমৎ বন মহারাজ, শ্রীনবেন্দু দত্তমজুমদার ও রামকৃষ্ণ মিশনাধ্যক্ষ স্বামীজী অভিনেতৃবর্গকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী অতি মর্মস্পর্শীভাবে বলিলেন যে, দুটী সুন্দর মালায় মিলিয়া যে একটি অনুপম মালা গাঁথা ছিল, শ্রীভগবান তাহা অকস্মাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন মাটিতে। কিন্তু পতিজীবনসর্বস্বা ডাঃ রমা চৌধুরী সেই ছিন্ন কুসুমগুলিকে মাটি হইতে অঞ্জলি ভরিয়া কুড়াইয়া লইয়া অসম সাহসে সমগ্র ভারতে ও বাহিরেও তাহা ছড়াইয়া দিতেছেন—তাহারই একটি পাইয়া বৃন্দাবনবাসিগণ আজ ধন্য।

মথুরায় সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

মথুরার বৃহত্তম "শ্রীদ্বারকাধীশ" মন্দির প্রাঙ্গণে, শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে উক্ত জনগণের বিশাল সভায় "অমর-মীরম্" পুনরায় অভিনীত হইয়া সকলকেই বিশেষ মুগ্ধ ও তৃপ্ত করিল। মন্দিরাধিকারী কাঁকরোলী নরেশ-গোস্বামী ১০০৮ শ্রীব্রজভূষণ লালজী মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র গোস্বামী শ্রীব্রজেশকুমার ১০৮ বাবা সাহেবজী সভাপতিত্ব করেন, এবং অভিনয়ান্তে অভিনেতৃগণকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন।

বৃন্দাবন-মথুরা ভক্তশ্রেষ্ঠা শ্রীমীরা বাঈয়ের পুণ্যস্থান। সেই জন্য, এই দুই স্থানে শ্রীমীরা বিষয়ক এই অপূর্ব সংস্কৃত নাটকটি বিশেষভাবে জমিল, এবং আমরাও আমাদের কৃতকৃতার্থ মনে করিলাম।

নেপালে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

পুণ্যশ্লোক ডাঃ যতীন্দ্রবিমল, তথা আমাদের সকলেরই বহুদিনের স্বপ্ন আজ সার্থক হইল। নেপালস্থ ভারতীয় দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীমন্নারায়ণ ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি সুধীবর ডাঃ ইন্দুশেখরের সাদর আহ্বানে আমরা নেপালের রাজধানী সুবিখ্যাত ও সুন্দর কাঠমাণ্ডু নগরে তিনটি আধুনিক সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের জন্য যাত্রা করিলাম। এই সংস্কৃত নাটকত্রয় হইল ডাঃ
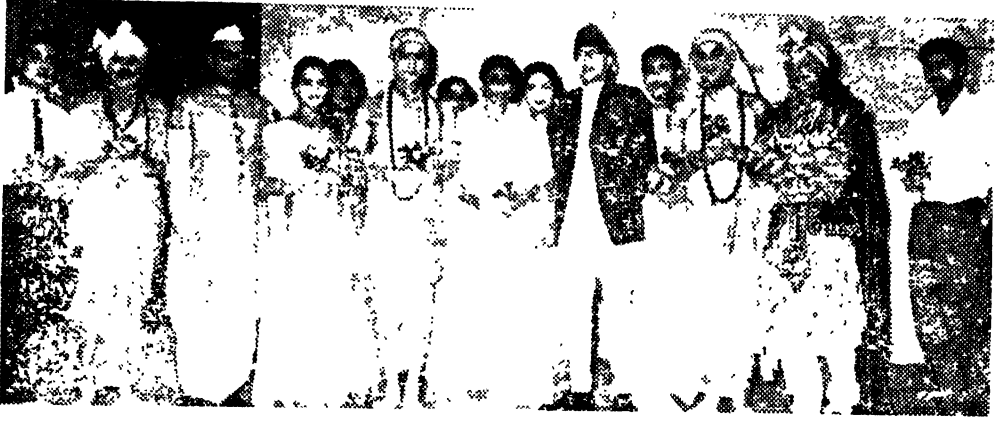
নেপালের মহারাজা ও ভারতীয় রাষ্ট্রদূতসহ কাঠমাণ্ডুতে সংস্কৃত নাটকাভিনয়ের জন্য নিমন্ত্রিত প্রাচ্যবাণী-সংস্কৃতিক দল

যতীন্দ্রবিমল বিরচিত "ভারত বিবেকম্", ডাঃ রমা চৌধুরী বিরচিত "শঙ্কর-শঙ্করম্" ও ডাঃ যতীন্দ্রবিমল বিরচিত "অমর-মীরম্"। কাঠমাণ্ডুর সুবিখ্যাত প্রেক্ষাগৃহ "রাষ্ট্রীয় নাচঘরে" এই তিনটি সংস্কৃত নাটক যথাক্রমে ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে মে, ১৯৬৮ প্রত্যহ সপ্তশতাধিক গণ্যমান্য দর্শকবৃন্দের সম্মুখে অতি সুন্দরভাবে অভিনীত হয়।

নেপালের মহারাজা পঞ্চশ্রী পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীমহেন্দ্র একদিন পরে কন্যার আসন্ন বিবাহানুষ্ঠানের মধ্যেও "শঙ্কর-শঙ্করম্" অভিনয়ের দিন দুই ঘণ্টার অধিককাল বসিয়া রাজপরিবারের অনেককে সঙ্গে লইয়া আদ্যোপান্ত অভিনয়ের রস উপভোগ করিলেন এবং অভিনয়ান্তে অভিনেতৃগণকে স্বহস্তে পুষ্পস্তবক উপহার দিলেন।

এই অনুষ্ঠান সমূহের একটা উপভোগ্য অংশ ছিল এই যে, প্রত্যহ প্রারম্ভে নেপাল মহারাজের স্বরচিত কয়েকটি নেপালী সঙ্গীতের ডাঃ রমা কর্তৃক সংস্কৃত রূপায়ণ, শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণেন্দু রায় কর্তৃক মূল নেপালী সহ অতি সুন্দরভাবে গীত হইত, সকলের অশেষ আনন্দ বৃদ্ধি করিয়া। এই গানগুলির সুর দেন শ্রীপূর্ণেন্দু রায়। ডাঃ রমা বিরচিত, শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণেন্দু রায় ও শ্রীঅরূপ দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রত্যহ প্রারম্ভে গীত, অতি সুন্দর "শ্রীনেপাল-জননী-বন্দনা" ও "শ্রীভারত-জননী-বন্দনা"ও সকলের মনোহরণ করে। নেপাল রেডিও হইতে পঞ্চশ্রী মহারাজের নেপালী ও সংস্কৃতে রূপায়িত গানগুলি, "শ্রীনেপাল জননী-বন্দনা" ও সংস্কৃত নাটক "শঙ্কর-শঙ্করম্" হইতে "নেপাল-বিজয়" নামক দৃশ্যটি সাদরে রেকর্ড করা হয় ভবিষ্যৎ প্রচারের জন্য।

"প্রাচ্যবাণী সাংস্কৃতিক-দলই" বাহির হইতে নেপালে সর্বপ্রথম আহূত হন সংস্কৃত অভিনয়ের জন্য। ভারতের পরম শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয়া সর্বজনপ্রিয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ প্রাচ্যবাণী সাংস্কৃতিক দলকে নেপাল সফরের সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন সাদরে।

ভারতীয় দূতাবাসের আদর-যত্ন ও আতিথ্যের তুলনা নাই। ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ হইতে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী মিলি এই সাতদিন মুহূর্তের জন্য আমাদের চোখের আড়াল করেন নাই, এবং সর্বক্ষণ আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের ঋণ সত্যই অপরিশোধ্য।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীশ্রীমন্‌নারায়ণ ও সাংস্কৃতিক সহকারী ডাঃ ইন্দুশেখর উভয়েই তিনদিনই সস্ত্রীক আদ্যোপান্ত উপস্থিত হইয়া আমাদের আনন্দ বর্ধন করেন। তাঁহারা আমাদের জন্য বহু Receptions দেন, এবং শেষদিন শ্রীমতী শ্রীমন্‌নারায়ণের পূজাগৃহে ভজন কীর্তনাদির পরে সকলকে

বহুমূল্য উপহার দেন। আমাদের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দেখার জন্য তাঁহারা সর্ববিধ ব্যবস্থা করেন, এবং আমাদের জন্য তিনখানি গাড়ী দেন সর্বক্ষণ। তাঁহাদের ঋণ সত্যই অপরিশোধ্য।

শ্রীভগবানের অশেষ কৃপায় আমরাও তাঁহাদের মুখ-রক্ষা করিতে সমর্থ হই। মঙ্গলাচরণ, শ্রীনেপাল-জননী বন্দনা ও শ্রীভারত-জননী বন্দনা, নেপাল মহারাজের নেপালী ও সংস্কৃতে রূপায়িত সঙ্গীত, ডঃ রমার অপূর্ব ইংরাজী ভাষণ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া অভিনয়, গান, বেশভূষা ও ছায়া-আলোক সম্পাত পর্যন্ত সমস্ত কিছুই ঈশ্বরকৃপায় নেপালবাসিগণের অত্যুচ্চ প্রশংসা লাভ করে। অবশ্য ইহাতে আমাদের নিজেদের গৌরবের কিছুই নাই; ইহা ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের অমর আত্মার লীলা খেলা ও আশীর্বাদেরই ফল; আমরা দীন-হীন উপলক্ষ্যই মাত্র।

নেপালের শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রদূত শ্রীশ্রীমন্ নারায়ণ সাদরে আমাদের লিখেছেন—

"I am happy to know that on your way back you were able to stage a drama at Raxaul.

We are indeed very happy that it was possible for you and your colleagues to visit Kathmandu and stage a few Sanskit dramas there. His Majesty and other dignitaries of Nepal greatly appreciated the Sanskit Dramas, more specially on Shankar.

with best wishes and cordial greetings.

রক্সৌলে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

প্রত্যাবর্তনের পথে, সীমান্ত নগর রক্সৌলের অতি সুন্দর, সুবিস্তৃত উদ্যান-শোভিত, কোকিল-পাপিয়া-কূজিত ভারতীয় দূতাবাসের অতিথিশালায় আমরা আসিয়া দেখিলাম যে, রক্সৌলবাসিগণের "জোর তাগাদা" লইয়া কাষ্টমস্ অফিসার শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুহৃদরঞ্জন মুখোপাধ্যায় হাজির—তাঁহারা কাঠমাণ্ডুর সংস্কৃত অভিনয়ের সুখ্যাতি ইতোমধ্যেই শুনিয়া রক্সৌলে একটা সংস্কৃত অভিনয় করাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল। তাঁহাদের নির্বন্ধাতিশয্যে আমরা মজঃফরপুর অকারণে গিয়া ও অতি কষ্ট করিয়া পরের দিন ভোরেই রক্সৌলে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একদিনের মধ্যেই তাঁহারা আমাদের সংস্কৃত নাটকাভিনয়ের অতি সুন্দর ব্যবস্থাদি করিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

সেই অনুসারে ২রা জুন, ১৯৬৬ রক্সৌলের সুবিখ্যাত দয়ানন্দ বিদ্যালয়ের চন্দ্রালোকিত উদার উন্মুক্ত প্রান্তরে ডাঃ রমা বিরচিত উদ্দীপনাময় দেশাত্মবোধক সংস্কৃত নাটক "দেশ-দীপম্" সহস্রাধিক দর্শকবৃন্দের সম্মুখে অতি সুন্দরভাবে অভিনীত হয় এবং সকলকেই বিশেষ মুগ্ধ করে।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়দ্বয়ের সঙ্গে আমাদের মাত্র একদিনের পরিচয়। অথচ, তাঁহারা আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যাহা করিলেন, তাহা নিকট-আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবগণও করেন না। তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমাদের নাই।

রক্সৌলবাসিগণের পক্ষ হইতে সর্বশ্রী সুনীল দাস, পূর্ণেন্দু রায় ও অরূপ দাসগুপ্তকে তিনটী স্বর্ণখচিত রৌপ্য-পদক দেওয়া হয়।

নেপালের সীমান্তনগর বীরগঞ্জেও একদিন "শঙ্কর-শঙ্করম্" অভিনয়ের জন্য আমরা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সময়াভাবে এ যাত্রা সেই সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে আমরা পুনরায় ঐ স্থানে আসিব, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতে হইল।

প্রাচ্যবাণী সাংস্কৃতিক দলে ছিলেন লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরী (নেত্রী), শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত অনাথশরণ, সর্বশ্রী সুনীল দাস, অরূপ দাশগুপ্ত, নিরাপদ বাকুলি, রমা চক্রবর্তী, প্রদীপ চক্রবর্তী অধ্যাপিকা শান্তি চক্রবর্তী ও অলকা বসু, সঙ্গীত তত্ত্বাবধায়ক শ্রীপূর্ণেন্দু রায়, বেশভূষা তত্ত্বাবধায়ক শ্রীদিলীপ ঘোষ ও ছায়া-আলোক তত্ত্বাবধায়ক শ্রীসুকুমার ঘোষ।

উপসংহার

সর্বত্রই কি আদর-আপ্যায়ন, কি মান-সম্মান, কি স্নেহ-ভালবাসা! আমরা নিজেরা ত তাহার যোগ্য নহি

কোনোদিক হইতেই। তা হলে? তা হলে, এই কথাই সুনিশ্চিত যে ডা: যতীন্দ্রবিমলের মরণ হয় নাই, মরণ নাই, মরণ হইবে না! সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার নামে আজও মাথা নত করিতেছে—তাঁহার আর শেষ কোথায়, মরণ কোথায়, তিরোভাব কোথায়? সুতরাং ডা: রমা যা প্রত্যেকবারই আবেগভরে বলেন—ইহা আমাদের সাধারণ নাটকাভিনয় নয়, আমরাও সাধারণ অভিনেতৃবর্গ নই—ইহা আমাদের পূজা; আমরা দীনহীন, ক্ষুদ্রক্ষীণ ভক্তজন, এই আমাদের একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ পরিচয়—অন্য কিছু নহে, অন্য কিছুই নহে।

তপতী

হাসিরাশি দেবী

না,—হারা হইনি পথ; হারাবনা,—এ আত্মবিশ্বাস
চঞ্চল হবেনা জেন' হে রুদ্র, তোমার ভ্রূকুটীতে,—
আমার এ ইচ্ছা-গঙ্গা রবে' চিরকাল
স্বর্গ থেকে মর্তের উদ্দেশে।
তুমি যদি প্রচণ্ড বাধায়
সম্মুখে দাঁড়াও এসে—আর,
তোমার উন্মুক্ত জটাজাল
যদি ঘেরে দিগঞ্চল,
যদি দীর্ঘশ্বাস
সৃষ্ট করে কুজ্ঝটিকা,—
তৃতীয় নয়ন—
উদ্গারে অগ্নির শিখা,
যদিই সে লেলিহ জিহ্বায়,
আমারে গ্রাসিতে চায়—তবু,
আমার এ ইচ্ছা-গঙ্গা-স্রোত
ব'য়ে যাবে যুগ-যুগান্তরে,—
অতীত গহ্বর থেকে
অনাগত দিনের সন্ধানে॥
না,—হারা হইনি পথ; হারাবনা,—এ দম্ভ আমার
নিশ্চিহ্ন হবেনা,—জেন।
প্রচণ্ড বাধায়
যদি সৃষ্ট কর মরু, যদি দুই হাতে
উপাড়ি—আছাড়ি ফেল পর্বত, কান্তার,—
হাস অট্ট অট্ট হাসি
ডমরুর ডিম-ডিম ধ্বনি
শঙ্কায় ভরায় বিশ্ব
চরাচর ত্রাসে কম্পমান,
যদি ফের অশান্ত নর্তনে
আবার উন্মত্ত হও,
ডুবে যায় রবি-শশি-তারা,
লুপ্ত হয় দিনরাত্রি আলো আর অন্ধকারে মিশে,—
স্তম্ভিত হাওয়ার বুকে
তবু রবে জীবন-স্পন্দন,
আমার এ ইচ্ছা-গঙ্গা তবু গাবে গান
মুক্তি মন্ত্রে।
দক্ষ-সুতা সম
বিষ্ণুচক্রে হবেনা সে লয়,
খণ্ডে খণ্ডে লভিবেনা শেষ পরিণতি।
না, হারা হইনি পথ, হারাবনা,—এ আত্মবিশ্বাসে
যতই আঘাত হান, কর অবহেলা,—
তবু তার স্রোত
বয়ে যাবে দ্বার হ'তে দ্বারে,—
স্বর্গের দেবতা ত্যজি
মর্তের মানুষে যাবে ছুঁয়ে।

মাসিক রাশিফল

শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য

১৬ই আষাঢ় হতে ১৫ই শ্রাবণ পর্যন্ত।

এবার আমরা ফলিত জ্যোতিষ আলোচনার পুনরাবৃত্তি করছি। গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমরা চন্দ্র সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এবারে চন্দ্র সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করলাম।

চন্দ্রের কোন শত্রু নেই। তার পরকে আপন করে নেবার বাসনা খুব প্রবল। সেজন্য তার মধ্যে স্বার্থপরতার বিকাশও খুব কম।

চন্দ্র সত্ত্বগুণ সম্পন্না। তার মধ্যে, মিথ্যাচার নেই। তিনি মধুরভাষিণী ও মনোরম হাস্যযুক্তা। কাজেই, তিনি যে-কোন অবস্থার মধ্যেই থাকুন না কেন, তার প্রকৃতি-সুলভ মধুরতা তিনি বর্জন করতে পারেন না। আবার চন্দ্র গুণগ্রাহী। গুণের কদর তিনি বোঝেন। তাই গুণীর সমাদর করতে তিনি জানেন।

চন্দ্রের স্নিগ্ধ রশ্মিতেজে জীবগণ পুষ্টিলাভ করে থাকেন। সে জন্য চন্দ্রকে মাতৃকারক গ্রহ বলা হয়েছে। আবার বিচিত্র সৃষ্টির মূলে আছেন চন্দ্রমা। চন্দ্র সৃষ্টিভাবের মাতা। চন্দ্রের মধ্যে রয়েছে নব নব সৃষ্টির প্রকাশ-ভঙ্গিমা।

শুক্রের প্রেমপ্রীতি কামগন্ধ বিজড়িত। ত্যাগের চেয়ে ভোগের বাসনাই তার প্রবল। আর চন্দ্র চির যৌবন সম্পন্না। তার প্রেমের পূর্ণ বিকাশ মাতৃত্বে। তিনি মাতৃত্বের অভিব্যক্তি। তার জননীত্ব প্রেম-ধর্মের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-প্রেমিকায় পরিণত হতে পারে।

চন্দ্র জীবগণের শরীরের জলীয় ভাগের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে তিথি-ভেদে জলীয় ভাগের হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত শিথিলতা সৃষ্টি করে থাকেন। আবার মাঝে মাঝে শরীরের রসভাগে পচনক্রিয়া দ্বারা ব্যাধি সৃষ্টি করে থাকেন।

চন্দ্র জলাত্মক, মঙ্গল অগ্নিময়। সুতরাং চন্দ্র ও মঙ্গলের পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা জল ও অগ্নি একত্র হয়ে নারীর শরীরে পিত্তরূপে পরিণত হয়। সে সঞ্চিত পিত্ত ক্ষুভিত হয়ে ঋতুরূপে নির্গত হয়। কাজেই, নারীগণের মাসিক আর্তবের আবর্তনের ওপর চন্দ্র এবং মঙ্গলের সম্পূর্ণ ক্রিয়া রয়েছে। আবার নারীজাতির বক্ষজ এবং নারীদুগ্ধের ওপর চন্দ্রের প্রভাবও বিদ্যমান।

চন্দ্র নির্দেশ করেন আতিথ্য, সহানুভূতি, রাজানুগ্রহ ও ও উচ্চাভিলাষ। চন্দ্র হতে সাহিত্যসেবা, গীতবাদ্য, সঙ্গীত-কলায় প্রগাঢ় অনুরাগ, আমোদ-প্রমোদ ও সন্তরণ-ক্রীড়া কল্পনা করা যায়।

চন্দ্র মন এবং ইন্দ্রিয়জ ষড়রিপুর ওপর কাজ করে থাকেন। সুতরাং মনের গঠন এবং মানসিক গতি ও প্রকৃতি বিশেষ ভাবে চন্দ্রের ওপর নির্ভর করে। কাজেই উন্মত্ত বা চন্দ্রাহত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা. বাতুলতা, মানসিক বিষাদ বা, অবসাদ, জড়মতিত্ব নিদ্রিতাবস্থায় ঘুরে বেড়ান, অশ্লীল বা কুৎসিত বিষয় চিন্তা এবং আশার ছলনায় প্রগাঢ় ভাবপ্রবণতা বা ভাববিহ্বলতা চন্দ্র হতেই অনুমেয়।

চন্দ্র রাত্রিতে বলবান হয়ে থাকেন। সুতরাং চন্দ্র ভাবাপন্ন ব্যক্তি যে কোন শ্রেণীর কাজ নিশাযোগে করতে ভালবাসেন।

জন্মকুণ্ডলীতে চন্দ্র বলবান হলে জাতিকা সংগৃহিণী ও আদর্শ জননী হতে পারেন। তিনি কখনও ঈশ্বরবিমুখ বা ক্ষুদ্রচেতা হতে পারেন না। চন্দ্র দুর্বল হলে জাতিকা মদনাতুরা গণিকার মত সর্বনাশকারিণী হতে পারেন। আবার শুভযোগকারক চন্দ্রের প্রভাবে জাতিকা জগদ্ধাত্রী-রূপা পালনকর্ত্রী অথবা সিদ্ধি-বিধাত্রী অন্নপূর্ণাসমা হতে পারেন।

বলবান চন্দ্রের প্রভাবে জাতক সাহিত্যসেবী, অধ্যাত্ম-বাদী, গায়ক, অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পী হয়ে থাকেন। দুর্বল চন্দ্রের প্রভাবে জাতক উন্মাদ, লম্পট ও মদ্যপায়ী হয়ে থাকেন।

চন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা শেষ করা হল। আগামী মাসে মঙ্গলের কারকতা বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যাক্, এবারে জন্মরাশি অনুসারে ব্যক্তিগত মাসিক শুভা-শুভ ফলের আভাস দিচ্ছি।

মেষ—আর্থিক ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। পারিবারিক অশান্তি আপনাকে বিব্রত করবে। এমাসে আপনার শত্রুরা পরাভূত হবে। পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ হবে। উকিল, দালাল প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের আয় বাড়বে। চিত্র পরিচালক ও প্রযোজকদের মাসের প্রথম দিকে কিছু ঝঞ্চাট রয়েছে। শিক্ষকদের আয় বাড়বে। পুলিশ বিভাগ ও সৈন্যবিভাগের চাকুরীতে স্থান পরিবর্তনের যোগ রয়েছে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা প্রতিকূল। স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে। অপরকে বিশ্বাস করে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। মহিলারা ছেলেমেয়ের ব্যাপারে অশান্তি ভোগ করবেন।

বৃষ—আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে আপনি বিব্রত হবেন না। প্রথম দিকে স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। চাকুরী কিংবা ব্যবসায়ে সুপরিবর্তনের যোগ রয়েছে। মাসের শেষ দিকে ভুলের বশে কিছু অর্থ ক্ষতি হতে পারে। কোন আত্মীয়ের জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। চিত্র পরিচালক ও প্রযোজকদের পক্ষে এ মাসটা ভাল নয়। শিক্ষকদের আয় বাড়বে। লেখকদের পক্ষে নতুন লেখার কাজ দ্রুত-গতিতে এগিয়ে যাবে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা গোলমেলে। বেকারের চাকুরী লাভের যোগ রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার ব্যাপারে শুভ ফল আশা করতে পারেন। তরুণ-তরুণীদের স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে বাধা আসতে পারে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ভাল।

মিথুন—আপনার মধ্যে যে অহমিকা ভাব জাগ্রত হয়েছে, তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আর্থিক ব্যাপারে অবশ্য দুশ্চিন্তার কারণ নেই। পারি-বারিক ক্ষেত্রে মাসের প্রথমভাগ অশান্তিকর। চিত্র পরি-চালক ও প্রযোজকদের সময়টা গোলমেলে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা ভাল। আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের আয় বাড়ার সম্ভাবনা। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সুপরিবর্ত্তনের যোগ রয়েছে। লেখক ও শিল্পীদের সুনাম ও স্বীকৃতি লাভের সম্ভাবনা। বেকারের চাকুরী লাভ হবে। মহিলাদের সময়টা মোটামুটি ভাল যাবে।

কর্কট—আপনার অশান্তি কেটে যাচ্ছে। কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হবার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করুন। আত্মিক গোলযোগে মাঝে মাঝে কষ্ট পাবার সম্ভাবনা। আইনজীবী ও বিচারকদের যশ ও আয় বাড়বে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা অত্যন্ত ভাল। লেখক ও শিল্পীদের কাজে বাধা আসতে পারে। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের সময়টা ঝঞ্চাটপূর্ণ। চিত্র পরিচালক ও প্রযোজকদের নিজের ভুলে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা। নিজের মনোমত কাজ খুজে পাবেন। প্রিয়দ্রব্য কিছু খোয়া যেতে পারে। তরুণতরুণীদের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহ হতে পারে। বেকারের চাকুরী লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ভাল-মন্দ মিশ্রিত।

সিংহ—কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের সহায়তায় উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে। চাকুরী ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। লেখক ও শিল্পীদের অর্থাগমের যোগ রয়েছে। চিত্র পরি-চালক ও প্রযোজকদের এবং সিনেমামালিকদের ক্ষতি-কর অ.স্থার সম্মুখীন হতে হবে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা ভাল নয়। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের আয় বাড়বে। চাকুরীজীবীদের এ মাসটা সুফলপ্রদ। দাম্পত্যক্ষেত্রে শুভ

ভাব বৃদ্ধি পাবে। জমি কেনাকাটার ব্যাপারে এখন বাধা আসতে পারে। আইনজীবীদের পক্ষে সময়টা ভাল। বেকারের চাকুরী লাভ মাসের প্রথমে হতে পারে। মহিলাদের যে-কোন কারণে উত্তেজিত হবার যোগ রয়েছে।

কন্যা—কর্মে দুশ্চিন্তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। আয়ের দিকটা ভাল। এখন থেকে একটা মানসিক দ্বন্দ্ব আপনাকে বিব্রত করবে। চাকুরীজীবীদের অপ্রত্যাশিত একটা সুযোগ আসতে পারে। স্বাস্থ্য মাঝে মাঝে উৎপাত করবে। আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের আয় বাড়বে। লেখক ও শিল্পীদের আর্থিক লাভের সম্ভাবনা। তাদের নূতন লেখায় স্বীকৃতিলাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা প্রতিকূল। স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে কি অগ্রসর হচ্ছেন? ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখুন। বন্ধুর দ্বারা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। বেকারের চাকুরী লাভ হতে পারে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা মোটামুটি ভাল বলা যায়।

তুলা—ঝগড়াঝাটি এড়িয়ে চলুন। আয়ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় থাকবে না। স্বাস্থ্য কিন্তু আপনার ভাল যাবে না। আপনি লটারী কিনতে পারেন। ব্যবসায়ীদের সময়টা ভাল নয়। চাকুরীজীবীদের পদোন্নতি হতে পারে। লেখক ও শিল্পীদের সময়টা ভাল নয়। আইনজীবী ও বিচারকদের কর্মে দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা যায়। দূরভ্রমণের যোগ রয়েছে। বেকারের চাকুরী লাভ হবে। মহিলাদের সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ।

বৃশ্চিক—আর্থিক ব্যাপারে দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা যায়। কিছু ঋণও হতে পারে। অযথা কাউকে সন্দেহ করবেন না। গুরুজনহানির যোগ দেখা যায়। এ মাসে আপনি সামান্য ভুগতে পারেন। চাকুরীজীবীদের এ মাসটা গোলমেলে। জমি কেনাকাটার সময় এখন নয়। পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে বহুদিন পর মিলন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের সময়টা ভাল নয়। বেকারের চাকুরীলাভ এখন হবে না। মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান থাকা উচিত।

ধনু—নিরাশ হবেন না। ধৈর্য ধরুন। নতুন বন্ধুলাভের সম্ভাবনা। আইনজীবীদের আয় বাড়বে। চাকুরীজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হবেন। শরীর কিছু উৎপাত করবে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা ভাল নয়। লেখক ও শিল্পীদের চিন্তাধারা এখন থেকে নতুন খাতে বইবে। চিত্র পরিচালক ও প্রযোজকদের সময়টা গোলমেলে। শিক্ষকদের আয় বাড়বে। গুরুজনের সঙ্গে মত-বিরোধ হতে পারে। বেকারের চাকুরী লাভের যোগ রয়েছে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ভাল।

মকর—আপনার কর্ম তৎপরতাই আপনাকে উন্নতির উচ্চশিখরে নিয়ে যাবে। নতুন কর্মের প্রসার বা যোগাযোগ হবে। লেখক ও শিল্পীদের সুনাম ও আয় বাড়বে। চাকুরীজীবীদের সময়টা এখনও গোলমেলে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা অনুকূল। চিত্র পরিচালক বা প্রযোজকদের পক্ষে সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের আয় বাড়বে। পত্নীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করুন। কারো শত্রুতা মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। সম্ভাব্যক্ষেত্রে মনোমত ক্ষেত্রে বিবাহ হতে পারে। দূরভ্রমণ হতে পারে। বেকারের চাকুরীলাভ হবে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা অত্যন্ত ভাল।

কুম্ভ—পারিবারিক অশান্তির লক্ষণ আছে। চাকুরীক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। দূরভ্রমণের যোগ আছে। সিনেমার পরিচালক ও প্রযোজকদের নতুন চুক্তির ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট দেখা যায়। আর্থিক দিকটা ভাল। তরুণ-তরুণীদের বিবাহে বাধা আসতে পারে। নতুন বন্ধুলাভের সম্ভাবনা। আইনজীবীদের সময়টা ভাল নয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তার কোন কারণ নেই। ব্যবসায়ীদের পক্ষে সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। লেখক ও শিল্পীরা কাজের চাপে বিব্রত বোধ করবেন। বেকারের চাকুরীলাভ হতে পারে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা গোলমেলে।

মীন—উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলুন। কোন ব্যাপারে সুখবর পেতে পারেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তার কোন কারণ নেই। দাম্পত্য-ক্ষেত্রে শুভভাব বৃদ্ধি পাবে। চাকুরীক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা। দূরভ্রমণের যোগ রয়েছে। লেখক ও শিল্পীদের নৈরাশ্য দেখা দেবে। ব্যবসায়ীদের এ মাসটা ভাল নয়। আর্থিক ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তরুণীমেয়েদের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহ হতে পারে। জমি কেনাকাটার ব্যাপারে বাধা আসতে পারে। বেকারের চাকুরীলাভের যোগ দেখা যায়। মহিলাদের স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে।

।।। ব্যতিক্রম ।।।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবা।

কি রে?

তুমি এখনও উঠলে না। আজ বুধবার ফার্ষ্ট পিরিয়ডে তোমার ক্লাস না?

ঘড়ির দিকে চেয়ে জ্ঞানবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সত্যিই ত, ৯টা বেজে গেল যে। তাড়াতাড়ি বাথরুমে চলে গেলেন।

খেতে বসে স্ত্রীকে বল্লেন, ঘরখানা আজ ভাড়া হোয়ে গেল গো, কিন্তু যে ছোক্‌রাকে ভাড়া দিলুম, সে ছোঁড়াটা পাগল নাকি ঠিক বুঝলুম না।

সে কি গো? গৃহিণী চমকে উঠলেন। পাগলই যদি মনে হোল, তা হলে পাগলকে ভাড়া দিলে কেন?

জ্ঞানবাবু মাছ ছাড়াতে ছাড়াতে বল্লেন, পাগল এমনি বলছি, পাগল হলে কি আর স্টেট্‌স্‌ম্যানের রিপোর্টার হতে হতে পারে? কিন্তু কথাবার্ত্তা যেন কি রকম!

মেয়ে রমাও খেতে বসেছিল। বল্লে, কি রকম কথাবার্ত্তা বাবা?

জ্ঞানবাবু বল্লেন, ভাড়া ত একশ' টাকা বলেছিলুম। ছোকরা এসে ঘর দেখেই বল্লে, হ্যাঁ আমার পছন্দ আছে। কি দিতে হবে? তা বল্লুম, এক মাসের ভাড়া জমা থাকবে আর প্রত্যেক মাসের ভাড়া সেই মাসের প্রথম সপ্তাহে দিতে হবে। শুনেই বল্লে, ঠিক আছে, আপনি টাকাটা নিয়ে নিন, আমি দু'একদিনের মধ্যেই আস্‌ব।

জ্ঞানবাবুর স্ত্রী নীলিমা দেবী বল্লেন, এতে পাগলের লক্ষণটা কি দেখলে?

জ্ঞানবাবু বল্লেন, শোনো না কথাটা। ভদ্রলোক পকেট থেকে একখানা একশ' টাকার নোট আর এ-পকেট ও-পকেট হাৎড়ে ন'খানা দশ টাকার নোট বার করে বল্লে, একশ নব্বুই টাকা রাখুন, বাকী দশ টাকা সঙ্গে নেই, যেদিন আস্‌ব সেইদিন দিয়ে দেব। বলেই বল্লে, চলি এবার, বাই-বাই।

বল্লুম, বসুন, রসিদটা লিখে দি'। তাই শুনে ছেলেটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, রসিদ আর কি হবে? আমি দিলুম, আপনি নিলেন। আবার রসিদের কি দরকার? বলেই এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীলিমা দেবী বল্লেন, ওঃ, এই কথা! এতে আর কি আছে? সরল বিশ্বাসী ছেলে, আর শুনেছে তুমি একজন প্রফেসার তাই বিশ্বাস করে দিয়ে গেল।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, আরে শোনো শোনো, আরও মজা আছে। এক মিনিটের মধ্যেই আবার দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকেই বল্লে, আরও পাঁচ টাকা সঙ্গে আছে, নিয়ে নিন।

একশ পঁচানব্বই দেওয়া রইল, বলেই পাঁচ টাকার একখানা নোট আমার টেবিলে রেখে বিনা ভণিতায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেয়ে রমা নিজের পাতে ঝোল ঢালতে ঢালতে বল্লে, বড় মজা ত? এর পর ও যখন মালপত্র নিয়ে আসবে, তখন যদি বলি, আপনি কে মশাই, আপনাকে চিনি না, তখন?

জ্ঞানবাবু হাসতে লাগলেন।

নীলিমা দেবী বল্লেন, বোধ হয় তোমাকে চেনে, তোমার ছাত্রও হতে পারে।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, না-না, আমাকে চিন্‌বে কি করে। ওর কাছেই শুনলুম, ও ছেলেবেলা থেকে দিল্লীতে মানুষ হয়েছে, বিলাতেও ছিল অনেকদিন। তারপরে কোথায় ঘুরেছে জানি না, কলকাতায় এসেছে মাত্র একমাস আগে ষ্টেটস্‌ম্যান অফিসে রিপোর্টারের চাকরী নিয়ে। তবে

চাকরীতে এসে ওখানে আমার যে ছাত্র আছে, তার সঙ্গে ওর চেনা হয়েছে, এই পর্য্যন্ত।

এই একমাস ছিল কোথায় বাবা? রমা প্রশ্ন করলে।

কলকাতার ব্রডওয়ে হোটেলে।

ওদের খাওয়া শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই জ্ঞানবাবুর ছেলে এসে বাড়ী ঢুকল। 'মা, ভাত দাও'।

নীলিমা বল্লেন, চান-টান হবে না?

ছেলে অজিত সিঁড়ি দিয়ে ওপোরে উঠতে উঠতেই বল্লে, পাঁচ মিনিটে নেয়ে নেব। তুমি ভাত দাও।

প্রায় পাঁচদিন হয়ে গেল, নতুন ভাড়াটের কোন পাত্তাই নেই।

রবিবার দুপুরে জ্ঞানবাবু তখনও ঘুমুচ্ছেন, একখানা ট্যাক্সি এসে দরজায় দাঁড়াল। অজিত বাইরের ঘরে বসে দিদির কাছে বাংলা টেক্সট পড়ছিল। জানলা দিয়ে দেখলে, প্যান্ট ও সার্ট পরা এক ছোকরা ট্যাক্সি থেকে নেমে লোহার গেট খুলে ওদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে ডাক দিলে, প্রফেসার মুখার্জ্জী।

দরজার ঝোলান পর্দ্দা সরিয়ে অজিত এগিয়ে এসে বল্লে, কাকে চাই?

আগন্তুক বল্লে, প্রোফেসার জে আর মুখার্জ্জী।

অজিত বল্লে, বাবা—বাবা শুয়ে আছেন, আপনি?

আগন্তুক বল্লে, ঠিক আছে, তাঁকে ডাকবার দরকার নেই। আপনি ঐ মেজেনাইন ঘরটা খুলে দিন, আমি জিনিষগুলো রাখব।

অজিত বল্লে, আপনি?

আমি ঐ ঘরটা ভাড়া নিয়েছি।

অজিত বা রমা দুজনের কেউই ওকে এর আগে দেখে নি। রমা তাড়াতাড়ি বাবাকে ডাকতে গেল। অচেনা লোককে ঘর খুলে দিয়ে শেষে কি বিপদ হবে?

অজিত বল্লে, আপনি বসুন, বাবা আসছেন।

অসহিষ্ণু আগন্তুক বল্লে, আঃহা, আবার তাঁকে বিরক্ত করে কি লাভ? ঘরটা খুলে দিলেই ত হোত।

জ্ঞানবাবু ঘুম চোখে বেরিয়ে এসে বল্লেন, ও, আপনি এসে গেছেন। বেশ, বেশ, অজিত মেজেনাইন চাবিটা খুলে দে ত। আর—আর আপনার সঙ্গে কেউ আছে নাকি?

আগন্তুক বল্লে, সঙ্গে? সঙ্গে ত কেউ নেই।

জ্ঞানবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ওরে আমাদের বামুয়া কি আছে? থাকলে বামুয়াকে ডাক্, জিনিষপত্র তুলতে হবে ত?

রমা বল্লে, বামুয়া কি দুপুরে কখনও থাকে বাবা? সে সেই কখন বেরিয়েছে, চারটের আগে সে ফিরবে না।

আগন্তুক বল্লে, না, না, কাউকে ডাকতে হবে না। মালপত্র কি বা এমন আছে, বলতে বলতেই ভদ্রলোক ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

নিউ আলিপুর 'পি' ব্লকে জ্ঞানবাবুর বাড়ী। ১৯৬০ সালে বাড়ীখানি তৈরী করেছেন। ছোট্ট বাড়ীখানি তৈরী করে তার পাশে একটুখানি জমি যা ছিল, এ পাড়ায় গ্যারেজের টান্ বুঝে তিনি ঐ জমিটায় একটা গ্যারেজই প্রথমে করেন। তারপর গ্যারেজের ওপোরে একটা নিচু ছাতের ঘর, যার ইংরাজী নাম mezannine floor সেই জিনিষ তৈরী করে ঐ ঘরে ওঠার জন্য একটা সিঁড়ি, সিঁড়ির সামনে এক ফালি রান্নাঘর এবং তারই পাশে কামরা সংলগ্ন বাথরুম বানিয়ে সিঁড়ির নীচের অংশে একটা পুরাণো দরজা এবং জানলা দিয়ে সেটাকেও একটা ঘরের আকার দেবার চেষ্টা করেছিলেন। গ্যারেজের ভাড়া ওঁর হয়ে গেছে। এখন এই নীচু ছাতের ঘরটার জন্য তিনি আশা করেছিলেন হয়ত পচাত্তর টাকা কিম্বা বাট-সত্তর টাকা ভাড়া মিলতে পারে, কিন্তু মুখে বলেছিলেন একশ' টাকা। ষ্টেটস্‌ম্যান অফিসে ওঁর যে অনুগত ছাত্র কাজ করত তাঁকে বলেছিলেন একটা বিজ্ঞাপন দিতে! সে বলেছিল যে, তাদের অফিসে একজন নতুন রিপোর্টার এসেছে, তাকে বলে সে দেখবে, তার যদি পছন্দ হয় তা হলে আর খরচ করে বিজ্ঞাপন দিতে হবে না। সেই সূত্রেই এই নতুন ভাড়াটে এসেছে।

ট্যাক্সি থেকে ভারী একটা ওয়ার্ডরোব, কয়েকটা ছোট-খাট সুটকেস, হোল্ডঅল এবং আরও চাটিখানি খোঁচাখুঁচি দেওয়া জিনিষ নিজেই দু'হাতে টানতে টানতে ভদ্রলোক ওপোরের ঘরে তুলে ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া চুকিয়ে কপালের ঘাম মুছলে। অজিত ও রমা দুজনেই নিজেদের ঘরে ফিরে এল। প্রথম দর্শনে ভদ্রলোককে বেশ মিশুক বলে মনে হোল না। তা ছাড়া একজন ভদ্রলোক নিজের

হাতে মুটের কাজ করছে, সেখানে অজিতের পক্ষে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাটা শোভন নয়, অথচ ভাড়াটের জন্য মুটেগিরি করাটাও তার ভাল লাগল না। অতএব সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

জ্ঞানবাবু আর ওপোরে শুতে গেলেন না। নীচের ঘরেই খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন। রবিবারের কাগজ সকালে পড়ে শেষ করা যায় না।

জ্ঞানবাবুর সংসারটি নির্ঝঞ্ঝাট। মেয়ে বাংলায় এম-এ পাশ করেছে গত বছরে, এবং এ বছরে কলকাতার এক কলেজে লেক্‌চারার হয়ে ঢুকেছে, ছেলে ইংরাজী অনার্স নিয়ে পড়ছে, ওরও জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে অধ্যাপনা করা। জ্ঞানবাবু দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। অধ্যাপক হিসাবে সুনামই আছে তবে বর্ত্তমানে পড়াশুনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। পুরাতন চর্ব্বিতচর্ব্বণ এবং ক্লাসে বসে ছাত্রদের নোট্ দেওয়া এইভাবেই তাঁর কর্ত্তব্য সমাধা করেন এবং কোথায় কোন সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু কতখানি উপরওয়ালা হয়ে কি পরিমাণ উপার্জ্জন করছে সেই সব আলোচনা করেই দিন কাটান। যারা অভাবে আছে এমন সব আত্মীয়-বন্ধুদের খোঁজখবরও রাখেন না।

বেলা চারটে নাগাধ নতুন ভাড়াটে ঘরের দরজায় এসে ডাক দিলে, প্রফেসার মুখার্জ্জী!

জ্ঞানবাবু ক্যাম্বিশের ইজি চেয়ারে থেকেই আহ্বান জানালেন, এই যে আসুন মিঃ রয়।

মিঃ রয় ঘরে ঢুকেই বল্লে, আপনার সেই টাকা পাঁচটা নিয়ে নিন।

জ্ঞানবাবুর হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে মিঃ রয় বল্লেন, আমার ভাড়াটা কি প্রত্যেক মাসের তের তারিখ থেকে পরের মাসের বার তারিখ অবধি চল্‌বে? আজ তেরই মার্চ্চ—

জ্ঞানবাবু বল্লেন, তা হতে পারে, কিম্বা এই ভাঙ্গাভত্তি বারো দিন, এ আর হিসেবে—

অল্প হেসে মিঃ রয় বল্লেন, ও আচ্ছা, ঠিক আছে, তা-হলে মাস হিসেবেই ধরবেন। এপ্রেল মাসের প্রথম সপ্তা-হেই এপ্রেলের ভাড়া দিয়ে দেব!

স্মিত হাস্যে জ্ঞানবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ঘর গুছান হয়ে গেল।

হ্যাঁ, ও-একরকম করে ফেলেছি। আসুন না, দেখে যান।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, চলুন দেখে আসি।

জ্ঞানবাবু উঠতেই মিঃ রয় রমা ও অজিতের দিকে চেয়ে বল্লে, আপনারাও আসুন, all are welcome.

ওরা তিনজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে মিঃ রয়ের ঘরে উপস্থিত হোল।

লোকটার হাতে যেন যাদু আছে। এই ঘণ্টা-দুই সময়ের মধ্যে ভাঁজ করা নতুন ক্যাম্বিশের খাট পেতে তার ওপোর বেডকভার নিয়ে লোহার ফোল্ডিং চেয়ার টেবিল পেতে টেবিলের ওপোর রেডিও বসিয়ে দেওয়ালের গায়ে যে পেরেকগুলো পোতা ছিল সেইগুলোয় আরসী ও ক্যালেণ্ডার ঝুলিয়ে ইলেক্‌ট্রিকের বাল্ব লাগিয়ে সাড়ে ছ'ফুট উচ্চতার ঘরখানা বেশ একটি মনোরম বাসগৃহে পরিণত করেছে। ঘরের সজ্জা দেখে জ্ঞানবাবু প্রশংসা করতেই মিঃ রয় বল্লেন, এই যাকে বলে Gypsy camp অর্থাৎ কিনা বেদের টোল। এ আমার বেশ চলে যাবে।

রান্না খাওয়া? জ্ঞানবাবু প্রশ্ন করলেন।

রয় বল্লে, সকালে ব্রেকফাষ্ট নিজে তৈরী করে নেব, তারপর উপস্থিত খাওয়া-দাওয়া বাইরে বাইরেই করব। আচ্ছা, আপনার সিঁড়ির তলার ঘরটায় যদি আমার স্কুটারটা রাখি, তাহলে ত আপনার কোন আপত্তি নেই?

জ্ঞানবাবু বল্লেন, নাঃ, আপত্তি আর কি আছে।

অজিত বল্লে, আপনার স্কুটার আছে বুঝি?

রয় বল্লে হ্যাঁ, সেটা অফিসে পড়ে আছে, আনা হয় নি।

দরজায় তালা ঝুলিয়ে রিং সমেত চাবিটা আঙ্গুলে ঘোরাতে ঘোরাতে শুভরাত্রি জানিয়ে রয় চলে গেল। জ্ঞানবাবুরা নিজেদের ঘরে ফিরে এল।

অজিত বললে, বাবা ভদ্রলোকের পুরো নাম কি?

জ্ঞানবাবু বললেন, ঠিক জানি না, শুনেছিলাম এস্ এন্ রয়।

দুই

অজিত বল্লে, দিদি, ভদ্রলোক বড় মজার।

রমা বল্লে, কি রকম?

অজিত বল্লে, আজ আমার কোচিং ক্লাস ছিল না,

তাই সকালে বাগানে গিয়ে ভদ্রলোকের ঘর খোলা দেখে ঢুকে দেখি দাড়ি কামাচ্ছেন। কি ভাবে কামাচ্ছেন জানিস? শুধু ব্লেড দিয়ে।

তার মানে? রমা ঘাড় ঘুরিয়ে যে রকম দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তাতে বিস্ময় এবং সন্দেহ দু'রকমই ফুটে উঠল।

অজিত বল্লে, হ্যাঁ রে। শুধু একখানা ব্লেড হাতে ধরে বিনা আরসীতে চেয়ারে বসে কামাচ্ছেন। মুখে সাবান দেন নি, আরসী নেন নি, একটা প্লেটে একটুখানি জল আছে। সেই জল গালে লাগিয়ে সাঁ সাঁ করে দাড়ি কামাচ্ছেন।

বলিস্ কি রে, কেটে কুটে যাচ্ছে না?

না, পরিষ্কারভাবে কামানো শেষ করে এক কাপ জলে মুখ ধুয়ে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, গুডমর্নিং মিঃ মুখার্জ্জী, বসুন। আমি বল্লুম, শুধু ব্লেডে কামাচ্ছেন দাদা, কেটে যাবে না। উনি বল্লেন, এই ভাবেই ত কামাই। আমি বল্লুম, ওতে কি সুবিধে হয়? তিনি বল্লেন, দুরকম সুবিধে হয়। প্রথমতঃ, হোল্ডার, সাবান, ব্রাস এ সব ঝঞ্ঝাট করতে হয় না, দ্বিতীয়তঃ, ব্লেডটা যে কোন রকম এ্যাঙ্গেলে ধরা যায় বলে একখানা সাধারণ ব্লেডে ছ'মাস আটমাস কামানো যায়।

বলিস্ কি রে? তোদের ত মাসে চার পাঁচখানা ব্লেড লাগে, রমা উত্তর দিলে।

অজিত বল্লে, বাবার ত একখানা ব্লেডে তিনচার বারের বেশী হয় না।

রমা বল্লে, ভদ্রলোক বোধ হয় সান দিয়ে নেয়।

অজিত বল্লে, না দিদি। সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম। উনি বল্লেন, সান দেবার দরকার হয় না।

রমা বল্লে, মাকুন্দে নয় ত?

অজিত বল্লে, না দিদি, রীতিমত কড়া দাড়ি। কামাবার সময় ফর্‌ফর্ করে শব্দ হচ্ছিল।

রমা বল্লে, তা হলে তোকে ধাপ্পা দিয়েছে। একখানা ব্লেডে ছ'মাস কামান এ হতে পারে না।

অজিত বল্লে, তারপর ওর খাওয়া দেখলুম। সেও এক মজার ব্যাপার।

কি রকম?

ভদ্রলোক বেতের বাক্স থেকে একখানা ছোট পাউরুটী বার করে দুটো মুরগীর ডিম একটার পর একটা ভেঙ্গে সেই রুটিতে জেলি মাখানোর মত মাখিয়ে দিব্যি খেতে লাগল। রুটি টোষ্ট করার কোন বালাই নেই। আমি ত ভাই অবাক্,—এভাবে কেউ খেতে পারে? নুন নেই, মরিচ নেই, গরম করলে না, কিছু না।

রমার মুখে একটা করুণ ভাব ফুটে উঠল। বল্লে টোষ্ট করার ব্যবস্থা বোধ হয় নেই। তা তুই বল্লি না কেন, আমরা না হয় টোষ্ট করে দিতুম!

অজিত বল্লে, আমি কি করে বুঝব যে, ঐভাবে খাবেন। আচ্ছা, তারপর কি করলে জানিস্! ঐ বেতের বাক্স থেকে চারটে সিঙ্গাপুরী কলা বার করে একে একে ছাড়িয়ে খেয়ে নিয়ে হরলিক্সের বোতল বার করে সেই বোতলে চামচ ঢুকিয়ে তিন চার চামচ হরলিক্স বার করে করে সেই গুঁড়ো হরলিক্সগুলো মুখে পুরতে লাগলেন। শেষে এক গেলাস জল খেয়ে সেই গেলাসের তলানি জলে চামচ-খানা ধুয়ে রুমালে মুছে বেতের বাক্সয় রেখে পাউরুটি জড়ান কাগজের মধ্যে ডিম ও কলার খোলাগুলো পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেখানে আমাদের জঞ্জালের টব আছে সেই টবের মধ্যেই ওপোর থেকে টিপ্ করে এমন ছুঁড়লেন যে প্যাকেটটা ঠিক টবের মধ্যে গিয়ে পড়ল। ঘরে ফিরে আসতে আমি বল্লুম, দাদা, এরকম করলেন কেন, আমাকে বল্লেই ত আমি পাউরুটি টোষ্ট করে দিতে পারতুম। কিম্বা যদি নিজেই করতে চান, তাহলে একটা হীটার এনে দিতে পারতুম। তাতে ভদ্রলোক ওঁর নিজের হীটারটা দেখিয়ে বল্লেন, হীটার ত ঐ রয়েছে, কিন্তু হীটার আমার লাগে না। তারপর গম্ভীরভাবে বল্লেন, দাদা দাদা বলেন কেন, মিঃ রায় বলবেন। অযথা সম্বন্ধ পাতিয়ে লাভ আছে কি? আমি ভাড়া দেই, থাকি, ভাড়া না দিতে পারলে থাকতে দেবেন না ত, তাহলে অনর্থক দাদা বলার কি দরকার।

বেজায় অভদ্র ত! রমা টিপ্পনী কাটলে। তুই কি বল্লি।

আমি কিছুই বল্লুম না। উঠবো উঠবো মনে করছি, উনি বিছানার তলা থেকে ভাঁজ করা প্যাণ্ট এবং আর একটা বাক্স থেকে ভাঁজ করা সার্ট বার করে আগে

সার্ট'টা পরে আমার সামনেই হাফ্ প্যান্ট ছেড়ে ফুল প্যান্ট পরতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মিঃ রয়, চান-টান করা হয়ে গেছে? তিনি বল্লেন, চান করি রাত্তিরে শোবার আগে। সকালে স্নান করার সময় পাই না।

রমা বল্লে, ও ঘরে আর যাস নি, ওর সঙ্গে মেলা-মেশার দরকার নেই।

অজিত বল্লে, মেলামেশার সুযোগ কই দিদি? এই ত বেরিয়ে গেলেন, ফিরবেন সেই রাত্রে। আর জানিস্ দিদি, কি তাড়াতাড়ি কাজ করেন। দু' মিনিটে জামা প্যান্ট পরে টাই বেঁধে আলো পাখা বন্ধ করে তালা হাতে বেরিয়ে পড়ে দরজায় তালা লাগিয়ে তিন লাফে সিঁড়ি পার হয়ে স্কুটার টেনে বার করলেন। স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বল্লেন, বাই বাই,—বলেই উধাও।

জ্ঞানবাবু পুজো আহ্নিক সেরে ঘরে ঢুকে বল্লেন, কে আলো পাখা বন্ধ করলে রে?

অজিত বল্লে, মিঃ রয়।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, পাখা কোথায়? আবার পাখা লাগিয়েছে বুঝি?

অজিত বল্লে, একটা পেডাস্টাল ফ্যান দেখলুম বাবা। কাল সেটা ছিল না। বোধ হয় রাত্তিরে এনেছেন।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, মুস্কিল। ইলেকট্রিকের জন্য কিছু বল হয় নি। আলাদা মিটারও নেই। সারা মাসে কত ইলেকট্রিক পোড়াবে তার ঠিক নেই। দেখি, একদিন বলতে হবে।

রমা বল্লে এ তোমার অন্যায় বাবা। এবার মার্চ্চ-মাসেই বেশ গরম পড়ে গেছে, এই গরমে, বিশেষ করে ঐ ঘরটায় পাখা না হলে কি থাকা যায়! আর তা ছাড়া ভাড়া ও তোমার অনেক বেশীই দিচ্চে।

হ্যাঁ, তা দিচ্চে, জ্ঞানবাবু বল্লেন, তা ওকে বল্লেই ইলেকট্রিকের জন্যও কিছু দেবে বলে মনে হয়। এক কথায় বারো দিনের ভাড়া ত ছেড়ে দিলে।

রমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জ্ঞানবাবু অজিতকে বল্লেন, তোর আজ কোচিং ক্লাস নেই?

অজিত বল্লে, না বাবা, কাল প্রফেসার বলে দিয়ে-ছিলেন, তাঁর কি একটা কাজ আছে বলে তিনি আজ সকালে আসবেন না। আমাদের সকলকেই ছুটি দিয়েছেন।

যত সব ফাঁকিবাজের দল, আপন মনে বলতে বলতে জ্ঞানবাবু খবরের কাগজ নিয়ে ক্যাম্বিশের ইজি চেয়ারে চিৎ হয়ে পড়লেন।

সেদিন সকালে ড্রেস করে বেরোবার সময় মিঃ রয় এদের ঘরের দরজায় এসে পরদার বাইরে থেকে ডাক দিলে প্রফেসর মুখার্জ্জী!

জ্ঞানবাবু তখনও এ ঘরে আসেন নি। রমা যেন কি করছিল, অজিত কোচিং ক্লাসে চলে গেছে। রমা পরদা সরাতেই মিঃ রয় বল্লে, গুড্ মর্ণিং মিস্ মুখার্জ্জী, আপনার বাবা আছেন!

রমা তীর্য্যক দৃষ্টি হেনে বল্লে, আছেন, ঠাকুর ঘরে।

I see, রয় ইতস্তত করতে লাগল।

ভদ্রতার খাতিরে রমা বল্লে, আসুন বসুন, বাবা এখনই আসবেন।

থ্যাঙ্কস্—রয় ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসল।

রমা খবরের কাগজখানা এগিয়ে দিলে, ষ্টেটসম্যান্।

রয় রমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে থ্যাঙ্কস্, কিন্তু ময়রারা সন্দেশ খায় না।

রমা বল্লে, তাও ত বটে, এ ত আপনাদেরই লেখা।

তারপর দুজনেই চুপচাপ। এই অশ্বস্তিকর নীরব অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য রমা বল্লে, বাবার কাছে আপনার দরকার বুঝি?

হ্যাঁ। আমার ঘরে একটা টেলিফোন নিতে চাই, ল্যাণ্ডলর্ডের পারমিশনের জন্য এসেছি।

টেলিফোন? রমা বল্লে, ফোন পেতে কত বছর যে লাগবে—

রয় বল্লে, না, আমাদের বেশী দেরী হবে না। অপিস থেকেই বন্দোবস্ত হচ্ছে দশ পনর দিনের মধ্যেই পাব।

তাই বুঝি? রমা সপ্রশংস দৃষ্টিতে রয়ের দিকে দেখলে। তা হলে মিঃ রয়, আমাদের জন্যও একটা করিয়ে দিন না কেন?

সে কি করে হবে? ওরা ষ্টেটস্ম্যানের নামে এখানে একটা ফোন দেবে, কিন্তু অন্য নামে দেবে কি?

ও, তাই বুঝি? রমা থেমে গেল।

রয় বল্লে, আপনারা এগ্রাই করে রাখুন, যতদিন না পান, আমার ফোনে কাজ চালাবেন।

রমা বল্লে, কি রকম? আপনার ঘর ত সারাদিন বন্ধই থাকে।

থাকুক। আপনি ঘরের চাবিটা রেখে দেবেন, কোন অসুবিধে হবে না

আপনি ত কারুর সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করেন না, রমার মুখ দিয়ে কথাটা ফস্‌কে বেরিয়ে গেল।

কে বল্লে? মিঃ রয় বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করেছিল।

রমা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে শেষে সামলে নিয়ে বলেছিল, না-না, এমনই বলছিলুম। মানে এতদিন এসেছেন, কিন্তু কোনদিন ত এ বাড়ীতে আসেন নি, তাই—

স্বীকারোক্তির ভঙ্গীতে রয় বল্লে, তা ঠিক, দরকার নয় নি, তাই আসি নি। তা ছাড়া সময়ও পাই না। উদয়-অস্ত ডিউটি। আর উদয়-অস্তই বা কেন, কাল রাত্রে, বাড়ী ফিরেছি একটা চল্লিশে। আজও বোধ হয় ঐ রকমই হবে। তা ছাড়া আমার আরও একটা অসুবিধে। এসপ্ল্যানেড থেকে নিউ আলিপুর দূর ত কম নয়, তাই দুপুরে ঘণ্টাখানেক সময় পেলেও আসতে পারি না। যা রোদ্দুর হয়েছে, আর আস্‌তে যেতেই আধ ঘণ্টার ওপোর লেগে যায়।

তা হলে এতদূরে এলেন কেন? ঐ পাড়ার কাছাকাছি কোথাও—

রয় বল্লে, এই রকম ঘর কোথাও পেলুম না। অর্থাৎ সিঙ্গলরুম ফ্ল্যাট, এট্যাচ্‌ড্‌ বাথ্‌ এবং রাস্তা থেকে নিজস্ব এন্‌ট্রান্স, এ কোথাও পাওয়া যায় না। লোকের বাড়ীতে একখানা ঘর নিলে রাত্তিরে যদি ফিরি তাহলে গেট খোলার একটা ঝামেলা থাকে। এখানে সেই সুবিধেটাই আমার প্রধান আকর্ষণ।

এর পর আর কি কথা বলা যায় রমা খুঁজে পেলে না। একটু ভেবে বল্‌লে অসুবিধাও আছেই, আমাদের ঘর খানাও নীচু ছাতের, খুব—

তাতে কি আসে যায়, মিঃ রয় বাধা দিয়ে উত্তর দিলেন ফ্লোর স্পেশ ত আছে এবং ছাতটা মাথায় ঠেকে না, এই যে আপনার এই ঘর, মানুষের মাথার ওপোর আরও ছ'ফিট জায়গা রয়েছে, ও নিয়ে আপনি কি করেন। ওটাকে বলতে গেলে এক রকম অপব্যয় তা ছাড়া বাড়তির অপর নাম আবর্জনা। আমার মনে হয় নীচু ছাতের ঘরই ভাল, ঘরের সমস্ত জায়গাতেই হাত পৌছায়, মানে নিজের ঘরের ওপোর নিজের full control থাকে, বাড়তি আবর্জনার কোন বালাই থাকে না। অবিশ্যি এ সব ব্যাপারে আমার মতের সঙ্গে সকলের মত মেলে না এই যা, কিন্তু এই কদিন বাস করে আমার মনে হচ্ছে, আপনাদের ঘরখানা বেশ camfortable।

আবার চুপচাপ। রমা মনে মনে বাবার ওপোর রীতিমত বিরক্তই হতে লাগল। এতক্ষণেও বাবার আসার সময় হোল না, অথচ অতিথিকে বসিয়ে রেখে চলে যাওয়াও যায় না চুপ করে মুখ বুজে থাকা আরও বিশ্রী দৃষ্টিকটু, কিন্তু আর কি বলা যায়!

মিঃ রয় এ বিষয়ে রমাকে সাহায্য করলে। জিজ্ঞাসা করলে, আপনি—আপনি বুঝি পড়েন?

এবার রমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লে। বল্লে, হ্যাঁ, পড়ি এবং পড়াইও বটে।

পড়ান? মানে আপনি।

হ্যাঁ, আমি অমুক কলেজের প্রফেসার।

I see, very good। আপনার সাবজেক্ট কি?

বাংলা!

বাংলা! very nice। আচ্ছা, তা হলে আপনি আমাকে একটা বিষয়ে নিশ্চয়ই হেল্প করতে পারেন। আমি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস এই দুটো পড়তে চাই। এ আমার নিজের দেশ এবং নিজের ভাষা কিন্তু বলতে লজ্জা হয়, এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর তেমন কিছুই পড়িনি; তাও রবীন্দ্রনাথও কি সমস্ত পড়া যায়!

রমা বল্‌লে, ঠিক আছে, আপনি আগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসটা পড়ে নিন, তারপর বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস পড়বেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কত বড় বই এবং কখানা? বুঝতেই ত পারছেন. অল্প সময়ের মধ্যে একটা outline knowledge আমার দরকার।

এবার রমা নিজের লাইনে এসে পড়েছে। বল্‌লে, ছোট বড় সব রকমের বইই আছে। আপনাকে ছোট বইই দেব।

দেবেন? আছে আপনার? তা হলে ত ভালই হয়। না হলে বইয়ের নাম করলে—

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জ্ঞানবাবু বল্‌লেন, কে রে রমা?

মিঃ রয়, রমা উত্তর দিলে।

রয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জ্ঞানবাবুর দিকে চেয়ে বল্‌লে, গুড মর্ণিং প্রোফেসার মুখার্জ্জী।

জ্ঞানবাবু বল্‌লেন, গুড মর্ণিং মিঃ রয়, বসুন।

টেলিফোন সম্বন্ধীয় কথা বলে একখানা কাগজ এগিয়ে দিয়ে পকেট থেকে কলম বার করে রয় বল্‌লে, আপনার অমত নেই এই মর্ম্মে সই করে দিন।

জ্ঞানবাবু সমস্তটা আত্মন্ত পাঠ করে কাগজটায় সই দিয়ে বল্‌লেন, মিঃ রয়, আপনার সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিকের ব্যাপারে কোন কথা বলা হয় নি। ওটা আমাদের সঙ্গে একই মিটারে আছে।

রয় বল্‌লে, ও, ভাড়ায় বুঝি ইলেক্‌ট্রিকটা নেই। মানে ওটা আমার খেয়াল হয় নি, দিল্লীতে ঘর মানে জল এবং ইলেক্‌ট্রিক সমেত ঘর ধরা হয়।

ব্যস্ত হয়ে জ্ঞানবাবু বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জল এখানেও ঘরের সঙ্গে, কিন্তু ইলেক্‌ট্রিক,—ওটা যিনি যেমন খরচ করবেন।

ঠিক আছে, ওর জন্য যা ধার্য্য করবেন দিয়ে দেব;—মিঃ রয় উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, তাহলে চলি মিঃ মুখার্জ্জী! বাই বাই মিস্‌ মুখার্জ্জী।

রমা খুব নীচু গলায় বল্‌লে, বাই বাই। জ্ঞানবাবু স্তম্ভিতের মত রমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

তিন

এক সপ্তাহের মধ্যেই টেলিফোন কোম্পানীর লোক এসে রাস্তা খুঁড়ে, বাড়ীর দেওয়াল কেটে টেলিফোনের তার বসাতে সুরু করলে। অজিত বল্‌লে, দেখলি দিদি, ওদের সব ব্যবস্থাই আলাদা। আমাদের পাশের বাড়ীতে গগনবাবুরা দু'বছর চেষ্টা করেও ফোন পেলে না, আর মিঃ রয় একবার দেখ্‌, আসামাত্রই—

দিদি বল্‌লে, তোর স্কুটার চড়ার কি হোল?

অজিত বল্‌লে, ও হবে না। বাবার জ্বালায় সাইকেল চড়া শিখতে পাই নি। এখন মিঃ রয় বললেন, সাইকেল চড়া না জানলে স্কুটার শেখা যায় না।

ভাইয়ের কথায় সায় দিয়ে রমা বল্‌লে, সত্যিই ত। বাবার সব সেকেলে আইডিয়া। উনি আমাকে কিছুতেই গান শিখতে দিলেন না, অথচ গান এবং অভিনয় যদি কিছু শেখা থাকত তা হলে এখন আমার কলেজে কি সুবিধে-ই না হোত! আমাদের অপর্ণা মাত্র ডিমনস্‌ট্রেটার হয়ে শুধু ঐ সবের জোরে কত পপুলার হয়ে গেছে। কলেজ-সোশ্যালের ব্যাপারে প্রিন্সিপ্যাল ওর হাতের মুঠোয়। ও যা বলে তাই হয়।

অজিত বল্‌লে, আমি এবার ফটো তোলা শিখব। মিঃ রয় খুব ভাল ফটোগ্রাফার রে। ওঁর সঙ্গে ছোট বড় অনেকগুলো দামী দামী ক্যামেরা আছে, আবার একখানা মুভি ক্যামেরাও আছে।

রমা বল্‌লে, তা ত থাকবেই, রিপোর্টার যে! যেখানে যায় সেখানেই ত ফটো তুলতে হয়।

অজিত বললে, সত্যি ভাই, লোকটা কত জিনিষ জানে। সর্টহ্যাণ্ড জানে, আবার এত সুন্দর টাইপ করে! সেদিন দেখি, ওর ছোট্ট মেশিনে একেবারে ঝড়ের মতন টাইপ করে যাচ্ছে। আবার বল্‌লে, সামনের বুধবার নেহেরুজী যে ময়দানে বক্তৃতা দেবেন, সেই সভায় উনিও যাবেন, সেখানকার সমস্ত ফটো নাকি উনিই নেবেন।

সত্যি? ভারি মজা ত! রমা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তা হলে তুই ওর সঙ্গে ভিড়ে যা না। সামনে বসে নেহেরুজীকে দেখ্‌বি।

হাসি হাসি মুখে অজিত বল্‌লে, আমি বলেছি, উনি রাজীও হয়েছেন। এখন দেখা যাক্‌ কি হয়।

হবে আবার কি, ওঁর সঙ্গে যাবি।

ম্লান হয়ে অজিত বল্‌লে, পাস্‌ চাই যে,—উনি বলেছেন পাস্‌ না পেলে ওঁর সঙ্গে প্রাইভেট হেল্পার হয়ে ওঁর জিনিষপত্র ঘাড়ে করে যেতে হবে। সেটা যেন কি রকম লাগে।

একটু থেমে অজিত বললে, আচ্ছা দিদি, তুই যাবি?

হেল্পার হয়ে? রমা হাসতে হাস্‌তে প্রশ্ন করলে।

না না, তা বলছি না। তুই যদি যাস্‌, তা হলে আমি কাল সকালেই ওঁকে বলে আমাদের নামে দুখানা পাস আনতে বলব। তা হলে আর আমাকে হেল্পার হয়ে বোঝা ঘাড়ে যেতে হবে না।

দূর! উনি যদি পাস্ না দেন তাহলে সে বড় লজ্জার কথা হবে।

জোর দিয়ে অজিত বললে, কিসের লজ্জা, তুই ত আর চাইছিস্ না। আমি ত চাইব, পেলুম ভাল, না পেলুম, নাই পেলুম।

নেহেরুজীর সামনে বসে বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য এবং কলেজে গিয়ে সেই সব গল্প বলার গৌরব রমাকে আকুল করে তুলেছিল। রমা বল্লে, যা ভাল হয় করিস্, সামনে বসার পাস্ পেলে যেতে রাজী আছি।

ময়দানের সভায় সামনের দিকেই ওরা বসেছিল এবং জনতার ছবি তোলবার সময় মিঃ রয় যেন বিশেষভাবে ওদের ভাই-বোনকেই ফোকাস্ করে ছবি তুলেছিল। ষ্টেটস্‌ম্যানের ছাপা ছবি থেকে ওদের বেশ চেনা যাচ্ছিল এবং ষ্টেটস্‌ম্যানের তোলা ফিল্ম থেকে ডকুমেণ্টারী ফিল্ম করে কবে যেন সিনেমায় দেখান' হোল, অজিতের এক সহপাঠী সেই খবর দিয়ে বল্লে, তোকে এবং দিদিকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে রে। ওরা ভাই-বোনে টিকিট কিনে সেই সিনেমা হলে গিয়ে নিজেদের ছবি দেখে নিজেরাই মুগ্ধ হয়ে গেল।

ছবি দেখার মাঝখানে রমা ফিস্‌ফিস্ করে ভাইকে বল্লে, দেখেছিস্ ব্যাপার, ছবি তোলার সময় মিঃ রয় যেন বিশেষ-ভাবে আমাদের দিকেই নজর দিয়েছেন।

অজিত বল্লে, দেবে না? আমি যে ওঁকে অনেক করে বলে দিয়েছিলুম।

তাই বুঝি? ছি-ছি, এ তুই বলতে গেলি কেন?

সব শুনে জ্ঞানবাবু গম্ভীর হয়ে বল্লেন, ওর সঙ্গে মেলা-মেশা করবে না। ও-সব ছেলে ভাল হয় না। নিশ্চয়ই মদ-টদ খায়। স্বভাব চরিত্রেও বোধ হয় ভাল নয়।

অজিত বল্লে, না বাবা, মদ-টদ ঘরে কিছু দেখি নি। লোকটিকে বেশ ভাল বলেই মনে হয়।

জ্ঞানবাবু রূঢ় স্বরে বল্লেন, মদ থাক্, না থাক, ওর সঙ্গে মেলামেশার দরকার কি? ভাড়াটে ভাড়া দেবে, থাকবে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ কি?

নীলিমা ছেলে মেয়ের আড়ালে এক সময় জ্ঞানবাবুকে বললেন, হ্যাঁ গো, তোমার ভাড়াটের পদবী ত রায়, তা ওরা কি? বামুন?

কেন, সে খবরে তোমার কি দরকার?

না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম। যদি ওর কাজ ভাল হয়, উপায় পত্তর—

জামাই করাব ইচ্ছে আছে বুঝি? জ্ঞানবাবু প্রশ্ন করলেন।

আইবুড়ো মেয়ে থাকলে মায়ের মনে এ-রকম কথা উদয় হয়, এতে দোষ কি? গম্ভীরভাবে নীলিমা দেবী উত্তর দিলেন।

হুঁ, হুঙ্কার দিয়ে জ্ঞানবাবু বললেন, অজ্ঞাতকুলশীল ছোক্‌রা, তিনকুলে কেউ আছে কিনা তার ঠিক নেই, তার হাতে মেয়ে দিতে হবে! কি বুদ্ধিই যে ভগবান দিয়েছিল তোমাকে!

নীলিমা দেবী নিরস্ত হলেন। একবার এ কথাও তাঁর মনে এসেছিল যে, হবু-জামাই অজ্ঞাতকুলশীলই থাকে, তারপর খোঁজ-খবর নিয়ে সে প্রথম হয় জ্ঞাতকুলশীল এবং পরে হয় জামাই। কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বললেন না, কারণ দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক স্বামী যে তর্ক পছন্দ করেন না, তা তিনি ভালভাবেই জানতেন।

রবিবার সকালে মিঃ রয় এদের ড্রয়িংরুমে অথবা দেশী ভাষায় বৈঠকখানায় ঢুকে দেখ্‌লে রমা একা বসে খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছে। বল্লে, গুড মর্ণিং।

সুপ্রভাত জানিয়ে রমা বললে, বসুন, বাবা কিন্তু বেরিয়েছেন।

রয় বল্লে, বেরিয়েছেন? তা ঠিক আছে, আমি কিন্তু আপনারই কাছে এসেছি।

সন্দিগ্ধভাবে রমা বলেছিল, আমার কাছে? কি ব্যাপার বলুন ত'।

বিনা ভণিতায় রয় চেয়ারে বসে বল্লে, এখন আমার হাতে বেশ খানিকটা সময় আছে। সেই যে আপনাকে বলেছিলুম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ব, তা এখন যদি বইটা পাওয়া যায়—

আশ্বস্ত হয়ে রমা বলেছিল, ও, হ্যাঁ। তা আপনি ত ছোট বই চান।

হ্যাঁ, খুব বেশী details-এর দরকার নেই, একটা outline পেলেই ভাল হয়।

রমা বল্লে, বসুন।

খবরের কাগজটা ওর কাছে টেবিলটার ওপোর রেখে রমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং ক্ষণ পরে দু'খানা বই-হাতে ঘরে ঢুকে বল্লে, এই দু'খানা পড়ুন, পরে আবার অন্য বই দেব।

থ্যাঙ্কস্। মিঃ রয় বই দু'খানা গ্রহণ করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, এক তরফা কিছুই হয় না, তা ত জানেন ; আপনার এই সাহায্যের বিনিময়ে পূর্ব্বের কথামত আমার এই চাবি আপনি রেখে দিন। টেলিফোনের দরকার হলে ঘর খুলে ফোন করতে পারবেন।

কিন্তু আপনি যখন ফিরবেন, তখন—

ডুপ্লিকেট চাবি আমার আছে, কোন অসুবিধে হবে না। রয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। টেবিলে পড়ে থাকা চাবিটার দিকে দেখতে দেখতে রমা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আচ্ছা লোক ত! চাবিটা এমনই দেয় নি। বই দেওয়ার মূল্যরূপে ফোন ব্যবহার করার অধিকার! তাও আবার বলে কয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে দেওয়া হোল। লোকটা কি? রস-কষ, ভদ্রতা, শালীনতা একটুও কি নেই?

বাজার থেকে ফিরে জ্ঞানবাবু খবরটা শোনা মাত্রই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বল্লেন, লেখাপড়া শিখে তোর এই বুদ্ধি হোল? এ তুই বুঝ্‌লি না যে, ছোক্‌রা চাবিটা কেমন কৌশলে তোর হাতে গছিয়ে দিয়ে গেল। এর পর একদিন যখন বলবে আমার অমুক জিনিষ কিম্বা এত টাকা খোয়া গেছে, তখন কি হবে? এই নিয়ে যদি থানা-পুলিশ হয়, তাহলে প্রথম চুরির দায়ে পড়তে হবে, তারপর হবে সামাজিক অপমান। একটা অজানা-অচেনা ছোকরার ঘরের চাবি, তুই আইবুড়ো মেয়ে তোর কাছেই বা থাকবে কেন?

রমা ঘাড় হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠেছিল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর জ্ঞানবাবু নিদ্রিত। সেই ঘরের মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে নীলিমা দেবীও ঘুমিয়েছেন। জানলাগুলো সমস্তই বন্ধ, দরজা প্রায় ভেজানই আছে, পাখাটা ধীরে ধীরে ঘুরছে। সমস্ত দেখে অজিত এসে রমাকে বল্লে, দিদি, মিঃ রয়ের চাবিটা একবার দিবি, আমার এক বন্ধুকে টেলিফোন করব।

মুখ তুলে রমা বল্লে, কেন? মিছামিছি টেলিফোন করে কি হবে?

মিছামিছি নয় দিদি, ভয়ানক দরকার।

কি দরকার শুনি, রমা বেশ গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

আঃ, তুই বুঝতে পারছিস্ না, মানে—

রমা বল্লে বুঝেছি। হাতের কাছে ফোন যখন রয়েছে তখন টেলিফোন করে ফুটানী মার্‌তে চাইছ।

রাগত-স্বরে অজিত বল্লে, বেশ, তাই যদি হয়, তোর তাতে কি?

মিষ্টি হেসে রমা বল্লে, ঐ চাবি বাবা কালই ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দেবে।

সেই জন্যেই ত আজ একটা ফোন করতে চাইছি, বুঝলি না? অজিত রমার সামনে এগিয়ে এসে রমার হাত ধরে বল্লে, চাবিটা কোথায় রেখেছিস্ বল্ না ভাই। প্লিজ্।

হাসি হাসি মুখে রমা বল্লে, আমি কি জানি। সে চাবি বাবার কাছে।

যাঃ, মিথ্যে কথা বলিস্ নি। বাবা কখনও কোন জিনিষ নেয় না।

মানে?

মানে, বাবা কখনও কোন কাজ নিজে হাতে করে কি? বাবা শুধু চেঁচায়, ধমক দেয়, কাজ ত আমরাই করি। নিশ্চয়ই চাবি তোর কাছে আছে। বল্—সত্যি কিনা?

চোখের ইসারায় রমা টেবিলের টানার দিকে দেখিয়ে দিলে। অজিত টানা খুলে চাবি নিয়ে রমার দিকে চেয়ে বললে, খবদ্দার, বাবা কিম্বা মায়ের কানে একথা যেন না ওঠে, তাহলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন—

আচ্ছা রে আচ্ছা, তুই যা, তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস্।

অজিত পেছনের দরজারদিকে দেখতে দেখতে সামনের দরজা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঘরে ঢুকে দিদির কাঁধে হাত দিয়ে বললে, একলা একলা যেতে ভাল লাগছে না দিদি, তুই চ আমার সঙ্গে যাবি?

আমি কি করব? তুই যা, চোর কোথাকার!

চোর কেন? মিঃ রয় ত ফোন করতে বলে গেছেন অজিত ফোঁস করে উঠল।

ও:, তেজ দেখনা একবার!

অজিত কুঁকড়ে গেল। অনুনয়ের সুরে বল্লে, না দিদি, তুই চল্। তুই একটা ফোন করবি, আমিও একটা ফোন করব।

চাবি পাওয়ার পরেই রমার সকালে মনে হয়েছিল, ওর সঙ্গে এম-এ পাশ করেছে যে সুলেখা এবং যার বিয়ে হয়েছে মাত্র একমাস পূর্ব্বে সে ওকে অনেক করে বলেছিল তার শ্বশুরবাড়ী সিঁথিতে যে কোনদিন দুপুরে ফোন করার জন্য। রমা নিজের কলেজ থেকে ফোন করার কথাও ভেবেছিল কিন্তু কলেজে ফোন আছে প্রিন্সিপ্যালের টেবিলে। অতএব সেই ফোন থেকে সুখ-দুঃখের গল্প করা অসম্ভব। আজ সকালে রমার মনে হয়েছিল দুপুরে সুলেখাকে ফোন করবে, কিন্তু চাবি নিয়ে [illegible] সে মতলব ও ছেড়েই দিয়েছিল। [illegible] কথায় [illegible] সেই [illegible] বাসনা আবার [illegible]।

আগে ফোন করল অজিত। ওধার থেকে খবর এল, সে বাড়ী নেই। ওধারে যে ফোন ধরেছিল সে বোধ হয় জিজ্ঞাসা করেছিল [illegible] ডাকছে [illegible]?

অজিত দিদিকে জিজ্ঞেস করলে, [illegible]? দিদি বললে, [illegible]?

ডায়ালের মাঝখানে লেখা [illegible] নম্বর বললে।

তারপর ডাকলে রমা।

সে তার বান্ধবীকে পেয়ে গেল। বান্ধবী উচ্ছ্বসিত হয়ে নানারূপ গল্প সুরু করলে।

দু'মিনিট পরেই অজিত ব্যস্ত হয়ে উঠল। জানলাগুলো সমস্ত বন্ধ, বেশ গরম বোধ হচ্ছিল। অজিত উঠে পাখা খুললে। পাখাটা বিছানার দিকে ঘোরানো ছিল, অজিত সেটা টেলিফোনে দিদির দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে শেল্‌ফে মিঃ রয়ের কতকগুলো বই যেখানে গাদা করা ছিল সেই দিকে গিয়ে বইগুলো নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগল। দিদির নাম লেখা বাংলা বই দেখে অজিত বললে, দিদি, এটা তোর বই না?

দিদি হাত তুলে থামতে বলে পূর্ব্বের ন্যায় ফোনেই কথা কইতে লাগল।

অজিত দেখলে মিঃ রয়ের শেল্‌ফে নানা জাতীয় বই, কিন্তু গল্পের বই একখানাও নেই। ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, জীবনী, আণবিক শক্তি সম্বন্ধীয় বিবরণী পুস্তক, সমস্ত ছোট ছোট বই, সেই সঙ্গে দুখানা মোটা খাতা। খাতা দুখানায় নানা রকম নোট লেখা, কোনটা শর্টহ্যাণ্ডে, কোনটা সাধারণ হাতের লেখায়। একখানা ফরাসী ভাষার অভিধান, সেই সঙ্গে দু'তিনখানা ফরাসী ভাষার বই। কিন্তু গল্পের বই একখানাও না পেয়ে অজিত কিছু হতাশই হোল। লোকটা কি? এই সমস্ত বই পড়ে!

অনেকক্ষণ পরে দিদির ফোন করা শেষ হোল। ফোনটা নামিয়ে দিদি বল্লে, ও সব ঘাঁটছিস্ কেন রে? ভদ্রলোক যে রকম গোছান' প্রকৃতির, তাতে মনে হয় অন্য কেউ ওঁর জিনিসে হাত দিলে ও এসেই টের পাবে অন্য কেউ হাত দিয়েছে, তখন কি মনে করবে বল ত? ছিঃ, তোর ছেলেমানুষি এখনও গেল না?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে অজিত বল্লে, কত রকমের বই দেখ্ দিদি। ভদ্রলোকের আসল সাব্‌জেক্ট কি বল ত?

রমা বল্লে রিপোর্টারদের কি একটা সাব্‌জেক্ট হলে চলে? [illegible] ওদের জানতে হয়। সেইজন্যেই উনি আমার কাছ থেকে [illegible] বই এনেছেন।

অজিত বল্লে, তাই দেখছি। এই যে তোর বই এখানে রয়েছে!

একখানা? রমা প্রশ্ন করলে।

তাই ত রয়েছে।

রমা বল্লে, সে কি? আমি আজ সকালে ওকে দু'খানা বই দিয়েছি।

অজিত বল্লে, একখানা দেখছি। আর একখানা কোথায় ফেল্লে তা হলে?

রমা বল্লে, কি জানি।

অজিত বল্লে, তা হলে সেখানা গেছে।

রমা বল্লে, না-না, যাবে কি? ওঁর চাল-চাল দেখে মনে হয় জীবনে কখনও কোন জিনিষ হারান নি।

দিদির যেমন কথা! অজিত শেল্‌ফে আরও এটা ওটা হাতড়াতে লাগল।

রমা বল্লে, চল্, আর না। পাখা বন্ধ কর্।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। রমা ফোনে হাত দিয়ে সেটা তুলে অজিতকে বল্লে, নে তুই ধর্, বোধ হয় তোর বন্ধুই ডাকছে।

অজিত দৌড়ে এসে ফোন ধরলে, হ্যালো—

বন্ধুই বটে। সে এইমাত্র ফিরেই ওকে ডাকছে।

টেলিফোনে অজিত বল্লে, এটা আমাদের ভাড়াটের ঘরের ফোন। হঁ্যা, দিদি রয়েছে ঘরে। না, আর কেউ নেই। হঁ্যা, দিদিই প্রথম ধরেছিল। না, ভদ্রলোক অফিসে গেছেন। হঁ্যা ভাই, মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই ফোন পেয়েছেন।

রমা উঠে মিঃ রয়ের ঘরে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। হঠাৎ নীচে স্কুটার থামার শব্দ হোল। অজিত রমার দিকে এবং রমা অজিতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে। ইতিমধ্যে মিঃ রয় এসে দরজার সাম্‌নে দাড়িয়েই বললে, I see, দরজা খোলা দেখে আমি ভাবছিলুম—

ঘরে চোর ঢুকেছে এই ত? রমা উত্তর দিলে। অজিত ইতস্তত করতে লাগল।

টুপিটা মাথা থেকে খুলে টেবিলে রেখে ভদ্রলোক অজিতকে লক্ষ্য করে বললে, Carry on, no worry। তারপর রমার দিকে চেয়ে বললে, আপনার এই বইটা অনেকখানি পড়লুম, বেশ informative বই।

ভাল লাগল?

হঁ্যা, কিন্তু কতকগুলো জায়গায় কেমন সন্দেহ হচ্ছে। আচ্ছা চণ্ডীদাস কি শাক্ত ছিলেন?

রমা বল্লে, তার মানে?

রয় বললে, চণ্ডীদাস নিশ্চয়ই শাক্তের ঘরে জন্মেছিলেন। প্রথম নামে চণ্ডীদাস, দ্বিতীয়তঃ তাঁদের গৃহদেবতা বাশুলী বা বিশালাক্ষী অর্থাৎ শক্তি। তারপর তিনি নিজেও গোবর বিশালাক্ষীর পূজা করেছেন এবং প্রত্যেক কবিতার শেষে লিখেছেন, 'বাশুলী শিরে বন্দি'। এই সমস্ত একসঙ্গে করলে মনে হয় তিনি নিশ্চয়ই শাক্ত ছিলেন।

তাই হয়ত ছিলেন,—রমা উত্তর দিলে।

তা হলে তিনি যে বৈষ্ণব গান লিখেছেন, সেটা নেহাৎ কবিত্বের জন্যই লিখেছেন। আসলে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না।

এ রকম একটা প্রশ্নের জন্য রমা তৈরী ছিল না। চিন্তিতমুখে উত্তর দিলে, কি জানি? হয়ত তাই হবে।

রয় বল্‌লে, ঠিক তাই। রাজা রামমোহন এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ বাইবেলের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু খৃষ্টান হন নি। চণ্ডীদাস বোধহয় ঐ রকমই হবেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের রচনাকে শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব রচনা বলেই গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য হয়ত ধরতে পারেন নি যে, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না, কিম্বা তার বংশানুগত ধর্ম্মমত সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য কোনরকম মাথা ঘামান নি।

রমা বললে, ঐ বইখানা কি আপনার শেষ হয়ে গেল নাকি?

রয় বললে, না শেষ হয় নি। অফিসে নিয়ে গিয়েছিলুম এবং ঘণ্টাখানেক সময় পেয়ে প্রথম দিক থেকে প্রায় শ'খানেক পাতা দেখেছি। আজ সন্ধ্যে পর্য্যন্ত কোন কাজ নেই, তাই বাড়ীতে চলে এলুম। আজ-কালের মধ্যেই বইটা শেষ করে ফেলব।

ফোন ছেড়ে অজিত বললে, এর মধ্যে একশ' পাতা পড়ে ফেললেন? অদ্ভুত ত।

হাসিমুখে রয় বললে, এতে আর কি আছে? ইতিহাস মানে গল্প ত। মনে মনে সেকালের একটা প্রচ্ছদপট তৈরী করে গল্পের মত পড়ে গেলে সমস্ত ছবিটা স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

অজিত বললে, আপনার কি সাবজেক্ট ছিল মিঃ রয়।

আমার? আমি সিনিয়র কেম্ব্রিজ দিয়ে টাইম্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়ায় ঢুকেছিলুম। সেখান থেকে যোগাযোগ করে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তিনবারে জার্নালিজম্ শিখেছিলুম। প্রিণ্টিং টেকনলজিও কিছুটা শিখেছি। কোন বিশেষ সাবজেক্ট আমার স্পেশিয়ালাইজ করা হয় নি।

কিন্তু অদ্ভুত ত? রমা উত্তর দিলে। এক ঘণ্টার মধ্যে আপনি বাংলা ভাষার আদিযুগ থেকে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাসটা তৈরী করে ফেললেন। আচ্ছা, আপনি চর্য্যাপদগুলো পড়লেন?

দেখলুম। এতে আর কি আছে? হিন্দুদের ভয়ে বৌদ্ধরা বাংলা বিহার ছেড়ে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব যে যে দিকে পেরেছিল, পালিয়েছিল। এই এখন যেমন হিন্দুরা পূর্ব্ব-বাংলা ফেলে পশ্চিমবাংলা ও আসামে এবং পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে পূর্ব্ব-পাঞ্জাব তথা সমগ্র ভারতে পালিয়ে

এসেছে ঠিক সেই রকম। মধ্যযুগে দাক্ষিণ য়োরোপে মুসলিম আক্রমণের ফলে বহু লোক আত্মরক্ষার জন্য মধ্য-য়ুরোপে আশ্রয় নিয়েছিল। এতে আর অভিনবত্ব কি আছে? এই পলাতকরা ওদের সঙ্গে এদের বিশ্বাস, এদের সংস্কৃতি, এদের ভাবধারা বহন করে নিয়ে গেছে, সেভাবে মহেঞ্জোদারোর ভাবধারা নেপাল এবং দাক্ষিণাত্যে এসে হাজির হয়েছিল।

রমা বললে, তা বটে, কিন্তু বৌদ্ধদের এই সব রচনা মাত্র নেপালেই পাওয়া গেছে, অন্য কোথাও ত পাওয়া যায় নি।

রয় বললে, যায় নি বললেই যে অস্তিত্ব ছিল না, তা নাও হতে পারে। পূর্ব-ভারতের এই অঞ্চলটা ভিজে-হাওয়ার দেশ। পুঁথিপত্র নষ্ট হবার সম্ভাবনাই সমধিক। তা ছাড়া এই সব অঞ্চলে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে। হয়ত এখানকার পুরাতত্ত্ব, বিশেষতঃ পুঁথিপত্র পরবর্তীকালে নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু নেপালের শুষ্ক ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বিশেষ করে রাজানুগ্রহে ঐ সব পুরাতন পুঁথি নেপাল রাজার পুঁথিশালায় স্থান পেয়ে ঠিক ভাবে রক্ষা পেয়েছিল, তাই আমরা ওগুলোকে ওখানেই পাচ্ছি, অন্যত্র ওগুলো লুপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য আর পাচ্ছি না।

শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সহকারে রয়ের মুখের দিকে দেখতে দেখতে রমা বললে, মিঃ রয়, আপনি কেন এ বিষয়ে গবেষণা করেন না। আপনি ঠিক ডি-ফিল্ পেয়ে যাবেন।

হাসতে হাসতে রয় বললে, এ বিষয়ে ডি-ফিল্ হয়ে কি হবে? এই সব সাবজেক্টের ইউটিলিটি কি?

রমা বললে, এই যে আমাদের এক প্রফেসার মঙ্গল-কাব্যের ওপর গবেষণা করে ডি-ফিল্ হলেন।

রয় বললেন, বুঝলুম, যারা টিচিং লাইনে আছেন তাঁরা ডি-ফিল হয়ে চাকরী-জীবনে উন্নতি করবেন, কিন্তু তা ছাড়া এ সব গবেষণার উপকারিতা কি?

রমা বললে, বাঃ, এর কোন প্রয়োজন নেই? জ্ঞান-চর্চ্চা, শিক্ষা—

রয় বললে, কিছু মনে করবেন না, এ সব গবেষণা হচ্ছে—non-essential এবং improductive।

এ সবের জন্য সময় এবং পয়সা খরচ করাটা নিতান্তই সময় ও পয়সার অপব্যবহার। সৌখীন গবেষণাবিলাস

অমিত বললে, দিদি যে রিসার্চ করছে, দিদির সাব্-জেক্ট তোমার মঙ্গলকাব্য।

রয় বললে, নিশ্চয়ই করবেন। ডি-ফিল্ও পাবেন, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, এতে দেশের কোন্ দুঃখটা ঘুচবে।

রমা বললে, দেশের কোনো দুঃখ হয়ত ঘুচবে না, কিন্তু আমার দেশকে আমি জানতে পারব, এবং পরকে জানাতে পারব। এটাই কি কম লাভ?

রয় চুপ করে গেল। মনে হল যেন সে চেষ্টা করেই নীরব রইল।

অমিত বললে, মিঃ রয়, আপনি কতরকম জানা জানেন?

কাজ চলার মত জানি।

আর কি জানা জানেন?

জানি দু'একটা। যখন যে দেশে গিয়েছি, তখন কাজ চলার মত সেখানকার কিছু কিছু শিখে নিয়েছি। কথা-গুলো বলতে বলতে মিঃ রয় উঠে বিছানাটা ঝেড়ে ঘরের টুকিটাকি কাজ সারতে লাগলেন।

রমা বললে, মিঃ রয়, আপনি একটা 'বয়' রাখেন না কেন, যে এই সব কাজ করবে। তা ছাড়া শুনলাম, আপনি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সব বাটা কাঁচা জিনিষ দিয়ে, বয় থাকলে সে অল্প-স্বল্প রান্নার কাজও করে দিতে পারবে।

হাতের কাজ চালাতে চালাতেই রয় বললে, এ-বিষয়ে আমার আইডিয়া একটু অন্য রকমের। দেখুন মিস্ মুখার্জী, সেকালের ইংরেজ বলেছিল 'plain living', একালের আমি বলতে চাই 'self-living'। অর্থাৎ 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনীপরে'। আমি চাই এমন একটা পন্থায় চলতে যাতে আমার দৈনন্দিন প্রয়োজনে আমার নিজেকে অথবা অন্য কাউকে অযথা পরিশ্রম করতে না হয়। সেই জন্যই এমন সব প্রণালীতে রপ্ত হয়ে গেছি, যার ফলে নিজেও বেশী খাটি না, অপরকেও খাটাবার দরকার বোধ করি না, এবং স্বেচ্ছা-অভ্যাসের ফলে মনেও হয়না যে কোন রকম কৃচ্ছ্র-সাধন করছি, বা বঞ্চিত হচ্ছি।

বিলাত-ফেরত, কৃতিসম্পন্ন আধুনিক যুবকের মুখে এই সব শুনে রমা অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কোন আলোচনা করার পূর্ব্বেই বাড়ী থেকে বাবার গলা শোনা

রমা বললে, আমি উঠি মিঃ রয়, বাবা ডাকছেন।

রয় বললে, ঠিক আছে। কিন্তু মিস্ মুখার্জ্জী, এই বই দুটো শেষ করার পর একদিন ঘণ্টাখানেক আপনার কাছে বসব, কতকগুলো জিনিষ সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার।

সায় দিয়ে রমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যের একটু আগে মিঃ রয় এদের বৈঠকখানার দরজায় এসে পরদার বাইরে থেকে ডাক দিলে, মিস্ মুখার্জ্জী।

জ্ঞানবাবু কাছে ছিলেন। একটু রাগতঃভাবে উত্তর দিলেন, কে?

মিঃ রয় পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকে বললে, গুড ইভনিং প্রফেসার মুখার্জ্জী। এই চাবিটা মিস্ মুখার্জ্জী দুপুরে আমার ঘরের তালায় লাগিয়ে রেখে চলে এসেছিলেন। এটা তাঁকে দিয়ে দেবেন। বলেই চাবিটা টেবিলের ওপোর রেখে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই জ্ঞানবাবু বললেন, মিঃ রয়, ও চাবির কোন দরকার নেই। ও আপনি নিয়ে যান।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রয় বললে, টেলিফোন ব্যবহারের জন্য আমার ঘরের একটা চাবি আমি ওঁর কাছে দিয়ে রেখেছি, এটা সেই চাবি।

টেলিফোন ব্যবহারের দরকার নেই, জ্ঞানবাবু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন।

হাসিমুখে রয় বললে, কখন কোন্ এমার্জেন্সিতে দরকার হয় কেউ বলতে পারে কি, সেইজন্যই—

না, কোন এমার্জেন্সি হবে না, জ্ঞানবাবু গরম হয়ে উত্তর দিলেন।

অ, আচ্ছা। চাবিটা তুলে নিয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে মিঃ রয় একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে স্কুটারে স্টার্ট দিলে।

চার

দিন কয়েক পরে একদিন ভোর বেলায় অজিত ঘুম থেকে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই রমা ওকে ডেকে বলে, অজিত একটা কাজ করতে পারবি?

কি কাজ চোখ্ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে অজিত প্রশ্ন করলে।

রমা বল্লে, পরশু শনিবার আমাদের কলেজের সোস্যাল ফাংসান। প্রিন্সিপ্যাল শুনেছেন যে, মিঃ রয় আমাদের বাড়ীতে থাকেন। প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছা, রিপোর্টার হিসেবে মিঃ রয় আমাদের ফাংসনে গিয়ে ফটো নেন এবং ষ্টেটস্‌ম্যানে রিপোর্ট দেন। এই কথাটা মিঃ রয়কে বলে ওঁকে নিমন্ত্রণ করতে হবে।

অজিত বল্লে, এতে আমি কি করব? তোমার কলেজের ব্যাপার, তুমি বল, তুমি নিমন্ত্রণ কর। আমার নিমন্ত্রণ রয় নেবে কেন?

রমা বিরক্ত হয়ে বল্লে, আমি ওর ঘরে যাব না। বাবা সেদিন যা বকাবকি করেছে তার পরে—

অজিত বল্লে, ঠিক আছে, আমি ওকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি—

রমা বল্লে, তুই ডাক্‌বি? কিন্তু বাবা যদি তখন ঘরে থাকে—

সে তুমি বুঝবে, অজিত গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে।

রমা ইতস্ততঃ করতে লাগল, কোন উত্তর দিলে না।

পূজা আহ্নিক সেরে জ্ঞানবাবু বাইরের ঘরে এসে খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে দু'চার লাইন পড়েই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, নাঃ এই এরা আমাদের শান্তিতে বাস করতে দেবে না। [illegible] জ্বালায় আমাদের সকলকেই নিঃস্ব করে ছাড়বে।

রমা [illegible] কেন বাবা?

এই দেখনা, এই দেখ, আবার সব নতুন নতুন ট্যাক্সের প্রস্তাব করছে. জ্ঞানবাবু খবরের কাগজটা এগিয়ে ধরলেন।

মেয়ে বললে, বাবা এক কাজ কর। তুমি এই সব নিয়ে কাগজে লিখতে সুরু কর। তোমার লেখাগুলো বেরুলে নিশ্চয়েই কাজ হবে।

হতাশ হয়ে জ্ঞানবাবু বল্‌লেন, ছাপবে কে? অনেকদিন আগে আমি কিছু কিছু লেখা কাগজে পাঠিয়েছিলুম, কোন কাগজ ছাপে নি।

রমা সুযোগ পেয়ে গেল। বল্‌লে, বাবা, তুমি এবার মিঃ রয়ের হাত দিয়ে তোমার লেখা পাঠাও, উনি নিলে নিশ্চয়ই ছাপা হবে।

জ্ঞানবাবুর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বল্‌লেন, ছাপবে কি? তা ছাপতে পারে, তুই ঠিক বলেছিস্। ভেতরে লোক না থাকলে কোন কাজ হয় না। তা হলে রয়কে বলে দেখলে হয়।

রমা দেখলে ওষুধ ধরেছে। উৎসাহ দিয়ে বললে, হ্যাঁ বাবা, তুমি ওর সঙ্গে দেখা কর। অজিতকে দিয়ে রয়কে ডেকে পাঠাব? উৎসুক নেত্রে রমা বাবার দিকে চেয়ে রইল। জ্ঞানবাবু ভাবতে লাগলেন!

অজিত এসে রমাকে চুপি-চুপি ডাকলে, দিদি।

কি?

শোন।

রমা অজিতের সঙ্গে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেল।

অজিত বললে, মিঃ রয় বোধ হয় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমাকে বললেন, ওঁর এখন আমার সময় নেই, তবে তুই যদি ওঁর ঘরে যাস তাহলে কথা হতে পারে।

চোখ কুঁচকে রমা বললে তাই বুঝি? ঠিক আছে।

অজিত কোচিং ক্লাসে চলে গেল।

ঘরে এসে রমা ডাকলে বাবা—

কি? অজিত কি বলছিল? জ্ঞানবাবু প্রশ্ন করলেন।

চোখ টিপে রমা বললে ও আমার একখানা বই নিয়ে গেল। সে যাক বাবা তুমি কি এখন মিঃ রয়ের ঘরে যাবে?

এখন?

হ্যাঁ যাও না। আমাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কলেজের ফাংসানে যাবার জন্য ষ্টেটসম্যানের রিপোর্টারকে নিমন্ত্রণ করেছেন; সেই নিমন্ত্রণ পত্রটাও আমার কাছে আছে। সেটাও দিয়ে আসবে, আর তোমার লেখার কথাও বলে আসবে।

নারী এবং অর্থলোভের তুলনায় আত্মপ্রকাশের লোভ কোন অংশে কম নয়। বৃদ্ধ, বিচক্ষণ, হিসেবী জ্ঞানবাবু সেই লোভের বশবর্ত্তী হয়ে চিন্তিত সুরে বললেন, যাব ওর কাছে? তা যাওয়া যায়।

তবে আজই যাও না বাবা। এখন ত উনি ঘরেই আছেন। রমা উৎসাহিত করলে।

নিজের কাপড়টার দিকে চেয়ে দেখে জ্ঞানবাবু বললেন, তা হলে আমার গেঞ্জীটা নিয়ে আয়। আবার সাহেব সুবো মানুষ, ময়লা কাপড় অথবা খালি গায়ে ওর ঘরে গেলে—

রমা দৌড়ে গিয়ে গেঞ্জী নিয়ে এল।

গেঞ্জী গায়ে দিয়ে রমার কলেজের নিমন্ত্রণ কার্ড হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে জ্ঞানবাবু কি ভেবে যেন বললেন, তোর কার্ড নিয়ে তুই চল্-না কেন আমার সঙ্গে, তোদের নেমন্তন্ন আমি করলে কি ভাল দেখায়।

রমা যেন এরই জন্য অপেক্ষা করছিল। উৎসুক হয়ে বললে, যাব? বেশ চল, যাচ্ছি। বাড়ীর ভেতর ঢুকে চটিটা পায়ে গলিয়ে রমা বাবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

রয়ের ঘরে ঢুকে দেখা গেল রয় সেই মাত্র একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে সুরু করেছে। জ্ঞানবাবুকে দেখে মিঃ রয় উঠে দাঁড়িয়ে সেই জ্বলন্ত সিগারেটটা সিগারেটের প্যাকেটের মধ্যে পুরে ফেলে ওদের সুপ্রভাত জানালে।

জ্ঞানবাবু সুপ্রভাতের শিষ্টাচার বিনিময় না করেই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, সিগারেটের আগুন না নিবিয়েই কাগজের প্যাকেটে পুরে ফেললেন, আগুন লাগবে না?

রয় বললে, না, ও আপনা হতেই নিভে যাবে।

কিন্তু যদি—

না, ও আমি অনেকদিন করেছি। কোন ভয় নেই।

কিন্তু ওটা নেভাবার কি দরকার ছিল?

স্মিতহাস্যে রয় বললে, এটা বাংলা দেশ। এখানে সিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলার সময় জুনিয়ারদের পক্ষে যে রীতি মেনে চলতে হয়, সেটা মেনে চলাই উচিত।

তারপর রয় তার একমাত্র চেয়ার ছেড়ে বিছানার দিকে এগিয়ে এসে চেয়ার খানায় রমাকে বসার অনুরোধ জানিয়ে জ্ঞানবাবুকে বিছানায় বসার জন্য আহ্বান জানালে। ওরা তিনজনেই বসল। পেডাষ্টাল পাখাটা ঘুরে ঘুরে সকলকেই হাওয়া দিতে লাগল।

জ্ঞানবাবু রমাকে বললেন, নাও তোমার কাজ সেরে ফেল। বসে নিজেই বলতে সুরু করলেন রমার কলেজের কথা। রমা নিমন্ত্রণ কার্ডখানা রয়ের দিকে এগিয়ে ধরল।

রয় বললে, দেখুন, এ সব ব্যাপারে আমরা অফিসিয়ালী যাই না। ফাংসান হয়ে গেলে একটা রিপোর্ট আমাকে দেবেন, ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। তারপর কার্ডখানা পড়ে রয় বললে ও, শিক্ষামন্ত্রী আসছেন প্রধান অতিথিরূপে, তা হলে দেখি, আমি হয়ত যেতেও পারি, যদি অন্য কোন জরুরী ম্যাটার না থাকে। গেলে ফটো তুলব।

ধন্যবাদ জানিয়ে রমা বল্লে, বাবার একটা কথা আছে। লেটার টু এডিটার কলমে—

সমস্ত শুনে রয় বললে, ওটা ঠিক আমার হাতে নয়। তা ঠিক আছে, আপনি লিখে দেবেন, যিনি ঐ সব কাজ করেন, আমি তাঁর হাতেই লেখাটা দিয়ে দেব।

জ্ঞানবাবু বললেন, একটু ভাল ভাবে বলে-কয়ে দেবেন না হলে ওরা ছাপতে রাজী হয় না। জ্ঞানবাবু কথায় ফুটে উঠল অনুনয়ের সুর।

রয় বললে, প্রফেসার মুখার্জী, আমাদের ওখানে বলা-কওয়ার কোন ফুরসৎ নেই, সব লেখাই আপন আপন মেরিটের ওপোর দাঁড়ায়। আপনি লিখুন, তারপর দেখা যাবে কি হয়।

রয় উঠে দাঁড়িয়ে হাত ঘড়িটা ঘুরিয়ে দেখলে। ইঙ্গিত পেয়ে এরাও উঠতে বাধ্য হোল।

কলেজের ফাংসানে রয় ঠিক সময় মত হাজির হোল। রমা রয়কে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতার পর প্রিন্সিপ্যাল অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের সঙ্গে মন্ত্রীকে জলযোগে আহ্বান জানালেন। সঙ্গে মিঃ রয়ও রইলেন। চা পানান্তে মন্ত্রী মহাশয় প্রস্থান করলেন। এবার মেয়েদের গান বাজনা এবং নাটক অভিনয় সুরু হবে। রমা মিঃ রয়কে থাকবার জন্য অনুরোধ জানালে। রয় মন্ত্রীর পরেই যাবার ব্যবস্থা করছিল, রমার অনুরোধে রয়ে গেল। সোস্যাল ফাংসান আরম্ভ হয়ে গেল।

গান শেষ হবার পর সুরু হোল নাটক।

এক অঙ্কের ছোট একটা হাসির নাটক। নাটকের প্রযোজনায় ছিল ডিমনষ্ট্রেটর অপর্ণা সোম। এক সময় অপর্ণা এসে রমার কানে-কানে কি যেন বল্লে। রমা বল্লে বেশ ত, তুই বল্-না।

অপর্ণা বল্লে, না ভাই, আমি একা যাব না, তুই চল, তোর সঙ্গে আমি থাকব।

রমা ও অপর্ণা দু'জনে এক সঙ্গে মিঃ রয়ের চেয়ারের সামনে এসে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করলে যে, নাটক শেষ হয়ে গেলে যারা এই নাটক অভিনয় করছে তারা এক সঙ্গে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে দর্শকদের সাক্ষাৎ দেবে, সেই সময় একখানা ফটো তুলতে হবে, হাসিমুখে রয় স্বীকার হয়েগেল।

রয়ের কাছ থেকে সরে আসতে আসতে অপর্ণা রমার পিঠে হাত দিয়ে চুপি চুপি বল্লে, বেশ বশম্বদ নায়ক জোগাড় করেছিস্ ত। নেমন্তনটা কবে পাচ্ছি আমরা?

কৃত্রিম অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টে রমা বললে আমার লোভ নেই, তোকে দান করছি, তুই-ই আমাদের নেমন্তন্ন খাওয়াস্।

রিয়েলি? জেলাসি হবে না? অপর্ণা গ্রীনরুমের দিকে চলে গেল।

রমা নিজের খালি চেয়ারটায় এসে বসল।

অভিনয় শেষে ফটো তুলে কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে ভদ্রতা বিনিময় করে রিপোর্টার মিঃ রয় সকলকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলে। অপর্ণা রয়কে ধন্যবাদ দিয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে রয় চলে যাবার পর রমাকে যেন বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলে, তুই গেলিনা, তোর গাড়ি চলে গেল।

কি গাড়ী?

স্কুটার।

বা রে! যাঃ, বলেই রমা অপর্ণার পিঠে এক চড় লাগালে। অপর্ণা হাসতে হাসতে গ্রীনরুমে গিয়ে ঢুকল। কাপড় চোপড় যে যা এনেছিল সব গুছিয়ে গাছিয়ে বিদায় নেবার ব্যবস্থা করতে হবে ত!

পরের দিন রবিবার। সকালে পূজা আহ্নিক সেরে জ্ঞানবাবু মেয়েকে ডেকে বলেন, ওরে, চিঠি একটা লিখেছি তুই শুনবি?

সাগ্রহে রমা বল্লে, দাও না বাবা, দেখি।

জ্ঞানবাবু নিজেই চিঠিটা পড়ে রমাকে শোনালেন।

দীর্ঘ এক চিঠি, লেটার টু এডিটার। রমার যে খুব ভাল লাগল তা নয়, কিন্তু মনের কথা গোপন রেখে সে ঐ চিঠিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বল্লে, আজই দিয়ে দাও বাবা। আজ রবিবার, ভদ্রলোক ঘরে আছে, তুমি নিজে গিয়ে দিয়ে এস।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, ওরে আমার হাতের লেখাটা তেমন সুবিধের নয়, তুই এটা ভালভাবে কপি করে দে।

রমা বুদ্ধিমতী, বল্লে, না বাবা, তোমার লেখাটাই দাও, ভদ্রলোকের টাইপ কল আছে, টাইপ করে অফিসে দিয়ে দেবে।

এতটা কষ্ট করবে? জ্ঞানবাবু সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করলেন।

নিশ্চয়ই করবে, ভদ্রলোক খুব ওবলাই-জিং। জানো বাবা, কাল আমাদের কলেজে গিয়ে উনি খুব ভাল ব্যবহার করেছেন।

ও, তাহলে এই কাগজ খানাই দিয়ে দি', কি বলিস্?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ঠিক হবে। রমা সায় দিলে। জ্ঞানবাবু বল্লেন, তা হলে এখনই যাওয়া যাক্ আর তুইও সঙ্গে চল, কালকের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে চিঠিটা টাইপ করতে বলে দিস।

ওরা দুজনে মিলে রয়ের ঘরে এসে ঢুকল।

রয় চেয়ারে বসে আপন মনে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ছিল। ওরা ঘরে ঢুকতেই সুপ্রভাত জানিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং চেয়ার ছেড়ে বিছানায় বসল। জ্ঞানবাবু রয়ের পাশে বিছানায় বসলেন এবং রমা চেয়ারে বসল।

জ্ঞানবাবু রমাকে লক্ষ্য করে বল্লেন, রমা, আমাদের যা বাড়তি চেয়ার আছে তাই থেকে দু' একখানা এ ঘরে দিয়ে দিস, মিঃ রয়ের ঘরে লোকজন আসে ত, বসার সুবিধে হবে।

বাধা দিয়ে রয় বললে, কি দরকার, এই ত বেশ চলে যাচ্ছে। বেশী জিনিষ নিয়ে—

জ্ঞানবাবু বললেন, না না, তাতে কি হয়েছে—

রয় বললে, মিস্ মুখার্জ্জী, আপনাদের কলেজ কি আজ থেকেই ছুটী হয়ে গেল?

রমা বল্লে, হাঁ, তবে কাল সোমবার আমাদের একবার যেতে হবে। ক্লাশ হবে না, কিন্তু আমরা একবার সব যাব, তারপর আমার ভেকেশন।

এইটে আপনাদের মস্ত এ্যাড্‌ভ. এড়ুকেশন লাইনে ছুটীটা—

জ্ঞানবাবু বল্লেন, তা ঠিক—

রয় বল্লে, আপনারও ত কলেজ বন্ধ?

জ্ঞানবাবু বল্লেন, হাঁ, আমাদের গত সোমবার থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার সিট পড়ার জন্য এবছর এত তাড়াতাড়ি গরমের ছুটী দেওয়া হয়ে গেল।

খুলবে? রয় প্রশ্ন করলে।

আমার পনরই জুন, রমার পাঁচিশে জুন, জ্ঞানবাবু উত্তর দিলেন।

ওঃ, লম্বা ছুটী। কোথাও আউটিং করবেন না কি?

জ্ঞানবাবু বল্লেন, না, যাব আর কোথায়? ট্রেনের যা ভিড়, তারপর বাড়ীতেই বা কে থাকবে?

রমা বল্লে, গরমের ছুটীতে বাবার কোথাও যাওয়া হয় না, ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার খাতা দেখা থাকে, তারপরই কলেজের ছেলে ভর্ত্তির হাঙ্গাম, গরমের ছুটীতে বাবা সময় পান না।

জ্ঞানবাবু উসখুস করতে লাগলেন। রমা বল্লেন, মিঃ রয়, বাবার সেই লেটার টু এডিটরটা লেখা হয়ে গেছে।

রয় বল্লে, নাইস্, দিন দেখি।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, এই যে। কাগজ বার করে বল্লেন পড়ে শুনিয়ে দি'।

রয় বল্লে, শিওর।

জ্ঞানবাবু পড়তে সুরু করলেন। পড়া শেষ করে কাগজখানা এগিয়ে ধরে বল্লেন, ঠিক হয়েছে ত?

রয় বল্লে নিশ্চয়, তবে একটু যদি রিটাচ করা হয়, তা হলে আপনার আপত্তি নেই ত?

না না, আপত্তি কিসের? মূল বক্তব্য বজায় রেখে—

রয় বল্লে, ঠিক আছে। কাগজখানা রয় হাতে নিয়ে আগাগোড়া দেখতে লাগল।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে, না হলে টাইপ করিয়ে দিতে পারতুম।

রয় বল্লে, সে আমি করে নেব, অসুবিধে হবে না, বলেই কাগজখানা টেবিলে চাপা দিয়ে রাখলে। রমাকে বললে, মিস্ মুখার্জী, আপনার বই দুখানা শেষ করে ফেলেছি। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চাই।

রমা বল্লে, বলুন, কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার বিদ্যের—

কি যে বলেন, এটা আপনার সাবজেক্ট, আমি একেবারে নতুন, রয় বিনয় প্রকাশ করলে।

রমা বল্লে আপনার যা সূক্ষ্মদৃষ্টি! তা বলুন, আমার ক্ষমতায় থাকলে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব।

এখন নয়, এখনও আমি ঠিক তৈরী হয় নি। আচ্ছা, আজ বিকেলে আপনার সময় হবে?

হবে, রমা উত্তর দিলে।

তাহলে আজ বিকেলে তিনটের সময় আপনার ঘরে যাব এবং চারটে পর্য্যন্ত আপনার কাছে ওগুলো বুঝে নেব। অসুবিধে হবে না?

না না, কোন অসুবিধে নেই, আপনি আসবেন।

জ্ঞানবাবু বললেন, মিঃ রয়, আমি তাহলে আর একটু বলব। আজ বিকেলে আপনি আমাদের ওখানেই চা-পান করবেন, কেমন?

হাসিমুখে রয় বললে, ধন্যবাদ। কিন্তু প্রফেসার মুখার্জ্জী, বিকেল চারটের সময় আমাকে উঠতেই হবে। পাঁচটার সময় আমাকে একটা ফাংসান এটেণ্ড করতে হবে।

ঠিক আছে।

পাঁচ

দিদি, দিদি—

ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজটা হাতে নিয়ে অজিত উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢুকে বাড়ীর ভেতর দিদির সন্ধানে ছুটে গেল।

রমা সেইমাত্র মুখ ধুয়ে গামছায় হাত মুচছে,—কিরে, কি ব্যাপার?

বাবার সেই চিঠিটা বেরিয়েছে, এই দেখ। অজিত খবরের কাগজটা দিদির দিকে এগিয়ে ধরলে।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ভাইবোন প্রত্যহ সকালে কাগজ এলে প্রথমেই লেটার টু এডিটর কলমটা আগে দেখে। আজ সকালে কাগজওয়ালা এইমাত্র কাগজটা দিয়ে গেছে।

রমা এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়ে ফেললে। বাবার নামটা তলায় রয়েছে বটে কিন্তু বাবার লেখা সে যা শুনেছিল তার সবটাই বদলানো হয়ে গেছে। বাবা লিখেছিল প্রায় দু'পাতা, এ চিঠিখানা হাতে লিখলে আধ পাতার বেশী হবে না, কিন্তু বক্তব্য সবটাই ঠিক আছে। ভাষাটাও অনেক সহজ এবং সরল হয়ে গেছে। কোন মত প্রকাশ না করেই রমা বললে, চল্, বাবাকে দেখাই।

জ্ঞানবাবু চিঠিখানা পড়ে বললেন, হুঁ, অনেক বাদ দিয়েছে দেখ্‌ছি।

কিন্তু তোমার কথাগুলো সবই আছে ত? রমা প্রশ্ন করলে।

তা আছে, কিন্তু ভাষাটা বড় জোরালো হয়েছে।

রমা কোন উত্তর দিলে না।

জ্ঞানবাবু নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার সুরে বললেন, যাক্ ছেপেছে এই ঢের।

রমা বল্লে, বাবা, এবার থেকে মাঝে মাঝে তুমি এই ভাবে লিখতে সুরু কর।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, তা মন্দ নয়, লিখলেও হয়। ছোক্‌রা যতদিন আছে—

রমা বলে, এবার কি নিয়ে লিখবে বাবা?

জ্ঞানবাবু বল্লেন, লেখার জিনিষ অনেক আছে। দেশে সমস্যা ত কম নেই, সব ব্যাপারেই ভালভাবে লেখা উচিত।

রমা বলে, ভদ্রলোককে আজ একটা ধন্যবাদ দেওয়া ত দরকার।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, তা দরকার। আর—হ্যাঁ—একটা কথা কাল থেকে মনে হচ্ছে,—জ্ঞানবাবু থেমে গেলেন।

কি বাবা?

জ্ঞানবাবু বল্লেন, গত কালই দরকার হয়েছিল। আজ দুপুরে—

কি বাবা?

আজ দুপুরে ইউনিভার্সিটিতে একটা ফোন করলে হয়। সামান্য একটা বিষয় জানতে হবে, সেটা ফোনেই হয়, না হলে আবার যেতে হবে, সে ত আবার দু'ঘণ্টার ধাক্কা!

মুখ টিপে হেসে রমা বল্লে, ফোনই করবে, অসুবিধে কি আছে?

কিন্তু দুপুরে ত রায় ঘরে থাকে না, চিন্তিত মুখে জ্ঞানবাবু উত্তর দিলেন।

রমা বল্লে, বাবা, এক কাজ কর। আজ সকালে আর একটু পরে রয়ের ঘরে গিয়ে তাকে এই লেখা প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোনের কথা বল। বল্লেই ভদ্রলোক ব্যবস্থা করে দেবেন।

তাই বলি! এঁ্যা, কি বলিস্, জ্ঞানবাবু যেন আপন মনেই কথাগুলো বল্লেন।

এর পর জ্ঞানবাবু নিজে হাতে করেই রয়ের ঘরের সেই চাবিটা এনে রমার কাছে রাখতে দিলেন, যে চাবি অত্যন্ত রাগতঃ ভাবে কিছু দিন আগে ফিরে দিয়েছিলেন। টেবিলের টানার মধ্যে রমা সেই চাবি রেখে দিলে।

দুদিন পরেই এক দুপুরে অপর্ণা সোম এসে হাজির। বাইরের ঘরে দুই বান্ধবী এক সঙ্গে বসে অনেক গল্প-গুজব

করার পরে অপর্ণা কথায় কথায় বল্লে, তোর নায়কের খবর কি রে?

ভেতরের দরজার দিকে সভীত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রমা বল্লে,ওসব ইয়াকি বাড়ীতে করিস্ নি,কেউ শুনলে শেষে—

কি আর হবে?

না ভাই, ওসব কি কথা! অন্য কথা নেই?

অপর্ণা বল্লে, ঠিক আছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিবি?

আলাপ ত হয়েছে। আবার কি আলাপ চাস্?

ও ঐ কলেজে ভিড়ের ভেতর আলাপ কিছু নয়। ওর ঘরে গিয়ে আলাপ করব, আর—

আর কি? প্রপোজ করবি?

হ্যাঁ, প্রপোজই করব। তবে তুই যা মনে করছিস্ তা নয়। অন্য প্রপোজ—

কি রকম? রমা উৎসাহিত হয়ে উঠল।

অপর্ণা বল্লে, ব্যাপার কি জানিস, আমাদের ঐ যে 'শোভনা' বলে কাগজটা আছে, ঐ কাগজের পক্ষ থেকে আমরা পঁচিশে বৈশাখ করছি, সেই উৎসবে ওঁকে নিমন্ত্রণ করব। জানিস ত, কাগজের লোক হাতে থাকা দরকার। উনি যদি সেইদিন যান—

সে গুড়ে বালি! উনি ঐ সব উৎসবে যেতে চান না। আমাদের কলেজের ফাংসানেও উনি প্রথমে যেতে চান নি, শেষে মিনিষ্টার আসছেন শুনে তবে যেতে রাজী হয়েছিলেন।

অপর্ণা হাসতে হাসতে বললে, এখানেও মিনিষ্টার আসবে রে, আমরা যা তা নই। এখানে কলেজের চেয়েও বড় উৎসব হবে, হাইকোর্টের জজ আমাদের প্রেসিডেণ্ট, তিনিই পঁচিশে বৈশাখের সভাপতিত্ব করবেন এবং সেণ্টারের শিক্ষামন্ত্রী ঐ দিন প্রধান অতিথি হয়ে ভাষণ দেবেন। অপর্ণা সোম যা করে খুব জাঁকজমক করেই করে, ছ্যাবলামি করে না।

রমা বললে, ওরে বাবা, তুই বাঘা-ভালুকো দিয়ে পঁচিশে বৈশাখ করবি? তা হলে ত বিরাট ব্যাপার!

অপর্ণা বললে, নিশ্চয়, তবে বাঘ-ভালুক নয়, আমরা অহিংস, জোড়া বলদ দিয়ে উৎসব করব। তা হলে তুই ওর ঘরে যাবি ত? নেমন্তন্ন করতে?

এখন কোথায়? রমা বিস্মিত হয়ে বললে, এ সময় কি বাড়ী থাকে! সকালে ছাড়া ওঁর দেখা পাওয়া যায় না।

অন্যদিন বাড়ীতে না থাকতে পারে, কিন্তু আজ বেলা তিনটের সময় থাকবেন এবং আমার জন্যই থাকবেন।

কি রকম? রমা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে।

অপর্ণা বললে, ষ্টেটস্‌ম্যান অফিসে ফোন করে টাইম এনগেজ করে তবে এসেছি, কোন ভয় নেই। তোকেও জানাব বলে ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীর ফোনে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করলুম, কিন্তু ফোন বেজেই গেল, কেউ ধরলে না।

আমি কি ওঁর ঘরে থাকি যে, ফোন বাজলেই ধরব? তুই কি ভাবিস্ বল্ ত?

দু'জনে আরও কিছুক্ষণ গল্প করতে করতে বাইরে স্কুটারের শব্দ পাওয়া গেল। অপর্ণা হাত-ঘড়ি দেখ্‌লে।

রমা বললে, ঐ এসেছেন। কটা বাজল রে?

পৌনে তিনটে। আর পনের মিনিট পরে যাব, কি বলিস, অপর্ণা উত্তর দিলে।

রমা বল্‌লে, তুই বোস্, আমি কাপড়টা বদলে আসি।

অপর্ণা বললে, হ্যাঁ, অভিসারিকার বেশ ধারণ করে—

যাঃ, রমা বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

রয়ের ঘরের খোলা দরজায় এসে রমা বাইরে থেকে বললে, আস্‌তে পারি?

আসুন-আসুন,—মিঃ রয় দরজার কাছে উঠে এল।

নমস্কার, অপর্ণা দু'হাত তুলে নমস্কার করলে।

নমস্কার, আসুন।

ঘরে ঢুকে রয় বললে, গরীবের ঘরে দেখতেই পাচ্ছেন, একখানি মাত্র চেয়ার। অতএব আপনারা ঐ বিছানায় বসুন—

ধন্যবাদ মিঃ রয়, চিনতে পারলেন ত? অপর্ণা বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

রমা ও অপর্ণা বিছানায় বসল। মিঃ রয় চেয়ারে বস্‌তে বসতে বল্লে, নিশ্চয়, আপনাকে ত কলেজে দেখেছি।

আর একে চেনেন? রমাকে দেখিয়ে অপর্ণা দুষ্টামির হাসি হেসে প্রশ্ন করলে।

রয় বললে, বলেন কি? ওঁকে চিনব না, উনি যে আমার শিক্ষয়িত্রী।

কি রকম? অপর্ণা প্রশ্ন করলে।

বাঃ, তা জানেন না, ওঁর কাছে আমি বাংলা শিখ্‌ছি, রয় উত্তর দিলে।

তাই বুঝি! রমার দিকে চেয়ে অপর্ণা বললে, কই একথা ত আমাকে বলিস্ নি যে, এমন একটি কৃতী ছাত্র তুই জোগাড় করেছিস্।

যাঃ, রমা সলজ্জভাবে অপর্ণাকে বাধা দিয়ে বললে, তোর কাজের কথা সেরে নে—

রয় বললে, মিস্ মুখার্জ্জী, আপনার বান্ধবীর নামটা কিন্তু আমি—

অপর্ণা সোম, অপর্ণাই উত্তর দিলে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মিস্ সোম। তা বলুন মিস্ সোম, আপনায় কি কাজে আমি লাগতে পারি বলুন।

অপর্ণা বললে, আমাদের শোভনা পত্রিকাটার কথা আপনাকে ফোনে বলেছিলুম—

হ্যাঁ, মনে আছে, রয় উত্তর দিলে।

সেই পত্রিকার পক্ষ থেকে—

অপর্ণা পঁচিশে বৈশাখের জন্য রয়কে নিমন্ত্রণ জানালে এবং আরও বললে, মিঃ রয়, আপনাকে ঐ কাগজে লেখা দিতে হবে।

লেখা? মিস্ সোম, আমরা রিপোর্টার, লিখি বটে অনেক, কিন্তু সে সব হচ্ছে সংবাদ, সাহিত্য নয়, মিঃ রয় উত্তর দিলে।

সোম বললে, যিনি সংবাদ-সাহিত্য পরিবেশন করেন, তিনি রস-সাহিত্যও সৃষ্টি করতে পারেন। যে ভাত রান্না করে, সে দুধও জাল দিতে পারে।

রয় বললেন, ব্রিলিয়ান্ট, আপনার উপমা অতুলনীয়, কিন্তু I konw my limitaions।

তা ছাড়া আর একটা কথা, সাহিত্য সম্বন্ধে আমার আইডিয়া যে কারুর সঙ্গে মেলে না, সেটা আমি যেমন জানি, তেমন আর কেউ জানে না।

রমা বল্লে, কি রকম? আপনার আইডিয়াটা কি শুনি।

রয় বল্লে, শুনবেন? শুনুন; শুনে কিন্তু এখনই কোন মত দেবেন না। দু'দিন ভেবে পরে আপনার মতামত জানাবেন।

রমা বল্লে—বলুন।

রয় বল্লে, বিশ্লেষণ করে দেখুন, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প সর্ব্বত্রই আমরা একটা থেলো রোমান্সের আবহাওয়া সৃষ্টি করে থাকি। এক জোড়া ছেলে মেয়ের মানসিক লুকোচুরি অথবা একাধিক ছেলে ও একটি মেয়ে কিম্বা একাধিক মেয়ে ও একটি ছেলের প্রণয়-প্রতিযোগিতা নিয়ে রসালো এবং অনেক সময় কুৎসিত কাহিনী রচনা করি, যেটা কিনা দেশী ও বিদেশী যাবতীয় গল্প-সাহিত্যের বর্ণিত বিভিন্ন কাহিনীগুলির পারমিউটেশন কম্বিনেশন মাত্র। তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় ওগুলো সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং অবাস্তব। সেই সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক আদান প্রদান এগুলোর সম্বন্ধে এমন একটা নীরবতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এমনই ঘৃণা বা অবজ্ঞা ফুটে থাকে যে, এই শ্রেণীর সাহিত্যপাঠের ফলে আমাদের দেশের তরুণ পাঠকরা সুস্থ মানুষ না হয়ে অলস, ভাবপ্রবণ ও অপদার্থ হয়ে পড়ে।

রমা বল্লে, তা হলে আপনার মতে গল্প উপন্যাস বাদ দিয়ে অর্থনীতি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ অথবা কলকারখানার হিসাব এবং যন্ত্রপাতির নক্সা ছাপিয়ে মাসিক পত্রিকাগুলো বার করতে হবে।

রয় এই শ্লেষ বা ব্যঙ্গকে উপেক্ষা করে গম্ভীর ভাবে বল্লে, মোটেই না, সে কাজ যে সমস্ত টেক্‌নিক্যাল পত্রিকায় হয়ে থাকে সেখানেই হোক। আমার মতে গল্পউপন্যাসের অন্তর্নিহিত ভাবধারায় বাস্তব ও জাগতিক উন্নতির প্রেরণা থাকুক, যার ফলে আমাদের তরুণপাঠক সমাজ রোমান্স করার জন্য চারিদিকে ছোঁক ছোঁক করে না বেড়ায়। চাঁদের আলো, মলয় বাতাস এবং চোখের জলের দালালী করে নিজেদের এবং গোটা জাতির মেরুদণ্ড দুর্ব্বল করে না ফেলে নিজেরা অপদার্থ না হয়ে, দুনিয়ায় কৃতী যারা তাদের অভিশাপ না দিয়ে, উড়ুক্কু ও বাউণ্ডুলের মত ভাবরাজ্যে না ঘুরে, ধুলোমাটির পৃথিবীতে শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে কর্ম্মী ও ক্ষমতাশালী হবার প্রেরণা লাভ করে।

রয়ের বক্তৃতা শেষ হতেই অপর্ণা বল্লে, চমৎকার, এই জন্যই ত আপনাকে লিখ্‌তে অনুরোধ করছি। আপনি এই নতুন সাহিত্যের অগ্রদূত হয়ে শোভনা কাগজকে আরও শোভন করুন, বাংলার লেখকসমাজকে নতুন পথ

দেখিয়ে নিয়ে চলুন, আপনি হোন নব-সাহিত্যের পথিকৃৎ।

স্মিতহাস্যে রয় বল্লে, ধন্যবাদ মিস্ সোম, আপনার নির্দেশ পালন করতে পারলে খুবই সুখী হতুম, কিন্তু ঐ গুরুদায়িত্ব বহন করার মতো বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কলমের জোর আমার নেই। এতএব ইচ্ছা থাকলেও আমি অপারগ।

কিন্তু অপর্ণা নাছোড়বান্দা। অন্তরঙ্গের দাবী নিয়ে সে বল্লে, ঐ সব পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ছাড়ছি না মিঃ রয়, লেখা আপনাকে দিতেই হবে নতুন যুগের লেখা এবং সেই ব্যাপারে নিয়মিত তাগিদ দেওয়ার জন্য আমি আপনার শিক্ষয়িত্রীকে ভার দিয়ে যাব। তাঁর ধমক যদি আপনি উপেক্ষা করেন—

মাই গড্, তাহলে কি হবে? রয় যেন ভীত হয়ে প্রশ্ন করলে।

হবে আর কি! মিস্ মুখার্জ্জী বাইরে থেকে আপনার ঘরে চাবি লাগিয়ে আটকে রাখবে। লেখা না দেওয়া পর্য্যন্ত দরজা খোলা পাবেন না। বলেই অপর্ণা হাস্‌তে লাগল।

রমা গম্ভীর ভাবে বললে, বাজে বকিস্ নি, কাজের কথা সেরে নে।

এটা কি কাজের কথা নয়? অপর্ণা গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলে।

ডায়রীটা খুলে রয় বললে, পঁচিশে বৈশাখ অর্থাৎ ৮ই মে মানে সামনের শনিবার, ঠিক আছে। মিঃ সেন কলকাতায় আসছেন ৬ই মে, ওঁর সঙ্গে অনেকগুলো জায়গায় আমাকে ঘুরতে হবে, অবশ্য আপনাদেরটা এখনও আমার প্রোগ্রামে আসে নি, তবে যদি আসে তাহলে আমি নিশ্চয়ই যাব। কারণ মিঃ সেনের সঙ্গেই আমাকে ঐ কদিন থাকতে হবে। ৯ই মে সকালের প্লেনে উনি দিল্লী যাবেন।

যাক্, তা হলে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত রইলুম, অপর্ণা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

প্রোভাইডেড্, রয় বল্লে, প্রোভাইডেড্ এডুকেশন্ মিনিষ্টার আপনাদের ফাংশানে যান।

উনি যাবেন, অপর্ণা জোর দিয়ে বল্লে।

রয় বল্‌লে ভেরি গুড, কিন্তু আমি যেন শুনছিলুম, ঐ দিন উনি বিশ্বভারতীতে যাবেন। অবশ্য সঠিক প্রোগ্রাম এখনও পাই নি।

তাই নাকি? তা হলে ত আপনি ভাবিয়ে তুললেন, অপর্ণা বিচলিত হয়ে উঠল।

শুক্রবার সকালের কাগজে এডুকেশন মিনিষ্টারের টুর প্রোগ্রাম ছাপা হয়েছিল। তাতে দেখা গেল, তিনি শুক্রবার সন্ধ্যায় বিমানযোগে কলকাতা থেকে পানাগড়ে গিয়ে সেখান থেকে মোটরে বিশ্বভারতী যাবেন এবং ২৫শে বৈশাখ শনিবার সকালে বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করে শনিবার দুপুরে বিমানযোগে কলকাতায় ফিরে বিকেলে তিনটার সময় য়ুনিভারসিটিতে যাবেন, চারটের সময় চেম্বার অফ্ কমার্সের অ্যাট্ হোম্ পার্টিতে যোগ দেবেন, পাঁচটার সময় সায়েন্স কলেজে ফলিত বিজ্ঞানের গবেষক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রদের সভায় ভাষণ দান করবেন, ছয়টার সময় শোভনা কাগজের পঁচিশে বৈশাখে যোগ দেবেন এবং তারপর সাতটার সময় আরও যেন কোথায় কি কি করবেন। শোভনা কাগজের খবরটা ছাপার অক্ষরে দেখে রমা মনে মনে অপর্ণাকে তারিফ করলে। ধুরন্ধর মেয়ে বাবা, এত ভিড়ের ভেতর থেকেও এডুকেশন মিনিষ্টারকে এক ঘণ্টার জন্য বুক্ করে ফেলেছে।

মহাজাতি সদনের ঘরে শোভনা পত্রিকার রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে। রমা ও অজিত দুজনেই নিমন্ত্রিত অতিথি। সাড়ে পাঁচটার পূর্ব্ব থেকেই ওরা উপস্থিত। ছ'টা দশ নাগাদ শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ী এল। পেছনেই press লেখা মোটরে মিঃ রয়। আজ আর স্কুটার নেই। অপর্ণা মন্ত্রী মহাশয়কে খাতির করে এনে ডায়াসে বসালে। মিঃ রয় সস্মিত দৃষ্টিতে অপর্ণা, রমা, অজিত সকলকে নীরবে শুভেচ্ছা জানিয়ে হলে ঢুকে press লেখা চেয়ারের একখানায় বসল। অনুষ্ঠান সুরু হয়ে গেল।

সাতটার সময় মন্ত্রীমহাশয় সবিনয়ে অপর্ণার জলযোগের নিমন্ত্রণ গ্রহণে দৈহিক অসামর্থ্য জানিয়ে শুধু মাত্র সৌজন্য রক্ষার জন্য কোলা-কোলার নল-লাগানো বোতলে দু'তিন চুমুক টেনে নিজের গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন, রয় পিছনে ষ্টেটস্‌ম্যানের গাড়ীতে উঠল। হারিকেন টুরের অতিথিদের

বিদায় দিয়ে শোভনা পত্রিকার নাচ গান রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত চলেছিল।

দু'দিন পরে ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে মন্ত্রীমহাশয়ের কলিকাতা ভ্রমণের বিস্তারিত সংবাদে বিশ্বভারতীর ছবির সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, চেম্বার অফ্ কমার্স এবং শোভনার ছবি সব একই সঙ্গে শেষ পাতায় ছাপা হয়েছিল। ছবি দেখে রমা মনে মনে কেমন একটা চাপা জ্বালা বোধ করলে। মাইকের সামনে মিনিষ্টার এবং বসে থাকা জজ সাহেবের পাশে দাঁড়ানো অপর্ণার ছবিটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওদের কারু-রই ছবি নেই। থাকবার অবশ্য কথাও নয়, কারণ ওরা ছিল নিচের চেয়ারে, এবং ছবি নেওয়া হয়েছে ডায়াসের, কিন্তু কোন যুক্তিতেই মন ঠিক সায় দিতে চায় না। রমার পরিচয়ে অপর্ণা হোল পরিচিত, তারপর রমাই কিনা বাদ পড়ল! যাক্, বেশী ভেবে লাভ কি?

কয়েকদিন পরে এক সকালে রয় এসে বাইরে থেকে ডাক দিলে, মিঃ মুখার্জ্জী—

জ্ঞানবাবু বাইরের ঘরে বসে কাগজ পড়ছিলেন, রমাও ঘরে বসেছিল। জ্ঞানবাবু ডাক দিলেন, আসুন মিঃ রয়।

রয় ঘরে ঢুকেই বল্লে, গুড্ মর্ণিং, গুড্ মর্ণিং মিস্ মুখার্জ্জী। আমি অজিতবাবুর খোঁজ করছিলুম!

সুপ্রভাত জানিয়ে জ্ঞানবাবু বল্লেন, বসুন। তারপর অজিতকে কি দরকার? সে কাল তার মাসির বাড়ী গেছে, আজ বিকেলে বোধ হয় ফিরবে।

I see, রয় উত্তর দিলে।

কি দরকার? জ্ঞানবাবু প্রশ্ন করলেন।

রয় বল্লে, আমার টেলিফোনটা আজ সকালে দেখছি একেবারে dead। কি হয়েছে জানি না, আমি অফিসে গিয়েই টেলিফোনটা সারাবার জন্য বলব। টেলিফোন অফিস থেকে মেকানিকরা এলে দুপুরে ঘরটা খুলে দিতে হবে, সেই জন্য অজিতবাবুকে ঘরটা খুলে দেবার জন্য request করতে এসেছিলুম।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, ঠিক আছে। অজিত নেই বটে, কিন্তু আমরা ত আছি। ওরা মেরামত করতে এলে—

থ্যাঙ্কস্, মেনি থ্যাঙ্কস্, রয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল, একটা চাবি ত আপনাদের কাছেই আছে।

জ্ঞানবাবু রমার দিকে চেয়ে দেখলেন। রমা বল্লে, হ্যাঁ আছে।

রয় উঠতে যাচ্ছিল, জ্ঞানবাবু বল্লেন, আপনার কি খুব তাড়া আছে? বসুন না একটু।

তাড়া তেমন নেই। রয় আবার চেয়ারে বসল।

জ্ঞানবাবু বল্লে, মিঃ রয়, কদিন থেকে আপনাকে একটা কথা বলব বলে মনে করছিলুম। মানে, আমাদের এই অঞ্চলটা, এখন ত বেশ এরিষ্টোক্রাটিক্ লোকালিটি হয়ে উঠেছে, কিন্তু এখানে সব চেয়ে বেশী ঝামেলা হয়েছে ঐ রসুই কারখানা, ধোঁয়া, শব্দ, নানা ঝামেলা, তার ওপোর এই নলিনীরঞ্জন এভিনিউ-এ বালির লরী। ভোর থেকে ত্রিশ চল্লিশখানা বালি ভর্ত্তি লরী এমন শব্দ সাড়া করে যে, সকালের ঘুম একেবারে মাটী! আপনারও ত অসুবিধে হয়। এ সম্বন্ধে কাগজে লিখে—

রয় বল্লে, এগুলো বন্ধ করতে বল্‌ছেন?

হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয়, জ্ঞানবাবু উত্তর দিলেন।

রয় বল্লে, এ ঠিক কার্য্যকরী হবে না। রসুই কারখানা এখানে অনেকদিন ধরে রয়েছে, ওদের সমস্ত কারখানা উঠিয়ে নিতে বলা যুক্তিযুক্ত হবে না। আর বালির লরী? এগুলো ত এখনও দরকার। এখন এখানে চতুর্দ্দিকেই বাড়ী তৈরী হচ্চে, কাজেই বালির লরী আস্‌ছে। বাড়ী তৈরীর ভিড় কমে গেলে লরীওয়ালারা নিজেরাই এখান থেকে চলে যাবে।

কিন্তু ততদিন পর্য্যন্ত এই সব কি সহ্য করতে হবে? জ্ঞানবাবু প্রশ্ন করলেন।

সহ্য করা আর কি বলুন? এতে কি খুব অসুবিধে হয়? রয় উত্তর দিলে।

হয় না? আপনার কি মনে হয়?

রমার দিকে চেয়ে রয় বল্লে, আমার কানে বিশেষ কিছু লাগে না।

হতাশ হয়ে জ্ঞানবাবু বল্লেন, না লাগলে আর কি বল্‌তে পারি বলুন। আমার কিন্তু এই সমস্ত শব্দ সাড়া, যন্ত্র-দানবের এই সব অত্যাচার—

হাসিমুখে রয় বললে, তা বুঝলুম, কিন্তু যন্ত্রদানব না থাকলে গোটা মানবসভ্যতাই যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পেছিয়ে যাবে। রমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে রয় কথা-

গুলো এমন ভাবে বল্লে যে, মনে হোল, সে বোধ হয় রমার কাছ থেকে সমর্থন চাইছিল।

রমা কিন্তু বাবার কথারই সুর ধরে বল্লে, যন্ত্রদানব বর্তমান সভ্যতা সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু তাই বলে কি যন্ত্রদানবের সমস্ত অত্যাচারই ভাল বলে মনে করেন?

গম্ভীর ভাবে রয় বল্লে, করি। একটু থেমে বল্লে, দেখুন, যন্ত্রদানব শব্দটা রবীন্দ্রনাথের তৈরী। কবিকে আমি প্রাণভরে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁর সমস্তটাই যে গ্রহণ করি তা নয়। কবি নিজে যন্ত্র নির্মিত সমস্ত জিনিষের সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ করতেন, গরুর গাড়ীর বদলে ট্রেণ এবং মোটরে চড়তেন, এরোপ্লেনও বাদ দেন নি, খাকের কলমে না লিখে ফাউন্টেন পেনে লিখতেন, তাঁর চব্বিশ ঘণ্টার সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যন্ত্রই জুগিয়ে আসত। তা সত্বেও তিনি যে যন্ত্রের বিরুদ্ধে বলেছেন সেটা নিছক কবিত্ব মাত্র, ওটার আমি কোন মূল্য দিই না, হয়ত মনে মনে তিনিও দিতেন না।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, মিঃ রায়, যন্ত্রের যন্ত্রণা কি আপনি অস্বীকার করতে চান?

রয় বল্লে, চাই। কারণ যন্ত্র মানুষেরই তৈরী। মানুষ কি এতই বোকা যে, সময় এবং পয়সা খরচ করে স্বেচ্ছায় এমন সব যন্ত্র সে তৈরী করেছে এবং পালন করছে, যে শুধু-মাত্র যন্ত্রণাই দেয়? আপনি ইলেক্‌ট্রিক পাখা রেখেছেন কেন, হাতপাখা ব্যবহার করতে পারতেন, ইলেক্‌ট্রিক পাম্প না লাগিয়ে কলসী করে জল তুলছেন না কেন, কলেজ যাবার সময় হেঁটে না গিয়ে গাড়ীতে চড়ছেন কেন?

জ্ঞানবাবু বললেন, সেগুলো সুবিধে এবং দরকার বলে, কিন্তু সৌন্দর্য্য এবং শান্তির জন্য—

বাধা দিয়ে রয় বললে, আপনি অনেক সিনিয়ার, আপনার সঙ্গে তর্ক করছি না, কিন্তু আমার মনে হয় সৌন্দর্য্য কি যন্ত্রে নেই? বরং আমার মনে হয় জীবনের আসল সৌন্দর্য্য, প্রাণপ্রাচুর্য্য, উৎসাহ, উদ্দীপনা এ সব যন্ত্রে যেমন আছে, স্থির শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে সে সব কিছুই নেই।

বিস্মিত কণ্ঠে রমা বললে, সে কি কথা মিঃ রয়? এ যে আপনি উল্টো মত প্রকাশ করছেন।

উল্টো নয়, এইটাই সরল এবং সোজা। অধ্যাপকের দিকে চেয়ে রয় বল্লে, দেখুন প্রোফেসার মুখার্জ্জী, বয়স আমার কম হলেও বহু জায়গায় ঘোরার সুযোগ আমি পেয়েছি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা কি জানেন, চেরা-পুঞ্জীর বিখ্যাত 'মস্‌মাই ফল্‌স্‌, ভৌগোলিকদের মতে যেটা পৃথিবীর যাবতীয় ঝরণার মধ্যে উচ্চতা এবং সৌন্দর্য্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর এবং দর্শনীয় বলে মনে হোল মানুষের হাতে তৈরী তিলৈয়া বাঁধের ছোট্ট ঝরণাটি। এই গত সপ্তাহে তিলৈয়ার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটাই মনে-প্রাণে অনুভব করলুম। হয়ত আপনি বল্‌তে পারেন, এই সৌন্দর্য্যবোধের পেছনে ইউটিলিটির স্বার্থবোধ রয়েছে, কিম্বা রয়েছে মানবশক্তির জয়ঘোষণা, যে-কারণে আমার দৃষ্টি এর বাস্তব ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে আরও গভীর কোন অর্থনৈতিক সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করেছে,' কিন্তু সে সব বিশ্লেষণ আমি করতে চাই না। সামগ্রিকভাবে তিলৈয়ার ঝরণা মস্‌মাই-এর চেয়েও আমার কাছে অধিক আনন্দপ্রদ। তিলৈয়ার কৃত্রিম হ্রদ এবং মাইসোরের কৃষ্ণসাগর মানুষের হাতে তৈরী। এই দুই জলাশয় কাশ্মীরের ডাল্‌লেক, উড়িষ্যার চিল্কা বা মণিপুরের লোগ্‌তাক্‌ লেকের চাইতেও আমার কাছে অনেক বেশী সুন্দর লাগে এবং আমার বিশ্বাস, এটা শুধু আমার কাছেই নয়, সকলের কাছেই সুন্দর বলে মনে হবে যদি আপনারা নাম-করা কবিদের প্রকৃতি-প্রশস্তি ও যন্ত্রনিন্দার সাহিত্যসুলভ প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের সহজ দৃষ্টিতে এইগুলো দেখে নিরপেক্ষ-ভাবে প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরী জিনিষের মধ্যে তুলনা করেন।

একটু থেমে রয় বল্লে, এই সহজ সত্যটা আমিও আপনাদের প্রত্যক্ষ করাতে পারি। আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, বোটানিক্যাল গার্ডেনে মধ্যরাত্রির শান্ত পরিবেশ দেখুন, আর সেই সঙ্গে রাত্রি একটা-দেড়টার সময় আমাদের রোটারী মেশিনের কাজও দেখুন। পল্লী-গ্রামে চাঁদিনী রাত্রে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে জল, হাওয়া, আকাশ এই সমস্ত দেখে যে আনন্দ পাবেন, তার চেয়েও ঢের বেশী আনন্দ পাবেন টাটানগরে রোলিং মিল্‌স্‌ দেখে, চিত্তরঞ্জনের এসেম্বি্লিং প্লাণ্ট দেখে। কারখানার কাজ দেখে আমার স্পষ্ট মনে হয় যে আমরা বেঁচে আছি,

শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে মনে হয় আমরা ঘুমিয়ে পড়ছি।

হতাশ হয়ে জ্ঞানবাবু বল্লেন, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে নেই, থাকলে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আপনি কথা বলতে পারতেন।

রয় বল্লে, আমার বিশ্বাস, তিনি আমার কথা একেবারে উড়িয়ে দিতেন না। আমার কথা হচ্ছে, জীয়ন্ত মানুষ কল-কারখানাই পছন্দ করে, তবে মৃতলোকের কবরের ওপোর প্রাকৃতিক গাছপালাই অধিকতর শোভন।

রমা বল্লে, মিঃ রয়, রবীন্দ্রনাথ শিলং-এর চিঠিতে বলেছেন—

জানি, রয় বল্লে, 'নয় ভালো ঐ গুর্খাদলের কুচ-কাওয়াজের কাণ্ডটা, নয় ভালো ঐ ব্যাঘ্রপাইপ নামক বাদ্যভাণ্ডটা', কিন্তু মিস্ মুখার্জ্জী, এটা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসঙ্গত উক্তি। যিনি আধুনিক ছন্দ, গান এবং নাচের প্রবর্ত্তক তিনি এ কথা কি করে বলেন! সৈনিকদের কুচকাওয়াজই জীবন্ত নাচ। বিরাট মাঠের ওপোর এক-দল সৈনিক একরকম পোষাক পরে তালে তালে পা ফেলে হাঁটছে, ছুটছে, জাগ্রত যৌবন শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে, সেটাকে ছন্দ-সাধক কবি ভালো নয় একথা বলেন কি করে তা আমি ভেবে পাই না। জড়জগৎকে প্রাণবন্ত করে যে শক্তি, সেই শক্তির পরিচয় পাচ্ছি যন্ত্রের মধ্যে, ঘর্ম্মাক্ত মানুষের কোলাহলের মধ্যে, আত্মরক্ষা এবং স্বাধীনতার স্পষ্ট রূপ প্রকাশিত হচ্ছে সৈনিকের কুচকাওয়াজ এবং মক্-ফাইটের মধ্যে। জীবিতের আনন্দ ঐখানেই মুক্তি লাভ করেছে।

জ্ঞানবাবু মনে মনে বিরক্ত হয়ে বল্লেন, যাক্, তা হলে বালির নদী এবং রমুই কারখানার ধোঁয়ার বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগ নেই।

মিঃ রয় নীরবে হাসলেন, কোন উত্তর দিলেন না। পরক্ষণেই হাত ঘড়ি দেখে বল্লে, এবার উঠি প্রফেসার মুখার্জ্জী, সকালে আপনার অনেকখানি সময় নিয়ে গেলুম। রমার দিকে চেয়ে বল্লে, মিস্ মুখার্জ্জী, টেলিফোন মেকানিক এলে—

রমা বল্লে, ঠিক আছে, সে ব্যবস্থা আমি করব।

বিদায় জ্ঞাপন করে রয় ঘর থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবাবু ডাকলেন, মিঃ রয়—মিঃ রয়—

রয় ঘরে ঢুকে এল!

জ্ঞানবাবু বল্লেন, ফোনের ব্যাপারে কোন পেমেণ্ট করতে হবে কি, অথবা কোন সই-টই দেওয়া?

রয় বললে, না না, ও সব লাগে না। আর যদি লাগে ত দিয়ে দেবেন, আমি এসে দিয়ে দেব।

রমা বললে, ঠিক আছে, যা হয় সে আমি করব'খন।

থ্যাংক্স্, রয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রমা বিরক্ত হয়ে বাবাকে বললে, টেলিফোনে কিছু দিতে হয় না, তা তুমি জান্তে না? রয় কি মনে করলে বল ত?

জেনে নেওয়া ভাল রে, জ্ঞানবাবু উপদেশের ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন।

দুপুরে বসে বসে রমা রয়ের যুক্তিগুলো উল্টে-পাল্টে বিশ্লেষণ করে দেখছিল। যে লোক শুধু ব্লেডে কামায়, কাঁচা রুটিতে কাঁচা ডিম মাখিয়ে খায়, যন্ত্রের ঘড়ঘড়ানি থেকে মিলিটারীর প্যারেড পর্য্যন্ত ভালবাসে, সেই লোকই আবার প্রবীণের সম্মান দেখিয়ে জলন্ত সিগারেট প্যাকেটের মধ্যে পুরে ফেলে। বঙ্গসাহিত্য সে পড়ে চণ্ডীদাস শাক্ত কি বৈষ্ণব সে বিষয়ে চিন্তা করে, কিন্তু রিসার্চ্চের ওপোর অবজ্ঞা। লোকটা কি প্রকৃতির! অজিত 'দাদা' বলে সম্বন্ধ পাতাতে গিয়েছিল, সে অসভ্যর মত 'না' বলে দিয়েছে, সোস্যালের দিন যে অপর্ণা তাকে অত খাতির করলো সে অপর্ণার নামটাও ভুলে গেল। এই যে ঘরের চাবি পর্য্যন্ত ওদের হাতে দিয়ে গেছে কোন দিন হয়ত বলে বসবে, আপনার নামটা ত মনে নেই! আচ্ছা, এর কি কেউ নেই? এই যে এতদিন এখানে এসে রয়েছে, কই কোন দিন ত ওর একখানা চিঠিও এল না! রমা শেষ পর্য্যন্ত ঠিক করলে, লোকটা পাগলই বটে, বাবা প্রথম দিনেই ঠিক ধরেছিলেন। অন্ততঃ মিষ্টিরিয়াস্ লোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। ওকে নিয়ে আবার অপর্ণা রসিকতা করে!

ছয়

কলেজ খোলার বেশ কিছুদিন পরে আগষ্ট মাসের শেষ বরাবর অপর্ণা সোম ক'দিনের জন্য বিশ্বভারতী থেকে ঘুরে এলে একদিন টিফিনের সময় শিক্ষয়িত্রীদের ঘরে বসে বিশ-

ভারতীর ভাদ্রোৎসবের গল্প হচ্ছিল। কৃষিমন্ত্রী কিভাবে হলকর্ষণ উৎসব পালন করলেন, শ্রীনিকেতনে কি কি উৎসব হোল, সন্ধ্যার সময় বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা 'রক্তকরবী' অভিনয়ে কি রকম কৃতিত্ব দেখালে, এই সব কাহিনী শেষ করে ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যখন যে যার ক্লাসে চলে গেল, তখন শিক্ষয়িত্রীদের ঘরে রইল মাত্র দু'জন, অপর্ণা ও রমা। ওদের তখন ক্লাস ছিল না। রমা বল্লে, হ্যাঁরে, ওখানে মিঃ রয়ের সঙ্গে তোর দেখা হয় নি? ও ত ঐখানে রিপোর্টার হয়ে গিয়েছিল।

নাক সিটকে অপর্ণা বল্লে, ওর কথা আর বলিস্ নি। অমন বেয়াড়া অভদ্র লোক আমি জীবনে দেখি নি।

কি রকম, কি রকম? রমা উত্তেজিত হয়ে উঠল।

অপর্ণা বল্লে, The less said the better; আচ্ছা ভাড়াটে জুটিয়েছিস্! ওকে সহ্য করিস্ কি করে?

রমা বল্লে, কেন? আমাদের সঙ্গে ত কোন খারাপ ব্যবহার করে না। কোন ঝঞ্ঝাট নেই, কোন গোলমাল নেই—

মাসে মাসে ভাড়া ফেলে দেয়, এই ত! অপর্ণা রমার সঙ্গে এক সুরে বলেই বল্লে, তা হলেই ভাল লোক, হ্যাঁ?

রমা বল্লে কেন, কি ব্যাপার? তোর রূপ দেখে মজে গেছে ত? হাত ধরে টেনেছিল বুঝি?

ধুৎ, তা হলে ত ছিল ভাল। একটি চড় মেরে হাতের সুখ করে নিতুম। সে সব কিছু নয়, কিন্তু লোকটা মানুষ নয় জানোয়ার, একটা আস্ত বাঁদর—

দাঁত খিচিয়েছে বুঝি, রমা মনে মনে মজা পেয়ে অপর্ণাকে উস্কে দেবার চেষ্টা করছিল!

বিরক্ত হয়ে অপর্ণা চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লে, ল্যাবরেটরীতে যাই, কাজ আছে—

বোস্-না, বোস্-না, রমা অপর্ণাকে বসাবার চেষ্টা করলে। অপর্ণা বল্লে, না রে, কাজ আছে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রমা বুঝলে, অপর্ণা পালিয়ে গেল।

কিন্তু ব্যাপারটা কি জানবার জন্য রমার আকুল আগ্রহ। মিঃ রয়কে জেরা করে ঘটনাটা আবিষ্কার করা কি সম্ভব হবে? না-হলে অপর্ণার কাছ থেকে কোন কথাই বার করা যাবে না।

সেদিন ভোর থেকেই খুব বৃষ্টি নেমেছে। নিউ আলিপুরের রাস্তাতেও জল দাঁড়িয়ে গেছে। বেলা দশটা বাজতে চল্লো, কিন্তু বৃষ্টির বিরাম নেই। জ্ঞানবাবু বল্লেন, আজ আর কলেজ যাওয়া হবে না বোধ হয়। রমা বল্লে আজ কি আর কলেজ-টলেজ হবে?

বোধ হয় নয়, ছেলেপিলে কেউ আসবে না, কিন্তু গরুর গাড়ী টাড়ী পাওয়া গেলে যেতুম, দরকার ছিল যাবার।

কোন গাড়ী কি চলবে বাবা, যা জল দাঁড়িয়েছে, অজিত উত্তর দিলে, তবে রিক্শা হয়ত পাওয়া যেতে পারে।

রিক্শার কথা জ্ঞানবাবু উপেক্ষাভরে উড়িয়ে দিলেন, বল্লেন, আরে যাঃ, রিক্শায় ঠুন্ ঠুন্ করে যেতে হবে, আর মেলা ভাড়া চাইবে।

তা হলে ফোন করে দাও, রমা উপদেশ দিলে।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, তাই করতে হবে দেখছি, একটু পরে করব। এখন বোধ হয় ফোন ধরবারও কেউ নেই। তা তুই কি করবি রমা? আজ কি আর কলেজে যাবি?

রমা বল্লে, না বাবা, আমি একটা ফোন করে দিয়ে আসি।

এখন? এই এত সকালেই?

হ্যাঁ, এখনই করে দিই। প্রিন্সিপ্যালের বাড়ীতে ফোন করে জানিয়ে দেব। আমার ক্লাস যে প্রথমেই কিনা।

তা হলে দিয়ে আয় ফোন করে। আমি পরে যাব।

অজিত বল্লে মিঃ রায় কিন্তু সকালেই বেরিয়ে গেছে, তবে স্কুটার নিয়ে যান নি, টুপি মাথায় নিয়ে ওয়াটার প্রুফ নিয়ে বেরিয়েছেন।

ওরা রিপোর্টার লোক, ওদের কথা আলাদা, জ্ঞানবাবু উত্তর দিলেন। রয়ের ঘরের চাবি নিয়ে ছাতা-হাতে রমা টেলিফোন করতে বেরিয়ে গেল।

রয়ের দরজার কাছে এসে রমা দেখলে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ইতস্তত করে দরজায় ঘা দিতেই ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল। রয় বল্লে, আসুন মিস্ মুখার্জ্জী।

ঘরে ঢুকে রমা দেখলে জানলাগুলো সমস্ত বন্ধ। পেডাষ্টাল ফ্যান ঘুরছে, আলো জ্বল্‌ছে, টেবিলের ওপোর কাগজ এবং খোলা ফাউণ্টেন পেন পড়ে আছে। ঘরের মেঝেটা যেন জলে স্নান করছে।

রমা বল্লে, ওমা, আপনিও বেরুতে পারেন নি ? তবে যে অজিত বল্লে—

হ্যাঁ, অজিতবাবু ঠিকই বলেছেন। আমি বেরিয়েছিলুম, অর্থাৎ বোরোবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু গাড়ী অভাবে যেতে পারি নি।

কেন ?

রয় বল্লে, কি করব! স্কুটার নিতে গিয়ে দেখি আপনাদের সিঁড়ির তলায় এক হাঁটু জল, স্কুটার অচল হয়ে আছে। তারপর ট্যাক্সি, এমন কি রিক্‌শা পর্য্যন্ত কোথাও পেলুম না।

রিক্‌শা ? রিকশা করে আপনি এস্‌প্লানেড যাবেন ? রমা প্রশ্ন করলে।

এস্‌প্লানেড নয়, রয় উত্তর দিলে, রিক্‌শা পেলে রিক্সা নিয়ে যেতে যেতে পথে কোথাও ট্যাক্সি পেলে রিক্সা ছেড়ে ট্যাক্সি নিতুম। কিন্তু কিছুই পেলুম না, তাই অগত্যা ফিরে এসে ফোন করে দিলুম।

রমা বললে, আমিও ফোন করতেই এসেছি। এ অবস্থায় কলেজে যাই কি করে!

করুন, রয় ফোনের দিকে চেয়ে রমাকে ইঙ্গিত করলে।

চেয়ারে বসতে গিয়ে রমা বললে, ওঃ, আপনার ঘরে এত জল এল কি করে ?

রয় বললে, আপনাদের দরজা জানলার তলা দিয়ে জলের স্রোত আসছে। আবার নর্দ্দমাটাও বোধ হয় বুঁজে গেছে।

ইস্, বিশ্রী জল হয়েছে, রমা আপন মনেই বলে ফেল্লে।

হাস্‌তে হাস্‌তে রয় বললে, বৃষ্টির সময় জল না হয়ে কি দুধ হবে ?

রমা চেয়ারে বসে টেলিফোন বই থেকে প্রিন্সিপ্যালের ফোন নম্বর খুঁজতে লাগল।

টেলিফোন শেষ করে রমা বললে, আপনি লেখাপড়া করছেন করুন, মিছামিছি আপনাকে বিরক্ত করে গেলুম।

রয় বললে, বসুন, বসুন। এত সহজে আমি বিরক্ত হই না। আর তা ছাড়া একজনকে বিরক্ত না করলে আর একজনের স্বার্থসিদ্ধি কি হয় ? আপনিই বলুন।

রমা দেখলে, রয়ের যেন গল্প করার ইচ্ছে আছে। রমা ভাবলে এই সময় অপর্ণার ব্যাপারটা জানবার সুবর্ণসুযোগ। চেয়ার ছেড়ে উঠে সে দাঁড়িয়েছিল, আবার সেই চেয়ারে বসে বললে, বসতে পারি এক সর্ত্তে, বিশ্বভারতীর ভাদ্রোৎসব কেমন হোল তা যদি বলতে রাজী থাকেন, তা হলে বসতে পারি।

ভালই হোল, রয় উত্তর দিলে, কিন্তু এ সব কথা আপনিই বা পরের মুখে শুনবেন কেন ? গেলেই পারতেন।

রমা বললে, তা পারতুম। অপর্ণাও বলেছিল। কিন্তু একা একা যাওয়া বাবা পছন্দ করেন না। সেই জন্যে—

একা একা না যাওয়াই ভাল, রয় উত্তর দিলে।

সে কি ? আপনিও ঐ কথা বলছেন। বাবা না হয় পুরানো আইডিয়া নিয়ে থাকেন, কিন্তু আপনি—

রয় মৃদু হাসলে, কোন উত্তর দিলে না।

রমা বললে, অপর্ণার সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি ?

হয়েছে।

কি রকম দেখলেন ওকে ?

ভালই।

একটু থেমে রমা বললে, আচ্ছা মিঃ রয়, ওর সঙ্গে কি আপনার কোন, মানে, ও বড় ঝগড়াটে গোছের কি না, তাই বল্‌ছি—

কেন, ও কিছু বলেছে আপনাকে ?

রমা ঢোক গিলে বললে, না, কিছু বলে নি, তবে ওর কথায় যেন মনে হোল—

কি মনে হোল ?

রমা বিব্রত বোধ করলে। বললে, যাক্ সে কথা, আমি উঠি। সে ওঠবার উপক্রম করলে।

রয় বললে, এক মিনিট! আপনি একটা দোষারোপ করে চলে যাবেন, সে ত হতে পারে না। সত্য কথা স্পষ্ট করে বলুন, আমি কিছু মনে করব না। মনে করা-করি জিনিষটাই আমার নেই।

রমা বললে, না, মনে করার মত কিছুই ও বলে নি। অর্থাৎ, ও কিছুই বলে নি,—

তা হলে? আপনি সত্য কথা প্রকাশ করছেন না। কেন ? এত সমীহ করছেন কেন। বলুন না।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রমা বললে, সত্যি বলছি মিঃ রয়, ও আমাকে কিছুই বলে নি, তবে—

তবে কি ?

ওর ভাবভঙ্গী থেকে মনে হোল, ও আপনার ওপোর কোন কারণে তেমন সন্তুষ্ট হতে পারে নি।

রয় ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে বললে, তা ঠিক। উনি যা চেয়েছিলেন, তা আমি দিতে পারি নি।

বাইরে বৃষ্টি আরও চেপে এল। মুষলধারা যাকে বলে ঠিক সেইভাবেই বৃষ্টি হচ্ছে। ভেজানো দরজা এবং বন্ধ জানলার তলা দিয়ে প্রচুর জল ঘরে এসে ঢুকছে। ওরা দুজনেই পা গুটিয়ে বসেছে। খাটের তলায় যে বড় ওয়ার্ড-রোবটা ছিল সেটা রয় বিছানার ওপোর আগেই তুলে রেখেছিল। সেই বাক্সর ওপোর হাত রেখে রয় স্বীকারোক্তির ভঙ্গীতে বললে, উনি যা চেয়েছিলেন তা আমি দিতে পারি নি।

কি এমন জিনিষ উনি চেয়েছিলেন, রমা প্রশ্ন করলে।

রয় বললে, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, আপনারও জেনে রাখা দরকার, উনি ঠিক আপনাদের মত নন। ওঁর যেন কবিত্ব একটু বেশী, মানে রোমান্স।

কি রকম ? রমার আগ্রহ বেড়ে উঠল।

রয় বললে, উনি ভেবেছিলেন, আমি বোধ হয় ওকে দেখে এনামার্ড হয়ে পড়েছি। সব রকম উৎসবের মধ্যে আমার কাছে কাছে থেকে শেষে শ্রীনিকেতনে উনি আমায় এমন একটা কথা বলে বসলেন যে, আমি বেশ বিরক্তি বোধ করলুম। ওঁকে বল্লুম,—রয় থেমে গেল।

কি বল্লেন ?

বল্লুম, মিস্ সোম ! একা একা বহুদিন থেকে ঘুরছি। যদি কোন মেয়ের কাছে ধরা দেবার মত দুর্ব্বলতাই থাকত, তা হলে এতদিনে সেই রকম সুযোগ অথবা দুর্য্যোগ অন্ততঃ হাজার বার পেতে পারতুম। ইউ, কে, জার্ম্মানী, ইটালি এবং ফ্রান্সে যখন সে রকম দুর্ঘটনা ঘটে নি, তখন এখানে যে ঘটবে, সে রকম আশা করবেন না। আপনি আমার পরিচিতা, এমন কি বান্ধবীও হতে পারেন, কিন্তু তার বেশী দাবী করলে আমি অপারগ। রয় চুপ করে গেল।

উত্তর শুনে রমার মনে এল অপরিসীম তৃপ্তি কিন্তু কেন যে এতটা আনন্দ হোল, তা রমা নিজেও ঠিক বুঝল না। মনের ভাব মনে চেপে রেখে রমা বল্লে, এই ? তা—তা ও বেচারীকে আপনি হতাশই বা করলেন কেন ?

রয় হাস্‌ল, বল্লে যার যা আইডিয়া। আমি ব্যাচিলর থাকতেই চাই এবং রোমান্স টোমান্সে আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় রোমান্স হচ্ছে এক শ্রেণীর মনো-বিকার, ইলিউশন। ও একটা রোগ, ছোঁয়াচে রোগও বলতে পারেন।

রমা বল্লে, ও, তাহলে আপনি শঙ্করাচার্য্য বিবেকানন্দর মতন জীবন কাটাতে চান ?

Far from them। আমার সঙ্গে ওঁদের নাম জড়ালে ওঁদের খেলো করে ফেলা হবে।

তা হলে ?

রয় বল্লে, আমার মনে হয়, বর্ত্তমান যুগে রোমান্স করা অথবা বিবাহ করে সময় নষ্ট করা অপরাধ বলে গণ্য হওয়া উচিত। মানুষের হাতে এখন এত কাজ এসে পড়েছে যে, ঐ সব বিলাস ও ভাবালুতায় সময় নষ্ট করা হবে highly criminal।

রমা বল্লে ও, তাহলে এই এতকাল ধরে যে সব সামা-জিক ব্যবস্থা চলে এসেছে, এই যে কাব্যে, সাহিত্যে, পৃথিবীর সকল দেশের মানব-সমাজে—

বাধা দিয়ে রয় বল্লে, ও সব পুরনো দিনের কাহিনী। যে-যুগে মানুষের কোন কাজ ছিল না, সে যুগে কাজের অভাবে মানুষ ঐ সব অকাজ নিয়ে সময় কাটাত। এখন আমাদের হাতের মধ্যে সারা পৃথিবী, এবং শুধু পৃথিবী কেন, মহাকাশ অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে আমার বিশ্বাস আগামী পঁচিশ ত্রিশ অন্ততঃ পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই গ্রহগুলি পর্য্যন্ত আমাদের নাগালের মধ্যে এসে পড়বে। তখন কি আমরা চাঁদপানা মুখ আর পটল-চেরা চোখ নিয়ে মধ্যযুগীয় ভাবাবেশে সময় নষ্ট করব ?

তা হলে এতদিন ধরে যে ধারা চলে এসেছে সেগুলো আপনি এক কথায় নস্যাৎ করে দিতে চান ?

রয় বল্লে, মিস্ মুখার্জ্জী, আমার চাওয়া চাওয়ি কিছু নেই, ও আপনা হতেই চলে যাবে। এবং যেটা টিকবে না, সেটাকে আগে থেকে যারা বর্জ্জন করতে পারবে তারাই এগিয়ে যাবে। যারা পুরানোকে আঁকড়ে নিয়ে থাকবে, তারা পুরানোর সঙ্গেই লোপ পেয়ে যাবে।

জ্ঞানী ও বিচক্ষণের ভঙ্গীতে রমা বল্লে, দাঁড়ান, অনেক-গুলো কথা এক সঙ্গে এসে পড়ল। একে একে প্রশ্ন

করি। বিবাহ ব্যবস্থা উড়িয়ে দিলে ভবিষ্যৎ মানবসমাজ টিক্‌বে কি ভাবে ?

উড়িয়ে-দেওয়া-না দেওয়ার মালিক আমি নই, রয় উত্তর দিলে, কিন্তু আমি বলছি, ওটা উড়েই যাবে—টিক্‌বে না।

আপনি কি মনে করেন মানুষগুলো এতই অধঃপাতে গেছে, রমার ক্রুদ্ধ টিপ্পনী।

অধঃপাতের কথা নয়, মানুষগুলো বদলে গেছে, শান্ত-ভাবে রয় উত্তর দিলে। বল্লে, মানুষের চিন্তাধারাই যে বদ্‌লে গেছে। ভেবে দেখুন মিস্ মুখার্জ্জী, আজ থেকে ঠিক দু'শো বছর আগে কেউ যদি বলত, রাজা তড়িয়ে জনসাধারণের ভেতর থেকে-যে কোন একজনকে বেছে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে রাজত্ব চালাব, তা হলে সেই দু'শ বছর আগেকার জনসাধারণ কি বলত একবার ভাবুন ত ? তেমনি দেখুন, এক সময় ইংরাজী ভাষায় সেকিউলার কথাটা ছিল নিন্দা বা গালাগালির কথা। 'সেকিউলার ম্যান' অর্থাৎ জানোয়ার বিশেষ এইটাই তারা মনে করত, কিন্তু আজ আমরা নিজেদের সেকিউলার নামে পরিচয় দিয়ে গর্ব্ববোধ করছি। তেমনি বিবাহ বন্ধনটা বর্ত্তমানের ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে আর খাপ খাচ্চে না। লোকে মনে প্রাণে অনুভব করছে, যে, বিবাহবন্ধন জীবনের অবাধগতির পক্ষে প্রতিকূল। অতএব ওটা ধীরে ধীরে লুপ্ত হবে।

তাহলে মানুষের বংশধারা টিকবে কোন পথে ? সব কি জাবালী আর সত্যকাম হবে ?

রয় বল্লে, শুনুন, জাবালী-সত্যকাম হবে কিম্বা যিশু-খৃষ্ট হবে সেটা পুরানো দিনের মাপকাঠি দিয়ে নতুন দিনকে বিচার করতে যারা চায় তারা বুঝবে, আমার মনে হয় নতুন দিনের ব্যবস্থা হবে সম্পূর্ণ অভিনব। তখন সমাজের সর্ব্বস্তরে division of labour অর্থাৎ শ্রমবিভাগ প্রতি-ষ্ঠিত হবে। আমার আলোচনায় কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হয়, এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক থাকবে যারা টেষ্ট টিউব বেবিজ্ তৈরী করবেন হয়ত বিজ্ঞান এই বেবি তৈরীর ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর উপকরণ মিশিয়ে বিভিন্ন ধরণের মেধা এবং শক্তিও সৃষ্টি করতে পারবে, যারা সমাজের ও বিশ্বের বিবিধ কাজের উপযুক্ত হয়ে জন্মলাভ করবে এবং সেই সব বিশেষ কাজ করার জন্য বাল্যকাল থেকেই বিশেষ ট্রেনিং পেতে থাকবে। ছেলে মানুষ করা এবং উপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞের দলই ব্যবস্থা করবেন, ছেলে মানুষ করার জন্য বাপ-মাকে অন্য সব কাজ ছেড়ে সংসারের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকতে হবে না।

তাহলে সংসার বলে কিছুই থাকবে না ? রমা প্রশ্ন করলে।

রয় বল্লে, না, স্বামীস্ত্রীর ক্ষুদ্র সংসার থাকবে না, থাকবে বৃহত্তর মানব-পরিবার। সেই পরিবারের কয়েকজন ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুযায়ী শিশু সৃষ্টি করবে ও পালন করবে। বাকী সকলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কাজ করে পৃথিবীকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবে নব নব উন্নতি ও বিস্তৃতির দিকে।

তাহলে শিশুদের বাপ-মা বলে কিছুই থাকবে না ? রমা প্রশ্ন করলে।

না, সব শিশুই নিজেকে স্বয়ম্ভূ বলে জানবে। এর ফলে সেই শিশু যখন যুবক হবে তখন তার কোন পিছু টান থাকবে না। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেতেও তার কোন বাধা থাকবে না।

রমা বললে, বুঝলুম, যুদ্ধবিগ্রহের সময় লড়াইয়ে গিয়ে মরতে কারুর কোন বাধা থাকবে না।

অল্প হেসে রয় বললে, আপনি ঠিক বুঝলেন না। যুদ্ধবিগ্রহ পাচ্ছেন কোথায় ? এই যে বর্ত্তমানের জাতীয়তা বোধ, স্বাধীনতার রক্তচক্ষু এ সব আর কতদিন ? আমার মনে হয় মিস্ মুখার্জ্জী, এই বিংশ শতাব্দীর শেষ বরাবর আর একখানা তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবে এবং সেই যুদ্ধে উন্নত ধরণের যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার পর গোটা পৃথিবী নিয়ে তৈরী হবে একখানা মাত্র রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্র আর কার সঙ্গে লড়বে ! সেই রাষ্ট্র তৎকালীন মানুষের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে পৃথিবী পুনর্গঠনের তাগিদে এবং সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টায় আপ্রাণ কাজ করবে এবং এখন আমরা যে সব জিনিষ কল্পনাতেও আনতে পারছি না,সেই সব অভাবনীয় কৃতিত্ব অত্যন্ত সহজে সফল ও সার্থক করে তুলবে।

তখন আমরা কি করব মিঃ রয়, কপট গাম্ভীর্য্যে আন্ত-রিক অবিশ্বাস ও ব্যঙ্গের সহিত রমা প্রশ্ন করলে।

আপন ভাবে বিভোর এস্, এন্. রয় রমার প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন শ্লেষের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করেই বল্লে, আমরা—আমরা হয়ত তখন থাকবই না। হয়ত তৃতীয় মহাযুদ্ধেই আমরা খতম হয়ে যাব। কিন্তু আমরা থাকি বা না থাকি, প্রকৃতির দুর্নিবার শক্তি তার নিজের পরিণতির দিকে অবাধে এগিয়ে যাবে, ভবিষ্যদ্বক্তার আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কথাগুলো শেষ করে রয় যেন সমাধিস্থ হয়ে বসে রইল।

বক্তার দৃঢ় বিশ্বাসে রমার অবিশ্বাস রমার অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেল। রমা যেন রয়ের মন নিয়েই রয়ের চিন্তাধারায় অল্পে অল্পে অবগাহন করলে।

কিছুক্ষণ পরে রয় যেন আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলে। ডাক্‌লে, মিস্ মুখার্জ্জী—

বলুন।

আপনার বান্ধবীকে বলবেন তিনি যদি পারেন তা হলে যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আর এটুকুও বলতে পারেন যে, এস্. এন্. রয় সাহিত্যবর্ণিত রোমান্স টোমান্স একেবারেই বিশ্বাস করে না।

সময় ও সুযোগমত বল্‌ব, রমা উত্তর দিলে।

আর পারেন ত এটাও বলবেন যে রোমান্স নামক জিনিষটার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। কল্পনাবিলাসী লেখকরা রোমান্স নামক আকাশকুসুমকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে কাহিনী রচনা করেন এবং ভূতের গল্প পড়ে বা শুনে ছোট ছেলেরা যেমন সর্ব্বত্রই ভূত দেখতেপায়,সেই রকম রোমান্সের পাঠকরা গল্পের কাহিনীকে নিজেদের জীবনে আরোপ করে বৃথাই রোমাঞ্চিত হয়। অবশ্য বর্ত্তমান কালের সামাজিক প্রয়োজনে সংসার গঠনের তাগিদে অন্য কাজ হাতে না থাকলে নিঃসঙ্গতার প্রতিষেধকরূপে এবং জৈবিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য পৃথিবী-শুদ্ধ লোক বিবাহ করে বটে কিন্তু সেই বিবাহের জন্য রোমান্স নামক বস্তুটি একেবারেই অলীক চিন্তা। যে কোন এক জোড়া নরনারী সংসারগঠন, পালন এবং ভোগ করতে পারে যদি তাদের বিষয় বুদ্ধি থাকে। রোমান্সের আকাশকুসুম সংসার গঠনের বিরাট অন্তরায়।

কেন? ধরা গলায় রমা প্রশ্ন করলে।

কেন বুঝলেন না? রয় উত্তর দিলে। রোমান্স হোল' এক শ্রেণীর মনোবিকার, ইলিউশন। প্রকৃত পক্ষে রোমান্সের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। ওটা হোল পাগলের পাগলামি, অথবা বলা যেতে পারে বোকা ছেলের বাজে আবদার।

কি রকম? রমার বড় মজা লাগল।

রয় বল্লে, শুনবেন? তা হলে শুনুন। আমার ছেলেবেলাকার একটা ঘটনা বলি শুনুন। আমরা তিনভাই এক সঙ্গে ভাত খেতে বসতুম। তিনখানা থালায় একই রকম ভাত, ডাল, তরকারী দেওয়া থাকত। আমার বড়দা, যিনি ছিলেন ঠাকুরমার অত্যন্ত আদুরে, তিনি খেতে বসার আগে দূর থেকে একখানা থালা দেখিয়ে চিৎকার করে বলতেন, আমি ঐ থালায় খাব। মেজদা বড়দার এই ঘোষণা শোনবার জন্য শান্তভাবে অপেক্ষা করত। বড়দার কথাটা শোনামাত্রই মেজদা দৌড়ে গিয়ে সেই থালায় বসে পড়ত। তখন সেই একখানা থালা নিয়ে লেগে যেত দু'জনের মারামারি। মা, বাবা ঠাকুরমা সকলে মিলে ওদের দু'জনকে কিছুতেই সাম্‌লাতে পারতেন না। মারামারি, কান্নাকাটি, শেষ পর্য্যন্ত ওদের দুজনের খাওয়াই হোত না কোন কোন দিন। আমি কিন্তু ওদের দলে থাকতুম না। ভাবতুম, ওরা কি পাগল!

থালায় কি আসে যায়? যে থালাতেই হোক্ খেলেই ত হোল; খাদ্য ত সবগুলোতেই সমান। তা রোম্যান্সটা কি জানেন মিস্ মুখার্জ্জী, রোমান্স হচ্চে থালার মোহ, আর রোমান্সের দ্বন্দ্ব হচ্চে আদুরে গোপালদের থালা নিয়ে মারামারি। এর ফল হচ্চে নিজেদের অশান্তি, মধ্যে মধ্যে অনাহার এবং অন্যান্যদের ঠাট্টা ও বিদ্রূপ। রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনটা এদের মুখস্ত রাখা উচিত, 'যাব অদৃষ্টে যেমন জুটুক তোমরা সবাই ভাল'।

একটু থেমে রয় বল্লে, দেখুন, রোমান্স হবে, কোর্টশিপ হবে, নিজেদের মধ্যে সবদিক বিচার করে, বাছাই করে তবে বিয়ে করব, বিশেষ ব্যক্তিটিকে না পেলে দুনিয়া অন্ধকার দেখব, এই যে কবিসুলভ মোহ, এ মোহ কোন দিনই স্থায়ী হয় না। এই বিয়ের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে প্রচণ্ড অহমিকা এবং বিয়ের পর মুহূর্ত্ত থেকেই ঝগড়ার ফল্গু বইতে সুরু হয়, এর শেষ হয় ডাইভোর্সে। হবেই ত, কারণ রোমান্স হচ্চে অস্তিত্বহীন

ইলিউশান, সে মুহূর্তে মুহূর্তে রং বদলায়। পাগলের প্রলাপে স্থায়ী যুক্তি থাকে না।

রমা ভুলে গেছে যে, সে একটা মাত্র টেলিফোন করতে এসেছিল এবং এখানে এতটা দেরী হওয়া যে অসঙ্গত, এজন্য তাকে তার বাবার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে এ সব কোন খেয়ালই তার ছিল না। রয় টেবিলের কাগজ-গুলোর দিকে নজর দিয়ে বল্‌লে মিস মুখার্জ্জী, আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি কিন্তু। ইঙ্গিতটা রমা বুঝলে, বল্‌লে, হ্যাঁ, এবার উঠি।

রয় বল্‌লে, বায়—বায়।

রমাও বায় বায় দিয়ে ছাতা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বৃষ্টির বেগ এখনও কমে নি।

নিজের ঘরে এসে রমা দেখলে, বাবা বাইরের ঘরে নেই, বোধ হয় স্নান করতে গেছেন। কলেজ থাকুক আর নাই থাকুক, বাবার স্নান আহার ঠিক একই সময়ে হয়। রমা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লে। যাক্, এখনই কোন কৈফিয়ৎ দিতে হোল না। কিন্তু যে কথা রয়ের সঙ্গে আলাপ করতে করতে একাধিকবার মনে হয়েছিল সেই কথাটা তাকে বেশ একটু পীড়া দিতে লাগল। কথাটা রয়ের মধ্যাহ্ন ভোজন সম্বন্ধে। ভদ্রলোক দুপুরে বাইরে খায়, কিন্তু আজ কি হবে? আজ ত বাইরে বেরুতে পারবে না, তা হলে কি আজ তার খাওয়াই হবে না।

কিন্তু রমাই বা কি করবে? নিমন্ত্রণ সে করতে পারত কিন্তু নিজের বাড়ীতে রমা ত এতটা স্বাধীন নয়। বলা নেই কওয়া নেই, একজনকে খেতে বল্‌লে মা অসন্তুষ্ট হবে, বাবা রীতিমত রাগারাগি করবে। থাক্ গে যাক, ওর কি দায়? কিন্তু—যাক্ গে ও যা হয় করবে'খন।

সাত

বিকেল তিনটে নাগাদ কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে জ্ঞানবাবু দেখলেন, সামনের চলন পথে গেঞ্জী গায়ে হাফ্‌প্যান্ট পরে দু'হাতে কালিঝুলি মেখে এস্.এন্. রয় তার স্কুটারের কলকব্জা খুলে কি যেন মেরামত করছে এবং অজিতও রয়ের সঙ্গে ঐ কাজে হাত লাগিয়েছে। অজিতের ব্যাপারে জ্ঞানবাবু মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে মুখে সেই ভাব চেপে রেখে বল্লেন, কি হোল, গাড়ী বিগড়েছে বুঝি?

রয় বললে, হ্যাঁ, একটু ট্রাবল দিচ্ছে।

জ্ঞানবাবু বললেন, গাড়ীর চিকিৎসাও আপনার জানা আছে দেখছি।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয় বললে, এ আর এমন কি? অত্যন্ত সোজা জিনিষ। অজিতবাবুও শিখে নিয়েছেন।

তাই নাকি? তুইও শিখেছিস্?

কুণ্ঠার সঙ্গে অজিত বললে, সামান্য। ওঁর কাছেই দু' একদিন যা দেখেছি।

চড়্‌ছিস্ না কি?

রয় বললে, উনি সাইকেল চড়্‌তে জানলে দু'একদিনেই স্কুটার চড়তে পারতেন কিন্তু, ব্যালান্সিং-এরই জ্ঞান নেই—

জ্ঞানবাবু বল্লেন, না না, ও সব জ্ঞান না থাকাই ভাল; কলকাতা সহরে গাড়ী ঘোড়ার যা ভিড়, এখানে ওসব চেষ্টা করা ভাল নয়। বলতে বলতেই বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেলেন। ঢুকে ভেতর থেকে ডাকলেন, অজিত।

কি বাবা?

একবার শুনে যাও, কাজ আছে।

অজিত রয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ীতে এসে ঢুকল। অনেকক্ষণের মধ্যে আর ফিরল না। রয় গাড়ীর কাজ শেষ করে নিজের ঘরে উঠে এসে হাত মুখ ধুয়ে পোষাক পরে দরজায় তালা দিয়ে স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রমা সেদিন কলেজ থেকে আগেই বাড়ী ফিরেছিল। রমার সামনেই জ্ঞানবাবু স্কুটার মেরামতের কাছে থাকার জন্য অজিতকে বেশ কড়া ভাবে দু'কথা শুনিয়ে দিলেন। জ্ঞানবাবুর স্ত্রী নীলিমা দেবী স্বামীর কথায় সায় দিয়ে বল্লেন, শুধু কি তাই, ও আবার ফটো তুলতে শিখেছে।

দিনে দিনে আরও কত কি শিখবে, যত সব—রাগের চোটে জ্ঞানবাবু নিজের বক্তব্য শেষ করতেই পারলেন না।

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে রমা বললে, কেন বাবা, ফটো তোলা কি খারাপ? ওতে ত কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।

বাজে পয়সা নষ্ট, অপব্যয়, জ্ঞানবাবু উত্তর দিলেন।

রমা বললে, না না, ও সবই ত রয়ের পয়সায়—

জ্ঞানবাবু বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ হোল। আজ রয়ের পয়সায়, তারপর কালই বলবে ক্যামেরা চাই, ফিল্ম চাই। সে কি কম খরচ! আমাদের বাংলা ডিপার্টমেন্টের

ছোক্‌রা এক প্রফেসার এসেছে নির্ম্মল বাড়ুজ্জে, ওর কাছে শুনেছি, ফটো তোলার বাতিকে ওর প্রতি মাসে ষাট পঁয়ষট্টি টাকা গচ্ছা যায়। যত সব বাজে অপব্যয়।

অপরাধীর মত নিঃশব্দে পালিয়ে বাঁচল অজিত।

সন্ধ্যের পর খেতে বসে জ্ঞানবাবু বললেন, শুন্‌ছ গো, আমাদের কলেজের এক নূতন প্রফেসার আমাকে পুজোর সময় কাশী যাবার নিমন্ত্রণ করছে। কাশীতে ওদের নিজেদের বাড়ী আছে, বললে, বেশ বড় বাড়ী, চলুন স্যার, একমাস ঘুরে আসবেন।

নীলিমা বললেন, বেশ ত, যাও না।

খেতে খেতে জ্ঞানবাবু বললেন, তাই ভাবছি। তুমিও ত অনেকদিন কোথাও যাও নি, তা ছাড়া কাশী জায়গাটাও ত ভাল। তা তুমিও চল না কেন?

নিয়ে গেলেই যাব, নিস্পৃহ কণ্ঠে নীলিমা দেবী উত্তর দিলেন।

এক চুমুক জল খেয়ে জ্ঞানবাবু বললেন, তাহলে ত চারজনকেই যেতে হয়, কিন্তু বাড়ী কি ঐ বাসুয়ার হাতে ছেড়ে যাওয়া ভাল হবে?

অজিত বললে, বাবা, সমীরের কাছে শুনলুম, ওদের সব আত্মীয় কুটুম্ব অনেক নাকি পুজোর সময় আসছে এবং ওর বাবা ভাবছেন—

সমীর কে? জ্ঞানবাবু প্রশ্ন করলেন।

গগনবাবুর ছেলে, পাশের বাড়ীর, অজিত উত্তর দিলে।

ও! তা ওদের কি হয়েছে? জ্ঞানবাবু প্রশ্ন করলেন।

অজিত বল্লে, ওদের যদি বাইরের ঘরটা এক মাসের জন্য ছেড়ে দেওয়া যায় তা'হলে ওদের যে সব কুটুম্বরা আসবে তারা ঐ ঘরেই থাকবে, এবং আমাদেরও বাড়ী আগলাবার কাজ হয়ে যাবে।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, তা হয়, কিন্তু আমরা আসার পর ওরা যদি ঘর না ছাড়ে!

বাঃ, ছাড়বে না কেন? আমরা ত আর ভাড়া দিয়ে যাচ্ছি না।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, ও, এম্‌নি থাকবে। তা—তাহলে ভেবে দেখতে হয়। চট্ করে কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু একেবারে কিছু না দিলে ত চলবে না। ইলেক্‌ট্রিক আছে, পাম্পের জল আছে, ঐ বাসুয়া চাকরকেও ত এক মাস ওরাই খাটাবে, তারপর ধর না কেন, কর্পোরেশনের ট্যাক্স—

রমা বল্লে, চাকর এবং ট্যাক্স ওরা থাকলেও দিতে হবে, না থাকলেও দিতে হবে। তবে ইলেক্‌ট্রিকটা—সেটাও যেমন আছে, তেমনি ত ওরা দারোয়ানের মত বাড়ী আগলাবে বাবা!

জ্ঞানবাবু বল্লেন, বুঝলুম, কিন্তু কলকাতা সহরে, নিউ আলিপুরের মতন জায়গায় অমন একখানা ঘর এক মাসের জন্য নিজস্বভাবে ব্যবহার করবে সেটাই কি কম! ধর না কেন, গ্যারেজের ওপর নীচু ছাতের ঘর, ওরই যদি ভাড়া হয় একশ' টাকা, তা হলে একখানা ভাল ঘরের ভাড়া এক মাসে কত হবে বল্ দেখি। চাঁদুবাবুর তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাটের ভাড়া কত জানিস্, সাড়ে চারশ টাকা।

জ্ঞানবাবুর ভোজনপর্ব্ব শেষ হোল। ওরা সকলেই পিঁড়ি থেকে উঠে আঁচাতে গেল।

শেষ পর্য্যন্ত ঘরখানা খালি করে গগনবাবুদেরই দেওয়া হোল। কথা হোল গগনবাবু চাকরের একমাসের মাইনে এবং খাওয়া দেবে, এ ছাড়া ইলেক্‌ট্রিকের বিল যা হয়, সবটাই দেবে, চাকরের পুজোর কাপড়টাও গগনবাবুরাই দেবে, জ্ঞানবাবুকে দিতে হবে না।

থার্ডক্লাস সিট্ রিজার্ভ করে জ্ঞানবাবুরা চারজনে এবং জ্ঞানবাবুর নিমন্ত্রণকর্ত্তা নতুন ছোক্‌রাপ্রফেসার নির্ম্মল বাড়ুজ্জে, তার বিধবা মা এবং স্ত্রী এই সাতজনে পুজোর নবমীর দিন কাশীযাত্রা করলেন। নবমীর আগে সিট রিজার্ভ করা সম্ভব হয় নি।

কাশীতে জ্ঞানবাবুদের দিনগুলো ভালই কাটছিল। রান্না-বাড়া ওদের এক সঙ্গেই হোত এবং সেটা নির্ম্মলবাবুর মা ও নীলিমা দেবী দুজনে হাতে হাতেই সেরে নিতেন, কারণ নির্ম্মলের মা রাঁধুনীর ছোঁয়া খাবেন না, নীলিমাও তাই। অতএব রান্নার লোকের কোন প্রশ্নই ওঠে নি। বাজার করার ভার নিয়েছিল নির্ম্মল নিজে, অজিত তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকত। নির্ম্মল-কাকাকে অজিতের বেজায় ভাল লেগেছিল। নির্ম্মলের স্ত্রী এবং রমারও খুব ভাব হয়েছিল। ওখানকার দিনগুলো সকলেরই খুব সুখে কাটছিল।

রাত্রে শোবার পর নীলিমা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন,

এখানে কত খরচ দিতে হবে গো? এই যে রোজ এত এত মাছ, মাংস, দুধ, দই সব আসছে, রাত্রে লুচি হচ্চে, রাবড়ী আসছে. এই এত খরচ—

জ্ঞানবাবু তাচ্ছিল্যের সুরে বল্লেন, কি জানি? খরচ-টরচ বল্‌তে পারি না।

ওমা সেকি? একি সব ঐ নির্ম্মলই দিচ্চে নাকি?

প্রশান্ত মুখে জ্ঞানবাবু বল্লেন, দেবে না কেন? বাপের পয়সা ও পেয়েছে অনেক, তারপর পাশ করতে না করতেই চাকরী পেয়েছে, ছেলেপুলে হয় নি, ওর অভাব কি? এই কাশীর ক্যাণ্টনমেণ্টে এত বড় বাড়ী, এখান থেকেও ভাড়া পাচ্ছে। কলকাতাতেও ভাল বাড়ী রয়েছে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে, দেশেও শুনেছি বাড়ী বাগান জমি-জায়গা বেশ কিছু আছে—

তা থাকলেও, নীলিমা দেবী ওর পয়সায় সকলে মিলে খাওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, এ-সব ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। এ কথা আমার কলকাতাতেই হয়ে গেছে। আর তা ছাড়া এটুকু খরচ ও আমার জন্য করবে না কেন বল্‌তে পার? এই যে কলেজের চাকরী, এ-কি ও নিজের চেষ্টায় পেত নাকি, যদি আমি ওর পেছনে না থাকতুম। অবিশ্যি এম-এ-তে ফার্ষ্টক্লাস পেয়েছে বটে, কিন্তু বাংলায় ফার্ষ্টক্লাস এম-এর কি অভাব আছে গো, এ-ত. ছড়াছড়ি—

নীলিমা দেবী গুম্ হয়ে রইলেন। নির্ম্মলের ঘরে তখনও ট্রানজিষ্টর রেডিওয় গান হচ্ছিল।

দু'দিন পরে এক সন্ধ্যায় ওরা চারজনে গল্প করতে করতে গঙ্গার রেলের পোলের কাছে এসে উপস্থিত হোল। নীচে রেল এবং ওপোরে গাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থায় অজিত ও রমার স্ফূর্ত্তি দেখে কে! নির্ম্মল বহুবার কাশীতে এসেছে ওর স্ত্রীও এর আগে এসেছিল কাজেই ওদের কাছে এটা পুরাণো জিনিষ, কিন্তু অজিত ও রমার আগ্রহে ওরা এদিক ওদিক দেখতে দেখতে থেমে থেমে হাঁটছিল। এমন সময় একখানা পথ চলতি ধূলো-মাথা মোটর গাড়ী ওদের কাছে এসে ব্রেক কষে থেমে গেল। গাড়ীর ভেতর থেকে কে যেন হেঁকে উঠল, হ্যাল্লো, মিঃ এণ্ড মিস্ মুখার্জ্জী—

ওরা চারজনেই চেয়ে দেখলে, মিঃ রয় এবং আরও একজন তার পাশে। রয়ের হাতে ষ্টীয়ারিং।

অজিত গাড়ীর পাশে এগিয়ে এসে বল্লে, মিঃ রয় যে এখানে?

এসে গেলুম. রয় উত্তর দিলে। বোধ হয় যেন রহস্য করেই বললে, আপনারা এসেছেন শুনে আমিও এলুম। তারপর গাড়ীটা ধীরে ধীরে চালিয়ে পথের বাঁদিকে দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে নেমে এল। নির্ম্মলের স্ত্রী রয়ের দিকে একবার দেখেই চোখ নামিয়ে নিলে।

অজিত নির্ম্মলের সঙ্গে রয়ের পরিচয় করিয়ে দিলে ইনি মিঃ এস্. এন্. রয়, স্টেটস্‌ম্যানের রিপোর্টার আর ইনি আমার কাকা প্রফেসার নির্ম্মল ব্যানার্জ্জী, ইনি আমার কাকীমা।

ওরা পরস্পর নমস্কার প্রতি-নমস্কার করলে। কাকীমা আর একবার ভাল করে রয়কে দেখে নিলে।

রয়ের বন্ধুটিও গাড়ী থেকে নেমে এল। রয় বল্লে, ইনি আমার বাল্য বন্ধু মিঃ টি. এন্. দাস। বরাবর দিল্লীতেই ছিলেন, এখন বাংলাদেশে আছেন, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের হুগলী ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।

পুনরায় নমস্কার বিনিময় হোল।

নির্ম্মল বললে, আপনারা কি বরাবর গাড়ীতেই আসছেন?

মিঃ দাস সায় দিলেন।

অজিত বললে, মিঃ রয়, আপনার কি ছুটি বুঝি? অফিস বন্ধ?

হাসিমুখে রয় বল্লে, খবরের কাগজের অফিস কি আর বন্ধ হয়? আমি দু'সপ্তাহ ছুটি নিলুম। দাসের নতুন গাড়ীতে চড়বার লোভ সামলাতে পারলুম না। কথাগুলো দাসের দিকে চেয়েই বলেছিল।

দাস বল্লে, বাজে কথা, ও সব আপনি শুনবেন না। রয় ছুটি নিয়ে দিল্লী যাবার ব্যবস্থাই করেছিল, এমন সময় ওর সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় আমার এক্‌সিডেণ্ট্যালি দেখা। সঙ্গে যেতে বল্লুম, ও রাজী হয়ে গেল।

নির্ম্মল বল্লে, সে যাই হোক, যাত্রার ইতিহাসে আমরা ইনটারেষ্টেড নই। কাশীতে এসেছেন এবং আমাদের

সঙ্গে দেখা হয়েছে, this is enough। তা এখানে ক'দিন থাকবেন ?

কদিন আবার ? কাল সকালেই চলে যাব, রয় উত্তর দিলে।

বাস, শুধু রাত্রিবাস !

ঠিক তাই, তবে চোর নই, হাসিমুখে রয় জবাব দিলে।

তার মানে ? দাস প্রশ্ন করলে।

রয় বললে, মানে জানি না। মানে জানতে হলে এখানে সব প্রফেসাররা রয়েছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা কর।

হাসিমুখে নির্ম্মল বল্লে, মিঃ দাস বরাবর দিল্লীতে বাস করেছেন, তাই হয়ত শোনেন নি, বাংলাদেশে একটা প্রচলিত কথা আছে 'চোরের রাত্রিবাসই লাভ'। উনি বোধ হয় সেই কথাটাই বলছেন।

অজিত বল্লে, মিঃ রয়, এখানে থাকবেন কোথায় ?

দেখি একটা হোটেলে ব্যবস্থা করতে হবে। আচ্ছা, আপনারা কোথায় আছেন ?

অজিত নির্ম্মলকে দেখিয়ে বল্লে, কাকার বাড়ীতে।

ও, আপনি বুঝি কাশীতেই থাকেন ? তা হলে ভালই হয়েছে। কোন্ হোটেলে যাওয়া যায় বলুন ত ?

নির্ম্মল বললে, চলুন, আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

গুড্। আচ্ছা সেখানে গ্যারেজ আছে ? গাড়ীর ক্লীনার পাওয়া যাবে ? মিঃ দাস প্রশ্ন করলেন।

ক্লীনার—নির্ম্মল ভাবতে ভাবতে বল্লে, ক্লীনার পাওয়া যাবে কি না জানি না, তবে গাড়ী রাখার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দাস বল্লে, সেটা কত দূরে ?

কাছেই।

নির্ম্মলের স্ত্রী নির্ম্মলকে কানে কানে বল্লে, আমাদের ওখানেই ওদের নিয়ে চল না। নির্ম্মল ইঙ্গিতে সায় দিয়ে দাসকে বল্লে, দাঁড়ান, একখানা ট্যাক্সি ডেকে নি। এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।

দাস বললে, আবার ট্যাক্সির কি দরকার ? একটু চেপে চেপে বসলে আমার গাড়ীতেই ছ'জনে যাওয়া যাবে।

দাস ষ্টীয়ারিং-এ বসল, রয় তার পাশে, পিছনের সিটে অজিত, রমা ও নির্ম্মলের স্ত্রী বিপাশা। গাড়ী ষ্টার্ট দিলে।

বিপাশা রমার হাতে চিম্‌টি কেটে বল্লে, একেই বলে টান্।

রমা মুখ লাল করে বল্লে, উঁঃ।

বিপাশা ফিস্‌ফিস্ করে বল্লে, যা ভেবেছি তাই ?

চুপ্, রমা ওকে থামিয়ে দিলে।

নির্ম্মলের নির্দ্দেশ অনুসারে গাড়ী চালিয়ে মিঃ দাস গাড়ী নিয়ে নির্ম্মলের গেটের মধ্যে ঢুকলে অজিত একটু বিস্মিত, বল্লে, কাকা, এখানে—

নির্ম্মল বললে হ্যাঁ। দাসকে শুনিয়ে বললে, একটা রাত এই হোটেলে এক রকম কেটেই যাবে।

গেটের পরেই অনেকখানি খোলা উঠান। সুন্দর বাঁধানো। তারপর দু'পাশে বারাণ্ডা, বারাণ্ডার পর ঘর, মাঝখান দিয়ে চওড়া সিঁড়ি ওপোরে উঠে গেছে। বারাণ্ডায় আরো তিনটি ছেলে সেই বারাণ্ডায় রয়েছে। এরা একতলার ভাড়াটেদের ছেলে। নির্ম্মলের বাবার সময় থেকে দু'ঘর বাঙ্গালী ভাড়াটে একতলায় থাকে। বিশিষ্ট ভদ্রলোক এরা। কাশীতেই কাজ করে। ভাড়া দেয়, আবার বাড়ী দেখাশোনাও করে। ওপোর তলাটা নির্ম্মলের বাবা নিজেদের জন্যই রেখেছিলেন, যখন আসতেন তখন ওপোরেই থাকতেন। সেই আমল থেকে একই নিয়ম চলে আসছে।

গাড়ী থেকে বেরিয়ে দাস বল্লে, এ হোটেলটা আগে দেখি নি, বেশ নিরিবিলি ত। সুন্দর জায়গা।

নির্ম্মল বললে, চলুন সব ওপোরে। আপনাদের জিনিষ-পত্র নেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, কিছু ভাবতে হবে না। আপনাদের জিনিষগুলো কোথায় ?

দাস বল্লে, জিনিষ মানে গোটা দুই সুটকেশ এবং আরও গোটা কয়েক খুচরা টুকিটাকি, সবই ঐ পেছনের বক্সে আছে। এই নিন চাবি।

নির্ম্মল স্ত্রীকে বললে, এদের নিয়ে যাও, ঐ সাইডের ঘরটা ঠিক করে দাও। বলেই রয়কে বললে, আপনি ওদের সঙ্গে ওপোরে যান, আমি মাল তোলার লোক ডেকে আনি।

ওরা ওপোরে উঠে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রয় বললে, অজিতবাবু, উনি এই হোটেলের—

অজিত বললে, এটা ওঁরই বাড়ী।

ও? তা ওঁর কি হোটেলবিজনেসও আছে?

না ত।

ওরা ওপোরে উঠে এল!

দোতলার বারাণ্ডার প্রথমেই দেখা হোল জ্ঞানবাবুর সঙ্গে। মোটরের শব্দে জ্ঞানবাবু বারাণ্ডায় পাতা ডেক-চেয়ার থেকে উঠে বারাণ্ডার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নিচের উঠানের দিকে দেখছিলেন।

চওড়া সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি একসঙ্গে উঠে এল রমা ও বিপাশা। ঠিক পেছনেই অজিত, মিঃ দাস ও রয়। ওপোরের বারাণ্ডায় এসে অজিত রয়কে আস্তে আস্তে বললে, বাবা দেখছি বারাণ্ডাতেই আছেন।

রয় বললে, ভেরী গুড্। এগিয়ে এসে জ্ঞানবাবুকে গুড ইভ্নিং জানিয়ে মিঃ দাসের পরিচয় করিয়ে দিলে! জ্ঞানবাবু যে খুসি হলেন, তা নয়, তবে একরকম মানিয়ে নিলেন।

এর পরেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল একজন মজুর শ্রেণীর লোক এবং দু'বার স্টেপ দিয়ে গাড়ীর জিনিষগুলো সমস্ত এনে কোণের ঘরে তুলে দিলে। নির্ম্মল লোকটার সাহায্যে ওদিকার ঘর থেকে একটা তক্তপোষ নিয়ে টানাটানি করে কোণের ঘরে হাজির করলে, কারণ সেই ঘরে মাত্র একখানা খাট ছিল।

রয় বল্লে, আঃঃ. আপনি আবার এই সব হাঙ্গামা করতে গেলেন কেন, আমরা একজন মেঝেয় শুলেই ত চুকে যেত।

নির্ম্মল বললে, না না, রয়েছে যখন—

রয় বললে, প্রফেসার ব্যানার্জ্জী, এ আপনার কি অন্যায় বলুন ত। আপনার নিজের বাড়ীটা হোটেল বলে চালিয়ে নিলেন।

নির্ম্মল বললে, হোটেলই ত!

গম্ভীর মুখে রয় বললে, হোটেল? তাহলে এখানকার চার্জ্জ কত?

মিঃ দাস এতক্ষণে কেমন একটা রহস্যের গন্ধ পেয়েছেন। বল্লেন, মালিকটি কে?

নির্ম্মল উত্তর দিলে, মিসেস্ ব্যানার্জ্জী।

তাহলে আপনি? আপনি কে?

আমি মালি।

হোল না, রয় গম্ভীর মুখে উত্তর দিলে, আপনি মালাকর, 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'।

ওরা তিনজনেই হেসে উঠল।

রয় বল্লে, না না, এ আপনার ভারী অন্যায়। হোটেল বলে নিজের বাড়ীতে—

নির্ম্মল বল্লে, নিশ্চয়,—রাত্রিকালে, বিদেশে, অজানা লোককে পথ ভুলিয়ে—রীতিমত চিটিং কেস্, ফোরটয়েন্টি—একটু থেমে বল্লে, আপনারা বসুন, হাত-মুখ ধুয়ে নিন; আমি এখনই আস্ছি। অজিত—অজিত কোথায়।

বারাণ্ডা থেকে অজিত এসে বল্লে, কি কাকাবাবু।

নির্ম্মল বল্লে, নাও, এঁদের বাথরুম দেখিয়ে দাও, আমি একটু বেরুচ্ছি। আপনারা ওয়াস্ করে নিন, আমি এক্ষুনি ফিরব। নির্ম্মল দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল।

আহারাদির পর ছ'জনে বারাণ্ডায় জটলা করতে বসল।

শোনা গেল রয় এবং দাস গতকাল দুপুরে হুগলী থেকে বেরিয়ে রাত্রে দাশের এক বন্ধুর কাছে দুর্গাপুরে ছিল এবং আজ সকালে সেখান থেকে বেরিয়ে ওদের বেণারস অথবা এলাহাবাদ কোথাও এক জায়গায় থাকার ইচ্ছে ছিল। এর পরের প্রোগ্রাম হচ্ছে, কাল সকালেই চা খেয়ে রওনা দেওয়া এবং দুপুরে লাঞ্চের জন্য বেশী সময় নষ্ট না করে কালই রাত্রে দিল্লী পৌঁছে যাওয়া। দাস বল্লে, এ রাস্তা আমার ভালভাবেই জানা আছে। এখানে বেশী ভিড় হয় না। অধিকাংশ জায়গাতেই পঞ্চাশ পঞ্চান্ন মাইল স্পীডে চালানো যাবে।

নির্ম্মল বল্লে, দাদা, আপনাদের এই প্রস্তাব আমি ভেটো করলুম। কাশীতে এসে বিশ্বনাথ দর্শন না করলে শিব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন।

রয় বল্লে, সেই দর্শন করার জন্য আপনাকে আমরা power of attorney দিলুম।

দাস বল্লে, রাইট্, উকীল দিয়ে সব কাজ হয়, অতএব শিবের রুদ্রমূর্ত্তি ধারণের কোন কারণ আর রইল না।

কিন্তু হোটেলের মালিক ছাড়বেন কি? কি গো তোমার মত? নির্ম্মল বিপাশাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলে।

উহুঁ, আরজী না-মঞ্জুর, বিপাশা উত্তর দিলে।

নিশ্চয়। বিনা নোটীশে রাত্রে যা ছাই-ভস্ম খাইয়েছ, এই খেয়ে কাল সকালেই যদি অতিথিরা পালায়, তাহলে হোটেলের বদ্নাম হয়ে যাবে. নির্ম্মল গম্ভীর ভাবে মন্তব্য করলে।

তাহলে অবশ্যই পালাতে হবে। বিনা নোটীশের খাওয়া যদি এই হয়, তাহলে নোটীশের খাওয়ার পর পৈতৃক উদর দামোদর হয়ে যাবে, সেই ফাঁড়া কাটাবার জন্য কাল ভোরবেলা অবশ্যই পালাতে হবে, মিঃ দাস মত প্রকাশ করলেন।

অজিত বল্লে, মিঃ দাস, আমার কথা শুনুন। কাল সকাল-সকাল খেয়ে সারনাথে চলুন। সেখান থেকে সন্ধ্যের সময় ফিরে রাত্রে ঘুমিয়ে পরশু ভোরে দিল্লী যাবেন।

দাস বল্লে, সারনাথে আর বার বার দেখার মত কি আছে? তবে রয়ের যদি ইচ্ছে থাকে—

রয় বল্লে, ইচ্ছে অনিচ্ছের প্রশ্ন নয় ভাই, দিল্লীতে আমার অনেকগুলো কাজ সারতে হবে। সময় লাগবে সেখানে—

রমা এতক্ষণ এদের কথাই শুনছিল। কিছু বলে নি। সারনাথ যাবার ঝোঁক ওর খুবই ছিল। এতক্ষণ পরে রমা বল্লে, একটা দিন কি খুবই বেশী হোল মিঃ রয়। সকলে যখন বলছে তখন থেকেই যান্।

আপনার সারনাথ যেতে এতই ইচ্ছে, রয় প্রশ্ন করলে।

ইচ্ছে মানে? আমার একবারও যাওয়া হয় নি, রমা উত্তর দিলে।

দাসকে লক্ষ্য করে রয় বল্লে, কি হে, থাকবে না কি?

থাকো, দাস উত্তর দিলে।

অজিত আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বিপাশাকে লক্ষ্য করে বল্লে, কাকীমা, কাল কিন্তু ভোরেই বেরুতে হবে, সকালে খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা করতে পারবেন না। সে ভুলেই গেল যে সেই সকাল-সকাল খাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল।

রয় ও রমার কথা নির্ম্মল অতিরঞ্জিত ভাবেই বিপাশার কাছ থেকে নির্ম্মল আগেই শুনেছিল। বিপাশা রয়ের আসার ক'দিন আগেই কথাপ্রসঙ্গে রয়ের কাহিনী অজিত ও রমার কাছ থেকে সংগ্রহ করে যেটুকু অনুমান করেছিল সেটুকুর ওপোর নীলিমা দেবীর মুখে রয়ের প্রশংসা শুনে বেশ একটা রঙিন কাহিনী মনে মনে রচনা করে নির্ম্মলকে বলেছিল। এবার সুযোগ বুঝে নির্ম্মল বললে, ধন্য বঙ্কিম-চন্দ্র, এমন না হলে কি আর ঋষি বঙ্কিম বলা হয়?

এর মধ্যে হঠাৎ ঋষি বঙ্কিমের আবির্ভাব হোল কেন? রয় প্রশ্ন করলে।

ঋষি বঙ্কিম বলে গেছেন, সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র, নির্ম্মল সংক্ষেপে উত্তর দিলে।

রয় বল্লে, না, ladies' reques, সুন্দর অসুন্দরের কোন প্রশ্নই নেই। রয়ের উত্তরটা কথঞ্চিৎ কর্কশ বলেই মনে হোল।

পরের দিন সারাটা দুপুর ওদের ছ' জনেরই সারনাথে কেটেছিল। মাটীর তলার গলিগুলোয় ঘুরে, অশোক-স্তম্ভের ছবি তুলে, মিউজিয়মের জিনিষগুলো খুঁটিয়ে দেখে, মূলগন্ধকুটী বিহারের দেওয়ালের প্রত্যেকটি ছবির আলোচনা করে, জাপানী ধর্ম্মশালার বেঞ্চে বসে টিফিন কেরিয়ারের খাবার এবং ফ্লাস্কের কফি ধ্বংস করে কখন কোথা দিয়ে যে পাঁচটা বেজে গেল তা ওরা কেউ যেন টেরই পেলে না! এর মধ্যে ফটো তোলা হয়েছে অনেক-গুলো, কারণ ক্যামেরা ছিল তিনটে। নির্ম্মল, দাস এবং রয় তিনজনে সারনাথ রেল ষ্টেশন, দুটো স্তূপ, এমন কি পোষ্ট অফিস পর্য্যন্ত কোনটা বাদ না দিয়ে একধার থেকে ফটো তুলতে সুরু করলে। একা অজিতই রয়ের ক্যামেরায় অনেকগুলো ফটো তুল্লে। ওর মধ্যে নির্ম্মলের একখানা আকস্মিক স্ন্যাপ বড় মজাদার হয়েছিল। অশোকস্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে রয়ের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল রমা। রমা আঙুল উঁচু করে ব্রাহ্মী লিপির অক্ষরগুলো দেখাচ্ছিল এবং রয় একাগ্রভাবে রমার মুখের দিকে চেয়ে তার কথা শুনছে এই অবস্থায় 'ক্লিক', নির্ম্মলের ক্যামেরায় ফটো উঠল। বিপাশা হাসি-হাসি মুখখানা ঘুরিয়ে নিলে, রমা মুখ তুলে বিপাশার দিকে চেয়েই লাল হয়ে গেল; দাস অজিতের সঙ্গে কথা কইতে কইতে এদের দিকে চাইলে, অজিত বল্লে, পোজটা খুব ফাইন হয়েছে, না কাকা? অজিতের প্রশ্নে নির্ম্মল কোন উত্তরই দিলে না।

ফেরবার সময় অজিত বল্লে আমি একটু গাড়ী চালাব।

বাবা বকবেন, রয় উত্তর দিল।

দাস বল্লে, রয় দেখ ত ভাই, পেছনের চাকাটা যেন বসে গেছে মনে হচ্ছে। leak-টিক হোল না কি ?

সর্ব্বনাশ ! রয় চাকা দেখতে ছুটল।

দাস ষ্টিয়ারিংএ বসে অজিতকে ডেকে বল্লে, আসুন, পাশে বসে ষ্টিয়ারিং ধরুন, কিন্তু বাবা বক্‌লে আমি জানি না।

অজিত দাসের পাশে উঠে বসতেই বিনা ভণিতায় নির্ম্মল অজিতের পাশে উঠে বসে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিলে।

দৌড়ে ফিরে এসে রয় বল্লে, না হে, চাকা ঠিক আছে, leak নেই। কিন্তু—বা রে, আমার সিট যে বেদখল। আমি কি এখানেই থাকব না কি ?

নির্ম্মল বল্লে, থাকতেও পারেন, আর না হয়ত পেছনে উঠুন, হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে নির্ম্মল পিছনের সিট দেখিয়ে দিলে।

পিছনের সিটে ড্রাইভারের ঠিক পিছনে ছিল বিপাশা। সে রমাকে টেনে মাঝখানে সরিয়ে রয়কে রমার পাশে বসার আমন্ত্রণ জানালে। রমা একটু জড়-সড় হয়ে বসল। রয় সকলের মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় অনুমান করতে পারলে কি পারলে না যে, এর মধ্যে গভীর এক ষড়যন্ত্র আছে। মুখে কিছু না বলে পিছনের দরজা খুলে রমার পাশে রয় বসল। নির্ম্মল পিছন ফিরে মুখ ঘুরিয়ে বিপাশার দিকে দেখলে, বিপাশা হাসি মুখ নামিয়ে নিলে। গাড়ী ষ্টার্ট দিল।

ক্লাচ এবং ব্রেকটা নিজের পায়ে রেখে ষ্টিয়ারিংটা অজিতের হাতে ছেড়ে দিয়ে দাস বল্লে, নিন, হাতে খড়ি করুন।

গাড়ীখানা আস্তে আস্তে চল্‌তে লাগল।

দাস বল্লে, আজকের দিনটা বেশ ভালই কাটল, এজন্য কিন্তু আন্তরিক ধন্যবাদ মিস্ মুখার্জ্জীকে।

মিস্ মুখার্জ্জী কেন ? আমরা কি কেউ নই, নির্ম্মল ফোড়ন দিলে।

দাস বল্লে, আপনি ত—নিজেই বলেছেন, আপনি মালি। মালিরা কখনও ধন্যবাদ পায় না।

নির্ম্মল বল্লে, আমি না হয় মালি, কিন্তু মালিকও ত সঙ্গে রয়েছেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়, উনি ত—তবে উনি ধন্যবাদের অনেক ওপোরে। মানে আসল কথা হচ্ছে মিস্ মুখার্জ্জী না থাকলে রয়কে আজ এখানে ধরে রাখা যেত না। এতক্ষণে হাতরাস কি আলিগড়ের রাস্তায় গাড়ী ছুটত।

পেছন থেকে রয় বল্‌লে, না না, থাক্‌তে আমার আপত্তি ত ছিল না, বিশেষতঃ হোষ্ট যখন প্রফেসার ব্যানার্জী, তবে দিল্লীতে আমার কাজ আছে অনেক সেইজন্যে—

সোজা করে সোজা করে, দাস ষ্টিয়ারিংটা ঠিক করে দিলে। অজিত গাড়ীটাকে ডান দিকে এনে ফেলছিল।

রমা বল্‌লে, অজিত, আর নয়, ছেড়ে দে, শেষে কি এক্‌সিডেন্ট করে বসবি ?

অজিত বল্‌লে, না:, মি: দাস রয়েছেন, ভয় কি ?

বাড়ী পৌছে দাস বল্‌লে প্রফেসার ব্যানার্জ্জী, আজও আপনার সেই ক্লীনারটিকে আর একবার চাই। তবে একটা কথা, ওর মজুরী কিন্তু আপনাকে দিতে দেব না।

হাসিমুখে নির্ম্মল বল্‌লে, o-k,

আহারাদির পর আজও বৈঠক বসল অতিথিদের ঘরে কিন্তু রমা সেই বৈঠকে অনুপস্থিত। নির্ম্মল বল্‌লে, অজিত, তোমার দিদি কোথায় ?

দাস বল্‌লে, শরীর খারাপ না কি ? সারাটা দিন ধুলোয় রোদ্দুরে—

বিপাশা বল্‌লে, কই শরীর খারাপ ত শুনি নি, আচ্ছা দেখছি বিপাশা উঠে গেল।

নির্ম্মল বল্‌লে, অজিত তুমিও একটু দেখ ত, দিদির কি হোল ?

অজিত বিপাশার পেছনে উঠে গেল।

নির্ম্মল বল্লে মি: দাস,—

কি ?

প্রস্তাবটা কি পবিত্র বারাণসী ধামেই হবে না কি ?

রয়ের দিকে চেয়ে দাস হাসিমুখে বল্‌লে the sooner the better, কি বল হে রয় সাহেব।

গম্ভীর ভাবে রয় বল্‌লে, সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে।

কিন্তু জানেন ত ? বিশ্বকবি বলেছেন, 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' নির্ম্মল উত্তর দিলে।

রয় বল্‌লে, some other topic please।

নির্ম্মল বল্‌লে, other topic, ভাল কথা। কাশীতে

'এখন রামনগরের বড় বড় বেগুন উঠতে সুরু হয়েছে, দাম একটু বেশী কিন্তু শীতকালে খুব সস্তা হবে. ষাঁড়গুলো গলির মুখে দাঁড়িয়ে শালপাতা খায়, ভিখারীরা গঙ্গার ধারে সারি সারি বসে ভিক্ষা করে—

রয় বল্লে সূর্য্য ভোর বেলা পূর্ব্ব দিকে ওঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়।

ওরা তিনজনেই হেসে উঠল। অজিত ঘরে ঢুকে বল্লে, দিদি শুয়ে পড়েছে, কাকীমা দিদিকে টানাটানি করছে।

শরীর খারাপ হয়েছে ত? মিঃ দাস প্রশ্ন করলে।

অজিত বল্লে, না না, দিদিটা ঐ রকমই। এক এক সময় কেমন যেন বিগড়ে যায়, গুম্ হয়ে থাকে।

বিপাশা ঘরে এসে বল্লে, রমার শরীর তেমন ভাল নয়, শুয়েছে।

শরীর, না মন? প্রশ্ন করলে নির্ম্মল। ঐ প্রশ্নে কেউই কান দিলে না।

কিন্তু সেদিনের আসর তেমন জম্লো না। তোয়ালে নিয়ে মিঃ রয় বাথরুমে যাবার উপক্রম করে বল্লে, এক্সিউজ মি, স্নানটা সেরে আসি।

বিপাশা বল্লে, রাত্রে স্নান?

অজিত বল্লে, উনি রাত্রেই স্নান করেন, শোবার আগে।

রয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অজিত বল্লে, আমাদের বাড়ীতেও উনি রোজ রাত্রে শোবার আগে স্নান করেন।

বিপাশা নির্ম্মলকে লক্ষ্য করে বল্লে, তোমার দৌত্য সফল ত?

কই আর? মিঃ দাস যদি হেল্প্ করেন, কথাগুলো নির্ম্মল মিঃ দাসের দিকে চেয়ে চেয়েই বল্লে।

দাস বল্লে, এখনই কিছু হবে বলে মনে হয় না। রয় বাইরে যাবার চেষ্টা করছে।

কোথায়? নির্ম্মল প্রশ্ন করলে।

দাস বল্লে, শুনেছি, ইউ এন্ ও যাবার জন্য ও চেষ্টা করছে। ওর মাথায় ঢুকেছে, ইউ এন ও ছাড়া বড় এবং ভাল কাজ করা যায় না।

ইউ এন ও-তে কি কাজ?

ঠিক জানি না। ও একটু একবগ্গা গোছের লোক। ওর সমস্ত আইডিয়াই একটু অভিনব। সাধারণ লোক যা ভাবে, যা করে, ও ঠিক সেইগুলোরই বিরোধিতা করে। এম্নিতে লোক ও খুবই ভালো, খুব উঁচুদরের মন, কিন্তু যাকে আমরা Normal বলি, ও ঠিক তা নয়।

সর্ব্বনাশ! নির্ম্মল বল্লে Normal নয়, তাহলে কি abnormal না কি?

হাস্তে হাসতে দাস বল্লে, প্রায় তাই। স্কুলে আমরা ওকে পাগল বলতাম।

প্রতিবাদ জানিয়ে বিপাশা বল্লে, এসব আপনাদের বাড়াবাড়ি কেন, এই ত সারাদিন ধরে এক সঙ্গে ঘুরলুম—

দাস বল্লে, না, তাতে কোন অসুবিধে নেই। কাম্ড়ে অবিশ্যি দেবে না, কিন্তু যে কোন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বসুন, দেখবেন প্রচলিত কোন মতকেই ও বিশ্বাস করে না। otherwise ওর মতন সরল ও সাদাসিদে, মনখোলা লোক সহজে খুঁজে পাবেন না।

মাথা মুছতে মুছতে রয় এসে ঘরে ঢুকল। চিরুণী নিয়ে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বল্লে, কি সব আলোচনা হচ্চে—

পরচর্চ্চা, স্রেফ্ পরচর্চ্চা, একজনের নৈশস্নান নিয়ে, দাস উত্তর দিলে—

নির্ম্মল বল্লে, পর কোথায়, রয় কি আমাদের পর নাকি?

বিপাশা বল্লে, তুমি উঠবে, না এখনও ওঁদের বিরক্ত করবে? ওঁরা শোবেন না?

এই ওঁদের মধ্যে আপনি বোধ হয় অন্যতম, নির্ম্মল বিপাশাকে পাল্টা অভিযোগ করলে।

তাই বুঝি বল্ছি, বিপাশা উঠে দাঁড়াল।

দাস বল্লে, দাদা, ঐ সব ঝগড়াগুলো সর্ব্বসমক্ষে হওয়া কি উচিত?

তা বটে, নির্ম্মল বল্লে, চল, জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে, যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে—

হয়েছে, এখন থামুন ত মশাই, বিপাশা নির্ম্মলকে ধম্কে উঠল।

পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে ওরা বিদায় নিলে।

পরের দিন সকালে অতিথির দল চা পানান্তে রওনা

দিলে। যতক্ষণ দেখা গেল, অজিত সেই দিকেই চেয়ে রইল। গাড়ীখানা নজরের বাইরে চলে গেলে অজিত বললে, পরীক্ষার পর হলে আমিও যেতুম, বাবার কথা কিছুতেই শুনতুম না।

রমা বললে, গুণধর ছেলে, বাবার কথা শুনবে কেন?

আট

জ্ঞানবাবুরা কলকাতায় ফেরার চার পাঁচ দিন পরে একদিন সকালে অজিত বল্লে, দিদি, মিঃ রয় ফিরেছেন।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, তাই না কি? এ মাসের ভাড়াটা এখনও পাইনি। এখন ও ঘরে আছে ত?

অজিত বল্লে, না বাবা, স্কুটারের শব্দ পেয়ে দেখলুম, উনি বেড়িয়ে গেলেন। বোধ হয় কাল রাত্রে ফিরে থাকবেন।

জ্ঞানবাবু বললেন, এত সকালে বেরিয়ে গেল? কাল সকালেই ধরতে হবে।

রমা বল্লে, ধরবার দরকার কি বাবা? এ ক'মাসের মধ্যে একবারও কি তাগিদ দিতে হয়েছে? নিজে এসে দিয়ে যান। দেখো, কাল সকালে নিশ্চয়ই দিয়ে যাবেন।

দেখা যাক। জ্ঞানবাবু বাসুয়াকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে গেলেন।

রমা বল্লে অজিত, আজ তোর কলেজ খুলবে না?

অজিত বল্লে, খুলবে ত!

রমা বল্লে, একমাস ধরে পড়াশোনা সব বন্ধ। এই যে কদিন এসেছিস, এর মধ্যেও ত বই নিয়ে বসতে দেখি না। এবার পরীক্ষায় রসগোল্লা খাওয়ার ইচ্ছা আছে বুঝি?

তোর যেমন কথা! রসগোল্লা খেতে হয় তুই খা গে যা, অজিত অভিমানভরে কথাগুলো বলেই বল্লে, সত্যি ভাই দিদি, কাশীতে দিনগুলো বেশ কেটেছিল। পরীক্ষার পরে যে করেই হোক, আর একবার যাব।

একলা?

একলা কেন? কাকা বলে দিয়েছে প্রত্যেক ছুটিতে আমাকে নিয়ে যাবে। তোরা কেউ না গেলেও আমি যাব।

হুঁ-উ-উ,—বাবার ধমকে চক্ষু অন্ধকার দেখবে।

ইস্, বাবা কিচ্ছু বলবে না, তুই দেখিস্।

নাঃ বলবে না, পূজো করবে!

অজিত বলে, তুই দেখিস বাবা কিছু বলবে না। বাবা কাছে টাকা চাইলেই বাবা রাগ করবে। না হলে রেল ভাড়া পাবি কোথায়?

সে আমি মায়ের কাছ থেকে জোগার করব। তো টাকা ত মায়ের কাছে থাকে, সেই থেকে নিে যাব।

ওঃ খুব ছেলে। আমি মাকে বারণ করে দেব।

অজিত খপ্ করে দিদির হাতটা চেপে ধরে বল্লে, ন ভাই দিদি রাগ করিস্ নি, বরঞ্চ তুই একটু মাকে বলে দিস্—

আচ্ছা আচ্ছা, সে যখনকার কথা তখন হবে, এখ বই পত্র ঠিক করে নে ত। বলি, পরীক্ষাটা পাশ করতে হবে ত।

পর দিনেই সকালে একরাশ ফটো এসে উপস্থিত হোল রয়ের ক্যামেরার ফটোগুলো রয়ের কাছ থেকে দেখার জন্যে অজিত নিয়ে এল। নির্ম্মলের বাড়ী থেকেও অজিত তার তোলা ফটোগুলো এ বাড়ীতে দেখবার জন্য নিয়ে এল। সেই সঙ্গে খামে মোড়া একখানা চিঠিও এল, ওখানা বিপাশা লিখেছিল রমাকে।

খাম খুলে রমা দেখলে বিপাশা এক দীর্ঘ চিঠি ওকে লিখেছে এবং সেই সঙ্গে একখানা ফটো, যে ফটোখানা নির্ম্মল তুলেছিল,—অশোক স্তম্ভের ধারে দাঁড়ানো রমা ও রয়ের ঘনিষ্ঠ আলোকচিত্র। রমা ফটোখানা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে দেখে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেল্লে। অন্যান্য ছবির বাণ্ডিলের মধ্যে ঐ ফটোখানা ছিল না।

রয়ের দেওয়া ফটোগুলোর মধ্য থেকে তেরখানা ফটো নিয়ে অজিত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে দেখে দিদিকে এবং মাকে বারবার দেখাতে লাগল। ঐগুলো সমস্তই অজিতের নিজের তোলা। আটখানা সারনাথের এবং অন্যগুলো পথের বিভিন্ন জায়গার, কাশীতেও দুখানা তুলেছিল। বাবাকে দেখাতে অজিতের সাহস হো'ল না। বহুবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আবরণে জ্ঞানবাবু এমনইভাবে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

দুদিন ধরে ছবিগুলো দেখা এবং দেখানোর পর রমা বল্লে, অজিত, এগুলো রয়কে ফিরিয়ে দিবি না? দিয়ে আয়। না হলে উনি কি মনে করবেন বল ত?

কি আবার মনে করবেন? ছবি দেখার জন্য—তুলে রাখবার জন্য নয়, অজিত উত্তর দিলে।

রমা চুপ করে গেল। অজিত বল্লে জানিস্ দিদি, রয়ের নিজের তোলা ছবির এলবাম দেখেছি। ওঃ কত জায়গার কত সব ছবি। বেশীর ভাগই ইংলণ্ড, য়ুরোপের। তুই দেখবি? একদিন নিয়ে আসব?

আনিস্, নিস্পৃহ কণ্ঠে রমা উত্তর দিলে।

বেশীর ভাগ ছবিই ভাই কলকারখানার। নানা রকম যন্ত্রপাতি, কারখানা, বড় বড় ব্রিজ, আবার নদী, পাহাড়, বুনো জানোয়ার, জাহাজ, প্লেন কত রকম ছবি ওর এলবামে আছে।

তা হলে এগুলো নষ্ট করিস্ নি, ওঁকে দিয়ে দিস্ এগুলো নিশ্চয় এলবামে রাখবার জন্য উনি তুলেছেন।

দিয়ে ত দেবই, অজিত বল্লে, তবে উনি বলেছেন, আমার তোলা ছবিগুলো উনি আমাকেই দিয়ে দেবেন। এবং আমিও ওঁর মত এলবাম করে এগুলো তারিখ এবং জায়গার নাম দিয়ে সাজিয়ে রাখব। তা দিদি, আমার জন্য ভাল একটা এলবাম কিনে আন্তে পারিস্?

আনব রমা সায় দিলে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে অজিত বল্লে, দেখ্ দিদি, আমি ঠিক করেছি, কোন মতে বি.এটা পাশ করে রয়কে ধরে স্টেটস্‌ম্যান অফিসে রিপোর্টারের চাকরি জুটিয়ে নেব। রিপোর্টারের কি মজা বলত! সব জায়গায় আগে যাবে, সামনে বসবে, ফটো নেবে, বড় বড় লোকসব নিজেদের বিষয় ছাপাবার জন্য খোসামদ করবে এবং আমরা সকালে যে সব বিষয় কাগজে পড়ে হৈহল্লা করব, ওরা সেই সমস্ত খবর সকলের আগে জানতে পারবে। ওদের নাকি এমন সব টাইপ কল আছে, যেগুলোয় দিল্লীতে বসে টাইপ করলে কলকাতায় টাইপ হয়ে যায়। কি মজা বল্ ত?

রমা বল্লে হুঁ, ঐ টাইপ করাকে টেলিপ্রিণ্টার বলে।

কি করে হয় দিদি? খুব আশ্চর্য নয়?

বাইরে থেকে রয় বল্লে আসতে পারি?

আসুন, আসুন, অজিত তাড়াতাড়ি উঠে পরদা সরিয়ে রয়কে আহ্বান করলে।

রয় ঘরে ঢুকেই বল্লে, গুড মর্নিং মিস্ এণ্ড মিঃ মুখার্জ্জী।

এরাও গুডমর্নিং জানালে।

রয় চেয়ারটা টেনে নিয়ে বল্লে প্রফেসার মুখার্জ্জী আছেন?

অজিত বল্লে বাবা? হ্যাঁ বাবা ত এইমাত্র বাজার থেকে ফিরলেন। ডেকে দেব?

একটু কথা ছিল, রয় উত্তর দিলে।

অজিত বাবাকে ডাকবার জন্য বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

তারপর মিস্ মুখার্জ্জী, কি করছেন বলুন, রয় বেশ ঘনিষ্ঠতার সুরে প্রশ্ন করলে।

এই চল্‌ছে, আপনি কেমন আছেন? রমা প্রশ্ন করলে।

আমার কথা? আমার এখন Strike the tent, অর্থাৎ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এলুম।

বড় বড় চোখ দুটো তুলে রমা বল্লে তার মানে?

মানে নিউইয়র্ক যাচ্ছি। ইউ এন্ ওতে একটা কাজ পেয়েছি, পাস্‌পোর্টও হয়ে গেছে। কালকের প্লেনে রওনা দিচ্ছি।

কতদিনের জন্য?

জানি না for good-ও হতে পারে, রয় উত্তর দিলে।

সে কি? দেশ ছেড়ে চিরকালের মত—রমার বাক্‌রোধ হল।

'তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে' দেখি যদি কাজের মত কাজ কিছু করতে পারি, রয় উত্তর দিলে।

জ্ঞানবাবু ঘরে ঢুকতেই রয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুপ্রভাত জানালে।

জ্ঞান বাবু প্রতি-সুপ্রভাত জানিয়ে বল্লেন, যাক্, অনেক দিন পরে আপনার দেখা পেলুম। বসুন বসুন।

রয় বল্লে, না, এখন আর বসতে পারছি না প্রফেসার মুখার্জ্জী, বড় ব্যস্ত আছি। আপনাকে বলতে এলুম যে আগামী কাল আমি চলে যাচ্ছি।

কোথায়?

নিউ ইয়র্ক যাত্রার কাহিনী শুনিয়ে রয় বল্লে, আমার এ মাসে ভাড়াটা দেওয়া হয় নি, মানে আমার যে এক

মাসের ভাড়া ডিপজিট আছে ঐটে এ মাসের ভাড়ার ধরে নেবেন।

ঘর ছেড়ে দিচ্ছেন? জ্ঞানবাবু প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ।

কিন্তু—কিন্তু একমাসের নোটীশ না দিয়ে ঘড় ছাড়া। অর্থাৎ আইনতঃ একমাসের নোটীশ দেওয়া ত উচিত। জ্ঞানবাবু হেসে হেসে বল্লেন।

রয় বল্লেন, একমাস আগে আমি নিজেই জানতুম না যে যাব। হঠাৎ যোগাযোগটা হয়ে গেল। কাজেই নোটীশ আর কি করে দেব?

জ্ঞান বল্লেন, হাঁ৷ either notice or month's rent এই হচ্ছে Rent Act-এর নিয়ম।

রমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রয় বল্লে, ঠিক আছে। আজ সন্ধ্যের সময় আপনি আছেন ত? ঐ সময় দেখা করব।

কবে যাবেন? জ্ঞান বাবু প্রশ্ন করলেন।

কাল সকাল আটটায় টেক্ অফ্ হবে। আচ্ছা বায় বায়্, রয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিকেল থেকে জ্ঞানবাবু ছট্‌ফট্ করছেন। লোকটা কি করে কে জানে! ভাড়া টাড়া বোধ হয় আর দেবে না। নীলিমা দেবী সচিন্তিতভাবে বল্লেন, ছেলেটা ভাল ছিল। চলে যাচ্ছে, আবার কে ঐ ঘরে ভাড়া আস্‌বে কে জানে? সে আবার কি রকম লোক হবে—

অজিতের খুবই মন খারাপ। রমা কিছুই বলে না, শুধু একটু বেশী পরিমাণে ধীর এবং গম্ভীর হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ করে রয় এল। ওর স্কুটারের শব্দ থামা মাত্রই জ্ঞানবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কিন্তু জ্ঞানবাবুকে কিছুই করতে হোল না। রয় নিজের ঘরে না গিয়ে প্রথমেই এ ঘরে এসে উপস্থিত হোল। জ্ঞান বাবু সাদরে স্বাগত জানালেন।

রয় বল্লে প্রফেসার মুখার্জ্জী, আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এলুম। কাল সকালে দেখা করা সম্ভব হবে না, সকাল সাড়ে ছ'টায় বেরিয়ে যাব।

জ্ঞানবাবু বল্লেন, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে তাহলে?

হ্যাঁ। আপনার এ মাসের ভাড়াটা নিয়ে নিন, ডিপোজিটটা আমার নোটীশের পরিবর্ত্তে adjnst করে নেবেন।

বলতে বলতেই অজিত এসে ঘরে ঢুকল, মিঃ রয় কি কালই যাচ্ছেন?

হ্যাঁ ভাই। এই প্রথম রয় অজিতকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করলেন পরে নিজের কাঁধে ঝোলান রোলিফ্লেক্স ক্যামেরেটা খুলে নিয়ে অজিতের দিকে এগিয়ে ধরে বল্লে এইটা আপনি ব্যবহার করবেন। এটার কাজ ত আপনি শিখে নিয়েছেন। এটা ব্যবহার করবেন আর আমাকে মনে রাখবেন। রয় মৃদু হেসে ক্যামেরাটা টেবিলে রাখলে।

এটা—এমন দামী জিনিসটা—জ্ঞানবাবু অনেকখানি সঙ্কুচিত হলেন।

রয় বল্লে, এটা আমি জার্ম্মানীতে কিনেছিলুম, খুব ভাল সার্ভিস দিয়েছে আমাকে। এতে একটা নতন ফিল্‌ম্ পরিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, আর একটা কথা, আমার ঘরে যা জিনিসপত্র আছে ওগুলো আপনার সার্ভ্যাণ্টকে দিয়ে দেবেন। আর এই চিঠিখানা প্রফেসর ব্যানার্জ্জীকে সময় মত দিয়ে দেবেন। বড় সুন্দর ব্যবহার করেছিলেন তিনি, কিন্তু যাবার সময় দেখা করতে পারলুম না। এই সঙ্গে এই সামান্য জিনিসটাও তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন। পার্কার কলম ও পেনসিলের একটা সেট্ বাক্স সমেত টেবিলে রেখে রয় বল্লে, কাশীর হোস্ট হয়ে আমাদের পেছনে অনেক করছেন তিনি! কিন্তু দুঃখু রইল কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারলুম না।

'ফোনে কথা বললে পাবেন। অজিত উত্তর দিলে ওর বাড়ীতেও ফোন আছে।

ফোন? ফোন ত আমার নেই। আজই রিসিভারটা খুলে নিয়ে টেলিফোন অফিসে জমা দিয়ে এসেছি।

তাই বুঝি? আপনার স্কুটার? অজিত প্রশ্ন করলে।

ওটা বিক্রী করে দিয়েছি। আপনি ত চরবেন না, মানে প্রফেসর মুখার্জ্জী পছন্দ করেন না. না হলে ওটাও আপনাকেই রাখতে বলতুম, রয় উত্তর দিলে।

হতাশার ভঙ্গীতে অজিত বাবার দিকে দৃষ্টিপাত করলে! মুখে বললে. স্কুটারেই আপনি এলেন-না?

রয় বললে, হ্যাঁ, এই শেষ চড়লুম ঐ স্কুটারে। আজই

ওটা ট্রান্সফার করেছি আমার এক কলিগের ছোট ভাইকে। তারপরেও অনেক জায়গায় ঘুরলুম। আজ রাত্রি দশটায় সে এসে এখান থেকেই ওটা ডেলিভারী নিয়ে যাবে।

অজিত চুপ করে রইল।

একটু থেমে রয় বললে, মিস্ মুখার্জ্জী কোথায়?

অজিত বললে, দিদিকে ডাকব? দিদি বাড়ীতেই আছে। অজিত বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল।

ধীর পায়ে রমা বেরিয়ে এল। কোনরকম সম্ভাষণ না করেই রয়কে বল্লে, আমাকে ডেকেছেন?

ওর প্রাণহীন কণ্ঠস্বরে রয় ওর মুখের দিকে চেয়ে চট করে কোন উত্তর দিতে পারলে না। যে লোক দ্রুত কথা কয় সেই মিঃ রয় এক মিনিট নীরব থেকে পকেট হাৎড়ে একখানা কাগজ বের করে বললে, কিছু মনে করবেন না মিস্ মুখার্জ্জী, আমার রেডিওটা আপনি ব্যবহার করবেন। এই লাইসেন্সটা রাখুন। আর—আর আটটা টাকা এবং এই কাগজখানা রাখুন, কাল যে কোন সময়ে পাখাওয়ালা এলে তাঁকে পেডাষ্ট্যাল ফ্যানটা এবং এই আটটা টাকা দিয়ে দেবেন। পাখাটা ওদের কাছ থেকে ভাড়া করে এনেছিলুম। ওদের বলে দিয়েছি, কাল যে কোন সময়ে লোক পাঠিয়ে ওরা পাখা এবং এ মাসের পাখাভাড়া আট টাকা নিয়ে যাবে।

রয় নীরব হোল। জ্ঞানবাবু রয়ের দেওয়া এ মাসের ভাড়ার টাকাটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, মিঃ রয় তাহলে ভারতের দেনা পাওনা শোধ করে এ দেশের মায়া কাটালেন।

রয় বললে, মায়া কাটাব কি? আমি ভারতীয়, এবং ভারতীয় হিসাবেই ইউ, এন্, ওতে যাচ্ছি। নিউ ইয়র্কে থাকলেও আমি থাকব নিউইয়র্কের ভারতে। আচ্ছা আজ উঠি।

এর পর রয় যা করলে, তা এর পূর্ব্বে কোনদিন করে নি। যাবার সময় জোড় হাতে সকলকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলে, গুড নাইট বললে না। অজিত ওর সঙ্গেই বেরিয়ে গেল।

রেডিওর কাগজটা হাতে নিয়ে ঘাড় হেঁট করে রমা বাড়ীর ভেতর চলে গেল। নীলিমা দেবী এ ঘরে এসে জ্ঞানবাবুকে বললেন, রয় চলে যাচ্ছে?

হ্যাঁ, জ্ঞানবাবু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।

জ্ঞানবাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে নীলিমা দেবী বললেন, আহা, ছেলেটা বড় ভাল ছিল—

জ্ঞানবাবু বললেন, অনেক টাকার জিনিষ দিয়ে গেল গো! আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এ মাসের ভাড়াটা কি ওকে ফেরৎ দিয়ে দেব। নোটগুলো জ্ঞানবাবু তখনও হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করছেন, ফতুয়ার পকেটে পুরে ফেলেন নি।

সে তুমি জান, নীলিমা দেবী উত্তর দিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন।

রাত্রে এক ছোকরা এসে অজিতের সামনেই স্কুটার নিয়ে চলে গেল। অজিত সেইদিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। নেহাৎ বাবার জন্য, না হলে স্কুটারখানা ওরই হতে পারত।

ভোরবেলা ট্যাক্সি এনে ওয়ার্ড রোব, সুটকেশ, থার্ম্মো-ফ্লাস্ক এই সব নিয়ে এস্, এন্, রয় গাড়ীতে উঠল। যাবার সময় ঘরের তালাটা খুলে নিজের এটাচি কেসের মধ্যে পুরে নিলে। তালার দ্বিতীয় চাবিটা রমার কাছেই রয়ে গেল। রয় চায় নি, রমারও মনে ছিল না।

বায়্ বায়্, চিয়ারো, ট্যাক্সিতে বসে অজিতের হাত ধরে প্রাণভরে ঝাঁকানি দিতে লাগল একখানা ঘরের ভাড়াটে মিঃ এস্, এন, রয়।

রমা তখনও ঘর থেকে বেরোয় নি। ঘুমুচ্ছিল কি?

না, রমা ঘুমোয় নি। বিপাশার পাঠানো সেই ফটোখানা এক দৃষ্টিতে দেখছিল, সেখানা অধ্যাপক নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায় রয় ও রমার অজান্তে সারনাথে তুলেছিল।

পিতারূপী ভারতবর্ষ

চারণকবি শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(সুর বিলাবল—চৌতাল)

হে ভারত ! হে উদার !
হে বিরাট ! হে মহান্ !
একা বসি', আসন 'পর,
অনাদি কাল করিছ ধ্যান ।
হে বিরাট হে মহান্ ।
হৃদয় প্রাণ শান্ত হে
হিংসা লোভ ক্ষান্ত হে
মানবেরে যুগে যুগে
ডাকি' নিলে আপন ঠান্ ।
হে বিরাট হে মহান্ ।
বাক্য মন কভু যা'রে
ধরিবারে নাহি পারে
সবারে সেই অমিয়ারে
ডাকিছ হে করিতে পান ।
হে বিরাট হে মহান্ ।

উদার নীল তব আকাশ
অসীমেরি হেরি বিকাশ
শুনি সেথায় সদা উদাস
অনাহত বীণার তান
হে বিরাট হে মহান ।
রাত্রি দিন চরণপর
কূল বিহীন মহাসাগর
গাহিয়া যায় নিরন্তর
অন্তহীন মন্দ্র গান ।
হে বিরাট হে মহান ।
তব প্রতি ধূলিকণায়
কত বাণী রণ-রণায়
দিল সেথায় কত জনায়
বিভূতিময় জীবন দান্
হে বিরাট হে মহান ।

শিল্পী : শম্ভু রায়

কি পড়বে

শ্রীজ্ঞান

বই পড়ায় ঝোঁক তোমাদের সকলকারই অল্প বিস্তর যে আছে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। অবশ্য বই পড়া বলতে পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বইয়ের কথাই মনে হচ্ছে—কারণ পাঠ্যপুস্তক পড়ার ঝোঁক পরীক্ষা না থাকলে তোমাদের যে কতটা হত তা বুঝতে দেরী হয় না মোটেই!

যাই হোক, পাঠ্যপুস্তকের বাইরের নানা রকম বই ও সাময়িক পত্র পড়ার ঝোঁক তোমাদের মধ্যে অনেকেরই আছে এবং এই অভ্যাস যে ভালই তাতে কোনও সন্দেহই নেই। হৈ-হুল্লোড় করে বেড়ান, আড্ডা দিয়ে সময়ের অপব্যবহার করা, আলস্যে আরামে সময় নষ্ট করা প্রভৃতির চেয়ে বই পড়া শত গুণে ভাল, কারণ তাতে জ্ঞান লাভ কিছু হবেই হবে। কিন্তু কি ধরনের বই তোমরা পড়বে বা তোমাদের পড়া উচিত, তা কি তোমরা কখনও ভেবে দেখ? বোধ হয় না। যার যে ধরণের বই ভাল লাগে তাই নির্বিচারে পড়ে যাও—তাই নয় কি? কিন্তু এটা ঠিক নয়। পড়বার আগে বই নির্বাচন করে পড়াই উচিত।

পড়বার বই অবশ্য নানা রকমের আছে আর সকলের পছন্দও তো এক নয়। তাই যার যার ইচ্ছা মত বই নির্বাচন করেই পড়া হয়ে থাকে। অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকারা বেশীর ভাগই পছন্দ করে রহস্য-রোমাঞ্চ ও য়্যাড্‌ভেঞ্চারের বই। কিছু কিছু ছেলেরা বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প বা 'সায়ান্স ফিক্‌শান্'ও পছন্দ করে। তবে একটু যাদের বয়স হয়েছে তাদের বেশীর ভাগেরই নজর থাকে গল্প ও উপন্যাসের দিকে। প্রবন্ধ ও ঐ জাতীয় লেখা পড়বার ঝোঁক খুব কম ছেলেমেয়েরই থাকে।

রহস্য-রোমাঞ্চ-ডিটেক্‌টিভ-য়্যাড্‌ভেঞ্চার প্রভৃতি বই পড়াটা বিশেষ নিন্দনীয় নয়। রহস্য সিরিজের ঐ সব গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ে অনেক সময় বিশ্লেষণ শক্তি, যুক্তিবোধ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির উন্নতি হয়ে থাকে। তবে সর্বসময়ে এই ধরনের বইএর মধ্যে ডুবে থাকাটা ঠিক নয়। য়্যাড্‌ভেঞ্চারের বই পড়ে মনে সাহস ও শক্তির উদয় হয়। সুতরাং এই জাতীয় বই পড়ারও একটা গুণ আছে। য়্যাড্‌ভেঞ্চার মিশ্রিত 'সায়ান্স ফিক্‌শান্' গল্প হলেও বিজ্ঞান-ভিত্তিক বলে তার মধ্যে অনেক কিছু শিক্ষণীয় থাকে। তাই এই ধরণের বই পড়াতেও লাভ আছে। কিন্তু নিছক গল্প ও উপন্যাস পড়াতে ছোটদের বিশেষ কিছু লাভ হয় না। জ্ঞানার্জ্জন তো দূরের কথা, বরঞ্চ ঐ সব বড়দের উপযোগী বই পড়ে ছোটদের মনের যথেষ্ট ক্ষতিই হয়ে থাকে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে "প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য" বলে মার্কা দেওয়া বড়দের উপযোগী চিত্র ছোটদের দেখতে দেওয়া হয় না। কিন্তু পুস্তকপাঠের ক্ষেত্রে সেরকম কোনও নিয়ম নেই, আর তা করাও সম্ভব নয় কারণ ঘরের মধ্যে বসে কে কি বই পড়বে তা আইনের

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়। একমাত্র অভিভাবকরাই এ বিষয়ে সজাগ থেকে তাঁদের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী পুস্তক পাঠ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন। তবে তোমরা নিজেরাই যদি এ বিষয়ে সজাগ হয়ে, নিজেরাই নিজেদের পড়বার উপযোগী বই নির্ব্বাচন করতে পার তাহলেই সব চেয়ে ভাল হয়।

সব সময়ে এই কথাটা মনে রাখবে যে, যাই তোমরা পড়বে তা তোমাদের তরুণ মনের ওপর রেখা পাত করবে, প্রভাব বিস্তার করবে। যদি পাঠ্য বিষয় তোমাদের উপযুক্ত হয় অর্থাৎ তোমাদের মানসিক কোনও ক্ষতি সাধন না করে জ্ঞানার্জ্জনে সাহায্য করে, তাহলে সেই বিষয়ের পাঠ যে তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট লাভের হবে তা আর বলে দিতে হয় না। কিন্তু পাঠ্য বিষয় যদি তোমাদের বয়সের ও মনের উপযোগী না হয়, তাহলে তা হয়ত তোমাদের মনের ও চিন্তাধারার ক্ষতি সাধন করতে পারে—এমন কি অনেক ক্ষেত্রে মানসিক বিকৃতিও ঘটাতে পারে! সে ক্ষেত্রে এই পাঠ যে কত ক্ষতিকর হতে পারে তা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তাই তোমাদের বলছি পড়বার আগে কি পড়ছ তা দেখে, বুঝে পড়। অভিভাবকরা এ বিষয়ে দৃষ্টি না দিয়ে তাঁদের কর্ত্তব্যে অবহেলা করলেও তোমরা এ বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক হও এবং আজে বাজে বই পড়ে বা তোমাদের অনুপযোগী গর্হিত বিষয় পাঠ করে নিজেদের ক্ষতি সাধন কর না।

পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা নিশ্চয়ই পড়বে এবং এই পড়ার অভ্যাস বজায় রাখবে। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইজাক্ নিউটন্ ছোটবেলার থেকেই খুব অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতির ছিলেন। সব কিছুই জানবার তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল, আর তাই তাঁর মাকে তিনি সব সময় প্রশ্ন করতেন। নিউটনের মাও ছেলের প্রশ্নের জবাবে সব সময়ে বলতেন—তুমি পড়, তাহলেই জানতে পারবে ('Read and you will know')। তাই নিউটনও তাঁর জিজ্ঞাসু মনকে সন্তুষ্ট করতে ছোটবেলা থেকেই অদম্য আগ্রহে পুস্তক পাঠ আরম্ভ করেন এবং অজস্র পুস্তক পাঠ করে তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেন।

তোমাদের মধ্যেও এই জানবার আগ্রহ নিশ্চয়ই আছে এবং এই আগ্রহকে পরিতৃপ্ত করতে হলে তোমাদেরও পড়তে হবে অনেক বিষয় নিয়ে, জানতে হবে অনেক কিছুই সারা জীবনে। কিন্তু জানতো—"Art is long and time is short"! সুতরাং এই ছোটবেলার থেকেই প্রচুর পরিমাণে পড়তে আরম্ভ কর এবং তবেই হয়ত সারা জীবনে অল্প কিছু জ্ঞানার্জ্জন করতে পারবে। তবে সব সময়ে সতর্ক থেক যেন বাজে বিষয় পড়ে তোমাদের অমূল্য সময় নষ্ট না হয়। সুনির্ব্বাচিত পাঠ্য বস্তু যত পার পাঠ করে যাও, তাতে তোমাদের বিশেষ উপকারই সাধিত হবে এবং তোমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, মননশীলতা, আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পেয়ে তোমরা শিক্ষিত, সভ্য, সুস্থ, সুন্দর মানবে পরিণত হবে। এবং তোমরা উত্তরকালে তোমাদের এই পাঠাভ্যাসের দ্বারা জাতির মেধা ও মননশীলতা বর্দ্ধিত করে আমাদের দেশের প্রভূত উন্নতি সাধন করবে।

আমরা কি এ আশা করতে পারি না?

***

নামের চেয়ে প্রেম বড়

সুলতা কর

কি করে নিজের নাম হবে, যশ হবে, খ্যাতি হবে, এই কথাই আজকের পৃথিবীতে সবাই ভাবছে। কেউ কি ভাবে আবার নিজের নাম চাই না, যশ চাই না, খ্যাতি চাই না। আমি শুধু সবাইকে ভালবাসব, সবাইকে সুখী করব। আমি অপরের নাম, যশ, খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নিজের নাম, যশ, খ্যাতি বিসর্জ্জন দেব। কেউ কি ভাবে নামের চেয়ে প্রেম বড়।

অথচ অতীতে এই ছিল বাংলার একমাত্র আদর্শ। বাংলার প্রাণের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন কিশোর বয়সে। কিশোর নিমাই কেমন করে দেখিয়ে গেছেন—নামের চেয়ে প্রেম বড়—সেই গল্প শোন।—ছোটবেলায় চৈতন্যদেবের নাম ছিল নিমাই। কিশোর নিমাইয়ের যেমন রূপ গুণের তুলনা ছিল না, তেমনি বিদ্যাবুদ্ধির তুলনা ছিল না। নবদ্বীপের টোলের ছাত্র তিনি। তাঁর সঙ্গে পড়ত আর একটি কিশোর,

তাঁর প্রিয় বন্ধু। নাম তার রঘুনাথ। সেও ছিল অসাধারণ বুদ্ধিমান্।

টোলের আচার্য অন্য ছাত্রদের বলতেন—নিমাই আর রঘুনাথ, এরা দুজনেই হল টোলের রত্ন। তোমরা এদের মত হও।

দেখ মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে এরা তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কার-শাস্ত্র, কাব্য শেষ করে ন্যায়শাস্ত্র পর্যন্ত পড়ে ফেলল। সাধারণ ছাত্রেরা কত বেশী বয়সে ন্যায়শাস্ত্র পড়তে আরম্ভ করে, শেষ করা ত দূরের কথা।

আচার্যের কথা শুনে অন্য ছাত্রেরা অবাক হয়ে নিমাইকে আর রঘুনাথকে দেখত। ভাবত সত্যি এরা দুজনেই আমাদের টোলের রত্ন।

ন্যায়শাস্ত্রের শেষ পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেছে নিমাইয়ের আর রঘুনাথের। এখন অনেক সময় দুই বন্ধুর। রঘুনাথ একখানি ন্যায়শাস্ত্রের বই লিখতে আরম্ভ করলেন। বইয়ের নাম "দীধিতি"। রাতে ঘুম নেই, দিনে খাওয়া নেই, একমনে লিখে চলেছেন বইখানি। কিন্তু লিখছেন খুব গোপনে। কেউ যেন না জানতে পারে। এত গোপনে লেখেন যে প্রাণের বন্ধু নিমাইও জানতে পারে না। নিমাই থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করেন—"হাঁ রঘুনাথ, কি হয়েছে তোর? বাইরে বেরোস্ না, আমার সঙ্গে—অন্য বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করিস্ না। দিন রাত বাড়ীতে করিস কি?"—রঘুনাথ বলেন—"না ভাই কিছু করি না। পরীক্ষা শেষ হল, বিশ্রাম করছি।"

দীর্ঘ কয়েক মাস নিদারুণ পরিশ্রমের পর শেষ হল "দীধিতি" লেখা। রঘুনাথ নিজেই পড়েন, নিজেই মুগ্ধ হয়ে যান। মনে মনে ভাবেন যখন টোলে গিয়ে আচার্যের সামনে আর অন্য ছাত্রদের সামনে এই বই পড়ব তখন আচার্য কি রকম অবাক হয়ে যাবেন। পিঠ চাপড়ে বলবেন—"ধন্য রঘুনাথ,যুগ যুগ ধরে অক্ষয় হয়ে থাকবে তোমার এই কীর্তি।" আচার্যের প্রশংসা শুনে নিমাই আর অন্য ছাত্রেরা কি রকম প্রশংসার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাবে। মনে মনে এইসব ভাবেন, আর আনন্দে মেতে ওঠেন রঘুনাথ।

এখন আর রঘুনাথ একমুহূর্তও বাড়ীতে থাকেন না। দিনরাত বন্ধুদের নিয়ে হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছেন। বই লেখা শেষ হয়ে গেছে আর ভাবনা কি।

একদিন সন্ধ্যায় নিমাই রঘুনাথকে বললেন—"বন্ধু, চল আজ একটু নৌকায় করে গঙ্গায় বেড়িয়ে আসি। কি সুন্দর পূর্ণিমার রাত। এমন রাতে তুমি আর আমি আগে কতদিন নৌকায় বেড়াতে যেতাম। আজকাল তুমি ত এসব ছেড়েই দিয়েছ। রঘুনাথ বললেন—"ঠিক বলেছ ভাই। চল চল নৌকায় উঠি।' দুই কিশোর বন্ধু নৌকায় উঠলেন। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। গঙ্গার তরল জল জ্যোৎস্নার আলোয় ঝলমল করে উঠছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন হাজার হাজার রূপার কুচি ঝিকমিক করছে। কতক্ষণ হাসি গল্পে কাটাবার পর নিমাই বললেন—"বন্ধু এত সুন্দর রাতে তোমাকে একটি জিনিষ পড়ে শোনাই। তুমি আমার প্রাণের বন্ধু তোমাকেই প্রথম শোনাব।" এই বলে গায়ের উড়ানীর তলা থেকে নিমাই বার করলেন একখানি বই।

রঘুনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ কিসের বই নিমাই?" হাসতে হাসতে নিমাই বললেন—"পরীক্ষা শেষ হল। সময় আর কাটে না। তাই সময় কাটাবার জন্য একটি ন্যায়ের বই লিখলাম।" রঘুনাথ আরো অবাক হয়ে বললেন—"বল ত কখন লিখলে? সারাক্ষণই ত দেখি হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছ। হয় গঙ্গার সাঁতার কাটছ, নয় বন্ধুদের নিয়ে খেলাধুলা করছ।" তাচ্ছিল্যের সুরে নিমাই বললেন—"ওই খেলাধুলার ফাঁকে ফাঁকেই একটু একটু লিখেছি। এ কি আর এমন কিছু বই হয়েছে।" আশ্বস্ত হলেন রঘুনাথ। ঠিক কথাই ত। অত হৈ হৈ যে করে সে কি আর খুব বেশী জ্ঞানের বই লিখতে পারে। রঘুনাথ বললেন—"পড় বন্ধু পড়, শুনি।" পড়তে আরম্ভ করলেন নিমাই। গম্ভীর সুললিত কণ্ঠে পড়ে চলেছেন। একমনে শুনছেন রঘুনাথ। যতই শুনছেন ততই মুখ শুকিয়ে উঠছে, মন দুঃখে ভরে উঠছে। মাত্র দু'চার পাতা পড়া শেষ হয়েছে, এমন সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন রঘুনাথ। পড়তে পড়তে হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনে চমকে উঠলেন নিমাই। মাথা তুলে চেয়ে দেখেন রঘুনাথের মুখ শুকনো, চোখে জল।

নিমাই বললেন—"এ কি, এ কি বন্ধু। কি হল? কেন আমার বই পড়া শুনে তোমার চোখে জল এল? কেন মুখ শুকিয়ে গেল?"

রঘুনাথ বললেন—"ও কিছু না। পড় তোমার বই নিমাই! আরো পড়।"

বই নামিয়ে রেখে দুহাতে রঘুনাথকে জড়িয়ে ধরলেন নিমাই। বললেন—"না কখনই পড়ব না। আগে তোমার মনের কথা খুলে বলতে হবে। আমি না তোমার প্রাণের বন্ধু।"

কাতর স্বরে রঘুনাথ বললেন—"বন্ধু, পরীক্ষার শেষে আমিও একখানি ন্যায়ের বই লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম সেই বইয়ের জন্য আমার জগৎ-জোড়া নাম হবে। অসাধারণ পণ্ডিত বলে খ্যাতি হবে।—কিন্তু আজ তোমার লেখা ন্যায়ের বই শুনে বুঝলাম আমি মিছেই বই লিখেছি। তোমার বইয়ের মাত্র প্রথম দু'চার পাতাতেই যে অগাধ পাণ্ডিত্য রয়েছে, তার এক কণাও আমার সারা বইয়ে নেই।"

নিমাই বললেন—"এই সামান্য কথা। তার জন্য এত দুঃখ পাচ্ছ মনে! আমি ত জানি না তুমিও এ বিষয়ে বই লিখেছ। কেন জানাওনি বন্ধু, তাহলে কখনও ন্যায়ের বই লিখতাম না। এখনি গঙ্গার জলে ফেলে দিচ্ছি আমার এই বই।" যে কথা সেই কাজ। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে নিমাই নিজের বই গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

"হায় হায় এ কি করলে, এ কি করলে" বলতে বলতে রঘুনাথ গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিতে গেলেন, বই তুলবেন বলে।

নিমাই দুহাতে চেপে ধরলেন তাঁকে। বললেন—

"যার কোন দাম নেই এমন একখানা বই, গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছি ত হয়েছে কি? অত উতলা হচ্ছ কেন?"

ব্যথাভরা চোখে নিমাইয়ের দিকে চেয়ে রঘুনাথ বললেন—"কোন দাম নেই, কি বলছ নিমাই? যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর লোক মুগ্ধ হয়ে থাকত এ বই পড়ে। অনায়াসে এমন বই গঙ্গার জলে ফেলে দিলে? আবার মনের আনন্দে হাসছ, কোন দুঃখ নেই তোমার মনে? কে তুমি নিমাই, দেবতা না মানুষ?"

নিমাই হাসতে হাসতে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন রঘুনাথকে, বললেন—"দেবতা নয় বন্ধু, মানুষ। আমি ভালবাসি তোমাকে, ন্যায়ের বইকে নয়। তোমার মুখের হাসি অক্ষয় হয়ে থাক বন্ধু। তাছাড়া ন্যায়শাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র। তর্কেতে কি ভগবানকে পাওয়া যায়? না বন্ধু, ভগবানকে পাওয়া যায় প্রেমে। এই যেমন প্রেম আমি তোমায় করছি।" এই বলে আরও নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলেন রঘুনাথকে।

অবাক হয়ে রঘুনাথ নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। একি তাঁর বন্ধু নিমাই না স্বর্গের দেবতা!

এরপর থেকে রঘুনাথের ন্যায়ের বই "দীধিতি" চলিত হ'য়ে গেল। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা সেই বই পড়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন—"রঘুনাথ, তুমি বাংলার মুখ উজ্জ্বল করলে। তোমার ন্যায়ের বই অমূল্যরত্ন। যুগ যুগ ধরে অক্ষয় হয়ে থাকবে এ বইয়ের যশ।"

নবদ্বীপের পণ্ডিতদের কথাই সত্য হল। কিন্তু কেউ জানল না যে ওই বইয়ের চেয়ে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ বই কিশোর নিমাই অনায়াসে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছেন—বন্ধু রঘুনাথের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য, বন্ধুর বইয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য। বলেছেন—"প্রেমই বড়, জ্ঞান বড় নয়। কি হবে পাণ্ডিত্য, নাম, যশ দিয়ে। ওসবের কোন দাম নেই।"

সেদিন সন্ধ্যায় কিশোর নিমাই বন্ধু রঘুনাথের কাছে পরিচয় দিয়েছিলেন যে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত হবেন না। তিনি হবেন সারা বাংলার প্রেমের ঠাকুর, প্রাণের দেবতা। ভক্তির বন্যায়, প্রেমের বন্যায় তিনি ভাসিয়ে দেবেন সারা বাংলাকে।

তিনি জগতকে দেখাবেন নাম বড় নয়; প্রেমই বড়।

চিত্রগুপ্ত
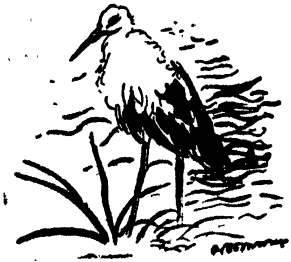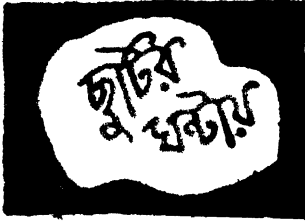
কোলকাতার পথে বেড়াতে বেরুলে হামেশাই নজরে পড়ে সৌখিন-সাজসজ্জায় সাজানো বড়-বড় বাড়ী, হোটেল, অফিস, দোকান-পাট, সিনেমা থিয়েটারের বিরাট শার্সি-আঁটা দরজা জানালার কাঁচের উপর নানান্ ছাঁদের কত সব সুন্দর সুন্দর নক্সাদার ছবি আর দেশী বিলাতী হরেক ধরণের হরফ লেখা সাইনবোর্ড বিজ্ঞাপনের ঘটা বাহার। কাঁচের উপর এমনি সব সৌখিন-সুন্দর নক্সা আর বিচিত্র ছাঁদের লেখার হরফ কি কৌশলে রচনা করা হয়, জানো কি?···তাহলে শোনো—এবারে তোমাদের সেই কলা কৌশলের আসল রহস্যের কথাটি খুলে বলি মোটামুটিভাবে।
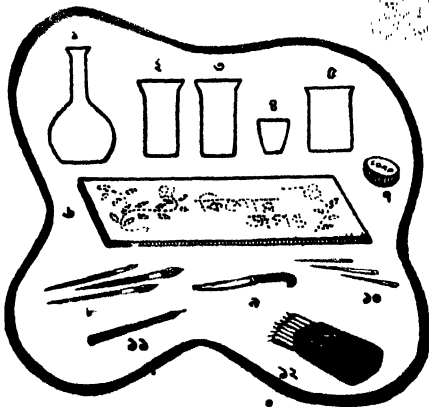
১) সালফিউরিক অ্যাসিড
২) বেরিয়াম সালফেট
৩) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড
৪) তরল গলিত-মোম
৫) ব্যাটারীর সীসার খোল
৬) কাঁচ (নক্সার খশড়া আঁকা)
৭) সাবান
৮) তুলি
৯) ছুরি
১০) ছুঁচ
১১) মোমের শিসওয়ালা পেন্সিল
১২) মোমবাতি

উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সেই নমুনামতো ধরণে কাঁচের উপর সৌখিন সুন্দর নক্সাদার ছবি বা অক্ষরের হরফ রচনার জন্য সবার আগে জোগাড় করা চাই—প্রয়োজনানুযায়ী মাপের একখানা সবুজ কাঁচ। এ কাঁচের গায়ে তোমরা অনায়াসেই মোমের-শিস্ওয়ালা পেন্সিল (wax-pencil) দিয়ে নিজেদের পছন্দমতো সৌখিন-সুন্দর নক্সা বা বাহারী হরফের লেখার ছাঁদ এঁকে কিম্বা কাঁচের নীচে অন্য কোনো শিল্পীর আঁকা আলঙ্কারিক রেখা-চিত্র আর নক্সাদার অক্ষরের প্রতিলিপি রেখে খুব সহজ উপায়েই মোমের শিসওয়ালা পেন্সিলের আঁচড় টেনে নিখুঁত পরিপাটিভাবে মূল নক্সাটির (original Design) 'খশড়া-চিত্র' (sketch-outline) 'ট্রেসিং' (tracing) করে নিতে পারো। তাহলে পরে কাঁচের উপর সে প্রতিলিপি রচনার আসল কাজের সময় বিশেষ কোনো অসুবিধা ঘটবে না এবং ভুল-ত্রুটিরও সম্ভাবনাও থাকবে না।

কাঁচ আর মোমের শিসওয়ালা পেন্সিল ছাড়াও এ কাজের জন্য জোগাড় করা দরকার আরো কয়েকটি বিশেষ ধরণের সাজ সরঞ্জাম। অর্থাৎ, চাই—কয়েক আউন্স বেরিয়াম সালফেট (Berium Sulphate), অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (Ammonium chloride) আর সালফিউরিক অ্যাসিড (Sulphiuric Acid) নামে তিনটি রাসায়নিক পদার্থ এবং সেই সঙ্গে একটি ব্যাটারীর সীসার খোল বা সীসার তৈরী বেশ মজবুত ছাঁদের গেলাস, বাটি কিম্বা কৌটার মতো ছাঁদের সুগভীর কোনো পাত্র, সরু মোটা ও মাঝারিসাইজের তিনটি তুলি, খাতা সেলাইয়ের উপযোগী সরু মোটা ও মাঝারি মাপের গোটা তিনেক শক্ত মজবুত ছুঁচ, একতাল মোম কিম্বা এক বাণ্ডিল ভালো মোমবাতি, মোম গলানোর উপযোগী একটি বাটি এবং কাঁচের উপর গলিত তরল মোম লেপনের উপযোগী বড় ফলাওয়ালা একখানা ছুরি।

এ সব সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় হবার পর, গোড়াতেই ব্যাটারীর সীসার খোলের ভিতরকার মাল মশলাগুলিকে সাফ ও পরিষ্কার জলে শূন্য খোলটিকে বেশ ভালোভাবে

ধুয়ে মুছে আগাগোড়া শুকনো ঝরঝরে করে নিতে হবে। এ কাজ সারা হলে, ব্যাটারীর ঐ শূন্য সীসার খোলটির ভিতরে তিন আউন্স বেরিয়াম সালফেট আর এক আউন্স অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে নাও। তারপর খুব সাবধানে সালফিউরিক অ্যাসিডের বোতলটিকে হাতে নিয়ে রীতিমত হুঁশিয়ার হয়ে ধীরে ধীরে ব্যাটারীর সীসার খোলের ভিতরে মিশিয়ে রাখা রাসায়নিক পদার্থ দুটির উপর ঢেলে দিতে থাকো। এতখানি সাবধান হবার কারণ,—সালফিউরিক অ্যাসিড খুবই সাংঘাতিক দাহ্য পদার্থ…অসাবধানতার ফলে, এ মারাত্মক অ্যাসিডের এতটুকু ছিটে ফোঁটা যদি গায়ে, হাতে বা পায়ে কোথাও ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গাটি জ্বলে-পুড়ে ফোশ্কা, এমন কি যন্ত্রণাদায়ক ঘা পর্য্যন্ত দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্যই এ সব রাসায়নিকপদার্থ নিয়ে কাজ করবার সময় রীতিমত সাবধান ও হুঁশিয়ার থাকা একান্ত দরকার—না হলে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। কাজেই এ সম্বন্ধে যে সদা-সতর্ক থাকা বিশেষ প্রয়োজন—কথাটা তোমরা আদৌ ভুলো না। তাছাড়া এই সাংঘাতিক রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজ করার সময় বাড়ীর বড়দের অভিজ্ঞ-সহায়তা নিতে এতটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করো না…বরং তাঁদের সুপরামর্শানুসারে বড়দের চোখের সুমুখে এ সব কাজ করলে, তোমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষারও যে সুবিধা এবং উপকার হবে অনেকখানি—সে কথা বলাই বাহুল্য।

যাই হোক, যে প্রসঙ্গের আলোচনা করছিলুম; আপাততঃ, সেই কথাই বলি। অর্থাৎ, ব্যাটারীর সীসার খোলের ভিতরে বেরিয়াম সালফেট আর অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানোর ফলে পাত্রের ভিতরকার 'মিশ্রণটি' যখনই বেশ 'অর্দ্ধ তরল' অবস্থায় (Semi-liquid) এসে পৌঁছুবে, তখন আর একফোঁটাও সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানোর প্রয়োজন নেই। কারণ, সেই 'অর্দ্ধ তরল' মিশ্রণটিই হলো—কাঁচের উপর নক্সাদার প্রতিলিপি আর বাহারী হরফের আলঙ্কারিক কারুকার্য্য রচনার অভিনব-বিচিত্র রাসায়নিক উপাদান। এই আজব রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যেই তোমরা এবার অনায়াসেই নিজেদের খুশীমতো কাঁচের উপর নানা রকম সৌখিন সুন্দর নক্সা আঁকার কাজ করতে পারবে। তবে সে কাজ কিভাবে করতে হবে, এখন তোমাদের তারই অভিনব কলাকৌশলের মোটামুটি হদিশ দিই।

এ কাজ করবার সময়, গোড়াতেই কাঁচখানাকে আগাগোড়া বেশ ভালভাবে সাবানজলে ধুয়ে, শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার করে নাও—কাঁচের কোথাও যেন এতটুকু তৈলাক্ত-ভাবের লেশমাত্র না থাকে। এমন পরিপাটি ধরণে সাফ্ করা দরকার, নাহলে কাঁচের উপর নক্সা বা হরফের ছাঁদ সুস্পষ্ট নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠবে না সহজেই।

এ কাজ সারা হলে, কাঁচখানার যে-অংশে সৌখিন-সুন্দর ছবি কিম্বা বাহারী-হরফের নক্সা-রচনা করবে, সে জায়গাটিতে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে আগুনের আঁচে-গলানো 'তরল-মোমের' প্রলেপ (a thin coating of liquid wax) লাগিয়ে দাও। তারপর কাঁচের গায়ে লাগানো সেই পাতলা-নরম মোমের প্রলেপের উপর কাগজের বুকে পেন্সিল অথবা কলমের আঁচড় টেনে যেমন ভাবে রেখাচিত্র রচনা করো, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে প্রয়োজনমতো সাইজের ছোট-বড় বা মাঝারি ধরণের ছুঁচ ব্যবহার করে নিখুঁত পরিপাটি ছাঁদে তোমাদের পছন্দমতো সৌখিন-সুন্দর ছবি কিম্বা বাহারী-হরফের নক্সাটিকে এঁকে ফেলো। তবে এভাবে নক্সা-রচনার সময় সর্ব্বদা নজর রেখো যে ছুঁচের ডগা যেন মোমের প্রলেপের আস্তরণ ভেদ করে কাঁচের অঙ্গটিকে স্পর্শ করে…নাহলে কাঁচের বুকে নক্সার রেখা আগাগোড়া বেশ সুস্পষ্ট-নিখুত এবং পরিপাটি সুন্দর ছাঁদে ফুটে উঠবে না বিশেষ তেমন। কাজেই কাঁচের গায়ে-লাগানো মোমের-প্রলেপের উপর ছুঁচ দিয়ে রেখাচিত্র রচনার সময় বেশ একটু হুঁশিয়ার হয়ে এবং হাতের আঙুলের ঈষৎ-জোর চাপ দিলে, আগাগোড়া সুষ্ঠুভাবে এ কাজটুকু সেরে নেওয়া চাই।

এমনিভাবে মোমের প্রলেপের উপর ছুচ দিয়ে ছবি বা হরফের নক্সা-চিত্রের রেখাঙ্কনের পালা শেষ করে, প্রয়োজন মতো সরু-মোটা অথবা মাঝারি ধরণের তুলির সাহায্যে, কাঁচের গায়ে-লাগানো মোমের আস্তরণের উপকার রেখা-চিহ্নিত অংশে এবার ঐ ব্যাটারীর সীসার খোলে বানিয়ে-

রাখা বেরিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আর সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়ে, কাঁচখানাকে কিছুক্ষণ উন্মুক্ত-বাতাসে রেখে দাও। তাহলেই ছুঁচের সাহায্যে মোমের আস্তরণের উপর রচিত রেখাচিত্রের ফাঁকে-ফাঁকে অর্দ্ধ-তরল ঐ রাসায়নিক-পদার্থ প্রবেশের ফলে, ক্রমশঃ নীচের কাঁচখানার গায়ে 'ক্ষরণ-চিহ্ন' সৃষ্টি করবে এবং এই 'ক্ষরণ-চিহ্নই' শেষ পর্যন্ত কাঁচের গায়ের বিভিন্ন অংশে স্থায়ী হয়ে থেকে মনোরম-সুন্দর নক্সার ছাঁদ ফুটিয়ে তুলবে। তুলির সাহায্যে এভাবে রাসায়নিক পদার্থ প্রলেপনের কিছুক্ষণ পরে, কাঁচখানাকে আগাগোড়া পরিষ্কার জলে বেশ ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে, তাহলেই রাসায়নিক-পদার্থের লেশমাত্রও আর কাঁচের বা মোমের আস্তরণের কোথাও বজায় থাকবে না। এবারে ছুরির ফলার সাহায্যে সযত্নে কাঁচের উপর থেকে মোমের আস্তরণটুকু চেঁছে তুলে ফেললেই দেখবে—কাঁচের বুকে সুস্পষ্ট-নিখুঁত ছাঁদে ফুঠে উঠেছে সৌখিন-সুন্দর ছবির নক্সা কিম্বা বাহারী হরফের অপরূপ প্রতিলিপি!

রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় কাঁচের উপর নক্সা রচনার কলা-কৌশলের মোটামুটি পরিচয় তো পেলে, এবার তোমরা নিজের হাতে পরখ করে ছাখো অভিনব-মজার এই বিচিত্র কারসাজিটি। তবে হুঁশিয়ার···অহেতুক গোয়ার্তুমী বা নিছক বাহাদুরী দেখানোর নেশায় মেতে কিম্বা অসাবধানতার ফলে, এ সব রাসায়নিক-পদার্থ ব্যবহার করবার সময় যেন অযথা বিপদ ডেকে এনো না কোনোমতেই!

—

মনোহর মৈত্র

১। ত্রিভুজের আজব হেঁয়ালী:

উপরের ছবিতে একজোটে যে তিনটি ত্রিভুজ (Tringle) সাজানো রয়েছে, সেগুলিকে এতটুকু এ-

পাশে ওপাশে কিম্বা উপরে নীচে সরিয়ে জায়গা বদল না করে, স্রেফ তোমাদের মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে কেবলমাত্র তিনটি সরলরেখা (Straight lines) এঁকে এবং সে-গুলিকে কায়দামতো ঐ ত্রিভুজগুলির আশপাশে সাজিয়ে যদি এমন একটি ত্রিভুজ রচনা করতে পারো—যেটির মধ্যে মোট তেরোটি ত্রিভুজ থাকবে, তাহলে বুঝবো—সত্যিই রীতিমত বাহাদুর হয়ে উঠেছো তোমরা। এবারের এই আজব হেঁয়ালির সঠিক উত্তর ও তোমাদের হাতে-আঁকা নক্সাটি যদি অবিলম্বে আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দাও, তাহলে আগামী মাসের সংখ্যায় সে বাহাদুরীর পরিচয় আমরা ছাপার অক্ষরে সকলের কাছে প্রকাশ করে দেবো। কাজেই তোমাদের বাহাদুরীর সংবাদ সুপ্রচারের এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুলো না যেন কোনোমতেই।
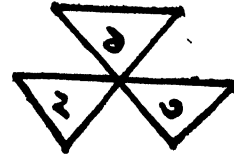
২। কিশোর-জগতের সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা:

চার-অক্ষরের কথা···হিন্দুদের নানান্ পাল পার্ব্বণে ও শুভ-কার্য্যে মঙ্গলসূচক প্রতীকচিহ্ন হিসাবে ব্যবহার হয়। প্রথম দুই অক্ষরে—বাঙালীদের বিশেষ এক শ্রেণীর সামাজিক পদবী এবং শেষ দুই অক্ষরে—জলের প্রবহমান স্রোত বুঝায়। দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষর জোড়া দিলে, তরল মাদক-পানীয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষরে মিষ্ট-সুস্বাদু অমৃত-জাতীয় পানীয় বুঝায়। চতুর্থ ও তৃতীয় অক্ষর জোড়া দিলে বৈষ্ণবকাব্যের বিশিষ্টা নায়িকা ও হিন্দুদের এক দেবীর নাম হয়। বলো তো, চার-অক্ষরের সেই কথাটি আসলে কি?

রচনা: গৌতম ঘোষ (কলিকাতা)

৩।

পাথর জীবন্ত কভু হতে পারে নাকো,
হয় তবু, মিথ্যা নয়—ইতিহাসে ছাখো।

রচনা: শ্যামাপ্রসাদ দাস (কয়াপাট, হুগলী)

বৈশাখ মাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালির

১। তিনটি দণ্ডই সমান এবং একই মাপের—কোনোটিই ছোট-বড় নয়।

২। চাঁদা

৩। মৌচাক

৪। রমাকান্ত কামার

বৈশাখ মাসের চারটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

রাজা, ভুটিন ও পুপু (কলিকাতা), পূরবী, সুস্মিতা, সমীর ও সন্দীপ মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), বিজয়া ও সৌরাংশু আচার্য্য (কলিকাতা), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), রবিন রায় (বোম্বাই), শর্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), হরিদাস, পুরসুন্দরী, বৈকুণ্ঠ, কানু, সুবর্ণ ও ইন্দুবালা দেবশর্মা (ইছাপুর), রাণা ও বুনা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), ফণী, বেচনা ও দোলন সাহা (কলিকাতা), সত্যেন্দ্র, সঞ্জয়, মুরারি, অমিয় ও সুনীল (ভিলাই), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (দিল্লী), বিজয়েন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র সিংহ (হাজারীবাগ)। গৌতম ঘোষ (কলিকাতা), তাপস বসু (কোন্নগর)।

বৈশাখমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

প্রশান্ত, অমিয়, অমৃত, সুনীত, অভি, কৃষ্ণলাল, রবীন, তিনকড়ি, রামসদয়, মৃণাল, পুলিন ও অজিত (গড়িয়া), সুস্মিতা, টুলটুল, কুলকুল, বুবুন, নন্দা, মিনতি, টিঙ্কু, ছন্দা, অলকা, স্বপ্না, পাপু, ছোটন, অর্চ্চি, পিন্টু, মাণিক, পার্থ, ও কল্যাণ (কলিকাতা), দুর্গাদাস, রেণু, খুকু, প্রণব, কেণী ও প্রশান্ত (রাণাঘাট), গৌরদেব ও লিপিকা ভরদ্বাজ (চুঁচুড়া), কল্যাণ, রজত, শচীন, ইন্দ্র, পৃথ্বীশ, নীলমণি, শিবশঙ্কর, লিলি ও শ্রাবণী গোস্বামী (মাদ্রাজ), রবি, মীরা ও অনিল মুখোপাধ্যায় (মীরাট), কবি, অধীশ ও অমিতাভ হালদার (জগদ্দল), বুবু, গুন, ঝুন্টু ও বাচ্চু বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) দীপঙ্কর, বাদল ও কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (হাওড়া), অমিতাভ, কৃষ্ণা, অভিজিৎ, পার্থ ও অঞ্জন (কলিকাতা), জিতেন্দ্রমোহন সরকার (কলিকাতা),

বৈশাখ মাসের দুইটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

হারানচন্দ্র, হিমাংশু, সুধাংশু, শীতাংশু ও সুষমা (শিলিগুড়ি), সুস্মিতা ও হীরেন ঘোষ (কলিকাতা), পুলিন ও পূর্ণিমা গঙ্গোপাধ্যায় (পাটনা), দেবকীনন্দন ও বিশ্বনাথ সিংহ (গয়া), রণজিৎ, জয়ন্ত, ও মানস (কাটলীছড়া), রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), খোকা ও গোবর্দ্ধন (কাটলীছড়া),

বৈশাখ মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

অনিল, মিণ্টু, হরিদাস, শামসের, মৈনুদ্দিন, গিরিজা ও সুধীরলাল (মুর্শিদাবাদ), শ্যামা, ঋষি ও খুশী (উত্তরপাড়া), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (লক্ষ্ণৌ) ধ্রুব, খোকন, কাবুল, তিলক ও অলক রায় (কৃষ্ণনগর)।

ছোটোর কবি

অনুত্তম ভট্টাচার্য

পথের ধারে দেখেছিলেম
ছোট্ট একটি ফুল,
নানান রঙে আঁকা সে যে
নেইকো তাহার তুল ;
হাতখানি মোর ব্যগ্র হ'য়ে
তুলতে তারে ধায়,
মনের মধ্যে কে ছিল যে
বাধা দিতে চায়।
ক্ষুণ্ণ মনে হাত গুটিয়ে
চলে গেলেম আমি,
বাজার গিয়ে 'অর্কিড্' এক
কিনলেম বেশ দামী।
ফুলদানিতে সাজিয়ে তারে
শোভা দেখতে যাই
মনের আশা মনেই থাকে
ক্লেশ যে বেশি পাই।
মনের মাঝে আঁকা আমার
ছোট্ট ফুলের ছবি,
ছোটোর মায়ার বদ্ধ আমি
ছোট্ট ফুলের কবি।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চার

নীলা চৌধুরী নামে একটি মেয়ে স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, পৃথিবীর অরণ্যে হারিয়ে গেছে। দত্ত সাহেবের কাছ থেকে তাকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব যেদিন দীপেন নিয়েছিল সেদিন কাজটা দুরূহ মনে হলেও একেবারে সাধ্যের অতীত মনে হয় নি। বোম্বাই সহরটাকে তোলপাড় করে ফেলতে পারলে নিশ্চয়ই তার সন্ধান পাওয়া যাবে—এমন ভরসা দীপেনের ছিল এবং সে জন্য প্রস্তুত হয়েই আরব সাগরের পটে এই বিশাল মহানগরীতে হানা দিয়েছিল সে।

কিন্তু এখানে এসে নগিনদাসজীর সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে, গ্রন্থিগুটিল বিচিত্র এক রহস্যময়তার দিকেই সে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। সেটা একান্তভাবেই আত্মকেন্দ্রিক। নিজের ছাড়া অন্য কোন সমস্যাকে—তা গভীরই হোক, জটিলই হোক—ত্রিসীমানার ঘেঁষতে দেয় না দীপেন। অকারণে অন্যের চিন্তা মাথায় পুরে সেটাকে বিব্রত ভারাক্রান্ত হতে দিতে চায় না। জীবনের বহিরঙ্গ নিয়েই মেতে থাকতে ভালবাসে সে, তার অন্তঃপুরে চোখ ফিরিয়ে নিজেকে জর্জরিত করার অবকাশ অথবা মানসিক গঠন কোনটাই তার নেই। দীপেনের এই স্বভাব।

কিন্তু নীলা চৌধুরী তাকে অন্যমনস্ক করে ফেলেছে। পূর্ববাঙলার এক তরুণী দেশভাগের পর জীবনের কোন অভ্রান্ত নির্দেশে পশ্চিমবাঙলায় এসে দত্ত সাহেবের মত মানুষের সংস্পর্শে এল, কিভাবে বোম্বাইতে এসে নগিনদাসজী অথবা নীলকান্ত যোশীর ঘনিষ্ঠ হল—এ সবই ধাঁধার মত মনে হচ্ছে। এই তিনজনই শুধু নয়, জীবন তাকে আরো কত মানুষের কাছে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে তাই বা কে বলবে।

নীলা চৌধুরীকে কোনদিন দেখে নি দীপেন। এই অজানা অচেনা পলাতকা ধীরে ধীরে সত্তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যেতে শুরু করেছে যেন।

কাল নগিনদাসজী কয়েকটা চমৎকার সাপ্তাহিকের নাম করেছিলেন। প্রতি সপ্তাহে বাজারে কিছু চাঞ্চল্যসৃষ্টিই তাদের ব্যবসা। চাকরি-বাকরি এবং জীবনধারণের হাজারো সমস্যায় মানুষের স্নায়ু যখন অসাড় জর্জরিত হয়ে আসে তখন এই পত্রিকাগুলো কিছু উত্তেজনা যুগিয়ে সেগুলোকে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত চাঙ্গা করে তোলে।

কাগজগুলোর আদিতে-মধ্যে-অন্তে বিস্রস্তবাসা লাস্যময়ীদের ছবি। দেখে মনে হয় লজ্জা তাদের ভূষণ নয়; ঐ বস্তুটিকে তারা কয়েক যোজন তফাতে রেখেছে।

ছবিগুলো মারাত্মক ; দেখা মাত্র কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে। স্নায়ুগুলো ধনুকের কষে-বাঁধা ছিলার মত টান টান হয়ে যায়।

ছবিগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আছে উত্তেজক খবর। সবই নারীঘটিত। কোথায় কোন গোপন মধুচক্রে শহরের কোন কোন মক্ষিরাণী গিয়ে জুটছেন, এবং তাঁদের চার-পাশে কোন কোন বিখ্যাত ব্যক্তি ভিড় জমাচ্ছেন, তার চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যাবে। পাওয়াই লেকে কোন অফিসারের স্ত্রীর সঙ্গে কোন কোটীপতিকে এক গাড়িতে যেতে দেখা গেছে, মহাবলেশ্বরের প্রমোদকুঞ্জে কোন দক্ষিণী শিখরদশনাকে নিয়ে কোন চিত্রতারকা মেতে আছে, কোন রাজনৈতিক নেতা কোন হোটেলে কোন সহচরী নিয়ে নিশিপালন করে থাকেন—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা মুখরোচক খবরে পত্রিকাগুলো ভর্তি। তীব্র উগ্র ঝাঁঝালো আরকের মত এই সব পত্রিকা মানুষকে চমকিত, নেশাগ্রস্ত করে রাখে।

কাগজগুলোর উদ্দেশ্য সাধু। সব মানুষের মধ্যেই যৌন যথেচ্ছাচারের গোপন ইচ্ছা আছে। একটা পোকার মত মনের অন্ধকার অংশে সেটা সঞ্চরণ করে বেড়ায়। কাগজগুলো সেই পোকাটাকে সুড়সুড়ি দিয়ে উত্তেজিত করে তোলে। বিক্রির বহর দেখে বোঝা যায় উদ্দেশ্য তাদের ব্যর্থ হয়নি; অভ্রান্তভাবেই তারা লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছে।

অবশ্য শুধু লাস্যময়ী রহস্যময়ী গোপনচারিণী এবং তাদের সহচরদের নিয়ে এই পত্রিকাগুলো মেতে থাকে ভাবলে ভুল হবে।

ইংরেজিতে 'স্ক্যাণ্ডাল-মঙ্গার' বলে একটা কথা আছে। পত্রিকাগুলো তা-ই। যে কোন ধরণের কেলেঙ্কারি—তা সামাজিক হোক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক হোক—সব সরবে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করাই এদের কাজ। কুৎসার প্রতি মানুষের যে লালাসিক্ত একটা লোভ আছে, সে খবর এরা রাখে। সেই লোভটাকে মূলধন করতে পারলে নগদ বিদায় যে মন্দ হবে না, সে তথ্য ওদের চাইতে কে আর ভাল জানে!

যাই হোক, নগিনদাস যে পত্রিকাগুলোর নাম উল্লেখ করেছিলেন পরের দিন দুপুরবেলা সেগুলোর অফিসে হানা দিল দীপেন। সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে চার-পাঁচ বছর আগেকার পুরণো সংখ্যা দেখবার ইচ্ছা জানাতেই অনুমতি পাওয়া গেল।

কয়েক সংখ্যা ধরে সে-সময় কাগজগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় নীলকান্ত যোশী এবং নীলা চৌধুরীর ফোটো ছাপিয়ে গেছে। নীলা চৌধুরীর যে সব ফোটো ছাপা হয়েছে সেগুলোর দিকে তাকালে মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। কটিতট এবং বক্ষদেশ ঘিরে যে সামান্য সংক্ষিপ্ত আচ্ছাদন রয়েছে সেগুলো দেহকে আবৃত করার জন্য নয়, দেহের অপার রহস্যগুলিকে আরো বেশি করে উন্মুক্ত করে দেবার জন্যই বোধ হয়।

নীলা চৌধুরীর এমন অর্ধনগ্ন মোহময়ী অবস্থার ফোটো কি ভাবে পাওয়া গেছে, ভেবে পেল না দীপেন। নীলা কি স্বেচ্ছায় এ সব তুলতে দিয়েছে ?

কাগজগুলো থেকে রসাল পরিবেশন পদ্ধতি ছাড়া তেমন বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া গেল না। শুধু জানা গেল, নীলাকে নিয়ে সেই সময় দিবস-রজনীর অর্ধেকেরও বেশি সময় কেটে যেত নীলকান্তর। কখনও তাদের দেখা যেত মহাবলেশ্বরের শৈলাবাসে, কখনও পুণার বিলাসবহুল হোটেলে ; কখনও পাওয়াই লেকে, কখনও জুহুর বালুকা-বেলায়। আবার একসঙ্গে পাঁচ সাত দিন মহারাষ্ট্রেই তাদের দেখা যেত না ; তখন তারা প্রমোদ-ভ্রমণে বেরুত মহীশূরে, হায়দ্রাবাদে, উটকামণ্ডে অথবা সুদূর দিল্লীতে।

নীলকান্ত যোশী মহারাষ্ট্রের খ্যাতিমান্ জননায়ক। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই অধ্যায়ে জীবনের অনেকগুলো বছর তাঁর কেটেছে কারাগারে। অকৃতদার, শুদ্ধচিত্তের মানুষ। চরিত্রের দৃঢ়তায়, মাধুর্যে এবং নিঃস্বার্থ দেশসেবায় একদা সারা মহারাষ্ট্রের হৃদয় জয় করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই মানুষই নীলা চৌধুরীর সংস্পর্শে আসার পর আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়েছিলেন। পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ নিষ্কলঙ্ক অতীতকে আরব সাগরের জলে ভাসিয়ে দিয়ে নীলকান্ত যোশী নাকি লুব্ধ পতঙ্গের মত তার পিছু পিছু ছুটে গিয়ে-ছিলেন। পরহিতার্থে, দেশের কল্যাণে তাঁর জীবন যে উৎসর্গ-করা—সে হুঁস তাঁর বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জন-চিত্তে শ্রদ্ধার যে সিংহাসনখানা তাঁর জন্য পাতা সেখান থেকে কোথায় নেমে আসতে শুরু করেছিলেন, সে খেয়ালও

তাঁর ছিল না। এক কালের শ্রদ্ধেয় জননেতা মানুষের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে শুরু করেছিলেন, দেশ-সেবা তাঁর কাছে নিরর্থক হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ জীবনের সর্বফল নীলা চৌধুরীর পায়ে সমর্পণ করে তিনি একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন।

কুৎসার ফাঁকে ফাঁকে নীলকান্ত যোশী সম্পর্কে মাত্র এটুকু তথ্যই আবিষ্কার করা গেল। অবশ্য আরো একটা খবর পাওয়া গেল। নীলকান্ত যোশী সারা মহারাষ্ট্র, বিশেষ করে বোম্বাই শহরের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; নীলা চৌধুরীর জন্য সে সব জায়গার ফাণ্ড ভেঙে অনেক টাকা অপচয় করেছেন। নেহাৎ পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলে তিনি রেহাই পেয়েছেন; নইলে ভিন্ন অর্থে কারাবাস তাঁর অবশ্যম্ভাবী ছিল। অবশ্য শাস্তিস্বরূপ সেই সব প্রতিষ্ঠান তাঁকে ছাড়তে হয়েছে।

নীলকান্ত যোশীর জীবনের কোন কোন দিকের তবু কিছু খবর পাওয়া যায় কিন্তু নীলা চৌধুরীর কয়েকখানা ছবি ছাপা ছাড়া তার সম্বন্ধে কাগজগুলো একেবারে নীরব। সে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় থাকত—এ সব সম্বন্ধে তারা কোন আলোকপাত করেনি।

যদিও নীলকান্ত যোশীর জীবনে অনেক বিস্ময় রয়েছে এবং সে সম্বন্ধে খুবই আকর্ষণ বোধ করছিল দীপেন তথাপি কিছু হতাশ হতে হল। যে উদ্দেশ্যে তার এতদূরে আসা সে ব্যাপারে নীলকান্ত যোশীকে তেমন প্রয়োজন তেমন দরকার নেই। দীপেনের ধ্যানজ্ঞান যার মধ্যে কেন্দ্রীভূত—সে নীলা সোনারপুরের নীলা চৌধুরী। নীলা সম্বন্ধে কোন প্রয়োজনীয় খবরই পাওয়া গেল না।

যাই হোক কাগজের অফিসে ঘুরে ঘুরে দিনটাকে একেবারে সন্ধ্যের মুখে টেনে আনল দীপেন।

ইতিমধ্যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বাতিগুলো ঝলমলিয়ে উঠেছে, দূরে দূরে বাড়ির মাথায় ব্রীজের গায়ে নিওন আলোর দেউটিগুলো একে একে জ্বলতে শুরু করেছে।

কাগজের অফিস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে কিছুক্ষণ লক্ষ্যহীনের মত হাঁটতে লাগল দীপেন। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে চার্চগেট ষ্টেশনের সামনে এসে পড়েছিল খেয়াল নেই। থমকে দাঁড়িয়ে একবার চারপাশ দেখে নিল সে। দূরে মেরিন ড্রাইভের দিকে গাড়ি আর মানুষের ঢল চলেছে। ব্র্যাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামের সুবিশাল বাড়িটার তলায় মেলা বসে গেছে যেন। ডান দিকে এয়ারলাইনস হোটেল; তার পাশে কি একটা অফিস; তার পাশে সারিবদ্ধ অগণিত নয়নাভিরাম প্রাসাদ।

চারদিক দেখতে দেখতে নীলকান্ত যোশীর ঠিকানা মনে পড়ে গেল। আঠাশ নম্বর ঘোড় বন্দর রোড, খার। নগিনদাসজী কাল এই ঠিকানাটা দিয়েছিলেন।

হাত ঘুরিয়ে ঘড়িটা দেখে নিল দীপেন। এখন মোটে সাড়ে ছ'টা। এখান থেকে বিজলী-ট্রেনে খার পৌঁছুতে খুব হলে মিনিট পঁয়তাল্লিসের মত লাগবে। চার্চগেট থেকে খারে পৌঁছুবার সময়টা নগিনদাসই কাল জানিয়ে দিয়েছিলেন।

অর্থাৎ খারে যেতে যেতে সোয়া সাতটা; তারপর ঠিকানাটা খুঁজে বার করতে আরো আধঘণ্টা খানেক। আটটার মধ্যেই নীলকান্ত যোশীর বাড়ি হাজির হওয়া যাবে।

আজই যাবে কিনা; সে ব্যাপারে দীপেন ইতস্তত করতে লাগল। আগে থেকে খবর না দিয়ে, সময় নির্দিষ্ট না না করে যাওয়া বোধ হয় ঠিক নয়। কিন্তু তাতে দিন কয়েক দেরি হবার সম্ভাবনা। দীপেন স্থির করল, আজই যাবে। নীলা চৌধুরীকে খুজে বার করাই এই বোম্বাই শহরে তার একমাত্র কর্তব্য। সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা চুকিয়ে তাকে কলকাতায় ফিরতে হবে। ফেরামাত্র দত্তসাহেব নগদ বিদায় করবেন। তার জীবনের সিদ্ধি—দিল্লীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজারিটা পাওয়া যাবে।

আর নীলকান্ত যোশার সঙ্গে আজ যদি দেখাও না হয় কাল পরশু যে কোনদিন একটা সময় ঠিক করে আসবে। তখন আবার যাওয়া যাবে। চার্চগেটে যখন এসেই পড়েছে তখন একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

অতএব একখানা টিকিট কেটে সাবার্বন ট্রেনে উঠে পড়ল দীপেন।

খার ষ্টেশনে নেমে নীলকান্ত যোশীর ঠিকানাটা বার করতে বেশি সময় লাগল না।

ঘোড় বন্দর রোডের এদিকটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা,

বাড়িগুলো দূরে দূরে; মূল শহরের মত এখানে বসতি ঘন নয়। কিছু কিছু গাছপালা চোখে পড়ছে; রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ভিড় নেই।

নীলকান্ত যোশীর বাড়িটা দোতলা। অনেকদিনের পুরনো বলে বেশ জীর্ণ মনে হয়; হয়ত বা পৈতৃক-সূত্রেই ওটা পেয়ে থাকবেন নীলকান্ত।

সামনের দিকে সংক্ষিপ্ত একটু বাগান। কিছু মরসুমী ফুল কিছু দিশি ফলের গাছ সেখানে চোখে পড়ল।

বাড়িটা অন্ধকার, নিঝুম। কেউ কি নেই? উঁকি ঝুঁকি দিতেই দেখা গেল, দোতলার পেছন দিকের একটা ঘরে আলো জলছে।

কাঠের গেটের সামনে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দীপেন। তারপর সেটা খুলে বাগান পার হয়ে বারান্দায় এসে উঠল। দরজার পাশে কলিং বেল। সেটা বার দুই বাজিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

খানিকটা পর সারা বাড়িতে তিন চারটে বাতি জলে উঠল। তার মধ্যে একটা বাতি এদিকের বারান্দায়। তাতে বারান্দা, বাগান এবং বাইরের রাস্তার খানিকটা অংশ আলোকিত হয়ে উঠেছে।

দোতলার বারান্দা থেকে একসময় ভারী গম্ভীর স্বর ভেসে এল। চমকে মুখ তুলতেই দীপেন দেখতে পেল, দীর্ঘদেহ এক প্রৌঢ় রেলিঙের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন।

চোখাচাখি হতেই প্রৌঢ় কি বললেন; ভাষাটা ঠিক বোঝা গেল না।

ভদ্রলোক বোধ হয় মারাঠিতে কথা বললেন। ও ভাষা দীপেন জানে না। ইংরেজিতে সে বলল, 'নীলকান্ত যোশী মহাশয়ের সঙ্গে আমি একটু দেখা করতে চাই।'

প্রৌঢ় এবার ইংরেজিতেই বললেন, 'আপনি অপেক্ষা করুন: আমি আসছি।'

দীপেন দাঁড়িয়ে রইল। একটু পর নীচে নেমে এসে প্রৌঢ় দরজা খুললেন।

যখন ওপরে ছিলেন তখন ভাল করে বোঝা যাচ্ছিল না। কাছাকাছি আসতে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। কিন্তু শরীরখানি এখনও বেশ মজবুত; মেরুদণ্ড আশ্চর্য ঋজু। চামড়া কিঞ্চিৎ শিথিল হয়েছে; সাদা রঙে বুরুশ ডুবিয়ে সময় মাথার চুলেও দু-চারটে টান দিয়েছে। সুশ্রী তিনি হয়ত নন কিন্তু বেশ সুপুরুষই। গায়ের রঙ দক্ষিণাত্য সুলভ অর্থাৎ কালো। অবশ্য পোড়া তামাটে বললেই যথার্থ হয়।

প্রৌঢ় বললেন, 'আসুন।'

তাঁকে অনুসরণ করে প্রথম যে ঘরটায় দীপেন ঢুকল সেটাকে বসবার ঘর বলা যেতে পারে। পুরনো আমলের কিছু সোফা এলোমেলোভাবে ছড়ানো, মাঝখানে বেতের একটা টি-পয় টেবিল। দেওয়ালে খানকয়েক ছবি টাঙানো। তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং তিলককে চিনতে পারল দীপেন। আর সবাই তার অচেনা; অচেনা হলেও তাঁদের দেশবিশ্রুত জননায়ক বলেই মনে হল।

ঘরের চার দেয়ালে চারখানা আলমারি; সেগুলোর ভেতর অসংখ্য বই। বইগুলো ইতিহাস, দর্শন, ফলিত জ্যোতিষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাজনীতি—ইত্যাদি বিভিন্ন গুরু-গম্ভীর বিষয়ের ওপর লেখা।

প্রৌঢ় বললেন, 'এখানে বসবেন না দোতলায় যাবেন?'

দীপেন কিছুটা অবাক হল। ভদ্রলোকের সঙ্গে এই-মাত্র আলাপ হল। এখনও তাদের পরিচয় পরস্পরের কাছে অজানা। তবু যেভাবে প্রৌঢ় তাকে দোতলায় আহ্বান করলেন তাতে তাঁর চরিত্রের একটা দিক পরিষ্কার হয়ে গেল। দীপেন বলল, 'আপনি যেখানে বলবেন—'

চুপ করে কি ভেবে প্রৌঢ় বললেন, 'আচ্ছা, এখানেই বসুন'—বলে আঙুল দিয়ে অদূরবর্তী একটা সোফা দেখিয়ে দিলেন।

দীপেন বসল। প্রৌঢ়ও মুখোমুখি বসে বললেন, 'আমার নাম নীলকান্ত যোশী; এবার বলুন কি দরকারে এসেছেন।'

দীপেন আগেই অনুমান করেছিল। তবু ভদ্রলোক নিজের নামটা বলতে চকিত হল সে। ইনিই তা হলে সেই লিজেণ্ডের নায়ক; সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঐ কাগজ-গুলো তা হলে এঁকে নিয়েই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল?

একটা ব্যাপার দীপেন লক্ষ্য করল, তার সম্বন্ধে নীল-কান্ত যোশীর বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই। এমন কি তার নাম, কোথায় থেকে সে আসছে ইত্যাদি ইত্যাদি কোন

কিছু সম্বন্ধেই তিনি প্রশ্ন করলেন না। কাজেই আলাপের সুবিধার্থে প্রথমে নিজের পরিচয় দিল দীপেন, এবং সুদূর বাঙলাদেশ থেকে যে আসছে সে কথাও বলল।

এবার বিস্মিত হলেন নীলকান্ত যোশী। বললেন, 'বাঙলাদেশ থেকে আসছেন!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা আমার নাম কিভাবে জানলেন!'

গলার স্বরে অনেকখানি ভক্তি ঢেলে দিয়ে দীপেন বলল, 'আপনি বিখ্যাত ব্যক্তি, নাম জানাটা আদৌ অসম্ভব কাজ নয়।' [ক্রমশঃ

কল্যাণ-দূত

স্বামী সত্যানন্দ

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে হে কল্যাণ দূত
স্বাগত জানাই বারে বারে
পুণ্য হোক ধন্য হোক মৃগতৃষ্ণ ধূলি
তৃপ্ত তব নব ধারা সারে।
বুকে বুকে ধূমায়িত রুদ্ধ জ্বালা যত
তব বক্ষে পেয়েছে আশ্রয়
কৃষ্ণতার রূপে আজি হে কান্ত-করুণ
কৃপা কত করেছ সঞ্চয়।
প্রণয়ের দূত নহ—মোহবার্তাবহ—
উত্তর বা পূর্ব্ব-মেঘ সম—
দুঃখ-দাব জর্জ্জরিত ল'য়ে যাও দূরে
উষ্ণ শ্বাস তৃষ্ণাহত মম।
মহাকাল মন্দিরের শীর্ষশিরে গাঁথি
শত বিদ্যুতের সেই লিখা
নিয়ে এই সানুদেশে সহস্র মিনারে
ঝকিয়া যে উঠে শত শিখা।
সুরধুনী তনু নৃত্যে ছায়া বিদ্যুতের
ত্রিবেণী রচনা করি কত
ভাঙা গড়া শত শত তব নর্ম খেলা
জীবনের কাব্য শত শত।
জঠরের নহ নহ প্রেত কবরের
তুমি দেব অমৃত মহান

ছায়াময় রূপ তব—কোমলে কঠোর
প্রজ্ঞায় স্থিত ধৃত প্রাণ।
শুষ্ক দীর্ণ ধরণীর বক্ষ পঞ্জরের
যত ব্যথা যত দৈন্য গ্লানি
সিক্ত তাই নেত্র তব কুণ্ঠা তায় কত
দিগ্ধ তাই তব মঞ্জুবাণী।
ছলছল আঁখি তাই অঝোর ঝরণ
ধরণীকে তৃপ্ত করিবার
তুমি চুপে আসিয়াছ মুক্তি মধুব্রতী
প্রমিথাস অগ্নির আধার।
বজ্রমুষ্টি তুলি কত হর্ম্য অভ্রশির
ছিদ্রপেতে করে নেত্রপাত
কামনার শীর্ষে তার রুদ্র বজ্রহানি
ক্ষণিকে কর যে ধূলিসাৎ।
বাসনার অলঙ্কারে সজ্জিত যে পুর
ভেসে যায় তব ধারা জলে
কৃষকের দীন ক্ষীণ কুটীরের পাশে
আশা আর আনন্দ উছলে।
পুষ্পলাবী যত মন তব শিলাঘাতে
পড়ে থাক্ মর্ম্মরিত রবে
মন্ত্রদীপ্ত অন্ধকারে অগ্নিনেত্রে তব
মদনেরে ধ্বংস কর তবে।
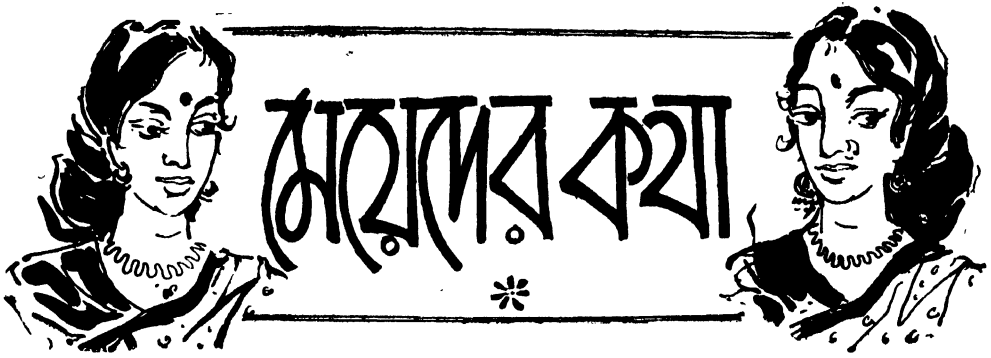
শুধু দিন যাপনের গ্লানি

শ্রাবণী রায়

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এই বিভাগে শৈল চট্টোপাধ্যায়ের "সঙ্কট : সমাজে, সংসারে" পড়ে আরও যে সব কথা মনে উদয় হল তাই এখানে লিখছি।

এ যুগের নারীকে সুখের নীড় গৃহকোণ ছেড়ে বাহিরে আসতে হয়েছে—কর্ম-ক্ষেত্রে দাঁড়াতে হয়েছে পুরুষের পাশে—তাকে সহায়তা করতে—তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে—সুযোগ পেলে তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে—তাকে পর্যুদস্ত করতে। তার পেছনে প্রয়োজনের তাগিদ আছে নিশ্চয়ই। সে প্রয়োজন আর্থিক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে আর্থিক প্রয়োজন ব্যতিরেকেও অনেক নারী কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। গৃহকোণে একটি মাত্র পুরুষকে শাসন পালন ক'রে তার তৃপ্তি হয়নি বলেই হয়ত অনেকের উপর প্রাধান্য বিস্তারের কামনায় তারা কর্মক্ষেত্রে নেমেছে। 'শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' তাকে বহির্মুখী করে দিয়েছে!

সংসারে অবশ্যই অর্থের প্রয়োজন—অনেক অর্থের প্রয়োজন আছে। পুরুষের একার উপার্জনে সংসার চালানো অনেক ক্ষেত্রেই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তাই প্রয়োজনের তাগিদেও নারীকে কর্মক্ষেত্রে নামতে হয়েছে বহুজায়গায়। ঘর সংসার চালানোর কাজে সময় নষ্ট করার মত সময় আজ তার নেই। তাই ঘরের কাজ স্বামী স্ত্রীতে চালাবার সংকল্প অনেকের মনে থাকলেও—পরে তা বাষ্প হয়ে উবে যায়। তখন ঘরের কাজের জন্যে লোক নিযুক্ত করতে হয়—তখন স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই হাতে থাকে প্রচুর অবসর,—কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

আগেকার দিনে বড় বা ছোট কোনও সংসারেই অবসর বড় বেশী জুটত না। যে নারী যত বেশী ভাগ্যবতী বলে গণ্য হতেন তাঁর দায়িত্ব ও কাজের ঝামেলা তত বেশী ছিল। স্বামী সন্তান নিয়ে বেড়ানোর সুযোগ তাঁরা বড় বেশী পেতেন না। সংসারের পাঁচজনের খোঁজখবর নিয়ে, অতিথির সেবায়, দেবসেবা মিটিয়ে যে সময়টুকু হাতে থাকত সেটুকু রামায়ণ মহাভারত মনসামঙ্গল পাঠেও ব্যয়িত হত। বার মাসের তের পার্বণেও কম সময় লাগত না।

এখন দিন পাল্‌টেছে। এখন স্বামী-স্ত্রীর হাতে অনেক সময়—সে সময় ব্যবহারের পদ্ধতিও অত্যাধুনিক হয়ে উঠেছে অনেক ক্ষেত্রে। আমাদের পুরাতন কিন্তু পরীক্ষিত সংস্কারকে, মতবাদকে, সামাজিক ব্যবস্থাকে ওলট পালট করে দিয়ে স্বাধীন নারীরা এক অত্যাধুনিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টায় আছেন। তাঁদের লক্ষ্য পশ্চিম দেশের সমাজের প্রতি এবং তারই অন্ধ অনুকরণে ও অনুসরণে এই স্বাধীন আধুনিকারা ব্যাপৃত রয়েছেন।

আজকাল স্বামীর সঙ্গে বান্ধবীর সঙ্গে, এমন কি স্বামীর বন্ধু বা নিজের পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া, পার্টিতে

যাওয়া, হোটেলে খাওয়া, নানা রকম আধুনিক ব্যসনে দিনাতিপাত করার নাম নাকি জীবন উপভোগ! কিন্তু এর ফল কি?

ফল অতি সাংঘাতিক। নিত্য সামাজিক কদাচার বৃদ্ধি—স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য—গর্ভ নিরোধের নানা প্রক্রিয়া সত্বেও জাত সন্তানদের প্রতি অবহেলা—বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতির কুফল থেকে সমাজকে রক্ষা করা এক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের হিতাহিত ভাববার দায়িত্ব যাঁদের আছে তাঁদের একটা কথা আজ ভালভাবে ভাবতে হবে। সেটা হচ্ছে সমাজের নারীরা—কিভাবে তাদের অবসর যাপন করবে? অবশ্যই কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। কিন্তু তারা যাতে ভালোভাবে অবসর বিনোদন করে, সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারা সম্ভব। অবসর সময়ে নানা রকম রুচি বিশেষের চর্চা করে,—কথনও গঠন মূলক কাজ করে—কখনও দরিদ্রের সেবা করে—বা সঙ্গীত সাহিত্য নৃত্য প্রভৃতির অনুশীলন করে,—শিশুপালন, রুগীর সেবা সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়িয়ে নিজের ও প্রতিবেশিনীদের অবসর সময়টাকে মধুময় করতে উৎসাহ যোগান যেতে পারে। যুগ বদলাচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকন্যাদের অবসর যাপনের পদ্ধতিরও পরিবর্তন হবে তা নিশ্চিত। কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যে শান্তি আসুক—সমৃদ্ধি আসুক, কল্যাণ আসুক, কিন্তু ব্যভিচার আর উৎকট আধুনিকতা যেন না আসে। এ বিষয়ে মা এবং মেয়েরা যেন সজাগ থাকেন, সতর্ক থাকেন। তা নইলে আমাদের যুগ যুগ ধরে গঠিত এই সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কারভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদ্দামতার রাজ্যই স্থাপিত হবে, আর ঘরে ঘরে ডেকে আনবে অশান্তির বন্যা। শুধু দিনযাপনের গ্লানিকে এড়াতে গিয়ে আরও গভীর গ্লানিতে যেন আমরা পতিত না হই সেই বিষয়ে অবহিত হতে আধুনিকাদের অনুরোধ করছি।

স্নপর্ণা দেবী

সুস্থ-স্বচ্ছন্দ দেহ-মনই হলো—বাঁচবার একমাত্র উপায়। তাই দেহ-মন সুস্থ প্রাণবন্ত রাখতে হলে, নিত্য নিয়মিত এমন ব্যায়াম চর্চ্চার প্রয়োজন—যে ব্যায়ামে দেহের বিকৃতি ঘটবে না এবং মেয়েদের রূপ-লালিত্য ও সৌকুমার্য্য অক্ষুণ্ণ-অটুট থাকবে। চলা-ফেরা, বসা-দাঁড়ানো, শয়ন-বিশ্রাম—এ সবের ভুল ভঙ্গীতে শুধু যে, মেয়েদের দেহের ছাঁদটুকুই বিকৃত হয় তা নয়, উপরন্তু বিকৃত দেহ ছাঁদের জন্য নানাভাবে স্বাস্থ্যহানিও ঘটে···এবং সে ভগ্ন-স্বাস্থ্যকে বিবিধ ঔষধ-পথ্য বা সুচিকিৎসকের সহায়তায় অনেক ক্ষেত্রেই পুনরুদ্ধার করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না।

মেয়েদের রূপ সৌন্দর্য্য এবং অঙ্গ-ছাঁদ নির্ভর করে, তাঁদের অবিকৃত গঠন সৌষ্ঠবের উপর। পাশ্চাত্য দেশের বহু অভিজ্ঞ রূপচর্চ্চা বিশারদেরাই বলেন—Low vitality is often the result of bad posture···অর্থাৎ অঙ্গ-ছাঁদ বিকৃত হলে, জীবনী শক্তিও সবিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়। তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে আমাদের দেহের বিভিন্ন পেশী—যথা, কাঁধের পেশী, বুক-পিঠের পেশী, মেরুদণ্ড এবং তলপেটের পেশী, হাতের ও পায়ের পেশী—এগুলির গঠন-পুষ্টি আর সুস্থ সবল সক্রিয়তার উপর জীবনী-শক্তি নির্ভর করে অনেকখানি। কাজেই নিত্য-নিয়মিতভাবে ব্যায়াম অনুশীলনে এ সব পেশীকে সুঠাম-সুন্দর, সজীব ও অবিকৃত রাখা একান্ত প্রয়োজন। না হলে এ পেশী-গুলির দৌর্ব্বল্য আর বিকৃতি ক্রমশঃ সারা দেহে অসুস্থতার

সঞ্চার করে এবং অসুস্থতার ফলে, কত জীবন যে অকালে কুৎসিত-জরাজীর্ণ ও রোগাক্রান্ত হয়ে ওঠে, তার আর সংখ্যা নেই।

বিশেষজ্ঞেরা আরো বলেন যে পিঠের পেশী, মেরুদণ্ড এবং তলপেটের পেশী—এগুলির শক্তির উপর কাঁধের শক্তি সামর্থ্যের নির্ভর অনেকখানি। এ পেশীগুলি যদি কোন কারণে দুর্ব্বল বা অসুস্থ হয়, তাহলে কাঁধের পেশীও সুস্থ-সবল থাকবে না...উপরন্তু, অকালে জীর্ণ হয়ে ঝুঁকে পড়ে সারা দেহকে বিকৃত করে তুলবে। তার ফলে, দেহের রক্ত চলাচল ক্রিয়ায় যে ব্যাঘাত ঘটবে, তাতে শারীরিক-অসুস্থতা হওয়া অনিবার্য্য।

তাই চলা-ফেরা, বসা-দাঁড়ানোর ভঙ্গী সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই—বিশেষতঃ, মেয়েদের সর্ব্বদা সজাগ-সচেতন থাকা দরকার। শুধু সতর্ক-দৃষ্টি রাখাই নয়, প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ খোলা জানলার সামনে, অথবা ছাদে কিম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে নির্ম্মল বায়ু সেবন এবং নিত্য-নিয়মিতভাবে নিতান্তই ঘরোয়া-ধরণের সহজ-সরল কয়েকটি ব্যায়ামভঙ্গী অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। এ সব ব্যায়াম ভঙ্গী অনুশীলনের ফলে, দেহের পেশীগুলি সুস্থ সবল ও সজীব থাকবে এবং শারীরিক বিকৃতি বা বৈকল্যেরও সম্ভাবনা দেখা দেবে না।

প্রসঙ্গক্রমে, আপাততঃ দেহের পেশীসমূহ সুস্থ-সজীব রাখবার উপযোগী বিশেষ ধরণের কয়েকটি ব্যায়াম ভঙ্গী অনুশীলনের মোটামুটি হদিশ দিয়ে রাখি।

১

উপরের ১নং চিত্রে যে ব্যায়াম ভঙ্গীর নমুনা দেখানো হয়েছে, সেটি অনুশীলনের রীতি হলো—সমতল জমির উপর সিধা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে মাথার পিছন দিকে দুই হাত মুঠো করে রেখে অন্ততঃপক্ষে মিনিট পাঁচেককাল ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুন। নিয়মিতভাবে এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অনুশীলনের ফলে, কাঁধের ও গলার পেশীগুলি সুস্থ-সবল, সুন্দর সুঠাম হয়ে উঠবে।

২

উপরের ২নং ছবিতে যে ব্যায়াম ভঙ্গীর নমুনা দেখানো হয়েছে, সেটির অনুশীলন রীতি হলো—সমতল জমির উপর দেহটি সটান সিধা ও খাড়াভাবে রেখে দাঁড়িয়ে দুইহাত সামনের দিকে চিবুকের নীচে মুষ্টিবদ্ধ করে কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুন। এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি অনুশীলনের সময়, মাথাটি যেন বরাবর খাড়া সিধা এবং দুই কনুই যেন উপরোক্ত-ছবির নমুনামতো দৃঢ়ভাবে স্থাপিত থাকে—সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। এ ব্যায়াম ভঙ্গীটিও নিত্য-নিয়মিত অন্ততপক্ষে পাঁচ মিনিটকাল মনো-যোগ সহকারে অভ্যাস করা চাই। এ ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের ফলে, গলার, ঘাড়ের, হাতের ও পুত্‌নীর পেশীগুলি সুস্থ সুঠাম আর সজীব-সবল হয়ে উঠবে অচিরেই।

স্থানাভাবের কারণে, এবারে এই দুটি ব্যায়াম ভঙ্গী অনুশীলনের মোটামুটি হদিশ দেওয়া হলো। আগামী সংখ্যায় আরো কয়েকটি ব্যায়াম ভঙ্গীর পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—আমাদেরই বাঙলাদেশের বিচিত্র মুখরোচক অভিনব এক ধরণের আমিষ খাবার রান্নার কথা। অপরূপ সুস্বাদু এই আমিষ খাবারটির নাম—'চিংড়ী মাছের দৈ-আলু'।

এ খাবারটি রান্নার জন্য উপকরণ চাই—গোটা বারো-চৌদ্দ মাঝারি সাইজের চিংড়ী মাছ, তিন-চারটি আলু, তিন-চারটি পেঁয়াজ, একটুকরো আদা, চার-পাঁচটি কাঁচা-লঙ্কা, একপোয়া টক-দই, আধ-ছটাক ঘি প্রয়োজন মতো পরিমাণে খানিকটা নুন, চিনি, গরম মশলা এবং চায়ের পেয়ালার এক পেয়ালা পরিমাণ জল।

উপকরণগুলি জোগাড় করে নেবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, উদ্যোগ-পর্ব্বের আরো কয়েকটি ব্যবস্থা সেরে নেওয়া দরকার। অর্থাৎ, গোড়াতেই চিংড়ী মাছ-গুলিকে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে, পরিপাটি ধরণে প্রয়োজনানুযায়ী ছোট ছোট টুকরোয় কুটে নিন। আলুগুলিকেও প্রয়োজনমতো ছোট ছোট ছাঁদে টুকরো করে কেটে নেবেন এবং পেঁয়াজ ও আদার খোশা ছাড়িয়ে নিয়ে, সেগুলিকে কুচিয়ে পরিপাটি ধরণে বেঁটে রাখুন। তারপর উনানের আঁচে রন্ধন পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে ঘি দিয়ে, তপ্ত-তরল ঘিয়ে আদা-পেঁয়াজ-বাটা ছেড়ে, 'মিশ্রণটিকে' মিনিট পাঁচেককাল বেশ ভালোভাবে ভেজে নিন। এবারে উনানের আঁচে বসানো রন্ধন পাত্রের এই সদ্য-ভাজা 'মিশ্রণের' সঙ্গে গরম-মশলা, চিনি ও নুন মিশিয়ে, 'রান্নার মশলাটিকে' অল্প কিছুক্ষণ বেশ ভালোভাবে 'কষে' নিন। এমনিভাবে 'রান্নার মশলা' কষে নেবার পর, উনানের আঁচে বসানো রন্ধনপাত্রে চায়ের পেয়ালার জলটুকু ঢেলে, রন্ধন পাত্রের মুখটি আগা-গোড়া বেশ ভালোভাবে থালা বা ঢাকনী চাপা দিয়ে ঢেকে বন্ধ করে, রন্ধন পাত্রের 'মিশ্রণটিকে' আরো কিছুক্ষণ উনানের আগুনের আঁচে বসিয়ে রেখে ফুটিয়ে নেবেন। এ ব্যবস্থার ফলে, কিছুক্ষণ বাদে 'মিশ্রণটি' বেশ ফুটন্ত হয়ে উঠলে, সাবধানে রন্ধন পাত্রের মুখের ঢাকনীটি সরিয়ে রেখে পাত্রের 'মিশ্রণে' চিংড়ী মাছের টুকরোগুলি এবং সেই সঙ্গে টুকরো করে কুটে রাখা আলু ও কাঁচা-লঙ্কার টুকরোগুলি ছেড়ে দিন। তারপর পুনরায় রন্ধন পাত্রের মুখ ঢাকনী চাপা দিয়ে বন্ধ করে, রান্নার উপকরণগুলিকে খানিকক্ষণ উনানের আঁচে বসিয়ে রেখে আগাগোড়া সুসিদ্ধ করে নিন। উপকরণগুলি যথাযথভাবে সুসিদ্ধ হবার পর, রন্ধন পাত্রের মুখের ঢাকনীটিকে সরিয়ে রেখে, মাছ আলু আর মশলার সঙ্গে দইটুকু মিশিয়ে দেবেন এবং পুনরায় রন্ধন পাত্রের মুখ ঢাকনী চাপা দিয়ে বন্ধ করে রেখে রান্নার উপকরণগুলিকে আরো মিনিট পাঁচেককাল আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ফুটিয়ে নেবেন। তবে খেয়াল রাখবেন—খাবারটি যেন খুব বেশীক্ষণ ফুটানো না হয়···কারণ, বেশী ফুটানোর ফলে, খাবারের স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই খাবারটি মিনিট পাঁচেককাল ফুটানোর পরেই, উনানের আঁচের উপর থেকে রন্ধন পাত্রটিকে নামিয়ে নেওয়াই ভালো। তাহলেই 'চিংড়ী-মাছের দৈ-আলু' খাবার রান্নার পালা শেষ হবে।

অতঃপর, প্রিয়জনদের পাতে সাদরে-সযত্নে এ খাবারটি পরিবেশনের পালা। অভিনব মুখরোচক এই 'চিংড়ী-মাছের দৈ-আলু' খাবারের বিচিত্র সুস্বাদে তাঁরা যে বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করবেন—সে পরিচয় মিলবে, আহারান্তে তাঁদের প্রশংসাসূচক মন্তব্য শুনতে পেলেই।

আগামী সংখ্যায় আরেকটি বিচিত্র অভিনব ভারতীয় খাবার রান্নার প্রসঙ্গ আলোচনা করার বাসনা রইলো।

—
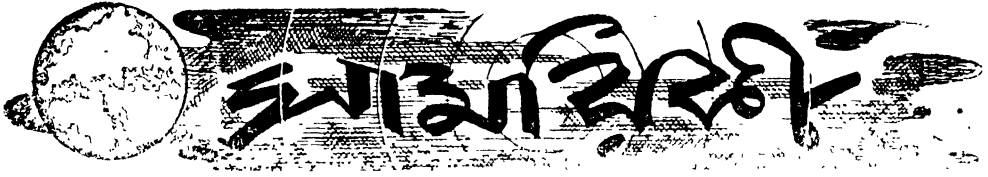
সফরের সাফল্য—

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র, যুগোশ্লাভিয়া ও রাশিয়ার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। প্রধান মন্ত্রীর এই সফরের যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাতে কোনও সন্দেহই নেই। বিশেষ করে রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোশিগিন-এর সঙ্গে তাঁর আলোচনার প্রয়োজন ছিল সব চেয়ে বেশী। কারণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর সাহায্য লাভ এবং টাকার মূল্য হ্রাস প্রভৃতি বিষয়ে রাশিয়ার মনোভাব কি এবং ভারত সরকারের বর্ত্তমান বৈদেশিক নীতি ঠিক কোনপথে চলছে—নেহেরু-নীতির থেকে সরে আসছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ে রাশিয়ার মনে যদি কোনও সন্দেহ জেগে থাকে তাহলে তার নিরসনের জন্যেও সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি আলোচনার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া ভিয়েৎনামের যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতের মনোভাব স্পষ্টকরে জানান এবং শান্তিস্থাপনের উপায় সম্বন্ধে ভারতের মত প্রকাশ করার জন্যও আলোচনার দরকার ছিল। নতুবা ভুল বোঝাবুঝি হয়ত ঘটতে পারত এবং সেই সম্ভাবনাকে দূর করবার জন্যেও এই রকম সরাসরি ও খোলাখুলি আলোচনার প্রয়োজন হয়েছিল। প্রেসিডেণ্ট নাসের ও মার্শাল টিটোর সঙ্গেও এই সব বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে চৈনিক সমস্যা নিয়েও আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই শ্রীমতী গান্ধী এই সফর করতে বেরিয়েছিলেন, যা আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বলে মনে না হলেও সত্য সত্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

যাই হোক, প্রধানমন্ত্রীর এই সফর সম্পূর্ণ সফল হয়ত না হলেও, ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন অপর দেশ-নেতাদের মনের সংশয় দূর করে তাঁদের বন্ধুত্ব-বন্ধন যে আরও দৃঢ় করতে সমর্থ হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহই নাই।

প্রধান মন্ত্রীর প্রত্যাবর্ত্তনের পর কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজও সোভিয়েট সরকার কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে রাশিয়া পরিদর্শনে গমন করেছেন। কংগ্রেস দলপতির এই ভ্রমণও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং তাঁর এই ভ্রমণের ফলে ভারত-রুশমৈত্রী বন্ধন আরও দৃঢ় হবে।

বিক্ষোভ দিকে দিকে—

ভারতের সাধারণ নির্ব্বাচন যতই এগিয়ে আসছে এবং খাদ্যাভাব ও অন্যান্য অভাবও যতই বেড়ে চলেছে, উত্তেজনা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতিও দেশের নানাস্থানে ততই পরিলক্ষিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বরাবরই বেশী। বিরোধী পক্ষ এখানে প্রবল এবং উদ্বাস্তু আগমনজনিত সমস্যা ও খাদ্য সমস্যাও এ প্রদেশে খুবই বেশী। তাই বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলাও এখানে এত প্রবল আকার ধারণ করে। অধুনা উত্তর-প্রদেশ প্রভৃতিস্থানেও এই সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। সেখানে সরকারী কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করে সরকারী কাজকর্ম্ম প্রায় অচল করে দিচ্ছেন। ছাত্রসম্প্রদায়ও, যদিও তাঁদের সঙ্গে এই বিষয়ে কোনও সম্পর্ক নেই, এই বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করে অবস্থা আরও জটিল করে তুলেছেন। বামপন্থী দলগুলির যুক্তপ্রদেশ 'বন্ধ' আন্দোলনের পরই এই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে এবং অনেকস্থলে এই বিক্ষোভ হিংস্র হয়ে উঠে শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে। তবে আশা হয় সরকার ও বিরোধী পক্ষ শান্তভাবে সবদিক বিবেচনা করে শীঘ্রই একটা মীমাংসা করে এই বিক্ষোভকে শান্ত করবেন।

পশ্চিম বঙ্গে তো ছোটখাট বিক্ষোভ সর্ব্বদাই লেগে আছে। ধান-চাল অপহরণ, পুলিশ ও চোরাই চালান-কারীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ, ট্রেণ আটক করে বিক্ষোভ প্রদর্শন, কলিকাতা নগরীর পথে পথে বিরাট বিরাট শোভাযাত্রার দ্বারা পথ ও যানবাহন অবরোধ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা,

প্রভৃতি বিক্ষোভ প্রায়শঃই ঘটছে। এর ওপর সরকার-বিরোধী দলগুলি আসন্ন আন্দোলনের হুমকি দিয়ে সরকারকে সশঙ্ক ও জনসাধারণকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছেন! সরকারী শাসন ব্যবস্থা যে ত্রুটিপূর্ণ তা অনস্বীকার্য্য, খাদ্যাভাব ও অন্যান্য নানা অভাবে জনজীবন যে জর্জ্জরিত তাও সত্য এবং সেজন্য সরকারী অব্যবস্থার প্রতিবাদে দলমত নির্ব্বিশেষে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানানর অধিকারও স্বীকৃত। কিন্তু বিক্ষোভের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট করা, প্রতিবাদের নামে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা কখনও নীতি হতে পারে না। অভাব, অনটন, অব্যবস্থার প্রতিকার অশান্তি ও অন্যায়ের মধ্যে দিয়ে, বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলতার মধ্যে দিয়ে করা কি সম্ভব? প্রতিকার করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা শান্তিপূর্ণ ভাবে, গঠনমূলক পরিকল্পনার সাহায্যে, বিভেদ-বিরোধ ভুলে, সহযোগী মনোভাব নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে করাই উচিত।

দেশ সকলকারই। তা সরকার পক্ষেরও নিজস্ব সম্পত্তি নয়—বিরোধী পক্ষেরও নয়। সেই দেশের উন্নতি করতে হলে—অভাব, অনটন, অস্বচ্ছলতা দূর করতে হলে, সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। আর সরকারী শাসন যদি পছন্দ না হয়—ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হয়, এবং সেই সরকারকে উচ্ছেদ করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে তো তার উপায় ও পথ হিসাবে গণতন্ত্রী দেশে সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করাই আছে। সেই নির্ব্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ভাবে যখন এই শাসক-পরিবর্ত্তন করা সম্ভব তখন এই অশান্ত বিক্ষোভের প্রয়োজন কি? রাজনীতি ক্ষেত্রের বাইরের বিপুল জনসাধারণও তো শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে চায়। প্রতিকারও তারা চায়, কিন্তু ধনপ্রাণ বিপন্ন করে নয়। এই জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকার ও বিরোধী পক্ষ উভয়েরই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম স্থির করা উচিত। নতুবা অচিরেই বিশ্বের এই সর্ব্ববৃহৎ গণতন্ত্রী দেশটি অরাজকতার অতল গর্ভে পতিত হবে।

আবার পরমাণু বোমা—

ফ্রান্স আবার শূন্যে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করেছে। কিছুদিন আগেই চীনের এইরূপ বোমা বিস্ফোরণ সারা বিশ্বের, বিশেষ করে এশিয়ার শান্তিপ্রিয় দেশগুলিকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। চীন সম্পূর্ণ জঙ্গীবাদী এবং কারুর মতামতের বা মানবতার সে ধার ধারে না বলে তার পক্ষে এই বিস্ফোরণ ঘটান বিশেষ আশ্চর্য্যের নয়; কিন্তু ফরাসী দেশকে চীনের সমতুল্য বলা চলে না, তবুও প্রেসিডেন্ট দ্য'গলের ফ্রান্স পরমাণু বোমা ফাটিয়ে বিশ্বের আবহাওয়াকে ও জনমনকে বিষাক্ত করে তুলেছেন। অবশ্য ফ্রান্সের পক্ষে যুক্তি থাকতে পারে যে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে উর্দ্ধে পরমাণু বোমা না ফাটাবার যে চুক্তি হয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তারা আগে ভাগে যথেষ্ট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাদের পরমাণু শক্তি যখন বর্দ্ধিত করে নিয়েছেন তখন ফ্রান্সেরই বা করতে বাধা কি? এই রকম যুক্তি হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু এই পরমাণু শক্তির রেষারেষি যতই বাড়তে থাকবে বিশ্বের বিপদও ততই ঘনিয়ে আসবে এবং হয়ত এমন এক দিন আসবে যখন প্রতিটি দেশই এই পরমাণু বোমা তৈরী করে তাদের শক্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করতে চাইবে। শক্তিমত্ত রাষ্ট্রনায়করা সে কথা ভাবছেন কি?

কিছুদিন পূর্ব্বে পুনায় শ্রীদিলীপকুমার রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "হরিকৃষ্ণ আশ্রম" পরিদর্শনে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ গমন করেছিলেন। এখানে শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের সহিত ডঃ রাধাকৃষ্ণণকে দেখা যাচ্ছে।

ভিয়েৎনাম পরিস্থিতি—

উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিন বোমাবর্ষণের তীব্রতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে পরিস্থিতিও ততই ঘোরাল হয়ে উঠেছে। হানয়, হাইফং প্রভৃতি সহরের ওপর বোমাবর্ষণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সর্ব্বত্রই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে এমন কি খোদ মার্কিন দেশেও অনেকেই এই যুদ্ধ ও বোমাবর্ষণের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ভারতেও প্রতিবাদ জানান হয়েছে নানা রকমে। সরকারী ভাবে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই বোমাবর্ষণের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। বামপন্থী দক্ষিণপন্থী, ছাত্রদল প্রভৃতি সভা, শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ লিপি, কুশপুত্তলিকা দগ্ধ প্রভৃতির মাধ্যমে বিক্ষোভ জানিয়েছেন। কলিকাতায় কয়েক স্থলে এই বিক্ষোভ অশান্ত হয়ে উঠে শান্তি ভঙ্গও করেছে। মার্কিন গ্রন্থাগারের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে এবং মার্কিন তত্ত্ব বিভাগের সম্মুখের পতাকা নামিয়ে এনে দগ্ধও করা হয়েছে। শালীনতা, সভ্যতা ও নীতির দিক থেকে এ কার্য্য করা খুবই অন্যায় হয়েছে যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের শত্রু নয়—আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র, যেমন সোভিয়েট রাশিয়া। সুতরাং একটি বন্ধু রাষ্ট্রের, তার অপর দেশে অনুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য,—তা ন্যায়ই হোক বা অন্যায়ই হোক, পতাকাকে দগ্ধ করে সে রাষ্ট্রকে অপমানিত করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। এরূপ কার্য্যে আমাদের দেশের ও জাতির মর্য্যাদাই নষ্ট হয়। সুতরাং আমাদের তরুণরা এ সব বৈদেশিক বিষয়ে আরও সংযমের পরিচয় দিয়ে যেন আমাদের দেশের সম্মান রক্ষা করেন।

ভিয়েৎনামের এই যুদ্ধ ও বোমাবর্ষণ বন্ধের উপায় স্বরূপ প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী জেনিভা কনফারেন্স ডাকার কথা বলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড এতে রাজী হলেও সোভিয়েট রাশিয়া উত্তর ভিয়েৎনামের সম্মতি ছাড়া এই কন্‌ফারেন্স ডাকায় মত দিতে রাজী হয় নি। চীন তো এর সম্পূর্ণ বিপক্ষে এবং চীনের পরামর্শ-পুষ্ট উত্তর ভিয়েৎনাম এই জেনিভা কন্‌ফারেন্সএর মাধ্যমে শান্তি স্থাপনে সম্পূর্ণ রূপে অসম্মত।

চীন উত্তর ভিয়েৎনামকে এই যুদ্ধে নানা সাহায্য দিয়ে আসছে। চীনা সৈন্যের উত্তর ভিয়েৎনামের রণক্ষেত্রে উপস্থিতি প্রমাণিত না হলেও, অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা চীন যে উত্তর ভিয়েৎনামকে যথেষ্ট সাহায্য করছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ কারুরই নেই। সুতরাং চীনের সম্মতি ছাড়া উত্তর ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্ট সরকার কোনও রকম আলাপ আলোচনায় রাজী হবে বলে মনে হয় না। কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠী-ভুক্ত অন্যান্য দেশগুলিও চীনের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকলেও এই বিষয়ে উত্তর ভিয়েৎনামের ইচ্ছার বিপক্ষে মত প্রকাশ করবে না। এই সকল দেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য কয়েকটি দেশও একযোগে বলছেন যে বোমাবর্ষণ বন্ধ করে ভিয়েৎনামের মাটি থেকে আমেরিকাকে তার সমস্ত সৈন্য অপসারণ করে আলোচনার পথ প্রশস্ত করতে।

কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, মার্কিন রাষ্ট্র ও তাদের সমর্থক কয়েকটি দেশের মত হচ্ছে যে চীনকেও তাহলে উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে হাত গুটাতে হবে। তা না হলে যদি শুধু আমেরিকাই সরে আসে তাহলে অচিরেই দক্ষিণ ভিয়েৎনাম চৈনিক কম্যুনিষ্টদলের কবলে পড়বে এবং শুধু দক্ষিণ ভিয়েৎনামই নয়—সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়াও অচিরেই চৈনিক প্রভাবের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হবে। সেই সঙ্গে চীনের দিক থেকে ভারতের বিপদও বর্দ্ধিত হবে।

যাই হোক, অবস্থা দেখে মনে হয় আমেরিকা বা চীন কেউই ভিয়েৎনাম থেকে সরে আসতে বর্ত্তমানে রাজী হবে না। সুতরাং ভিয়েৎনামের যুদ্ধ চলবে। তবে যতদিন না চীন সরাসরি এই যুদ্ধে যোগদান করছে বা অন্য কম্যুনিষ্ট দেশ সৈন্য পাঠাচ্ছে ততদিন এই যুদ্ধ ভিয়েৎনামের রণাঙ্গনেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আমেরিকাও যতদূর মনে হয় এই যুদ্ধের বিস্তৃতি কামনা করে না। কিন্তু অঘটন ঘটতে কতক্ষণ? আর যদি সেরকম কিছু ঘটে তাহলে হয়ত এই ভিয়েৎনামের যুদ্ধ থেকেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হতে পারে। তবে আশা করা যেতে পারে যে বিশ্বের চিন্তাশীল দেশনেতারা তাঁদের প্রভাব বিস্তার করে এই যুদ্ধকে আর বিস্তৃত হতে দেবেন না।

উড়ন্ত দাদু

তাপসকুমার চক্রবর্ত্তী

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন
বামাপদ সরকার,
পাড়াতুত সম্পর্কে
দাদু তিনি হন সবার।
'ভোঁ-কাট্টা' আওয়াজ শুনে
তাকিয়ে দেখেন উপর পানে,
ঘুড়িখানা এদিকেতেই
আসছে ছুটে হাওয়ার টানে।
দাদু ভাবেন ঘুড়িটাকে
ধরতে যদি পাই,
নাতির জন্যে তবে ওটা
বাড়ি নিয়ে যাই।
এই না ভেবে যেমনি
কাছে এসেছে ঘুড়িখান
সুতোটা ধরে অমনি তিনি
মেরেছেন একটান।
ঘুড়ির সুতো যেই না ধরা
অমনি কষে টান
দাদু দেখেন তাঁকে শুদ্ধ
উড়ছে ঘুড়িখান।
অনেক উঁচু উঠে দাদু
তাকিয়ে দেখেন একি!
চারি দিকেই ঘোরে শুধু
রকমারি পাখী।
চিলগুলো সব ভয়ের চোটে
পাশ কাটিয়ে যায়,
টিয়াগুলো ছুটে এসে
ঠোকর দিতে চায়।
কাকেরা সব চেঁচিয়ে বলে
কা—কা, জ্যেঠা, মামা,
দাদু বলেন 'ও ভাই ঘুড়ি
এবারটি কর ক্ষমা'।

ট্রিওলেট গুচ্ছ

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

১

অর্গলে রেখো না হাত, খুললেই তার কণ্ঠস্বর
রাতের বাতাস হয়ে ভেসে আসে ঘরের ভেতরে।
আগে যদি জানতাম, তা হলে কি দেখাতাম ঘর?
অর্গলে রেখো না হাত খুললেই তার কণ্ঠস্বর
প্রতিধ্বনি হয়ে ভাসে বিকম্পিত আমার এ ঘরে
কেননা সে মৃতমুখ এ দর্পণে আজো খেলা করে।
অর্গলে রেখো না হাত, খুললেই তার কণ্ঠস্বর
রাতের বাতাস হয়ে ভেসে আসে ঘরের ভেতরে।

২

শ্লেটের ওপরে হাত বুলোলেই মুছে যায় সব।
স্মৃতির নক্ষত্র থেকে আহরিত নামের অক্ষর,
আলতো খড়ির রঙে ছবিআঁকা তুচ্ছ কলরব।
শ্লেটের ওপরে হাত বুলোলেই মুছে যায় সব।
ধূসর স্বপ্নের ধুলি, ধূলিময় স্মৃতিদের সব
দীর্ঘশ্বাসে উড়ে যায় প্রাত্যহিক আকাঙ্খার স্তব।
শ্লেটের ওপরে হাত বুলোলেই মুছে যায় সব
স্মৃতির নক্ষত্র থেকে আহরিত নামের অক্ষর।

৩

এখন দীঘির জলে, গ্যাখো, কটি মাছ খেলা করে।
খোলা চুলে এ সময়ে বাতায়নে বসো না, বসো না।
ভোরের আলোর মতো কৈশোরের কথা মনে পড়ে।
এখন দীঘির জলে, গ্যাখো, কটি মাছ খেলা করে।
তারার নির্জন আলো নীল চোখে নিঃসঙ্গ বেদনা
অসময়ে আজ সখি এই জলে ছড়িয়ে দিও না।
এখন দীঘির জলে, গ্যাখো, কটি মাছ খেলা করে।
খোলা চুলে এ সময়ে বাতায়নে বসো না, বসো না।

৪

তোমার চুলের গন্ধে ভরে গেলো সমস্ত প্রাঙ্গণ।
বারান্দায় দাঁড়িয়ে কে বারে বারে রুমাল ওড়াও?
যখন ঘরের জন্যে ব্যাকুলিত উন্মুখর মন
তোমার চুলের গন্ধে ভরে গেলো সমস্ত প্রাঙ্গণ।
দীর্ঘশ্বাসে মনে পড়ে, এ হৃদয়ে স্মৃতি অনুক্ষণ।
তোমাকেই খুঁজেছিলো। তবু তুমি রুমাল ওড়াও?
তোমার চুলের গন্ধে ভরে গেলো সমস্ত প্রাঙ্গণ।
বারান্দায় দাঁড়িয়ে কে বারেবারে রুমাল ওড়াও?

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

দ্বিতীয় টেষ্ট ক্রিকেট

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ২৬৯ রান (নার্স ৬৪, বুচার ৪৯ এবং সোবার্স ৪৬ রান। হিগস ৯১ রানে ৬ এবং নাইট ৬৩ রানে ২ উইকেট)

ও ৩৬৯ রান (৫ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড। সোবস নট-আউট ১৬৩ এবং ডেভিড হলফোর্ড নটআউট ১০৫ রান। হিগস ৮২ রানে ২ এবং নাইট ১০৬ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ৩৫৫ রান (বরকট ৬০, গ্রেভনী ৯৬ এবং পার্কস ৯১ রান। হল ১০৬ রানে ৪ এবং গিবস ৪৮ রানে ২ উইকেট)

ও ১৯১ রান (৪ উইকেটে। সি মিলবার্ন নটআউট ১২৬ এবং গ্রেভনী নটআউট ৩০ রান। হল ৬৫ রানে ২ এবং গ্রিফিথ ৪৩ রানে ২ উইকেট)

বিশ্ববিশ্রুত লর্ডস মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। কিন্তু তার জন্যে প্রকৃত ক্রিকেট অনুরাগীর বিন্দুমাত্র অভিযোগ বা ক্ষোভ নেই। কারণ এই খেলাটি সাধারণ অমীমাংসিত খেলার পর্য্যায়ে পড়ে না। বিবিধ চিত্তাকর্ষক ঘটনা এবং প্রবল উত্তেজনায় পরিপূর্ণ এই অমীমাংসিত খেলাটি নিঃসন্দেহে বিশ্ব টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে গৌরবজনক স্থান পাবে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। বৃষ্টির জন্যে পুরো সময় খেলা হয়নি—তিন ঘণ্টা পনের মিনিটের খেলা নষ্ট হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম দিনের খেলায় চারটে উইকেট খুইয়ে ১৫৫ রান সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের বিরতির সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রান ছিল ২৪৭ (৬ উইকেটে)। লাঞ্চের পর তারা মাত্র ৪০ মিনিট খেলেছিল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ২৬৯ রানের মাথায় শেষ হলে বাকি সময়ে ইংল্যাণ্ড দুটো উইকেট খুইয়ে ১৪৫ রান তুলেছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ড বিশেষ ক্রীড়া-চাতুর্য্যের পরিচয় দেয়।

তৃতীয় দিনে ৩৫৫ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলে খেলার বাকি ৩৫ মিনিটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল একটা উইকেটের বিনিময়ে ১৮ রান সংগ্রহ করেছিল। ইংল্যাণ্ডের প্রবীণ খেলোয়ার (বয়স ৩৯) টম গ্রেভনী মাত্র চার রানের জন্যে সেঞ্চুরী রান পূর্ণ করতে পারেন নি। প্রায় চার বছর পর গ্রেভনী ইংল্যাণ্ডের টেস্ট ক্রিকেট দলে স্থান পেলেন।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৮৮ (৫ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স (১২১ রান) এবং তাঁর জ্ঞাতিভাই ডেভিড হলফোর্ড (৭১ রান)।

পঞ্চম দিনের লাঞ্চের ৪০ মিনিট আগে সোবার্স দলের ৩৬৯ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সোবার্স এবং হলফোর্ড অসমাপ্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ২৭৪ রান তুলে দিয়েছিলেন। এই ২৭৪ রান যে কোন দেশের বিপক্ষে সরকারী টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে ৬ষ্ঠ উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান।

ইংল্যাণ্ড যখন দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে তখন খেলা শেষ হতে ২৪০ মিনিট বাকি ছিল এবং ইংল্যাণ্ডের জয় লাভের জন্যে ২৮৪ রান সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই ২৪০ মিনিটে ইংল্যাণ্ড চার উইকেট খুইয়ে ১৯৭ রান সংগ্রহ করলে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। ইংলণ্ডের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ রান করেন কলিন মিলবার্ণ (নটআউট ১২৬) এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ রান করেন। গারফিল্ড সোবার্স (নটআউট ১৬৩)।

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ: ২৩৫ রান সেমুর নার্স ৯৩ এবং ল্যাসলি ৪৯ রান। জন স্নো ৮২ রানে ৪, হিগস ৭১ রানে ৪ এবং ডি' ওলিভিয়েরা ৫১ রানে ২ উইকেট) ও ৪৮২ রান (৫ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড। বেসিল বুচার নটআউট ২০৯, কানহাই ৬৩, নার্স ৫৩ এবং সোবার্স ৯৪রান। হিগস ১০৯ রানে ৩ এবং ডি' ওলিভিয়েরা ৭৭ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড: ৩২৫ রান (টম্ গ্রেভনী ১০৯ কলিন কাউড্রে ৯৬ এবং ডি' ওলিভিয়েরা ৭৬ রান। সোবার্স ৯০ রানে ৪, হল ১০৫ রানে ৪ এবং গ্রিফিথ ৬২ রানে ২ উইকেট)

ও ২৫৩ রান (বয়কট ৭১ গ্রেভনী ৩২, কাউড্রে ৩২, এবং ডি' ওলিভিয়েরা ৫৪ রান গ্রিফিথ ৩৪ রানে ৪, গিবস ৮৩ রানে ৩ এবং হল ৫২ রানে ২ উইকেট)

নটিংহামের ট্রেন্ট ব্রিজে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৩৯ রানে জয়ী হয়ে বর্ত্তমানে ২-০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। আরও দুটি টেস্ট খেলা বাকি—চতুর্থ (লিডস: আগষ্ট ৪-৯) এবং পঞ্চম (ওভাল: আগষ্ট ১৮-২৩)। এই দুটি খেলার একটি ড্র রাখতে পারলেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল উপর্যুপরি দুবার উইসডেন ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করবে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার দান হাতে নেয়। কিন্তু তারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। দলের ১৪৪ রানের মধ্যে পাঁচজন খেলোয়াড় বিদায় নেন। প্রথম দিনেই ২৩৫ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে ৫৩ মিনিটের খেলায় ইংল্যাণ্ড তিন উইকেট খুইয়ে মাত্র ৩৩ রান সংগ্রহ করেছিল। ফলে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে প্রথম ইনিংসের ২৩৫ রানে নামিয়ে দিয়ে ইংল্যাণ্ড যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তা হাতছাড়া হয়।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড আরও চারটে উইকেট খুইয়ে প্রথম দিনের ৩৩ রানের (৩ উইকেট) সঙ্গে আরও ২২১ রান যোগ করে। ফলে রান দাঁড়ায় ২৫৪ (৭ উইকেটে)। ইংল্যাণ্ড ১৯ রানে অগ্রগামী হয় এবং হাতে জমা থাকে তিনটে উইকেট। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে গ্রেভনী এবং অধিনায়ক কাউড্রে তিন ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট খেলে দলের ১৬৯ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। গ্রেভনীর ১০৯ রান তাঁর টেষ্ট খেলোয়ার জীবনের সপ্তম সেঞ্চুরী। চারবছর পর ইংল্যাণ্ড দলে নির্ব্বাচিত হয়ে তিনি লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্টে ৯৬ রান করেছিলেন। আজ প্রধান খেলোয়াড় টম গ্রেভনীই ইংল্যাণ্ডের প্রধান ভরসা।

তৃতীয় দিনে ৩২৫ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের ২৩৫ রান অতিক্রম করে ৯০ রানে অগ্রগামী হয়। বাকী সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসের দুই উইকেটের বিনিময়ে ১৩৮ রান সংগ্রহ করলে ৯০ রানের ঘাটতি পূরণ হয়ে ৪৮ রানে তারা অগ্রগামী হয়।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল তাদের ৪৮২ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক সোবার্স এবং বুচার ১২৭ মিনিটে দলের ১৭৩ রান সংগ্রহ করেছিলেন। সোবার্স মাত্র ৬ রানের জন্যে শত রান পূর্ণ করতে পারেন নি। তার পঞ্চম উইকেটের জুটি বেসিল বুচার ডাবল সেঞ্চুরী (২০৯) ক'রে অপরাজিত থেকে যান। বুচার সাত ঘণ্টার বেশী খেলে তাঁর ২০৯ রানে ২২ টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের কোন উইকেট না পড়ে ৩০ রান উঠেছিল। খেলায় জয়লাভের জন্যে ইংল্যাণ্ডের ৩৯৩ রানের প্রয়োজন ছিল।

পঞ্চম দিনে ইংল্যাণ্ড যখন পুনরায় দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে মাঠে নামে তখন তাদের হাতে ছিল ১০টা উইকেট এবং ৬ঘণ্টা খেলার সময়। এদিকে খেলায় জয়লাভ করতে তাদের আরও ৩৬৩ রান তুলতে বাকি ছিল। ইংল্যাণ্ডের অর্দ্ধেক খেলোয়াড় লাঞ্চের আগেই খেলা থেকে বিদায় নেন। লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের ১৪২ রান দাঁড়ায় (৫ উইকেটে)। তখনও সাড়ে তিন ঘণ্টার মত খেলার

সময় ছিল। কিন্তু খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৮৫ মিনিট আগেই ২৫৩ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়।

উইম্বলেডন লন্ টেনিস:

১৯৬৬ সালের ৮০ তম উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা ঘটনা বৈচিত্র্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। অস্ট্রেলিয়া তার গত দু'বছরের (১৯৬৪-৬৫) সালে প্রাধান্য ১৯৬৬ সালের প্রতিযোগিতায় বজায় রাখতে পারে নি। গত দু'বছরের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) এ বছরের কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলায় বিদায় নেন; ফলে তিনি উপর্য্যপরি তিন বছর পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উইম্বলেডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৮০ বছরের ইতিহাসে একমাত্র ফ্রেড পেরী (ইংল্যাণ্ড) পুরুষ বিভাগে উপর্য্যপরি তিন বছর সিঙ্গলস খেতাবা জয়ী হয়েছেন। ১৯৬৬ সালের প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা এবং মহিলা বিভাগে আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন মোফিট সিঙ্গলস খেতাব জয় করেছেন। তারা দুজনেই সিঙ্গলসের বাছাই তালিকায় চতুর্থ স্থান পেয়েছিলেন। ম্যানুয়েল সান্তানা ১৯৩৮ সালের মে মাসে স্পেনের মাদ্রিদ শহরের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সংসার প্রতিপালনের জন্যে সান্তানাকে বাল্যকালে সামান্য দৈনিক মজুরীতে টেনিস ক্লাবের 'বল-বয়ের কাজ নিতে হয়েছিল। সান্তানা ১৯৬১ সালে ফ্রেঞ্চ, ১৯৬৫ সালে আমেরিকান এবং ১৯৬৬ সালে উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। তিনিই স্পেনের পক্ষে এই তিনটি খেতাব সর্ব্বপ্রথম জয়লাভের গৌরব লাভ করেছেন। ১৯৬৫ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতায় চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড পর্য্যন্ত স্পেন যে খেলেছিল তার মূলে ছিলেন ম্যানুয়েল সান্তানা।

মহিলা বিভাগে গত বছরের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন এবং এ বছরের এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় কুমারী মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া সেমি-ফাইন্যালে ৪নং বাছাই খেলোয়ার শ্রীমতী বিলি জিন মোফিট কিংয়ের (আমেরিকা) কাছে পরাজিত হন। শ্রীমতী মোফিট কিং ফাইন্যালে তিনবারের উইম্বলেডন সিঙ্গলন চ্যাম্পিয়ন (১৯৫৯-৬০ ও ১৯৬৪) এবং এ বছরের ২নং বাছাই খেলোয়াড় কুমার মেরিয়া বুনোকে (ব্রেজিল) পরাজিত ক'রে গত দশ বছরের প্রতিযোগিতায় আমেরিকাকে দ্বিতীয়বার সিঙ্গলস খেতাব জয়ে গৌরবান্বিত করেন।

এ বছরের প্রতিযোগিতার ফলাফল পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে ২নং এবং ৪ নং বাছাই খেলোয়াড়রাই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ বছরের প্রতিযোগিতার অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা তিনটে বিভাগের ফাইন্যালে খেলে দুটি খেতাব, আমেরিকার খেলোয়াড়রা চারটি বিভাগের ফাইন্যালে খেলে দুটি খেতাব এবং স্পেনের খেলোয়াড় একটি বিভাগের ফাইন্যালে খেলে একটি খেতাব পেয়েছেন। প্রতিযোগিতায় দুটি খেতাব পেয়েছেন একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার কেন ফ্লেচার। অস্ট্রেলিয়ার কুমারী মার্গারেট স্মিথ দুটি বিভাগের ফাইন্যালে খেলে একটি খেতাব পেয়েছেন। একমাত্র তিনিই খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকার তিনটি বিভাগে শীর্ষস্থান পেয়েছিলেন।

ফাইন্যাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস: ৪ নং বাছাই ম্যানুয়েল সান্তনা (স্পেন) ৬-৪, ১১-৯ ও ৬-৪ গেমে ৬নং বাছাই ডেনিস রলষ্টনকে (আমেরিকা পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: ৪নং বাছাই শ্রীমতী বিলি জিন মোফিট-কিং (আমেরিকা) ৬-৩, ৩-৬ ও ৬-১ গেমে ২নং বাছাই কুমারী মেরিয়া বুনোকে (ব্রেজিল) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস: ২নং বাছাই কেন ফ্লেচার এবং জন নিউকম্ব (অস্টেলিয়া) ৬-৩, ৬-৪, ৩ ৬ ও ৬ ৩ গেমে ৪নং বিল বাউরে এবং ওয়েন ডেভিডসনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলন: ২নং বাছাই কুমারী মেরিয়া বুনো (ব্রেজিল) এবং নান্সি রিচে (আমেরিকা) ৩, ৪-৬ ও ৬-৩ গেমে ১নং বাছাই কুমারী মার্গারেট স্মিথ এবং জুডা টেগার্টকে (অস্ট্রেলিয়ারা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস: ১নং বাছাই কুমারী মার্গারেট স্মিথ এবং কেন ফ্লেচার (অস্ট্রেলিয়া) ৪-৬, ৬-৩ ৬-৩ গেমে ৩নং বাছাই শ্রীমতী বিলি জিন মোফিট-কিং এবং ডেনিস রলষ্টনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ২৮।৭।৬৬ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেবালয় শিল্পী : বি, আর, পানেসর

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রাবণ-১৩৭৩

প্রথম খণ্ড | চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

জপ

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

জপ-সাধনার প্রণালী জগতের প্রায় সকল জাতিদের মধ্যে অতীতকাল হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত। জপের অর্থ কোন নাম বা মন্ত্রের অবিরাম আবৃত্তি। জপ যে উদ্দেশ্য সিদ্ধি দান করিবার অব্যর্থ ও আশু ফলপ্রদপন্থা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জপ করিবার বিজ্ঞান সম্মত পন্থা জানা চাই, তাহা না জানিলে সিদ্ধিলাভ করা সুকঠিন। যে কোন মন্ত্রের পক্ষে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য জপ যে অনিবার্য্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পূজাও একপ্রকার জপ বলা যায় কারণ তাহাতে ইষ্টের স্মরণ মনন ও স্তুতি অবিরাম করিতে হয়। মন্ত্র জপ ভাল মন্দ উভয় প্রয়োজনেই সম্ভব। যাহারা সৎ ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের জন্য মন্ত্র জপ করেন তাহাতে মাত্র নিজেরই মঙ্গল নহে, তাহার সাহায্যে ও সৎ চিন্তার প্রভাবে অন্যেও উপকৃত হন। যাহারা অসৎ কর্ম্মের বা উদ্দেশ্যের জন্য (Black Magic) মন্ত্র জপ করেন বা করিতে চেষ্টা করেন বা মন্দ চিন্তা ক্রমাগত করিতে থাকেন তাহাতে শুধু অপরের নহে নিজেরও সমূহ ক্ষতি হয় ("Learn that no efforts not the smallest whether in right or wrong direction, can vanish from the world of causes"—J R. Sorabji), কারণ ঐ মন্দ চিন্তা-

গুলি যদি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর কার্য্যকরী না হয় তাহা বহুগুণে নিজের উপর ফিরিয়া আসিয়া সক্রিয় হয় নতুবা অনন্তকাল মহাশূন্যে ঘুরিতে থাকে যতক্ষণ তাহা কার্য্যকরী না হয়। এই জন্যই সমস্ত ধর্ম্মেই সৎ ও মঙ্গল চিন্তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

জপ অর্থে এখানে মাত্র মানসিক বা আন্তরিক জপের কথা হইতেছে, বাচিক বা বৈখরী, যাহা বাক্য দ্বারা জোরে উচ্চারণ করা হয় তাহা বা উপাংশু যাহা আস্তে উচ্চারণ করা হয় তাহার কথা নহে। মন্ত্র জপে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে উহার বৈজ্ঞানিক পন্থাগুলি বিশেষ ভাবে জানা দরকার তাহা সঠিকভাবে পালন না করিয়া শুধু মুখে মুখে যন্ত্রবৎ উচ্চারণ করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। বিক্ষিপ্ত, মূঢ় ও চঞ্চল চিত্তে যেমন যোগ অসম্ভব ঠিক তেমনই জপসিদ্ধির ক্ষেত্রে এবং ইহার জন্যই প্রায় সকলেরই জপের ফল নষ্ট হইয়া যায়। যন্ত্রের মত অবিরাম মন্ত্র জপ করিলে জপের পুর্ণ ফল পাওয়া যায় না। জপে সিদ্ধির জন্য প্রধান ও শ্রেষ্ঠ উপায় মনকে প্রশান্ত (Silence) ও উদার (wide and open) করা। মনকে শান্ত করা সুকঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই তবে যে কোন প্রকারে একবার মনকে চিন্তাশূন্য করিয়া একবার শরীরের বাহিরে লইতে পারিলেই, যদিও ইহা সুকঠিন, ইহাই ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সহজ পন্থা। এই প্রশান্তি (Silence) বা নিস্তব্ধতা, যাহা সুদুর্লভ, যাঁহাদের করায়ত্ত, তাঁহারা অতি সহজেই সত্বর ব্রহ্ম নির্ব্বাণ বা অন্য কোন লোকের (Plane) উপলব্ধি বিনা শ্রমে করিতে পারেন কারণ এই নিস্তব্ধতা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের এক অংশ বা রূপ যাহা সর্ব্বব্যাপী, যাঁহাদের ব্রহ্মনির্ব্বাণের উপলব্ধি আছে তাঁহারা এই সত্য ভাল করিয়াই জানেন। জপে সিদ্ধি লাভ করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় একাগ্রতা (One pointedness—"when you fix your heart on one point, then nothing is impossible for you" I chin) ইহারই অপর নাম ইচ্ছাশক্তি বা তপঃশক্তি। অবিশ্রান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জপ বা মানসিক মননের ফলে অন্তরে একপ্রকার স্পন্দন সৃষ্টি হয়, ফলে অন্তশ্চেতনায় তাহার ছাপ বা স্পন্দন ধীরে ধীরে গভীর ভাবে ক্রমাগত পড়িতে থাকে অবশেষে উপযুক্তকালে ঐ অন্তশ্চেতনা উপযুক্ত হইলে ইষ্টসহ মিলিত হয়। যাহার অপর নাম সিদ্ধি অথবা মন্ত্রটি তিলে তিলে একটি বিশিষ্ট রূপ নেয় ইষ্ট রূপে যাহার আর কখনও ধ্বংস হয় না।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন পদার্থ মাত্রই সূক্ষ্মেরই পরিণতি এবং ঐ সূক্ষ্মকে আবার সুসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় সকল সৃষ্টির মূল চেতনা (consciousness), ইহা মানিলে স্বীকার করিতে হয় তপঃশক্তি বলে অসংখ্য দেব-দেবী সৃষ্টি করা সম্ভব। তবে এই মন্ত্রশক্তিকে রূপ বা আকার দিতে হইলে প্রথমে একাগ্র ও সুসংবদ্ধ ইচ্ছাশক্তির (Will-power) অধিকারী হইতে হয়। ভাসা ভাসা বা অগভীর এবং অসংবদ্ধ বা যান্ত্রিক জপ স্থায়ী শক্তিশালী রূপ দিতে পারে না। এইজন্যই অধিকাংশ লোকেরই শুধু জপসিদ্ধিতে নহে, মনস্কামনা, আকাঙ্ক্ষা বা আস্পৃহা (aspiration) পূর্ণ হয় না। যে কোন কিছু, তাহা আধ্যাত্মিক বা পার্থিব হউক, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে একাগ্রতা ও একান্ত সুতীব্র ইচ্ছা ও প্রযত্ন থাকা চাই তবেই সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব, নতুবা নহে। মন্ত্রশক্তি বা জপ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই কথা। জপে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে তাহার পন্থাগুলি মানিয়া চলিতে হয় নতুবা তাহা যতই শক্তিশালী মন্ত্র হউক না কেন তেমন কার্য্যকরী হয় না, ইহা অবশ্য সিদ্ধি লাভের আগের কথা। ("তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ১।২৮—পতঞ্জলি)—মন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থের উপর অর্থাৎ ইষ্টের উপর মন রাখিয়া ভাবনা বা জপ করিতে হয়। যাহাদের আবেগ [Aspiration) বা অস্পৃহা অতি সুতীব্র (তীব্রসম্বেগানামাসন্নঃ—১।২১—পতঞ্জলি] তাঁহারাই অচিরে সিদ্ধিলাভ করেন। মহর্ষি অবশ্য এই আবেগকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, মৃদু মধ্য ও অতিরূপে [মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ—[The Success of yoga differ according as the means they adopt are mild, medium or intense —Swami Vivekananda] অর্থাৎ যাহাদের আবেগ অতি সুতীব্র তাঁহারাই অচিরে সিদ্ধিলাভ করেন—তাহার পর মধ্য এবং সর্ব্বশেষ মৃদু অধিকারী। ইঁহাদের সকলেই

সিদ্ধিলাভের উপযোগী। আর একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। জপে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে যোগের মত বলিষ্ঠ দেহ, মন ও প্রাণের বিশেষ দরকার, অসুস্থ দেহ বা বিক্ষিপ্ত চিত্তে যোগ বা জপে সিদ্ধিলাভ করা যায় না, ইহার অন্তর্নিহিত কারণ ইহাতে ইচ্ছাশক্তি বা মন্ত্রশক্তি এত প্রবল হয় না যাহা প্রাণময় বা মনোময় [Vital or Mental] জগৎ অতিক্রম করিয়া ইষ্টে গিয়া পৌছাইতে পারে। প্রত্যেক সূক্ষ্ম জগতের একটি সূক্ষ্ম আবরণ বা সীমারেখা আছে এবং তাহা ভেদ করিতে হইলে প্রবল তপঃশক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই শক্তির অভাবই জপসিদ্ধির বিফলতার কারণ এবং এই কারণেই বয়স্ক লোক অপেক্ষা যুবক ব্রহ্মচারীরাই জপে অতি সহজেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন বা সক্ষম হন। আমি অতীতে জপে দুইবার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলাম অথচ আমার জানিত মন্ত্রসিদ্ধ একজনও নাই। বহু লোককে মন্ত্র লইতে দেখিয়াছি, অবশ্য তাহারা সকলেই ভোগী সংসারী, সংসারী লোকের পক্ষে সিদ্ধিলাভ করা প্রায় অসম্ভব (আমিও সংসারী), ইহার মূল কারণ ব্রহ্মচর্য্যের অভাব ও জপের বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ না করা।

জপে অতি সহজেই সিদ্ধিলাভ করা যায় এবং শীঘ্র যদি কয়েকটি পন্থা বা উপায় অনুসরণ করা যায়। সিদ্ধিলাভ এই জন্মেই করিতে চাহিলে ধৈর্য্যের সহিত কিছু পরিশ্রম বা সাধনা করিতে হয় এবং তাহা যথেষ্ট আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতার সহিত করিতে হয়। ভগবানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। জপে সিদ্ধিলাভ বিনা গুরু, দীক্ষা বা কৃপা ছাড়াও সম্ভব, আমারও কোন দীক্ষাগুরু নাই, লৌকিক কৃপাদাতাও নাই, বড় যোগী বা সাধকও নহি—সাধারণ সংসারীদের মত দোষে গুণে মানুষ। দীক্ষা পাই নাই মন্ত্র নিজের তৈয়ারী অথচ প্রায় দুই বৎসর লাগে নাই আমার মহাকালীকে (মহাকালী, আর যে কালীকে আমরা মন্দিরে দেখি, তাহা এক নহে ; মহাকালীর মন্দির বা মূর্ত্তি কোথাও আছে কিনা জানি না , মহাকালী আদ্যাশক্তি, দু-হাত মনুষ্যপ্রমাণ, রং উজ্জ্বল, তাঁর জ্যোতিঃ ও লোক কোটি সূর্য্য তুল্য, অধিমানস জগতের (overmind), আর যে কালী আমরা মন্দিরে দেখি তাহা মহাকালীর এক অংশমাত্র, ইনি প্রাণময় জগতের, ('Mahakali is usually golden, of a very bright and strong hue. The Black Kali is a manifestation on the vital Plane of Mãhakali, bnt Mahakall herself in the overmind is golden"—Sri Aurobindo.) নিজে মধ্যে নামাইতে বা তাঁহার সঙ্গে একীভূত হইতে। তাঁহার কৃপায় আমি শান্তি (peace) ও অধিমানস জগতের দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করি। ইহা পাওয়া সুকঠিন বলিতে পারিনা তবে সম্ভবতঃ অতি অল্প লোকেই ইহার সন্ধান রাখেন। ইঁহাকে প্রথমে ধারণ করা অতি সুকঠিন। ইঁহাকে ধারণ করিতে হইলে শুধু মাত্র বলশালী হইলেই হয় না ব্রহ্মশক্তিতে বলীয়ান হইতে হয়। বলা বাহুল্য তাঁহাকে আমি বেশীক্ষণ ধারণ করিতে পারি নাই। ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ডাকিলেই পাওয়া যায়, যাহার অন্য নাম এক প্রকার জপ, তাঁহার কৃপা পাওয়া যায় (তাঁর মধ্যে আছে এক দুর্ব্বার তীব্রত, পূর্ণসিদ্ধির দিকে শক্তির বিপুল আবেগ সকল বাধা চূর্ণ ক'রে ছুটে চলে এমন দিব্য প্রচণ্ডতা… তিনি রয়েছেন ক্ষিপ্রতার জন্য, আশুফলদায়ী প্রক্রিয়ার জন্য।…তিনি যদি না থাকেন তবে একদিনে যে কাজ হয় তা নিষ্পন্ন করতে বহু শতাব্দী প্রয়োজন হত।"—মা—শ্রীঅরবিন্দ) তাঁহার কৃপায় বা স্পর্শে আমি অন্তরাত্মার (Psychic) সাড়া পাইয়াছিলাম, তাঁহার বাণী শুনিয়াছিলাম। নিজেকে ইষ্টের কাছে খুলিয়া ধরা, আত্মসমর্পণের চেষ্টা করাই শুধু নিরাপদ পন্থা নহে তাহা আশুফলদায়ী। নিজেকে খুলিয়া না ধরিলে অন্তরে ইষ্টের অবতরণ হয় না. মাত্র বাহ্য দর্শন হয়।

ইষ্টের দর্শনও খুব সহজ নহে। দর্শনের সঙ্গে স্পর্শের বিরাট পার্থক্য, আবার স্পর্শের সঙ্গে অন্তরে অবতরণের বা ইষ্টসহ একীভূত হওয়ার পার্থক্য বিরাট। ইহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইষ্টের সঙ্গে একীভূত হওয়া এবং ইহা আত্মসমর্পণের চেষ্টার পথেই মাত্র সম্ভব। ইষ্টস্পর্শে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যেমন শান্তি (Peace) ইত্যাদি লাভ করা যায়, মাত্র দর্শনে এগুলি পাওয়া যায় না। আমি এগুলি উপলব্ধি অতীতে করিয়াছি। এই প্রবন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধিগুলিই আমি লিখিয়াছি, সমর্থনের জন্য উদ্ধৃতিগুলি ব্যবহার করিয়াছি।

জপ ও যোগের সঙ্গে এইখানেই বিরাট পার্থক্য।

অষ্টাঙ্গ যোগের পথে, তাহা বৌদ্ধ, জৈন, বেদান্ত, সাংখ্য বা তন্ত্র, যে পথেই হউক না কেন, যম, নিয়মাদি অধিগত করিয়া তাহাদের আচারাদি অনুসরণ করিয়া যাহারা সমাধি যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে চেষ্টা করেন, সে পথ সুকঠিন, ক্ষুরস্য ধারা, সে পথ ভয়াবহ (All yoga is difficult for the aim of each yoga is to reaeh the Divine"—Sri Aurobindo) উত্থান পতনের পথ, মাত্র এক জন্মে তাহা অতিক্রম করা সুকঠিন "স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতোদৃঢ়ভূমিঃ"—১।১৪ পতঞ্জলি (It becomes firmly grounded by long constant efforts with great love (for the end) to be attained"—Swami Vivekananda) অর্থাৎ সুদীর্ঘকাল ব্যাপী নিরন্তর সুকঠিন সাধনার দ্বারা দৃঢ়ভূমি লাভ করা সম্ভব (Restraint does not come in one day.. but by long continued practice,—Sawami Vivekananda ; এই অষ্টাঙ্গযোগে সিদ্ধিলাভ কদাচিৎ কোন ভাগ্যবানের অদৃষ্টেই মাত্র ঘটিয়া থাকে, অধিকাংশই অর্দ্ধপথ হইতেই ফিরিয়া আসেন ("But they are rare indeed, who know that the search for the Truth···Few are those who enquire after the truth, about the self···Fewer still are the Self-Realised"—J. Sorabji) ইহাই যোগপথের পরিণাম and few there be that find it" Christ)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা এক জন্মে হয়না (The whole life and several lives are often not enough to achieve it"—Sri Aurobindo)। এই পথে চলিতে গেলে বহু বাধা বিঘ্ন দুঃখ কষ্টাদির মধ্য দিয়া চলিতে হয়, কারণ ইহা ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে আরোহণের পথ। এ পথে সবচেয়ে বিপজ্জনক বাধা আসে প্রাণময় জগৎ (Vital worlds) হইতে, যাহার হাত হইতে যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব বা কেহই নিস্তার পান নাই এবং এই জগৎটি অতিক্রম করিতে দীর্ঘকাল লাগে। কিন্তু জপসাধনের ইহাই মস্ত বড় লাভ যদিও তাহাও আরোহণের পথ (Ascent) কিন্তু তাহা একেবারেই সোজা উচেঁ লইয়া যায়, মধ্যে কোথাও আর না থামিয়া, কাজেই প্রাণময় জগতের সঙ্গে কোন সংঘর্ষ তাহার প্রথমে বাধে না। একবার উপরে উঠিয়া দৈববলে বলীয়ান্ হইতে পারিলে পরে নিম্নস্তরের জগৎগুলির সম্মুখীন হওয়া অতি সহজ হইয়া আসে, বেশী পরিশ্রম বা অযথা হয়রানি ভোগ করিতে হয় না। আর একটি কথা সাধকদের মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন, যাহা আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে উপলব্ধি করিয়াছি। জ্ঞানচক্ষু, দিব্যচক্ষু বা ত্রিনয়ন, যাহার অন্য নাম অন্তশ্চেতনা (Innerconscionsuess) সেখানে চেতনাই দেখে চেতনাই উপলব্ধি করে এবং তাহা সাধনার প্রারম্ভেই খুলিয়া যায়না, তাহা লাভ করিতে কিছু সময় লাগে। এই খাঁটি দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন মহাযোগী আমি একটিও দেখিনাই যিনি মানুষ চিনিতে পারেন। সমাধির চৈতন্য অবশ্য অন্য প্রকার। কারণ সমাধির প্রকার ভেদে চৈতন্যেরও তারতম্য ঘটে। সাধকের প্রথম প্রথম অধ্যাত্ম উপলব্ধি স্বপ্নের মধ্য দিয়াই আরম্ভ হয়। ইহার রহস্য জাগ্রত অবস্থায় আমাদের বাহ্যচেতনা কার্য্যকরী ও জাগ্রত থাকে, অন্তশ্চেতনা তখন থাকে লুপ্ত বা সুপ্ত অবস্থায়। নিদ্রাকালে বাহ্যচেতনা সুপ্ত হইলে অন্তশ্চেতনা কার্য্যকরী হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন স্বপ্নে জাগ্রত অবস্থার চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর উপলব্ধি হইতে পারে (At times in dreams, when you come into contact wilh certain planes of consciousnes you may see such vbtrant colonr so to say, even more physical world—Sri Aurobindo); আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি স্বপ্নে নির্ব্বিকল্প সমাধির অভিজ্ঞতা ছাড়া আর অন্য সব সমাধির চেয়েও বড় অভিজ্ঞতা স্বপ্নে উপলব্ধি করা সম্ভব। সবিকল্প সমাধির মধ্য দিয়াই অধিমানস অতিমানস ইত্যাদি লোকে যাইতে হয়। স্বপ্নেও তাহা অতি শীঘ্র ও সহজে লাভ করা যায় যাহা সমাধিতে লাভ করিতে সুদীর্ঘকাল লাগে যোগের পথে। নির্ব্বিকল্প সমাধি ছাড়া আর অন্য সব সমাধিই এক প্রকার ঘুমের অবস্থা, যদিও ইহাদের সঙ্গে ঘুমের প্রভেদ বিস্তর। সাধকরা বা সাধারণে স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দেখিয়া থাকেন ইহা সুপরিচিত। অতএব স্বপ্নকে একেবারে ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আর একটি কথা ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁহাদের মাত্র একবারও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার সৌভাগ্য

হইয়াছে, তাঁহারা জাগ্রত অবস্থায় চক্ষু বন্ধ করিলেই সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন বা অন্য জগতের দৃশ্যাবলী, দেখিয়া থাকেন ইহা আমার নিজের অভিজ্ঞতা। স্বপ্নের সঙ্গে সমাধির (নির্ব্বিকল্প নহে) এইখানেই বিশেষ পার্থক্য। সমাধিতে যে কোন লোকে (Plane) ইচ্ছামত যাওয়া যায়না। স্বপ্নেও তাহা ঠিক ঐ চেতনায় না হইলেও তাহা একই প্রকার অবস্থা। সমাধিকালের মধ্যেই মাত্র অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাগুলি আবদ্ধ থাকে যাহার অনুভূতি স্থূল দেহে পাওয়া অসম্ভব। সমাধিস্থ অবস্থায় ইষ্ট সাধকের দেহে অবতরণ করিতে পারেন না কিন্তু স্বপ্নে তাহা সম্ভব এবং স্বাভাবিক। সমাধিকালে অন্তশ্চেতনা দেহ ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া যায় এবং তাহা ইষ্ট বা প্রার্থিত লোকে গিয়া পৌঁছায় কিন্তু স্বপ্নের মধ্য দিয়া ইষ্ট স্থূল দেহে অবতরণ অতি সহজেই করিতে পারেন এবং জাগ্রত অবস্থায় স্থূলদেহে তাহা অনুভব করা যায়, যাহা কোন সমাধিতেই সম্ভব নহে। আর একটি বড় কথা স্বপ্ন হইতে অতি সহজেই জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়া আসা যায় যাহা নির্ব্বিকল্প ছাড়া অন্য সব সমাধিতে অসম্ভব। নিদ্রার মধ্য দিয়াও অন্য সমাধিতে যাওয়া যায় এক নির্ব্বিকল্প ছাড়া। (রমণ মহর্ষি ছাড়া অন্য কোন নির্ব্বিকল্প সমাধির অধিকারীকে আমি দেখি নাই।)

"মন্ত্র প্রতিপাদ্য কোন মূর্ত্তি বিশেষের ধ্যান যারা করেন, সে মন্ত্রজপ বড় কষ্ট সাধ্য হয়। জগতে যত প্রকার কঠোরতা আছে তার মধ্যে মূর্ত্তি বিশেষের ধ্যানই সর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতম বলে মনে হয়। ইহা বহুধা পরীক্ষিত সত্য। কদাচিৎ সৌভাগ্যবান এই কঠোরতায় সিদ্ধিলাভ করেন। অধিকাংশই অকৃতকার্য্য হন। মূর্ত্তি চিন্তায় চিত্তের তুল্যজাতীয় প্রবাহ রূপ যে একতানতা তা প্রায়ই হয় না। চিন্তায় প্রত্যেক স্পন্দনই মূর্ত্তির বিভিন্ন অবয়ব লইয়া উঠে ফলে যোগলাভ দুঃসাধ্য।" ইহাই হইল মূর্ত্তি ধ্যানের শেষ পরিণাম। অপর দিকে ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্মে মন রাখিয়া সাধনা করা কঠিন ব্যাপার। এই দুইটিই আমি করিয়া দেখিয়াছি, এ দুটি করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। ধারণা বা ধ্যানের মস্ত বড় অসুবিধা, ইহাতে সিদ্ধিলাভ করা প্রায় অসম্ভব কদাচিৎ কেহ তাহা পারেন কিন্তু মন্ত্রজপে এ সব দুর্ভোগ ভুগিতে হয় না। জাপকের ধ্যান-ধারণা না করিলেও চলে, মাত্র ইষ্টে মন রাখিয়া, রূপে নহে, বা মন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থের উপর জোর দিয়া ঠিক মত জপ করিতে পারিলেই অতি সহজেও সিদ্ধিলাভ করা যায়। জপের মস্ত বড় সুবিধা ইহাতে মূর্ত্তির ধারণা করিতে হয় না নিরাকারের ধ্যানও করিতে হয় না। মন্ত্রজপের মস্ত বড় সুবিধা কাজ কর্ম্মের বা চলিবারকালে তাহা করা সম্ভব। মন্ত্রজপ বসিয়া করিবার চেয়ে কাজ কর্ম্মের বা চলিবার কালে করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়, ইহার অপর নাম কর্ম্মযোগ, ইহা সহজ ও আশুফলদায়ী ইহাতে কর্ম্মফল ইষ্টে নিবেদন করিতে হয়, ইহাই কর্ম্মযোগের সুকৌশল। এই সমস্ত পদ্ধতিগুলি একত্রে একসঙ্গে করা যায়। আমি করিয়াছি এবং ইহার প্রয়োগে প্রায় দশ মাসে নির্গুণ ব্রহ্মসহ একীভূত হই এবং এইসঙ্গে সবিকল্প সমাধি আপনিই আমার লাভ হয় বিনা চেষ্টায় যাহার মধ্য দিয়া আমি অচিতির (Inconscient) সঙ্গে একীভূত হই। এই অভিজ্ঞতা লাভ কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে কারণ ইহা অতীব সুকঠিন। কর্ম্মযোগের পন্থাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পন্থা যাহা একটু চেষ্টা করিলেই অতি সহজে করা যায় এবং এ পথে অতি সত্বর বিনা বাধায় সিদ্ধি লাভ করা যায়।

ত্রাটকসিদ্ধ আমি নহি, মাত্র ২।৩ মাস চেষ্টা করিয়াছিলাম। ত্রাটক সাধনের মূল উদ্দেশ্য চিন্তা ও শক্তিকে একত্র এককেন্দ্রীভূত করা। ত্রাটক চক্ষু খুলিয়াই অন্ততঃ প্রারম্ভে করিতে হয় বলিয়া জানি, তাহা ঘরের দেওয়ালে কাল বিন্দু দিয়া, প্রদীপ আকাশের নক্ষত্র বা রাস্তার আলো ইত্যাদির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অভ্যাস করা যায়। আমি ভ্রমণ করিবার কালে রাস্তার আলোর দিকে চাহিয়া ত্রাটক অভ্যাস করিতাম এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও আশুফলদায়ী, কারণ চলিবার কালে দেহ, প্রাণ, মন ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি সহজেই কার্য্যকরী থাকে, ফলে মধ্যে তাহাদের কেন্দ্রীভূত করা সহজ হয় যাহা বসিয়া করিতে বহুকাল লাগে। মন্ত্র-জপ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই কথা। যাহারা স্থির হইয়া বসিয়া জপ করিতে চেষ্টা করেন তাহাদের অপেক্ষা, যাহারা কার্য্যকালে বা চলিবার কালে ঠিক মত সাধনা করেন তাঁহারা শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার অন্তর্নিহিত রহস্য কার্য্যকালে দেহ, প্রাণ, মন ও ইচ্ছাশক্তি

সক্রিয় থাকে যাহা উপবেশন কালে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়। ত্রাটক মাত্র যুবকদের জন্য কারণ ইহাতে দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিশেষ প্রয়োজন আছে। বয়স্করা বা বৃদ্ধরা ইহা করিতে গেলে অভিজ্ঞের অধীনে করা সঙ্গত নতুবা দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে এই মাত্র ভয়। ত্রাটক ঠিকমত করিলে দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ত্রাটকের মস্ত বড় সুবিধা বা উপকারিতা, ইহা মাত্র দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি বা একাগ্রতা বৃদ্ধি ছাড়াও অন্তর্দৃষ্টি (Third eye) খুলিয়া দেয় আর ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ কামজয়ী হওয়া। আমরা জানিনা আমাদের দৈহিক চেতনা নাভিকেন্দ্রে জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া আবদ্ধ রহিয়াছে। ত্রাটক অভ্যাস করার ফলে ঐ আবদ্ধ চেতনা মুক্ত হইয়া ভ্রূমধ্যে আস্তে আস্তে চলিয়া আসে অবশ্য তাহা করিতে ২।৩ মাস সময় লাগে, প্রারম্ভেই নহে, এবং তাহা ঠিক মত করিতে পারিলে সাধক এক নব জীবনের (Newlife) আস্বাদ লাভ করেন এবং ইহাতে না থামিয়া যদি আরো অগ্রসর হইতে পারেন সিদ্ধাই ছাড়িয়া, তাহা হইলে অতি সহজেই নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান, যা নির্ব্বাণ, যাহার অন্যনাম কৈবল্য মুক্তি বা জীবন্মুক্তি, তাহা অতি সহজেই লাভ করিতে পারেন। ইহার জন্য দীক্ষা, গুরু মন্ত্র বা গুরুকৃপার কোন প্রয়োজন নাই, মাত্র ঐ অর্দ্ধোন্মুক্ত চেতনাকে একবার সহস্রার ভেদ করিয়া শরীরের বাহিরে নিতে পারিলেই তাহা সম্ভব হয়। ত্রাটকসিদ্ধদের পক্ষে এগুলি করা অতি সহজ এবং ইহার সঙ্গে "ওঁ" মন্ত্রটি জপ করিলে সিদ্ধি শীঘ্র হয়। আমার মতে ত্রাটকসিদ্ধের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিতে ছয় মাস যথেষ্ট। বৌদ্ধরা বা মায়াবাদীরা মনকে চিন্তাশূন্য করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণলাভ করিতে চেষ্টা করেন বটে কিন্তু তাহা অতি সুকঠিন। তাহার চেয়ে ত্রাটকের সঙ্গে "ওঁ" মন্ত্রটি জপ করিয়া সহস্রার (crown-centre) ভেদকরা অতি সহজ, আমার প্রায় দশ মাস লাগিয়া ছিল। ইহাও সত্য, ত্রাটকে সিদ্ধ না হইয়া ছাড়িয়া দিলে শারীর চেতনা (physical consciousness) আবার নাভিকেন্দ্র (navel centre) নামিয়া আসে এবং ঐ কেন্দ্রের ফলগুলি দিবার চেষ্টা করে এবং তাহা পুনরায় ভ্রূ মধ্যে নেওয়া অসম্ভব না হইলেও বিশেষ কষ্ট সাধ্য, ইহাই সাধনা ছাড়িবার ফল বা শাস্তি ও দুর্ভোগ। একবার সাধনা ছাড়িলে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। ইহাও সত্য যাঁহারা একবার মুক্তির স্বাদ পাইয়াছেন তাঁহাদের আর বদ্ধ করা যায় না বা চিরপতন তাঁহাদের হয় না, সাময়িক পতন হইলেও, তাঁহারা আবার উঠিয়া চলেন। ভগবানের বিশেষ নিয়ম যিনি একবার মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন বা মুক্ত হইয়াছেন তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না, হইলেও সে জন্ম মুক্তপুরুষের ইচ্ছায় ঘটে ভগবানের কার্য্যের জন্য।

হিন্দুদের মধ্যে প্রত্যেক মন্ত্রের প্রারম্ভে "ওঁ" শব্দটির প্রয়োগ সুপ্রচলিত। মহাযানী ও বৌদ্ধতন্ত্রেও "ওঁ" শব্দটির প্রয়োগ আছে। "ওঁ" মন্ত্রটি স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ মন্ত্রটি দীক্ষা বা কাহারো কৃপার অপেক্ষা রাখে না। মন্ত্রটি নিয়মসম্মত উপায়ে ঠিক মত জপ করিতে পারিলেই সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। মন্ত্রটির উপকারিতা সর্ব্বত্র স্বীকৃত। গ্রীকরা (greeks) ইহাকেই লোগাস্ (Logos) এবং জ্ঞানবাদীরা (stoicks) ইহাকেই বিশ্বাত্মা (World-Soul) বলিয়া অভিহিত করিতেন। ইহাই মহর্ষি পতঞ্জলির 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ', বৌদ্ধতন্ত্রের "ওম্" যাহার অপর নাম শব্দব্রহ্ম বা ব্রহ্মনাদ, (The prime ordeal—"In the beginning there was word and the word was with God and the word is God.—The Bible) ওঁ বা প্রণবধ্বনি শুধু অনাহত নহে, তাহা প্রথম সৃষ্ট শব্দ বা নাদ যাহা সকল শব্দের মূল ও আধার। আর একটি বিশেষ কথা মন্ত্রগুলি সিদ্ধ মহাপুরুষগণের তপস্যা শক্তির দ্বারা সঞ্জীবিত সুতরাং মন্ত্রগুলির মধ্যে সূক্ষ্মশক্তি আবহমানকাল কমবেশী সঞ্চিত থাকে যাহার অন্য নাম মন্ত্রশক্তি, মন্ত্রচৈতন্য বা তপঃশক্তি, সিদ্ধ মন্ত্রে তাহা থাকিবেই। কাজেই তাহা ঠিকমত জপ করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য। সংসারীদের পক্ষে মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব নহে তবে সুদুর্লভ। তাহার প্রথম কারণ মন তাঁহাদের সদা চঞ্চল থাকে সাংসারিক চিন্তায়, দ্বিতীয়তঃ জপে তাহারা অতি অল্প সময়ই দিতে পারেন এবং শ্রেষ্ঠ কারণ ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। সংসারে থাকিয়া জপসিদ্ধ হওয়া যায়, আমিও হইয়াছিলাম, তবে সংসারী হইয়া নহে। জপে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে বৈরাগ্য, ত্যাগ, নির্জ্জনে সাধনারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। এখানে বাহ্যিক ত্যাগের বা

বৈরাগ্যের কথা হইতেছে না। মন্ত্রগুলির কোন দোষ নাই, দোষ আমাদের। ভগবানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না অথচ ব্যাকুলভাবে ডাকিলে তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়, আমিও পাইয়াছিলাম, এবং ইহা ইষ্টের পক্ষেও প্রযোজ্য, বুদ্ধ কৃপা পাইতে আমার পাঁচ মিনিট লাগিয়াছিল প্রায়। "ওঁ" মন্ত্রটির সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন (Om is the mantra, the expressive Sound—Symbol of the Brahmic consciousness in its domain from the Turiya to the external material plane. The function of a mantra is to create vibration in the inner consciousness that will prepare it for the realisation of what the mantra Symbolised and is supposed indeed to carry within itself. The Mantra should, therefore, lead forwards the opening consciouness to the sight and feeling of the one consciousness in all material things, in the inner being and in the Supra physical worlds, in the causal planes above now superconscient to us and finally, the Supreme Liberated transcendence above all cosmic existence. The last is usually the main preoccupation with those who use the mantra···Om if rightly used (not mechanically) might very well help the opening upwords and outwards (Cosmic Consciousuess) as well as the descent'—Sri Aurobindo) অর্থাৎ "ওঁ" মন্ত্রটি যন্ত্রবৎ উচ্চারণ না করিয়া ঠিকমত জপ করিতে পারিলেই এই পার্থিব জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া তুরীয় পর্য্যন্ত সমস্ত লোকেরই উপলব্ধি মন্ত্রটি দিতে সক্ষম, মন্ত্রটি ব্রাহ্মী-চেতনার দ্যোতক।

মন্ত্রটি ক্রমাগত জপের ফলে অন্তশ্চেতনায় সূক্ষ্ম স্পন্দন ও প্রস্তুতি সৃষ্টি করে এবং পরে সাধন উপযুক্ত হইলে ঐ অন্তশ্চেতনা ইষ্টে চলিয়া যায়। মন্ত্রটি সূক্ষ্মদৃষ্টি বা যে কোন উপলব্ধি দিবার ক্ষমতা রাখে। মন্ত্রটি যারা জপ করেন তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া এবং মন্ত্রটি জাপককে মূলতঃ তাহাই দিয়া থাকেন। আমি শ্রীঅরবিন্দের এই লেখাটি পড়িয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করি, যদিও আমার মূল লক্ষ্য ছিল পরব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম নহে, প্রায় দশ মাস আপ্রাণ চেষ্টার ফলে মন্ত্রটির কৃপায় অযাচিত ভাবে নির্ব্বিকল্প সমাধির মধ্য দিয়া বহুবার অতীতে (ব্রহ্মজ্ঞান আমি ভুলের জন্য হারাইয়াছি) ব্রহ্মসহ একীভূত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম এবং সেই সঙ্গে বিনা চেষ্টায় সবিকল্প সমাধি-লাভ করি।

সদ্‌গুরু লাভ করা সুদুর্ল্লভ। সদ্‌গুরু দীক্ষা দিবার সময়েই শিষ্যকে সিদ্ধমন্ত্র দান করেন অর্থাৎ মন্ত্রশক্তির পরিচয় শিষ্য দীক্ষার সময়েই পাইয়া থাকেন। ফলে গুরু বা মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে শিষ্যের আর কোন সন্দেহ বা সংশয় থাকেনা, ইহার পর সিদ্ধি নির্ভর করে শিষ্যের সাধনার উপর। সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশ মত চলিলেই সিদ্ধি এই জীবনেই লাভ করা যায়; ইহাও সত্য যে অতীব শক্তিশালী গুরু দীক্ষা বা মন্ত্র না দিয়াও অন্য প্রকারে, দৃষ্টি বা স্পর্শ বা ইচ্ছাশক্তির বলে শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারেন কিন্তু এ সৌভাগ্য কদাচিৎ কাহারো ভাগ্যেই মাত্র ঘটিয়া থাকে। ভগবানের আদেশ না পাইলে সদ্‌গুরু হওয়া যায়না। আবার যেমন সদ্‌গুরুর বিশেষ প্রয়োজন ঠিক তেমনিই সৎশিষ্যেরও বিশেষ প্রয়োজন অর্থাৎ উপযুক্ত আধারেরও বিশেষ প্রয়োজন। ইহা সত্য, উপযুক্ত আধারের পক্ষে গুরু না হইলেও সিদ্ধি-লাভ করা সম্ভব, আমার ছিলনা তবে মহাকালীর কৃপা আমি ১২ বৎসরে পাই, তাঁর স্পর্শে আমার গাত্র রং বদলাইয়া যায়, তাঁর আদেশেই গৃহত্যাগ করি; যাহার আত্মবিশ্বাস নাই তাহার ইষ্ট বা গুরুর উপরও বিশ্বাস নাই। আমার ব্যক্তিগত মত যাহারা উপযুক্ত আধার বা যাহাদের দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আছে বা যাহারা দৈবানুগ্রহ লাভ করিয়াছেন তাহাদের পক্ষে গুরুবরণ না করাই শ্রেয় ও শুভ, কারণ গুরুরাই অনেক সময় শিষ্যদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ান। তাহার দৃষ্টান্ত বহু আছে, যে-গুরুর অহংবোধ প্রবল সে গুরু সর্ব্বনাশা এবং এই সব ভণ্ড গুরুরা তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য প্রায়ই মিথ্যা ও শঠতার আশ্রয় লইয়া থাকেন। সদ্‌গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন —"শিষ্যকে তিনি পরিচালনা করেন তার স্বভাব অনুযায়ী, গুরুভার হয়ে তার উপর চেপে বসেন না।" আমি গুরু

এই অভিমান থাকলে গুরু হওয়া যায় না, তিনি পথের সাথী, পথের শেষ নন। কিন্তু এইখানে এসে সিদ্ধেরও ভরা ডুবি হয়ে যায়। গুরুগিরির অহঙ্কার হ'ল মহামায়ার শেষ বন্ধন। তাকে কাটিয়ে ওঠা সহজ কথা নয়।" গুরু সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মত—"বাহ্য শাস্ত্রাদির উপর নির্ভর না করিয়া আপনার অন্তঃস্থ ভগবানের উপর নির্ভর করা, আপনিই আপনার গুরু (আত্মনো গুরুরাত্মৈব—ভাগবত) এবং বুদ্ধদেবের মত "আত্মাই আত্মার গুরু, আত্মাই আত্মার বন্ধু (অত্তাহি অত্তনো নাথো, কোহি নাথো পরোসিয়া)।

বলা বাহুল্য, যাঁহারা সদ্‌গুরু নহেন তাঁহারা সশিষ্যে উভয়েই অকৃতকার্য্য হন, এ যেন এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইবার মতন অবস্থা। যেখানে সমস্ত শিষ্যই অকৃতকার্য্য হন সেখানে বুঝিতে হইবে গুরু ভণ্ড।

জপেও যোগের মত সিদ্ধিলাভ করিতে গুরু, শাস্ত্র, অধ্যবসায় ও কালের প্রয়োজন আছে। ইহার মধ্যে উপযুক্ত আধারের বা যাঁহারা দৈব কৃপা পাইয়াছেন তাঁহাদের গুরু না হইলেও চলে এবং তাহাই মঙ্গলজনক; অন্তর্জগতে বহু সিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন যাঁহাদের ব্যাকুলভাবে ডাকিলেই অতি অল্পেই তাঁহাদের কৃপা পাওয়া যায়, বুদ্ধদেবের সঙ্গে আমার একাত্মা লাভ হইয়াছিল, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৈবীকৃপা তাহাও আমি পাইয়াছি। শাস্ত্র বা জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন অধ্যাত্ম পথে আছে, কারণ জ্ঞান না থাকিলে শক্তি হস্তগত হইলে মূর্খের হস্তে তাহার অপব্যবহার হইয়া থাকে। শাস্ত্রে বহু অবস্থা ও লোকের (planes) বিষয় বলা হইয়াছে, জানা থাকিলে তাহা বুঝিতে বিশেষ সুবিধা হয়। ইহার পর অধ্যবসায়। অধ্যবসায় না থাকিলে কোন প্রকার যোগ বা জপে বা কাজে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। সর্ব্বশেষ কাল। কাল সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন "কালের প্রতি প্রবর্ত্তসাধকের মনোভাব এই হবে—সাধনার জন্য অনন্ত কাল তার সামনে পড়ে রয়েছে, সুতরাং তাকে হতাশ বা ধৈর্য্য হারালে চলবে না। অথচ তার চাই এই মুহূর্ত্তেই চাই অর্থাৎ অবিচল ধৈর্য্যের ভূমিকায় প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োগ —এই হ'ল কালজয়ের সঙ্কেত।" যাঁহারা সাধনাকে ধৈর্য্যের সহিত ধরিয়া রাখিতে পারেন সিদ্ধিমাত্র তাঁহাদের জন্য ("All who cleave to the path steadfastly can be sure of their spiritual success."—Sri Aurobindo) এবং সিদ্ধি-লাভের উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন দুটি উপায়ের কথা ("The e are always two elements in the spiritual success—one's own steady will and endeavour and the Power that in one way or another helps and gives the result of endeavour."—Sri Aurobindo) একটিতে সাধকের নিজস্ব ব্যক্তিগত অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সুতীব্র ইচ্ছা অপরটি দেবী-কৃপা। ইহা সত্য যাঁহারা সত্যই ভগবানকে বা ইষ্টকে ব্যাকুল হইয়া পাইতে চেষ্টা করেন তাঁহারা অতি সহজেই তাহা লাভ করিতে পারেন এবং তাহা আত্মদানের ব্যাকুলতায় সম্ভব হয়, অহং-এর পথে নহে অর্থাৎ যাঁহারা মনে করেন অহমিকা বলেই সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিবেন, তাহা সম্ভব কিন্তু তাহা ঘটে বহু বিলম্বে, বহু দুঃখ কষ্ট বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়াই, ইহাই হইল আত্মসমর্পণ ও ব্যক্তিগত সাধনার পার্থক্য।

কাল সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে ১২ বর্ষ একটি বিশেষ কাল। ভাল মন্দ ঐ কালে কিছু বিশেষ ঘটিয়া থাকে। আমার প্রথম মহাকালীর স্পর্শলাভ ঐ কালে ঘটে। তাহার পর ২৫ বর্ষ হইতে ২৬ বর্ষ মধ্যে আর একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে, মহাকালীর আজ্ঞায় আমি ২৩ বর্ষে গৃহত্যাগ করি—এই কালেই সত্যকার সাধক তাহার ভাগ্যোন্নতি পরিবর্ত্তন, সন্ন্যাস বা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির প্রথম উন্মেষ হয় অর্থাৎ সাধক জানিতে পারেন এই কালেই ভবিষ্যতে তিনি কি হইবেন বা সিদ্ধিলাভের আভাস। আমার মহাকালীর সঙ্গে শারীরিক একত্ব বা তাঁহার সঙ্গে একীভূত হইবার সৌভাগ্য এই কালেই ঘটে। এইকালে যাহার কিছু না হয় তাহার কিছু আর হয় না বলিয়া মনে হয়। আমি কয়েক জনকে এই ২৫বর্ষের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তন এই কালেই ঘটিয়াছে। ইহার পর ৩৫ বর্ষ হইতে ৩৬বর্ষকাল। এই কালের মধ্যে প্রায় সকল লোকেরই ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয় এবং ইহার মধ্যেই বড় সাধকের সিদ্ধিলাভ ঘটে। বুদ্ধদেব ৫ বর্ষে সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার পর ৪৫ বর্ষ হইতে ৪৬ বর্ষ, ইহার মধ্যেই অনেকের সিদ্ধিলাভ বা পূর্ণ ভাগ্যোদয় লাভ ঘটে। আমি ৪৬ বর্ষ বয়সে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করি। সর্ব্বশেষ ৫৫বর্ষ হইতে ৫৬বর্ষ, ইহাই সর্ব্বশেষ কাল, ইহার মধ্যে কিছু না হইলে আর বড়

হয় না। এইগুলিই প্রকৃতিদত্ত নির্দ্দিষ্ট কাল সকলের পক্ষে, ইহার অন্যথা অবশ্য হয় কদাচিৎ। ভগবান কোন নিয়মে বদ্ধ নহেন, দৈব কৃপায় তাহা যে কোন কালেই তাহা সম্ভব। আর একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। সিদ্ধিলাভ এই জড়জগতে থাকিয়াই করিতে হইবে মৃত্যুর পর বা অন্য লোকে নহে ("Sadhana has to be done in the body, it connot be done by the soul without the body"—Sri Aurobindo) ইহাই ভগবানের অমোঘ বিধান। মৃত্যুর পর তপস্যা করা যায় না ইহাই চিরন্তন সত্য। এ জগতে থাকিয়া যে যতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন মৃত্যুর পর তাহার বেশী বা অতীত যাইবার ক্ষমতা কাহারো নাই। সিদ্ধি বা মুক্তি এই জড় জগতে থাকিয়াই করিতে হইবে অন্যত্র নহে। জীবন্মুক্ত ছাড়া আর কাহারো মুক্তি হয় না। সিদ্ধি কেহ কাহাকেও দিতে পারেনা, আমি এক জনকেও দেখিনাই বা শুনিনাই। ইহার জন্য উপযুক্ত আধার ও বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন। সুদীর্ঘ সাধনারও প্রয়োজন (It is also a fact that no body can give you any spiritual experiences…"Sri Aurobindc); সদ্ গুরু পাওয়া যেমন শিষ্যের সৌভাগ্য ততোধিক সৎ-শিষ্য সম্বন্ধে (গুরু মিলে লাখ লাখ, শিষ্য মিলেনা এক !) এই সৎ শিষ্যের অভাবেই বহু মহাপুরুষকে আক্ষেপ করিতে হইয়াছে। বুদ্ধদেব মৃত্যুকালে আনন্দকে শেষ উপদেশ দিয়াছিলেন—সাধনা সাধককেই করিতে হইবে, তথাগতেরা পথপ্রদর্শক মাত্র (none can help yon, help yourself, work out your own salvatiou" Swami Vivekananda), স্বামীজী প্রায়ই বুদ্ধদেবের এই বাণীটি আবৃত্তি করিতেন—"পথ যদি না থাকে তবুও এগিয়ে যাও।

ভীত হয়োনা, কোন উদ্বেগ যেন তোমাকে স্পর্শ না করে। একলাই এগিয়ে চল তুমি, যেমন করে চলে গণ্ডার।

বাতাসকে বাঁধা যায় না জাল দিয়ে, পদ্মপত্রে জল জমতে পারে না।

গণ্ডার একলাই চলে যায়—তুমিও চলো।"

---

* অনেকগুলি উদ্ধৃতি দিয়াছি দুঃখের বিষয় নামগুলি মনে নাই।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

বৈশ্বানরঃ সাধারণ শব্দবিশেষাৎ (২৪)
ছান্দোগ্য উপনিষদেতে—
জেন এই কথা আছে—
পণ্ডিতদের হয়েছিল সংশয়
আমাদের আত্মা কি হয়
কিইবা ব্রহ্ম হয় ?
কেকয়রাজ সে অশ্বপতিকে কয়
রাজা তাঁহাদের কন
আপনারা কয়জন
উপাসনা কর্ন্নো কাঁহাকে আত্মবলি,
কেহ বা স্বর্গ কয়
কেহ সে সূর্য্য কয়
কেহ বা আবার বায়ু বলি বলে বলি
অশ্বপতি সে কন
অংশ ইহারা হন
বৈশ্বানর যে মস্তক হয় তাঁর
সূর্য্য চক্ষু হয়
বায়ু প্রাণরূপে রয়
আকাশ দেহের মধ্যভাগ সে যাঁর।
এবে হল সংশয়
বৈশ্বানর কি আত্মা হয় ?
জঠরাগ্নি যে ইহাতে জড়ায়ে রয়
অগ্নিও বলা যায়
দেবতা বিশেষ হয়,
এখানেতে তাহা পরমাত্মাই হয়
সাধারণ ইহা নয়
বিশেষ শব্দ কয়
যাহারে জানিলে সব পাপ দূরে যায়,

বৈশ্বানর আত্মার কথা
বলিলেন রাজা তথা
সুধীজনদের সংশয় তবে যায়।
স্মর্য্যমান মনুমানং স্যাদিতি (২৫)
স্মর্য্যমান—অর্থাৎ স্মৃতিতে যাহা উক্ত হইয়াছে।
শ্রুতিবাক্যতে বৈশ্বানরের আত্মা বলিয়া কয়
স্মৃতিগ্রন্থেও ব্রহ্মের জেন এই উল্লেখ হয়
বিষ্ণু পুরাণ বই এ
আছে জেন এক শ্লোক এ
"যস্য অগ্নি রাস্যং দ্যৌমূর্দ্ধং।
খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ
সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশং শ্রোত্রে
তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ।
অগ্নি সে মুখ হয় স্বর্গ মস্তকে রয়
নাভি সে আকাশ যাঁর
পৃথিবী চরণ হয় রবি সে নয়ন ময়
দিক কান রূপে তাঁর
তাঁহারে প্রণাম করি রয় যে সকল ভূমি
সবার আবাস ময়
বলিতে ভাষা যে হারে জয় জর চরাচরে
সবাকার মাঝে রয়।
অসম্ভবাৎ পুরুষমপি চ এনম্ ধীয়তে (২৬)
তবু যদি মনে হয় বৈশ্বানর ব্রহ্ম সে নয়
শব্দাদিভ্য আহুতির কথা রয়
অগ্নি বুঝিবা হয় অন্ত প্রতিষ্ঠানাচ্চ রয়
দেহের মধ্যে একথা এখানে কয়
তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ জঠরাগ্নিতে পরমাত্মা
দরশন করো বলে
অসম্ভবাৎ এ কথা আছে বৈশ্বানরের মস্তক বলিয়াছে
স্বর্গই তারে বলে।
জঠরাগ্নির কথা নয় এতেই ত বোঝা যায়
শ্রুতিতে পুরুষ কয়
ব্রহ্মই এই জন দ্বিধা নাহি করো মন
বৈশ্বানর সে ব্রহ্ম হয়॥
অতএব ন দেবতাভূতং চ (২৭)
বৈশ্বানর এখানেতে জেন
ব্রহ্মই তাহা যেন
শুধু সে আগুন নয়
শুধু দেব হেথা নয়
সাধারণ নাহি হয়
ব্রহ্মেরই কথা কয়।
সাক্ষাৎ অপি অবিরোধং জৈমিনিঃ (২৮)

বৈশ্বানর শব্দে এখানে জাঠর অগ্নিময়
উপাধি যুক্ত ব্রহ্ম স্বরূপ তারি কথা জেন কয়
ঋষি জৈমিনি তবু কয়
শুধু ব্রহ্মের কথা নয়
সাক্ষাৎ অপি উপাধি বিহীন ব্রহ্মের কথা কয়
অবিরোধং এই অর্থ করিতে বিরোধ কভু না হয়
বিশ্বস্য অয়ং নরঃ
পুরুষ ইতি বৈশ্বানর
সমগ্র বিশ্ব দেহ হয় যার ইনিই সেজন হন
বিশ্বের মাঝে মধ্যবর্ত্তী হয়ে এ পুরুষ রন।
অভিব্যক্তেরিতি আশ্মরথ্যঃ (২৯)
প্রশ্ন হইতে পারে ব্যাপ্ত যে চরাচরে
সেই পরমেশ্বর উপাসনা
যদি তাহা বলা হয় জঠরাগ্নিতে শুধু রয়
বলা হল কেন শুধু এইটুকু কথা?
আশ্মরথ তখন কয় তাহা নয় তাহা নয়
ঈশ্বর প্রকাশ সমভাবে নাহি হয়
অভিব্যক্তিটি তার যেথায় যেই প্রকার
উপাসনা তাঁর জেনো সেই মত হয়।
অনুস্মৃতের্বাদরিঃ (৩০)
আচার্য্য বাদরি বলেন যদিও ব্রহ্ম সর্বময়
তবুও তাঁহারে বলিতে বলিব হৃদয়েতে সেই রয়
হৃদয় মাঝেতে মন
স্মরিও অনুক্ষণ
হৃদয় কমলে তাঁহারে স্থাপিয়া তাঁর উপাসনা কর
পরাণ অধিকে পরাণে ধরিয়া দিবানিশি
তাঁরে স্মর।
সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি (৩১)
জৈমিনি বলে শ্রুতির হয়ত এমনি অভিপ্রায়
এইভাবে তারে উপাসনা হলে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়
অশ্বপতি সে কন
শুন পণ্ডিতগণ
ব্রহ্মের নানা অবয়ব যথা স্বর্গ সে মাথা তাঁর
সূর্য্য চক্ষু এই ভাবে জানি পুজা কর সবে তাঁর।
আমনন্তি চৈনস্মিন্ (৩২)
জাবাল উপনিষদেতে জেন এই কথা তাতে আছে
ব্রহ্মের মস্তক উপরেতে আর চিবুকের কথা আছে
চিবুক অন্তরালে
বলেছেন যেই কালে
ব্রহ্মকে প্রদেশবিশেষে অবস্থিত বলে বলা
তবে জেন হয়
যুক্তি যুক্ত এই কথা জেন কথার কথা সে নয়।

॥। দ্বি-ধারা ॥।

মৈত্রেয়ী মুখার্জী

—ইন্দ্র! হ্যালো ইন্দ্র! কি করছিস বাড়ী বসে?

—কি আর করবো, এই গরমে কোথায় ঘুরবো তাই ঘরে বসে আছি।

—বেশ করেছিস। দেখ, আমি ভাবছিলাম যদি তোর দেখা না পাই তাহলে কি করবো? এই রোদ মাথায় করে আবার ফিরে যেতে হবে। কিন্তু দেখ, আমার ইচ্ছা-শক্তি কি প্রবল, যার জোরে তোকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে রেখেছি। তুই এক পা'ও নড়তে পারিস নি।

—তোর যে কি কথা বিদ্যুৎ? আমি বের হলাম না রোদের ভয়ে,—আর তুই মাঝখান থেকে তোর ইচ্ছাশক্তির জোর দেখাচ্ছিস। যাক, কি মনে করে এই দুপুরবেলায় আমার বাড়ী হানা দেওয়া হয়েছে, জানতে পারি কি?

—নিশ্চয়ই! সেই জানাতেই তো তোর এখানে আসলাম। দেখ ভাই,—আমি একটা গল্প লিখেছি। লেখা শেষ হবার পর তোর কথা মনে পড়লো—

—সে কিরে আমি কি তোর নায়িকা যে আমার কথা মনে পড়বে?

—ইস্, তোর কি মাথা খারাপ হ'লো নাকি ইন্দ্র, তোর ব্যাকরণে এত ভুল হলো কেমন করে?

—কেন মাথা খারাপের কি হলো? আর ব্যাকরণেরই বা কি ভুল ক'রলাম?

—"ভুল করলি না?—তুই হচ্ছিস ইন্দ্র। আচ্ছা ইন্দ্র কার নাম জানিস? উনি হচ্ছেন রাজা মানে স্বর্গের রাজা। অতএব ইন্দ্র পুরুষ, এবং তোর নাম যখন ইন্দ্র তখন তুইও পুরুষ! তোর নাম পুরুষের, তোর ইয়া বড় বড় গোঁফ, ইয়া বুকের ছাতি, টেনিস বলের মত শক্ত শক্ত হাতের গুলি, গলার আওয়াজ একেবারে মহাদেবের খোদ বেয়ারা ষাঁড়ের মত, লম্বায় চওড়ায় ঘটোৎকচকেও লজ্জা দিচ্ছিস। তোমা হেন রাম চোয়াড়েকে আমি করবো আমার গল্পের নায়িকা? হে সখা! এ তোমার কেমন কথা? ইহার পরেও যদি,—তব মাথা খারাপ না কহি—তাহা হইলে লোকে মোরে কহিবে পাগোল!

—ওহে কবি-বর বিদ্যুৎকুমার।—যদি তব মনে হয় হইয়াছি পাগল আমি। তবে জানিয়া রাখ, তব কথাই মোরে করিয়াছে পাগল।

—"কেন? আমি আবার কি কথা বললাম, যে তোর মাথা খারাপ হলো তাতে?

—"হবে না খারাপ? তুই একটা বেকার ছবি আঁকিয়ে, সারা দিন ধরে মশার ঠ্যাং মাছির ডানা আর ম্যালেরিয়ার বীজাণু এঁকে কোন রকমে দিন গুজরাণ করিস, তার ওপর আজ ছেলের অসুখ, কাল মেয়ের জন্মদিন, পরশু শালীর বিয়ের সাহায্য, এই সব নিয়ে নাজেহাল হচ্ছিস। এর মধ্যে আবার গল্প লেখার রোগ হ'ল, এবং এই গল্প লেখার পর মনে পড়লো এই শর্মারামকে—

—কেন? তোকে মনে পড়াটা আশ্চর্যের ব্যাপার হবে কেন? আর মশা, মাছির ছবি আঁকি বলে গল্প লিখতে না পারার কি আছে? মশা, মাছির ছবি আঁকি জীবিকার জন্যে, আর গল্প লিখি নিজের বক্তব্য পেশ করার জন্যে।

বেশ বাবা! বেশ! মেনে নিলাম সকলকে তুই তোর বক্তব্য শোনাতে লিখছিস। কিন্তু সেই গল্প লিখে নায়িকা হবার মত কোন মহিলার কাছে না গিয়ে আমার কাছে এসে জুটলে কেন ব্রাদার? আমি তো তোমার গল্প শুনে চোখের জলে রুমাল ভিজিয়ে সেই রুমাল নিঙড়ে জল বার করে তোমার ঐ উত্তপ্ত হৃদয় ঠাণ্ডা করতে পারবো না? বৎস বিদ্যুৎকুমার, তোমার অভিসার পথ এটা নয়, অন্য পথ ধরো।

—আচ্ছা ইন্দ্র! তুই আমার কথাটা শেষ করতে না দিয়েই চেঁচাতে আরম্ভ করে দিলি কেন? আমার কথা আগে শোন তারপর বলিস,—তোর প্রাণ যা চায়।

—বেশ এই করিলাম আমার জিহ্বাকে সংযত কহ তব হৃদয়ের কথা, কিবা অভিপ্রায়ে আসিয়াছ হেথা?

—আরে বাবা হৃদয়ের কথা নয়, আমার লেখা গল্প তোকে শোনাতে এসেছি। তুই একটু ধৈর্য ধরে শোন—এবং শুনে বলবি কেমন হলো লেখাটা।

—দেখ এই জন্যেই বলে বোকাকে বন্ধু ভাবা মানেই বিপদে পড়া। এই গরমের দুপুরে কোথায় উত্তর মেরুর বরফের কথা ভাবতে ভাবতে নিজে বেশ ঠাণ্ডা মেরে যাবো! আর তুই এলি ঘ্যানর ঘ্যানর করে মাথা মুণ্ড তোর লেখা পড়তে।

—যদি বারণ করো তবে পড়িব না মম গান আমি চলিলাম—

—আরে আরে! তুই সত্যি সত্যি চললি নাকি? হে বন্ধু বিদায় তোমায় দিতে পরাণ চলিয়া যায়—হৃদয় গলে জল হওয়ার চেয়ে তোর গল্প শুনে হৃদয় জমানো অনেক ভালো। নে, আরম্ভ কর।

বিদ্যুৎ রায় পড়তে আরম্ভ করলো……

অপলা ভালোবেসেছিলো প্রদ্যুম্নকে। অপলা জানতো না প্রদ্যুম্ন তার মায়ের আঁচলে বাঁধা একটি নাবালক পুত্র। তাই অপলা ওকে ভালোবেসেছিলো। অনেক যন্ত্রণার মধ্যে 'ও' দেখা পেয়েছিলো প্রদ্যুম্নের, এবং ভেবেছিলো, তার দুঃখের রাত্রি শেষ হয়েছে। রাতের অন্ধকার ভেদ করে ভোরের সূর্যের মত অপলার সামনে এসেছে প্রদ্যুম্ন। ভুল—ভুল—ভুল অপলা আজ বুঝতে পারছে কত ভুল ধারণা সে করেছিলো। প্রদ্যুম্ন আসেনি সূর্যের আলো নিয়ে 'ও' এসেছে আলেয়া হয়ে। আলেয়ার কোন ক্ষমতা নেই লতাকে বাঁচিয়ে রাখার সূর্যের আলোর মত বরং লতা শুকিয়ে যায় আলেয়ার বাষ্পে। অপলা যন্ত্রণায় শুকিয়ে যাচ্ছে, বাঁচার আলো 'ও' দেখতে পাচ্ছে না। ওকি আলেয়া? না…প্রদ্যুম্ন আলেয়া নয় ও শিকড় বিহীন গাছ, ওর নিজস্ব কোন শিকড় নেই, ও ভর করে আছে মা, বোন, ভাইদের ওপর। যে গাছ নিজে দাঁড়াতে পারে না, সে কেমন করে লতাকে আশ্রয় দেবে? ভাবে মনে মনে অপলা। ও ঠিক করেচে প্রদ্যুম্নকে ফিরিয়ে দেবে। প্রদ্যুম্নকে ফিরিয়ে দিতে অপলার হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়"—

—এই! এই! এই থাম বিদ্যুৎ, থাম। এই পচা মধ্যযুগের ঢংয়ে লেখা গল্প আমায় শোনাতে এসেছিস? জানিস আমি অতি আধুনিক শিল্পীদের, সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছি? আমরা বিপ্লবী, আমরা পুরাতন ভঙ্গকারী এই হচ্ছে আমাদের মন্ত্র, আর তুই কিনা এই পচা, বাসি গল্প শোনাতে এসেছিস আমাকে?

—পচা, বাসি, মধ্যযুগ এসব আবার কি আরম্ভ করলি ইন্দ্র?

—করবো না? আরে তুই এতগুলো লাইন লিখলি তার মধ্যে একটাও গালাগাল নেই, খেউড় নেই এ আবার কি গল্পরে বাবা!

—গালাগাল, খেউড়—?

হ্যাঁ! বিদ্যুৎ হ্যাঁ! খেউড়,—মানে যা শুনে ঐ সেকেলে উন্নাসিক বুড়োগুলোর নাক কুঁচকে উঠে, আর আধুনিক তরুণেরা যা শুনে সারা দেহে—যাকে বলে একেবারে শিহরণে থরো থরো—এই মরেছে তোর পাল্লায় পড়ে আমি আবার রবিবাবুর কাব্য আওড়াচ্ছি, নাঃ থরো থরো নয়,—তরুণেরা যা শুনে কোমর দোলাতে আরম্ভ করে সেই গালাগাল নেই একটাও তোর গল্পে, তার ওপর নায়িকার পাঁজরের মধ্যে হৃদয়টাকে রেখে দিয়েছিস, তোর গল্প কেই বা পড়বে। আর পড়তেও হবে না সম্পাদক গল্প ছুঁকেই ফেলে দেবে ওয়েষ্ট পেপার বক্সে।

—ইন্দ্র তোর টেম্পরেচারটা একবার দেখলে হত।

—কেন! টেম্পারেচার দেখতে যাবো কেন? আমার কি জ্বর হয়েছে?

আমার মনে হচ্ছে তোর জ্বর হয়েছে এবং জ্বরটা একটু বেশীই, তা না হলে এমন ভুল বকছিস কেন?

—"কেন?…ভুল আবার কি বকলাম?

.ভুল বকছিস না?—লিখছি গল্প, মানে সিরিয়াস গল্প, আর তুই বলছিস গালাগাল কৈ? নায়িকার পাঁজরের মধ্যে হৃদয়টা রেখেছি। আরে হৃদয়টাতো পাঁজরের মধ্যে নিয়েই মানুষ জন্মায়, সেটার আমি কি করবো!

—কি আর করবি ? যখন গল্প লিখবি তখন তোর নায়িকার হৃদয়টাকে অপারেশান করে বাদ দিবি।

হৃদয়টাকে অপারেশন করে বাদ দেব তুই কি আমায় খুনের দায়ে ফেলতে চাস ?

নাঃ—তোর আর বুদ্ধি হবে না কোন কালে। তুই তো আর সত্যিকারের ছুরি দিয়ে নায়িকার হৃদয়টা বাদ দিচ্ছিস না! কালি কলমে লিখছিস।

—কিন্তু মিছেমিছি নায়িকার হৃদয়টা বাদ দেব কেন ?

—তা নাহলে বিংশ শতাব্দীর আধুনিকা নায়িকা হবেনা। বিংশ শতাব্দীর নায়িকাদের হৃদয় থাকতে নেই।

—ইন্দ্র! আমার গল্পটা শুনবি—না তোর থিওরি আওড়াবি ?

—তোর ভালোর জন্যেই বলছিলাম—যাকগে। পড়।

বিদ্যুৎ পড়তে আরম্ভ করে—

"অপলা বসে আছে জাহাজঘাটার একটি সিঁড়িতে গঙ্গার জলে পা ডুবিয়ে. পাশে দাড়িয়ে আছে প্রদ্যুম্ন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে অনেকক্ষণ। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ আকাশের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। গঙ্গার এদিকটা বেশ নির্জন, অন্ধকারও। অপলা পরেছে গেরুয়া রংয়ের তাঁতের শাড়ী, লেস বসানো সাদা ব্লাউজ, চুলগুলো কোন রকমে ঘাড়ের কাছে জড়ানো"—

—উঁহু···হুঁ···হুঁ···হল না! আধুনিক নায়িকারা গঙ্গার ধারে বসে না ওটা কেটে দে। লেখ "অপলা' 'বারে' বসে আছে, সামনে স্যাম্পেনের গ্লাস, চারিদিকে নিওনলাইটের নীল আলো, পরণে ফিতে হাতা লাল ব্লাউজ চলির ঢংয়ে তৈরী, লাল পাতলা শাড়ীটা ডজন খানিক সেপটিপিন লাগিয়ে পেচিয়ে পেচিয়ে দেহের সঙ্গে আঁটা, নিচের দিকটা ঠিক যেন ড্রেন পাইপ প্যান্ট পরা মনে হয়, সামনে বসে নায়ক···

—ইন্দ্র, শোন আমার গল্প, পরে বলিস কথা—

—"অপলা!—অপলা! উঠে এসো। ডাকলো প্রদ্যুম্ন।

—তুমি বাড়ী যেতে পারো প্রদ্যুম্ন! আমি পরে যাবো।—

উত্তর দিলো অপলা।

"কিন্তু এই অন্ধকার রাতে এরকম নির্জন জায়গায় তোমাকে একলা রেখে আমি যেতে পারি না।

"প্রদ্যুম্ন! দোহাই, অনেক উপকার করেছ তুমি এই দীর্ঘদিন ধরে, আর নাইবা চিন্তা করলে আমার জন্যে! তোমার কাছে যা পেলাম আমার পক্ষে যথেষ্ট পাওয়া বলা যেতে পারে। আর চাই না কিছু তোমার কাছে। এবার আমার চিন্তা আমায় করতে দাও।" অপলা কথাগুলো বলে খুব শান্ত ভাবে।

"কিন্তু তুমি বলেছিলে তোমার সব ভাবনার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছ চিরদিনের মত ;—মনে আছে অপলা ?'

"আছে; কিন্তু যেদিন বলেছিলাম সেদিন ভাবতে পারেনি, একটু আশ্রয়, একটু নিশ্চয়তার প্রলোভন দিয়ে আমায় এমন অসম্মানের অপমানের কাঁটা ফুটিয়ে রক্তাক্ত করবে। তাই—তাই তোমার কাছে আশ্রয়ের আশায় দু' হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম আর সুখের চিন্তায় ডুবেছিলাম, বেঁচে থাকার যন্ত্রণা ভুলেছিলাম। কিন্তু একি!···একি অসহ্য যন্ত্রণা তুমি আমায় দিলে প্রদ্যুম্ন? আমার যন্ত্রণা কমাতে এসে, তীব্রভাবে আঘাত দিয়ে আমার সমস্ত চেতনাকে অসাড় করে দিলে! কেন? বলো প্রদ্যুম্ন বলো! আমি তোমার কি ক্ষতি করেছিলাম যার জন্যে আমায় তুমি এতো বড় আঘাত করলে ?"

আজ বিকেল থেকে অপলা অনেক চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে রেখেছিলো, কিন্তু প্রদ্যুম্নের কথায় আর নিজেকে প্রসন্নতার আবরণে ঢেকে রাখতে পারলো না।

উত্তেজনায়, যন্ত্রণায় কাঁপতে লাগলো অপলার ঠোঁট। আর বারবার জানতে চাইলো তার প্রশ্নের উত্তর প্রদ্যুম্নের কাছে। কিন্তু কি উত্তর দেবে প্রদ্যুম্ন? ও একটি ব্যক্তিত্বহীন, মেরুদণ্ডহীন যুবক। চিরকাল মায়ের শাসন আর আদেশ বোবার মত পালন করে এসেছে। ও ভয় করে ওর মাকে, ওর নিজস্ব কোন মত নেই, নেই কোন সত্ত্বা। প্রদ্যুম্ন পারলো না অপলাকে আশ্বাস দিতে; বলতে পারলো না;—"অপলা তোমায় যারা অপমান করলো তাদের সঙ্গে আমার সব সম্পর্কের শেষ হল।"

অপলা জানে, প্রদ্যুম্ন পারবে না তাকে সম্মানের সঙ্গে

আশ্রয় দিতে। পারবে না সমাজের সামনে স্বীকৃতি দিতে।

যেদিন অপলা এই গ্রামে এসেছিলো শুধুমাত্র সংসারের চাহিদা মেটাতে; সেদিন অপলা ভেবেছিলো জীবনের লক্ষ্যে সে পৌছুতে পেরেছে। ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো বাবা মা ভাই-বোনদের স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া। বাবার দায়িত্ব, যে দায়িত্বের ভার বহন করা, তাঁর কষ্টকর, প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছিলো,—তার কিছুটা ভার নিজের কাঁধে বহন করে, বাবার কষ্টের লাঘব করা। ভাইবোনদের ভালো করে তোলা। বহু কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে দেখে অনেক চেষ্টায়, অপলা এই মফঃস্বল শহরের স্কুলে শিক্ষিকার কাজটি পেয়েছিলো। ভেবেছিলো এই ছোট্ট স্কুলে তার জীবনের বাকী দিনগুলি কেটে যাবে নিশ্চিন্তে। মাসের প্রথমে বাবাকে টাকা পাঠিয়ে বাকি দিনগুলো ছোট ছোট মেয়েদের পড়িয়ে; অবসর সময়ে সহকর্মীণীদের সঙ্গে গল্প করে কেটে যাচ্ছিলো। এই জীবনে ছিলো না কোন যন্ত্রণা, না ছিলো কোন নতুনত্বের ইংগিত, না ছিলো জোয়ার, না হত ভাটা। একই ছন্দে অপলা এগিয়ে যাচ্ছিলো। ভেবেছিলো এমনি নিঃশব্দে নিস্তরঙ্গে ও এগিয়ে যাবে জীবনের শেষ সীমায়।

—"ধুত্তুরি! ওরে বিদ্যুৎ, তুই কি কোন চার্চের নানকে নায়িকা বানাতে চাস?" অধৈর্য হয়ে ইন্দ্র বিদ্যুতের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়।

—কেন! নানকে নায়িকা বানাতে যাবো কেন? আমার লেখার কোন লাইনে তো চার্চ কিম্বা নানের উল্লেখ নেই! উত্তর দেয় বিদ্যুৎ।

—না তা নেই, একটি জলজ্যান্ত তরুণী সংসার ছেড়ে, প্রেমে পড়ার কথা না ভেবে, ক্লাবে বারে নেচে বেড়ানোর স্বপ্ন না দেখে, গাঁয়ের স্কুলে শিক্ষিকা হয়ে, বাবা, মা ভাই বোনদের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পরম শান্তিতে, শেষের দিনের চিন্তা করতে লাগলো; অথচ সে মেয়ে চার্চের নানও না, আশ্রমের সন্ন্যাসিনীও না! আধুনিক জগতের নায়িকা। এ আবার কেমন নায়িকা?

—কেন, ক্লাবে আর 'বারে' নেচে-গেয়ে না বেড়ালে আধুনিকা নায়িকা হওয়া যায় না?

—না যায় না! দেখ ব্রাদার বিদ্যুৎ, আজকের নায়িকাকে যদি স্ল্যাক্স পরিয়ে, ঠোঁটে রং লাগিয়ে, নাইট ক্লাবে গিয়ে ঐ রংকরা ঠোঁট শ্যাম্পেনের পেয়ালায় চুমুক দেওয়াতে না পারো; তবে সেই নায়িকার দুঃখে কেউ কাঁদবে না। তাকে যতই তুমি দুঃখের সাগরে চোবাও না কেন, চোখের জল ফেলতে ফেলতে কেউ চীৎকার করে বলবে না;—"হে নির্দয় লেখক, বন্ধ করো তোমার লেখনী, আমাদের স্বপনচারিণীকে আর দুঃখ দিও না!"

—দেখ ইন্দ্র আমার জীবনের যে আদর্শ, সেই আদর্শ, মেয়েদের অত হাল্কা করে দেখতে বাধা দেয়, তাই আমি পারি না তোর মতকে সমর্থন করতে। আর আমি নায়িকাকে যে ভাবে সৃষ্টি করেছি, ভারতবর্ষে, না ভারতবর্ষ বললে ঠিক বলা হ'ল না, বাংলাদেশের প্রায় সব মেয়েকেই এইরূপেই আমরা দেখতে পাই। বাংলাদেশের অধিকাংশ মেয়েদের বুকে এখনও ঘুমিয়ে আছে মাতৃমূর্তি, যিনি শুধু মাত্র পালন করে যান পৃথিবীর জীবকে। তোমরা কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের মেয়েদের দিকে চোখ ফিরিয়ে আছো; তাই বাংলার নায়িকারা সাজতে চেষ্টা করছে বিদেশীনীদের মত, চলতে চেষ্টা করছে ওদের সঙ্গে পা মিলিয়ে। আমি চাই না ইন্দ্র, বাংলার মেয়েরা তোমাদের চাহিদা মেটাতে ছুটে চলুক মিথ্যের চমক লাগানো জগতে, আমি চাই ওদের অন্তরে ঘুমিয়ে-থাকা নারীত্বের অবসান ঘটুক, সেই সৃষ্টির প্রথম যুগের শক্তিশালিনী ধাত্রী রূপে তারা জেগে উঠুক। যাক, অনেক বাজে বকে ফেলেছি, আর নয়; এইবার শোন গল্পটা আমি আবার পড়ছি।—

কিন্তু হ'লো না নিঃশব্দে জীবনের শেষ দিনে পৌছানো অপলার।

নিস্তরঙ্গ জীবনে তরঙ্গের বিরাট ঢেউ তুলে এসে দাঁড়ালো প্রদ্যুম্ন।

অপলা স্কুলে পড়ানো আর পরীক্ষার খাতা দেখা ছাড়া স্কুল সম্বন্ধে আর কিছু খবর রাখতো না। হেডমিস্ট্রেস এক-দিন হোষ্টেলে এসে অপলাকে ডেকে বললেন, "অপলা, সেক্রেটারির কড়া তলব এসেছে, 'তাঁর' সঙ্গে দেখা করার, কিন্তু আমার শরীরটা ভালো নেই, আমি যেতে পারছিনা তুমি একবার দেখা করে এসো।'

—আমি! আমি যাবো সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে? না, বড়দি, আমি পারবো না।

—কেন? কেন পারবে না?

—আমার ভয় করে, তাছাড়া এই স্কুলের কিছুই আমি জানি না। আমাকে যদি তিনি কিছু প্রশ্ন করেন, আমি ঠিক উত্তর দিতে পারবো না। বোকার মত ওঁর সামনে হাজির হওয়াটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

না তোমাকে কিছুই প্রশ্ন করবেন না, শুধু একটি মেয়েকে ভর্তি করা নিয়ে হয়ত কিছু বলবেন। আর ভয় করার কি আছে? তুমি তো আর ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছ না!

তবুও অপলার ভয় যায় না। ভাবে আমি কখনো সেক্রেটারিকে দেখিনি, আর শুনেছি উনি বিরাট বড়লোক এবং রুক্ষ স্বভাবের। আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবেন কি জানি। কিন্তু যেতেই হবে আমাকে সেক্রেটারির বাড়ী।

অনিচ্ছার সঙ্গে সুটকেসের ডালা তুলে ধরলো তারপর একটা সাদা শাড়ী তুলে ধরলো দুটি আঙ্গুলে, শাড়ীটাকে দেখলো, আবার রেখে দিলো, আর নিজের অজান্তেই যেন টেনে আনলো একটা গোলাপী রংয়ের শাড়ী, তলা থেকে। এই কয়েক মাস স্কুলে পড়িয়ে অপলা সাদা শাড়ী পরতে অভ্যস্ত হয়েছিলো, তাই আজ এই গোলাপী শাড়ীটা হাতে নিয়ে ও অবাক হ'ল নিজেই।

অবাক হলেও ঐ শাড়ীটাই পরলো অপলা, সেই সঙ্গে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো আর হাল্কা প্রসাধনের প্রলেপ লাগালো মুখে, অনেক দিন পরে। হঠাৎ খেয়াল হ'ল অপলার,—সে বেশ সাজিয়েছে নিজেকে। আচ্ছা! আমি তো যাচ্ছি সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে তবে এত সাজলাম কেন?" অপলা প্রশ্ন করলো নিজেকে। হয়ত নিজেকে খুব ছোট হীন মনে হচ্ছে আর সেই হীনতা ঢাকবার জন্যেই হয়ত আমার এই প্রসাধনের বর্ম আঁটার চেষ্টা। ভাবলো আপন মনে অপলা। তারপর বেরিয়ে পড়লো সেক্রেটারির বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

আশঙ্কায় পরিপূর্ণ মন নিয়ে বেরুলেও প্রায় সন্ধ্যে হয়ে আসা গ্রাম্য পথটাকে ভালো লাগলো অপলার। এখানে ও এসেছে চার মাস কিন্তু গ্রামটাকে ঘুরে দেখার মত ইচ্ছে জাগেনি তাই গ্রামের সঙ্গে পরিচয় হয়নি ভালো করে। আজ অপলার মন চাইলো গ্রামের সঙ্গে পরিচিত হতে। অবশ্য গ্রামের মানুষের সঙ্গে নয়, গাছ-পালা, মাঠ, ঘাট-পুকুর, পাখী আর ফুলের সঙ্গে।

ঐগুলো কি ফুল?—কি সুন্দর দেখতে, কি সুন্দর গন্ধ! বাড়ীতে বাবা মাঝে মাঝে ফুল কিনে আনতেন ফুলদানিতে সাজানের জন্যে, বিলিতী ফুল, কিন্তু এত সুন্দর লাগেনি তো সেই ফুলগুলো? অপলা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আপন মনে।

আরে আরে! হাঁসগুলো যে জলে নেমে গেলো তর-তর করে? ইস—! কি চমৎকার লাগছে, যেন সাদা পদ্মগুলো চলার ক্ষমতা পেয়ে সাঁতার কাটছে।

অপলার মন থেকে সেক্রেটারির বিভীষিকা মুছে যায়, সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায় ওর মস্তিষ্ক। ও এখন বাচ্চা মেয়ের মত হাঁসের সাঁতার দেখতে লাগলো। হঠাৎ ভয় পেয়ে অপলা আপন মনে বলে উঠলো—"আচ্ছা হাঁসগুলো যে এই সন্ধ্যেবেলায় পুকুরে সাঁতার কাটছে? যদি শিয়াল এসে ধরে নিয়ে যায়? শুনেছি শিয়ালে হাঁস খায়।"

ও এমন ভাবে কথাগুলো বললো, আর হাঁসগুলোকে দেখতে লাগলো, যেন অপলাকে, হেডমিষ্ট্রেস হাঁসের পরি-চর্যা করার জন্যেই পাঠিয়েছেন।

—বাঃ—বেশ—বেশ! হে বিদ্যুৎ···তুই শেষকালে কালিদাসের অভিজ্ঞান থেকে টুকলিফাই করলি?

—নাঃ! ইন্দ্র তোর চিন্তার দৌড়ানোর জন্যে আর পথ ঘাটের দরকার হয়না, বেপথে, আঘাটায় সব জায়গায় দৌড়তে পারে।

—কেন! আমার চিন্তা আবার আঘাটায় দৌড়ালো কি করে?

—আচ্ছা, এখানে আবার শকুন্তলার নকল পেলি কোথায়?

—কোথায় না বল? শকুন্তলা তপোবনে হরিণ দেখে-ছিলো—আর তোর অপলা গ্রামের পথে হাঁস দেখছে, শকুন্তলা সহকারের সঙ্গে নবলতিকার বিয়ে দিয়ে ফুল দেখার জন্যে বসেছিলো, আর তোর নায়িক ফুল দেখে একেবারে বালিকার মত চেঁচিয়ে উঠলো। ঐ একই, সেই

পথে ঝমক ঝমক চলিছে থমকে থমকে থামিছে। য—তঃ—রাবিশ! যাকগে নে পড়।

—পড়ি কেমন করে? আমার এই অক্ষরের বনে তুই একটি মত্ত হাতীর মত বার বার এসে সব অক্ষরগুলোকে তচনচ করে দিচ্ছিস।

—না, তোর ভালো আর কেউ করতে পারবে না। আরে বোকা, তোর ঐ স্বর্ণাক্ষরগুলোকে গালিয়ে ফোর্টিনে করার চেষ্টা করছি। জানিস না? আজকাল টুয়েন্টি-টু ক্যারেট আর চলে না। ওর ফ্যাসান এখন মমিতে পরিণত হয়েছে। তাই বলছিলাম, তোমার ঐ স্বর্ণাক্ষরগুলো আর পুরণো সোনাতে না রেখে আধুনিক ফোর্টিনে পরিণত কর। বুঝলি? নে পড়! আর দেরি করিস নি। তোর ঐ প্যানপ্যানে গল্পের জন্যে আমি আর বেশী সময় দিতে পারছি না।

"বলছিস পড়তে?"

"হ্যাঁহে কপি হ্যাঁ. পড়।"

বিদ্যুৎ পড়ে—

খসখস শব্দে চমকে উঠে অপলা. দেখলো কয়েকটি মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখে তাদের গ্রাম্য-কৌতূহল। ওদের দেখে অপলা লজ্জা পেলো, আর ঠিক সেই সময়ে মনে পড়লো সেক্রেটারির কথা। আবার ওর মাথায় ভর করলো দায়িত্বপূর্ণ বয়স্ক মন। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো সন্ধ্যের শেষ লাল আলোটা পশ্চিম কোণে প্রায় মুছে এসেছে। "তাড়াতাড়ি যেতে হবে," অপলা ভাবলো মনে মনে। আর প্রশ্ন করলো সেই মেয়েদের—"আচ্ছা বলতে পারেন স্কুলের সেক্রেটারির বাড়ীটা কোন্ দিকে?

—হ্যাঁ, বলতে পারবো না কেন। ঐ তো, ঐ রাস্তা দিয়ে যান, কিছু দূর গিয়েই দেখতে পাবেন রাস্তাটা বেঁকে গেছে বাঁদিকে তারপর কয়েক পা এগুলেই ডানদিকের রাস্তার উপরেই দেখতে পাবেন একটা লাল রংয়ের দোতলা বাড়ী, ঐ বাড়ীটাই সেক্রেটারির। আপনি একেলা যেতে পারবেন? না আমরা যাবো আপনার সঙ্গে?"

—না-না আপনাদের যেতে হবে না আমি একলাই যেতে পারবো।

—আচ্ছা! আপনি বুঝি স্কুলের দিদিমণি?

—"হ্যাঁ ভাই। যাচ্ছি"—বলেই চলতে আরম্ভ করলো অপলা। তারপর এক সময়ে পৌঁছে গেলো সেই লাল বাড়ীটার সামনে। অপলার গলাটা শুকনো শুকনো মনে হতে লাগলো।

"এক গ্লাস জল পেলে ভালো হ'ত। জল এখন কোথায় পাবো? যাক্‌গে জল খেয়ে কাজ নেই।" বলে আপন মনে অপলা। বাড়ীটার সামনে বারাণ্ডার ওপর কয়েকটা বেতের চেয়ার আর একটা টেবিল বসানো আছে। তিন ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে বারাণ্ডায় উঠে দাঁড়ালো অপলা আর পর্দা ঢাকা দরজার ফাঁকে দেখার চেষ্টা করলো ভেতরে কেউ আছে কিনা। ওর জুতোর শব্দ শুনে একটা লোক বাইরে এলো। তাকে দেখে মনে হ'ল এ বাড়ীর হুকুম তামিল করার জন্যেই সে এ বাড়ীতে আছে।

—"বাবু বাড়ী আছেন কি?" প্রশ্ন করে অপলা।

—"হ্যাঁ আছেন, বসুন ডেকে দিচ্ছি।" বলে লোকটি বাড়ীর মধ্যে চলে যায়।

অপলা বসলো একটা চেয়ারে, কিন্তু ভয় ওকে ছাড়তে নারাজ। নানা রকম বিভীষিকা দেখতে লাগলো। "আচ্ছা! ভদ্রলোক প্রাক্তন জমিদার, নিশ্চয়ই খুব বদ মেজাজি? শুনেছি ভীষণ রাগি আর খামখেয়ালি। চেহারাটা নিশ্চয়ই খুব জাঁদরেল হবে? শিকারী বেড়ালের মত একজোড়া গোঁফ আছে। সব সময়ে চোখ রাঙিয়ে থেকে থেকে চোখের রং হয়ে গিয়েছে লাল, আর সবায়ের ওপর হুকুম চালিয়ে গলার আওয়াজটা হয়ে গেছে রুক্ষ এবং তীক্ষ্ণ। শুনেছি কারো কোন ত্রুটি সহ্য করতে পারেন না। আমি তো স্কুলের কিছুই জানি না। প্রশ্ন করলে যদি উত্তর না দিতে পারি তাহলে হয়ত দুচারটে অপমান-কর কড়া কথাও বলে ফেলতে পারেন। তখন আমি হয়ত দু-চারটে রুক্ষ কথা বলতে পারি। কারণ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি কিন্তু অসম্মান সহ্য করতে পারি না। তখন? তখন কি হবে?—কি আর হবে শিক্ষিকার পদচ্যুতি, আবার সেই বাবার ঘাড়ের বোঝা হয়ে ফিরে যাওয়া, তারপর আবার সেই অফিসে, স্কুলে দরখাস্ত লেখা আর উত্তরের আশায় পথ চেয়ে বসে থাকা।

"নমস্কার"—অপলার চিন্তার ছেদ পড়ে। খুব নরম

আর আস্তে গলায় অপলাকে সম্ভাষণ জানালো একটি তরুণ। প্রায় অপলারই সমবয়সী।

"নমস্কার!—অপলা উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করে; আর জানায়—আমি সেক্রেটারি মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"ও আচ্ছা!—বলুন আমিই সেক্রেটারি।"

"আপনি সেক্রেটারি" !!!···অপলার কণ্ঠ বিস্ময়ে রুদ্ধ হয়ে আসে।

"হ্যাঁ আমি সেক্রেটারি, কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না; মানে আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

"না—না আগে আপনার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি। আমি আপনার স্কুলে চাকরি করি।" অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বলে অপলা।

—আচ্ছা!—তাই নাকি? আপনি নিশ্চয় অল্প কিছু দিন এখানে এসেছেন?

—হ্যাঁ, চার মাস।

—ও:—তাই আপনাকে দেখিনি,—তখন আমার দিদির শিরিয়াস অসুখের খবর পেয়ে চলে যাই নাগপুরে আর বলে যাই হেডমিস্ট্রেসকে, একজন শিক্ষিকা নিয়োগ করতে। শুনেছিলাম আপনি এসেছেন, কিন্তু নানা কারণে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি; মাফ করবেন।

অপলা কি বলবে বুঝতে পারে না। সকলের কাছে সেক্রেটারির স্বভাবের বর্ণনা শুনেছিলো এবং সেই শুনে এর সম্বন্ধে ধারণা যা হয়েছিলো ঠিক তার বিপরীত দেখলো অপলা। সুন্দর! অদ্ভুত সুন্দর সামনের এই মূর্তিটি। এই প্রথম কি দেখলো এত সৌন্দর্য! না:—অপলা কলেজের সহ-পাঠীদের মধ্যে অনেক সুন্দর দেখেছে; কিন্তু কই এমন এক অদ্ভুত উপলব্ধি আসেনি তো ওর মনে? এযেন এক শান্ত জলের পাত্র, এর সামনে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যায় নিজের নিস্তঃরঙ্গ ছায়া। প্রগলভতা বিদায় নেয়।

গভীর ভালো লাগার আকর্ষণে এগিয়ে যাওয়ার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে ফেলে মন। ওর আস্তে আস্তে কথা বলার মধ্যে চঞ্চলতা নেই; নেই কোন চমক লাগার দ্যুতি। আছে শুধু সরলতা। ও যেন প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার নয়, পরম বৈষ্ণব কবি। বিরাট কপাল, হয়ত গভীর চিন্তায় ওর কপালের চুলগুলো গজাতে অবসর পায়নি। নাকটি তীক্ষ্ণ; নাকের তলায় সরু চাপা বাঁকা ঠোঁট, ছোট্ট গোল চিবুকের তলা দিয়ে আর একটি থাকের অল্প আভাষ, চিবুকের মাঝখানে ছোট্ট একটি টোল, যেন সৃষ্টি কর্তা তার নিজের সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে একটি আঙ্গুল দিয়ে আদর করেছিলেন, সেই আদরের দাগ বসে গেছে চিবুকের মাঝখানে। চোখগুলো বড় নয় কিন্তু শান্তনীল। সমুদ্রের নীল জলরাশি নয়, পটুয়ার মাটির পাত্রের নীল তুলি ডোবানো জল, যার মধ্যে ঢেউয়ের অশান্ত আহ্বান নেই শুধু আছে ছায়া বুকে ধরে অপেক্ষার ধৈর্য। আধুনিক সৌন্দর্যের সংজ্ঞা অস্থায়ী ও হাল্কা রজ্জু নয়, আধুনিক পুরুষের মত ছুটে চলার গতি নেই, আছে রাজপুত যুগের সৌন্দর্য আর সুরমুগ্ধ ধীর পুরুষত্ব।—

—বিদ্যুৎ! তুই যে নায়কের বর্ণনা দিলি তা কালি-দাসকেও মডার্ণ করে দিলি, আরে তোর ঐ নায়কের রূপের কথা শুনে 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান' বলে চেঁচাতে ইচ্ছা করছে। আরে ব্রাদার, ও সব এখন চলবে না। এখনকার যুগে নায়কের চেহারাটা হবে বাইবেল বর্ণিত শয়তানের মত।

—শয়তানের মত।······তুই কি বলছিস ইন্দ্র তা তুই নিজেই জানিস না।

জানি বন্ধু জানি! দেখ বিদ্যুৎ! একটু নতুন কিছু চিন্তা করতে শেখ। সেই পুরানের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যত নায়কের চেহারার বর্ণনা পড়লাম, সব ময়ূর ছাড়া কার্ত্তিক, নয়ত দেবদূতের মত, আর নায়কের মুখের বাণী যেন কোন স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার মত। আমরা নতুনের শিকা-রীরা ঠিক করেছি নায়কের ক্যারেক্টরটা পালটাতে হবে। তোর গল্পের নায়ককে করবি বাইবেলের শয়তানের মত। আর যা খাঁটি যা আমরা দিন রাত্রি দেখতে পাচ্ছি তাই তো লিখবি? তুই রোজ ট্রামে, বাসে, রাস্তায়, ঘাটে কাদের দেখতে পাস? অবশ্য সবাই যে আধুনিক নায়কের মত তা বলছিনা। তবে বেশীর ভাগ বাচ্চাদের মানে ভবিষ্যৎ পুরুষদের আমরা কি রূপে দেখতে পাই? ওদের চুলগুলো মাথার ওপর কাঁটার মত আঁটা ঠিক তোমাদের মাদুগগার অসুরের মত। মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ, মাথায়

তেল না দেওয়াতে মাথা সর্ব সময়ে নরকের চুল্লির মত গরম। কোটরে ঢোকা চোখগুলো জলতে থাকে সব সময়ে আর একটু কিছু মতের বিরুদ্ধে গেলেই মুঠো পাকিয়ে পাঁজর বের করা বেঁকে যাওয়া বুক চাপড়ে এগিয়ে যায় বন্ধু অথবা সহযাত্রী কিম্বা প্রতিবেশীর দিকে। অতএব তোর ঐ জড়ভরত মার্কা নায়ককে বাদ দে।'

—ইন্দ্র শোন! বাঁদরেরা মানুষের চেয়ে তাড়াতাড়ি চলা ফেরা করতে পারে, লাফাতে পারে কেন জানিস? বাঁদরেরা চিন্তা করতে পারে না তাই। তোর নায়কেরাও চিন্তা করতে শেখেনি, ওরা নতুন কিছু করার জন্যে ছুটে চলেছে শুধু, চিন্তা করার ধৈর্য হারিয়েছে, তাই নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়ে অসুন্দরের 'স্রষ্টা' শয়তানের দোসর হয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু আমি চাই ওরা আবার মানুষের মত চিন্তা করতে শিখুক, সুন্দরের রক্ষক হোক, ঈশ্বরের প্রতিনিধি হোক। যাক্ আমার গল্পের মাঝখানে আর বাধা দিসনি—আমাকে পড়তে দে।

সেক্রেটারির কথার উত্তর দিতে গিয়ে অপলা নতুন করে ফিরে পেলো যেন ষোড়শীর ব্রীড়ানম্র কম্রতা। রুমালে কয়েক বার মুখ মুছলে, যেন মেয়েলী লজ্জাটাকে ঘসে তুলে দিতে চাইলো। 'আপনি ডেকেছিলেন কেন আমি এখনো জানতে পারিনি' একটুখানি হেঁসে অপলা বললো।

—ও: হাঁ কাজের কথায় আসা যাক। দেখুন, আমার এক বন্ধুর আট, নয় বছরের মেয়ে আছে, মেয়েটির মা কিছু দিন আগে মারা গেছেন। মেয়েটির জন্যে বন্ধুটি ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়েছে। ও বদলি হয়ে চলে যাচ্ছে দিল্লীতে মেয়েটিকে রাখার মত কোন আত্মীয় নেই। আমি ভাবছিলাম আপনাদের হষ্টেলে ওকে রাখা যায় কি না। যদিও ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা নেই, আপনারা যদি একটু কষ্ট করে ওকে রাখেন, বড় উপকার হয়।

—দেখুন, এসব ব্যাপারে হেডমিষ্ট্রেস ঠিক বলতে পারেন। আমি তো সামান্য শিক্ষিকা, তবে একটি মা-হারা মেয়েকে রাখতে আপত্তি করার কিছুই নেই, আর স্কুল তো আপনার, আপনি যদি বলেন তবে আপত্তি কেন করবেন হেডমিষ্ট্রেস।"

—"না মিস···মিস···"

—গাঙ্গুলী, অপলা গাঙ্গুলী। ও নিজের নামটা বললো।

"—ধন্যবাদ, দেখুন মিস গাঙ্গুলী, জোর করে কারো ওপরে বোঝা চাপাতে চাই না।"

—আপনি আমাদের এত ছোট ভাবলেন কেন? একটি মা-হারা ছোট মেয়েকে বোঝা ভাববো কেন? তা ছাড়া তার দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি না, আপনার স্কুল নিচ্ছে। দেখাশোনার ভারটুকুই আমরা নেব।

—না না! আপনাদের ছোট ভাববো কেন? আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম, আপনাদের অসুবিধে হবে কিনা।

—না কিছু অসুবিধে হবে না, আপনি নিয়ে আসতে পারেন ওকে।

"—ধন্যবাদ মিস গাঙ্গুলী, আমি কালকেই কোলকাতায় গিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে আসবো।"

—আচ্ছা নমস্কার, যাচ্ছি।

—নমস্কার। মৃদু হেসে প্রতি নমস্কার জানালো সেক্রেটারি।

ইস্! শেষকালে, নায়ক, নায়িকাকে একটি মানুষের বেবীকে পালন করতে দিলো? হাউ ফানি! ওরে বিদ্যুৎ! তুই জানিস না, আজকাল নায়িকারা আর মানুষের বেবীকে কোলে নেয় না।

—তবে কিসের বেবী কোলে নেয়?

—কুকুরের—স্রেফ কুকুরের বেবীদের কোলে নেওয়া হচ্ছে মডার্ণ ফ্যাসান। আর সেই কুকুর যাতা বংশের কুকুর নয়। হয়ত তার মা হচ্ছেন খাস ইউকের অধিবাসিনী, আর বাবা হচ্ছেন সুইজারল্যাণ্ড থেকে আগত। রীতিমত রাজবংশীয় পুরুষদের মত তাদেরও বংশানুক্রমিক তালিকা আছে।

—ইন্দ্র, তুই ভুল করছিস, আমি তোর মেমসাহেব নায়িকাকে ভারতীয় শাড়ী পরিয়ে ভারতীয় মহিলা বানাচ্ছি না। আমি পুরোপুরি ভারতীয় মহিলাকেই নায়িকার রূপ দিচ্ছি। আর যে দেশে ফুটপাতে মানুষের বাচ্চারা মরে, সেদেশে কুকুরের বাচ্চা নিয়ে ফ্যাসান্ দেখানোটা সত্যিই হাসির ব্যাপার। যাক নে শোন্!

তারপর অপলার সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে প্রদ্যুম্নের মানে সেক্রেটারির—গিরিকার খবর নেওয়ার অজুহাতে।

গিরিকা ওর বন্ধুর সেই মেয়েটি। খবর নেওয়ার সূত্রে, ওদের আলাপ হয়েছে। একটি একটি করে ছয়টি ঋতু পার হয়েছে ওদের ঐ আলাপের অবসরে। আলাপের বিষয় পালটেছে কবে থেকে, তা ওরা জানে না। প্রদ্যুম্ন আসে গিরিকার খোঁজ নিতে, কিন্তু আসার পর অনেক মুহূর্ত কেটে যায় গিরিকার নাম ছাড়াই। গরমের ছুটিতে অপলা কলকাতায় চলে এলো। প্রদ্যুম্নের কাজ পড়লো কলকাতায়। অপলার আসার কয়েকদিন পরেই বিকেলেই পড়ন্ত রৌদ্রে লম্বা ছায়া ফেলে প্রদ্যুম্ন এসে দাঁড়ালো অপলাদের বারাণ্ডায়। অবাক হয় অপলা, আনন্দিত হয় অপলার মা, মা স্বপ্ন দেখে অচিন দেশের রাজপুত্র এলো অন্ধকারের দেশে। কিন্তু ভয় পায় অপলার বাবা।

প্রদ্যুম্ন অভ্যর্থনা পেলে তার প্রাপ্য অনুযায়ী। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো অপলা—প্রদ্যুম্নের সঙ্গে বাস ষ্ট্যাণ্ডে, ওরা একসঙ্গে পা ফেললো, সাতপায়েরও বেশী ছিলো ওদের রাস্তাটা, তাই হয়ত ওদের মত আশ্রয় নিলো আশা, এমনি করে ওরা চলবে জীবনের শেষ রাস্তা পর্যন্ত একসঙ্গে। তারপর একটি মাস ধরে ওরা ঘুরলো ইডেন গার্ডেনে, আউটরাম ঘাট, জু গার্ডেন, ময়দানে। ওরা অনেক স্বপ্ন রচনা করলো অনেক শপথে বাঁধলো একে অন্যকে। ছুটি ফুরোল আবার ওরা ফিরে এলো গ্রামে। আবার প্রদ্যুম্ন এলো অপলার হষ্টেলে গিরিকার খবর নেওয়ার অজুহাতে। গ্রামের লোকের কৌতূহলের সীমা নেই। বিদ্রূপের শিকার হলো ওরা গ্রামের অলস শিকারীদের। কিন্তু ওদের মুখে কোন অপমানের ছায়া দেখতে পেলো না কেউ। ওরা যেন অদৃশ্য এক লৌহ আবরণের বাসিন্দা। ওদের চোখ শুধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, ওরা স্বপ্ন দেখছে—ভালোবাসার স্বপ্ন।

শরতের রবিবারের সকালে বসে আছে অপলা ঘরের সামনে বারাণ্ডায়, প্রদ্যুম্ন এসে দাঁড়ালো ওর পাশে, নিঃশব্দে। অপলা শুনতে পায়নি প্রদ্যুম্নের আসার শব্দ। অপলা তাকিয়ে ছিলো আকাশের দিকে। ও কিছুই দেখছিলো না, কিছুই চিন্তা করছিলো না,—শুধু তাকিয়ে ছিলো। মনে হয় ও স্বপ্ন দেখছে সুখের স্বপ্ন। অথবা ও দেখছিলো, নিঃসঙ্গ আকাশে হাল্কা মেঘেরা এসে কেমন নানা আকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি বিরাট মেঘ ভালুকের মত চেহারা নিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে আর একটি নারী মূর্তিধারী মেঘের দিকে। কিন্তু ঐ পথটুকু আসতে আসতে ভালুক মেঘ তার চেহারা পালটে ফেললো। ভালুক মেঘকে এখন দেখতে হয়েছে, একটি বিরাট বীর পুরুষ।

'অপলা!' আস্তে আস্তে ডাকলো প্রদ্যুম্ন। চমকে উঠে তাকালো অপলা। প্রদ্যুম্নের গলার স্বরে, চোখের চাহনিতে যে কি ছিলো তা অপলা বুঝতে পারছে না, তবুও এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে ফেলে ওর মন। ও আবার অনুভব করে অষ্টাদশীর উচ্ছল কম্পন। অপলা মুখ নীচু করে দাঁড়ালো।

—অপলা, মা আসছেন কাশী থেকে।

—কেন? উনি তো ওখানেই থাকবেন শুনেছিলাম।

—হ্যাঁ আমিও তো তাই জানতাম, কিন্তু সরকারমশাই ওখানে যাওয়ার কয়েকদিন বাদে চিঠি এসেছে,—মা আসছেন, সঙ্গে দিদিও আসছেন।

প্রদ্যুম্ন! আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, বহুদিন তোমার কাছে মায়ের গল্প শুনেছি। তোমার মায়ের জন্যে সঞ্চিত আছে আমার অজস্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। অপলা উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ।

—কিন্তু অপলা! আমায় ভয় করছে। কি জানি মা তোমাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবেন।

—ইস কি ভীতু তুমি প্রদ্যুম্ন! তোমার কিছু ভয় নেই প্রদ্যুম্ন, আমি ঠিক মাকে আপন করে নেব। হাসতে হাসতে বলে অপলা।

—কিন্তু আমি এত সহজ করে নিতে পারছি না। সরকারমশাই নিশ্চয় অনেক কিছু বলেছে মাকে। জানি না কি হবে। অপলা দেখলো প্রদ্যুম্নের মুখে সত্যিই যেন এক অসহায় শিশুমুখের ছায়া পড়েছে। অপলা অবাক হলেও ভয় পায় না। ভাবে এটা ওর ক্ষণিকের দুর্বলতা। যদি ওর মা আপত্তি করেন ওদের মিলনে, তাহলে প্রদ্যুম্ন নিশ্চয় সে আপত্তি মেনে নেবে না। দৃঢ়ভাবে অগ্রাহ্য করে, অপলাকে গ্রহণ করবে, প্রদ্যুম্ন সেইভাবেই আশ্বাস দিয়েছিলো অপলাকে। যাক, কিছু হাড়া ছাড়া কথা বলে প্রদ্যুম্ন চলে যায়। আর অপলা ভাবতে থাকে কেমন করে অভ্যর্থনা জানাবে প্রদ্যুম্নের মাকে।

পরদিন সকালে অপলা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিলো।

হেডমিষ্ট্রেসের কাছে ছুটি চাইলো লাজুক স্বরে। হেড-মিষ্ট্রেস বাঁকা হেসে তির্যক ভঙ্গিতে তাকিয়ে বিদ্রূপ করে বললেন,—কেন? ছুটির কি দরকার? ওহো বুঝতে পেরেছি, ভাবী শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে বুঝি? তা যাও দেখে এসো কি দিয়ে তোমায় বরণ করেন তিনি।" অপলা বুঝতে পারে ঈর্ষার আগুন বেরুচ্ছে হেডমিষ্ট্রেসের মুখ দিয়ে। কিছু না বলে, আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ে প্রদ্যুম্নের বাড়ীর দিকে।

অত্যন্ত শঙ্কিত পদক্ষেপে অপলা ওদের বাড়ীতে ঢুকলো। ভেবেছিলো প্রদ্যুম্ন দাঁড়িয়ে থাকবে ওর জন্যে, আর এক-সঙ্গে গিয়ে মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। কিন্তু প্রদ্যুম্নকে দেখতে পেলো না। মনে পড়ে যায় কালকের দেখা অসহায় ভীত ত্রস্ত, শিশুমুখ প্রদ্যুম্নের। আশঙ্কায় পরিপূর্ণ মন নিয়ে অপলা দাঁড়ালো ওদের অন্দর মহলে। দেখলো বারাণ্ডায় বসে আছেন বিপুলা এক ভদ্রমহিলা। অপলা অনুমান করলো, ইনিই নিশ্চয় প্রদ্যুম্নের মা, অপলা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলো।

—কে তুমি? ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো ভদ্রমহিলা।

—আমাকে চিনতে পারবেন না, আমার নাম অপলা। অল্প হেসে বলে অপলা।

—অ—! তুমিই সেই মাষ্টারনি? যে আমার ছেলের মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছে। বলি হ্যাঁ বাছা, পেটের দায়ে চাকরি করতে পথে বেরিয়েছ, তার কিছু বলার নেই; কিন্তু আমার ছেলের ওপর আবার দৃষ্টি পড়লো কেন? আমার ছেলের এই লাখ টাকার সম্পত্তি দেখে? চেহারাখানা অমন ভালো মানুষের মত করে রেখে; আমার শিবতুল্য ছেলের চোখকে ধুলো দিতে পারো বটে, কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। আমার ছেলেমানুষ ছেলেকে মেরে, তার মাথাটা চিবিয়ে খাওয়ার লোভ সামলাতে পারো নি,—না? ডাইনী কোথাকার! ভদ্রমহিলা অপলাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই তারস্বরে একলাই চীৎকার করতে লাগলো। অপলার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো। তীরবিদ্ধ হরিণীর মত যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো, প্রদ্যুম্নের দেখা পাওয়ার আশায়। কিন্তু কোথায় প্রদ্যুম্ন! তার বদলে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো একটি বিবাহিতা তরুণী। 'কে! মা? কার সঙ্গে কথা বলছো? ও! এই সেই বিদ্যেধরী পরী? তা ভাই তোমাকে বিদ্যেধরী বলা যেতে পারে। তোমার পেটে পেটে এত বিদ্যে? দেখছ, আমার ভাইয়ের মাথার ওপর কেউ নেই আর ভাইটিও সরল মানুষ, ওকে একটু মিষ্টি হেসে রাজভোগ খাওয়ালেই ভুলে যাবে, আর উনি এখানে রাজত্ব করবেন দশহাতে। আমাদের সব কিছু গ্রাস করবেন। আচ্ছা, তোমার কি ডাকিনী-যোগিনী মন্ত্র জানা আছে নাকি? থাকে তো আমায় একটু শিখিয়ে দাও না, চেষ্টা করে দেখি, তোমার মত কারো ঘাড় মটকাতে পারি কিনা?'

লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে অপলা দাঁড়াতে পারছে না। মুখ তুলে তাকাতে পারছে না কারো দিকে, তবুও ও বুঝতে পারছে, পাড়ার লোক, ঝি, চাকরেরা সব হাসাহাসি করছে, ওরা যেন অপলার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে আর বলছে ঐ দেখ লোভী চোর একটি মেয়ে।

এত অপমানের কোন প্রতিবাদ না করে অপলা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে ওদের বাড়ী থেকে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে শেষবারের মত তাকালো বাড়ীটার দিকে, আর ঠিক তখনি চোখে পড়লো প্রদ্যুম্ন দাঁড়িয়ে আছে দোতলার বারাণ্ডায়। অপলার দেহের সমস্ত কম্পন, সমস্ত যন্ত্রণা স্তব্ধ হয়ে গেলো। মনে হল যেন অপলার দেহটা রক্তমাংসের নয়; পাথরের—পাথর দিয়ে তৈরী ওর দেহ। ঠিক এই মুহূর্তে অপলা যে যন্ত্রণা পাচ্ছে তা ওর মায়ের বোনের দেওয়া যন্ত্রণা থেকে সহস্রগুণ বেশী। 'প্রদ্যুম্ন, তুমি মানুষ নও, তুমি ওয়ার্ম, তুমি পুরুষ নও কাপুরুষ।' পাথরের মত শক্ত ঠোঁট দিয়ে ফিসফিস করে বললো, তারপর আবার চলতে আরম্ভ করলো, চলা নয়, ছুটতে আরম্ভ করলো আর সেই ছুটে এসে থামল ষ্টেশনে। তারপর চলে এলো কোলকাতায় এক কাপড়ে। মা, বাবা অনেক প্রশ্ন করলো, কিন্তু কি উত্তর দেবে অপলা? উত্তর দেওয়ার মত কিছুই নেই তাই শুধু চুপ করে থাকলো।

পরদিন প্রদ্যুম্ন এলো আমাদের বাড়ী, আশায় চঞ্চল হলো অপলার মন, "ওকি এলো আমার কাছে সকলকে

ছেড়ে? সংযত পায়ে এসে দাঁড়ালো প্রদ্যুম্নের সামনে অপলা।

—অপলা, তুমি আমায় ক্ষমা করো—বলে প্রদ্যুম্ন অপরাধী কণ্ঠে।

—তুমি যদি নিজেকে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য মনে করো, তবে ক্ষমা কোরলাম। কিন্তু আবার কেন এখানে এলে প্রদ্যুম্ন? আমি তো কোন অভিযোগ করিনি? তোমাদের দেয়া অপমানের প্রতিবাদও করিনি। সব নীরবে মেনে নিয়ে চলে এসেছি। তবে কেন আবার আমার এখানে এলে?

—আমায় ভুল বুঝোনা অপলা,—আমার কিছু বলার আছে, তোমার কি সময় হবে আমার কথা শোনার?

—বলো। ধীর কণ্ঠে জানতে চায় অপলা।

—এখানে বলা সম্ভব নয়। চলো অপলা গঙ্গার পাড়ে বসে সব কথা শুনবে।

—বেশ চলো।

সন্ধ্যার সময়ে ওরা এসে বসলো গঙ্গার পাড়ে।

—প্রদ্যুম্ন! বলো তোমার কি বলার আছে?

—অপলা! আমার কিছু করার ছিলো, তোমার অপমানের প্রতিবাদে—

হ্যাঁ, ছিলো, কিন্তু তুমি কিছুই করোনি এবং একবার তোমার মায়ের সামনে এসে বলোনি "মা তুমি অন্যায় ভাবে ওকে অপমান করেছো, ও কোন অপরাধ করেনি, তোমার অধিকার নেই ওকে অমন করে অপমান করার।" তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে তোমার মায়ের সামনে থেকে। আমার মনে হচ্ছে, তোমার ঐ ধীর, শান্ত, গম্ভীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ সুন্দর চেহারা, যা দেখে আমি আমার সব সত্ত্বাকে বিকিয়ে দিয়েছিলাম, তা ঈশ্বর অপাত্রে দান করেছেন। শুধু মাত্র চেহারাটার মধ্যেই দিয়েছেন ব্যক্তিত্বের ছাপ মনের মধ্যে দেননি এতটুকু ব্যক্তিত্ব। কিন্তু থাক প্রদ্যুম্ন, আমি আর তোমার কাছে কোন অভিযোগ জানাতে চাই না। তুমি আমায় মুক্তি দাও।

—অপলা, তোমার অপমান আমাকেও রক্তাক্ত করেছে, কিন্তু মায়ের মুখের ওপর প্রতিবাদ করার ক্ষমতা আমার নেই, ওখানে আমি অসহায়। আর আমি প্রতিবাদ করলে তোমাকে আরও বেশী অপমানিত হতে হতো, তাই আমি চলে গিয়েছিলাম—

আমি বুঝতে পেরেছি প্রদ্যুম্ন তুমি একটি পুরুষের দেহধারী শিশু। হয়ত তাই প্রথম দিন, যেদিন তোমায় দেখেছিলাম সেই দিন ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি তুমি মেরুদণ্ডহীন শিশু, তোমাকে ভালোবালা যায়, তোমার কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়াও যায়, কিন্তু তোমার কাছ থেকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মত পুরুষত্বের আশা করা ভুল। তোমার কাছে আশ্রয় চাওয়াও ভুল,—ভুল করেছি আমি প্রদ্যুম্ন, তাই তো পেলাম তার শাস্তি। তোমার দোষ নয়, আমি আমার ভুলের মাশুল দিয়েছি। কিন্তু আবার আমায় ডাকলে কেন? তোমার অক্ষমতার কথা জানাতে?

—না—আমি কি করবো তাই জানতে চাই তোমার কাছে।

—আমার কাছে? কিন্তু আমি তো তোমার কেউ নই। জন্মসূত্রে না, ধর্মসূত্রেও নয়। আমি তোমায় কি বলতে পারি? আর বললেও তুমি শুনবে কি? তার চেয়ে তুমিই বল, কি করতে চাও।

—অপলা, তুমি ফিরে চলো আমাদের স্কুলে, যেমন ভাবে আমরা ছিলাম তেমনি ভাবেই থাকবো।

"—আর তোমার মা, দিদিরা আমায় বলবেন, পেটের দায়ে চাকরি করছি এবং তাঁর লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাঁর নাবালক পুত্রের মাথায় হাত বুলিয়ে নেবার চেষ্টা করছি।"

"—অপলা তুমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছ, তাই আমার অবস্থাটা চিন্তা করতে পারছো না।"

—পারছি প্রদ্যুম্ন, পারছি, তাই তো বলছি, আর তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো না, আমার এখানে আর এসো না।

প্রদ্যুম্ন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অপরাধীর মত। অপলা বুঝতে পারে ওর যন্ত্রণা, তবুও কঠোর হয়ে ওকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। "প্রদ্যুম্ন চলে যাও, আমায় একটু একলা থাকতে দাও।"

—না—না! অপলা তুমি আমায় এমন করে তাড়িয়ে দিওনা, তুমি ফিরে চলো আমাদের স্কুলে।

—বেশ যাবো কিন্তু পারবে আমায় সমাজের কাছে স্বীকৃতি দিতে? পারবে ওদের কাছ থেকে চলে এসে আমায় গ্রহণ করতে?

তা কেমন করে হবে অপলা ? মায়ের কাছে ঋণী আমি, কেমন করে তাঁকে ফেলে আসবো ? অপলা জানে, ও পারবেনা অপলাকে গ্রহণ করতে। সহপাঠীদের থেকে ওকে স্বতন্ত্র লেগেছিলো হয়ত এই ধর্মভীরু স্বভাবের জন্যে, যা আজকালকার পুরুষদের থাকে না। ও সত্যিই এখনো পড়ে আছে রাজপুত যুগে। যে যুগে মাতৃ আজ্ঞাই ছিলো শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা। এ যুগের অপলা কেমন করে আশা করবে, তার মূল্যই সব থেকে বেশী দেবে প্রদ্যুম্ন।

অপলার কথা বলার মত ইচ্ছাও ছিলোনা শক্তিও ছিলোনা। প্রদ্যুম্নর কথা বলার সাহসও ছিলো না। নিঝুম নিঃশব্দে কেটে গেলো অনেক মুহূর্ত। ওদের মনে হল অনন্তকাল ধরে পৃথিবী যেন যন্ত্রণায় নিঝুম হয়ে আছে, অনন্তকাল ধরে থাকবে।

—অপলা উঠে এসো—ডাকলো প্রদ্যুম্ন।

—তুমি বাড়ী যেতে পারো প্রদ্যুম্ন, আমি পরে যাবো।

—কিন্তু এই অন্ধকার রাতে এরকম নির্জন জায়গায় তোমাকে একলা রেখে যেতে পারি না।

—দোহাই তোমার, অনেক উপকার করেছো আর নাই বা চিন্তা করলে আমার জন্যে। এবার আমায় মুক্তি দাও।

তবুও দাঁড়িয়ে থাকে প্রদ্যুম্ন। অপলা আর নিজেকে সংযত করে রাখতে পারে না। চীৎকার করে বলে—প্রদ্যুম্ন! শুনতে পারছো ? তুমি যদি না যাও তবে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দেব। প্রদ্যুম্ন ভয় পায়, ওর মুখে ছায়া পড়ে একটি অসহায় শিশুমুখের। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেলো। অপলা ভাবে এখন কি করবে! প্রদ্যুম্ন শিশু ওর ওপর নির্ভর করা যায় না। অপমানের জ্বালা জুড়াতে ওকি গঙ্গার জলে তলিয়ে যাবে ? না, তাও সম্ভব নয়, অপলার ওপর নির্ভর করে বসে আছে ওর মা, বাবা, ওর কোথাও নির্ভর করার জায়গা না থাকুক, অপলাকে নির্ভর করার মত অনেক ভার আছে। ও ভাবতে থাকে আবার সেই বিজ্ঞাপন দেখা, দরখাস্ত লেখা, অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়ানো, আর উত্তরের আশায় বসে থাকা···

—কেমন হ'ল ইন্দ্র ?

—জানি না। তোদের এই ছিচকাঁদুনে গল্পের আমি কিছু বুঝি না। তবে তোর অপলার জন্যে আমার বুকের মধ্যে কিসের যেন এক জ্বালা, অনুভব করছি। নাঃ—ভয় হচ্ছে আমার বুকের মধ্যে আবার হৃদয়টা মানে যেটাকে বহু কষ্টে বাদ দিয়েছিলাম সেই বাদ-দেওয়া হৃদয়টা না আবার গজিয়ে ওঠে।

—ইন্দ্র তুই ভুল করছিস! হৃদয়টা বাদ দেওয়া যায় না, তোর অহমিকা তোর হৃদয়টাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। আমি যদি হৃদয় জাগানোর কথা তেমন করে বলতে পারতাম তাহলে হয়ত তোদের ঘুমন্ত হৃদয়টাকে জাগাতে পারতাম। অপেক্ষায় আছি কবে আসবে সেই কথাকার যার কথায় জেগে উঠবে তোদের ঘুমন্ত হৃদয়।

অস্তিত্ব

শ্রীশ্যামলকুমার বিশ্বাস

তীব্রভাবে অনুভব করতে পারিনি
স্পষ্ট করে বচন ভঙ্গীর ভুলে
নিঃশব্দে ক্লান্ত পতঙ্গের মতো
সমস্ত সমস্তই উঠেছে দুলে।
যে গান হয়নি গাওয়া আমার
সুরে, থামকা মিছিমিছি আর কেন ?
সভ্যতার চেতনায় আত্মমগ্ন শিল্পী
বর্তমান বেকার সমস্যা যেন।

ও জীবনে প্রচণ্ড তৃপ্তি এনে দেয়
আমি—আমি কেবল একটু পূর্ণ বিন্দু চাই
উত্থান কিংবা পতন, বাঁচা নয় মরা
বিদ্রোহী হয়ে আমি সেই গান গাই।
প্রসন্ন সকালে যদি সেই সুখী মনটা
কপোত-কপোতী হৃদয়ের বাঁচার ছন্দ
আমি ক্লান্ত, স্বেদসিক্ত, হীনমনা
ভেসে আসে অনির্বাণ জলন্ত চিতার গন্ধ।

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উপভাষাগুলো সবই ভাষাগোষ্ঠীগুলির অন্তর্গত ভাষা-সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রত্যেক ভাষার পরিচয় আর অবস্থানক্ষেত্র উল্লেখের পর আলাদা ক'রে উপভাষাগুলোর নাম করার তত প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর সজীব ভাষা-সমূহের মোট সংখ্যা নির্ধারণের জন্যে ভাষাগুলি গণনার পর আর উপভাষাগুলো গণনা করার দরকার হয় না। যে সব ভাষায় এক হাজার, দশ হাজার বা এক দেড় লক্ষ মাত্র লোক কথা বলে, তাদেরও তেমন গুরুত্ব নেই। বিখ্যাত ফরাসি মনীষী জাঁ জাক্ রুসোর মতে, যে-সব ভাষার লৈখিকরূপ নেই, সে-সব ভাষার কোন গুরুত্ব নেই, আমরা অতটা বলবো না। তবে যে-সব ভাষা খুব কম লোকে ব্যবহার করে, সে-সব ভাষার ভিত্তিতে আধুনিক জগতের উপযোগী বিপুল ব্যয়সাধ্য রাষ্ট্রগঠন করা একরকম অসম্ভব। খুব কম লোকের দ্বারা ব্যবহৃত ভাষায় সচরাচর ভালো সাহিত্যও দেখা যায় না।

কিন্তু যদি দেখা যায় যে, বিশেষ ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ সমষ্টি একত্র হয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে, তাহলে অভিনব ও ব্যতিক্রমাত্মক পরিস্থিতিতে এক-দেড় লাখ লোকের এলাকাও আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে, যেখানে উৎকৃষ্ট সভ্যতার স্বতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর। বিশেষ ক'রে দ্বীপ এলাকায় এমন হওয়া স্বাভাবিক।

প্রাচীন কালে ক্ষুদ্র ক্রেতে বা ক্রিট দ্বীপে মুকেনাই সভ্যতার বিকাশ অতি অল্প লোকের দ্বারাই হয়েছিল। বর্তমান কালে আইসল্যাণ্ড দ্বীপের মাত্র দেড় লক্ষ লোকের ভাষায় উন্নত ধরণের সাহিত্য রচিত হয়েছে। অল্প সংখ্যক লোকের ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যের এমন বিকাশ কদাচিৎ দেখা যায়। আমরা সেই সব ভাষার নাম উল্লেখ করবো।

কিন্তু যে-সব ভাষায় মুষ্টিমেয় লোক কাজ চালায় এবং তেমন কোন সাহিত্য গ'ড়ে ওঠেনি, যাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের কোন আন্দোলন নেই, যারা সংখ্যায় বেশি লোকের ভাষা হলেও অত্যন্ত অবনত ও সব রকম গৌরব-বর্জিত, তাদের নিয়ে আলোচনার তেমন দরকার নেই। ঐ সব ভাষাভাষী জনসমষ্টি সংলগ্ন কোন বৃহৎ ভাষাভাষী জনসমষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে বাধ্য এবং সে-সংশ্লেষ যে পরপদানত অবস্থা, তা বলাই বেশি।

উপভাষাগুলি আর অতি ক্ষুদ্র ভাষাগুলি গণনার আওতায় উপরি উক্ত কারণে না আনলে পৃথিবীর জীবন্ত ও কোন-না-কোন ভাবে শক্তিশালী ভাষাগুলির সংখ্যা মোট দুশোর বেশি হবে না। অর্থাৎ পৃথিবীকে যদি ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহে বিভক্ত করা যায়, তা হলে দুশো-র কম রাষ্ট্র হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা ভাবতে হবে। আজ যে-সব ভাষা মুষ্টিমেয় লোকের ভাষা, কাল সে-সবই বহুজনের ভাষায় পরিণত হতে পারে। আজ যে-ভাষা অবনত, কাল সে-ভাষা সমুন্নত হতে পারে। আবার, আজ যে-ভাষা জীবিত ও শক্তিশালী, কাল সে-ভাষার নাভিশ্বাস উঠতে পারে। সুতরাং আমাদের আলোচনা একান্ত ভাবে বর্তমান কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অতীত ও ভবিষ্যৎ, বিশ্বভাষা-পরিক্রমায় দুই-ই আপাতত বর্জন করা হ'ল।

অন্তত এক মিলিঅন বা দশ লক্ষ লোক কথা বলে, এমন ভাষার ভিত্তিতে সহজেই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে যদি অন্তত দু হাজার বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে হয় সেই ভাষার বিস্তার। স্তালিনের নীতি নির্দেশ নাকি এই রকম ছিল এবং এটাকে একটা সাধারণ মাপকাঠি ব'লে মেনে নিয়ে হিসেব করা চলতে পারে।

বর্তমান পৃথিবীতে এখনই এমন অনেক রাষ্ট্র আছে

যাদের লোকসংখ্যা যৎসামান্য এবং আয়তনও স্বল্পপরিসর। তাদের স্বাধীনতা আজ অক্ষুণ্ণ এবং নিরাপদ। পক্ষান্তরে বৃহৎকায় ভারতের সীমান্ত মোটেই অনাক্রান্ত অনতিক্রান্ত ও নির্বিঘ্ন বলা যায় না।

অন্তত এক মিলিঅন লোক কথা বলে, বিশ্বে এমন ভাষার সংখ্যা ১৩৭। এদের মধ্যে ৫ মিলিঅন পর্যন্ত লোক কথা বলে, এমন ভাষার সংখ্যা ৬৪। বাকি ৭৩টি ভাষায় ৫ মিলিঅনেরও বেশি লোক কথা বলে। ১০০ মিলিঅন বা তার বেশি লোক কথা বলে ৬টি ভাষায়।

এ-কথা মনে রাখা চাই যে, পৃথিবীতে এখন ছোটো বড় মিলে যে-সব ভাষা প্রচলিত আছে, তাদের মোট সংখ্যা প্রায় দু হাজার হলেও লোক সংখ্যা, সাহিত্যিক মূল্য এবং মানবীয় চিন্তাধারার প্রকাশ-ক্ষমতার দিক থেকে ঐ সব ভাষার পারস্পরিক প্রভেদ আকাশ-পাতাল। কোন কোন ভাষায় মাত্র জৈব প্রয়োজনগুলো চরিতার্থ করা যায়, উচ্চ ভাব ও চিন্তারাশি ব্যক্ত বা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

অধুনা প্রচলিত সমস্ত ভাষাকে শ্রেণীবিভাগের দ্বারা কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করলে দেখা যাবে, একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সব ভাষার অবস্থাও পরস্পরের সঙ্গে সমান বা তুল্য মূল্য নয়। একই গোষ্ঠীর কোন ভাষায় হয় তো প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য আছে এবং পাঁচ-সাত কোটি লোক সেই ভাষায় কথা বলে। অন্য আর এক ভাষায় হয় তো সাহিত্যের বালাই নেই এবং মাত্র এক-দেড় লাখ লোক তাতে কথা বলে। আমরা আগে যে নীতির কথা বলেছি তা অনুসরণ ক'রে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে কেবল উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠীগুলি নিয়ে আলোচনা করবো এবং আলোচ্য গোষ্ঠী-গুলির অন্তর্ভুক্ত গ্রহণযোগ্য ভাষাগুলির কথা সবিস্তারে বলা হবে গৌণ ভাষাদের বড় জোর নাম উল্লেখ ক'রে।

কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিকের মতে উপযুক্ত নিদর্শনের অভাবে জাপ, কোরীয় আর বাস্ক্ ভাষাকে নাকি কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি। অবশ্য বাস্ক্‌ভাষী লোকদের সংখ্যা ও সাহিত্যিক নিদর্শন যৎসামান্য। কিন্তু জাপানিরা না সংখ্যায় কম, না তাদের সাহিত্যিক নিদর্শনের অভাব। কোরীয় ভাষার কথাও উপেক্ষণীয় নয়। সুতরাং উপযুক্ত নিদর্শনের অভাবে জাপ ও কোরীয় ভাষা দুটিকে গোষ্ঠীবদ্ধ করা যায় নি, এ-কথা প্রমাণসহ নয়। এমন অবস্থায় বরং জাপ, কোরীয় এবং বাস্ক্ ভাষাগুলির প্রত্যেকটিকে এক একটি আলাদা জাতি ব'লে ধরা সঙ্গত। উত্তর কাশ্মীরের হুন্জা অঞ্চলের অজ্ঞাতকুলশীল বুরুশাস্কি বা খাজুনা ভাষাসম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

ছোট ছোট ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠীগুলির কথা প্রথমে সংক্ষেপে সেরে নেওয়া যেতে পারে। তারপর বৃহৎ ভাষা-গোষ্ঠীগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাবে।

গৌণ বা অপ্রধান ভাষাগুলি নিয়ে এই রকম একটা শ্রেণীবিভাগ বা গোষ্ঠীবন্ধন করা যেতে পারে :—

(১) এস্কিমো (২) উত্তরপূর্ব সীমান্ত (৩) হট্টেনটট্ (৪) বুশম্যান (৫) হামীয় (৬) আমেরিকার আদিম ভাষাগোষ্ঠী-সমূহ (৭) অস্ট্রেলিয়ার আদিম ভাষাসমূহ (৮) বাস্ক্ ভাষা (৯) বুরুশাস্কি ভাষা।

এদের নিয়ে আমরা খুব সংক্ষেপে একটু আলোচনা ক'রে নিচ্ছি মুখ্যতঃ কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে। কোন দিক দিয়ে এই সব ভাষার বিশেষ গুরুত্ব নেই। অধিকাংশই সুনিশ্চিত অবলুপ্তির পথে।

আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় একদা বহু আদিম ভাষার প্রচলন ছিল—এখনও কিছু কিছু আছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ নৃমুণ্ডশিকারী তথা পাশ্চাত্য বর্বরদের উৎপাতে তারা উৎসন্নপ্রায়। ভাবলেও আফশোস হয় যে, আস্তেক, মায়া ও ইন্‌কা সভ্যতার সাহিত্যিক নিদর্শনগুলিও স্পেনীয় ধর্মোন্মাদ রোমান ক্যাথলিক বর্বরদের দ্বারা ধ্বংস হয়েছে। ঐসব ভাষার কোন কোনটি হয়তো তাদের সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গের মতো খুব সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ আর জোর ক'রে বলার মত কিছু উপকরণ, কোন উপায় নেই।

(১) এস্কিমো ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থান উত্তর মেরুর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে, গ্রিনল্যাণ্ডে, আলেউসিআন দ্বীপ-পুঞ্জে আর আইসল্যাণ্ডে। এইসব ভাষায় যারা কথা বলে, সেই এস্কিমোরা মানসিকতায় স্বভাবতই পশ্চাদ্বর্তী। তাদের জীবনও ঠিক আধুনিক সভ্যজগতের উপযোগী নয়। সুতরাং তাদের ভাষা ও সাহিত্য আমাদের কাছে মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। ডেনমার্ক রাষ্ট্র ঐ নরগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্যে খানিকটা চেষ্টা করে বটে, কিন্তু অমন শীতার্ত মরুভূমিতে কি বা সম্ভবপর!

(২) উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থান সাইবেরিয়ার কামচাত্‌কা অঞ্চলে। সাইবেরিয়া বা এশিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এই সব ভাষায় যারা কথা বলে তারা সংখ্যায় খুব কম। চুকচি এই গোষ্ঠীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য ভাষা। এস্কিমোদের মতো এরাও অনুন্নত। সোভিএট রুশরা এদের জন্যে রুশ প্রজাতন্ত্রের মধ্যেই "জাতীয় এলাকা"-র ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। এদের রাতারাতি ধ্বংস না ক'রে নির্দিষ্ট এলাকা স্থির ক'রে দেওয়ায় যেমন এক দিকে রুশ জাতির মহত্ত্ব সূচিত হচ্ছে, অন্য দিকে তেমনি হার্ডারের "জাতীয় আত্মা"-র দার্শনিক মতবাদও প্রমাণিত হয়েছে। এত ক্ষুদ্র ও অনুন্নত জাতিগুলির জাতীয় সত্তাও উপেক্ষণীয় নয়। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের ক্ষমতা এদের না থাকলেও এক বৃহৎ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এদের জন্যে আলাদা একটি এলাকা নির্দিষ্ট করতে হয়েছে, যা গ্রাম-থানা-মহকুমা-জেলা ইত্যাদি প্রশাসনিক বিভাগের মতো একটা কিছু। অথচ চুকচিদের সংখ্যা মাত্র ১৫০০০।

(৩) হটেনটট্‌ ভাষাগুলি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার আদিবাসীরা ব্যবহার করে। এদের সাহিত্য ও সভ্যতার প্রশ্ন আপাতত ওঠে না।

(৪) বুশম্যান মনুষ্যগোষ্ঠীও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় কালাহারি মরুভুমির সন্নিহিত এলাকার অধিবাসী। বুশম্যান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ১১টি ভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলি পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ভাষা, না একই ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন উপভাষা, তা বলার মতো প্রমাণের অভাব। বিখ্যাত পিগমি জাতি বুশম্যান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা পৃথিবীর খর্বতম নরগোষ্ঠী।

সভ্যতার মাপকাঠিতে এস্কিমো আর চুকচিদের মতো ঠাণ্ডা দেশের অধিবাসী জাতিরা এবং হটেনটট্‌ আর বুশ-ম্যানদের মতো গরম দেশের অধিবাসীরা সবাই নিতান্ত পশ্চাৎপদ। জলবায়ুর অতিরিক্ত শৈত্য বা গ্রীষ্মাধিক্য সভ্যতা তথা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের পরিপন্থী, এ-কথা অবশ্য এখন আর বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন না।

(৫) হামীয় ভাষাগোষ্ঠী আজ লুপ্তপ্রায়। একদা প্রাচীন মিশরীয়রা এই গোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলত। প্রাচীন মিশরীয় জাতি সভ্যতার সব ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কিন্তু আজ তারা যেমন জাতি হিসেবে লুপ্ত তেমনি তাদের ভাষা ও সাহিত্যও অপ্রচলিত, মৃত। প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় অতি বিরাট সাহিত্য ছিল। মাত্র কিছু কাল আগে প্রচলিত কপ্টিক ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান ভাষা ছিল। এখন হামীয় গোষ্ঠীর ৪৭টি ভাষা আফ্রিকার উত্তর ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলে প্রচলিত। কিন্তু কোনটিরই তেমন প্রাধান্য নেই। প্রাচীন গোথিক, স্লাভ লাতিন, গ্রিক, পারসিক, সংস্কৃত, চৈনিক ভাষাগুলিও আজ লোকমুখে অপ্রচলিত বটে, কিন্তু তাদের বংশধর জার্মান, রুশ, ইতালীয় আধুনিক গ্রিক, ফার্সি, বাংলা, পাইহুআ ভাষা-গুলি এখনও জীবিত। দুঃখের বিষয় প্রাচীন মিশরীয় ভাষার কোন বংশধরভাষাও আজ উদ্বর্তিত হয়ে বিদ্যমান নেই। বর্তমান হামীয়রা সভ্যতায় পূর্বোক্ত চারটি ভাষা-গোষ্ঠীর লোকদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত।

(৬) আমেরিকার আদিম ভাষাগোষ্ঠী সমূহের লোকে-রাও তুলনায় যথেষ্ট সভ্য জাতিরূপে গণ্য হবার যোগ্য। দুই আমেরিকার লাল মানুষ বা রেড ইণ্ডিআনদের সমস্ত ভাষা মোট আটটি শাখায় ভাগ করা যায় :—

(১) আল্‌গঙ্কিআন (২) আথাবাস্‌কান (৩) ইরো-কোইআন (৪) মুসকোজিআন (৫) নাহুআট্‌লান (৬) পিমান ( ) সিওউআন (৮) শোশোনিআন।

এই সব ভাষাগোষ্ঠীর আদিম অধিবাসীরা আলাস্কা থেকে আর্জেনটিনা পর্যন্ত বিস্তৃত দুই আমেমিকায় বাস করে। নাহুআটলান গোষ্ঠীর আস্তেক ভাষা আজ অপ্রচলিত এবং প্রাচীন ভাষাসমূহের পর্যায়ে পড়ে। প্রাচীন কালে মেক্সিকো অঞ্চলে এই ভাষা এক বিরাট সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন ছিল। ইউরোপ থেকে আগত ঔপ-নিবেশিকদের বর্বরতায় এই ভাষার প্রায় সমস্ত লিখিত নমুনা ধ্বংস হয়েছে। এখন দুই আমেরিকায় ইংরেজি, স্পেনীয়, পোর্তুগিস, ফরাসি ও ডাচ ভাষার আধিপত্যের পেষণে ঐ আটটি ভাষাগোষ্ঠীই সম্ভবত চিরতরে নিষ্পিষ্ট। তাদের ভাষাগুলির মধ্যে কেচুআ, গুআরানি আর আইমারা—এই তিনটি ভাষা এখনও উল্লেখযোগ্য। কেচুআভাষীদের সংখ্যা প্রায় ৬ মিলিঅন। রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করলে স্পেনীয় ও পোর্তুগীসরা রেড ইণ্ডিআনদের একে-বারে ধ্বংস করতে চায় না। কিন্তু প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম গ্রহণ

করুক বা না করুক ইংরেজিভাষীরা লাল মানুষদের একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলতে চায়। নির্দিষ্ট সংরক্ষিত এলাকায় আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের আবদ্ধ ক'রে ফেলে ক্রমশ লুপ্ত ক'রে দেওয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য।

(৭) ঠিক এই কৌশলে অস্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়ার আদিম অধিবাসীদেরও প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম ভাষাসমূহ অতি অল্পসংখ্যক অসভ্য লোক ব্যবহার করে। ঐ মহাদ্বীপের অভ্যন্তরভাগে এদের বসতি। এদের সাংস্কৃতিক অবস্থা সবচেয়ে অনুন্নত।

(৮) বাস্ক ভাষা স্পেন ও ফ্রান্সের সীমান্তরেখার কাছাকাছি পিরেনিজ পর্বতমালার পশ্চিমাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। বাস্কভাষীদের আবির্ভাব কোথা থেকে হলো সে ব্যাপারে বিতর্কের অবসান হয় নি। কেউ কেউ অনুমান করেন আটলান্টিস্ মহাদেশ জলে ডুবে যাবার সময় এরা অধুনালুপ্ত সেই মহাদেশ থেকে নিকটবর্তী আইবেরীয় উপদ্বীপে পালিয়ে আসে। এরা ইউরোপীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকায় গৌণ ভাষাগোষ্ঠীগুলির লোকদের মধ্যে সভ্যতায় সবচেয়ে অগ্রবর্তী।

(৯) বুরুশাস্কি-ভাষীরা আগে অখণ্ড ভারতের কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখন তাদের অবস্থানক্ষেত্র পাকিস্থানের অধীনে। হুনজা-নগর এলাকা গিলগিটের অদূরবর্তী। সেখানে বসবাসকারী এদের সংখ্যা মাত্র ত্রিশ হাজারের মতো, সুতরাং উপেক্ষণীয়।

গৌণ ভাষাগোষ্ঠীগুলির লুপ্তি এক রকম অনিবার্য। এদের লোকসমষ্টির কোন রাজনৈতিক সংস্থা নেই কিম্বা তার জন্যে কোন দাবি দাওয়া বা আন্দোলন নেই। এদের নিয়ে এদের জন্যে কোন রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টাও নেই। এস্কিমোরা ডেনমার্ক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন। চুকচিরা রুশের তাঁবেদার। হটেনটট্ ও বুশম্যানেরা হয় নিগ্রো বাণ্টু জাতির নয় দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের অধীন। হামীয়রা সেমীয় ভাষাগোষ্ঠীর শাসনাধীন। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা ইউরোপ থেকে আসা শ্বেতকায়দের অধীনে। বাস্কজাতি স্পেন ও ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত। বুরুশাস্কিভাষীরা এখন পাকিস্থানের কর্তৃত্বে।

মোট কথা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ওশিয়ানিয়া বা বৃহত্তর অস্ট্রেলিয়া আর আণ্টার্কটিকা, এই চারটি মহাদেশ একান্তভাবে ইউরোপীয় জাতিগুলির কবলে পড়েছে। অর্থাৎ পূর্ণ পাঁচটি মহাদেশ জুড়ে ইউরোপীয় জাতি তথা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ বিস্তার। ইউরোপ ইউরোপীয়দের যতখানি নিজস্ব, বাকি চারটি মহাদেশও ততখানি আপনার ক'রে নিতে তারা পেরেছে। আণ্টার্কটিকার আদিম অধিবাসী ব'লে কিছু নেই। দুই আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে। ওশিয়ানিয়া মহাদেশের অস্ট্রেলিয়া বাদে অবশিষ্ট অংশে অর্থাৎ নিউজিল্যাণ্ডে ও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর কিছু লোক এখনও টিকে আছে বটে, কিন্তু তারাও মার্কিন, ইউরোপীয় আর অস্ট্রেলীয় ঔপনিবেশিকদের কবলে ধ্বংসোন্মুখ জনসমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।

এর পর আমরা মুখ্য বা প্রধান ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠীগুলি নিয়ে আলোচনা করবো। ব'লে রাখা দরকার যে গোষ্ঠী বন্ধন সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। আমরা ফিন্-উগ্রীয় আর উরাল-আলতীয়দের দুটি আলাদা গোষ্ঠী ব'লে ধরেছি। কিন্তু অনেকে শুধু উরাল-আলতীয় গোষ্ঠী ধরেন ফিন-উগ্রীয়দের তার অন্তর্গত ক'রে। আবার কেউ কেউ দুটি শাখাকে আলাদা ব'লেই গণ্য করেন, কিন্তু উরাল-আলতীয়দের তুর্ক-মঙ্গোলমাঞ্চু শাখা ব'লে বর্ণনা করেন।

প্রকৃতপক্ষে উদ্ভব, গঠন বৈশিষ্ট্য ও শাব্দ উপাদান বিচার করলে আমাদের গোষ্ঠীবিভাগ যুক্তিসম্মত। এ ভাবে ভাগ করলে জগতের কোন বড় ভাষা বাদ যাবে না। অন্য যে কোন রকম গোষ্ঠিবিভাগ করলে সব বড় ভাষার বেলায় যা হবে, এতেও তাই হবে—সব ভাষাই একে একে কোন-না-কোন শাখায় আলোচিত হবে।

১৯৬৫ সালের পৃথিবীর মুখ্য ভাষাগুলিকে মোটামুটি এই শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়:—

(১) ককেশীয় (২) ফিন-উগ্রীয় (৩) কোরীয় (৪) উরাল-আলতীয় (৫) জাপ (৬) দ্রাবিড় (৭) সেমীয় (৮) অস্ট্রিক (৯) নিগ্রো (১০) চীন-তিব্বতীয় (১১) ভারত-ইউরোপীয়।

এই এগারোটি গোষ্ঠীতে সজীব ও শক্তিশালী ভাষার সংখ্যা একশো-র কিছু বেশী। তিনটি রেড ইণ্ডিয়ান

ভাষার কথা বাদ দিলে পৃথিবীর প্রধান সব ভাষা, অর্থাৎ যে-সব ভাষায় অন্তত এক মিলিঅন লোক কথা বলে, এই এগারোটি শাখার অন্তর্গত। রেড ইণ্ডিয়ানদের কোন নিজস্ব রাষ্ট্র না থাকায় তাদের ভাষা তিনটিতে যদিও এক মিলিঅন বা তার বেশি লোক কথা বলে, তবুও তাদের মুখ্য ভাষাগোষ্ঠীগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হলো না। আপাতত প্রধান শতাধিক ভাষার আলোচনাই যথেষ্ট।

এগারোটি গোষ্ঠীর সকলের অবস্থা স্বভাবতই সমান নয়। কোন কোনটির অবস্থা বাড়্তির পথে। কারো-বা মরণদশা ঘনিয়ে আসছে। কোথাও-বা বাইরের চাপে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা; কোথাও কোথাও দুর্বলতা এসেছে ভেতর থেকে। কোথাও ভাষাভাষীদের সাংস্কৃতিক প্রয়াসে সমৃদ্ধি অর্জিত, কোথাও সাম্রাজ্যিক বা বাণিজ্যিক প্রাধান্যে সাময়িক বাড়বাড়ন্ত ভাব। এগারোটি গোষ্ঠীর মধ্যেও আবার প্রত্যেক গোষ্ঠীর অন্তর্গত নানা শাখায় হ্রাসবৃদ্ধির কম-বেশি আছে। ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর বর্তমান শাখাগুলির দুটি আলবানীয় আর আর্মেনীয় ক্ষয়িষ্ণু বা ক্ষীণপ্রাণ। পক্ষান্তরে স্লাভরা ক্রমবর্ধমান মনুষ্যগোষ্ঠী।

গোষ্ঠীগুলির অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার পর তাদের পারস্পরিক তুলনামূলক আলোচনা ক'রে হার্ডারের জীবন-দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দাবিদাওয়ার বিচার করা সম্ভবপর হবে। বনে-জঙ্গলে দ্বীপে-উপত্যকায় গোপন দু চারটি ক্ষুদ্র ক্ষীণ ভাষা ভিন্ন পৃথিবীর সভ্য মানবসমাজের জ্ঞাত সব ভাষা নিয়েই আমরা আলোচনা চালাচ্ছি। পৃথিবীর সব ভাষা এখনও সভ্য সমাজের পরিচিত না হতে পারে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার গহন অরণ্যে, নিউ গিনির অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত বনভূমির অভ্যন্তরে কিম্বা দক্ষিণ মেরুর কাছে পিঠে কোথাও কোথাও দুএকটি ক্ষুদ্র ভাষা লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়। তবে তারা অন্তত আজ উল্লেখযোগ্য নয়। কয়েক শতাব্দী পরে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হতে পারে। আজ থেকে মাত্র চার শতাব্দী আগে ইংরেজি ভাষার প্রসার ইংল্যাণ্ডের বাইরে ছিল না। পাঁচ শতাব্দী আগে দুই আমেরিকায় অন্তত তিনটি বড় বড় সভ্যতা ছিল—মেক্সিকো গুআতেমালা ও পেরুতে, প্রত্যেকটিই ইংরেজদের সভ্যতার চেয়ে ঢের বেশি সমৃদ্ধ তৎকালীন অবস্থার তুলনায়। তিন শতাব্দী আগে পুরাতন রুশদের সংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশ লক্ষের মধ্যে। আজ তিনটি শাখায় আধুনিক রুশদের সংখ্যা ষোল কোটি!

এগারোটি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ককেশীয় ভাষাগুলির অবস্থা সবচেয়ে সঙ্গিন। ককেশাস পর্বতমালার কাছে এই সব ভাষার লোকদের আস্তানা। এরা সোভিয়েট ইউনিঅনের অন্তর্ভুক্ত। কারো কারো মতে, কাশ্মীরের বুরুশাস্কি ভাষাও এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ককেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে কেবল জর্জীয় ভাষা উল্লেখযোগ্য। ঐ ভাষার ভিত্তিতে জর্জিয়া বা গেওর্গিআ প্রজাতন্ত্র গঠিত। গেওর্গিআর দুই অধিবাসী স্তালিন ও বেরিয়া জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু জর্জীয়দের পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র নেই। রুশ জাতির কর্তৃত্বেই তাদের থাকতে হয়েছে। ককেশীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই ক'টি ভাষা:—

(১) গেওর্গীয় বা কার্থ্বেলীয় (২) সোয়ানেশিআন (৩) মিংগ্রেলীয় (৪) মিংগ্রেলীয়-লাজি।

রুশ ভাষা তাত্ত্বিকরা জর্জীয় ভাষার দুই মিলিঅন লোক বাদে বাকি আরো প্রায় দুই মিলিঅন লোককে ৩৬টি শাখা উপশাখায় ভাগ করেছেন। সেগুলিতে ৯০০ থেকে ৪ লক্ষের মতো লোক কথা বলে। বাহুল্যভয়ে কেবল জর্জীয় ভাষা ছাড়া অন্যগুলি নিয়ে আপাতত কোন আলোচনা করা হলো না।

রুশ পণ্ডিতদের মতে, ইবেরীয়-ককেশীয় বা ককেশীয় ভাষাগোষ্ঠীকে চারটি বড় শাখায় ভাগ করা যায়:—

(১) কার্তহ্বেলীয় বা গেওর্গীয় বা জর্জীয় (২) দাগেস্তানি (৩) নাখ্ বা হ্বেইনাখ্ (৪) আবখাজ-আদিগেই।

দাগেস্তানি শাখায় ২৮টি ভাষার মধ্যে ৫টির লিখিত রূপ আছে। ঐ পাঁচটি ভাষায় লোকসংখ্যা সাড়ে ছয় লক্ষ। বাকি ২৩টি ভাষার অত্যন্ত কম লোক-সংখ্যার জন্যে কোন লিখিত রূপ নেই। এগুলি ক্রমশঃ কোন বৃহৎ ভাষার অন্তর্লীন হবে। রুশ পণ্ডিতেরা সে-সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন।

নাখ্ শাখায় দুটি উপশাখা উল্লেখযোগ্য। একটির নাম চেচেন, তাতে ৪ লক্ষ লোক কথা বলে। অন্য উপশাখা ইঙ্গুশে প্রায় ৯০,০০০ লোক কথা বলে। নাখ শাখায় আরো দু একটি উপশাখা আছে যাদের লিখিত রূপ পাওয়া যায়। একটি উপশাখার কোন লিখিত রূপ নেই।

আবখাজ-আদিগেই শাখাতে ৫টি ভাষা আছে। তাতে মোট ৩ লক্ষ ৮০ হাজার লোক কথা বলে।

ফিন্-উগ্রীয় ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থান লাপ্ল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিআ, হাঙ্গেরি এবং উত্তর রুশে। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলির নাম:—

(১) হুঙ্গারীয় বা মজ্যার (২) ফিন্ (৩) এস্ত্ (৪) লাপ্ (৫) মর্দ্ভিন।

(ক্রমশঃ)

কল্যাণ-তীর্থ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আজ যেখানে আশ্রম একদা সেখানে ছিল শ্মশানক্ষেত্র। বহু যুগযুগান্তরের প্রাচীন শ্মশান। সে যুগের সাক্ষী আছেন দুটি মহামহীরুহ। বট আর অশ্বথ। বটের মূল-কাণ্ড বহুদিন হোল বিলুপ্ত হ'য়েছে। ঝুরি থেকে সৃষ্টি হয়েছে নূতন নূতন কাণ্ডের। অশ্বত্থের কলেবরে পরিবর্তন হয়নি। প্রাচীন মহিমায় তিনি আজও বিরাজমান। মহাতাপস আচার্য্য শ্রীশ্রীকৈশোরানন্দ সরস্বতী মহারাজ
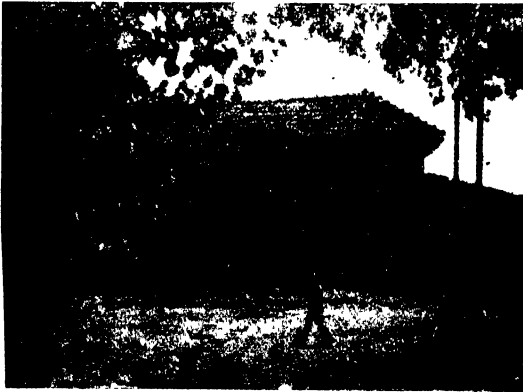
রামচন্দ্রপুর
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমের পুরাতন গৃহ

বলেছিলেন এই শ্মশানক্ষেত্র ছিল শক্তিসাধনার মহাপীঠ। তাঁর নির্দেশে অশ্বত্থের তলদেশ খনন করে আবিষ্কৃত হয়েছিল পঞ্চমুণ্ডীর আসন ও অনির্বাণ যজ্ঞকুণ্ড। সাড়ে সাতশত বৎসরের ঐতিহ্যমণ্ডিত দুটি স্তব্ধ বিস্ময়। অশ্বত্থের পশ্চিমে একটি শান্তশীতল কুটিরে এখন প্রতিষ্ঠিত আছেন সেই আসন। পাশেই যজ্ঞকুণ্ড। হোমের সময় অগ্নিকে আবাহন করতে হয় না, আহুতি পেলেই তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হন। এ এক পরম বিস্ময়। বিস্ময় আরও আছে। কখনও কখনও গভীর নিশীথে শংখধ্বনি শোনা যায় এখানে। শোনা যায় গম্ভীর সমবেত কণ্ঠের স্তোত্রপাঠ। সময় সময় মহাসংগীতও—এ যেন এক রহস্যলোক!

শ্মশানের যুগে এই ভূমি ছিল এক ভয়ংকর ভয়াবহ স্থান। নিতান্ত দায়ে না পড়লে মানুষ দিনের আলোতেও এ পথে আসত না। রাত্রের শ্মশানযাত্রীরা অশ্বত্থশাখায় মড়া বেঁধে রেখে যেত। দাহ করত সকালে এসে। জায়গাটার নামই ছিল মড়িডাঙ্গা। পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও এখানে ছিল দুর্ভেদ্য জঙ্গল। প্রথম যুগের বিপ্লবীরা এই বনভূমিতে নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করতেন। ভয়ের রাজ্যই তো এইসব ভয়ংকর মানুষের নিরাপদ বিচরণ-ক্ষেত্র। এই পুণ্যভূমির রক্ষক আছেন এক মহাদেবতা—শ্রীশ্রীভৈরব। দীর্ঘ সাড়ে চারশত বৎসর ধরে তিনি অভয়-হস্ত বিস্তার করে রক্ষা করছেন এই পুণ্যক্ষেত্র। আশ্রমের পূর্বদ্বারে তাঁর মন্দির।

আশ্রমের অধীশ্বর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী মহারাজ। পূর্বাশ্রমে তিনিই ছিলেন শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী, মানভূমের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা। যজ্ঞগৃহের দক্ষিণে অন্দরমহলের যে প্রবেশদ্বার, তারই বামদিকের দেওয়ালে স্থাপিত আছে একটি প্রস্তর ফলক। সন তারিখ দিয়ে লেখা আছে কবে ঐ স্থানে মানভূমের জয়েন্ট ম্যাজিস্টেট টেলর ও চাটার বিবস্ত্র অন্নদাপ্রসাদকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করেছিল। অপরাধ তাঁর বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ, তাঁর ইংরাজ শাসনদ্রোহিতা। বেত্রাঘাতে জ্ঞানশূন্য বিপ্লবী-কে সিপাইরা এক ঘোড়ার পিছনে বেঁধে দিয়ে কশাঘাত করে ছুটিয়ে দিয়েছিল ঘোড়া। ক্ষিপ্ত অশ্ব বনবাদাড় ভেঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল মাইলের পর মাইল। পুলিশী বর্বরতার সেদিন সীমা ছিল না। কিন্তু কী বিস্ময়ের কথা,—আজকের স্বামী অসীমানন্দের হৃদয়ে যে কূলপ্লাবী

ক্ষমার স্রোত, সেদিনের বিপ্লবী অন্নদাপ্রসাদের হৃদয়েও তার কলধ্বনি ছিল সমান সংগীতময়। না হ'লে, সেদিন তাঁর অনুগত গুণমুগ্ধ ভক্ত পাঁচহাজার ধনুর্ধর সাওতাল বীর বার বার ভিক্ষা ক'রেও পুলিশবাহিনীকে প্রতিরোধ করবার অনুমতি পায়নি। তবে ঘোড়ার পিছনে তারা অনেকে ছুটেছিল এবং শেষপর্যন্ত শরবিদ্ধ ক'রেছিল সেই ঘোড়াকে। সামনে ছিল নদী। সেই নদীর জলে তাঁর মৃতপ্রায় দেহটি নিক্ষেপ করে ঘোড়া পালিয়ে যায় নদী পার হ'য়ে। দীর্ঘদিন সযত্ন সেবা ও চিকিৎসার পর প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন অন্নদাপ্রসাদ সে আজ প্রায় চল্লিশ বছরের কথা।

নিতান্ত তরুণ বয়স থেকেই অন্নদাপ্রসাদ রাজনীতির ক্ষেত্রে নেমেছিলেন। তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সংগঠন' সে যুগে সমগ্র পুরুলিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক মুখপত্র, ছিল। দেশের মানুষের মনে চেতনা জাগান'র অপরাধ ইংরাজ সরকার ক্ষমা করতে পারে নি। অপরাধীর কাছে শাসকপক্ষ তাই বারংবার কঠিনমূল্য আদায় করেছে। দৈহিক নির্যাতন, কারাদণ্ড, অন্তরীণ প্রভৃতি নানা ভাবে বিপর্যস্ত করা ছাড়াও, তাঁর মুদ্রণ-যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে, পত্রিকা প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছে, এমন কি অসঙ্গতভাবে, তাঁর যথাসর্বস্ব হরণ ক'রে তাঁকে নিঃস্বতায় পর্যবসিত করতেও কার্পণ্য করেনি। কিন্তু খাঁটি ইস্পাতকে অবনমিত করা যায় কি? উত্তুঙ্গ পর্বতশীর্ষ কি পীড়নে নেমে আসে বেণুশাখার মত? কত দিন গেছে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, গৃহে হাহাকার, ক্ষুধার্ত শিশুর করুণ আর্তনাদ। কিন্তু আদর্শে যিনি অবিচল, জীবনের সাধ্য কোথায় তার পরাজয় ঘটায়। আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়েও বার বার তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, আবার দ্বিগুণ তেজের সঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছেন সংগ্রাম সাগরে। বিপুল বিক্রমে মামলা চালিয়েছেন বিহার সরকারের বিরুদ্ধে এবং অবশেষে সকলকে বিস্মিত ক'রে সুপ্রীম কোর্টে জয়লাভ করেছেন।

আজকের যে বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম, সে এক রাজনীতি কেন্দ্রের নবরূপে উত্তরণ। এখানেই ছিল মানভুম কর্মী সংসদের মূলকেন্দ্র। বহুমুখী ছিল তার কর্মপ্রচেষ্টা। ইংরাজ শাসনের ভিত সে নাড়িয়ে দিয়েছে, আর এক হাতে গড়েছে দেশকে, জাতিকে, অনুন্নত সম্প্রদায়কে। সমাজের
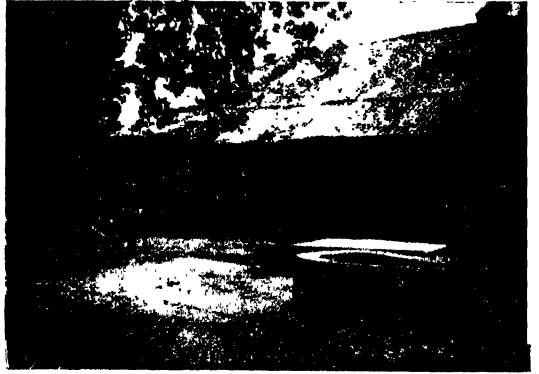
পঞ্চমুণ্ডীর আসন ও প্রাচীন যজ্ঞকুণ্ড

সেবায় নানাভাবে নিযুক্ত করেছে তার কর্মীদের। সংসদের প্রথম সভাপতি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২৮ সালে এখানে সমগ্র মানভুম জেলার রাজনৈতিক কর্মীদের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রই তার সভাপতিত্ব করেছিলেন। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকেও প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিলেন দলে দলে। রাজনৈতিক সংগ্রামের এক বিরাট কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল এই অধিবেশনে।

* * *

আশ্রমের প্রায় পূর্বসীমায় বটবৃক্ষের দীর্ঘ প্রসারিত ছায়ায় এক অনতিপ্রসর কুটির। এই কুটিরেই স্বামী অসীমানন্দের আসন। বিপ্লবী অন্নদাপ্রসাদ আজ সন্ন্যাসী অসীমানন্দ। লাল সিমেন্টে বাঁধান প্রশস্ত বেদীর উপর বিস্তৃত ব্যাঘ্রচর্মের আসন। বেদীর নীচে ভূগর্ভে বাঁধান আছে মনুষ্যদেহপ্রমাণ স্থান কোন এক অশুভ ভবিষ্যতের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে। সন্ন্যাসী স্বামীজী আপন সমাধির জন্য নিজ হাতে ঐ স্থানটুকু চিহ্নিত করে রেখেছেন। ভবিষ্যতের সমাধির উপর পেতে রেখেছেন তাঁর বর্তমানের আসন। মৃত্যু তাঁহার বাহন,—তিনি মৃত্যুঞ্জয়। তাঁকে দেখে পলক পড়বেনা। অনেকক্ষণ ধরে দেখতে হবে, তবু চোখের আশা মিটবেনা। অতি কান্ত কোমল নবনীত দেহ। দীর্ঘকেশ দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি, ক্ষৌম বসন। দেখে মনে হয় বিগলিত করুণা হঠাৎ যেন কায়া ধারণ করে প্রসন্ন-

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

মহিমায় বিরাজমান। আকর্ণ বিশ্রান্ত দুই চক্ষে ত্যাগ ও তিতিক্ষার শান্ত আলোকচ্ছটা। তিনি ক্ষমা-সুন্দর স্নেহনির্ঝর, প্রেমঘন মূর্তি। তাঁর উপস্থিতি পরমা শান্তির কোমলদ্যুতি বিকীর্ণ করে, এক অনির্বচনীয় অমৃত রসের অভিষেকে সঞ্জীবিত করে হতাশ্বাসে জীর্ণ শুষ্ক প্রাণ। কর্মযোগ অবলম্বন করে আছেন এই প্রেমিক সন্ন্যাসী। তাঁর ভগবৎপ্রেম শিবজ্ঞানে জীবসেবার মধ্যে এক মহিমময় রূপ নিয়েছে। নানামুখী সেবাকর্মের মধ্যে প্রবাহিত করে দিয়েছেন তিনি নিজেকে। শুধু কাজ, কাজ আর কাজ। চার হাজারের মত তাঁর মন্ত্র-শিষ্য। আর আছেন অগণিত অনুরাগী ভক্ত সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। প্রতিদিন আসে অসংখ্য পত্র। কত প্রশ্ন, কত অনুরোধ, কত দাবি। নিজের হাতে রাশি রাশি পত্রের জবাব দিচ্ছেন। দিচ্ছেন শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, ব্যাধিতকে আশীর্বাদ, ধর্মজিজ্ঞাসুকে পথের সন্ধান। জলধারা বহনে নদীর ক্লান্তি নেই, কর্মধারা বহনে তাঁর। অশ্রান্ত, অক্লান্ত। দেহ ক্লান্ত হলেও মনের শক্তি অপরিসীম। পর্বতভার বহনেও সে মনের ক্লান্তি নেই। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে স্বতন্ত্র সদস্য হিসাবে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন বিহার বিধান সভায়। তখন তিনি অশেষ লোক কল্যাণকর কর্ম সাধনের প্রেরণা দিয়েছেন সরকারকে। আজও তিনি সাঁতুরি আঞ্চলিক পরিষদের কর্ণধাররূপে তাঁর মূল্যবান সময়ের অনেকখানি অংশ নিত্য ব্যয় করে চলেছেন গ্রামসংগঠন ব্যবস্থার কাজে। কর্মের বন্ধনে সংহত হয়ে আছে তাঁর প্রমত্ত প্রেমভক্তি। নামকীর্ত্তনের মধ্যে তাঁকে প্রাণপণ প্রয়াসে স্থির থাকতে হয়। একবার যদি বাঁধ ভাঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের ঐশ্বর্য্য ঝলমল করে ওঠে তাঁর সর্বাঙ্গে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমাধি। সে মহাভাবতরঙ্গের অভিঘাত দর্শকেরও শিরায় শিরায় বিদ্যুতের শিহরণ সঞ্চারিত করে।

ভগবান শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের শিষ্য শ্রীশ্রীমৎ স্বামী কৈশোরানন্দ সরস্বতী। পূর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন শ্রীকিরণচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, গুরু স্নেহভরে আখ্যা দিয়েছিলেন 'দরবেশ'। সেই দরবেশজী মহারাজের প্রিয়শিষ্য অন্নদাপ্রসাদ। নিতান্ত আকস্মিকভাবেই প্রথম পরিচয়। সেই প্রথম দর্শনেই গুরু চিনে নিলেন শিষ্যকে। তারপর দীক্ষা,—জীব-সেবার মহত্তর প্রেরণা। সক্রিয় রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে সরে এলেন অন্নদাপ্রসাদ। সামনে মহামন্বন্তর। গুরু দিলেন শক্তি। সুরু হ'ল বিরাট অন্নযজ্ঞ। দীর্ঘ এক বৎসর ধরে চলল এই মহৎ অনুষ্ঠান। সহস্র সহস্র নিরন্ন মানুষের দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা! অনুরাগী কর্মীদের নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্মস্রোতে। অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ—কত প্রয়োজন মানুষের! শুধু যারা এলো, তারাই যে পেল তা নয়, যারা আসতে পারছে না অনেক দূরের পথ ভেঙ্গে তাদের দ্বারে গিয়ে হাজির হ'ল অন্ন-বস্ত্রের আশীর্বাদ, শিশুর দুধ, রোগীর ঔষধ পর্য্যন্ত। রাজনৈতিক কারণে যে শাসক সম্প্রদায়ের তিনি ছিলেন বিরাগভাজন, তারা পর্য্যন্ত এই মহৎ প্রচেষ্টার পদপ্রান্তে প্রণাম না জানিয়ে পারেনি। সহযোগিতার দক্ষিণহস্ত তারাও প্রসারিত করে দিয়েছিল। ওমর সাহেব ছিলেন তখন মানভূমের জেলাশাসক। তিনি স্বয়ং এসে উদ্বোধন করেছিলেন এই অন্নসত্রের। রেল বিভাগের ওপর তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল, যতদিন এই অন্নযজ্ঞ চলবে ততদিন অন্নদাপ্রসাদের নামে প্রেরিত সমস্ত রসদ সামগ্রী যেন বিনা বাধায় ন্যূনতম সময়ের মধ্যে তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। রেলবিভাগ অবনত মস্তকে এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। দেশবরেণ্য পুরুষ শ্যামাপ্রসাদ এসেছিলেন পুরুলিয়া সফরে। তিনি স্বচক্ষে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন অন্নদাপ্রসাদের বিপুল অন্নযজ্ঞ। সেই দুর্বার সংগঠনী শক্তির সম্মুখে তিনি অভিভূত না হ'য়ে পারেন নি।

কোলকাতা থেকে কত আর দূর। আসানসোল ১২৮ মাইল মাত্র! তারপর আদ্রা লাইনের গাড়ীতে দামোদর পার হয়ে বাকী চোদ্দ মাইল। বার্ণপুর, দামোদর, মধুকুণ্ডা পার হ'য়ে মুরাডি। নামতে হবে এখানে। সাবধানে—খুব নীচু প্ল্যাটফরম। রাত্রে এলে আরও দুর্ভোগ, আলো নেই বললেই হয়। টিম্‌টিম্ করছে কেরোসিন ল্যাম্প। অথচ সারা বছর আশ্রমের কল্যাণে মুরাডি ষ্টেশনে যাত্রীর প্রবাহ সমান। এর ওপর আবার পূর্ণাঙ্গ ষ্টেশন থেকে ফ্ল্যাগ পর্য্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছিল মুরাডিকে। সম্প্রতি বহু আবেদন নিবেদনের পর হাসপাতালের কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ প্ল্যাটফরম উন্নত করার কাজে হাত লাগিয়েছেন। ষ্টেশনে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাও হচ্ছে! তাছাড়া আবার পূর্ণাঙ্গ রূপও এখন ফিরে পেয়েছে মুরাডি। ঈশ্বরের কৃপা, সন্দেহ নেই।

যাওয়ার পথে এক হতভাগ্য অন্ধ অন্নের জন্য তাঁর গাড়ী চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। তাকে দেখে করুণায় উদ্বেল হ'য়ে ওঠেন সেই মহামানব। সহযাত্রী অন্নদা-প্রসাদকে বলেন, "এদের জন্যে কি কিছু করা যায় না?" নেতাজীর সেই আর্তজিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন স্বামীজী ১৯৫৩ সালে এই "নেতাজী চক্ষু হাসপাতালের" প্রতিষ্ঠা করে। নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর একক প্রচেষ্টা। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।" একলাই চলেছিলেন। সাথী জুটলো পরে। গোড়ায় যা ছিল এক সামান্য প্রতিষ্ঠান মাত্র, আজ সেখানে গড়ে উঠেছে একশত শয্যাবিশিষ্ট বিপুলায়তন ইমারত। আশপাশের আট দশটি জেলা থেকে দলে দলে রোগী আসে। পশ্চিম-বাংলা ছাড়াও আসে বিহার ও উড়িষ্যা থেকে। কী অবিচল তাদের বিশ্বাস। এখানে আসা নিয়েই কথা।

নেতাজী চক্ষু হাসপাতাল গৃহ

ষ্টেশন থেকে মাইলটাক পথ। আঁকাবাঁকা উঁচু নীচু পাহাড়ী পথ। শেষ হয়েছে দিগন্তের পাহাড়ের কোলে। ঐখানেই রামচন্দ্রপুর। গ্রামের প্রান্তে আশ্রম—শ্রীশ্রীবিজয়-কৃষ্ণ আশ্রম। লোকে সংক্ষেপে বলে রামচন্দ্রপুর আশ্রম। চারিদিকে বলয়াকৃতি পাহাড়, তার কোলে উন্মুক্ত প্রান্তর, ধানক্ষেত, মাঝে মাঝে ছোট বড় জলাশয়। চোখ জুড়োয়, মনও ভুলোয়। উদার উন্মুক্ত আকাশ, উদ্দাম বাতাস, প্রখর সূর্য্য! প্রকৃতির আশীর্বাদের সঙ্গে অভিশাপও আছে। ব্যাপক চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা। চোখের হাস-পাতাল করেছেন স্বামীজী নেতাজীর পুণ্য নামে—১৯৫৩ সালে। এতে নেতাজীর প্রেরণা ছিল। রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনের পর পুরুলিয়া সফরে এসেছিলেন তিনি সংগঠনী কর্মোপলক্ষ্যে। গভীর রাত্রে মোটরে আদ্রা

এলেই আরোগ্য! তাই জানুয়ারী থেকে মার্চ এই তিন মাসের ক্যাম্প হাসপাতালে স্থান পাওয়াই কঠিন হ'য়ে ওঠে। ডাক্তার, নার্স, কম্পাউণ্ডার ও অন্যান্য কর্মীদের হিমসিম খেয়ে উঠতে হয়। আজ পর্য্যন্ত অস্ত্রোপচার বড় কম হয়নি—প্রায় চার হাজারের মত হবে। বহির্বিভাগে চিকিৎসা হয়েছে কমকরেও বত্রিশ হাজারের মত। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ আরোগ্যের সাফল্য। বিপুল ব্যয়। অথচ আয় কোথায়! রোগীদের চিকিৎসা, ঔষধ, পথ্য, আরামের উপকরণ সব বিনামূল্যে। চক্ষু চিকিৎসার জন্য অর্থব্যয় করবার মত বিলাসিতা এ অঞ্চলের হতদরিদ্র পল্লী-বাসীদের কল্পনারও অতীত। আগে রোগীদের সঙ্গে, অভিভাবকস্থানীয় যারা আসত তাদের পর্য্যন্ত আহার যোগান হ'ত। স্বামীজী বলতেন, "আহা, ওরা যাবে

কোথায়?" আজ আর সে কথা বলবার কোনও উপায় নেই,—চাল কোথায়? অর্থের উৎস একমাত্র দান। অযাচিত স্বতঃস্ফূর্ত্ত দান। কিন্তু তাতে কি অভাব মেটে! সরকারী সাহায্য আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে একত্রিশ হাজার টাকা চার কিস্তিতে। সমুদ্রে শিশির। ঋণ হচ্ছে, ধীরে ধীরে স্ফীত হচ্ছে তার পরিমাণ। কিন্তু উপায় কী! যাঁর কাজ, তিনিই করাচ্ছেন—তিনিই করাবেন। ভাবনা তাঁর। স্বামীজী ভাবেন না। তিনি মেতে আছেন কাজ আর কাজ নিয়ে। তিনি হাসপাতালে ঘরের পর ঘর যোগ করে চলেছেন, ব্লকের পর ব্লক। গত ৩১শে মার্চ এ বছরের মত শেষ হয়েছে ক্যাম্প। সামনের জুলাই থেকে সুরু হচ্ছে বহির্বিভাগীয় স্থায়ী একটি সাধারণ হাসপাতাল। তৈরী হয়ে রয়েছে বিপুলাকার এক পরিকল্পনার খসড়া। চাই যক্ষ্মা নিরাময় কেন্দ্র, প্রসূতি-সদন; সর্ব্বার্থসাধক পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল। চাই বীজাণুমুক্ত কুষ্ঠরোগীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র; কারণ সমাজ তাদের স্থান দিতে চায় না। অঙ্গহানির জন্য শ্রমসাধ্য কাজেরও তারা অযোগ্য। দুঃখের সীমা নেই তাদের। পর্য্যাপ্ত অর্থ এলেই শুরু হবে কাজ। একটি আধুনিক ব্যবস্থা সমন্বিত অস্ত্রোপচার গৃহ চাই। চাই বিদ্যুৎ-সরবরাহ। কিন্তু নেই, নেই, নেই। আছে শুধু অদৃশ্য কর্মোৎসাহ, নিষ্কাম কর্মপ্রবাহ। স্বামীজী জানেন দিন আসবে—দেশের প্রতিটি মানুষ একদিন তাদের মুষ্টি খুলবে, তবে সময় লাগছে—লাগবে। দিন আসবেই।

আশ্রমের প্রবেশমুখেই হাসপাতাল। প্রাঙ্গণে নেতাজীর গত জন্ম জয়ন্তী দিবসে প্রতিষ্ঠিত হল আবক্ষ মর্মর-মূর্ত্তি। আবরণ উন্মোচন করলেন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়। উৎসব হল। দিগদিগন্তর হতে এলেন গণ্যমান্য পুরুষেরা। মুখ্যমন্ত্রী অভয় দিয়ে গেলেন যথাসাধ্য ব্যবস্থা করবেন। সাধারণের কাছে আবেদনেও তিনি স্বামীজীর সঙ্গে যোগ দেবেন। বড় হোক এই পুণ্য প্রতিষ্ঠান—সেবার মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠুক। দিন আসছে,—সত্যিই আসছে মনে হয়।

আশ্রমের মধ্যেই আছে দুটি বিদ্যায়তন, একটি প্রাথমিক আর অপরটি জুনিয়ার হাইস্কুল। পল্লী শিক্ষা বিস্তারে স্বামীজী অক্লান্তকর্মা। একক প্রচেষ্টায় আজ পর্য্যন্ত শতাধিক বিদ্যাকেন্দ্র গড়েছেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য এক আদর্শ ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়। আরণ্য পরিবেশে গড়ে উঠবে সে শিক্ষা নিকেতন—প্রতি দশটি করে ছাত্রের তত্ত্বাবধান করবেন এক একজন কৃতবিদ্য আদর্শ শিক্ষক। প্রকৃত মানুষ তৈরী হবে এখানে,—যারা একদিন নতুন করে গড়বে দেশকে, জাতিকে—জগৎকে।

পল্লীর অনাথ শিশুদের দেখে কে? আগাছার মত অযত্নে বাঁচে তারা, সমাজের মালঞ্চে তাদের স্থান কোথায়! স্বামীজী দেবেন তাদের স্থান। মানুষ করবেন তাদের, আগাছাকে পরিণত করবেন মূল্যবান চন্দন বৃক্ষে। হবে এক আদর্শ অনাথ আশ্রম। সহায় সম্বলহীনা দরিদ্র পল্লীবিধবাদের উপায় কী? করুণার আলো পড়েছে সেখানেও। পরিকল্পনা তৈরী। বিধবা আশ্রম। কুটির-শিল্পে শিক্ষা নিয়ে তারা কি স্বয়ংভরা হয়ে উঠতে পারে না? নিশ্চয় পারে। দিন আসছে। শুধু তাদের নয়,—বার্ধক্য জীর্ণ দুর্বল অশক্ত অসমর্থ মানুষদেরও, সংসার একদিন আপন দাবিতে শোষণ করছে, তারপর শুকনো ছিবড়ের মত নিক্ষেপ করছে চরম অবহেলায়। তারা পাবে আহার, পাবে নিশ্চিন্ত আশ্রয়, পাবে ধর্মের পবিত্র আলোকে নূতন দৃষ্টি। তাদেরই জন্য বার্ধক্য আশ্রম।

স্বামীজী কবি সাহিত্যিক, সাহিত্যদরদী। দুখানি মাসিক পত্রিকা তাঁর আশ্রম থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়, মন্দির ও সংগঠন। ধর্ম-সাহিত্য ও লৌকিক-সাহিত্যের দুটি বাহন। সাহিত্যিকদের তিনি অকৃত্রিম দরদী বন্ধু। বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির একজন অগ্রণী কর্মী। এক বিশিষ্ট সাংবাদিক-সাহিত্যিকের প্রেরণায় তিনি তাঁর গঠনমূলক পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করেছেন সাহিত্যিক আশ্রমের, যেখানে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকরা অবসর যাপনের উদ্দেশ্যে এলে আশ্রয় পাবেন। পাহাড়ের কোলে অরণ্যের ছায়া—পাখীদের সঙ্গীত সভা। সেখানে গড়ে উঠবে সারি সারি আশ্রয় কুটির। নিভৃত নিলয়ে সৃষ্টির স্পর্শ পাবে কত মহামূল্য সাহিত্যের দলিল। স্বামীজী প্রস্তুত। দিন আসবে,—আসছে। আমরা উৎকর্ণ হ'য়ে শুনছি তার পদধ্বনি।

* * *

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমের কেন্দ্রভূমিতে শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর মন্দির। মন্দিরে নিত্যপূজিত গোঁসাইজীর পট। আর

আছেন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ—শ্বেত মর্মরমূর্তি। অলৌকিক-ভাবে সংগৃহীত। এই যুগলমূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করে স্বামীজি তুলে দিয়েছিলেন তাঁর পূর্বাশ্রমের সহধর্মিণী শ্রীমতী শৈলবালা দেবী ঠাকুরাণীর হাতে, তাঁর বৃন্দাবন পদযাত্রার পূর্ব-ক্ষণে। এ মূর্তি সদাজাগ্রত, কথা বলে। এ তর্কের কথা নয়। ভগবৎলীলা তর্কের অতীত। তর্ক দিয়ে কি তাঁকে স্পর্শ করা যায়?

প্রসন্নতা, করুণার কোমল আলোক। নীরবে বয়ে চলেছে চঞ্চল কর্মস্রোত।

কর্মের আহ্বানে সারাবৎসরই স্বামীজীকে সফর করে বেড়াতে হয়। বারাণসী, পুরীধাম, গয়াক্ষেত্র তো গোস্বামী সম্প্রদায়ের তীর্থভূমি। বারাণসীতে দরবেশজীর প্রতিষ্ঠিত মঠ, পুরীতে গোস্বামীপ্রভুর সমাধিমন্দির, গয়ায় তাঁর দীক্ষানিকেতন—আকাশগঙ্গা পাহাড়ের চূড়ায়। এইসব

নেতাজী চক্ষু হাঁসপাতাল গৃহ

আশ্রমে সারি সারি কুটির। উৎসবের সময় আসেন অগণিত ভক্ত, শিষ্য ও অনুরাগীবৃন্দ। স্বামীজীর জন্মোৎসব হয় শিবচতুর্দশীর পূর্বদিন। মেলা বসে। মহোৎসব হয়। আশ্রম হ'য়ে ওঠে জনারণ্য। কয়েকদিন বাস করেন অনেকে। তারপর হয় গুরুপূর্ণিমার উৎসব। শ্রাবণ মাসে। তখনও আসেন ভক্তের দল। আবার উৎসব প্রাঙ্গণ মুখর হ'য়ে ওঠে শারদীয়া পূজায়। লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত বেজে চলে উৎসবের বাঁশী। এ ছাড়াও সারা বৎসরে অতিথির আবির্ভাবের বিরাম নেই। দেশদেশান্তর থেকে তাঁরা আসছেন—আশ্রম কুটিরে বাস করছেন, হাসিমুখে গ্রহণ করছেন আশ্রমের শাকান্ন। আশ্রমে স্থায়ীভাবে থাকেন কয়েকজন সন্ন্যাসী ও কর্মী। কিন্তু অনাহূত, রবাহূতের দল প্রত্যহই আসেন। এই দারুণ দুর্দিনেও দুবেলা দীর্ঘ-পংক্তি পড়ে আহারের সময়। পাতা হয় সুদীর্ঘ চটের আসন। ভোজনপাত্র পূর্ণচন্দ্রাকৃতি শালপাতা। জগৎ-পাবন গোস্বামীপ্রভুর জয়ধ্বনি দিয়ে শুরু হয় শাকান্ন গ্রহণ, আবার জয়ধ্বনিতে শেষ। নিত্য নিয়মিত চলেছে এই পর্ব। এ আশ্রম এক যোগযুক্ত কর্মকেন্দ্র। নৈষ্কর্ম্যের আশ্রয় নয়। যাঁরা আছেন এখানে কর্মকে আশ্রয় করেই আছেন, আছেন সেবাকে আশ্রয় করে। দেবসেবা, অতিথিসেবা, গোসেবা, রোগীরসেবা, কিছু-না-কিছু কাজ নিয়েই আছেন। সকলের মুখে হাসি, সন্তোষের

তীর্থ পরিক্রমা প্রতি বৎসরের নিয়মিত কর্তব্যের তালিকায়। তাছাড়া দিল্লী, কানপুর, পাটনা, মজঃফরপুর, কটক, কোলকাতা তো আছেই। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে স্বামীজী উপস্থিত হন তাঁর অভীষ্ট স্থানে। কিন্তু বিশ্রামের সুখ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কাজ শেষ হবার পর মুহূর্তেই আবার যাত্রার শুরু। শারীরিক অসামর্থ্যও তাঁকে নিরস্ত করতে পারে না। অপরাজেয় তাঁর কর্মশক্তি। গত আট বৎসরের মধ্যে তিনবার গেছেন দীর্ঘ পদযাত্রায়—রথ নিয়ে মিছিল করে। ১৯৫৮ সালে শ্রীবৃন্দাবন, ১৯৬১তে নীলাচল, ১৯৬৩তে নবদ্বীপ ধাম। ঐতিহাসিক পদযাত্রা। আগে চলেছে গোস্বামী প্রভুর রথ সঙ্গে কীর্তন-মুখর ভক্ত সম্প্রদায়; মধ্যে ভাব-বিবশ তনু গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী। পথের দু'ধারে বিহ্বল জনতা দলে দলে ছুটে আসছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা হয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে পথের ধূলায়। গোঠে গোঠে ধেনুর পাল উন্মুখ হ'য়ে চেয়ে রয়েছে এই অপরূপ শোভাযাত্রার দিকে। চোখ দিয়ে জল ঝরছে অবিরল ধারায়। সে এক মহিমময় দৃশ্য! প্রত্যহই দিনের শেষে মিলেছে রাজকীয় অভ্যর্থনা—আহার্য্য ও আশ্রয়ের উদার নিমন্ত্রণ। চেষ্টা নেই, সন্ধান নেই—আপনি এসেছে—স্বতঃস্ফূর্ত। এই গোঁসাইজীর লীলা। যাঁর প্রেরণা তাঁরই আয়োজন। স্বামীজী যাত্রীদের বলেছেন, "তোমরা এগিয়ে চলো কীর্তন সম্বল ক'রে—গাও "ভজ গৌরাঙ্গ রাধাগোবিন্দ

ব্রহ্মনারায়ণ হরে কৃষ্ণ রাম," তোমাদের আহার ও আশ্রয়ের ভার তাঁর। সব ব্যবস্থা তিনি পথে পথে করে রেখেছেন। বর্ণে বর্ণে সত্য হ'য়েছে তাঁর আশ্বাস বাণী। প্রতি পদ-ক্ষেপে ঝরে পড়েছে গোস্বামী প্রভুর আশীর্বাদ। জয় জগৎ-পাবন শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর জয়!

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঁকারনাথ ঠাকুরের স্বাগত বাণী—

"বিজয়কৃষ্ণের বিজয়ভেরী বাজাতে বাজাতে সঘনে,

কলির কলুষ নাশিতে নাশিতে এস এস সখা সগণে।"

স্বামীজীর নীলাচল পদযাত্রার প্রাক্কালে একটি সুললিত হ্রস্ব কবিতার মাধ্যমে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন ওঙ্কারনাথজী। নীলাচলে পদার্পণ করা মাত্রই পদযাত্রীদের আদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তিনি সকলের আগে। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর গভীর স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন।

স্বামীজী 'চঞ্চল, সুদূরের পিয়াসী' পথিক। রামচন্দ্র-পুরের আকাশে বাতাসে ধূলিকণায় জড়িয়ে রয়েছে সেই ঘরছাড়ার আহ্বান। সাড়ে চারশ বছর আগে একদিন এই পথ দিয়ে যেতে যেতে সেই ডাক দিয়ে গেছেন চির-পথিক সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেব। আশ্রমের এক মাইলের মধ্যে ঝাড়খণ্ডের পথ। সেই পথেই তিনি গিয়েছিলেন নীলাচলের যাত্রী হয়ে—পাহাড় ও অরণ্য অতিক্রম করে—লীলাময়ের আহ্বানে। আজও তার সাক্ষী দাঁড়িয়ে আছে এক বটবৃক্ষ—যার ছায়ায় ক্ষণিকের বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে-ছিলেন মহাপ্রভু। আশ্রমের প্রতি উৎসবে যখন গ্রাম পরিক্রমায় যায় কীর্ত্তনের দল, এই বটবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করে তারা ভক্তিনম্রচিত্তে। এই পথই বারংবার ডাক দিয়েছে—স্বামীজীকে—বারংবার মাতিয়ে তুলেছে পথের নেশায়।

এই সেদিন এক ভক্ত প্রস্তাব করলেন—হোক্‌না আবার পদযাত্রার আয়োজন। স্বামীজী বললেন,—"দেহ অশক্ত, চরণ দুর্বল, আর বোধহয় হয়ে উঠবে না।" এ-ও এক লীলা। প্রতি যাত্রায় তিনি সারা পথ পদ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, পা ফুলেছে, ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। সব উপেক্ষা করে যাত্রাপথে এগিয়ে গেছেন তিনি। কী এ রহস্য! ভক্তেরা বলেন,—"প্রভু সকলের ব্যথা বেদনা হরণ করে নিজের অঙ্গে গ্রহণ করেছেন। না হলে এত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে কেন?" শুধু তাই নয়, আরও যে কত লীলা প্রকটিত হয়েছে যাত্রার পথে পথে, তার বিবরণ জুড়ে আছে যাত্রীদের খাতার পাতা, ডায়েরীর পাতা, মনের পট। লীলা—লীলা—শুধু লীলা। যুগ-যুগান্তরের ঐশ্বরিক লীলার অনুবর্ত্তন।

আশ্রমের সর্বত্র, দেয়ালে দেয়ালে, ফলকে ফলকে লেখা আছে স্বামীজীর অমৃতময় বাণী। তিনি বলেছেন, "প্রভু হইতে যাইও না, সত্যকার সেবক হও", আবার—"অহং-কার, প্রভুত্বপ্রিয়তা ও ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন না দিলে সত্যকার সেবক হওয়া যায় না।" তিনি বলেছেন, "সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল জাতির প্রত্যেকটি নর-নারী আমাদের আত্মীয়, বন্ধু, ভাইবোন। আমরা সকলের, সকলে আমাদের।" "প্রাণ ভরিয়া হাসো ও সকলকে বুকে জড়াইয়া ধরো।" তার নিজের জীবন তাঁর বাণীরই রূপায়ণ। যে ধর্মের আচরণ তিনি নিজে করেন, তাই শিক্ষা দেন অপরকে। তাঁর কথা ও কাজ এক। আধুনিক সভ্যতার বিধ্বংসী রূপটি তিনি উন্মোচিত করে দিয়েছেন, তাঁর আর একটি বাণীর মাধ্যমে,—"আজ আমরা সভ্যতার আবরণে চুরি করিতেছি, আমাদের আদর্শ ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে ডাকাত করিয়া তুলিবে। সাবধান!!" উদাত্তকণ্ঠে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন সত্যকার পথের,—"সত্যাশ্রয়ী না হইলে দেশ ও জাতির কল্যাণ করা যাইবে না, দেশকে দুর্নীতি ও গ্লানি মুক্ত কর।" "আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে সকল সংগঠন ব্যর্থ হইবে।" তিনি বলেছেন—সর্বাগ্রে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে সুচারুরূপে গড়ে তুলতে হবে, শিক্ষকদের সচেতন হতে হবে তাঁদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে। আর বলেছেন—গ্রামগুলিকে গড়ে তুলতে পারলেই দেশকে গড়া যাবে। তাঁর গভীর উপলব্ধি সঞ্জাত এই বাণীগুলি যেন অপচিত না হয়। যে মহাপুরুষ শুধু ধ্যানধারণার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে দেশ ও জাতির কল্যাণচিন্তনে নিজেকে নিত্য-নিয়ত যুক্ত রেখেছেন, প্রেমের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করে আপামর তৃষিত মানুষকে আহ্বান জানিয়ে-ছেন, আমরা যেন শুভবুদ্ধির বশবর্ত্তী হয়ে আত্মকল্যাণের উদ্দেশ্যেই তাঁর অমৃত মন্ত্রগুলি সার্থক করে তুলি। তাঁর কল্যাণস্পর্শে আমাদের জীবন মধুময় হোক্!

একটি রাত

শ্রীসপ্তর্ষি ভট্টাচার্য্য

বাইরে বারিবর্ষণের বিরাম নেই। অবিশ্রান্তভাবে সারাদিন বৃষ্টি ঝরে চলেছে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

গ্রীষ্মের পর বর্ষা নেমেছে। একটা হিম-শীতল স্পর্শ পৃথিবীতে বুলিয়ে দিয়েছে। বেশ লাগে এই বৃষ্টিঝরা রাতে ঝুম, ঝুম, ঝুমা-ঝুম তালের সাথে তাল ঠোকা।

দামী পারসীয়ান গালিচার উপর বসে সেতারে ছড় টানছিল চিত্রাভিনেত্রী সরমা রায়। একমনে বসে মেঘ-মল্লার আলাপ করছে। সেতারের টুং-টাং ঝংকার যেন বাইরের বৃষ্টির শব্দের সাথে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং……

হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে কলিং বেলটা।

ঝং, এক টা বিশ্রী রব তুলে সেতারে তাল কেটে যায়। কে আবার এল এই ভীষণ রাতে। কুকুর বেড়ালও বেরোতে পাচ্ছে না আর……

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং ক্রিং……

ধুত্তোর জ্বালালে দেখছি। মনে মনে একটু বিরক্তি বোধ করে সরমা। শ্লথ পদে এগিয়ে দরজাটা খুলে দেয়। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরটায় ঢুকে পড়ে।

Come in. শান্ত গলায় আহ্বান জানায় সে। ঘরে ঢোকে এক সম্পূর্ণ অপরিচিতা আগন্তুক। আপাদমস্তক ওয়াটারপ্রুফে মোড়া। ঝর, ঝর করে গা থেকে জল ঝরে পড়ছে। তার মুখ দেখে সরমা চমকে ওঠে। আশ্চর্য্য হয় সে। কে এই নারী এই ভয়াবহ রাতে একাকী বেরোতে সাহস পায়?

ততক্ষণে ওয়াটারপ্রুফটা খুলে রেখে হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রেখেছে সে। এতক্ষণে সম্পূর্ণ শরীর দেখতে পায় সরমা। লম্বায় বেশ উঁচু হবে। অন্তত বাঙালী মেয়েদের চেয়ে বেশী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রং, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখ।

বসুন, পাশের কৌচের দিকে আঙুল নির্দেশ করে সরমা তাকে বসতে বলে।

সেই থমথমে মুখের কোণায় এক ঝলক হাসি ঝিলিক মেরে ওঠে।

ধন্যবাদ, মৃদু হেসে কৌচে সে বসে পড়ে।

দেখুন, সরমা শুধায়, আপনাকে ত ঠিক চিনতে পারছি না আর কোথাও দেখেছি বলেও মনে হচ্ছেনা, আপনি কে বলুন ত?

আমি কে? আবার হাসে সেই আগন্তুকা তার আগে বলুন আপনি কে?

আমার নাম সরমা রায়।

ও।

অনেকক্ষণ কী এক স্তব্ধতা ঘরটায় ভরে যায়। দুই পক্ষই নীরব। কেউ বলার ভাষা খুঁজে পায় না।

সেই মেঘলা আবহাওয়া কাটানোর জন্যই হয়ত সরমা বলে ওঠে, কই বললেন না ত, আপনি কে?

আবার হাসে সেই নারী।

একি চুপ করে রইলেন কেন? বলুন, বলুন আমার কাছে কেন এসেছেন?

ছোট্ট একটা গল্প শোনাতে, পাথরের বুক থেকে যেন ভাষা বেরিয়ে আসে!

গল্প শোনাতে! অতিমাত্রায় বিস্মিত হয় সরমা। কী পাগলের মত কথা বলছেন? আপনি কে? একী, চুপ করে কেন, জবাব দিন? নয়ত আমি চেঁচাব, পুলিশ ডাকব, বলুন আপনি কে, কৌচ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে সরমা।

চুপ, ঠোঁটের ওপর এক আঙ্গুল রেখে মৃদুকণ্ঠে সরমাকে চুপ করতে বলে।

না, না, বলুন, বলুন আপনি কে? ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে ফেলে সরমা।

ডান হাতটা দিয়ে ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলে সেই নারী।

কী জানি কেন, কী এক ভীরু আকর্ষণে, নয়ত বা তার থমথমে মুখের পানে চেয়ে সুবোধ বালিকার মত বসে পড়ে!

এক নারীর ইতিকথা শুনবেন, মেয়েটি শুধায়।

না, দৃঢ় ভাবে জবাব দেয় সরমা।

আপনাকে যে শুনতে হবেই সরমা দেবী।

দোহাই আপনার, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি যান, আমি আর বসে থাকতে পারছি না, মিনতি ঝরে পড়ে গলা থেকে।

আবার হাসে মেয়েটি। শান্ত, গম্ভীর, মধুর হাসি। জীবনে সেই নারী সুখ পায়নি, মেয়েটি বলে চলে—নারীর সুখ স্বামীর কাছে। আর তার স্বামীই তাকে সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে। চমকে উঠছেন সরমা দেবী?

এই কী? কেন তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে নি জানেন? সামান্য রূপের মোহে, হ্যাঁ রূপের মোহেই তার নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে ভালবেসেছে অপর একজনকে। হয়ত মধুর আশায় ভীড় জমিয়েছে তার চারি পাশে, গুণ গুণ করে গান গেয়েছে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনতে থাকে সরমা। ঘরের মধ্যে কিছু একটা যেন থমথম করছে। পিন পড়লেও শব্দ শোনা যায়।

প্রথম থেকেই তবে বলি। বাজনা, বাজি, হৈ চৈয়ের মধ্যে দিয়ে ছেলেটা তাকে বিয়ে করে আনছে। ধীরে ধীরে এল ফুলশয্যার রাত। ঘরটা সুন্দরভাবে ফুল দিয়ে সাজান। রাত তখন অনেক হয়েছে। নিমন্ত্রিত অতিথিরা সব যে যার ঘরে চলে গেছে। আত্মীয়রাও ঘুমসাগরে ডুবন্ত। আড়ি পাতার মত লোকও কেউ নেই।

লাল টকটকে বেণারসী আর চন্দন তিলক পরে নববধূর সাজে ঘরে ঢুকল সে। রাগ করবেন না, ধরুন ছেলেটির নাম অনিরুদ্ধ আর মেয়েটির নাম নীরাজিতা।

অনিরুদ্ধ! নামটা শুনে আর একদফা চমকে ওঠে সরমা।

আবার অদ্ভুত ভাবে হাসে সেই আগন্তুকা।

চেয়ারের উপর মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল অনি। কী যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন সে। বাইরে হু হু করে বাতাস বইছে। হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া ঘরটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। সুর্মা টানা ঢুলুঢুলু চোখ মেলে অনিরুদ্ধর দিকে তাকাল নীরাজিতা, বললে, জানালাটা বন্ধ করে দেব।

চেয়ার থেকে বসে বসেই অনিরুদ্ধ জবাব দেয়, দরকার নেই।

শরীর খারাপ করছে?

না।

মাথা টিপে দেব?

এবার মুখ তুলে তাকাল অনি, আমায় বিরক্ত কর না, না নীরা, তুমি শোওগে যাও।

তুমি?

আমার কথা তোমায় চিন্তা করতে হবে না। আমি কী করি, না করি তা দেখার তোমার অধিকার নেই।

অধিকার নেই, কী এক ভীষণ লজ্জায় নীরাজিতার গাল রক্তিম হয়ে ওঠে। তার আশাভরা রঙিন স্বপ্নের ফানুস চুপসে যায়।

ভীষণ এক স্তব্ধতা ঘরটায় ছেয়ে যায়। বিছনার ওপর বসে ফুলের পাপড়ীগুলো ছিঁড়তে থাকে সে। হঠাৎ সেই স্তব্ধতা ভাঙে অনিরুদ্ধ, তোমার সাথে আমার একটা কথা ছিল।

কী, মুখ নিচু করেই নীরা জবাব দেয়।

তোমায় স্ত্রী রূপে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শান্ত গলায় অনিরুদ্ধ বলে।

নীরার হাত থেকে ফুলগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে। বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটিয়ে যাচ্ছে।

আমি অন্যের পাণিপ্রার্থী।

উঃ, এক বুকফাটা আর্তনাদ করে ওঠে নীরাজিতা। তার অবিশিষ্ট রঙিন আশা দপ্‌ করে নিবে যায়।

হ্যাঁ, তবে তোমায় আমি বেরিয়ে যেতে বলছি না। তুমি থাকবে সবই করবে। কেবল আমায় স্বামীর মত দেখবে না, অনি আবার বলে।

মনের মধ্যে বিয়ের রাতে উচ্চারণ করা মন্ত্র নীরাজিতার মনে ভেসে ওঠে, তবে সবই কী মিথ্যা ?

তবে, তবে কেন আমায় তুমি বিয়ে করলে ? বিড়বিড় ক'রে নীরা শুধায়।

কেন করলাম, হাসে অনিরুদ্ধ, তোমার বাবা মরার সময় আমার বাবার কাছে তোমায় তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর কথা রাখার জন্যই আমি তোমায় বিয়ে করেছি। থামে অনিরুদ্ধ। তারপর ঘরের কোণ থেকে মাদুরটা টেনে নিয়ে মেঝের উপর শুয়ে পরে। ঠায় বসে থাকে নীরাজিতা।

এমনিভাবে একমাস কেটে যায়। কেউ কারো সাথে কথা বলে না। দুইপক্ষই নীরব। আয়নার সম্মুখে যখন নীরাজিতা দাঁড়ায় তখন তার সিঁথির সিঁদুর তাকে বিদ্রূপ করে ওঠে। ঘষে তুলে ফেলতে চায় কিন্তু পারে কই ?

আস্তে আস্তে সবই যেন তার অসহ্য লাগে। স্বামীই যখন ত্যাগ করল তখন বেঁচে থেকে লাভ কী। স্বামী যাকে চায় যে তার সুখের কারন, তার কাছেই যখন থাকতে চায়, থাকুক না। কী দরকার তার বেঁচে। সে চলে যাবে। পরক্ষণেই তাবে তার স্বামীর পছন্দ করা বধূ যদি তাকে ভালভাবে না দেখতে পারে। তাই তার একদিন সেই মেয়েটির বাড়ী যেতেই হবে, পরখ করে আসতে হবে সে তার স্বামীর ভার নিতে পারবে কিনা। যদি পারে তবেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবে।

একদিন সে সুযোগ মিলে যায়। বাক্স খুঁজতে খুঁজতে একরাশ পত্র পেয়ে যায়। প্রেমপত্র।

হঠাৎ কোথা থেকে এক রাতজাগা পাখী কুৎসিত রব তুলে চলে যায়। চমকে ওঠে সরমা।

তারপর, হ্যাঁ তারপর সেই প্রেমপত্র থেকে তার স্বামীর প্রেয়সীর ঠিকানা খুঁজে নিতে নীরাজিতার বেগ পেতে হয় না। তার বাড়ী এসে তাকে স্বচক্ষে দেখে নীরাজিতা বুঝতে পারে এ পারবে তার স্বামীর ভার নিতে।

গল্প শেষ করে নীরাজিতা।

বলুন, বলুন আপনি কে ? চেঁচিয়ে ওঠে সরমা।

আমিই সেই হতভাগ্য নারী। ওয়াটারপ্রুফটা টেনে নিয়ে দরজার দিকে এগোয় নীরাজিতা, বলে, আচ্ছা চলি কেমন, নমস্কার।

বাইরে তখনও বৃষ্টি ঝরে চলেছে।

কবিতা

শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার কবিতাখানি
পড়িবেনা কেউ জানি,
সেদিন আর আসিবেনা
মোর খোঁজ কেহ করিবেনা।
হয়তো সৃষ্টিতে রয়েছে ফাঁকি
মন বলে—"আরো কিছু আঁকি,"

সুন্দর সত্যের উন্মেষ লাগি
শুধু বিধাতারে বর মাগি।
ইচ্ছা করি মানুষেরে ভালবেসে
লিখিব অমরকাব্য জীবনের শেষে।
মানবের দুঃখের হ'বে অবসান
সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান,

এই মতেরে রচিব স্বর্গ
তা'হবে প্রাণের চাওয়া অর্ঘ ॥

মুক্তিদাত্রী

(গঙ্গা স্তব)

১

এসো কাছে···আরো কাছে
শুনি তোমার জলের মুক্তি নূপুর বাজে।
সেই নটন আলোয় কাটে কালোর বাঁধন সকাল সাঁঝে।

২

ভালো বেসেছি মা তোমায় শিশুকালে।
গান গেয়েছি কতই উছাসে তোমার স্নেহের তালে।
আশা স্বপ্ন কতই পেয়েছে মা ভাষা তোমার নাচে
তোমার পেয়েছি পরশ বেদনায় কতই সকালসাঁঝে।

৩

যারা বলে : তুমি শুধুই জলের ঢেউ মা,
তারা প্রাণ-অতলে তোমার কোলের ডাক শোনে নি কেউ মা।
তাই জানে না—প্রেম তোমার ডাকে যে যেখানে আছে :
যারা কান পাতে—পায় শুনতে : "প্রেমের বুকেই প্রেমল রুজে।"

৪

তোমার আনন্দে পাই দিশা অন্ধকারে।
তোমার ছন্দে উজান বায় মা এ-প্রাণ পায় অভয় অপারে।
তুমি অমূল উধাও বাঁশি বাজাও : "মনের মানুষ আছে,
ওরে করলে বরণ তার শ্রীচরণ মরে মরা লাজে।
তার গাঁথলে মালা হয় উজালা জীবন সকাল সাঁঝে।"

এ গানটি দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকের সুর একই। স্বরলিপিতে কেবল দ্বিতীয় স্তবকের সুর দেওয়া হ'ল। হিন্দি গানটির সম্বন্ধেও ঐ কথা, অর্থাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবকের একই সুর। এ-গানটির সুর ভাটিয়ালি—বাংলার নদীর গান। ইন্দিরা দেবী এই সুরে তাঁর নামকীর্তনটি বানিয়েছেন—যাতে হরিকৃষ্ণ মন্দিরের সাধক সাধিকারা সবাই কোরাসে গাইতে পারেন। বাংলা গানটিও সহজেই কোরাসে গাওয়া যায়—খুবই সহজ সুর।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নামকীর্তন

(গঙ্গা স্তবের সুরে)

১

হরি গাও…হরি গাও।

জয় রাম সিয়াপতি রাম সিয়াপতি ধ্যাও !

জো রাম নাম সব সংকট কাটে,

সখি, রাম রো কোঁ্যা বিসরাও ?

২

জয় দশরথনন্দন দুখভঞ্জন রঘুরাঈ !

জয় সীতাবল্লভ ভবভয়হারণ রাম সদা সুখদায়ী,

জয় রাম সিয়াপতি রাম সিয়াপতি রাম সিয়াপতি ধ্যাও !

জয় রাম রাম সিরি রাম রাম সিরি রাম রাম নিত গাও !

হরি গাও…হরি গাও।

হরি নাম মধুর হরিনাম মধুর হরি ধ্যাও॥

৩

জয় মাধব মুকুন্দ মোহন মুরলীধারী !

জয় গিরি গোবর্ধন গোকুলচারী রাধানাথ মুরারি !

জয় রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ গাও !

জয় রাধে রাধে রাধে রাধে রাধে শ্যাম ধিয়াও।

হরি গাও…হরি গাও !

হরি নাম মধুর হারিনাম মধুর হরি ধ্যাও !

জয় মহাদেব শিব শম্ভু ত্রিশূলধারী !

জয় উমা মনোহর জয় যোগেশ্বর গঙ্গাধর ত্রিপুরারি !

জয় হর হর হর হর জয় শিব শঙ্কর জয় জগদীশ্বর ধ্যাও !

জয় হর হর ভোলা হর হর ভোলা হর হর ভোলা গাও !

হরি গাও…হরি গাও…

হরি নাম মধুর হরি নাম মধুর হরি ধ্যাও !

৫

জয় জয় দুখহারিণি দুর্গা গৌরী মৈয়া !

জয় জয় ভবতারিণি কালী মাতা জয় জয় গঙ্গা মৈয়া !

জয় সদ্‌গুরু গোবিন্দ এক শরীরী জয় গুরু জয় গুরু গাও !

সখি সদগুরু বিনি গতি নহী জগৎমে সদগুরু নাম ধিয়াও !

হরি গাও…হরি গাও।

হরি নাম মধুর হরিনাম মধুর হরি ধ্যাও !

ইন্দিরা দেবী

তাল—চতুর্মাত্রিক

II সা ন্‌া I সা -া গা -া | -া -া গা গা I গমা ধা পা -া | -া -া মা গা I
এ সো কা - ছে - - - আ রো কা - ছে - - - শু নি
হ রি গা - ও - - - হ রি গা - ও - - - জ য়

রগা -া গা -া | গমা ধা পা র্সপা I • মগা -া -া মা | গা রা সা রা I
তো - মা র জ - লে র মু - ক্‌ তি নূ - পু র
রা - ম সি য়া - প তি রা - ম সি য়া - প তি

সন্া -া সা -া | -া -া সা র্সা I র্সা -া র্সা -া | র্সা -া র্সা র্র্সা I না র্সা না ধা I
বা - জে - - - সে ই ন - ট ন আ - লো য় কা - টে -
ধ্যা - ও - - - জো - রা - ম না - ম স ব স ং ক ট

পা ধা ণা -া I পধা -া পা -া I -া -া মা গা I মা ধা ধা ণা | ধা পা পা ধা I
কা - লো - - - - - - - - র বাঁ - ধ ন স - কা ল
কা - টে - - - - - - - স খি রা - ম রো কেঁ্যা - বি স

মা পা মা গা | -া -া II সা না I সা -া গা -া | গা -া গা -া I গা মা মা পা I
সাঁ - ঝে - - - ভা লো বে - সে - ছি - মা - তো - মা য়
রা - ও - - - জ য় দ শ র থ ন ন্ দ ন দু খ ভ ন

পা ধা পা ধা I মা পা পা -া | -া -া পা ধা I ধা র্সা র্সা -া I র্সা -া র্সা র্র্সা I
শি - শু - কা - লে - - - গা ন গে - য়ে - ছি - ক -
জ ন র ঘু রা - ষ্ট - - - জ য় সী - তা - ব ল্ ল ভ

না র্সা না -া | ধা না ধপা -া I পা না না র্সা | না ধা ধা না I পধা -া পা -া I
ত ই উ - ছা - 'সে - তো - মা র স্নে - হে র তা - লে -
ভ ব ভ য় হা - র ণ রা - ম স দা - সু খ দা - য়ী -

-া -া মা গা I মা ধা -া ধা | ধা -া ধা ণা I ধা পা পা ধা | পা -া পা মা I
- - আ শা স্ব - প্ ন ক - ত ই পে য়ে - ছে - ছে -
- - জ য় রা - ম সি য়া - প তি রা - ম সি য়া - প তি

মা -া মা ধা | পা মা মা পা I গমা -া গা -া | -া -া গা মা I
ভা - ষা - তো - মা র না - চে - - - ক ত
রা - ম সি য়া - প তি ধ্যা - ও - - - জ য়

র্সা -া র্সা -া | না -া ধা -া I পা ধা পা -া | মা -া মা পা I
পে - য়ে - ছি - প - র শ বে - দ - না য়
রা - ম রা - ম সি রি রা - ম রা - ম সি রি

গা -া গা মা | গা -া রা গা I সরা -া সা -া | -া -া II
ক - ত ই স - কা ল সাঁ - ঝে - - - -
রা - ম রা - ম নি ত গা - ও

রাশিয়ার লোকসাহিত্য ও পুশ্‌কিন

মনোরঞ্জন মাইতি

রাশিয়ার সাহিত্য অনেকাংশেই তাদের লোকসাহিত্যের ভিত্তিভূমিতেই রচিত। রাশিয়ার সাহিত্য বলতে প্রথমেই বুঝি পুশ্‌কিনের বিরাট প্রতিভা। কেননা, রাশিয়ার সাহিত্য পুশ্‌কিনের আবির্ভাবের সংগে সংগেই নবজাতকের পবিত্রতা দেহে ধারণ করে শৈশব এবং যৌবনের কঠিন ও কোমল, মননশীল এবং সংযতাবেগপূর্ণ সম্ভাবনাময় দেহ-বল্লরীলাভের আকাঙ্ক্ষাপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। পুশ্‌কিনের সাহিত্য-ইমারত প্রাচীন রাশিয়ার লোকসংগীত ও লোককথার চুন-সুড়কী দিয়ে গঠিত। পুশ্‌কিনের অনেক সাহিত্য অনুবাদকের কাছে অনেকটা হতাশাব্যঞ্জক বলে মনে হয়। তার কারণ, তাঁর লেখার মধ্যে সহজ ও সাবলীল সুর। প্রত্যেকদেশের লোকসাহিত্য ঐ দেশের প্রাচীন লোক-মুখ থেকে সংগৃহীত ও গ্রথিত হয়। ঐ মুখের ভাষা যখন অনাবৃত সহজ এবং সরলভাবে কোন লেখক কর্তৃক লিখিত হয়, তখন সেই সহজকে আরো সহজ করে অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদককে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হয়। কেননা, অনুবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন একটা বিষয়কে সহজতর ও সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করা। কিন্তু যে জিনিষ একেবারে খোলা আকাশের মত সহজ, তাকে আরও সহজ করে প্রকাশ করা মুশ্‌কিল। সহজকে অনুকরণ করার প্রধান বাধা এইখানে। পুশ্‌কিনের সাহিত্যে এই নিরাবরণ ও নিরাভরণ সহজ এবং সাবলীল রূপ এসেছে যেহেতু তাঁর সাহিত্যের কংক্রিট—ভিত্তিভূমির মধ্যে প্রাচীন লোক-সাহিত্যের সহজতর সুর ফল্গুধারার মত অন্তঃসলিলারূপে প্রবাহিত বলে। তাই তাঁর সাহিত্যের অনেক সৃষ্টি অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক অনুবাদককে অতৃপ্তির বেদনা প্রকাশ করতে হয়েছে।

"No matter how deep and painful his inner experiences, he usually expresses them in the simplest manner imaginable. It does not take long, however, to discover that this simplicity is complexity crystallised and transmuted—by a kind of verbal alchemy—into poetic forms, the very perfection of which gives the impression of spontaneity. While giving much joy to reader, it is more than likely to be a translator's despair." রাশিয়ার লোককথায় যদি তথ্য আলোচনা করা যায় তবে দেখতে পাওয়া যাবে যে তার মধ্য দিয়ে আজকের রাশিয়ার আশা এবং আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পুশ্‌কিনের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে চিরন্তনত্বের বা 'Universality'র কথা অনেক সমালোচকরা বলেন, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এক জাতীয় আকাঙ্ক্ষা (National spirit)। এখন এই National spirit-এর মূল শিকড় কিন্তু রাশিয়ার প্রাচীন লোক-সাহিত্যের মধ্যেই প্রোথিত। কেননা, এ অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, একমাত্র রাশিয়ার লোকসাহিত্যের মধ্যেই ঐ দেশের এবং জাতির একটা ঐতিহ্যাশ্রিত অভীপ্সা প্রকাশ পেয়েছে। সেই দিক দিয়ে বলতে পারি রাশিয়ার সাহিত্য এবং সাহিত্যের মূল ভাবধারার সংগে পরস্পরের মধ্যে একটা নিবিড় যোগ-সূত্র রয়েছে। যেমন রয়েছে লোক-সাহিত্যের মূল সুরের সংগে আজকের বর্তমান রাশিয়ার একটা ঐতিহ্যগত মিলন সূত্র—

"What Dostoevsky appreciated in Pushkin was, above all the fusion of the Russion spirit, with his characteristic of all-embracing Universality···This Universality is to be found

only in Pushkin. So I repeat that he is a pssophetic phenomenon, because in his poetry he expressed the national spirit of our future which, already has come to pass. For, there is no power in the spirit to aspire to universality and to an all-embracing humanism."

আসলে পুশ্‌কিনের সাহিত্যে এই যে 'National spirit'—যার মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল "to aspire to Universality and to an all embracing humanism"—একে বলতে পারি রাশিয়ার লোক-সাহিত্যের মূল বক্তব্যের যোগ্য উত্তরাধিকারীর সার্থক প্রকাশ। পুশ্‌কিনের সাহিত্য-কৃতিত্বের মূল্যায়ন রাশিয়ার লোকসাহিত্যকে বাদ দিয়ে কিছুতেই সম্ভব নয়।

যখন পুশ্‌কিন পিটার্সবার্গে নির্বাসিত হ'ন তখন তাঁর সেই নির্বাসিত কালের (১৮১৭-২০) মধ্যে তাঁর সার্থক সৃষ্টি "Ruslan and Ludmila" কাব্য রচিত হয়। ছয়টি সর্গে সমাপ্ত এই কাব্য। এই কাব্যের মধ্যে প্রাচীন রাশিয়ার লোকগাথা—Folk Saga ও Bylina-র প্রকাশ লক্ষ্যণীয়। কাব্যের আরম্ভ আমাদের সেই মুহূর্তে প্রিন্স Vladimir-এর রাজপ্রাসাদে নিয়ে যায় যখন মহারাজ তাঁর কন্যা Ludmila-র সংগে বীর যুবক Ruslan-এর বিবাহ উৎসব যাপন করছেন। কিন্তু বিবাহের ভোজপর্বের পরেই হঠাৎ chernomov নামে এক ঐন্দ্রজালিক Ludmilaকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার অনেক দূরের রাজ-প্রাসাদে। তখন Ruslan এবং আর তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী যাত্রা করলো রাজকুমারীর সন্ধানে।—গোটা কবিতাটি চারজন সন্ধানীর যাত্রাপথের আশ্চর্যতম বর্ণনায় পরিপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে chernov-এর গুপ্ত প্রাসাদ থেকে রাজকুমারীকে উদ্ধার করে এবং সেই দীর্ঘ শ্মশ্রু বিশিষ্ট ঐন্দ্রজালিককে পরাজিত ও নিহত করে বিজয় গর্বে—ফিরলো তার নিজের রাজ্য kieveএ। কাব্যটি পড়ার পর রাশিয়ার অনেকগুলো লোককথা বা যাকে বলে Bylinaর কথা মনে পড়ে—যেখানে ঐ Kieve রাজ্যের প্রাচীন ও পৌরাণিক আখ্যানের খণ্ড খণ্ড কিংবদন্তী ও ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে লোকসাহিত্যের কায়া নির্মিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক এই কয়টি গল্প পড়তে পারেন। যেমন, 'Alyosha Popovich', 'The Priest's Son', 'Ilya of Muron and Solovei', 'Mikula the Ploughman' ইত্যাদি। পুশ্‌কিন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাচীন লোক-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন তা এক সমালোচকের একটি উক্তি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। পুশ্‌কিনের "The Robber Brothers" (লিখিত হয় ১৮২১ খৃঃ; কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৮২৫ খৃঃ অব্দে) কাব্য প্রসংগে এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

"Always keenly interested in the folk-song and tales about the Volga brigadar, specially those about the legendary seventeenth century dare-devil stenka Razin, he modified the theme accordingly."

শুধু পুশ্‌কিন কেন, Lermentov, glinka, nekrasov, rimsky-korsakov, tolstoy gorky এবং mayakovsky প্রভৃতি লেখকদের রচনা বিশ্লেষণ করেও দেখিয়ে দেওয়া যায় এঁদের লেখার উপরে লোক সাহিত্যের প্রভাব কতখানি পড়েছে। আসলে রাশিয়া কৃষক ও সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে সামাজিক অগ্রগতির মূল উৎসভূমি মনে করে—তাই প্রাচীন লোকসাহিত্যের প্রচারের মধ্যদিয়ে সাধারণ মানুষকে জাগানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

১৯৬৩ সালে লেনিন পুরস্কার পেলেন কবি গান-জাতোফ তার শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ 'হাই স্টার্স' এর জন্য। লোক-কাহিনীর ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট ইনি লোকসাহিত্যকে সমসাময়িক বিষয়বস্তুর দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। তাই বলছিলাম, রাশিয়ার আধুনিক সাহিত্যের পটভূমিকায় রয়েছে রাশিয়ার প্রাচীন লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যই হচ্ছে অপূর্ব পাত্র যেখানে সাহিত্য ও লোকজীবন অঙ্গাঙ্গী-ভাবে সম্পৃক্ত। প্রসঙ্গতঃ রুশ সমালোচক Blenski এর একটি উক্তি মনে পড়ছে অনেক বছর পূর্বে রুশ সাহিত্যিক-গণকে bliensky বলেছিলেন, romance খুব হয়েছে,—

'The element of a new romantic art shall be found in the life of the masses—'এর সার্থকতা আজকের রাশিয়ার সাহিত্যে আমরা লক্ষ্য করি। জন-সাধারণের জীবনের কাছে শিল্পকে পৌঁছে দেওয়াই বড় শিল্পীর কর্তব্য। Lowell টলস্টয়ের 'আর্ট' সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন,

"Tolstoy maintains that it is just the immensely diifficult task of carrying high messages of art to the common man—that is the supreme test of an artist's capacity to render mighty service to humanity."

রাশিয়ার বর্তমান সাহিত্যিকগণ আর্ট সম্পর্কে টলস্টয়ের এই ধারণারই এক একটি বাস্তবরূপ।

রাত এগারোটায়

নারায়ণ চক্রবর্তী

(একাঙ্ক নাটক)

চরিত্র

অজিত বোস	...	এ্যাটর্ণি। বয়স বেয়াল্লিশ।
বিনয় লাহিড়ী	...	ব্যারিষ্টার। বয়স বাহান্ন।
আলো	...	অজিতের স্ত্রী। বয়স আটাশ।

প্রথম দৃশ্য

[যবনিকা উঠলে দেখা যাবে একটি বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি, সামনে বাগান, মরশুমী ফুলের সমারোহ। একটি ঘরের খোলা জানালা দিয়ে আলোক-রশ্মি বাগানে এসে পড়েছে। বাগানের কাঠের গেট বন্ধ। তার বাইরে রাস্তা। একটি স্ট্রীট ল্যাম্পের আলোয় রাস্তাটা আলোকিত কিন্তু বাগান ও বাংলো আবছা অন্ধকারে ঢাকা।

উইংস্‌এর আড়াল থেকে দুটি লোক গেটের কাছাকাছি এসে দাড়াল, দু'জনেরই পরণে নিখুঁত ইউরোপীয়ান্ পোষাক। একজন অজিত বোস, বয়েস বেয়াল্লিশ, মোটা, বেঁটে, মাথায় টাক পড়েছে, রং ময়লা, মুখশ্রী চলনসই, মুখে চুরুট। অন্যজন বিনয় লাহিড়ী, বয়েস বাহান্ন, রোগা, লম্বা, ফর্সা, মুখে পাইপ।

ওরা ঢুকবার আগে মোটরকার-এর হর্ণ বাজবে, গাড়ি থামার শব্দ হবে।

সময় রাত দশটা

অজিত। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিষ্টার লাহিড়ী—

বিনয়। (শ্রাগ্ করে) নট্ এ্যাট্ অল্ মিষ্টার ভোস। আপনাকে আমার কারএ করে সামান্য একটু লিফ্ট্ দিয়েছি মাত্র,—এটা তো আমার নাগরিক কর্তব্য—

অজিত। তা ঠিক। কিন্তু এ যুগে আপন কর্তব্যে অবিচল লোক আর ক'টা আছে বলুন?

বিনয়। রাইট্ ইউ আর,—সিভিক্ সেন্স আছে এমন লোক এ দেশে আঙ্গুলে গোণা যায়—বাইশ বছর ধরে ব্যারিষ্টারী করছি, মানুষ চিনতে আর বাকী নেই আমার, ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে অসাধু ধাপ্পাবাজ সব—

অজিত। শুধু সিভিক্ সেন্সের জন্যই নয়, আর একটা বিশেষ কারণেও ধন্যবাদটা আপনার প্রাপ্য মিষ্টার লাহিড়ী—

বিনয়। ইজ ইট সো? তা হলে আর দেরী না করে প্রাপককে সেটা জানিয়ে দিন মিষ্টার ভোস।

অজিত। (স্পষ্ট উচ্চারণে) আজ রাত ঠিক দশটায় বাড়ি ফেরার বিশেষ প্রয়োজন ছিল আমার—আপনার লিফ্ট না পেলে হয়তো সব কিছু বানচাল হয়ে যেতো—

বিনয়। বান্‌চাল? ইউ মীন টপ্‌সী-টারভী?

অজিত। (অনেকটা আপন মনে) সর্বনাশ হয়ে যেতো,—লুপ্ত হয়ে যেতো জীবনের সুখ আর শান্তি—এই পৃথিবীতে আর মাথা তুলে দাড়াতে পারতাম না—

বিনয়। সর্বনাশ? হোয়াট ডু ইউ মীন মিষ্টার ভোস? কার সর্বনাশ? আপনার?

অজিত। (নিজেকে সামলে নিয়ে) ইয়ে—মানে—জানেন তো, আমার স্ত্রী অর্থাৎ আলোর হার্ট ভীষণ উইক, —তাই বেশী রাত হয়ে গেলে আবার—

বিনয়। ও, আই সী,—তা হলে এখন আপনাকে দেখেই মিসেস ভোসের হার্ট একেবারে যাকে বলে সিন্ধু-ঘোটকের মতো মজবুত হয়ে যাবে, তাই না মিষ্টার ভোস? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

অজিত। হার্ট-স্পেশালিষ্ট ডক্টর রয় ওকে সব সময়ে চিয়ারফুল রাখতে বলেছেন। কিন্তু আমার এই এটর্নীর

পেশাটাতে এত ঝকমারী যে চু'ঘণ্টার জন্যও আমার আলোকে আমি সঙ্গ দিতে পারি না মিষ্টার লাহিড়ী।

বিনয়। আউ পিটি হার লাক্। মিসেস ভোসের মতো সুন্দরী মহিলা লাখে একটিও মেলে কিনা সন্দেহ—

অজিত। ঠিক বলেছেন মিষ্টার লাহিড়ী,—আমার আলো সকাল বেলার সোনালি রোদের মতোই উজ্জ্বল, ঝকঝকে আর দীপ্তিময়ী ছিল। কিন্তু এই অসুখটাতে পড়ার পর থেকে সে যেন অস্তাস্তের ধূসরতার মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে,—কে জানে কবে সে এই নিকষ নিশীথ রাত্রির অন্ধকারের মাঝে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাবে!—ওঃ, আমি—আমি আর সহ্য করতে পারছি না মিষ্টার লাহিড়ী, —মনে হচ্ছে আমার বুক যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে পড়বে—

বিনয়। (সহানুভূতির সঙ্গে) ওয়েল, ডোণ্ট্ ওরি সো মাচ্ মিষ্টার ভোস,—ডক্টর রয়ের ট্রিটমেণ্ট যখন আছেন তখন আশা করি তিনি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠবেন, —আবার আপনারা সুখী হবেন—

অজিত। সুখী?

বিনয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুখী। স্ত্রী যদি অমন প্যারাগন অব্ বিউটি হন তা হলে সুখের ক্ষমতা কি যে আপনাকে ধরা না দেয়!

অজিত। ভুল, ভুল মিষ্টার লাহিড়ী, সুখের কথা বলছেন? সে তো সোনার হরিণ, চির-অধরা,—আমি জানি যে আমার জীবনের এ অন্ধকার কোনো দিন কাটবে না—আলো-নেভা সে অন্ধকারের কথা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না—

বিনয়। আজ বাইরেও কী ভীষণ অন্ধকার দেখছেন মিষ্টার ভোস? রাস্তার ঐ টিমটিম বাতিটা যেন অন্ধকারের সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে—

(ব্যাঙ আর ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ শোনা যাবে)

অজিত। কিন্তু একটু পরেই চাঁদ উঠবে, সব অন্ধকার লুপ্ত হয়ে যাবে,—পৃথিবী থেকে,—এমন কি অন্য সবার জীবন থেকেও,—নরম, স্নিগ্ধমধুর আলোকছটায় বিশ্বভুবন ঝলমল করে উঠবে।

বিনয়। ওয়াণ্ডারফুল, ওয়াণ্ডারফুল,—এটনী হলে কী হবে, আসলে আপনি একজন কবি মিষ্টার ভোস—

অজিত। হ্যাঁ। বিস্মৃতির অন্ধকারে যে দিনগুলি তলিয়ে যাচ্ছে—সে সব দিনে কাব্য চর্চা করেছি বইকি মিষ্টার লাহিড়ী। তাই এখনো প্রত্যেকটি নীরস আর বিরক্তিকর কাজকেও কাব্যসুষমায় মণ্ডিত করে তুলতে চাই,—অসুন্দরের ছলনাকে আমি ঘৃণা করি—

বিনয়। ও আই সী। তাই বুঝি কলকাতার বাইরে এই নির্জন পল্লীতে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রকাণ্ড বাগানের মাঝখানে এই ছোট্ট ছিমছাম বাংলোটি কিনেছেন মিষ্টার ভোস?

অজিত। হ্যাঁ। কারণ আমি বিশ্বাস করি যে মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করলেও প্রকৃতি কখনও তা করবে না।

বিনয়। ওয়েল, গুড্‌নাইট মিষ্টার ভোস,—চলি তা হলে—

অজিত। গুড্ নাইট—

[বিনয় ও অজিত পরস্পর করমর্দন করল। বিনয় যে পথে ঢুকেছিল সেই পথে চলে গেল। অজিত বাগানের গেট খুলে বাগানের ভেতর দিয়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল]

অজিত। (আবৃত্তির ঢংএ) হে স্তব্ধ নিশীথ! তোমার অন্ধকার আবরণের অন্তরালে তুমি যে কী ভয়ঙ্কর রহস্য লুকিয়ে রেখেছ তার সম্যক পরিচয় আমার জানা নেই,— কিন্তু আমার মনের অন্ধকার গুহায় যে অন্ধ দানবটা দাপাদাপি করছে তার চেয়ে ভীষণতর কিছু নিশ্চয়ই নয়। (নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে) আঃ,—ফুটন্ত গোলাপ তার গন্ধ-নিবিড় মধুর হৃদয়ের উষ্ণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছে,—আলো ও কি আর কোনো দিন এমনি আন্তরিক, এমনি নিবিড় অভ্যর্থনা জানাবে না আমাকে? না। হয়তো না। তার মন আজ বরফের মতোই ঠাণ্ডা, বরফের মতোই কঠিন। ঐ যে, তার শোবার ঘরের খোলা জানালা দিয়ে কয়েকটি আলোকরেখা বাগানে এসে পড়েছে। গানের সুর ভেসে আসছে…

(দরজায় টকটক শব্দ করল)

আলো। (ভেতর থেকে) কে? দরজা খোলাই আছে, ভেতরে এসো।

(দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো অজিত)

দৃশ্যান্তর

[আলোর শোবার ঘর। সুসজ্জিত। একদিকের

দেওয়ালের কাছে ইংলিশ খাট। যে দরজা দিয়ে অজিত ঢুকলো তার বিপরীত দিকে দুই দেওয়ালের সংযোগ কোণে ড্রেসিং টেবিল, তার ওপর আধুনিকতম রূপসজ্জার উপকরণ সাজানো। বাগানের দিকে একটি জানালা,—খোলা। মেঝের মাঝখানে একটা নীচু গোল টেবিল, দু'খানা বেতের চেয়ার। টেবিলের ফুলদানীতে টাটকা রক্ত-গোলাপ। ড্রেসিং টেবিলের বিপরীত কোণে ওয়ার্ডরোব। তার ওপর সাদা রংএর টেলিফোন। দেওয়ালে ফ্লুরোসেণ্ট লাইট।

আলো ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে একমনে রূপ-সজ্জায় মগ্ন। গুণ গুণ করে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে। প্রয়োজন হলে গানটা রেডিওতেও বাজতে পারে।

অজিত সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে বেতের চেয়ারে বসল। আলোর অনেকখানি খোলা পিঠ তার দিকে ফেরানো, সেদিকে তাকিয়ে অজিত যেন আর চোখ ফেরাতে পারল না]

[প্রসাধন করতে করতে গুণ গুণ করে গান গাইছিল আলো]

আলো। "আমার মনে মাঝে যে গান বাজে শুনতে
কি পাও গো।
আমার চোখের' পরে আভাস দিয়ে যখনি যাও গো॥
রবির কিরণ দেয় যে টানি ফুলের বুকের শিশির খানি,
আমার প্রাণের সে গান তুমি তেমনি কি নাও গো॥"

তোমার না এগারোটায় আসার কথা, এক ঘণ্টা আগেই চলে এলে যে? তর সইছিল না বুঝি?

অজিত। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে কার জন্যে এমন পরীটি সাজছো আলো?

আলো। (বিদ্যুৎ বেগে মুখ ঘুরিয়ে অজিতকে দেখে ভীষণ চমকে উঠলে) একি! তুমি!

অজিত। হ্যাঁ আমি। তোমার স্বামী। কিন্তু আমাকে দেখে তুমি অমন ভাবে চমকে উঠলে যে?

আলো। (বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে কাঁপা গলায়) কোথায় আবার চমকে উঠলাম? তোমার যতো সব উদ্ভট কথা—

অজিত। উদ্ভট কথা? তা হবে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে আমার বদলে আর কাউকে দেখবে বলে আশা করেছিলে তুমি,—অন্য কাউকে এক্সপেক্ট করছিলে।

আলো। (হাসবার চেষ্টা করে) হি হি হি, শোনো কথা? এত রাতে কাকে আবার এক্সপেক্ট করব? কী যে বলো তার ঠিক নেই—

[ক্ষণ নীরবতা। যেন মুখ লুকোবার জন্যই আলো আয়নায় তাকালো, কাঁপা হাতে লিপষ্টিক তুলে নিলো, আয়নার ভেতর দিয়ে অজিতকে দেখল। দেওয়াল ঘড়ি টক্ টক শব্দে সেই নীরবতাকে বাঙ্ময় করে তুলতে চেষ্টা করল]

অজিত। আচ্ছা আলো, বাড়িটা হঠাৎ খুব স্তব্ধ আর নিঃঝুম বলে মনে হচ্ছে না?

আলো। তা হতে পারে, বাড়িতে কেউ নেই যে—

অজিত। কেউ নেই? কোথায় গেল সব?

আলো। মোতির মা তার কোন এক পিসির সঙ্গে দেখা করতে গেছে উল্টোডিঙ্গায়—

অজিত। এত রাত হল, এখনো দেখছি ফিরলো না—

আলো। বলে গেছে যে আজ রাতে সে আর ফিরবে না—

অজিত। আর মোতি?

আলো। সে গেছে কলকাতায় থিয়েটার দেখতে কাল সকালে তার মাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবে—

অজিত। সে কী? এত বড়ো বাড়িতে তুমি একা? ভয় করছিল না?

আলো। একটুও না। একা থাকতেই তো আমার ভালো লাগে,—নির্জনতার স্বাদই তো সব চেয়ে মিষ্টি—

অজিত। ও। আর আমি হঠাৎ এসে পড়ায় সে স্বাদ বুঝি তেতো হয়ে উঠেছে? তাই বুঝি আমাকে দেখেই তোমার মুখখানা অমন রক্তহীন, সাদা হয়ে গিয়েছিল?

আলো। উঃ, বড্ড বাজে বকো তুমি। আমি কি তাই বলেছি? আজকাল প্রায়ই এ ধরণের খোঁচা-মারা কথা বলো কেন বলো তো? তুমি তো জানো এতে আমি কতো ব্যথা পাই মনে—

অজিত। যা আমি বলতে চাই না, তাই আমার মুখ

ফস্কে বেরিয়ে পড়ে মাঝেমাঝে,—আমাকে তুমি মাফ্ করো আলো—[অজিত ঘরময় পাইচারী করতে লাগলো]

আলো। করলুম, কিন্তু তোমার না কাল সকালে ফেরার কথা ছিল? রাত্রেই ফিরে এলে যে?

অজিত। আমার আলোর কাছে আমি ফিরে এসেছি,—তাতে কোনো অন্যায় হয়েছে কি?

আলো। (ঘুরে অজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে অসহিষ্ণু অধীর কণ্ঠে) আঃ, ন্যায়—অন্যায়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না এখানে, আজ দুপুরে কোর্টে যাবার সময়ে বলে গেলে যে কোন এক মামলার প্রয়োজনে আজ রাতটা তোমাকে চন্দননগরে কাটাতে হবে—

অজিত। (কাছে এসে আলোর কাঁধে হাত রেখে) মামলার প্রয়োজনের চেয়ে প্রিয়জনের সান্নিধ্যের দাম যে অনেক বেশী আলো—

আলো। (ডান হাতদিয়ে তার কাঁধ থেকে অজিতের হাত সরিয়ে দিয়ে) উঃ, তোমার কেবল হেঁয়ালী, কেবলই হেঁয়ালী,—একটা প্রশ্নেরও সোজা উত্তর দিতে পারো না তুমি?

অজিত। মামলার কাজটা হঠাৎ মুলতুবী হয়ে গেল, তাই আমি আমার প্রাণের আলো, আমার সুইট্, আমার ডার্লিং এর কাছে চলে এলাম। অন্যায় করলাম কি?

আলো। (নিস্পৃহ কণ্ঠে) তোমার বাড়িতে তুমি আসবে তাতে আবার অন্যায়টা কোথায়?

[ক্ষণ নীরবতা। অজিত অস্থির ভাবে ঘরের এ কোণে ও-কোণে ঘুরতে লাগলো, তারপর আলোর ডান পাশে এসে দাঁড়ালো]

অজিত। (গাঢ় কণ্ঠে) আলো—

আলো। (উত্তাপহীন কণ্ঠে) কী?...একটু সরে দাঁড়াও প্লীজ, আয়নায় ছায়া পড়ছে, মুখ দেখতে পাচ্ছি না—

অজিত। না না, আয়নায় নয়, আয়নায় নয়, আমার চোখের তারায় তোমার মুখ দেখ আলো—

আলো। আচ্ছা, তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো? তখন থেকে শুধু আবোল তাবোল বকছ—

অজিত। আবোল তাবোল? প্রেমের অভিব্যক্তিকে তুমি আবোল তাবোল বলছ?

আলো। (ব্যঙ্গের সুরে) প্রেম যে একেবারে উথলে উঠেছে আজ—

অজিত। উঠবে না? কী চমৎকার সেজেছ তুমি আজ? সিম্পলি র‍্যাভিশিং—

(আলোকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে গেল)

আলো। (মুখ সরিয়ে নিয়ে অজিতকে দু' হাতে ঠেলে দিয়ে) আঃ, এ কী করছ? ? ছাড়ো ছাড়ো,—আঃ, ছা ড়ো না—বাড়ি এলেই বড্ড বিরক্ত করো তুমি,—ভালো লাগে না এ সব—

অজিত। (অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) আজকাল আমার ছোঁয়াও তোমার কাছে অসহ্য বোধ হয়, তাই না আলো? অবসিত প্রেম বুঝি তার প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসছে?

আলো। বাঃ, তা কেন? তবে জানো তো আমার হার্টের অবস্থা,—অমন হুড়োহুড়ি করলে কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়ি। তা না হলে স্ত্রী হয়ে তোমার ভালোবাসাকে অগ্রাহ্য করতাম কি করে বলো? দেখনা, এই সামান্য উত্তেজনাতেই বুকের ভেতরটা কেমন ধুকপুক করছে—

অজিত। অ। তাই বুঝি আমি আসবার পর থেকেই তোমার মুখখানা অমন ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। ওষুধটা নিয়ে আসব? খাবে?

আলো। ওষুধ? উম্,—নাঃ, থাক। তার চেয়ে তুমি বরং দু'মিনিটের জন্য লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বোসো, আমি—আমি, শাড়িটা পাল্‌টে নি—কেমন?

অজিত। রাত এখন সাড়ে দশটা,—এমন শাড়ি পালটাবে কী?

আলো। বাগানে গিয়ে একটু পায়চারী করব, হয়তো তাতে বুকের ব্যথাটা একটু কমবে। যাও না, লক্ষ্মীটি—

অজিত। আচ্ছাঃ। বেশী দেরী কোরো না কিন্তু, বেড়িয়ে এসেই এগারোটার মধ্যে আমরা শুয়ে পড়ব, কেমন?

আলো। (সভয়ে) এ-গা-রো-টা! এ-গা-রো-টা!

অজিত। হ্যাঁ, এগারোটা,—কেন, কী হয়েছে তাতে?

আলো। (সবলে নিজেকে সামলে নিয়ে) নাঃ, কী আবার হবে? হয়নি কিছু।...কিন্তু তুমি আর দেরী

কোরো না, চুপটি করে লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বোসো, আমি তৈরী হয়ে সেখান থেকে তোমাকে ডেকে নেব, কেমন ?

অজিত। আচ্ছা—

[অজিত দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। আলো বন্ধ দরজার দিকে তাকালো, উঠে দাঁড়ালো, অস্থিরভাবে ঘরময় ঘুরতে লাগলো, গভীর মানসিক উত্তেজনার অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো তার প্রসাধন-সুন্দর মুখে।

আলো। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) এগারোটা বাজতে আর দেরী নেই, উঃ, আমি কী করি এখন ? কী করি— কী করি,…ও, হ্যাঁ,—টেলিফোন, –টেলিফোন,—দেখি টেলিফোনে পাই কি না—

[টেলিফোনের কাছে গিয়ে ফোন তুলে নিল, দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে ডায়াল করল। নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল, সন্তর্পণে ঘরে ঢুকলো অজিত, দরজার কাছে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো]

আলো। হ্যালো,…কী বললেন ? এনগেজড্ ? তা হলে…তা হলে উপায় ? উঃ, আমার নিজের হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে করছে এখন—

অজিত। (নিঃশব্দ পায়ে আলোর পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ এনে) এত রাতে কাকে ফোন করছিলে আলো ?

আলো। (বিদ্যুবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে) কে ? ও, ও তুমি ? (হঠাৎ রেগে উঠে) আবার এসেছ তুমি ? তোমাকে না বললাম লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বসতে—

অজিত। (গম্ভীর ভাবে) আমার প্রশ্নের জবাব দাও। এত রাত্রে কাকে ফোন করছিলে তুমি ?

আলো। ফোন ? ফোন ? ও ফোন ? হ্যাঁ হ্যাঁ,— মুক্তিকে মুক্তিকে—

(আলো হাঁপাতে লাগলো)

অজিত। মুক্তি ? কে সে ?

আলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, মুক্তি, মুক্তি,—সেই যে,—খুব সুন্দর দেখতে মেয়েটা,—টুকুদার বোন,—আমার বান্ধবী, কাল আমার সঙ্গে 'মাই ফেয়ার লেডী' দেখতে যাবে কি না জিজ্ঞেস করছিলাম—

অজিত। ও, তাই বলো। তা বেশ তো ফোন করো জেনে নাও—

(টেলিফোন বেজে উঠলো)

ঐ তোমার কল এসেছে,—ধরো ফোন্‌টা—

আলো। (ইতস্তত: করে) নাঃ, থাক কাল সকালে কথা বলব'খন—

অজিত। কিন্তু ফোনটা যে বেজেই চলেছে—

আলো। বাজুক না, একটু পরেই আপনি থে[মে] যাবে—

অজিত। আচ্ছা, তুমি না ধরতে চাও তো আমি ধরি—

(অজিত ফোন ধরতে এগিয়ে গেল, আলো বিদ্যুদ্বেগে ফোন আড়াল করে দাঁড়াল)

আলো। (হাঁপাতে হাঁপাতে) কিছুতেই না—খবর দার না,—ও ফোন তোমাকে আমি ধরতে দেব না। ছিঃ আমাকে এত অবিশ্বাস তোমার ?

অজিত। কী হল তোমার আলো ? অমন কর[ছ] কেন ? তোমার বান্ধবীর সঙ্গে দু'টো কথা বললেই কি আমি তার প্রেমে পড়ে যাবো ভেবেছ ? হা হা হা হা-

আলো। (টেন্‌শন কেটে যাবার সুযোগ নিয়ে তর[ল] কণ্ঠে) পড়তেও তো পারো,—পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস কি–

অজিত। আর মেয়েদের ?—মেয়েদের বুঝি সব সম[য়] বিশ্বাস করতে হবে ?—

আলো। হবেই তো—

অজিত। কোনো মেয়ে যদি সে বিশ্বাসের মর্যাদ[া] না রাখে ?

আলো। বিশ্বাসের মর্যাদা না রাখে ? তাও কি কখনো হয় ? কী বিশ্রী কথা তোমার।—ইয়ে, (হঠা[ৎ] আদরে গলায়) কথা কাটাকাটি আর ভালো লাগছে না —এসো না একটু গল্প করি দু'জনে—

অজিত। কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি না বাগানে বেড়াতে যাবে বলছিলে—

আলো। থাক, বেড়াতে যেতে আর ইচ্ছে করছে না– তুমি ঐ বেতের চেয়ারটাতে বোসো, আমি বিছানায় ব[সে] একটু রেষ্ট নিয়ে নি —

অজিত। বেশ—

[আলো বিছানার মাঝখানে বসল, অজিত একটা বেতের চেয়ার টেনে এনে তার কাছে এসে বসল। আলো মাঝে মাঝে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল]

অজিত। (চুরুট ধরিয়ে) বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছ কেন আলো? এগারোটা বাজতে এখনো পনেরো মিনিট বাকী। তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?

আলো। (কী যেন ভাবছিল, চমকে উঠলো) এঁ্যা! ঘুম? কই না তো,—আচ্ছা, ঘড়িটা যদি পৌনে এগারোটাতেই থেমে থাকে তা হলে বেশ হয়, তাই না?

অজিত। জীবন কখনো সময়কে স্তব্ধ করে দিতে পারে না আলো,—পারে একমাত্র—

আলো। কে? কে পারে? (চীৎকার করে) ওগো, কে পারে?

অজিত। মৃত্যু—

আলো। মৃ—ত্যু? মৃ—ত্যু?

অজিত। হঁ্যা, মৃত্যু। একমাত্র মৃত্যুর তুহিনস্পর্শেই সময়ের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়, মৃতের বয়েস আর বাড়ে না—(হঠাৎ হালকা সুরে) জানো আলো, তুমি হঠাৎ ভয় পাবে বলে এতক্ষণ বলিনি, ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেছে আজ—

আলো। ভীষণ কাণ্ড?

অজিত। হঁ্যা। আজই বিকেলে একটা লোক ট্রাক চাপা পড়ল—একেবারে আমার চোখের সামনে,—উঃ, সে কী ভীষণ দৃশ্য? চোখের পলকে ছাতু হয়ে গেল লোকটা—

আলো। আহা বেচারা,—কেমন লোক? বুড়ো?

অজিত। না না। বুড়ো হবে কেন? জোয়ান বয়েস লম্বা চেহারা, টকটক করছে গায়ের রং—

আলো। আহা রে,—তেল থাকতে জীবনদীপ নিভে যাবার কোনো অর্থ হয় না—

অজিত। সত্যিই হয় না আলো, তাই তো মুহূর্তের মধ্যে—আপিস-ছুটি ঘর-মুখো বাবুরা ভীড় করে ঘিরে দাঁড়াল, হায় হায় করে উঠলো। আমি বড় কষ্টে ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে তাকিয়ে দেখেই চমকে উঠলাম—

আলো। চমকে উঠলে? কেন?

অজিত। লোকটি যে আমাদের চেনা—

আলো। আ-মা-দে-র-চে-না? কে সে?

অজিত। সেই যে, মাস ছয়েক আগে আমার কাছে মুহুরীর কাজ করত একটা লোক,—কী নাম যেন? উম্ উম্ · ও হঁ্যা, মনে পড়েছে,—মলয়—মলয় ব্যানার্জি—

আলো। (হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত ভাবে) কী? কী নাম বললে?

অজিত। মলয় ব্যানার্জি। মনে নেই তোমার? সেই যে হঠাৎ একদিন তোমার সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করতে দেখে যাকে আমি চাকরী থেকে বরখাস্ত করেছিলাম,—আমাকে দেখে নেবে বলে শাসিয়ে যে লোকটা চলে গিয়েছিল—

[আলোর মুখ সাদা হয়ে গেল, কোলের ওপর রাখা হাত দুখানা কাঁপতে লাগলো, অতি কষ্টে চোখের জল ঠেকিয়ে রাখল]

আলো। (আত্মগত ভাবে) ম-ল-য়-মা-রা-গে-ছে? ম-ল-য়-মা-রা-গে-ছে!

অজিত। [চেয়ার ছেড়ে উঠে আলোর সামনে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে] একী? তোমার কী হল আলো? তোমার মুখ যে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে,—তুমি অমন ভাবে কাঁপছ কেন? কী বকছ বিড়বিড় করে?

আলো। [প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে] ও, কিছু না,—তোমার কথা শুনে বুকটা এমন ধড়মড় করে উঠলো—

অজিত। তা তো করবেই,—এতো বড়ো একটা শক্ পেলে—

আলো। শক্? কিসের শক্? আমি কেন শক্ পেতে যাবো?

অজিত। তা শক্ না পাও, শোকও তো পেতে পারো?

আলো। প্রায়-অচেনা লোকের জন্য শোক করব আমি? এ সব আজে বাজে কথার অর্থ কী আমি জান্‌তে চাই।

অজিত। আহা, কথাটা ওভাবে নিচ্ছ কেন তুমি? আর প্রায় অচেনাই বা বলছ কেন? মলয়কে নিশ্চয়ই ভালোভাবে মনে আছে তোমার—

আলো। [কৃত্রিম হাসি হেসে] হি হি হি হি,—তোমার যেমন কথা! কে না কে মলয়, আমি তাকে

মনে রাখতে যাবো কেন ? তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ?

অজিত। সে তো ঠিক কথাই, তবে কথাটা কী জানো, ঐ মলয় লোকটা ছিল বড্ড বেপরোয়া, অনেকটা বর্বর টাইপের, যা তার কাম্য বস্তু তাই যেন সে ছিনিয়ে নিতে চাইতো, তাই তাকে ভোলা একটু শক্ত—

আলো। [আপন মনে] তাকেই তো বলি পুরুষ। মেয়েলি প্যানপ্যানানি ওর ধাতে ছিল না। ও ছিল রাবণের মতো দুঃসাহসী, দুর্যোধনের মতো দুর্বিনীত। ওর বলদৃপ্ত বাহু দুটি আর লোহার মতো শক্ত বুকটাই ছিল মেয়েদের যোগ্য আশ্রয়—

অজিত। [উঠে চেয়ারে বসতে বসতে] বিড়বিড় করে আপন মনে কী বলছ আলো ?

আলো। কিছু না বড্ড ক্লান্ত লাগছে,—আমি—আমি শুয়ে পড়ি, কেমন ? তুমি আজ রাতে আর আমাকে বিরক্ত কোরো না লক্ষ্মীটি, পাশের ঘরে ঘুমিও, কেমন ?

অজিত। এখনই শোবে তুমি ?

আলো। হ্যাঁ। ভালো লাগছে না,—কিছুই ভালো লাগছে না,—অন্ধকারের সমুদ্রে সাঁতার কাটা পৃথিবীটাতে ভালো বলতে যেন আর কিছুই নেই—

অজিত। এ কথা বলছ কেন আলো ? আমি আছি, তুমি আছো, আর আছে আমাদের সুখনীড়, ভালো লাগবার অজস্র উপকরণ ছড়িয়ে আছে চারদিকে, জীবনের সমুদ্রবেলায় তারা বর্ণাঢ্য ঝিনুকের মতো ছড়িয়ে আছে, আঁচল ভরে তুলে নাও—

আলো। আর কথা নয়, আমায় একটু একা থাকতে দাও,—ভীষণ অবসন্ন বোধ করছি আমি, বুকের ভেতরটাতে যে কী হচ্ছে…ওগো, তোমার পায়ে পড়ি,—আমায় একটু একা থাকতে দাও, প্লীজ —

অজিত। কিন্তু মলয় সম্পর্কে সব চেয়ে মজার কথাটাই যে বলা হয়নি এখনো—

আলো। মৃত্যুর আঘাতে সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পরেও কি মজার তলানীটুকু পড়ে থাকে ?

অজিত। থাকে বই কি আলো। মৃত্যু শুধু জীবনের স্পন্দনটুকুই শেষ করে দেয়, আর সবই তো বজায় থাকে। আর এ কথাটা তো তোমার চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানে না—

আলো। [বিমূঢ়ভাবে] আমার চাইতে ভালো করে আর কেউ জানে না ?

অজিত। না। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার মতো উৎসাহ আর কার ? আর কে অত প্ল্যানচেট্ বসিয়েছে ? বিদেহী আত্মার আবির্ভাব দেখেছে ?

আলো। হ্যাঁ, ও নিয়ে আমার কিছু পড়াশোনা আছে,কিন্তু তার সঙ্গে মলয়ের এ্যাক্সিডেণ্টের কী সম্পর্ক ?

অজিত। কথাটা তা হলে খুলেই বলি। মলয়ের এক প্রেমিকা আছে,—ও কী ? অমনভাবে চমকে উঠলে কেন আলো ?

আলো। (জোর করে পরিহাসের সুরে) তুমি তো আজ সব ব্যাপারেই আমাকে চমকে উঠতে দেখছ,—সত্যি বলছি চমকাই নি, ও তোমার চোখের ভুল—

অজিত। চোখের ভুল ? হয়তো তাই, কিন্তু যে মারা গেছে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো, কী বলো, আলো ?

আলো। না না, তুমি বলো, আমার শুনতে ভীষণ ইচ্ছে করছে,—কে তার প্রেমিকা ? কী তার নাম ? কেমন দেখতে ? কতো বয়েস ?

অজিত। বাপরে বাপ, একঝাঁক প্রশ্ন ? কিন্তু আমার উত্তর তোমাকে নিরাশ করবে আলো—

আলো। তার মানে ?

অজিত। মানে মলয়ের প্রেমিকা যে কে তা আমি জানি না, তবে—

আলো। (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে) জানো না ?

অজিত। না, তবে—

আলো। (উদ্বেগহীন কণ্ঠে) তবে আবার কী ?

অজিত। তবে এ্যাক্সিডেণ্টের এক ঘণ্টা আগে মলয় তাকে ফোন করেছিল—

আলো। (ভয়ানক চমকে) ফোন ?

অজিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফোন। আজ বিকেল চারটায়, —মলয় ফোন করেছিল তার প্রেমিকার কাছে,—আমি নিজের কানে শুনেছি—

[ঘরে মৃত্যু-তুহিন নীরবতা নেমে এলো। দেওয়াল ঘড়ির টকটক্ শব্দ শোনা গেল। পাণ্ডুর মুখে আলো স্থির-চোখে তাকিয়ে রইলো অজিতের মুখে]

আলো। (দুর্বল, কাঁপা গলায়) তুমি—তুমি কী করে জানলে সেই ফোনের কথা?

অজিত। আমি তখন কোর্টের টেলিফোন বুথের পাশে আলমারীর আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা ল' জার্ণাল দেখছিলাম, এমন সময়ে কোত্থেকে হন্তদন্ত হয়ে মলয় এসে ফোন তুলে নিল, ফর্সা আঙ্গুলে অভ্যস্ত নিপুণতার সঙ্গে ডায়াল করল।

আলো। (নিরুদ্ধ নিশ্বাসে) তারপর?

অজিত। আড়ি আমি পাততে চাই নি, তবে ওর কথার দু চারটে ভগ্নাংশ আমার কানে আসছিল,—ও কী? শুয়ে পড়লে যে আলো? তোমার বুকের ব্যথাটা কি আবার বাড়ল? তা হলে এ গল্প থাক,—ঘুমাও তুমি—

আলো। (বিকৃত স্বরে) ও কিছু নয়, তুমি বলো,—এই যে, আবার আমি উঠে বসেছি,—বলো,—কী কী শুনেছ সব, স—ব বলো—

অজিত। ওর বান্ধবীর কী কথার উত্তরে মলয় বলল যে রাত এগারোটায় সে নিশ্চয়ই যাবে তার কাছে। শোবার ঘরের বাগানের দিকের জানালাটা যেন খুলে রাখা হয়। আরও বলল যে চিরজীবনের মতো নিষ্কণ্টক হবার একটা মতলব ওর মাথায় এসেছে—

আলো। (বিহ্বলভাবে) চিরজীবনের মতো নিষ্কণ্টক!

অজিত। হ্যাঁ, তাই তো বলল সে। তাদের সুখের পথের কাঁটাটি চিরজীবনের মতো সরিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করল। আমার মনে হয় যে মলয়ের প্রেমিকা হয়তো বিবাহিতা মহিলা—

আলো। (অস্ফুট স্বরে) বি-বা-হি-তা মহিলা?

অজিত। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি হাত দিয়ে অমনভাবে বুক চেপে ধরলে কেন আলো? বাগানের দিকের ঐ খোলা জানালাটা দিয়ে আসা শীতের হাওয়া হয়তো তোমাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। জানালাটা বন্ধ করে দি, কেমন?

আলো। (দুর্বল কণ্ঠে) তাই দাও—তাই দাও, আর—আর ঐ আলোটা, ঐ আলোটাও নিভিয়ে দাও—বড্ড চোখে লাগছে—

[অজিত উঠে জানালা বন্ধ করে দিল। লাইট অফ করে দিল। জানালার কাচ দিয়ে সামান্য জ্যোৎস্নার ম্লান আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।]

আলো। (আপনমনে) আঃ,—কী নিবিড় অন্ধকার! মৃত্যুর মতো গহন, গভীর। আমার মন, আমার শরীর, আমার সমস্ত সত্তা,—সব কিছু এই অন্ধকারে ঢেকে যাক, লুপ্ত হয়ে যাক—

অজিত। (জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে) এই রকম অন্ধকারেই তো অতৃপ্ত বিদেহী আত্মারা আপন প্রিয়জনের খোঁজে পৃথিবীতে নেমে আসে, তাই না আলো? হয়তো—

আলো। (ভয়ার্ত চীৎকারে) ওগো, আমাকে তুমি এ ভাবে ভয় দেখাচ্ছ কেন?

অজিত। ভয়? ভয়ের কী আছে এতে? তুমি নিশ্চয়ই জানো যে ভয়ানক একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছুটে আসা কোনো লোক যদি হঠাৎ মারা যায় তা হলে তার আত্মা বুঝতেই পারে না যে তার দেহের আশ্রয় ভেঙ্গে গেছে। সে নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক এসে তার প্রিয়জনকে দেখা দেয়—

আলো। (ভয় পেয়ে) তা হলে কি তুমি বলতে চাও যে মলয়,—না না না। এ হতেই পারে না,—সে আসতে পারে না।

অজিত। (হিস হিস শব্দে) পারে আলো পারে—তুমি বেশ ভালো ভাবেই জানো যে মলয় তার প্রেমিকার কাছে আসতে পারে—স্বয়ং মৃত্যুও তাকে আজ আটকাতে পারবেনা—

আলো। (হাঁপাতে হাঁপাতে) তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে তুমি তার প্রেমিকাকে চেন (চীৎকার করে) বলো সত্যি কি না—

অজিত। না আলো, আমি সত্যিই তাকে চিনি না, ফোন করবার সময়ে মলয় তাকে একবারও নাম ধরে ডাকে নি—

আলো। আঃ—কী শান্তি,—কী স্বস্তি—

অজিত। কিসের শান্তি, কিসের স্বস্তি আলো?

আলো। কিছু না।

[দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে এগারোটা বাজার শব্দ হল]

আলো। (ভয়ার্ত কণ্ঠে) ওগো? ও কিসের শব্দ?

অজিত। ঘড়িতে এগারোটা বাজার শব্দ—

আলো। । না না, এ শব্দ নয়, এ শব্দ নয়, অন্য আর একটা শব্দ,—শুনতে পাচ্ছ না তুমি ?

[বাইরের বাগানে শিশ দিয়ে "বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহী"র সুর]

অজিত। অন্য শব্দ ? কোথায় ?

আলো। (আকুল ভাবে) ঐ যে,—শিশ দিয়ে হিন্দী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কে যেন বাগান দিয়ে এগিয়ে আসছে—

অজিত। কী আবোল তাবোল বকছ আলো! কে আবার এত রাতে আমাদের বাগানে আসবে ? কোনো গানের সুরই তো আমি শুনতে পাচ্ছি না—

আলো। (উঠে দাঁড়িয়ে অস্থির ভাবে) কিন্তু—কিন্তু আমি যে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি,—ঐ—ঐ –, ওগো আমাকে ধরে একটু জানালার কাছে নিয়ে চলো না,—আমার হাত পা সব যেন অবশ হয়ে আসছে—

অজিত। বেশ তো, চলো……

[আলোকে ধরে ধরে জানালার কাছে নিয়ে এলো অজিত]

অজিত। জানালাটা খুলে দেব আলো ?

আলো। (ফিসফিস করে) দাও,—তাই দাও—তাই দাও।

[অজিত জানালাটা খুলে দিল। ঝিঁঝিঁ পোকা আর ব্যাংএর ঐক্যতান শোনা গেল। শিশ দেবার শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল]

অজিত। বাঃ, কী সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। ঘাসের পাতাগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতিই প্রকৃত রূপসী, তাই না অলো ?

আলো। (জানালার বাইরে কী দেখে হঠাৎ অজিতের বাহু খামচে ধরে ভয়ার্ত স্বরে) ওগো…

অজিত। কী ? ভয় কী আলো,—এই তো আমি তোমার পাশেই আছি—

আলো। আরও কাছে এসো, আরও,—আরও, —ঐ গ্যাখ, দেখেছ ?

অজিত। (বাইরে তাকিয়ে) কী ? কী দেখব আলো ?

আলো। (বিকৃত স্বরে) সে এসেছে,—সে এসেছে, —হায় ভগবান, এ আসা আর সে আসার মাঝখানে যে জীবনমৃত্যুর ব্যবধান,—এ আসা আমি চাইনি,—চাইনি, —চাইনি—

(আলো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো)

অজিত। কী সব আজে বাজে কথা বলছ আলো ? কে এসেছে ? কার আসা তুমি চাও নি ?

আলো। ঐ যে, ঐ গোলাপঝাড়ের পাশে, এই জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে,—ওর মুখে চাঁদের আলো এসে পড়েছে,—ওঃ, ওঃ, কী ভয়ানক! মৃত্যুর পরেও এমন জীবন্ত দেখাচ্ছে কী করে ওকে ?

অজিত। কোথায় কে ? কিছুই তো নেই। ও,—ওটা ? ওটা তো কবরী গাছের ছায়া—

আলো। না না—ছায়া নয়, মায়া নয়, — কায়া —কায়া,—ঠিক যেন রক্তমাংসের কায়া,—ও এসেছে আমাকে নিতে। আমার হাত পা সব অবশ হয়ে আসছে—বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠছে,—ওগো, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও,—এই জীবন, এই সুখ আর সম্ভোগ-ভরা পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে আমি চাই না—বাঁচাও,—ওর হাত থেকে আমাকে বাঁ—চা—ও—

[আলো হঠাৎ ঢলে পড়ল। অজিত তাকে ধরে ফেলল, মেঝেতে শুইয়ে দিল।

অজিত। এ কী! আলোর শরীর হঠাৎ এমন নেতিয়ে পড়ল কেন ? নিঃশ্বাসও তো পড়ছে না দেখছি—

[ছুটে বাথরুম থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে এলো, আলোর চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিল]

অজিত। নাঃ, সব শেষ! আলো,—আলো ? একটিবার চোখ মেলে তাকাও, পৃথিবীতে আমার মতো আর কেউ তোমাকে ভালোবাসতে পারে নি,—কিন্তু—

(অজিত উঠে দাঁড়াল)

আলো, তা হলে সব শুনে যাও। মলয়ের এ্যাক্সিডেণ্টের কথাটা আমার বানানো,—ঈর্ষ্যায় অন্ধ হয়ে তোমাকে আমি মেরে ফেললাম। গভীরতম ভালোবাসাই বুঝি তীব্রতম ঈর্ষ্যাকে লালন করতে পারে।…কিন্তু তোমার মৃত্যুর কারণ ঐ স্কাউণ্ড্রেলটা এখনো তোমার জন্যে ঐ বাগানে অপেক্ষা করছে, ও জানে যে আজ আমি বাড়িতে থাকব না, তাই এসেছে গোপন অভিসারে, ওকেও আমি ছাড়ব না। আমার বন্দুকটা কোথায় ? বন্দুক ?

[আলমারী খুলে দোনলা বন্দুক বার করল, (জানালায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য স্থির করে] চাঁদের আলোয় সুন্দর শিকার! এবার তোমার মরার পালা—

(বন্দুক ফায়ার করল)

ব্যস,… এক গুলিতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে…আলো, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও—…এসো তোমায় বিছানায় শুইয়ে দি, …তুমি ঘুমাও,…যে ভালোবাসা একদিন তোমার-আমার হৃদয়ে সুধা ঢেলে দিয়েছিল, আজ তাই বিষ হয়ে উঠেছে,—ঈর্ষ্যার সাপ হয়ে তোমাকে ছোবল দিয়েছে। আমাকে তুমি ক্ষমা করো আলো।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চড়ক-পূজা, স্নানযাত্রা, দুর্গোৎসব, সরস্বতী পূজার মতো রথযাত্রার পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে কোম্পানীর হাতে-গড়া শহর কলিকাতায় এবং শ্রীরামপুর, মাহেশ প্রভৃতি সেকালের বিশিষ্ট মফঃস্বল-নগরে এবং আশপাশের ছোট-বড় আরো নানান পল্লী অঞ্চলেও রীতিমতো ধুমধাম-আড়ম্বর সহকারে ও তখনকার আমলের দেশী-বিলাতী সমাজের সকল শ্রেণীর লোকজনই সোৎসাহে উৎসব-পালনের আনন্দে মেতে উঠতেন। রথযাত্রার পার্ব্বণের সময় শহরে এবং গ্রামে প্রচুর জাঁক জমকে ভরপুর ছোট-বড় নানা রকমের বিচিত্র-মনোরম মেলার আয়োজনও হতো···· সে মেলায় তালপাতার বাঁশী, মাটির পুতুল, শোলার তৈরী রকমারি খেলনা, মাদুর-পাটি, মাদুর-কুলো-চুপড়ী-বারকোশ, সৌখীন কাঁচের চুড়ি, আয়না, আসন, বাসনপত্র থেকে সুরু করে তেলেভাজা ফুলুরী, পাঁপর, ফুটকড়াই, এলাচদানা, কদমা, বীরখণ্ডি-চিনির মঠ, মেঠাই সন্দেশ, গোলাপী খিলীর পান, সৌখিন গাছপালা, বিবিধ পশু-পক্ষী, প্রভৃতি এমনি আরো যে কত সব আবালবৃদ্ধবনিতার মনোহারা-সামগ্রী বেচা-কেনার সমরোহ হতো, তার আর ইয়ত্তা নেই। এ সব ছাড়াও রথের মেলায় আরো আকর্ষণীয় ছিল—ভেল্কী-ভোজবাজীর যাদু-মজলিশ, যাত্রা, কবি-গান, কথকতায় মনোমুগ্ধকর জমজমাট আসর, কুস্তি, জুয়াখেলা, খেলাধুলার আখড়া, চপ-কীর্ত্তনওয়ালী, বাউল-বৈরাগীদের গানের জলসা, সং আর ভাঁড়েদের রঙ্গ-রসিকতা—এমনি আরো কত সব জনচিত্তহারী বিলাস ও আনন্দোৎসবের বিচিত্র লীলা।

সেকালের কলিকাতা শহরে রথযাত্রার এই অভিনব উৎসব কি ভাবে উদযাপিত হতো তার নিখুঁত-মনোরম পরিচয় মেলে তৎকালীন সাহিত্যিক ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের রচিত সুপ্রসিদ্ধ রম্য রচনা "হুতোম প্যাঁচার নক্শা" গ্রন্থে। একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহল পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে আপাততঃ, সে কাহিনীর কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

* * * *

(৺কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত "হুতোম প্যাঁচার নক্শা" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

········ক্রমে রথ এসে পড়লো। ফ্যাতো র‍্যাতো পরব প্রলয় বুড়ুটে ; এতে ইয়ারকির লেশমাত্র নাই, সুতরাং সহরে রথ পার্ব্বণে বড় একটা ঘটা নাই ; কিন্তু কলিকাতায় কিছুই ফাঁক যাবার নয় ; রথের দিন চিৎপুর রোড লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, ছোট ছোট ছেলেরা বার্নিসকরা জুতো ও সেপাইপেড়ে ঢাকাই ধুতি পরে, কোমরে রুমাল বেঁধে, চুল ফিরিয়ে, চাকর চাকরাণীদের হাত ধরে পয়নালার ওপর পোদ্দারের দোকানে ও বাজারের বারাণ্ডায় রথ দেখতে দাঁড়িয়েচে। আদ্‌বয়সী মাগীরা থাতায় থাতায় কোরা ও কলপ দেওয়া কাপড় পরে রাস্তা জুড়ে চলেচে ; মাটি-

জগন্নাথ, কাঁঠাল, তালপাতের ভেঁপু, পাখা সোনার পাখী বেধড়ক বিক্রি হচ্চে ; ছেলেদের দেখাদেখি বুড়ো বুড়ো মিন্‌সেরাও তালপাতের ভেঁপু নিয়ে বাজাচ্চেন ; রাস্তায় ভোঁ পোঁ ভোঁ পোঁ শব্দের তুফান উঠেচে—ক্রমে ঘণ্টা, হরিবোল, খোল কত্তাল ও লোকের গোলের সঙ্গে একখানা রথ এলো—রথের প্রথমে পেটা ঘড়ি, নিশান, খুন্তি ভোড়োং ও নেড়ীর কবি ; তার পর বৈরাগীদের দু তিন দল নিম্‌খাসা কেত্তন, তার পেছনে সকের সংকীর্ত্তন গাওনা, দোয়ার দলের সঙ্গে বড় বড় আটচালার মত গোলপাতার ছাতা ও পাখা চলেচে, আশে পাশে কর্ম্ম-কর্ত্তারা পরিশ্রান্ত ও গলদ্‌ঘর্ম্ম—কেউ নিশান ও রেশালার মিলে ব্যতিব্যস্ত, কেউ পাখার বন্দোবস্তে বিব্রত, সখের সংকীর্ত্তনওয়ালারা গোছসই বারাণ্ডার নীচে, চৌমাথার ও চকের সাম্‌নে থেমে থেমে গান করে যাচ্চেন, পেছনে পোতাদারেরা চেঁচিয়ে হাত নেড়ে গান বলে দিচ্চেন, দোয়ারেরা কি গাচ্চেন, তা তাঁরা ভিন্ন আর কেউ বুঝতে পাচ্চেন না। দর্শকদের ভিড়ের ভিতর একটা মাতাল ছিল, সে রথ দর্শন করে ভক্তিভরে মাতলামি সুরে

কে মা রথ এলি ?
সর্ব্বাঙ্গে পেরেক মারা চাকা সরঘুরালি।
মা তোর সাম্‌নে দুটো কোটো ঘোড়া,
চুড়োর উপর ময়ূরপোড়া,
চাঁদ চামুরে ঘণ্টা নাড়া,
মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা,
লোকের টানে চল্‌চে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাখা,
বেহদ্দ ছেনালি।

গানটি গেয়ে, "মা রথ! প্রণাম হই মা!" বলে প্রণাম কল্লে। এদিকে রথ হেলতে দুলতে বেরিয়ে গ্যালো ; ক্রমে এই রকমে দু'চারখানা রথ দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে পড়লো—গ্যাস্ জ্বালা মুটেরা মই কাঁদে করে দ্যাখা দিলে পুলিসের পাসের সময় ফুরিয়ে এলো, দর্শকেরাও যে যার ঘরমুখো হলেন।

মাহেশে স্নানযাত্রায় যে প্রকার ধুম হয়, রথে তত হয় না বটে ; তবুও ফ্যালা যায় না।

এদিকে সোজা ও উল্‌টো রথ ফুরাল, শ্রাবণ মাসে ঢ্যালা ফ্যালা পার্ব্বণ, ভাদ্র মাসের অরন্ধন ও জন্মাষ্টমীর পর অনেক জায়গায় প্রিতিমের কাঠামোয় ঘা পড়লো, ক্রমে কুমোররা নায়েকবাড়ি একমেটে, দোমেটে ও তেমেটে করে বেড়াতে লাগলো। কোলা ব্যাঙেরা ক্রোড়্ কোঁ ক্রোড়্ কোঁ ক্রোড শব্দে আগমনী গাইতে লাগলো ; বর্ষা আঁবের আটি কাঁটালের ভুতুড়ি ও তালের এশো খেয়ে বিদেয় হলেন—দেখতে দেখতে পূজো এলো!

* * * *

রথযাত্রার পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে সেকালের শহুরে লোকজন যেভাবে আনন্দোৎসবে মেতে ধূমধাম আড়ম্বর, বিলাস-উচ্ছৃঙ্খলতা বা ভগবদ প্রেমে আত্মহারা হয়ে উঠতেন, উপরের বিবরণী—থেকে তার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। তবে তখনকার আমলে পল্লী-অঞ্চলে রথযাত্রার উৎসব যেভাবে প্রতিপালিত হতো, তার সুস্পষ্ট নিখুত মনোরম পরিচয় পাওয়া যায়—স্বনামধন্য সাহিত্যিক ৺দীনেন্দ্র কুমার রায় মহাশয়ের সুবিখ্যাত 'পল্লীচিত্র' গ্রন্থে। একালের অনু-সন্ধিৎসু-পাঠকপাঠিকাদের অবগতির উদ্দেশ্যে, নীচে সেকালের রথযাত্রা-পার্ব্বণোৎসবের কিঞ্চিৎ বিবরণ উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। সুসাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমারের অনবদ্য লেখনী-স্পর্শে সেকালে পল্লীগ্রামের রথযাত্রার আনন্দোৎসবের চিত্রটি অপরূপ মনোহারী এবং সজীব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

* * * *

(৺দীনেন্দ্রকুমার রায় রচিত 'পল্লীচিত্র' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

রথযাত্রা

গোবিন্দপুরের বাঁড়ুয্যেরা বনিয়াদী বড়মানুষ ; কিন্তু এখন তাঁহাদের ভগ্নদশা। * * * শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে বাঁড়ুয্যে বাড়ী 'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ' হইত। একে জমিদারীর আয় অধিক ছিল, বংশধরগণ মা ষষ্ঠীর কৃপায়

রক্তবীজের ন্যায় ব্যাপকতা লাভ করিয়া প্রত্যেক দু'কড়া দু' ক্রান্তির মালিকে পরিণত হয় নাই; * * তাহার উপর প্রজার অবস্থা ভাল ছিল, নির্ব্বিঘ্নে রাজস্ব আদায় হইত টাকায় যোল সের তেল, আটসের ঘি পাওয়া যাইত, বারো আনায় একমণ উত্তম মিহি চাউল মিলিত, একটাকা ব্যয় করিলে ঘরে বসিয়া তিনমণ গম পাওয়া যাইত; কাজেই 'বাবুদের বাড়ী' পূজাপার্ব্বন হইলে গ্রামের লোককে উনন জ্বালিতে হইত না; বাঁড়ুয্যে বাড়ীতেই সকলে মহা-সমারোহে লুচি-মণ্ডায় উদর পরিতৃপ্ত করিত। ধুমধামেরও অন্ত ছিল না। * * * এখন সে সকল ধুমধাম আর নাই। * * * কিন্তু দোল ও রথযাত্রায় আজও কিছু কিছু ঘটা আছে। এই উৎসব একমাত্র বাঁড়ুয্যে পরিবারের নিজস্ব নহে, ইহা গ্রামবাসিগণের সাধারণ সম্পত্তি। বালকবালিকা হইতে বৃদ্ধবৃদ্ধা পর্য্যন্ত গ্রামস্থ সকলেই এই উৎসব-উপলক্ষে আমোদে মত্ত হয়।

অনেক দিন আগে বাঁড়ুয্যে বাবুদের কাঠের রথ হয়। একবার গ্রামে আগুন লাগিয়া বহুসংখ্যক গৃহাদি দগ্ধ হইয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের দারুময় রথখানিও ব্রহ্মার কুক্ষিগত হয়, দেবতার সামগ্রী বলিয়া তিনি পক্ষপাত প্রদর্শন করেন নাই। তাহার পর অর্থ ও উৎসাহ—বোধ করি এ উভয়েরই অভাববশতঃ আর কাঠের রথ নির্ম্মিত হয় নাই। তদবধি প্রতি বৎসর বাঁশের রথ নির্ম্মাণ করিয়া গৃহবিগ্রহ গোবিন্দদেবের রথযাত্রা চলিতেছে; কিন্তু প্রতি বৎসর রথের আকার ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে, তাহাতে দীর্ঘকাল পরে ইহার সাকার অস্তিত্বের কতখানি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা এখন কে বলিতে পারে ?

যাহা হউক, দগ্ধাবশিষ্ট কাঠের রথের চক্রগুলি, দুইটি কাষ্ঠনির্ম্মিত অশ্ব, একটি সারথি ও কয়েকটি কাষ্ঠপুত্তলিকা অগ্নিমুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। সারা বৎসর তাহারা বাঁড়ুয্যে বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্তবর্ত্তী একটি অন্ধকারময় গুদামে বিশ্রাম করে; রথের দুই দিন পূর্ব্বে সেগুলিকে গুদাম হইতে বাহির করা হয়। চক্রগুলি নব-নির্ম্মিত বংশরথে সংযুক্ত হইয়া থাকে, ঝুল ও ধূলায় সমাচ্ছন্ন অশ্বদ্বয়ের দেহও রঞ্জিত হয়; এবং বর্ষব্যাপী তত্ত্বাবধানের অভাবে, কিংবা ছোট ছেলেদের উৎপাতে সারথির অথবা কোন পুত্তলিকার হস্ত পদ স্থানচ্যুত হইলে, সেই 'ডিস্‌লোকেশন'গুলির উপর 'ব্যাণ্ডেজ' জড়াইয়া এবং তাহাদের দাড়ি গোঁফ ও মাথার চুল 'ভুষোর কালি' দিয়া আঁকিয়া তাহাদিগকে রথে তুলিয়া বংশদণ্ডের সহিত দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

রথের দিন খুব সকাল হইতে বাঁড়ুয্যে বাবুদের চর্ম্ম-চটিকা সমাচ্ছন্ন দেউড়ীর নীচে গোটাকতক ঢাক ঢোল ও কয়েকখানা কাঁশি অতি উচ্চরবে আপনাদিগের আগমন-বার্ত্তা ও রথের উৎসবকাহিনী সমস্ত পল্লীর মধ্যে ঘোষণা করিতে থাকে।

বাঁড়ুয্যেদের ফাটা দেওয়াল-সংলগ্ন প্রকাণ্ড জীর্ণ দেউড়ীটার সম্মুখে * * প্রকাণ্ড আঙ্গিনা। সকাল হইতেই সেখানে ছোট ছোট ছেলেদের হাট বসিয়াছে; কেহ নাচিতেছে, কেহ খেলিতেছে, কেহ কাহাকেও মারিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কে বা ভালমানুষের মত রথের লাল চূড়ার দিকে চাহিয়া আছে। আজ স্কুল পাঠ-শালা বন্ধ; মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া আজ সকল ছেলেই নিশ্চিন্ত!

বেলা আটটার মধ্যেই গোবিন্দদেব রথে উঠিবেন; চারিজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ঠাকুরদালান হইতে রথতলায় সিংহাসনসহ বহিয়া আনিল; * * গোবিন্দদেবের সিংহাসন তাহারা কাঁধে তুলিয়া বহিয়া আনিতেছে; পশ্চাতে একদল লোক অধিকাংশই বাঁড়ুয্যে পরিবারের সম্পর্কীয় লোক—জামাই, জামাইএর ভাই, মামাতো ভাইএর সম্বন্ধী, পিস্‌তুতো ভগিনীর দেবর প্রভৃতি মাতব্বর কুটুম্ব ও সরস্বতীর বরপুত্রগণ, কপালে তিলক কাটিয়া, বাহুমূলে ছাপা লাগাইয়া, ময়ূরকণ্ঠী, পীতাম্বরী কিংবা চেলিখানি কোঁচাইয়া পরিয়া, এবং উত্তরীয়খানি কেহ দেহের উর্দ্ধোধোভাবে উপবীতের মতন ঝুলাইয়া, কেহ তাহা 'তো' করিয়া কটিদেশে জড়াইয়া, কেহ বা সুশুভ্র উপবীতগুচ্ছে কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, খোলকরতাল বাজাইয়া—

"জয় গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন দয়া কর হে।"

সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছে। ঠাকুরদালান হইতে বাহির হইয়া দেউড়ীতে আসিতে দুই পাশে সারি সারি ঘর। পূর্ব্বে এখানে ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাহ্মণভোজন হইত; এখন কার্ণিসের উপর কপোত ও মেঝের নীচে সরীসৃপের বাসা হইয়াছে! এই সকল প্রকোষ্ঠের বারান্দায় দাঁড়াইয়া

পাড়ার সধবা, বিধবা, কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধারা গোবিন্দদেবকে রথে যাত্রা করিতে দেখিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতেছে।

* * *

ঠাকুর রথে স্থাপিত হইলেন। পুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় রথের সর্ব্বোচ্চ 'থাকে' উপবিষ্ট হইয়া গোবিন্দের ক্ষুদ্র সিংহাসন ধরিয়া রহিলেন। যিনি বিশ্বমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন, এই পাপ কলিযুগে তাঁহাকেও আবার হাত দিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়! নতুবা যদি তিনি রথ হইতে পড়িয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার হাত পা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে! রথের পাঁচটা চূড়া। প্রত্যেক চূড়ার উপর এক একটি শ্বেতচামরের ধ্বজ। চূড়াগুলি লোহিতবস্ত্রে মণ্ডিত। প্রধান চূড়ার নীচে একটা ছোট তালপাতার ছাতি গুপ্তভাবে অবস্থিত; পাছে রথচূড়া ভেদ করিয়া বর্ষার জলধারা গোবিন্দের মস্তকে পতিত হয়, সেই আশঙ্কায় এইরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে।

পাড়ার ছেলেরা কামিনীগাছের ডাল, দেবদারুপাতা, প্রস্ফুটিত কদম্বশাখা ভাঙ্গিয়া আনিয়া, তদ্দ্বারা রথের আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। রথের চতুর্দ্দিকে পুষ্পস্তবক ও পুষ্পমালা ঝুলিতেছে। একটু বেলা হইলে রথের কাছে ঠাকুরের বাল্য-ভোগ আনীত হইল; কয়েক জন ব্রাহ্মণ লুচি, মোহনভোগ, সন্দেশ, ক্ষীর, ছানা, আম, কাঁঠাল ও অন্যান্য নানাবিধ ফলফুলারী এক একখানি বারকোসে ও পিতলের থালে সাজাইয়া লইয়া রথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভোগ আসিতেছে দেখিয়া হঠাৎ চারিদিকে তুমুল কলরব উঠিল; "ভোগ আসচে বাজে লোক সব তফাৎ!" বলিয়া দুই চারিজন মোড়ল-গোছের লোক হুঙ্কার ছাড়িল। মাথায় লাল চাদর-বাঁধা দুই একটা পাইক লাঠি ঘাড়ে লইয়া নিকটেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; উপযুক্ত অবসর দেখিয়া তাহাদের হাতের লাঠি কাহারও কাহারও পিঠে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সকলে সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল।

যে সকল সুবৃহৎ পাত্রে ভোগ আনীত হইল, বাহকগণ দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাহা উঁচু করিয়া ধরিল। পুরোহিত ঠাকুর গোবিন্দদেবের কাছে বসিয়াই ঊর্দ্ধ হ তে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন। নিবেদনকালে পুরোহিত হস্তনিক্ষিপ্ত দুই চারিটা তুলসীপত্র বারকোসে আসিয়া পড়িল; দুই একটা ফুল ঘুরিতে ঘুরিতে কোন বারকোস ধারীর মাথায় পড়িয়া তাহার দীর্ঘ টিকির পাশ দিয়া গড়াইয়া গেল! ঢাক ঢোল ও কাঁসি জোরে জোরে বাজিতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে চেলী বা নীলাম্বরীর উপর লাল চাদর বা রুমাল-বাঁধা ছোট ছোট ছেলেরা আনন্দভরে নাচিতে আরম্ভ করিল।

দুপুরের সময় রথতলায় বেশী লোক থাকে না, কেবল দুই চারিজন দোকানদার সহচরবর্গের সাহায্যে অস্থায়ী দোকান সাজাইবার আয়োজন করে; এবং পাড়ার দুই একটা দুষ্ট ছেলে নিঃশব্দপদক্ষেপে দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মধ্যাহ্ন-নিদ্রাকাতর ঢাকীদের ঢাকে সজোরে দুই চারিটা ঘা দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়, আর তাহাদের অপেক্ষাকৃত ভীরু সহচরগণ দূর হইতে তাহাদের এই দুঃসাহসিক অনুষ্ঠান দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়ে।

কিন্তু বেলা যত শেষ হইয়া আসে রথতলায় জন কোলাহল ক্রমেই তত বাড়িতে থাকে। বেলা চারিটা বাজিতে না বাজিতে রাজপথের দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ পল্লীবাসীরা,—বালক বালিকা হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলে রথতলার দিকে অগ্রসর হয়। ছোট ছোট ছেলেদে ট্যাকে ও মেয়েদের আঁচলে দুই চারিটা পয়সা বাঁধা; ম বাপের কাছে পার্ব্বনী আদায় করিয়া তাহারা রথ দেখি যাইতেছে। কাহারও পরিধানে সদ্যধৌত কাপড়, গা 'ছক-কাটা' পিরাণ, তাহার উপর কোঁচান চাদর; কেহ নূতন ধুতিচাদরে সজ্জিত হইয়া চলিয়াছে। সাধারণ পল্লী রমণীগণ নদীতীরস্থ বৃক্ষান্তরালবর্ত্তী নিভৃত পথ দিয়া দেখিতে যাইতেছে; পথিপ্রান্তে কচিৎ কোন পুরুষ সম্মু পড়িলে তাহারা অবগুণ্ঠন টানিয়া সলজ্জভাবে ফিরি দাঁড়াইতেছে, এবং পথিক কিছু দূরে চলিয়া গে অবগুণ্ঠন সরাইয়া মুক্তকণ্ঠে আলাপে প্রবৃত্ত হইতেছে; *

ক্রমে রথতলা হইতে আরম্ভ করিয়া দূরবর্ত্তী বা পর্য্যন্ত লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পথের দুই প সদ্যোনির্ম্মিত বিপণি শ্রেণী; ময়রার দোকানে পিত থালে অগণ্য মক্ষিকাসমাচ্ছন্ন মোণ্ডা গোল্লা, মে তেলেভাজা ছোট ছোট জিলিপি, এবং ধামা লাল গুড়ে মুড়কী ও মোটা আউসের 'গুমো' চি স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। চাষার ছেলেরা দোকা

সম্মুখে ঝুকিয়া পড়িয়া কেহ এক পয়সা দিয়া চারিখানি ছোট জিলিপি, কেহ আধ পয়সায় মুড়কী কিনিয়া কেঁচড়ে পুরিয়া লইয়া যাইতেছে; কোন বালক বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য্যধারণে অসমর্থ হইয়া চলিতে চলিতেই তাহা ঘনঘন 'ফাঁকাইতেছে'। পথের যেখানে সেখানে বসিয়া কুমোরেরা বড় মোড়া বোঝাই 'চিত্তির' করা ছোট ছোট ঘট, মাটির 'ছোবা' মাটির জাতা, পুতুল, ও হাঁড়ি বিক্রয় করিতেছে। নানা আকারের নানা রঙ্গের পুতুল; কুকুর, বিড়াল, গরু, হাতি। * * ছেলের দল চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে; * * দোকানীর অবসর নাই। ইহার উপর যখন কোন দুষ্ট ছেলে পুতুল না কিনিয়া কেবল দরই করিতেছে, তখন দোকানীর ধৈর্য্যধারণ করা কঠিন হইয়া উঠিতেছে; * * কিন্তু স্ত্রীলোক ক্রেত্রীগণের সে দিকে লক্ষ্য নাই, তাহারা কেহ ছেলেদের জন্য পুতুল কিনিতেছে, কেহ ছোবা পছন্দ করিতেছে, কেহ হাঁড়ী দূর করিয়া তাহা ভাঙ্গা কি না পরীক্ষার জন্য বাজাইয়া দেখিতেছে। একটা বড় বটতলার ছায়ায় তিন চারিখানা মনোহারীর দোকান বসিয়াছে, সেখানেও ক্রেতার সংখ্যা অল্প নহে; * *

রথতলার কিছু দূরে, নিমাই কুরীর দোকানের পাশে কাঠাখানেক ফাঁকা জমীর উপর আজ এক কাপড়ের তাম্বু উঠিয়াছে। এখানে হয় ত কোন রকম খেলা দেখান হইতেছে ভাবিয়া অনেক চাষার ভিড় হইয়াছে, ছোট ছোট ছেলেরও সংখ্যা নাই, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার দেখিয়া অনেকেই ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেল। কারণ তাহারা দেখিল একজন পাকা দাড়ীওয়ালা সাহেবের সঙ্গে সারি দিয়ে দাঁড়াইয়া তিনজন শুষ্কমুখ ক্ষীণদেহ বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রচারক এক একখানি কাগজ হাতে করিয়া গান গাহিতেছে:—

"বেথলহেমে হইল যিশু-চন্দ্রের উদয়,
গায় সবে ধরাবাসী জয় জয় জয়।"

কিন্তু বেথলহেমের চন্দ্রের সহিত আমাদের গোবিন্দ-পুরের লোকের কোন সম্বন্ধ না থাকায় সে সঙ্গীতে কেহই মুগ্ধ হইল না। * * শ্রোতার আগ্রহ না দেখিয়া সাহেব অগত্যা গান বন্ধ করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন; এবং তাঁহার সহকারী রেভারেণ্ড সলোমন বিশ্বাস ও যোহন পরামানিক "সত্যগুরু কে?" যিশুই পরম পথ" স্বর্গের সোপান" প্রভৃতি 'বাইবেল ট্রাষ্ট সোসাইটির' ছাপাখানা প্রসূত ছোট ছোট বইগুলি দর্শকগণের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। * *

রথতলার আর এক দিকে পেয়ারা পাকা কাঁটাল, কলা, আনারস, কাঁকুড় প্রভৃতি সুপক্ক ফলের ও পটোল, ঝিঙে, উচ্ছে, কাঁচকলা প্রভৃতি তরিতরকারির দোকান। মেছুনীরা সারি দিয়া বসিয়া ঝুড়ি-বোঝাই পচা ইলিশ মাছ ডাঙ্গায় সাজাইয়া তিনগুণ লাভে বিক্রয় করিতেছে। মাছগুলি ফুলিয়া পচিয়া উঠিয়াছে, দুর্গন্ধে সে দিকে যাওয়া কঠিন; কিন্তু ক্রেতার অভাব নাই! * *

দেখা গেল, এই তরকারীর বাজারের মধ্যে মাথায় লাল পাকড়ী-বাঁধা, পাঁচ হাত লম্বা বাঁশের পাকা লাঠী কাঁধে এক বরকন্দাজ জমীদারের জন্য 'তোলা' তুলিতেছে, সে কাহারও কাছে কিছু চাহিতেছে না, কেবল প্রত্যেক দোকানে আসিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া এক থাবায় যাহা ধরিতেছে, ডালা হইতে টানিয়া তুলিতেছে ও তাহার পশ্চাবর্ত্তী একটা চাকরের ঝুড়ির মধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিতেছে, কেহ বলিতেছে, আমি এখনও বৌনি করি নি, একপাক ঘুরে এসে তোলা নিও। কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য করে কে? * *

রথের কাছে যেখানে বড় ভিড় তাহার কিছু দূরে দাঁড়াইয়া মালীরা শোলার ফুল, পাখি, পুতুল, পাল্কী প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছে; * * অন্যত্র কামরেরা ছোট ছোট ছুরী, কাস্তে, কাটারি, বঁটি প্রভৃতি নানা রকম অস্ত্র কাঁধে লইয়া বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে; ইস্পাতের সঙ্গে এই সকল অস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই, এবং যে মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতেছে, তাহাতে গঠনপারিপাট্যের কিংবা ইস্পাতের অস্তিত্বের আশা করা যায় না।

রথতলার একপাশে 'মালামো' করিবার আখড়া। অনেকখানি জায়গা বাঁশ দিয়া ঘেরা; ঘাসগুলো চাঁচিয়া ফেলিয়া আখড়াটি পরিষ্কার করা হইয়াছে। গোবিন্দপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যে সকল চাষার শারীরিক বল অধিক ও যাহাদের কুস্তী করিবার অভ্যাস আছে তাহারা আজ পূর্ণ উৎসাহে লড়িতে আসিয়াছে। কারণ 'দশের মাঝে' তাহাদের 'কেরামতি' দেখাইবার আজ উৎকৃষ্ট অবসর। এই সকল 'এমোচিয়োর' পালোয়ানদের প্রত্যেকের পশ্চাতে চারি পাঁচ জন পৃষ্ঠচর। গ্রামস্থ ভদ্র-

লোকেরা কুস্তি দেখিতে আখড়ার 'ঘেরের' নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে অসংখ্য চাষা। দুই জন বলিষ্ঠ যুবক কুস্তির জন্য প্রস্তুত হইয়া আখড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা মশলা চিবাইতে চিবাইতে ও 'ধুলোগড়া' দিয়া বাহুদ্বয় ডলিতে ডলিতে সমগ্র দর্শকবৃন্দের উপর এমন সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল যে বোধ হইল, আজ তাহারা বিশ্বসংসারের কাহারও কিছুমাত্র তোয়াক্কা রাখিতেছে না!

** অবসর বুঝিয়া একজন অপরের বামহাতখানি হঠাৎ চাপিয়া ধরিতেই সে দক্ষিণ হস্তে প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘাড় ধরিয়া তাহার একপায়ে নিজের পা বাধাইয়া দিল। তখন উভয়ের মধ্যে হস্তে, হস্তে, পদে, পদে, বক্ষে, বক্ষে, প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; দর্শকগণ নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে শেষ ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর একজন অপরকে শূন্যে তুলিয়া চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিল, আর চারিদিক হইতে অমনি চটাপট করতালি পড়িয়া গেল, এবং অনেকে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল 'বাহা তুষ্টু বেশ! বলিহারি ওস্তাদি!" ** যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তুষ্টু বাঁড়ুযোদের মেজবাবুর নিকট হইতে একখানা চাদর শিরোপা পাইল, সে তৎক্ষণাৎ তাহা মাথায় বাঁধিয়া নত মস্তকে শিরোপা দাতাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া উঠিল। ঝড়ু দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত হইবার পর তাহার পৃষ্ঠপোষকগণ ও স্বগ্রাম বাসী চাষার দল বলিতে লাগিল তুষ্টু অন্যায় করিয়া ঝড়ুকে ফেলিয়া দিয়াছে; অতএব তুষ্টুর এ জিত জয় বলিয়া মঞ্জুর হইতে পারে না। **

ঝড়ু আবার তুষ্টুর সঙ্গে কুস্তি আরম্ভ করিল। প্রায় পাঁচ মিনিটকাল উভয়ে স্ব স্ব প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূমিসাৎ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল; কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী আজ তুষ্টুর প্রতিই প্রসন্না, তুষ্টু ঝড়ুকে সহসা মাথার উপর তুলিয়া তিন চার হাত দূরে ফেলিয়া দিল। তুষ্টুর দলস্থ লোকেরা সোৎসাহে ছুটিয়া গিয়া তাহার বিজয়গর্ব্বস্ফীত শ্রমচঞ্চল বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক ধন্য ধন্য করিতে লাগিল; চারিদিকে ঘোর কলরোল উত্থিত হইল।

কিন্তু চাঁদপুরের চাষারা আজ জোট বাঁধিয়া আসিয়াছে, ঝড়ুর পরাজয়কে তাহারা চাঁদপুর গ্রামখানিরই পরাজয় বলিয়া মনে করিল; সুতরাং গ্রামের মানরক্ষার জন্য সকলেই তুষ্টুর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তুষ্টুর দল নিকটেই ছিল। দুই পক্ষে প্রথমটা খুব কথা কাটাকাটি চলিল; ** অবিলম্বে দুই পক্ষ হইতেই লাঠিবর্ষণ আরম্ভ হইল। **

অকস্মাৎ মাথায় লাল পাগড়ী-বাঁধা জন পাঁচ সাত কনষ্টেবল হস্তস্থিত অনতিদীর্ঘ রুল উদ্যত করিয়া হাঙ্গামার মধ্যে প্রবেশ করিল; দেখিতে দেখিতে বিবাদ থামিয়া গেল, এবং যাহারা লাঠী চালাইতেছিল, তাহারা দলাদলি ভুলিয়া একযোগে চম্পট দিল! কয়েকজন নির্ব্বিরোধ চাষাকে লইয়া কনষ্টেবল সাহেবরা টানাটানি করিতে লাগিল। **
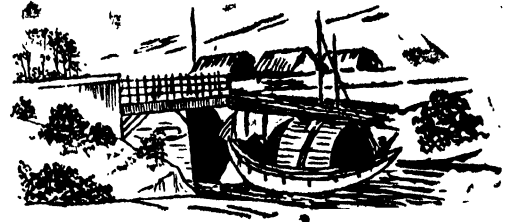
প্রাচীন কলিকাতার দৃশ্য—বেলেঘাটার খাল
(পুরাতন চিত্রের প্রতিলিপি অনুসরণে)

রথ টানিবার সময় হইয়াছে বুঝিয়া ঢাকে ও ঢোলে কাঠি পড়িবামাত্র দর্শকগণ চারিদিক হইতে রথের কাছে দৌড়াইয়া আসিল। দুইগাছি খুব মোটা 'কাছি' রথের কাছে পড়িয়াছিল; যাট সত্তরজন লোক তাহা ধরিয়া সজোরে টানিতে লাগিল। কেহ বা টানিতে টানিতে দড়ী ছাড়িয়া একেবারে রথের উপর অশ্বদ্বয়ের সম্মুখস্থ উদ্যত পদদ্বয়ের কাছে উঠিয়া দাঁড়াইল। রথ হেলিয়া দুলিয়া রাজপথের দিকে অগ্রসর হইল। রাজপথে উঠিলে সকলে তাহা বাজারের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল; মুহুর্মুহুঃ 'হরিবোল' শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঢাকীরা রথের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মহা উৎসাহে নাচিয়া নাচিয়া পাখাওয়ালা বড় বড় ঢাকগুলা বাজাইতে লাগিল।

রথ চলিতে চলিতে একটু থামিলেই চারিদিক হইতে পানের বিড়া, সুপারি, বাতাসা, পাকাকলা, পয়সাকড়ি গোবিন্দদেবের উদ্দেশে রথের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল; দুই একটি সুপারি গোবিন্দদেবের পুরোহিত (যিনি কপিধ্বজ

হইয়া গোবিন্দদেবের সিংহাসনখানি ধরিয়া বসিয়াছিলেন) মহাশয়ের কেশশূন্য মস্তকের উপর ঠকাস করিয়া পড়িল ; তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একটু কাতরভাবে মস্তক অবনত করিলেন। * *

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রথের নিম্নতম 'থাকে' বসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আমোদ উপভোগ করিতেছে। যতই জোরে ঢাক বাজিতেছে, রথ দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে যতই দুলিতেছে, তাহারা উভয় পার্শ্বস্থ কামিনী ও দেবদারু পত্রাচ্ছাদিত কদম্বকুসুম ভূষিত বাঁশের খুঁটা দুইহাতে ততই দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া হর্ষোচ্ছ্বাসে পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে নীচে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইবার আশঙ্কা, তাহার উপর এমন প্রচণ্ড উদ্দীপনার লোভ—এই সকল চপলচিত্ত বালক বালিকা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না ; তাই অনেকে মাকে না বলিয়া এবং বাপ দাদাকে লুকাইয়া পলাইয়া আসিয়া কোন প্রতিবেশীর সাহায্যে রথে চড়িয়া বসিয়াছে ; * *

রাজপথ দিয়া প্রায় অর্দ্ধমাইল পথ ঘুরিয়া রথ রথতলায় ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় ; ময়রার দোকান কতক কতক উঠিয়া গিয়াছে, দর্শকগণ গৃহে ফিরিতেছে, এবং জনতা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু এখনও পানের দোকানে ক্রেতার অভাব নাই। খিলিবিক্রেতা সাদা বোতলে লাল, নীল সবুজ নানারঙ্গের জল পুরিয়া, ছোট ছোট শিশি কাচের ডিস্ কাঁসার রেকাবী প্রভৃতিতে মশলা রাখিয়া দোকানখানি সুন্দর রূপে সাজাইয়াছে। উৎসব প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তথাপি তাহারা ঘন ঘন হাঁকিতেছে, "চার চার খিলি এক পয়সায়, বড় শস্তা, চাই মশালাদার গোলাপী খিলি!" চাষার দল পয়সা ফেলিয়া মুঠা মুঠা খিলি কিনিতেছে, কেহ কেহ বা পানে সন্তুষ্ট নয়, কোমর হইতে সূত্রনির্ম্মিত গেঁজে বাহির করিয়া পয়সা খুলিতে খুলিতে বলিতেছে, "দোকানী দাদা! এক পয়সার বিলাতী বিড়ি দাও, খুব তলব হবে ত?" —বিলাতী সভ্যতার প্রভাবে অনেকদিন আগেই গোবিন্দপুরে সিগারেটের আবির্ভাব হইয়াছে ; তাই রথের দিন দেখা গেল, চাষারাও থর্দান ছাড়িয়া পয়সা-জোড়া সিগারেট কিনিয়া কঠোর শ্রমলব্ধ অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছে!

* * চাষার দল পান চিবাইতে চিবাইতে পানের পিকে শুভ্র দন্তপাঁতি ও কৃষ্ণ অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া অদূরবর্ত্তী নাগরদোলায় চড়িয়া বসিল। এক পয়সার কুড়ি পাক ; কিন্তু অনেকে এক পয়সার পাক খাইয়া তৃপ্ত হইল না বন্‌বন করিয়া কুড়ি পাক ঘুরিয়া আসিলে নাগরদোলার বেগ যেমন মন্দীভূত হইল, অমনই তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, "আর এক পয়সা।" নাগরদোলা আবার সবেগে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ নাগরদোলায় উঠিয়াই গান ধরিয়াছিল,—

"ঐ যায় বুঝি যৈবনের তরী অকূল তুফানে।"

কুড়ি পাকের শেষে গানটা মধ্যপথে হঠাৎ থামিয়া গিয়াছিল, নূতন করিয়া পাক আরম্ভ হইলে আবার তাহারা নবোৎসাহে সপ্তমে গলা চড়াইয়া সমস্বরে গায়িতে লাগিল,—

"মনের ঢেউ লেগেছে রাখতে পারি নে!"

রথ রথতলায় আসিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঠাকুরের বৈকালিক ভোগের ব্যবস্থা আছে। সকালের ন্যায় সন্ধ্যাকালেও ব্রাহ্মণগণ ভোগ লইয়া রথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ; পুরোহিত ঠাকুর পূর্ব্ববৎ তাহা উদ্দেশ হইতে নিবেদন করিতে লাগিলেন।

প্রতি বৎসরেই রথের দিন বৃষ্টি হয়। আজ এতক্ষণও বৃষ্টি নামে নাই ; ভয়ানক গরম,—যাহাকে 'গুমট' বলে, তাহাই হইয়াছে ; আকাশ ঘনীভূত মেঘে সমাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে অল্প বাতাস ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। দর্শকবৃন্দের মধ্যে যাহাদের ছাতা ছিল, তাহারা ছাতা মাথায় দিয়া চলিল ; অনেকে চাদর মুড়ি দিয়া দৌড়াইতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল ; ছেলে কোলে লইয়া দৌড়াইতেও পারে না. দাঁড়াইয়া ভিজিতেও কষ্ট ; কয়েকপদ দ্রুতবেগে চলিয়াই শ্রমভরে গতি মন্থর হইয়া আসে। গোবিন্দদেবকে যথারীতি ভোগ নিবেদন করিবারও অবসর হইল না ; সকলে ব্যস্ত ভাবে তাঁহাকে রথ হইতে নামাইয়া ঘরে লইয়া গেল।

দশ মিনিটের মধ্যে রথতলা জনহীন হইয়া পড়িল। চারিদিক অন্ধকার। বায়ুর সনসন, মেঘের ঘন গর্জ্জন ও ঝম্ ঝম্ বর্ষণের মিশ্র কলতানে বর্ষার গান জমিয়া গেল। একঘণ্টা পূর্ব্বে যে রথতলা মহোৎসবমত্ত অসংখ্য নরনারীর হর্ষকলরবে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, এখন তাহা নির্জ্জন, নীরব, * * শুধু দেবপরিত্যক্ত গৌরববিচ্যুত বংশরথ মেঘমণ্ডিত আকাশতলে নিঃশব্দে ভিজিতেছে, আর ঢাকীর দল দেউড়ীর নীচে ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর বসিয়া ঢাক বাজাইতেছে, এবং সানাইওয়ালা গাল ও গলা ফুলাইয়া, দম বন্ধ করিয়া সানাইয়ে যথাশক্তি ফুৎকার দিয়া করুণ রাগিণীতে গাহিতেছে,—

"ব্রজ ত্যেজে যেও না, যেও না, বঁধু হে!"

* * * [ক্রমশঃ

কীর্ত্তনে স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা

রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব

কীর্ত্তন সঙ্গীত বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ। এই সম্পদ বাঙ্গালীর সুপ্ত ভাবধারার উন্মোচন করিয়া তাহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। বাঙ্গলার নিজস্ব সঙ্গীতের মধ্যে যে গুলি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়ালী, শ্যামা বিষয়ক, আগমনী প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কবির ভাষায় "কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়াছি খুলি, মনের গোপনে নিভৃত ভবনে দ্বার ছিল যতগুলি।" উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে আবার কীর্ত্তনই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বলিয়া পরিগণিত হয়। কীর্ত্তনের মধ্যে যে সুকুমার শিল্প ও মনের যে গভীর তৃপ্তি তথা ভক্তিভাবের উদয় হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কীর্ত্তনের পদাবলীর বিশ্লেষণে আমরা বাঙ্গালী হৃদয়ের উদ্বেল ভক্তির ও ভাবোচ্ছ্বাসের পরিচয় পাই। গৌরচন্দ্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব যেন বাঙ্গালীর এই সুপ্তভাবোচ্ছ্বাসের উদ্বেলতার মূর্ত্ত প্রতীক, শ্রীরাধিকার মধ্যে যে কৃষ্ণপ্রেমের স্ফুরণ ছিল, যাহা সমস্ত হৃদয়সত্তাকে বিচলিত করিয়াছিল, সেই প্রেমের শাশ্বত রূপ মহাপ্রভুর মধ্যে প্রকাশমান। মহাপ্রভুর ও শ্রীরাধার মত, জোয়ার ভাঙ্গা প্রেম, তাঁহার হৃদয় বেদনা, কৃষ্ণ মিলনে আকৃতি, পদাবলীর ভাষায় "প্রতি অঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ কাঁদে" অতি সুস্পষ্ট। বাঙ্গালার ঘরে বাঙ্গালী নররূপী ভগবানের পরিচয় পাইয়াছে, মূর্ত্তিমান্ ভাব বা ভক্তি শ্রীচৈতন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কবির ভাষায় "বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া, নিমাই ধরেছে কায়া।"

কীর্ত্তন-গানে স্বরলিপির অভাব এদেশে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। কীর্ত্তনরসিক ব্যক্তিগণকে কীর্ত্তনের পদ ও সুর শিক্ষার নিমিত্ত গুরুর নিকট প্রাচীন ধারায় শিক্ষালাভ করিতে হয়।

অনেক সময় বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত সুর-সংযোগে কীর্ত্তন-গান গাওয়া হয়, তাহার ধারা বজায় রাখিয়া কীর্ত্তন শিক্ষাদান সকলের পক্ষে সম্ভব নয়; ফলে বিভিন্ন সুরের বিকৃত রূপ শিক্ষার্থী আয়ত্ত করেন এবং শিক্ষাও সুসম্পন্ন হয় না। প্রত্যেক ঘরাণা কীর্ত্তনের একটি নিজস্ব ভঙ্গি আছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সুর ও তাহার আবির্ভাবানুযায়ী তাহাকে অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত ঐ সমস্ত সুরের চর্চ্চা ও সেই সুর অনুযায়ী স্বরলিপি প্রণয়নে, তাহার অব্যাহত গতি বজায় রাখা সম্ভব। মৎ-লিখিত 'কীর্ত্তনের ঘরাণা' শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ব্বে আমি কীর্ত্তনের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ ও তাহার বিশেষ সুর, তাল মাত্রা ইত্যাদি যুগান্তরে প্রকাশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আলোচ্য প্রবন্ধে কীর্ত্তনের স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা ও তাহার উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি পদের স্বরগ্রামও উল্লেখ করিতেছি। ক্লাসিকেল, মার্গ সঙ্গীত ও অন্যান্য সঙ্গীতের যথেষ্ট আলোচনা তাহাদের পারম্পর্য্যক্রমে ধারাবাহিকতার, আলোচনা ও চর্চ্চা দেশে দৃষ্ট হয়।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় অধুনা কীর্ত্তন-সঙ্গীত বড়ই অবহেলিত। এই সঙ্গীতের দিকে যদি সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের তথা কীর্ত্তনানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সুনজর পড়ে তাহা হইলে, আমাদের নিজস্ব একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদের ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্য ভাবধারার অব্যাহত গতি সংরক্ষিত হইবে।

কালের করাল কবলে সমস্ত কিছুই ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে। এই ধ্বংসোন্মুখতা হইতে কোন কিছুকে ভাবী কালের জন্য সংরক্ষণ করিয়া রাখাই, মানুষের একান্ত চিরন্তন নেশা। পূর্ব্ববর্তী ভাবরাজির ভিত্তিতে নূতন ভাবের ইমারৎ গড়িয়া উঠিবে। জাতির ধ্বংসোন্মুখতা হইতে এই মহাভাব, তাহাকে উন্নয়নের তথা বৃহত্তর জীবনের স্বাদ দান করিবে। কীর্ত্তনের পুণ্য ভাবধারা যাহা জগৎ পূজ্য পদ-কর্ত্তাদের দ্বারা সৃষ্ট ও প্রচারিত কীর্ত্তন সহযোগে গীত হইয়া, সাধারণে বিমল আনন্দ দান করিত, তাহার নিজ স্বরূপ, ভঙ্গী ও সুরের ধারাকে অনাগত কালের জন্য সংরক্ষণ করিয়া যাইতে পারে। স্বরলি

প্রণয়নের মাধ্যমে; কীর্ত্তনে স্বরলিপি দেশের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য তথা কৃষ্টিকে রক্ষা করিবার সহায়তা করিবে—এ কথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে যে পাঁচটি কীর্ত্তনের বিশেষ ধারা প্রচলিত যথা গরাণহাটী, মনোহর সাহী, রেনেটি, মান্দারণ ও ঝাড়খণ্ডী ইহাদের সুরের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিভিন্ন পালাক্রমে পদকর্ত্তাদের সুললিত পদগুলির স্বরলিপি প্রণয়ন সমাপ্ত প্রায়। এই কর্ম্ম অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। কারণ অধুনা এই পাঁচটি ঘরের অনেক গুলির যথাযথ সুরের ধারা অন্বেষণ করা সহজ ব্যাপার নহে; এবং কোনও একজন বিশিষ্ট কীর্ত্তনীয়ার নিকটও পাঁচটি ঘরের সুর পাওয়া যায় নাই। বহু অন্বেষণে উক্ত পাঁচটি ঘরের এক একটিতে অভিজ্ঞ কীর্ত্তনীয়ার অন্বেষণ করিয়া এই স্বরগ্রাম রচনাকার্য্য করিতে হইয়াছে। সমঝদার উৎসাহী ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতি ও সাহায্যে ইহা অচিরেই প্রকাশিত হইয়া আমাদের একটি বহু মূল্যবান্ কিন্তু অবহেলিত বিষয়ের সংরক্ষণ করিয়া আমাদের অভাব পূরণ করিবে। স্বরলিপির সাহায্যে কি ভাবে বিভিন্ন ঘরের কীর্ত্তনের পদগুলির সুরের প্রকৃতি বজায় রাখা হইয়াছে, সাধারণের জ্ঞাতার্থে অতি সংক্ষেপে প্রত্যেক ঘরের পদের কিছু কিছু অংশ স্বরলিপির সংযোগে নিম্নে উল্লিখিত হইল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পদগুলির শুধু লয়েরই স্বরগ্রাম যোজনা করা হইল। বাহুল্য বোধে বা দীর্ঘতার জন্য মাতানের স্বরগ্রাম উল্লেখ করিলাম না।

গরাণহাটী ঘর—মধ্যম দশকুশী (বিলম্বিত গতি)

"বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে
তাহে শোহে নানা ফুল দাম"

১´ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ৩ ০ ৪ ০ ০ ০
সা । মা মজ্ঞা | রা । সা । | সা । সসা ণ্সা সা । |
০ ০ বি ০০ ম ০ ল ০ হে ০ ০০ ০০ ম ০

১´ ০ ০ ০ ২ ০ ০০ ৩ ০ ৪ ০ ০ ০
সা । রা গর গর গরা | সা রস রস রসা । ণ্া | সা । গা । রগা মপা
জি ০ ০ ●০ ০০ ০০ নি ০০ ০০ ●০ ০ ০ ত ● ০ ০ নু০ ০০

১´ ০ ● ০ ২ ০ ০ ● ৩ ০ ৪ ● ০ ০
মা । । । | । । । পমা | গা মা রা গা মা গ মা পা
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ অনু পা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম

১´ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ৩ ০ ৪ ০ ০ ০
মা । সা ণ্র স র সা | ণ্া । ধা ধণ্া | সা । গা । রগা মপা
রে ০ তা হে০ ০ ০ ০ শো ০ ০ শোহে না ০ না ০ ০০ ০০

১´ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ৩ ০ ৪ ০ ০ ০ ০ ০
মা । । । | মমা । । পমা | গা মা রা গা মা গ ম পা
ফু ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ফুল দা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ম

১´ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০
মা । মা মজ্ঞা | রা । সা । |
রে ০ বি ০০ ম ০ ল ০ ইত্যাদি হইবে

মনোহরসাহী ঘর—তাল বড়দাস পেড়ে (বিলম্বিত গতি)

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

ধন ধ ষ্ম পা
রূপ লা গি

১´ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ০ ৩ ০ ০ ০
পপা । । ষ্মগা | -গর্ষ্ম´ ধধা ধ ণ র্মর্রা । | র্সা- র্স´ণ ধ পা- পর্সা- ন র্সা |
আঁখি ০ ০ ০ ০ ০০ ঝুরে রে ০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০

৪ ০ ০ ০ ১´ ০ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০
ধা- র্রর্সা- -র্ন´ ধর্ণা | পা পর্সা না ধন ধ পা | পমা । গমা গ ম প ধা |
০ গুণে ম ন ০ ভো ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ র

৩ ০ ০ ০ ৪ ০ ০ ০
ণধা পা । । | । । । স ন্ সা |
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ কি ০ বা

১´ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ৩ ০ ০ ০
রা রপা পা ধপমগ রা | মা গা সরা গরা | সা সধা- ধ ধ ণ ধ প
প্র ০০ তি ০ ০ ০ ০ ০ অ ০ ০০ ০০ ঙ্গ লাগি - কাঁদে ০ ০ ০

৪ ০ ০ ০ ১´
। পর্সা -নর্স´ ধণা | পপা
০ প্রতি ০ অ ঙ্গ০ মোর ইত্যাদি হইবে।

রেনেটী ঘর—তাল সমতাল। ১৪ মাত্রা

পধ ন র্সা । র্সা র্সা র্স´ণধা ধ ণা ধ পা প ধ মা পা |
ও ০ ০ ০ ০ আ জু ০ ০ ০ হা ০ ০ ০ ম ০ ০ ০

১´ • ০ ০
প পা । । । । । । । প মপা । । । । । । । |
কি পে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ০ ০ ০
। । প পা । পা পধা ধা ধ র্সা ধ পা । । । । ধপা । ণ ধা |
০ ০ কি পে ০ ধ ০০ ০ ০০ লু ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০

৩ ০ ৪
প মা স মা মমা পা পা ধপা পধা পধা ণধা পা । । । ।
০ ০ ন ব দ্বীপ ০ চ ০০ ০০ ০০ ০১ ন্দ্র ০ ০ ০

০ ২ ০
। । ধ না র্স ন ধ পা প ধ না র্সা সর্সা না ধণা পা পধা মপা |
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও ০ ০ ০ আজু ০ হা০ ০ ম০ ০০

১´
প পা
কি পে ইত্যাদি হইবে।

মান্দারণ ঘরাণা—তাল আড়তাল (দশমাত্রা)

"কে জানে গৌরাঙ্গ রূপ অমিয় পাথার"

০ ০
প পা । — ম ধ প ধপা মগা । — র্গ গ ম গ মা |
কে জা ০ ০ ০ ০ ০০ নে০ ০ গৌ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ০
ম পা । । স পা । । — র্ম মপধনা । ন ধা ধপা
রা ঙ্গ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রূ প০ ০০ ০ ০ ০ ০০

০ ২ ০
। প ন ধ না ন ধ ধপা | । । । — মর্ম মপা — র্ম প প ধপ মগা । |
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ওগো আমি ০ ০ ০ ০ ০ য় ০০

৩ ০
। । । গ র্গ গা গ মা পধা না — ণর্ধ ধপা
০ ০ ০ পা থা র গো ০ ০০ ০ ০০ ০ও

• ০
-র্গ র্সা না না । ধা ণধপা পধা মপা |
কেজা ০ ০ ০ নে ০০০ গৌ০ ০০

১´
প পা
রায় ইত্যাদি হইবে।

ঝাড়খণ্ডী ঘরাণা—তাল দোওট। ১৪ মাত্রা

"সীদতি সখি মম হৃদয় মধীরম্"

১　　　　　　　　　　　　　　　　২
(র্স ন ধধা ধ নর্সনা ধ ন ধ পা া)॥ া গপা ধধা ধ ন র্স র্রা |
আ মা ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র　প্রাণ যায় গো০ ০ ০

৩　০　০　　১　　　২
র্সা া া া া া | র্সা া া া | ন র্স না, র্সন ধা ধনধা ণধপা |
সি ০ ০ ০ ০ ০　সি ০ ০ ০　দ ০ ০ ০ ০০ তি০০ ০০০

৩　　০　　০　　১
প পা া মপধনা ধপা া া | - রর্ম গ রসা া া |
স খী ০ ০০০০ মম ০ ০　সধীম ম০ ০০

২　　　　３　০　০　১
া ধ সা -র্স রা | রা া মরা া া া -ধর্স না ধ স নর্সা ন ধ পা॥
০ হৃ দ য় ম　ধি ০ রং ০ ০ ০ ওরে আ মা ০ ০ ০ ০ র

মান্দারণ ঘরাণার সুর অধিকাংশ চৈতন্যমঙ্গলের সুর, এবং মঙ্গলকাব্যের সুরের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঝাড়খণ্ডীতে চৈতন্যমঙ্গলের সুরের প্রাধান্য কম, নাই বলিলেও চলে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমার আবেদন গুণিগণের সুবুদ্ধির উপর; গুণিজনের মনে যদি আমার বক্তব্য কিছু-মাত্র রেখাপাত করে, যদি বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন ও উহার একটি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

জগৎপূজ্য কবি জয়দেবের ভাষায় "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।"

আমি কীর্ত্তনের চর্চ্চা, যন্ত্রাদির যথাযোগ্য অনুশীলনে ও পরিবেশ সৃজনে কতকাংশ সাফল্য লাভ করিয়াছি, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিবর্গের যথাযোগ্য আগমনে তাহা পরিদর্শিত হইবে। কীর্ত্তনের এই বিষয়ে অনুরাগী বা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের অনুসন্ধিৎসা মিটাইতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সহযোগিতা করিলে আনন্দের সহিত যোগাযোগ করা যাইবে। পরম প্রেমময় "শ্রীরাধারমণের" পদ পঙ্কজে চিত্ত সমর্পিত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

ওঁ তৎসৎ

ঘোষাল দম্পতি *

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি)

অনুক্রমণিকা

সোফিয়া লিখল অসিতকে

দাদা,

চন্দুর কাহিনী পড়তে পড়তে বারবারই চোখে জল আসছে। অথচ ঠিক কেন যে কেঁদেছি জিজ্ঞাসা করলে হয়ত ভাসা ভাসা উত্তর দেব, কারণ আমি নিজেই জানি না ওর নিঃশ্রয়তাকে ঠিক দুঃখের বলা চলে কি না। যদি না চলে তাহলে ওর কথা ভেবে মন ব্যথিয়ে উঠলে সেটা কি ঠিক হবে? ভগবানের জন্য যে তার চিরচেনা স্নেহনীড় ছেড়ে বিদেশে বিভুঁয়ে গিয়ে একাহারী হয়ে যাবে (রাতে ক্ষুধাশান্তি করে জলপান ক'রে)। তার ত্যাগে যদি আমাকে ব্যথা বাজে তাহলে কি বলা চলে না যে আমি ভগবানকে সংসারসুখের চেয়ে ছোট করে দেখছি? ঠিক বুঝতে পারি না। তবে এটুকু অসঙ্কোচেই বলতে পারি যে, এ সূত্রে ছায়ার দরদ ও বেদনার যে ছবিটি আপনি ফুটিয়েছেন তার সঙ্গে আমাদের নাড়ীর টান আছে। কারণ যতই কেন না বলি দাদা যে, ভগবানের মতন আপন কেউ নেই, এ কথায় আমাদের মন কিছুতেই ভরতে পারে না—অন্ততঃ যতদিন না ভগবান আমাদের কাছে তেমনি সত্য হ'য়ে দাঁড়ান যেমন সত্য মা-র স্নেহ, বোনের দরদ, বন্ধুর প্রীতি, স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়। নয় কি? না দাদা, তর্ক করতে একথা বলছি না—ছায়া যাকে এত ভয় করে সেই 'বিদ্রোহের' আমেজও নেই এতে—আমার শুধু কেন জানি না মন খারাপ হয়ে যায় বৈরাগ্যের কথা শুনলে। মন কেবলই টোকে: যার সব আছে তাকে সব ছাড়িয়ে না নিলে কি সে ভগবানকে পেতে পারে না?

কিন্তু যাক এসব বাজে কথা। আপনি হয়ত ফের হাসবেন, আর দিদি হাল ছেড়ে দেবেন—এত সব শুনেও শেষে সেন্টিমেন্টাল! তাই আর প্রশ্ন করব না। শুধু একটা অনুরোধ করব? করতে বাধছে—না জানি কী ভাববেন? তবু ক'রেই ফেলি—কারণ মনে হয় আপনি বুঝবেন।

অনুরোধটি এই যে, এবার একটি গল্প বলুন আপনাদের আশ্রমের—আপনার দপ্তরে তো কত কী-ই আছে—যাতে মন ভালো হয়ে যায়। এ-গল্পটি পড়ে কেবল চোখের জল ফেলেছি। এবার এমন গল্প বলুন যাতে ফের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। লক্ষ্মীটি দাদা! না করবেন না।

ইতি। আপনার বিষণ্ণ বোন সোফি

তপতী চিন্তিত সুরে বলল: "তাই তো! দাদুর বর্মার কাহিনী তো লিখে ফেলেছ। এখন—" ব'লেই ওর চিন্তিত মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে: "হয়েছে হয়েছে। লেখো তুমি ঘোষাল দম্পতির কথা।"

অসিত হাসে, বলে "তথাস্তু। It seems indicated."

*   *   *

* পাদটীকা: আশ্রমটি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম নয়, গুরুদেবও শ্রীঅরবিন্দ নন।

অসিত সোফিয়াকে লিখল; "তপতী এবারও বাংলে দিয়েছে মুস্কিলাশানের দেখা কোথায় মিলবে। বলি শোন আমাদের ডুমেল আশ্রমে একবার কী কাণ্ড ঘটেছিল এক ঘোষাল দম্পতিকে নিয়ে।

আমি তখন গুরুদেবের সঙ্গে ব'সে তর্ক করছি—যোগকে কেন কালচারের বাহন করা যাবে না? কেন অন্তর্মুখী সাধক বাইরের কাল্চারের সঙ্গেও সমানে তাল রেখে পা ফেলে চলতে পারবে না? কালচারের সঙ্গে স্পিরিচুয়ালিটির সম্বন্ধ কি অহি-নকুলের—যার সমন্বয় হ'তেই পারে না··· ইত্যাদি ইত্যাদি। গুরুদেব কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন—কিন্তু সে যাক, শুনলে হয়ত তোমার ফের মন খারাপ হবে যদি বলি—ভগবানকে না পেলে কালচার দাঁড়ায় খতিয়ে গিল্টি সোনা—অর্থাৎ চকচক করে বটে, কিন্তু অগ্নি-পরীক্ষায় পাশ করতে পারে না। (আমাদের ঘরোয়া ভাষায় বলে: "ধোপে টেকে না।") তাই অবহিত হও।

গুরুদেব একদিন আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন তাঁর এক সহপাঠীর কথা। স্কুলে পড়তেন এক ক্লাসে। বললেন তার সম্বন্ধে অনেক কথাই। তার সারমর্ম এই:

শ্রীমণি ঘোষাল বনেদি জমিদারের ছেলে। বীরভূমে খুব নামডাক। হাল আমলে জমিদারদের জমিদারির প্রতিপত্তি খ'সে গেলেও তখনো—আমাদের স্বাধীন হবার আগে—তাদের যথেষ্ট নামডাক ছিল বীরভূমে। তাছাড়া ব্যাঙ্কে অনেক টাকা রেখে যান মণিবাবুর পিতৃদেব।

যথাকালে এম-এ পাশ ক'রে কালচারের জৌলুশ বাড়াতে মণিবাবু বিলেতে প্রয়াণ করেন। সেখানে ব্যারিষ্টার হ'য়ে সাহেব মেমদের সঙ্গে দহরম মহরম করে কালচারের বরপুত্র হ'য়ে দেশে ফেরেন। বার-এ তাঁর সময় হয় নি, কিন্তু তাতে কি! জমিদারির আয় তখনো যথেষ্ট ছিল তো। তার উপর মাত্র একটি কুলতিলক। তাকে এম-এ পাশ করিয়ে, জমিদারিতে বসিয়ে দিলেন। এই সময়ে তাঁর স্ত্রী মারা যেতে মণিবাবু পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তরুণী ভার্যা করেন—হোক না দ্বিতীয় পক্ষ, ঘর আলো করা স্ত্রী তো—হ'লেই বা অশিক্ষিতা। বললেন: "চলো বিলেত, তোমাকে পালিশ ক'রে অপরূপা দাঁড় করাব।" শিবানী দেবী শিউরে উঠলেন: "বিলেত! সে কি! আমি চাই কেবল একটি জিনিষ—তীর্থ করতে।" বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা, মণিবাবু কী করেন! স্ত্রীর গোঁ। সব জানিয়ে গুরুদেবকে লিখলেন। গুরুদেব আমাকে সে চিঠি দেখিয়ে বললেন: "আসতে চায় আসুক, তবে লিখে দিও স্পষ্ট ক'রে যে আমি তাদের দেখাশোনা করতে পারব না, তোমার'পরেই সে-ভার দিচ্ছি।" ব'লে বললেন মৃদু হেসে: "ব্যাপার কি জানো? ওর স্ত্রীর খুব হাঁপানি। মণির এক বন্ধু আমাকে লিখেছে যে, মণি এক ঢিলে দু-পাখী মারতে চায়—তীর্থ তথা রোগ সারা। কারণ—বন্ধুটি লিখেছেন—ও শুনেছে লোকমুখে যে, আমি শিবের অসাধ্য ব্যাধিও সারাতে পারি। মনে হয় শিবানীর একটু আটপৌরে গোছের বিশ্বাস আছে। মণির নেই অবশ্য। তবু ও—মানে, ভাবছে: স্ত্রীর পাল্লায় প'ড়ে তীর্থে যখন যেতেই হচ্ছে তখন মন্দ কি?—একবার দেখাই যাক না কিছু হয় কি না। হ'তেও তো পারে। শেক্সপীয়র পড়েছে তো: There are more things in heaven and earth Horatio, than are dreamt of in your philosophy." ব'লে সে কী হাসি!

গুরুদেবের মুখে সচরাচর ঘনঘটার গাম্ভীর্যই প্রকট হ'ত—যে জন্যে বাইরের লোকে এসে প্রায়ই তটস্থ হ'য়ে পড়ত। কিন্তু হাসলে তাঁর মুখ একেবারে বদলে যেত ঠিক যেমন ঘন মেঘ কেটে গেলে হয় শরৎকালের আকাশের রূপ। তখন তাঁর হাসি হয়ে উঠত ছোঁয়াচে—ঠিক শিশুর হাসির মত। তাই আমিও হো হো ক'রে হেসে উঠে বললাম: "আপনার বন্ধুর ছবি এঁকেছেন ভালো। কেবল জিজ্ঞাসা করি—এ-হেন কালচারের আলোক-স্তম্ভকে নিজে না বরণ ক'রে আমার স্কন্ধে চাপালেন কী দুঃখে?"

গুরুদেব বললেন ফের হেসে: "তুমি কি আপ্তবাক্য মানো না—'যোগাং যোগেন যোজয়েৎ'? মণি হ'ল—তোমারই ভাষায়—কালচারের আলোকস্তম্ভ। তার ওপর জমিদার, বিলাতফেরৎ, ব্যারিষ্টার—হ'লই বা আজ ব্রীফলেস, কে বলতে পারে ওর মধ্যে চীফ জাষ্টিস প্রচ্ছন্ন হ'য়ে নেই! এহেন 'সংস্কৃতিবান্ পুরুষোত্তম' আশ্রমে এসে প্রথমেই যদি এক মুখদাড়ি গম্ভীরাননদের দেখে, তাহ'লে ফিরে গিয়ে যত্র তত্র কী রটাবে একবারটি ভেবে দেখেছ কি? বলবে সঘনে—দেখে এলাম যে মিডীভাল

vuminant-দের দেশে এক পক্ষী ধ্যানঘুমন্ত অকর্মণ্য জপছে—ওর প্রিয় কবি শেক্সপীয়রের ভাষায়—

And so, from hour to hour we ripe and ripe
And then, from hour to hour, we rot
and rot—"

ব'লে ফের হেসে: "আর তাই তো আমার ব্রেন-ওয়েভে এল যে, ওকে বাধিয়ে দিই তোমার সঙ্গে। ও ইংরিজি শেক্সপীয়রের ভূরী বাজালে তুমি জর্মন গেটের ভেরী বাজাবে···হা হা হা! Quits!"

দুই

মণিবাবু ও তাঁর অর্ধাঙ্গিনী স্ত্রী উভয়েই দোহারা শাঁসালো। শিবানী দেবী যাকে বলে একেবারে ভারিক্কি গিন্নি। কিন্তু দুজনের মিল ঐ পর্যন্ত, তার পরে মতিগতি একেবারে উল্টো। দেখে মনে হ'ত ডি এল রায়ের বুড়োবুড়ির হাসির গান: 'বুড়োবুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত, বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত।' স্বামী চাইতেন বিলিতি কালচার, স্ত্রীর দিশি চাল। স্বামী খেতেন সিগার, স্ত্রী রাতদিন পান আর দোক্তা। স্বামী উঠতে বসতে সাধুদের প্যারাসাইট বলে গাল দিতেন। স্ত্রী মাথা নোয়াতেন গেরুয়া দেখবামাত্র। তাঁর প্রণামের ঘটা দেখে সত্যিই মনে প'ড়ে যেত ভাগবতের "জগৎ-প্রণাম"।

যাই হোক, দুজনকেই আমার ভালো লেগে গেল, কারণ দুজনেই বেশ হাসিখুসি মিশুকে ও গল্পপ্রিয়। তাই তাঁদের সঙ্গেই রোজ আমি খেতাম।

তাঁদের আমি থাকবার ব্যবস্থা করেছিলাম আমার কুটিরের ঠিক সামনেই আশ্রমের একতলা অতিথিশালার বাংলোয়। ডান দিকের দুটি ঘরে দুতিনদিন আগে এসে বসেছিলেন এক পেন্সনভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্যামল সোম ও তজ্জায়া শ্যামলী দেবী। বাঁদিকের দুটি ঘরে ঘোষাল দম্পতি। আমি এব্যবস্থা করেছিলাম এই ভেবে যে, দুই বাঙালী দম্পতি পাশাপাশি থাকলে আর কিছু না হোক, অন্ততঃ আমার ঝক্কি একটু কমবে। একথা বলছি কেন—একটু বলি সংক্ষেপে বলার দরকার আছে।

আমাদের আশ্রমে গুরুদেব অতিথিদের সঙ্গে দহরম মহরম করা তো দূরে থাক বেশি দেখাসাক্ষাৎও করতেন না। তিনি ছিলেন—পরমহংসদেবের ভাষায়—"ভিতর-বুঁদে" স্বভাবের লোক। সহজে ধরা দিতেন না। তাই বাইরের অতিথি-অভ্যাগতরা এসে প্রায়ই ঘা খেতেন। গুরুদেব ভাগবতী কথা বলতেন প্রত্যহ সকালে। ধ্যান-চক্রে বসতেন সন্ধ্যায়। সবাই যোগ দিত। কিন্তু যোগাশ্রমে এসে হঠাৎ এত গাম্ভীর্য অনেকেরই সইত না। তাই তাদের অনেককেই—আমি গান শোনাতাম—গল্পালাপও করতাম। গুরুদেব প্রায়ই গীতার খেদ উদ্ধৃত করতেন: "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি" অর্থাৎ মানুষ গড়াবেই তার স্বভাবের ঢালুপথে। আমি চিরকাল মিশুক, দহরম মহরমে পোক্ত। তাই আশ্রমে আমার'পরেই ভার পড়ত অনেক অতিথির দেখাশোনার।

কিন্তু সে সময়ে আমি একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তাই চেয়েছিলাম ঘোষাল দম্পতীকে সোম দম্পতীর সঙ্গ-সুখে রাখতে।

কিন্তু হায় রে, প্রথম দিনই বাধল শ্যামলী দেবীর সঙ্গে শিবানী দেবীর! হ'ল কি, পাশাপাশি খেতে ব'সে শিবানী দেবী বাঁ হাত দিয়ে জলের গেলাস ধরতেই শ্যামলী দেবী ব'লে বসলেন: "করছেন কী? বাঁ হাত দিয়ে জলের গেলাস ধরা?"

শিবানী দেবী ফোঁস ক'রে উঠলেন: "তোমার জন্মের আগে থেকে আমি বাঁ হাতে জলের গেলাস ধ'রে আসছি, জানো? হুঁম্।"

শ্যামলবাবু বিব্রত হ'য়ে বললেন: "কিছু মনে করবেন না। আমার গিন্নী একটু সেকেলে মানুষ—"

আর যাবে কোথা? এবার শ্যামলী দেবী উঠলেন ফোঁস ক'রে: "সেকেলে? তার মানে? একালে যা কিছু হচ্ছে সবই ভালো না কি? দুমেলে যদি আশ্রম না হ'য়ে—ইয়ে ক'রে—হোটেল হ'ত—ভালো হ'ত?"

মণিবাবু সন্ধিভঙ্গে বললেন: "তার মানে?"

শ্যামলী দেবী বললেন: "একেনিয়ানা সুন্দর সুন্দর জায়গায় হোটেল বানায়—সেকেলিয়া না—ইয়ে ক'রে—গড়ত মন্দির বা আশ্রম। উনি যখন আশ্রমে এসেছেন তখন সেকেলে আবার একটু মানতে হবে বৈ কি। "যেখানকার যা।"

আমি ফাঁপরে প'ড়ে বললাম: "গুরুদেব কিছু মনে

করেন না এসব আচার অনাচারে। তিনি চান ভক্তি নিষ্ঠা জপতপ এই সব। তখনকার মতন দুজনকে শান্ত করা গেল।

গুরুদেবকে সেদিনই রাতে বললাম: "গতিক ভ'লো বুঝছি না, গুরুদেব! ঘোষাল দম্পতীকে আর একটা কুটিরে রাখব কি?"

গুরুদেব একটু ভেবে বললেন: "এ-দুদিন থাক এক-সঙ্গে কোনোমতে—তারপরে কাশ্মীরের পুলিশ সাহেব প্রস্থান করলে তাঁর ওখানে মণি আর শিবানীকে তুলো।"

তিন

কিন্তু হবি তো হ তার পরদিনই অতিথিশালার পাশের কুটিরেই ঘটল এক কাণ্ড।

হ'ল কি, পরদিন সাধক সোহনলালের পাশের ঘরেই এসে উঠলেন এক উড়িষ্যার সাধু। গুরুদেবের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি। বিশেষ ক'রে গুরুদেবের "ভাগবতী বাণী" তাঁর জপমালা। সোহনলালকে বললেন: "এযুগে কোনো পণ্ডিতের লেখারই এমন অপূর্ব ব্যাখ্যা পড়ি নি।"

সোহনলাল বিজ্ঞ হেসে বলল: "ধেৎ! কোথায় গুরুদেব সাক্ষাৎ অবতার, আর কোথায় পণ্ডিত যে গজ গজো গজাঃ মুখস্থ ক'রে শাস্ত্র বুঝতে ছোটে!"

সাধুজি ছিলেন সত্যিই মস্ত পণ্ডিত।

অভিমানে আতপ্ত কণ্ঠে বললেন: "যারা দেবভাষার অপমান করে তারা কি মানুষ নাকি? ফুঃ!"

সোহনলাল রুখে উঠে বলল: "আর যারা অবতার-কল্প মহাপুরুষকে চিনতে পারে না তারা কি সাধু না কি? ধেৎ!"

সাধুজি বললেন: "অবতার ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায় না কী।"

সোহনলাল গর্জে উঠল: "কী? গুরুদেব অবতার তুই মানিস না?"

"না।"

"তবে মর্তে এখানে এসেছিস কেন? বেরো।"

"বেরোব? সে কি?"

"হ্যাঁ—যা বেরিয়ে এক্ষুনি"—ব'লেই সোহনলাল সাধুজিকে অর্ধচন্দ্র দিতে যাবে এমন সময়ে তিনি সোহন-লালকে ঠাশ্ ক'রে এক চড়! আর কোথায় যাবে? কুস্তিগির সোহনলাল সাধুজিকে ল্যাংমেরে ভূমিসাৎ ক'রে বুকের ওপর চ'ড়ে বলল: "বল্ গুরুদেব অবতার। নৈলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন।"

বলেছি, ওদের কুটিরটি ছিল অতিথিশালার ঠিক পাশেই। যে-সময়ে এই দাঙ্গা হয় সে সময়ে মণিবাবু অর্ধাঙ্গিনীর পরি-বেষিত এক কাপ দার্জিলিং চা সেবন করছিলেন। ওদের লড়াই হয় ঠিক সাম্‌নের বারান্দায়—মণিবাবু ও শিবানী দেবী সবই দেখেছিলেন তথা শুনেছিলেন (আমি এ-রিপোর্ট পাই প্রথম তাঁদের কাছে) তাই সাধুজি সশব্দে ভূমিশয্যা নিতেই মণিবাবু ছুটে গেলেন—শিবানী দেবী চিৎকার ক'রে ছুটে পিছন থেকে তার শার্ট চেপে ধরলেন: "যেও না গো, যেও না এ-দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে!" মণি-বাবু স্থূলকায়, কিন্তু শিবানী দেবীর ওজন পাকা আড়াই মণ। ফলে টাগ-অফ-ওয়ারে মণিবাবুর শার্ট ছিঁড়ে গেল, শিবানী দেবী টাল সাম্‌লাতে না পেরে ট'লে পড়লেন; শ্যামলী দেবী চিৎকার ক'রে উঠে তাঁর হাত ধ'রে কোনো-মতে ওঠোলেন; আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলবাবু ও মণি বাবুর কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ। লিখতে সময় লাগছে কিন্তু এসব ঘটেছিল যাকে বলে বিদ্যুদ্বেগে।

সোহনলাল ওঁদের দেখে সাধুজিকে ছেড়ে দিয়ে উঠে শাসিয়ে বলল: "মনে থাকে যেন! পণ্ডিত, না মুখ্যুর সর্দার। ধেৎ!"

গোলমাল শুনে ঠিক এই সময়ে আমি পৌছলাম অকু-স্থানে। কিন্তু তখন রণাঙ্গনে আস্ফালন স্তব্ধ—শুধু দুটি শব্দ প্রকট: সাধুজির কাতরোক্তি "উঃ আঃ"···আর ঘোষাল গিন্নির চাপা কান্না: "এ কী গুণ্ডামি গো—গুরুদেবের যোগাশ্রমে···কোথায় এসেছি আমরা···হুঁম্···"

আমি যেতেই ছিন্নশার্ট উত্তেজিত মণিবাবু আমার কাছে ঘটা ক'রেই পেশ করলেন—আই-উইট্‌নেসের এজাহার। শ্যামল বাবুও টিপ্পনি কেটে চললেন সমানে। ওদিকে সোহনলাল হাওয়া। কেবল সাধুজি তখনো ভূমি-শয্যায় সমানে কাৎরাচ্ছেন।

আমি মণিবাবু ও শ্যামলবাবুকে থামিয়ে তাঁকে ধ'রে ওঠালাম। তিনি উঠে দাঁড়িয়েই ট'লে ফের পড়েন আর কি, আমি ধরতেই আমার গলাকে খুঁটির মতন চেপে ধ'রে কেঁদে বললেন:

"সাধুদ্রোহী দুরাত্মা যো বধ্যো ভুজঙ্গমো যথা" লিখেছে কুড় পুরাণে মশাই। আপনি এর বিহিত করুন।"

বলতে বলতে তাঁর ক্রোধ গ'লে মিনতি হয়ে গেল, চোখে জল ভ'রে এল, অথচ জটার নিচে প্রবল ভ্রূকুটিতে কপালে পড়ল অন্ততঃ তিনটি সমান্তরাল বলীরেখা। এ-ও আমার স্বচক্ষে দেখা দিদি!

চার

আশ্রম হ'ল একটি ছোটখাটো জগৎ—কেবল পরিধি ছোট এই যা। ইংরাজিতে বলা চলে miniature—না, epitome, epitome—ঐ শব্দটিই আমি খুঁজছিলাম। তাই যাঁরা বলেন আশ্রমে থাকা মানে জগৎছাড়া হওয়া তাঁরা আশ্রমের সদর অন্দর কোনো মহলেরই খবর রাখেন না ব'লেই এমন উপরভাসা রায় দেন। বিশেষ ক'রে কোনো বড় আশ্রমে, যেখানে বহু সাধক-সাধিকাবিরাজমান, সেখানে মানবচরিত্র যেন আরো গাঢ় হ'য়ে দেখা দেয়, কেন না বেড় কম ব'লে দেখা যায় আরো খুঁটিয়ে তল পর্যন্ত—আন্‌-ডাইল্যুটেড।

কাজেই এধরণের একটা রোমহর্ষক কাণ্ডে আমাদের সাধক-সাধিকার সে কী আনন্দ! একটা গল্প করবার মতন টঙ্কার তথা হুঙ্কার বৈ কি! এর ওর তার মুখে পল্লবিত হ'য়ে সত্যিই সোহনলালের ক্রোধ ও সাধুজির ভূমিসাৎ হওয়া দুইই র'টে গেল রুদ্ররাগে তথা হাসি কান্নার তালে: "সোহনলাল যত রাগে, সাধুজিও ততই কাঁদেন।" "হবে না! সোহনলাল যে বিষম গুণ্ডা!" …"সাধুজিরও আস্পর্ধা তো কম নয়—গুরুদেবকে অবতার ব'লে না মানা—এ কি ভাবা যায়?" "বলিস্ কি? মানে না সত্যি?" …"কিন্তু তাই ব'লে সাধুর গায়ে হাত?" …বাঃ গুরুনিন্দা করে যে…" "কিন্তু তিনি ঠিক গুরুনিন্দা তো করেন নি বরং প্রশংসাই করছিলেন তাঁর ভাগবত বাণীর…" "রেখে দে—অবতার ব'লে না মেনে শুধু টীকাকার নাম? এরই তো নাম—damning with faint praise—নয় তো কি? বেশ হয়েছে, যেমন কুকুর তেম্‌নি মুগুর—ধন্যি সোহনলাল—দিয়েছে blasphemerকে গো-বেড়েন…" ইত্যাদি ইত্যাদি চলল চণ্ড রাগের অন্তহীন স্বরবিহার…

বলা বাহুল্য, গুরুদেবের কাছে এ-খবরের-মতন-খবরটি উড়ে গিয়েছিল। আমি সাধুজিকে সান্ত্বনা দিয়ে বিছানায় শুইয়ে ফোলা কপালে পট্টি দিয়ে, হাতে আর্নিকা দিয়ে বলছি: "সোহনলাল খুব অন্যায় করেছে সাধুজি, আমি এর বিহিত করব বৈ কি, কেবল আপনি ওকে অন্ধ গোঁড়া ব'লে ক্ষমা করুন। জানেনই তো জগতে যতরকম অন্ধ আছে তাদের মধ্যে সেরা অন্ধ হ'ল গোঁড়া উৎসাহী…" এমন সময়ে গুরুদেবের কাছ থেকে দূত এসে হাজির: "সাধুজি কেমন আছেন?…আপনাকে গুরুদেব ডাকছেন।"

পাঁচ

গুরুদেবের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি গম্ভীর মুখে বললেন: "লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে অসিত! তুমি সাধুজিকে গিয়ে সব প্রথম বলো আমি সোহনলালের হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছি—"

"আপনি কেন ক্ষমা চাইতে যাবেন গুরুদেব? সোহনলাল—"

গুরুদেব হাত তুলে আমাকে নিরস্ত ক'রে বললেন: "ভাগবতে পড়ো নি—বৈকুণ্ঠে নারায়ণের দুই দ্বারী জয়-বিজয় মুনিদের ঢুকতে না দিয়ে অপমান করার জন্যে নারায়ণ স্বয়ং এসে তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, বলেছিলেন: কিঙ্করের অপরাধ প্রভুকে বর্তায়?"

আমি বললাম: "জানি গুরুদেব, কিন্তু এখানে তো সোহনলাল ঠিক দ্বারী ছিল না—তাছাড়া ও যদি সত্যিই আপনাকে অবতার মনে করে—গুরু ইষ্ট—ভগবান্—

"আমার সবচেয়ে আপত্তি তো ঐখানেই অসিত। তোমাদের আমি অগুন্তিবার বলি নি কি যে আমি অবতার নই নই নই? গুরু শিষ্যের কাছে ভগবানের প্রতিনিধি তাই ইষ্টের মতনই পূজ্য ঠিকই। কিন্তু রাজপ্রতিনিধিকে অর্ঘ দিলে সে-অর্ঘ সে রাজার কাছে পৌছিয়ে দেয় একথা সত্য হ'লেও ভাবলে একথাও সত্য নয় যে, প্রতিনিধি ও রাজাধিরাজ অভিন্ন। বিশেষ ক'রে অবতার—অবতার—অবতার শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হ'য়ে গেছে। গোঁড়ামির এত বড় আশ্রয় আর নেই—এই মোড়ে মোড়ে এক এক অবতারের খড়ের পুতুলকে খাড়া ক'রে তাদের পায়ে কাকুতি মিনতি!…আমার সত্যি সময়ে সময়ে মনে হয় যে গীতায় ঠাকুর সম্ভবামি যুগে যুগে না বললেই ভালো করতেন। মানুষ যখন স্বভাবেই অন্ধ, গোঁড়া, তামসিক

তখন এ-অবতারতত্ত্ব হয়ত গোপনে রাখলেই ভালো হ'ত। —কিন্তু মরুক গে। তুমি সোহনলালকে গিয়ে বলো এক্ষনি যে, সাধুজির পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতে হবে ওকে। নৈলে এখানে থাকা চলবে না। আর এক কথা—ও কিছুদিন পরিব্রাজক হ'য়ে ঘুরে আসুক। যদি পারে তো অমরনাথ যাক। এর প্রয়োজন আছে। আশ্রমে থেকে সাধনা করার যেমন সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও আছে ও হাড় হাড়ে জানুক। গুরুর আশ্রয়ে থেকে মানুষ প্রায়ই বলে: 'আমরা পর্বতের আড়ালে আছি।' কিন্তু যদি কেউ ডিনামাইট দিয়ে সে-পর্বতকে ধন্যবাদ জানায় তবে! গুরুভক্তির বীণাকে নিয়ে গদাযুদ্ধ করলে শুধু বীণাই ভেঙে থান থান হয়, দিগ্বিজয়ী হওয়া যায় না। সোহনলালকে বোলো একথা—কারণ আমি ওর সঙ্গে উপস্থিত দেখা করতে চাই না। পরিব্রাজক হ'য়ে তীর্থ-ভ্রমণ ক'রে আগে শুদ্ধ হোক তারপর ওকে ঠাঁই দেব ফের।"

ছয়

গুরুদেবকে এত ক্ষুব্ধ আর কখনো দেখি নি। গিয়ে বললাম সোহনলালকে। সে কিন্তু একবারও আপত্তি করল না। চোখের জলে সাধুজির পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইল। সাধুজি তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

বাঁচা গেল! একটা সমস্যার অন্ততঃ সমাধান হ'ল, যদিও আশ্রমে মুখে মুখে নানা উল্টোপাল্টা মন্তব্য উড়ে বেড়াতে থাকল। কিন্তু সে অন্য কথা, দুই অতিথি দম্পতির প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

সাধু মার খেল এতে দেখলাম এক আশ্চর্য ব্যাপার! মণিবাবু বললেন: "সোহনলালের গোঁড়ামি অক্ষমণীয়। কিন্তু তাঁর স্ত্রী শিবানী দেবী বললেন অকুণ্ঠেই: "গুরু-দেবের যে অপমান করে তার ঠিক সাজাই হয়েছে, ধন্য সোহনলালের গুরুভক্তি—হুঁম্।"

বাধল আবার এক নতুন ফ্যাসাদ—জোরা দাম্পত্য কলহ। কারণ এ বাগ্বিতণ্ডায় অন্য দম্পতিটি এসেও কাঁধ মেলালেন পরম আগ্রহে। মেলাবেন না?—আশ্রমের গম্ভীর সাধনায় মন বসানো তো চাট্টিখানি কথা নয়!—ওঁরা বেশ একটু ছাড়া পেলেন। ফলে শ্যামলী ও শিবানী দেবীর মধ্যে সন্ধি হ'য়ে গেল দেখতে দেখতে। দাম্পত্য-কলহ হ'য়ে উঠল ডবল—একদিকে দুই স্ত্রী মহোল্লাসে দাঁড়ালেন সোহনলালের তরফে-তাকে "সাবাস জোয়ান" উপাধি দিয়ে। অন্য দিকে দুই স্বামী সোহনলালকে নাম দিলেন গোঁয়ার চাষা আনকালচার্ড ইত্যাদি। বারবারই বিশেষ ক'রে মণিবাবু বলা সুরু করলেন আমার সামনে যে, ধর্ম যতদিন কালচারকে না মানবে ততদিন তাকে দিয়ে কোনো কাজই হবে না। সহিষ্ণুতা—tolerance—শুধু কালচার থেকেই আসে, ধর্মের স্বভাবই হ'ল মানুষকে গোঁড়ামির দীক্ষা দেওয়া।

যতবারই উনি বলেন একথা শ্যামলবাবু জুড়ে দেন: "হ্যাঁ তা বটেই তো, এই দেখুন না কেন নানা মঠের মোহান্তদের অনাচার ছুঁৎমার্গ—বিবেকানন্দ কি সাধে ব'লেছেন ধর্ম আমাদের গিয়ে ঠেকেছে শুধু ভাতের হাঁড়িতে…।"

সঙ্গে সঙ্গে দুই গিন্নি কোরাসে প্রতিবাদ সুরু ক'রে দেন: "যত সব বাজে কথা। কালচার মানে কি? দুটো ইংরাজি বুকনি রপ্ত করা বৈ তো নয়। ফলে দেখ না দেশ চলেছে কোন্ রসাতলে!—চাল ডাল নুন তেল ঘী কোন্টা পাওয়া যায় শুনি!…রাজ্যিজোড়া হাহাকার। ধর্ম তবু পেট ভ'রে খেতে দিত—দেখ না কেন এই আশ্রমে কেমন থাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। আহা যেন রামরাজ্য রে! আর যাও কলকাতা, যাও বম্বে, যাও হিল্লি দিল্লি মথাকুটে মরলেও চোরাবাজারে ছাড়া মিলবে না কিছুই। এর নাম কালচার? ঝাঁটা মারি এমন কালচারকে।"

মণিবাবু বিরক্ত হ'য়ে বললেন: "কী সব ধান ভানতে শিবের গীত! চাল ডাল আক্রা হ'লে কি প্রমাণ হয় কালচারের জন্যেই হয়েছে? মানুষের শিক্ষার ফুল কালচার—আর কালচারের ফল সহিষ্ণুতা ভদ্রতা সুবুদ্ধি।"

আমি দিনের পর দিন এই ধরনের দাম্পত্য কলহ শুনে একদিন অতিষ্ঠ হ'য়ে বললাম: "মণিবাবু, শিক্ষা কালচার সবই খাসা খাসা কথা। কিন্তু এ সবের ফলে মানুষ সহিষ্ণু হয় একথা সত্য নয়। হ'লে এ-জগতে নাজি ফ্যাশিস্ত, কম্যুনিষ্টদের এমন বোলবোলা হ'ত না। পরমহংসদেবের উপমা মনে নেই! টিয়া পাখী দাঁড়ে ব'সে খাসা রাধাকৃষ্ণ বলে। কিন্তু তার গলা টিপে ধরলেই বার হয় ক্যাঁ ক্যাঁ বুলি। কালচারের বেলায়ও এই কথা। Liberty,

equality, fraternity, internationalism, socialism, secularism এ সবই কথা কথা কথা—দাঁড়ে বসা মানুষ-টিয়ার রাধাকৃষ্ণ বলা। কিন্তু হাজার কালচারেও মানুষের আত্মাভিমান অহংবুদ্ধি যায় না। আর আত্মাভিমান অহঙ্কার না গেলে সহিষ্ণুতা তিতিক্ষার ভিৎ গাঁথা হ'তেই পারে না।"

মণিবাবু ব'ললেন উচ্চাঙ্গের হেসে: "আপনি যোগি-মানুষ অসিতবাবু। তাই কালচারকে ছোট ক'রে দেখেন। আর এ-ভুল আপনার এসেছে ধর্মের কুয়াশায় wrong focus-এ ফরলেই।"

শিবানী দেবী বললেন: "মরি মরি! ধর্ম বিশ্বাস হ'ল কুয়াশা আর অধর্ম অবিশ্বাস হ'ল সূয্যিমামার আলো! চোখ চেয়ে দেখ না একবার—ধর্মকে পুলিপোলাও চালান দিয়ে কালচারকে নিয়ে ঘরকন্না ক'রে দেশের কী দশা হয়েছে—হুম্। ঘরকন্না নয়, অসিতবাবু, ঘরে ঘরে কান্না, কান্না কান্না। আপনি আশ্রমে থাকেন বড় বেঁচে গেছেন, নইলে আপনাকেও ডাক ছেড়ে কাঁদতে হ'ত আক্রাগণ্ডার দিনে—হুঁম্।"

শ্যামলবাবু দরদী কণ্ঠে বললেন: "বৃথা মণিবাবু, বৃথা। কালচার যে কী বস্তু গিন্নিরা কোনোদিনই বুঝবেন না।"

শ্যামলী দেবী ঝঙ্কার দিয়ে বললেন: "না বুঝবে কেবল ইয়ে ক'রে চোরাবাজারীরা, পুলিশঠন্‌ঠনরা, আর ছাপোষা ডিপুটি—ডি এল রায় কি ভুল বলেছেন

তড়বড় খেয়ে ভাত দড়বড় ছুটি
আপিসেতে চলে যান কালচার্ড ডিপুটি।"

মণিবাবু বললেন: নবীন ডিপুটি লিখেছিলেন ডি এল রায়।"

শিবানী দেবী পিঠ পিঠ বললেন: "কিন্তু বলতে চেয়েছিলেন কালচার্ড ডিপুটি শ্যামলী ঠিকই বলেছে হুঁম্।"

গুরুদেবকে গিয়ে বললাম, তিনি হেসে বললেন: "এরা জানে না ধর্ম কী বস্তু তাই ধর্মের অপভ্রংশ ও ব্যভি চারের শোভাযাত্রা দেখে ভাবেবুঝি এরি নাম ধর্ম। দুপাতা ইংরাজী প'ড়ে কয়েকটা সাহেবি বুলি কপচে ভাবে বুঝি শুধু বুদ্ধির প্রেসক্রুপ্‌শনে দলাদলি, রেষারেষি, হানাহানির রোগ সারে। সহিষ্ণুতা খুব বড় কথা অসিত, কিন্তু যথার্থ সহিষ্ণু হ'তে হ'লে চাই সব আগে দুটি জিনিষ: কল্পনা ও দীনতা। কল্পনা দেখতে শেখায় যে, আমার কাছে অমুক নীতি ঠিক মনে হ'লেও তোমার কাছে তার উল্টো নীতি সমানই সত্য মনে হ'তে পারে। আর দীনতা মানতে শেখায় যে, যারা স্বীকার করে তারা অজ্ঞান অযোগ্য কেবল তারাই পারে হৃদয়কে ঠাকুরের কাছে খুলে ধরতে যার ফলে সে আলো পায়। সোহনলালকে সব আগে এই দুটি শিক্ষা পেতে হবে, নৈলে তার মন্ত্রদীক্ষা হবে শুধু কথার কথা, কালচার্ড আত্মম্ভরির মতনই তাকে অজ্ঞানের মধ্যেই আমরণ বসবাস করতে হবে।"

এত শত গুরুগম্ভীর কথা বলব ভাবি নি, কিন্তু বলতে হ'ল এর পরের অভাবনীয় পরিণতির ব্যাখ্যা এর মধ্যেই মিলবে ব'লে।

হ'ল কি, সাধুজি সোহনলালের হাতে মার খেলেও সোহনলাল তাঁর কাছে মাপ চাইবার পরে দুজনের খুব ভাব হ'য়ে গেল। গুরুদেব সোহনলালকে ধমকে কিছুদিন পরিব্রাজক হ'তে বলেছেন শুনে তাঁর মনটা আরো নরম হ'য়ে গেল। তিনি বললেন সোহনলালকে যে, তিনি আবার যাচ্ছেন অমরনাথ, সোহনলাল যদি যেতে চায় তো পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, কারণ অমরনাথের পথ তাঁর নখদর্পণে।

শুনে মণিবাবু ধরলেন তিনিও যাবেন। আশ্রমের গুরু-গম্ভীর আবহাওয়া তাঁর আর বরদাস্ত হচ্ছিল না। দিনের পর দিন সেই এক নামগান, গুরুদেবের সামনে ধ্যান, তাঁর গীতা বেদ ভাগবত ব্যাখ্যা কাঁহাতক সয় মানুষ? শ্যামল বাবুর অবিকল ঐ অবস্থা। তাই তিনিও সাধুজির সঙ্গ নিলেন। আর তোড়জোড় বেঁধে ওঁরা চারজন, রওনা হলেন। শ্যামলী দেবী ও শিবানী দেবী অমরনাথের পথ-কষ্টের কথা শুনে সাহস পেলেন না। পতিযুগল পত্নী-যুগলকে আশ্বাস দিলেন অমরনাথ থেকে ফিরে তাঁদের নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবেন। আর কত তীর্থ আশ্রয় করবেন? বলা বাহুল্য, ওঁরা অমরনাথ যেতে চেয়েছিলেন তীর্থ করতে নয় মোটেই, হৈ চৈ ক'রে ঘুরে এসে যত্র তত্র বড়াই করবে—দেখে এলাম বরফের শিব, পথে হেন করলাম তেন করলাম—ইত্যাদি।

ভর্তাযুগল চ'লে যেতে জায়াযুগল যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। শিবানী দেবাকে মণিবাবু প্রায়ই খোঁটা দিতেন

কালচারের নামে। বলতেন ইংরাজী শিখতে আমার কাছে। আমি বাধ্য হ'য়ে প্রথমদিকে শেখাতাম, কিন্তু তাঁর মন বসছে না দেখে দুদিন বাদেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। ফলে মণিবাবু স্ত্রীকে আরো খোঁটা দিতেন কথায় কথায়। এহেন স্বামী চ'লে যেতে সাধ্বী শিবানী দেবীর যে কী আনন্দ! যেন ছুট পেলেন—বলতেন আমাকে অকুণ্ঠেই। বলতেন: স্বামী অখাদ্য খান কালচারের নামে, মেমসাহেবদের সঙ্গে নৃত্যরঙ্গে মজেন, সময়ে সময়ে লালপানিকেও ভজেন···ইত্যাদি ইত্যাদি। বুঝতে বেগ পেতে হয় নি কেন স্বামীর বরেণ্য কালচারকে পতিব্রতা জঘন্য মনে করতেন—যে জন্যে থেকে থেকে তাঁদের মধ্যে তুমুল দাম্পত্য কলহ বাধত। শ্যামলী দেবী সে কলহাগ্নিতে বাতাসের কাজ করতেন, বলতেন তাঁর স্বামীও তাঁকে বোঝেন না কথায় কথায় তাঁর আচারিপনাকে শুচিবাই ব'লে ব্যঙ্গ করেন···কথায় কথায় কথা বাড়ে—বলে না?

এহেন পতিযুগল প্রস্থান করতে পত্নীযুগল সই পাতিয়ে খুব মন দিয়েই শুনতেন গুরুদেবের ভাগবতী কথা। শুনতে শুনতে ক্রমশ তাঁরা মনের মধ্যে শান্তির স্বাদ পেলেন—যে-স্বাদ কখনো পান নি এর আগে। আমাকে একথা বলতেন দুজনেই উজিয়ে উঠে।

তারপর ঘটল আর এক আশ্চর্য ব্যাপার: শিবানী দেবীর ছিল রক্তের চাপ, তার উপর ডায়াবেটিস। নানা ডাক্তার কবিরাজ হাকিম দেখানো হয়েছিল, কিন্তু বৃথা। তিনি বহুদিন হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। দুমেলে এসে মাঝে মাঝে খুব কষ্ট পেতেন—মাথা ঘুরত ব'লে বিষম ভয়ও পেতেন, কিন্তু উপায় কি?—ডাক্তারেরা সকলেই যখন একবাক্যে জবাব দিয়ে গেছেন!

একদিন কথায় কথায় প্রেমলবাবাজির প্রসঙ্গ উঠতে আমি শিবানী দেবীকে বলি যে, তাঁর একটা খুব শক্ত অসুখ গুরুর চরণামৃতে সেরে গিয়েছিল।

স্বামীর কাছে উঠতে বসতে চরণামৃত কুসংস্কার ও ভূত-প্রেত সব মিডীভাল শুনতে শুনতে তিনি ধ'রে নিয়েছিলেন ওরা একই জাতের মিথ্যে কল্পনা। আমার মুখে একথা শুনে তাঁর হঠাৎ ইনস্পিরেশন এসে গেল যেন—বললেন আমাকে: গুরুদেবের চরণামৃত তিনি একবার পরখ ক'রে দেখতে চান। আমি খুশী হ'য়ে গুরুদেবকে বলতেই তিনি রাজী হ'লেন। রোজই সকালে আমি গিয়ে তাঁর চরণামৃত আনতাম তা থেকে এক চামচ তাঁকে পাঠিয়ে দিতাম।

মণিবাবু ও শ্যামলবাবু অমরনাথ রওনা হবার দিন দশেক পরে, শিবানী দেবী বললেন গদ্‌গদকণ্ঠে সাশ্রু-নেত্রে যে, দেবগুরুর কৃপায় তাঁর মাথার কষ্ট প্রায় নেই বললেই হয়। আশ্রমের ডাক্তারকে দিয়ে রক্তের চাপ নেওয়াতে তিনি আশ্চর্য হ'য়ে বললেন: সম্পূর্ণ সারে নি, তবে অনেক ক'মে গেছে। শিবানী দেবী শুনে আনন্দে অশ্রুনদী বইয়ে দিয়ে গুরুদেবের পায়ে গিয়ে পড়লেন: "আর কখনো এমন অপরাধ করব না গুরুদেব। 'চরণামৃত ছাই' ব'লে কত হাসাহাসিই না করেছি···মাপ করুন।" গুরুদেব তো অবাক্। আমার দিকে তাকাতে আমি সব বললাম। গুরুদেব হেসে আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "অপরাধ এমন কিছু হয় নি মা, অজ্ঞানদের কথা ঘড়ি ঘড়ি শুনতে ঠিকে ভুল হয়ই তো। আমিও একসময়ে বিশ্বাস করতাম না যে, চরণামৃতে কঠিন রোগ সারে। আমার নিজের এক শক্ত অসুখ সেরেছিল, তাই তো আমি চরণামৃত পাঠাতে রাজী হয়েছিলাম। তোমার বিশ্বাস এসেছে এ আনন্দের কথা। কারণ তোমার কালচার্ড স্বামী যে আদৌ বিশ্বাস করেন না এসব তুকতাকে একথা আমার অজানা নেই। সে এক সময়ে আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। এখন সে আমাকে দেখে যেমন সুমেরু দেখে কুমেরুকে।"

বাস, আর কিছু বললেন না। শিবানী দেবীর দেখা-দেখি শ্যামলী দেবীও গুরুদেবের চরণামৃতের আবদার ধরলেন। অগত্যা তাঁকেও দিতে হ'ল। তাঁর ছিল অনিদ্রা রোগ। পাঁচ সাতদিন চরণামৃত পান করতে না করতেই গাঢ় নিদ্রা!

দুই সখীরই তখন সে কী গলাগলি! প্রথম দিকে যাঁরা পরস্পরকে সইতে পারেন নি, গুরুদেবের ছোঁয়াতে—বিশেষ ক'রে চরণামৃতের যাদুতে—তাঁরা হ'য়ে উঠলেন পরস্পরের দরদী সখী, ব্যথার ব্যথী। মণিবাবু কথায় কথায় বলতেন শ্যামলী আনকালচার্ড—আমাদের থাকের মেয়ে নয়—এমন কি, আমাকে একদিন সোজা জিজ্ঞাসাই

ক'রে ফেলেছিলেন ওরা কবে "ভেগে পড়বে"? এহেন দুই থাকের কালচার—"তেল আর জল"—মিশে দাঁড়ালো এক চমৎকার সখিত্বের কম্পাউণ্ড—শুধু ভাগবতী কথা আর চরণামৃতের কৃপায়, ভাবতে পারো? মরুকগে, তারপর কী হ'ল শোনো—সে এক রীতিমত নাটক।

মাসখানেক বাদে দুই সখা ফিরে এসে সখীযুগলের মাখামাখি দেখে তো অবাক! ওঁরা পাতিয়েছিলেন নয়নতারা—ইনি ওর নয়নতারা, উনি এর নয়নতারা। আমাদের দেশে মেয়েরা খুব গলাগলি হ'লে এম্‌নি নাম পাতায়।

বলা বাহুল্য, শ্যামলবাবু এতে খুশী হ'লেও মণিবাবু খুব আশ্বস্ত হন নি। এ যেন অসবর্ণ বিবাহ—ব্রাহ্মণ বৈদ্যের। বৈদ্য পাত্রী ব্রাহ্মণকে বিয়ে ক'রে সামাজিক সিঁড়িতে—ladder এ—এক ধাপ উঠলেও ব্রাহ্মণ পাত্র একধাপ নেমে যায়। কাজেই পাত্রীর বাপ-মা খুশী হ'লেও পাত্রের বাপ-মা উৎফুল্ল হবেন কেমন ক'রে?

কিন্তু এসব বেবনতিই ফিঁকে হ'য়ে গেল কালচারের গরমিলে নয় দুই স্ত্রীর বিশ্বাসের বিপ্লবে। মণিবাবু তো রেগেই খুন স্ত্রী রোজ চরণামৃত সেবন করছেন দেখে।

"এ কী কাণ্ড অসিত বাবু!" বললেন আমাকে প্রথম দিন ফিরেই—স্ত্রী সামনে, কিন্তু গ্রাহ্যই নেই এমন রাগ। "চরণামৃত! কেঁচে গণ্ডূষ? এত কালচারের লেকচার দিয়ে শেষে কি না…" ইত্যাদি তর্জনগর্জন।

আরো আশ্চর্য এই যে, শিবানী দেবী রুখে উঠলেন, সাফ জবাব দিলেন: "কেঁচে গণ্ডূষ আবার কি? ডি এল রায় বলেছিলেন আবার তোরা মানুষ হ। গুরুদেবের কৃপায় ফের আমরা দুই বোনে মানুষ হয়েছি, হুঁম্‌। শিখেছি কিসে কী হয়—কার কী দাম! রাতদিন তোমার আদরের কালচারের কলকলানিতে আমার হয়েছিল কান ঝালাপালা প্রাণ পালাপালা—হুঁম্‌। শুধু তাই? মাথা ঘুরত, ডায়েবেটিস, অরুচি—সবই তো আমাকে কালচারের কাঁপুনিতেই আরও অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল! গুরুদেব হ'লেন সাক্ষাৎ দেবতা—ধন্বন্তরি। তাঁর চরণামৃতে আমার শরীর ভালো হয়ে গেছে—আমার নয়নতারাও আজকাল রাতে খাসা ঘুমোয়—ওর অনিদ্রা সেরে গেছে। কালচার অপদেবতাকে নিয়ে তুমিই ঘর করো, আমি আর ওমুখো হচ্ছি নি—শুধু চরণামৃত দেবতার প্রসাদেই ভ'রে নাও—ভরসা রাখি। তুমি বাড়ী যাও, যদি সইতে না পারো। হুঁম্‌।"

"বাড়ী যাব? মানে?" বললেন মণিবাবু চোখ কপালে তুলে।

"যাও তোমার কালচার্ড বন্ধুমহলে—সাধু সন্ত সাধন ভজনকে নিয়ে যত পারো হাসাহাসি করো—আমি অন্ততঃ আর 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'—সেদিন বলছিল আমার নয়নতারাও।"

"সংস্কৃত বুকনি আবার কবে শিখলে? খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি!"

এবার শ্যামলী দেবী টুকলেন: "রাগ করবেন না মণিবাবু: গুরুদেবের কাছে মাসখানেক ধ'রে শুধু—ইয়ে ক'রে—সংস্কৃত শ্লোকই শুনে এসেছি গীতা ভাগবতের। তবে ও বুকনিটি আমি আমার বাবার কাছ থেকেই শিখেছিলাম তিনি ছিলেন নবদ্বীপের পণ্ডিত—আমাকে সংস্কৃত পড়াতেন। কী যে ভালো লাগত সংস্কৃত দেবভাষা, বলতেন জ্যাঠামশায়!" শ্যামলী দেবী উজিয়ে উঠলেন।

মণিবাবু তুড়ি মেরে তাচ্ছল্যের সুরে বললেন: "অং বং চং আবার একটা ভাষা নাকি? তবে মেয়েছেলে তো, হবে না? শেক্সপীয়র কি সাধে বলেছিলেন Taming of the Shrew-তে:

A woman moved is like a fountatn troubled:
Muddy, ill-seeming, thick, bereft of beauty: *

—কোথায় বার্নার্ড শ, সেক্সপীয়র আর কোথায় গীতা ভাগবত! বলি নি আমি—তেলে জলে মিশ খায় না?—"

আমি আর থাকতে পারলাম না, হেসে বললাম: "কিন্তু চর্মচক্ষে তো দেখছি পরিপাটি মিশ খেল মণিবাবু! শুনলেন না ওঁদের পাতানো নাম—নয়নতারা?"

মণিবাবু ক্ষেপে গেলেন: "এইজন্যেই আমি ওঁকে এখানে রেখে যেতে চাই নি। যাহোক যা হয়েছে হয়েছে—কালই প্রস্থান—বুঝলে?"

---

* মুগ্ধা নারী—আলোড়িত উৎসের মতন
পঙ্কিল, অভব্য, স্থূল, সৌন্দর্যবিহীন!

শিবানী দেবী বললেন: "বুঝতে বেগ পেতে হয় নি, কেবল আমাকে সীতাহরণ করতে হ'লে তোমায় মোহন-লালের শরণাপন্ন হ'তে হবে, মনে রেখো। হুঁম্।"

"যাবে না? ছেলেকে ব'লে এসেছি—"

"ছেলে তো কত! সতীনের। তাকে তুমিই কোলে ক'রে 'দোলে আমার গোপাল দোলে' গেও। আমার আর পোষায় না আধিখ্যেতা! হুঁম্।"

"তার মানে?"

"কতবার বলব গো, বলো তো? আমি অন্ততঃ বছর-খানেক থাকব এখানে। তারপরে যাব কি না তখন দেখা যাবে। হুঁম্।"

"এ কি ঠাট্টা নাকি অসিতবাবু?" বললেন মণিবাবু আমার দিকে চেয়ে রুষ্ট সুরে। "গুরুদেবকে গিয়ে বলছি আমি এক্ষুনি।"

আমি হেসে বললাম: "কেন পণ্ডশ্রম করবেন মণি-বাবু? গুরুদেব কালচারের চেয়ে ভগবানকে বড় মনে করেন।"

"তাই ব'লে ধানদুব্বো দিয়ে বিয়ে করা স্ত্রী—"

আমি বললাম: "আপনাকে কি বলি নি—এখানে তিন চারটি মেয়ে এসেছে স্বামী ছেড়ে? কেবল জিজ্ঞাসা করি স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়িতে আপনার আপত্তি কি একটু 'মিডীভাল' নয়? কথায় কথায় আপনি কালচারের জয়-গান করেন। কিন্তু আপনার মডেল সাহেবমেমদের কালচার্ড মহলে তো আজকাল ডাইভোর্সেও কেউই শক্ পায় না।

"আমি ডাইভোর্সে বিশ্বাস করি—একথা কবে বলেছি? আমি বিশ্বাস করি স্ত্রী চলবে স্বামীর মতে।

শিবানী দেবী বললেন: আর আমি বিশ্বাস করি—শিষ্যা চলবে গুরুর মতে। হুম্।"

শ্যামলী দেবী জবাব দিলেন: "গত পূর্ণিমায়—গুরু-পূর্ণিমায় আমরা দুজনেই—ইয়ে করে—মন্ত্র নিয়েছি গুরুদেবের কাছে।"

মণিবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন "সে কি? মন্ত্র নেওয়া? আমার মত না নিয়েই? এ চলবে না চলবে না চলবে না।" কী বলো শ্যামল?

শ্যামলবাবু হাসলেন: "মণিবাবু, আমরা তো তেল নই, জল—তাই চরণামৃতের সঙ্গে মিশ খাই। আমার স্ত্রীর অনিদ্রা সেরেছে গুরুদেবের চরণামৃতে এতে আমার যে কী আনন্দ হয়েছে এ-পাপমুখে বলব কেমন করে?"

মণিবাবু জ্ব'লে উঠে বললেন: "তার মানে? তুমি তোমার স্ত্রীকে এখানে থাকতে দেবে—indefinitely?

শ্যামলবাবু বললেন: "কেন দেব না মণিবাবু? আপনি জানেন, আমি সাধারণ চাকরে—আপনার মতন কালচার্ডও নই, জমিদারও নই। চিরজীবন ডেপুটিগিরি ক'রে কোনোমতে সংসারের বোঝা ব'য়ে এসেছি। আমার একটি ছেলে—এখন কৃতী, মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে। অল্প পেন্সন পাই তাতে আমাদের দুটি প্রাণীর দিব্যি চ'লে যাবে। তাছাড়া গুরুদেব যদি আমাকেও দীক্ষা দেন তবে আমি ফিরতে চাইব বা কেন, আর ফিরবই বা কোন্ চুলোয় বলুন? বলে না—'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে?' আমার গিন্নিই যদি এখানে কায়েমী হন তবে আমি কার সঙ্গে ঘর করব গিন্নিহীন মরুচরে?"

মণিবাবু জ্ব'লে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললেন: "আমি···আমি···সইব না, সইব না, সইব না ব'লে রাখছি।"

আমি হেসে বললাম: "সে কি মণিবাবু? আপনি যে ঘড়ি ঘড়ি বড় গলা ক'রে বলতেন—সহিষ্ণুতা tolerance শুধু কালচারের একচেটে—আশ্রমে মানে ধর্মক্ষেত্রে শুধুই হানাহানির কুরুক্ষেত্র?

"নয় তো কী? মোহনলাল সাধুজিকে মারে নি—স্বচক্ষে দেখেও ভুলে গেলেন সব?"

আমি বললাম: "ভুলিনি মণিবাবু। কেবল আপনিই ভুলে যাচ্ছেন—গুরুদেবের এককথায় সে সাধুজির পায়ে প'ড়ে শুধু যে অকুণ্ঠে ক্ষমা চেয়েছিল তাই নয়—তার গোঁড়ামিকে দাবিয়ে রেখে গুরুদেবের নির্দেশে ছুটেছিল অমরনাথে তারই সঙ্গে যাকে সে একদিন সইতে পারে নি। পাশাপাশি আপনার নিজের কথা ভেবে দেখুন দেখি একবার: এত কালচার কালচার ক'রে গলাবাজি করেন; কিন্তু চরণামৃতে স্ত্রীর শিবের অসাধ্য ব্যাধি সারতে দেখেও কেমন তম্বি করছেন তাঁকে—ফিরে যেতেই হবে ব'লে! তাই তো বলেছিলাম সেদিন মণিবাবু—মনে আছে কি—যে, কালচারের টিয়াপাখীকে দিয়ে বুদ্ধিবাদের

নানা সভ্যভব্য বুলিই বলানো যায়, কিন্তু যখন আঁতে ঘা লাগে তখন সেসব বুলি আর কাজে আসে না—সভ্যভব্য কলার নেকটাই কোট পেনটুলুন ছেড়ে সে বাঁদরামি সুরু করে দেয়। আপনি কথায় কথায় শেক্সপীয়রের শ্লোক ঝাড়েন, শুনুন তিনি কী বলেছিলেন একথায়:

But man, proud man,
Drest in a little brief authority,
Most ignorant of what he's most assured,
His glassy essence, like an angry ape,
Plays such fantastic tricks before high heaven
As make the angels weep.

মণিবাবু (দাউ দাউ ক'রে জ'লে উঠে) কী বলছেন আপনি অসিতবাবু? আমাকে বাঁদর বলা! আমি নালিশ করব, বুঝলেন? আমি জমিদার ফণী ঘোষালের ছেলে জানেন—যার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত?

নীলা দেবী (মুখ টিপে হেসে): সত্যিই আপনি ভুল বলেন নি দাদা! কালচারের টিয়াপাখী ক্যাঁ ক্যাঁ ছাড়া সব ভুলে যায় একমুহূর্তেই বটে। হুঁম্।"

* সামান্য ক্ষণায় শক্তি প্রমত্ত দাম্ভিক নর হায়
না জানি' স্ফটিকশুভ্র জন্মস্বত্ব দেবত্ব আপন
ক্রোধে অন্ধ বানরের ম'ত করে কুশ্রী হানাহানি
দেখি' যাহা দেবগণও স্বর্গে অশ্রু ঝরান অঝোরে।

শ্রাবণ রাত্রি

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ

মেঘেতে তাণ্ডব নৃত্য বিদ্যুতের হানা
কাছে এস প্রিয় সখি নাহি কোন মানা
ললিত কপোলতলে মাধুরী মাখিয়া
আমারে সে বাঁধ সখি দুটি বাহু দিয়া
যূথিমালা গলে দোলে স্খলিত কবরী
জাগিয়া কাটানু আজ সারা বিভাবরী
প্রমত্ত দা'দুরী ডাকে সিক্ত বনতল
বিফলে কাঁদিছে নিশি মেঘ ছলছল

কদম্ব কেশর ঝরে নীপবন 'পরে
বিকচ বকুল কুঞ্জে পুষ্প থরে থরে
আজি সখি বক্ষ'পরে করিয়া শয়ন
মেলি রহ মায়াভরা ও দুটি নয়ন
আজ শুধু চোখে চোখে চেয়ে থাকা দিন
রিমিঝিমি বাজিতেছে বরষার বীণ
সিক্ত যূথিকায় আজ ভরিয়াছি ডালা
শাওনে পরাবো আজ বাহুডোর মালা॥
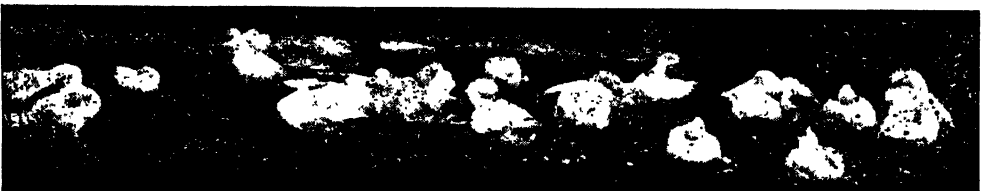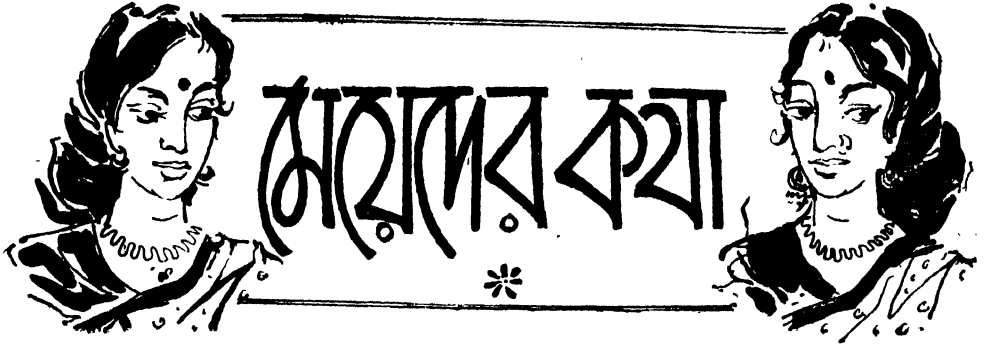
অপরাধ জগতে নারী

জয়শ্রী চক্রবর্তী

সব দেশেই নারী অপরাধী আছে। পুরুষের তুলনায় নারীদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কম হলেও নারী অপরাধীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আমাদের দেশেও নারী অপরাধী আছেই শুধু নয়, এদের সংখ্যা যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে! এই সব অপরাধী নারীদেরও একটা ব্যক্তিগত দিক থাকে। এই দিকটি তার অপরাধ জগতে প্রবেশের কাহিনী এবং এই জগতে থাকাকালীন তার সুখ দুঃখের এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস! কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই দিকটিতে আলোকপাত করা হয় না বলে তা অন্ধকারেই থেকে যায়। এই রচনার লেখিকা ইতিমধ্যেই নারী অপরাধীদের বিষয় লিখে সুনাম অর্জন করেছেন। এবার থেকে এই বিভাগের পাঠিকাদের নারী অপরাধীদের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শোনাবেন।

এ জগৎ সংসারে দু'টি কথা পাশাপাশি হ'য়ে এসেছিল। পাপ এবং পুণ্য। ওরা এক সংগে এলেও, কেউ কারো নয়। কেউ কাউকে চায়না। কারো সংগেই কারো মিল নেই। অথচ ওরা পাশাপাশি বাস করে। ওদের দু'জনেরই দুটি জগৎ আছে, আছে যার যার সংসার। যে যার সুখ দুঃখ নিয়ে তৈরী করেছে—যার যা পৃথিবী। আছে যার যা সংসার।

কারো নরকে সুখ। কারো স্বর্গে সুখ। কারো দুঃখে সুখ। কারো বা আনন্দে। কারো ঘৃনায়, কারো শ্রদ্ধায়। বিচিত্র এই জগতের সংসার। বিচিত্র এই মানব জীবন। এই তো পাপ পুণ্যের পৃথিবী। ভাল মন্দের দুনিয়া। ওদের নিয়েই তো, গোটা একটা জগতের বৃহৎ সংসার চলছে। দুজনের হাসি কান্নায় ঘেরা এক বিচিত্র ভুবন; বিচিত্র চরিত্র। সেই ভুবন-মাঠে হাটে খেলে বেড়াচ্ছে—কত রকমের মানুষ। সবাই যেন এই জগতের আনন্দপ্রিয় ক্রীড়াময় শিশু। কারো সৃষ্টির খেলা, কারো ধ্বংসের খেলা। কেউ স্বর্গ রচনার খেলাঘর পাতে—কেউ নরক রচনার খেলা ঘর পাতে। অথচ ওরা দু'জনেই সেই বিরাট শক্তিমান ভগবানকে খেলার 'বুড়ি' করে। কেউ তাঁকে ভাবে—কেউ ভাবেনা। কেউ চায় কাছে—কেউ আবার চায় না। কিন্তু জানে সকলেই, 'ভগবান' আছেন স্বর্গ—নরকের সর্বময় স্রষ্টা—তিনি ত্রি-লোকেই অবস্থান করেন। তাই ঈশ্বর যেমন স্বর্গেরও পূজা পান—পান নরকেরও।

তাই স্বর্গ-নরক পাশাপাশি। দুজনেই থাকে কাছাকাছি। দুই সংসারেই আছে—নারী এবং পুরুষ। আছে তাদের দু'রকমের ক্ষুধা তৃষ্ণা কাতরতা। আছে সুখ, সম্ভোগ, সম্ভাবনার সমান বাসনা। তার জন্যেই বিশাল বিপ্লব চলেছে···বিচিত্র এই দুনিয়ায়। কখনো কখনো দেখি স্বর্গের মানুষ নরকেও বেড়াতে যায়।

আবার নরকের মানুষও, স্বর্গে আসে। দু'ই জগতেই—অলক্ষ্যে এক নিবিড় আকর্ষণ আছে। বিচিত্র স্বাদ আছে। নইলে, কোন মানুষ কেন দেবতা সাজতে চায়? কেনই বা এই মানুষের শরিফ—পশুর মত ভয়ঙ্কর হিংস্রতায় প্রকাশ পায়? আসলে, যিনি সর্বময় স্রষ্টা যাঁর সৃষ্টির খেয়ালে—স্বর্গ-নরক রচিত হ'য়েছে—যিনি মানুষকে দেবতা হ'বার গুণ দিয়েছেন, তিনি তো আবার পশুর প্রবৃত্তির বীজ বপন করেছেন। এই বৈচিত্র্য সাধনের—বিচিত্র লীলায় স্বয়ং বিশ্বেশ্বর—যে বিশ্ব মেলা সাজালেন—যেন মনোহারী সুদৃশ্য পট চিত্রের মত—এই সব বিভিন্ন মানুষ গুলো। তাদের বিচিত্র ক্ষুধা—তৃষ্ণা—কাতরতা—সব কিছু নিয়ে জমাটি হাট বসিয়েছে তাঁর সেই খেয়ালী খেলার সাজানো মেলা দেখতে গিয়ে, যখন দেখলাম নরকের দরজা উন্মুক্ত, প্রবেশাধিকারের পথ খোলা পথ ভ্রমে যেখানে স্বর্গের মানুষও অবাধে প্রবেশ করে নরকের বিচিত্র স্বাদে—আর এক জীবন ধারণ করে। তখন এক বিচিত্র বিস্ময়ে শিহরিত হ'য়ে উঠি……

দেখি অবাক হ'য়ে, চির সৌন্দর্যময়ী নারীও—তার দেবী মূর্তির সাজ খুলে ফেলেছে। নরকের রঙ্গমঞ্চে—সে অবতীর্ণা শয়তানীর ভূমিকায় শুধু নারী, নারী বলেই, বড় দুঃখ বড় কষ্ট! শক্তির শুদ্ধরূপ জাগ্রত সত্ত্বা সৃষ্টির প্রেরণা-ময়ীর একি নির্দয়—সর্বনাশা দশা? কি ভয়ঙ্কর ছবি?

ঈশ্বরের তৈরী এই বিচিত্র জগৎ প্রদর্শনীর—তাদেরই ছবি দেখে গেলাম একের পর এক। নরকের সংসারে, নারী এক বিচিত্র রূপিণী। নারকীয় জীবনের বিচিত্র হাটে—সে এক বিচিত্র পসারিনী। বিস্মিত তার পসার সে সাজিয়ে নিয়ে বসেছে—। নরকের সংসারে তার অদ্ভুত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাতরতা! বিচিত্র জীবনের—বিক্ষত বাসনা!

ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম, তাই প্রথম বিলাসিনীকে দেখে। ও কোথাকার মেয়ে জানতাম না। তবু, ওর মুখে শোনা সেই স্বর্গের গল্প। ভাল মানুষের দেশের—অপূর্ব সেই ইতিহাস! ছিল সেখানে ওর সব কিছু। সে যেন ওর পূর্বজন্মের স্মৃতি? কিন্তু আজ ও একা। এত বড় দুনিয়ায় ওর আজ কেউ নেই। আছে এই নরকের বিচিত্র স্বাদে মরে যাওয়া আর এক জীবন।

যার ওপর মমতা নেই করুণা হয় না। খুব কাঁদতে ইচ্ছে করলে, হাসি আসে। কঙ্কাল সার দেহের খাঁচা ভেঙ্গেও বিকট শব্দে হেসে উঠে। তখনই বিলাসী অমৃতে আকণ্ঠ স্বাদ নেয়। বিলাসী সুরাকে বলে, সুধা। বিষকে বলে, অমৃত। সেই অমৃত, আকণ্ঠ নেশায় —উদরস্থ করে বিলাসী। যেখানে খুসী মাতাল হ'য়ে গড়াগড়ি খায়—ধুলোয় আঁচল লুটিয়ে। আনন্দে খুসীতে ও আনমনা হয়ে যায়। হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে আসে। কখনো কাঁদতে গেলেই একটা বিচিত্র সুরেও গান গায়। "সংসারে কে আমার মত রাণী বল? ধুলোয় গড়ানো গরবিণীর সেই বুক ভরা গান শুনে, ওর রাজা আসে কাছে! শুনে সেও হাসে বিচিত্র সোহাগে আদর করে তার রাণীকে। বলে, সংসারে আমিও সেই এক রাজা। তুই যেমন রাণী, তোর রাজা তেমনি আমি।

বিচিত্র সম্পর্ক—বিচিত্র প্রেম এই নরকের—নর-নারীর। বিলাসী ওর রাজার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে—কাঁদে রাজার দু'পা জড়িয়ে।

'আমাকে ছুঁয়ে বল—কোথাও তুই পালাবিনা। বল্ তুই আমার রাজা মিথ্যা বলিস না, সত্যি বল, তোর রাণীকে ছেড়ে কখনো তুই পালাবিনা।

একটি অভিনব প্রতিশ্রুতির হাসিতে রাজার চোখ দুটো চকচক্ করে ওঠে! চুপি চুপি আড়ালে বসে চোরা হাসি হাসে 'চোরা পল্লীর' অন্ধকার রাত। বিচিত্র ইশারায় তার দুচোখ মৃদু মৃদু কেঁপে ওঠে!

এই অন্ধকার জীবনের রাহাজানির রাজা যাকে দলের সবাই ডাকে সর্দারজী বলে, যাকে সবাই ভয় পায় ভয়ঙ্কর আনন্দে সেই ভয়াবহ মানুষটা, এই চোরা পল্লীর অন্ধকার নেমে এলেই ভাল মানুষ বনে যায়—এক মেয়ে মানুষের কাছে। তার বিচিত্র প্রেমের সেই নারীর চোখে জল দেখলে, কেমন যেন বে-কুফ্ সেজে যায় সেই দুর্দান্ত সর্দারী ভঙ্গী সহসা শিথিল হ'য়ে যায়। শিহরিত আবেগে রাজা শোনায় তার প্রাণের গল্প…

তোকে নিয়েই তো আমার এই আজব দুনিয়া গড়েছি। তোকে দেখিয়ে না ওই শয়তানগুলো'কে লাগামে বেঁধেছি। তুই আমার জান, এই রাজার রাজেশ্বরী।

অদ্ভুত হয়ে ওঠে বিলাসীর চোখ দুটো। চোরা

পল্লীর অন্ধকার সুখে সোহাগের সুর্মা লাগে—ওর টানা টানা চোখে। কি যেন সে দেখেছে—তার রাজার আজব দুনিয়ার চেহারার ভেতর। কি সুখের—সখে—দু নয়নের দুধারে, সিক্ত ঝরণা ঝরে,ও যেন নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিতে চায়—সেই প্রেমিক রাজার পায়ে। কি ভীষণ আসক্তির প্রাণ—আপন হারা মন। তার জন্য ও রাজার রাজত্বে নিজেকে নিঃশেষে বিতরণ করে। দুঃখ হ'লেও ঘৃণা হ'লেও অমৃত পানের আনন্দে ও মূর্ছা যায়। রাজার প্রাণ তখন উদার হ'য়ে যায়—রাণীর ওপর।

চোরা পল্লীর এই অন্ধকার রাতের নরকের সংসার। আছে সেই নর নারী, নারকীয় সুখে। অন্ধকার রাজ্যে—রাজত্ব করে—এক রাজা—এক রাণী। আছে তাদের পারিষদ—সভাসদ। ওদের মাঝখানেই রাজা—রাণী। বিচিত্র প্রেমে ওরা—পরস্পরকে ভালবাসে। দলের—সবাই চেয়ে চেয়ে দেখে, চোরা পল্লীর নিভৃত অন্ধকারে—রাজার—রাণী তাদের বিচিত্র সুখে ভরে আছে। তবু, সেই এক নারীর দিকে চেয়ে আর পাঁচটা পুরুষের বুক কাঁদে। ভয়ঙ্কর ক্ষুধায় কঙ্কালটাকে দেখে ওরা শুধুই কষ্ট পায়। কিন্তু রাণী যে শুধু রাজার ধন। এই দলের এক প্রতাপ শালী পুরুষের—প্রভাবশালিনী এক নারী। তাই অন্য নরেরা, আর পুরুষগুলো সব চুপ।

তবু, ওরা সবাই নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চায়ি—করে, চোখে চোখে হাসে। ইশারায় ঈর্ষা জাগায়! ইঙ্গিতে ঈপ্সিত হ'য়ে ওঠে।

চোরা পল্লীর অন্ধকার আরো নেমে এলে, দলের সবাই একে বেরিয়ে যায়। রাজা তখন তার রাণীকে সাজিয়ে—নিজের দলের লোকের ড্রাইভারের ট্যাক্সিতে তুলে দেয়। বাঙালী জেনেনার মত—বিলাসী হয় তখন লাজবরণী বধু। আধো ঘোমটায় ঢাকা মুখ, ভীরু ভঙ্গীমা। সলাজ চাউনি, গা ভর্তি নকল সোনার গয়না, দামী রংদার শাড়ী ওর কঙ্কাল চেহারাটাকে—ঢল ঢল করে দেয়। রাজা তখন মোহব্বতের ভঙ্গীতে—রাণীকে একবার যাবার আগে আদর করে নেয়। রাজারই দোস্ত সেই ড্রাইভার—প্রতি রাত্রের মত—বিলাসীকে—সিনেমা হলের সামনে নামিয়ে দিয়ে—কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ সময়টা তখন রাত বারোটার শো' ভাঙার মুহূর্ত। দর্শকের ভীড় যখন একেবারে কমে যায়। অথচ দু' চার জন—অর্থাৎ দূরগামী যাত্রী—গাড়ী না পেয়ে—ট্যাক্সির অপেক্ষা করে—তখন সেই মুহূর্তে—রাজার দোস্ত ট্যাক্সি নিয়ে আসে—পূর্ব পরিকল্পিত নির্দেশে। কোন একজন পুরুষ যাত্রী—উঠলেই বিলাসী ও'ঠে পড়ে। সে বোঝাতে চায়—ট্যাক্সি না পেয়ে পুরুষ যাত্রীর সংগেই—বাড়ী ফিরতে চায়—একাই সিনেমা দেখতে এসে কি বিপদেই না পড়েছে।...সুন্দর একটি সাবলীল ছন্দোময় অভিনয়। কাজেই আপত্তি ওঠেনা—ভীরু উদার ভদ্রলোক যাত্রীটির তরফ থেকে।...

ভদ্রলোক আগেই এই অসহায়া নারীকে (?) তার গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দেন চালককে। ড্রাইভার চুরি করে মৃদু মৃদু হাসে। ঘোমটার আড়ালে ঢাকা—বিলাসীরও—দু চোখ দুরন্ত হাসিতে দুষ্টু হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত, বিলাসীর নির্দেশে ড্রাইভার গাড়ী থামায় কোন নির্জন পল্লীর পাশে—নয় ময়দানের অন্ধকার রাস্তায়। যেখানে মানুষের নাগাল পাওয়া সহজ সাধ্য নয়।...তখনই বিলাসী ওর ঘোমটা খুলে দিয়ে—ভদ্রলোককে ভয় দেখায় 'যা আছে যথাসর্বস্ব দিয়ে এখানে নেবে পড়, নইলে চেঁচিয়ে লোক ডেকে বলবো আমাকে নিয়ে পালাচ্ছো।'

ভীরু ভদ্রলোক সহজে ভয় পায়। ভয়ঙ্কর ফাঁদ দেখে ভীত হয়েই—তার সর্বস্ব দিয়ে মুক্তি পায়। যেমন ঘড়ি—আংটি, টাকাপয়সা। হতবুদ্ধি সেই যাত্রী যখন যথাসর্বস্ব খুইয়ে গাড়ী থেকে নেবে-পড়ে—সেই নির্জন পথের ধারে·· তখনই দ্রুত বেগে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে—ওরা চোরা পল্লীর অন্ধকারে ফিরে আসে।...

অন্ধকার আখরার প্রধান সড়কে দুঃসহ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে—রাজা। রাণী ফিরতেই, শ্বাপদ শয়তানের জ্বলন্ত চোখের আগুন নিভে আসে। বিচিত্র হাসি হেসে গোঁফের আগায় হাত বোলাতে বোলাতে—সোহাগে টেনে নেয়—রাণীকে আরো কাছে। রাণী তার রাতের রোজগার দেখায় ঘড়ি—আংটি—বোতাম টাকাকড়ি। চোরা পল্লীর ঘন অন্ধকারেও সে গুলো, অস্ত্রের মত চিক্ চিক্ করে ওঠে। দুরন্ত আনন্দে রাজার কুৎসিত মুখটা অদ্ভুত হ'য়ে যায়। বলিষ্ঠ তার তাগড়া চেহারাটা এবং সর্দারী ভঙ্গীটা, আরো দৃপ্তময় হ'য়ে ওঠে। যেন তারই হিম্মতে

চোরা পল্লীর শয়তানী রাতটা এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে।

রাজার তখনই মোহব্বতের পালা। চোরা পল্লীর সেই একমাত্র নারীকে নিয়ে, সেই রাতের রুজি রোজগারের মেয়েটাকে নিয়ে, রাজা তার দুঃস্বপ্নের রাতটিকে পার করে দেয়।

এই ছিল, রাজা রাণীর সংসার। চোরা পল্লীর বিভীষিকাময় রাত্রের সেই অবাক নায়ক নায়িকা নরকের অভিনয়ে অভিনন্দিত হয়েছিল। রাণী বলতো—'রাজা তুই পালাসনে আমাদের ছেড়ে।' রাজা তার সেই বিচিত্র প্রেমে ভঙ্গীতে জানাতো— 'মোহব্বতের দুনিয়ায় বেইমানী নেই।' কাজেই দুনিয়া যদি বে-সামাল হ'য়ে যায় রাজা রাণী সামলে থাকবে ঠিক। চোরা পল্লীর অদ্ভুত সেই রাজত্বের কাহিনী কোনদিনও—ঝুট হবে না। সাচ হয়ে থাকবে রাজা রাণী শুধু।

বিলাসী নারী—তাই রাজার অঙ্গীকারে প্রাণটা তার ডুবে গিয়েছিল, কি সুখের আশায় সে কাতর হয়েছিল কে জানে!

কিন্তু চোরা পল্লীর সেই বিচিত্র প্রেমের নায়ককে একদিন ধরা পড়তে হোল পুলিশের হাতে। রাজা তার রাজত্ব ছেড়ে চলে গেল—জেলখানায়। পরেই—ধরা পড়েছিল—ছিনতাই রবরার অপরাধে। তাই চলে যাবার আগে একবার তার রাণীর সংগে দেখা হোল না। রাজাহীন—রাজত্বে রাণী তখন একা—দলের সবাই আসে সুযোগ নিতে। এক দল ভয়ঙ্কর পুরুষের মাঝখানে—তখন এক অসহায়া নারী। দলপতির অভাবে—দলের মানুষগুলো—ভীষণ হ'য়ে ওঠে। চোরা পল্লীর অনেক অন্ধকার রাতে দেখা সেই এক নারীকে ওরা—দুঃস্বপ্নের মত নাগালে পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের শয়তান এসে—রাণীকে আরও একটি দুঃসহ খবর দিয়ে গেল, দলের খবর জানবার জন্য—রাজার ওপর যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার হয়েছিল তাতেই রাজার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু দলের কাউকে সে ধরা পড়তে দেয়নি। রাণী তখন, কাঙালিনীর মত ডুকরে কাঁদতে গিয়েই—ভয় পেয়েছিল, সমস্ত দলটাকে দেখে। রাজার অবর্তমানে অবহেলিত তার সেই দামী সম্পদের ওপর—যে যার খুশী অধিকার নিয়ে বসে আছে। চোরা পল্লীর অগণ্য রাত্রি ধরে—রাজার সুখ দেখে দেখে যে বাকি কাঙা পুরুষগুলো—একটা বিচিত্র ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়েছে—আজ সেই সুযোগে তারা সবাই মাতোয়ারা।

রাণী আর রাণী নেই, কাঙালিনী। বিলাসী কেঁদেছে চুপি চুপি, বলেছে রাজাকে—'তুইও বেইমান? আমাকে ছেড়ে পালালি।'

সে কান্না কে শুনেছিল কে জানে? কিন্তু নিজের কান্না শুনতে শুনতে ও' যখন আর নিজেকে সামলাতে পারলনা, পারলনা যখন সমস্ত দলের কাছে—সারা জীবনের দুঃখ কষ্টে—ভরা, কঙ্কাল সেই দেহ মনটাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে, তখনই বিলাসী নিজেই ধরা দিয়েছিল পুলিশের হাতে। একে একে ধরিয়ে দিয়েছিল—রাজার দলের সেই সব বেইমান লোকগুলোকে। রাজার অভাবে যে রাজ্য শুধু নির্বোধ যন্ত্রণায় কাঁদছিল, বিলাসী তাকে হাসিমুখেই তুলে দিল—পুলিশের হাতে। ভাবলো, সে তার সমস্ত পাপ স্বীকার করে নিয়ে—ওদের কাছে প্রাণ দণ্ড চেয়ে নিয়ে, সে রাজার কাছেই পালাবে...

কিন্তু দীর্ঘ দিনের বিচারে, সেই অপরাধিনী নারীর সমস্ত স্বীকারোক্তি সত্বেও, প্রাণদণ্ড হয়নি। হয়েছিল, দীর্ঘ কার দণ্ড! সেই দীর্ঘ দণ্ড ভোগের মধ্যে, রুদ্ধ কারা-অন্তরালে থেকে কারাবাসিনী সেই নারীর কাছ থেকে আজও এক কাতর প্রার্থনা শোনা যায়—

যখনই কাউকে সামনে সে দেখতে পায় লৌহ কপাটের বড় বড় গরাদের ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে—সজোরে চেঁচিয়ে বলে—'আমাকে মৃত্যু দণ্ড দাও—আমাকে যেতে দাও রাজার কাছে।

কখনো কখনো সে অস্থির হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে, লৌহ গরাদের কঠিন ধাতুতে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তারক্তি করে। এই ভাবে, এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর অভিসন্ধিতে যেন বিলাসী নিজের দেহটা থেকে প্রাণটাকে বার করতে চায়।

কিন্তু পারেনা। শুধু, চারদিকে রক্তের ছিটে পড়ে থাকে।

স্নপর্ণা দেবী

মেয়েদের দেহ-মন সুস্থ-স্বচ্ছন্দ এবং রূপ-লালিত্য ও সৌকুমার্য্য অক্ষুণ্ণ-অটুট রাখার উপযোগী নিত্য-নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞ-আধুনিক রূপচর্চ্চা-বিশারদগণের সুচিন্তিত নির্দেশ-উপদেশাবলীর আভাস দিয়েছি। এবারেও তাঁদের নির্দ্দেশানুযায়ী আরো কয়েকটি সহজ-সরল 'ঘরোয়া-ধরণের' ব্যায়াম-ভঙ্গীর মোটামুটি পরিচয় দিচ্ছি।

সচরাচর দেখা যায় যে যথাযথ আহার-বিশ্রাম এবং নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চার অভাবে ও ঔদাসীন্যের ফলে, আমাদের দেশের অনেক রূপসী-মেয়ে নিতান্ত অল্প-বয়সেই রীতিমত স্থূলাঙ্গী ও মেদ-বহুল কুশ্রী-চেহারার অধিকারিণী হয়ে ওঠেন...শুধু তাই নয়, এজন্য তাঁদের দৈহিক-স্বাস্থ্য এবং মানসিক-স্বাচ্ছন্দ্যের যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে। অকালে মেদ-বাহুল্যের ফলে, অনেকেরই অল্প-বয়সে মুখের শ্রী-সৌন্দর্য্য-কমনীয়তা নষ্ট হয়ে যায়...বয়সের অনুপাতে—অর্থাৎ, 'কুড়িতেই' তাঁরা ক্রমশঃ 'বুড়ি' হয়ে ওঠেন... দৈহিক-স্থূলতা বৃদ্ধির দরুণ, অনেকেরই চিবুকের নীচের দিক দু'ভাঁজ হয়ে পড়ে এবং সেজন্য কণ্ঠের গঠন-শোভারও ক্ষতি হয় প্রচুর। পাশ্চাত্যের রূপচর্চ্চা-বিশারদেরা অযথা মেদ-বাহুল্যের ফলে, চিবুক এমনি দু'ভাঁজ হওয়ার নাম দিয়েছেন—'ডবল্-চিন' (Double chin) বা 'দু' থাক্ হওয়া চিবুক'।

তাঁদের অভিমতে, চিবুক এমন দু'ভাঁজ হয়ে ওঠে শয়নের দোষে, আহার-বিহারের গলদে, নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চার অভাবে এবং চলা-ফেরা ওঠা-বসা-শোয়ার দোষ ক্রটিতে। কাজেই এদিকে যদি গোড়া থেকেই সচেতন-দৃষ্টি-রাখা যায়, তাহলে 'ডবল-চিন' বা 'দু'ভাঁজ চিবুক' হবার সম্ভাবনা কম থাকে। উপরন্তু নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চা, আহার-বিহার সম্বন্ধে সচেতন-দৃষ্টি এবং চলা-ফেরা, ওঠা-বসা-শোয়া প্রভৃতি অভ্যাসের ফলে, শুধু দেহ মনের স্বাস্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষাই নয়, মেয়েদের রূপ-লাবণ্য শোভামাধুরীও অটুট-অক্ষুণ্ণ রাখা চলে সুদীর্ঘ কাল—এবং চিবুকের ও কণ্ঠের গড়নেরও একটুকু বৈকল্য ঘটে না।

দৈনন্দিন-জীবনে মেয়েদের কিভাবে চলতে, বসতে, শুতে এবং দাঁড়াতে হবে, এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের আধুনিক রূপচর্চ্চা-বিশারদেরা বলেন—সর্ব্বদা বুক সিধা রেখে স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে চলা-ফেরা করাই উচিত। বসা, দাঁড়ানো চলা ফেরা, শয়ন—সব সময়েই মাথাটিকে সিধা-খাড়াভাবে রাখা চাই। মাথা যদি একান্তই হেলানোর প্রয়োজন হয় তো পিছন দিকে...অর্থাৎ, সামনের দিকে মাথা কখনো যেন না ঝোঁকে এবং চিবুকও কখনো সামনের দিকে ঝুঁকে বা হেলে না থাকে। শয়নের সময়েও সচেতন থাকা দরকার...উঁচু অথবা শক্ত বালিশ মাথায় দিয়ে শুলে, পিঠের মেরুদণ্ডের সঙ্গে মাথাটি সমান রেখায় রাখা যায় না—ঘাড় একটু বেঁকে থাকে। তার ফলে, মুখে নানা ধরণের কুঞ্চন-রেখা' (Wrinkles) দেখা দেয় এবং চিবুকেও ভাঁজ (folds) পড়ে। এ সব কারণে, অল্পদিনের মধ্যেই মুখের শোভা-মাধুর্য্য বেয়াড়া-কুশ্রী হয়ে ওঠে·· চিবুকেও পুরু ভাঁজ পড়ে অর্থাৎ, অকালেই 'ডবল চিন'এর আবির্ভাব ঘটে।

রূপ-সৌন্দর্য্য হানিকর এই উপসর্গের উপদ্রব থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে, পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ আধুনিক রূপচর্চ্চা-বিশারদেরা নিত্য নিয়মিত ভাবে কয়েকটি সহজ সরল ও নিতান্ত ঘরোয়া ধরণের ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন প্রসঙ্গক্রমে নীচে তারই বিশেষ দুটি ভঙ্গীর মোটামুটি হদিশ দেওয়া হলো।

পরপৃষ্ঠায় ১নং ছবিতে ব্যায়ামের যে ভঙ্গীটি দেখানো হয়েছে সেটি চিবুকের গঠন-সৌষ্ঠব সুন্দর ও শ্রী-মণ্ডিত রাখার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এ ব্যায়াম ভঙ্গীটির অনুশীলন রীতি হলো—পিঠে ঠেশান দেওয়া যায়—এমন

একটি চেয়ারের উপর সটান সিধা খাড়া হয়ে বসুন। এমন ভাবে বসবেন যে তলপেটের পেশীগুলিতে যেন টান পড়ে এবং চেয়ারের পিঠে ঠেশান দেওয়ায় কাঠের গায়ে যেন মেরুদণ্ডের ভর থাকে। এভাবে আসন গ্রহণের সময় হাত দুখানি কোলের উপর রাখুন এবং ধীরে ধীরে নিশ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিকে ৩নং ছবির নমুনা অনুসারে, যতখানি সম্ভব পিছন দিকে হেলিয়ে দিন। নিশ্বাস গ্রহণকালে মুখটি ঈষৎ খোলা রাখবেন। এবারে পুনরায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিকে ক্রমশঃ পিছন দিক থেকে সরিয়ে এনে সামনের দিকে হেলিয়ে দিন। পিছন দিকে মাথা হেলানোর সময় নিশ্বাস গ্রহণ কালে মুখটি ঈষৎ খোলা রাখবেন কিন্তু পিছন দিক থেকে সামনের দিকে মাথা হেলানোর সময়, মুখটি খোলা রাখা চলবে না—বন্ধ রেখে ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে এমনিভাবে অন্ততঃপক্ষে পাঁচ মিনিটকাল অর্থাৎ, পনেরো থেকে কুড়িবার, একবার পিছন দিকে এবং আরেকবার সামনের দিকে মাথা হেলিয়ে এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি অভ্যাস করা দরকার; নিয়মিতভাবে এ ব্যায়াম ভঙ্গী অনুশীলনের ফলে, কণ্ঠের ও গালের পেশীতে চাড় পড়ে, অচিরেই এ দুটি অঙ্গের শ্রী সৌষ্ঠব মনোরম ও সুস্থ হয়ে উঠবে।

উপরের ৪নং ছবিতে যে ব্যায়াম ভঙ্গীর নমুনা দেখানো হয়েছে, নিয়মিত অভ্যাসের ফলে, যাঁদের চিবুক 'দো-ভাঁজ' (Double chin) ও কণ্ঠ শোভা বেয়াড়া ছাঁদের, তাঁদের সবিশেষ উপকার ঘটবে। এ ব্যায়াম ভঙ্গীটির অনুশীলন রীতি হলো—সমতল মেঝের উপর দুই পায়ের ভর রেখে সটান সিধা খাড়াভাবে দাঁড়ান। এভাবে দাঁড়ানোর সময়, হুঁশ রাখবেন—পায়ে পায়ে যেন ঠেকে না থাকে··· অর্থাৎ দুই পা ঈষৎ ফাঁক রেখে দাঁড়াবেন এবং দুই হাত রাখবেন দুদিকের দুই কোমরের উপর। এমনিভাবে দাঁড়ানোর সময়—ঘাড়টিকেও সটান সিধা এবং খাড়া রাখা চাই। এবারে ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকে যতখানি পারেন ঘাড় ফেরান—চিবুকটি যেন ঠিক ডান কাঁধের উপরাংশ পর্য্যন্ত আসে। তারপর পুনরায় ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ডানদিক থেকে বাঁ দিকে ঘাড় ফেরান—এবারে চিবুকটি এসে পৌছুবে বাঁ কাঁধের উপরাংশ পর্য্যন্ত; এমনিভাবে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ মিনিট অর্থাৎ পুর্ব্বোক্ত ব্যায়াম ভঙ্গীটির মতোই পনেরো থেকে কুড়িবার—একবার ডানদিকে এবং পরক্ষণেই বাঁ-দিকে ঘাড় ফিরিয়ে এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি নিয়মিত অভ্যাস করা দরকার।

আগামী সংখ্যায় এ ধরণের আরো কয়েকটি ব্যায়াম-ভঙ্গীর হদিশ দেবার চেষ্টা করবো।

—

হাতের কাজ
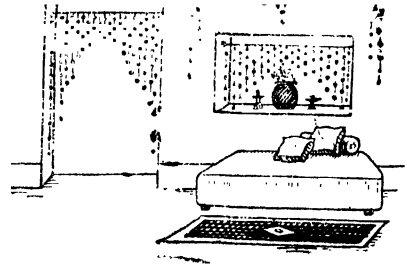
রঙিন- কাগজের বুটি-দানার কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

রঙীন-কাগজের টুকরো ছাঁটাই করে নানা ছাঁদে ছাঁটাই করা সেই সব কাগজের টুকরোর একদিকে আঠার প্রলেপ লাগিয়ে সুকৌশলে পশম-বোনার কাঁটার উপর সেগুলিকে বসিয়ে সযত্নে হাতের আঙুলের চাপ দিয়ে কায়দামতো নিপুণ ভঙ্গীতে পরিপাটি ধরণে প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে পাকিয়ে নিলে খুব সহজ উপায়ে সুচারু অভিনব ছোট বড়, সরু মোটা আর লম্বা ও গোল বিভিন্ন আকারের সৌখিন সুন্দর বিচিত্র নক্সাদার রঙ বেরঙের কাগজের বুটিদানা বানানো যাবে—সে সম্বন্ধে মোটামুটি হদিশ ইতিপূর্ব্বেই গত বৈশাখ সংখ্যায় দিয়েছি। এভাবে রঙীন কাগজ দিয়ে বানানো নানা ছাঁদের এই সব সৌখিন সুন্দর বিচিত্র নক্সাদার বুটিদানাকে ছায়া শীতল জায়গায় রেখে উন্মুক্ত বাতাসে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে শুকিয়ে নেবার পর, সেগুলিকে শক্ত মজবুত সুতো বা মিহি তারের সাহায্যে পুতির দানার মতো ভঙ্গীতে নিখুত পরিপাটি কায়দায় গেঁথে নিয়ে বিবিধ ধরণের অভিনব কারুশিল্প সামগ্রী করা যাবে। এ কাজের সহজ সরল নমুনা হিসাবে, আপাততঃ; গৃহ সজ্জার উপযোগী সৌখিন সুন্দর ও বিচিত্র ছাঁদের দরজা, জানলা, আলমারী, দেয়ালের তাক, কুলঙ্গী, এবং দেব বিগ্রহ রক্ষার মঞ্চ সিংহাসন প্রভৃতি সুচারুভাবে অলঙ্কৃত করার জন্য অভিনব ধরণের পর্দ্দা ঝালর রচনার মোটামুটি হদিশ দেওয়া হলো··· পাশের ছবিটি দেখলেই তার সুস্পষ্ট আভাস পাবেন।

কারুশিল্পীর রুচি আর কলা নৈপুণ্য অনুসারে নিখুত পরিপাটি ছাঁদে রঙীন কাগজের টুকরো দিয়ে বানানো হরেক মাপের নক্সাদার বুটিদানাগুলিকে আগাগোড়া মানানসইভাবে ঠিকমতো গেঁথে নিতে পারলে, বিচিত্র অভিনব এই সৌখিন সুন্দর পর্দ্দা ঝালর যে গৃহ সজ্জার শোভা শ্রী অনেকখানি মনোরম ও সুন্দর করে তুলবে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

বারান্তরে, রঙীন কাগজের বুটিদানা দিয়ে রচনার উপযোগী এমনি ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র অভিনব কারুশিল্প সামগ্রীর কথা আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

—

সূচী-শিল্পের নতুন নক্সা

সুলতা দেবী

ঘর-সংসারের দৈনন্দিন-কাজকর্ম্মের অবসরে নিজের হাতে সূতী, রেশমী এবং পশমী কাপড়ের ছাট কাট সেলাই করে নানা ধরণের নিত্য প্রয়োজনীয় আর সৌখিন সুন্দর ছাঁদের পোষাক, পর্দ্দা, কুশন, টেবিল ক্লথ, বালিশের

ওয়াড়, রুমাল, ব্যাগ, টি কোজি, ট্রে ঢাকার ন্যাপকিন প্রভৃতি সূচীশিল্প সামগ্রী রচনার দিকে যে সব মহিলার বিশেষ আগ্রহ আছে, তাঁরা সর্ব্বদাই বিচিত্র অভিনব নতুন নতুন 'আলঙ্কারিক নক্সা' বা 'Decorative motifs' খোঁজ-খবর করেন। তাই তাঁদের সুবিধার্থে এবারে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের উপযোগী সৌখিন সুন্দর ছাঁদের একটি নতুন ধরণের 'আলঙ্কারিক-নক্সার' নমুনা প্রকাশ করা হলো।
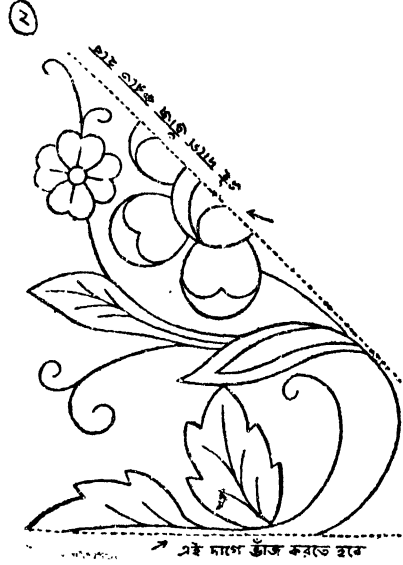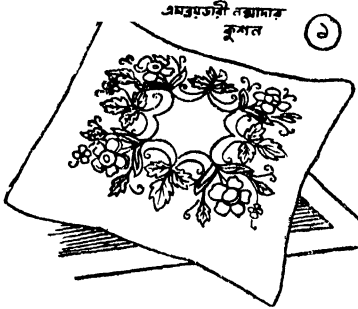
উপরের ১নং ছবিতে দেখানো ফুল-পাতার বিচিত্র মনোরম 'আলঙ্কারিক নক্সার' নমুনাটি কুশন কভার, বালিশের ওয়াড়, টেবিলক্লথ, 'রানার' (Table runner cloth) পর্দ্দা, ট্রে ঢাকা দেবার সৌখিন ন্যাপকিন প্রভৃতি নানা ধরণের সূচীশিল্প সামগ্রীকে রঙ বেরঙের সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারী সেলাইয়ের কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সুতী, রেশমী আর পশমী কাপড়ের উপর এ নক্সাটির অবিকল প্রতিলিপি ফুটিয়ে তোলার জন্য অবশ্য পুরো প্যাটার্ণটি আগাগোড়া এঁকে বা 'ট্রেসিং' (Tracing) না করে নিলেও চলবে···বরং পাশের ২নং চিত্রে যেমন হদিশ দেওয়া রয়েছে, ঠিক তেমনি কৌশলে, গোড়াতেই একখানা কাগজের টুকরো কোণাকুণি ধরণে দু' ভাজ করে নিয়ে, সেই দুই ভাজ করা কাগজের উপর নিম্নোল্লিখিত নমুনার ছাদে কেবলমাত্র একদিকের নক্সার অংশ রেখাঙ্কিত করে নিয়ে, সেই নক্সাটিকে আধাআধিভাবে দুইবারে সেলাইয়ের কাপড়ের টুকরোটির উপর নিখুত পরিপাটি ধরণে 'ট্রেসিং' করে নিলেই কাজের সুবিধা হবে অনেকখানি।

মোটামুটিভাবে, ২নং ছবির নমুনায় দেখানো ফুল পাতার আলঙ্কারিক নক্সাটি সব রকমেরই সুতী রেশমী এবং পশমী কাপড়ের উপর এমব্রয়ডারী করা চলবে—তবে এ নক্সাটি আরো বেশী মানানসই হবে খদ্দর, লিনেন, দো সুতী প্রভৃতি মোটা ও খাপি মজবুত ধরণের সুতীর কাপড়, সাটিন, আলপাকা, মুগা প্রভৃতি রেশমী কাপড় এবং ফেল্ট, ফ্ল্যানেল, পট্টু প্রভৃতি পশমী কাপড়ের উপর প্রয়োজনমতো রঙ বেরঙের শক্ত মজবুত সুতো দিয়ে পরিপাটি ছাদে সূচীশিল্পে কাজ করলে।

পাশের ১নং নক্সায় যে নমুনাটি দেখানো হয়েছে সেটি মোটা-মুটিভাবে ১৬" ইঞ্চি থেকে ২০" ইঞ্চি মাপের কুশন বানানোর উপযোগী। এ মাপের কুশন সেলাইয়ের জন্য চাই একগজ বা পৌনে একগজ মাপের খদ্দর, লিনেন, দোসুতী কিম্বা সাটিন, মুগা, আলপাকা অথবা ফেল্ট, ফ্ল্যানেল, প্রভৃতি জাতের খানিকটা মজবুত খাপি ধরণের কাপড়ের টুকরো, এবং এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের উপযোগী ৬নং সাইজের গোটা দুই তিন ভালো জাতের ছুচ। এছাড়া আরো দরকার—প্রয়োজনানুযায়ী সূচীশিল্পকাজের উপযোগী কয়েকটি 'গুলি' (Strands) বিভিন্ন রঙের মজবুত ও খাপি ধরণের রেশমী বা পশমী সুতো। তবে সর্ব্বদাই নজর রাখবেন—সুতোর রঙ যেন পাকা হয়।

সূচীশিল্প কাজের সাজ সরঞ্জামগুলি সংগ্রহের পর সেলাইয়ের পালা। আগামী সংখ্যায় সে প্রসঙ্গের বিশদ ও সচিত্র আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

—

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—ভারতের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ প্রিয় অভিনব সুস্বাদু একটি নিরামিষ জাতীয় খাবার রান্নার কথা। বিচিত্র মুখরোচক এই খাবারটির নাম—'বেগুনের দোর্ম্মা'। ছুটির দিনে কিম্বা বাড়ীতে কোনো উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অল্প খরচে এবং স্বল্প আয়াসে নিজের হাতে নতুন ধরণের খাবার রান্না করে আত্মীয় বন্ধু প্রিয়জনদের তৃপ্তিসাধনের পক্ষে, 'বেগুনের দোর্ম্মা' বিশেষ উপযোগী হবে বলেই আমাদের ধারণা।

এ খাবারটি রান্নার জন্য যে সব উপকরণ দরকার—গোড়াতেই তার একটী মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ দু' তিন জনের আহারোপযোগী 'বেগুনের দোর্ম্মা' রান্নার জন্য চাই—গোটা ৪।৫ ছোট বেগুন, ১টি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ, চায়ের চামচের ১-৪ চামচ মেথি, চায়ের-চামচের ৸৹ চামচ হলুদ গুড়ো, চায়ের-চামচের ১ চামচ ধনিয়া-গুড়ো, চায়ের-চামচের ৸৹ চামচ লঙ্কা-গুড়ো, চায়ের চামচের ১ চামচ আম-চূর, বড়-চামচের ৪ চামচ ঘি এবং আন্দাজমতো পরিমাণে সামান্য একটু চিনি আর নুন।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগেই—ছুরি বা বঁটির সাহায্যে বেগুনগুলিকে সযত্নে লম্বালম্বি-ছাদে চার-ফালি করে চিরে নিন এবং উপরোক্ত গুড়ো-মশলাগুলিকে পরিপাটিভাবে পিশে নরম-বাদার মতো 'লেই' বা 'মণ্ড' বানিয়ে রাখুন।

এ কাজ সারা হলে, চার ফালি করে চিরে-রাখা বেগুন-গুলির ভিতরে সযত্নে মশলা পিশে বানানো ঐ 'লেই' বা মণ্ডের প্রলেপ মাখিয়ে নিন। তারপর উনানের মৃদু-আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে ঘি-টুকু গলিয়ে গরম করে, রন্ধন-পাত্রের সেই তপ্ত-তরল ঘিয়ে মশলার-প্রলেপ লাগানো ও চার-ফালিতে-চেরা ঐ বেগুনগুলিকে ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ ভালোভাবে ভেজে নিন। এভাবে ভাজবার ফলে, বেগুন-গুলির এক-দিক বেশ বাদামী-কালো রঙের হয়ে উঠলে, খুন্তীর সাহায্যে সেগুলিকে সযত্নে সাবধানে উলটে দিয়ে অপর দিকটিও এমনিভাবে আরো কিছুক্ষণ রন্ধন পাত্রের তপ্ত তরল ঘিয়ে রেখে ভেজে নিন।

এবারে মশলার প্রলেপ মাখানো বেগুনগুলি আগা-গোড়া বেশ নরম ও সুসিদ্ধ হয়ে উঠলেই, উনানের মৃদু আঁচের উপর থেকে সাবধানে রন্ধন পাত্রটি নামিয়ে নিন··· তাহলেই উত্তর ভারতীয় প্রথায় 'বেগুনের দোর্ম্মা' খাবার রান্নার পালা শেষ হবে।

অতঃপর, যথাসময়ে অভিনব মুখরোচক এই নিরামিষ জাতীয় খাবারটি সযত্নে প্রিয়জনের পাতে পরিবেশন করুন··· আপনার হাতের রান্না 'বেগুনের দোর্ম্মার' সুস্বাদে তাঁরা যে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

—

বীরসিংহ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

[১৩ই শ্রাবণ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে ঈশ্বরচন্দ্রের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন দিবস উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য।]

বিদ্যার সাগর বলি' ভণিয়াছে তাঁ'রে
উদাত্ত ভারত মুখে। দয়ার সাগর
ভাবিয়াছে বন্ধুজন কৃতজ্ঞ অন্তর।
বন্দিত করেছে তাঁ'র সমাজ-সেবারে
আদর্শবাদীরা যত। বাণী সাধনারে
নন্দিত করেছে কবি। স্বভাব-সুন্দর
সেবাময় সে-সারল্য চির-মুগ্ধকর
ঘরে-ঘরে কীর্তিত যে হয় গল্পাকারে।
আমি কিন্তু অভিভূত—বিস্মিত-বিহ্বল
সে-ব্যক্তি-সিংহত্ব স্মরি'; 'বীরসিংহ' নাম
সর্ব্বোত্তম বিঘোষিতে চাহে চিত্ততল।
মানব-ঈশ্বর সে যে চির-প্রাণারাম।
বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃপ্ত মনুষ্যত্ব-বল
দীপ্তিময় করিয়াছে এ মেদিনী ধাম।

(পূর্বানুবৃত্তি)

৫

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল শুভ্রার। প্রায় নটা বাজল। যেমন আশঙ্কা করেছিল মায়ের কাছ থেকে ঠিক তেমনি অভ্যর্থনাই জুটল।

বাড়িতে পা দিতে না দিতেই নলিনী রূঢ় কণ্ঠে বললেন, 'কী আক্কেল তোর। স্কুল কখন ছুটি হয়েছে। আর এখন তোর ফেরার সময় হল।'

শুভ্রা বলল, 'আমি তো বলেই গিয়েছিলাম মা, আমার ফিরতে রাত হবে।'

নলিনী রাগ করে বললেন 'রাত হবে বলে কি এমন দুপুর রাত করবি নাকি? দরকার নেই বাপু তোমার ওই স্কুল করে। আমি আগেই বলেছিলাম।'

শুভ্রা বলল, 'তুমি মিছিমিছি রাগ করছ মা। আজকে ফাংশন আছে। সেখানে আমাকে যেতে হবে তোমাকে বলেই গিয়েছি। আর এক জায়গায় গিয়ে বসলে সঙ্গে সঙ্গেই তো উঠে আসা যায় না। একটু থাকতে হয়, একটু শুনতে হয়। তবু তো আমি খুব তাড়াতাড়িই চলে এসেছি। গাড়িতে আসতেও তো সময় কম লাগে না।'

নলিনী আর কোন কথা বললেন না। কিন্তু তাঁর মন যে অপ্রসন্ন হয়ে রইল শুভ্রা তা' বুঝতে পারল। কিন্তু মায়ের সঙ্গে তর্ক কি কথা কাটাকাটি করতে সে ক্লান্তি-বোধ করল।

অন্যদিন ছেলেমেয়েদের খেতে দেওয়ার সময় কত কথা বলেন নলিনী! কিন্তু আজ গম্ভীরভাবে তাদের পরি-বেশন করতে লাগলেন।

শুভ্রা অনেক সাধাসাধি করেও তাঁকে দিয়ে কথা বলাতে পারল না।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুতে এল শুভ্রা। দুই বোন একই ঘরে শোয়। তপন কোন কোন দিন দিদিদের ঘরে এসে বিছানা পাতে, কোন দিন শিশুর মত মায়ের কোলের মধ্যে গিয়ে মাথা গোঁজে।

' আজ তপনকে মা-ই ডেকে দিলেন।

আলো নিবিয়ে দিয়ে শিপ্রা বলল, 'মা আজ তো ওপর ভারি রেগে গেছে দিদি।'

শুভ্রা বলল, 'রাগলে কী করব বল? আমি তো বলেই গিয়েছিলাম আমার রাত হবে। স্কুলের পর কাজ আছে আমার। আচ্ছা জ্বালা হয়েছে। তুইই বল। বাইরে আমার না বেরোলে চলে? নানা কাজকর্মে আমাকেই তো বেশি ঘোরাঘুরি করতে হয়? তবু যতবার বাইরে বেরোব মার যেন ততবার নতুন করে দুর্ভাবনা। প্রতিবারই তিনি এমন ভাব করেন যেন আমি এই প্রথম বাইরে পা বাড়াচ্ছি।'

শিপ্রা দিদির কাছে আরো এগিয়ে এল। তারপর হেসে বলল, 'কী করবি বল। সুন্দরী হওয়ার এই এক বিপদ। মার এই সুন্দরী বড় মেয়েটির জন্যেই যত চিন্তা। চিলের মত কে কখন ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যায়।'

শুভ্রা বলল, 'আর তোর জন্যে বুঝি কোন ভাবনা নেই?'

শিপ্রা বলল, 'আমার জন্যে? দূর দূর। আমার জন্যে আবার কে কি ভাববে? আমার জন্যে মার কোন ভয় ভাবনা নেই।'

শুভ্রা চুপ করে রইল। সত্যিই তার এই ছোট বোনটির রূপ নেই। ছেলেবেলা থেকেই রিকেটি চেহারা। একটু বড় হবার পরেও মাঝে মাঝে বেশ রোগে ভুগেছে। মুখ চোখের যেটুকু শ্রী ছাঁদ ছিল রোগ, অস্বাস্থ্য সব যেন ছিনিয়ে নিয়েছে। বয়স অনুযায়ী শরীর পুষ্ট হয়নি শিপ্রার। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এখনো অপূর্ণতা। যেন বালিকার দেহ। অথচ যৌবন এসেছে। শিপ্রার কথায়বার্তায় দৃষ্টিতে হাসিতে সেই আবির্ভাবের বার্তা মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে। কিন্তু সেই সঙ্গে শিপ্রার গভীর নৈরাশ্য বোধের কথাও শুভ্রা টের পায়। তার বাঁকা কথায় সূক্ষ্ম ঈর্ষায় কখনো বা চাপা দীর্ঘশ্বাসে সেই হতাশা ফুটে ওঠে।

বোনের জন্যে মনে মনে বেদনা বোধ করে শুভ্রা। সত্যি, দৃষ্টির অগোচরে কার পড়ে থাকতে ইচ্ছা করে? পাঁচজনের আদর সমাদর পেতে কার না ইচ্ছা হয়! কিন্তু শিপ্রাকে যে চিরদিন পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে সে আশঙ্কা তো নিতান্ত মিথ্যা নয়। অথচ ওর অনেক গুণ আছে। ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম ভালোই জানে শিপ্রা। রান্না-বান্নায়, গোছগাছ করায় মার ডান হাত। পড়াশুনোতেও মোটামুটি মন্দ নয়। কিন্তু গুণ তো চট করে কারো চোখে পড়েনা। বিশেষ করে পুরুষদের। তারা আগে মেয়েদের রূপটাই দেখে। আচ্ছা সমীরণ? সমীরণও কি তাই? সমীরণ রূপবান পুরুষ নয়। কিন্তু ওর গুণ আছে। আদর্শবোধ আছে। শুধু নিজে খেয়ে পরে পরিবারের ভরণপোষণ করে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে চায়না সমীরণ। বৃহত্তর সমাজকেও সে কিছু দিতে চায়। দশজনের মধ্যে, দশজনকে নিয়ে বাঁচতে চায় সমীরণ। তার এই আদর্শবাদ শুভ্রার ভালো লেগেছে। সে যদি আকৃষ্ট হয়ে, সামান্য আকৃষ্ট হয়ে থাকে সমীরণের এই সব গুণের জন্যেই হয়েছে। কিন্তু সমীরণ সম্বন্ধেও কি সে কথা বলা যায়?

শিপ্রা তার পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। হ্যাঁ, ও এবার ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরন দেখে শুভ্রা এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'ল।

কোন কোন দিন শিপ্রা আগে ঘুমিয়ে পড়লে, আর শুভ্রার গল্প করবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলে শুভ্রা বোনকে ঠেলে জাগিয়ে দেয়। ঘুমিয়েছে বলে কোন রকম দয়া-মায়া দেখায় না। খোঁচা দিয়ে বলে, 'কীরে তুই? এত সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিস? আচ্ছা ঘুমকাতুরে মেয়ে যা হোক।'

কিন্তু আজ আর ছোট বোনকে অমন করে ডেকে তুলল না শুভ্রা। আজ জেগে থেকে নিজের মনে তার ভাবতে ভালো লাগছে। কথা বলবার জন্যে আজ আর তার অন্য কাউকে দরকার নেই। নিজের মনই যথেষ্ট।

সমীরণ কী দেখে আকৃষ্ট হয়েছে? নিশ্চয়ই এই কদিনের মধ্যে সে শুভ্রার এমন কোন গুণের পরিচয় পায় নি। স্কুলে তো সবেমাত্র ঢুকেছে শুভ্রা। সেখানে ভালো পড়াবার খ্যাতি নিশ্চয়ই এরই মধ্যে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েনি। সমীরণের আকর্ষণ নিশ্চয়ই তার রূপের জন্যে। একঘর লোকের ভিতর থেকে বেছে বেছে সমীরণ যে দীপ জ্বালাবার জন্যে শুভ্রাকেই ডেকে নিল, সে শুভ্রার অঙ্গে অঙ্গে রূপের দীপ জ্বলতে দেখেছে বলেই। কিন্তু তখন যতই আড়ষ্ট, যতই বিব্রত বোধ করুক শুভ্রা, এই অন্ধকার ঘরে গভীর রজনীর নিঃশব্দতার মধ্যে শুভ্রা মোটেই লজ্জা বোধ করলনা। বরং অনুভূতির নিবিড়তায় তার মনে এক অনির্বচনীয় সুখ-কল্পনা উদগ্র হয়ে উঠল। তার রূপ

দেখেই আকৃষ্ট হয়েছে সমীরণ। কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা যদি হয়ে থাকে তাতে আপত্তির কি আছে? গুণ-যোগ্যতা যেমন তার নিজের রূপ লাবণ্যও তেমনি তার নিজেরই। সে তো কারো কাছ থেকে রূপ ধার করেনি যে তার লজ্জা করবে। গুণের চেয়ে কেউ যদি তার দেহ-কান্তিকে ভালোবেসে থাকে সেই ভালোবাসা যেন আরো প্রত্যক্ষ।

সকালে উঠে চা-টা খেয়ে তপনকে একটু ধমকে-টমকে পড়াতে বসাল শুভ্রা। তারপর মার কাছে গিয়ে বলল, 'এখনো আমার ওপর তোমার রাগ আছে নাকি মা?'

নলিনী বললেন, 'রাগ আবার কিসের? কারো ওপর রাগ করবার আমার অধিকার আছে নাকি যে রাগ করব?'

শুভ্রা সাদরে মাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল, 'রাগ কোরোনা মা। সত্যি বলছি। তোমাকে মুখ ভার করে থাকতে দেখলে ভালো লাগে না।'

নলিনী বললেন, 'থাক, আমার আর অত সোহাগে কাজ নেই।'

একটু বাদে শিপ্রা শুভ্রাকে একান্তে পেয়ে বলল, "ব্যাপার কি রে দিদি? আজও তোর কোন ফাংশন-টাংশন আছে নাকি?'

শুভ্রা বোনকে ধমক দিয়ে বলল, 'যাঃ রোজই কি ফাংশন থাকে? আজ আবার কিসের ফাংশন?'

শিপ্রা বলল, 'কী জানি বাবা। তোর রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে আজও যেন কিছু একটা আছে।'

শুভ্রা এগিয়ে এসে ছোট বোনের গাল টিপে দিয়ে বলল, 'ফাজিল কোথাকার।'

উৎসব অনুষ্ঠান আজ আর নেই। তবু শুভ্রার মন কালকের সেই উৎসবের স্মৃতিতে ভরে রইল। ট্রাম বাসের ভিড়ে কোন কষ্ট কি বিরক্তি বোধ করল না শুভ্রা। ট্রেনের জানালায় গ্রাম অঞ্চলের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সেই টুকরো টুকরো দৃশ্য দেখতে দেখতে চলল। কয়েকটি দুরন্ত ছেলে পুকুরে নেমে সাঁতার কাটতে শুরু করেছে। কোন নাম না-জানা গাঁয়ের বউ স্নান সেরে এসে উঠোনে টানানো ভিজে শাড়ি মেলে দিচ্ছে। এসব তো রোজই দেখতে দেখতে যায় শুভ্রা। কিন্তু আজ যেন সারা পৃথিবীর ওপর নতুন রঙের ছোপ লেগেছে।

স্কুলে আরো মন দিয়ে ক্লাস নিল শুভ্রা। ছাত্রীদের মুগ্ধতায় আরো বেশি উৎসাহ বোধ করল শুভ্রা।

টিচার্স রুমে এলে মল্লিকাদি বেশ খানিকটা ঠাট্টা করলেন, 'কী ব্যাপার। দীপান্বিতার খবর কি?'

শুভ্রা বলল, 'খবর আবার কি, বাঃ রে।'

মল্লিকাদি বললেন, 'বটে? খবরটা কিন্তু সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। খুব সাবধান। প্রদীপের আগুন যেন আর কোথাও না লাগে।'

এ ধরণের ঠাট্টার জবাব দিতে নেই। দিলেই কথায় কথা বেড়ে যায়।

শুভ্রা তাই চুপ করে সহকর্মিণীদের হাসি ঠাট্টা সহ্য করে গেল।

কি একটা বারোয়ারী পুজো আছে গাঁয়ে। ছাত্রীরা হাফ হলিডে চেয়েছিল। হেডমিস্ট্রেস তাদের কথা দিয়েছিলেন নির্ভুল আবেদন করতে পারলে ছুটি পাবে। তারা ভুল করেনি। তাই হেডমিস্ট্রেসকে তাঁর কথা রাখতে হল।

কয়েক ঘণ্টা আগে ছুটি পেয়ে ছাত্রীরা টিচাররা সকলেই খুসি হয়ে উঠল।

ষ্টেশনে এসে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল শুভ্রা। এ সময় কোন ট্রেন আছে কিনা কে জানে।

এখনো পাকা ডেইলি প্যাসেঞ্জারের মত ছোট টাইম টেবল কিনে রাখেনি।

হঠাৎ লক্ষ্য করল একটু দূরে সমীরণও দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। শুভ্রাকে নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে। কিন্তু কাছে এলনা, চোখের দৃষ্টিতেও পরিচয় স্বীকার করল না সমীরণ। তার এই অসৌজন্যে শুভ্রা বিস্মিত হল, ক্ষুণ্ণও হল। ভাবল কাল অত আদর আপ্যায়ন আর কাজ ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গেই আজ একেবারে সমীরণ তাকে চিনতে পারছেনা। বেশ, শুভ্রাও তার কাছে অপরিচিতা হয়ে থাকবে।

মিনিট পনের বাদেই ট্রেন এসে দাঁড়াল। শুভ্রা অবাক হয়ে দেখল সে যে কামরায় উঠেছে সমীরণও তাতেই উঠে বসল।

উঠুক। শুভ্রা কিছুতেই পূর্ব পরিচয় স্বীকার করবে না। সেও শোধ নিতে জানে। [ক্রমশঃ

মাসিক রাশিফল

শ্রীবাসুদেব ভট্ট

১৬ই শ্রাবণ হ'তে ৩১শে ভাদ্র পর্যন্ত

এবার আমরা ফলিত জ্যোতিষ আলোচনার পুনরাবৃত্তি করছি। গত আষাঢ় সংখ্যায় আমরা চন্দ্র সম্পর্কে বাকী আলোচনা শেষ করেছিলাম। এবারে চন্দ্র সম্পর্কে আরো গোটা কয়েক কথা বলে মঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনা করলাম।

বুদ্ধির আকর হচ্ছে বুধ। তিনি যা দেখেন, যা শোনেন এবং যা শেখেন, সব স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা করে রাখেন। কাজেই তার বিবেচনা শক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা রয়েছে প্রচুর। কিন্তু তার জ্ঞান অর্থকরী; যা বাস্তব, যা স্থূল ও প্রত্যক্ষ—তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর চন্দ্র ভাবপ্রবণ। তিনি ভাবময় জগতে বিচরণ করেন। কাজেই তার জ্ঞান কল্পনাপ্রসূত। এখানেই বুধের সঙ্গে চন্দ্রের মৌলিক পার্থক্য।

রবি-চন্দ্র গ্রহের পরে মঙ্গলের প্রভাব খুব বেশী। নামকরণ হতেই মঙ্গলের কারকতা বোঝা যায়। যা কিছু দেশের বা দশের অমঙ্গলকর ও অশুভপ্রদ মঙ্গল তার পরম শত্রু। যেকোন রকম অনিষ্টকর প্রভাব হতে রক্ষা করা মঙ্গলের কাজ। কাজেই মঙ্গলের মধ্যে সব গ্রহের চেয়ে প্রাণশক্তি বেশী অভিব্যক্ত। সুতরাং রবি কর্তা, চন্দ্র গৃহিণী বা ভাণ্ডারী এবং মঙ্গল রক্ষী।

মঙ্গলের আদর্শ হচ্ছে বিশ্বমৈত্রী ও আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব। বিশ্বে সাম্যভাব রক্ষা করাই মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম কার্য। যুগে যুগে সাম্যের নবীন সাম্রাজ্য স্থাপন করা এবং গঠন করা মঙ্গলের কাজ। যখন বিশ্বে ভ্রাতৃভাব ভেঙ্গে যায়, মৈত্রীভাব শিথিল হয়ে পড়ে এবং সাম্যভাব নষ্ট হয় তখন মঙ্গল রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। জগতের সমস্ত অনাচার ও অবিচার এবং অশুদ্ধতা ও মলিনতা প্রভৃতি সকল পাপ বা কলুষতা ধৌত করা মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কর্ম। যখনই জগৎ তন্দ্রালু বা নিদ্রালু হয়ে পড়ে, তখনই তাকে সচেতন করবার জন্য সজোরে একটু নাড়া বা ধাক্কা দেয়া মঙ্গলের প্রধান ধর্ম। কাজেই মঙ্গল প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ও ধ্বংস-লীলা সৃষ্টি করেন, এমন কি আবশ্যক হলে, সমরানল প্রজ্জ্বালিত করে থাকেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে মঙ্গল চান, সাম্য, মৈত্র ও স্বাধীনতা। তিনি রাজনীতির জটিল পদ্ধতি বা কূট শাসননীতি জানেন না। তিনি সাধারণ তন্ত্র বা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনি চান, জনসাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা সাম্যের নীতি অনুসারে রাষ্ট্রশাসন। সুতরাং জণগণের স্বার্থ যেখানে ব্যাহত হয়, যেখানে গণ-তন্ত্রের নামে স্বৈরাচার বা স্বেচ্ছাচারিতা বিরাজ করে, সেখানে মঙ্গল বিদ্রোহ-বহ্নি সৃষ্টি করেন। তিনি গণ-আন্দোলনের পথিকৃৎ। আবার যেখানে সাম্রাজ্যবাদিতা বনাম গণতন্ত্রবাদিতা, অথবা ধনজীবীর সহিত শ্রমজীবীর দ্বন্দ্ব, সেখানে মঙ্গল দুর্বলের সহায়। দুর্বলের সহায়তার জন্যই মঙ্গল যুদ্ধবিগ্রহ সৃষ্টি করেন। সেখানে তিনি ভীষণ মহাশক্তি-সম্পন্ন বিস্ফোরক আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা, অথবা তীব্র বিষবাষ্প প্রয়োগ করে দর্পীর দর্প চূর্ণ করে থাকেন। ঐ যুদ্ধই তার শক্তির বহিঃস্ফূরণ।

মঙ্গল অর্থশাস্ত্র-বিশারদ। জগতের অর্থনীতির কাঠামো দৃঢ় করাই তার কাজ। যখনই জগতে সবলের অর্থনৈতিক প্রণালী স্বজাতিগত স্বার্থ কেন্দ্র করে অপরকে তার চাতুরী-জালে জড়াতে চেষ্টা করে, তখনই মঙ্গল রণ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে জগতে ঘোর অনর্থ ঘটায়। মঙ্গল বোঝে অর্থই অনর্থের মূল।

শনি ভৃত্য, শনি ক্রীতদাস এবং ভারবাহী পশু। তিনি দাসত্ব ও বন্ধনের সূচক। স্বাধীনতার অর্থ তিনি বোঝেন না। তার একজন-না-একজন প্রভু থাকা চাই। আর মঙ্গল স্বাধীনতার পূর্ণমূর্তি। তিনি চান সম্পূর্ণ শক্তি ও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে চান না। নিজের অধিকারের এক ক্ষুদ্রতম অংশও তিনি ছাড়তে নারাজ। কাজেই নানাবিধ অশান্তির দাবানল জ্বলে ওঠে।

মঙ্গল সাহস ও বিক্রমের কারক। ভয় তিনি জানেন না। দুর্বলতার স্থান তার কাছে নেই। তিনি অত্যন্ত প্রতাপী, বীর্যবান ও শক্তিশালী এবং অকৃতদার যুবক—পূর্ণ ব্রহ্মচারী। সুতরাং ভীরুতা, কাপুরুষতা ও স্ত্রৈণতা মঙ্গলের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কাজেই শৌর্য, বীর্য, শক্তি ও তেজস্বিতা এবং সৎ-সাহস ও সদ্-বন্ধুলাভ, বিশেষতঃ ভ্রাতা মঙ্গল হতেই অনুমেয়। আবার মঙ্গলকে ভূমি-পুত্র বা পৃথিবীর পুত্র বলা হয়েছে। সেজন্য মঙ্গলের অপর নাম ভৌম। সুতরাং ভূমি বা পৃথিবীর ওপর মঙ্গলের সম্পূর্ণ ক্রিয়া রয়েছে। কাজেই ভূমিজ ও খনিজ পদার্থলাভ এবং প্রোথিত-ধনপ্রাপ্তি মঙ্গল হতে অনুমেয়।

মঙ্গলের আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান বড় বেশী। কাজেই মঙ্গলের ক্ষমতার বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়ালে বা বাধা দিলে তিনি শতগুণ তেজে জ্বলে ওঠেন। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীর আহ্বান স্বীকার করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি, অহঙ্কার, গর্ব, ক্রোধ, বাকবিতণ্ডা, তর্ক, রাজশত্রুতা, বিপ্লববাদিতা ও কারাবাস প্রভৃতি মঙ্গল হতে কল্পনীয়।

মঙ্গল সমরশাস্ত্র-বিশারদ। সুতরাং মঙ্গল হতে সৈন্য পরিচালনা, লাঠি-ভাঁজা, অসি-চালনা ও দুর্গরক্ষা করা প্রভৃতি সমস্ত রণকৌশল কল্পনা করা যায়। আবার মঙ্গল অগ্নিকারক। সুতরাং যুদ্ধে যে কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে অভিজ্ঞতা এবং তড়িৎ বা বিদ্যুৎ-শক্তি ও অগ্নি সংযোগের কাজে প্রতিভা দান করা, মঙ্গল হতে কল্প করা যায়।

বাইরের শত্রুর আক্রমণ হতে নিজেকে রক্ষা করা এ আভ্যন্তরীণ শত্রুকে নিজের মধ্য হতে বহিষ্কার করা এ দু মঙ্গলের কাজ। তিনি সদাই সতর্ক, সব সময়ে সজাগ তার সতর্ক দৃষ্টি সারা দেহের ওপর রাত দিন ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানেই একটু অনিষ্টের সম্ভাবনা, সেখানেই তিনি বিদ্যু গতিতে উপস্থিত হয়ে তার শক্তি প্রয়োগ করে থাকেন।

মঙ্গলের কাজ দেহ হতে আবর্জনা বহিষ্কার করা এ বাইরের অনিষ্টকর প্রভাব হতে দেহকে রক্ষা করা। দেহে আবর্জনা বহিষ্কারের যন্ত্রগুলো হচ্ছে অন্ত্র, গুহ্য ও মূত্রনা অর্থাৎ মল-মূত্র বহিষ্কারের পথ এবং ঘর্ম ও পিত্তনিঃসরণে পথ প্রভৃতি। সুতরাং এদের ওপর মঙ্গলের সম্পূর্ণ ক্রি রয়েছে। আর রক্তসঞ্চালনাদি ক্রিয়া এবং বাইরে আবর্জনা, উত্তাপ, শৈত্য, বর্ষা ও দুর্ঘটনা প্রভৃতি দৈ উৎপাত হতে নিজেকে রক্ষা করার শক্তি মঙ্গল নির্দে করেন।

মঙ্গলের আত্মাভিমান ও আভিজাত্য যেখানে অক্ষু থাকে, মঙ্গল সেখানে ঔদার্যের পরাকাষ্ঠা দেখান। মঙ্গ চান, 'যাক্ প্রাণ, থাক্ মান।' সুতরাং যেখানে মঙ্গলে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার হানি হয়, মঙ্গল সেখানে রক্তবর্ণ, ভয়ঙ্ক মূর্তি—কু-মঙ্গল। শত্রু সৃষ্টি করতেও মঙ্গল, শত্রু ধ্বং করতেও মঙ্গল। চরিত্রের এ দ্বিভাব এত সুস্পষ্টভাবে অপ কোন গ্রহে অভিব্যক্ত হয় কিনা সন্দেহ। এ প্রসঙ্গে ক্ষু একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। খৃষ্টাব্দের প্রায় তিনশত বৎসর আগে গ্রীক সম্রা সেকেন্দর শাহ ভারত-বিজয় করতে এসে পুরুরাজকে বন্দী করেন। বন্দী পুরুরাজ সম্রাটের নিকট আনীত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?" আত্মাভিমানী পুরুরাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন "আমি রাজা, সুতরাং রাজার কাছে রাজার যোগ্য ব্যবহারই আমার প্রাপ্য।" মুগ্ধ সেকেন্দার শাহ তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর বিজিত রাজ্য পুনঃ প্রদান করলেন। এখানেই শুভ মঙ্গলের দ্বিভাব-চরিত্রের প্রকাশ। পুরু-রাজের শত্রু সৃষ্ট করে শত্রু নাশ করা এবং সেকেন্দরশাহের ওপর বিজয়ী হওয়া মঙ্গলের বুদ্ধির জয়। আর সেকেন্দর-

সাহের ক্ষমতার কাছে মাথা নীচু করা এবং সে মস্তক উদার-হস্তে উত্তোলন করা মঙ্গলের নৈতিক-বিজয়। সুতরাং উভয়েরই বিজয়-গৌরব মঙ্গলের প্রভাব-সম্ভূত।

রক্তপাত যুদ্ধের অঙ্গ। সুতরাং রক্তের ওপর মঙ্গলের প্রভাব অধিক বিদ্যমান। কোন প্রকার বাহ্য বস্তু শরীরে প্রবেশ করলে, জীবদেহের রক্ত দূষিত হয়। রক্ত দূষিত হলে ক্ষত, ব্রণ ও বিস্ফোটকাদি নানা ব্যাধির সৃষ্টি হয়। ঐ পীড়ার স্রষ্টা এবং ধ্বংসকর্তা একা মঙ্গলই। সুতরাং মঙ্গল হতে রক্তঘটিত পীড়া, অস্ত্রচিকিৎসা, অস্ত্রাঘাত ও রসায়নশাস্ত্র অনুমেয়।

মঙ্গল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হল। যাক, এবারে জন্মরাশি অনুসারে ব্যক্তিগত শুভাশুভ ফলের আভাস দেওয়া গেল।

মেষ—কর্মে প্রেরণা পাবেন। নতুন বন্ধু লাভ হবে। জমি কেনাকাটার ব্যাপারে শুভ ফল আশা করতে পারেন। স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে। ছোটখাটো ভ্রমণযোগ রয়েছে। কিছু ঋণ হতে পারে। চাকুরীজীবীদের কর্মক্ষেত্রে অশান্তি দেখা দিতে পারে। উকিল, দালাল প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের আয় বাড়বে। চিত্র পরিচালক ও প্রযোজকদের নতুন চুক্তির ব্যাপারে বাধা আসতে পারে। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের চিন্তার কোন কারণ নেই। লেখক ও শিল্পীদের চিন্তাধারা এখন থেকে নতুন খাতে বইবে। চিকিৎসকদের সময়টা মন্দা যাবে। ব্যবসায়ীদের সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার ব্যাপারে শুভ ফল আশা করতে পারেন। বেকারের চাকুরীলাভ হতে পারে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ভাল।

বৃষ—নতুন মর্যাদা লাভ করবেন। লেখক বা শিল্পী হলে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করবেন। ব্যবসায়ীদের অর্থ লাভ হবে। চাকুরীজীবীদের কর্মস্থলে গোলযোগ দেখা যায়। গৃহসুখ ও দাম্পত্য প্রণয় বৃদ্ধি পাবে। গৃহে আত্মীয়,বন্ধুর সমাগম হবে। সন্তানগণের স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ব্যবসায়ীদের সময়টা ভাল। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের মান-সম্মান ও অর্থ দুই-ই লাভ হবে। বুদ্ধিজীবীদের আয় বাড়বে। চিত্রপরিচালক ও প্রযোজকদের নতুন চুক্তির ব্যাপারে সাফল্য আসতে পারে। চিকিৎসকদের আয় ভালই হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় পাশ করবে। বেকারের চাকুরী লাভ হবে। মহিলাদের সময়টা অত্যন্ত ভাল।

মিথুন—স্ত্রীলোক হতে কিছুটা অশান্তি ভোগ করবেন। সময়টা জটিল অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটাতে হবে। অসম্মান, বৃথা অপবাদ, শত্রুতা ও আত্মীয় কলহ ইত্যাদি হতে পারে। অর্থহানির যোগ দেখা যায়। বুদ্ধিবিভ্রমের ফলে এমন অন্যায় কাজ করবেন যার ফলে অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে। শরীরে কোন বিষাক্ত দ্রব্য প্রবেশ করে অথবা অগ্নি ও ইলেকট্রিক হতে অনিষ্টের আশঙ্কা করা যায়। বিদ্যার্থীদের বিদ্যা লাভে বিঘ্ন। মহিলাদের সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ।

কর্কট—আয় ভালই হবে। নতুন বন্ধু লাভ হবে। অর্থ ক্ষতির যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে বিবাদ বিসংবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। স্ত্রীলোক হতে সতর্ক থাকবেন। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে কোন গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল চলবে না। দাম্পত্যক্ষেত্রে শুভভাব বৃদ্ধি পাবে। নীচমনা লোকের সঙ্গ এড়িয়ে চলুন। প্রিয় দ্রব্য কিছু খোয়া যেতে পারে। বেকারের চাকুরী লাভ হতে পারে। মহিলাদের সময়টা ভাল।

সিংহ—স্বাস্থ্য ভালই বলা যায়। শোক সংবাদ পাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। ঝি-চাকর দ্বারা ক্ষতি হতে পারে। কর্মে সুনাম লাভের যোগ রয়েছে। আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা কঠিন হবে। আত্মীয়গণের নিকট কোন উপকার প্রত্যাশা না করাই ভাল। বিদ্যার্থীদের বিদ্যা লাভে বিঘ্ন আছে। বেকারের কর্ম লাভ হবে। মহিলাদের সময়টা ভাল।

কন্যা—ভাল এবং মন্দ দুরকম ফলই লাভ করবেন। নতুন বন্ধু লাভ হবে। রক্ত চাপ বৃদ্ধি বা উদর সংক্রান্ত পীড়া দিতে কষ্ট পেতে পারেন। কোন জিনিষ চুরি যাবার সম্ভাবনা আছে। শত্রু সৃষ্টি হবে কিন্তু তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কষ্টকর ভ্রমণযোগ আছে। ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ করবেন না। বেকারের চাকুরী লাভ হতে পারে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা গোলমেলে।

তুলা—সবদিক থেকে সময়টা ভাল। আর্থিক উন্নতি হবে। গৃহে শান্তি বিরাজ করবে। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি

পাবে। যশ ও সম্মান লাভ হবে। বন্ধু-বান্ধবের সমাগম হবে। কোন সম্পত্তি ক্রয় করার যোগ দেখা যায়। শত্রুরা পরাজয় স্বীকার করবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের সময়টা কিন্তু ভাল নয়। ছোটখাট ভ্রমণ হতে পারে। বেকারের চাকুরী লাভ হবে। মহিলাদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে না।

বৃশ্চিক—ধীরে ধীরে দুঃখের কালোছায়া সরে যাচ্ছে। আশার আলোকবর্তিকা দেখতে পাবেন। স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে। শত্রুতার অবসান হবে। বন্ধু-বান্ধব ভিড় জমাবে। ব্যবসায়ীদের সময়টা ভাল নয়। চাকুরীজীবীদের সময়টা ভাল। শরীরে কোন আঘাতাদি প্রাপ্তির সম্ভাবনা। গুরুজন হানির যোগ রয়েছে। স্ত্রীলোক হতে বিপদ হতে পারে। পরীক্ষার্থীদের শুভ ফলের আশা করা যায়। বেকারের চাকুরী লাভে দেরী আছে। মহিলাদের সময়টা ভাল।

ধনু—অশুভ ফলের চেয়ে শুভ ফলের মাত্রাই বেশী। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল চলবে না। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করুন। দুর্ঘটনায় আঘাতও পেতে পারেন। সন্তানদের স্বাস্থ্য অবশ্য ভাল থাকবে। আয়ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় থাকবে। বিদ্যার্থী বা পরীক্ষার্থীরা বিদ্যা লাভে শুভ ফলের আশা করতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমা এড়িয়ে চলুন। বেকারের চাকুরী লাভ হতে দেরী আছে। মহিলাদের সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ।

মকর—অর্থ লাভ ভালই হবে। স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে। মান, মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হবে। অনুগত ভৃত্য লাভ করবেন বা ভৃত্যের দ্বারা উপকৃত হবেন। সৎ বন্ধু লাভ হবে। শত্রুরা নতি স্বীকার করবে। গুরুজনদের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করবেন। গৃহে নানারকম পুণ্যকার্য অনুষ্ঠিত হবে। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে। সন্তানগণের বেশ উন্নতি হবে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আত্মীয়-বিরোধ হতে পারে। লেখক ও শিল্পীরা সুনাম ও স্বীকৃতি লাভ করবেন। বেকারের চাকুরী লাভ হবে। মহিলাদের সময়টা মন্দের ভাল।

কুম্ভ—স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে। কোন জিনিষ নষ্ট হওয়া বা চুরি যাবার আশঙ্কা আছে। ছেলেমেয়েদের কারো কৃতিত্বে আনন্দলাভের সম্ভাবনা। রাজনৈতিক ব্যাপার এড়িয়ে চলা উচিত। পারিবারিক ক্ষেত্রে শুভ প্রভাব দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট থাকলেও কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সুফল পেতে পারেন। আয় বাড়বে। কর্মপরিবর্তনের যোগ রয়েছে। দূর ভ্রমণ হতে পারে। গুরুজনদের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। আত্মীয়বিচ্ছেদ বা আত্মীয়হানি হতে পারে। কোন দুর্ঘটনায় আঘাত পেতে পারেন। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সময়টা ভালই বলা চলে। বেকারের চাকুরী লাভ হবে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল।

মীন—আর্থিক ক্ষেত্র ভাল। শোক সংবাদে আশ্চর্য হবেন না। পেট সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। নতুন কর্ম লাভ হবে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। পত্নীর স্বাস্থ্য উৎপাত করতে পারে। ব্যবসায়ীদের সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। লেখক ও শিল্পীদের সময়টা মধ্যবিধ। উকিল, দালাল প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের আয় বাড়বে। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের নতুন কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। ছোটখাট ভ্রমণ হতে পারে। চিত্রপরিচালক ও প্রযোজকদের নতুন চুক্তির ব্যাপারে বাধা আসতে পারে। চাকুরীজীবী হলে কর্মপরিবর্তনের যোগ রয়েছে। চিকিৎসকদের আয় বাড়বে। বেকারের চাকুরী লাভ হতে পারে। মহিলাদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে না।

খাদ্যাভাব—

১৩৭৩ বঙ্গাব্দেও খাদ্যাভাব না কমিয়া বরং বাড়িবার উপক্রম হইয়াছে। বৈশাখজ্যৈষ্ঠ মাসে অনাবৃষ্টির ফলে কোথাও চাষ আরম্ভ হয় নাই। আষাঢ়শ্রাবণ মাসে যে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কিছু আউস ধান হইবে বটে কিন্তু আমন ধানের কোন আশা ভরসা দেখা যায় না। এখনও দুই মাস বর্ষা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই এই দুই মাসে দেশের অবস্থা কি হইবে তাহা এখনই বলা যায় না। ধানের সম্ভাবনা খারাপ বলিয়া অন্য কোন খাদ্যও সুলভ হইতেছে না। মন্ত্রীরা যাহাই বলুন না কেন এ বৎসর জনসাধারণ দারুণ খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছে আশ্বিনকার্ত্তিক মাসে কি হইবে তাহা চিন্তা করিয়া লোক ভীত হইয়া আছে। কৃষি বিভাগ যতই তোড়জোড় করুন কোন বিকল্প খাদ্যও উৎপন্ন হইতেছে না। জনসাধারণকে সকল কথা চিন্তা করিয়া আন্দোলন বন্ধ করিতে বদ্ধ পরিকর হইতে হইবে।

রাশিয়ায় কংগ্রেস সভাপতি—

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাশিয়া পরিদর্শনের পর ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার রাশিয়া পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। কংগ্রেস নেতার পক্ষে এইভাবে সরকারী প্রথায় বিদেশভ্রমণ বলিতে গেলে এই প্রথম। শ্রীকামরাজ শুধু কংগ্রেস সভাপতি নন, ভারতের মন্ত্রী-সভার একজন বিশিষ্ট পরামর্শদাতা। কাজেই তাঁহার এই বিদেশ ভ্রমণ ভারতকে নূতন আলো দেখাইবে। তিনি মস্কোতে যাইয়া ক্রেমলিনে লেনিনের বাসগৃহাদি ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। ভবিষ্যতে লেনিনের বাস-গৃহ পৃথিবীর অন্যতম জাতীয় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে।

দুর্গাপুর হইতে বাঙালী বিতাড়ন—

দুর্গাপুরের কারখানাগুলি হইতে পুরাতন বাঙ্গালী কর্ম্মীদিগকে একে একে তাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার স্থানে নূতন অবাঙালী নিযুক্ত করা হইতেছে। বাংলাদেশে অবাঙ্গালীর প্রাধান্য কেহ আর সহ্য করিতে পারে না। ইহার প্রতিকারের জন্য বাঙ্গালীর ঐক্যবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করা প্রয়োজন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৫ই আগষ্ট লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবস উৎসব উপলক্ষে বিরাট জনসমাবেশের সম্মুখে জাতির উদ্দেশে বক্তৃতা করিতেছেন।

পুলিশ ও চালের চোরাকারবার—

পশ্চিমবঙ্গে এত পুলিশী ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও চালের চোরাকারবার বন্ধ হইতেছে না। সর্ব্বত্রই দেখা যায়

চোরাকারবারীরা পুলিশ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। পুলিশ চোরাকারবারীদের ধরিতে গেলে পুলিশকে মার খাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। দেশে এই অবস্থা কতদিন চলিবে? পুলিশকে যদি অধিকতর শক্তিশালী করা না হয় তাহা হইলে পুলিশী ব্যবস্থা রাখিয়া লাভ কি?

উত্তর প্রদেশ বিধান সভা—

পুলিসের প্রহার ও লাঠিচালনার বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ বিধান সভায় কয়েকদিন ধরিয়া নানারূপ গোলমাল চলিয়াছিল। সদস্যরা বিধান সভার কার্য্যে যোগদান করেন নাই। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনির চেষ্টায় ধীরে ধীরে সভায় শান্তি ফিরিয়া আসে। বিষয়টি প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। স্বাধীনতার নামে সর্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতাও ক্রমেই বাড়িতেছে।

মিষ্টান্ন নিষিদ্ধ—

১৪ই জুলাই হইতে পশ্চিমবঙ্গে সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি ছানাজাত মিষ্টান্ন দ্রব্য কলিকাতায় আনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এতদিন রাবড়ি এ তালিকায় ছিল না। কিন্তু ১৪ই জুলাই হইতে রাবড়িও এই তালিকাভুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ১৪ই জুলাই হইতে ছানাজাত মিষ্টান্ন দ্রব্য কর্ডনিং-এর আওতায় পড়িয়াছে। এই আইন যে অমান্য করিবে তাহাকে গ্রেফতার ও শাস্তি দেওয়া হইবে।

পূর্ব্বপাকিস্তানে যুদ্ধাতঙ্ক সৃষ্টি—

পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ করার জন্য আয়ুব খাঁ সেখানে যুদ্ধের আতঙ্কের কথা প্রচার করিতেছেন। যুদ্ধ বাধিলে কি কি অসুবিধা ও ক্ষতি হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া চারিদিকে প্রচার করা হইতেছে। আয়ুব খাঁর তালিকাভুক্ত অসুবিধাগুলি অধিকাংশ তাঁহার কল্পনাপ্রসূত, কাজেই পাকিস্তানের আন্দোলনকারীরা সে কথায় বিশ্বাস করিবে না। বর্তমানে যুদ্ধ কেহই চাহেনা। যুদ্ধ বাধিলে কি পাকিস্তান কি ভারত উভয় দেশই ধ্বংস হইবে। একথা আজ সকলে বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

লাবণ্যপ্রভা দত্ত—

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ-সভানেত্রী লাবণ্যপ্রভা দত্ত গত ১৯শে জুলাই মঙ্গলবার রাত্রে তাঁহার কলিকাতা রমেশ দত্ত রোডস্থ বাসভবনে হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পূর্বদিন বেলগাছিয়ায় মহিলা কর্মী সম্মেলনে যোগদান করিতে গিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। পরদিন ৫৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অন্যতম কর্মকর্ত্রী ছিলেন এবং নিষ্ঠার সহিত কংগ্রেসের সকল কাজ সম্পাদন করিতেন। তিনি দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্যা ছিলেন। স্বর্গত সুধী স্যার রমেশচন্দ্র দত্তের পরিবারে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার স্বামী একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন।

রমণীমোহন রায়—

কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রমণীমোহন রায় ৬৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন। কলিকাতায় নানা সদনুষ্ঠানে প্রিন্সিপ্যাল রায়কে বক্তৃতা করিতে দেখা যাইত। তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু বার্ষিকীতে উপস্থিত থাকিতেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাসগৃহ—

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পরে তাঁহার বাসগৃহটি আবার ব্যবহার করা হইতেছে। গৃহটি তিনি তাঁহার পিতা মাতার নামে 'অঘোর-প্রকাশ ট্রাষ্টের' হাতে দান করিয়াছিলেন। সরকার ঐ ট্রাষ্টের নিকট হইতে বাড়ীটির ভার গ্রহণ করিয়া অল্প ব্যয়ে কঠিন রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকারী অর্থ সাহায্যে সাধারণ ব্যয় অপেক্ষা শতকরা ৫০৲ টাকা কমে চিকিৎসা করা হইবে। ডাঃ রায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইলে দেশ উপকৃত হইবে।

ভারত পাকিস্তান আপোষ—

শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্তান ভারতের সহিত আপোষের জন্য বিনা সর্তে বৈঠকে বসিতে রাজী হইয়াছে। এই বৈঠক সফল হইলে পরে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক বসিবে। পাকিস্তানের সুবুদ্ধি না হইলে উভয় দেশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কবে যে পাকিস্তান একথা বুঝিবে কে জানে?

দেশী প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম—

সম্প্রতি মাদ্রাজে বক্তৃতা প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন যে, দেশের প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা

সরঞ্জাম দেশেই প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার জন্য পর-মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা চলিবে না। ভারত সেজন্য স্বদেশে বহু কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া যুদ্ধের সরঞ্জাম উৎপাদন করিতেছে। এ চেষ্টা বাড়িলে দেশ সকল দিক দিয়া লাভবান হইবে।

ফারাক্কা বাঁধ তৈয়ারী—

সরকারী সংবাদে জানা গিয়াছে ১৯৭০-৭১ সনের আগে ফারাক্কা বাঁধ তৈয়ারীর কাজ শেষ হইবে না। আসল বাঁধ, তাহার উপর রেল যাতায়াতের সেতু ও পাশের খাল তৈয়ার করিতে সময় লাগিবে। অথচ সত্বর এ কাজ শেষ না হইলে পশ্চিমবাংলায় কোনরূপ উন্নতিমূলক কাজ করা যাইবে না। পুরাতন গঙ্গার খাতে জল না আসিলে ক্রমে কলিকাতা সহর অকেজো হইয়া যাইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ—

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ ১৯১৭ সালে গণিতের অধ্যাপকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৯৬৬ সালে প্রায় ৫০ বৎসর কাজ করার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। শেষ জীবনে দীর্ঘকাল কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন ; তাহার সঙ্গে ৫।৭ বার অস্থায়ীভাবে ভাইস-চ্যান্সেলারের কাজও করিয়াছেন। সারা জীবন তিনি নিষ্ঠার সহিত যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন তাহা অসাধারণ বলা যায়।

জেনারেল জে, এন, চৌধুরী—

ভারতের প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি জেনারেল জে, এন, চৌধুরী গত ১৯ জুলাই অটোয়ায় কানাডার হাই কমিশনার রূপে কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। বাঙালীর এইরূপ উচ্চ সম্মান লাভ ইদানীং অধিক দেখা যায় না।

ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যে ক্ষতি—

ভারতীয় ফারনেস ম্যানুফ্যাকচারারস্ সমিতির সভাপতি ডাঃ ইউ, পি, গাঙ্গুলী একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যে অসুবিধার কথা জানাইয়াছেন। তাঁহার মতে আমেরিকান জাহাজ কোম্পানীর মাশুলের তারতম্যের জন্য ভারতের রপ্তানীবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বিষয়টির প্রতি সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তিনি ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করেন।

দক্ষিণ আমেরিকায় বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রেরণ—

গত ২৬শে জুন বোম্বাই বন্দর থেকে জাহাজে এক বিরাট মর্মর প্রস্তরের বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ফেলিসিটি শহরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে নব নির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠান

মর্মর প্রস্তরের বিষ্ণুমূর্ত্তি

হয়েছে। সঙ্ঘ দক্ষিণ আমেরিকাস্থিত সুদুর ওয়েষ্ট ইনডিজ ও ব্রিটিশ গায়েনার পাঁচ লক্ষাধিক হিন্দু সন্তানগণের সঙ্গে ধর্ম ও সংস্কৃতিগত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গত পনের বৎসর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার করে আসছেন। এখন সেখানে পাঁচটি মন্দির, আশ্রম ও স্কুল কলেজ খোলা হয়েছে। স্বামী পূর্ণানন্দজী মহারাজের কার্য্যকুশলতায় ঐ প্রদেশগুলিতে সহস্র সহস্র প্রবাসী ভারতীয়গণ—ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়াছে।

ভারতকে রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য দান—

১৬ই জুলাই ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন রাশিয়ায় ছিলেন তখন রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী শ্রীকোসিগিন ভারতকে শতাধিক কোটী ডলার ঋণ দিতে সম্মত হন। এত অধিক টাকা সাহায্য ইহার পূর্বে ভারত আর কখনও রাশিয়ার নিকট ঋণ পায় নাই। এই টাকা পরিশোধ করিতে হইলেও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজে ইহা বিশেষ উপকারে লাগিবে।

কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন বিচারপতি—

শ্রীঅরুণকুমার দাস ও শ্রীঅমরেন্দ্র সেন মহাশয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কলিকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা পূর্ব্বে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ইহা ছাড়া শ্রীসমরেন্দ্রনাথ বাগচী, শ্রীঅমিয় নিমাই চক্রবর্ত্তী ও শ্রীশম্ভুচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

হারীতকৃষ্ণ দেব—

ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত হারীতকৃষ্ণ দেব ৭৩ বৎসর বয়সে গত ২৩শে জুলাই কলিকাতায় নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শোভাবাজার রাজবংশের সন্তান ছিলেন এবং তিনি চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য সকলে তাঁহাকে সম্মান করিত

ব্যয় সঙ্কোচ ব্যবস্থা—

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা নিম্নলিখিতরূপ ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(১) বিমানে বাহিরে যাইতে হইলে ভাড়া কম শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে হইবে। (২) বিমানে ভ্রমণ ভাতা ২০৲ টাকা করা হবে। পূর্বে ৩০৲ টাকা ছিল। (৩) বর্তমানে রেল ভ্রমণের জন্য প্রকৃত ভাড়া দেওয়া হইবে। (৪) বিদেশ যাত্রী প্রতিনিধিদলের খরচের পরিমাণ বহুলাংশে কমানো হইবে। (৫) পর্যাবৃত্ত সম্মেলন বৈঠকের ব্যয় কমানো হইবে। (৬) ভবিষ্যতে ভারতে তৈরী মোটর গাড়ীই কেবল কেনা হইবে। (৭) গণডেপুটেশন ভাতাও কমানো হইবে।

ইহা ছাড়া অন্যান্য ব্যয়হ্রাসের কথাও বলা হইয়াছে।

ডাঃ ত্রিগুণা সেন—

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ ত্রিগুণা সেন দীর্ঘকাল ঐ পদে কাজ করার পর কার্য্যকাল শেষ হইবার পুর্বেই পদত্যাগ করিয়াছেন। ডাঃ হেমচন্দ্র গুহ তাঁহার স্থানে নূতন ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। ত্রিগুণাবাবু জানাইয়াছেন যে, তিনি অবসর গ্রহণের পর শিক্ষা বিভাগে কাজ করিবেন, কোনরূপ রাজনীতিতে যোগদান করিবেন না। তাঁহার মত বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি এ যুগে বিরল।
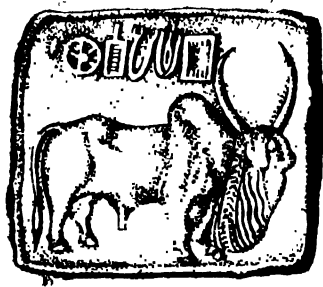
বিধির বাঁধনে বাঁধা…
উপায় যে নাই !
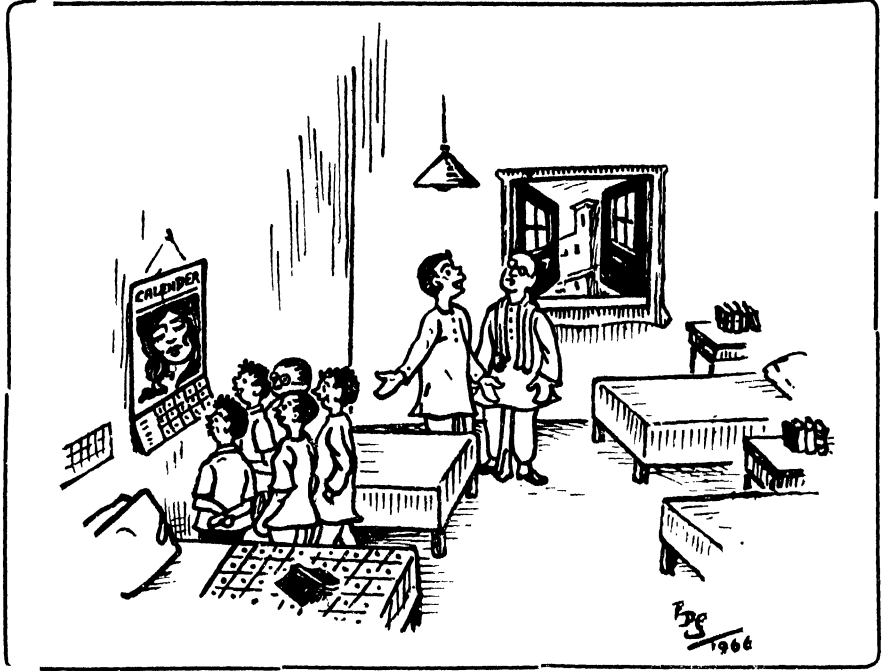
সরকারী-পরিদর্শক : (সবিস্ময়ে) একি বেয়াড়া কাণ্ড !…ছাত্রাবাসের দেয়ালে সিনেমা-ষ্টারের ছবি ঝোলানো !…আইন কানুন মানেন না !

ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ : (নিরুপায়ভাবে) আজ্ঞে, আইন-কানুন সবই জানি…এবং ঠিকঠাক মেনেও চলছি…কিন্তু উপায় কি বলুন !…হোষ্টেলে ক্যালেণ্ডারের আর বাড়ীর লোকজনের ছবি টাঙানো তো বারণ নয়…তাছাড়া চশমা-চোখে ঐ ছেলেটি বলছে যে ক্যালেণ্ডারের ছবির সিনেমা-ষ্টারটি নাকি আসলে ওরই একজন নিকট-আত্মীয়া…বড়দার ছোট শ্যালিকা—সুনেত্রা দিদি ! কাজেই··

শিল্পী : পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

জর্জ্জ এলিয়ট্

রচিত

সাইলাস মারনার

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এমনিভাবে সুদীর্ঘ ষোলো বছর কেটে গেল…এ ক'বছরে সারা দুনিয়াতে ঘটলো কত কি পরিবর্ত্তন—তার ঢেউ এসে লাগলো নিরালা-সুন্দর র‍্যাভেলো গ্রামের প্রান্তে…সাইলাস্ আর এপির জীবনেও। ষোলো বছর আগে সহসা সেই ঝড়-তুষারাচ্ছন্ন শীতের রাতে মা-হারা শিশু এপি এসে পর্ণ-কুটিরে হাজির হওয়ার পর থেকেই সাইলাসের নিঃসঙ্গ-জীবন ক্রমেই শান্তি-সুখে ভরে উঠেছিল। সেদিনের সেই অসহায়-অনাথ দু'বছর বয়সের শিশু এপি আজ সাইলাসের স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ হয়ে লেখাপড়া, ঘর-সংসারের কাজ, সেলাই, গান-বাজনা শিখে ফুলের মতো ফুটফুটে-সুন্দর আঠারো বছরের তরুণী…এপির সেবা-যত্নে, আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসায় প্রৌঢ় সাইলাসের জীবন আজ দুঃখ-দুর্ভো অশান্তি অস্বাচ্ছন্দ্য আর নিঃসঙ্গতার ছোঁয়াচ থেকে রেহা পেলেও, সুদীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর বয়সের বোঝার চাপে তা মাথার চুলগুলি পেকে শাদা হয়ে গেছে…দেহও জরাজী দুর্ব্বল…কাঁধ দুটিও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ত সাইলাসের মনে আজ আর আগেকার দিনের মতে কোনো ক্ষোভ অনুযোগ, অভাব অভিযোগের গ্লানি নেই… নববর্ষোৎসবের সেই দুর্য্যোগময় রাতে এপির অতর্কি আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বিধাতার আশীর্ব্বাদে তার দুঃখে বরাত যেন কোন যাদু-কাঠির স্পর্শে বেমালুম বদলে গি ক্রমশঃই মনোরম-মধুর হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। সাইলাসের নয়নের মণি—এপি…এপিকে কেন্দ্র করেই সাইলাসের জীবন…সাইলাসের সংসার…বেঁচে থাকার যা কিছু বাসনা… যত কিছু স্বপ্ন! বয়স কম হলেও, এপির সারাক্ষণের ধ্যান-চিন্তা আর চেষ্টা-সাধনা ছিল—সাইলা কিসে আরাম স্বাচ্ছন্দ্য পাবে…শান্তি-সুখে-আনন্দে দি কাটাবে। তাই সাইলাসের যাতে কোনো কষ্ট বা অসুবিধ না ঘটে, এজন্য এপি গ্রামের অন্য সব সমবয়সী-মেয়েদে মতো বাজে গল্প-গুজব আর অনর্থক হৈ-চৈ ছুটোছুটিতে না মেতে, সারাক্ষণই ছায়ার মতো নিঃসঙ্গ প্রৌঢ় সাইলাসের পাশে পাশে থেকে সেবা যত্ন করতো…নিজের হাতে রান্না-বান্না, ঘর-দোর বাগান নিখুঁত পরিপাটিভাবে সাজানো-গোছানো, পরিচ্ছন্ন রাখা, সেলাই, গান, উপাসনা, পাড়া-পড়শীদের খোঁজ-খবর নেওয়া, বিপদে-আপদে, আর উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁদের বাড়ীতে হাজির হয়ে সামাজিকতা রক্ষা

করা—এমনি আরো কত সব কাজকর্ম্ম। এপির এ সব গিন্নীপনার কাজ-কর্ম্ম দেখে সাইলাসের খুবই আনন্দ হতো ⋯সাইলাস অবাক হয়ে ভা'তো—সেদিনের সেই ফুটফুটে সুন্দর একরত্তি শিশু এরই মধ্যে এমন পাকা-গিন্নী হয়ে উঠেছে!

ছোটবেলা থেকেই এপিকে ঘর-সংসারের এ সব কাজ-কর্ম্ম করতে শিখিয়েছিলেন—পাড়ার মাতৃসমা পড়শিনী ডলি উইনথ্রপ। তিনি নিত্যই সকালে বিকালে ফুরসৎ মতো তাঁর ছেলে আরণকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে আসতেন সাইলাসের কুটিরে—এপি আর সাইলাসের খোঁজ-তল্লাশ ও ঘর-সংসারের কাজে সাহায্য করতে। তাছাড়া আরণও ছিল এপির প্রায় সমবয়সী⋯মাত্র দু'চার বছরের বড়। তাই শৈশব থেকেই আরণ আর এপি ছিল, খেলাধুলার সঙ্গী⋯দিনে দিনে দুজনের মধ্যেই বেশ সুন্দর একটি ভাব-ভালোবাসা অন্তরঙ্গতার মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল⋯ তাদের দুজনের ঘনিষ্ঠতা দেখে র‍্যাভেলো গ্রামের লোক-জনেরা অনেক সময় স্নেহভরে মন্তব্য করতো—আহা, বড় হলে, এ দুটি ছেলে-মেয়ের যদি বিয়ে দেওয়া যায় তো খুবই মানানসই হয়! দুজনেরই এমন সুন্দর মনের মিল⋯বিয়ে দিলে,এদের দুটির সংসার পরম সুখে-শান্তিতে ভরে থাকবে!

গ্রামের লোকজনের এমন সব মন্তব্য মাঝে মাঝে সাই-লাসেরও কানে এসে পৌছুতো। সাইলাস্ কিন্তু এ সব কথা শুনলে মনে মনে শিউরে উঠতো⋯সে ভাবতো—তাই তো!⋯কবে সেই শিশুকাল থেকে সুদীর্ঘ এই ষোলো বছর ধরে সোনার মোহর জমানোর মতো একান্ত নেশায় বিভোর হয়ে যে এপিকে এমন স্নেহে যত্নে ভালোবাসায় তিলে তিলে মানুষ করে তুলেছি⋯তাকে এবার পরের ঘরে ঘরণী হিসাবে এ সংসার থেকে দূরে অন্যত্র সরিয়ে আলাদা করে দিতে হবে!⋯তারপর⋯নয়নের মণি এপিকে পরের ঘরে সঁপে দিয়ে আবার এই শূন্য কুটিরে একা একা আগেকার মতো সেই নিরালা নিঃসঙ্গ দুঃসহ জীবনের বোঝা ব'য়ে বাকী দিনগুলি কাটানো!⋯সে যে কি দুর্ভোগ⋯কতখানি মর্ম্মান্তিক অসহ্য—সাইলাস্ তা ভালোভাবেই জানে!

কাজেই গ্রামের লোকজনের এ সব গুজব মন্তব্যে, সাইলাস্ কোনো সাড়া দেয় না⋯চুপচাপ থাকে⋯আর নিজের মনে মনেই নানান্ রকম চিন্তা করে!

কিন্তু নিয়তির বিধান খণ্ডাতে পারে—এমন সাধ্য কারো নেই এ দুনিয়াতে! কাজেই সাইলাস্‌কেও শেষে হার মানতে হলো—নিয়তির সেই বিধানের কাছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

—

চিত্রগুপ্ত
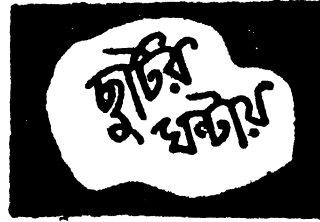
এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের আরেকটি আজব-মজার কারসাজির কথা বলি। অভিনব-বিচিত্র এই বিজ্ঞানের খেলাটির নাম—'ডিমের অন্দরে আজব রেখাঙ্কন।' নাম শুনেই হয়তো অনুমান করতে পারছো যে—খেলাটি বেশ রহস্যময় এবং রীতিমত অদ্ভুত ধরণের। কাজেই এ খেলার কলা কৌশল ঠিকমতো রপ্ত করে নিয়ে ছুটির দিনে আত্মীয় বন্ধুদের আসরে যথাযথভাবে 'ডিমের অন্দরে আজব-রেখাঙ্কনের' আজব-মজার কারসাজি দেখাতে যদি পারো, তাহলে তাঁরা যে শুধু বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবেন তাই নয়, তোমাদের বাহাদুরীরও তারিফ করবেন সবিশেষ।

এ খেলার কলা-কৌশল আয়ত্ত করা এমন কিছু দুঃসাধ্য কঠিন কাজ নয় এবং কারসাজিটি দেখাতে হলে, টুকিটাকি ঘরোয়া-ধরণের সামান্য যে কয়েকটি সাজ সর-ঞ্জামের প্রয়োজন, সেগুলি জোগাড় করাও সহজ এবং খরচও নিতান্তই অল্প।

আসরে দর্শকদের সামনে আজব-মজার এই কারসাজি দেখাতে হলে, টুকিটাকি যে সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন গোড়াতেই তার মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, 'ডিমের অন্দরে আজব-রেখাঙ্কনের' খেলা দেখানোর জন্য চাই—এক আউন্স ফিটকিরি (Alum) পাঁচ, আউন্স

'সিরকা' বা 'ভিনিগার' (viniger) মাঝারি-সাইজের একটি এনামেলের বাটি, কাঁচের অথবা এনামেলের একটি রেকাবী, রেখাঙ্কনের উপযোগী ভালো একটি তুলি এবং একটি খোলা-সমেত ডিম।

ফর্দ্দমতো জিনিষগুলি জোগাড় হবার পর, এনামেলের বাটিতে পাঁচ আউন্স ভিনিগারের সঙ্গে এক আউন্স ফিটকিরি মিশিয়ে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে গলিয়ে নাও। এবারে ঐ 'তরল-মিশ্রণে' তুলিটিকে ডুবিয়ে, 'মিশ্রণ-সিক্ত' তুলি দিয়ে রেখা টেনে ডিমের খোলার উপরে তোমাদের পছন্দমতো ছাঁদে ফুল লতা পাতার নক্সা কিংবা কোনো হরফ এঁকে ফ্যালো। তারপর কিছুক্ষণ ছায়া শীতল কোনো জায়গায় রেখে সন্ত-চিত্রিত খোলা সমেত ডিমটিকে বেশ ভালোভাবে শুকিয়ে নিলেই, ডিমের খোলার উপরে রেখাঙ্কনের সব কিছু চিহ্নই এমন বেমালুম মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে, যে কারো এতটুকু বোঝবারও উপায় থাকবে না। তবে এ সব কাজ কিন্তু আসরে দর্শকদের সামনে খেলার কারসাজি দেখানোর আগেই সকলের দৃষ্টির অগোচরে নেপথ্যে সেরে রাখতে হবে। কারণ, এ সব ব্যাপার ঘৃণাক্ষরেও যদি তাঁরা কেউ জানতে পারেন তো মজা মাটি হয়ে যাবে বিলকুল। কাজেই হুশিয়ার, খেলার উদ্যোগ-আয়োজন পর্ব্বের এ সব কলা-কৌশলরহস্য কেবল মাত্র খেলোয়াড় ছাড়া আর কারো কাছে যেন এতটুকু ফাশ্ না হয়ে যায়—সেদিকে রীতিমত নজর রাখা দরকার।
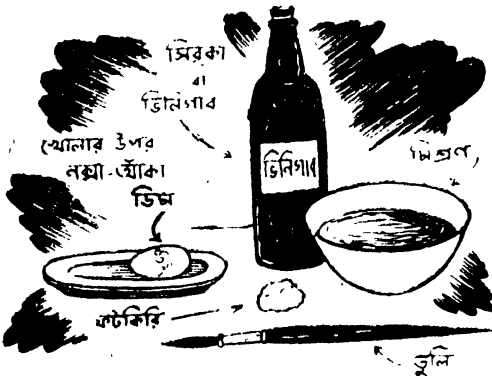
যাই হোক, লোক-চক্ষুর অন্তরালে নিভৃতে নেপথ্যে উদ্যোগ আয়োজনের এ সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সেরে নেবার পর, আসরে দর্শকদের সামনে খেলা-দেখানোর পালা।

আসরে খেলা দেখানোর সময় নিতান্তই সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে দর্শকদের সামনে ইতিপূর্ব্বে নে রেখাঙ্কিত খোলা-সমেত ডিমটি দেখিয়ে, তাঁদের সু ভাবে জানিয়ে দেবে যে বিজ্ঞানের বিচিত্র রহ প্রক্রিয়া'য় অদ্ভুত উপায়ে অতি সাধারণ সেই ডিমের অ ফুটে উঠবে—অভিনব অসাধারণ ছাঁদের ফুল লতা অথবা হরফের আজব নক্সা। এমন আজগুবী কা বাস্তবিকই ঘটতে পারে—এ কথাটা হয়তো গোড়াতেই বিশ্বাস করবেন না…এমন কি, কেউ বা হ উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও ছাড়বেন না…পরিহা সুরে বলবেন,—এ আবার কখনো সম্ভব হয় নাকি!

তখন তাঁদের চোখের সামনে দেখাও তোমা বাহাদুরী…অর্থাৎ, এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব করে তো আজব কলা কৌশল। সে কলা কৌশল দেখানোর —আসরেই দর্শকদের চোখের সুমুখে ইতিপূর্ব্বে নেপ রেখাঙ্কিত খোলা-সমেত ডিমটিকে অন্ততঃপক্ষে মি দশেক সময় গরম জলে রেখে ফুটিয়ে সু-সিদ্ধ করে না তারপর সু-সিদ্ধ ডিমের উপরের খোলাটি ভেঙে আগাগো ছাড়িয়ে ফেললেই—দর্শকেরা স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন ডিমের ভিতরকার শ্বেতাংশের গায়ে দিব্যি সুস্পষ্ট ছ ফুটে রয়েছে বিচিত্র আজব ফুল লতা পাতা অথবা কো হরফের অদ্ভুত নক্সা! এমন অসম্ভব দৃশ্য দেখে তাঁরা শুধু বিস্ময়ে অবাক হবেন, তাই নয়—উপরন্তু, তোমা বাহাদুরীর প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে প্রশংসায়ও পঞ্চমুখ হ উঠবেন, সে কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

এবারে এই পর্য্যন্তই…আগামী সংখ্যায় এমনি ধর আজব-মজার আরেকটি অভিনব-খেলার কলা কৌশ কথা জানানোর বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। রেখাঙ্কনের আজব হেঁয়ালি :
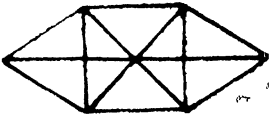
উপরে বিচিত্র ছাঁদের যে জ্যামিতিক-নক্সাচিত্রটি দেখছো এক টুকরো শাদা-কাগজে পেন্সিলের রেখা টেনে যদি চটপট সেটির হুবহু-প্রতিলিপি এঁকে ফেলতে পারো তো বুঝবো—তুমি রীতিমত বাহাদুর হয়ে উঠেছো। তবে এ কাজটুকু যত খানি সহজ-সরল বলে মনে করছো, আসলে কিন্তু তা নয়! কারণ, প্রতিলিপিটি আঁকবার সময় এক মুহূর্তের জন্যও কাগজ থেকে পেন্সিলটিকে এতটুকু না সরিয়ে, পুরো-নক্সাটি-আগাগোড়া এক-টানে এঁকে ফেলতে হবে। মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে, ত্যাখো তো চেষ্টা করে—এ আজব-হেঁয়ালির সঠিক-সমাধান করতে পারো কিনা তোমরা কেউ!

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

আকাশেতে আছি আমি,
পৃথিবীতে নাই…
সাগরে পাবে না মোরে,
স্বর-বর্ণে ঠাঁই!

রচনা : বাবুন্ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

গত মাসের 'ধাঁধা ও হেঁয়ালির' উত্তর :

১। পাশের ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবে—কি
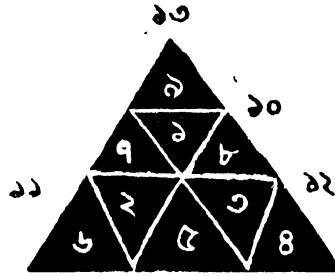
উপায়ে তিনটি সরল-রেখা আঁকলে মোট তেরোটি ত্রিভুজ রচনা করা যাবে।

২। বসুধারা

৩। কালাপাহাড়

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

সুধাংশু, হিমাংশু, শীতাংশু, হারাণচন্দ্র ও সুষমা (শিলিগুড়ি), রাজা, ভুটিন ও পুপু মুখোপাধ্যায় (কলিঃ) সত্যেন্দ্র, সঞ্জয়, মুরারি, অমিয় ও সুনীল (ভিলাই), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু, টাবলু, সঞ্জীব ও সুনীরা মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), রবিন রায় (বোম্বাই), প্রশান্ত, অমিয়, অমৃত, পুলিন, প্রতিমা, কৃষ্ণলাল, মাণিক, পিণ্টু, মানস, সুনীত ও তিনকড়ি (গড়িয়া), দ্বিজয়েন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র সিংহ (হাজারীবাগ), সুধীশ, তাপস, জগবন্ধু, মানস, সলিল ও অজিত (কলিকাতা), রিণি ও রণি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), ফণী, রোচনা ও দোলন সাহা (কলিকাতা), দেববর বন্দ্যোপাধ্যায় (দিল্লী), রাণা, বুনা, গৌর ও লিপিকা (চুঁচড়া), দুর্গাদাস, রেণু, খুকু, প্রণব, ক্ষেপী ও প্রশান্ত (রাণাঘাট), কবি, অধীশ ও অমিতাভ হালদার (লক্ষ্ণৌ), বুবু, জন, ঝুণ্টু ও বাচ্চু বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), অনিল, মীরা ও রবি (মীরাট), শর্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), অলক ও তিলক রায় (কৃষ্ণনগর), সঞ্চিতা, টুলটুল, কুলকুল,

অচ্চি, ছোটন, পাপু, মালা, নন্দা, সৌমিত্র, রঞ্জন, টুটুল, পার্থ, কল্যাণ, তনু, বুকু ও মিনতি (কলিকাতা), শিবশঙ্কর, লিলি ও শ্রাবণী গোস্বামী (মাদ্রাজ), রজত, কল্যাণ, শচীন, ইন্দ্র, পৃথ্বীশ, রণজিৎ, নীলমণি, কালিদাস, নীতীশ, রামসদয়, বিশ্বতোষ (কলিকাতা), হরিদাস, দুলাল, কাশীনাথ, ছন্দা, বকুল, মালিনী, টুকলু, বটুকেশ্বর ও শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায় (বিলাশপুর), বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), অনিল, ভাস্কর, রবি, অরবিন্দ, শ্যামলী, কুন্দনন্দিনী, মায়া ও সুশান্ত সেন (কলিকাতা), দ্বিজেন্দ্রমোহন সরকার (কলিকাতা)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে

সুস্মিতা ও হীরেন ঘোষ (কলিকাতা), বাপি, বুতা ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), শ্যামা, ঋষি ও খুকি (উত্তরপাড়া), প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘাটশীলা), রেণুকা ও সতী বিশ্বাস (কলিকাতা), শোভনা রায় ও সুজাতা সেন (ভুবনেশ্বর), তারক, অজয়, পশুপতি, সমীর, আশীষ ও প্রেমেন্দ্র সিংহ-রায় (বর্দ্ধমান), সন্তু, নেপাল, ভূপাল, চন্দন, হাসি ও সুনন্দা রায়চৌধুরী (কলিকাতা), চায়না চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

দুঃসহ রজনী

শ্রীকল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার বিনিদ্র রাত কাটে
আবছা হ'য়ে আসা স্মৃতির ভীড়ে
অবসন্ন মন, চিন্তা করে।
মুখ তোলে মাঝে মাঝে
না ফোটা আশার কলি
মুহূর্তেই তলিয়ে যায়।
আমার নিঃসঙ্গ রাত কাটে,
একা ঘরে ঘিরে ধরে আমাকে সহস্র ভাবনা
পাকে পাকে বেঁধে ফেলে।
বাস্তবের রূঢ় চাবুকের ঘায়ে
ক্ষতময় অন্তর শান্তি খোঁজে।
আমার ব্যথিত রাত কাটে
গুমরে ওঠা বেদনার মুখে হাত চেপে
সময় কেটে যায়।
অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে
হঠাৎ জেগে ওঠা উচ্ছ্বাস
আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে ; আবার রাত
ভোর হ'য়ে যায়।

লাইলাক

প্রদীপ চৌধুরী

ঘুম এখনো এলো না
বাইরে বেড়িয়ে এলাম
তাকিয়ে দেখলাম কালো আকাশটার দিকে
কোন কৃষ্ণনয়নার কালো চুলের মত লাগছে।
কয়েকটা তারা তাকিয়ে আছে
বোধহয় আমি ঘুমোলেই ওরা ঘুমোবে।
স্বপ্নমদির নিঝুম রাত
জ্যোৎস্নায় আছে প্রথম প্রেমের স্পর্শসুখ,
এগিয়ে আসতেই বুঝলাম
তুমি কোথাও রয়েছো।
তোমার দেহের কামনা মদির গন্ধ
আমায় টেনে আনছে।
আমি নিতে এসেছি
তোমার নরম বুকের ঘ্রাণ আমার বুক ভ'রে।
সামনে এগোতেই দেখি আমার 'লাইলাক'
তুমি ঘুমজড়ানো আবেশ জড়িয়ে আছো।
আমায় দেখে দুলে উঠল
তোমার প্রতীক্ষা-কাতর বক্ষ।

পাশের ছবিতে অভিনব-ছাঁদের যে বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রটি দেখছো, সেটি হলো জাপান দেশের বিশেষ এক-ধরণের তার-যন্ত্র। ওদেশের লোকজনেরা এই তার-যন্ত্রটিকে রীতিমত ভালবাসে— ভারী সুমিষ্ট এ যন্ত্রের সুর-সঙ্গীত। জাপানের অধিবাসীরা এই তার-যন্ত্রের নাম দিয়েছেন —'সামিসেন'

আরেক ধরণের বিচিত্র তার-যন্ত্র — আফ্রিকা মহাদেশের টিম্‌বাক্‌টু-অঞ্চলের সঙ্গীত-কলারসিক অধিবাসীদের বিশেষ-প্রিয় অভিনব ছাঁদের এই কুমড়োর খোল দিয়ে তৈরী 'বীন'-জাতীয় বাজনা। এ বাজনার আওয়াজ নাকি অনেকটা ঠিক আমাদের দেশের লাউ-কুমড়োর খোল দিয়ে বানানো বিরাট-মাপের তুম্বাওয়ালা তানপুরা ও বীন-বাদ্যের মতো সুরেলা।

'জল-তরঙ্গ' বাদ্যের মতো ছোট-বড় মাপের একরাশ পিতল-কাঁসার তৈরী বাটি-সাজানো এই অভিনব বাজনাটি হলো, ব্রহ্মদেশে সঙ্গীত-প্রিয় অধিবাসীদের— বড় আদরের সামগ্রী। এমনি ধরণের বাদ্যযন্ত্রের রেওয়াজ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া অঞ্চলের জাভা, বা দ্বীপ প্রভৃতি আরো নানান রাজ্যেও দেখা যায়। ওদেশী অধিবাসীদের এ বাদ্যযন্ত্রটির নাম —'গামেলান'...অপরূপ সুমধুর এ বাদ্যের সুরধ্বনি।

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

বিশ্ব ফুটবল কাপ ঃ

লণ্ডনের বিশ্ববিখ্যাত ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে অষ্টম বিশ্ব-ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইংল্যাণ্ড ৪ ২ গোলে ১৯৫৪ সালের জুলে রিমে কাপ বিজয়ী পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করে। ইংল্যাণ্ডের এই প্রথম ফাইনাল খেলা। ফাইনাল খেলার নির্দিষ্ট ৯০ মিনিট সময়ে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি, দুই দেশই দুটি করে গোল দেওয়াতে খেলার ফলাফল ২-২ গোলে ড্র ছিল। অতিরিক্ত সময়ের ৩০ মিনিটের খেলায় ইংল্যাণ্ড আরও দুটি গোল দিয়ে পশ্চিম জার্মানীকে শেষ পর্য্যন্ত ৪-২ গোলে পরাজিত করে। ইংল্যাণ্ডের চারটি গোলের মধ্যে লেফ্‌টইন জিওফ হার্স্ট একাই তিনটি গোল দেন। অপর গোলটি দেন পিটার্স। খেলার ১২ মিনিটে পশ্চিম জার্মানীর হেলমুট হাল্লার প্রথম গোল করেন (১-০)। ৬ মিনিট পরই জিওফ হার্স্ট হেড দিয়ে গোলটি শোধ করেন (১-১)। খেলার ৭৮ মিনিটে ইংল্যাণ্ডের পিটার্স দলের দ্বিতীয় গোল দিলে ইংল্যাণ্ড ২-১ গোলে এগিয়ে যায়। কিন্তু খেলা ভাঙ্গার ৩০ সেকেণ্ড আগে পশ্চিম জার্মানীর ওয়েবার অপ্রত্যাশিতভাবে দলের দ্বিতীয় গোলটি দিলে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে (২-২) শেষ হয়। খেলার অতিরিক্ত সময়ের ১১ মিনিটে জিওফ হার্স্টের এক বিতর্কমূলক গোলে ইংল্যাণ্ড ৩-২ গোলে অগ্রগামী হয়। এই গোলের পর পশ্চিম জার্মানীর খেলায় ভাটা পড়ে। খেলা ভাঙ্গার শেষ সময়ে হার্স্ট দলের চতুর্থ গোলটি দিয়ে গোলের ব্যবধান বৃদ্ধি করেন।

১৯৬৬ সালের অষ্টম বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে যে সব দেশ প্রথমে নাম দিয়েছিল তারা শেষ পর্য্যন্ত সকলেই যোগদান করেনি। প্রতি-যোগিতায় ইউরোপীয়ান দেশগুলিকে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল আফ্রিকা মহাদেশকে তা থেকে বঞ্চিত করায় আফ্রিকান ফুটবল দলগুলি এই নীতির প্রতিবাদে প্রতিযোগিতা বর্জ্জন করে। ষোলটি গ্রুপ নিয়ে প্রাথমিক অর্থাৎ বাছাই পর্ব্বের লীগ খেলার তালিকা তৈরী হয়েছিল। দশ নম্বর গ্রুপে ছিল অষ্টম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ইংল্যাণ্ড এবং চোদ্দ নম্বর গ্রুপে গতবারের (১৯৬২) জুলে রিমে কাপ বিজয়ী ব্রেজিল। এই দুটি দেশকে প্রতিযোগিতার বর্ত্তমান নিয়মে প্রাথমিক পর্য্যায়ের লীগ খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হয়নি। তারা সরাসরি মূল প্রতিযোগিতার শেষ পর্য্যায়ের লীগ খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল।

পনের নম্বর গ্রুপকে আবার ক, খ ও গ এই তিন গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল। এই তিনটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশ-গুলি ফাইনাল রাউণ্ডের লীগ খেলায় অংশ গ্রহণ করে এবং এই খেলায় চ্যাম্পিয়ান দেশই পনের নম্বর গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশ হিসাবে শেষ লীগ পর্য্যায়ের খেলায় যোগ-দানের অধিকার লাভ করেছিল।

প্রাথমিক পর্য্যায়ের খেলা :

বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাথমিক (অর্থাৎ বাছাই পর্ব্ব) পর্য্যায়ের লীগ খেলায় অংশ গ্রহণ করে যে ১৪টি দেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হিসাবে মূল প্রতিযোগিতার শেষ লীগ পর্য্যায়ের খেলায় যোগদানের অধিকার অর্জ্জন করেছিল তাদের নাম :

সাউথ আমেরিকান জোন (৩) : আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে এবং চিলি।

ক্যারেবিয়ান নর্থ আমেরিকান জোন (১) : মেক্সিকো

ইউরোপীয়ান জোন (৯) : বুলগেরিয়া, পশ্চিমজার্মানী, ফ্রান্স, পর্তুগাল, সুইজারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রাশিয়া, ইতালী এবং স্পেন।

এসিয়ান জোন (১) : নর্থ কোরিয়া।

শেষ লীগ পর্য্যায়ের খেলা :

ইংল্যাণ্ডে আয়োজিত শেষ লীগ পর্য্যায়ের খেলায় ১৬টি দেশ সমান চারভাগ হয়ে খেলেছিল। লীগ খেলার শেষে চারটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স আপ দেশ নিয়ে প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার তালিকা তৈরী হয়।

শেষ লীগ পর্য্যায়ের চারটি গ্রুপের খেলায় এই আটটি দেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান এবং রাণার্স-আপ হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছিল : ১নং গ্রুপ থেকে ইংল্যাণ্ড এবং উরুগুয়ে, ২নং গ্রুপ থেকে পশ্চিম জার্মানী এবং আর্জেন্টিনা, ৩নং গ্রুপ থেকে পর্ত্তুগাল এবং হাঙ্গেরী এবং ৪নং গ্রুপ থেকে রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়া (গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান দেশগুলির নাম প্রথমে)। এই আটটি দেশের মধ্যে ৫টি দেশ ইউরোপের, ২টি দেশ (আর্জেটিনা এবং উরুগুয়ে) দক্ষিণ আমেরিকার এবং মাত্র ১টি দেশ (উত্তর কোরিয়া) এশিয়ার। জুলে রিমে কাপ বিজয়ী ইতালী (১৯৩৪ ও ১৯৩৮) এবং ব্রেজিল (১৯৫৮ ও ১৯৬২) কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারে নি। ১৯৬৬ সালের অষ্টম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে যে আটটি দেশ উঠেছিল তাদের মধ্যে জুলে রিমে কাপ বিজয়ী দেশ ছিল মাত্র দুটি—উরুগুয়ে (১৯৩০ ও ১৯৫০) এবং পশ্চিম জার্মানী (১৯৫৪)।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

কোয়ার্টার ফাইনাল

ইল্যাণ্ড	১	:	আর্জেন্টিনা	০
পঃ জার্মানী	৪	:	উরুগুয়ে	০
পর্ত্তুগাল	৫	:	উঃ কোরিয়া	৩
রাশিয়া	২	:	হাঙ্গেরী	১

সেমি-ফাইনাল

ইংল্যাণ্ড	২	:	পর্ত্তুগাল	১
পঃ জার্মানী	২	:	রাশিয়া	১

ফাইনাল

ইংল্যাণ্ড	৪	:	পঃ জার্মানী	২

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ :

১৯৬৬ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ২৮টা খেলায় ৫২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে ; অপর দিকে গত চার বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব রাণার্স আপ হয়েছে (২৮টা খেলায় ৪৮ পয়েন্ট)। এই নিয়ে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব আটবার প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হল। তারা লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯৪২, ১৯৪৫-৪৬, ১৯৪৯-৫০, ১৯৫২, ১৯৬১ ও ১৯৬৬ সালে। এবারের রানার্স-আপ মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৩বার (সর্ব্বাধিক বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড)।

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা :

১৯৬৬ সালের বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিজয়ী হয়েছেন রাশিয়ার তিগ্রান পেট্রোসিয়ান। ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্বদেশের বোরিস স্পাস্কি। ১৯৬৩ সালে মিখাইল বোটভিন্নিককে পরাজিত করে পেট্রোসিয়ান সর্ব্বপ্রথম বিশ্ব খেতাব জয় করেছিলেন।

ওয়াইটম্যান কাপ :

আমেরিকা বনাম বৃটেনের দ্বৈত বার্ষিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় (১৯৬৬ আমেরিকা ৪-৩ খেলায় বৃটেনকে পরাজিত করে উপর্য্যুপরি ৬বার এবং প্রতিযোগিতার ইতিহাসে মোট ৩২বার ওয়াইটম্যান কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই দ্বৈত প্রতিযোগিতা ১৯২৩ সালে আরম্ভ হয়। বিশ্বযুদ্ধের দরুণ ৬ বছর (১৯৪০-৪৫) প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। বৃটেন ৬বার কাপ জয়ী হয়েছে।

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ :

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৫০০ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) সোবার্স ১৭৪, নার্স ১৩৭, হাণ্ট ৪৮ এবং কানহাই ৪৫ রান। হিগস ৯৪ রানে ৪ এবং স্নো ১৪৬ রানে ৩ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ২৪০ রান (ডি' ওলিভেরা ৮৮ এবং হিগস ৪৯ রান। সোবার্স ৪১ রানে ৫, হল ৪৭ রানে ৩ এবং গ্রিফিথ ৩৭ রানে ২ উইকেট)

ও ২০৫ রান (বারবার ৫৫ এবং মিলবার্ণ ৪২ রান। গিবস ৩৯ রানে ৬ এবং সোবার্স ৩৯ রানে ৩ উইকেট)

লিডসে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের চতুর্থ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এক ইনিংস ও ৫৫ রানে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে ৩০ খেলায় (ড্র ১) অগ্রগামী হয় এবং সেইসঙ্গে রাবার জয়ের পুরস্কার হিসাবে উপর্যুপরি দু'বার (১৯৬৩ ও ১৯৬৬) 'উইসডেন' ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করে। ১৯৬৩ সালে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম 'উইসডেন' ট্রফি জয়ী হয়েছিল। এই দুই দেশের মধ্যে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা ১৯২৮ সালের ২৩শে জুন লর্ড মাঠে আরম্ভ হলেও 'রাবার' জয়ের কোন পুরস্কার ছিল না। 'রাবার' জয়ের পুরস্কার 'উইসডেন' ট্রফির সূচনা মাত্র ১৯৬৩ সালে। প্রখ্যাত 'উইসডেন' ক্রিকেট বর্ষপঞ্জীর শততম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে এবং এই উপলক্ষে উক্ত বর্ষপঞ্জীর স্বত্বাধিকারী এই দুই দেশের প্রতি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে বিজয়ী দলকে 'উইসডেন' ট্রফি দ্বারা পুরস্কৃত করার আয়োজন করেছেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল চতুর্থ টেষ্ট খেলাতেও টসে জয়ী হয়। প্রথম ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল তিন উইকেটের বিনিময়ে ১৩৭ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনে দলের ৫০০ রানের [৯ উইকেটে] মাথায় অধিনায়ক সোবার্স প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষনা করেন। দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের রান ছিল ২৪৭ [৪ উইকেটে] এবং চা-পানের সময় ৩৯০ [৪ উইকেটে]। সোবার্স এবং নার্স পঞ্চম উইকেটের জুটিতে রেকর্ড সংখ্যক ২৬৫ রান তুলেছিলেন [পঞ্চম উইকেটের জুটিতে সর্ব্বাধিক রানের রেকর্ড]। সোবার্স [১৭৪ রান] এবং নার্স (১৩৭ র সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন। সরকারী টেষ্ট ক্রিকে সোবার্সের এই সপ্তদশ সেঞ্চুরী—ইংল্যাণ্ডের বি সপ্তম এবং বর্ত্তমান ১৯৬৬ সালের টেষ্ট সিরিজে সেঞ্চুরী। সোবার্স ২৪৩ মিনিটের খেলায় তাঁর ১৭৪ র ২৪টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। নার্সের ১৩৭ রানে ১৪টি বাউণ্ডারী এবং ওভার-বাউণ্ডারী ২।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড ব্যাট করার সামান্য হাতে পেয়ে কোন উইকেট না খুইয়ে ৪ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনে ২৪০ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্র ইনিংসের খেলা শেষ হলে তারা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ প্রথম ইনিংসের ৫০০ রানের (৯ উইকেটে ডিক্লেয়া থেকে ২৬০ রান কম সংগ্রহ করে ; ফলে 'ফলো-অন' ক তারা দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। এইদিন ইংল্য দ্বিতীয় ইনিংসের ১টা উইকেট খুইয়ে ৪০ রান সং করেছিল। তৃতীয় দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের ১১টা উই পড়ে যায়—প্রথম ইনিংসের ১০টা এবং দ্বিতীয় ইনিং ১টা।

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে বেসিল ডি'ওলিভেরা দ পক্ষে সর্ব্বাধিক ৮৮ রান করে ইংল্যাণ্ডের মুখ রেখেছিলে

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের এক ঘণ্টা পর ২০৫ রানের মা ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এ ইনিংস ও ৫৫ রানে জয় লাভের গৌরব লাভ করে। খে ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের দেড়দিন আগেই চতুর্থ টেষ্ট খেল জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যাণ্ড কাবু করেছিলেন সোবার্স (৩৯ রানে ৩ উইকেট) এ গিবস (৩৯ রানে ৬ উইকেট)।

চতুর্থ টেষ্টে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফি সোবার্সের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্র ইনিংসে ১৭৪ রান এবং ৮০ রানে ৮টা উইকেট প [৪১ রানে ৫ এবং ৩৯ রানে ৩ উইকেট]। প্রথম ইনিং সোবার্স তাঁর ১৭৪ রানের মধ্যে ৮৩ রান সংগ্রহ কর সরকারী টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর ৫০০০ রান পূর্ণ হ সোবার্সকে নিয়ে সরকারী টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ৯ খেলোয়াড় পাঁচ হাজার বা তার বেশী রান সংগ্রহ কর গৌরব লাভ করলেন।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ২৬।৮।৬৬ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চিত্র--রামকিঙ্কর সিংহ

সম্ভবামি যুগে যুগে

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ভাদ্র-১৩৭৩

প্রথম খণ্ড | চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

মাণ্ডুক্য উপনিষদে প্রজ্ঞার বিস্তার

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাণ্ডুক্য উপনিষদে প্রজ্ঞার বিস্তার বিষয়টি বুঝিতে হইলে প্রথমে শাস্ত্রকথিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ ও প্রজ্ঞার যথার্থ তাৎপর্য্য জানিতে হয়। এ সম্বন্ধে আমরা গীতার পথ অনুধাবন করিব ও নিজমনে যেমন বুঝিয়াছি তাহা জানাইব। তাহার পর মাণ্ডুক্য উপনিষদে প্রজ্ঞা যেমন বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার বিবরণ যথা সাধ্য দিব। তাহা হইলেই মানবসত্তায় প্রজ্ঞার বিস্তার স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হইবে।

কাহাকে প্রাজ্ঞ বলিয়া মনে করিতে পারি? গীতায় এ বিষয়ে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে। "প্রজহাতি যদা কামান সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্" (গীতা ২।৫৫)। যাঁহার সমস্ত মনোগত কামনা প্রাণে জন্মিয়াই মরিয়া যায় তাহাকে প্রাজ্ঞ বলা চলে। "প্রজহাতি" বাক্যের অর্থ আমরা বুঝিতে চাই। "প্র" অর্থে প্রাণে, জ অর্থে জন্মিয়া, হ অর্থে যাহ হত হয়। তবে ত প্রজহ বুঝিলে প্রজ্ঞ বুঝা যায়। ঞ কেন শেষে আসিল? চ, ছ, জ, ঝ ও ঞ এই পাঁচটি ব বায়ুসূচক। ঞ পঞ্চম বর্ণ, হাওয়ায় যাহার শেষ হয়, তাহা চরম গতি ঞতে। যে সমস্ত কামনা আমার অন্তে উঠিতেছে ও উঠিয়াই পড়িতেছে এবং হাওয়ায় নষ্ট হইতেছে ভূমি, জল, অগ্নি বা আকাশ অর্থাৎ দেহস্থ বাকি চার ভূতে

স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই বিলীন হইয়া যাইতেছে, তাহাদের সংবাদ আর ত পাওয়া যায় না, আমার জীবনে তাহারা বাসা বাঁধিতে পারে না। এইরূপ যদি সকল কামনা সম্বন্ধে হইতে থাকে, তাহা হইলে আমি প্রজ্ঞাধনে ধনী হইতে পারিব অর্থাৎ প্রাজ্ঞ হইব। আর সত্য কথা বলিতে কি, পঞ্চভূতের সঙ্গে আমার সংস্কারজাত কামনারাশি একত্রিত হইলে আমার সত্তায় যে বিকার জমিতে থাকে, তাহার ফলস্বরূপ কামনার প্রচণ্ড প্রভাব আমি কি করিয়া এড়াইতে পারি? তবে মনোজাত কামনা প্রাণে মরিয়া গেলে তাহা নিঃশেষ হইয়া যায় ও আমি তখন প্রাজ্ঞ হইবার পথের পথিক হই। (বলা বাহুল্য, মন ধরিতে চায় বলিয়া সংস্কারজাত কামনা সেখানেই প্রথম দেখা দেয় ও পরে ইন্দ্রিয়ে সংক্রামিত হয়। কিন্তু প্রাণের সাধন ধরা দেওয়া সে যদি ইন্দ্রিয়দের পক্ষ লয় এবং কোন মতেই ইন্দ্রিয়দের ধরা দিতে না দেয় তাহা হইলে ত "প্রজহাতি" আরম্ভ হইয়া যায়।)

প্রাজ্ঞ হইবার সাধন মার্গের কথাও গীতাতে পাই। যৎক্ষণাৎ অন্তরে কামনা উঠিল, কূর্ম্মের ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। অর্থাৎ কূর্ম্ম যেমন (গীতা ২।৫৮) স্বীয় অঙ্গগুলি ভিতরে সংহরণ করিয়া লয়, সেই মত ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। মনেতে যদি বিষয়ের ধ্যান হইতে থাকে তাহা হইলে সেখানেই বিষয়ের "সঙ্গ" উপজিবে ও অন্তরের "সম গ" (অর্থাৎ "সমতা গমন করিবে"। সমতা নষ্ট হইলে সেখানে কাম প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি ফলগুলি গীতায় স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে (গীতা ২।৩২-৩৩)। অতএব কূর্ম্মের ধর্ম্ম যদি কূর্ম্ম বাহির হইতে বিপদ আসিতেছে জানিলেই পালন করিতে পারে তবে মানুষ কেন আরও সহজেই তাহা অভ্যাস করিতে পারিবে না? একবার অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিলেই তাহার স্বভাবজাত বৈরাগ্য তাহাকে সাহায্য করিবে। তাহা ছাড়া মানুষের কূর্ম্মের মত "সংহরণ" কার্য্যে স্বয়ং শ্রীহরি বা মধুসূদন যখন বিপদভঞ্জন হইয়া কাছেই রহিয়াছেন, একবার হরিনাম করিলেই ত সব সংহরণ হইয়া যায়। তবে ত প্রজ্ঞা সাধনের প্রথম ধাপটি পাওয়া গেল। রামায়ণে "শত্রুঘ্ন" বলিতে যিনি ইন্দ্রিয়রূপী শত্রুকে সংহার করিতে পারিতেন তাঁহাকে বলা হইত। ইন্দ্রিয় যখন প্রভু না হইয়া ভৃত্য হয়, তখনই সে মানুষ শত্রুঘ্ন হইল বলা যায়।

এইবার প্রজ্ঞা সাধনের দ্বিতীয় ক্লাশে প্রমোশনের চেষ্টা করিতে হয়। যদি অন্তরকে "অনভিস্নেহ" (গীতা ২।৫৭) করা যায়, শুভ বা অশুভ যাহা লাভ হইয়াছে সমস্ত হইতে নিজ নিজ স্নেহ বা অনুরাগ দূরে রাখা যায় ও যাহা লাভ হইতে পারে তাহার প্রতিও কোন স্নেহ না থাকে, অর্থাৎ কোন কিছুতেই রুচি বা আসক্তি নাই, এই অবস্থাই প্রজ্ঞা-সাধনের দ্বিতীয় সোপান। ইহা রামায়ণে ভরতমহারাজ সাধন করিয়া সফলতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে ঐ ক্লাশের মণিটার বা প্রধান ছাত্র বলা যায়। রামের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া একেবারে স্বার্থবর্জ্জিত অবস্থায় যিনি রাজ কার্য্য করিতে পারেন তিনি যে কতখানি নমস্য তাহা স্বরাজের যুগে ভারতবাসী আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবেন। ইহাও যে সাধন করিতে হয় নিজের ও দেশের হিতের জন্য তাহা বলা বাহুল্য।

যখন শত্রুঘ্ন ও ভরতের সাধন আয়ত্ত হইয়া যায়, তখন লক্ষ্মণের সাথী হওয়া যায় অর্থাৎ রামের নিকটবর্ত্তী থাকিয়া জীবনযাপন সম্ভব হয়। তখন দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মন, সুখে বিগতস্পৃহ এবং ভয় ও ক্রোধহীন হইয়া মানুষ সব সময়েই "স্থিতধী" হইয়া যায় (গীতা ২।৫৬) ইহা মুনির অবস্থা অর্থাৎ এ অবস্থায় মানুষ সর্ব্বপ্রকারে মৌনী হইয়া যায়, আর তাহাকে কোন কামনা বাহির বা অন্তর হইতে পীড়ন করে না, এবং সারা সত্তা সুস্থ ও সবল হইয়া যায়। প্রজ্ঞাসাধনের তৃতীয় তীর্থে উপনীত হইলাম। কিন্তু এখানে থামিলে চলিবে না। প্রজ্ঞাসাধনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে হইবে, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র মানুষের অন্তর জুড়িয়া অপেক্ষায় রহিয়াছেন। ইহাই প্রজ্ঞা সাধনের শেষ সোপান যাহা শ্রীরামের পদানুসরণ করিয়া মানুষ পৌঁছাইতে পারে। ইহাই চতুর্থ বা চরম ধাম। তখন আত্মাকে লইয়া আত্মতুষ্ট, আত্মক্রীড় ও ক্রিয়াবান হইতে হয় (গীতা ২।৫৫ ও মুণ্ডক উপনিষদ ৩।১।৪)।

গীতার তত্ত্বকথা রামায়ণের রাম প্রভৃতি চারটি ভ্রাতার ধর্ম্ম অনুশীলন পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলাম

যেমন নিজ অন্তরে বুঝিয়াছি সরলভাবে জানাইলাম। প্রজ্ঞা সাধনের লক্ষ্য ত স্থির হইল। কিন্তু এক্ষণে প্রজ্ঞার স্বরূপ জানিলে কি মূলধন লইয়া আরম্ভ করিলে অন্তে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষদের আদর্শ মত প্রজ্ঞাবান্ অথবা প্রাজ্ঞ হওয়া স্বাভাবিক হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারি। এইবার সেই কথা বলিব।

মানুষের অন্তরে জ্ঞান কোন কোন প্রকারে সঞ্চিত হয় তাহা আমাদের ঠিক করিয়া জানা আছে কি? তাহার মধ্যে প্রজ্ঞার স্থান কোথায়? গীতা "তপস্যা"র কথা বলিতে গিয়া জানাইয়াছেন "দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনম্" (১৭।১৪) অর্থাৎ দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা করিলে জ্ঞান লাভের পথগুলি জীবনে খুলিয়া যায়। তবে ত জ্ঞান চার প্রকার এবং কাহার কাছ থেকে, কোন দিক হইতে তাহা পাওয়া যায় তাহার আভাস এখানেই দেওয়া হইল। আবার গীতায় আর একস্থানে জ্ঞানকে জলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে "জ্ঞাননির্ধূত: কল্মষ:" (৫।১৭) অর্থাৎ জ্ঞান সমস্ত কলুষ ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দেয় ও সেই সঙ্গে নিজেও ধুইয়া যায়। যেমন সাবান গোলা জল দিয়া কাপড় কাচিলে কাপড় পরিষ্কার হয় এবং সাবান গোলা জলও সেই সঙ্গে চলিয়া যায়। জ্ঞানের কাজ হইয়া গেলে জ্ঞান সেইরূপ আর থাকে না। প্রজ্ঞা সম্বন্ধেও পরিশেষে আমরা এই পরিচয়ই পাইব। এক্ষণে জ্ঞান ও জলের তুলনামূলক আলোচনা অনুধাবন করি। জ্ঞান যেমন চার প্রকার, জলও চার প্রকারে পাওয়া যায়! জল বৃষ্টির ধারায় নামিয়া আসে আকাশ হইতে, নদীর স্রোতে তাহা লব্ধ হয়, সরোবরে সঞ্চিত থাকিলে সেখান হইতে পাওয়া যায় এবং কূপ হইতেও জল নির্গত হয়। জ্ঞান চিদাকাশ হইতে পাইলে পর শাস্ত্র বলেন তাহা দেবতাদের দান। দেশের সংস্কৃতির ধারা হইতে প্রাপ্ত হইলে মনে করা হয় তাহা ব্রাহ্মণদের দান, যেখানে গুরু বা আচার্য্যগণ কর্তৃক সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার কাজে আসে তাহা সরোবরের একত্রিত জলের মত বিবেচিত হয়। পরিশেষে যেখানে বৃষ্টি নাই, নদী দূরে, সরোবর সম্ভব নহে, সেখানে মানুষ হৃদয়কূপ হইতে জ্ঞান পাইয়া ধন্য হয়। এই কূপ হইতে জ্ঞান পাওয়া গেলে তাহাকে প্রজ্ঞা বলা হয়। অতএব জ্ঞান পাইবার যে চারটি উপায়, দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের "পূজা" করিবার বিধি গীতায় দেওয়া হইল। শুধু তাহাই নহে। প্রজ্ঞা বা হৃদয়স্থিত কূপের জল বা জ্ঞান যে মানুষের সবচেয়ে কল্যাণতম অবলম্বন তাহারও ইঙ্গিত করা হইল। সন্ধ্যাবন্দনায় আচমনকালে তাই বলা হয়, কূপের জল সবচেয়ে মঙ্গলজনক। এই ভাবে যাঁহারা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করেন, মাণ্ডুক্য উপনিষদ তাঁহাদের জন্য বিরচিত। মাণ্ডুক্য জানান, ইহা মানব জীবনে সর্ব্ব ও জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি স্থানে পাওয়া যায় ও অন্তে তুরীয় স্থানে ইহার আর প্রয়োজন হয় না। দেবতা অর্জ্জিত জ্ঞান যে সাধকদের চিদ্‌শক্তি তাঁহাদের কাছে চিদাকাশের সংবাদ আনিয়া দিয়াছে, তাঁহারাই পান। ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ তখনই পাওয়া যায়, যখন প্রকৃত ব্রাহ্মণের সন্ধান মিলে। গুরুকৃপাও সহজলভ্য নহে, আবার সহজেও পাওয়া যায়। কিন্তু প্রজ্ঞা এমনই সামগ্রী যাহা প্রত্যেক মানুষ জন্ম অধিকার সূত্রে বিধাতার নিকট হইতে পাইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মানুষকে তিনি একটি প্রতিভা দিয়াছেন যাহা দ্বারা সে শুধু জীবিকা অর্জ্জন করে না, তাহা হইতে আনন্দ ও পরে অমৃত পর্য্যন্ত পাইতে পারে। প্রজ্ঞা প্রতিভার মতই স্বতঃস্ফূর্ত্ত সামগ্রী। যতই ইহা ব্যবহার করিবে ততই ইহা বাড়িবে ও সাহায্যকারী হইবে ও অন্তে তোমায়, আমায়, সবাইকে প্রজ্ঞাবান করিবে যেমন রামায়ণের আদর্শ লইয়া পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে আত্মার চারটি পাদে (জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়) প্রজ্ঞার কথা নানাপ্রকারে পাওয়া যায়। প্রথম জাগ্রত স্থানের কথা। যেমন কূপের জল পাইলেই মানুষ সর্ব্বপ্রথম স্নান করে, পরে পান করে, তারপর ক্রমশঃ সব কাজে লাগায়, সেইমত প্রজ্ঞা লাভ হইলে, "বহিঃপ্রজ্ঞ" হইবার সাধ যায় সর্ব্বপ্রথমে। জাগ্রত অবস্থায় বহির্জ্জগতের সব কিছু প্রজ্ঞা দ্বারা জানিতে ইচ্ছা হয়। অতএব বহিঃপ্রজ্ঞ অবস্থা জাগ্রত স্থানের উপায় স্বরূপ। যতই ইহা কাজে লাগিবে, বহির্জ্জগতের সংক্রামক কামনাগুলি আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। জাগ্রত স্থান কামনার স্থান, তাই কামনা হইতে ক্রমমুক্তি প্রজ্ঞার সামান্য দান নহে।

ইহার পর স্বপ্নের কথা আসে। স্বপ্নের স্থানে "অন্তঃ-

প্রজ্ঞ" হইলে মানুষ প্রজ্ঞার দ্বারা অন্তরের সব কিছু বুঝিয়া লয় ও সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সমস্তই অন্তঃপ্রজ্ঞার কার্য্য। তারপর নিদ্রা-কালেও যে প্রজ্ঞার কাজ চলে তাহা নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেও বুঝা যায়। স্বপ্ন ত জাগিয়া ও নিদ্রা গিয়া উভয়-বিধ অবস্থায় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এমন নিদ্রা যদি হয়, যখন আধজাগা ঘুমঘোরে মানুষ প্রজ্ঞার কাজ চালায়, তখন মানুষ "উভয়প্রজ্ঞ" হয় অর্থাৎ জাগ্রত ও স্বপ্ন উভয় স্থানই জানিতে থাকে। আবার যখন সে তামসিক নিদ্রায় অভিভূত তখন একেবারে 'অপ্রজ্ঞ' হয়। পরিশেষে যখন সুষুপ্তির মধ্যে থাকে, যখন জাগ্রত স্থানের মত কামনা থাকে না, আবার স্বপ্নও দেখে না তখনও প্রজ্ঞা তাহাকে ভিতরে বাহিরে একভাবে ঘিরিয়া থাকে, যেমন যদি চাদর দ্বারা দেহ মন মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকা হয়। ইহাকে বলা হয়, একীভূত প্রজ্ঞানঘন অবস্থা। অর্থাৎ প্রজ্ঞা তখন একত্র হইয়া, ঘনরূপ ধারণ করিয়া মানুষের সত্তাকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, যেন কুয়াসার মত। সূর্য্য উঠিলেই যেমন কুয়াসা সরিয়া যায়, সেইমত সুষুপ্তির পর তুরীয় উদয় হইলেই প্রজ্ঞার কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়া তাহা কোথায় যেন পলাইয়া যায়। তুরীয়তে তাই কোন প্রকার প্রজ্ঞা থাকে না, প্রজ্ঞার কাজও থাকে না। তখন প্রজ্ঞা কোথায় পলাইয়া যা'ন? বেদ বলেন, প্রজ্ঞা আত্মারই রূপ, তবে ত তাহা আত্মাতেই গিয়া মিশিয়া যায়। যতদিন ইহা সম্ভব ছিল না, তখন আত্মার আলোক দিয়া অর্থাৎ প্রজ্ঞা দ্বারাই আত্মার অনুসন্ধান করিতে হয়। আত্মা দিয়াই আত্মাকে পাওয়া যায়।

এখানে প্রজ্ঞাকে আবার আলোক কেন বলিলাম? জলের মধ্যে যেমন জলও আছে, আবার বিদ্যুৎও আছে, সেই মত প্রজ্ঞার মধ্যে রস বা ভক্তি আছে যাহা সুষুপ্তি পর্য্যন্ত জীবকে বাঁচাইয়া রাখে ও শেষে বিদ্যুৎ হইয়াও ধরা পড়ে যাহা তুরীয় স্থানকে দূর হইতে দেখাইয়া দিয়া, আত্মার মধ্যে আত্মদান করিয়া, শেষ খেলা দেখাইয়া যায়।

আরও একটু বলিতে ইচ্ছা করে যে সুষুপ্তি হইতে জাগিলে পর প্রজ্ঞার পূর্ণ বিকাশ মানবসত্তায় নিষ্পন্ন হয়। মানুষ তখন "চেতোমুখ প্রাজ্ঞ" হইয়া পড়ে। চিত্ত তাহার প্রধান অবলম্বন হয়, তাই "চেতোমুখ" বলা হইয়াছে। মন ও চিত্তের পার্থক্য বুঝিতে হয়। মন চলনশীল [dynamic], অন্তঃকরণ চিত্ত স্থির [static]। চিত্ত অস্থির হইলে তাহা রূপান্তরিত হইয়া মন হইয়া দেখা দেয়। আবার মন স্থির হইলে তাহা আর মন থাকে না, চিত্ত হইয়া যায়। মন দ্বারা কর্ম্ম ও ভক্তি সাধন চলে। কিন্তু চিত্ত না হইলে যোগ বা জ্ঞান সম্ভব নহে। গীতাতেও ইহার আভাস পাই [৬.১০, ১২.৯] এ সম্বন্ধে গভীরভাবে এখানে আলোচনা সম্ভব নহে। তবে সুষুপ্তিতে মন নাশ হইয়া যায় ও চিত্তের নবকলেবরের দর্শন পাওয়া যায়। তখন চিত্ত আবার দুমুখো হইতে পারে। ইহা যদি তুরীয় স্থান অভি-মুখে জয়যুক্ত হয় তাহা হইলে যোগের পথ ধরিল বলা যায়। আর যদি সুষুপ্তি হইতে আবার জাগ্রত ও সূক্ষ্ম স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া মনের কাজ পালন করিতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন সে মানুষকে "প্রাজ্ঞ" বলা হয়।

সাধারণ মানুষ জীবত্বের অবস্থায়, সুষুপ্তি পর্য্যন্ত পাইয়া, পূর্ণতা অর্জন করিলে পর প্রাজ্ঞ হয় ইহাই মাণ্ডুক্যের নির্দ্দেশ বাণী। আবার আমরা জানি যে সকল অবতারদের জন্মকর্ম্ম "দিব্য" বলা হয় [গীতা, ৪।৯] তাঁহারা তুরীয় হইতে সুষুপ্তি পর্য্যন্ত নামিয়া সেখানেই অবস্থান পূর্ব্বক জাগ্রত ও স্বপ্নে অবস্থিত জীবদের পরিচালিত করেন ও তাঁহাদেরও সে অবস্থায় "প্রাজ্ঞ" বলা হয়। আমরা যেমন শ্রীরামকে "প্রাজ্ঞ" বলিয়াছি ও যুধিষ্ঠির যেমন মহাভারতের সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে প্রাজ্ঞ নামে সম্বোধন করিয়াছেন। অতএব দুইপ্রকার প্রাজ্ঞ স্বভাবের সম্ভাবনা সুষুপ্তিতে পাই, এক প্রজ্ঞা জন্মগত ও দ্বিতীয়তঃ আর একপ্রকার প্রজ্ঞা যাহা সাধারণ মানুষের সুষুপ্তিতে অর্জ্জিত। মাণ্ডুক্য কিন্তু এই প্রকার বাচবিচারের পক্ষপাতী নহেন। তাঁর মতে সাধারণ মানুষও যখন তুরীয় স্থানে পৌঁছাইয়া অদ্বৈত জ্ঞানে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন. তখন এই প্রকার গণ্ডীর দ্বারা অবতারদের পৃথক করা কেন? আমরা এর বেশী ইহার আলোচনা করিতে অক্ষম। শুধু প্রজ্ঞা সম্বন্ধে সবদিক হইতে আলোচনার সম্ভাবনা দেখাইলাম।

প্রজ্ঞার খেলা বড় বিচিত্র। যত জানিতে পারা যায়, ততই জানিতে ইচ্ছা করে। এ যেন "আগুনের পরশমণি" যাহার পরশ মানুষের সবখানে লাগিতেছে ও তাহার সত্তাকে উত্তরোত্তর উচ্চস্থানে লইয়া যাইতেছে যিনি মাণ্ডুক্য বুঝি-বেন, তিনি ধরিবেন ও আমাকে কৃতার্থ করিবেন।

তবু প্রজ্ঞা সম্বন্ধে বুঝিবার জন্য নিম্নে তাহার নিরূপণ নির্দ্দেশের ইঙ্গিত দিলাম :—

১। জাগ্রত স্থান—প্রজ্ঞ (বহিঃপ্রজ্ঞ)

২। নিদ্রা (তামসিক)—অপ্রজ্ঞ

৩। নিদ্রা (রাজসিক) স্বপ্ন স্থান—প্রজ্ঞ (অন্তঃপ্রজ্ঞ)

৪। নিদ্রা ও জাগরণ এক সাথে, যাহাকে বলা হয় আধজাগা ঘুমঘোর, ইহাকে সাত্ত্বিক নিদ্রাও বলা যায়—উভয়তঃ প্রজ্ঞ।

৫। নিদ্রা (ত্রিগুণাতীত), ইহা জাগ্রত অবস্থায়, যোগী জীবনে সম্ভব—সুষুপ্তি নামে অভিহিত হয়—একীভূত প্রজ্ঞানঘন।

৬। সুষুপ্তি হইতে ব্যুত্থান হইলে পর—চেতোমুখ প্রাজ্ঞ।

৭। তুরীয় স্থান—ন অন্তঃপ্রজ্ঞম্, ন বহিঃপ্রজ্ঞম্, ন উভয়তঃপ্রজ্ঞম্, ন একীভূত। প্রজ্ঞানঘনম্, ন প্রজ্ঞম্, ন অপ্রজ্ঞম্।

তুরীয় স্থানে প্রজ্ঞা আত্মায় লীন হইয়া যায়। তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। তাই প্রজ্ঞাকে আত্মা বলিয়া নমস্য জানি ও প্রসঙ্গ শেষ করি। যাহা দেবতা পূজা, শাস্ত্রপাঠ, অথবা ব্রাহ্মণ বা গুরুর নিকট অবগত হই তাহাও স্বীয় প্রজ্ঞার দ্বারা অনুমোদিত না হইলে জ্ঞানে দাঁড়ায় না। অতএব প্রজ্ঞাই মুখ্যতঃ আত্মজ্ঞান।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ (১)

দ্যো অর্থেতে স্বর্গ এবং ভূ-তে পৃথিবীই হয়
স্বর্গ পৃথিবীর দুয়েরই জেনো ব্রহ্মই আশ্রয়
স্ব-শব্দের প্রয়োগ হয়
এই অর্থ-ই রয়

মুণ্ডক উপনিষদে আছে—

যস্মিন দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
তমেবৈকং জানায় আত্মানং
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্য এষ সেতুঃ

অনুবাদ— যাহার মধ্যে স্বর্গ পৃথিবী আকাশ জানিও রয়
সকল প্রাণের সহিত জানিও মন যার আশ্রয়
তাহাকেই জ্ঞান বরে।
অন্য কথা সে ছাড়ে।
সেই জন জেন অমৃতের সেতু অমৃতময় সে জন
সব ছেড়ে দিয়ে কর তাঁর পূজা তাহাতে মগন রন

সেতুর আবার পারাপার আছে ব্রহ্মের তাহা নাই
তাবলে ভেবনা প্রকৃতি বা বায়ু ব্রহ্মের কথা নাই
প্রকৃতি বা বায়ু যাহা
আশ্রিত হয় তাহা
পৃথিবী এবং স্বরগের মাঝে আশ্রিত এরা হয়
কিন্তু ইহারা আত্মা বলিয়া উল্লেখ নাহি হয়।
এখানেতে সেতু অর্থ হইল ধারণ করেছে যাহা
পারাপার তরে সেতু নহে জেন বলা
হইয়াছে তাহা।

মুক্তোপসৃপ্য ব্যপদেশাৎ (২)

মুক্ত পুরুষ হইতে প্রাপ্য বা উপসৃপ্য যাহা
ব্যপদেশ এই কথাটির দ্বারা উল্লেখ হল তাহা
মুণ্ডক উপনিষদেতে
আছে যে পরের শ্লোকে

ভিদ্যন্তে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়ঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।

অনুবাদ—সবচেয়ে যেই উৎকৃষ্ট হয় সেইজন শ্রেয়তম
তাহারে হেরিলে বন্ধনহীন হৃদয় গ্রন্থি সব

নাহি থাকে সংশয়
হয় কর্ম্মের ক্ষয়
যাহারে পাইলে বাকি আর কিছু নাহি থাকে কোনখানে
সবার অধিক সবচেয়ে শ্রেয় তাহারে যেজন জানে।

পুনশ্চ বলা হইয়াছে—

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষ মুপৈতি দিব্যম

জ্ঞানী সুধী যত জন
এভাবে মুক্ত হন
নাম আর রূপ হতে বিমুক্ত যখন তাঁহারে পায়
দিব্য সেই যে পরম পুরুষ তাঁহারে যখন চায়।
উপনিষদেতে প্রসিদ্ধ জেন মুনি ঋষি বলিয়াছে
মুক্তি লভিলে জীবগণ সবে ব্রহ্মেরে লভিয়াছে।

নানুমানম অতচ্ছব্দাৎ (৩)

সাংখ্য দর্শনোক্ত প্রধান এখানেতে জেন নয়
অতচ্ছব্দাৎ (প্রধান বাচক শব্দ এখানে নয়)
অনুমান ইহা নয়
অচেতন কথা নয়
বলেছেন শ্রুতি যাঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ যে জন
তাঁহার কথাই হয় বর্ণনা চেতন তিনিই হন।

প্রাণভৃচ্চ (৪)

জীব অর্থাৎ প্রাণভৃৎ কথা বলা হেথা নাহি হয়
সেরূপ শব্দ প্রয়োগ হেথায় কখনই নাহি হয়

ভেদব্যপদেশাৎ (৫)

এই প্রসঙ্গে বলেছেন শ্রুতি শোন তবে কথা এই
তমেব একং জানথ আত্মানং বিশদ করিয়া কই
জ্ঞাতা সেই জীব হন
জ্ঞেয় সে ব্রহ্ম হন
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র প্রভেদ এখানে উল্লেখ করি কয়
তাতে বুঝা যায় জীবের কথা না ব্রহ্মেরি কথা হয়।

প্রকরণাৎ (৬)

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বেতে জেন আছে
কাহারে জানিলে সব জানা যায় জানিবারে সেই যাচে
"কস্মিন নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"
এই প্রকরণে স্থির বুঝা যায়
ব্রহ্মেরি কথা এখানে বুঝায়
ব্রহ্মে জানিলে সব জানা যায় জীবকে জানিলে নয়
জ্ঞাত হইবার এই প্রকরণ সহজে বুঝায়ে কয়।

স্থিত্যদনাভ্যাং চ (৭)

এই শ্রুতি বাক্যের পরে আছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়ৌ সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি অনশ্নন্নন্যঃ অভিচাকশীতি।

দেহরূপ এই বৃক্ষের মাঝে দুটি পাখী বাস করে
একটি পক্ষী খায় শুধু ফল অন্যে দরশ করে
জীব সে কর্ম ফল ভোগ করে
ব্রহ্ম চাহিয়া দেখে যে অপরে
জীবের কর্ম্মে সাক্ষী ব্রহ্ম দেখে শুধু চেয়ে রয়
কর্ম্মের ফলভোগ করে জীব ব্রহ্মের তাহা নয়।
কর্ম্মের ফলভোগ করে যেই ব্রহ্ম সে কভু নয়
সাক্ষী হইয়া জেন এইখানে অমৃত সেতুই রয়।

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

নীলকান্ত বললেন, 'নাম না হয় জানলেন কিন্তু ঠিকানা ?'

আগের সুরে দীপেন বলল, 'এই বোম্বাই সহরে প্রতি দশজনের একজন আপনার ঠিকানা জানে। কাজেই ওটা যোগাড় করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।'

একটু চুপ করে থেকে অন্যমনস্কের মত নীলকান্ত বললেন, 'তা না হয় হল। এখন বলুন আমার কাছে কি দরকারে এসেছেন।'

সরাসরি প্রয়োজনের কথাটা পেড়ে বসা বোধহয় শোভন নয়; বুদ্ধিমানের কাজও না। তার আগে কিছু ভূমিকা এবং ভণিতা করে নেওয়া ভাল। খানিক ইতস্তত করে দীপেন বলল, 'দরকারটা তেমন কিছু নয়; আপনাকে দেখাটাই আসল। বলতে পারেন আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে এসেছি।'

'কিন্তু—'

'বলুন—'

মৃদু হাসলেন নীলকান্ত, 'আমার কাছে কি জানবেন ?'

একটু চিন্তা করে দীপেন বলল, 'কেন দেশ আর রাজনীতির বর্তমান অবস্থা। আপনার রক্তমাংসের সঙ্গে ওই দুটো জিনিস তো একাকার হয়ে আছে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন নীলকান্ত 'উঁহু-উঁহু-উঁহু—'

'কী ?'

নীলকান্ত সংশোধন করে দিলেন, 'আছে নয়, ছিল। দেশ কিম্বা রাজনীতির সঙ্গে এখন আমার কোন সম্পর্ক নেই। বছর চারেক আগেই ওসবের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।'

দীপেনের ইচ্ছা ছিল নানা কথার ফাঁদ পেতে কৌশলে এক সময় নীলা চৌধুরীর প্রসঙ্গ টেনে আনবে। কিন্তু দেশ এবং রাজনীতি নিয়ে আলাপের যে সূচনা সে করতে চেয়েছিল, প্রথমেই তা নাকচ করে দিলেন নীলকান্ত।

দীপেন চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'ও কথা না হয় থাক। আপনার জীবনের কথা শুনতে ভারি লোভ হচ্ছে।'

এবার সরাসরি তীক্ষ্ণ চোখে দীপেনের দিকে তাকালেন নীলকান্ত। বললেন,'পরিষ্কার করে একটা কথা বলুন তো।'

দীপেন হকচকিয়ে গেল, 'কী কথা ?'

'আমার কাছে আসার আসল উদ্দেশ্যটা কী আপনার ?'

'ঐ যে বললাম, আপনাকে দেখা। আপনার মুখে কিছু শোনা।'

টেবিলের ওপর একটা ঝিনুকের এ্যাশট্রে রয়েছে। সেটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেন নীলকান্ত। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি খবরের কাগজে কাজ করেন ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে ?'

'মার্চেন্ট অফিসে চাকরি—'

দীপেনের উত্তর শেষ হতে না হতেই নীলকান্ত আবার প্রশ্ন করলেন, 'এই কাগজগুলো আপনি পড়েন ?'

'কোন কাগজ ?'

'স্পার্ক', লাইটিং, উইকলি থাণ্ডার—'

দীপেন আরেকটু হলে বলেই ফেলত, ঐ পত্রিকাগুলো শুধু ছাখেই নি নীলকান্ত সংক্রান্ত মশলাদার ঝাঁঝালো খবরগুলো সাগ্রহে গোগ্রাসে গিলেছে। পরিণাম চিন্তা করে সে সামলে গেল। একটু থতিয়ে থেকে বলল, দেখা দূরে থাক, ওগুলোর নামও আমি শুনিনি।'

দীপেনের কথাগুলো পুরোপুরি বোধ হয় বিশ্বাস করলেন না নীলকান্ত। ধারাল চোখে কিছুক্ষণ ত'কে শব-ব্যবচ্ছেদ করে বললেন, 'শোনেনও নি ?'

'আজ্ঞে না।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।'

'কী ব্যাপার ?'

'আমার সম্বন্ধে আপনি কতটুকু জানেন, জানি না।' নীলকান্ত বলতে লাগলেন, 'এমন এক দিন ছিল যখন এ বাড়িতে দিবারাত্রি মেলা লেগে থাকত। ছোট-বড়-মাঝারি নেতা, অর্থী-প্রার্থী-অনুগ্রহ-লোভী কত ধরনের লোক যে আসত তার ইয়ত্তা নেই। আমার একটু সঙ্গ পেলে, দুটো কথা শুনলে লোকে কৃতার্থ হয়ে যেত। কিন্তু এসব পাঁচ বছর আগের কথা।' বলে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

দীপেন কিছু বল না ; নিষ্পলকে তাকিয়ে রইল।

নীলকান্ত আবার শুরু করলেন, 'কিন্তু এ বাড়ির ঠিকানা ইদানীং সবাই ভুলে গেছে। ভুলেও কেউ আজ-কাল ঘোড়া্ন্দর রোডে আসে না। মহাভারতে পাণ্ডবদের কাহিনী পড়েছেন তো ?"

'পড়েছি।' দীপেন মাথা নাড়ল।

'পাণ্ডবদের মত আমিও এবাড়িতে একরকম অজ্ঞাত-বাস করছি।' বলতে বলতে মাথা নাড়লেন নীলকান্ত 'উঁহু, কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না। আমার মনে হয়, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে নির্বাসিত হয়ে আছি। আমার আত্মীয় নেই বন্ধু নেই স্বজন নেই। স্বপাকে খাই নিজের হাতে ঘরদোর পরিষ্কার করি। একটা ঝি-চাকর পর্যন্ত আমার নেই। সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে। তাই ভাবছি হঠাৎ আমার মত লোকের কাছে আপনি আসতে গেলেন কেন ?'

দীপেন প্রশ্নটার উত্তর দিল না। নীলকান্তর কথার সূত্র ধরে জিজ্ঞেস করল, 'সবাই আপনাকে ত্যাগ করেছে কেন ?'

নীলকান্ত বিচিত্র হাসলেন। হাত উল্টে বললেন, 'জবাবটা খুবই সহজ। এখন আমি নির্বাপিত তারকা। রঙ্গমঞ্চের সামনের দিকে যে ঝলমলে আসর সাজানো আছে সেখান থেকে নেপথ্যের অন্ধকারে আমাকে সরে যেতে হয়েছে। আমার হাতে ক্ষমতা নেই, প্রতিপত্তি নেই, কাউকে দেবার মত কিছুই নেই। লোক আসবে কেন ? কিসের আশায় ?'

দীপেন কি বলবে, ভেবে পেল না।

নীলকান্ত আবার বললেন, 'তবেই ভেবে দেখুন, আমার কাছে এই যে আপনি এসেছেন সেটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কি ?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল দীপেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনার কাছে কিছু পাবার লোভে আমি কিন্তু আসিনি। অর্থী-প্রার্থী-অনুগ্রহলোভী, যারা একদিন সর্বক্ষণ আপনাকে ঘিরে থাকত আমি সে দলের নই। স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনার যে ভূমিকা ছিল, এ দেশের লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরদিন তা মনে রাখবে। বছরের পর বছর জেল খেটেছেন, অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেছেন। সে সব কাহিনী পড়তে পড়তে আমরা অভিভূত হয়েছি। স্বাধীনতা লাভের পর অনেক নেতার পরিবর্তন হয়েছে। কেউ কেউ সুখের, আরামের-ভোগের পথ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু ব্যতিক্রম যাঁরা আছেন, জাতি-গঠনের কাজকে ব্রত বলে ধরে নিয়েছেন, কোন অন্যায় যাঁরা প্রশ্রয় দ্যান না আপনি তাঁদেরই একজন। নিছক একজন নন, প্রায় অগ্রগণ্য বলা যেতে পারে। চিরদিন দেশকে সবার আগে আপনি স্থান দিয়েছেন।'

একটু থামল দীপেন। নীলকান্ত ঘোষী সম্পর্কে

বিশেষ কিছুই সে জানে না। সেই চমক দেওয়া, তুফান-তোলা কাগজগুলো মারফত সামান্য যেটুকু জেনেছে তার ওপর যতদূর সম্ভব উদ্দামবেগে কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়েছে। দীপেন খুবই আত্ম-সচেতন। নিজে যে সে চালাক, চতুর, স্মার্ট—এ ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন যে বাক-পটীয়স তা জানা ছিল না। নিজের ওপর তার শ্রদ্ধা অনেকগুণ বেড়ে গেল।

যাই হোক কিছুক্ষণ পর আবার সে শুরু করল, 'কিন্তু হঠাৎ একদিন আমরা লক্ষ্য করলাম আপনার নামটা যেন মুছে গেছে। আপনার কাছে দেশের মানুষের অসীম প্রত্যাশা। জাতি আপনার কাছে অনেক কিছু পেতে পারে। কিন্তু—'

'কী?' নীলকান্ত কি ভাবছিলেন; দূরমনস্কের মত প্রশ্ন করলেন।

'আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, নিজেকে আপনি গুটিয়ে নিলেন কেন? কেন নিজেকে দেশের চলমান ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন? বলতে পারেন, দেশের একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছি।'

দীপেনের কথাগুলো সম্ভবত নীলকান্তর মনে বিপুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মুখের শিথিল চামড়ায় অস্থির ঢেউ খেলতে লাগল। কিছুক্ষণের জন্য তিনি বোধ-হয় বিচলিত হয়ে পড়লেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'সে কৈফিয়ৎ অবশ্য আপনি দাবী করতে পারেন। তবে—' বক্তব্য অসম্পূর্ণ রেখে তিনি থেমে গেলেন।

'তবে কী?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন না নীলকান্ত। গভীরে নিহিত কোন যন্ত্রণায় তাঁর চোখ এবং ঠোঁটের প্রান্ত কুঁচকে যেতে লাগল। চাপা তীব্রস্বরে তিনি বললেন, 'ক্যারেক্টার এ্যাসএ্যাসিনেশন বলে একটা কথা ইদানীং চালু হয়েছে। তার অর্থ জানেন?'

'আজ্ঞে না।'

'তার অর্থ হল ব্যক্তিত্ব হনন।'

দীপেন বুঝতে পারল না; চোখেমুখে বিমূঢ়তা ফুটিয়ে সে তাকিয়ে রইল!

কিছুক্ষণের জন্য নীলকান্ত বোধহয় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। এবার যেন সচেতন হলেন। বিষণ্ণ শ্লথ স্বরে বললেন, 'থাক ওসব কথা।'

দীপেন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না-না আপনি বলুন।'

নীলকান্ত ধোণী মাথা নাড়লেন, 'শুনে বা বলে কিছু লাভ নেই। অনেক রাত হয়ে গেল; আজ বরং ওঠা যাক। আপনাকেও যেতে হবে অনেকদূর; আমারও রান্নাবান্না সাধতে হবে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন।

নীলকান্তর বলার মধ্যে অস্পষ্টতা নেই। প্রসঙ্গটার ওপর তিনি ইতি টেনে দিয়েছেন। অগত্যা দীপেনকেও উঠে দাঁড়াতে হল।

নীলকান্ত একটু বিব্রতভাবে বললেন, 'তাই তো, এতক্ষণ বসলেন। আপনাকে একটু চা-ও খাওয়াতে পারলাম না।'

দীপেন বলল, 'সে জন্যে আপনাকে কুণ্ঠিত হতে হবে না। আপনি একা মানুষ; তাড়াহুড়ো করে চা করতে গেলে আমি খুব লজ্জা পেতাম।'

কথা বলতে বলতে বাইরের বারান্দায় চলে এসেছিল দুজনে। নীলকান্ত বিদায় সম্ভাষণ জানালেন, 'আচ্ছা নমস্কার।'

দীপেন প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব।'

'কী?'

'মাঝে মাঝে আপনার কাছে আমি আসতে চাই।'

থেমে থেমে নীলকান্ত বললেন, 'আমার কাছে আসবেন?'

'হ্যাঁ, যদি আপনি অনুমতি করেন—'

'বেশ, আসবেন।'

এরপর প্রায় প্রতিদিনই ঘোড়বন্দর রোডের এই বাড়িটিতে হানা দিতে লাগল দীপেন। প্রথম প্রথম পুরোপুরি নিজেকে মেলে ধরেন নি নীলকান্ত। দীপেনের এই আসাটা তাঁর চোখে কিছুটা সংশয়জনক মনে হয়েছিল। পরে অবশ্য সন্দেহ কেটে গেছে।

তা ছাড়া এই বাড়িতে দিবারাত্রি একাই থাকেন নীলকান্ত। অসীম একাকিত্বের মধ্যে কথা বলার একটা সঙ্গী পর্যন্ত তাঁর নেই। ধীরে ধীরে দীপেনকে ভালই লাগতে লাগল তাঁর। এতদিন মৌনতার সাধনাই যেন করছিলে

নীলকান্ত। একটি কথা বলার লোক পেয়ে তিনি যেন বেঁচে উঠতে লাগলেন।

দীপেন আসে, নানা কথা বলে। এমন কি তাঁর রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য পর্যন্ত করে। প্রথম প্রথম কুণ্ঠিত হতেন নীলকান্ত। বলতেন, 'না-না, এ সব আপনাকে করতে হবে না।'

দীপেন বলত, 'আপনার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। আপনি শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান মানুষ; চোখের সামনে বসে কাজ করে যাবেন আর আমি বসে বসে দেখব, তা হয় না। তা ছাড়া আমাদের জন্যে আপনি যা করেছেন সেদিক থেকে দেখলেও অনেক সেবা আপনার প্রাপ্য। সে তুলনায় আমি যা করছি তা প্রায় কিছুই নয়।'

অতএব ধীরে ধীরে সঙ্কোচ কেটে গেছে। চতুর, তোষামোদ-পটু দীপেনের সেবায় কবে যে নীলকান্ত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, নিজেরই খেয়াল নেই।

দীপেন প্রতিদিন যাতায়াত করত; নানা বিষয়ে কথা বলত। শুধু একটি প্রসঙ্গ সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখত। অথচ সেটাই ছিল আসল প্রসঙ্গ। চতুর শিকারীর মত লক্ষ্য স্থির রেখে নিঃশব্দসঞ্চারে সেদিকেই সে এগুচ্ছিল।

কথায় কথায় একদিন সে বলল, 'আমার একটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আজও পাই নি।'

'কী প্রশ্ন বল তো?' নীলকান্ত যোশী জিজ্ঞেস করলেন। ইতিমধ্যেই দীপেনকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছেন তিনি। অবশ্য নিজে বলতে চাননি। দীপেনই জেদ ধরে পীড়াপীড়ি করে সম্বোধনটায় ঘনিষ্ঠতার রঙ ধরিয়ে ছেড়েছিল।

'একদিন 'ক্যারেক্টার এ্যাসএ্যাসিনেশন' বলে একটা কথা বলেছিলেন, মনে আছে?'

'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তা কি হয়েছে?'

'তার অর্থ বলেছিলেন 'ব্যক্তিত্ব হনন'। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কেন রাজনীতি থেকে, দেশের চলমান অবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন সে কথা বলতে ঐ শব্দ দুটো শুনিয়েছিলেন। ক্যারেক্টার এ্যাসএ্যাসিনেশনের সঙ্গে আপনার কিছু সম্পর্ক আছে কি?'

'আছে।' বলেই অসহিষ্ণুভাবে উঠে পড়লেন নীলকান্ত। ঘরময় নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে অনেকক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন 'আমি ঐ শব্দ দুটোর অসহায় শিকার।'

দীপেন চুপ করে রইল।

নীলকান্ত আবার পেছন দিকে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে পদচারণা শুরু করলেন। করতে করতে বললেন, 'স্যামসনের কাহিনী জানো?'

'কোন স্যামসন?'

'সেই যে, যার চুল কেটে নিলে সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যেত।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।'

নীলকান্ত যোশী বলতে লাগলেন, 'মানুষের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র—এ-সবই তার শক্তি। এগুলো যদি কেউ ধ্বংস করে দিতে পারে তবে তার শক্তির উৎসটাই যায় নষ্ট হয়ে। ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র করে আমাকেও এইভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।'

দীপেন বলল, 'আপনার সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ অপরিসীম। আপনি লোকচক্ষু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, এটুকুই শুধু জানি। এ ছাড়া—'

তার কথা শেষ হবার আগেই নীলকান্ত বলে উঠলেন, 'স্বেচ্ছায় আমি নিজেকে সরিয়ে নিইনি। জোর করে আমাকে সরানো হয়েছে। বলতে পারো, আমাকে হত্যা করা হয়েছে; নিষ্ঠুরভাবে, নৃশংসভাবে। তোমরা দেখছ, আমি বেঁচে আছি কিন্তু আমি জানি, আমার মৃত্যু ঘটে গেছে। আমার বুদ্ধি নেই, গতি নেই, বেঁচে থাকার কোন লক্ষণই নেই। কিভাবে এ অবস্থা হল, জানতে চাও।'

দীপেনের মনে হল, দীর্ঘদেহ এই জননায়কের প্রাণে অনেক বিক্ষোভ, অনেক যন্ত্রণা এবং অভিযোগ জমা হয়ে আছে। সে-সব কারো কাছে বলে তিনি হয়ত ঈষৎ হাল্কা হতে চান। দীপেন বলল, 'নিশ্চয়ই শুনব।'

'বেশ, শোন।'

[ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণবপদাবলী

পম্পা ঘোষ

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লেখা এক পত্রে (১৩২৮ কার্তিক ১৪) রবীন্দ্রনাথ আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন—

"বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেনে এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই মিশিয়াছে।"

—'বিশ্বভারতী পত্রিকা', ১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৮৮০ শক

উপনিষদের প্রতি আকর্ষণকে তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকার বলা চলে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী একান্তভাবেই তাঁর নিজের আবিষ্কার। কিশোর কবির সহজাত সহৃদয়তাই তাঁকে দাদাদের অবজ্ঞাত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের' অন্তর্গত বৈষ্ণব পদাবলীর অনাস্বাদিতপূর্ব রসের সন্ধান দিয়েছিল। এ ছাড়া তাঁদের পারিবারিক বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীও হয়তো এ-বিষয়ে তাঁকে কিছুটা উৎসাহ দিয়ে থাকতে পারেন। ভানুসিংহের ছদ্মবেশে কবির পদাবলী রচনার পশ্চাতেও আছে এঁরই পরোক্ষ প্রভাব।

বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে কবির যোগ যেমন বিচিত্র তেমনই ব্যাপক। রবীন্দ্রনাথের নিজের সাক্ষ্য অনুযায়ী বিচার করে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেছেন যে, আনুমানিক ১২৮২ সালে তের বছর বয়সে তিনি সর্বপ্রথম পদাবলীর সংস্পর্শে আসেন, আর জীবনের শেষ পর্যন্ত কত প্রসঙ্গেই না তিনি পদাবলীকে স্মরণ করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪ খ্রীঃ)। ব্রজবুলির প্রতি আকর্ষণ ও দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হবার উৎসাহই যে কবিকে এই কাব্য লিখতে প্রণোদিত করেছিল, 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকমাত্রেরই কাছে তা সুপরিচিত। ব্রজবুলিতে এমন বৈষ্ণব পদরচনা তাঁর পূর্বে আর দেখা যায় নি। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হলেও তার ভাষা বাংলা এবং নায়িকা Mrs. Radha। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'তে (১৮৬৯ খ্রীঃ) এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের 'বঙ্গদর্শনে' ব্রজবুলিতে লেখা কয়েকটি পদ পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে পদ রচনা করেই কবি ক্ষান্ত হন নি। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় সঙ্কলন করেছিলেন 'পদরত্নাবলী' (১৮৮৫ খ্রীঃ)। তাঁর পূর্বে ১২৭৯ সালে জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'বিদ্যাপতির পদাবলী' এবং ১২৮১—১২৮৩ সালের মধ্যে অক্ষয়কুমার সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের যুগ্ম প্রচেষ্টায় 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। দুটি গ্রন্থই কবি দেখেছিলেন। কিন্তু কোনটিই সঙ্কলনের দিক্ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচিত না হওয়ায় তিনি স্বয়ং এই পদসমুদ্র থেকে রত্ন আহরণে অগ্রসর হলেন। পরবর্তী কালে যেসব পদ তিনি তাঁর সাহিত্যে উদ্‌ধৃত করেছেন তার অধিকাংশই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রন্থবহির্ভূত যথেষ্ট পদও তিনি ব্যবহার করেছেন যাতে বোঝা যায়, তাঁর পদাবলীচর্চা এই পদ ক'টিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে দেখি তাঁর পদাবলীর রসাস্বাদনকে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি তাঁর সৃষ্টিকার্যে প্রয়োগ করেছেন। তারপর সেই রসকে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করবার উদ্দেশ্যে করেছেন 'পদরত্নাবলী' সঙ্কলন। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। উৎকৃষ্ট পদের কাব্যত্ব কোথায়, কোন ব্যঞ্জনায় কোন ধ্বনিতে তা প্রকাশিত, রসগ্রাহী আলোচনার দ্বারা সেটি উদ্‌ঘাটিত করে তিনি পাঠকসাধারণকে সেই ভালো-লাগায় প্রণোদিত করতে ব্রতী হয়েছেন। আজ আমরা পদাবলীর যে মাধুর্যে বিমোহিত হই, সে মুগ্ধতাটুকুও রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তপরিবেশিত। তবে এ বিষয়েও পথপ্রদর্শক হিসাবে স্মরণ করতে হয় বঙ্কিমচন্দ্রকে। তাঁর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'

প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'জ্ঞানদাস' এবং 'বলরাম দাস' নামক প্রবন্ধ দুটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

"জয়দেব ভোগ, বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা।" পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেন—

"যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।"

—'বিবিধ প্রবন্ধ', বিদ্যাপতি ও জয়দেব।

বঙ্কিমপ্রদত্ত এই সূত্রটি ধরেই যেন রবীন্দ্রনাথ ১২৮৮ সালে 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' সম্বন্ধে লিখলেন—

"বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি।"

—'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।

১২৮৯ সালে তিনি 'রায় বসন্ত' নামে এক প্রায়-অজ্ঞাত পদকর্তাকে বিদ্যাপতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে যেভাবে তাঁর কবিত্বকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করলেন তাতে সন্দেহ থাকে না যে, ইনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি। কিন্তু কবির প্রথম যুগের এই জাতীয় আবেগ-সমুত্থ মন্তব্যগুলি বিচারসহও বটে। আবার ১২৯২ সালে 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রবন্ধে তিনি বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি-পদের মাধুর্য যেভাবে স্তরে স্তরে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখালেন রবীন্দ্রভাষ্য ছাড়া সে-পদ ক'জন রসিক ওইভাবে আস্বাদন করতে পারেন?

জীবনের প্রথম যুগে যে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর রসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন, উপরের আলোচনাতেই তা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ঐ সময়ের 'ভারতী' পত্রিকার পাতায় পাতায় আছে তার প্রমাণ।

শুধু প্রবন্ধ রচনায় নয়, তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেও আছে তার স্বাক্ষর। ১৮৮৫ খ্রীঃ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা তাঁর চিঠিগুলি সংকলিত হয়েছে 'ছিন্নপত্রাবলী'তে। ঐ গ্রন্থে বারটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি বৈষ্ণব পদকে স্মরণ করেছেন। সেখানে কখনো বলেছেন—

"এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া।" আবার কখনও দুঃখ জানাচ্ছেন—

"বরাবর আমার বৈষ্ণব কবি এবং সংস্কৃত বই আনি এবার আনিনি, সেইজন্যে ঐ দুটোরই আবশ্যক বেশি অনুভব হচ্ছে।"

কখনও ঝড়বাদলের অভিসারে শ্রীরাধা কৃষ্ণের কাছে 'কী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন' সকৌতুকে তা স্মরণ করছেন কিংবা বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদ সুরে গুন্‌ গুন্‌ করে অবসর বিনোদন করছেন আর কখনও বা 'পদরত্নাবলী'র পাতা ওলটাতে ওলটাতে বৈষ্ণবপদের মোহ-মন্ত্র পরিবেশন করার জন্যে প্রবন্ধ লেখার পরিকল্পনা করছেন। অবশ্য এই সময়ে তাঁর বাস ছিল পদ্মাবক্ষে—প্রকৃতির উন্মুক্ত লীলানিকেতনে এবং কবির উপরে এই প্রকৃতির প্রভাব প্রতিফলিত হত বৈষ্ণব পদাবলীর মাধ্যমে, কবি স্বয়ং সেকথা স্বীকার করেছেন।

"প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দোঝঙ্কার এনে দেয়—তার প্রধান কারণ, এই সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়…এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের সেই অনন্ত বৃন্দাবন রয়ে গেছে। বৈষ্ণব কবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।"

—'ছিন্নপত্রাবলী', ১৪৭-সংখ্যক পত্র, ১৮৯৪

সুতরাং এই নিভৃত অবকাশে তিনি বৈষ্ণবপদের চর্চা করেছেন নিরঙ্কুশভাবেই।

পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁর উপরে বৈষ্ণব পদাবলীর এই একাধিপত্য হ্রাস পায়। কিন্তু তাঁর মনঃপ্রকৃতির উপরে তার ক্রিয়া কখনও একেবারে লোপ পায় নি। বরং সে ক্রিয়া সূক্ষ্মতরভাবেই তাঁর চিত্তসংস্কারকে আশ্রয় করে অলক্ষিতে তাঁর বাণীকে নূতন ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করেছে।

২

নিছক সাহিত্য রসাস্বাদনের জন্যই বৈষ্ণবপদাবলীর সৃষ্টি নয়। তার পিছনে আছে বৈষ্ণব ভক্তের বহুযুগসঞ্চিত ধর্মসংস্কার। এই ভক্তির সংগতিসূত্রে পদাবলীর বিশেষ

আস্বাদন। রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর 'সূচনা'য় (১৯৩৯ খ্রীঃ) তিনি সেকথা স্পষ্ট করেই বলেছেন। তবে কি জন্য তাঁর বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রবেশ? এর উত্তর পাই হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত তাঁর এক পত্রে (১৯৩৬ মে ১৫)।

"প্রথম বয়সে বৈষ্ণব সাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন, সেটা যৌবনচাঞ্চল্যের আন্দোলনবশতঃ নয়। কিছু উত্তেজনা ছিল না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ওর আন্তরিক রসমাধুর্যের গভীরতায় আমি প্রবেশ করেছি। চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত পড়েছি বারবার। পদকর্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অসীমের আনন্দ এবং আহ্বান যে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যে ও মানব প্রকৃতির বিচিত্র মধুরতায় আমাদের অন্তরবাসিনী রাধিকাকে কুলত্যাগিনী করে উতলা করেচে প্রতিনিয়ত, তার তত্ত্ব আমাকে বিস্মিত করেচে। কিন্তু আমার কাছে এই তত্ত্ব ছিল নিখিল দেশকালের—কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ পাত্রে কতকগুলি বিশেষ আখ্যায়িকায় আবদ্ধ করে একে আমি সংকীর্ণ ও অবিশ্বাস্য করে তুলতে পারি নি।"

—চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড (১৯৬৩)

এর থেকে বোঝা যায়, কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মপদ্ধতির খুঁটিতে তাঁর মন বাঁধা পড়ে নি। তাঁর ধর্ম মহামানবধর্ম, তাঁর সাধনা মনুষ্যত্বের সাধনা। সুতরাং বৈষ্ণবীয় বিশেষ 'রাগানুগা' ভজনপদ্ধতি তাঁর কাছে নিষ্ফল। এছাড়া উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত মহর্ষিপুত্র রবীন্দ্রনাথের সাধনমন্ত্র—'শান্ত উপাসীত'। তাঁর প্রার্থনা—

…"সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ।
দাও ভক্তি শান্তিরস।"

—'নৈবেদ্য', ৪৫

বৈষ্ণবীয় রসসম্ভোগের সাধনাকে তিনি আধ্যাত্মিক বিলাস বলে মনে করেছেন, যে বিলাসে বিকারের সম্ভাবনাই ষোলো আনা। তাঁর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে এই রসের রাক্ষসীর সর্বনাশা নেশার ছবি আছে। সুতরাং ধর্মতত্ত্ব বা সাধনা হিসাবে নয়, সাহিত্য হিসাবেই তাঁর কাছে বৈষ্ণবপদাবলীর মূল্য। তাঁর 'হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ' কবিচিত্ত ধর্মতত্ত্বের নীর বাদ দিয়ে ভাবরসের ক্ষীরটুকু ছেঁকে নিয়েছে। তারই মধ্যে থেকে গেছে সমগ্র বৈষ্ণবধর্মের রসনির্যাস। তাঁর Sadhana গ্রন্থে এই সত্যেরই উল্লেখ আছে সংশয়াতীত ভাষায়—

"The Vaishnava religion has boldly declared that God has bound himself to love, and in that consists the greatest glory of human existence."

—'Sadhana', Realisation in love, (1961); p. 115.

ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এই যে প্রীতিমধুর সম্পর্ক, এই হল বৈষ্ণবধর্মের মর্মবাণী।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দেবতাকে ঘরে টেনে এনেই তৃপ্ত হন না, ঘরের প্রিয়জনের মধ্যেও দেখতে চান দেবতার ছবি। তাই তাঁর অতৃপ্ত হৃদয়ের প্রশ্ন—

…এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।"

—'সোনার তরী', বৈষ্ণব কবিতা, ১৮৯২

আর শেষে বৈষ্ণবের হয়ে তিনি নিজেই এ প্রশ্নের মীমাংসা করে দেন—

"দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।"

কিন্তু বৈষ্ণবের দেবতা তাদের কাছে পুত্ররূপে, সখারূপে, প্রিয়রূপে ধরা দিলেও কোনো মর্ত্য প্রিয়কে তাঁরা দেবতার আসনে বসাতে পারেন না। কারণ 'কৃষ্ণরতি' ছাড়া পার্থিব প্রেমের কোনো মূল্য নেই তাঁদের কাছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেবতা যে সর্বমানবে বিরাজিত। তাঁর চোখে ভগবদ্‌প্রেম আর মানবপ্রেম দুই-ই মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। তাঁর প্রিয়জনে তাঁর দেবতাই প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর এ ধারণা ছিল আজীবন। তাই 'সোনারতরী'তে (১৮৯২) যা লিখেছিলেন 'শ্যামলী'তে পৌঁছেও (১৯৩৬) তাই-ই লিখলেন—

"সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন একটি মেয়ে ছিল,

ভালোবাসার কুঁড়ি-ধরা তার মন।
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল পরা,
ঘাটের থেকে নীলশাড়ি
'নিঙাড়ি নিঙাড়ি' চলা।
—'শ্যামলী', স্বপ্ন।

চৈতন্যপূর্ব যুগে যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব বিধিবদ্ধ হয়ে যায় নি, তখন হয়তো এ সন্দেহের পশ্চাতে কিছু সত্য ছিল, যেমন চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির রাধার পিছনে রজকিনী রামী বা শিবসিংহপত্নী লছিমা দেবীর ছায়া থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে এ কথা মানা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর অনন্যকরণীয় ভাষায় মর্মস্পর্শী করে বলেন—

"বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে।"

—'পঞ্চভূত', মনুষ্য

তখন বলতেই হয় এ অ-পূর্ব উপলব্ধি কবির নিজেরই সৃষ্টি।

৩

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি কবির প্রত্যক্ষ আকর্ষণ কিছুটা কমে গেলেও একেবারে লোপ পায় নি। তার প্রমাণ, তাঁর সাহিত্যে উদ্ধৃতিরূপে ক্ষণে ক্ষণে তার আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের আগে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কপালকুণ্ডলা'য় (১৮৬৬ খ্রীঃ) 'আত্মমন্দিরে' অধ্যায়ে "জনম অবধি হম"··· ইত্যাদি পদটি এবং 'কমলাকান্তের দপ্তরে' (১৮৭৬ খ্রীঃ) 'একটি গীত' অধ্যায়ে "এসো এসো বঁধু এসো"···পদটি উদ্ধার করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের হাতেই এই জাতীয় উদ্ধৃতির সর্বাধিক ও যথার্থ প্রয়োগ। আর উক্ত দুটি পদই (বিশেষতঃ প্রথম পদটি) রবীন্দ্রসাহিত্যে বারংবার দেখা দিয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি কবির আকর্ষণের কারণ তার কাব্যরস। কাজেই যে কোনো সূত্রে সাহিত্যরসের প্রসঙ্গ এলে অনিবার্যভাবেই তাঁর মনে পড়ে যায় বৈষ্ণব পদাবলী। বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তা রক্ষা করে কেমন ভাবে বাক্যকে কাব্য করে তোলা যায় তা দেখাতে গিয়ে কবি স্মরণ করেন বলরাম দাসের পদ—

"আধ চরণে আধ চলনি আধ মধুর হাস।"

···'আধ চরণে আধ চলনি' বলিলে ভাবুকের মনে যে এক প্রকার চলন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে ভাষা ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিলে সেরূপ সম্ভবে না।"

'সাহিত্য', কাব্য: স্পষ্ট ও অস্পষ্ট

তেমনই জ্ঞানদাসের 'হাসি মিশা বাঁশি বায়' পদের ব্যঙ্গার্থের সত্যতা তথ্যজগতের সত্যতার সবটুকু ঘাটতি পূরণ করে দেয়। আবার নিতান্ত সুস্পষ্ট গদ্যভঙ্গির পংক্তি—

"শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে লেহা"

শোনামাত্র কোন অনির্দেশ্য বেদনা আমাদের হৃদয়কে ব্যাকুল করে তোলে।

১৯৩৬ খ্রীঃ প্রকাশিত 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থেও দেখি রসপ্রসঙ্গে তাঁর এই পদাবলীর কথাই মনে হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন ভাষাকে অভিধাননির্দিষ্ট অর্থের তথ্যসীমা ছাড়িয়ে অসীমতার ব্যঞ্জনায় নিয়ে যেতে পারলে তবেই তা হবে কাব্য। জ্ঞানদাস বলেন—

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল"—

কিন্তু "রূপের পাথার" বা "যৌবনের বনে"র অস্তিত্ব তো বস্তুজগতে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই সেখানে কবির উপদেশ—

"নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ যে তথ্যের দুর্গ ফেঁদে বসে আছে ছলে বলে কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র করে নানা ফাঁকে নানা আড়ালে সত্যকে দেখাতে হবে।"

—'সাহিত্যের পথে' তথ্য ও সত্য।

আর সেই সত্যই হবে রসের সত্য।

'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি তাঁর পরিণত বিচারের ফল। কিন্তু এখানেও রসের অত্যুক্তি ও

অনির্বচনীয়তার উদাহরণ হিসাবে ডাক পড়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর। কারণ কবির মনের মাপকাঠি অনুযায়ী রসসাহিত্যের দরবারে প্রথম সারির প্রথমেই বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান।

শুধু ভাব নয়, এর ভাষাও কবিকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর বৈষ্ণব পদের প্রথম আস্বাদনের মুগ্ধতায় দুর্বোধ মৈথিল ভাষার দান কম নয়। ১৯৩৪ খ্রীঃ পরিণত বয়সে তিনি এই বিশেষ ভাষার যাদুগিরি প্রকাশ করে দিয়েছেন।—

"বৈষ্ণব পদাবলীতে যে মিশ্রিত ভাষা চলে গেছে সেটা যে কেবলমাত্র হিন্দি ভাষার অপভ্রংশ তা নয়, সেটাকে পদকর্তারা ইচ্ছা করেই রক্ষা করেছেন, কেননা অনুভূতির অসাধারণতা ব্যক্ত করবার পক্ষে সাধারণ ভাষা সহজ নয়।"

—'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যের তাৎপর্য।

ব্রজবুলি ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অধ্যবসায়ের কথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন। দুরূহ শব্দ ও ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলি নোট করে রেখে এবং তার প্রয়োগ দেখে দেখে তিনি এ ভাষা আয়ত্ত করেন। 'ভারতী' পত্রিকা যখন পদাবলী সাহিত্যের আলোচনায় মুখরিত তখনই দেখি 'পঁহু' এবং 'নিছনি' শব্দদুটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নিয়ে কবি রীতিমতো গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখছেন। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর এই ঔৎসুক্যের ফল 'বাংলা শব্দ' তত্ত্ব, 'বাংলা ভাষা পরিচয়' প্রভৃতি গ্রন্থ। 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে দেখি 'সম্বন্ধে কার' প্রবন্ধে তিনি পদাবলীতে ব্যবহৃত 'থাকর', 'তাকর' ইত্যাদি শব্দ স্মরণ করেছেন, 'বাংলা নির্দেশক' প্রবন্ধে তাঁর মনে পড়েছে বৈষ্ণব পদে পড়া 'লাগ্' শব্দের ব্যবহার। আবার 'লাবণ্যকে 'লাবণি' বলে গোবিন্দদাস ব্যাকরণ লঙ্ঘন করলেও তাতে কাব্য অঙ্গের যে লাবণ্য বর্ধিত হয়েছে সেটুকু কবি স্বীকার না করেই পারেন না।

ভাষার পরেই মনে আসে অলংকারের প্রয়োগ। সেক্ষেত্রেও বৈষ্ণবকবির অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব। ১৩০১ সালে 'সঞ্জীবচন্দ্র' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে উপমাসৌন্দর্য বোঝাতে কালিদাসের সঙ্গেই ডাক পড়েছে গোবিন্দদাসের। ১৩১০ সালেও ঐ একই কারণে কবি বৈষ্ণবপদ স্মরণ করেছেন।—

'দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়।'

—'সাহিত্য', সাহিত্যের তাৎপর্য

ব্যাকুল আগ্রহ 'আঁখি পাখি'র মধ্যে যেভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে তাতে পংক্তিটি প্রথম শ্রেণীর কাব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেমনই গোধূলি বেলায় রূপসীকে ঘর থেকে বার হতে দেখে কবি যখন বল্লেন যে, নববর্ষার মেঘে বিদ্যুতের রেখা যেন দ্বন্দ্ব প্রসারিত করে দিয়ে গেল তখন রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—

"এই উপমার যোগে বাহিরের ঘটনা আপন চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল!"

—'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যের তাৎপর্য, ১৯৩৪

অর্থাৎ এই এক উপমার যোগেই এটি আমাদের অন্তরের রসলোকে গিয়ে উত্তীর্ণ হল।

তবে ভাষা-অলংকারের চেয়েও তাঁকে বেশী মুগ্ধ করেছে পদাবলীর ছন্দোবৈচিত্র্য। 'মানসী' কাব্যের ভূমিকাতে কবি বলেছিলেন—

"আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। 'মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"

এই নতুন শিল্পী তাঁর শিল্পাদর্শ নিলেন বৈষ্ণব পদাবলী থেকে। বাংলা ছন্দের প্রাচীন আদর্শ ছিল সাধু জাতের অক্ষরগোণা ছন্দ। আর রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে আনলেন এক নতুন জাতের 'সংস্কৃত ভাগ ছন্দ'। এতে রুদ্ধদলে (closed syllable) দুই মাত্রা ধরে বাংলা উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেই ছন্দের বৈচিত্র্য দেখা দিল। এই বৈচিত্র্যের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে কবি দেখেছেন যে, 'বিচিত্র হৃদয়াবেগের সংঘাতে'ই পদাবলীর ছন্দ এমন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তাঁর মন্তব্যকে প্রয়োগ করতে হবে দুই দিকেই হৃদয়াবেগের সংঘাত যেমন ছন্দকে বিচিত্র করেছে এর ছন্দ তরঙ্গও তেমনই হৃদয়ের উত্থান-পতনকে সার্থক ভাবে স্পন্দিত করে তুলেছে। তাই 'কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' পদে রাধার শ্যামনাম-শ্রবণরূপ ঘটনাটি শেষ হয়ে গেলেও কবি যখন ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে কথাটিকে দুলিয়ে দেন তখনই তা মর্মে গিয়ে পৌঁছয়। 'ছন্দ' গ্রন্থে আটটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে অজস্র উদ্ধৃতিতে কবি পদাবলীর ছন্দ মাধুর্য স্মরণ করেছেন এবং বলেছেন—

"বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে।"

—'ছন্দ', ছন্দের অর্থ

এই ঢেউ ক'জন বাঙালী অনুভব করেছিলেন জানি না। তবে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে এই ঢেউ যে দোলা জাগিয়েছিল, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীই তার একমাত্র ফল নয়, মানসী কাব্যের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত বাংলা কাব্যই সেই তরঙ্গাভিঘাতে উত্তাল হয়ে উঠেছে।

৪

কবি শুধু বৈষ্ণব পদগুলির ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলংকার নিয়ে আলোচনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি একই পদকে তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে একাধিকবার স্মরণ করেছেন কিন্তু সর্বত্র এক অর্থে নয়। প্রত্যেকবারই তার অর্থ দিয়েছেন বদলে। একই পদকে জীবনের কোন পর্যায়ে কোন অর্থে স্মরণ করেছেন তা অনুধাবন করলে রবীন্দ্রমানসের একটি নতুন পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর সর্বাধিকব্যবহৃত শব্দ হল বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটি। কবির মনে বর্ষা ঋতুর সঙ্গে এ পদ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে। প্রথম জীবনের লেখা 'বিবিধ প্রসঙ্গে' (সমাপন) দেখি ঘনঘোর বর্ষার মেঘ ও শ্রাবণের বর্ষণের সঙ্গে তাঁর মনে পড়ছে বিদ্যাপতির গান। আবার ১৩১৩ সালেও তাঁকে বলতে দেখি—

"বর্ষার চারিদিকে কত গানের বর্ষা, কাব্যের বর্ষা, কত মেঘদূত কত বিদ্যাপতি বিস্তীর্ণ হইয়া আছে।"

—'সাহিত্য', বিশ্বসাহিত্য

কখনও তিনি এই পদটিকে আপন সুরের ছাঁচে ঢালাই করে নিজের বলে বানিয়ে নেন, কখনও বা এর থেকে বিরহীর তপ্ত শ্বাসে শ্বসিত সাহিত্যরস ভোগ করেন। আবার সেই সঙ্গে 'মত্ত দাদুরি' রব যে কেমন করে বর্ষা-নিশীথিনীর নিগূঢ় ও অব্যক্ত সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করে তোলে তার ব্যাখ্যাও এসে যায়। তাই দেখি শ্রীশবাবুর বিরহে লঘু হাস্যকৌতুকে তিনি যেমন এই পদটি স্মরণ করেন (ছিন্নপত্র) কিন্তু শান্তিনিকেতনের (২য়) অন্তর্গত 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' প্রবন্ধে এ পদকে তিনি অধ্যাত্মলোকে উত্তরণ করিয়ে দেন। বিদ্যাপতি 'হরিবিনে' শ্রীরাধার বিরহ ভেবেই আক্ষেপ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই বিরহকে সীমা ও অসীম—জীবাত্মা ও পরমাত্মার চিরন্তন বিরহপ্রসঙ্গে টেনে নিয়ে গেছেন।—

"বিরহসন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদতে হত যে 'কেমন করে তোর দিনরাত্রি কাটবে,' তাহ সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্যন্ত বাঁচ না। কিন্তু শুধু 'কেমন করে কাটবে' নয় তো, কেম করে কাটবে 'হরি বিনে' দিনরাতিয়া…চিরদিনরাত্রি যা নিয়ে কেটে যাবে এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আ —তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে, আছে—বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে"…

কবি হতাশার বেদনায় এ পদকে শেষ হতে দেন নি এরই থেকে খুঁজে নিয়েছেন চিরমিলনের আশ্বাস। তঁ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশ এই কথাটাই বে ছিল—

"বিরহে যে-মন্দির শূন্য হয় সে-মন্দিরের শূন্যতার মধ্যে বাঁশি বাজে। কবি সেই বাঁশিই শোনাতে চান। আ সেই সঙ্গে আরও মনে হয় কবির উপলব্ধির সঙ্গে এখা মিশেছে উপনিষদের বাণী—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং'। হরি বিশ্বের আকাশ ব্যাপ্ত করে কবির মনের আকাশ জু বসেছেন তাঁর মধ্যে বৈষ্ণবের হরির সঙ্গে উপনিষদের ঈশা কি সমভাবেই মেলে না?

কবির আর একটি প্রিয় পদ 'সখি কি পুছসি অনুভ মোয়'। পদাবলী বিশেষজ্ঞের মতে এর রচয়িতা 'ক বল্লভ'। রবীন্দ্রনাথ 'পদরত্নাবলী'তে এটি 'কবিবল্লভে ভণিতায় উল্লেখ করেও মন্তব্য করেছেন—

"এই কবিতা সাধারণতঃ বিদ্যাপতির বলিয়া পরিচিত আর কবি নিজেও এটিকে বিদ্যাপতির বলেই মনে করতেন তাঁর একাধিক উদ্ধৃতিতে পাই তার প্রমাণ।

১২৮৮ সালের ফাল্গুন মাসে 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপ প্রবন্ধে তিনি এই পদপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—

"বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীতে একটিমাত্র কবি আছে। চণ্ডীদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলনা হই পারে।"

পরের বছর শ্রাবণ মাসে তিনি কিন্তু এই পদ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীতে ফেলেছেন। এ সম্ব এটুকুই বলা যায় যে, এ বিচার সুবিচার নয়, না বিদ্যাপ পক্ষে না কবির নিজের বিচারবুদ্ধির পক্ষে। তাঁর পরব কালের সাহিত্যে এই পদপ্রসঙ্গে লিখিত উচ্ছ্ব প্রশংসাবাণীই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের 'শব্দের খেয়াল' প্রবন্ধে দেখি, এ পদটির শব্দপ্রয়োগের অভিনবত্বে কবি মুগ্ধ। আবার তাঁর সাহিত্যতত্ত্বমূলক তিনটি গ্রন্থের (সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ) রসপ্রসঙ্গেও এ পদটি স্বতঃই এসে গেছে তাঁর মনে। ১২৯০ সালে প্রথম তিনি এ পদের অন্তর্গত 'জনম অবধি হম'…ইত্যাদি অংশটির ব্যাখ্যা করে লেখেন—

"একটা মানুষ যত বড়ই হউক না কেন, তাহাকে দেখিতে কিছু বেশিক্ষণ লাগে না—কিন্তু আজন্মকাল দেখিয়াও যখন দেখা ফুরায় না তখন সে না-জানি কত বড় হইয়া উঠিয়াছে! ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, অনুরাগের প্রভাবে প্রেমিক একজন মানুষের অন্তরস্থিত অসীমের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, সেখানে সে মানুষের আর অন্ত পাওয়া যায় না।"

তাই যেন প্রেমিকের প্রেমিকের সেই দেখা আর ফুরায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার "তাহার এত বেশি তৃপ্তি বর্তমান যে, সে-তৃপ্তিকে সে সর্বতোভাবে আবিষ্কার করিতে পারে না ও তাহা সুমধুর অতৃপ্তিরূপে চতুর্দিক পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে।"

—'আলোচনা', ডুব দেওয়া : ডুবিবার স্থান।

কবির প্রথম বয়সের এই উপলব্ধি পুনর্বার দেখা গেল ১৩১৮ সালে পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারিতে—

"লক্ষ যুগের পাওয়া অল্পকালের মধ্যেই পেয়েছি আবার সেই সঙ্গেই লক্ষ-যুগের না পাওয়াও লেগেই রইল।"

আবার ১৩১৩, ১৩৩১ এবং ১৩৩৮ সালে যথাক্রমে 'সাহিত্য সম্মিলন' (সাহিত্য), 'তথ্য ও সত্য' (সাহিত্যের পথে), এবং সাহিত্যে চিত্রবিভাগ (সাহিত্যের স্বরূপ), প্রবন্ধে এই পদটি স্মরণ করে বলেছেন যে, 'অনুরাগবীক্ষণে' অত্যুক্তি থাকবেই। সে নিয়ে লজিকের তর্ক করা বৃথা। আর কাব্যানুরাগীর চোখে সেটা অত্যুক্তি নয়—অতি প্রয়োজনীয় উক্তি।

১৩৪০ সালে তিনি ও পদের অর্থকে আরো একটু দূরে টেনে নিয়ে গিয়েছেন।

"সাধারণতঃ মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা পরিমাণ রক্ষা করেই চলি। কিন্তু, যাকে ভালোবাসি অর্থাৎ যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিপুরুষের পরম সম্বন্ধ তার সম্বন্ধে পরিমাণ থাকে না…ব্যক্তিপুরুষের অনুভূতির মধ্যে ক্ষণকালের সীমায় সংহত হতে পারে চিরকাল।"

—'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব।

১৩৩১ সালে 'সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধে কবি সম্পূর্ণ নতুন অর্থে এ পদ প্রয়োগ করলেন—যে নবীনের মধ্যে চিরন্তনের সুর নেই, যে নবীনতাকে দেখে বলা যায় না যে 'জনম অবধি হম রূপ নেহারলু নয়ন না তিরপিত ভেল' তাকে নবীন বলে ভাববার কারণ নেই।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বৈষ্ণব পদ সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি বিশেষ সম্প্রদায়গত আধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডল বহির্ভূত, তা মানব হৃদয়ের তপ্ত অনুভূতিতেই সঞ্জীবিত। আর সব কিছুতে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আরোপ যে কত অনাবশ্যক ও হাস্যকর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে কবি তা দেখিয়ে দিয়েছেন। সেখানে ব্যোম 'কচদেবযানী'র মতো একটি কাব্যের তাৎপর্য বার করতে বসে 'জনম অবধি হম'…পদটি তুলনা এনে এক উৎকট আধ্যাত্মিকতায় পৌঁচেছে। অরসিকের হাতে কাব্যের অপমৃত্যু যে কেমন করে হয় এটি তারই নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একদা প্রিয় পদকর্তা বসন্ত রায়কে পরবর্তীকালে আর তেমন করে স্মরণ করেন নি। তবে তাঁর 'নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি' পদাংশটি তাঁর মনে কিছু স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। অবশ্য ১২৮৯ সালে তিনি এ পদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাতে ঐ ব্যাখ্যার সাহিত্যমূল্য প্রকৃত পদের মূল্যকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এক পত্রে দেখি তিনি এই পদকে রাধাপ্রেমের ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধিতে টেনে নিয়ে গেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে, বৃহৎ কালপ্রবাহে মানুষের জীবনের স্থিতি মুহূর্তের বেশি নয়। তাই—

"নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি। বাস্তবিক মানুষের এক নিমেষের মধ্যে শত যুগের সংযোগ বিয়োগ ঘটতে পারে। এইজন্য নিমেষগুলোকে দুর্মূল্য বলে বোধ হয়।"

'ছিন্নপত্রাবলী', ১৩০-সংখ্যক পত্র, ১৮৯৪

আবার ১৩৩২ সালে 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে কবি

এই পদকে ব্যক্তিপ্রেম বা বিশ্বপ্রেমকে পেরিয়ে নিয়ে গেছেন অসীমের দিকে। তবে সে উপলব্ধির জন্যেও আছে প্রেমের অপেক্ষা।

"নিমেষই বলো আর লক্ষযুগই বলো, দুয়ের মধ্যেই অসীম সমানভাবেই আছেন, শুধু কেবল উপলব্ধির অপেক্ষা এইজন্যই কবি প্রেমের ভাষায় অর্থাৎ নিবিড় সত্য উপলব্ধির ভাষায় বলেছেন—

"নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।"

এমনই করে একই পদকে অর্থ থেকে অর্থান্তরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার থেকে নবনব রস নিষ্কাশন ও আস্বাদন করা রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষেই সম্ভব।

শুধু সাহিত্যপ্রসঙ্গ নয়, রাজনীতি-সমাজনীতির মতো জটিল-কুটিল আলোচনাতেও পদাবলীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি কার্যসাধন করে নেন। ১৩০৫ সালে দেশী ইংরেজ ভক্তদের উপরে পড়ে তাঁর ব্যঙ্গকশা—

সাহেব, তোমারই জন্য দেশের লোকের কাছে গাল খাইলাম।

ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।

(অতএব কিছু আশা রাখি)।"

—'সমূহ', পরিশিষ্ট : আল্‌ট্রাকন্‌সার্ভেটিভ।

১৩০৮ সালে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' শীর্ষক প্রবন্ধে ('সমাজ', পরিশিষ্ট) তিনি ঐ উদ্ধৃতির দ্বারাই পাশ্চাত্য-শিক্ষার মোহে আত্মবিস্মৃত জনসম্প্রদায়কে স্বস্থ করতে চান। ১৩১১ সালে সমাজনীতি প্রসঙ্গেও ('আত্মশক্তি', স্বদেশী সমাজ) ঐ উদ্ধৃতির যোগে তিনি বলেছেন যে, বাইরে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ঘরে তার প্রয়োগ করতে হবে। তবেই সমাজের উন্নতি। আবার 'কালান্তরে'র মতো রাজনৈতিক সমস্যামূলক গ্রন্থেও বৈষ্ণবপদাবলী এসে গেছে সহজেই। রায়তের দুর্দশা সেখানে রাধিকার, দুর্দশার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে।

আসলে মনে হয় একদা বাংলাদেশে কানু ছাড়া গীত ছিল না। কানুর সেই মধ্যযুগীয় একাধিপত্য আজ না থাকলেও সে সংস্কার জড়িয়ে গেছে বাঙালীর অস্থিমজ্জায়। তাই রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ বাঙালী পাঠকের মনে সাড়া জাগায় সহজেই। সর্বত্র না হলেও কবি এ সুবিধাটুকুর সদ্ব্যবহার করেছেন। তাই তাঁর নাটক ও উপন্যাসের পাত্রপাত্রী প্রায়ই পদাবলীর উদ্ধৃতি ব্যবহার করে এবং সে প্রয়োগ আমাদের হৃদয়গত সংস্কারে ঘা দিয়ে একটা নতুন স্বাদে সঞ্চার করে।

কবি কর্তৃক ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলি লক্ষ্য করলে আরও একটি বিষয় চোখে পড়ে। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রথম কারণ ছিল বিদ্যাপতির 'ব্রজবুলি' ভাষা। কিন্তু একটু পরিণত বয়সে তিনি সহজ কথার কবি চণ্ডীদাসের বাংলাপদকে বিদ্যাপতির কৃত্রিম (!) ব্রজবুলির তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করেছেন। এমন কি, বসন্ত রায়ের পদ বাংলা মিশ্রিত ব্রজবুলি না হয়ে ব্রজবুলি মিশ্রিত বাংলা হওয়ায় বিদ্যাপতির তুলনায় তাকেও শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন এবং ব্রজবুলির 'বৃন্দাবনী চাপকানে' কেবল টানাবোনা কৃত্রিম কল্পনা লক্ষ্য করেছেন। কৌতুকের বিষয় হল কবির এই মন্তব্যের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের মিল হয় নি। তাঁর রচনায় সর্বাধিক ব্যবহৃত পদগুলি বিদ্যাপতির এবং তার ভাষাও ব্রজবুলি। এছাড়া 'ছবি ও গানে'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে কবি জানিয়েছিলেন যে, তিনটি পদ ছাড়া ভানু-সিংহের পদাবলীর সব পদই ১২৮৯ সালে লেখা এবং বলা বাহুল্য যে, পদগুলির ভাষা ব্রজবুলি। অথচ ব্রজবুলির বিরুদ্ধে তাঁর ওকালতি শুরু হয়ে গিয়েছিল ১২৮৮ সালের ফাল্গুনেই। কথায় ও কাজে তাঁর এই অসঙ্গতির কারণ কি ?

১৩৩৯ সালে পরিণত বয়সে অলংকৃত অত্যুক্তিকে সমর্থন করে কবি বলেছেন—

"কখন হৃদয় হয় সহসা উতলা
তখন সাজিয়ে বলা
আসে অগত্যাই।"

—'সানাই' অত্যুক্তি

এখানে কবির বক্তব্য হৃদয়ের আবেগে কথা যখন স্বতঃই অলংকারে সেজে ওঠে তখন তাকে কৃত্রিম বলা যায় না—সে যে ঢেউএর মুখে সহজে ভেসে-আসা মোতির ঝিনুকের মতো। ব্রজবুলির রসসম্পৃক্ত অলংকরণও কিন্তু সেই কারণেই কবির মন ভুলিয়েছে যদিও তাঁর সচেতন বিচারবুদ্ধি তাকে মানতে চায় নি। তবু তাঁর সতর্ক বিচারের

পাহারা এড়িয়ে তারা ছন্দ ও ভাষাভঙ্গির প্রসাধনে তাঁর হৃদয় জয় করে নিয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলী কবির মনে যে কত গভীর এবং স্থায়ী ছাপ রেখেছিল, উপরের আলোচনাই তার প্রমাণ। তাঁর কৈশোরের মুগ্ধতা রূপ ধরেছে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে, পদাবলীর সংকলনে ও বৈষ্ণবপদের মাধুর্য বিশ্লেষণে। পরিণত বয়সে তাঁর সাহিত্যে তারা দেখা দিয়েছে উদ্‌ধৃতি রূপে এবং তাতে নতুন ভাব আরোপ করে, নতুন ব্যঞ্জনা নিষ্কাশন করে 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে' কবি তাকে নূতন রূপ দান করেছেন। তাঁর সেই যাদুস্পর্শে পদাবলী সাহিত্য এমন এক অপূর্ব রসরূপ নিয়ে আমাদের কাছে দেখা দেয় যার ছবি হয়তো বৈষ্ণব পদকর্তাদের কল্পনাতেও ছিল না। আর তখনই কবি তাকে আপন সাহিত্য সমৃদ্ধির খাজে না গয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর কৈফিয়ত—

"অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়।"

—'সাহিত্যের পথে', সাহিত্য সম্মিলন।

ভানুসিংহের পদাবলীতে পাই এই অনুকরণ। কবির নিজের মাপকাঠিতে তা চৌর্যাপরাধ, কারণ তার ভাবের মধ্যে 'মেকি' ছিল। কবি স্বয়ং এজন্য লজ্জিত। কিন্তু পরবর্তীকালে 'স্বীকরণ' শক্তিতে যখন 'ভাবচুরি' করেছেন তখন তার থেকে আর 'চোরাই মাল' বার করা যায় না। কারণ স্রষ্টা যে, সে উপকরণ যেভাবেই হোক সংগ্রহ করে "কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরী করে না।" এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করে।"

—'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা

সুতরাং স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনের যে উপাদান বৈষ্ণবপদাবলী থেকে নেওয়া তার স্থূল প্রত্যক্ষ অংশটুকুই আলোচনা করা গেল। আর বৈষ্ণবকবিতার যে রস-বৈশিষ্ট্য কবির ভাবসত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে, তার আলোচনা এখানে শুধু যে অবান্তর তা নয়, বিশ্লেষণের দ্বারা তাকে পৃথক করে দেখাবার প্রয়াসও বৃথা।

ওজন

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বর্ধমান ষ্টেশনে দশপয়সার একটি মুদ্রা
ওর গহ্বরে চালান করে ওর বুকে পা
দিয়ে দাঁড়ালাম। কয়েক সেকেণ্ড পরে
উত্তর পেলাম: একটি ছোট্ট টিকিটের
সঙ্গে: বাহান্ন কে-জি আর উল্টো পিঠে
লেখা Happy love marrige.
শিউরে উঠলাম লেখাটা পড়ে
হ্যাপি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ অটোম্যাটিক
অয়েট বক্স আর তার রেলওয়ে—
কর্তারাই জীবনের ভাগ্যবিধাতা?
সেদিন শিউরে উঠিনি।—
করবী যে কথা দিয়েছিল, "সে আমারই
থাকবে।" ফাগুনের সোনাঝরা সন্ধ্যায়
আমার হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা
করেছিল: আর—আমাকে হ্যাপি
লাইফ দিয়ে ভালোবেসে
বিয়ে করলো সুবিনয়কে।
সেদিন শিউরে উঠিনি, মনের
আনাচে, কানাচে রক্তিম দাগ লেগেছিল।
সেদিন নিজের ওজন জানতাম না
তাই বুঝিনি, তাবলে আজও?

ফুল ও বীণা

শ্রীবংশী মণ্ডল

একটি প্রেমের জ্যোতি শান্ত ফুল বনে
ফোটায় আলোক রেখা শান্তি মহিমার
পেয়েছি সে ফুল প্রিয় জীবন প্রাঙ্গণে
রচিয়া সুরের অর্ঘ্য একটি বীণার?

গানের দিগন্তে তার স্নিগ্ধ দিনচ্ছটা
নিবিড় প্রেমের রসে ঘন রশ্মিজালে
আনিবে উষার আলো মেঘ ঘনঘটা
দূর হয়ে যাবে কোন অন্তহীন কালে।

একটি সুরের আলো স্বপ্ন ভালবাসা
উদয় আকাশে আজ ফুটায়ে রাঙ্গিমা
একটি প্রাণের ছন্দে শ্যাম স্বচ্ছ আশা
পরাইবে কণ্ঠে তার একখানি সীমা?
আলোর পাথার তীরে প্রিয়ার সঙ্গমে
তখন সুরের গন্ধে মিশে যাব সমে
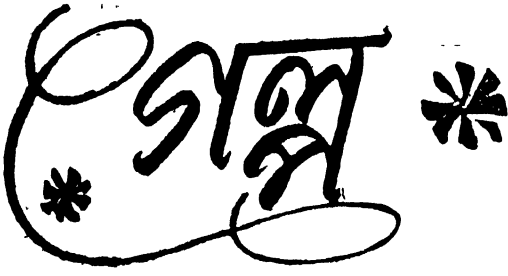
দুটি মন

সুমিতা সরকার

ড্রইংরুমে বসে অনীতা আর মঞ্জু গল্প করছিল। দরজায় দেখা গেল রূপেশের সুদীর্ঘ মূর্ত্তি। অনীতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দে—মঞ্জুর গাল লাল হয়ে উঠল লজ্জায়; অনীতার চোখে জাগল অভ্যর্থনা, মঞ্জুর চোখের পাতা নিমীলিত হল কি জানি কি ভেবে।

অনীতা দাঁড়িয়ে উঠে জানাল নমস্কার, মঞ্জু ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল পাশের ঘরে। রূপেশের হাত দুটী উঠল অনীতার নমস্কারের প্রত্যুত্তরে, তার উৎসুক চোখ দুটী অনুসরণ করল মঞ্জুকে।

* * *

বোটানিক্যাল গার্ডেনের গঙ্গার ধারে বসেছিল তিনজনে। রূপেশের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিল অনীতা, মঞ্জু পাশে বসে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল রূপেশের দিকে। রূপেশের মতকে নিপুণ যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করছিল অনীতা; মঞ্জু আঁচলের কোণ জড়াচ্ছিল আঙুলে। রূপেশ হার মেনে সমর্থন চাইল মঞ্জুর। অনীতা হাসল প্রীতিভরে; মঞ্জুও হাসল লজ্জাভরে।

* * *

ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছিল অনীতা আর মঞ্জু। অনীতা চিন্তিত; মঞ্জু ম্রিয়মাণ। সাত আটদিন রূপেশ আসে নি। অনীতা বলল, "হয়ত শরীর খারাপ।" "শরীর খারাপ না ছাই," তর্জ্জন করল মঞ্জু।

"হয়ত কাজ পড়েছে।"

"কি আর এমন কাজ নীতা—সন্ধ্যেবেলা একবারের জন্ম আসতে পারে না!"

"না আসবার কারণ কিছু আছে নিশ্চয়ই।"

"কারণ কিছুই নেই—জানে আমরা বসে থাকব—তাই"।

এমন সময় এল রূপেশ।

অনীতা সাদর অভ্যর্থনা জানাল—"আসুন, এতদিন আসেন নি যে—"

"কাজ ছিল একটু"—রূপেশ তাকাল মঞ্জুর দিকে। এক ঝলক চাহনীতে অনেকখানি অভিমান ছড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মঞ্জু। সেদিন রূপেশকে মনে হল গম্ভীর।

* * *

একলা পেয়ে অনীতাকে প্রশ্ন করল রূপেশ "আমি না আসাতে খুব বিরক্ত হয়েছেন ত?"

"বিরক্ত কেন হব? কাজ না পড়লে নিশ্চয়ই আসতেন, আর আসেন নি যখন নিশ্চয়ই আসা সম্ভব ছিল না।" প্রসন্ন যুক্তিতে ব্যাখ্যা করল অনীতা।

মঞ্জুকেও একলা পেয়ে প্রশ্ন করল রূপেশ, "আমি না আসাতে রাগ করেছিলেন নাকি?"

"করেছিলামই ত! আপনি জেনেশুনেই এমন করেন। এবার থেকে আপনি না এলে একবারও চিন্তা করব না।" অন্য কথার সুযোগ না দিয়ে মঞ্জু চলে গেল চঞ্চল পায়ে।

* * *

অনীতাকে পার্কে একলা ডেকে রূপেশ বলল যে, অনীতার সঙ্গে বিশেষ কারণে তার আর মেলামেশা করা সম্ভব নয়। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল অনীতা। মুখের বিচিত্র অভিব্যক্তি ক্রমশঃ শান্ত হয়ে এল, বললে, "সম্ভব না হলে আর কিছু করবার নেই। যাই তাহলে।"

* * *

মঞ্জুকে পার্কে ডেকে রূপেশ জানাল যে আর তার সঙ্গে রূপেশের সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয় অনিবার্য্য কারণে। কেঁপে উঠল মঞ্জু, চোখের কোল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় নামল জল। রূপেশের হাত চেপে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে—"সে আমি পারব না!"

* * *

কিছুদিন পরে অনীতা খবর পেল মঞ্জুর সঙ্গে রূপেশের বিয়ে।

"দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-সাধনা ও আমরা"

অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সমস্যা-কণ্টকিত ভারত ও উহার বিচিত্র সমাধান পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া মনে জাগে 'দিলদারের' হাসি, কণ্ঠে জাগে আলেকজাণ্ডারের বাণী "সত্য সেলুকস, কি বিচিত্র এই দেশ"। মুসলমান রাজতন্ত্রের অন্ধতার ও নিষ্ঠুরতার উপর জ্ঞানী বিদূষক দিলদারের হাসি জাগিয়া উঠিয়াছিল। আজও নানা সমস্যা পীড়িত সমাজের মধ্যে দিলদারের 'দিল' লইয়া সমস্ত সমস্যাগুলির উপর একেবার তুচ্ছতার হাসি ছড়াইতে ইচ্ছা যায়। কল্পনায় জাগিয়া উঠে ভারতবর্ষ যেন একটি 'ফল' বিশেষ। বিভিন্ন দিক হইতে কাকগুলি ঠোকরাইয়া খাইতেছে। ঐ ফলের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজের মত আমরা ছড়াইয়া আছি। কাকের ঠোকরে যতই ব্যথা লাগিতেছে ততই দেশপ্রেমের সঙ্গীত, ভক্তিসঙ্গীত প্রভৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। Radioতে তাহারই চীৎকার শুনি।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

গানটিতে যে সহজ স্নেহ-সুরটি লাগিয়া আছে তাহা বহুদিন হারাইয়াছি। সেইদিনকার সমগ্র জাতীয় চেতনা স্নেহসম্পর্কের আনন্দে যেন কথা কহিয়া উঠিয়াছে। আজিকার দেশ-প্রেমের সঙ্গীতে সেই সহজ আনন্দ বাজে কই? সমস্যা সমাধানের অতি-প্রয়োজনের তীব্রতা আমাদের দেশপ্রেমের সঙ্গীতগুলিতেও বাজিয়া উঠিতেছে।

দেশকে বাঙ্গালী 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছে। এই ডাকটি তাহার নিজস্ব। বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ও বাঙালীর জীবনের কেন্দ্রে যেন ঐ ডাকটি রহিয়াছে। বাংলার নিসর্গ-প্রকৃতি ও মনুষ্যপ্রকৃতির মিলনেই বুঝি ঐ ডাকটির সৃষ্টি। তাই বাঙালী 'মা' বলিয়া কাঁদিয়াছে।

নিজের 'মা' না থাকিলে পরকে মা ডাকিয়া কাঁদে। রামপ্রসাদ হইতে এই উদাত্ত কান্নার সুরু। দ্বিজেন্দ্রলালেও উহার নব পরিচয় লাভ করিলাম।

চাণক্য বহুদিন পর কন্যাকে পাইয়া 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। চন্দ্রগুপ্তের একান্ত 'মা' ডাক চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রের কেন্দ্রে জাগিয়া আছে। এন্টিগোনসের মা ডাকের ব্যাকুলতা চন্দ্রগুপ্ত নাটকটি জুড়িয়া আছে।

উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের নাট্যকারগণ সুযোগ পাইলেই তাঁহাদের সাহিত্য রচনায় এই 'মা' ডাকটি গুঁজিয়া দিতেন। দিয়া মনের আনন্দে তৃপ্তির হাসি হাসিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রভৃতিতে ঐ মা ডাকটির বিচিত্র সুর ব্যঞ্জিত হইয়াছে; আজ হিল্লী-দিল্লী—বিলেত—আমেরিকা করিয়া ঘর ভুলিয়াছি। 'মা'কে আর মনে নাই। কিন্তু অফিসের কোট-প্যাণ্ট ছাড়িয়া দিনের মিথ্যার বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিতে অজ্ঞাতসারে আজও ঐ মা ডাকটিই ব্যবহার করিতেছি। আজও জীবনের বহুক্ষণে মন কেবলই একটি melodrama খুঁজিতেছে। যাহা চাহিয়া ফিরিতেছি বাসে ট্রামে চড়িয়া কেবলই তাহাকে অস্বীকার করিতেছি, আর সেই অস্বীকৃতির যুক্তি খুঁজিতে আর্টের সহায়তা লইতেছি। বলিতেছি—দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক আসলে melodrama। নাটকের ভাবের সাথে লেখকের ঐক্যানুভূতি নাটকগুলির মধ্যে যে Eloquence সৃষ্টি করিয়াছে, লেখকের কথাই নাকি সেখানে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

আসল কথা গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে, কথা বলিতে ভুলিয়াছি। উদাত্ত-কণ্ঠে আবৃত্তির মর্য্যাদা নাই। নটের মর্য্যাদা আজ স্বাভাবিকতার মাপ কাঠিতে। সুতরাং যাহা তীব্র, যাহা একান্ত, তাহার মর্য্যাদা কোথায়। এত গান শুনিতেছি,—না শুনিয়া পারিতেছি না বলিয়া শুনিতেছি। কিন্তু "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে"

—গানটিতো শুনিতেছি না। উহার মধ্যে যে আবেগ—যে তীব্রতা রহিয়াছে তাহা যে উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়া উঠার। অনেকটা Eloquent কিন্তু স্বগতোক্তিজাত স্বপ্নালু নয়, জীবনকে গড়ার আকাঙ্ক্ষায় তীব্র ব্যাকুল।

উনবিংশ শতাব্দীর লেখকগণ, বিশেষ করিয়া নাট্যকার গণ—লেখার মধ্যেও কথা বলিতেন। তাঁহাদের এই বলার ভঙ্গিটি নাটকে জাগিয়া আছে। এই বলা সকলের হইয়া বলা, সকলকে ডাকিয়া বলা, তাহারই ফলে সবলের ভাবটি লেখকের হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানা সমস্যার পীড়নে লেখকের সাথে জনগণের এই যোগটুকু হারাইয়াছি। এই ঐক্যবোধের তীব্রতায় যে Emotionটি প্রকাশ পাইত তাহা হয়ত 'একপেশে' বা partial, হয়ত আবেগ সমৃদ্ধ—এখনকার মত বুদ্ধি-দীপ্ত বা cerebral নয়, কিন্তু উহা বাঙ্গালীর। বিশেষ করিয়া তখনকার বাঙ্গালীর বিশেষ কথা। এই বিশেষ কথাটি একান্ত হইয়া জাগিয়া রহিয়াছে, নির্বিশেষের রস সাধনায় আপনাকে হারাইয়া ফেলে নাই। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের নাটককে কেহ বলেন—ঐতিহাসিক নাটক নহে, ইতিহাস মিশ্রিত নাটক। সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, মেবার পতন প্রভৃতি তাই নাকি ইতিহাসের মিশ্রণে কবি ভাবনার নাটক। কবি যেন তাঁহার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছেন—সেই ভাবনার ওঠা-পড়ার নাট্যরূপের ছবিই তাঁহার চরিত্রাবলী। কিন্তু শখের থিয়েটারগুলি আজও তাহাদের 'শখ' মিটাইতে দ্বিজেন্দ্রলালকে খোঁজে। আজও সাজাহান পুরাণ হইল না, আজও চাণক্যের মত বিশেষ ক্ষণে আমাদের বিরুদ্ধমন প্রতিহিংসায় জাগিয়া উঠিতে চায়। চায় অমনি হারানো কন্যার পুনঃপ্রাপ্তিতে নতুন করিয়া জাগিয়া উঠিতে। আঘাত প্রাপ্ত সর্পের মত হিংস্র ব্যর্থতায় জীবনের আস্ফালন অমনই বিরাট হাহাকারে ফাটিয়া পড়িতে চায়। আবার চাণক্যের সফলতা ত' আমাদের ব্যর্থতাক্ষুব্ধ মনের fancy ; ঐ fancy তো আজও পুরাণ হইল না।

সজ্ঞান মন ইংরাজী পড়িয়া কেবলই তুলনা করিতেছে—তিনি shakespeare হইলেন না। নিজেকে লুপ্ত করিয়া চরিত্রগুলির মত হইয়া উঠিলেন না। না-ই বা হইলেন। চরিত্রগুলি যদি তাঁহারই ভাবনার মত হইয়া আমাদের ভাবনা জাগাইল, তবে তো "সহৃদয়-হৃদয় সংবাদ" সৃষ্টি হইল। সেই সৃষ্টি সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ আমাদের মন আজও তাই দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে মুগ্ধ হয়।

আমাদের সাহিত্য আছে, কিন্তু সাহিত্যের tradition নাই; সাহিত্যের আনন্দের ভোজ আছে; সাহিত্যকে জীবনের কেন্দ্রে দেখিবার matthew arnoldএর মত বা Eliot এর মত প্রচেষ্টা নাই। থাকিলে দেখিতাম দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের জীবনের সমালোচনার অনেকখানি জুড়িয়া আছেন। আমরা নাটকের সার্থকতার সমালোচনা করি; বিদ্যাসাগরমহাশয় নীলদর্পণের অভিনয় দেখিয়া জুতা ছুড়িয়া মারিয়াছিলেন বলিয়া অনেক সময় তাঁহার Aesthetic sense-এ সন্দেহ প্রকাশ করি, কিন্তু জীবনকে মঙ্গলময় করিবার আবেগে সুন্দরের সাধনার প্রচেষ্টার পরিচয়ও তো বাঙ্গলা সাহিত্যে আর দেখিনা,—দ্বিজেন্দ্রলালে দেখি। বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্রে যাহার সার্থক সূত্রপাত, দ্বিজেন্দ্রলালে তাহারই lyric উচ্ছ্বাস।

আজ সাহিত্য—বিশেষ করিয়া নাটক উপন্যাস আদি narrative সাহিত্য cinemaকে আদর্শ করিতেছে। three dimensional হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। জীবনকে পূর্ণরূপে দেখাইবেন। কিন্তু হেম-মধু-বঙ্কিম হইতে 'একপেশে' দেখার একান্ত রূপটি দেখিয়াছি, তাহারই নাট্যভঙ্গী দেখিলাম দ্বিজেন্দ্রলালে।

কেহ বলেন তাঁহার নাটক যাত্রাধর্ম্মী; emotion হইতে emotionএ পরিবর্ত্তনের যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু আজও আমাদের রসিক মন তো যাত্রারই মন। আমাদের পুরাণ কাহিনী হইতে সুরু করিয়া আমাদের জীবনের কাহিনীগুলি কেবলই তো যাত্রার মত লাফাইয়া চলে। আর চলে বলিয়া উহাদের এত ভালবাসি। দ্বিজেন্দ্রলালও আমাদের তাই প্রিয়। কিন্তু তাহা স্বীকার করি না।

আমাদের সাহিত্যের কোনও মধ্যযুগ নাই যেখানে জীবন আদর্শ ও সত্য এক পরম ঐক্যে বিধৃত। ইংরেজী সাহিত্যে এই মধ্যযুগীয় আদর্শের দ্বারা বর্ত্তমান দুর্নীতিকে শোধন করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন carlyle, ruskin ও অবশেষ eliot. কিন্তু আমাদের বিংশ শতাব্দীতেও এই ঐক্য প্রচেষ্টার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালে ঐ ঐক্য প্রচেষ্টার স্বপ্ন সাধনা দেখি। জীবনে

যাহা দেখিলেন না, ইতিহাসে যাহার ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায়, অথচ অন্তর যে সত্যকে 'পরম' বলিয়া জানে তাঁহার সৃষ্টির আবেগ দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল,—ছিল না তাহাকে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বস্তু সাধনা বা eliotএর কথায় objective correlative। দ্বিজেন্দ্রলাল তাই উচ্ছ্বাসময়। নাটকের কাহিনী চলিতে চলিতে তাই বার বার সঙ্গীতে ও উচ্ছ্বাসময় সংলাপে ফাটিয়া পড়িতেছে।

আসলে কবি নিজেই তাঁহার ভাবনার 'বিভাব'। সুতরাং পাঠকের সাথে বা দর্শকের রসিক মনের সহিত সম্পর্কের যে correlation তাহা আসলে লেখকের সহিত পাঠকের বা দর্শকের নবপরিচয়। কিন্তু চরিত্রগুলি লেখকের ভাবনা ভাবিতে গিয়া বেশী ভাবিয়াছে! কখনও বা সেই ভাবনায় গান গাহিয়া ফেলিয়াছে অথবা কখনও গান গাহিবার মন লইয়া কথা বলিয়াছে যাহা শুনিতে শুনিতে মনে হয় যে উহা গান হইয়া উঠিলেই বুঝি ভাল হইত। লেখক ও পাঠকের মধ্যে চরিত্রগুলির আতিশয্য অনেক সময় তৃতীয় পক্ষের বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহারই ফাঁকে ফাঁকে কোন চরিত্রের মধ্য দিয়া লেখককে খুঁজিয়া পাই—নতুন বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। অপূর্ব্ব আনন্দের এক আবেগ বুক ঠেলিয়া বাহির হয়। জাহানারার উক্তি ভোলা যায় না। ভোলা কি যায় 'দিলদারকে'? হাসি ও অশ্রু কেমন সুন্দর মিলিল। জীবনকে ঐরূপ দেখাই তো আমাদের দর্শন।

আজকাল রবীন্দ্রনাথের সহিত সমস্ত কবির তুলনার প্রথা আছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবন ও সাহিত্যের আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। তাই রবীন্দ্র সাহিত্য হইতে পার্থক্যই আমাদের বিচারের বৈচিত্র্য হইয়া উঠিয়াছে। একটু উদার দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় মাইকেল বঙ্কিম-হেম-নবীন প্রভৃতির রচনা যেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের raw material, উহার রস-নির্য্যাসই তাঁহার কাব্য। জীবধর্ম্ম আপন বেদনা হারাইতে হারাইতে কাব্য হইয়া উঠে; সাহিত্য impersonal হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ সেই impersonality-র কবি। কিন্তু জীবধর্ম্মের বেদনা হারাইবার কাহিনীর কাব্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সার্থক-মুহূর্ত্তের কবি, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই মুহূর্ত্তে পৌঁছাইবার পথের কবি।

সাহিত্যকে যতই "escape from emotion" বলিতেছি কাব্য হইতে যতই আমিত্ব মুছিয়া দিয়া 'ক্লাসিক' হইয়া উঠিতে চাহিতেছি, ততই আমরা এই সব লেখকদের হারাইতেছি। দেশের সমস্যা, জীবনের একান্ত সাধারণ সমস্যাকে নিজের আমিত্বে ভরিয়া লইয়া উদাত্ত স্বরে তাহারই গান গাহিয়া ওঠার সেই 'উদারায়' আর পৌঁছাইতে পারিব না। আজ "সাধারণ-সমস্যা" ও "ব্যক্তি সমস্যা" আলাদা হইয়া গিয়াছে। সাধারণ সমস্যা ও ব্যক্তি সমস্যার যোগফল নয়, বরং সাধারণ সমস্যার সাথে ব্যক্তি জীবন সমস্যার অমিলের tragedyই আজ প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্য তাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভরিয়া উঠিতেছে। সেই eloquent আমিত্বের পরিচয় আজ কোথায়?

সময় যতই অগ্রসর হয় ততই সার্থক লেখকদের ভাল ও মন্দ নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করিতে থাকে; এবং ঐ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই প্রতিষ্ঠিত হয় কবির চিরকালীন রূপটি। উহাই যে বিরাট "ঐকতান" সভায় কবির পরিচয়। এই ঐকতানই তো Eliot-এর tradition। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লিখিয়াছেন, কখন লিখিয়াছেন প্রহসন, কখনও বা গান—হাসির গান। অথচ তাঁহার ঐ বিচিত্র রচনাবলী নিজেদের বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে 'কবি' দ্বিজেন্দ্রলালকে। দ্বিজেন্দ্রলাল কবিরূপে আমাদের কাছে ধরা পড়িয়াছেন। ইহা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান পরিচয়। কিন্তু Shakespeareকে অমন করিয়া ধরিতে পারি নাই। কবি, নাট্যকার প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা যতই তাঁহার কাছাকাছি যাইতেছি ততই মনে হইতেছে "এহ বাহ্য, আগে কহ আর।" 'আগের' কথা আর জানি না বলিয়া বিস্ময়ে চুপ করিয়া থাকি। রবীন্দ্রনাথকে কবি বলিলে অনেক বলা হয় বটে কিন্তু সব তো হয় না। সেখানে ত বিস্ময় আছে, তবে Shakespeare-এর বিস্ময় নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি লেখকদের বৈচিত্র্য কম, কিন্তু একটি বিশেষ পরিচয়ের গভীরতায় তাঁহারা আমাদের কাছে পরিচিত। দ্বিজেন্দ্রলালকে ত আমরা প্রধানতঃ কবি বলিয়া মনে করি। তাঁহার সমগ্র সাহিত্য ছাড়াইয়া তাঁহার কবিসত্ত্বার স্পন্দন কেবলই জাগিয়া উঠিতে চাহিতেছে। তাঁহার নাটক গান প্রভৃতির

একই রস: কবির অন্তরের সাথে পাঠক বা দর্শক-অন্তরের নতুন পরিচয়ের আনন্দোল্লাস। কবি যেন একটু eloquent। এই eloquence আবার দুই প্রকারের। কখনও প্রকাশভঙ্গীজাত কখনও বা theme বা বিষয় গৌরব জাত, কখনও বা এই দুইয়ের মিশ্রণে বিচিত্র।

আসলে উনবিংশ শতাব্দীর ঐ লেখকদের এবং দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে ছিল এক লিরিকসত্তা, যাহার একটি কাহিনী ছিল। সুতরাং স্বভাবত: এরা narrative শ্রেণীর কবি বা নাট্যকার। তাঁহাদের এই narrative fiction কাহারও হাতে মহাকাব্যের রূপে প্রকাশে উচ্ছ্বসিত, কাহারও মধ্যে উপন্যাসে বিন্যস্ত, আবার কাহারও মধ্যে নাটকে বিনীত। আসলে ইহারা narrative poets.

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক episodic, চরিত্র-বিশ্লেষণ তাঁহার প্রধান কথা নহে। নাটকীয় situation-জাত রসটুকু তাঁহার রচনায় প্রধান। ফলে চরিত্রগুলি অনেক সময় romantic বা ছায়াময় হইয়াছে, কিন্তু ঐ situation এর মধ্যে কবির অন্তর জাগিয়াছে। তাঁহার সমগ্র রচনাবলী এই জাগরণের বিচিত্র ইতিকথা।

আমরা ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে 'যাত্রাকে' নাটক হইতে আলাদা করিয়াছি। নিম্নস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি যাত্রার জন্য, নাটককে আরও মর্য্যাদা দিতে। 'যাত্রা' Miltonএর Satan-এর মত নিম্নজগৎ হইতে বারবারই নাটকের Adam ও Eve-কে ছলনা করিতেছে। নাটকের বহু প্রশংসিত Adam ও Eve-রাও অসতর্ক মুহূর্ত্তে Satan-এর ছলনায় ভুলিতেছে, নাটক যাত্রা হইয়া উঠিতেছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও এই চিরকালীন ছলনার অন্ত হইল না। আজ 'সেতু', 'তাপসী', 'উল্কা' প্রভৃতি নাটকের বহু প্রশংসার মূলেও আছে এই Satan এর ছলনা। এই সব নাটকগুলির প্রশংসার একান্ত স্বরূপটি চিন্তা করিলে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালে গিয়া পৌছাইব। দেখিব গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকার আমাদের ঐ যাত্রা প্রবৃত্তিকেই নাটকে কী সুন্দর স্থান দিয়াছিলেন। আমাদের জীবনের আবেগ দ্রুত পরিবর্ত্তনে মধুর। এই quick turns of emotion এদের নাটকে কী মধুর হইয়াই রহিয়াছে। এঁদের নাটক 'character in action' নয়,—"emotion in action."

সময় অগ্রসর হইয়া চলিবে, অহংকৃত মানুষ ভুলিতে থাকিবে ইঁহাদের কথা; কিন্তু জীবনের আবেগ যখনই সকলের হইয়া জাগিয়া উঠিতে চাহিবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণে ইঁহারা আমাদের মনে জাগিয়া উঠিবেন। ইঁহাদের এই melodramatic কাহিনী রূপটি বাঙ্গালীর জীবনের একান্ত রূপটিকে বার বার আমাদের কাছে তুলিয়া ধরিবে। কবির জন্মশতবর্ষপূর্ত্তিতে কবির এই পরম দানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

ঝড়, সমুদ্র, তুফান

শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত

একটা ঝড় উঠবেই তা জানি ॥
চকিতে উঠে জানালা বন্ধ করি
ঝড়কে যে ভয় মানি।
ঝড়ের গতি বেড়েই চলে, বেগে বেগে
রাতের সঙ্গে আমি একা থাকি জেগে।
সমুদ্র কখনো উত্তাল হয়,
কখনো তুঙ্গ
মত্ত-মৃত্যুর মত ছুটে আসে বারবার।

আর কিছু নয় সমুদ্র-তুফান
নিশ্চিত-অনিশ্চিতের ফরিয়াদ নিয়ে
সে এখনি এসেছে। এসেছে কি?
জীবন বিশাল, যেন এক সমুদ্র
তাই জীবনে যদি ঝড় ওঠেই,
তুফান নামে
কি জানি হারিয়ে যাব তার মধ্যে
শত শত প্রশ্ন নিয়ে।

পরিণাম

শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু অনুসন্ধান করেও কাবেরী যখন কোন একটা 'টিউশনির' জোগাড় করে উঠতে পারলে না—তখন তার মনের সবটুকু আশা-ভরসা হতাশার আঁধারে ডুবে গেল।

কোন একটা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করে মাসে যা পায় তা' হাতে মাথতে কুলোয় না। স্বামীও যা রোজগার করেন তাও অতি নগণ্য, তা'তে করে এই চার-পাঁচটী লোকের দু'বেলা দু'মুঠো খোরাক জুটিয়ে ঘর ভাড়া দিয়ে কিছুই থাকে না। তার উপর আবার তার মাস পাঁচেকের একটি মেয়ে। তার জন্যেও আজকালকার বাজারে খরচা বড় কম নয়। দুধ, সাগু-মিশ্রী, বিলিতী ফুড্, জামা ইত্যাদি তো আছেই তার উপর আবার বার-মাসে তেরো রোগ তো লেগেই আছে। ডাক্তার, পথ্য, ওষুধ, লোক-লৌকিকতা, ট্রাম-বাসাদি খরচা এইসব তো রয়েইছে। সিনেমা-থিয়েটার না হয় ছেড়েই দিলাম। এই সব চাহিদা মিটিয়ে অতি দুঃখেকষ্টে ধার-কর্জ্জ করে তবে সংসার চলে।

বড় রাস্তার ধারের অর্দ্ধভগ্ন বারাণ্ডার জানালাটা খুলে দিয়ে কাবেরী নিবিষ্ট মনে এই কথাই ভাবছিল। কি করবে সে, কেমন করেই বা সুষ্ঠুভাবে চালাবে। দিন দিন তো জিনিষ পত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলুচ্ছে না। এত যে দুঃখ কষ্ট—তা, জেনেও স্বামী যেন নির্ব্বিকার। মাত্র মাস মাহিনার টাকাটা কাবেরীর হাতে তুলে দিয়েই সব দায়-দফা থেকে নিশ্চিন্ত। কাবেরীরই যেন সব দায়। গৃহবধূ হয়েও আজ তাকে বাইরে বেরুতে হচ্ছে অনটনের দায়ে।

শীতের বেলা হু-হু করে কেটে যাচ্ছে। পড়ন্ত সূর্য্যের শেষ কিরণটুকু গাছের মাথায়, কোঠা বাড়ীর ছাতের কোণে পড়ে চিক্‌মিক্ করছে। কতকগুলো চড়ুই পাখী ওদিকের ফুটপাথের ধারে আধভাঙ্গা মন্দিরচত্বরে কিচির-মিচির শব্দে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে। অফিস্ ফেরতা বাস-ট্রামগুলোতে বাদুড়ঝোলা হোয়ে অফিসার বাবুরা যে যার ঘরে ফিরছে। কাবেরীর সে সব দিকে কোনই হুঁস্ নেই—গভীর তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হোয়ে সে সেখানে স্থাণুর মত বসে আছে।

যখন তার সে ভাব কাটলো তখন সন্ধ্যে গড়িয়ে এসেছে। সামনে বড় বড় রাস্তার দু'ধারে সবে দু' একটা করে আলো জ্বলে উঠছে। আশে-পাশের বাড়ী থেকে সন্ধ্যার শাঁখ বেজে উঠছে। সামনের আধভাঙ্গা মন্দির থেকে আরতি ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তার অন্তর ভেদ করে বেরিয়ে এল। অতীত স্মৃতির আলো-ছায়া তার চোখের সামনে এতক্ষণ ভাসছিল। সেই স্মৃতি গঠিত হোয়ে তার সারা মন জুড়ে এতক্ষণ তাকে সেই দূর অতীতের সুখচ্ছায়ে ভাসাচ্ছিল। আজ তার এই অবস্থা—আজ তাকে বাইরে বেরিয়ে জীবিকার জন্য ঘুরে মরতে হচ্ছে। অথচ একদিন সবই ছিল। কত আদরে স্নেহে সে মানুষ হয়েছে। বাপ-মা—ভাল ঘর বর দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন। পল্লীগ্রামের সেই স্নেহ-উচ্ছল স্বচ্ছল সুন্দর সংসার। শ্বশুর-শাশুড়ীর স্নেহের ধন। কত সুন্দর পরিবেশ—স্বামীর অফুরন্ত ভালবাসা সবই সে পেয়েছিল। তারপর হঠাৎ কি হোল দুরন্ত দুর্ম্মদ ঝড়ের একটা ঝাপটে কোথা দিয়ে কি হোয়ে গেল—সে আর ভাবতে পারে না। চোখের কোণ বেয়ে বিন্দু বিন্দু জলধারা টসটস্ করে ঝরে ঝরে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছিল।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটার পর হঠাৎ তার সম্বিৎ ফিরে এল। চোখের জলটাকে মুছে ফেলে নানান্ চিন্তা করতে লাগলো। কি-ই বা করবে সে, কাকেই বা বলবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার ছেলেবেলাকার বন্ধু মিনতির কথা মনে পড়ে গেল। কাছেই তো থাকে, একবার মিনতিকে বলে দেখবে। সে যদি কোন একটা উপায় করে দিতে পারে। এই ভেবে উঠে পড়লো সে। তাড়াতাড়ি করে কাপড় ছেড়ে নিয়ে মেয়েটাকে পিসির কাছে রেখে বেরিয়ে পড়লো সে।

মিনতির আজ 'টিউশনির' দিন—তাই তাড়াতাড়ি তৈরী হোয়ে নিয়ে সবেমাত্র পিছু ফিরে দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছিল এমন সময় কাবেরী এসে পিছু থেকে তার চোখটা টিপে ধরলো। হঠাৎ চমকে গিয়ে ভীত ত্রস্ত হয়ে মিনতির কণ্ঠ দিয়ে এক রকম গোঁঙানীর শব্দ বেরিয়ে এল এবং কাবেরীর হাত দুটো চেপে ধরে ফেললো। কাবেরী চোখ থেকে হাত দুটো ছেড়ে দিতে দিতেই খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো—আর মিনতি কাবেরীকে দেখেই বলে উঠলো—মর্ পোড়ারমুখী! হঠাৎ এতদিন বাদে মরতে এসেছ কেন? আমি মনে করলাম—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাবেরী বললে: কি মনে করেছিলি ভাই! তোর কোন অজানা অচেনা কিম্বা কিছু চেনা-চেনা তোকে লুট করতে এসেছিল—

মিনতি বললে: ধ্যেৎ তা' কেন!—আমি মনে করলাম কোন বদ্‌মায়েস্ ডাকাত-টাকাত হবে নাকি?—আজকাল যা অরাজকের রাজত্ব!—

কাবেরী হাসতে হাসতে বললে: যদি এমন আইবুড় ডাঁশো-টাঁশো রূপবতীকে কোন চেনা ডাকাত লুটেই নেয় তো দোষ কি? বরং তা'তে সুখই পাবি—

মিনতি রাগের অভিনয় করে বলে: মর্-মর্! তুই মরেছিস্ বলে আমাকে মরতে বলিস্! তা হঠাৎ কি মনে করে—

হঠাৎ নয় ভাই—এসেছি বিশেষ দায়ে পড়েই। কিন্তু তুই তো এখন বেরিয়ে যাচ্ছিস্—সব কথা তো তোর শোনবার সময় হবে না এখন—

—চল্‌না সংক্ষেপে বলতে বলতে বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছ অবধি—

কাবেরীর মুখে সমস্ত শুনে মিনতি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে: যত শীগগির পারি আমি তোর জন্যে একটা 'টিউশনির' ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করব। তুই কিচ্ছু ভাবিস্ না—বুঝলি।—বলে আগত বাসে উঠে পড়লো—আর কাবেরী খানিক এধার ওধার ঘুরে-ফিরে বাড়ীর পানে এগিয়ে গেল।

দশ পনেরো দিন বাদে মিনতি কাবেরীকে নিয়ে বালীগঞ্জের এক ধনীগৃহে এসে হাজির হোল। ধনী-গৃহিণী উমাদেবী সানন্দে তাদের আহ্বান করে সাদরে বসালেন এবং একথা-সেকথার পর উমাদেবী তাঁর কন্যার শিক্ষার ভার কাবেরীর হাতে অর্পণ করলেন। তাঁর কন্যাটি বার দুই 'স্কুল ফাইনাল' পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়েছে। এইবার তৃতীয়বার 'প্রাইভেটে' দেবে—তাই একজন ভাল শিক্ষয়িত্রীর কথা মিনতিকে বলেছিলেন। ইতিমধ্যে জনতিনেক শিক্ষয়িত্রী হাত বদল হ'য়ে গেছে।

মিনতির সঙ্গে ইঁহাদের বহুদিনকার আলাপ—সেই সূত্রে এখন খুব ঘনিষ্ঠতায় পর্য্যবসিত হয়ে গেছে। উমাদেবীকে মিনতি মাসিমা বলে ডাকতো। তাই প্রসঙ্গক্রমে মিনতি কাবেরীর ভাল করে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বললে: দেখুন মাসিমা—আমি এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম। আমার ছোটবেলাকার বন্ধু—একই গ্রামে আমাদের বাড়ী এবং এক সঙ্গেই লেখাপড়া খেলাধুলা সব করেছি। আনুপূর্ব্বিক সব কথা বলে উমাদেবীকে বুঝিয়ে দিলে। তারপর আবার বললে: জানেন মাসিমা? ও শুধু ভাল পড়ায় না, খুব ভাল গানও গাইতে পারে। উমাদেবী সহাস্যে বললেন: তাই নাকি? তাহলে তো খুবই ভাল মা মিনতি। বলে আনন্দের আতিশয্যে উৎফুল্ল হোয়ে কন্যাকে ডাক দিয়ে বলেন: ওরে ও তপতী, কোথায় গেলি! এখানে আয় না মা—দেখে যা তোর মিনতিদি তোর জন্যে কি এনেছে দেখবি আয়।

পাশের ঘর থেকে একটি কুড়ি, বাইশ বছরের তন্বী যুবতী আঁচল উড়িয়ে প্রজাপতির মত বেরিয়ে এলো—তা'কে দেখে উমাদেবী কাবেরীকে প্রণাম করতে বললেন।

কিন্তু তপতী কপালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে কেমন যেন অভিনেত্রীর মত দাঁড়াল। উমাদেবী যদিও তার এই

আচরণে ক্ষুণ্ণ হলেন—তবুও তখন কিছু আর বলতে পারলেন না। শুধু কাবেরীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর মিনতিকে উদ্দেশ করে বললেন: ঠিক আছে মা মিনতি, তাহলে কাল থেকেই কাজ আরম্ভ করতে বোলো।

জলযোগ শেষ করে যখন তারা পথে এসে দাঁড়াল তখন কাবেরী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কণ্ঠে বললে: ভাই মিনু, তুই আমাকে বাঁচালি—তোর ঋণ আমি জন্মে শোধ করতে পারবো না।

মিনতি কৃত্রিম রাগতঃ ভাবে বললে: যা, যা, তোকে আর অত ন্যাকামি করে কৃতজ্ঞতা দেখাতে হবে না—কবে থেকে এই সব বুলি শিখেছিস্ রে?

কাবেরী ছলছল নয়নে মিনতির পানে তাকিয়ে রইল—কথাটি আর বলতে পারলে না—একটা আবেগ তার রাঙা মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল। তাই দেখে মিনতি সস্নেহ কণ্ঠে বললে: নে, এবার খুব করে কাঁদ্! আরে বোকা মেয়ে, ওসব তো মানুষেরই কাজ। এমন কিছু তো করিনি ভাই! এখন জিজ্ঞেস্ করি—কই, মাইনের কথা তো কিছু শুনলি না—তোর তাতে পোষাবে কিনা?

—সে আবার কি জিজ্ঞেস্ করব বল? তুই তো আছিস্ যা করবার করবি!

—বারে মেয়ে! ওরা যা দেবে তা'তে তোর পোষাবে কিনা দেখবি না?

—আমার দেখবার দরকার নেই ভাই—সে তুই আছিস্—

—বেশ, তবে শোন্—সোত্তোর টাকা মাইনে আর যাতায়াতের দরুন আরও পনেরো টাকার ব্যবস্থা করেছি—কিরে, কিছু কম বললাম নাকি বল দেখি—

—না, না,—এ যে অভাগীর স্বর্গ ভাই—তুই আমাকে বাঁচালি—বলতে বলতে তারা দুজনে আগত বাসে উঠে বসলো।

* * *

উমা দেবীর সস্নেহ দৃষ্টি কবেরীর উপর বর্ষিত হয়েছে। কন্যা তপতীর শিক্ষণের ভার নিয়ে কাবেরী এই ক' মাস যাবৎ অবিশ্রান্ত প্রাণপণ শক্তিতে খেটে আশাতীত সুফল লাভ করেছে। ধনীকন্যা তপতী যেন আলালের ঘরের দুলালী। একটুতেই যেন ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া গোচের মেয়ে। আদরে আবদারে আধুনিক বিলাসিতার চরম উপকরণে যেন একটি সখের অভিনেত্রীকেও হার মানায়। চলিয়ে, বিলিয়ে, নাকিসুরে সিনেমা অভিনেত্রীদের অনুকরণের নানান্ অশ্লীলতার ঢংএ কথা বলা, হাবে, ভাবে, লাস্যে যেন বাতাসে ভেসে বেড়ায়। নানান্ বিচিত্র ব্যসন বসনে, নানান্ সুরুচি বিগর্হিত কায়দায় সাজসজ্জার ঘটাপটায় চলাফেরা করে। কুমারী মেয়ের দেহে যে একটা পবিত্র ভাব থাকে তা তার এই দেহ থেকে যেন অন্তর্হিত হতে বসেছে। আজ পার্টি, কাল জলসা, বিকালে সিনেমা, পরশু অমুকদার সঙ্গে বনভোজন—এমনি নিত্য রুটিন বাঁধা। এ হেন মেয়ের শিক্ষণের ভার নেওয়া যে কতদূর কঠিন দায়-দায়িত্বের বিষয় ভুক্তভোগী মাত্রই তা জানে। তবুও কাবেরীর অক্লান্ত পরিশ্রমে কুমারী তপতীও 'স্কুল ফাইনাল' পরীক্ষায় পাশ করল। আর কাবেরীরও মান বাড়লো।

তপতী এখন 'ফার্ষ্ট-ইয়ারের' ছাত্রী। এখন তার জন্যে একজন নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু কাবেরীকে উমাদেবী ছাড়েন নি। কারণ কাবেরী সঙ্গীত বিষয়েও বিশেষ পারদর্শিনী ছিল। তাই তপতীর সঙ্গীত শিক্ষার ভার তারই উপর ন্যস্ত ছিল।

অল্প দিনের মধ্যেই কাবেরী উমাদেবীর মন জয় করে ফেলেছিল—তার অমায়িক ব্যবহারে এবং একটা খুব নিকট ঘনিষ্ট সম্পর্কে এসে পড়েছিল। তাই যে কোন পার্টি, জলসা—সবেতেই কাবেরীকে নিয়ে যাওয়া এঁদের চাই ই–চাই। অথচ, কাবেরী বহুবার বহু ক্ষেত্রে যেতে অস্বীকার করেছে। কারণ তার সংসার আছে। তাছাড়া ছোট মেয়েটাকে অন্যের হেফাজতে রেখে নিজের মনে কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠাই জেগে থাকতো। তাছাড়া স্বামীও এসব উগ্র আধুনিকতা বিশেষ পছন্দ করত না। এই নিয়ে আজকাল স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই কলহের সৃষ্টি হতে থাকতো। এইভাবেই চলে কিছুদিন।

অথচ, এমনি একটা অন্ধ মোহ কাবেরীকে রোজ রোজ পেয়ে বসতে থাকলো—যার আকর্ষণে শত চেষ্টা করেও সে তার মনকে বাঁধতে পারতে না, যেতে হোত উমাদেবীর বাড়ী। আভিজাত্যের বিলাস মদিরায় তার মনকে একটু একটু করে আচ্ছন্ন করে তুলতে লাগলো।

অতীতের সুখস্পর্শ থেকে হঠাৎ এই দরিদ্রতায় যে মন একদিন তাকে পথে বের করল সেই মনই তাকে হঠাৎ অগাধ আভিজাত্যের মধ্যে এনে বিভ্রম করে তুললো। সে মনে মনে চিন্তা করতো, এই রকম যদি তার অবস্থা হোত তাহলে আর তাকে এমন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করতে ঘুরে বেড়াতে হোত না। নিজের জীবনকে এক এক সময় ধিক্কার দিত। কিছু তার ভাল লাগতো না—এমনিভাবে উপজীবিকা বহন করা, সংসারের আবার উদয় অস্ত কাজকর্ম্ম করা সব যেন এক এক সময় তার মনকে তিক্ত বিষাক্ত করে তুলতো। এই আভিজাত্যভরা পরিবেশে তার মনকে দিন দিন ভরিয়ে তুলতে লাগল। নিজের পানে চেয়ে দেখতো, পরিপূর্ণ-যৌবনউচ্ছলা খরস্রোতা রূপময়ী যে নারীত্ব—সে যেন আজ কানায় কানায় ভরা, সে যেন আজ ছুটে যেতে চায় আপন বেগে এক উদ্দাম আবেগে। গতি ছন্দে কল্‌কল্ ছলছল লাস্যে, হাস্যে, নৃত্যে সব কিছু সম্মুখের দুস্তর বাধা-বিপত্তিকে ভেঙেচুরে তচ্‌নচ্ করে আপন আবেগে এক অনাগত সুখের বিকৃত কামনার উৎস নিয়ে।

* * *

প্রতি বছরই তপতীর জন্মোৎসবটা বেশ জাঁকজমক করেই সম্পন্ন হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হোল না। পূর্ব্ব থেকেই উদ্যোগ আয়োজন চলছিল। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব নিমন্ত্রিত হোল—এবং সেই সঙ্গে কাবেরী ও মিনতিকে বিশেষ করে বলা হোল। যথা সময়ে জোগাড় যন্ত্র সারা হোল। গৃহ আলোকমালায় সজ্জিত করা হোল। নানান্ উপকরণ দ্রব্য সম্ভারে থরে থরে সাজান হোল ঘর, দোর,বারাণ্ডা, সিঁড়ি,নানান্ কায়দাকানুনে ও দ্রব্যসম্ভারে। তারপর নির্দ্দিষ্ট দিনে নানান বসনভূষণে ভূষিত হ'য়ে কপালে চন্দনের টিপ পরে পুরোহিতের আশীর্ব্বাদসহ ধান-দুর্ব্বা মাথায় নিয়ে তপতীর মধ্যাহ্ন কেটে গেল।

সন্ধ্যায় অতিথি অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত হোয়ে রইল। গৃহ আলোকে, পুষ্পে, গন্ধে সমুজ্জ্বল হোয়ে ভ'রে উঠলো। একে একে আমন্ত্রিতরা আসতে সুরু করল। কত উচ্ছ্বাস, কত প্রীতির ডালি, কত পুষ্প স্তবক, নানান্ উপহার দ্রব্যসম্ভারে ঘর ভরে যেতে থাকলো। ষোড়শী, অষ্টাদশী, পঞ্চবিংশতি, অনূঢ়া, বিবাহিতা যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রৌঢ়প্রৌঢ়া—যুবক কত জনই না এলো! কত কথা, কত হাসি, কত কৌতুক, কত রঙ্গরস, কত রাগ-অনুরাগ, কত বিরহ, কত চোরা চাউনি, কত কটাক্ষ—সব মিলেমিশে সেই স্থানে যেন গঙ্গার জোয়ার-ভাটা খেলে বেড়াতে লাগলো। তার মাঝে আবার ছোট শিশুরাও আছে। তাদের দাপাদাপি, লাফালাফি, কলহ-ক্রন্দন, হাস্য সবই ওই একই সঙ্গে সাগর সঙ্গমে মিশে যাচ্ছে।

তপতী তার বন্ধু-বান্ধবীদের আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত। ওধারে আমন্ত্রিতদের বসবার যে স্থান নির্ব্বাচিত হোয়েছিল সেখানে কাবেরী হারমনিয়ম নিয়ে বসে একের পর এক এক করে তার সুরেলা কণ্ঠের গানের মূর্চ্ছনায় ভরিয়ে তুলছে। পাশে মিনতি বসে আছে। অনতিদূরে দেওয়ালের দুই কোণে পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পদানে সজ্জিত হয়ে সুরভি বিলাচ্ছে। ধূপ ও ঘৃতদীপ জলছে। বিজলি পাখার বাতাসে তা' থেকে সুরভিত সুগন্ধে ঘর আমোদিত।

উমাদেবী ও তাঁর স্বামী তীর্থবাসবাবু ওধারে নিমন্ত্রিত-দের আহারের ব্যবস্থায় রত আছেন। তপতী একবার ওপর একবার নীচেয় এসে তদারক করছে। কখনও কোন বান্ধবীর গলায় হাত দিয়ে রহস্যালাপ করছে। এমন সময় তার দূর সম্পর্কের মাসতুত ভাই স্বপন এসে হাজির হোল। নিটোল সুস্বাস্থ্যপূর্ণ গৌরবর্ণ আধুনিক কেতাদুরস্ত যুবক। তাকে দেখে তপতী বলে উঠলো: বাব্বা! এত-ক্ষণে তোমার আসার সময় হোল স্বপনদা—

স্বপনকুমার সহাস্যে বললে: কি করি ভাই বল্—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তপতী বললে: জানি, ওজর দিতে তুমি খুব ওস্তাদ। অত করে বলে এলাম যে, এই সব কাজের ভার তোমায় নিয়ে সব বিলি ব্যবস্থা করে দিতে হবে—বাপীর—মা'র, শরীর খারাপ, তা' বাবুর আর আসা হোল না—বলে অভিমানের আতিশয্যে সিনেমার ঢংএ ঠোঁট ফোলাতে লাগল। স্বপনকুমার তপতীর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বললে: রাগ করিস কেন বোন! আমি সত্যিই একটা বড় সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলাম নইলে নিশ্চয়ই আসতাম। সে কি আর বলতে হোত রে—

তপতী তামাসাচ্ছলে বললে: কি এমন সমস্যা বাবা! এ ধারে তো 'কাকস্য পরিবেদনা'—আইবুড়ো

ছেলের আবার এতো সমস্যা কিসের? বলে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে যেতে বললে: চল আজ তোমায় গানের আসরে ভর্ত্তি করে দিই—বলেই যেখানে কাবেরী, মিনতি প্রভৃতি অন্যান্য মেয়েরা বসেছিল সেখানে নিয়ে গেল। স্বপন যেতে যেতে বললে: আরে! করিস্ কি? ওখানে যে সব মেয়েরা আছে—

আছে তো কি হয়েছে? তোমাকেও কাবেরী দি'র দলে ভর্ত্তি করিয়ে দিয়ে আসি—ওই দলের দলিও তো তুমি একজন। বলে একেবারে কাবেরী যেখানে বসেছিল সেখানে নিয়ে গেল।

এধারে তপতীর বান্ধবীদের মধ্যে চোখ ঠারাঠারি চলতে থাকলো। কাবেরী স্বপনের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই গান বন্ধ করে দিলে। এই সৌম্য সুন্দর যুবকের পানে কতক্ষণ যে বিমূঢ়ের মত চেয়েছিল তার খেয়াল ছিল না। পুরুষের মধ্যেও যে এমন কমনীয়তা থাকতে পারে তার তা জানা ছিল না। তপতীর ডাকে তার সেই তন্ময়তা বাধা প্রাপ্ত হ'তে না হ'তে সে লজ্জায় মাথাটা আনত করে ফেলেছিল। কি জানি কেন ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় তার সর্ব্ব শরীর সহসা রোমাঞ্চিত হোয়ে উঠেছিল। আর ক্ষণিকের দৃষ্টি বিনিময়ে স্বপনেরও যেন কেমন একটা তন্ময়তা এসে গিয়েছিল। অনিন্দ্যসুন্দরী কাবেরীর রূপ-মুগ্ধ স্বপনকুমার কিছুক্ষণ যেন অনড় হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল—হুস্ ভাঙ্গলো দু'জনের তপতীর ডাকে: স্বপনদা, ইনি হচ্ছেন কাবেরীদি—বলে পরিচয় করিয়ে দিলে আর কাবেরীকে বললে: ইনি স্বপনদা, আমার মাসতুতো ভাই—এবং একজন নামজাদা গাইয়ে—

কাবেরী সঙ্কুচিত ভাবটাকে কাটিয়ে নিয়ে বললে: বেশ, বেশ, ওঁকে এবার আমরা দু' একটা গাইতে অনুরোধ করছি—

স্বপন বললে: না, না, আপনারা গান—আমার শরীরটা ভাল নেই বলে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল। আর মিনতি এই সব লক্ষ্য করে কাবেরীকে বললে একটু রূঢ় কণ্ঠে: নে নে, তাড়াতাড়ি আর গোটাদুই গান গেয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাড়ী যাবার পথ দেখি।

* * *

উমাদেবীর একান্ত অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত মিনতি ও কাবেরীকে থাকতে হোল। এবং উৎসবশেষে উমাদেবী স্বপনকুমারের গাড়ীতে কাবেরী ও মিনতিকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। স্বপনকুমার মিনতিকে প্রথমে পৌঁছে দিয়ে তারপর কাবেরীকে পৌঁছাতে গেল। চলার পথে উভয়ের পরিচয়ান্তে বেশ কিছুক্ষণ উভয়েই একেবারে চুপচাপ। তারপর বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই কাবেরী বললে: এইখানেই আমায় নামিয়ে দিন। এটুকু পথ আমি নিজেই চলে যাব।

স্বপনকুমার বললে: কেন,—আপনি মেয়েছেলে, অধিক রাত্রি হোয়ে গেছে—একলা এতটা পথ নাইবা গেলেন—আমি বাড়ীর দরজায় পৌঁছে দিচ্ছি।

কাবেরী বল্লে: না থাক—আমাকে এইখানেই নামতে দিন—বলে সে গাড়ীর দরজায় হাত দিলে। অগত্যা সেই খানেই কাবেরীকে নামিয়ে দিয়ে স্বপনকুমার চলে গেল। কাবেরীও ওই পথটুকু গিয়ে বাড়ীতে ঢুকলো। দরজা খোলাই ছিল। উপেনবাবু এতক্ষণ তার আসার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে সেই সবেমাত্র ঘরে গিয়ে শোবার উপক্রম করছেন। কাবেরী ঘরে ঢুকতেই বিদ্রূপের সুরে উপেনবাবু বললে, আজ আর নাইবা আসতে! এই রাতটুকু কাটিয়ে এলেই তো পারতে?

কাবেরীও দীপ্তস্বরে বললে: পারলে তো বাঁচতুম্।

উপেনবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন: তা বাঁচবে বৈ কি—বাঁচবে না—বিবাহিতা যুবতীর পরপুরুষের সঙ্গে একলা এত রাত্রে আসতে লজ্জা করে না?

কাবেরী চড়াস্বরে বললে: কি বল্লে, মুখ সামলে কথা বল? না জেনেশুনে অমন ইতরের মত কথা বলতে যেও না—বলেই আর না দাঁড়িয়ে কলঘরে ঢুকে গেল। আর উপেনবাবু রাগে দুঃখে গজরাতে লাগলেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে। কাবেরী এলো কি গেল আর কোন দিকে চেয়ে দেখলেন না। কাবেরী কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘরে ঢুকতে যাবে—তখনও উপেনবাবুর তীক্ষ্ণ শ্লেষপূর্ণ কথাগুলো তার কানে এসে একটা অন্তর্দাহ সৃষ্টি করছিল। উপেনবাবু বলছিলেন: বিবাহিতা স্ত্রী যদি তার স্বধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হয় তার পতন অবশ্যম্ভাবী। আমি বেশ লক্ষ্য করছি দিনে দিনে তোমার মন এক নতুন উগ্র আভিজাত্যে ভরে

যাচ্ছে আর তার সঙ্গে আছে”—কাবেরী তখন কথার পিঠে উত্তর দিলে: কি আছে? যা আছে তা আজ তোলাই থাক—রাত হেয়ে গেছে—ঘুম পাচ্ছে—আর পাড়ার লোকও জেগে উঠবে বরং কাল এর জবাবদিহি করলেও কিছু এসে যাবে না—। বলে খাট থেকে বালিশটা সজোরে টেনে নিয়ে আঁচলটা মেঝেতে বিছিয়ে শুয়ে পড়লো—আর উপেনবাবু কিছুক্ষণ আরও গস্ গস্ করতে করতে নীরব হলেন এবং তাঁর নাসিকাধ্বনি তীব্রভাবে ধ্বনিত হতে থাকলো।

* * *

আগে সপ্তাহে তিনদিন তপতীকে গান শিখিয়ে আসতো কাবেরী। এখন প্রায় প্রত্যহই তার যাওয়া সুরু হোল। এবং সেখানে আজকাল বেশীর ভাগ দিনই স্বপনকুমারকেও দেখতে পাওয়া যেত। কোন কোন দিন ওরা একই সঙ্গে আসতো এবং কাবেরীকে তার বাড়ীর কিছুদূরে ছেড়ে দিয়ে চলে যেত। এমনি করে কিছুদিন চলার পর—কাবেরীর তপতীদের বাড়ীতে যাওয়া ঢিলে পড়ে গেল। প্রথমে দু’দিন অন্তর তারপর চারদিন অন্তর এমনি করে করে যাওয়া প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হোল। অথচ সন্ধ্যার সময় কাবেরীকে তার বাড়ীতে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যেত না। রাত্রি আট-টা নটার কম বাড়ী ফেরে না। উপেনবাবু যেন নির্ব্বিকার ভাবে সমস্ত ধৈর্য্য ধরে শুধু দেখে যান—কিছু বলেন না। পিসিমা মাঝে মাঝে রাগ গোঁসা করেন বটে কিন্তু নানান অজুহাতের মিথ্যা কথার ছলনায় তাঁকে শুব্ধ করে দেয় কাবেরী। নোটের গোছাটা এনে হাতে গুজে দেয়। বলে: দু’তিনটে টিউশনি করতে হয় তা’ রাত হবে না পিসি? নইলে সংসার চলবে কি করে? পিসি ভাবেন যে তাইতো? সত্যিই তো বৌয়ের কি দোষ—বেচারাকে উদয় অস্ত অন্ন চিন্তা করতে হয় তো। তাই তিনি আর বিশেষ কিছুই বলেন না—পাড়াগাঁয়ের মানুষ অতশত কিছু বোঝেনও না। এধারে স্বপনকুমারের সাহচর্য্যে কাবেরী বিভোর। মাসান্তে স্বপন কাবেরীকে টাকা দেয়—সেই টাকা নিয়ে কাবেরী এসে পিসির হাতে দিয়ে মুখ বন্ধ করে। এমনি করে চলে কিছুদিন। এক-দিন অফিস্ থেকে ফিরতে উপেনবাবুর একটু রাত হোয়ে গেল। চৌরঙ্গীর ‘বাস স্টপেজে’ বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ স্বপনের গাড়ীটা তারই সামনে দিয়ে ভিড় ঠলতে ঠেলতে এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ উপেন বাবুর নজর তাদের গাড়ীর পানে পড়ে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলেন কাবেরী বসে আছে স্বপনের পাশে। বেশ পরিষ্কার ভাবে বারে বারে দেখতে লাগলেন—হ্যাঁ, কাবেরীই তো? তখন যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিন্তু তবুও তিনি দেখলেন স্থির দৃষ্টি দিয়ে, স্বপনের সঙ্গে কাবেরী কেমন সহজ সরল ভাবে হেঁসে হেঁসে কি যেন বলাবলি করতে করতে যাচ্ছে। আপাদ-মস্তক তাঁর জ্বলে উঠলো। মিথ্যার বেশাতি করে নিজের বিবেক ধর্ম্মকে যে কাবেরী বিসর্জ্জন দিতে পারে, এবং সর্ব্বোপরি তার সতীত্বকে পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়ে মিথ্যা ছলনার খেলা খেলতে পারে, তা এতদিন ঠিকমত উপলব্ধি করে উঠতে পারছিলেন না উপেনবাবু। আজ চাক্ষুষ দেখে সে মোহ ভেঙ্গে গেল। তিনি আগত বাসে উঠে পড়লেন। এবং মনে মনে ভাবলেন এরা সব পারে। মিথ্যার অভিনয় করতে এদের জুড়ি নাই। তথাপি তিনি সব দেখেশুনে এতটুকুও মুখ খুললেন না, এবং কাবেরীকে পারৎ পক্ষে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতেন শুধু এর শেষে পরিণতি দেখতে চাইলেন।

* * *

এর মধ্যে তপতী সন্ধ্যার সময় প্রায়ই কাবেরীর খোঁজে আসে। কিন্তু প্রত্যহ-ই তাকে বিফল মনোরথে ফিরে যেতে হয়। পিসিমাকে জিজ্ঞেস্ করলে বলেন: এমন সময় এলে মা—এখন তো বৌমা পড়াতে গেছে। উপেন বাবুকে জিজ্ঞেস্ করলে বলেন: আমি জানি না। তবে, উপেনবাবু ও পিসিমা, তপতীকে যথেষ্ট খাতির যত্ন করেন। তপতীও কিছু সময় এখানে নানান্ গল্প-গুজবে মেতে থেকে তারপর চলে যায়। কাবেরী এসে শোনে কিন্তু কিছু বলে না। বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াতে বসে। এমনি করে চলে অভিনয়।

* * *

এর পর প্রায় বছরখানেক পরের ঘটনা। ইতিমধ্যে কাবেরীর মেয়েটি আর এ সংসারে নাই। কাল সংক্রামক ব্যাধি তাকে কালের কোলে তুলে দিয়েছে। কিছুদিন শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে কাবেরী বেদনার বোঝা বয়ে

বেড়িয়েছে। তারপর মায়ামোহভরা কালেরই মোহিনী জালে ধীরে ধীরে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। এমনিই এই সংসারের নিয়ম। সবাই বলে আমি অমুককে ভালবাসি, তমুকের জন্যে প্রাণ দিতে পারি। সামনে রক্ত-মাংসের দেহ যতক্ষণ জীবন্ত প্রাণবন্ত থাকে ততক্ষণ কতই না এই ধার করা খোসামুদি করা ভালবাসা—এর কোন মূল্য নেই। যখনই সেই সবল দেহটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়—এই সংসার থেকে চিরদিনের মত বিলীন হয়ে যায় তখন দু'তিনদিন একটু ব্যথা, একটু বিরহ, একটু আঘাত মনের মধ্যে গুমরে মরে—তারপর যেইকে সেই। গতানুগতিক সংসার চলে, খায় দায়, আমোদ-আহ্লাদ করে, সবই কালের মোহে পড়ে সব স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে যায়। এত ভালবাসাবাসি, এত স্নেহ, প্রেম, বিরহ কোথায় ভেসে যায়—মনের কোণে এতটুকুও দাগ রেখে দেয় না। স্বার্থের সঙ্গে সবই সম্বন্ধ। আবার নতুন করে খুঁজতে থাকে নতুন পথকে। কাজেই, আমি অমুককে ভালবাসি তমুককে স্নেহ করি ওসব স্বার্থেভরা ফাঁকা বুলি মাত্র। মানুষ ভালবাসে শুধু নিজেকে। নিজেকে ছাড়া সে আর কাউকে ভালবাসে না—ভালবাসতে পারে না। বাকী যা করে সে শুধু নিজের ভালবাসার উপকরণ জোগাবার জন্য। নিজের স্বার্থের জন্য মিথ্যার অভিনয় করে চলে। কাজেই ধীরে ধীরে সব বেদনা কাবেরীর মনের কোণ থেকে মিলিয়ে গেল।

এরি মধ্যে একদিন তুমুল কাণ্ড ঘটে গেল। এতদিনকার জমা বারুদে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলো। নীরবে উপেনবাবু যা এতদিন না হজম করতে—না উগ্‌রে তুলে ফেলতে পারছিলেন আজ হঠাৎ 'দু' এক কথায় কথায় আগুন লেলিহান মূর্ত্তি নিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। এতদিন যে একমুখী সত্বার দুজনে চলছিল একই টানে আজ উভয়ের বিভিন্নমুখী সত্বা পরস্পরকে ভিন্ন মতে এবং ভিন্ন পথে নিয়ে চলছিল। উপেনবাবু চাইতেন, স্ত্রী, সে—সে, থাকবে গৃহাঙ্গনে। পূজা পার্ব্বণ, বার ব্রত হিন্দুর প্রাচীন যা আচার-আচরণ আছে তাই নিয়ে। অন্নপূর্ণার মত গৃহকে করবে স্নেহে, মমতায়, ধর্ম্মে প্রীতিতে পরিশোভিত। কিন্তু কাবেরী চায় বহির্মুখী সত্বা। কাজেই উভয়ের এই মতভেদকে কেন্দ্র করে আগুন ছাই চাপা থেকে থেকে হঠাৎ একদিন জ্বলে উঠলো। তাই সেদিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ চিত্তে উপেনবাবু কাবেরীকে বলে দিয়েছেন যে—এতদিন যা করেছ তা' করেছ আমি সমস্তই জেনেছি এবং জেনেও কিছু বলিনি—সব তিলে তিলে সহ্য করে গেছি। স্পর্দ্ধা তোমার সীমা ছাড়িয়ে গেছে! তাই আজ থেকে আমার আদেশ যে, তোমার বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না। স্ত্রীলোক সে স্ত্রীলোকই—অন্তঃপুরেই তার বাস এবং তাই তাদের শোভা। বাইরে বেরুলেই নানান্ প্রলোভনে মনকে করবে আচ্ছাদিত এবং নানান্ লালসার জ্বালায় অন্তর জ্বলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। না পাবে নিজে শান্তি-সুখ না পারবে দিতে স্বামীকে। কাজেই ওসব শৃঙ্খল এবং শৃঙ্খলা ভাঙবার চালাকী না করে থাকতে হবে গৃহাভ্যন্তরে গৃহবধূরূপে। যা চিরন্তন, যা শাশ্বত—সেই দেবীর মূর্ত্তি নিয়ে। ভিতরের ক্ষুধার তাড়নায় যারা শৃঙ্খল এবং শৃঙ্খলা ভেঙে বেরিয়ে আসতে যত যুক্তিজালই বিস্তার করুক না তাদের সে সব বুলি শুধু ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। কলুষিত মন নিয়ে তারা আর সবাইকে কলুষিত করতেই তাদের এত আয়োজন। প্রকৃত সত্যকে চাপা দিয়ে তারা মিথ্যার ছায়া নিয়ে হাঁক ডাক করে পতঙ্গের মত আলোর পিছেই ছুটে যায়। ওসব তাদের চালাকীর ছলাকলা মাত্র। এই রকম বুদ্ধি নিয়ে তারা সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি-ন্যায়পরায়ণতা বিবেক সব কিছুকে ভেঙে দিতে চায় তাদের শাঠ্যের লোভের কামনায়। ব্যভিচারের পঙ্কিল আবর্ত্ত রচনা করতে চায় পবিত্র শোণিতকে কলুষিত করে। নিজেকেও বঞ্চিত করে অপরকেও বঞ্চনা করে।

কিন্তু কাবেরী এই সব যুক্তি মেনে নিতে পারে না। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গী পিঞ্জর মুক্ত হ'লে আর সে সেই পিঞ্জরে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে চায় না। কাজেই কাবেরী তার স্বামীর এই যুক্তি মেনে নিয়ে সহ্য করে উঠতে পারে না। চিরদিনের জন্য স্বামীর কাছ থেকে সকল দেনা-পাওনা পরিশোধ করে চির মুক্তির জন্য বদ্ধপরিকর হ'তে চায়।

অথচ, একদিন এমন ছিল, যেদিন তার ছিল স্বামী অন্ত প্রাণ। উপেনবাবুর অগাধ ভালবাসায় সে ছিল ভরপুর। সেও তার স্বামীকে দেবতার অধিক করে ভালবেসে এসেছে। উপেনবাবুও কাবেরীকে কোনদিন কোনপ্রকারে অসন্তুষ্ট করেন নি। তখন তাঁদের অবস্থা ছিল ভাল।

সুখের সংসার—কোন অভাব অনটন ছিল না। তারপর হঠাৎ এক ঝট্‌কা ঝড়ের ঝাপটে কোথা দিয়ে সব কি হোয়ে গেল। নিজের দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসে চাকরীর সন্ধানে ঘুরতে হোল। মাথা গুঁজবার জন্য একটা ঘর ভাড়াও করতে হ'ল। অল্প মাইনের চাকরী যেমন তেমন করে যোগাড় করে নিতে হোল। কাবেরীকেও কখনও বধূরূপে এসে বাড়ীর বার হ'তে হয়নি। দিনকাল এবং কাল-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দিনে দিনে অনটনের তাগিদে একদিন সংসারের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হোয়ে কাবেরীকেও যেতে হোল বাড়ীর বাইরে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায়। আজ সে সব কোথায় ভেসে গেল মন থেকে। তাই কাবেরী স্থির করলে তার মনকে—এ বাঁধন সে ছিঁড়ে দেবে। আভিজাত্যের লোলুপভরা ঝলমলে রূপকে সে উপলব্ধি করেছে এবং সে তার মোহিনী মায়ায় মোহিত হয়েছে। নতুনের রঙ তার অন্তর বাহির নয়ন সব একাকার করে দিয়েছে—ওই ক্ষণিক চাকচিক্য তার মনকে মোহগ্রস্ত করে তুলেছে। তাই তার মনকে ঠেলে নিয়ে চলেছে এই সর্ব্ব-নাশা অতল অন্ধকার পানে। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সব ভুলে গেল কাবেরী। ভুলে গেল এতদিনের প্রেমরূপ গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা বিবাহের সেই বাঁধনকে। নতুন আইনের সাহায্য গ্রহণ করতে চাইল। পুরান সমাজ কানুন যা কিছু ছিল দেশের সরকার তাকে ভেঙ্গেচুরে তচনচ করে দিলে। অনেক কিছু অসিদ্ধ আইন বলে সিদ্ধ হয়ে গেল। সতীত্ব, নারীত্ব বলতে সংসারে যে পবিত্রতা ছিল, যে মর্য্যাদা ছিল, তা যেন আর থাকলো না! ব্যভিচারের পথ পূর্ণ মাত্রায় পরিষ্কার হোয়ে গেল! এর জন্য কেউ প্রতিবাদ করে না, এরজন্য কোন জবাবদিহি করবারও লোক নাই। কাজেই সহজ পথ যখন খোলা তখন কাবেরী কেন না তাকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাবে? কেন সে এক ফুলের মধু খেয়ে বসে থাকবে? পাঁচটা পাঁচরকম ফুলের মধুর স্বাদ কেন না সে আস্বাদন করবে? দিনে দিনে তাই তার মন এই সব ভেবে ভেবে দুর্ব্বার দুঃসহ অন্তর্জ্বালায় জ্বলে জ্বলে খাক্ হোয়ে যেতে থাকলো—সেই মনকে সে চোখকে ঠেরেঠুরে ধরে রাখত মন আজ আর চায় না। স্বামীর সমস্ত শৃঙ্খল-সংস্রব ছিন্ন করে তাই সে একদিন একটি পত্র স্বামীকে লিখে রেখে—ভেসে গেল স্বপনকুমারের সঙ্গসুখ আশায়—এক অনাগত ভবিষ্যের সুখের আস্বাদনের যাত্রী হয়ে।

* * *

ইতিমধ্যে কাবেরী চলে যাবার পর মাস তিনেক গত হয়েছে। বৃদ্ধা পিসিমাও লোকান্তরিত হয়েছেন। শূন্য সংসার—শূন্য মন নিয়ে কোন রকমে উপেনবাবু অফিস করেন আর নিজের ঘরটীতে এসে শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করেন। আহার নিদ্রা, আমোদ প্রমোদ সব যেন একাকার হোয়ে গেছে, অবসাদ আর ক্লান্তি যেন মন জুড়ে বসে রয়েছে। কোন দিন ইচ্ছে গেলে দু'বেলা রান্না করেন, নইলে দু'বেলা হট্টমন্দিরে খেয়ে আসেন। এমনি করে চলছে তাঁর দিন।

সেদিন হঠাৎ আকাশ ঘিরে ঘন মেঘ করে এলো শ্রাবণের প্রভাত বেলায়। আকাশ ঘিরে বিজলি চমকের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গর্জ্জন সুরু হোল তারপর প্রবল প্রলয়ঙ্কর বাত্যায় সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত ভাবে বর্ষণ সুরু হোয়ে গেল। ঝড়ের দাপটে আকাশের কড়কড়ানীতে বিদ্যুতের ঝলকানীতে সে এক বীভৎস ব্যাপার করে তুললো। পথে ঘাটে বন্যার মত জল থৈ থৈ করছে। ঝড়ের ঝাপটে কোথাও কোথাও পথের উপর দু' একটা গাছ ট্রামের তার ছিঁড়ে এসে উপড়ে পড়েছে। জলের ঝাপটে কুয়াশার মত অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। যানবাহন সব বন্ধ হোয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ভিজে চুপসে গিয়ে দু'একটা রিক্সা গাড়ী ঠুং ঠুং করে চলেছে। মাঝে মধ্যে দু'একজন পথচারী এক হাঁটু কাপড় তুলে ঝুপঝুপ শব্দে পথ দিয়ে যাচ্ছে। দোকানপাট প্রায় বন্ধ—পথে বের হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। অফিস, স্কুল কলেজ যাবার কোন উপায় নেই। কাজেই উপেনবাবুর আজ অফিস যাবার আর বিশেষ তাগিদ্ নাই। খানিকক্ষণ বসে বসে ভেবে-চিন্তে দেখে 'ষ্টোভে' চা তৈরী করে খেয়ে আবার বিছানার আশ্রয় নিলেন। ভাবলেন বেলায় যা হোক কিছু ফুটিয়ে নিলেই হবে এখন।

বেলা একটা দেড়টার পর আকাশের কতকটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো—বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চোরা চাউনি মেলে সূর্য্যদেব মাঝে মাঝে উঁকি মারতে লাগলেন। কিন্তু পথ-ঘাট তখনও জলে জলময়। কোন রকমে উপেনবাবু স্বপাকে রন্ধন করে স্নান সেরে

আহার করে নিয়ে আবার বিছানায় গিয়ে শয়ন করলেন। নানান্ চিন্তার ভারে জর্জ্জরিত মন তাঁর—অতীত, বর্ত্তমান সব দেখতে লাগলেন মনোরূপ দর্পণে। কখনও চোখের কোল থেকে জমাট অশ্রু ঝরে পড়ে বুক ভাসিয়ে দেয়—কখনও বিদ্রূপের হাসি হাসেন আপন মনেই,—এমনি করে দুপুর কেটে অপরাহ্ণ গড়িয়ে আসে। কিছু তাঁর ভাল লাগে না। দিন, রাত্রি, আনন্দ—সব তাঁর কাছে যেন একাকার হোয়ে গেছে। অমন যে সুন্দর সুঠাম দেহ তাঁর এই ক'দিনে যেন মলিন হোয়ে গেছে। সব কিছুর বাইরে যেন তাঁর মন এক নির্ব্বিকার জড়তায় ভরে গেছে। এক একবার ভাবেন, কি হবে আর এ সংসারের বোঝা বয়ে মরে! সবই যখন গেল, তখন এভাবে এই মরুময় শূন্য হৃদয়টাকে অনর্থক হেথাকার এই পরিবেশের মাঝে ধরে রেখে কি মোক্ষম ফল পাবেন। তার চেয়ে এই সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হোয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালে তবুও যদি শান্তি আসে মনে, সেই তো তাঁর পরম লাভ।

চায়ের জলটা 'ষ্টোভে' চড়িয়ে দিয়ে বসে বসে অনেক কিছু চিন্তা করছিলেন। তখনও সন্ধ্যা হয়নি। সবে মাত্র মেঘের ফাঁকে আলোর লাল দীপ্তি রেখে রবিমামা বিদায় নিয়েছেন। এমন সময় বহুদিন বাদে অকস্মাৎ তপতী উপেনবাবুর ঘরের দরজার সামনে এসে চুপীসাড়ে দাঁড়াল। কিন্তু উপেনবাবুর খেয়াল নেই, তিনি যেন আত্মস্থ হোয়ে গেছেন। এধারে চায়ের জলটা ফুটে ফুটে উছলে উপচে পড়ছে। তপতী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল এবং নিজেই নামিয়ে নিয়ে চা তৈরী করে উপেনবাবুর সামনে ধরে দিয়ে বললে: চা-টা খেয়ে নিন—নইলে আবার বর্ষার দিনে ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে।

তপতীর ডাকে উপেনবাবুর সম্বিৎ ফিরে এলো। থত-মত খেয়ে সামনে হঠাৎ তপতীকে দেখে বললেন: আপ-নি—তু-মি আবার—

তপতী মৃদু হেসে বললে: আপনি, তুমি কিছুই নয়—তুমিই বলবেন—এখন আগে চা-টা খেয়ে নিন।—কিন্তু এঁরা সব কোথায়? কাবেরীদি—পিসিমা—

যে তপতী একদিন প্রথম যৌবনের ছোঁয়াচ লেগে উদ্দাম চঞ্চলতায় ভরা ছিল, আভিজাত্যে, ধনে, মানে সর্ব্বদিক দিয়েই যার জীবনটা বেয়ে চলছিল—বিশৃঙ্খল মনের বর্ণচ্ছটায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। এবং সর্ব্বোপরি অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র কন্যার প্রথম যৌবনে যে উদগ্র বিলাসিতার যে মদিরতা ছিল, আজ যেন সেই চঞ্চলতা আর নেই। যে দেহলতা অমিতাচারে একদিন সব কমনীয়তা লুপ্ত হোতে বসেছিল আজ সেই দেহলতার তনুশ্রী তপতীর তপঃপ্রভায় যেন জ্যোতিতে ভরা। ভোগের চরম সীমানায় অধিরোহণ করে আজ যেন নিরাসক্ত মন সমস্ত বিলাসিতা'কে পরিত্যাগ করে দীনহীনভাবে সাধারণত্বের সীমারেখায় এনে দিয়েছে। আজ যেন সেই তপতী সত্যিই আমাদের সেই দেবীসমা। পরিধানে লালপেড়ে সাদা সাড়ী, সাধারণ জামা, পায়ে টক-টকে লাল আলতা, আর কপালে একটি লাল সিঁদুরের টিপ, গলায় একটি সরু হার। হাতে দু'গাছি করে সাধারণ চুড়ী ও বাম হাতে একটি লৌহবলয়। দুধে-আলতা গোলা রং যেন আরো ফেটে উপচে পড়ছে। পদ্মপলাশ আঁখি দু'টি যেন কি এক করুণাঘন আবেশে আবেশিত। ঘনকৃষ্ণ-কুঞ্চিত আজানুলম্বিত কেশদাম বায়ুহিল্লোলে হিন্দোলিত।

অকস্মাৎ তপতীর এই যে পরিবর্ত্তন এ যেন বিশ্বাস করা যায় না। তপতী বিলাসিতার চরম পর্য্যায়ে পৌছে-ছিল। আজ সেই তপতী সমস্ত কিছু ত্যাগ করে অতীতের সকল সংস্কারকে মাথায় তুলে নিয়েছে। প্রাচীনকালের বাংলার সেই গর্ব্বভরা পল্লীকন্যার মত পবিত্রতায় মনকে বেঁধে ফেলেছে। যা শাশ্বত, যা সনাতন সেই আদর্শকে মাথায় তুলে নিয়েছে। কারণ সে আধুনিকতার সকল পথঘাট দেখেছে—তা'তে সুখ পায়নি, শান্তি পায়নি, পেয়েছে ক্ষণিক বিদ্যুতের চমক—শুধু চোখকে ধাঁধিয়েই দিয়েছে, মনকে বাঁধতে পারেনি।

উপেনবাবু ব্যথাভরা কণ্ঠে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: এঁরা বলতে আর কে? কাবেরী তো নিজের পথ নিজেই দেখে নিয়েছে—আর পিসিমা গত হয়েছেন। এখন আমি একা।—কেন, তুমি কি কিছুই জান না তপতী?

তপতী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললে:—না-তো, আমি তো এর কিছুই জানি না—আর কই, তেমন কিছু শুনিনিও—কাবেরীদি—

উপেনবাবু তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন: সে

অনেক কথা তপতী—বলে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেল্লেন। —তারপর বল্লেন: নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অপরের অঙ্কশায়িনী করে দিয়েছে! যাক্—সে কথা শোনাও পাপ—বলাও পাপ! তপতী আগ্রহাতিশয্যে উপেনবাবুর পানে তাকিয়ে রইল। তার এইরূপ উদ্‌গ্রীবতা দেখে উপেনবাবু বললেন: একান্ত যদি সবই শুনতে চাও তাহলে তোমাকে সমস্তই আনুসঙ্গিন্ বলতে হবে তবেই বুঝতে পারবে—কিন্তু সে সময় কি তোমার হবে?

তপতী বললে: হবে—আপনি চা খেতে খেতে বলতে থাকুন। উপেনবাবু বললেন: তা-হলে তুমিও একটু খাও—বলে আর একটা কাপে করে তপতীকে দিলেন।

চা পান করতে করতে আগাগোড়া সমস্তই শুনলে তপতী। উপেনবাবু ছেলে-মানুষের মত হঠাৎ হাউ-মাউ কেঁদে ফেলে বললেন: আমি তাকে বড্ড ভালবাসতাম তপতী। সে যে এমন হবে কখনও তা ভাবতাম না। হঠাৎ যে তার মাথাটা কি হোয়ে গেল—বলে হঠাৎ তপতীর ডানহাতটি চেপে ধরে বল্লেন: তুমিই বল না তপতী, আমার দোষটা কোথায়!—বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হঠাৎ চমকে উঠে তপতা—তার হাতটা ছাড়িয়ে নিলে—কিন্তু কি জানি কেন তার সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা অজানা শিহরণ খেলে গেল ক্ষণিকের মধ্যে। তার মন যেন আজ সহজ হ'তে পারলো না। তবুও নিজের মনকে বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করলো সে। ব্যথাভরা কণ্ঠে বললে: আপনি অতটা ব্যথা পাবেন জানলে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস্ করতাম না। যাক্, যা হবার তো হোয়েই গেছে। মেয়েমানুষ যদি মেয়েমানুষের ধর্ম্মকে না চিনে সংসারে চলাফেরা করে তাহলে তাকে সাপের গর্ত্তেই পা' দিয়ে একদিন মরতে হয়—তখন হাজার আফশোষ করলেও তার সে সেই ধর্ম্ম, মর্য্যাদা আর ফিরে পায় না। আপনি শান্ত হ'ন!

উপেনবাবু তার কথার উপর কথা দিয়ে বল্লেন: শান্ত আর কি হব বল—আর তুমিও তো অনেকদিন আসনি তপতী! তুমি যদি আসতে, তাহলে হয়তো বুঝিয়ে-সুজিয়ে যা হয় একটা কিছু করতে পারতে!

তপতী করুণকণ্ঠে বললে: আপনারও যে অবস্থা আমারও তাই—বাবা মারা গেলেন, সেই গভীর শোক কাটতে না কাটতে মাও বাবার সঙ্গ নিলেন। পড়ে গেলাম মহা বিপদে। সংসারের আর পাঁচটা দিক দেখবার শোনবার আর সময় রইল না। তারপর সব ব্যবস্থা করে উঠতে সময় করে আসবার আর সুযোগ সুবিধা করে উঠতে পারি নি। আজ হঠাৎ মনটা বড়ই খারাপ হোয়ে গেল। অনেকদিন কাবেরীদির খবর পাইনি আর তিনিও অনেক-দিন ও পথে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন—তাই আমিই চলে এলাম। বলে উঠে দাঁড়াল। উপেনবাবু বল্লেন: এখন তো সবই জানলে? ভাবছি কোথাও চলে যাব—আর এ সংসার ভাল লাগছে না—যদি কোনদিন কাবেরীর সঙ্গে দেখা হয় তো বুঝিয়ে বোলো—

তপতী কথায় বাধা দিয়ে বললে: ভাল না লাগারই কথা বটে—তবুও পুরুষ মানুষকে ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয়। আজ তাহলে আসি—বলে তপতী পথে এসে নামলো সামনে লাগানো গাড়ীর কাছে। উপেনবাবু তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন। তপতী বললে: আপনি যান্—আমি মধ্যে মধ্যে এসে দেখে যাব। তপতীর গাড়ী চলে গেল। উপেনবাবু সেই দিকে উদাস নয়নে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর ধীরে ধীরে ভিতরে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

* * *

গাড়ীতে যেতে যেতে সারা পথটা আজ তপতীর কেমন যেন বেসুরো বাজছিল। একটা অজানা অনুভূতির দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে পাক খেতে লাগলো। উপেনবাবুর এরূপ অসহায় শোচনীয় অবস্থা দেখে তার মনে কেমন যেন একটা বিষণ্ণের ভাব এসে মনটায় খালি খচ্‌খচ্ করতে লাগলো। কিছুতেই যেন স্বস্তির ভাব খুজে পাচ্ছিল না। কোথায় যেন মনের অতলে কাঁটা বেঁধার মত বেদনা ভরা মমতা—কিম্বা ভালবাসার ছাপ পড়ে গেছে।

সে অনেক পুরুষের সান্নিধ্যে এসেছে—সে শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে। সেখানে সে, যে সব পুরুষকে দেখেছে, মিশেছে অবশ্য ধরা কাউকেই দেয়নি শুধু যাচাই করে দেখেছে, তাদের মধ্যে যেন কেউ পুরুষপদবাচ্য নয় বলেই সে জেনেছে। তারা যেন শুধু অভিনয় করে যায়—শুষ্ক ভালবাসার মুখোস পরে। এমনি সব চিন্তা করতে করতে যখন সে বাড়ীতে

এসে পৌছাল তখন রাত হোয়ে গেছে। বৃদ্ধ সরকার মশায় রামরতনবাবু তার জন্য বসে আছেন।

এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে তপতী জেঠু জেঠু বলে ডাকতো। রামরতনবাবুও তপতীকে নিজ কন্যার মতই স্নেহ করতেন। এবং তপতীর পিতামাতার মৃত্যুর পর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি কাজ কারবার তিনিই দেখাশুনা করতেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সৎ প্রকৃতির শক্ত মানুষ ছিলেন। কাজেই তপতীকে ও সব বিষয়ে বিশেষ কিছুই চিন্তা করতে হোত না।

রামরতনবাবুকে বসে থাকতে দেখে তপতী বললে: জেঠু আপনি এখনও বসে আছেন? শুধু শুধু এতক্ষণ পর্য্যন্ত কষ্ট করে বসে থাকলেন কেন? আমার একটু দেরি হোয়ে গেল ফিরতে—বলেই তপতী তার কোলের উপর মাথাটা রেখে শুয়ে পড়লো।

তার কথায় বাধা দিয়ে তপতীর মাথায় সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে রামরতনবাবু বললেন: তা'তে কি হয়েছে মা, তার জন্যে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি?

তপতী বললে: আমাকে কি কিছু বলবেন?

রামরতনবাবু সম্মতি জানিয়ে বৈষয়িক বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তার পর বললেন, মা এবার একটা বিয়ে থা' কর। নইলে এত বিষয় আসয় দেখার তো একটা লোক চাই—আমি ক্রমশই বৃদ্ধ হোয়ে পড়ছি আর কতদিন টেনে বেড়াব? বলতো উপযুক্ত পাত্র দেখি।

তপতী একটু সলজ্জ ভাবে বললে: আচ্ছা জেঠু ভেবে বলব। তবে এত তাড়াতাড়ি মেয়েকে পর করে দিতে চাইছেন কেন? বলে হাসতে লাগলো। রামরতনবাবু বললেন: না—মা, পর করে দোব কেন? ছেলে-মেয়েরা উপযুক্ত হলে অভিভাবকদের কর্ত্তব্য যে মা। তাছাড়া দিন দিন তোমারও তো বয়স বেড়ে যাচ্ছে—মেয়েদের স্বামীই রক্ষাকর্ত্তা যে মা, তাছাড়া তারা সে কর্ত্তব্যের ভার আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন সেটুকু পালন না করলে অন্তর্য্যামীর কাছে অপরাধী থেকে যাব যে মা লক্ষ্মী। বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখ দিয়ে অজস্র অশ্রুর প্রবাহ উদগত হোয়ে বুক বেয়ে ঝরে পড়তে লাগলো। চশমাটা চোখ থেকে খুলে কাঁধের উত্তরীয়ের খুট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন: এই সংসারকে হাতে করে বুক দিয়ে গড়ে ছিলুম মা—তীর্থবাস তখন এতটুকু—লেখাপড়া শিখিয়ে নানা পর্য্যা করে বড় করে তুললাম—তারপর বৌমাকে নিয়ে এলাম—সে সবই আজ চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভাসছে। অথচ তারাই আগে ভাগে ফাঁকী দিয়ে চলে গেল আর মাঝ-মধ্যে এই বুড়াটাই রইল পড়ে—য'র যাবার দরকার আগে সেই রইল পড়ে বলতে বলতে রামরতনবাবু চলে গেলেন। তপতী খানিকটা বিমূঢ়ের মত বসে থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে গেল ঠাকুরঘরে।

* * *

বহু চিন্তাকরে তপতী স্থির করে ফেললে—যদি উপেনবাবু রাজী হন তাহ'লে তাঁকেই বিয়ে করবে। কারণ উপেনবাবুকে বিয়ে করলে এ বাড়ীতেই তাঁর থাকা চলবে এবং বিষয় সম্পত্তিগুলোও দেখাশুনার মত একটা লোক পাওয়া যাবে। ইত্যাদি নানারকম চিন্তা করে তাহাই সে শেষ পর্য্যন্ত স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেললে। এবং সেই কথা তার বৃদ্ধ সরকার মশাই রামতনবাবুকে জানালে। বৃদ্ধ প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করে শেষে অনেক চিন্তা করে তাই সাব্যস্থ করে নিলেন কারণ উপেনবাবুরাও উঁহাদের পালটী ঘর। বিবাহে কোনই আপত্তির কারণ নাই। চাটুজ্জে এবং মুখুজ্জ্যে উভয়েই রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং দুজনাই বনেদীঘর বিশেষ। এই সব চিন্তা করে তিনি একদিন উপেনবাবুর বাড়ী গিয়ে পৌছাবেন বলে স্থির করলেন।

* * *

সেদিন সবেমাত্র অফিস থেকে এসে উপেনবাবু তাঁর ছোট্ট দাওয়াটীতে এসে বসেছেন। মনমেজাজ ভাল নেই। সদাই যেন কেমন একটা অস্বস্তি তার অন্তর পিঞ্জর ভেদ করে ভেদ করে চলেছে। আলস্যভরা মন যেন কোথায় পালাবার জন্য সদাই ছটফট করে মরছে। আজ সকালে রান্না করতে পারেন নাই—মুড়ী ও মুড়কী খেয়ে অফিসে গেছেন। এবেলাও আর রান্নাবান্না করতে ইচ্ছা হচ্ছেনা। বসে বসে ভাবছেন—ভবিষ্যতের ভাবনা। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন। বিষণ্ণতা ও হতাশায় চেহারাতে যেন কেমন একটা ছন্নছাড়া ভাব ফুটে উঠেছে। সবেমাত্র সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে।

উপেনবাবু উদাস দৃষ্টে কেমন আনমনা ভাবে বসে আছেন।

এমন সময় তপতী এসে দাওয়াটার সামনে দাঁড়াল এবং মৃদু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে: অফিস থেকে কখন এলেন?

ম্লান হেসে উপেনবাবু বললেন: এই মাত্র আসছি—বলে তপতীকে বসতে বললেন। তপতী বসতে বসতে বললে: ও-বেলা কি রান্না করলেন?

উপেনবাবু বললেন: ওবেলা আর ভাল লাগল না—তাই ব্রাহ্মণের ছেলে ফলার খেয়েই অফিস্ ছুটলাম। এবেলাও ভাবছি তাই করব। ও পাট আর করতে ভাল লাগে না—আর রোজ রোজ পারিও না, যা হয় কিছু এনে নিলেই হবে।

তপতী দাওয়া থেকে উঠে ঘরের মধ্যে ঢুকলো এবং যা কিছু তরী তরকারী ছিল কুটতে বসে গেল—এবং ষ্টোভটা জ্বেলে চায়ের জল বসিয়ে দিলে। এবং চায়ের জল হয়ে গেলে পরে—আলু ও চাল চাটি হাঁড়িতে চাপিয়ে দিলে। তারপর চা তৈরী করে উপেনবাবুকে এক কাপ দিলে এবং নিজেও এককাপ নিয়ে বললে: নিন খেয়ে নিন—

উপেন হেঁ-হেঁ করে উঠে বললেন: একি করছ তপতী ও সব তোমার—তপতী কথা কেড়ে নিয়ে বললে: কি করছি—কিচ্ছু না।—মেয়েমানুষ হোয়ে জন্মেছি—এগুলো তো তাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

উপেনবাবু বলেন: আমার দুঃখ্যু আমারই আছে তপতী, তুমি কেন কষ্ট করে এ সব করতে যাচ্ছ। এ সব তোমাদের ধাতে তো সইবে না—বাউন চাকরের কাজ—

তপতী মৃদু হেসে বললে: হ্যাগো মশাই—বামুন চাকরের কাজ তা জানি—মানে আমরা বড়লোক আমাদের মুখে মুখে বামুন চাকরে জুগিয়ে দেয় এই তো! তা হয়তো দেয়—কিন্তু সবার পন্থা এক নয়! কিন্তু শুনলে আপনার তাক লেগে যাবে বামুনের হাতের রান্না খাওয়া আমি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।

তাছাড়া বড়লোক হ'লেই কি এই কাজগুলি করতে মেয়েমানুষের মর্য্যাদায় বাধে? তা বাধে না—এইগুলো মেয়েমানুষের গৌরবের জিনিষ—রেধে খাইয়ে, যে তৃপ্তি তারা পায় তার তুলনা এ সংসারে কোথায়! বলতে বলতে ভাতটাকে নামিয়ে রেখে তরকারী চাপিয়ে দিতে দিতে বললে: এমন কোরে ক'দিন আর চলবে? তার চেয়ে একটা বিয়ে করে ফেলুন না—

উপেনবাবু মৃদু বিষণ্ণের হাঁসি হেঁসে বললেন: আর বিয়ে—! বলে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন আর বিয়ে ক'রেই বা কি হবে? তাছাড়া এই ছন্নছাড় মানুষকে কেই-ই বা মেয়ে দেবে? তেমন পাত্রী কোথায় যে—

তপতী বললে: কেন বাংলাদেশে কী পাত্রীর অভাব—

উপেনবাবু বললেন: অভাব অবশ্য নেই—কিন্তু আমার মত এই একক গরীব ব্রাহ্মণের জন্যে কে দুঃখভোগ করতে আসবে বল? একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারপরে বলেন: ঐ তো একজনকে অত ভালবেসেছিলাম—সেও শিকল কেটে ফুরুৎ করে পালিয়ে গেল। যুগের পরিবর্ত্তন তপতী, যুগের পরিবর্ত্তন! এ যুগে মন বেঁধে কে আর তেমন ভাবে—সংসার, স্বামী পুত্রকে দেখবে বল? সে যুগ চলে গেছে—

তপতী হাসতে হাসতে বললে: সবাই কি তাই—এমন মেয়েও আছে যে—তার কথা কেড়ে নিয়ে উপেনবাবু বললেন: হ্যাঁ,—সে হয়তো থাকতে পারে তপতী—কিন্তু খুঁজে পেতে বের করা শক্ত—

ইতিমধ্যে তরকারীর কড়াটা নামিয়ে রেখে তপতী বললে: যাক্ মুখ হাত ধুয়ে আসুন। উপেনবাবু উঠতে উঠতে বললেন: দেখ দেখি আমার জন্যে অনর্থক অযথা এতখানি কষ্ট করে এ সব ব্যাপার করতে হোল তো?

অতি যত্নসহকারে ভাতের থালা সাজিয়ে পরিপাটী করে জায়গা করতে করতে তপতী বলে: কষ্ট না হয় একটু করলাম তাতে তো আর আমার দেহটা ক্ষয় হয়ে যাবে না। ইতিমধ্যে উপেনবাবু আহারে প্রবৃত্ত হ'ন। দু' এক গ্রাস মুখে তুলে বললেন: ক্ষয় হয়তো হবে না তপতী—তবুও এমন যত্ন করে অনেকদিন কেউ খেতে দেয়নি—বাষ্পরুদ্ধ নয়ন হ'তে অজস্র অশ্রু ঝরে পড়লো। তপতীরও প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত কেমন একটা মোচড় দিয়ে দিলে তথাপিও শক্ত হ'য়ে বললে: ছিঃ! খেতে খেতে কাঁদতে নেই। চোখের জলটা কোঁচার খুঁটে মুছে বললেন:

তপতী, কাবেরীও একদিন এমনি যত্ন করে করে খাওয়াতো। ক'দিনই বা আমাদের বিয়ে হোয়েছিল মেরেকেটে বছর পাঁচেক হবে। এর মধ্যেই সব যেন কি হোতে কি হোয়ে গেল। ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস তপতী, এর মধ্যেই—

তপতী কথা কেড়ে নিয়ে বললে: সে যা হবার হয়ে গেছে। অতীতকে আঁকড়ে নিয়ে চললে তো মানুষ বাঁচে না—সংসারও চলে না। এখন একটা বিয়ে থা' করে পুনশ্চ সংসার পেতে সুখী হবার চেষ্টা করুন। উপেনবাবু বলেন: তেমন কে আছে যে বিয়ে করতে চাইবে আমাকে—তার চেয়ে যে ক'টা দিন বাঁচি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব—

তপতী পরিহাসের সুরে বলে: বেশ তো তাহোলে আপনি আমাকেও সঙ্গে নেবেন? আমার তো কেউ নেই—সন্ন্যাসিনী হোয়ে আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে আমারও বেশ ভাল লাগবে।

উপেনবাবু বলেন: কি যে বল তপতী—তুমি কি আমার সঙ্গে রহস্য করছ নাকি? তুমি ধনী কন্যা, সুপাত্রে বিয়ে করে—ঘর সংসার করবে—আমার মত এই ছন্নছাড়ার সঙ্গে কোথায় ঘুরে বেড়াতে যাবে বল?

না, না,—আমি ধনী নই, কিছু নই, শুধু তোমার—বল তুমি আমায় তোমার সেবার ভার দেবে? বলে তপতী তার সমস্ত সত্বাকে উপেনবাবুর সত্বার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। বিস্মিত উপেনবাবুর মুখ দিয়ে কোন কথা ফুটে বেরুল না—কেমন যেন বিমূঢ়ের মত তপতীর পানে চেয়ে রইলেন।

* * *

রামরতনবাবুর ব্যবস্থাপনায় অনাড়ম্বরে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে পুরোহিত নারায়ণশীলা সাক্ষী রেখে তপতীর সঙ্গে উপেনবাবুর বিয়ে হোয়ে গেল। নেহাৎ নিকট সম্বন্ধ যে ক'জন আত্মীয় স্বজন ছিল তাদেরি খালি নিমন্ত্রণ করা হোয়েছিল। এবং সেই সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশী যে ক'জন ছিল তাদেরও বলা হয়েছিল। এই উপলক্ষে রামরতন-বাবুর স্ত্রীও এসেছিলেন। এবং তদ্বির তদারক যা কিছু তিনিই করেছিলেন। এইভাবে ফুলশয্যা কেটে গেলে এবং কাজকর্ম্ম সব মিটে গেলে একদিন রামরতনবাবু তপতীকে বললেন: মা, কাজকর্ম্ম তো সব চুকেবুকে গেছে এবার তোমার জ্যাঠাইকে ছুটি দাও অনর্থক আর ওর এখানে থেকে লাভ কি?

তপতী বললে: কেন জ্যেঠু জ্যাঠাই কি জলে পড়ে আছে যে আপনি অত তাগাদা দিচ্ছেন? জ্যাঠাইমার আর যাওয়াই হবে না—

উপেনবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রামরতনবাবুকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইলেন। রামরতনবাবু মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বললেন: চির সুখী হও বাবা—আমার তপা-মা'কে সুখী কর—উপেনবাবু কথার উপর কথা দিয়ে রামরতনবাবুকে বললেন: আপনি তো জ্যেঠু এই ভিক্ষুককে ধরে এনে রাজপাটে বসালেন এখন সেই ভিক্ষুক আপনাদের দ্বারে অতিথিমাত্র—তার কথা কেড়ে নিয়ে রামরতনবাবু বললেন: সে কি কথা বলছ বাবা! তুমি হেজা-পেঁজা ঘরের ছেলে? তোমাদের ঘরে মেয়ে দেওয়া তখনকার দিনে ছিল নেহাৎ ভাগ্যের কথা—আর তা' ছাড়া এখন তুমিই তো বাবা তীর্থবাসের এখন পুত্র স্থানীয় আর তপতী তাঁর পুত্রবধূ হয়ে এই সংসার গৃহাঙ্গনকে সুষমামণ্ডিত শোভায় ভরিয়ে তুলবে? এখন তোমাদের দু'জনার প্রীতি ও সাহচর্য্যে এই সংসার আবার হাস্যোজ্জ্বল, প্রাণরসে সতেজ ভরপুর হয়ে ভরে উঠবে—সেইটাই তো কামনা করি—যিনি সব জানেন সেই মহিমাময় অন্তর্য্যামীর কাছে। তারপর কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন: কি বল মা—তা' হলে আর দু' একদিন থাক—

তপতীর মুখে রামরতনবাবুর প্রস্তাব শুনে উপেনবাবু বলেন: না জ্যেঠু তা হয় না—জ্যাঠাইমাকে আর ছাড়ছি না—তিনি আমাদের মাথার উপর থেকে সংসারের সব দায়দফা নিয়ে এইখানেই চিরকাল থাকবেন। শুধু জ্যাঠাইমা নন আপনাদের বাসা তুলে দিয়ে এইখানেই সব থাকবেন। যে ক'দিন বাঁচবেন তপতীর আর আমার সেবা গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করবেন। আপনারও শরীর দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে আমাদের সেবা নিয়ে আপনাকে থাকতে হবে।

রামরতনবাবু স্নেহের হাসিতে ভরে বলেন: আচ্ছা, আচ্ছা বাবা সে হবে'খন। উপস্থিত আগে বিষয়সম্পত্তি-গুলো সব তোমায় বুঝিয়ে দিই—উপেনবাবু সহাস্যে বলেন: এই তো সব মাটী করে দিলেন জ্যেঠু—ও সব

যেমন চলছে তেমনি চলুক আমাকে আর এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন? রামরতনবাবু বলেন: তা কি হয় বাবা। আমি থাকতে থাকতে সব শিখিয়ে পড়িয়ে কোথায় কি আছে না আছে দেখিয়ে দিলে তবেতো আমার ছুটী তবেতো তপামার সেবা খেতে পারব নিশ্চিন্তে বসে বসে। বলতে বলতে রামরতনবাবু তাঁর খড়মের আওয়াজ তুলতে তুলতে নীচেয় নেমে গেলেন। আর তপতী উপেনবাবুর একটা হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

* * *

বিপুল বিত্তশালী পিতার একমাত্র সন্তান স্বপনকুমার। সংসারে আজ তার আপন বলতে কেহ-ই নাই। পিতা-মাতা হঠাৎ অসময়ে এই একটীমাত্র সন্তানকে রেখে আর তার জন্য বিপুল অর্থ ও সম্পত্তির ভার ঘাড়ে চাপিয়ে মহা-কালের কোলে আশ্রয় নিলেন। দূর সম্পর্কের এক মাসি এসে দেখাশুনা করতে থাকলো যখন, তখন সে বি-এ পাশ করে এম-এ ক্লাসে ঢুকেছে। তারপর হঠাৎ সেই মাসিও সরে গেল। তখন সে একেবারে একা। দরিদ্রতা যে কি বস্তু সে তা' জানে না। চারিধারে তার অজচ্ছল প্রাচুর্য্যে ভরা। তার বিরাট প্রাসাদ—সেই প্রাসাদসংলগ্ন বিরাট উদ্যান। তা'তে নানা জাতীয় বৃক্ষ, ফল, ফুল, নানান জাতীয় লতাবিতানে কেয়ারী করা—বিচিত্র শোভায় শোভিত। প্রাসাদের একধারে ভৃত্য ও সরকার কর্ম্মচারী-দের আবাস ও তারই পাশে আস্তাবল, গ্যারেজ ইত্যাদি রয়েছে। দরওয়ান, খানসামা ইত্যাদিতে গৃহ পূর্ণ। বন্ধু-বান্ধবে তার ঘর ভর্ত্তি থাকে। গান, বাজনা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ সব তার সম্মুখে সর্ব্বদাই যেন আজ্ঞাকারী ভৃত্যের মত হাত বাড়িয়ে রয়েছে।

এর মধ্যেই আবার নানান স্থান থেকে তার বিয়ের জন্য সম্বন্ধও আসছে—তার বৃদ্ধ সরকার বেচারাম দাসের কাছে। কিন্তু যেদিন থেকে সে কাবেরীকে দেখেছে—সেই দিন থেকেই তার মানসপটে এই অনিন্দ্যসুন্দরী কাবেরীর মুরতিখানি ছাপমারা হোয়ে গেছে। হোক সে বিবাহিতা পরস্ত্রী—ওকেই চাই যেমন করেই হোক। তাতে যত অর্থ ব্যয় হয় হোক। কি এক মোহের তাড়নায় তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। সে জানতো আজকাল-কার আইন কানুনের কথা। আর তাই এই দারিদ্র্যক্লিষ্টা দুর্ব্বলমনা নারী কাবেরীকে বশ করতে বেশী বেগ পেতে হয়নি। নানান প্রলোভনে মুগ্ধ করে অর্থের আনুকূল্যে সহজেই তার মনকে জয় করে নিতে দেরী হয়নি। কাজেই অর্থ যেখানে উপপাদ্য সেখানে কোন বিষয় ব্যর্থ হ'তে পারে না। আর হোলও না। উদ্দাত সুখের গৌরবোজ্জ্বল রবিচ্ছটার মত মত্ত হোয়ে কাবেরী ধরা দিল স্বপনকুমারের অঙ্কমধ্যে। তাই বিবাহবিচ্ছেদ আইনের আওতায় জড়িয়ে কাবেরী তার স্বামীকে ত্যাগ করে—'রেজেষ্ট্রী' করে স্বপনকে বরণ করে নিলে। উগ্র আধুনিক ঝলমলে রঙিন স্বপনে বিভোর হোয়ে—পতঙ্গের মত আলোর পিছনে ধেয়ে গেল। ক্ষণিকের জন্য দুঃখের হয়তো অবসান হোল কিন্তু আজীবনের জন্য সঞ্চিত যে ব্যথা—তার উপশম হবে কিসে? অলক্ষ্যে বুঝি তাই তার নিয়তি আড়ালে হেসে উঠেছিল। তাই না বুঝে দুঃখ থেকে ক্ষণিক সুখের আস্বাদন পেয়ে—কাবেরী যেন এক নতুন মানুষ হোয়ে গেল।

* * *

প্রাসাদোপম অট্টালিকা, বাগানবাড়ী, গাড়ী নানান লোকলস্করে পরিবেষ্টিত কাবেরীর আজ অঢেল সুখ। দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে আজ রাজরাণীর রাজ সিংহাসনে বসে কাবেরী ভুলে গেছে অতীতকে। বিলাসিতার মোহ অঞ্জন চোখে লাগিয়ে আজ সে সর্ব্বসুখের অধিকারিণী। আজ স্বপনকে লাভ করে সে সর্ব্বসুখে সুখী হয়েছে। যেমনটি তার মনদর্পণে এতদিন আঁকা ছিল আজ অক্ষরে অক্ষরে সে তা' লাভ করেছে। আজ তার চেয়ে সুখী কে? আজ যেন তার মত স্বামী-সোহাগিনী এজগতে বিরল।

স্বপনকুমারকে নিজের মুঠোর মধ্যে রাখবার জন্য আজ কাবেরী তার নারী চরিত্রের যতরকম কলাকৌশল আছে তা দিয়ে চারিধারে তাকে ঘিরে রেখেছে। যাতে স্বপন কোনদিন না তার মোহপাশ ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। তাই সে কতকগুলো ধরা ছক্ তৈরী করে রেখেছে। প্রত্যহ ভোরে উঠে স্বপনকে জাগিয়ে নিয়ে বাগানে যায়। নানান জাতের গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্প আহরণ করে; স্বপন তাকে ফুলরাণীর মত সাজিয়ে দেয়। সারা বাগান জুড়ে তারা খেলা করে বেড়ায়। হাস্যে, লাস্যে স্বপনকে মুগ্ধ চকিত করে তোলে। উদ্দাম যৌবনশ্রী তার দেহে দেহে, মনে

মনে, ছন্দে ছন্দে নেচে বেড়ায়। স্বপনকে সে তার একান্ত অনুগত করে ফেলেছে এমনি কোরে। এমনি করে চলে তাদের নিত্য সংসারনাট্য।

স্বপনকুমার এখন বন্ধু বান্ধব সব ছেড়ে কাবেরীকে নিয়েই পড়ে থাকে। মনে প্রাণে কত কাল্পনিক ছবি আঁকে। কত রঙীণ স্বপ্নে বিভোর হয়। দু'জনে যেন এক আত্মা, একদেহ, একমন—প্রাণের যতটুকু ভালবাসা সব যেন উজাড় করে ঢেলে দেয় দুজনা দুজনকে।

এমনি করে ঋতুচক্র আবর্ত্তিত হয়—দশটা ঋতু পার হোয়ে আসে। তখন মাঘের শেষ—আগত বসন্তের বার্ত্তা নিয়ে দখিন পবন বয়ে যায়। শীতের জড়তায় স্তব্ধ কোকিলের কণ্ঠ থেকে সুমধুর বসন্তের বায়ুস্পর্শে কোন বৃক্ষ শীর্ষ থেকে মধ্যে মধ্যে ডাক শোনা যায়। বাগানে দু'একটা গাছে যূই বেলের কুঁড়ি স্ফুটনোন্মুখ। আকাশে, বাতাসে, মনে একটা আগত আলস্যের আমেজে কেমন যেন অভূতপূর্ব্ব সুখস্পর্শ।

সেদিন এমনি এক দুপুরে স্বপন ও কাবেরীর মধ্যাহ্ন-ভোজন সারা হ'লে—স্বপন বাইরের ঘরের পানে চলে গেল। আর কাবেরী ওপরে গিয়ে যখন আরাম কেদারায় বসল তখন পরিচারিকা কারুময় পানপাত্র নিয়ে সামনে ধরলো। সুবাসিত আতরগোলাপ মিশ্রিত পান তুলে নিয়ে কাবেরী বসে বসে সিনেমার বই-এর পাতাটা উলটাতে লাগলো। পরিচারিকা টেবিলের উপর পাত্রটা রেখে চলে গেল। কতক্ষণ বাদে স্বপন এসে ঘরে ঢুকলো এবং পানপাত্র থেকে একটা পান মুখে পুরে দিয়ে চিবুতে চিবুতে কাবেরীকে একটান মেরে বিছানার উপর নিয়ে গেল। কাবেরী হাসতে হাসতে বলে: আরে, ছাড়-ছাড়—যখন তখন—

তার কথা লুফে নিয়ে স্বপন বললে: যখন তখন বলে কি আমার কাছে কিছু আছে? বলে কাবেরীকে একেবারে বুকের মধ্যে চেপে ধরতে ধরতে বললে: একটু বিশ্রাম করে নিয়ে আজ তোমাকে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাব। তৈরী হয়ে থেকো—লক্ষ্মীটি।

যথা সময়ে প্রস্তুত হয়ে তারা একটা চলচ্চিত্র 'স্টুডিওয়' এসে পৌছাল। 'ষ্টুডিয়ো'র মালিক ধনপতিলাল স্বপনকে খুব খাতির করে সমস্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছবি তোলা দেখাল। তারপর তার পুত্র সুখনলালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। 'ষ্টুডিয়ো'র এই মনোরম পরিবেশ কাবেরীকে যেমন করল মুগ্ধ তেমনি সুখনলালের আদর আপ্যায়নে কাবেরীর পরাণ ভরে উঠলো। ক্রোড়পতি সুখনলালের মুগ্ধ দৃষ্টির কাছে দুর্ব্বলমনা কাবেরীর দুর্ব্বল মন দুলে উঠলো। এবং আবার আসবে এই আশ্বাস দিয়ে—সেদিনের মত বিদায় নিল।

'ষ্টুডিও' থেকে ফিরে আসার পর থেকে কাবেরীর অন্তরে আবার দাহ উপস্থিত হোল। উদগ্র কামনার লাভা-স্রোত তার সর্ব্বাঙ্গকে পুড়িয়ে দিতে চাইল। চাই আনন্দ, অপার আনন্দ—জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত আনন্দরসে কানায় কানায় ভরে নিতে হবে। তার সাথে সুখ—আরো সুখ—আরো—আরো—আরো—। চাই অগাধ ঐশ্বর্য্য নাম, যশ আর অতৃপ্ত কামনার পরিপূর্ণতা। স্বপনকুমারে আর মন ভরে না। চাই সুখনলালের সাহচর্য্য—তাতে তার আসবে সব।

বিচিত্র এই সংসার—বিচিত্র রমণীর মন। এরা যত সুখ পায় আরো বেশী পেতে ছুটে যায়—অতি লোভের বশবর্ত্তী হোয়ে। এককূল ভাঙ্গে এরা আর কূল গড়ে। মন ভেসে চলে নিত্য নতুনের আস্বাদ-আশায়। এরা আলাদা জাতের মানুষ—কিছুতেই এরা পরিতৃপ্তি খুজে পায় না; স্বপনের সঙ্গে মাঝে মধ্যে 'ষ্টুডিয়ো'য় গিয়ে সুখন-লালের বাড়ীর ঠিকানা জেনে নেয়। তারপর চলে অভিসার—আর স্বপনের সঙ্গে চলল ছলনার অভিনয়।

কিন্তু এ অভিনয় ক'দিন ঢাকা থাকে। শিক্ষিত স্বপনের মোহ ভেঙ্গে গেল একদিন। সামনা সামনি বোঝাপড়াও হোয়ে গেল। কাবেরী সুখনলালের পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত স্বপনের কাছ থেকে মুক্ত হোয়ে সুখন-লালের সঙ্গসুখ আশায় পালিয়ে গেল। হিন্দু কোড্‌বিল এখানেও হোল তার সহায়। স্বপনের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে ভেসে গেল কাবেরী অনিশ্চিতের সন্ধানে। উত্তরকালে নাকি সেই হবে সুখনলালের সমস্ত ছবির প্রধান অভি-নেত্রী। এই উদগ্র নেশায় উন্মত্ত হোয়ে অমৃতের স্বাদ না চেখে দেখে সে ছুটলো নীলকণ্ঠের মত গরল ভক্ষণ করতে।

* * *

ছুটেছে ট্রেন—দুর্ব্বার দুর্দ্দাম গতিতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আপনার তালে ধরিত্রীর বুক কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে। আশে-পাশে সুমুখে শূন্য প্রান্তর, গাছপালা, পাহাড় পর্ব্বত, ঘরবাড়ী, নদীনালা সব পিছনে পড়ে থাকছে। উপরে নিঃসীম নীলাকাশ অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জকে বক্ষে ধারণ করে আছে—সেই নক্ষত্রগুলো যেন নীচেকার এই সংসারের সব কিছু চেয়ে চেয়ে দেখছে। তারা সব দেখে। তারা ন্যায়ের সাক্ষী, অন্যায়ের সাক্ষী, তারা সর্ব্বকালের সাক্ষী। কিন্তু তাদের বলবার মত কোন ভাষা নেই। অধিকার নাই, তাই নির্ব্বাক হোয়ে শুধু দেখেই যায়।

প্রথম শ্রেণীর 'রিজার্ভ করা' কামরার একটি আসনের একধারে বসে আছে কাবেরী: সুখনলাল এতক্ষণ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দিগন্ত মাঠ প্রান্তর জুড়ে আকাশে অন্ধকারে ধরণীর বুকে মেশামেশি—যেন কোন বিরহিণী প্রিয়তমের পরশ আশার আশে মগ্না। কাবেরী সেইদিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছে। ললাটে অজানা একটা চিন্তার রেখা। চেয়ে চেয়ে দেখছে পিছনে যেন অতীতের সব আঁধারগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরে ঘুরে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। যেন তারা এই বিপুল সংসারের আবর্ত্তে পড়ে মাথা লুটালুটী করে আছড়ে পড়ছে। সুখনলাল জানালা থেকে ভিতরের দিকে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে কাবেরীর পাশে এসে বসতে বসতে বললে: এমন চুপ করে বসে বসে কি ভাবছ কাবেরী?

কাবেরী মৃদু হেসে বললে: কই! কিছু ভাবিনি তো?

সুখনলাল কাবেরীর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে: আনন্দ কর কাবেরী—'ডোণ্ট বি মোরজ'—বলে সজোরে কাবেরীকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বারংবার চুম্বন করতে লাগলো। কাবেরীও কোনরূপে বাধা না দিয়ে নিজেকে একেবারে সমর্পণ করে দিলে সুখনলালের মধ্যে। কতক্ষণ এইভাবে থাকার পর কাবেরী বললে: এবার ছেড়ে দাও—ষ্টেশন এসে গেল।

গাড়ী এসে ষ্টেশনে থামলে সুখনলাল কাবেরীকে ছেড়ে দিয়ে 'ডিনারের' জন্য 'প্লাটফরমে' নেমে গেল। কাবেরী একটা কোণে বসে বসে যাত্রীদের আনাগোনা দেখতে লাগল। ওধারে পাশের কামরা থেকে কোন এক অন্ধ ভিক্ষুকের কণ্ঠ হতে অস্পষ্ট করুণ সুরের রেশ তার কানে ভেসে আসছিল। ভিখারী গাইছিল—মামি পৃথিবীর মায়া কাটাব বলিয়ে—ইত্যাদি'—এই সুরের বেদনার্ত্ত ভাষা হঠাৎ কাবেরীকে কেমন যেন আনমনা করে তুললো। হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার শৈশবের সব অতীত স্মৃতি-বিস্মৃতির কথাগুলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই তার কোন এক পল্লীর পিতৃমাতৃ গৃহ! সেই মাঠ প্রান্তর, পথ-ঘাট, কত স্নেহ মমতায় ভরা—কত খুশীর অফুরন্ত আমেজ। তারপর তার বিয়ে হোল—শ্বশুর শাশুড়ীর অবারিত স্নেহ, স্বামীর সোহাগ,—কি সুখ, কত পবিত্র আনন্দ সব কিছু চিন্তা করতে করতে যেন অতীত তার কাছে এসে তালগোল পাকিয়ে দিলে। চোখ দিয়ে দরদর ধারে তার জমাট অশ্রু আজ অনেকদিন বাদে এই প্রথম বারে ঝরে ঝরে পড়তে থাকলো। সে আর ভাবতে পারল না—কাপড়ের খুঁটে চোখটা মুছে সেইখানে শুয়ে পড়লো।

* * *

অনন্ত যৌবন, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত সুখ, অনন্ত গৌরব —সর্ব্বোপরি অনন্ত কামনার লোভ কাবেরীকে উন্মাদ করে দিয়েছিল তাই আজ টেনে নিয়ে চলেছে সুদূরের পথে। তার অপরিমিত রূপ-যৌবনই তার মনকে অধঃপাতের পঙ্কিল পিচ্ছল পথে নিয়ে গিয়েছিল। তারই দাবদাহের উত্তপ্ত উত্তাপে উত্তরোত্তর নিয়ে চলেছে তাকে জ্বালামুখীর প্রজ্জ্বলিত গভীর গহ্বরে। সমাজ, ধর্ম্ম, দেব, দ্বিজ, ন্যায় অন্যায়, বিবেক সব কিছুকে সে ভেঙ্গেচুরে তচনচ করে দিয়ে ভেবেছিল এই বুঝি প্রকৃত সভ্যতা, ভেবেছিল, এ সংসারে মানুষ সবই একই ছাঁচে গড়া, এখানে জাত্যা-জাত্যের আবার বিচার কি, ভেদ কিসের? সে এটুকু তলিয়ে দেখেনি যে দেহের উপরে যেমন মাথা, তারপর বাহু, পা—ইত্যাদি তেমনি এই সমাজের মধ্যেও শ্রেণী বিচার অবশ্যই আছে। আর তা প্রকাশ পেয়েছে শ্রীগীতায় শ্রীশ্রীভগবানের মুখ নিঃসৃত অমৃত বাণীতে। যা সনাতন, তা প্রাচীন হলেও আমাদের এই সমাজ, ধর্ম্ম সব কিছুই তারই উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। এবং তা আছে

বলেই এখনও এই জাতটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়নি। ইতিহাসের উত্থান পতন কতই না ঘটে গেছে কিন্তু এর কি কোন ক্ষয়-ব্যয় হয়েছে?

যাইহোক কাবেরী এক ভেলা থেকে আর এক ভেলা, সে ভেলা থেকে অপর ভেলায় এখন ভাসতে ভাসতে চলেছে—চরম সুখের অধিকারিণী হবে বলে।

দু' রাত্রি একদিন কাটিয়ে গাড়ী এসে পৌঁছাল বম্বেতে। সুখনলালের পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত নগরের উপকণ্ঠে সুসজ্জিত আবাস ঠিক করাই ছিল। ট্রেন থেকে নেমে তারা সরাসরি সেই স্থানে গিয়ে উঠলো। বাড়ীতে যেখানের যা সব থরে থরে সাজান; চাকর, বামুন, খানসামা, সব মোতায়েন। অজস্র অর্থ ঢেলে দিয়েছে সুখনলাল এই প্রাসাদের পিছনে। সুমুখে ফোয়ারী করা উদ্যান,—উদ্যান মধ্যস্থ কোথাও সরসী জলে পদ্মপত্রের আড়ে কমলকলি স্ফুটনোন্মুখ—বড় বড় শুভ্র রাজহংসের দল কেলি করছে। কোথাও ফোয়ারা দিয়ে জল ঝরছে তারই ধারে ময়ূর ময়ূরী ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে পেখম ধরে নৃত্য করবার জন্য উন্মুখ। নানা জাতীয় পুষ্প-সম্ভারে পরিপূর্ণ উদ্যান। মৌয়ের লোভে মক্ষিকাগুলি গুঞ্জন তুলে ধেয়ে চলেছে ফুল হ'তে ফুলে। পাখায় তাদের মৌয়ের পরশ—সুরভি তাদের অঙ্গে অঙ্গে—উজাড় করে বয়ে নিয়ে চলেছে সঞ্চয়ের ধনকে। গাড়ী বারাণ্ডার তলে দাঁড়িয়ে আছে, "রোলস্" "ক্রহম্", মিনার্ভা প্রভৃতি নানান্ ট্রেড্মার্কা গাড়ী। কুবেরের ঐশ্বর্য্য যেন উপচে পড়ছে। কাবেরী এই সব চাকচিক্যভরা জাঁকজমক দেখেশুনে আজ সান্ত্বনা পেয়েছে। জীবনে সে যা কামনা করেছিল আজ তার ভাগ্যবিধাতা যোলকলায় তা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। স্বপনকুমারেও এই সাধ বুঝি মিটত না। আজ তাই সে সর্ব্বপ্রকারে পরিপূর্ণতা যেন ফিরে পেয়েছে। আর সেই সঙ্গে সুখনলালকে তার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে দিয়েছে নিঃশব্দে নিঃশেষে। রাতের পর রাত কামনার উদগ্রতায় মাতাল হয়ে ঢেলে দিয়েছে তার সমস্ত নারীত্বের সত্বাকে।

কিন্তু পাটোয়ারী ব্যবসায়ী সুখনলাল জানে—এতো দেবতার নিবেদিত একটি পবিত্র ফুল নয়—এ যে, পাঁচ সাজী ফিরে আসা বাসী ফুল—তাই তাকে একটু একটু করে সুরাপান করতে শিখিয়েছে। স্তোকবাক্য দিয়ে বুঝিয়েছে যে, প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতে হ'লে আগে সেই মত বাড়ীতে তৈরী হতে হবে। সম্পূর্ণ তৈরী হলেই তাকে প্রধান চরিত্রে নামাবে—এবং ওই একটি মাত্র বইয়েই তার নাম 'হিট' হ'য়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। কাজেই সুখনলালের কথায় বিশ্বাস করে বসে থাকে কাবেরী দিনের পর দিন।

* * *

সুখনলাল তার পিতা-মাতার কাছ থেকে ছ' মাসের ছুটী নিয়ে বম্বে এসেছিল। দেখতে দেখতে পাঁচ মাস গড়িয়ে গেল। কাজেই এবার যাবার জন্য তাকে তৈরী হ'তে হোল। তাই একদিন রাতে কাবেরীকে বললে: দেখ কাবেরী, আমাকে দিন কতক কাজের জন্য কলকাতায় যেতে হবে। আমি সব ব্যবস্থা করে যাব। তারপর কাজ শেষ হলেই আবার চলে আসব। তুমি এখানেই থাকবে। সুখনলাল কাবেরীকে তার নর্ম্মসহচরী করেই ছ' মাসের জন্য এনেছিল। সে জানতো ছ'মাস কেটে গেলেই সে কাবেরীকে তার সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে দেবে। কাজেই কাবেরীর সবটুকু মধু নিঙড়ে নিঙড়ে খেয়ে এই ছ' মাসের মধ্যে নিঃশেষ করে ছেড়ে দিয়েছে। কাবেরী সুখনলালের কথায় তেমন যেন ভরসা পেলে না—তাই সে উত্তর করলে: বারে—তুমি আমায় একা ফেলে চলে যাবে? তাকি হয়?—কি গো, তুমি যে বলেছিলে আমায় অভিনেত্রী করে তোমার বইএর প্রধান ভূমিকায় নামাবে—তার কি হোল?

—অভিনেত্রী তো তুমি অনেকদিনই হোয়ে গেছ কাবেরী—নিজেই তা ভেবে দেখনা কেন? বলে গম্ভীর হ'য়ে গেল সুখনলাল।

কঠিন কণ্ঠে কাবেরী বললে: মানে? তুমি কি বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বল।

সুখনলাল বললে: স্পষ্টই তো বললাম! সারাজীবন তো অভিনয় করেই এলে! আবার কিসের অভিনয়—

কাবেরী প্রথমে একটু সংযত হোয়ে বললে: আমার সঙ্গে তামাসা করছ না যা বলছ সত্যি করে বলছ?

—তামাসা করে বলার পাত্র সুখনলাল নয়—যা বলছি ঠিকই বলছি।

কাবেরী রূঢ় রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলে: তাহলে

এতদিন তুমিও অভিনয়ই করেছ আমার সঙ্গে? আমাকে এতদিন শুধু প্রতারণাই করে এসেছ? তাই যদি হয় তাহলে আমি বলব তুমি একটি পাকা জোচ্চোর—এবং আমিও তোমাকে সহজে ছাড়ব না। বলে রাগে কান্নায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল কাবেরী।

ভুল করল কাবেরী—কোথায় কখন্ কি অবস্থায় কি ভাবে ছোবল মারলে বিষক্রিয়া হয় তা না জেনেই আকণ্ঠভরা বিষ নিয়ে সুখনলালকে ছোবল মারলে কাবেরী—কিন্তু সুখন পাকা ওস্তাদ রোজা—তাই সজোরে কাবেরীর গালে একটি চপেটাঘাত করে বললে: এরই নাম ওস্তাদের মার—

কাবেরী এতটা আশা করেনি। তাই সে চড় খেয়েই বললে: তুমি আমাকে মারলে? হ্যাঁ, মারলুম বলেই ছুটে গিয়ে লাথি, কিল চড়-চাপড় মারতে মারতে ফটকের বাইরে বার করে দিয়ে বললে: এই তোর চরম শাস্তি। অভিনয় করবে? এরই নাম অভিনয়—তার এতদিনের ছলনার ভালবাসা ধুলায় পড়ে ছটফট করতে লাগল।

আচম্বিতে এমনটা যে হঠাৎ হ'য়ে যাবে কাবেরী তা ভাবে নি। সহায় সম্বলহীনা কপর্দ্দকহীনা কাবেরী এই বম্বে সহরের অজানা, অচেনা স্থানে কোথায় যাবে? মার খেয়ে তখন তার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, দেহ কম্পিত। এই স্তব্ধ নীরব নিশীথিনীর অন্ধকার আবর্ত্তে পড়ে কূলহারা কাবেরী আর্ত্তনাদ করে মূর্চ্ছিত হ'য়ে সেই প্রাসাদের অনতিদূরে ফুটপাতের উপর পড়ে রইল।

* * *

নিত্য যেমন প্রভাত হয়—তেমনি প্রভাত হোল। আবার তেমনি সারা সংসার নিত্যের মত জেগে উঠল। যে যার কাজ কর্ম্মের জন্য ছুটোছুটি করতে লাগল। সহর প্রাণচঞ্চল হোয়ে উঠলো। কে কার খোঁজ রাখে, কে কার জন্য ব্যথায় ভরে উঠে সমবেদনা জানাতে ছুটে আসে! যে যার নিজের নিয়েই ব্যস্ত। সহরের উপকণ্ঠে এই নির্জ্জন স্থানে লোকজনের যাতায়াত খুব কম। কাজেই এই উন্মুক্ত পথে একজন বিকৃত সুন্দরী যুবতী তরুণীর এতক্ষণ পর্য্যন্ত এমনভাবে পড়ে থাকায় কারু কিছু বিস্ময় উৎপাদন করার কারণ হয়নি। কাবেরীকে পথে বার করে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি সুখনলাল—তার দেহে যে সমস্ত অলঙ্কার ছিল তাও খুলে নিয়ে একবস্ত্রে ছেড়ে দিয়েছে। ছ'টী মাস অজস্র মধু পান করে নিঙড়ে রসকস্ বের করে শুধু ছোবড়াটুকু সার করে ছেড়ে দিয়েছে। দিনদিন কাবেরীকে মুখে কিছু না বললেও বিষ নজরে দেখতে সুরু করেছিল। তাছাড়া এবার পিতামাতার সৎপুত্র সুখনলাল পিতামাতার আহ্বানে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে। সেখানে সাদি হবে—নতুন প্রেমের জোয়ারে সে ভাসছিল। কাজেই পিছনের এই পাপ লালসার পালাকে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে যাওয়াই সমীচিন বিবেচনায় সুখনলাল সামান্য কারণ নিয়ে কাবেরীকে পথের কুকুরের মত বিতাড়িত করে দিয়ে সেখানকার পাট তুলে দিয়ে চলে গেল।

প্রভাত বেলা কাবেরীর যখন নিদ্রাভঙ্গ হ'ল তখন বেশ খানিকটা বেলা হ'য়ে গেছে। উঠতে পারে না, গা-গতরে বেশ ব্যথা হয়ে গেছে। কাপড়চোপড়ে থোকা থোকায় রক্ত লেগে আছে। শরীরের দু'এক স্থানে কাটা, এখনও একটু একটু রক্ত বের হচ্ছে। কোনরকমে উঠে—কাপড়টাকে আঁট সাঁট করে পরে সে কোনমতে সে স্থান ত্যাগ করে সহরের পানে এগুতে লাগলো। উদ্দেশ্য ভিক্ষা-শিক্ষা করে কিছু টাকা তুলে কোনরকমে কোলকাতায় যাবে। তারপর সেখানে গিয়ে যা' হয় কিছু করবে।

এতদিন যে নিয়তি তাকে এতদূর পর্য্যন্ত টেনে আনলো সেই নিয়তিই আজ ভিন্ন পথ ধরে তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকল। কাবেরী নিজের পানে চেয়ে দেখলে। নিরাভরণা সে,—খালি কানের ফুল দুটী যা মাত্র সম্বল। তার নিজস্ব যে অলঙ্কার ছিল তাও সুখনলাল কেড়ে নিয়েছে। এই ফুল জোড়াটী দিয়ে কিছুই করা যাবে না। ভাবতে ভাবতে চলল পথ ধরে। কিছুদূর যেতে না যেতেই বিষম ক্লান্তিতে দেহ তার ভরে গেল। অনাহার ক্লিষ্ট দেহ তার, দুঃশ্চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হ'য়ে উঠছে। ক্ষোভে, দুঃখে, তীব্র অনুশোচনায় এবং সর্ব্বোপরি একটা তীব্র প্রতিহিংসায় তার অন্তরমনকে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। আজ তার নারীত্বের মধ্যে যে আত্মমর্য্যাদা আছে তা' জেগে উঠে তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলছে। শিক্ষিতা রমণী এতদিন সে যে মোহের ভ্রান্তিতে পড়ে যে কামনার উষ্ণ স্রোতোধারার আবর্ত্তের মাঝে নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে চলছিল, যে মাদকতার অন্ধ আবেগে,—সমাজ, ধর্ম্ম, ন্যায়, অন্যায়,

কর্ত্তব্য, বিবেক সকলকে পদাঘাতে সরিয়ে দিয়ে—আধুনিকার পরদেশী মোহের বশবর্ত্তী হোয়ে আজ এই আকস্মিক আঘাতে তার সেই বিস্মৃতপ্রায় লুপ্ত মর্য্যাদা, বিবেক, সমাজ, ধর্ম্ম সব যেন তার কাছে এসে ভিড় করে সমস্বরে বলছে—"কাবেরী নারীত্বের মর্য্যাদাকে যে সম্মান না দিয়ে পদাঘাতে সরিয়ে দিলে তার উপযুক্ত শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও—তার সে অন্যায়ের জবাব দাও।" ভাবতে ভাবতে চলেছে—পথের ধারে একটা কল্ থেকে খানিকটা জল আকণ্ঠ পান করে নিলে। কতকটা শান্তি এলো। তারপর আবার চলা।

*   *   *

খানিকদূর গিয়েই একটা রাস্তার বাঁক পার হতেই সহরের মুখ দেখতে পেলে। কিন্তু আর সে চলতে পারছে না। ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে। কোন রকমে নিজের কানের ফুল জোড়াটা খুলে নিয়ে বিক্রী করে তার কাছে কিছু পয়সা এল। তাই দিয়ে আহারাদি সমাপন করে নিলে। তারপর কোন একটা খালি জায়গা দেখে তার থাকবার আস্তানা করে নেয়। আজ তার এই দুঃসহ পরিণাম দেখে অতীতের স্মৃতিগুলো একে একে মনমকুরে প্রতিফলিত হ'য়ে ওঠে। বাসনা, কামনা, লোভ ও অগাধ ঐশ্বর্য্যের লালসায় কাবেরী তার সমস্ত নারীত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে আজ এই অধঃপতিত পরিণামের পঙ্কিল-পঙ্কে পড়ে নিজেকে শত ধিক্কারে ধিক্কার দিতে থাকে। তার তো সবই ছিল, নারীত্ব, সতীত্ব সর্ব্বোপরি ছোট্ট একটি গৃহকোণ সংসারে দশজনের একজন হ'য়ে সুখে দুঃখে স্বামীর আশ্রয়ে দিব্যি তার জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতো। আজ তার এই পরিণাম সে নিজেই রচনা করেছে—সে আজ কোন্ দেবতাকে ধিক্কার দেবে! চোখের জলে তার বক্ষ ভেসে যায়—নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য আজ অনুশোচনায় তার হৃদয় মন পুড়ে খাক্ হয়ে যায়। তার সব গেছে। মান, মর্য্যাদা, সতীত্ব, নারীত্ব সব গেছে, আছে শুধু এই কায়া। জ্বলন্ত অঙ্গারের মত কখনও সে জ্বলে ওঠে—প্রতিশোধ কামনায়—চাই সুখনলালের এই অপমানের জবাব।

*   *   *

ঋতুচক্র আবর্ত্তিত হয়।

সজলঘন বাদল ধারার অভিসারকে ক্ষান্ত দিয়ে নির্ম্মল নীলাকাশে লঘুপক্ষ শুভ্র মেঘখণ্ডগুলো পেঁজা তুলোর বস্তার মত ভেসে বেড়াতে থাকে। শরৎ এসেছে, এনেছে তার অপরূপ রূপসম্ভার। আকাশে বাতাসে আলোছায়ার খেলার সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে আগমনীর বোধনবাদ্য।

পূর্ণযৌবনবতী সরসীনীর টলটল ছলছল করছে—তায় ফোঁটা আধফোঁটা কমল, শালুক আরও জলজ ফুলদল উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে। ইতস্ততঃ যেখানে সেখানে মাঠে প্রান্তরে ঝোপে ঝাড়ে কামিনী বকুলার আর কাশ ফুল চামর দুলাচ্ছে। নদ-নদী তাদের ভরা কামনার উৎস নিয়ে ছুটে চলেছে পিয়াসভরা অন্তর নিয়ে কোন্ দয়িতের সন্ধানে! কোয়েল-দোয়েল প্রভৃতি পাখ-পাখালীরা শরতের প্রভাত বেলায় থেকে থেকে গেয়ে ওঠে।

মা আসছেন। তাই শিশিরস্নাত শিউলি ধূলি তুষারসিক্ত শ্যামল দুর্ব্বাদলে আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এতো গেল পল্লীবাংলার কথা। উৎসবমুখর কলকাতা সহরও মাতৃ আহ্বানে মুখর হয়ে উঠবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে।

আজ দু' তিন দিন হোল কলকাতা সহরে একটা বেশ জনরব পড়ে গেছে। আউটরাম ঘাটের সন্নিকটে কে একজন পিশাচসিদ্ধা সন্ন্যাসিনী নাকি কোথা থেকে এসে আস্তানা গেড়েছে। সে নাকি বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ সব কিছু বলতে পারে। এবং প্রয়োজন হ'লে অবশ্য সবাই নন্—বিপদগ্রস্ত আর্ত্তকে এবং কঠিন রোগগ্রস্তকে তার অলৌকিক যোগবলে রোগমুক্ত ও বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। তবে তার নাকি কতকগুলি নিয়ম আছে সেই নিয়মানুসারে সে কাজ করে দেয়। কতজন যে তার শরণাপন্ন হোয়ে কঠিন রোগ ও বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে তার ঠিক নাই। জনে জনে, মুখে মুখে এই বার্ত্তা রটে যায়। ভিড় জমতে থাকে। সেই বার্ত্তা ধনীপুঙ্গব সুখনলালের কাণেও গিয়ে যথাসময়ে পৌছোল। তার পিতার তখন কঠিন অসুখ। দু' তিন মাস ধরে শয্যাশায়ী—ডাক্তার-বদ্যিতে কিছুই করতে পারছে না। তাই এই সংবাদ শুনে 'ষ্টুডিও' ফেরতা এসে হাজির হোল সেই সন্ন্যাসিনীর দ্বারে।

জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ আজ ভয়াল ভ্রূকুটী হেনে আসন্ন প্রলয় প্রভঞ্জনের জন্য যেন অপেক্ষা করছে। উত্তাল ভাগী-

রথীর জলকল্লোল আজ তীব্র তীক্ষ্ণ উন্মাদনায় উন্মত্ত প্লাবনে আছড়ে পড়তে চায় রোষে, ক্ষোভে।

সেই পিশাচসিদ্ধা ছদ্মবেশী সন্ন্যাসিনীর এতদিনের শ্রম আজ ষোলকলায় পূর্ণ হ'তে চলেছে। অনাহার ক্লিষ্ট ব্যাঘ্র যেমন সম্মুখে আহার্য্যরূপী শিকার পেলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—সেইরূপ এক হাহাকার করা প্রতিশোধ কামনার হিংস্রতায় ওই ছদ্মবেশধারিণী সন্ন্যাসিনীর চোখ দুটো একবার ধ্বক্‌ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠে।

সুখনলালকে দূর থেকে আসতে দেখে সেই পিশাচসিদ্ধা তার তাঁবুর মধ্যে গিয়ে তার পরিচারিকাকে দিয়ে সব কিছু জেনে নিলে। তারপর নির্দ্দেশ দিলে সামনের অমাবস্যায় কাশীমিত্রের শ্মশানঘাটের সন্নিকট এক বটবৃক্ষতলে যেন রাত দু'টোর সময় সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তিনি নাকি ওই দিন এক দিব্যযোগের দ্বারা সুখনলালের পিতার রোগ আরোগ্য করে দেবেন। এবং তিনি যেন একা সেইখানে যান। কেন না এ অতি দুরূহ গোপন যোগ।

মাড়োয়ারীপুঙ্গব সুখনলাল সহজেই বিশ্বাস করে ফেললে এবং সেইদিন নিশ্চয়ই যাবে বলে কথা দিয়ে চলে গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে রাত একটার সময় বহু দূরে গাড়ী রেখে একা সুখনলাল কাশীমিত্রের শ্মশানঘাটের অনতিদূরে একটি বটবৃক্ষের তলে এসে দেখে ছোট একটি তাঁবু খাটানো আছে আর তারই পিছনে একটা বেদীতে আগুন জ্বেলে সন্ন্যাসিনী বসে আছে। সুখন যখন সেই নির্ব্বাচিত স্থানে এসে পৌছাল তখন অমানিশীথিনী শুব্ধ গম্ভীর। জনমানবের সাড়া নেই। গঙ্গার ধারে প্রশস্ত চত্বর—বড় বড় অশ্বত্থ পাকুড় বট গাছে রাস্তার ধারের আলোককে ঢেকে ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। পথ থেকে কিছুই সহসা নজরে আসেনা। সামনে 'সানটিং' করা মালগাড়ীগুলো লম্বালম্বী ভাবে অজগর সাপের মত শীতের রাতে অনড় হ'য়ে দিবসের জন্য প্রতীক্ষারত। ভাগীরথীর উচ্ছল জলধারা নৈশ আঁধারে খালি ছলাৎছল্ শব্দ তুলে তীরে এসে আছড়াচ্ছে। ওপারে ও দূরে বিজলী বাতিগুলি আকাশের নক্ষত্রের মত মিটমিট করে জ্বলছে। কিছু দূরে পানসিগুলো বাঁধা আছে ও জলের ঢেউএ অস্থির হয়ে এধার ওধার করে বেড়াচ্ছে।

সুখনলালকে সেই স্থানে আসতে দেখে তার পরিচারিকা এসে বলে: আসুন তাঁবুর ভিতরে।

সুখনলাল তাঁবুর মধ্যে গিয়ে বসে। তাকে বসিয়ে রেখে সেই পরিচারিকা পিশাচিনীর নির্দ্দেশমত সেখান থেকে চলে গেল সেই আউটরাম ঘাটের আস্তানায়। শুধু সুখনলাল আর সন্ন্যাসিনী সেই জনশূন্য স্থানে রয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে সেই সন্ন্যাসিনী একটা বোতল থেকে ঢক্-ঢক্ করে কারণবারি পান করে নিলে। তারপর সুখনলালের নিকটে এসে তার ঘোমটা খুলে দিয়ে এলায়িতাকেশা চামুণ্ডার মত—হা-হা-হা রবে উন্মাদিনীর মত বিকট বীভৎস হাসি হাসতে হাসতে একটা তীক্ষ্ণ ছুরিকা নিয়ে সুখনলালের সম্মুখে ধরে বলে: চিনতে পারিস পাষণ্ড—সুখনলাল—

হঠাৎ এই ভাব দেখে সুখনলাল চমকে উঠলো—একি? কে, এ—কা-বেরী—

—হ্যাঁ—আমি তোর যম। বলেই আর প্রস্তুত হবার সময় না দিয়ে সেই সুতীক্ষ্ণ ফলক সুখনলালের বুকে বসিয়ে দিতে দিতে বলে: নরাধম পশু, একদিন যাকে নর্ম্মসহচরী করে সব মধু পান করে শেষে সাধু সেজে পদাঘাতে পথে ফেলেছিলি আমি সেই কাবেরী—আজ আমি পিশাচিনী—আজ তোর ওই বুকের রক্ত পান করে আমি আমার নারীত্বের অবমাননার ইতি করে যাব। বলে পুনশ্চ তার সেই ছোরা দিয়ে সুখনলালের বক্ষ ভেদ করে দিলে। তপ্ত রক্ত স্রোত ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে এলো ঝলকে ঝলকে—

একটিবার মাত্র আর্ত্তনাদ করেই লুটিয়ে পড়লো সুখনলাল। তার এই আর্ত্তনাদ শুনে গুমটি থেকে কতকগুলো কুলি ছুটে আসছিল। তাই না দেখে কাবেরী পলকে সেই স্থান ত্যাগ করে গঙ্গার ধারের রেলিং টপ্‌কে উত্তাল উচ্ছল বারিধি গঙ্গার বক্ষে ঝুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর আর তার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

কান্তকবি স্মরণে

অমরেন্দ্র গণাই

(কবিমানস ও কাব্যবিচার)

১

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের জন্ম শত-বার্ষিকী পূর্ণ হল। তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বর্তমানের বিকারগ্রস্ত, অন্ধ তামসিকতার দিনে তাঁকে স্মরণ করার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। যাঁর ভক্তি রসাশ্রিত সঙ্গীত আমাদের মানসিক সম্পদকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল, তাঁর সম্পর্কে আজ আমরা উদাসীন। অবশ্য এ উদাসীনতা আমাদের অনেকের সম্পর্কেই। তাই এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে লাভ নেই। শতবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে কবির সামগ্রিক রচনা ও তার বিশিষ্ট ভাবধর্মের পরিচয় গ্রহণই কবির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। অবশ্য দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য যে এধরণের প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে হয়নি।

১২৭২ সালের ১২ই শ্রাবণ (ইং ২ শে জুলাই, ১৮৬৫) বুধবার পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে তাঁর জন্ম। রবীন্দ্রনাথের মতো কান্তকবিও সাহিত্য ও সঙ্গীতের পরিবেশ পরিবার জীবনের মধ্যেই লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতা গুরুপ্রসাদ সেন সঙ্গীতজ্ঞ ও সুকবি ছিলেন। ব্রজবুলিতে তাঁর লেখা কীর্তন-গান 'পদচিন্তামণিমালা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ জীবনে 'অভয়াবিহার' নামে একখানি গীতিকাব্যও রচনা করেছিলেন। এতে সতীর জন্ম থেকে সতীর দেহত্যাগ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। পিতার দু'টি রচনা গ্রন্থই কান্তকবিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তার ওপরে ছিল ভক্তি রসাশ্রয়ী কীর্তন-গানের সুরের প্রভাব। অল্পবয়স থেকেই তিনি পিতার কাছে রামপ্রসাদী সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। শাক্তপদাবলী, বিশেষ করে রামপ্রসাদের প্রভাবের মূলসূত্রও এখানে নিহিত।

সঙ্গীত ও সাহিত্যগতপ্রাণ কান্তকবিকে উত্তর-জীবনে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে হয়েছিল আইনবিদ্যা (ওকালতী)। ফলতঃ মধুসূদনের মতো তিনিও ব আইনজীবী। নিজেও এই অসঙ্গতি মর্মে মর্মে উপল করেছিলেন। তিনি নিজেই একটি চিঠিতে লিখেছিলেন- 'কোন দুর্জ্ঞেয় অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধি দিয়াছেন, কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশলাভ করি পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতা কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।' বৃত্তি ও প্রবৃত্তি এই বিরোধ, পেশা ও নেশার এই দ্বন্দ্ব তাঁকে আজীব ভোগ করতে হয়েছে। এই ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁ রাজশাহী যেতে হয়েছিল এবং সেখানে তিনি সাহিত প্রতিভা বিকাশের অনুকূল সুযোগ লাভ করেছিলেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের স রজনীকান্তের পরিচয় না ঘটলে কবির স্বপ্রকাশ ঘটতে কিনা সন্দেহ। কাব্য-কবিতা প্রকাশের ব্যাপারে তি একান্ত উদাসীন ছিলেন, সঙ্কোচ বোধ করতেন। আত্ম প্রকাশের এই দ্বিধা থেকে অক্ষয়কুমার তাঁকে মুক্ত করেন অক্ষয়কুমার কান্তকবির স্মৃতিসম্বর্ধনা প্রবন্ধে এ সম্পর্ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই রাজশাহীতেই কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে কবির পরিচয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বর্তমানে দ্বিজেন্দ্রলালের মুখ্য পরিচয় নাট্যকার রূপে হলেও হাসির গানের তিনি অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ রচয়িতা এব সেখানে তিনি অসামান্য সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অংশের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। তাঁর হাসির গান শুনে তাঁ গানের আদর্শে তিনি গান লিখতে সুরু করেন এটা ঠিক আকস্মিক ব্যাপার নয়। ব্যঙ্গ ও কৌতুকপ্রিয়ত তাঁর চরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল। ছাত্রজীবনে তিনি

তাঁর শিক্ষকগণের সম্পর্কে সংস্কৃতে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে তার প্রমাণ রেখে গেছেন। সেই সুপ্ত কৌতুকপ্রিয়তা দ্বিজেন্দ্রলালের সংস্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও তাঁর কাব্যে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কণিকার আদর্শে তিনি 'অমৃত' কাব্য রচনা করেছিলেন। সাহিত্য-বিচারে শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলো বাদ দিয়ে কণিকা কাব্য যে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল তার কারণ তাঁর চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। তার চরিত্রে অন্যান্য গুণাবলীর সঙ্গে নৈতিক চরিত্রের মহনীয়তা ছিল। নৈতিক আদর্শ বোধের প্রেরণায় তিনি যেমন সমাজ ও গ্রাম-উন্নয়ন মূলক কর্ম-প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনি 'অমৃত'র মত নীতি-কাব্যও রচনা করেছেন।

জীবনে দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ-শোকের প্রাবল্য সবই তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল; অথচ এ সব তাঁকে সম্পূর্ণ-রূপে অভিভূত করতে পারেনি। সাংসারিক অর্থকষ্ট, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নীর মৃত্যু, নিজ পুত্রকন্যার মৃত্যু, বার বার তাঁর জীবনে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, নিজেও দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগেছেন, কিন্তু অন্তরের অনাবিল আনন্দ থেকে তিনি বঞ্চিত হননি। সেই অপরিমেয় প্রাণপ্রাচুর্য স্বাদেশিকতায়, সঙ্গীতে ও সাহিত্যে উৎসারিত হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কান্তকবিকে মৃত্যুশয্যায় দেখে এই পরম উপলব্ধির কথা জানিয়ে গেছেন—'সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি মাংস, স্নায়ু পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম।…শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই, পৃথিবীর সমস্ত আশা ও আরাম ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য।'

২

কান্তকবির রচনার সংখ্যাগত পরিমাণ খুব বেশি নয়। জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা নগণ্য বললেই চলে। মৃত্যুর পূর্বে তিনখানি কাব্য প্রকাশিত হয়, মৃত্যুর পরে অবশ্য আরও পাঁচখানি কাব্য প্রকাশ লাভ করে। জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য—বাণী (১৯০২) কল্যাণী (১৯০৫) ও অমৃত (১৯১০)। বাণী এবং কল্যাণীই কান্তকবির শ্রেষ্ঠ কীর্তি কিন্তু অপরাপর কাব্যগুলোও নানা-কারণে স্মরণযোগ্য। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তিনখানি কাব্য প্রকাশিত হয়—'আনন্দময়ী' (আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত) 'বিশ্রাম' এবং 'অভয়া'কাব্য। নীতিমূলক কাব্য 'সদ্ভাবকুসুম' ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবির অপ্রকাশিত রচনার সঙ্কলন-রূপে 'শেষদান' কাব্যটি প্রকাশিত হয়।

৩

কান্তকবির সমগ্র রচনাকে আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে করা যেতে পারে। সাধারণভাবে তিনি—ভক্তি গীতি, হাসির গান ও দেশপ্রেমের গান—এই তিন শ্রেণীর সঙ্গীত রচনা করেছেন। এ ছাড়া রয়েছে নীতি-কবিতা। সংখ্যায় অল্প হলেও প্রেমের কবিতাও তিনি লিখেছেন। তবে তাঁর প্রতিভার যথার্থ বিকাশ ঘটেছে ভক্তিগীতিতে।

প্রেম বিষয়ক কবিতায় প্রেম নয়, বরং প্রেমের স্মৃতি সৌরভই তাঁর উপজীব্য। বাণী কাব্যের বিলাপ অংশে এই শ্রেণীর কতকগুলি কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রেমের মোহন স্পর্শে কবির মনের দুধারে বাসনার পর্যাপ্ত কুসুম ফুটে উঠেছিল, তারই স্মৃতি গৌরভে কবি আজো মোহমুগ্ধ—

একটু সুধাহাসি আধেক প্রেমগান,
কামনা ফুল দু'টি, শুষ্কহীন প্রাণ,
এখনও প'ড়ে আছে, চরণ রেখাপাশে
মুগ্ধ হ'য়ে আছি, তাই নিয়ে গো।

(পদাঙ্ক: বাণী)

যেদিন কবি তাঁর মানসপ্রিয়াকে পেতে চেয়েছিলেন, সেদিন সে অধরা থেকে গেছে। তাই তিনি তাঁকে স্বপ্নের আবরণে ঢেকে রাখতে চেয়েছেন। স্বপ্নের সুনীল আকাশে

চলেছে প্রেম-বিহঙ্গের মুক্ত সঞ্চরণ-লীলা। আদর্শায়িত প্রেমকে প্রত্যক্ষ করতে না পেরেই কি কবি স্বপ্নের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন?

স্বপনে তাহারি মু'খানি নিরখি
স্বপন কুহেলি মাখিয়া!
(কারে) বরমালা দিনু স্বপনে
(হ'ল) হৃদি বিনিময় গোপনে
স্বপনে দুজনে প্রেম আলাপনে
যাপি সারা নিশি জাগিয়া।

(স্বপ্নপুলক : বাণী)

কবির প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। তারপর লগ্ন যখন ভ্রষ্ট, প্রাণের আনন্দদীপ্তি যখন স্তিমিত, তখন অসময়ে তিনি তাঁর স্বপ্ন-মানসীর দেখা পেয়েছেন। যে মিলন-মালিকা নিয়ে তিনি উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় ছিলেন, সে মালা আজ শুষ্ক, বিবর্ণ—

দেখা দিবে বলে কেন আশা দিলে
আশা পথপানে চেয়ে রই
(আমার) ভেঙ্গে গেছে বুক, ভেঙ্গেছে পরাণ
সময় থাকিতে আসিলে কই?

(অসময়ে : বাণী)

'ব্যর্থ প্রতীক্ষা' কবিতাটিতেও অনুরূপ ভাব ব্যঞ্জিত হয়েছে। বিরহের আর্তবেদনার দিকটি তাঁর কাব্যে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় এর একটা কারণ হতে পারে, কিন্তু কবির মানসিক প্রবণতাই এর মুখ্য কারণ। পদাবলীর ভাব ভাষাও কখনো কখনো তিনি আত্মস্থ করেছেন। 'মালিনী' কবিতায়—

চন্দন, সখি, হ'ল বিষতরু
নন্দনবন হ'ল ঘোর মরু
উদাস নয়নে, বিরহ শয়নে
ভাসিতেছি আঁখি নীর তরঙ্গে।

এই অংশে গোবিন্দদাসের 'চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব' 'শশিধর রবিখর আগি'-কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ব্যক্তি-প্রেম থেকে দেশপ্রেমে উৎক্রমণ ঘটেছে। তখন বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ার চলেছে—বাঙলাদেশের গ্রামে গ্রামে তার তরঙ্গ পৌছেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল দেশপ্রেমের কবিতা রচনা করে চলেছেন। বঙ্কিমের বন্দে-মাতরম সঙ্গীত সমগ্র জাতিকে নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। সেই সময় রজনীকান্ত রচনা করলেন—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।

বাঙলার ঘরে ঘরে এ গানের প্রচার ও অসাধারণ সমাদর হয়েছিল। দেশীয় শিল্প সামগ্রীর দিকে তিনি বাঙ্গালীর দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন এ গানে। এ গানের প্রভাব যে কত গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল আজকের দিনে তা উপলব্ধি করা সহজ নয়। সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই সঙ্গীতটি সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ উদ্ধারযোগ্য—'কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সঙ্গীত-সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান।...যে গান দৈববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মত সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে—নিয়তির বিধান আছে।...স্বদেশী যুগের বাঙ্গলা-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্র লালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোন গান ব্যাপ্তি সৌভাগ্য ও সফলতায় এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দেশ করি।' 'তাঁতি ভাই', 'আমরা' 'তাই ভালো', ইত্যাদি কবিতাতেও কবির এই ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। 'বাণী' কাব্যগ্রন্থের 'জন্মভূমি' 'বঙ্গমাতা', 'ভারতভূমি', ইত্যাদি কবিতার মধ্যে বাঙলা ও ভারতবর্ষের সুমহান মূর্তি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ও ভেদবুদ্ধির অবসান ঘটিয়ে পারস্পরিক ঐক্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই ভারতবর্ষের মুক্তি-স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠবে বলে কবির বিশ্বাস—

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু মুসলমান
ঐ দেখ ঝরছে মায়ের দু'নয়ান
আজ এক ক'রে দে সন্ধ্যা-নমাজ
মিশিয়ে দে আজ বেদকোরাণ।

অতঃপর হাসির গান। হাসির গান রচনায় তিনি

বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কল্যাণী কাব্যগ্রন্থের কিছু সংখ্যক কবিতায় বিশেষ করে পুরোহিত দেওয়ানী হাকিম, ডেপুটি, উকিল ইত্যাদি কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা-ভঙ্গীর প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমরা বিলেত ফেরতা ক'ভাই-এর সুরের অনুকরণও করেছেন। তবে কান্তকবির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে এ ব্যাপারে কাজে লাগিয়েছেন। নিজে আইনজীবী হওয়ায় তার কর্মজীবনের দেখা হাকিম, ডেপুটি, উকিলই তাঁর রঙ্গ-ব্যঙ্গের আধার হয়ে উঠেছে।

দেওয়ানী হাকিমের শেষ কর্ম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

আমাদের কাজটি অতীব সোজা
শুধু, মিল দিয়ে যাই গোঁজা
এই কলমে যা' আসে করে দি বাস্
ঘাড় থেকে নামে বোঝা।

এ সব কবিতায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও, এগুলো নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব মুক্ত হয়ে তিনি যে সব ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছেন, সেগুলো আশ্চর্য সার্থকতা অর্জন করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনায় তা বৈচিত্র্যে ন্যূন হলেও, অনেক গভীর। তাঁর এই সব ব্যঙ্গ কবিতায় বিদ্রূপের জ্বালা নাই, তীব্রতা নাই; অসঙ্গতিটুকু হাস্যরসের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই ধরণের ব্যঙ্গ কবিতা বাঙলা সাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ। অভিনবত্ব প্রদর্শনের অত্যুৎসাহে গবেষণার রীতি-প্রকৃতি সম্পর্কে গুপ্তকবির শ্লেষ-মিশ্রিত কবিতাটি একদা বহু-পরিচিত ছিল—

রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী
টোডরমল্লের ক'টা ছিল নাতী
কালাপাহাড়ের ক'টা ছিল ছাতি
এ সব করিয়া বাহির বড় বিদ্যা করেছি
জাহির। (পুরাতত্ত্ববিৎ)

কিম্বা 'ঔদরিক' কবিতায় যে ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছেন, তা সকলের কাছেই সমান উপভোগ্য—

যদি কুমড়োর মত চালে ধ'রে রত
পানতোয়া শত শত,
আর সরষের মত হত মিহিদানা
বুঁদিয়া বুটের মত
(প্রতি বিঘা বিশ মণ ক'রে ফল্‌ত গো)

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি স্বভাবতই বেশি বয়সের পুরুষের একটু দুর্বলতা থাকে; নানাভাবেই তিনি তাকে পরিতুষ্ট রাখবার চেষ্টা করেন, তবুও স্ত্রীর মন পাওয়া ভার হয়ে ওঠে। 'বুড়ো বাঙ্গাল' কবিতাটি এই বিষয়কে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, কিন্তু তার প্রকাশটি বড় মনোহর—

বাঙ্গার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা, ঢাইলা দিচি পায়;
তোমার লগে কেম্‌তে পারুম হৈয়া উঠ্‌ছে দায়।
আরসি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের
হাপান দিচি
চুল বান্ধনের ফিত্যা দিচি, আর কি স্থাওন চাও?

তাঁর হাসির কবিতায় তীব্রতার বদলে করুণার অভিবিস্বলে স্নিগ্ধ সজল হয়ে উঠেছে। সেজন্যে তা আমাদের মনকে আঘাত করেনা, আপনার করে নেয়। উপরোক্ত কবিতাটির মধ্যেও সেই বেদনাবোধের স্পর্শ পাওয়া যায়। 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে'র মধ্যে তা আরও সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী জড়োয়ার মতিমালা, সতের ভরি ওজনের মকরমুখো বালা, তারের কান, হীরের দুল স্ত্রীকে দেখালেন। এখানেই শেষ নয়, আরও অলঙ্কার দেখাতে লাগলেন। কবির ভাষায়—

স্বামী :—এই সোনার সিঁথি, ঝালরে মতি, কপিপাতা
অনন্ত এ
আর হীরের চুড়ি, একুশ ভরি, হয় কিনা পছন্দ এ
খোঁপার শোভা সোনার ফুল এ, দেজেছে
দুটি নীলে।

স্ত্রী :— (আহা) পান সেজে দি, মশলা দিয়ে
ফেলেছ মোরে কিনে।

পরিশেষে স্বামী জানালেন, এগুলো সব বড় বৌয়ের জন্য—

তোমার সব গহনা আছে বড় বৌয়েরি নাই গো।

স্ত্রী :—হায় কি হ'ল! ধর গো ধর, পড়িয়া বুঝি যাই গো।

এইবার তাঁর নীতিমূলক কবিতার আলোচনা করা যেতে পারে। 'অমৃত' কাব্য রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' কাব্যের আদর্শে লেখা সে কথা কবি স্বয়ং স্বীকার করে-ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর মৌলিকতা নষ্ট হয়ে যায়নি।

জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন ও আদর্শবোধ থেকে এগুলোর সৃষ্টি। সারল্যে ও সরসতায়, ভূয়োদর্শন ও জীবন-বোধে কবিতাগুলো প্রদীপ্ত। বাঙ্‌লা কাব্য-সাহিত্যে নীতিমূলক কাব্য-কবিতার মধ্যে এর স্থান অতি উচ্চে। 'সদ্ভাব কুসুম' কাব্যটিও নীতিমূলক, তবে সেখানে একটা গল্পের আবরণ আছে। কাব্য হিসাবে 'অমৃত' উৎকৃষ্টতর।

৪

পিতা গুরুপ্রসাদের শেষ বয়সে লেখা 'অভয়া বিহার' কবিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, একথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। 'আনন্দময়ী' এবং 'অভয়া'—এই দুটি কাব্যই সেই ভাব-স্বাক্ষর বহন করছে। 'আনন্দময়ী' কাব্য সম্পর্কে কবি নিজেই লিখেছেন—'ভগবানকে কন্যা-রূপে আর কোনও জাতি ভজন করেনি। যশোদার গোপাল আর মেনকার উমা ভগবানকে সন্তানরূপে পাওয়ার দৃষ্টান্ত। সেই বাৎসল্য ভাবটা পরিস্ফুট করে তোলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল ও আছে। প্রেমই নানা আকারে খেলা করে।

বাৎসল্য একটা আকার। যে বাৎসল্যে জগৎ চলছে, শুধু দাম্পত্যপ্রেমের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করতো, মানে সৃষ্টি হত, কিন্তু বাৎসল্য না থাকলে সৃজন পর্যন্তই থাকতো —পালন আর হতো না। একেবারেই সংহার এসে উপস্থিত হতো। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার—এই তিনটি অবস্থার মধ্যে স্থিতিটাই বাৎসল্য। এই ভাবটা মনে ক'রে বই আরম্ভ করেছি, এই ভাব দিয়েই বই শেষ করবো। (হাসপাতালের রোজনামচা)

এ কাব্যে আগমনী ও বিজয়া দুটি অংশ রয়েছে। বিজয়ার কবিতাগুলো আর্ত বেদনায় বিধুর হয়ে উঠেছে। নবমী নিশার শেষ যামে বিদায়ের আসন্ন মুহূর্তে মায়ের বুকফাটা হাহাকার সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অপূর্ব বাণী-মূর্তি পরিগ্রহ করেছে—

জাগরে দাসদাসী জাগরে প্রতিবাসী
দেখরে কাছে আসি' ফেটে যে গেল বুক।···
যাহারে পাব বলে বছরে ঘুম নাই
যাহারে বুকে পেলে নিখিল ভুলে যাই
যে চলে যাবে ভয়ে মরণ আগে চাই
বিধাতা নেবে তারে চাবে না মার মুখ।

একাদশীর প্রভাতে রাণীর দুঃখও বড় তীব্র—

কাল, এখনো আমারি কোলে ছিল,
মা বলে কেঁদে কি বলেছিলো
আমার আকুল রোদন গভীর বেদন
দেখে দয়াময়ী গলেছিল।
উমা, কাঁদিয়া বিবশা 'মা' ব'লে গো
অশ্রু মিশিল কাজলে গো
আমি, মুছেচি দুকূল আঁচলে গো।

কান্তকবির ভক্তিমূলক গীতি-কবিতার তিনটি পর্যায় রয়েছে। এ গেল প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে শাক্তপদাবলীর, বিশেষকরে রামপ্রসাদের ভাবানুসরণে রচিত ভক্তি-গীতি। কল্যাণী কাব্যগ্রন্থের 'দুর্গতি' কবিতায় রামপ্রসাদের মতই ভক্তির আকুতি ও জগন্মাতার প্রতি পুত্রসুলভ অভিমান পরিব্যক্ত হয়েছে—

আর কতদিন ভবে থাকিব মা ?
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা ?
(তুমি) দেখা তো দিলে না কোলে তো নিলে না
কি আশে পরাণ রাখিব মা ?

কল্যাণী কাব্যগ্রন্থের 'পরপার' কবিতাটি দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের 'পড়িয়ে ভব সাগরে, ডুবে মা তনুর তরী'র অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। 'অন্তর্দৃষ্টি' কবিতাতে রামপ্রসাদের প্রভাব লক্ষণীয়। অভয়া কাব্যগ্রন্থের 'পাগল ছেলে' কবিতার মধ্যে শাক্তপদাবলীর প্রভাব আরও গভীর। যেমন,—

আমায় পাগল করবি কবে ?
মা মা বল্‌তে অবিরত ধারে, দু'নয়নে ধারা ব'বে।···
মা মা বল্‌তে এ অরূপা, ফুরায়ে যাবে যবে
সেদিন পাগল ছেলে ব'লে, জাপ্টে ধরে
আমায় কোলে তুলে লবে।

এই মাতৃভক্তিই তাঁকে ঘরের মায়ের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় বিনম্র করে তুলেছে। ভক্তিগীতির অন্তর্ভুক্ত না হয়েও বাণী কাব্যের 'মা' কবিতাটি কান্তকবির একটি অবিস্মরণীয় কবিতা—

স্নেহ বিহ্বল করুণা ছলছল
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে
মিটিল সব ক্ষুধা সঞ্জীবনী সুধা

এনেছে, অশরণ লাগিয়ে।···
নমো নমো নমঃ জননী দেবি মম
অচলা মতি পদে মাগিয়ে।

ভক্তিগীতির তৃতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলো কান্তকবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতি, গভীর বিশ্বাস, নিবিড় আন্তরিকতা এবং ভগবদ্‌ভক্তির উজ্জ্বল আলোকে এ কবিতাগুলো এক অনন্যসাধারণ কমনীয়তা ও স্নিগ্ধশ্রী লাভ করেছে। 'কল্যাণী' ও 'বাণী' কাব্যের নির্ভর, সখা, করুণাময়, বিশ্বাস কবিতাগুলো বাঙলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ,
আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ।

অথবা 'করুণাময়' কবিতায়—

(তব) আশীষ কুসুম ধরি নাই শিরে
পায়ে দ'লে গেছি চাহি নাই ফিরে
তবু দয়া করে কেবলি দিয়েছ
প্রতিদান কিছু চাও নি।

ভক্তি ও অনুরক্তির বিচিত্র মিলন ঘটেছে। 'কল্যাণী' কাব্যে কবির এই বিশ্বাস আরও নিবিড়তা পেয়েছে—

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি, কত আশা করে বসে আছি
পাব জীবনে, না হয় মরণে।

কিম্বা 'কবে' কবিতায়—

কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমার রসাল নন্দনে;
কবে, তাপিত এ চিত কবির শীতল
তোমারি করুণা চন্দনে।

ক্যান্সার রোগাক্রান্ত কবি আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও এই বিশ্বাস থেকে বিচলিত হননি—

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে,
গর্ব করিতে চুর:
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য
সকলি করেছে দূর।

এই কবিতাটি সম্পর্কে (কান্তকবি মৃত্যুশয্যায় কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'সিদ্ধিদাতা ত আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই ত তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ ত একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন: আজ আপনার জীবন সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে এবং আপনার ভাষা সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।'

ঈশ্বরের প্রতি পরম নির্ভরতাই তাঁর ভক্তিগীতির ধ্রুব সুর। 'বাণী' কাব্যগ্রন্থের নির্ভর কবিতাটি কান্তকবির জীবনবেদ—

তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে,
তব, পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক্‌, মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে।

সে পুণ্য কিরণ স্পর্শ তিনি পেয়েছেন—তার কাব্যসৌরভ লাভ করে আমরা ধন্য হয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব

ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীভক্তিবৈভব গোবিন্দ মহারাজ

'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, অব্যয় স্বরূপ অনশ্বর শরীর, সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও নিজ 'চিন্ত্যশক্তিবলে আবির্ভূত হন। মানুষ যখন ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণ করে, ধনমদ জনমদ ও বিত্তামদে মত্ত হইয়া সত্যানুসন্ধিৎসা বৃত্তির ব্যভিচার ক্রমে ভোগৈশ্বর্য্যে প্রমত্ত থাকিয়া সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘনে গর্ব্বান্বিত হয়, মিথ্যা ও দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া মহতের প্রতি অত্যাচার ও অশিষ্ট আচরণকেই শিষ্টাচাররূপে আদর করে, তদবস্থায় দুষ্টের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত শ্রীভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হন।

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে দুর্নীতিগ্রস্ত, অর্থ-লোলুপ,অসংযতেন্দ্রিয় কূটনীতিতে দর্পিত হল রাজ-রূপ-ধারী দৈত্যগণের অসংখ্য অসুর প্রকৃতি অসুরবর্গের গুরুভারে আক্রান্তা হইয়া ধরণীদেবী—ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। গোরূপ ধারণপূর্ব্বক কাতরা পৃথিবী অশ্রুসিক্ত নয়নে, কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে স্বীয় দুর্ভাগ্যের কথা ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা শিব ও অন্যান্য দেবগণকে সঙ্গে লইয়া পৃথ্বী সহ ক্ষীরসাগরের তীরে গমন করিলেন এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতার পরমেশ্বরকে ধ্যান করিলেন। ক্ষীরোদনাথ ব্রহ্মার পক্ষেও দুর্ল্লভদর্শ অতএব সমাধিমধ্যে সমুচ্চারিতা আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবগণকে কহিলেন, "অমরবৃন্দ, ক্ষীরোদশায়ী মহাপুরুষের বাণী শ্রবণ কর। আমাদের নিবেদন করিবার পূর্ব্বেই ভগবান ধরণীর দুঃখ জানিতে পারিয়াছেন।

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥

অর্থাৎ প্রকট সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত পুরুষোত্তম বসুদেব গৃহে আবির্ভূত হইবেন। দেবপত্নীগণ তত্তোষণার্থ ব্রজে অবতীর্ণ হইবার জন্য নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন"। অনন্তর যখন সর্ব্বগুণসম্পন্ন অতীব রমণীয় কাল উপস্থিত হইলেন, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ, রবি প্রভৃতি গ্রহগণ ও অন্যান্য তারকাগণ শান্ত ভাব ধারণ করিল, রোহিণী নক্ষত্র সমাগত হইল এবং দিকসকল প্রসন্ন, নির্ম্মল, আকাশমণ্ডল তারকাবিভূষিত পৃথিবীস্থ নগর গ্রাম গোষ্ঠ আকর সমূহ বহু মঙ্গলময়, নদীসকল স্বচ্ছসলিলপূর্ণ, হ্রদ সকল বিচিত্র পদ্মে সুশোভিত, বনরাজী কোকিলাদি বিহঙ্গ ভ্রমরগণের শ্রুতিমধুর নাদে পরিপূরিত, পাদপশ্রেণী পত্র-পুষ্পগুচ্ছে সুসজ্জিত, পুণ্যগন্ধবাহী বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নির্ব্বাপিত যজ্ঞানল পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল,তখন ভগবান বিষ্ণু অবতরণে উন্মুখ হইলে অসুরদ্বেষী সাধুগণের চিত্তও প্রসন্ন হইল, কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ সিদ্ধচারণগণ, বিদ্যাধরীগণ ও অপ্সরাগণের সহিত নৃত্য করিয়াছিল এবং দেবতা ও মুনিবৃন্দ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অষ্টমীর চন্দ্র তখনও অপুষ্ট কিন্তু নিজবংশে স্বয়ং প্রভু আবির্ভূত হইবেন এই আনন্দে সর্ব্বকলাপূর্ণ পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বজীবের হৃদয় গুহায় বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ দেবতারূপিণী সচ্চিদানন্দ স্বরূপিণী দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হইলেন। বসুদেব দেখিলেন অদ্ভুতবালক চতুর্ভুজ ও শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলদেশে কস্তুভ বিরাজিত, পীতবস্ত্র পরিহিত বর্ণ নিবিড় জলধর সদৃশ সুরম্য মহামূল্য বৈদূর্য্যমণি শোভিতমুকুট, কুণ্ডলযুগলের ছটায় তাঁহার কেশরাশি সমুজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছে। তৎকালে তিনি শ্রীহরিকে পুত্ররূপে দর্শন করিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইলেন। মহামুনি মুনীন্দ্রদিগের দুর্ল্লভদর্শন পরমেশ্বর একে ত আমি মায়াবদ্ধ জীব তাতে অবিদ্যাগ্রস্ত দুষ্টমতি কংস কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ কারাগারে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীহরি আমাকে দর্শন দিলেন— ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। আরও ভাবিলেন, সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্ম ভগবান মানুষের গর্ভে জন্ম নিলেন! বিবিধাস্ত্র ব

কটককুণ্ডল কিরীটাঙ্গদক'র বিশিষ্ট বালক গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন! সাক্ষাৎ মহাভয়েরও ভয়ঙ্কর আদিপুরুষ ভগবান কংসভয়ে ভীত আমাকে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করিলেন। সদ্যোজাত শিশুর অবলোকনে যুগপৎ শ্রেষ্ঠ-দেবত্ব ও পুত্রত্ব বোধের উদয়ে আনন্দপরিপ্লুত মানসে চিন্তা করিলেন যে সাধারণ পুত্রের জন্মোপলক্ষে পিতা কি প্রকার দানাদি উৎসব সম্পাদন করিয়া থাকে আর আমার স্বয়ং ভগবান পুত্ররূপে অবতীর্ণ কিন্তু আমি কারাবন্দী কি উৎসব করিতে পারি? মনে মনে দশসহস্র গাভী ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করিলেন। পুত্ররূপী নারায়ণের প্রভাব জানিতেন বলিয়া বসুদেব নির্ভয় হইয়া স্তব করিলেন, অনন্তর কংস ভয়ে ভীতা দেবকীও মহাপুরুষলক্ষণযুক্ত পুত্রকে দর্শন করিয়া অতি বিস্ময়ের সহিত স্তব করিলেন। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে জানা যায় যে ভক্তিবলেই তাঁহারা ভগবানকে পুত্ররূপে পাইয়াছেন এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ে স্ফুর্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

অসুর স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥
আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥

কৃষ্ণ বস্তুটী কি? জগতে দুইটী তত্ত্ব—আশ্রয় ও আশ্রিত। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রিত তত্ত্ব বর্ত্তমান, সেই মূল তত্ত্বই আশ্রয়। সেই তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে সকল তত্ত্ব আছেন, তাঁহারা সকলেই আশ্রিততত্ত্ব। স্বর্গ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত আশ্রিত তত্ত্ব সুতরাং পুরুষাবতার ও সমস্ত অবতার, সমস্ত শক্তি তদনুগত জৈব ও জড় জগৎ সকলেই সেই কৃষ্ণরূপ আশ্রয়ের আশ্রিত। অতএব কৃষ্ণের পরিচয় ব্রহ্মার স্তবে জানা যায় যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর; তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ। গীতাতেই স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে কৃষ্ণ সকল জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের একমাত্র কারণ স্বরূপ। তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ বা তাঁহার সমান কেহ নাই। সুতরাং সুতায় যেরূপ মণিগণ গ্রথিত থাকে, সমগ্র বিশ্ব তাঁহাতেই ওতঃপ্রোতভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে

দেবকী ভগবানকে বলিলেন—আপনি ভৃত্যজনের ভয়হারী; সেই ভীষণ প্রকৃতি কংসভয়ে ভীত আমাদিগকে রক্ষা করুন। ধ্যানগম্য আপনার এই বিষ্ণুরূপ তাঁহার প্রাকৃত চক্ষুগোচর করিবেন না। অতএব এই অলৌকিক রূপ সম্বরণ করুন। ভগবান তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনফলের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং বর্ত্তমানে নিরন্তর পুত্রভাবে চিন্তা করিতে করিতে অনুরাগযুক্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের নন্দনরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, তাহা জানাইলেন। ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সমক্ষেই নিজ মায়াশক্তি বলে প্রকৃত শিশুর মত হইলেন অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধরূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর বসুদেব তাঁহার প্রেরণায় বালককে সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গমনের অভিলাষ করিলেন "যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া" তখনই যশোদা 'যোগমায়াকে' প্রসব করিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে কারাগারের প্রহরীগণ নিদ্রিত, দরজা স্বতঃই উন্মুক্ত, প্রাকৃত দুর্য্যোগাদি অনুকূলভাব প্রাপ্ত হইল; এমন কি উত্তাল তরঙ্গক্ষুব্ধা যমুনা পথ প্রদান করিলেন। বসুদেব নন্দালয়ে গমন করতঃ গোপগণকে প্রসুপ্ত দেখিয়া যশোদার শয্যায় শিশুকে রক্ষা পূর্ব্বক তদীয়া কন্যাকে গ্রহণান্তর পুনরায় কংসকারাগারে উপস্থিত হইলেন। প্রসবক্লান্তা যশোদা যোগমায়াবলে স্মৃতিশক্তি শূন্য হইয়া পড়ায় সন্তান প্রসূত হইয়াছে জানিতেন কিন্তু পুত্র বা কন্যা তাহা বিশেষভাবে জানিতে পারেন নাই।

বসুদেব কন্যাকে দেবকীক্রোড়ে স্থাপন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নিগড়বদ্ধ হইয়া বিশ্রাম করিলেন। প্রহরীগণ কন্যার রোদনধ্বনিতে জাগ্রত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজাকে জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। সংবাদ শ্রবণমাত্র 'এই শিশু আমার মৃত্যুর কারণ' মনে করিয়া মুক্তকেশে নগ্নপদে দ্রুত সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া কংস জানিলেন যে কন্যা প্রসব হইয়াছে। ক্ষণিক মোহিত হইয়া চিন্তা করিলেন যে দৈববাণীও মিথ্যা হয়! অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ দুর্জ্জয় মৃত্যুকে রোধ করিবার জন্য কদর্য্যবৃত্তি গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয় না। অতএব দীনভাবাপন্না ভগ্নীর কাতর ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া বলপূর্ব্বক শিশুটিকে গ্রহণ করতঃ শিলা-পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন।

সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপেত্য সজ্যো দেব্যম্বরং গতা।

তাদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্ট মহাভুজা॥

অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুর কনিষ্ঠা যোগমায়া দেবী কংস হস্ত হইতে উর্দ্ধদিকে উৎপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে গমনপূর্ব্বক অষ্টভুজা মূর্ত্তিতে লক্ষিতা হইলেন এবং বলিলেন—"রে মূঢ়! আমাকে বধ করিয়া তোর কি ফল হইবে? যিনি তোর বিনাশক, তিনি কোথায়ও উৎপন্ন হইয়াছেন, অনর্থক দীন শিশুগণকে নষ্ট করিস না।"

দেবীর কথিত বাক্যে কংস স্তম্ভিত হইলেন। বসুদেব-দেবকীকে কারামুক্ত করিয়া নানা প্রবোধবাক্যে তাহাদের পুত্রশোকের সান্ত্বনা প্রদানান্তর কৃতকর্ম্মের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কুমন্ত্রীদিগের প্ররোচনায় বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইলে তিনি গোকুলে পুনরায় উৎপাত সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ আবির্ভাবক্ষণ হইতেই অসুর বিনাশ, ভক্তদিগের রক্ষণ ও পালনমুখে তাঁহার অসমোর্দ্ধত্ব প্রদর্শন করিলেন। পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তবধ যমলার্জ্জুনভঞ্জন, বিবিধ অসুর বিনাশ, ব্রহ্মমোহন, ইন্দ্র-পূজাবারণ, অরিষ্টাসুর বধ, কেশীবধ প্রভৃতি নৈমিত্তিক লীলাদ্বারা—ভগবদ্ কৃপায় অনর্থমুক্ত হইয়া কৃষ্ণে প্রেমযুক্ত ভক্তি লাভই বদ্ধজীবের অমৃতপ্রাপ্তি—শিক্ষা দিলেন। সাধক কৃষ্ণসেবনোন্মুখ চিত্তে মুকুন্দ শ্রেষ্ঠ মহতের অনুসরণে শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা বোধ হইবে যে, পরম-পুরুষ স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদি মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে [illegible] বতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে [illegible] হইয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রকুমার জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিকল্পে একবার প্রকট-বি[illegible] করিয়া জানান যে তিনি অখিলরসামৃত মূর্ত্তি এবং [illegible] ভক্তিদ্বারা ঐশ্বর্য্যপ্রধান নারায়ণের উপাসনাক্রমে চতু[illegible] মুক্তিলাভ করতঃ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়। সেই প্রকার [illegible] ভক্তির অতীত প্রেমভক্তি জগতে প্রচার করিবার অভি[illegible] ভগবান নরদেহ প্রকটপূর্ব্বক রাসলীলাদি প্রকাশ ক[illegible] ছেন, তাহা শ্রবণ করতঃ "তৎপরো ভবেৎ" অর্থাৎ [illegible] পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া মনুষ্যজীবনের চরমপ্রাপ্য [illegible] নন্দ অর্থাৎ পরম শান্তি লাভ করিবেন। কৃষ্ণ গোকু[illegible] বৈভবরূপ গোলোকে ব্রজরসের সমস্ত উপকরণসহ [illegible] বিহার করেন—ইহার নাম অপ্রকট-বিহার।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ

ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।

সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্ম ভক্তিং

জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জী[illegible] যাবতীয় অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার ক[illegible] তাঁহার চরণ স্মরণে অন্তঃকরণশুদ্ধি এবং জ্ঞান বিজ্ঞান বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

অতসী

ক্ষিতীশ দেব সিকদার

তুমি ছুঁলে পৃথিবী সবুজ, তুমি ছুঁলে তীব্র জলধারা
ছুটে চলে সাগর সঙ্গমে,
অয়ি আঁখিতারা!

তুমি বুকে বিঁধে আছ অবিচল বাস্তব নিয়মে।
পাছে আমি কণ্ঠস্বর ভুল করে বসি
চিরদিন বারোমাস সাথে সাথে রয়েছ অতসী!

যে নদী মরুপথে

ঝর্ণা রায় চৌধুরী

নিজের কাছে আজ জবাবদিহি করতে বসেছে সুতপা। কতদিন পর খতিয়ে দেখছে তার সারাজীবনের হিসেব-নিকেশ আর দেনা পাওনা। কতটুকু সে দিল আর কত সে পেল? যা হারিয়েছে তার বেশীই কি পায়নি ফিরে? পেয়ে হারানোর ব্যথাও তার ঐ ফিরে পাওয়ার মাধুর্যকে ম্লান করতে পারেনি।

সমস্তদিনই আজ সে ভেবেছে আর ভেবেছে। ট্রেণে ক'রে ফিরে আসবার সময়টুকু সে তার একান্ত ভাবনাটুকু দিয়ে ভরাট ক'রে রেখেছে।

এমন গভীর করে, নিবিড় ভাবে নিজের মধ্যে নিজেকে কখনও সমাহিত করেনি—তার দরকারও হয়নি। যা যখন ক'রেছে ঠিক ক'রছে ভেবেই ক'রেছে। জীবনকে একটা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে বরাবর।

বাস্তব যখন তার রূঢ় চেহারা নিয়ে বারবার সুতপার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ততবারই সুতপা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে—কঠিনকে সবলে আঘাত ক'রেছে তবে সেই সঙ্গে বিপরীত প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতাও হ'য়েছে।

এখনও যেন কানে বাজছে নরেনের সেই প্রলাপ—"এসোনা, তুমি এসোনা।"

ট্রেণের গতির ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে সুতপা যেন শুনছে "তুমি এসোনা।"

যে লোকটাকে সুরু থেকে পর্যন্ত এড়িয়ে এড়িয়ে আসছে সুতপা সেই লোকটাই যে এভাবে জীবন খেয়া পেরিয়ে যাবার আগে ওর সমস্ত সত্তায় প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে যাবে তাই বা কে ভেবেছিল? এ লোকটা ওর কে?

কিছুই ছিলনা—তাই ব'লে কি আজও নয়?—সে কথা ভাবতে গিয়ে আজ ওর হিসেবের গরমিল—ছন্দপতন। নিজেকে ভুল বোঝানোয় অবাধ্য দু' ফোঁটা চোখের জলও বুঝি বা উপ্ছে পড়ে। কিন্তু এখন আর করার কিছুই নেই।

যে তরুণ ডাক্তারটি নরেনের শয্যাপার্শ্বের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল শেষ কদিন ধ'রে—সেই কাল রাত্রে সুতপার কাছে নরেনের অব্যক্ত যন্ত্রণাকে একটু একটু ক'রে মেলে ধরেছে। একেবারে সব শেষ হবার পর।

সুতপার পরিচয় পাবার পর ডাক্তার প্রথমে ভেবে পায়নি কি তার করা উচিত। অথচ সেই খবর পাঠিয়েছে আসতে। তবু মনস্থির করতে সে বেশী সময় নেয়নি। মৃত্যুমুখী নরেন তার শেষ বিশ্বাসটুকু আঁকড়ে ধ'রে পরম আশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে চরম পরিণতির। কি আকুলতা সেই আশ্বাসে। সুতপার উপস্থিতি নরেনকে কিছুতেই জানাতে পারলো না সে। তার বিবেক তাকে বাধা দিয়েছে। মরবেই যে নিশ্চিত—তাকে শান্তিতে যেতে দাও।

সব যখন শেষ হ'ল ডাক্তার যেন নিশ্চিন্তে মন দিল সুতপার দিকে। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার। বিচিত্র লাগছে সুতপারও।

যাকে তাচ্ছিল্য ক'রে এসেছে বরাবর খুব বেশী রকমই তার কাছেই এতবড় পরাজয়ে কই নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে না তো? সুতপার ওপর যার ষোলো আনা দাবী সে-ই কখনও ওর ওপর জোর খাটায়নি। আজ ওর মনে হ'চ্ছে নিজের অজান্তে ওই উল্টো দাবী খাটিয়েছে নরেনের ওপর, এটা স্থূলভাবে কারোও চোখে পড়েনি। সুতপা ভেবেছে সে যা ক'রছে, তাতে অমত ক'রবার, আপত্তি ক'রবার কোন মুখই নেই নরেনের তাই সে এত নির্বিকার এত নিরপেক্ষ।

কিন্তু সত্যিই কি তাই! সকলেই প্রথম প্রথম নরেনের সিদ্ধান্তে অবাক হ'য়েছে, পরে ঠাট্টাও ক'রেছে। কিন্তু নরেনকে যেন কিছুই স্পর্শ করেনি। চুপচাপ নির্বিরোধীচোখে অনুযোগকারীর দিকে একবার তাকাতো মাত্র। তারাও শেষে আর ঘাটাতো না।

আর যারা সুতপাকে দেখতো তারাও ভাবত—এও কি সম্ভব? একজন মেয়ে হ'য়ে তার সমস্ত জেদটুকু বজায় রেখে হেসে খেলে কেমন দিন কাটাতে পারে ভাবতেও তাজ্জব লাগে। কবে কাকে মন দিয়েছে ব'লে সারা জীবনেও আর কারও ঘর করবেনা এমন কি নরেনের মত স্বামীর কাছেও কখনও যাবেনা এই বা কেমনতরো কথা?

সুতপাও ভাবতে বসেছে সত্যিই তো এ কেমন কথা? ভুলই তো ক'রেছে!

ও ভাবত ওর ভালবাসার নিষ্ঠায় সংসারের চেনা জানা সকলেই মুখ বেঁকিয়েছে, ঠাট্টা করেছে। একটু যারা সেকালপন্থী তারা বলেছেন—"তোর ধর্মের ভয়ও নেই?"

ধর্মের ভয় ওর সত্যিই নেই। নেই ব'লেই তো নরেনের কাছে যায় নি। বিয়ের আগেই নরেনকে জানিয়ে দিয়েছিল, এটা জেনে তাকে বিয়ে করতে হবে যে সুতপা অন্ততঃ জীবন থাকতে তার কাছে যাবেনা। সুতপার ওপর তার আইনত স্বামীর অধিকার থাকলেও সে দাবী তার ত্যাগ করতে হবে। ওর দিকে অধিকারবোধের হাত বাড়াতে পারবেনা। একমাত্র এসব সর্ত্তেই সুতপা তাকে বিয়ে করতে পারে—নতুবা নয়। নরেন তাতেই রাজী হয়েছিল। প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গে সুতপা বিদ্রূপভরা দৃষ্টি দিয়ে নরেনের আপাদমস্তক যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল।

মনে ওর যে প্রশ্ন জেগেছিল ওর মুখে তারই প্রকাশ দেখতে পেয়েছিল নরেন। হেসে বলেছিল "ভয় নেই, ভাবছ তুমি, বিয়ে হ'লেই মেয়েদের মন পাল্‌টাতে বাধ্য এই ভেবেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। ভুল তুমি অন্ততঃ করবেনা এটা আমার ভরসা আছে।" কথাটার মানে ঠিক বোঝেনি এমন ভাবে সুতপা জিজ্ঞেস করেছিল—"যেমন।"

—"যেমন আর কি; তোমার ভালবাসার সমকক্ষ আর কারও ভালবাসা থাকতে পারে কিনা সেটাও আমার একবার জানা দরকার।"—এটুকু বলে সেদিন আর দাঁড়ায়নি নরেন।

মাঝে দিন সাতেক সময় পাওয়া গিয়েছিল। তারই মধ্যে মা, দাদা, বাবা সকলে মিলে পুরো বিয়ের জোগাড় করেছেন। একমাত্র মেয়ের বিয়েতে কম সময়ে হ'লেও আড়ম্বরের ত্রুটি করেনি কেউ। বাবারও টাকার অভাব ছিলনা তাছাড়া ভাইয়েরা তিনজনেই যথেষ্ট ভালই রোজগার করে তখন। যে বড় ভাই—নরেন তারই সঙ্গে কাজ করে। তবে পদোন্নতির ঢেউ নরেনকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাতে অবশ্য বন্ধুত্বে ভাঁটা পড়েনি। ঐ টুকুর সঙ্গে আরও যে কিছু বেশী ছিল তাতে কারও যেমন সন্দেহ ছিলনা তেমন তাই নিয়ে আপত্তিও ছিলনা। যে কোনও দিক থেকে বিচার করলে নরেন পাত্রীপক্ষের মতে যোগ্যতম।

বাড়ীর মধ্যে একজন মাত্র ছিল এ বিষয়ে উদাসীন—সে সুতপা। বুঝতো কিম্বা না বোঝার ভান করতো কেউ সঠিক জানেনি। নরেনও কি অন্ধ ছিল?

সুতপার মনের রাজ্যে যার একচ্ছত্র আধিপত্য সেই জয়ন্তকে আর সকলের মত নরেনও চিনতো জানতো। জয়ন্ত ছেলেটা তো শুধু সেদিনই নয়, পড়ার ছেলে হিসেবে ওবাড়ীতে ১৪ বছর বয়েস থেকে যাতায়াত করে।

ছেলে হিসেবে সে এতই সাধারণ, সুতপার সঙ্গে তার বিয়ের কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা এ যেন স্বতঃসিদ্ধ। একমাত্র মেয়ে সুতপা—তাকে দেখলে কেউ অপছন্দ ক'রবেনা, সব চাইতে বড় কথা পয়সা আছে যথেষ্ট খরচ করার মত। এ বিশ্বাস বাবা, মা, দাদাদের এত বেশী ছিল যে যোগ্যতার বিচারে সুতপা নিজেই যথেষ্ট সচেতন থাকবে। জয়ন্তর সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় তাই কারও কোনওদিন সামান্য আপত্তি হয়নি।

কিন্তু সুতপা যে এতদূর এগোতে পারে—জয়ন্তকে তার কথা পর্যন্ত দেওয়া হ'য়ে গিয়েছে তাকেই বিয়ে ক'রবে বলে, এতে বাড়ীশুদ্ধ সকলে যেন স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। বহু রকম চেষ্টা হ'য়েছিল ওকে নিয়ে যাতে জয়ন্তর দিক থেকে মন ফেরাতে পারে কিন্তু কিছু লাভ হয়নি। ওর এক গোঁ—জয়ন্ত ছাড়া আর কাউকে স্বামী বলে স্বীকার

করা ওর পক্ষে অসম্ভব। কতই বা বয়স হবে সুতপার বোধহয় আঠারোর কিছু বেশী। বাবা মাও ভেবেছিলেন এ ছেলেমানুষী ঘোর কেটে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই তবে জয়ন্তর আওতা থেকে মেয়েকে সরালেই হবে।

বাবা রিটায়ার করার অল্প কিছুদিনই বাকী ছিল। তিনি অফিসের পাট চোকাবার সঙ্গে সঙ্গেই আসামের বাস তুলে ছেলের আস্তানায় পাকাপাকি ভাবে সকলে এসে উঠলেন। সেটা কোলকাতায়।

তারপর ভাগ্যের চক্রান্তেই অথবা সুতপার তপস্যার জোরে হোক্, জয়ন্ত একটা সামান্য চাকুরে হ'য়েও কীভাবে যে কোলকাতায় বদলী হোল সেটা আজও আশ্চর্য লাগে ভাবতে।

পুরোণো খাতে আবার জীবনটাকে বইয়ে নিতে ওদের বিশেষ দেরী হয়নি। জয়ন্ত আর সুতপা যেন বেপরোয়া। প্রকাশ্যে কারও কথায় সুতপা যেমন প্রতিবাদ করেনি তেমনি গুরুজনদের মন রেখে জয়ন্তকে এড়িয়ে চল্‌বে এমন মেয়েও সে মোটেই নয়। বাড়ীর লোকেরা ওর জেদ দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। যাক্ গে জোর ক'রে ওর ভালো করার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই। যদি ওর ভাগ্য মন্দই হয় তবে তাকে রোধ করা তাদের সাধ্য নয় ভেবে তারা ওর ভাল-মন্দ চিন্তাতে ক্ষান্ত দিয়েছিল।

সেই সুতপাই যে কি কারণে হঠাৎ জয়ন্তর ওপর অভিমান ক'রে তার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ ক'রে দিল সেটা কেউ বুঝতে পারল না। শুধু এটুকু অনুমান করে নিল সকলে যে কোনও একটা ব্যাপারে তাদের মধ্যে কিছু মন-মালিন্যের সৃষ্টি হ'য়েছে এবং তারই ফলস্বরূপ ওদের এই মান-অভিমানের পালা।

যোগাযোগ রাখতেও যেমন ওদের অস্বাভাবিক আগ্রহ ছিল—অভিমানের পালাটাও তেমন তীব্রভাবেই চলছিল। বাড়ীর লোকে খুশী হ'ল এটা লক্ষ্য ক'রে যে সুতপা বাড়ী থেকে বেরোয় না—জয়ন্তও ও বাড়ীতে পা দেয়না। যাক্ রাগ না লক্ষ্মী এ ভেবে মা তো কালীঘাটে মানতও করে এলেন একদিন। তবে সকলে আশ্চর্য হ'লেন যে ঝড়ের কোনও আভাস সুতপাকে খুঁটিয়ে দেখলেও বোঝা যায় না।

এ মনোমালিন্য কিন্তু কোনদিনই মেটবার সুযোগ পেল না। ভুল বোঝাবুঝির পালা বহুদূর গড়িয়েছিল। জয়ন্ত ঝোঁকের মাথায় দু' বছরের মধ্যে হঠাৎ বিয়ে ক'রে বসলো। যার সঙ্গে বিয়ে হ'ল সেও নাকি পোড় খাওয়া মেয়ে। বন্ধুত্বের খাতিরে জয়ন্ত তার সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পেয়ে মনের দুঃখ উজার করে দিয়েছিল। দুটি সহানুভূতিভাবাপন্ন মন গতানুগতিক সামাজিক বন্ধনের মধ্যে শান্তি খুঁজে পেতে চেয়েছে।

কিন্তু এর জের সুতপার নিস্তরঙ্গ জীবনে যে কতবড় ঢেউ তুলেছিল জয়ন্ত এর ওর মুখে সে কথা জেনেছে।

জয়ন্তর ঐ নতুন জীবনের কথা কণা গিয়ে প্রথম বলে সুতপার কাছে—যে সুতপারই সম্পর্কে মাসি হয়। জয়ন্তকে কণা চেনে—সুতপাদের বাড়ীতেই আলাপ।

হঠাৎ এক সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে কণা এ খবরটা দিয়ে-ছিল, ভাবেনি বিশেষ কিছু গুরুতর ফল হ'তে পারে। বিশেষ ক'রে সুতপা আর জয়ন্তর মধ্যে কোনও যোগা-যোগই নেই ব'লতে গেলে দীর্ঘদিন ধরে।

"তপু, জয়ন্ত তো বিয়ে ক'রলো,"—এ কথাটা প্রথমে সুতপার কানে গেলেও মরমে প্রবেশ করল বলে মনে হ'ল না এমনই পাথুরে চাউনি ছিল ওর।

কথাটা বেশ জোরেই ব'লেছে কণা। শুনতে পেয়ে পাশের ঘর থেকে মা-ও এসে দাঁড়িয়েছেন। দু চোখে খানিক আশার আলোও মাখানো—এবারে মেয়ের যদি সুমতি হয়।

"জানা কথাই যে ও শেষ পর্যন্ত এরকম করবে। তুই শুধু ওর জন্য মরবি।"

মায়ের কথা শেষ হবার আগেই—"বেশ তো"—সুতপা কথাটা কেমন এক অদ্ভুত স্বরে উচ্চারণ করে। তার পরই ওর যে মূর্চ্ছা হ'য়েছিল সে নাকি ঘণ্টাতিনেকের আগে ভাঙেনি বলে সকলেই জানে। হুলুস্থুল কাণ্ড—সকলে ভয় পেয়েছিল বেশ। সুতপা কিন্তু ভাবে ওর আর জ্ঞান না হ'লেই ভাল ছিল।

তারপর কেমন ক'রে ও বিয়েতে মত দিয়েছে—যাকেই বিয়ে করবে তাকেই ওর সব কথা জানতে হবে—সর্বোপরি স্বামীর ঘর ও মোটেই করবেনা এসব পুঙ্খানু-পুঙ্খ ভাবে জেনে নরেনের এগিয়ে আসা—সব কিছুই যেন স্বপ্নের একটা ঘোরের মত মনে হয় সুতপার।

কতদিন মনেও হ'য়েছে ওর, একজনের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আর একজনের দাবীকে উপেক্ষা করা হ'চ্ছে—সেই সঙ্গে নিজেকেও বঞ্চিত করছে। কিন্তু মন থেকে এসব ভাবনা তখুনি ঝেড়ে ফেলতে কটা মাত্র মুহূর্তের বেশী সময় লাগেনি।

ভাবতে আশ্চর্য লাগছে নরেন ওর থেকে কত দূরের মানুষ হ'য়েও যাবার বেলায় আজ সব ব্যবধান মুছে দিয়ে গেল। কোনওদিন দাবী জানালো না।

বিয়ের পর থেকে আগে যেটুকু যাতায়াত ছিল তাও বন্ধ করে দিল। পাছে সুতপা ভাবে ওর কাছে নরেনের কিছু পাওনা আছে।

মা, বাবা ভেবে অবাক হ'য়েছেন—পরে ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন মেয়ের জেদ দেখে। কিন্তু এত সব জটিলতার যে নায়িকা—সে যেন নির্বিকার। নিজের মনে খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়, হৈ, হৈ করে সিনেমা দেখে আর বাড়ীতে যতক্ষণ থাকে বেশী সময়টা সেতার বাজায়। বাবা, মা শেষে হাল ছেড়ে দিলেন। তবে সব থেকে বেশী দুঃখ পেতেন ওর সাজ পোষাক দেখে। পরিচ্ছন্ন কুমারীর সাজ। সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্নটুকু দূরে থাক্,—হাতের লোহাটা পর্যন্ত বিয়ে চুকে যাওয়া মাত্র খুলে কোথায় ফেলেছিল তা কেউ জানেনা। এসব দেখে শুনে মায়ের মন মাঝে মাঝে শিউরে উঠ্‌তো কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। সর্তে এসবও ছিল আগে থেকে।

শেষের দু' তিনটে বছর নরেন কোলকাতাতেই ছিলনা। যেখানে গিয়ে আস্তানা ক'রে নিয়েছিল নিজের একক জীবনের সেখানে ঐ ডাক্তার ছোক্‌রাটি ওর একমাত্র সঙ্গী।

ওরই জরুরী তাগাদায় না গিয়ে পারেনি সুতপা। কিন্তু গিয়ে বিশেষ লাভ হয়নি ওর। শেষ দেখা দেখলো বটে নরেনকে কিন্তু তাকে জানাতে পারলো না যে সুতপা এসেছিল তার কাছে। ডাক্তারের হুকুম ছিল নরেনের কাছে না যাবার। সব শুনে সুতপাও পারেনি কাছে যেতে।

সমস্ত কিছু শেষ হবার পর ও বুঝেছে শেষ হ'লেও এমন কিছু ও পেল শেষ পর্যন্ত যাকে পাথেয় ক'রে বাকী জীবন স্বচ্ছন্দে কাটানো যেতে পারে। যা দুহাত পেতে নিতে পারেনি বলে এতদিন ব্যর্থ হাহাকারে গুমরে মরেছে, আজ সেই পরম প্রাপ্তিতে ওর অন্তর যে অপূর্ব আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে—তার যেন সত্যিই তুলনা নেই।

ডাক্তারের কথাগুলো ওর মনে পড়ছে—

"জানেন মিসেস্ সান্যাল, নরেনবাবু আপনাকে ঠিক কতখানি ভালবাসতেন সেকথা আমার থেকে বেশী কেউ জানেনা। কোনওদিন আপনাকে পাবেন না জেনেও এতখানি আত্মত্যাগ কেউ করেছে ব'লে শুনেছেন। আপনাকে খবর দিয়েছিলাম শুধু আপনার কাছে আমার নালিশ আছে ব'লে। জানলেনই না যে ভালবাসা পেয়েছিলেন সেটা যা পেলেন না তার থেকে কত বেশী দামী।"

সুতপা কথাগুলো শুনতে শুনতে কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। ডাক্তার আবেগ খানিকটা সামলিয়ে আগের কথার খেই ধ'রে—

"ভেবেছিলাম নরেনবাবুকে যদিও ভালো ক'রে তুলতে পারবো না তবুও জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে উনি আপনাকে তার খুব কাছে দেখ্‌তে পেয়ে শান্তি পান।

আপনি অবশ্য ব'লবেন তাও তো আমি হ'তে দিলাম না। মৃত্যু পথযাত্রী যখন একটুক্ষণের জন্য জ্ঞান ফিরে পেল তখনও আপনাকে সরিয়ে আনলাম ওঁর কাছ থেকে—শেষ দেখাটাও করিয়ে দিলাম না—কিন্তু কেন?"

ডাক্তারের দিকে ম্লান ব্যথার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সুতপা। সে দৃষ্টিতে বেদনভরা কৌতূহল।

"জানেন—এতে কিন্তু আমার কোনও অপরাধ হয়নি। আমার দিকে আমাকে সে কথাই বলে।

মিষ্টার সান্যালকে আমি যতটুকু জেনেছি তাতে এটা স্পষ্ট বুঝেছি আপনাকে উনি যত ভালবাসেন—জয়ন্তবাবুর প্রতি আপনার একনিষ্ঠ ভালবাসাকে তার থেকে ভালবাসেন শ্রদ্ধা করেন অনেক বেশী। আমাকে ব'লেছেন—

—'সুতপার এতবড় ভালবাসা আর কারও অন্যায় দাবীর জোরে অপমানিত হবে তা আমি কখনও কল্পনাও করতে পারি না। সুতপার এই নিষ্ঠায় আমি অনেক জোর পাই মনে। ওর যদি কোনদিন মনের গতি পাল্‌টে যায়—যদি আমার কাছে কখনও আসতে চায় আমিই সব থেকে বেশী ব্যথা পাবো ডাক্তার। আমি চাই ও যেন হার না মানে—আমার কাছেও না আসে। তবেই ওকে আরও বেশী ভালবাসতে পারবো। ওর ওপর আমার এই বিশ্বাস ভেঙে গেলে আমার পক্ষে সে আঘাত সহ্য করা সত্যিই কঠিন হবে।

—"আচ্ছা বলুনতো মিসেস সান্যাল, আমি কি ঠিক করিনি? ভুল ক'রলাম কি?"

ডাক্তারের উত্তেজিত জিজ্ঞাসু আর আবেগ বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে অভিভূত সুতপা নীরবে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধ'রেছে।

"যাক্ আমি তাহ'লে আপনার ক্ষমা পেলাম। আর আমার দুঃখ করবার কিছু নেই।" ডাক্তারের মুখে যেন একটু হাসি দেখা যায়।

সব কিছু সুতপার সামনে ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসছে চোখের জলে—কানে বাজছে সেই আকুল আর্তি—"এসোনা, তুমি এসোনা।"

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হাঙ্গেরীয়, ফিন্ আর এস্ত্ ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্য সাহিত্য আছে। রবীন্দ্রনাথ হুঙ্গারীয় কবি মাউরুস ইওকাই-কে বাঙালি পাঠকের কাছে খানিকটা পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর "সাহিত্য" শীর্ষক গ্রন্থে মৌরস য়োকাই বা মাউরুস ইওকাই উল্লিখিত ও সশ্রদ্ধভাবে আলোচিত হয়েছেন। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার ফিন্ মহাকাব্য কালেভালা আর এস্ত্ মহাকাব্য কালেভিপোত্বগ্—এই দুটি বৃহৎ গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাঁর নিবন্ধরচনায়। ফিন্ সাহিত্যিক এমিল্ সিল্লান্পাআ ১৯৩৯ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়ে জগৎপ্রসিদ্ধ হন। এ-দেশে তাঁর রচনার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। ভারতের লোকদের কাছে ফিন্রা সুপরিচিত ক্রীড়াজগতে তাদের দক্ষতার জন্যে। ফিন্ জাতির সামরিক বীরত্ব ও রাজনৈতিক দুর্ভাগ্য সারা জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তাদের ওপর রুশদের নির্মম অত্যাচারে রবীন্দ্রনাথ মর্মপীড়িত হয়ে লিখেছিলেন :—

টেলিগ্রাম এলো সেই ক্ষণে
ফিন্ল্যাণ্ড চূর্ণ হ'ল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।

মাত্র চার মিলিঅন লোকের দেশ হয়েও ফিন্ জাতি যে উন্নতি করেছে, যে বীরত্ব ও কর্মদক্ষতা দেখিয়েছে, বিশ্বে তার তুলনা খুব কম। ফিন্রা ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর লোক নয়, তারা ইউরোপের আদিবাসীও নয়, তারা আর একটি বহিরাগত নরগোষ্ঠীর লোক। অথচ মানিয়ে নেবার অসাধারণ ক্ষমতার জন্যে এখন আর তাদের ইউরোপীয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবা চলে না। এমনকি নরওয়েজীয়, সোয়েডিশ প্রভৃতি স্কাণ্ডিনেভীয় জাতির সঙ্গে তারা বেমালুম খাপ খাইয়ে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জীবন যাপন করছে। লাপ্ ও মর্দভিন্ ভাষার সাহিত্য উল্লেখযোগ্য নয়। তবে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের আওতায় মর্দভিন্দের উন্নতি লাপ্দের চেয়ে বেশি। নরওয়ে, সুইডেন, ফিন্ল্যাণ্ড ও সোভিয়েট ইউনিয়নের বৃহৎ রুশ প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কারেলিয়া নামক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের উত্তরাংশ ব্যাপ্ত ক'রে ভৌগোলিক লাপ্ল্যাণ্ডের অবস্থান; এই বিস্তীর্ণ এলাকা উত্তর মেরু-র সন্নিহিত ব'লে অত্যন্ত শীতপ্রধান; এখানে লাপ্ জাতি ফিন্দের মতো সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ দেখাতে পারেনি।

কোরীয় ভাষার অবস্থান কোরিয়ায়; এ-ভাষা সাহিত্যগুণসম্পন্ন এবং বহু জনের ভাষা। একে কোন কোন পণ্ডিতউরাল-আলতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন, তা একেবারে অসম্ভব না হতেও পারে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় একে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বিবেচনা করা সঙ্গত। ১৯৫০-৫৩ সালের যুদ্ধে কোরীয়দের প্রভূত লোকক্ষয় হলেও তারা এখনও সংখ্যায় সাড়ে তিন কোটির কম নয়। এরা একদা ভারতীয় লিপিচিত্র বা ব্রাহ্মী লিপির এক রূপ ব্যবহার করত। চীনা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে বহু নির্যাতন এদের ভোগ করতে হয়। চৈনিক লিপিচিত্র এদের জোর ক'রে ধরানো হয়। ক্রমশ রুশ সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টি এদের ওপর পড়ে। জাপানিরা চীনাদের কবল থেকে আগেই কোরিয়া দখল করায় রুশদের অভিসন্ধি ব্যর্থ হয়। তুলনায় বরং জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে কোরিয়া অপেক্ষাকৃত বেশি শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে ছিল স্বাধীনতার মর্যাদা ভোগ করতে না পেলেও। জাপানের পতনের পর চীনা ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে কোরিয়া বাইরের চাপে যে নিষ্পেষণ ভোগ করছে, যন্ত্রণাসহনের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে এক

ভিয়েৎনাম ছাড়া মানুষকে আর কোথাও এত দুঃখ দেওয়া হয় নি।

উরাল ও আলতাই পর্বতমালার মধ্যবর্তী মধ্য এশিয়া, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, সিবেরিয়া ও তুরস্কে আর এক শক্তিশালী ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থান। একদা বর্তমান তুরস্ক আর মধ্য এশিয়ায় অর্থাৎ রুশ ও চৈনিক তুর্কিস্থানে অথবা পামির মালভূমির উত্তরে ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর তিনটি অধুনালুপ্ত শাখা হিত্তি, তুখারীয় বা তুষার আর কুচীয় বা কুশীয়-ভাষাভাষীরা বাস করত। মঙ্গোলিয়ার প্রান্তর থেকে নির্গত তুর্ক-মঙ্গোল জাতির লোকেরা তাদের ধ্বংস করে।

মধ্য যুগে এই উরাল-আলতীয় ভাষাগোষ্ঠীর লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। চেঙ্গিস খান ও তৈমুর লং দুজনেই এই ভাষাগোষ্ঠীর লোক। আধুনিক কালে কোন প্রাকৃতিক শক্তির খেয়ালে এই গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা অনেক ক'মে গেছে এবং দ্রুত আরও ক'মে আসছে। আজ প্রকৃতির বিচিত্র বিধানে মঙ্গোল জাতি ক্ষীণ হতে হতে লুপ্ত প্রায় হিত্তি, তুষার, কুশ আর আগ্নের প্রভৃতি "আর্য" জাতিদের মতো, তুরস্ক ক্ষীণকায়, মঙ্গোলিয়া দুর্বলতর, মঞ্চুরিয়া নামে স্বতন্ত্র কোন রাষ্ট্র নেই। তুরস্ক ও মঙ্গোলিয়া দুটিই স্বাধীন রাষ্ট্র বটে, কিন্তু উরাল-আলতাই পর্বত-মালাসন্নিহিত এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষাগুলি এখন রুশ ও চীনের দ্বারা শাসিত। অথচ এক দিন এই তুর্ক-মঙ্গোল অভিযাত্রীরা এক সঙ্গে রুশ-চীন ভারতকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছিল।

উরাল-আলতীয় গোষ্ঠীর তিনটি বিভাগ :—

(১) তুর্ক-তাতার (২) মঙ্গোল (৩) মাঞ্চু।

তুর্ক-তাতার শাখার অবস্থান একসময়ে তুর্কিস্থান নামে এক বিরাট অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত ছিল। এখন এই অঞ্চল আয়তনে অনেকটা সঙ্কুচিত হয়েছে। এই তুর্ক-তাতার শাখার অবস্থান এখন যে ভৌগোলিক এলাকায় সম্প্রসারিত, সেখানে চীনা তুর্কিস্থান বা সিনকিআং, রুশ তুর্কিস্থান বা কাজাকস্থান, তুর্কোমানিস্থান প্রভৃতি সোভিয়েট-এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলি এবং তুরস্ক ইত্যাদি আধুনিক রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠেছে। এই শাখার তাতার জাতির লোকেরা উরাল পর্বতের পশ্চিমে ইউরোপেও এক বসতি স্থাপন করে। তুর্ক তাতার শাখায় এই ক'টি নাম·কর আছে :—

(১) তুর্কি (২) তুর্কোমান (৩) উজবে[illegible] কিরগিজ (৫) কাজাক (৬) তাতার (৭) বা[illegible] (৮) চুভাশ (৯) আজেরবাইজানি (১০) উইগুর

এই ভাষাগুলির মধ্যে তুর্কি প্রধানতম; তুর্কি প্রায় তিন কোটি লোক কথা বলে। এই তুর্কিভাষী মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে এশিয়া, ইউরোপ ও আ[illegible] এক বৃহদংশ ব্যাপ্ত ক'রে বিরাট সাম্রাজ্য গ'ড়ে [illegible] ভারতের তথাকথিত পাঠান ও মোগল সাম্রাজ্য এশিয়ার উজবেক-তুর্কোমানদের কীর্তি। তুর্ক-[illegible] জাতিদের মুষ্টিমেয় লোকেরা দীর্ঘকাল রুশ, চৈনিক, ও আরব জাতিগুলিকে সন্ত্রস্ত ক'রে রেখেছিল।

এই জাতিগুলি মুখ্যত ফার্সি ভাষার মা[illegible] সাহিত্যচর্চা করত ব'লে এদের নিজেদের ভাষায় [illegible] সাহিত্য তেমন বিকাশ লাভ করে নি। ধর্ম, চি[illegible] ও অন্য কয়েকটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায় এই সব [illegible] উল্লেখযোগ্য রচনা আছে। তুরস্ক বাদে তুর্ক-তাতার শ[illegible] বাকি জাতিগুলি প্রজাতন্ত্ররূপে রুশ ও চীনের [illegible] অর্থাৎ সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগোষ্ঠী ও প্রজাতন্ত্রী চ[illegible] অন্তর্ভুক্ত। অতিবৃদ্ধির সময় এই শাখায় আভি[illegible] মতো মহামনীষীরও উদ্ভব হয়েছিল।

মঙ্গোল শাখায় এই ভাষাগুলি লক্ষ্য করার মতো :

(১) মঙ্গোল (২) বুরিয়াৎ-মঙ্গোল (৩) কাল[illegible] (৪) ইআকুত (৫) তুঙ্গু।

মঙ্গোলভাষীরা তাদের সমগ্র এলাকা একটি রাষ্ট্রে সং[illegible] করতে পারে নি। বহির্মঙ্গোলিয়া এখন মঙ্গোলিয়া র[illegible] রূপে পরিচিত। অন্তর্মঙ্গোলিয়া চীনের শাসনাধী[illegible] অনেকটা মঙ্গোলভাষী এলাকা রুশ শাসনাধীনে স[illegible] বেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত। বেশির ভাগ মঙ্গোলভাষীর অব[illegible] এখন মঙ্গোলিয়া রাষ্ট্রের বাইরে। মোট মঙ্গোলভা[illegible] সংখ্যা বর্তমানে তিন মিলিঅনের বেশি হবে না। চে[illegible] খানের সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা স্মরণ করলে আজ [illegible] তুলনায় মঙ্গোলদের লোকসংখ্যার স্বল্পতা মনকে বিস্[illegible] অভিভূত করে।

মাঞ্চুশাখার উল্লেখযোগ্য ভাষা :

(১) মাঞ্চু (২) তুঙ্গুস।

মাঞ্চু ভাষা চীনের অন্তর্গত ভূতপূর্ব মাঞ্চুরিয়া এলাকায় প্রচলিত। মাঞ্চুদের রক্ষা ক'রে চীনাদের জব্দ করার উদ্দেশ্যে জাপান মাঞ্চুকুও বা মাঞ্চুরিয়া রাষ্ট্র গঠন করে। কমিউনিষ্ট চীন মাঞ্চুরিয়ার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লুপ্ত ক'রে দিয়েছে। তুঙ্গুস ভাষা সোভিয়েট শাসনাধীন সিবেরিয়ায় প্রচলিত। সাইবেরিয়া রুশ প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, তার কোন রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক অস্তিত্ব নেই দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের আগের কালের মতো। রুশরা তুঙ্গুসভাষীদের জন্যে "জাতীয় এলাকা" নির্দিষ্ট করেছে। চীনে মাঞ্চুভাষীদের সংখ্যা পঁচিশ লক্ষ; কিন্তু উত্তর চৈনিক জাতির চাপে তাদের লুপ্তি আসন্ন। তুঙ্গুসরা আরও শীঘ্র অবলুপ্তির দিকে যাত্রা করছে।

জাপ ভাষার অবস্থান জাপান ও নিকটবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরীয় কতকগুলি দ্বীপে এবং মাইক্রোনেশিয়ায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ও সমকালে জাপানীরা সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগরে জড়িয়ে প'ড়ে মার্কিনদের অশান্তির কারণ হয়েছিল। জাপানি ভাষা কোন দিক দিয়ে চীনা ভাষার জ্ঞাতি নয়। কোন কোন পণ্ডিত জাপানি ভাষাকে উরাল-আলতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। হিটলার তাঁর Mein Kampf-এ অনুমান করেছেন যে, এরা সম্ভবত কোন পথভ্রষ্ট "আর্য" জাতি, ভৌগোলিক ব্যবধানের জন্যে যাদের বিকাশ ভিন্ন ধারায় হয়েছে। এই ভাষাকে এখন একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী ব'লে ধরাই সঙ্গত। এ-ভাষা অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুপ্রচারিত ভাষা। প্রায় দশ কোটি লোক মাতৃভাষারূপে এর ব্যবহার করে। সর্বাধিক লোকের মাতৃভাষারূপে গণ্য ভাষাগুলোর মধ্যে এর স্থান ষষ্ঠ। উত্তর চৈনিক, ইংরেজি, স্পেনীয়, জার্মান আর রুশের পর জাপ ভাষার স্থান।

দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থানক্ষেত্র ভারত, সিংহল, পাকিস্থান ও মালয়ে। পাকিস্থানের অন্তর্গত বালুচিস্থানে মুষ্টিমেয় ব্রাহুই-জাতীয় দ্রাবিড়ভাষীদের ও মালয়বাসী তামিলভাষী দ্রাবিড়দের কথা বাদ দিলে সমস্ত দ্রাবিড়ভাষী ভারতে ও সিংহলের উত্তরাংশে সংলগ্ন হয়ে পাশাপাশিভাবে অবস্থিত এলাকাতেই বাস করে অন্য সব ভাষাগোষ্ঠীর মতো। ভারতেও ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্যে এরা যে এলাকায় বাস করে, তা মোটামুটি অখণ্ড। ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের কোন জ্ঞাতিসম্পর্ক নেই।

দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলি :—

(১) তেলুগু (২) কানাড়ি (৩) তামিল (৪) মালয়ালম্ (৫) গোণ্ডি (৬) ওরাওঁ (৭) খোন্দ (৮) তুলু (৯) কোডগু (১০) ব্রাহুই (১১) মাল্তো।

এদের মধ্যে প্রথম চারটি ভাষায় অতি উন্নত লিখিত সাহিত্য আছে যাদের উৎকর্ষ ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সেরা ভাষাগুলির চেয়ে কম নয়। তেলুগু, কানাড়ি, তামিল আর মালয়ালম্ ভাষাভাষীর সভ্যতায় আধুনিক ভারত-ইউরোপীয় জাতিগুলির সমকক্ষ। গোণ্ডি প্রভৃতি ভাষায় প্রচলিত কবিতা ও গানের সংগ্রহ উৎকৃষ্ট সাহিত্য-নিদর্শন ব'লে গণ্য হতে পারে বটে, কিন্তু ও-সব মুখে মুখে প্রচলিত ব'লে উন্নত ভাষা হিসেবে গ্রাহ্য নয়। গোণ্ডি বা গোণ্ড বা গোঁড়, খোন্দ বা কন্ধ বা খোঁড় এবং ওরাওঁ ভাষার লোকসংখ্যা এক মিলিঅন বা তারও বেশি ব'লে এদের উপেক্ষা করা চলে না। এরা রোমক লিপিতে লিখিতরূপ গ্রহণ ক'রে শক্তিশালী ভাষা হয়ে উঠতে পারে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মিশনারীরা এদের জন্যে উন্নতি-বিধায়ক বহু প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন হলে এদের আরও উন্নতি সরকার থেকে করা হত। কিন্তু ইংরেজ আমলে বা তার পরবর্তী যুগে ভারত সরকার এদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা প্রসারের জন্যে বিশেষ কিছু করেন নি।

দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে তেলুগুর লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি কিন্তু তামিল সবাপেক্ষা প্রাচীন। প্রাচীন তামিল সংস্কৃতের প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত। এটি সংস্কৃতের মতোই একটি প্রাচীন ভাষারূপে পরিগণিত। উৎকর্ষের বিচারে ভারতের মধ্যে প্রাচীন সাহিত্য হিসেবে প্রাচীন তামিল সাহিত্যের স্থান সংস্কৃত সাহিত্যের পরেই। প্রাচীন কানাড়ির বয়সও প্রাচীন তামিলের সমান; কিন্তু তার ওপর প্রাচীন কালেই সংস্কৃতের বেশ কিছু প্রভাব পড়ে-ছিল। দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে মালয়ালমের ওপর সংস্কৃত প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তেলুগুর আধুনিক কথ্য-ভাষাময় বিশুদ্ধ তেলুগুরূপের ওপর সংস্কৃত প্রভাব বেশি

নয়। কিন্তু তার প্রাচীন ব্যাকরণ-অনুমোদিত বা এখন পর্যন্ত মুখ্য রূপটি সংস্কৃত দ্বারা প্রভাবিত। এটি সাহিত্যিক-রূপ। সাহিত্যসৃষ্টির কাজ এগিয়ে চলেছে কথ্যভাষার প্রাধান্যময় আধুনিক তেলুগুতেও যেমন, প্রাচীনপন্থী লেখ্যভাষা এবং কেবল সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃতপ্রভাবিত তেলুগুতেও তেমন ভাবেই। সাহিত্যে ব্যবহৃত তেলুগুর মুখ্য রূপ আর ইদানীন্তন কালের সাহিত্যে ক্রমশ অধিক প্রচলিত তেলুগুর কথ্য রূপ, দুই রূপের মধ্যে কোন্‌টি শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করবে, তা নির্ভর করছে আধুনিক তেলুগু লেখকদের ওপর। অনেকটা আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের মতো ব্যাপার এটা। এ ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত আধুনিক তেলুগুর কথ্য রূপের উদ্বর্তন অবশ্যম্ভাবী।

প্রধান চারটি দ্রাবিড় ভাষার ভিত্তিতে ভারতে অন্ধ্র, মহীশূর, মাদ্রাজ ও কেরল—এই চারটি প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্য গঠিত হয়েছে। সিংহলের উত্তরাংশে অবস্থিত তামিলদের দুরবস্থার শেষ নেই। তাদের কথা পরে আলোচ্য। মালয়ের তামিলদের অবস্থা বর্তমানে খুব ভালো। তামিল বর্তমানে মালয়ের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্থানে ব্রাহুইরা ক্রমশ লুপ্তির সম্মুখীন। অন্যান্য দ্রাবিড়ভাষা যথা তুলু, কোডগু আর মাল্‌তো সম্বন্ধে একই মন্তব্য করা যায়।

সেমীয় ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থান পশ্চিম এশিয়া আর উত্তর ও উত্তরপূর্ব আফ্রিকায়। সেমীয় ভাষাগুলির দুটি বড় বিভাগ :—

(১) পূর্ব (২) পশ্চিম।

পূর্ব শাখায় অধুনা অপ্রচলিত অসুর বা আসুরীয় বা আসীরীয়, আক্কাদীয় বা বাবিলোনীয় ভাষাগুলি ধরা হয়। বর্তমানে নিষ্প্রয়োজন ব'লে এগুলির আলোচনা আমরা করবো না। তবে কিছু সংখ্যক অসুর বা আধুনিক আসীরীয় বা আইসর্‌ এখনও আজেরবাইজান অঞ্চলে বর্তমান। এরাই পূর্ব-সেমীয় শাখার শেষ জীবিত দৃষ্টান্ত।

পশ্চিম শাখার দুটি উপশাখা :—

(১) উত্তর (২) দক্ষিণ।

উত্তর উপশাখার শ্রেষ্ঠ ভাষা হিব্রু আজও সজীব এবং ইস্‌রাএল রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা। এই উপশাখার কানানীয়, ফিনিসীয়, আরামীয় প্রভৃতি ভাষাগুলি এখন অচল। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ভাষা হিব্রুকে নানা-দেশ-থেকে-ইস্‌রাএলে-আসা সমবেত ইহুদি জাতির লোকেরা যে-ভাবে পুনর্জীবিত করেছে, তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই। ইহুদিরা যে বিচিত্র পরিস্থিতিতে এ-কাজ করেছে, সে-অবস্থায়ও আর কোন জাতি কখনও পড়ে নি। সারা পৃথিবীর বারো মিলিঅন ইহুদির মধ্যে মাত্র দুই মিলিঅনের মতো লোক এখন ইস্‌রাএল রাষ্ট্রে সমবেত হয়েছে। একটি নিজস্ব জাতীয় রাষ্ট্রের প্রয়োজন যে কত বেশি, তা ইহুদিদের দুরবস্থা এবং সেই রাষ্ট্র লাভের জন্যে তাদের আকুতি থেকে বোঝা যায়, "সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর লবো খুঁজিয়া"—কাব্যে শুনতে ভালো। কিন্তু রাষ্ট্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্যে তৎপর না হলে বাস্তব জগতে কোন জাতির দুর্দশার সীমা থাকে না। সেই সিদ্ধি লাভের তাৎপর্য হচ্ছে প্রতি জাতির নিজস্ব রাষ্ট্র লাভ। ইহুদিরা জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু টাকার অভাব না থাকলেও এই জাতির নিজস্ব রাষ্ট্রের জন্যে অভাববোধ কোন দিন ঘোচে নি। তথাকথিত অখণ্ড ভারতকে বাঙালি নিজস্ব রাষ্ট্র বলতে পারে কিনা, সে-কথা সে কখনও ভেবে দেখে নি।

ইহুদিরা ইস্‌রাএলের আয়তন বৃদ্ধির চেষ্টাও করছে। ইস্‌রাএলের ৭৯৭৮ বর্গমাইল মাত্র আয়তনের সঙ্গে জর্ডানের ৩৭৭৫০ বর্গমাইল আয়তন সংযুক্ত হ'লে ইহুদিদের রাষ্ট্রীয় স্বপ্ন সফল হবে। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।

দক্ষিণ উপশাখার শ্রেষ্ঠ ভাষা আরবি; তার পরে এথিওপিয়ার রাষ্ট্রভাষা আমহরিকের স্থান। উত্তরে তুরস্ক, দক্ষিণে আরব সাগর, কেনিয়া, উগাণ্ডা প্রভৃতি নিগ্রোভাষী রাজ্য, সাহারা মরুভূমি, পূর্বে ইরান ও পারস্য উপসাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় সেমীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিপুল বিস্তার। এই গোষ্ঠীর মধ্যেও সব চেয়ে বড়ো ভাষা আরবি এখন লোক-সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের প্রধান মাতৃভাষাসমূহের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে—সপ্তম স্থান বাংলার। প্রায় আট কোটি লোক এখন আরবি ভাষাকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে।

দক্ষিণ উপশাখার কয়েকটি বিভাগ আছে :—

(১) আরবি (২) আবিসিনীয় বা এথিওপীয় (৩) কুশীয় (৪) বর্বর।

কুশীয় শাখার ভাষাগুলি লিবিয়াতে প্রচলিত। বের্বের বা বর্বর শাখার ভাষাগুলি সোমালিয়ায় ব্যবহৃত। আবিসিনিয়ায় আমহারিক রাজভাষা; এখানে এথিওপীয় ভাষাবর্গের আরো দু একটি ভাষা চলে, বিশেষত এরিত্রেআ ইতালির হাত থেকে আবিসিনিয়ায় চ'লে যাওয়ার পর থেকে। এথিওপীয় ভাষাবর্গের তালিকা:—

(১) আম্‌হারিক বা থাস এথিওপীয় বা আবিসিনীয় বা হাব্‌সি ভাষা (২) গাল্লা (৩) তিগ্রিনিয়া (৪) তিগ্রে (৫) গুরাগে (৬) হারার।

সেমীয় ভাষাগোষ্ঠী সাহিত্যে অতি সমৃদ্ধ। লেখনের কাজে এরা অতি প্রাচীন কাল থেকে নিপুণ। লিপিসৃষ্টিতে এদের দক্ষতা সুবিদিত। আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয় বা ভারত-ইউরোপীয় জাতি-গোষ্ঠীর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী এরাই এক কালে ছিল। অবশ্য এখন সে-গৌরব চৈনিক জাতি গোষ্ঠীর প্রাপ্য। বহু সেমীয় ভাষা অধুনালুপ্ত। তবু এখনও এই গোষ্ঠী অত্যন্ত সজীব। এখনকার মোট সেমীয় ভাষার তালিকা দেওয়া হচ্ছে খুব ছোট ভাষাগুলো বাদ দিয়ে:—

(১) হিব্রু (২) আরবি (৩) আম্‌হারিক (৪) সোমালি (৫) গাল্লা (৬) বের্বের (৭) তিগ্রিনিয়া (৮) তিগ্রে (৯) গুরাগে (১০) হারার।

শুধু সাহিত্যের ভাষা হিসেবে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আরবি ভাষার মতো প্রাচীন ও মধ্য যুগীয় সিরীয় ভাষাও বেশ সমৃদ্ধিশালী ভাষা এবং অবশ্য বাহ্‌রাইন দ্বীপ থেকে কাসা ব্লাঙ্কা পর্যন্ত বিশুদ্ধ আদর্শ আরবি ভাষার প্রবল বিস্তার। লিখিত রূপ বিচার করলে ইরাক থেকে মরক্কো পর্যন্ত এক আরবি ভাষার প্রচলন কিন্তু কানে শুনলে মক্কা-দামাস্কাস-কাইরো-তুনিস-ট্যাসন্‌জিআর্স সব জায়গায় একরকম শোনায় না। যে কোন বহুবিস্তৃত ভাষার পক্ষে একথা প্রযোজ্য যে, ভৌগোলিক প্রসার বেশি হলে অনেক উপভাষার সৃষ্টি হবেই।

কাইরো থেকে আব্‌দেল জামাল নাসেরের নেতৃত্বে সমস্ত আরবী-ভাষী এলাকাকে একত্র করার প্রবল চেষ্টা চল্‌ছে। মিশর-সিরিয়া-ইএমেন-ইরাক রাষ্ট্র চারটিকে নাসের কতকটা সংহত করতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁর প্রধান প্রতিবন্ধক ইব্‌ন্ সাউদের বংশধর বাদ্‌শারা এবং তুনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট হাবিব বুর্গিব।

কোন কোন সেমীয় ভাষাকে কোন কোন পণ্ডিত হামীয় ব'লে চালাতে চান। যেমন, সোমালি ভাষা কারও কারও মতে হামীয় ভাষা। কিন্তু সোমালিভাষীরা নিজেদের আরবদের জ্ঞাতি ও সেমীয়দের বংশধর ব'লেই পরিচয় দেয়। আসলে বাইবলে বর্ণিত হাম-নামক ব্যক্তিটির বংশধরদের খুঁজে বার করার প্রয়াসে এই ভ্রান্তি গোঁড়া ধর্ম বিশ্বাসী খ্রীস্টান পণ্ডিতদের হয়ে থাকে। হামের বংশধররা আজ লুপ্তপ্রায়; প্রাচীন মিশরীয়দের আমলে তারা অবশ্য জগতের এক শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল।

অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থান ওশিয়ানিয়া, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, ইন্দোনেশিয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ, ভারতবর্ষ ও মাদাগাস্কার দ্বীপে। এই ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ রূপে ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব এশিয়ায় দুটি মহৎ সভ্যতা গঠন করেছিল। এদের ভৌগলিক অবস্থান থেকে বোঝা যায়, এক সময় এরা পৃথিবীতে অত্যন্ত শক্তিশালী নরগোষ্ঠীরূপে অবস্থান করত। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, এরা একসময়ে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে বাস করত। ভারতবর্ষেই এদের ভাষাগুলির পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। কিন্তু দ্রাবিড় ও আর্যদের চাপে এরা এখন ভারতে নিশ্চিহ্ন প্রায়। প্রাচীনকালেই ভারতে ভাষা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে পূর্ণ বিকাশ লাভের পরে এরা সিংহল, আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্ম, মালয়, কাম্বোদিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পলিনেশিয়া প্রভৃতি পূর্ব দিকের দেশগুলিতে এবং পশ্চিমে মাদাগাস্কারে ছড়িয়ে পড়ে। এরা ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল কি না, সে-বিষয়ে অর্থাৎ এদের ভ্রমণ-পথ সম্বন্ধে মতভেদ আছে বিশেষতঃ থর হেয়ারডালের কন্‌টিকি অভিযানের পর। তবে দেখা যায় যে, এরা ঝাড়খণ্ড থেকে কাম্বোদিয়া পর্যন্ত এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে বিস্তৃত। সমুদ্রপথে এরা পলিনেশিয়া থেকে মাদাগাস্কার পর্যন্ত প্রসারিত। খর্বকায় নিগ্রো আর চীনা-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে ব্যাপক মিশ্রণের ফলে এদের দেহবর্ণে ও ভাষায় অনেক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, বহু নতুন ভাষার উদ্ভব হয় এবং লোকসংখ্যা ও ভৌগোলিক প্রসারও

খুব বেড়ে যায়। সভ্যতার অগ্রগতিতে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর লোক এককালে প্রভূত সাহায্য করেছে। এরা অত্যন্ত মিশ্রণপ্রবণ নরগোষ্ঠী; পৃথিবীর কোথাও এরা নিজেদের ভাষা, শোণিত ও জাতীয় পরিচয়ের শুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পারে নি, সে-চেষ্টাও করে নি।

ভারতে অস্ট্রিকভাষীদের সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু ভারতের বাইরে এরা সংখ্যায় এখনও বহু কোটি। এদের ভাষায় সাহিত্যের নিদর্শন প্রচুর কিন্তু তেমন উন্নত নয়। ভারতে এদের ভাষায় উপকথাসংগ্রহ, গীতিকবিতাসঙ্কলন যা পাওয়া যায়, তা উপভোগ্য; কিন্তু মহৎ সাহিত্য আখ্যা লাভের যোগ্য কিছু এরা আজও রচনা করে নি। ভারতের বাইরে এদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি আরও বেশি হলেও উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলির সংখ্যা অনেক; অধিকাংশ ভাষার লোকসংখ্যা বেশি নয়। এই গোষ্ঠীকে দুটি বড়ো শাখায় ভাগ করা হয়:—

(১) অস্ট্রো-এশীয় (২) অস্ট্রোনেশীয়।

অস্ট্রো-এশীয় ভাষাগুলি ভারত, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোদিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এশিয়া মহাদেশের মূল ভূখণ্ডে পরিব্যাপ্ত। অস্ট্রোনেশীয় ভাষাগুলি ইন্দোনেশিয়া, মেলানেশিয়া, নিউ জিল্যাণ্ড প্রভৃতি এলাকায় সম্প্রসারিত। হাওআইই দ্বীপপুঞ্জ থেকে মালাগাসি বা মাদাগাস্কার দ্বীপ পর্যন্ত এই ভাষাগুচ্ছ সুবিস্তৃত।

অস্ট্রো-এশীয় শাখার ভাষাসমূহ দুটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়:—

(১) ভারতের অস্ট্রিক ভাষাসমূহ (২) মোন্-খ্‌মের ভাষাসমূহ।

ভারতে আসামের খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, ছোট নাগপুর, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অস্ট্রিকদের দেখা যায়। ভারতের হিন্দু সংস্কৃতিতে বিশেষত পূর্ব ভারতে এদের প্রভাব খুব বেশি। ভারতের অস্ট্রিক ভাষাসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত:—

(১) কোল বা মুণ্ডা (২) খাসিয়া বা খাসি (৩) নিকোবারি।

এদের মধ্যে নিকোবারিতে খুব কম লোক কথা বলে। এটি অত্যন্ত অনুন্নত ভাষা। নিকোবার ও আন্দামান অঞ্চলে এর অবস্থান।

বর্তমানে ভারতে এমন কোন অস্ট্রিক ভাষা নেই যার লোকসংখ্যা খুব বেশি বা সাহিত্য খুব উৎকৃষ্ট। অস্ট্রিকরা দ্রাবিড় ও আর্য দুই জাতির দ্বারা দীর্ঘকাল যাবৎ পর্যুদস্ত থাকায় তাদের মধ্যে একটা নির্জীবতা এসেছে। বেশির ভাগ ভারতীয় অস্ট্রিক বনে-পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে ধ্বংসোন্মুখ জাতি হিসেবে দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অস্ট্রিকরা ভারতে আসার পর নিগ্রোবটু, দ্রাবিড়, আর্য, চীনা-তিব্বতীয়, পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক—প্রত্যেক ভিন্ন জাতির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত হয়েছে। বনে জঙ্গলে ভারতীয় অস্ট্রিকদের সঙ্গে খর্বকায় নিগ্রোদের প্রচুর মিশ্রণের ফলে কোথাও এরা বেশ কালো, আবার ভোট-বর্মীদের সঙ্গে মিশে-যাওয়া অস্ট্রিকেরা দিব্যি ফর্সা। কোল বা মুণ্ডা এবং খাসিয়া ভাষাগুলো মোটের ওপর উন্নত।

আসামের খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের খাসিয়ারা বহু দিন হলো রোমকলিপি গ্রহণ করেছে। এরা দেহবর্ণে গৌরাঙ্গ ও রূপশ্রীসম্পন্ন। এদের ভাষার উৎকর্ষ প্রভৃত এবং স্নাতক পরীক্ষা পর্যন্ত স্বীকৃত। এদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র শিলং নগর। সংখ্যায় এক মিলিঅনের কম হলেও সাংস্কৃতিক কারণে এদের গুরুত্ব সমধিক। রোমক লিপি, খ্রীষ্ট ধর্ম, গৌর কান্তি, পাশ্চাত্য সাংস্কৃতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, মিশনারিদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য এদের অতি দ্রুত উন্নত একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করছে।

কোল শ্রেণীর এই ভাষাগুলি আলোচ্য:—

(১) সাঁওতালি (২) মুণ্ডারি (৩) হো।

সাঁওতালি ভাষাই ভারতের শ্রেষ্ঠ অস্ট্রিক ভাষা। এতে সব চেয়ে ভালো সাহিত্য আছে। লোকসংখ্যাও প্রায় চার মিলিঅন। মুণ্ডারি ভাষায় প্রায় এক মিলিঅন লোক কথা বলে। হো ভাষায় তার চেয়ে কিছু কম। এই দুটি ভাষারও নিজস্ব সাহিত্য আছে। এদের নিজেদের কোন লিপি নেই। আজ-কাল এরা রোমক লিপি ব্যবহারের দিকে অগ্রসর হয়ে ঠিক পথেই চলেছে। সাঁওতাল জাতি কৃষ্ণকায় কিন্তু সুগঠিত। এরা নিজেদের অঙ্গরাজ্য বা ভাষাভিত্তিক প্রদেশ দাবি করছে।

মোন্-খমের ভাষাসমূহ ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোজ বা

কাম্বোদিয়া অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। সিংহলের বেদ্দা জাতি অষ্ট্রিক হলেও তাদের সংখ্যাল্পতা ও পশ্চাদ্বর্তিতার জন্যে তাদের নিয়ে আমাদের আলোচনার প্রয়োজন নেই। সম্ভবত বর্তমান শতাব্দী শেষ হবার আগেই এরা নিশ্চিহ্ন হবে। মোন্-খমের ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র কাম্বোদিয়ার ভাষা খমের উল্লেখযোগ্য। এই ভাষা কাম্বোদিয়ার রাষ্ট্রভাষা। ভারতে অষ্ট্রিকরা নিজেদের কোন স্বাধীন রাজ্য গড়া দূরে থাক, অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশও গঠন করতে পারে নি। ঝাড়খণ্ড প্রদেশ গঠনের আন্দোলন হচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও তাতে কোন ফল হয় নি। সমস্ত অষ্ট্রো-এশীয় জাতিগুলির মধ্যে একমাত্র কাম্বোজরা নিজেদের জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করতে পেরেছে।

মোন্-খ্মের ভাষাসমূহের তালিকা :—

(১) মোন (২) খমের (৩) তালাইং (৪) পালোউং (৫) ওয়া (৬) বাহনার (৭) স্তিএং।

এই সব ভাষায় চীনা-তিব্বতীয় প্রভাব বেশ কিছু লক্ষ্য করা যায়।

অষ্ট্রোনেশীয় ভাষাগুলির শক্তি অনেক বেশি। এদের প্রসারক্ষেত্র থেকে একদা অষ্ট্রিকদের ভুবনব্যাপী প্রাধান্য উপলব্ধি করা যায়। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মালাগাসি বা মাদাগাস্কার দ্বীপ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওআইই দ্বীপ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক দ্বীপই এদের বাসভূমি। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে এদের এই দ্বীপময় অবস্থিতির জন্যে এদের শত শত ভাষা আছে তাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পূর্ণ আলোচনা ক'রে গোষ্ঠী ও শ্রেণীতে সজ্জিত করা আজও শেষ হয়নি। অন্তত এক মিলিয়নের কাছাকাছি লোকে কথা বলে এবং অন্য নানা ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এমন অষ্ট্রোনেশীয় ভাষাগুলির নাম :—

(১) মালাই (২) যবদ্বীপীয় (৩) বলিদ্বীপীয় (৪) সুন্দা (৫) তাগালোগ (৬) বিসাইয়া (৭) মাদুরি (৮) ইলোকানো (৯) বুগি (১০) বাতাক (১১) দাইয়াক (১২) মালাগাসি (১৩) মাওরি।

এই ভাষাগুলির মধ্যে মালয়ের ভাষা মালাই কেবল মালয়ে নয়, সমস্ত ফিলিপিন ও ইন্দোনেশিয়ায় সুপ্রচলিত। একেই "বাহাসা ইন্দোনেশিয়া" নামে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। খাস মালয়ের মাত্র কয়েক মিলিঅন লোকের মাতৃভাষা এই মালাই। কিন্তু এই ভাষায় কর্মোপলক্ষে প্রায় সাত কোটি লোক কথা বলে। বাণিজ্য উপলক্ষে দ্বীপে দ্বীপে এর প্রচার হয়েছে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। অষ্ট্রোনেশীয় জাতিগুলি স্বভাবতই সমুদ্রযাত্রী।

মালাই ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টিও উল্লেখযোগ্য, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার ভাষাগুলিতে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি প্রাচীন-ভারতীয় ও মধ্য-ভারতীয়-আর্যভাষার প্রভাব খুব বেশি। যবদ্বীপের ভাষায় প্রায় সাড়ে চার কোটি লোক কথা বলে। আষ্ট্রিকভাষাগোষ্ঠীতে এটি সবচেয়ে বেশি লোকের মাতৃভাষা। সুন্দা দ্বীপমালায় প্রচলিত সুন্দা ভাষায় প্রায় দেড় কোটি লোক কথা বলে। ফিলিপিনের তাগালোগ ও বিসাইয়া ভাষাদুটিতে ৮ মিলিঅন ক'রে লোক কথা বলে। তাগালোগ ফিলিপিনের রাষ্ট্রভাষা। যবদ্বীপের ভাষাই ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রভাষা হতে পারত। কিন্তু সমস্ত ইন্দোনেশিয়াকে অখণ্ড রাখার প্রয়োজনে এবং মালাই ভাষার সাহায্যে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং ফিলিপিনকে মিলিয়ে এক অখণ্ড "মাফিলিন্দো" রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ মালাই-কে তাঁর রাষ্ট্রের সরকারি ভাষারূপে বরণ করেন। ইংরেজরা তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্যে মালয় ও ব্রিটিশ বোর্নিও নিয়ে মালয়েশিয়া রাষ্ট্র গঠন করেছে। অখণ্ড ইন্দোনেশিয়া গঠনে প্রধান প্রতিবন্ধক মালয়ের সঙ্গে উত্তর বা ব্রিটিশ বোর্নিও-র একীকরণ। সুকর্ণ চান উত্তর বোর্নিও স্বাভাবিক অঙ্গরাজ্যরূপে ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ বোর্নিও-র সঙ্গে মিলিত হোক।

মালাগাসি মাদাগাস্কার দ্বীপ-রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা। এতে পাঁচ মিলিঅনেরও বেশি লোক কথা বলে। মাওরি ভাষা নিউ জিল্যাণ্ডে এখনও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সব চেয়ে বিস্ময় ও প্রশংসার কথা এই যে, সেখানকার সরকারি কাজে মাওরি ভাষা কতকটা মর্যাদাও পেয়েছে। মাওরি-ভাষীরা শক্তিশালী জাতি; এক সময় সমস্ত নিউজিল্যাণ্ড তাদের অধিকারে ছিল। এখন বেশিরভাগ নিউজিল্যাণ্ডবাসী শ্বেতকায় ঔপনিবেশিক।

অষ্ট্রোনেশীয় জাতিগুলি অন্তত চারটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে পেরেছে :

(১) মালাগাসি (২) মালয়েশিয়া (৩) ফিলিপিন (৪) ইন্দোনেশিয়া।

[ক্রমশঃ

মাসিক রাশিফল

শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য

আশ্বিন মাসের ফল

এবার আমরা ফলিত জ্যোতিষ আলোচনার পুনরাবৃত্তি করছি। গত শ্রাবণ সংখ্যায় আমরা মঙ্গল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এবারে মঙ্গল সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করলাম।

মঙ্গলকে তমঃ প্রধান গ্রহ বলা হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলের মধ্যে তমোগুণের চেয়ে রজোগুণের প্রাবল্য অধিক। সুতরাং ব্যবহারিক জগতে মঙ্গল রাজসিক গ্রহ। কাজেই মঙ্গলের মধ্যে সর্বদা কার্য-প্রবৃত্তি, শূরতা বা বীরত্ব প্রকাশ ও আমিত্বের লক্ষণ দেখা যায়। আবার মঙ্গলের অহংভাব বা আমিত্বজ্ঞান বড় বেশী। কাজেই মঙ্গলভাবাপন্ন ব্যক্তি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তার প্রকৃতি-গত অহং-ভাব ও ক্ষমতার দম্ভকে তিনি ত্যাগ করতে পারেন না।

মঙ্গল রণদেবতা। যুদ্ধবিদ্যা তার সহজাত বৃত্তি। সুতরাং সামরিক বিভাগের ওপর তার আধিপত্য রয়েছে প্রচুর। কাজেই শুভযোগ কারক মঙ্গলের প্রভাবে জাতক সৈন্য-নায়ক বা সেনাপতি অথবা রণতরীসমূহের অধ্যক্ষ হতে পারেন।

মঙ্গল ক্ষত্রিয়। তিনি ক্ষাত্রবীর্যের আদর্শ। সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনা করা তার কাজ। সুতরাং মঙ্গল হতে মন্ত্রিত্ব, দৌত্যক্রিয়া এবং শাসন বিভাগে যে কোন প্রকার পদ-প্রাপ্তি কল্পনা করা যায়।

সমাজ জীবনে মঙ্গল সমতা ও ভ্রাতৃভাবের পক্ষপাতী। সংকীর্ণ বুদ্ধি ও আপনপর রূপ ভেদজ্ঞান তার মধ্যে নেই। তিনি চান, সমাজের প্রত্যেক স্তরে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। যেখানে স্বার্থ—সেখানে প্রেমের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ—ভ্রাতৃত্ব সুদূরপরাহত। তিনি জানেন, নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃপ্রেম আদর্শ জাতি গঠনের সহায়ক। আবার মঙ্গলের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাজ্ঞান বড় বেশী। কাজেই মঙ্গল-ভাবাপন্ন ব্যক্তি সমাজ-নীতির পক্ষপাতী এবং কথিত বা লিখিত বাক্যের মর্যাদা বোঝেন। যদি কেহ সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধে কোন গর্হিত কার্য করে, অথবা যথা-সময়ে কার্য না করে, কিংবা প্রবঞ্চনা করে বা মিথ্যা কথা বলে সময়মত কার্য করতে অবহেলা করে, তা হলে মঙ্গল ভাবাপন্ন ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে অশ্রাব্য ও অবাচ্য বাক্য প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করেন না, এমন কি মারামারি ও মোকদ্দমা করতেও পশ্চাৎপদ হন না। ফৌজদারী আদালতে যতপ্রকার অভিযোগ উপস্থিত হয়, এবং তার প্রমাণ ফলে অথবা মিথ্যা-রচনার ফলে যতপ্রকার অর্থদণ্ড ও সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়, তার মূল কারণ সমাজ-নীতির ব্যতিক্রম; এবং মঙ্গল তার দণ্ডদাতা। মঙ্গল কর্তব্যনিষ্ঠ—একদিকে যেমন সমাজের প্রহরারত সারমেয় অপর দিকে তেমন ভীষণ ক্রূর রক্তখেকো কুকুর।

মঙ্গল রক্ষণশীল বটে, কিন্তু সমাজের পুরাতন জরাজীর্ণ মুমূর্ষু অবস্থার সহিত নবীনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করার যে প্রয়োজন তা তিনি অস্বীকার করেন না। সুতরাং মঙ্গলভাবাপন্ন ব্যক্তি সমাজ সংস্কারক হতে পারেন। আবার মঙ্গলের মধ্যে সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে প্রচুর।

কাজেই শুভ যোগকারক মঙ্গলের প্রভাবে জাতকের মধ্যে সভা-সমিতি ও সংঘ গঠনের স্পৃহা দেখা যায়।

সংসার-ধর্মে মঙ্গল বিবাহিত জীবন বা বহুবিবাহ চান না; সুতরাং মঙ্গল স্বামী বা স্ত্রী হানিকারক। ইহা অবশ্য স্থান বিশেষে অনুমেয়। কাজেই মঙ্গলভাবাপন্ন ব্যক্তির স্ত্রী-বিচ্ছেদ বা স্ত্রী-বিয়োগ হয় এবং স্ত্রী রুগণা হয়ে থাকেন। আবার এরূপ জাতক অধিক ক্ষেত্রেই পত্নী হতে লাঞ্ছিত বা অনাদৃত হয়ে থাকেন।

দৈত্যগুরু শুক্র জ্ঞানী—পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কিন্তু তার জ্ঞান সীমিত—উচ্চমার্গে পৌছুতে পারে না। তার দৃষ্টি স্থূল। তিনি পার্থিব জগতে ভোগ-বিলাসের গ্রহ। তার কামনা ও বাসনার শেষ নেই। সবচেয়ে বড় কথা শুক্র প্রেমের কারক। আর মঙ্গল কুমার এবং বিবাহ-বন্ধন স্বীকারে তিনি অনিচ্ছুক। কিন্তু যখন শুক্রের মত গ্রহের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন, তখন আসঙ্গলিপ্সা তার মধ্যে প্রবল ভাবে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু সে প্রবৃত্তির মধ্যেও তার নিজের স্বভাব অটুট থাকে, এখানেও অহং প্রবল এবং নিজের সুখই একমাত্র কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। তখনই তার নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটে।

কর্মক্ষেত্রে মঙ্গল পুরুষকারের পক্ষপাতী। তিনি কার্য-কারিতা ও ক্ষিপ্রকারিতার কারক। ধীরতা ও স্থিরতার সঙ্গে কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব। তিনি নিরলস কর্মী। বিশ্রাম তার কাম্য নয়। পরনির্ভরশীলতা তিনি পছন্দ করেন না। তিনি জানেন, কর্মই জীবনের সৌন্দর্য বা মাধুর্য। কর্মই অমরত্ব দান করতে পারে। সেজন্য মঙ্গল বোঝেন কাজ, শুধুই কাজ। তার মতে জীবের প্রকৃতি ত্রিগুণ দ্বারা আবদ্ধ থাকায় জীব কর্ম করতে বাধ্য। সুতরাং কর্মময় জগতে কর্মই আস্তিকতা, কর্মই ধর্ম, এবং কর্মই ধ্যান-জ্ঞান ও সাধনা। আর কর্ম-বিমুখতার নামই নাস্তিকতা, ঔদাসীন্যের অপর নাম জড়তা—অমার্জনীয় অধার্মিকতা, বৃদ্ধি ও উন্নতির পরিপন্থী। কর্মক্ষেত্রে মঙ্গল বাস্তববাদী—স্থূল ও প্রত্যক্ষের পূর্ণ অবতার। ভাব প্রবণতার স্থান তার কাছে নেই। আর সেখানেই তার মহানুভবতার বিকাশ।

মঙ্গল সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা করা হল। যাক, এবারে জন্মরাশি অনুসারে ব্যক্তিগত মাসিক শুভাশুভ ফলের আভাস দিচ্ছি।

মেষ—আর্থিক অবস্থা ভালই বলা চলে। মানসিক শান্তি পাবেন। নতুন বন্ধুলাভ হবে। শরীরে আঘাতাদি প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। রক্তচাপ বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা আছে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পিতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করুন। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। ছোটখাট ভ্রমণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন-চেতাদের অশান্তি দেখা দিতে পারে। শত্রুরা নতি স্বীকার করবে। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। কর্মপরিবর্তনের যোগ রয়েছে। মহিলাদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে না।

বৃষ—আর্থিক অবস্থা সাধারণ থাকবে তবে খরচের চাপে কিছুটা বিব্রত বোধ করবেন। শরীর খুব ভাল থাকবে না। অনেক দিনের কোন ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। জীবনে নতুন কোন সুযোগ পেতে পারেন। মাতার স্বাস্থ্য শুভ নয়। পিতার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল, এমন কি তাদের যশোবৃদ্ধির যোগ রয়েছে। তীর্থাদি ভ্রমণে বাধা আসতে পারে। বৈষয়িক ব্যাপারে গুরুজনদের সঙ্গে মতানৈক্য হতে পারে। মহিলাদের সময়টা ভাল।

মিথুন—আর্থিক কষ্ট পেতে পারেন। শরীর ভাল থাকবে না। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য জনিত দুশ্চিন্তার আশঙ্কা রয়েছে। সম্পত্তির ব্যাপারে কিছুটা মনোমালিন্য ঘটতে পারে। আগের পরিকল্পনামত কাজের পক্ষে বাধা আসতে পারে। ন্যায্য প্রাপ্তিতে হতাশ হবার লক্ষণ আছে। গুরুজন হানির যোগ দেখা যাচ্ছে। দূর ভ্রমণ হতে পারে। বিদ্যার্থীদের বিদ্যালাভে বিঘ্ন। শত্রুরা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কর্ম পরিবর্তনের যোগ দেখা যাচ্ছে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা অত্যন্ত ভাল।

কর্কট—স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করুন। সামান্য ভুলে কর্মক্ষেত্রে অথবা আর্থিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ক্ষতি হতে পারে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল বলা চলে না। ভ্রাতা বা বন্ধু দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। সন্তানদের পীড়ায় অর্থব্যয় অবশ্যম্ভাবী। গোপন শত্রু থাকলেও বশ্যতা স্বীকার করবে। নতুন কাজের উদ্দীপনাও রয়েছে। দাম্পত্যক্ষেত্রে শুভভাব বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যার্থীদের বিদ্যা লাভ ভালই হবে। তীর্থাদি ভ্রমণ হতে পারে। স্থান পরিবর্তন হতে পারে। কোন প্রিয় দ্রব্য চুরি যাবার

আশঙ্কা আছে। মহিলাদের ধৈর্যহারা হলে চলবে না। তাতে অশান্তি বাড়বে।

সিংহ—যে কোন কাজে সফল হবার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য সামান্য উৎপাত করতে পারে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। হঠাৎ কোন প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। খুব ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটবে। সম্পত্তি লাভের যোগ রয়েছে। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য কিন্তু ভাল যাবে না। পত্নীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক হউন। গুরুজন হানির সম্ভাবনা রয়েছে। বিদ্যার্থীদের বিদ্যা লাভে বিঘ্ন যোগ বিদ্যমান। দাম্পত্যক্ষেত্রে অশান্তি বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে যশ থাকবে। হঠাৎ আঘাত পেতে পারেন, কিংবা হিংস্র জন্তু দংশন করতে পারে। আয়ের অধিক ব্যয় যোগ দেখা যায়। মহিলাদের সময়টা ভাল।

কন্যা—শরীর খুব ভাল থাকবে না। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি চলবে। কোন উপহার পেতে পারেন। পারিবারিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সামান্য কারণে মনোমালিন্য হবার সম্ভাবনা রয়েছে। শত্রু বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে, সাবধানে থাকবেন। সামান্য ভুলের ফলে কর্মক্ষেত্রে ক্ষতি হতে পারে। বাইরে যাবার যোগাযোগ হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিপ্রেত ব্যাপারে বাধা আসতে পারে। হঠাৎ শোক পেতে পারেন। সন্তানাদির পীড়ায় অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। পিতার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার।

তুলা—শরীর খুব ভাল থাকবে না। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হতে পারেন। হঠাৎ কোন বস্তু লাভ হতে পারে। আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হবেনা। মানসিক চাঞ্চল্য প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল যাবেনা। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুর দ্বারা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে; এমন কি কোন উন্নতির মূলে অনিষ্ট করবার যোগ পরিলক্ষিত হয়। ছোটখাট ভ্রমণ যোগ দেখা যায়। প্রিয়জনের সহিত মনোমালিন্য হতে পারে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। মহিলাদের সময়টা গোলমেলে।

বৃশ্চিক—মানসিক চঞ্চলতা, এমন কি নানাবিধ অশান্তির যোগ বিদ্যমান। হঠাৎ কোন আঘাত বা যকৃৎ পীড়ায় কষ্ট পাবার আশঙ্কা আছে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল বলা চলে। পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ বিদ্যমান। অর্থক্ষতি হতে পারে। ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে, এমন কি ঋণ হতে পারে। স্থান পরিবর্তন হতে পারে। দাম্পত্য ক্ষেত্রে শুভ ভাব বৃদ্ধি পাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যধারা নির্ণয়ে গোলযোগ দেখা দিতে পারে। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভালই বলা যায়। ভ্রমণে আনন্দ পাবেন। মহিলাদের অভিপ্রেত ব্যাপারে সাফল্য লাভ হতে পারে।

ধনু—শরীর ভাল থাকবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিয়ের কথা পাকাপাকি হবে। আর্থিক দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাবেন। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন শুভ খবর আশা করতে পারেন। ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে একটু সজাগ থাকবেন। বিদ্যার্থীদের শুভফলের আশা কম। পত্নীর স্বাস্থ্য শুভ বলা চলে। পত্নীর সহিত মতের মিলের কোন অভাব হবেনা। কর্মে উন্নতি হবে। কর্ম পরিবর্তনেরও যোগ রয়েছে। তীর্থাদি ভ্রমণ ও সদ্‌গুরুলাভ হতে পারে। গৃহে কোন সৎকর্মানুষ্ঠানযোগ বিদ্যমান। হঠাৎ কোন প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। মহিলারা অনুরূপ ফল পাবেন।

মকর—আয়ক্ষেত্র শুভ থাকা সত্ত্বেও ব্যয়ের মাত্রা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। হঠাৎ কোন উপহার পেতে পারেন। বিদেশে যাবার সুযোগ আসতে পারে। বিদ্যার্থীরা কিছুটা শুভফলের আশা করতে পারে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা আশা করতে পারেন। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনার জয়ের আশা আছে। গুরুজনদের সঙ্গে মতানৈক্য হতে পারে। ভূ-সম্পত্তি ব্যাপারে একটু সজাগ থাকবেন। মহিলারা অভিপ্রেত ব্যাপারে সাফল্য পাবেন।

কুম্ভ—এখন থেকে লটারীর টিকিট কাটতে পারেন। এ মাসেও আপনার মানসিক উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়। কাজকর্মের দিক থেকে নৈরাশ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধা আসতে পারে। কোন সদ্‌বন্ধু বা পরম আত্মীয়ের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। ভূ সম্পত্তি ক্রয় যোগ দেখা যায়। মাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। আশ্রিতজনের শত্রুতা মনে আঘাত দেবে। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন

করুন। প্রাপ্য অর্থ যা কোনদিন আদায় হবে বলে আশা করেন নি, সে টাকা পাবার যোগ আছে। মহিলাদের এমাসটা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ।

মীন—পারিবারিক ক্ষেত্রে শুভ খবর আশা করতে পারেন। হঠাৎ কোন কাজ করবেন না। তাতে ক্ষতি হতে পারে। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক। শরীর একটু অসুস্থ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রীতির প্রসার এবং উপরন্তু কর্মচারীর সাহায্যে কর্মে উন্নতি হবে। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। বিদ্যার্থীদের বিদ্যালাভে বিঘ্ন আছে। পত্নীর স্বাস্থ্য উৎপাত করতে পারে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবেনা। দাম্পত্যক্ষেত্রে শুভভাব বৃদ্ধি পাবে। মহিলারা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

নদী

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

নদী কাঁপে নদী কাঁপে থরো থরো ব্যথিত সন্ধ্যায়
মেখে তার সারা মুখে লজ্জার আবির : আমি তাকে
দেখেছি সুন্দর আহা আমি তার আশ্চর্য ছটাতে
বিস্ময়ে অস্থির, তার বিচুর্ণ অলক কাঁপা হাওয়া
আমাকে বিহ্বল করে, তার চোখ গভীর আশ্রয়
আমার। আমি কি তার হৃদয়কে ছুঁতে পারি তাকে !

আশ্বিনের শুক্লা রাত। চন্দ্রমার অশ্রুতে অশ্রুতে
সে নদী কি স্নান করে টেনে নেয় বিস্রস্ত বসন,
সে আমার মুখোমুখি বসে তার বৃষ্টির বীণাতে
নরম আঙুল রাখে আমাকে সে নিয়ে চলে যায়

দূরতম সমুদ্রের বুকে যার উন্মুখর ঢেউ
উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত ফেনিল কথার ভারে ভারে।

আমি যে ও নদীটির বেদনার্ত বুক ভালোবাসি
যে নদী আমাকে দেয় দেবে জানি অন্তহীন স্বর
হৃদয়ের গানে গানে—আমার সমস্ত অন্ধকারে
যে নদী নক্ষত্র হয় আমি তাকে ভালোবাসি ভালো

অনেক অনেক রাত। পাখি নেই। পাতাতে পাতাতে
জ্যোৎস্না আর শিশিরের অশ্রু ঝরে, আমার হৃদয়
ঝরে যায় ; নক্ষত্রের পরিশ্রান্ত কান্না থামে না তো
বেদনার্ত এই রাতে—আমি ভাবি নদীটির কথা

যে নদী নিঃশব্দে কাঁদে আমাকে আচ্ছন্ন করে আর
আশ্চর্য করুণ ক্লান্ত করে তোলে ব্যথার রাত্রিতে।

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(রমন্যাস)

পাদটীকা

"প্রেমল বৈরাগী" নামের ছদ্মবেশে যাঁকে এ রমন্যাসে পরিবেষণ করেছি তিনি স্বনামধন্য মহাত্মা। তবু কথাসাহিত্যে আব্রু রাখা ভালো। কারণ এ-রমন্যাস মূলতঃ তাঁর আশ্চর্য জীবনকাহিনী হইলেও রমন্যাসে কল্পনার স্থান আছে। তাই যাঁরা সে-মহাত্মার নিছক জীবনী চাইবেন তাঁদের জন্যে এ-রমন্যাস নয়। এ-রচনা তাঁদের জন্যে যাঁরা শুধু ঐতিহাসিক নন, রসিকও বটে—অর্থাৎ যাঁরা এ-কাহিনীর মধ্যে রসের স্বাদও চাইবেন জীবনীর মাধ্যমে। এই রসস্বাদ গভীরতর করতেই কল্পনা মিশিয়েছি নিরঙ্কুশ হ'য়ে যদিও কোথাও মূল চরিত্রগুলিকে লংঘন ক'রে ভুল আঁকিনি বা অত্যুক্তি ক'রে খাটো করি নি। তবে সাধ্য-ম'ত চেষ্টা করেছি—তাঁদের বাহ্য রূপকে পাশ কাটিয়ে তাঁদের অন্তর্জীবনের সত্যটুকু ফুটিয়ে তুলতে, ফটোগ্রাফারের শৈলীতে নয়—চিত্রকরের ভঙ্গিতে। বিশেষ ক'রে অধ্যাত্ম সাধক-সাধিকাদের চিত্রণে এই অন্তর্জীবনের সত্যই হ'ল আসল সত্য—সত্যের সত্য, বাইবেলের ভাষায়—not of the letter but of the spirit ; এ-জাতের রমন্যাসের বিচারের সময়ে আরো স্মরণীয় যে, the letter killeth but the spirit giveth life। যে-মহাত্মার জীবনী কল্পনার পটে নানা রঙে রঙিয়ে আরো উজ্জ্বল ক'রে ফলিয়ে তুলতে চেয়েছি তাঁকে যাঁরা জানতেন চিনিতেন ভালো-বাসতেন তাঁরা এ-ছবিটি প'ড়ে আনন্দ পাবেন ব'লেই আমার বিশ্বাস। কেবল তাঁদের মনে রাখা চাই—পুনরুক্তি মার্জনীয়—যে, এ-রচনা রসচিত্র, ইতিহাসের ঘটনা পঞ্জিকা নয়।

উপক্রমণিকা

সোফিয়া লিখল তপতীকে :

দিদি,

স্বামী প্রেমানন্দের কথা শুনে আরও মুগ্ধ হয়েছি দাদা কাহিনীটিকে নাট্যাকারে পরিবেষণ করেছেন ব'লে। পড়তে পড়তে বারবারই মনে হয়েছে যে, দাদা যে এ নাটকটিকে "নাট্যোপন্যাস" নাম দিতে চেয়েছেন তার সার্থকতা আজ এই জন্যে যে, এ নাটকটির নানা দৃশ্যে নাট্যরস অপর্যাপ্ত মিললেও দাদা নানা সংলাপ সাজিয়েছেন খানিকটা তাঁর স্বকীয় রমন্যাসের ঢঙে। কে না জানে উপন্যাসের পট-ভূমিকা নাটকের চেয়ে অনেক বড়? এর প্রধান কারণ—উপন্যাসে নানা বর্ণনা বিশ্লেষণ স্বগতোক্তি ইত্যাদি ফোটাতে পারা যায় লেখকের নিজের জবানীতে, যেখানে নাটকে ছবিটি ফোটাতে হয় কেবল মাত্র সংলাপের মাধ্যমেই। অবশ্য অভিনয় হ'লে রঙ্গমঞ্চে নটের নানা ভঙ্গিমার মধ্যে দিয়েও অনেক কিছু ফলিয়ে তোলা যায় বটে কিন্তু তবু বলব নাটকের পরমতত্ত্ব রস খতিয়ে সংলাপের কাব্যরস তথা প্রাণবত্তা—নটের নৈপুণ্য নয়। এই জন্যেই দেখতে পাই যেসব নাটকের সংলাপে বিশেষ কাব্যরস বা প্রাণ-শক্তি নেই হাজার প্রতিভাবান অভিনেতাও তাকে দাঁড় করাতে পারে না, দু দিন হৈচৈ ক'রে মানুষকে একটু হকচকিয়ে দেওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু তার পরেই তারা মৌসুমী ফুলের মতনই মিলিয়ে যায়—রং যায় মিলিয়ে, ঢং মনে হয় একঘেয়ে, হৈ চৈ ধুমধাম হ'য়ে ওঠে দুঃসহ। উদাহরণ হাতের কাছেই পাবেন: দেখুনা না কেন, ইবসেন যে ইবসেন—অতবড় দিক্‌পাল নাট্যকার তাঁর

নাটকও আর কোনো রঙ্গমঞ্চেই ঠাঁই পায় না—কেমন যেন মনকে আর তেমন স্পর্শ করে না। কেন করে না? কারণ, তাঁর সংলাপ ছিল একটা বিশেষ যুগের বিশেষ স্ফুরণের বা মুডের প্রকাশ। কাজেই সে-যুগ চ'লে গেলে সে-স্ফুরণের ছবি আর তেমন মন টানতে পারে না তেমন জীবন্ত হ'তে পারে না ব'লে। মানি—সাফক্লিস ইউরিপিডিস—এথাইনাম শেক্সপীয়রের তো কথাই নেই—আজও সুধীসমাজে আদরণীয়। কিন্তু কেন? তিনটি কারণ আছে। এঁরা সংলাপের মধ্যে দিয়ে কোনো স্থানীয় বা সে যুগের ছবিই আঁকতে যান নি, নানা বিশ্বজনীন প্রবৃত্তির সংঘাত নিয়েই মশগুল হয়েছেন তাই সে-ছবিতে আমরা আজও মশগুল হ'তে পারি। দ্বিতীয় কারণ তাঁদের গল্পাংশের বাহার। মানুষ নাটকে শুধু চরিত্র চিত্রণই চায় না, গল্পও চায়। তৃতীয়—আর হয়ত এইটিই সব চেয়ে বড় কারণ—তাঁদের কবিত্ব।

একটা জিনিষ বড় চোখে পড়ে দাদা: কবিত্ব কোনো যুগেই বেশি লোকে বোঝে না বুঝতে চায়ও না। কিন্তু তবু দেখুন কবিত্বই সবচেয়ে দীর্ঘজীবী। শেক্সপীয়র এ-কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তিনি যদি তাঁর নাটকগুলি অদ্যন্ত গদ্যে লিখতেন মনে করেও কি কেউ পড়ত আজ? বলতে কি, তাঁর নাটকে নানা স্থানে থাসা গদ্য সংলাপও তো আছে, কিন্তু কয়েকটি উদ্ধৃতি ছাড়া কি সে সব কারুর মন টানে আর! সে গদ্যের মরুভূমি আমরা আজও পেরুই—শুধু তার পরেই তাঁর কবিত্বের ওয়েসিসের দেখা মিলবে ব'লে। এই কবিত্বই তাঁকে চিরজীবী ক'রে রেখেছে—তাঁর নাটকের নানা নাটকীয় রসও নয়, সংলাপও নয়, এমন কি গল্পাংশও নয়। বলতে কি, তাঁর গল্পাংশ অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দুর্বলভিত্তি। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত দুটি নাটকের ক্ষেত্রেই এ কি চোখে না প'ড়ে পারে? হ্যামলেটের সমস্ত নাটকীয় সৌধ দাঁড়িয়ে আছে এক ভূতের আত্মপ্রকাশে। সাইকিক রিসার্চ সোসাইটির অজস্র ভুতুড়ে কাহিনী আছে—অনেকেই হয়ত মানেন যে তাদের মধ্যে সত্য আছে যথেষ্ট—কিন্তু কোনো ভূতই এসে বলেনি যে তাকে খুন করেছে। যদি বলত, তাহ'লে সার্লক হোমসের বা স্কটল্যাণ্ড য়ার্ডের দরকারই হত না। অথচ এই ভূতের মুখেই হ্যামলেট জানতে পারলেন যে তাঁ পিতৃহন্তা কে—আর এই জ্ঞানের বিঘোষণেই যত নাটকী ভূমিকম্প! ম্যাকবেথেও তাই। কোথায় এক মাঠে কয়টি ডাইনির বিচিত্র ভবিষ্যদ্বাণীই হ'ল ম্যাকবেথে কাল—সে খুনের পর খুন ক'রে চলল শুধু তাদে হসনীয় ভবিষ্যদ্বাণীর 'পরে ভর ক'রে। এ পরিকল্পনাকে কে বলবে রিয়ালিসটিক। অথচ তবু হ্যামলেট বা ম্যাকবে আমাদের কাছে নীরস মনে হয় না কেন? আমি বল তার কবিত্বের জন্যে ও সংলাপের প্রাণবত্তার গুণে। কি সংলাপের গুণপনা আরো অনেক নাট্যকারই দেখিয়েছে যথা ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ, গলসওয়ার্দি, সমসেট মম (শ- সংলাপ উৎরে গেল বারোআনা তাঁর আশ্চর্য রসিকতা প্রসাদে) কিন্তু মম ঠিকই বলেছেন গদ্য নাটক স্বভাবতই ক্ষণায়ু—এক কবিত্বই তাকে দীর্ঘায়ু করতে পারে।

কিন্তু এই সঙ্গে আর একটা কথা আমার মনে হয়েছে—বিশেষ ক'রে আপনার সদ্যোজাত নাটক "স্বামী প্রেমানন্দ" প'ড়ে। কথাটা এই যে, কবিত্বের আদর কম হ'লেও সে নাটককে যে-কারণে দীর্ঘায়ুতার বর দিতে পারে, ঠিক সেই কারণেই ধর্মও নাটককে দীর্ঘজীবী করতে পারে। কেন? কারণ ধর্ম নিত্যকালের বস্তু সাময়িক—topical—প্রসঙ্গ নয়। তাই ধর্মের নানা ভাব বিভাব রস রং নিয়ে নাটক লিখলে সে নাটকের বেশি দিন বাঁচার কথা। অবশ্য এখানে খতিয়ে আসে নাটকীয় নৈপুণ্যের কথা: অর্থাৎ নাট্যকারকে শুধু খাঁটি ধার্মিক হ'লেই চলবে না, সেই সঙ্গে হ'তে হবে নিপুণ নাট্যকার। ঠিক যেমন বড় গায়ক হ'তে হ'লে শুধু পণ্ডিত গীতবিৎ হ'লেই চলে না হ'তে হয় সুরেলা সুরকার। তাই আমার অনুরোধ—আপনি নাটক আরো লিখুন। লোকে হয়ত ধর্মীয় নাটক এ যুগে নেবে না, নাই নিল। ক্ষতিপূরণ মিলবে আগামী যুগে যখন এ যুগের নানা টপিকাল নাটকের রসকষ উঠে যাবে দুদিন পরে। তখন আমার মনে হয় ধর্মীয় নাটকই মান পাবে—ঠিক যেমন কবিত্ব মান পায় কালের দরবারে। আর যদি কবি ধার্মিক ও নাট্যশিল্পী এই তিনের ত্রিবেণীসঙ্গম হয় তাহ'লে তো কথাই নেই। আপনার মধ্যে আমরা দুবোনে অন্ততঃ দেখতে পেয়েছি এই ট্রিনিটির

স্ফুরণ। তাই আপনি একে লাগন করুন এই অনুরোধ করছি আমি কোরাসে।

আর, রসুন—অতিষ্ঠ হবেন না দাদা, প্রেমল বৈরাগীকে নিয়েই লিখুন এর বারের নাটক। রাজীব প্রায়ই বলে "শুভস্য শীঘ্রং"। আমি ও বার্বারা দোয়ার দিই সেক্সপীয়রের ভাষায়: fiery-red with haste!

ইতি আপনার স্নেহের বোন সোফিয়া।

পুনশ্চ। রাজীব ধরেছে—জুড়ে দিতেই হবে: "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—তারপর ভুলে গেছে—তার উপনিষদটা খুঁজে পাচ্ছে না। পেলে বাকিটা লিখবে পরের মেলে।

* * *

তপতী: সোফি নাটক নিয়ে কী দুর্দান্ত মাথা খাটিয়েছে দাদা! ও তো দেখ্‌ছি সামান্যি মেয়ে নয়?"

অসিত (চিন্তিত সুরে): সে তো হ'ল—কিন্তু উস্কে দিতে চায় যে।

তপতী: ভালোই তো।

অসিত: না। নাটক লিখবার মুড নেই এখন। বিশেষ প্রেমলের সম্বন্ধে নাটক? অসম্ভব।

তপতী: কেন অসম্ভব?

অসিত: সোফিই তো লিখেছে সেকথা। নাটকের পটভূমিকা—canvas—ছোট। উপন্যাসই হ'ল এ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—কারণ কেবল উপন্যাসেই কবিত্ব, নাট্যরস ও বর্ণনা এই ত্রিকুটীর সমন্বয় হ'তে পারে এবং হয়েছে—মানে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে।

তপতী: (চিন্তিত) নাট্যরস—অর্থাৎ কথাবার্তা, উদ্বেগ ও সংঘর্ষ এ সবই হ'তে পারে। বর্ণনার তো প্রধান আখড়াই গল্প। কিন্তু কবিত্ব হয় শুধু নাটকেই।

অসিত: কেন? গদ্যে?

তপতী: সন্দেহ।

অসিত: কেন? চোখে পরে না কি—এযুগের একটি নবধর্ম হচ্ছে—গদ্যে কিছুটা অন্তত: কবিত্বের রস আমদানী করা?—না, টুকো না আমায়। আমি বলছি না—ছন্দ বিনা কবিত্বের শ্রেষ্ঠ রূপ ফুটতে পারে। কিন্তু গদ্যে ছন্দ না থাকলেও এমন গাঢ়বন্ধ ও প্রসাদগুণ আনা যেতে পারে যে, কাব্যের—ঐ যে বললাম—কিছুটা রস আনা সম্ভব।

তপতী: দু-আনা মানে তো পনের আনা নয়।

অসিত (হেসে): না। তবে দুই-কে চতুর্গুণ করা চলে। অর্থাৎ তোমার কথাও থাক আমার কথাও থাক—গদ্যে আট আনা কাব্যরসের ঢেউ বেশ স্বচ্ছন্দেই তোলা যেতে পারে। মনে রেখো, উপন্যাস এসেছে সবে সেদিন—মানে, খাঁটি উপন্যাস। আগের যুগে ছিল কাব্যকথিকা বা এপিক।—না, প্রেমলকে নিয়ে আমি লিখব, কিন্তু নাটক নয়। অন্তত: এখন নয়। আগে রমন্যাসের পাঠ দেওয়া যাক, পরে দেখা যাবে নানা পর্ব নিয়ে কয়েকটি আলাদা কাব্যনাট্য লেখা চলে কিনা। তবে মুস্কিল কি জানো? কাব্যনাট্য লিখতে হ'লে চাই খুব জোরালো প্রেরণা।

তপতী (হেসে): কিন্তু যদি বলি ধর্মের প্রেরণাও কাব্যনাট্যের প্রেরণা দিতে পারে?

অসিত (ভ্রূকুটি ক'রে): আমার মন্তব্য দিয়েই আমাকে কাবু করা? কিন্তু আমি কাবু হবার পাত্র নই। প্রেমল প্রায়ই বলত: 'Never say die!' আমি ধর্মের নানা ভাব বিভাবকে নিয়েও কাব্যনাট্য লিখেছি—আরো লিখবার আশা রাখি—যদি না হঠাৎ ডাক পড়ে অবশ্য।

তপতী (আলোভরা মুখে ছায়া এসে পড়ে): কী যে অলুক্ষুণে কথা বলো। যা—ও।

অসিত (হেসে): আচ্ছা আচ্ছা, আর বলব না। হয়েছে কি জানো? (মুখে ছায়া নেমে আসে) সে হঠাৎ চ'লে গেল···অসময়ে···

তপতী: কিন্তু তিনি কি বলতেন না উঠতে বসতে: খাঁটি সত্যের সাধক যারা তারা কেউই চ'লে যায় না—যেতে পারে না?

অসিত: সে এপার থেকেই ওপারের খবর রাখত। আমি রাখি না তো।

তপতী: বাজে বোকো না। সোফিয়া ঠিকই বলে: তুমি সকলকে এগিয়ে দিয়ে নিজে আড়ালে ঘুপটি মেরে থাকতে—ধরা না দিয়ে।

অসিত: এ-বিদ্যাও আমার প্রেমলের কাছেই শেখা। কত কীই শিখেছি তার কাছে···

তপতী: তবে ব'সে যাও লিখতে।

অসিত: অগত্যা। আনো এক দিস্তে কাগজ, আর এক কেটলি চা।

এক

মথুরায় নামতেই অসিতকে ধরল এক পাণ্ডা: কোথেকে আসছেন···কি বৃত্তান্ত···

অসিতের কৌতূহল হ'ল। বলল: "শুনেছি তোমরা যাত্রীদের পূর্বপুরুষদের নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখো?"

পাণ্ডা একগাল হেসে বলল: "রাখি, বাবুজি। চলুন, আমি ব'লে দিতে পারব—আমি আপনাদের কুলের পাণ্ডা না আর কেউ।"

অসিত গেল তার সঙ্গে। গিয়ে দেখে—অবাক কাণ্ড—সত্যিই তার পিতৃদেব, পিতামহ ও প্রপিতামহের স্বাক্ষর তার দপ্তরে। কাছের আর এক পাণ্ডা দেখাল তার দপ্তরে—বন্ধু জ্ঞানেশ ও শ্যামঠাকুরের পিতৃপুরুষদের স্বাক্ষর ও তাঁদের জন্মের তারিখ।

অবাক হ'য়ে পাণ্ডাযুগলকে মোটা দক্ষিণা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল মথুরায় কোন্ ঘাটে স্নান করা নিরাপদ।

দুজনেই তাকে নিয়ে গেল বিশ্রাম ঘাটে পৌঁছে দিয়ে স্টেশনের দিকে উধাও হ'ল আর এক দল যাত্রীর দরবারে হাজিরি দিতে।

নীল যমুনার শোভা দেখে অসিত মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে! কী অপরূপ দৃশ্য! ও দিকে এক ঝাঁক পাখী সার বেঁধে উড়ে চলেছে। এ দিকে সারি সারি ঘন পল্লব গাছ বাতাসে করতালি দিচ্ছে। প্রাতঃসূর্যের ঝিকিমিকিতে জ্যৈষ্ঠ শেষের যমুনা ঝলমল ঝলমল করছে। মাঝে মাঝে এক এক ঘন মেঘের জাহাজ ভেসে এসে সূর্যকে হারিয়ে দিয়ে যমুনার জলে ভাসাচ্ছে তাদের ছায়ার দ্বীপ। দ্বীপ তো নয়—যেন প্রসারিত উত্তরীয়। নীল জলের সঙ্গে স্নিগ্ধ ছায়ার লুকোচুরি। এদিকে আলো ওদিকে কালো। অসিতের বুকে বেজে ওঠে অতুলপ্রসাদের একটি গানের অন্তরা: "আলো কালো করে হোলি খেলা।" স্নান সেরে যাবে বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশনে—স্বামী দেবানন্দ তাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু তার আগে মথুরায় যা কিছু দেখার সেরে যেতে চায়। তাই ওর বিছানা ও তোরঙ্গ স্টেশনে রেখে এসেছে স্নান সেরে নিতে বিশ্রাম ঘাটে। কিন্তু জলে নামবে কি? নীল যমুনার কথা বইয়েই পড়েছে, কখনো চোখে দেখে নি। ভালোই হ'ল—ঠিক সময়ে মথুরায় এসেছে—আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের ঠিক এক সপ্তাহ আগে। বর্ষা নামলেই যমুনা দেবীর নীল শাড়ীতে ছোপ লাগবে ধূসর পাটল গৈরিক রঙের। প্রতি রঙেরই স্বকীয় শোভা আছে, আছে সুর তাল রেশ। কিন্তু নীলের কাছে কেউ নয়। আকাশেও কত রঙই তো ধরে! কিন্তু নীল ছাড়া আর কোন্ রঙে মন ভ'রে ওঠে বলো তো?—শুধায় ও নিজেকেই।

মনে হঠাৎ যেন ভাবের জোয়ার উঠল জেগে। গুনগুন ক'রে ধরল স্বামী কৃষ্ণানন্দের অবিস্মরণীয় কীর্তন:

যমুনে! এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী?
ও যার বিমল তটে রূপের হাটে
বিকাত নীলকান্ত মণি!

দেখতে দেখতে জোয়ার-এ দুলে উঠল বান। ও পকেট ডায়রি খুলে লিখতে ব'সে গেল:

হেথা বেজেছিল তার বাঁশি
এই নীল যমুনার তীরে,
নিতি গাহিত যে: "ভালোবাসি,
তাই যুগে যুগে আসি ফিরে।"
বঁধু, আমরা সে-কথা ভুলি'
আজো কত সুরে উঠি দুলি',
সব চাহি না সঁপিতে প্রেমে
এই নীল যমুনার তীরে।
তুমি ছুঁয়েছিলে লো যমুনা;
তার চরণের বনভূমি,
তাই তোমার নীল করুণা
বুঝি আমরা আদরে চুমি'
সেই সুরে কান পাতি ফিরে
এই নীল যমুনার তীরে!
মন শুনি' বলে কলহাসি':
"আজো বুঝিবি না তুই কিরে—
আলো স্বপন-বাসর-বাঁশি
কালো জাগরে আসে না ফিরে?"
প্রাণ শোনে, তবু শোনে না তো,
বলে: "তারি তরে মালা গাঁথো,
বিনা সে-বনমালীর দিশা
বলো, ফিরিব সে-কোন্ তীরে?"
সে যে বিরহে মিলনমণি,

সে যে মরণে জীবন-ক্ষুধা,
আজো যমুনা কলস্বনী
বহি' তারি অফুরান ক্ষুধা।
সেই সুরে কান পাতি ফিরে
এই নীল যমুনার তীরে।

গানটি বেঁধে বিভোর হ'য়ে তখনি তখনি সুর দিয়ে গাইছে—ঘাটে তখনও স্নানার্থীরা আসে নি—এমন সময়ে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল বাঁদিকে বাঁধানো ঘাটের পৈঠা পেরিয়ে এক গৌরকান্তি গৈরিকধারী বৈরাগী আকণ্ঠ জলে সূর্যের দিকে চেয়ে অঞ্জলি করে জল ছড়াচ্ছে থেকে থেকে। অসিতের বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না যে সে বিদেশী—সম্ভবতঃ ইংরাজ। একটু কৌতূহল হ'ল বৈ কি, কিন্তু ইংরাজেরা সহজে অপরিচিতের সঙ্গে মিশতে চায় না ব'লে অসিত তার দিকে বেশি তাকিয়ে না থেকে, মাথায় তেল মেখে জলে নামতে যাবে এমন সময়ে সে তর্পণ শেষ ক'রে উঠে এল পৈঠা বেয়ে। মাঝপথে দেখা হ'তে সে হেসে নমস্কার ক'রে পরিষ্কার বাংলায় বলল: "আমার তর্পণ আজ ভালো হ'ল না আপনার গানের জন্যে।"

অসিত চমকে প্রতি নমস্কার ক'রে বলল: "মাপ করবেন, আমি জানতাম না আপনি তর্পণ করছিলেন। বলতে কি, আপনাকে প্রথমে আমি দেখিই নি।"

সে হেসে বলল: "জানি। আমি তো ঘাটকে পাশ কাটিয়ে স্নান করি—তাই আপনি দেখতে পান নি। আপনার গানটি বড় সুন্দর।"

"আপনি কি—"

"হ্যাঁ, ইংরাজ—ম্লেচ্ছ। তবে দেহেই। আমার মন হিন্দু।"

"সন্ন্যাসী?"

"হ্যাঁ। নতুন নাম পেয়েছি—প্রেমল বৈরাগী।"

"বেশ বেশ। কিন্তু এত ভালো বাংলা শিখলেন কোত্থেকে?"

"কেম্ব্রিজে এক বাঙালী বন্ধুর কাছে প্রথমে তালিম নিই। তারপর এখানে এসে শিখি কথা বলতে—মা-র কাছে—গুরুমা—তিনি বাঙালী।"

প্রথম দেখায়ই এত কথা! অসিত একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। সন্ন্যাসী হেসে বলল: "অবাক হবার কথা বৈ কি। তবে ঐ যে বললাম—আমি রক্তে বিদেশী হ'লেও মজ্জায় হিন্দু। তাছাড়া গুরুমা আমার সব কুলাচার ভেঙেচুরে দিয়েছেন।"

অসিত আরো আশ্চর্য হল। ইংরাজ যুবক তো ভুলেও এত সহজে আত্মপরিচয় দেয় না। তাছাড়া কেম্ব্রিজের ছাত্র! বলল: "আপনি কেম্ব্রিজে ছিলেন? কোন্ বৎসরে?"

"যে-বৎসরে আপনি ট্রাইপস প্রথম পার্ট পাশ করেন। তাই আপনাকে আমি চিনি।" ব'লেই ফের হেসে: "আমি আপনাদের মজলিসে যেতাম প্রায়ই—শুধু আপনার গান শুনতে।"

অসিতের মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। বলল: "ও, তাই বুঝি তর্পণে মন বসে নি?"

সে হেসে বলল: "না, আরো কারণ ছিল। আমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছে—তাই যতবারই বলি 'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব-পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্'—ততবারই সেই কাঁটাটা খচ খচ করে। কাজেই বুঝুন কেমন বৈরাগী—একটা কাঁটা যাকে এমন পাকে ফেলে।"

"সে কি? কাঁটাটা কি তোলেন নি?"

"না। ফিরে গিয়ে তুলব। ঘাটে আসতেই বিঁধল কি না। বলে না শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি? যমুনার জলে স্নান সেরে তর্পণ ক'রে পুণ্যবান্ হ'য়ে ফিরব ভাবতেই ঠাকুর বাদ সাধলেন কাঁটা হয়ে বিঁধে।"

অসিত হেসে বলল: "আমি শ্যামঠাকুর নামে এক বৈরাগীকে জানি তিনি মজার মজার ছড়া কাটেন। একটি এই:

খুনী হ'য়ে খুন করে শ্যাম, পুলিশ হ'য়ে ধরে চেপে,
পুরুত হ'য়ে বলে: "মাভৈঃ", জজ হ'য়ে দেয়
ফাঁসি ক্ষেপে।"

বৈরাগী একগাল হেসে বলল: "রসুন এ-ছড়াটা আমি মুখস্থ করে নেব। বলুন তো আর একবার। কিন্তু না, আগে স্নান সেরে নিন, আমি অপেক্ষা করছি।"

"কিন্তু কাঁটাটা—"

"ও ফিরে ঘরে গিয়ে তুললেই হবে—আর একটা কাঁটা দিয়ে—কে বলতেন জানেন তো?"

অসিত খুশী হ'য়ে বলল: আপনি 'কথামৃত' পড়েছেন?"

"অনেকবার এ-যুগের গীতা হ'ল কথামৃত—বলেন আমার গুরুমা। বলতে কি, বাংলা শিখেছি আমি কথা-মৃতেরই প্রসাদে।"

"তাহ'লে বলবেন আমাদের। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা ডুব দিয়ে নিই।"

বৈরাগী বাধা দিয়ে বলল: "ওদিকে—বড় বেশি কচ্ছপ। কিছু বলে না বটে—তবু কাজ কি? চলুন ঐ বাঁদিকে—আমি নিয়ে যাচ্ছি। যমুনায় আগে স্নান করেছেন কি?"

"না। আমার দৌড় গঙ্গা পর্যন্ত।"

সে মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলল: "আহা, মা গঙ্গা! ত্রিভুবনতারিণি, তরল তরঙ্গে! তবে গঙ্গাস্নানে সব স্নানেরই ফল পাওয়া যায়।"

"আপনি এ-ও বিশ্বাস করেন?"

"বলি নি যে আমার প্রাণ হিন্দু, দেহ—তবে দেহ তো আমি নই।—কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে আসুন এদিকে—আমি যেখানে স্নান করি। একটিও কচ্ছপ পাবেন না।"

অসিতের আপত্তি সত্ত্বেও বৈরাগী পৈঠার ওদিকে লাফ দিয়ে নেমে সন্তর্পণে তাকে নামিয়ে নিল।

[ক্রমশঃ

বাদল রাত

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য

আকাশে আজ মেঘের মেলা, বিজন চারিধার—
নীরব গৃহতল;
তোমারে তাই খুঁজিয়া ফিরি গহন পথপার—
ঝরায়ে আঁখি জল।
তোমার কত কথা যে আজি
গভীর সুরে উঠিছে বাজি',
সমুখে মোর দুলিছে ঢেউ অকূল তমসার—
বেদনা টলমল্।
আকাশে আজ মেঘের মেলা, বিজন চারিধার—
নীরব গৃহতল।

বাতাসে আজ ঝড়ের সুরে ব্যাকুল দশদিক্—শূন্য পথঘাট;
উদাসী মন হারিয়ে গেছে, নয়ন অনিমিখ্—
নিশীথ কালো রাত
ঝিঁঝির সুর স্রোতের মত
বিরামহীন বহিতে রত,
আকাশে আজ তারার দল করেনা ঝিকিমিক্—
আঁধার শতবাট।
বাতাস বহে ঝড়ের বেগে আকুল চারিদিক—
শূন্য নদীর ঘাট।

কেমন যেন বাদল রাতে পরাণ কা'রে চায়—
আপন করি' তার;
না-বলা কোন্ প্রাণের কথা বলিতে যেন তায়—
বাজায় বীণা তার।
এমনি করি' দু'হাত ভ'রে
সকলি দিতে উজাড় ক'রে
গুণ্ গুণিয়ে মনের অলি প্রেমের গীতি গায়—
স্বপনে অনিবার।
কেমন যেন বাদল রাতে পরাণ কা'রে চায়—
আপন করি' তার।

বুঝিতে পারি কে তুমি যেন এসেছো কাছে মোর—
দেখিতে নাহি পাই;
পরশ তব অঙ্গে লাগে অলখ ফুলডোর—আকুল হিয়া তাই।
আসিলে যদি বলগো কেন
লুকায়ে তবে রহিলে হেন,
বেদনা মম করগো দূর মুছায়ে আঁখিলোর—
তোমারে যেগো চাই।
বুঝিতে পারি কে তুমি যেন এসেছ কাছে মোর—
দেখিতে নাহি পাই।

এমনি করি কত সে দিন চলিব আরো পথ—
পথের নাহি শেষ;
তোমারি দেখা পাবে এ-দীন, পূরিবে মনোরথ—
পরিবে রাজবেশ।
চকিতে জ্বলি' বিজলীসম
দিবে না চোখে গভীরতম,
দাঁড়াবে আসি' জীবন'পরে উদয় উষাবৎ—
নয়নে মোহাবেশ;
এমনি করি' আর কত দিন চলব কত পথ—
চলার নাহি শেষ।

আকাশে আজ বাদলবেলা, মাদল ঘন ঘন—
অথির অমারাত;
তোমারি পথ চাহিয়া আমি খুলেছি বাতায়ন—
আকুল আঁখিপাত।
বারেক লাগি' আসিয়া তুমি
রাঙিয়া যাও এ-পথভূমি,
লভুক মম মলয় তব কোমল পরশন—
ঘুচুক্ অবসাদ।
আকাশে আজ বাদলবেলা, মাদল ঘন ঘন,
অথির অমারাত।
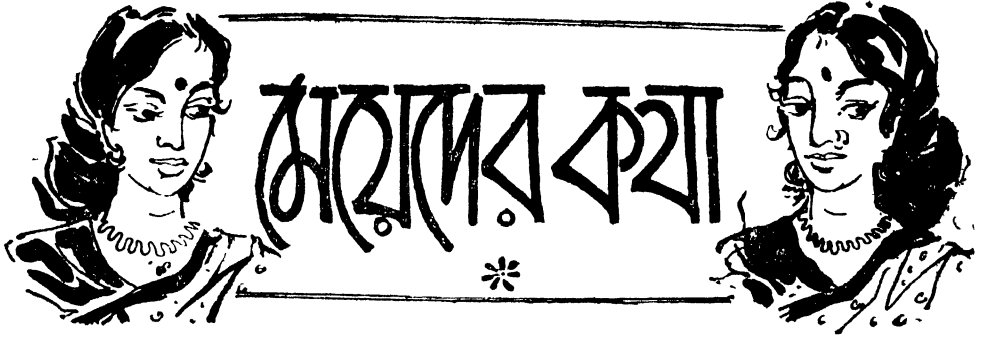
॥ অপরাধ জগতে নারী ॥

একটি মৃত্যুস্বপ্ন বোবা রাতে

জয়শ্রী চক্রবর্তী

সুইট্ বাংলো থেকে শেষ আলোটা নিভে গিয়েছিল।

শেষ রাতের নিষ্প্রভ আলো! প্রায়াসন্ন মৃত্যু প্রতীক্ষিত —ক্লান্ত রোগীর মতই নিস্তেজ নিষ্প্রভ শেষ আলোটার অস্তিত্বটুকু। শ্বাস রুদ্ধ করে অরুণিমা দু'হাতে মুখ ঢেকে ধূসর নিঃসীম অন্ধকার মধ্যে কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে, এক সময় ও পা ফেলে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। অলিন্দে অলিন্দে—সমস্ত প্রাসাদটার অঙ্গন-প্রাঙ্গণগুলো—আয়নার মত মেঝেগুলো মাড়িয়ে এক সময় ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল—শেষ রাতের অস্ফুট একটা যন্ত্রণা শুনে।

চাপা, কি ভীষণ করুণ! অসহায় কাকুতিতে যেন ককিয়ে উঠেছে—সমীরণের রোগার্ত কণ্ঠস্বর।···

"রাত এখন ক'টা? শেষ প্রহর কি ফুরিয়ে আসছে? সমীরণ ব্যাকুলভাবে মাথা নাড়ালো। দু'চোখে সচকিত ভাব এনে, দূরের দিকে চেয়ে ছিল। জানলা খোলা ছিল। শীতের শিশির ঝরা—দমকা বাতাসেও সমীরণ কপাট বন্ধ করতে দেয়নি।

"না না রাণী, আমার ভারি ভুল হ'য়ে যাচ্ছে·· আমি ভুলে যাচ্ছি—পৃথিবীটা এই মুহূর্তে মরে যাবেনা। আমার জগৎ কি আশ্চর্য তার জীবন স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। খুব স্পষ্ট, বুঝলে রাণী? আচ্ছা, এত দূরে দূরে তুমি থাকো যে, তোমাকে ছুঁতেই পারিনা। খুব কাছে পেলে, ভীষণ একটা ইচ্ছে হয়—অনাসক্ত প্রাণটা নিতান্ত যেখানে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, মাঝে মাঝে হঠাৎ তার সচেতন ভাবটা ঝাঁকিয়ে উঠলে ইচ্ছে হয়, বে—শ কাছে, অর্থাৎ খুব কাছে তোমাকে টেনে নিতে। যাতে তোমার মৃদু মৃদু নিঃশ্বাসটাও শুনতে পাই।···তোমার দেহ মনটা—যে দীর্ঘদিন ধরে—আমার কাছ থেকে অনেকটা দূরে থেকে অপেক্ষা করছে—অসহায় আকুলতায়, সেই দেহলতাকে সমস্ত বুকের আলিঙ্গনে বেঁধে নিয়ে আদর করতে পারি ওই স্বেদবিন্দুতে ভরা তোমার সুন্দর কপাল এতই শূন্য লাগে, মনে হয়—এই মুহূর্তে ক্ষণকালের মধ্যে, সিক্ত চুম্বনের রাঙা টিপ পরিয়ে দিই। ইচ্ছে হয়, সাড়া শব্দহীন অসাড় নিরক্ত ঈষৎ চাপা অধরের ওপর—আমার এই রাতের ভালবাসার অনেকখানি নির্যাস দিয়ে—হৃদয়ের আল্পনা আঁকি। খুব সাধ হয় এই পাহাড়ী নির্বান্ধব দেশটা থেকে—আরও বান্ধবহীন বিশাল—শূন্যতার মাঝে ঘর বাঁধি। নিস্তব্ধ নির্জন দেশে সমস্ত নিরাকার শূন্যতার মাঝখানে শুধু আমাদের দুজনের একটা ভালবাসার নিশ্চুপ ছবি নিয়ে ভগবানের তৈরী এই সব সুন্দর দিন গুলোকে

কাটিয়ে দিই তোমাকে নিয়ে এমন ইচ্ছে খুব হ'লে আমার যেন কি হয়! কি হয় জানো? বিবর্ণ এই পীড়িতের শয্যা থেকে উঠে গিয়ে—নিরানন্দের সমস্ত বসন ভূষণগুলোকে ছেড়ে দিয়ে, একটা বিচিত্রতর সুখে, বোধ হয় খুব বড় এক মহাজীবনের সাগরে ডুবে যাই। সে জীবনটা কি জানো! মৃত্যুর কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে জীবনটাকে সত্য জেনে তার সঙ্গে ভারি আনন্দের একটা মিতালী পাতানো। ভাবতে হয়: পৃথিবীটা আমার সমস্ত আশা আনন্দ নিয়ে—একটা সুন্দর জীবন বোধের গল্প লিখতে চাইছে। যে গল্পের নায়ক তার চির সৌন্দর্যের বুকে সুখ আনন্দ, প্রেমকে একটা গভীর সচেতন আনন্দে জাগিয়ে রেখেছে। যার সর্বদা জাগতিক সুখানুভূতিগুলো কোন সংঘাতের আকুলতায় হারিয়ে যায়না।

কি স্পষ্ট, কি জীবন্ত, কি প্রখর সেই জীবনবাদী নায়ক। মৃত্যুর দর্শন নিয়ে তাকে কখনো 'থিসিস' লিখতে বলতে—পাগলের মত হেসে ওঠে। এক মরণ জয়ী দুঃসাহসিক হাসি নিয়ে, শেষে এক জীবন ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে—হঠাৎ বিরতির শেষ পরিচ্ছেদ দেখতে পেয়ে হঠাৎই পালিয়ে আসে—প্রথম পরিচ্ছেদে। সে যেন সাইবেরিয়ার আ-দিগন্ত মরুভূমির বুকে মহাযাত্রার উট চালিয়ে তার দিগন্ত প্রসারি দৃষ্টি—কোন এক সবুজ প্রকৃতি বেষ্টিত জলাশয়ের—দুরন্ত স্বপ্ন দেখে সহসা বালুকা প্রান্তরের নিঃসঙ্গ রাতটুকু অনায়াসে পার করে দিতে পারে।

মরুর রুক্ষতা: অপার শূন্যতা—মরু রাজ্যের মধ্যে হঠাৎ কল্পনা করা কোন রাজকুমারীর মত—শুধু এক অভ্রান্ত সুখ দিতে পারে। সেই আশাবাদী জীবন বোধের নায়ক—যার জীবন ইতিহাসের শেষ পাতা নেই কিংবা সে ছিঁড়ে ফেলেছে—এই সব রোগ, শোক, দুঃখ অনুতাপের—পুরোন পোষাকটা পরে, নিজেকে যে দারিদ্র্যের প্রতিনিধি সাজাতে পারে না। যার কাছে প্রতিবেশী রাজ্যের অনেকের মধ্যে প্রতি মুহূর্তের ভাগ্য বিড়ম্বনার ছবি—এক রূপক সৃষ্টি বলে মনে হয়। শুধু সেই নায়ক অনাবিল সুখ সৌন্দর্যের প্রতিনিধি, রাণী—আমি তার কথা ভাবতে ভীষণ ভালবাসি। তার জন্যে একটা অতিরিক্ত কাতরতা আমাকে পাগল করে। তোমাকে ভালবেসে, আদর করে, চুম্বন করে অসম্ভব এ[illegible] পাগলামী করার ইচ্ছে যেমন করে, তেমনি তাকে নি[illegible] এমনি স[illegible] ইচ্ছাগুলো পূরণ করবার জন্যে, আ[illegible] সহসা এমন কি সময় অসময়ে, দুরন্ত পাগলামী আসে···

উন্মাদ হলে, যে ভয়ঙ্কর ক্ষুধা আসে, যা সমস্ত চি[illegible] বিবেক, বিবেচনাকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিয়ে, তার আ[illegible] স্বীকৃতিকে প্রাধান্য দিতে চায়—আমার সেই রকমই [illegible] থেকে থেকে···

অরুণি, কোন কোন দিন মাস ফুরিয়ে গেলে, ক্যাল[illegible] ণ্ডারের বিবর্ণ পাতাটা ছিঁড়ে দাও। তোমার হিসে[illegible] মনটা সচেতন হ'য়ে ওঠে—বছর ফুরিয়ে আসার দিকে আশ্চর্য! ভুলেও তোমার হাত কাঁপে কিনা (হয়তো বুক কাঁপেনা কে জানে ঈশ্বর তোমার মত নারীর বুকে পাথ[illegible] রের মত প্রাচীর তুলেছে কিনা) দেখে দেখে কত সম[illegible] তোমাকে নিষ্ঠুর মনে হয় এই রোগাতের মৃত্যু শান্তির জন্য কোথায় যেন তোমার একটা দুঃসহ প্রতীক্ষা চলেছে। এই প্রায়াসন্ন মৃত্যু ঘরের ভয়ঙ্কর বা[illegible]সটাকে আর নিতে পারছ না। তাই শেষ পরিণতির কথা চিন্তা করতে তোমার সাধ হয়, আমার কিন্তু তখনই কষ্ট হয় আর তখনই কাশিটা বাড়ে। যেটা বেশী হলে, আমার দেহের শেষ রক্ত বিন্দুটা পর্যন্ত বেরিয়ে যেতে চায়। বিক্ষত বুকের দু পাশে টিউবার কুলোসিসের ভয়ঙ্কর জার্মগুলো রাক্ষুসে ক্ষুধা বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চায় অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত দেহটা কুঁকড়ে ওঠে। শিরা উপশিরার জটিল গ্রন্থিগুলো প্রচণ্ড শক্তির ধাক্কায় ছিঁড়ে যেতে চায়। দ্রুত এবং অস্থির শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রটা তার শিথিল অস্তিত্বে ঘুমিয়ে আসে। তখন আমার সমস্ত বিশ্বাস, এই পীড়িতের শয্যাপাশে, তার নিভন্ত প্রায় প্রদীপের শেষ শিখাটুকু—শেষ আশাটুকু শেষ ভাবনাটুকুও—অলক্ষ্যের অতীতে মুছে যায়। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—তার চিহ্নটুকু! আমার অত্যন্ত ভাললাগা সেই জীবনবাদী নায়কের—মনোময় গল্পটি ভুলে যাই। তখনই মনে হয় তোমারই নিজের হাতে বন্ধ করা দরজাটা অজানিতে সহসা খুলে গেছে। তুমি যেন ঘুমিয়ে পড়ে আছো—কোন এক শিশুর মত। যে বেরিয়েল গ্রাউণ্ডে খেলা করতে করতে এক সময়—অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ে আছে। যে মাটিটার নীচে—

অসংখ্য ঘুমের কফিন সাজানো আছে। অনেক মৃত্যু-শয্যার ওপরে—তোমারও ঘুমের শয্যাটি তৈরী হয়েছে।

আমি দেখতে পাই—এই মেঝের ওপর শুয়ে—কত সময় তোমার সমস্ত দেহটা অচৈতন্য আকৃতিতে পড়ে আছে। প্রাণের ক্ষুধা কোন অব্যক্ত অন্ধকার কারায় বন্দীত্ব ভোগ করছে। আমার শয্যা থেকে বেশ দূরে তোমার শয্যা পাতা হয়, সেখানে তোমার শরীরটার দিকে চেয়ে দেখেছি—চুলে তোমার চিরুণী পরেনা সিঁথির সিঁদূরে রক্ত রঙটা ফিকে হ'য়ে গেছে। যে সুন্দর মুখে মিষ্টি একটা হাসির রেখা টানা থাকতো—যেটা আমার অসুখ হ'বার পর থেকে মুছে গেছে অযত্নে, সেই অবিন্যস্ত চুলের গোছা পড়ে থাকে, তোমার আধখানা ঢেকে রাখে আর বাকি অর্দ্ধেক মুখে সমস্ত পরিণতির জন্য পরম নিশ্চিন্ত হবার প্রশান্তিটুকু লেগে থাকে—তথাপি অযত্ন কেশের ঘন গুচ্ছে সিঁথিতে—পলাশ ফুলের রাঙা পাপড়ি-গুলো বিবর্ণ হয়ে ছড়িয়ে থাকে যেটা দেখলে, তোমার অবচেতন মনের আশাটা ধরা পড়ে—তখন সত্যিই মমতা হয় ভীষণ। আমি তখন সিঁদুর মাখা মলিন রক্তাক্ত এক সধবা বধুকে দেখতে দেখতে সহসা সেই খুলে যাওয়া দর-জার দিকে তাকাই। অন্ধকারে একটা অস্পষ্ট আকার যেন দাঁড়িয়ে থাকে। যার—মুখ চোখ হাত পা কিছুই ঠাহর করা যায় না। সমস্ত অবয়ব যার—অন্ধকারে অবলুপ্ত অবসন্ন হ'য়ে আছে তার একটা অসহায় নির্বোধ শূন্যতা খোলা দ্বারে এসে পথ খোঁজে, যার উপস্থিতি অনুক্ষণ টের পাই, সহসা শঙ্কা হয়, সহসা তখন সভয়ে চেয়ে দেখি সেই সধবার সিঁথিবনে আগুনধরা পলাশ ফুল, তখন আমি চিৎকার উঠতে গিয়ে প্রবল কাশির দমকে ফেটে পড়ি যখন সেই মল্লিক রাজার তৈরী এই পাহাড়ী প্রদেশের সুইট বাংলোটা আমার অসহায় কাতরোক্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে—এই প্রাসাদ পুরী তখন অরুণিমা, আমার বুকের সমস্ত রক্ত যেন বেরিয়ে এসে এই মৃত্যুভীত কক্ষটার শ্বেত মেঝেটাকে আহত রক্তাক্ত সৈনিকের মত সাজিয়ে দেয়···তুমি ভয় পেয়ে ছুটে আসো। সভয়ে দুচোখ তোমার নীল হয়ে ওঠে। পীড়িতের শয্যাপাশকে সবলে আঁকড়ে বোধ হয় পরিণতির শেষ দৃশ্যটার কথা ভাবো। আমার তখন ছুঁতে ইচ্ছে করে তোমাকে। তাই কেন ? এই পাগলামীর ইচ্ছায় নিজেকে হারিয়ে ফেলতে সাধ হয়। কিন্তু নিষেধ! নিষেধকে মান্য করে করে তাকে আর অমান্য করতে পারিনা। বিশেষতঃ আমার রাণীকে, রাজার সর্বস্বত্ব বিকিয়ে দেওয়ার কাঙাল সাজার যে সুখময় ভূমিকা নিয়েছিলাম এই মুহূর্তেই, তার রূপ বদলাতে পারিনা।

তবু, নিষেধ ছিল। যখন আমার জন্যে এই শয্যাটি তৈরী হ'য়েছিল—ডাক্তার যখন মাত্র অল্প দিনের কথা বলে ভরসা দিয়েছিলেন, টিউবার কুলোসিসের ভয়ঙ্কর ভয়াবহতাকে যদি নিরাময় করে তোলা যায় মাত্র অল্প দিনের মধ্যে, অর্থাৎ নিরাময়কের (ডাক্তার, যিনি ঈশ্বরের মতন) ধারণা ছিল, বছরখানেক পরেই আমার রোগমুক্তি ঘটবে। আমার সেই অত্যন্ত সুখকর জীবনকে আগের মতই—অনাবিল আনন্দে কাছে পাব। আমার সদ্য রচিত সংসার—আমার নব বিবাহিত জীবনের সেই প্রেয়সীকে—অর্থাৎ তোমাকে। বিয়ের পর মাত্র দু' বছরে—যে বুকটার মধ্যে তৈরী টিউবার কুলোসিস জার্মের বাসাটা জানা গেল, যেদিন থেকে আমার শয্যাটি এই ভাবে তৈরী হোল, এই রকম একটা ক্লান্ত জীবন ইতিহাস, একদিন ভেবেছিলাম সেটা চিরদিনের নয় —কিন্তু দীর্ঘ দিন কেটে গেল—সুদীর্ঘ চার বছর প্রায় অতিক্রান্ত। এখন সেই ঈশ্বরের মতন ডাক্তার—নিতান্তই ক্লান্ত। সমস্ত প্রতিশ্রুতি তার ম্লান। এখন আমার চার ধারটা অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে··জানলা খুলে রেখে এই শীতার্ত দিনেও আলোর প্রার্থনা নিয়ে কাঙালের মত বসে থাকি—যখন তোমায় ক্যালাণ্ডারের পাতাটা ছিঁড়তে দেখি। যখন তোমার মুখে শেষ পরিণতির প্রতীক্ষা দেখি আমার তখন দু'চোখ, চার পাশের অন্ধকারে হারিয়ে যায় ···আলোর প্রার্থনাটুকুও অবশেষে মুছে যায় নিঃশেষে! বুকের একান্ত সেই দুরারোগ্য ব্যাধির বৈধব্য ব্যথা—আস্তে আস্তে আমাকে যেন কোথায় ঠেলে দেয়।···

* * * *

রক্ত! রক্ত! রক্ত! দেখতে দেখতে অরুণিমার দু'চোখ ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছিল। সমীরণের প্রতিদিনের অসহায় প্রলাপগুলো শুনতে শুনতে সে পাগল হ'য়ে যাচ্ছিল। আশ্চর্য, সে চলে যাবে ঠিকই কিন্তু না যাওয়া পর্যন্ত, এই সব রক্তাক্ত কাণ্ড কেন? ডাক্তার নিশ্চয় বিধাতা নয়?

নিশ্চয়ই সে বিধাতার ওপর খবরদারী করতে পারে না। যা পারে সেই ঈশ্বরের পুত্র, তাই সে করেছে। আন্তরিক ভাবে—পরিপূর্ণ প্রাণে। কিন্তু যার প্রাণের উৎস হারিয়ে যাচ্ছিল—ধীরে ধীরে ক্ষয়রোগের যে রকম ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল—তখন ডাক্তারও সভয়ে দেখেছিলেন রোগীর মুখ। তার নির্ভরতাহীন দৃষ্টি! শুধু তার সেই থমথমে ভারাক্রান্ত চোখের নীচে অত্যন্ত দুরাশার একটা ভংগিমা ছিল—নিঃশব্দ সঞ্চারে। তখনই অরুণিমা নিশ্চিত হ'য়েছে, রক্তাক্ত কোন অপরাহ্নের বিদায়ী সূর্যটার দিগন্তে মিলিয়ে যাবার দৃশ্য দেখে সে বুঝেছে—এমনি আরো রক্ত রঙ্ ছড়াতে ছড়াতে সমীরণও অবশেষে বিদায় নেবে।

তাই ও ক্যালাণ্ডারের পাতাগুলো একের পর এক ছিঁড়ে চলেছিল। পাহাড়ী নির্জন প্রদেশের উপকণ্ঠে, সেই মল্লিক রাজার তৈরী সুরম্য প্রাসাদপুরীতে—শীতার্ত বাতাস রাতের প্রহরে প্রহরে চম্‌কে উঠেছে, তখন অরুণিমা দেখেছে—সমীরণ এক মুহূর্তও ঘুমতে পারে না। যন্ত্রণা দিচ্ছিল শুধু শুধু দেহের? এই সব রক্তাক্ত বীভৎস কাণ্ডগুলো কি ঘটছিল, শুধু দেহের ওপর দিয়েই? অরুণিমা বুঝেছিল মনের সবাংশেও যে অসহনীয়তা প্রকাশ পাচ্ছিল, তা সমীরণকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেবার জন্যে…

তাই ভয়াবহ রক্তাক্ত কাণ্ডগুলো আর চোখের সহ্য করাও যখন কষ্টকর হচ্ছিল, ক্রমশঃই দুঃসহ যন্ত্রণায় অরুণিমা কাটা জন্তুর মত কাতরাচ্ছিল, আর তখনই সে সব কিছুর প্রতিকার চেয়েছিল। অরুণিমা আর দেখতে পারছিলনা সমীরণের কষ্ট! এই ভয়ঙ্কর রক্তস্রোত। আর কিছুতেই শুনতে পারছিলনা মৃত্যু প্রতীক্ষিত একটি মুমূর্ষুর সেই সব প্রলাপন। সেই জীবনবাদী নায়কের গল্প শোনাতে শোনাতে সমীরণ ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলতো। বলতো, রাণী জন্মান্তরবাদকে স্বীকার কর? অরুণিমা ঠোঁট কাঁপিয়ে, ভীরু চোখে যেন চেয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করতো—'না, কিছু জানিনা।'—'মানোনা?'

সমীরণ চোখে চোখে চেয়ে হয়তো বোঝাতে চাইতো, হয়তো নিজেকে সান্ত্বনা দিতো, একটা মৃত্যু তো শুধু! তারপরই তো আবার নব জন্ম। সে দিন খুব সুখে যাবে বুঝলে রাণী?

তারপর কাশতে কাশতে সমীরণ বুক চেপে ধরতো। মুখ চেপে ধরেও অরুণিমা ওর রক্ত বমন থামাতে পারতো না। রক্তময় হ'য়ে যেতো ওর দু'টি হাত। জলে জলে, দু' চোখ যেন সমুদ্র হ'য়ে যেতো, ভাবতো, আর নয়…

"এবার ঈশ্বর তুমি ওকে মুক্তি দাও—শান্তি দাও। আমার সামনে থেকে এই রক্তাক্ত মূর্তিটা সরিয়ে নাও। …আমি আর এই যন্ত্রণা সইতে পারছি না।" অরুণিমার এই প্রার্থনা ছিল প্রতিদিনের প্রায়াসন্ন এক মৃত্যুযাত্রীর সামনে সে চুপি চুপি জানাতো—আমি আর ঐ ভাবে তোমাকে দেখতে পারছি না তার চেয়ে বিধাতা আমার জিনিস কেড়ে নিয়ে যাক। আর যাবেই যখন, এত দেরী কেন? আমি আর সহ্য করতে পারছি না কিছুতেই!… বলতে বলতে অরুণিমা সমীরণের গলদেশ দু'হাতের মধ্যে জড়িয়ে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠেছিল, তারপর?… তারপর কি ভয়ঙ্কর কাজই না ও' করে ফেললো। সেই বড় স্নেহে জড়ানো হাত দুটো ভীষণ কঠিন শক্ত হয়ে উঠলো—। চোখের জল মুছে গেল—চোখ যেন আগুনের ভাঁটা।…মনে মনে বিধাতাকে বলে উঠে—'তোমার জিনিস তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি…আমার নয়!'

সেই শক্ত কঠিন হাত দুটো সহসা চেপে বসে গেল সমীরণের কণ্ঠদেশে। সবশক্তি দিয়ে—সমীরণের ক্ষীণ আর্তনাদটুকু একেবারে বন্ধ করে—এক সময় ও' শ্রান্ত হয়ে পড়লো।…পর মুহূর্তে সমীরণের দুর্বল দেহটা নিস্তেজ হয়ে উঠলো। অরুণিমা তখন তার দু'হাত সরিয়ে নিয়েছে—দু'হাতে মাখা রক্ত। সেই রক্ত হাতে—সমীরণের গায়ের চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে দিল। ওর নাসারন্ধ্রের কাছে নিজের কান দুটো নিয়ে গিয়ে বুঝতে পারল—সব শেষ।

শেষ রাতের আলোটা তখনই নিভে গিয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অরুণিমা প্রাসাদের—চারপাশে ছুটে বেড়াতে থাকে…বাড়ীর লোকজন, চাকর বাকর সবাইকে ডেকে তোলে ওর রক্ত রঞ্জিত হাত দু'টিকে দেখিয়ে বলে—'এই হাতে স্বামীকে নিশ্চিন্তে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি… তোমরা গিয়ে দেখে এসো সবাই…বলতে বলতে আনন্দে হাসিতে ফেটে পড়ে। রাতের প্রাসাদ কেঁপে ওঠে। লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় সমীরণের ঘর।…রক্তাক্ত সমীরণ ঘুমিয়ে আছে—মুখ তার বীভৎস…দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে—সম্পূর্ণ জিভটা। ভয়াবহ তার ঘুমন্ত রূপ।

*　　*　　*

আদালতে শেষ পর্যন্ত এক উন্মাদিনীকে ধরে আনা হোল। নরহত্যার দায়ে অভিযুক্তা—সেই নারী। বিধাতার দরবারে স্বামীকে পাঠিয়ে দেবার জন্য—যে অভিনব কাণ্ডটি করেছিল—তার বিরুদ্ধে বিচার স্থগিত রাখা হোল।

ভয়ঙ্কর সেই উন্মাদিনীকে মেণ্টাল হসপিটলে পাঠাবার ব্যবস্থা করলো আদালত।

সেখান থেকে আর ফিরে আসেনি সে। অল্পদিনের মধ্যে অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় তার মৃত্যু হয়।

জানিনা, বিধাতার সংসারে গিয়ে সে তার স্বামীকে দেখতে পেয়েছে কিনা।

সুপর্ণা দেবী

মুখের শ্রী ও শোভা অটুট-অক্ষুণ্ণ রাখা এবং অকালে দু'ভাঁজ চিবুকের আবির্ভাব ও কণ্ঠের কমনীয়তা বিনষ্ট হওয়ার উপসর্গ থেকে রেহাই পেতে হলে, আধুনিক রূপচর্চ্চা বিশারদেরা বিশেষ ধরণের যে সব ব্যায়াম অনুশীলনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন, ইতিপূর্ব্বেই সে সম্বন্ধে মোটামুটি আভাস দিয়েছি। প্রসঙ্গক্রমে এবারেও তেমনি ধরণের আরো দুয়েকটি ঘরোয়া ব্যায়াম ভঙ্গীর হদিশ দেওয়া হলো।

পাশের ৫নং ছবিতে যে ব্যায়াম ভঙ্গীটির নমুনা দেখানো হয়েছে, যাঁদের চিবুক দো-ভাঁজ (doublechin) এবং কণ্ঠ বিশ্রী বেয়াড়া ছাঁদের, নিত্য নিয়মিত এ ব্যায়াম

অনুশীলনের ফলে, তাঁদের সে বিকৃতি মোচন করা যেতে পারে। এ ব্যায়াম ভঙ্গী অনুশীলনের রীতি হলো,—কৌচে, খাটে, বেঞ্চিতে কিম্বা তক্তাপোষের উপর সটান চিৎ হয়ে শুয়ে, হাত দু'খানি দেহের দুই পাশে সোজাসুজি ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে, মাথাটি শয্যার প্রান্ত-সীমায় বিন্যস্ত করে উপরের ৫নং ছবির ভঙ্গীতে অর্থাৎ, ঘাড়ের কাছ থেকে দেহাংশটিকে ঝুলিয়ে দিন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের ও প্রশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মাথা সমেত ঘাড়টি যতখানি সম্ভব কয়েকবার তোলা-নামা করুন। সামনের দিকে মাথা-তোলার সময় এমনভাবে মাথাটিকে উঁচু করবেন যে চিবুকের প্রান্ত ভাগ যেন কণ্ঠ-বিবর স্পর্শ করে। তারপর মাথাটিকে আবার পিছনে…অর্থাৎ, নীচের দিকে নামিয়ে নেবেন। এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি অভ্যাসের সময়, ধীরে ধীরে ও খুব মৃদুভাবে এমনিভাবে মাথাটিকে তোলা-নামা করবেন যে ঘাড়ে আর গলায় যেন চাড় পড়ে। নিত্য নিয়মিতভাবে অন্ততপক্ষে, পাঁচ মিনিটকাল এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি অনুশীলন করা দরকার এবং ব্যায়ামের সময় চোখ দুটি বরাবর খোলা রাখা চাই।
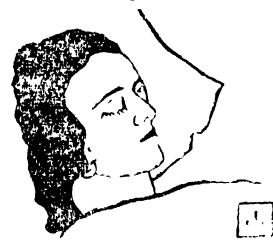
উপরের ৬নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, দো-ভাঁজ চিবুক এবং কুশ্রী কণ্ঠের বিকৃতি সংশোধনের পক্ষে এমনিভাবে শয়ন পদ্ধতিটিও বিশেষ উপযোগী। অনেক সময়

শক্ত উঁচু বালিশে মাথা রেখে শয়নের দোষে ঘাড় ও চিবুকের প্রান্ত অস্বাভাবিক ধরণে বেঁকে এবং ঝুঁকে থাকার দরুণ মুখের শ্রী ও গড়ন বিকৃত হয়ে ওঠে। কাজেই মুখের গড়ন, শ্রী-সৌন্দর্য্য যথাযথভাবে বজায় রাখতে হলে, নরম এবং নীচু বা পাতলা বালিশ মাথায় দেওয়াই ভালো। এমন কি অভিজ্ঞ বিচক্ষণ একালের অনেক রূপচর্চ্চা বিশারদেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে শয়নকালে যদি বালিশ আদৌ মাথায় না দেওয়া হয়, তাহলে ঘাড়, গলা বা চিবুকের গড়ন কখনোই বিকৃত হবে না এবং মুখের শোভা-শ্রীও সুদীর্ঘকাল অটুট-অক্ষুণ্ণ থাকবে। কাজেই নিত্য-নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা ছাড়াও, শয়নকালে এ সব ব্যবস্থা-বিধির দিকেও সচেতনদৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

আপাততঃ, এই পর্য্যন্তই। আগামী সংখ্যায় বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে রূপ চর্চ্চা প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক বিশেষজ্ঞদের আরো কয়েকটি সুচিন্তিত অভিমতের মোটা-মুটি পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

কার্পেট আর ক্রশ-ষ্টিচ, সূচী-শিল্পের নক্সা-নমুনা

হিরণ্ময়ী দেবী

ঘর-সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে, মহিলাদের অনেকেরই বিশেষ আগ্রহ—নানা রকম সৌখিন-সুন্দর সূচীশিল্প সামগ্রী রচনার দিকে। তাই এবারে সূচীশিল্পানু-রাগিণী মহিলাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, ক্রশ্-ষ্টিচ্ সেলাইয়ের কাজ আর কার্পেট বোনার উপযোগী নতুন-ধরণের একটি নক্সা-নমুনার প্রতিলিপি প্রকাশ করা হলো।
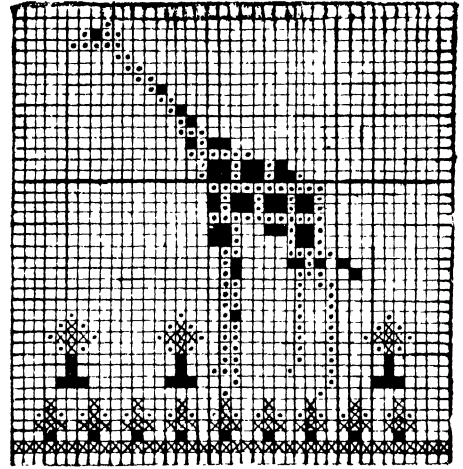
উপরের ছবিতে জংলী ঝোপের মাঝে দাঁড়ানো জিরাফের যে 'আলঙ্কারিক নক্সাটি' (Decorative Motif) দেখানো হয়েছে, কার্পেট-বুনে কিম্বা ক্রশ্-ষ্টিচ্ সেলাইয়ের কাজ করে সৌখিন সুন্দর ছাঁদে মানান-সই রঙীন কাপড়ের বুকে সেটিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা এমন কিছু দুঃসাধ্য কঠিন বা ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়।

ক্রশ্-ষ্টিচ্ সেলাইয়ের কাজের সময়, নক্সাটি কাপড়ের উপর ফুটিয়ে তোলার আগে—যেখানে নক্সা রচনা করবেন, সেইখানে এক-টুকরো কার্পেট বা এমব্রয়ডারী ক্যানভাস-জাতীয় বিশেষ ধরণের কাপড় আটকে নেবেন এবং কাপড়ের সঙ্গে সেই টুকরোটির চারিধার সুতো দিয়ে টেঁকে সেলাই করে নিয়ে কার্পেটের টুকরোর উপর নমুনা-অনুসারে যথাযথভাবে বিভিন্ন রঙের রেশমী (Silk) বা পশমী (wool) সুতো (chord) দিয়ে একের পর এক 'ঘর' গুণে গুণে—অর্থাৎ, যেমন পদ্ধতিতে কার্পেট বোনেন, ঠিক তেমনি পদ্ধতিতে নক্সাটিকে আগাগোড়া রচনা করবেন। এইভাবে সম্পূর্ণ নক্সাটিকে রচনার পর সূচীশিল্পের কাপড়ের সঙ্গে কার্পেটের টুকরোটি জোড়া লাগানোর জন্য চারিধারে সুতো টেঁকে যে সেলাই দিয়েছিলেন, সেই সেলাইটি নিখুঁতভাবে কেটে ফেলবেন। অতঃপর একটি একটি করে কার্পেটের সুতোগুলি—অর্থাৎ, যা দিয়ে কার্পেট তৈরী,

সেগুলিকে টেনে নিন…সদ্য-বোনা নক্সার সুতোগুলি হয়ত এই টানাটানির ফলে, সামান্য আলগা-ঢিলা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু কার্পেটের সমস্ত সুতো খোলা হয়ে গেলে, কাপড়ের বুকে ক্রশ্-ষ্টিচ সেলাই দিয়ে রচিত নক্সাটির উপর যদি ঈষৎ-তপ্ত ইস্ত্রী চালিয়ে দেন, তাহলেই সুতো আবার সুন্দরভাবে যথাস্থানে চেপে বসবে।

প্রসঙ্গক্রমে, বলে রাখা যায়—এই ধরণের ক্রশ্-ষ্টিচ সেলাইয়ের কাজ অবশ্য অন্যান্য কাপড়ের উপরেও করা চলে, তবে সেগুলির চেয়েও আরো বেশী উপযোগী হবে—'এম্-ব্রয়ডারী ক্যানভাস' নামে মোটা ধরণের বিশেষ এক জাতীয় কাপড়।

রঙ-বেরঙের পশমী সুতোর সাহায্যে এ সব নক্সা বুনতে হলে, থাপি-মজবুত ধরণের ভালো কার্পেট ব্যবহার করাই সমীচীন।

উপরের নক্সা-নমুনা অনুসারে জিরাফের প্রতিলিপি রচনার জন্য—যে সব রঙের সুতো ব্যবহার করা দরকার, এবারে তারই মোটামুটি হদিশ দিই। জিরাফের চেহারাটি রচনা করবেন—গাঢ় হলুদে (deep yellow) বা সোনালী হলুদ রঙের (golden yellow) রেশমী বা পশমী সুতো দিয়ে এবং মাঝে মাঝে নক্সার যে সব 'ঘর' কালো রঙে চিহ্নিত, সেই সব অংশের জন্য ব্যবহার করবেন হাল্কা বাদামী (light brown) রঙের সুতো। জমির ঘাস আর গাছের পাতা—অর্থাৎ, উপরের নক্সানমুনার '×' চিহ্নিত 'ঘরগুলি' রচনার জন্য বেছে নেবেন ফিকে-সবুজ (light green) এবং গাঢ় সবুজ (deep green) রঙের রেশমী কিম্বা পশমী সুতো। গাছের ডাল রচনা করবেন—গাঢ় বাদামী (dark brown) রঙের সুতোয়। উপরের নক্সানমুনার 'পশ্চাৎপট' (background) রচনার জন্য—ফিকে-আসমানী (light blue) কিম্বা ফিকে গোলাপী (pink) অথবা সাদা রঙের সুতো বেছে নেওয়াই ভালো। এই নিয়মে 'ঘর' গুণে গুণে বিভিন্ন রঙের সুতো দিয়ে বুনলে, অনায়াসেই উপরের নক্সা-নমুনার ছাঁদে জংলী ঝোপের মাঝে দাঁড়ানো ঐ জিরাফের প্রতিলিপি রচনা করা যাবে।

আগামী সংখ্যায় কার্পেট ও ক্রশষ্টিচ সেলাইয়ের কাজের উপযোগী আরো কয়েকটি সৌখিনছাঁদের নক্সানমুনা প্রকাশের চেষ্টা করবো।

সুন্দর বন

শ্রীব্রজগোপাল বিশ্বাস

অসূর্য্যম্পশ্যা সুন্দরী !
ক্ষণেকের দরশন নাহি পায় আলো-কণা,
সমীরণ-পরশনে চলে কত আলোচনা,
কাঁপিয়ে গহন বন।
দুকূল ছাপিয়ে উঠে জোয়ারের লোনা-জল
ধুয়ে যায় বনানীর পদতল ;
পরশ করিতে চায় নিবিড় মেখলা হ'তে
লতিকার মালা-গাঁথা ফুল-দল।
অসূর্য্যম্পশ্যা সুন্দরী !
তারে ঘিরি' নিশিদিন ধরি'
গড়িয়াছে অন্তঃপুর লতা-গুল্মে সুশোভন
পশুর-কাকড়া-বা'ন—কেওড়া-গজ্জন—
গরান-সিংড়া গেওয়া-গামুর
হাত ধরাধরি করি' বহুদূর।
ঝড়-বজ্র-দাবানল ব্যাধি-জরা
স্থির করে বনানীর সেনানীর বাঁচা-মরা।
মানুষের গড়া বিধি সবার উপরে।
"অকালে কে প্রাণ দেবে জাতি ও দেশের তরে"
মানুষেই লিখে দেয় লৌহ-লেখনী ঠুকে
কাকড়া-পশুর-বা'ন গেওয়া কেওড়া-সুন্দরী বুকে।
যবে আকাশের দেহ ঘামে
ধরা-পরে ঝর্‌ঝর্ ধারা নামে,
আমরা তখন চড়ি উচ্চশির তরু-শাখায়।
আঁধার মাথায়
তার যত কালি জমা ছিল গোপন ভাণ্ডারে।
ফুলে উঠে জোয়ারের জল গ্রাসে চারিধারে।
অনধিকার প্রবেশ দোষে,
চারিদিক হ'তে বিভীষিকা যুদ্ধ ঘোষে ;
মশা আর বেড়েপোকা রক্ত চোষে ক্ষুব্ধ রোষে,
রুখে আসে বিষ-পিপীলিকা
নিষ্ঠুর সেনার মত। মাটী নাহি যায় দেখা
সব জলে জলময়।
আঁধার জমাট হয়।
হাঙর কুমীর আসে সাথে ক'রে কা'ন-মাছ
—কাঁটায় সাপের বিষ, সাপেরা জড়ায় গাছ ;
বাঘ ডাকে—মিশে যায়
হরিণের চীৎকার মৃত্যুর যন্ত্রণায়।
সুন্দরী সুন্দর বন তবু শোভা পায়।

আলেয়ার আলো
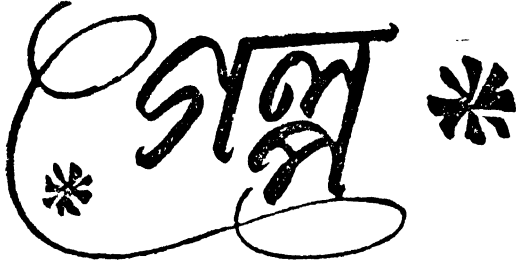
অরুণ দে

বোনের কথা শুনে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন রঞ্জনবাবু। তার ছোট বোনের কাছে এমন উত্তর তিনি আশা করেন নি। যে মেয়ে সাত চড়ে রা করেনা তার মুখে এতবড় কথা! কি হল মেয়েটার? "না" বলার এত শক্তি পেল কোথায়? গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, "আমি যে কথা প্রায় পাকা করে ফেলেছি।"

"তা হোক। আমাকে মাপ কর।" বলল চন্দনা।

"কেন?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন রঞ্জনবাবু।

কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল চন্দনা। উত্তর না পেয়ে রঞ্জনবাবু আবার বললেন, "বিয়ে করবি না কেন?"

"এমনি", ছোট করে জবাব দিল চন্দনা। কি একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন রঞ্জনবাবু। ছোট বোনের আনত মুখের দিকে তাকিয়ে তার মায়া হল। বাপ-মা মরা মেয়েটাকে তিনি বোনের মত নয় নিজের মেয়ের মতই মানুষ করেছেন। বাবার অভাব যাতে বোন অনুভব না করে সে জন্য বড় ভাই হিসাবে কোনদিনই তার চেষ্টার অভাব ছিল না। চন্দনার কোন ইচ্ছাতেই তিনি কোনদিন বাধা দেন নি। বরং প্রয়োজনের অতি-রিক্ত যত্নেই মানুষ করেছেন। অবশ্য চন্দনাও চিরকাল তার স্নেহের মর্যাদা রেখেছে। দাদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেও কোনদিন কোন কাজ করে নি। মায়ের অভাবও সে তার সেবা দিয়ে অনেকটা পূরণ করেছে। চন্দন তো চিরকাল নম্র এবং শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু আজ তার একি হোল! এমন স্পষ্ট করে দাদার কথার উপর "না" বলল কি করে!

চন্দনার কাছে আর একটু এগিয়ে গেলেন রঞ্জনবাবু। আনত মুখটা তুলে ধরে কোমল স্বরে বললেন, "আমার কাছে লুকোস না। কি হয়েছে বল?"

চন্দনা কি একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। রঞ্জন-বাবু আবার বললেন—"বড় হয়েছিস, বিয়ে দিতে হবে না? পাত্রপক্ষ যে জ্বালিয়ে মারছে। আমার বোনের মত সুন্দরী লাখে একটা মেলে।"

ঠিক সেই সময় "আসতে পারি?" বলে ঘরের পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করল চন্দনার বন্ধু মৃদুলা। হিল তোলা জুতোয় খুট খুট আওয়াজ করতে করতে এগিয়ে এল। তার প্রসাধনলিপ্ত গালে লাল আভা। ঠোঁটে লিপষ্টিক। চোখের কোণায় কাজলের রেখা। নাইলনের নীল শাড়ীর সঙ্গে লাল ব্লাউজ। হাতে ছোট ভ্যানিটি ব্যাগ।

তাকে পেয়ে চন্দনা যেন বেঁচে গেল। এগিয়ে গেল তার দিকে। মাথাটা একটু হেলিয়ে, ব্যাগটা দুলিয়ে মৃদুলা বলল, "কি ব্যাপার বল তো? আজ ক্লাবের মিটিং অথচ তোর পাত্তা নেই?

এদিকে সেই ভদ্রলোক—

চোখ দিয়ে ইসারা—করল চন্দনা। দাদার দিকে দেখাল। নিজেকে সামলে নিল মৃদুলা। রঞ্জনবাবুর দিকে ফিরে বলল "কি ব্যাপার রঞ্জনদা? আপনাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?"

মৃদু হেসে রঞ্জনবাবু বললেন, "গম্ভীর কোথায়? আসলে আমার মুখটাই এই রকম। তবে আপাতত একটু চিন্তায় পড়েছি।"

"কেন, চিন্তা কিসের? আপনার চামড়ার ব্যবসা ভাল চলছে না বুঝি?" বলল মৃদুলা।

"না তা নয়। তোমার বন্ধুর বিয়ে ঠিক করেছিলাম কিন্তু চন্দনা বিয়ে করতে চাইছে না।"

"কেন?"

"কি জানি। তা জানতে পারলে না হয় যা হোক

একটা ব্যবস্থা করা যেত। দেখো তো, তোমার বন্ধুর কাছে কারণটা জানতে পার কিনা ?”

“ও এই। মেয়েদের বিয়ে নিয়ে আজকাল লোকে মাথা ঘামায় নাকি ?—আপনি একেবারে সেকেলে।”

“না, মানে…।”

“মানে খুঁজতে হবে না। আমি দেখছি।”

রঞ্জনবাবু ঘর থেকে চলে গেলেন। মৃদুলা বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, “দাদাকে বললেই পারতিস। ভয় কিসের ?”

“বলা যায় না কি ? হ্যারে, আজ মিটিংএ এসেছিল ?” বলল চন্দনা ?

“না এসে উপায় আছে ? বেচারার অবস্থা দেখে আজ আমার মায়া হল। তুই তো দেখলাম ভদ্রলোকের মাথাটা একেবারে চিবিয়েছিস।”

“কেন ?”

“নইলে এমন অবস্থা হয়। কোথা থেকে যেন শুনেছে যে তোর বিয়ে। মিটিং থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে হাজারবার জিজ্ঞেসা করল খবরটা সত্য কি না।”

“তুই কি বললি ?”

“বললাম সব সত্যি। ভয়ানক সত্যি।”

“শুনে কি বলল ?”

“কি আর বলবে ? মুখের এমন অসহায় করুণ ভাব করল যেন পৃথিবী রসাতলে গেছে !”

“যা :—সত্যি ?”

“আচ্ছা, হীরেনবাবু কি তোকে সত্যি বিয়ে করতে চায় ?”

“মানে ? আমি রাজী হলে তো এখনই”

আমার কিন্তু কেমন সন্দেহ হয়। আজকাল ছেলেদের বিশ্বাস নেই। ওদের যত প্রেম মুখে। যাক, চল।”

“এখনই যেতে হবে নাকি ?”

“নিশ্চয়ই, আমি তোকে নিয়ে যাবার কথা দিয়েছি।”

“তবে চল।”

“দাঁড়া, শাড়ীটা পাল্টে নে। আর তোর পাউডারের কেসটা বের কর তো। সেন্ট আছে ?”

“না, আমার সাজতে ভাল লাগে না। যেমন আছি, যদি ভাল লাগে তো স্বাভাবিক রূপই ভাল। নকল সাজে কি লাভ ?”

“তুই মরবি। ওরে, রঙকরা মুখই ছেলেরা ভালবাসে। ভেতরের রূপ কিছু নয় বাইরের রূপটাই ওদের কাছে মূল্য পায়।”

“সব ছেলে সমান নয়। হীরেনবাবু একটু আলাদা।”

“থাম। কোথায় পাউডার আছে দেখি। তোর না দরকার থাক আমার আছে।”

প্রসাধনে মৃদুলা নিপুণা। ড্রেসিং টেবিলে বসে সে চোখে কাজলের রেখা টানছিল। চন্দনাও পাউডারের পাফটা মুখে বুলিয়ে নিচ্ছিল। সে সামনের আয়নায় নিজের ছায়া ভাল করে দেখল। চন্দনাকে সুন্দরী না বলে পারা যায় না। কাঁচা সোনা গায়ের রঙ। সুগঠিত দেহ-বল্লরী। ভাসা ভাসা চোখ। মুখে মধুর লাবণ্য। নিজের গালের মধ্যিখানে কিছুকাল হয় একটা ছোট সাদা দাগ হয়েছিল। আয়নায় দাগটা ভাল করে দেখল চন্দনা। দাগটা একটু বড় হয়েছে। অবশ্য খুব ভাল করে লক্ষ্য না করলে বোঝা যায় না। এমন মসৃণ চামড়ায় কোথা থেকে এই বিশ্রী দাগটা এল কে জানে। বন্ধুর দিকে ফিরে চন্দনা বলল, “কিরে, তোর হোল ?”

মুখে ক্রিম ঘষতে ঘষতে মৃদুলা বলল, “দাঁড়া, তোর যে আর তর সইছে না দেখছি।”

* * *

কফি হাউসে বসেছিল হীরেন। অধীর অপেক্ষায় গোটা কয়েক সিগারেট পুড়ে শেষ হয়েছে। টেবিলের উপর কফি জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তবু চন্দনা এখনও এল না। হীরেন ভাবছিল যদি চন্দনা নাই আসে তবে সে নিজেই যাবে তাদের বাড়ীতে। অত সহজে সে চন্দনাকে হারাতে রাজী নয়। একটা শেষ বোঝাপড়া করতে হবে।

রঞ্জনবাবু বিয়েতে আপত্তি করবে ? করুক। যে কোন ঝক্কি নিতে সে প্রস্তুত।

একটা লোকের বাধায় সে তার আকাঙ্ক্ষিত ধন হারাবে নাকি ? যে কোন বিপর্যয় আসুক না কেন তাকে জয় করবে নিজের বাহুবলে।

বাধা যত প্রবল, প্রণয় তত দুর্বার।

আপন ভাবনায় মগ্ন ছিল হীরেন। পেছনে শব্দ হতেই ফিরে তাকাল। চন্দনা মিটি মিটি হাসছে।

"কার কথা এত ভাবছিলে? কাছে এসে দাঁড়িয়েছি তবু টের পাওনি।" বলল চন্দনা।

"বোস," সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল হীরেন।

চন্দনা বসতেই হীরেন আর দেরী করল না। অধীর আগ্রহে সোজা প্রশ্ন করল, "তোমার নাকি বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি মত দিয়েছ?"

ক্ষণকাল দ্বিধা করে চন্দনা দুষ্টু হাসি হেসে বলল, "নিশ্চয়ই। মুখে না বললেও সব মেয়েই বিয়ে করতে চায়। তা ছাড়া ভাল ছেলে, বড়লোক—অমত করব কেন?"

গম্ভীর হল হীরেন। বলল, "তাহলে আমাকে নিয়ে এতদিন খেললে কেন?"

"খেলতে ভাল লাগে যে।" বলে হাসল চন্দনা। ভ্রূকুঞ্চিত করল হীরেন। পর মুহূর্তে চন্দনার হাত ধরে অসহায় কণ্ঠে বলল—"তোমাকে না হলে আমি বাঁচব না চন্দনা।"

"—আঃ—ছাড। সবাই দেখছে।" নিজের হাত সরিয়ে নিল চন্দনা।

শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল হীরেন। মনে হল পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে। তার বিষাদ মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দনার মায়া হল। সে বলল, "আচ্ছা, তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করলে আমি অন্য জায়গায় বিয়ের মত দিয়েছি?"

"তবে?"

"তোমাকে যে লোকে কেন বুদ্ধিমান ভাবে জানি না। কিছু বোঝ না।"

"তাই বল। যা ভয় পেয়েছিলাম। তোমার দাদা জোর করল না?"

"—না।"

"—একটা কথা বলব।"

"বল। তোমার মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনতে প্রস্তুত হয়েই এসেছি।"

"আমাদের বিয়েটা সেরে ফেললে হয় না? অ.জকাল রেজিষ্ট্রেশন—"

"তোমার পরীক্ষা শেষ হোক। মাস ছয় বাদে তোমার পরীক্ষা না?"

"—হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে বিয়ের পরে লোকে পরীক্ষা দেয় না?"

"পরীক্ষার আগে বিয়েটা হলে তোমার পড়াশুনার ক্ষতি যদি হয়। তুমি তো সেদিন বলছিলে, এই পরীক্ষার উপর তোমার জীবনের উন্নতি নির্ভর করছে।"

"তা হোক। আমার ক্ষতির জন্য তুমি ভেবো না।"

"তবে কে ভাববে?"

"আমি কথা দিচ্ছি। বিয়ের পর মন দিয়ে পড়ব। তোমার সঙ্গে দুষ্টুমি করে একটুও সময় নষ্ট করব না।"

"যাও। অসভ্য।" বলে চন্দনা অন্যদিকে তাকাল। দেরী করাবার ইচ্ছে তার একটুও নেই। কিন্তু হীরেনকে তো সে জানে। অমন উচ্ছল প্রাণশক্তি যার সেকি বিয়ের পর বইএর মধ্যে মুখ গুঁজে থাকবে? তার ইচ্ছা পূরণের জন্য শেষে সে কি হীরেনের উন্নতির বাধা সৃষ্টি করবে? না। প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় চাই আত্ম-সংযম, চাই প্রতীক্ষা। চন্দনা অপেক্ষা করবে শুভলগ্নের জন্য। উন্নতির পথে বাধা হবে না।

"কি ভাবছ?" বলল হীরেন। চন্দনা কোন উত্তর দিল না। হীরেনের মনে হল হয়ত চন্দনা তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। মেয়েদের বিশ্বাস কি? তাছাড়া চন্দনার অপরূপ দৈহিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হবে না, এমন পুরুষ ক'জন আছে?—শুধু সৌন্দর্য নয়, চন্দনা শিক্ষিতাও। বন্ধুরা ঠিকই বলে এমন রত্ন হাতছাড়া করলে ঠকতে হয়।

—খুট খুট আওয়াজ শুনে দুজনেই ফিরে তাকাল। মৃদুলা আসছে। সঙ্গে এক সুবেশ যুবক। পাশের টেবিলে বসে মৃদুলা বলল, "কপোত-কপোতী নীরব কেন? দুর্ভাবনা?"

হীরেন কি একটা বলতে যাচ্ছিল, মৃদুলা বাধা দিয়ে বলল, "কিছু ভাববেন না। রঞ্জনদা যদি আপত্তি করে আমি তাকে ম্যানেজ করব। দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলুন।"

"শুভস্য শীঘ্রম্" বলল সংগের সুবেশ যুবকটি। কিছু-

ক্ষণ কথাবার্তার পর হীরেন ও চন্দনা তাদের কাছে বিদায় নিল।

* * *

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রঞ্জনবাবু বললেন, "ক'দিন খোঁজ নিয়ে দেখলাম ছেলেটা ভালই মনে হচ্ছে।

চন্দনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল, "কার কথা বলছ?"

"হীরেনবাবুর। মৃদুলা সব বলেছিল কিনা।"

লজ্জায় সঙ্কুচিত হল চন্দনা। রঞ্জনবাবু বললেন, "গ্রাজুয়েট। দেখতেও মন্দ নয়। তা ছাড়া I. A. S. পরীক্ষা দিচ্ছে। বড় অফিসার তো হবেই।"

"দাদা, তোমার চা নিয়ে আসব।" বলল চন্দনা।

"না। আয়, কাছে এসে বোস।"

চন্দনা চলে যাচ্ছিল। রঞ্জনবাবু তাকে টেনে এনে কাছে বসিয়ে বললেন, "এতদিন আমার কাছে লুকিয়েছিলি কেন? আমি তো শুধু তোর দাদা নয়, ফ্রেণ্ড, ফিলসফার এ্যাণ্ড গাইড।"

মাথা নীচু করে বসে রইল চন্দনা। রঞ্জনবাবু বললেন, "হীরেনবাবুকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস।"

"আচ্ছা।"

হঠাৎ রঞ্জনবাবু চন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "একি! গালে এই সাদা দাগটা কবে হল? কি সর্বনাশ।"

"কেন?" ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল চন্দনা। দাগটা যে অনেকটা বড় হয়েছে সে নিজেও লক্ষ্য করেছে কিন্তু ভয়ের কিছু আছে বলে মনে করেনি। তার প্রশ্ন শুনে রঞ্জনবাবু বললেন, "না, কিছু না বোধ হয়। তবু ডাক্তার দেখান ভাল। চল, আজই দেখিয়ে আনব।"

বিকাল বেলায় ডাক্তারের বাড়ী থেকে দুই ভাই বোন গম্ভীর মুখে ফিরল। ডাক্তার বলেছেন, চন্দনার শ্বেতী হয়েছে। চন্দনার পিঠেও বেশ বড় লালচে আভাযুক্ত একটা সাদা দাগ আছে, আগে চন্দনা খেয়াল করেনি।

পাশের বাড়ীর মেয়েটার কথা মনে পড়ল চন্দনার। তার শ্বেতী আছে। সারা দেহে চাকা চাকা সাদা দাগ। দেহের স্বাভাবিক রঙের মধ্যে বিশ্রী দেখায়। অনেক চিকিৎসা করেও ভাল হয় নি।

ভয় ও ভাবনায় সারারাত ঘুম এল না চন্দনার। কত কথা যে ভাবল ঠিক নেই। পরদিন ভোরেই হীরেনের সঙ্গে দেখা করে বলল, "দাদা তোমাকে যেতে বলেছে।"

"আমাকে! কেন?"

"জানি না। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"বল।"

"ধর, যদি কোনদিন আমার এই বাইরের রূপ নষ্ট হয়ে যায়, যদি আমি দেখতে বিশ্রী হয়ে যাই, তবে কি তুমি আমায় ভালবাসবে না?"

"তার মানে!!"

"এমন তো হতে পারে। ধর, যদি হঠাৎ আগুনে পুড়ে আমার গায়ের রঙ ঝলসে যায় তবে কি তোমার ভালবাসা পালটে যাবে?"

"কি যে বল ঠিক নেই। এতদিনে এই বুঝেছ? আমি বুঝি শুধু তোমার বাইরেটাই দেখি। তোমার মনের স্পর্শে আমি যে পাগল হই সে কি তুমি বোঝ না?"

"ও।"

"কিন্তু হঠাৎ এসব কথা কেন?"

"এমনি। তুমি যেও কিন্তু। দাদা যেতে বলেছে।"

"আচ্ছা। বোস।"

"না, চলি। দাদা একটু দেরী করে ঘুম থেকে ওঠে তবে এতক্ষণে উঠে পড়েছে বোধ হয়।"

চন্দনা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল। রঞ্জনবাবু কেন ডেকেছেন ভেবে পেল না হীরেন। চন্দনাও কিছু খুলে বলে নি। চন্দনাকে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছিল। কি জানি কেন ডেকেছে। দূর থেকে একদিন রঞ্জনবাবুকে সে দেখেছিল। গম্ভীর চেহারা। হয়ত তাকে চূড়ান্ত অপমান করার জন্যই ডেকেছে। তবু সে যাবে। বলে আসবে চন্দনাকে তার চাই। যেমন করে হোক তাকে সে ছিনিয়ে নেবে। যদি অপমানিত হতে হয়, হবে। প্রিয়ার জন্য দুঃখ বরণে দুঃখ কি!

চন্দনাদের বাড়ী এসে রঞ্জনবাবুর কথা শুনে বিস্মিত হল হীরেন। এমন মানুষও হয়! এত ভাল।

রঞ্জনবাবু বললেন—"তা হলে শুভ দিন স্থির করে ফেলি?"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল হীরেন।

রঞ্জনবাবু ডাকলেন, "চন্দনা।"

"যাই দাদা" বলে হাজির হল চন্দনা। হীরেনের দিকে দেখিয়ে রঞ্জনবাবু বললেন, ভদ্রলোক কখন এসেছেন, এক কাপ চা-ও এখন পর্যন্ত দিলি না। তোরা কি যে হয়েছিস।

"আনছি।" বলে চন্দনা চলে গেল। চা তৈরী ছিল। ট্রেতে খাবার সাজিয়ে নিয়ে এল চন্দনা। রঞ্জনবাবু বললেন, চা-টা খেয়ে নিন। আমি যাই ঠাকুরমশায়কে পঞ্জিকাটা দেখিয়ে আনি।"

রঞ্জনবাবু চলে যেতে হীরেন চোখ তুলে তাকাল। চন্দনা তখনও চায়ের ট্রে ধরে আছে। তাকে অদ্ভুত সুন্দরী লাগছে। এত সাধারণ ঘরের পোষাকে চন্দনাকে সে কোনদিন দেখে নি। এই সাধারণ পোষাকেই তাকে যেন বেশী মানিয়েছে। সে শুধু রূপসী নয়, অপরূপা।

ট্রে রেখে বসল চন্দনা। হীরেন তার কোমল হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইল।

* * *

ঠাকুরমশায়ের বাড়ী থেকে রঞ্জনবাবু চিন্তিত মুখে ফিরলেন। দু মাসের মধ্যে বিয়ের কোন শুভ দিন নেই। বোনের বিয়ে হয়ে গেলেই তিনি নিশ্চিন্ত হতেন। চন্দনার পিঠের সেই সাদা দাগটা ক্রমশ সারা দেহের স্থানে স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে তাও তিনি লক্ষ্য করেছেন। সে জন্যও তার ভাবনা কম নয়! অবশ্য একদিকে ভালই হল। হীরেনের পরীক্ষাও ইতিমধ্যে হয়ে যাবে। তা ছাড়া হীরেনের মত ছেলের জন্য দু মাস অপেক্ষা করা কিছুই নয়। এদিকে চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা যাবে। রঞ্জনবাবু শুনেছিলেন, বৈদ্যনাথের কোন এক সাধু নাকি শ্বেতীর অব্যর্থ ওষুধ দেয়। তিনি ভাবলেন সেখানে চন্দনাকে নিয়ে যাবেন। হয়ত রোগ সেরে যাবে। তাছাড়া বিয়ের ঠিক আগে ভাবী স্বামীর সঙ্গে নিত্য দেখা হওয়াটাও তার ভাল মনে হল না।

খবর শুনে হীরেন প্রথমটা মুষড়ে পড়ল। বিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার জন্য নয়। চন্দনা এক মাসের জন্য বৈদ্যনাথে চলে যাবে শুনে তার বেশী দুঃখ হল।

চন্দনা বলল, "মন্দ কি। ঘুরে আসি। এদিকে তোমারও পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে তখন নিশ্চিন্তে দুজনে কুজনে মগ্ন হব।"

"তুমি কাছে না থাকলে আমার পড়াই হবেনা" বলল হীরেন।

"এতকাল কত যে পরীক্ষা দিয়েছ, আমি বুঝি ছেলেবেলা থেকে কাছে আছি?"

"না। তবে এখন হারাবার ভয় বেশি হয়।"

"ভয় নেই। ঠিক ফিরে আসব। কি করি বল। দাদার খেয়াল, কিছুতেই ছাড়বে না।"

"দাদার খেয়ালটাই বুঝি বড়—আমার ইচ্ছাটা কিছু নয়?"

"তুমি কিছু বোঝ না। এটাই দাদার শেষ জোড় ফলান। এর পরে তো আর আমার উপর জোড় খাটবে না। না গেলে খুব দুঃখ পাবে। তুমি যদি—"

"থাক। ঘুরেই এস। তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু।"

সাশ্রু-নয়নে বিদায় নিল চন্দনা।

* * *

সাধুর সন্ধানে বৈদ্যনাথে দিন কয়েক কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া গেল। ওষুধ এনে সযত্নে ভক্তিভরে চন্দনার দেহে প্রলেপ লাগান হল। কিন্তু ফল হল না। যত দিন গেল ততই সাদা দাগগুলি দেহের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত চন্দনা অধৈর্য হয়ে বলল —"দাদা, ফিরে চল। আমার এসব ভাল লাগছে না।" রঞ্জনবাবু বললেন, "দাঁড়া, আর দিন সাতেক দেখি। যদি ফল না হয় ফিরে যাব।"

দাদার এত ভাবনার কারণ চন্দনা বুঝতে পারল না। মুখে না হয় তার কতগুলি সাদা দাগই হয়েছে তাতে কি এমন হয়েছে! সে জন্য লোকে যদি ঘৃণা করে কি আসে যায়। পৃথিবীতে একজন তো আছে সে ঘৃণা করবে না। বাইরের চামড়ার রঙটাই সে সব কিছু মনে করে না। চামড়ার নীচে মনটাকেও সে ভালবাসে। এদিকে চন্দনার অভাবে হীরেনের কাছে দিনগুলি সুদীর্ঘ মনে হচ্ছিল। এক মাস নয়, যেন এক বছর। অধীর আগ্রহে সে মাসান্তের প্রতীক্ষা করছিল। মাস শেষ হল তবু চন্দনা ফিরল না। সেদিন পথে যেতে যেতে মৃদুলার সঙ্গে হীরেনের দেখা হল। একজন সুশ্রী যুবকের সঙ্গে মৃদুলা যাচ্ছিল। কফি হাউসের সেই ভদ্রলোক নয়, অন্য একজন।

মৃদুলা হীরেনকে দেখে থেমে বলল "এই যে হীরেনবাবু ভাল আছেন তো ?"

"হ্যাঁ—এই বেটে যাচ্ছে", বলল হীরেন।

"কেন ? এখন তো ভাল কাটার কথা। আজ রাত্রে চন্দনারা ফিরছে, জানেন তো ? চিঠি দেয় নি ?"

"না, তো !"

"ও' চলি।"

মৃদুলা চলে গেল। হীরেন স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। চন্দনা তাকে আজ ফেরার কথা চিঠিতে জানাল না কেন ? হীরেন একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। দু' ঘণ্টা আগে বৈদ্যনাথ থেকে ট্রেন এসেছে। রাত হয়েছে। হোক রাত। না-ই বা জানাল চন্দনা। সে যাবে। চন্দনাদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল হীরেন। উত্তাল হল তার হৃদয় তরঙ্গ। দরজা খুলে রঞ্জনবাবু প্রথমটা বিস্মিত হলেন। তারপর, হেসে বললেন, "মনের টান একেই বলে। আসুন।" ঘরে বসল হীরেন। ছুটে এসে চন্দনা বলল—"সব মাটি হয়ে গেল। ভেবেছিলাম ভোরে গিয়ে তোমাকে অবাক্ করে দেব। কিন্তু তুমি কি করে বুঝলে আমি এসেছি ?" হীরেন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। চন্দনার মুখের চামড়া অনেক পাল্টে গেছে। চোখের তলায় সাদা সাদা দাগ। মাঝখানে সেই আগের দেহের রঙ। আবার গালের একপাশটা সাদা। সব-চেয়ে বিশ্রী লাগছে ঠোঁটটা। ফ্যাকাশে সাদা রঙ। সাদা আর তামাটে রঙে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত সমস্ত মুখটা।

"কি দেখছ ?"

"কিছু না।"

"তোমার জন্য কয়েকটা জিনিষ এনেচি। দাঁড়াও নিয়ে আসছি।" বলে চন্দনা চলে গেল।

নিয়ে এল কয়েকটা পুতুল। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি, মা আর ছেলে, হর-গৌরী এমন আরও কত। একটা পুতুল হীরেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "দেখ কি সুন্দর।"

হীরেন পুতুলটা ধরতে গিয়ে নিজের হাত সরিয়ে নিল। চোখে পড়ল চন্দনার সমস্ত হাতের পাতাটা সম্পূর্ণ সাদা !

"ধর", চন্দনা বলল।

"তোমার রোগটা ছোঁয়াচে নয় তো ?" প্রশ্ন করল হীরেন।

"কি হল ! আমার এই হাত ধরার জন্য তো—"

"না মানে দেখি পুতুলটা। বাঃ বেশ তো।"

রঞ্জনবাবু ঘরে ঢুকে বললেন; "উঁহু, বিয়ের আগেই এতটা ভাল নয়।"

লজ্জা পেয়ে চন্দনা চলে গেল।

হীরেন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—"চলি।"

রঞ্জনবাবু বললেন, "সে কি ! খেয়ে যাবেন। বসুন।"

"আমার বিশেষ কাজ আছে।"

"তাই নাকি ? তবে বাধা দেব না। তাহলে এ মাসে দিনটা মনে আছে তো ?"

"আমাকে একটু ভেবে দেখার সময় দিন।"

"তার মানে ?"

"মানে—"

"ও হো। চন্দনা আগে আসার কথা জানায় নি—তাই রাগ ?"

"না। তা ভাবছি না। তবে আমার মনে হয় আমি চন্দনার যোগ্য নই। মানে, সে শিক্ষিতা সুন্দরীও—আমি ঠিক তার উপযুক্ত নই। চলি।"

অপরাজেয় কথাশিল্পী
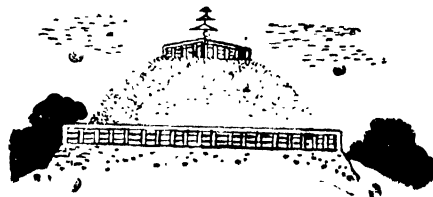
গল্প পড়তে তোমরা ভালবাস। গল্পের বই তোমাদের খুবই প্রিয়। আধুনিক লেখকদের অনেকের গল্পই তোমাদের পড়া আছে। তাঁদের মধ্যে কোন কোন লেখক বা লেখিকা আবার তোমাদের কারও কারও বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছেন। কিন্তু গল্প সাহিত্যে সকল নামকে ছাপিয়ে জেগে রয়েছে একটি নামই, যা বাংলা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অতি পরিচিত ও অতি প্রিয়। দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম তোমাদেরও অতি পরিচিত। গত ৩১শে ভাদ্র বাংলার এই অপরাজেয় কথাশিল্পীর ৯০তম জন্মদিন প্রতিপালিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের লেখা গল্পগুলি তোমরা নিশ্চয়ই কিছু কিছু পড়েছ। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ না পড়ে থাক তাহলে তারও উচিত পড়ে ফেলা। অবশ্য শরৎচন্দ্রের বেশীর ভাগ লেখাই পরিণত বয়স্কদের জন্যে হলেও, অনেক উপন্যাস ছেলেমেয়েদেরও পাঠপযোগী। যেমন ধর "শ্রীকান্ত"-র কাহিনীর প্রথম দিকটা এবং "রামের সুমতি", "বিন্দুর ছেলে", প্রভৃতি।

শরৎচন্দ্র ছিলেন বিরাট সৃষ্টিশক্তির অধিকারী। এবং এই শক্তির সহিত মিশে ছিল তাঁর দরদী মনটি। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি এত মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠতে পেরেছিল। অনেক প্রচলিত ধারণার ওপর আঘাত হেনে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর অপূর্ব্ব চরিত্রগুলি। কিন্তু তিনি আজকালকার যুগের মতন ভাঙ্গার দেবতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন সৃষ্টিকর্ত্তা! তাই সৃষ্টির আনন্দে তিনি সৃষ্টি করে গেছেন তাঁর কালজয়ী অপূর্ব্ব অনুভূতিসম্পন্ন চরিত্রগুলি। সামাজিক ও পারিবারিক দুর্নীতির ওপর তিনি আঘাত দিয়ে সুস্থ সমাজ ও পরিবার গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টি করে গেছেন এক একটি গোটা চরিত্র যা পাঠকের মনকে নাড়া দিয়ে যায়, অভিভূত করে তোলে।

শরৎচন্দ্রের মতন শক্তিশালী লেখক শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও বিরল। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাস নানা ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। তাঁর এই কালজয়ী উপন্যাসগুলি তাঁকে দিয়েছে অমরত্ব, দিয়েছে অপরাজেয় কথাশিল্পীর সম্মান। আর বাঙ্গালী পাঠকের মনের মণিকোঠায় চিরজাগরূক করে রেখেছে শ্রেষ্ঠ গল্পকার-রূপে। বাংলা তথা ভারতের সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্র চিরতরে বিরাজ করবেন একটি সমুজ্জ্বল তারকারূপে।

শরৎচন্দ্রের জন্মদিন ৩১শে ভাদ্র। প্রতি বৎসর এই দিনটিতে তোমরা বাংলার এই মহান সন্তানকে স্মরণ করে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দিও এবং তাঁর লেখা পাঠ করে তাঁর ভাবধারাকে গ্রহণ করবার চেষ্টা কর।

***

জর্জ্জ এলিয়ট্
রচিত
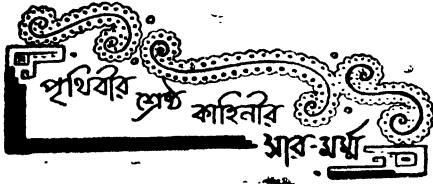
সাইলাস মার্নার্

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নিজেদের ছোট্ট-সুন্দর সংসারের কাজকর্ম্ম সারা হলে, প্রতিদিন বিকালে এপি আর সাইলাস্ বেরুতো বেড়াতে··· কথনো গ্রামের প্রান্তে নিরালা-নির্জ্জন পাহাড়ী-খাদের পথে···কখনো বা নানা রকম বাহারী গাছপালা-লতা আর রঙ-বেরঙের মরশুমী-ফুলের কেয়ারী দিয়ে সাজানো ছবির মতো মনোরম-সুন্দর কুটিরের সামনেকার বাগানে!··· দুজনের কত গল্প···হাসি-গান-আনন্দের বিচিত্র মজলিশ। সে মজলিশে প্রায়ই এসে যোগ দিতো তরুণ আরন্··· আর আসতেন তার মা ডলি উইনথ্রপ্। এপি আর আরণের প্রিয় খেলার সঙ্গী ছিল—বাড়ীর পোষা-বিড়াল এবং আদরের টেরিয়ার-কুকুর···সবাই মিলে পরম শান্তি-সুখে মশগুল হয়ে ছুটির আসর জমিয়ে তুলতেন। রবিবারের সকালগুলিও ছিল—আরো মধুর···সকালে দল বেঁধে তারা সবাই যেতো গ্রামের গির্জ্জায়...সেখানে উপাসনা সেরে কুটিরে ফিরে এসে একসঙ্গে মিলে কত কি গল্প গান··· খাওয়া দাওয়া···খেলাধূলো· এমনি সহজ সরল হাসি খুশী আর নিশ্চিন্ত আরামে মেতেই তাদের দিন কাটতো।

বয়স বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পাঠশালায় পড়বার সময় এপিও জানতে পেরেছিল—সেই তুষার-ঝড়ের রাতে তার মাতৃবিয়োগের করুণ-কাহিনী···আর সাইলাসের অপূর্ব্ব-মহানুভবতার কথা···মাতৃসমা-পড়শিনী ডলি উইনথ্রপের বুক-ভরা স্নেহ যত্ন মায়া মমতার পরশ···আর আশৈশবের খেলার সাথী আরণের আন্তরিক সৌহার্দ্দ-সাহচর্য্য ...সব কিছুই। গ্রামের জমিদার-মশায়ের বড় ছেলে গড্ফ্রে ক্যাসও এপিকে মেয়ের মতোই ভালোবাসতেন···স্নেহভরে নিত্যই তিনি তাকে দামী-দামী খাট-বিছানা, আলমারী-আসবাবপত্র, খেলনা-খাবারদাবার, কাপড়-জামা···আরো কত কিজিনিষ উপহার পাঠিয়ে দিতেন—'রেড-হাউস' জমিদার বাড়ী থেকে! এ সব উপহার পেয়ে এপি খুব খুশী হলেও, সে কিন্তু বুঝতে পারতো না যে গড্ফ্রে ক্যাস কেন তাকে এতখানি স্নেহ করেন!···গড্ফ্রে ক্যাস্ ছাড়া, সাইলাসের কাছ থেকেও এপি আরেকটি খুব দামী জিনিস উপহার পেয়েছিল···সেটি হলো,—চক্চকে পালিশ করা সুন্দর একটি সোনার আংটি! গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখে আর বয়সেও বেশ বড়-সড় হয়ে ওঠবার পর, সাইলাস্ একদিন ছোট্ট একটা কৌটার ভিতর থেকে সযত্নে রাখা এই দামী সোনার আংটিটি বার করে সাদরে এপির হাতে সঁপে দিয়ে বলেছিলেন,—এ হলো—তোমার মায়ের বিয়ের আংটি! তোমার জন্যই তুলে রেখেছিলুম এতদিন!···তুমি এখন বড় হয়েছো...এটি তোমার কাছেই রাখো...সযত্নে!···তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন···তুষার ঝড়ের সেই দুর্য্যোগ-রাতে তোমার মায়ের হাতের আঙ্গুলে পরানো ছিল!···

সযত্নে তুলে রাখা হারানো মায়ের-স্মৃতিচিহ্ন সেই সোনার আংটি হাতে পেয়ে এপির দু'চোখ জলে ভরে উঠেছিল··· এবং তারপর থেকেই সারাক্ষণ তার মন ব্যাকুল হয়ে থাকতো—কে তার মা···সেই পরিচয় জানবার জন্য!... কিন্তু তার সে প্রশ্নের কোনো জবাই মেলেনি কারো কাছে ···এমন কি, সাইলাস্ও তাকে জানাতে পারেনি সে খবর! তবে ইতিমধ্যেই গ্রামের প্রান্তে নিরালা পাহাড়ী খাদের পথে বেড়ানোর সময় সাইলাস্ একদিন এপিকে দেখিয়ে দিয়েছিল জংলী-ঝোপঝাড়ের পাশে যে-জায়গাটিতে জীর্ণ-দেহভার লুটিয়ে ষোলো বছর আগে সেই দারুণ-দুর্য্যোগের রাতে নিতান্ত-অসহায়ভাবে এপির মা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

মায়ের অন্তিম-শয্যার স্থানটুকু দেখে এপি তখন পাথরের মতোই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল···মুখে তার বাক্য সরেনি কোনো···কিন্তু জায়গাটি সে মনে মনে চিনে রেখেছিল বরাবর।

এ ঘটনার কিছুকাল পরে, নিত্যকার মতোই আবার আরেকদিন বিকালে সাইলাসের সঙ্গে গ্রামের প্রান্তে পাহাড়ী খাদের ধারে বেড়াতে গিয়ে সেই জংলী ঝোপঝাড়ের কাছে এসে এপি হঠাৎ বললো—ক'দিন থেকেই একটা কথা কেবলই আমার মনে জাগছে, বাবা! কিছুতেই তার কোনো হদিশ ঠাওর করতে পারছিনে!···

সস্নেহে এপির মাথার একরাশ কুঞ্চিত কেশদামের উপর জীর্ণ-হাতখানি বোলাতে-বোলাতে সাইলাস্ শুধালো,—কি এমন কথা ভাবছো মা, তুমি···বলো!

এপি বললে,—ধরো, আমি যদি কোনোদিন বিয়ে করি, বাবা···তাহলে, বিয়ের সময় আমি কি মায়ের

হাতের সেই সোনার আংটি, আমার আঙুলে পরতে পারি? ···এতে কোনো অন্যায়···

এপির মুখে আচমকা এ কথা শুনে সাইলাস শিউরে উঠলো...বাধা দিয়ে বিচলিত-কণ্ঠে শুধালো,—হঠাৎ এ কথা তোমার মনে হলো কেন?...তুমি কি চাইছো, মা বিয়ে করতে?

শান্ত-স্বরে এপি জবাব দিলো,—হ্যাঁ বাবা!···আরণ সেদিন আমায় বলেছে যে সে এবার বিয়ে করবে! এখন তার প্রায় চব্বিশ বছর বয়স হয়েছে...তাছাড়া মোটা মাইনের ভালো-ভালো কাজকর্ম্মের ডাক পাচ্ছে সে আজকাল নানান জায়গায়···তাই আমায় বলছিল···

নিজের মনের ভাব গোপন রেখে এপির কথা শেষ না হতেই সাইলাস্ বল্‌লে—কিন্তু জানো তো মা··· তোমাকে বুকে তুলে নেবার আগে। কি নিঃসঙ্গ-নীরস ছিল আমার জীবন···তোমাকে পেয়েই আমার সে-শূন্যতা আজ ফুলে-পাতায় ভরে রঙীন হয়ে উঠেছে আগাগোড়া!··· কিন্তু সে কথা থাক্!···তুমি কি জবাব দিলে, মা —আরণকে!

সরল-হাসি হেসে এপি বেশ সহজভাবেই জবাব দিলে, —আমি বল্‌লুম···বারে, সে কি করে হয়···বিয়ে মানে বাবাকে এই অতখানি বয়সে নিরালা-কুটিরে এমন নিঃসহায় —একা ফেলে রেখে, তোমার সংসারে ঘর করতে যাওয়া! তা কখনো সম্ভব?···

কৌতূহলভরে সাইলাস্ শুধালো,—তোমার কথা শুনে, আরণ কি জবাব দিলে?···

শান্ত-কণ্ঠে এপি জানালো,—আরণ বললে, বিয়ের পর তোমাকে একা ফেলে রেখে আমাকে সে তাদের ঘরে নিয়ে যাবে না···বরং তোমার নিজের ছেলের মতোই সে এসে থাকবে তোমার সংসারেই···তোমাকে দেখাশুনো করা— ফাই-ফরমাশ খাটা···কাজ কর্ম্মের ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট সামলানো— সব কিছুরই ভার নেবে সে—সবাই আমরা মিলে-মিশে একসঙ্গেই থাকবো আমাদের ঐ ছোট্ট কুটিরেই!— তোমাকেও আর হাড়ভাঙা খাটুনী খাটতে দেবো না আমরা কিছুতেই!···

এপির কথা শুনে সাইলাস ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবলো···তারপর ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে বললে,— বাস্তবিকই···এ বড় কঠিন-সমস্যা, মা!···বিয়ের পর, আরণের সংসারে ঘরনী হয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, তোর সঞ্জীবনী-প্রাণধারার স্পর্শে জীর্ণ নীরস যে জীবনটাকে এতদিনে রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে আবার সজীব করে তুলেছিলুম সে সবই নিমেষে শুকিয়ে ঝরে গিয়ে বিরাট শূন্যতায় ভরে উঠবে বটে, তবু, তুই সুখী হবি···তোদের মঙ্গল হবে··· শুধু এই কথা চিন্তা করেই সর্ব্বান্তঃকরণে আমি শুভ-কাজে সম্মতি জানাচ্ছি!···তোদের দুজনের জীবন সুন্দর-সার্থক হয়ে উঠুক—মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে এই আমার একান্ত প্রার্থনা। তবে আমার মত থাকলেও এ বিষয়ে আরণের মায়ের মতামত নেওয়া দরকার সবার আগে।

সাইলাসের সম্মতি পেয়ে এপির মন আনন্দে-কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো···তার দু'চোখে অশ্রুর ধারা!—আবেগভরে দুই হাতে পিতৃসম-প্রৌঢ় সাইলাসের গলা জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রেখে উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে এপি বললে,—বাবা— বাবা—তুমি সুখী হয়েছো তো—আমাদের এই বিয়ের প্রস্তাবে!—

ওদিকে রাভেলো-গ্রামের জমীদার-বাড়ী 'রেড-হাউসেও' দেখা দিলো আরেক সমস্যা! নিজের মান-ইজ্জৎ আভিজাত্য গৌরব বজায় রাখার জন্য গড্‌ফ্রে ক্যাস নিষ্পাপ-সরলা অসহায়া মাতৃহারা-সন্তান এপির প্রতি এতদিন যে অন্যায় অবহেলা আর নির্ম্মম-অবিচার করে এসেছেন, সেই অনুশোচনার নিদারুণ অন্তর্দাহে রীতিমত কাতর অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কলঙ্ক কুৎসা আর লোকলজ্জার ভয়ে তিনি এপির আসল পরিচয়টুকু আর এ-যাবৎ কারো কাছেই প্রকাশ করতে পারেননি— নিতান্তই অপরিচিত-অনাত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো মাঝে-মাঝে সুযোগ পেলেই এপিকে নানা রকম সামগ্রী উপহার পাঠিয়ে পরোক্ষভাবে তাঁর উপেক্ষিতা কন্যাকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ হয়ে ওঠার ব্যাপারে পিতার দায়িত্ব পালন করতেন। কারণ, তিনি সারাক্ষণই শঙ্কিত হয়ে থাকতেন হঠাৎ কোন ফাঁকে নিরুদ্দিষ্ট ড্যান্‌সি হতভাগা না শেষে আবার রাভেলো গ্রামে ফিরে এসে লোকজনের কাছে গড্‌ফ্রের সেই গোপনে বিবাহের কেলেঙ্কারীর কথা ফাঁশ করে বসে!

কিন্তু বরাতক্রমে, সে দুর্ভাবনা থেকেও রেহাই পেলেন গড্‌ফ্রে।—ঘটনাচক্রে, গ্রামের ক'জন কুলিমজুর পাহাড়ী খাদের ধারে পাথর কাটতে গিয়ে গভীর নালা থেকে জল ছেঁচে তোলার সময় হঠাৎ খুজে পেলো—ড্যান্‌সির কঙ্কাল··· কঙ্কালের কাছেই কুড়িয়ে পাওয়া গেল ড্যান্‌সির ঘড়ি, নাম খোদাইকরা সোনার তকমা আর গড্‌ফ্রের অজান্তে চুরি করে-নেওয়া শিকারের চাবুক। এ সব জিনিষের সন্ধান পেয়েই গ্রামের সবাই আর গড্‌ফ্রে স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে হতভাগা ড্যানসি রাতের অন্ধকারে রাভেলো ছেড়ে সটকে পালানোর সময় পাহাড়ীখাদের অতলগহ্বরে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে—এ দুনিয়াতে এবার সে কোনো-দিন কাকেও আর জ্বালাতন করতে আসবে না!

ড্যান্‌সির মৃত্যুসংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই এতদিনের অনুতাপে অনুশোচনায় জর্জ্জর গড্‌ফ্রে শেষে তার দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহিতা স্ত্রী ন্যান্‌সির কাছে নিজের অতীত-জীবনের অন্যায়আচরণ আর অবহেলিতা এপির মায়ের

সঙ্গে তাঁর গোপন বিবাহের কলঙ্ককাহিনী—সব কিছুই প্রকাশ করে বললেন ! স্বামীর এই নির্মম অবহেলার ফলে সরলসুন্দর নিষ্পাপঅসহায়া এপির জীবনে যে দারুণ ক্ষতি হয়েছে সে কথা চিন্তা করে মমতা-স্নেহে ন্যান্‌সির মন ভরে উঠলো ! স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ন্যানসি তখনি সেই রাত্রের অন্ধকারে ছুটে গেলো—গ্রামের প্রান্তে সাইলাসের নিরালা কুটিরে—গড্‌ফ্রে'র সন্তান এপিকে সাদরে নিজেদের বাড়ীতে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে।

সাইলাস্‌ তখন কুটিরে আরাম কেদারায় বসে এপিকে দেখাচ্ছিল তার এতদিনের সযত্নসঞ্চিত সোনার মোহরের রাশি। তবে এ সব সোনার মোহরের জন্য তার এখন আর মায়া নেই এতটুকু—এপিই তার সবার চেয়ে বড় সম্পদ—এপিকে পেয়েই সে ভুলেছিল তার সোনার মোহর হারানোর দুঃখবেদনা আর লোকসানদুর্দশা ! সাইলাসের যা কিছু সঞ্চয় ছিল জীবনে—মোহর-সোনা, জমিজমা বিষয়সম্পত্তি—সবই সে সাদরে সঁপে দিলো—এপির হাতে। ঠিক এমনি সময়ে সাইলাসের কুটিরে এসে হাজির হলেন—ন্যান্‌সি আর গড্‌ফ্রে ক্যাস্‌ ! এসেই সাইলাস্‌কে জানালেন তাঁদের মনের বাসনা—এপিকে তাঁরা জমীদারবাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান—সেখানে নিজের সন্তানের মতো সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ করবেন তাকে !

এ প্রস্তাব শুনে সাইলাস কোনো জবাব দিলো না—জবাব দিলো এপি। ন্যানসি আর গড্‌ফ্রেকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে এপি তাঁদের স্পষ্টই জানিয়ে দিলো যে সাইলাস্‌কে এমন নিঃসঙ্গএকা রেখে এ কুটির ছেড়ে সে দুনিয়ার কোথাও গিয়ে থাকবে না ! জীবনের এতগুলো দিন সুখেদুঃখে এখানে সে যাদের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছে তাঁদের সঙ্গেই এমনি মিলে মিশে সে থাকতে চায় চিরকাল ···অন্য কোথাও নয় !

নানান যুক্তি তর্ক করেও ন্যানসি আর গড্‌ফ্রে কোনোমতেই এপিকে সাইলাসের কুটির থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না তাঁদের নিজেদের বাড়ীতে। কাজেই হতাশমনে তাঁরা ফিরে গেলেন জমীদারবাড়ীতে।

এ ঘটনার কদিন বাদেই গ্রামের রেনবোসরাইখানায় মহাসমারোহে হলো—এপি আর আরণের শুভ-বিবাহ। সে বিবাহে গ্রামের সবাই এসে সাদরে বরণ করে নিলেন——সদ্যপরিণীত এই সুখী দম্পতিকে।

—

চিত্রগুপ্ত
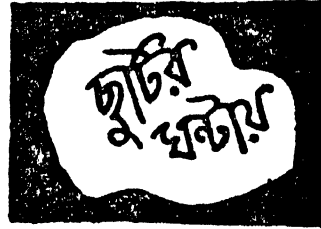
এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের আরেকটি আজব মজার খেলার কথা বলি। ছুটির দিনে কিম্বা দৈনন্দিন পড়াশুনো আর কাজকর্মের অবসরে বিচিত্র কয়েকটি রাসায়নিক-পদার্থের সাহায্যে, আত্মীয়-বন্ধুদের ঘরোয়া-আসরে বিজ্ঞানের এই অভিনব-কারসাজি দেখিয়ে তোমরা অনায়াসেই তাঁদের রীতিমত তাক্‌ লাগিয়ে প্রচুর তারিফ-সুখ্যাতি আদায় করতে পারবে।

রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে আজব-মজার এ খেলাটি দেখাতে যে সব সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ আর কলা-কৌশল রপ্ত করা দরকার—আপাততঃ তার মোটামুটি পরিচয় দিই।

বাড়ীর ছাদে জলের ট্যাঙ্কে (water-tank) বা কলঘরের 'সিষ্টার্ণে' (cistern) যে-ধরণের অন্দর ফাঁপা তামার বল থাকে তেমনি ছঁ্যাদের একটি বল জোগাড় করো। এবারে সেই বলের ছিদ্র-পথে তাপ-উৎপাদক বিশেষ ধরণের কয়েকটি রাসায়নিক-পদার্থ···অর্থাৎ চায়ের চামচের আঠারো-চামচ পরিমাণ সোডিয়াম্‌ হাইপো সালফাইট (sodium hypo-sulphite) এক চামচের একটু কম গ্লিসারিন (glycerine) এবং কয়েক ছিটা ক্যাল্‌সিয়াম্‌ ক্লোরাইড (calcium chloride) মিশিয়ে ফাঁপা অন্দরটি ভর্তি করে ছিদ্র পথের মুখ বেশ ভালোভাবে ছিপি এটে বন্ধ করে রাখো। এ কাজটুকু কিন্তু আসরে কারসাজি দেখানোর আগেই দর্শকের দৃষ্টির অগোচরে চুপিচুপি সেরে রাখতে হবে—তাঁরা কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও এ কায়দা কৌশলের এতটুকু হদিশ জানতে না পারেন। কারণ, নেপথ্য

কারসাজি এ রহস্যটুকু কোনো কারণে তাঁদের কাছে ফাঁশ হয়ে গেলেই, সব মজা মাটি হয়ে যাবে···কাজেই রীতিমত হুশিয়ার থেকো।

উদ্যোগ পর্ব্বের এ কাজটুকু গোড়াতেই সুষ্ঠুভাবে সেরে রেখে, আসরে দর্শকদের সামনে খেলা দেখানোর সময়, তাঁদের কারো হাতে তামার বলটি দিয়ে তাঁকে সেটি ধরতে বলো।

তোমার কথামতো তামার বলটি তিনি হাতে ধরলে বলের ছিপি খুলে ছিদ্র পথে বড় চামচের সিকিচামচ পরিমাণ জল ঢেলে মিশিয়ে দাও বলের ভিতরকার রাসায়নিক পদার্থগুলির সঙ্গে। এভাবে জল মেশানোর সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় ছিপি এটে তামার বলের ছিদ্রপথটি বন্ধ করে দাও।

এ কাজটুকু শেষ হলেই বিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যময় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে আসরের দর্শকেরা সবাই অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন, ছিদ্রপথে ছিপিআঁটা তামার বলটি অবিলম্বেই তেতে এমন দারুণ গরম হয়ে উঠেছে যে সেটিকে হাতে ধরে রাখা যেন রীতিমত কঠিন ব্যাপার!

আজব-মজার এ খেলাটি অবশ্য আরেক রকম উপায়েও দেখানো চলে। সে উপায়টি হলো—চায়ের চামচের চৌদ্দ চামচ পরিমাণ লোহাচুর, দেড় চামচ কপার সাল্‌ফেট (copper sulphate) এবং আধ চামচ গুড়ো নুন অল্প একটু ক্যাল্‌সিয়াম্ ক্লোরাইড (calcium chloride) আর একছিটা পোটাশিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে মিশিয়ে তামার বলের ভিতরে ভরে সে বলের ছিদ্রপথে জল ঢেলে ছিপি এটে রাখলেও ঠিক এমনি মজার কাণ্ড ঘটবে।

এই হলো—এবারের আজব কারসাজির আসল রহস্য! আগামী সংখ্যায় এমনি বিচিত্র মজার আরেকটি নূতন-ধরণের বিজ্ঞানের খেলায় কলা কৌশলের পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। সেপাই সাজানোর সমস্যা :

লোকালয় থেকে বহুদূরে দুর্গম-গভীর অরণ্যে-ঘেরা পাহাড়ী উপত্যকার মাঝখানে প্রকাণ্ড-উঁচু এক টিলা···সে টিলার চূড়োয় আকাশের বুকে সদর্পে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সামন্ত-রাজার বিশাল-গড়। আশপাশের লোকেরা বলে, বিশালগড়ের ভিতরে পাথর-বাঁধানো মজবুত কোন গুপ্ত-কোঠায় নাকি সযত্নে লুকিয়ে রাখা আছে—সামন্ত-রাজার যত কিছু সঞ্চিত ধন-রত্ন-সম্পদ!

লোকজনের মুখে এ সব ধন দৌলতের কাহিনী শুনে দুর্দ্ধর্ষ শক্তিশালী এক ডাকাত-সর্দ্দারের খেয়াল হলো—সদলে বিশালগড়ে হানা দিয়ে সামন্ত-রাজার সেই সঞ্চিত সম্পদ লুঠ করে আনবে। তাই সে দলের অন্য সব জবর-দস্ত ডাকাতদের সঙ্গে পরামর্শ করে সামন্তরাজাকে একদিন চর-মারফৎ খবর পাঠালো যে সামনের অমাবস্যার রাতেই দলবল হাতিয়ার নিয়ে তারা চড়াও হবে বিশালগড়ে ধন দৌলত লুঠতরাজ করতে!

আচম্‌কা এই লুঠতরাজের খবর পেয়ে সামন্ত-রাজা

তো দুর্ভাবনায় আকুল !···ডাকাতের দল রীতিমত নামজাদা—তাদের জুলুম-দৌরাত্ম্যের দাপটে সারা রাজ্যের লোক ভয়ে কাঁপে···এমন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হামলাদারদের সঙ্গে লড়াই করে বিশালগড়ের ধন সম্পদ রক্ষা—সে তো বড় সহজ ব্যাপার নয় ! প্রচুর লোকজন সেপাই শান্ত্রী আর অস্ত্রশস্ত্র হাতিয়ার জোগাড় করা দরকার কিন্তু এত অল্প সময়ে সে সব ব্যবস্থাও তো অসম্ভব! তাছাড়া ডাকাতেরাও যথেষ্ট সেয়ানাফন্দিবাজ···গভীর জঙ্গলে-ঘেরা এই নিরালা নির্জ্জন পাহাড়ী অঞ্চলে নিশুতি অমাবস্যা রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতেরা যদি চারিদিক থেকেই বিশালগড় আক্রমণ করে বসে তাহলে উপায় ?···গড়ে সেপাই শান্ত্রীর সংখ্যাও তো বেশী নেই আপাততঃ—মোট ৯০ জন মাত্র! কাজেই ডাকাতের দলের হামলা আক্রমণ রুখে বিশালগড় রক্ষা করতে হলে মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে মাত্র এই ৯০ জন সেপাই শান্ত্রীকে নিয়েই এখন সুকৌশলে ব্যূহ রচনা করা প্রয়োজন। অনেক ভেবে চিন্তে সামন্ত রাজা নিজেই শেষে সুকৌশলে বিশালগড়ের চারিদিকে সেপাই শান্ত্রী সাজিয়ে এই আজব প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করলেন। অর্থাৎ মাত্র ঐ ৯০ জন সেপাই শান্ত্রীকেই মোট দশটি দলে ভাগ করে এমন কায়দায় সাজালেন যে প্রত্যেক সারিতেই ত্রিশজন করে পাহারাদার রক্ষী রইলো—গড়ের যে কোনো দিক থেকেই ডাকাতেরা এসে আক্রমণ করুক না কেন, প্রত্যেক দিকেই তাদের লড়তে হবে, সারিতে মোতায়েন মোট ত্রিশজন পাহারাদার রক্ষীর সঙ্গে !

বলতে পারো, তোমরা—সামন্ত রাজা কেমন কায়দায় মোট দশটি সারিতে তাঁর ৯০ জন সেপাই শান্ত্রীকে সাজিয়ে এই প্রতিরক্ষা ব্যূহরচনা করেছিলেন ? যদি পারো তো এক টুকরো কাগজের উপর কালি কলমের রেখা টেনে, সে কায়দাটির নক্সা এঁকে নক্সার নীচে সুস্পষ্ট হরফে তোমাদের নাম ধাম লিখে চটপট আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিও। তোমাদের মধ্যে যারা এই আজব সমস্যার সঠিক সমাধান করতে পারবে, আগামী সংখ্যায় ছাপার অক্ষরে আমরা তাদের পরিচয় প্রকাশ করবো—সবাইকার কাছে।

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

২। চার অক্ষরে আমার নাম। আমার শেষার্দ্ধ থেকেই কিন্তু আমার জন্ম। বলো তো, আমার আসল পরিচয় কি ?

রচনা : বিজন কুমার ঘোষ (জগৎবল্লভপুর, হাওড়া)

৩। চার অক্ষরে নাম তার—বিশেষ এক ধরণের জন্তু···গাছেতেই বাস করে। শেষের অক্ষর দুটি ছেঁটে দিলে, গাছেরই অংশ বোঝায় এবং গোড়ার অক্ষর দুটি বাদ দিলে, আরেক ধরণের বনের জীব হয়। বলতে পারো, এ ধাঁধার সঠিক উত্তরটি কি ?

রচনা ঃ গীতশ্রী চক্রবর্ত্তী (রহড়া)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির উত্তর :
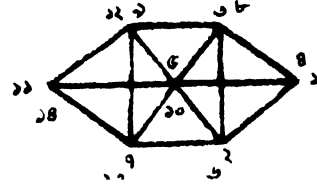
১। উপরের নক্সাতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে পর পর প্রত্যেকটি সংখ্যা অনুসারে রেখা টানলেই, হেয়ালির মীমাংসা হবে।

২। বাঙলা-ভাষার স্বরবর্ণের দ্বিতীয় অক্ষর—"আ"

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : গত শ্রাবণ, ১৩৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত ২নং ধাধাটির উত্তর অনবধানতাবশতঃ, 'লিভিংষ্টোন'-এর পরিবর্তে 'কালাপাহাড়' ছাপা হইয়াছে, সেজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত]

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

স্বাতী, মিনতি, ভাস্বতী, অজয়, হিমাদ্রি, জয়ন্ত ও সুশান্ত সরকার (এলাহাবাদ), কল্যাণী, হিরণ্ময়ী ও শামু মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), বুবু ও মিঠু গুপ্তা (কলিকাতা), হাবলু, টাবলু, সুমা, পুতুল, নিপু ও খোকা (হাওড়া),

বিজয়া ও সৌরাংশু আচার্য্য (কলিকাতা), অমিয়, প্রশান্ত, অমৃত, ভাস্কর, কৃষ্ণলাল, অভীন্দ্র, সুনীত ও তিনকড়ি (গড়িয়া), কুলু মিত্র (কলিকাতা), রনি ও রিণি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), পিণ্টু, বাপি, বুতাম ও অশোক দেববর্ম্মা (পাটনা), শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), রানা, বুনা, গৌর ও লিপিকা (চুঁচুড়া), শীতাংশু, সুষমা, সুজাতা, শৈলেন ও হারানচন্দ্র (কলিকাতা), কবি, অমিতাভ ও অধীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ), জয়তী, রোচনা ও ফণীন্দ্র সাহা (কলিকাতা), হরিদাস, অজয়, বীরেন্দ্র, দুলাল, শ্যামসুন্দর, তারা, অবনী ও রামসদয় (পুটিয়ারী), সত্যেন, মুরারি, সঞ্জয়, অমিয় ও সুনীল (ভিলাই), হিমাংশু মুখোপাধ্যায় (শিলিগুড়ি), ভুটিন, পুপু ও ভুলুয়া (কলিকাতা), ববিন রায় (বোম্বাই)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

লতিকা, কটাই, ঝুণ্টু, খোকা ও কাবুল দেবশর্ম্মা (কলিকাতা), দেবকীনন্দন ও বিশ্বনাথ সিংহ (গয়া), মিহির, কল্যাণ, শচীন, রজত, বিশ্বতোষ, ইন্দ্র, বিমল, সুধীশ, অশোক, অনাবিল, রঞ্জিত ও সুখদো (কলিকাতা), রীতা স্বপ্না, মীরা, পাপু, ছোটন, মালা, কল্যাণ, অর্চ্চি, পার্থ, অলক, তিলক, তিমু ও নীতা (নাগপুর), বিনয়েন্দ্র, বিজয়েন্দ্র, সুধীর, রামদেব ও মধু (হাজারীবাগ)।

সমস্যা-সমাধান

সহজ-সরল উপায়ে, এই-ধরণের সমবায়-কৃষি পদ্ধতিতে নিজেদের খিড়কী-বাগানে উন্নত-আধুনিক সৌখিন-প্রথায় ফসল চাষ করিয়া দেশের খাদ্য-সমস্যা সমাধান করুন।

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

বিদ্যার্ণব শতবার্ষিকী—

ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে হিন্দুধর্ম যখন ক্ষীণবল হইতেছিল তখন তিনজন হিন্দুধর্ম প্রচারক এ বিষয়ে কাজ করিয়াছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন ও শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব এই তিনজনই হিন্দুধর্ম রক্ষা করেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সেন মহাশয় পরবর্তী কালে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভক্তগণ হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় তাঁহার স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। বিদ্যার্ণব মহাশয় কুষ্টিয়ার নিকটস্থ কুমারখালির অধিবাসী ছিলেন। এবং তথায় কালীমন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তন্ত্র সাধনা করিতেন। কলিকাতা হাইকোর্টের জজ স্যার জন উড্রফ তাঁহার শিষ্য ছিলেন এবং বিদ্যার্ণব ও উড্রফ একযোগে কতকগুলি তন্ত্রের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশবিভাগের পর বিদ্যার্ণবের বংশধরগণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তি কুমারখালি হইতে হাওড়ার বাকসাড়ায় আনিয়া মন্দির নির্মাণ করিয়া পূজা করিতেছেন। তাহারা সম্প্রতি ঐ মন্দিরে উৎসব করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিদ্যার্ণবের কোন জীবনীগ্রন্থ নাই। এই উপলক্ষ্যে যদি জীবনীগ্রন্থ রচিত হয় তাহা ইতিহাসের উপকরণ দান করিবে। আমরা এ বিষয়ে সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করি। সকলকে উৎসাহের সহিত এ কাজে সাহায্য করিতে আহ্বান জানাই।

সীমান্ত গান্ধী ও ভারতীয় সমস্যা—

সম্প্রতি একদল ভারতীয় সাংবাদিক কাবুলের সহরতলী দারমুলামানে সীমান্ত গান্ধীর বাসগৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি ভারতের সহিত পাকিস্তানের মীমাংসার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস এখনও চেষ্টা করিলে ভারত-পাকিস্তান সমস্যার সমাধানের পথ পাওয়া যাইবে। তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর। তিনি গ্রামের বাড়ীতে বাস করেন এবং প্রায় ৩০ বৎসর জেলে থাকার পর এখনও আশাবাদী আছেন।

তুরস্ক সরকার প্রেরিত তিন জনের একটি প্রতিনিধিদল পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য ভারতে আসিয়াছেন। এখানে তাঁদের নতুন দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে আলাপরত দেখা যাইতেছে।

গোলপার্কে স্বামীজীর মর্মর মূর্তি—

গত ১৪ই আগষ্ট দক্ষিণ কলিকাতার গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। স্বাধীনতা দিবসের পূর্বদিনে স্বামীজীর আদর্শের কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

হলদিয়ায় নূতন পরিকল্পনা—

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সঞ্জীব রেড্ডী ঘোষণা করিয়াছেন ৩৭ কোটী টাকা ব্যয়ে নূতন বন্দর নির্মাণ করা হইবে। তার মধ্যে কিছু টাকা বিদেশ হইতে পাওয়া যাইবে। হলদিয়ায় নূতন বন্দর নির্মাণ না হইলে কলিকাতা বন্দর

অকেজো হইয়া যাইবে। সেইজন্য হলদিয়ায় কিছু কিছু কাজ করা হইয়াছে। নূতন বন্দরের কাজ সত্বর যাহাতে সম্পাদিত হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ২৬শে আগষ্ট নতুন দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রায় ৪০০ বিদেশী ছাত্রছাত্রীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময় শ্রীমতী গান্ধী বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও দর্শন করেন। চিত্রে থাইল্যাণ্ডের ছাত্রীগণের একটি নৃত্য-অনুষ্ঠান দেখা যাইতেছে।

স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার—

রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতা দিবসে ৩৬০ জন ভারতবাসীকে বীরত্ব ও অন্যান্য অবদানের জন্য পুরস্কার দিয়াছেন। ৩৬০ বিভিন্ন রকম পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। পুরস্কারগুলি হল প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট সেবা পদক, মহাবীর চক্র, দ্বিতীয় শ্রেণীর অশোকচক্র, দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশিষ্ট সেবা পদক, তৃতীয় শ্রেণীর অশোকচক্র, বীরচক্র, ইত্যাদি।

চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিবার নিয়ন্ত্রণ—

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর পরিবার পরিকল্পনা করিবার আগামী কয়েক বৎসরে প্রচুর অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে ভাবে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে। ভারতে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। সে ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। এবিষয়ে যে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে ইহা আনন্দের কথা। পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা হইলে অন্য সকল সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। জনসাধারণকে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেওয়া বিশেষ দরকার।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি—

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডাঃ আর কে দাসগুপ্তের উদ্যোগে 'টেগোর হলে" ৭ই আগষ্ট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি উন্মোচন হইয়াছে। এই মূর্তি বাংলাদেশের সহিত দিল্লীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করিবে।

কলিকাতা উন্নতির নূতন সংস্থা—

কলিকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় জল সরবরাহ, আবর্জনা অপসারণ এবং পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন চিফ্ সেক্রেটারী শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত পরিচালক বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। ছয়জন সদস্যকে লইয়া বোর্ড গঠিত হইবে। আপাততঃ তিনজন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। অপর দুইজন হইলেন শ্রীপি, সি, বসু ও শ্রীবি, পি, সেনগুপ্ত। আশা করা যাচ্ছে এই বোর্ড সেপ্টেম্বর মাস হইতে কাজ শুরু করবেন।

পশ্চিমবঙ্গে চাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি

পশ্চিমবঙ্গে যাহাতে ঠিকমত চাল সরবরাহ করা হয় কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্র থেকে কিছু চাল পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট চাল কেন্দ্র যথাসময়ে পশ্চিমবঙ্গে সরবরাহ করিবেন আশা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সমস্যায় প্রধানমন্ত্রী—

কিছুকাল পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের এম, পিদের সহিত প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক বৈঠকে বসিয়াছিলেন, শ্রীরামপ্রসন্ন রায় ঐ বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী ঐ বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাভাব সমস্যা দুর

করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইহা ছাড়া সুন্দরবনের সেচ সমস্যা, কলিকাতার সারকুলার রেল সমস্যা প্রভৃতি বিষয়েও আলোচিত হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের বহু সমস্যা বর্তমান। কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলির প্রতি মনোযোগ দিলে পশ্চিমবঙ্গ উপকৃত হইবে।

ভারতে জাহাজী শিল্পের প্রসার—

খবরে প্রকাশ চতুর্থ পরিকল্পনা কালে জাহাজী শিল্পের উন্নতির জন্য ৯০ কোটী টাকা ব্যয় করা হইবে। ভারতে যাহাতে বহু সংখ্যক জাহাজ নির্ম্মিত হয় তাহার ব্যবস্থা হইবে। ভারতকে এখন সকল বিষয়ে উন্নত করিতে হইলে জাহাজশিল্পের উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন।

শোক সংবাদ—

খ্যাতনামা লেখক বাঁশরীলাল সরকার ৮৩ বৎসর বয়সে গত ৮ই আগষ্ট কলিকাতা বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সরসীলাল সরকারের ভ্রাতা এবং স্বর্গতা সরলাবালা সরকার তাঁহার ভগ্নী ছিলেন। তাঁহাদের পরিবার বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত।

—

হাওড়ার বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রীতিনকড়ি কাব্যতীর্থ গত ৬ই আগষ্ট ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি সারাজীবন অন্নদান করে অসংখ্য ছাত্রকে অধ্যাপনা করিয়াছেন। তিনি অনেকগুলো বিশিষ্ট সংস্থার সদস্য ছিলেন।

—

আজীবন কংগ্রেস কর্ম্মী দক্ষিণ কলিতাতা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীপরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার কালীঘাটস্থ বাসগৃহে গত ১১ই আগষ্ট পরলোক গমন করিয়াছেন।

বঙ্গ-প্রকৃতির ত্রয়ী

শ্রীঅভিনব গুপ্ত

১

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই বঙ্গভূমি, বনরাজির শ্যামলী রূপে বঙ্গভূমি নয়ন মন সহজেই মুগ্ধ করে। চারিদিকে শুধু গাছ আর গাছ, গাছে গাছে ছড়াছড়ি, জড়াজড়ি অবিরাম বায়ুর হিল্লোলে তা'রা মর্ম্মর তান তুলে শ্রবণ-যুগল বিভোর ক'রে দেয়।

বাংলার বিবিধ ও বিচিত্র এই গাছের মধ্যে তিনটি গাছের ধ্যান মগ্ন রূপ-মহিমা আমার খুব ভাল লাগে।

নারিকেল গাছ সুপরি গাছ আর তালগাছ বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে গণ্য। তিনটিই সরল সুপত্রযুক্ত সহজ-মহিমামণ্ডিত। অন্য গাছগুলি ডাল পালা ছড়িয়ে দিয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চায়, তা'রা মাটির মায়া কিছুতেই কাটাতে পারে না। কিন্তু এই গাছগুলি মাটির মায়া ছিন্ন ক'রে উর্দ্ধে আকাশে উড়ে যেতে চায়; কিন্তু মাটি তা'দের ধ'রে রাখে ব'লে আর উড়তে পারে না, তিনটি গাছই এক রকম মহামায়া ছিন্ন-কারী সন্ন্যাসীর মত—ধ্যান-মগ্ন সাধুর মত।

সন্ন্যাসীরা যেমন নির্জ্জন স্থানে ব'সে ধ্যান করে তেমনি এ গাছগুলিও পথের প্রান্তে, দিঘীর ধারে বা নির্জন প্রান্তরে যেন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে অনন্তের ধ্যান করে।

নারিকেল গাছ একত্রে অনেকে একই স্থানে বাস করে সত্যি, কিন্তু কেউই কা'রও সাথে যেন সম্পর্কিত নয়, এম্নি ভাবে সবাই নিজের নিজের ধ্যানেই যেন নিমগ্ন থাকে। ঝড় উঠলে প্রত্যেকেই বুঝি 'হর-হর-বম্‌বম্' শব্দ ক'রে বলে যে—'হে বন্ধুগণ, তোমরা সাবধানে থাকো, ঝড় উঠেছে'। ঝড় জোরে উঠলে নারিকেল গাছ-গুলি যেন সবেগে মাথা নাড়িয়ে ঝড়কে আসতে বারণ করতে থাকে।

সমুদ্রের তীরেই নারিকেল গাছ সবচেয়ে বেশী দেখা-যায়। রুক্ষতাপূর্ণ বালুকাময় স্থানে এদের শ্যামশ্রী সম্পন্ন উন্নত মস্তক দেখতে কা'র না ভাল লাগে। চারদিকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত বালুর মধ্যে নারিকেলগাছের আকাশমুখী ধ্যান-নিমগ্ন ভাবটি সত্যিই অপূর্ব। সমুদ্রের সৈকতে নীল জল তরঙ্গের বার বার যাতায়াত চলে। মাঝে মাঝে যূথভ্রষ্ট দুই একটি নারিকেলগাছ দেখতে অভিনব।

পাখীর থাকে দু'টি ক'রে পাখা আর নারিকেল গাছের থাকে পনের ষোলটি লম্বা-মত ডাল। এই পাখা-রূপী ডালগুলি দিয়ে সে চেষ্টা করে তা'র মাটি-মাখা জীবন থেকে মুক্ত হ'তে, আর শূন্যময় শান্ত জীবন গ'ড়ে তুলতে; কিন্তু মাটি বুঝি তা'কে ছাড়ে না। যেন মা আর তা'র সন্তান। সন্তান যেমন বৈরাগী হ'তে চাইলে মা প্রথমে বাধা দেন, তেমনি নারিকেল গাছ বুঝি চায় মহাশূন্যে আপনাকে তুলে ধরতে; তাই মাটি-মা তা'কে আঁকড়ে ধ'রে থাকে। তাই নারিকেল গাছ যত চেষ্টাই করুক না কেন, মাটি-মা তা'কে উদাসীন হ'তে দিতে চায় না।

সর সর মর মর অবিরাম তার
ছেড়ে যেতে চায় নাকি মাটির সংসার।

শ্যামা বাংলা মার আর একটি অপূর্ব্ব বিটপী-সন্তান সুপুরি গাছ।

বাংলার বড় বড় কবি লেখকের লেখায় শুধু বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বড় বড় গাছের কথাই বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের রচনায় বাংলার সুপুরি গাছের কথা ফোটে নি; কিন্তু বাংলার কিশোরদের মনে সুচিক্কণ এই দীর্ঘদেহ সুপুরি গাছের কথাই বারবার জেগে ওঠে।

এই সুপুরিগাছ শীর্ণকায় হ'লেও নারিকেল বা তাল-গাছের মত সোজা উর্দ্ধলোকে উঠে গেছে। অবিরাম অভ্রস্পর্শ করার আকুলতায় এরা অভিনব। মূল দিয়ে রস টেনে নেয় বটে, তবু নীল শূন্যের অপার রহস্যের স্বাদ নিতে এরা তৎপর। আলোর নিশানা ঠিক রেখে এরা যতই আলোমুখী হয়, ততই মর্মর কীর্তনে প্রাণের আনন্দ প্রকাশ করে।

বাংলার গহন গভীর দিঘীর ধারে ধারে সুপুরিগাছ-গুলি দাঁড়িয়ে থাকে, তা'দের ছায়া কাঁচবৎ পুকুরের টলটল-করা জলে পড়ে। জলের মৃদু হিল্লোলের সাথে সাথে তা'দের ছায়াও নাচে। চলন্ত ছায়া আর চলন্ত জল যেন পরস্পরের সঙ্গী। তাই কি সুপুরি গাছের ছায়া জলে দোলে?

সুপুরী সব দিঘীর ধারে
ধ্যানের মাঝে খুঁজছে কারে!

ঝাঁকড়া-মাথা বাংলার তালগাছ। সন্ন্যাসীরা মাথায় জটা রাখে। তেমনি তালগাছ যেন জটাধারী সন্ন্যাসী। সূর্য-চন্দ্রের আলোক-ধারা পান ক'রে তালগাছ অসীম ঊর্দ্ধ-লোকে সোজা উঠে যায়। সন্ন্যাসীরা যেমন রোদ, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম, আলো, অন্ধকার সব কিছুতেই সমভাবাপন্ন ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকে তেমনি তালগাছও রোদ, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম, আলো, অন্ধকার সব কিছুই সমভাবে গ্রহণ করে; চুপচাপ দাঁড়িয়ে বুঝি কোন্ অসীমের ধ্যান করে।

তালগাছ কেন যে স্তরে স্তরে ডালপালা মেলে না, কেন যে সোজা উঠে যায়, বুঝতে চেষ্টা ক'রেও বুঝতে কি পারি! তবে মনে হয় যে সে বোধহয় উদাসী, সেজন্যে মাটিময় জীবনের মায়া কাটিয়ে আকাশে উড়ে যাবারই তা'র একান্ত আগ্রহ।

আকাশের অসীম বিস্তারে
খুঁজিছে সে যেন শুধু কারে!

কথিত আছে যে বাংলার প্রাণের প্রাণ মহাপ্রেমময় 'নদীয়ার চাঁদ' নিমাই নিমগাছের তলায় জন্মেছিলেন। নিমাই যদি নিম গাছের তলায় জন্ম না নিয়ে বাংলার এই উদাসী গাছের তলায় জন্ম নিতেন তাহলেই সবচেয়ে মানাতো না কি?

আশমানী

সমীর চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আপন মনে গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে রাস্তা পার হয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ইয়াসিন মিঞা। রাজমিস্ত্রীর কাজ করে ইয়াসিন। রোজগার মন্দ করে না। ক'দিন হল একজন কন্ট্রাক্টারের আণ্ডারে কাজ করছে সে। একটা নতুন সড়ক তৈরী হচ্ছে, নাম দিল্লী রোড। তারই একটা অংশে হচ্ছে একটা ওভার-ব্রিজ। নীচ দিয়ে চলে গেছে রেল লাইন। সেই ব্রিজের ওপর দিয়ে চলে যাবে পাকা পিচ্ ঢালা সড়ক।

এই কাজটাতে বেশ ভাল রেট্ পেয়েছে ইয়াসিন মিঞা। তাছাড়া কাজও চলবে অনেকদিন ধরে। মনটা তাই কদিন খুস্বু-আতরের মতন একটা মিষ্টি সৌরভে ভরে আছে যেন। ক'দিন ধরেই হচ্ছে এমনই। পাওনা টাকা সঙ্গে করে ঘরে ফেরে ইয়াসিন প্রতিদিন সন্ধ্যে-বেলা। সারাটা পথ পিয়ারীর কথা ভাবে। রোজগারের টাকায় বাজার থেকে তরিতরকারী আনে। কোনদিন বা একটু গোস্ত। পিয়ারীকে বলে,—আজ একটু নবাবী খানা বানাতে হবে বিবিজান, গোস্ত আওর পরেট্টা। বিরিয়ানী হলেই সবসে বড়া হতো, লেকীন উকদির বিগড় গেয়ী। চাল মেলে না বাজারে। তারপর উঠানে নেমে হাত-মুখ ধুতে ধুতে বলে, সামনের পরবে নিশ্চয় পোলাও বানাবো বুঝলি পিয়ারী!

পিয়ারী ইয়াসিনের বউ। ঐ নামটা আদরের। আসল নাম পরীবানু। ঐ পরীবানুর ভগ্নাংশ কখনও পরী আবার কখনও বা পিয়ারী।

পরীবানু ইয়াসিনের বউ হলেও ঠিক বিয়ে করা বউ নয়। এক বেতমিজ বেল্লিক ওকে তালাক দিয়েছিল। তারপর পরী তার ঘর ছেড়ে ইয়াসিনের সঙ্গে চলে এসেছিল এখানে। পুরানো জায়গায় আর থাকেনি তারা। নতুন ঘর বাঁধতে,—নতুন জীবনকে উপভোগ করতে ওরা চলে এসেছিল নতুন শহরে। প্রথমে এসে উঠেছিল একটা বস্তীতে। তারপর নিজের রুজি রোজগারের টাকায় এই ছোট টালীর ঘরখানা তৈরী করেছিল ইয়াসিন। নিজে মিস্ত্রি। মালমশলা কিনে নিজেই তৈরী করেছিল নিজের ঘর। সেই সঙ্গে ঘরের লাগোয়া একটা ছোট্ট বাগান। বাগানটুকু চারপাশ দিয়ে ঘিরে আছে ঘরখানাকে। বাগানে নিজের হাতে গাছগাছালী পোঁতে ইয়াসিন। যে দিন ছুটি পায় ঐ বাগানে কাটায়। নানারকম শাক-সব্জি করেছে। একফালি জমিতে কিছু ভুট্টার দানা বুনেছে। আর দু' একদিনের মধ্যেই সেগুলির কলি বার হবে।

বাগানের আগড় সরিয়ে ঢুকলো ইয়াসিন মিঞা। অন্ধকার নেমেছে। হাল্কা ধুসর রঙের ওড়নার মত অন্ধকারের একটা আবরণ। এখানে সেখানে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে—ঠিক যেন ঘুংরু বাজছে। নধর নধর শাকগাছগুলি সারি সারি মাথা চাড়া দিয়েছে। রোজ গাছে জল দেয় পরীবানু।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে চোখ চালালো ইয়াসিন। গাছগুলিকে দেখছে সে। হঠাৎ একটা খস্‌খস্ শব্দ হল। সাপটাপ নাকি, সজাগ দৃষ্টি চালালো ইয়াসিন অন্ধকারের দিকে।

অল্পদূরে একটা ছোট মাচার মত করা আছে। শুকনো ডালপালা আর কঞ্চির গাদা। শব্দটা ঐদিক থেকেই শোনা গেল। এখন চুপ-চাপ। ফিরে যেতে গেল ইয়াসিন। এক পা এগোতেই আবার তেমনই খস্‌খসানি শব্দ। শুকনো পাতার ওপর যেন কিছু নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে।

মাটি থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে সেইদিকে ছুঁড়ে দিল ইয়াসিন। সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ শুনলো সে। কঁক্‌… কঁক্‌…কঁ…।

না, শব্দটা সাপের নয়। যেন চেনা চেনা,—আগে এমন ডাক বহুবার শুনেছে ইয়াসিন। বাচ্ছা মুরগীর ডাক। মাঝে মাঝে শিঁ শিঁ করে। হাঁপানী রুগীর শ্বাসটানের মত শব্দ। জোরে ডাকলে অমনই কঁক্‌—কঁক্‌ করে শব্দ হয়।

অন্ধকারে আর দাঁড়ালো না ইয়াসিন। উঠানে পা দিয়ে পরীবানুকে ডাকলো সে,—এই পিয়ারী, শোন, জলদি…।

—কি ব্যাপার? এত জরুরী তলব? তাড়াতাড়ি ছুটে এল পরীবানু।

—একটা কুপী জ্বেলে নিয়ে আয়।

—কুপী কি হবে?

—বেশী বাৎ করিস না, যা বলছি কর। রান্নার জায়গা থেকে একটা কুপী জেলে আনলো পরীবানু। দেখলো, ইয়াসিনের চোখে চাপা হাসির ঝিলিক্‌।

বাইরে পা বাড়ালো ইয়াসিন, বলল,—আয়, আয়, আমার সঙ্গে। একবার বাগানে যেতে হবে। মনে হচ্ছে একটা জবর শীকার মিলবে।

পরীবানুর কাছ থেকে কুপীটা নিয়ে এগিয়ে গেল ইয়াসিন। তার পিছনে পরীবানু।

ইয়াসিন বলল,—তুই আর আসিস না পিয়ারী, আঁধারে সাপখোপ থাকতে পারে।

ইয়াসিনের কথায় গা'টা কেমন সির্‌ সির্‌ করে উঠল পরীবানুর। ঐ ঝোপঝাড়ের দিকে নির্ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ইয়াসিন। কি দেখেছে সে ওখানে।

হাতে একটা বাঁশের টুকরো তুলে নিয়ে মাচার ওপর খোঁচা দিল ইয়াসিন। পর পর দুবার। সেই সঙ্গে একটা ডাক ভেসে এল,—কঁক্‌ কঁক্‌! সরে এসো! অমন করে কি দেখছো? পরীবানুর কণ্ঠে ভীতির আভাস।

কুপীটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে ইয়াসিন, মাটিতে উপুড় হয়ে আধশোয়া অবস্থায়। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো,—ইয়া আল্লাহ্‌! খোদা মেহেরবান। পিয়ারী শীকার মিলেছে। সাপের মত বেঁকিয়ে দিল ইয়াসিন শরীরটাকে। তারপর ঝোপের নীচ থেকে ছোট্ট একটা বস্তু হাত দিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে এল। কুপীর আলোয় দেখলো পরীবানু, এতটুকু একটা মুরগীর বাচ্ছা! ইয়াসিনের হাতের মুঠোয় বন্দী হয়ে সরু-সরু কাঠির মত পা দুটো আর মাথাটা নাড়িয়ে আর একবার ডাকলো সেটা —কঁক্‌, কঁক্‌…কঁ!

—মনেহয় বাগানে ঢুকেছিল ভুট্টার দানা খাবে বলে, অন্ধার হলে আর ফিরতে পারেনি। কথাটা বলতে বলতে ঘরের দিকে পা বাড়ালো ইয়াসিন। পিছনে পরীবানুও এগিয়ে গেল।

মুরগীর বাচ্ছাটা থেকে গেল ইয়াসিন মিঞার ঘরে। একটু একটু করে সেটা বড় হল। একটা কাঠের বাক্সে তাকে যত্ন করে রেখে দেয় পরীবানু। মাঝে মাঝে উঠানে ছেড়ে দেয় সেটাকে। ঘুরে ঘুরে দানা খুঁটে খায় মুরগীটা। বাচ্ছা মুরগীটার ওপর যেন কেমন মায়া পড়ে গেছে পরীবানুর। নিত্য নিয়মিত সেটার পরিচর্যা করে সে। একটুও ভুল হয় না সে নিয়মের। পরীবানু বলে, —একা একা দিনভর ঘরে কাটাই। ওটাকে আমি যত্ন করে পুষবো! কেমন পোষ মেনে গেছে। ছেড়ে দিলে ও আর বেশী দূরে যায় না। ঘরের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়।

মুরগীটার নাম রেখেছে পরীবানু,—আশ্‌মানী। নীলচে —ময়ূরকণ্ঠী রঙের দেহ,—মাথায় বড় ঝুঁটি নেই। পুরুষ হলে লম্বা ঝুঁটি থাকে। আশ্‌মানী মেয়ে,—তাই ওর মাথায় একটুকরো একটা মাংসের তীরকাটা ঝালরের মত।

বেশ মোটাসোটা নধর চেহারা হয়েছে আশ্‌মানীর। রোয়াকে বসে রুটি চা খেতে খেতে আড়চোখে দেখছে ইয়াসিন। মুফতের মাল! নসীব ভাল থাকলে এমনিই হয়। মুরগীর আবার নাম রেখেছে, আশমানী! হঃ! আশমানীই বটে! যেন আশমান থেকে নেমে এসেছে বেহেস্তের হুরী!—হিঃ—হিঃ—হিঃ—, হাসতে গিয়ে কিছুটা চা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল ইয়াসিনের হাত থেকে।

হাসির শব্দে বাইরে এল পরীবানু, কি মেঞা, হাসো কেন সক্কালবেলা? এ কেমন ধারা উল্টা ভাব দেখি

তোমার? সকালে তো তুমি হম্বিতম্বি করো—চা কর, রুটি বানা, আমার কর্ণিক আর উসো পাটা এনে দে, কাজে যাবো। জল্‌দি, জল্‌দি……

হিঃ—হিঃ—হিঃ আবার হাসে ইয়াসিন। আশমানীকে দেখে বলে—তোর রকম সকম দেখে হাসি। হাসির কাম করিস তাই। তুর রং-ঢং আর পিরিতের চাপে শেষে না মুরগীটা মরে! ওদের কি অত মায়া দেখালে চলে? ওরা জনম নেয় শুধু মরার জন্যি। চাকুর মুখে ওদের প্রাণ,—এই ওদের নসীবের লিখা! বাকি চাটুকু এক চুমুকে শেষ করে যন্ত্রপাতি নিয়ে বাইরে চলে গেল ইয়াসিন।

উঠানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল পরীবানু। আশমানী ঘুরে ঘুরে দানা খুঁটে খাচ্ছে। হৃষ্টপুষ্ট মসৃণ তেল চকচকে শরীর। হাল্কা ময়ূরকণ্ঠী রংটা যেন ঠিক্‌রে পড়ছে ওর গা থেকে। কেমন নাচের ভঙ্গিমায় ঘাড় হেলিয়ে দুলিয়ে ধীর গতিতে চলাফেরা করছে সে। চলার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের ঝিঞ্জিরে শব্দ হচ্ছে ঝুম-ঝুম। আশমানীর পায়ে একজোড়া রিং পরিয়েছে পরীবানু। নিজের মেয়ের মত সাজিয়েছে।

আশমানীর পায়ের মল বাজে রুম-ঝুম। ইয়াসিন বলে—কি বাজেরে পিয়ারী?

—আশমানীর পায়ে ঝিঞ্জির পরিয়েছি, তাই বাজছে।

কেয়া বাৎ! কেয়া বাৎ! ঘর ফাটিয়ে হাসে ইয়াসিন। বলে,—তুর আশমানীকে দেখে বুক ফেটে যায় মাইরী! এর থেকে মোরগা হয়ে জন্মালে ভাল ছিল।

ইয়াসিনের ঐ কথাগুলি যে নিছক রসিকতা নয়, একথা বোঝে পরীবানু। তাকে ইয়াসিন আদরে সোহাগে সংসারে আশ্রয় দিয়েছে। তাকে কোনদিন অবহেলা বা অনাদর করেনি। পরিবর্তে ইয়াসিন তার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করে তাও পরীবানু জানে! সেটুকু পরিপূর্ণভাবে মিটিয়ে নেয় ইয়াসিন—সেই সঙ্গে সে চায়, পরীবানু তার সবটুকু সোহাগ ভালবাসা উজাড় করে ঢেলে দিক ইয়াসিনের উপর। তাছাড়া সংসারে নতুন করে কোন আগন্তুক আসুক এ কামনা ইয়াসিন করে না। মাঝে মাঝে এ বিষয়ে পরীবানুর কণ্ঠের ক্ষোভ ইয়াসিনের শান্তি নষ্ট করে দেয়। পরীবানু বলে,—আশমানীকে নিয়ে তবু আমার দিন কাটে যাহোক! নাহলে দিন-রাত একা ঘরের মধ্যি বন্দী হয়ে…!—তাই সেই অভাব তুই মোল দিয়ে মেটাচ্ছিস্!

কি তোর দুঃখ্যু! তোর ভালবাসার মানুষ নেই?—তারে তুই দেখতি পাস্‌না? একটা মুরগীর নাম রেখেছিস আশমানী!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে পরীবানু। ইয়াসিনের প্রেম দরিয়ায় নিমজ্জিত থেকেও অনেক দুঃখ আর অতৃপ্তি নিয়ে বেঁচে আছে পরীবানু। ইয়াসিন তাকে নিয়ে ঘরই বেঁধেছে কিন্তু সংসার দেয়নি।

…আয়, আয়, তি, তি, তি…আশমানীকে ডাকলো পরীবানু। টালীর ছাদে উঠে ঘোরাফেরা করছে আশমানী। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে সে পরীবানুকে। তার পায়ের মল বাজছে রুম-ঝুম, রুম-ঝুম।

সন্ধ্যেবেলা কাজ থেকে ঘরে ফিরল ইয়াসিন। দরজায় পা দিয়েই হাঁক পড়লো,—পিয়ারী, এই পিয়ারী। শোন, জল্‌দি…।

উঠানের একধারে আশমানীর কাঠের ঘর। আশমানীকে আদর করে ঘরে বন্ধ করছিল পরীবানু, বলল,—দাঁড়াও, আশমানীকে ঘরে তুলে দিয়ে যাচ্ছি।

ইয়াসিনের হাতে একটা জিনিস ভর্তি থলি। তাতে সংসারের জিনিষ কেনাকাটা করে এনেছে। চিৎকার করে উঠলো ইয়াসিন—তোর আশমানীর তদ্‌বির করাটাই বুঝি সব থেকে বড় কাম হল? ইধার আও হারামির বাচ্ছি! ধর জলদি সামানটা।

তাড়াতাড়ি আশমানীর ঘরের পাল্লা বন্ধ করে ইয়াসিনের কাছে এসে তার হাত থেকে জিনিষগুলি নিল পরীবানু।

হাত-পা ধোবার জন্য উঠানে নেমে দেখল ইয়াসিন, জলের বালতী ফাঁকা, এক ফোঁটা জল নেই তাতে।

কদিন ধরে এমনই লক্ষ্য করছে ইয়াসিন। সংসারের সব কাজে যেন কেমন একটা আগোছালো ভাব। যেন ঠিক মত মন দিয়ে কাজ করে না পরীবানু। যেন কেমন অবহেলা, আর অযত্ন সব কিছুতে। অথচ এমনটা আগে হত না।

পিছনের ডোবায় হাত-পা ধুয়ে এল ইয়াসিন। আমার

সময় আশমানীর ঘরটার দিকে দেখল সে। নিজের হাতে কাঠের বাক্সে রং লাগিয়েছে পরীবানু। চটের পর্দা তৈরী করে দিয়েছে, পাছে ঠাণ্ডা লাগে আশমানীর কিম্বা বৃষ্টির জল পড়ে তার গায়ে।

—আঃ পিরিত দেখে গা জ্বালা করে! দিমু একদিন কোর্মা বানিয়ে! মুরগীর নাম আশমানী! যেন আশমানের হুরী। তারে নিয়ে এমন মশগুল যে ঘরের মানুষটারে দেখতি পায় না।

রাতে শুকনো রুটী ডালে ভিজিয়ে খেতে খেতে ইয়াসিন বলল,—আজ আর কিছু হয়নি বাজার থেকে না গোস্ত, না মাছ। বাজারে কিছু নাই। শুক্‌না রুটী কি ছাই খাওয়া যায়!

পরীবানু বলল,—আর যে কিছু নেই ঘরে।

—কেন? ঘরে এমন খাসা গোস্ত মজুত রয়েছে! বল্‌না একদিন আচ্ছা করে বানিয়ে দিই?

প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনা পরীবানু, তারপর সব সরল হয়ে যায়। আশমানীর ওপর যে ইয়াসিনের একটা আক্রোশ আছে একথা জানে পরীবানু। এ সংসারে দুজনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখে মুরগীটাকে। ইয়াসিনের চোখে আশমানী একতাল উৎকৃষ্ট মাংস ভিন্ন আর কিছু নয়।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াসিনের চোখ দুটো কেমন লোভী শিয়ালের মতন জ্বলে উঠল, পরীবানুর দৃষ্টিতে তা এড়ালোনা। তার বুকটা কেমন কেঁপে উঠলো। বলল, —অমন কথা বলোনা মেঞা! আশমানীরে খাওয়ার আগে আমারে খাও তুমি!

আড় চোখে পরীবানুকে একবার দেখে উঠে গেল ইয়াসিন। দাওয়ায় বসে বিড়ি টানতে লাগল সে চুপচাপ।

রাতে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছে, ইয়াসিন আর পরীবানু। একটা হাত দিয়ে পরীবানুকে কাছে আনার চেষ্টা করল ইয়াসিন। বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামল। কান খাড়া করে শুনেই ধড়মড় করে উঠে বসলো পরীবানু। ইয়াসিনের হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে করতে বলল,—ছাড়ো, আশমানীর ঘরটা একবার দেখে আসি। জল ঢুকলে ওর গা ভিজে অসুখ করবে। শক্ত করে চেপে ধরে ইয়াসিন পরীবানুকে, বলে,—করুক অসুখ! জলে ভিজলে মুরগী মরে না, কিন্তু এই বাদ্‌লা রাতে মরদের বুক খালি করে যদি তার পিয়ারী ঘরের বাইরে যায় তাহলে মরদ মরমে মরে যায়! এমন বর্ষার রাতে চুপচাপ শুয়ে থাক্ পিয়ারী।

একটিবার ছাড়ো, আমি এখুনই ফিরে আসবো। একবার দেখে আসি আশমানীকে। নাহলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবো না। ছাড়ো মিঞা, ছাড়ো!

—যা ভাগ! তোর মত বেতমিজ জেনানায় আমার কাম নেই! দূর-হ ঘর থেকে। এক ঝট্‌কায় সরিয়ে দিল ইয়াসিন পরীবানুকে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো পরীবানু কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

একটা ভাল কাজ জোগাড় করেছে ইয়াসিন। কদিন ধরে একজনের দরজায় এ জন্যে হাঁটাহাঁটি করেছে। কাজটা হলে এক মুঠো টাকা আসবে হাতে। যে লোকটা যোগাযোগ করে দিয়েছে তাকে একদিন খানাপিনা করাতে হবে। ইয়াসিন ভাবে, অত ঝুট-ঝামেলার দরকার নেই, তার থেকে একটা গোটা মুরগী ভেট দিলেই চলে যাবে।

একটা মুরগীর দাম আজকালকার বাজারে অনেক। কিন্তু মুরগী কেনার জন্য পয়সা খরচের দরকার হবে না। অনেকদিন ধরেই ঐ আপদটাকে ঘরের বার করার চেষ্টা করছে ইয়াসিন, কিন্তু হারামী জেনানাটা যেন বুক দিয়ে আগলে রাখে সর্বক্ষণ।

সকাল থেকে আর কোথাও গেল না ইয়াসিন। শিকারী বেড়ালের মতন ওৎপেতে বসে থাকলো সুযোগের অপেক্ষায়। দু' একবার বাইরে গিয়ে দেখে এল। উঠানে আশমানীকে দানা খাওয়াচ্ছে পরীবানু। একটু পরে আর একবার দেখলো সে, আশমানীকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

ঘরে একটা চাটাই বিছিয়ে শুয়ে থাকলো ইয়াসিন। তক্তাপোষের ওপর পরীবানু শুয়েছে। কিছুক্ষণ পরে আড়চোখে দেখলো ইয়াসিন, পরীবানু ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে উঠে গেল ইয়াসিন। আশমানীর ঘরের কাছে দাঁড়ালো। তারপর সন্তর্পণে দরজাটা খুলে ফেললো সে। আশমানীর চোখে বোধ হয় তন্দ্রা নেমেছিল, চম্‌কে সোজা হয়ে বসলো সে। মুখ দিয়ে শব্দ করলো—কঁক্, কঁ।

নিজের লক্ষ্য স্থির করলো ইয়াসিন। হাতের আঙুল-গুলো সাঁড়াসীর মতন শক্ত হয়ে উঠেছে। একেবারে ধরে ফেলতে হবে, না হলে চিৎকার করে সব পণ্ড করে দেবে শয়তানটা!

হাতের চেটোটা ছড়িয়ে দিয়ে এক ঝট্‌কায় আশমনীর গলাটা চেপে ধরলো ইয়াসিন। বাইরে বার করার সময় ডানা ঝাপ্‌টে উঠলো আশমানী বার দুই। দু-হাতে আশমানীকে চেপে ধরে একটা থলির মধ্যে তাকে বন্ধ করে ফেললো ইয়াসিন। তারপর ঘরের বাইরে চলে গেল।

আজ যেন মরণ-ঘুমে পেয়েছিল পরীবানুকে। সন্ধ্যে হয়ে গেলে তার ঘুম ভাঙলো। বাইরে বম্‌ ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে। প্রথমেই আশমানীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো পরীবানু। আহা! বোধহয় বেচারা ভিজে যাচ্ছে জলের ছাটে! কিন্তু কোথায় আশমানী। ওর ঘরের দরজা খোলা রয়েছে। শূন্য ঘর মুখ ব্যাদান করে আছে। তবে কি পরীবানুই ভুলে দরজা খুলে রেখেছিল? কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছে না পরীবানু। ইয়াসিন ও ঘরে নেই। কখন একসময় চলে গেছে বাইরে।

—আয় আয়, তি তি···আশমানী, আশমানী···বোধ হয় দরজা খোলা পেয়ে নিজেই বাইরে চলে গেছে। কোনো আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে এমন করে আশমানী। ডাকাডাকি করলে বেরিয়ে আসে। মনে মনে কথাটা ভাবলো পরীবানু। আয় আয় তি তি···আশমানী···আবার ডাকতে লাগল পরীবানু।

পিছনের ডোবায় বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো পড়ে যেন আশমানীর পায়ের ঘুমুরের মত শব্দ হচ্ছে—ঝুম-ঝুম ঝুম-ঝুম।

খুব জোরে চিৎকার করে ডাকলো পরীবানু,—আশ-মানী···ই-ই-ই···। তারপর সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে ঘরের আশেপাশে ছুটে বেড়াতে লাগলো পরীবানু। আশমানীকে ডাকলো। কাণ সজাগ করে শুনতে চেষ্টা করলো আশমানীর পায়ের ঘুঘুরের শব্দ। এবং একটি সন্দেহ পরীবানুর মনে ঘনীভূত হতে লাগল যে আশমানী আর ফিরে আসবে না। এখন সে এমন এক জগতে চলে গেছে, যেখানে মাটির মানুষের ডাক গিয়ে পৌঁছাতে পারে না। সে জগৎ আর এ জগতে আশমান—জমিন্ ফারাক্।

জন-গণ-মন

শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি হচ্ছে এই জনতা। আর বিচিত্র হচ্ছে এই জনগণের মন। জনগণের মন বোঝা আর তার হদিশ পাওয়া অত্যন্ত জটিল আর দুরূহ ব্যাপার। কাল যাকে ভাল লেগেছে--ভালবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি, প্রীতি ও প্রণতি জানিয়েছি, সে আজ দুয়োরাণী। সে আজ অপাংক্তের, অশ্রদ্ধেয় ও নিন্দনীয়। এই হচ্ছে জনমতের রীতি ও নীতি। কোথায়, কখন, কেন তারা কি ক'রে উঠবে তা বলা শক্ত। পান পাত্রে তুফান তুলতেও যেমন তারা পটু, তেমনি আন্দোলিত বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের আব-হাওয়াকেও নিঃশেষে শান্ত করতেও তারা সুদক্ষ যাদুকর। জনতার মনস্তত্ত্ববোদ্ধা নেতা ও মনীষী পৃথিবীতে খুবই কম। যে কজন আছেন তা আঙুলে গোণা যায়। পৃথিবীতে সৃষ্টির আরম্ভ থেকে আজ অবধি যত নেতার আবির্ভাব হয়েছে তার মধ্যে খুব কমই আছেন যাঁরা সব সময়েই জনতার সমর্থন, হাততালি বা বাহবা পেয়েছেন। অন্য দেশের কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের এই ভারতবর্ষেই সুরেন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, নেতাজী ও পণ্ডিতজীর মত বিশিষ্ট জনপ্রিয় জননায়করাও সব সময়ে জনতার মন ও মর্জি ঠিক মত বুঝে উঠতে পারেন নি। তাই সময়ে সময়ে তাঁদেরও জনতার সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

জনতার বিচার-বিবেচনা, বিদ্যা-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা কি

এই সব প্রাতঃস্মরণীয় নেতাদের চেয়ে বেশী? না ঐ সব মহাপুরুষদের ত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা, সততা ও দেশহিতৈষণা সন্দেহের অতীত নয়? তাঁদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জনমতের কষ্টিপাথরে তারা খাঁটি সোনা, খাদ তাতে নেই বললেই চলে। তবুও মাঝে মাঝে জন-গণ-মন তাঁদের উপর বিরূপ হ'য়ে উঠেছে। পথে, ঘাটে, মাঠে তাঁদের সম্বন্ধে বিরূপ অভিমত ও বিরুদ্ধ সমালোচনার গুঞ্জন উঠেছে। সভায়, কাগজে তাঁদের বিপক্ষে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও হয়তো অত্যন্ত অশিষ্ট আচরণ ও অভদ্র ব্যবহার তাঁদের প্রতি করা হয়েছে। কিন্তু কেন? সত্যই কি তাঁরা দেশের অমঙ্গলকামী হ'য়ে উঠেছিলেন?

মনে সংশয় জাগে—তা ঠিক নয়। তাঁরা জনতার নাড়ী ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। জন-মত ও গণ-মন কি চায় তা তাঁরা ঠিক ঠাহর করতে পারেন নি। এই খানেই হয়েছে তাঁদের বোঝার ভুল।

বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্য যে জনমত একদিন প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, সেই জনমতই আর একদিন বাংলা ভাগ করবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের দরজায় ধর্ণা দিয়েছে। যে সুরেন্দ্রনাথ একদিন জনতার মুকুটহীন রাজা ছিলেন, সেই জনতাই তাঁকে সামান্যতম সৌজন্য দেখিয়ে বিধান সভায় প্রবেশাধিকার দিতে কার্পণ্য করেছে। অন্যান্য জননায়কদেরও অনেক অবাঞ্ছিত লাঞ্ছনা ও একাধিক গঞ্জনা ভোগ করতে হয়েছে জনতা ও জনমতের কাছে। জহরলাল ও গান্ধীজীকেও আজও জবাব দিহি করতে হচ্ছে এই জনমতের কাছে। যদিও আজ তারা দু'জনেই সকল জনমতের বহু উর্দ্ধে।

জনমতের নীতি হচ্ছে রাজনীতির মতই কুটিল এবং সর্পিল। তা কখনও সোজা পথে চলে না। কখনও সে দাবাখেলার ঘোড়ার মত আড়াই পা চলে। আবার কখনও গজের মত চলে কোণাকুণি। আবার মন্ত্রীর মত কখনও যথেচ্ছ। তার মেজাজ ও চাল বোঝা বড়ই দুরূহ। সে রাজার হাতী!

যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও মোটা খদ্দর পরিহিত ব্যক্তিবর্গ জনতার শ্রদ্ধা ও সম্মান একদিন বিশেষভাবে আকর্ষণ করতো তা আজ অশ্রদ্ধেয় হয়ে পড়েছে। সরকার পরিচালনার ব্যাপারে হয়তো তাঁদের অপটুতা ও অযোগ্যতা কিছুটা হ'য়ে থাকতে পারে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের ত্যাগ, সততা ও কর্মনিষ্ঠা উপেক্ষণীয় নয়। হাওয়া আজ বদলে গেছে—জনমত তাই উল্টোমুখী। আজ কংগ্রেস অফিসে তাই আগুন লাগছে। কংগ্রেস-নেতাদের কেউ কেউ আজ নির্যাতিত। কংগ্রেস-কর্মীরা আজ নিজ বিবরে যেন আবদ্ধ। অথচ এঁদের পূর্বসূরীরাই একদিন "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" বলে ইংরাজের বুলেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন জনতা ছিল তাঁদের সঙ্গে। জনমত ছিল তাঁদের স্বপক্ষে। জনগণ তাঁদের তখন বাহবা দিত, সাধুবাদ করতো এবং প্রশংসায় হত পঞ্চমুখ। আজ সত্যই কি কংগ্রেস পুঁজিপতি ও কালোবাজারীদের প্রতিষ্ঠান, না জনগণের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী? তার উত্তর দেবার দিন এসেছে তার নেতাদের আর কর্মীদের। দেশ ও দশের কাছে প্রমাণ করবার দিন এসেছে যে, তাঁদের নীতি ও রীতি বড়লোক-ঘেঁষা এবং কালোবাজারীপোষা নয়। অপ্রিয় হ'লেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে বাংলাদেশে কিষাণ, জোয়ান, মজদুরের এক বৃহৎ অংশ আজ তাঁদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছে না। ছাত্র থেকে শিক্ষক, করণিক থেকে অবসরভোগী বৃদ্ধ আজ অনেকেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও সরকারের বিরুদ্ধে মুখর হ'য়ে উঠেছে। আগেকার মত আজ তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তালে তালে পা ফেলে চলছে না। এই জনমতের রায় আর গণমনের যথার্থ চিত্র!

এই প্রসঙ্গে জনতার কাছে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই! জনমত ও গণমন সব সময়েই ন্যায়সঙ্গত ও অভ্রান্ত নয়। অতীতের দৃষ্টান্ত থেকে যীশুখৃষ্ট ও গ্যালিলিওর নির্যাতনের কথা তাঁদের সামনে নজীর হিসাবে তুলে ধরতে চাই। প্রজানুরঞ্জনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাকে ত্যাগ করতে হয়েছে একথাও সুবিদিত। তবুও পৃথিবীর পরিবেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে একথা অস্বীকার করা যায় না রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে জনমত ও গণ-মন উপেক্ষণীয় ও অশ্রদ্ধার বস্তু নয়।

উস্রী জলপ্রপাতে

অধ্যাপক নির্মলকান্তি বসু এম্, এ.

বছর চারেক আগের কথা। ইংরাজি ১৯৫৯ সাল—গরমকাল। তখন আমি হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করি। মধুপুরে বেড়াতে যাবার সুযোগ হ'ল। সেখান থেকে গিরিডিতে গেলাম। গিরিডিতে গিয়ে ইচ্ছে হ'ল উস্রী জলপ্রপাতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করবার।

গিরিডি রেলওয়ে স্টেশান থেকে উস্রীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম—একখানা 'টাঙ্গা'য় করে। আমার সঙ্গে দু'জন সঙ্গী—তাদের মধ্যে একজন আমার পথিপ্রদর্শক। গিরিডি স্টেশান থেকে উস্রীর দূরত্ব প্রায় ৭.৮ মাইল। অল্প সময়ের মধ্যেই সহর পেরিয়ে গেলাম। এইবার শুরু হ'ল বিশুদ্ধ পল্লী প্রকৃতির অকৃত্রিম লীলাভূমি। মাঝখানে বড় রাস্তা। পথের দু'ধারে কোথাও গ্রাম, কোথাও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, কোথাও শূন্য প্রান্তর—আবার কোথাও বনভূমি। লোকবসতি বিরল। অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী বা শ্রমজীবী বলে মনে হ'ল। তাদের আর্থিক অবস্থাও হয়তো স্বচ্ছল নয়। ছোট ছোট বাড়ী—মাটির দেওয়াল—সাধারণ ছাউনি। তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার আলো প্রবেশের সুযোগ পায়নি ব'লেই অনুমান করলাম। সারাটা পথে তেমন কোনো কোলাহল ছিল না। পথচারীর সংখ্যাও যে খুব বেশি ছিল তা নয়। এখানে ওখানে সরল শিশুরা ছুটোছুটি—খেলা-ধুলো ক'রছিল। কোনো কোনো জায়গায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আমাদের চলন্ত টাঙ্গার পেছনে পেছনে ছুটছিল এবং মাঝে মাঝে কাছে এসে নীরবে হাত পাতছিল—পয়সার প্রত্যাশায়। বোধ হয় তারা আমাদের ধনবান ব'লে ধ'রে নিয়েছিল।

ট্যাঙ্-ট্যাঙ্ ক'রে আমরা অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি। সমতলভূমি পেছনে রেখে আমরা ক্রমশঃ উপরে উঠছি। মনে হ'চ্ছে—মাটির পৃথিবীর যা-কিছু তুচ্ছ, যা-কিছু মলিন, যা-কিছু নীচ—সে-সব অসারবোধে পরিত্যাগ ক'রে কোন এক উর্ধ্বলোকের সন্ধানে চ'লেছি।

পথের ধারে ধারে ফুলের গাছও ছিল। যেমন গুণহীন সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহদৃষ্টি স্বভাবতই সমধিক, তেমনি নির্গন্ধ পলাশের প্রতিই এখানকার বনস্থলী অপেক্ষাকৃত বেশী যত্নশীল। এক জায়গায় টাঙ্গা থামিয়ে আমি সবার উপেক্ষিত, নিতান্ত অনাদৃত, যেন অভিমানভরে ভূলুণ্ঠিত, কোপভরে আরক্তিম ভ্রূভঙ্গিযুক্ত গোটাকয়েক গন্ধহীন অথচ সুদর্শন পলাশফুল সাগ্রহে কুড়িয়ে নিলাম। বিকালবেলা। আকাশে মেঘ নেই। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। লাগছে ভাল।

আস্তে আস্তে উস্রীর অনেক কাছে এসে পড়েছি। টাঙ্গা আর চলে না। অগত্যা তাকে থামাতে হ'ল। এইবার শুরু হ'ল আমাদের পদযাত্রা। এখন আমরা সমভূমি থেকে অনেক উপরে। ক্রমে ক্রমে চিরবাঞ্ছিত বহু-প্রতীক্ষিত গন্তব্যস্থলে এসে পড়লাম। এই সেই উস্রী জলপ্রপাত। সুশ্রী উস্রীর সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান করতে লাগলাম। সমস্ত পথশ্রান্তি দূর হ'য়ে গেল। বুঝলাম—কবির উক্তি কত সত্য—"পথের সে শ্রমক্লেশ ভ্রম মনে হয়।"

উর্ধ্বে উদার দিগন্তস্পর্শী নির্মেঘ নির্মল নীলিমময় বিরাট্ আকাশ। নিম্নে সুবিস্তৃত উস্রী পরিমণ্ডল। কোনো অজানা শিল্পীর অনুপম শিল্পনৈপুণ্যে ছোট-বড়, উঁচু-নীচু নানারকম প্রস্তরখণ্ড সুবিন্যস্তভাবে সাজানো র'য়েছে। এদের সংহতিও লক্ষণীয়। তারই মাঝে উস্রী-সুন্দরীর অপূর্ব ভঙ্গিময় চপলচরণ নৃত্য। তার সুমধুর কলধ্বনির মধ্যে অশ্রুত সঙ্গীতের মূর্ছনা। এই 'প্রবল প্রপাতধ্বনি' বর্ষাকালে প্রবলতর হয়। এখানে—ওখানে পাথরের নুড়ির ছড়াছড়ি। আবার ওদিকে সুস্থির বিশাল শিলাখণ্ড। আশেপাশে গাছপালাও আছে। উদাস

অপরাহ্ন। প্রকৃতি প্রশান্ত। প্রকৃতির সেই প্রশান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় বাতাসও নিঃশব্দ। অস্তগামী সূর্যের লাল আভায় পশ্চিম আকাশ সমুজ্জ্বল। জলপ্রপাতের উপরে সূর্যের আরক্ত রশ্মিসম্পাত হওয়ায় উভয়ের সংমিশ্রণে অনবদ্য সৌন্দর্যের সঞ্চার হ'য়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায়—কোথাও মানুষের বা অন্য কোনো প্রাণীর কোনো অস্তিত্বই নেই। কর্মচঞ্চল জীবনের কোনো ছাপ এখানে নেই। কর্মমুখর প্রাণিজগতের কোনো সাড়াশব্দও এখানে পৌঁছয় না। সে এক নিঃসীম নৈঃশব্দ্য। এখানে প্রকৃতিদেবী যেন ধ্যান-নিমগ্না।

প্রাকৃতিক পরিবেশের অমোঘ প্রভাবে আমার মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তন এল। আমি যেন কেমন হ'য়ে গেলাম! সে এক অব্যক্ত অননুভূতপূর্ব আনন্দের আস্বাদন। আন্তর আনন্দের বাহ্য প্রকাশও ঘটল স্বতঃ-স্ফূর্তভাবেই। আমি কখনও পাথরের নুড়ি কুড়োচ্ছি। কখনও জলপ্রপাতের নীচে মাথা পেতে দিচ্ছি। মানুষ মাত্রেই চায় নিজের নামটি অক্ষয় ক'রে রাখতে। এই সহজাত প্রবৃত্তিবশেই আমরা শিলাখণ্ডের উপর আমাদের নাম লিখলাম। কর্মের দ্বারা হোক—আর-নাই হোক, অন্ততঃ অক্ষরের দ্বারা নাম অক্ষয় করে রাখবার বৃথা চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার সঙ্গীদের একজায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে আমি তাদের দৃষ্টির অগোচরে সম্পূর্ণ নির্জনে চ'লে গেলাম। সেখানে সুবিস্তৃত শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে কখনও হরিণশিশুর মতো ছুটোছুটি ক'রছি। কখনও বা দাঁড়িয়ে, আবার কখনও বা ছুটতে ছুটতেই তারস্বরে বারংবার প্রণব (ওঁকার) উচ্চারণ ক'রছি। নানা মন্ত্র মুখে আসছে—উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ ক'রে চ'লেছি। কখনও বা বিস্ময়ে নীরব হ'য়ে যাচ্ছি। তখনকার সেই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কখনও ভাবছি—প্রকৃতির কী বর্ণাঢ্য সমারোহ! আবার কখনও ভাবছি—বিধাতার সৃষ্টি কী সুন্দর! কখনও মনে হচ্ছে—এই সৌন্দর্যের যিনি স্রষ্টা, না-জানি তিনি কত সুন্দর! মনে হ'ল—জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো এখানেই কাটিয়ে দিই।

এদিকে আমি আমার ভাবে বিভোর হ'য়ে আছি। ওদিকে আমার ফিরতে দেরি দেখে সঙ্গীরা চিন্তিত হ'য়ে প'ড়েছে। তারা চীৎকার ক'রে ডাকছে—ডেকে সাড়া না পেয়ে আমার খোঁজ করবার জন্যে, আমি যেদিকে ছিলাম সেইদিকে আসতে শুরু ক'রেছে—এমন সময় তারা আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল আমারও ভাবভঙ্গ হ'ল।

এইবার ফেরার পালা। কিছুদূর এসে একটি কুটীর ও তৎসংলগ্ন মন্দির দেখতে পেলাম। মন্দিরে প্রণাম করে কুটীরের কাছে গিয়ে জনৈক সাধুকে দেখলাম। তিনি তখন ভাত রাঁধছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপ ক'রে চলে এলাম। যথাস্থানে এসে আমাদের টাঙ্গায় উঠলাম। এতক্ষণে পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। এইবার টাঙ্গাওয়ালার কথাবার্তা শুনে আমাদের ভয়-ভয় করতে লাগল। এই নির্জন বনপথে নাকি রাত্রিতে পথচারীর বিপদ পদে পদে। দুর্বৃত্তেরা নাকি বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সুযোগ পেলেই তারা পথিককে আক্রমণ করে—টাকাকড়ি কেড়ে নেয়—এমনকি খুন করাও বিচিত্র নয়। আমি মনে মনে সর্বভয়বিনাশন ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলাম। আবার মাঝে মাঝে আমরা গল্পও ক'রতে লাগলাম। অবশেষে গিরিডি স্টেশনে এসে তবে নিশ্চিন্ত হ'লাম। সেখান থেকে যখন মধুপুরের আস্তানায় পৌঁছলাম, তখন রাত প্রায় বারোটা।

পরে বিশ্লেষণ ক'রে বুঝতে পেরেছি—চিত্ত নিরুদ্বেগ এবং প্রশান্ত থাকলে অসীম আনন্দ অনুভব করা যায়। উদ্বিগ্ন ও অশান্ত চিত্তে সে-আনন্দের স্ফুরণ হ'তে পারে না। আরও বুঝেছি—মানুষের মনের উপর প্রকৃতির ও নিভৃতির প্রভাব কত অসাধারণ! তাইতো কবি এবং সাধক উভয়েই নিভৃতির প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ।

উস্রীর সেই মুহূর্তটি আমার হৃদয়পটে স্মৃতির তুলিতে প্রোজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হ'য়ে থাকবে।

আগামী "আশ্বিন" পূজা সংখ্যায় লিখছেন :—

প্রবন্ধ

ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী, অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি

গল্প

নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রফুল্ল রায়, শক্তিপদ রাজগুরু, মায়া বসু, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি

নাটক

মন্মথ রায়

অনুবাদ গল্প

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

কবিতা

কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, হাসিরাশি দেবী যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শান্তশীল দাস, সুধীর গুপ্ত, আশুতোষ সান্যাল প্রভৃতি

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ত্রিদলীয় ক্রিকেট টুর্নামেণ্ট :

ইংল্যাণ্ডের লর্ডস মাঠে আয়োজিত প্রথম ত্রিদলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে ইংল্যাণ্ড একাদশ দল ৬১ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একাদশ দলকে পরাজিত করে পুরস্কার জয় করেছে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে কিছুটা সান্ত্বনা এই কারণে যে, ১৯৬৬ সালের সরকারী টেষ্ট ক্রিকেট সিরিজে তারা ৩-১ খেলায় (ড্র ১) এই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলেরই কাছে পরাজয় বরণ করেছিল। আলোচ্য ত্রিদলীয় ক্রিকেট টুর্নামেণ্টে ইংল্যাণ্ড, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং বিশ্ব একাদশ দল অংশ গ্রহণ করেছিল। টেড ডেক্সটার ইংল্যাণ্ডের গারফিল্ড সোবার্স ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের এবং ববি সিম্পসন (অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক) বিশ্ব একাদশ দলের অধিনায়কত্ব করেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন খেলায় ইংল্যাণ্ড একাদশ ৮২ রানে এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ একাদশ ১৮ রানে বিশ্ব একাদশ দলকে পরাজিত করে। বিশ্ব একাদশ দলে অষ্ট্রেলিয়া (৩ জন), ওয়েষ্টইণ্ডিজ (১ জন) পাকিস্থান (২ জন), দক্ষিণ আফ্রিকা (৩ জন) এবং ভারতবর্ষের (পাতৌদির নবাব এবং বাপু নাদকার্ণী) খেলোয়াড় খেলেছিলেন।

আমেরিকান লন টেনিস :

১৯৬৬ সালের ৮৫তম আমেরিকান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলসে ফ্রেড ষ্টোলে, মহিলাদের সিঙ্গলসে মারিয়া বুনো (ব্রেজিল), পুরুষদের ডাবলসে রয় এমার্সন এবং ফ্রেড ষ্টোলে (অষ্ট্রেলিয়া) এবং মহিলাদের ডাবলসে মারিয়া বুনো (ব্রেজিল) এবং নান্সি রিচে (আমেরিকা) খেতাব জয় করেছেন। ফ্রেড ষ্টোলের পক্ষে এই প্রথম আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব জয় এবং বিশ্বের প্রধান চারটি লন টেনিস প্রতিযোগিতায় (অষ্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান) দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেতাব লাভ। ১৯৬৫ সালে তিনি ফ্রেঞ্চ সিঙ্গলস খেতাব জয় করেছিলেন। অপরদিকে কুমারী মারিয়া বুনো এই নিয়ে চারবার (১৯৫৯, ১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৬৬ আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব পেলেন।

পুরুষ বিভাগের ফাইনালে দু জনেই ছিলেন অবাছাই খেলোয়াড়—ফ্রেড ষ্টোলে এবং জন নিউকম (অষ্ট্রেলিয়া) আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে একটি দেশ থেকে একই বছরের পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল খেলায় কখনও প্রতিযোগিতার দুজন অবাছাই খেলোয়াড় খেলেননি—এই তার প্রথম নজির। এবছর পুরুষ বিভাগে প্রতিযোগিতার এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় এবং গত বছরের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান ম্যানুয়েল সান্তানা (সেবান) সেমি-ফাইনালে অবাছাই খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়ার জন নিউকমের কাছে পরাজিত হন এবং ২নং বাছাই রয় এমার্সন পরাজিত হন তাঁর ডাবলসের জুটি ফ্রেড

ষ্টোলের (অষ্ট্রেলিয়া) কাছে। রয় এমার্সন দু'বার (১৯৬১ ও ১৯৬৪) আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রতিযোগিতার এক নম্বর বাছাই এবং এ বছরের উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান শ্রীমতী বিলি জিন মোফিট কিং দ্বিতীয় রাউণ্ডেই অবাছাই খেলোয়াড় ১৯ বছরের অষ্ট্রেলিয়ান কুমারী কেরী মেলভিলের হাতে পরাজয় স্বীকার করেন। অষ্ট্রেলিয়ার টেনিস খেলোয়াড়দের জাতীয় ক্রমপর্য্যায় তালিকায় কুমারী মেলভিলের স্থান ৯ম। কুমারী মেলভিল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল পর্য্যন্ত উঠে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতার তিন নম্বর বাছাই নান্সি রিচের (আমেরিকা) কাছে পরাজিত হন। মহিলা বিভাগের ফাইনালে খেলেছিলেন ২নং বাছাই কুমারী মারিয়া বুনো (ব্রেজিল) এবং ৩নং বাছাই নান্সি রিচে (আমেরিকা)। এঁদের জুটিই মহিলাদের ডাবলস খেতাব পেয়েছেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস: ফ্রেড ষ্টোলে (অষ্ট্রেলিয়া) ৪-৬, ১২-১০, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে জন নিউকমকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: মারিয়া বুনো (ব্রেজিল) ৬-৩ ও ৬-১ গেমে নান্সি রিচেকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস: রয় এমার্সন এবং ফ্রেড ষ্টোলে (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে ডেনিস রলষ্টোন এফ্ ক্লার্ক গ্রাবনারকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস: ১নং বাছাই জুটি মারিয়া বুনো (ব্রেজিল) এবং নান্সি রিচে (আমেরিকা) ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে ২নং বাছাই জুটি বিল জিন মোফিট কিং এবং রোজমেরী ক্যাসলসকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ভাগীরথীর জলে দূরপাল্লার সাঁতার:

ভাগীরথীর বক্ষে আয়োজিত মুর্শিদাবাদ সুইমিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে দূর পাল্লার সাঁতারের (জঙ্গীপুর সদর ঘাট থেকে গোরাবাজার এবং জিয়াগঞ্জ সদর ঘাট থেকে গোরাবাজার সদর ঘাট) ফলাফল:

৭২ কিলোমিটার (৪৫ মাইল):

১ম বৈদ্যনাথ নাথ (কলকাতা স্পোর্টস্ এসো:)—সময় ৯ ঘণ্টা ২৭ মিনিট; ২য় দেবীপ্রসাদ দত্ত (ষ্টেট-ট্রান্সপোর্ট, কলকাতা)—সময় ৯ ঘণ্টা ৫১ মিনিট। গত দু বছর দেবীপ্রসাদ দত্ত এই বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ১৫ জন সাঁতারুর মধ্যে ৮ জন নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব পথ অতিক্রম করেন।

১৯ কিলোমিটার (১৩ মাইল):

১ম কালীকিঙ্কর মণ্ডল (ইষ্টার্ণ রেলওয়ে) সময় ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট; ২য় দুলালচন্দ্র মণ্ডল (বাগবাজার ইউনাইটেড) সময় ২ ঘণ্টা ১৬ মিনিট। গত দু বছর এই বিভাগে লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক (বি এন রেলওয়ে) প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ৩১ জনের মধ্যে যে ২৮ জন সাঁতারু নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করেন, তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা সাঁতারু ছিলেন—কলকাতার কুমারী কাজল ঘোষ। কুমারী ঘোষ ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে দূরত্ব অতিক্রম করে নবম স্থান পেয়েছিলেন।

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা—

কুয়ালালামপুরে আয়োজিত নবম মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ১—০ গোলে ব্রহ্মদেশকে পরাজিত করে টুঙ্কু আবদুল রহমন ট্রফি জয় করেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পক্ষে এই ট্রফি জয় এই প্রথম। মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা উৎসব দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর রাজধানী কুয়ালালামপুরে মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসে।

আলোচ্য নবম বার্ষিক প্রতিযোগিতায় এই দশটি দেশ—ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, তাইল্যাণ্ড, হংকং, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, ভারতবর্ষ, সিঙ্গাপুর, জাপান এবং তাইওয়ান যোগদান করেছিল। এই দশটি দেশকে দুটি গ্রুপে সমান ভাগে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলতে হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত মূল প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছিল দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশ। 'এ' গ্রুপে ব্রহ্মদেশ ৭ পয়েণ্ট অর্জ্জন করে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল এবং ৬ পয়েণ্ট পেয়ে রানার্স-আপ হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া। অপরদিকে 'বি' গ্রুপের খেলায় দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এবং ভারতবর্ষ সমান ৬ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে। প্রতিযোগিতার নতুন নিয়মে (স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ গোলের বিয়োগ ফলের ভিত্তিতে) দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ফাইনালে খেলবার অধিকার

লাভ করে। ভারতবর্ষ 'বি' গ্রুপের রানার্স আপ হয়। লীগের চারটি খেলায় ভারতবর্ষ ১—০ গোলে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, ৩—০ গোলে জাপান এবং ১—০ গোলে তাইওয়ানকে পরাজিত ক'রে ০—১ গোলে সিঙ্গাপুরের কাছে হেরে যায়। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ভারতবর্ষের একটি ন্যায্য গোল রেফারী বাতিল করেন; তাছাড়া তিনি এই খেলাটি চার মিনিট কম খেলিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করেও কোন সুবিচার পাওয়া যায় নি। তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় ভারতবর্ষ ১—০ গোলে দক্ষিণ কোরিয়া দলকে পরাজিত করেছিল।

রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতা :

আজাদ হিন্দ বাগে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় একটি জাতীয় রেকর্ডসহ মোট ৯টি রাজ্য রেকর্ড ভঙ্গ হয়—পুরুষদের সিনিয়র বিভাগে ৩টি, পুরুষদের জুনিয়র বিভাগে ২টি, পুরুষদের ইন্টারমিডিয়েট বিভাগে ১টি এবং বালক বিভাগে (১৬ বছরের নীচে) ৩টি। প্রতিযোগিতায় বিশেষ ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দেন বালী সুইমিং ক্লাবের সুনীল ঘোষ। পুরুষদের জুনিয়র এবং বালকদের ১০০ মিটার ব্যাকস্টোক সাঁতারে তিনি নতুন রাজ্য এবং জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ন্যাশনাল এস এ দুটি বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়।

প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগের দলগত প্রথম স্থান লাভ করে: পুরুষদের সিনিয়র বিভাগে ইস্টার্ণ রেলওয়ে (৫৫ পয়েণ্ট), পুরুষদের ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগে শৈলেন্দ্র এম সি (৪৩ পয়েণ্ট) পুরুষদের জুনিয়র বিভাগে বালী এস সি (৩৪ পয়েণ্ট) বালক বিভাগে (১৬ বছরের নীচে) ন্যাশনাল এস এ (১৯ পয়েণ্ট), মহিলাদের সিনিয়র বিভাগে ন্যাশনাল এস এ (১৪ পয়েণ্ট) এবং মহিলাদের জুনিয়র বিভাগে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিংস সোসাইটি (১৮পয়েণ্ট)।

বৃটিশ কমনওয়েলথ গেমস্ :

কিংস্টনে (জামাইকা) অনুষ্ঠিত অষ্টম বৃটিশ কমনওয়েলথ গেমসের দশদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে যেসব নতুন কমনওয়েলথ গেমস রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্তরণ বিভাগের ১৪টি বিশ্ব রেকর্ড এবং এ্যাথলেটিক্সের (পুরুষদের ৪×৪০০ গজ রিলে) একটি বিশ্ব রেকর্ড। বৃটিশ কমনওয়েলথের ৩৫টি দেশের হাজার খানেক প্রতিনিধি আলোচ্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য্যের তালিকায় প্রথম আসরে নিউজিল্যাণ্ডের শ্রীমতী ভ্যালেরী স্লোপার ইয়ংয়ের নাম। তিনি এবার নিয়ে পাঁচটি স্বর্ণপদক পেলেন—১৯৫৮সালে সটপুটে, ১৯৬২ ও ১৯৬৬ সালে সটপুট এবং ডিসকাসে। পুরুষদের এ্যাথলেটিক্সে কেনিয়ার ১ মাইল, ৩ মাইল এবং ৬ মাইল দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ের ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেনিয়ার কিপচো কিনো ১ মাইল ও ৩ মাইল এবং নাফতালি তেমু ৬ মাইল দৌড়ে প্রথম হন। বৃটিশ কমনওয়েলথ গেমসের ইতিহাসে একই বছরে একজনের পক্ষে ১ মাইল ও ৩ মাইল দৌড়ে স্বর্ণপদক জয় ইতিপূর্ব্বে সম্ভব হয় নি। তিন মাইল এবং ৬ মাইল দৌড়ে অষ্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত বিশ্বরেকর্ড স্রষ্টা রণ ক্লার্ক প্রথম স্থান অধিকার করতে পারেন নি। ৬ মাইল দৌড়ে কেনিয়ার অখ্যাতনামা এ্যাথলীট নাফতালি তেমুর, প্রথম স্থানলাভ একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

প্রতিযোগিতায় পদক লাভের চূড়ান্ত তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করে ইংল্যাণ্ড ৮০টি পদক (স্বর্ণ ৩৩, রৌপ্য ২৪ ও ব্রোঞ্জ ২৩), দ্বিতীয় স্থান অষ্ট্রেলিয়া—৭৩টি পদক (স্বর্ণ ২৩, রৌপ্য ২৮ ও ব্রোঞ্জ ২২) এবং তৃতীয় স্থান কানাডা—৫৭টি পদক (স্বর্ণ ১৪, রৌপ্য ২০ ও ব্রোঞ্জ ২৩)। ভারতবর্ষ মোট ১০টি পদক (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৪ ও ব্রোঞ্জ ৩) পায়।

ভারতবর্ষের পদক জয়

স্বর্ণপদক (৩) : হেভিওয়েট ভীম সিং, ব্যাণ্টামওয়েটে বিশ্বম্ভর সিং এবং লাইটওয়েটে মুক্তিয়ার সিং।

রৌপ্য পদক (৪) : কুস্তির ফ্লাইওয়েটে এস সাবলে এবং ফেদারওয়েটে রনধাওয়া সিং, ভারোত্তোলনে মোহন ঘোষ এবং হাতুড়ি নিক্ষেপে পারভিন কুমার।

ব্রোঞ্জ পদক (৩) : কুস্তির ওয়েল্টার ওয়েটে ডি সিং এবং লাইট হেভী ওয়েটে বিশ্বনাথ সিং; ব্যাডমিণ্টনে দীনেশ খান্না।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংল্যাণ্ড ঃ

ওভালে ইংল্যাণ্ড—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ৩৪ রানে জয়ী

হলে ১৯৬৩ সালের টেস্ট সিরিজের মতই ১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩—১ (ড্র ১) খেলায় জয় লাভের সূত্রে উপর্য্যপরি দ্বিতীয়বার 'উইসডেন ট্রফি' জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই শেষ টেস্ট খেলায় নতুন অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজ ইংল্যাণ্ড দল পরিচালনা করেন। ক্লোজ ইংল্যাণ্ডের এখন পর্য্যন্ত অধিনায়ক। তবে টসে নয়। পঞ্চম টেস্ট খেলাতেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক টসে জয়ী হলে একই সিরিজের পাঁচটি টেষ্ট খেলায় টসে জয়লাভের গৌরব লাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে একটি সিরিজের পাঁচটি টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় টসে জয়ী হয়েছেন এই চারজন অধিনায়ক : ১৯০৯ সালে এম এ নোবল (অষ্ট্রেলিয়া), ১৯২৭ সালে এইচ জি ডিন (দক্ষিণ আফ্রিকা), ১৯৫৩ সালে লিণ্ডসে হ্যাসেট (অষ্ট্রেলিয়া) এবং ১৯৬৪ সালে পাতৌদির নবাব (ভারতবর্ষ)।

১৯৬৬ সালের টেষ্ট সিরিজে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় উভয় দলের পক্ষে প্রথম স্থান পেয়েছেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স (খেলা ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ১, মোট রান ৭২২, এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান ১৭৪, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১০৩.১৪) এবং দ্বিতীয় স্থান ইংল্যাণ্ডের টম গ্রেভনী (খেলা ৪, ইনিংস ৭, নটআউট ১, মোট রান ৪৫৯, এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান ১৬৫, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৭৬.৫০)। বোলিং তালিকায় উভয় দলের পক্ষে শীর্ষ স্থান লাভ করেছেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ল্যান্স গিবস (ওভার ২৭৩.৪, মেডেন ১০৩, ৫২০ রানে ২১ উইকেট এবং গড় ২৪.৭৬) এবং দ্বিতীয় স্থান ইংল্যাণ্ডের কেন হিগস (ওভার ২৩৬.৪, মেডেন ৪৯, ৬১১ রানে ২৪ উইকেট এবং গড় ২৫.৪৫)।

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের মধ্যে এ পর্য্যন্ত যে ১২টি টেস্ট সিরিজে মোট ৫০টি টেস্ট খেলা হয়েছে তার ফলাফল : ইংল্যাণ্ডের জয় ১৭, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ১৬ এবং খেলা ড্র ১৭। উভয় দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ১২টি টেষ্ট সিরিজের ফলাফল : ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৫, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের রাবার জয় ৫ এবং 'রাবার' অমীমাংসিত ২ বার।
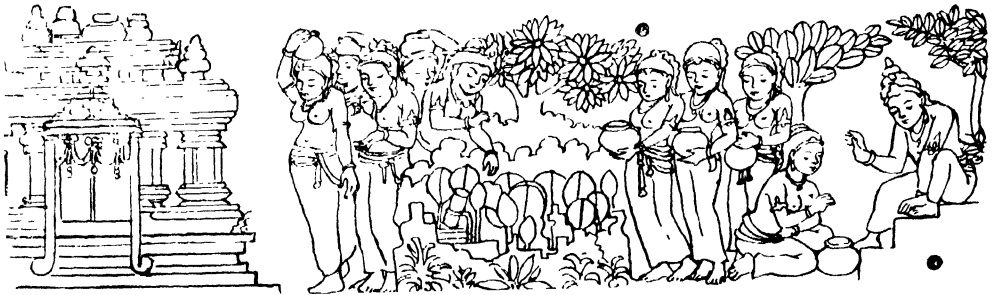
সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ২৮।৯।৬৬ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাল ভাল উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিপাসা ৪-৫০

তৃতীয় নয়ন ৪-৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এক জীবন অনেক জন্ম ৬-৫০

ঔ ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

দিব্যদৃষ্টি ২-৫০

অনুরূপা দেবী

গরীবের মেয়ে ৪-৫০ বিবর্তন ৪৲

রামগড় ৪-৫০ বাগ্‌দত্তা ৫৲

পোষ্যপুত্র ৪-৫০ পথের সাথী ৩৲

হারানো খাতা ৩৲

নিরুপমা দেবী

দিদি ৫৲

পুষ্পলতা দেবী

নীলিমার অশ্রু ৩-৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠ ৩-৫০

শক্তিপদ রাজগুরু

জীবন-কাহিনী ৪-৫০

কুমারী মন ৩-৫০

গৌড়জনবধূ ৫-৫০

মণিবেগম ৬-২৫

কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৫৲

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মনের অগোচরে ২৲

ভাস্কর

রুল্ অফ থ্রি ২-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

পরাজয় ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

ঝিনীর খাল ২-৫০

ননীমাধব চৌধুরী

দেবানন্দ ৪৲

প্রফুল্ল রায়

সীমারেখার বাইরে ১০৲

নোনা জল মিঠে মাটি ৮-৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পতনে উত্থানে ৫৲

সুধা হালদার ও সম্প্রদায় ৩-৭৫

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অচল প্রেম ৪৲

পঞ্চানন ঘোষাল

একটি অদ্ভুত মামলা ৫৲

একটি নির্মম হত্যা ২-৫০

অধস্তন পৃথিবী ৫৲

একটি নারী-হত্যা

অন্ধকারের দেশে

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২-৫০

মুস্কিল আসান ২-৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতার স্বাদ ৪৲

সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বয়ং-সিদ্ধা ৩৲

ভুলের মাশুল ১-৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিবস্ত্র মানব ৫-৫০

কার্টুন ২-৫০

দেহ ও দেহাতীত ৪৲

পতঙ্গ ১ম—২-৫০, ২য়—২-৫০

শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ভুলের ফসল ২৲

খেয়ালের খেসারৎ ২৲

বংশধর ২৲

ভোলা সেন

উপন্যাসের উপকরণ ২-৫০

অমরেন্দ্র ঘোষ

পদ্মদীঘির বেদেনী ৩৲

দক্ষিণের বিল ২য় ৪৲

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিরাজ-বৌ ২-৫০ রামের সুমতি ১-২৫ বিন্দুর ছেলে ১-২৫ পথ-নির্দেশ ১-২৫ কাশীনাথ ২-৫০

সমরেশ বসু

ছিন্নবাধা ৭-৫০

মায়া বসু

অগ্নিবলয় ২-৭৫

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশিয়ান শো ৪-৭৫

শ্যামপদ মুখোপাধ্যায়

কাল-কল্লোল ৪-৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কালকূট ৩৲ কানু কহে রাই ২-৫০ কাঁচামিঠে ৩৲ গৌড়-মল্লার ৪-৫০ বিজয়লক্ষ্মী ২-৫০ বহ্নি-পতঙ্গ ৩-৫০ পঞ্চভূত ২-৫০ ঝিন্দের বন্দী ৪-৫০ শাদা পৃথিবী ৩৲ ছায়াপথিক ৩৲ চুয়াচন্দন ৩-২৫

প্রবোধকুমার সান্যাল

নবীন যুবক ২-৫০ কলরব ২৲

প্রিয় বান্ধবী ৪৲

কয়েক ঘণ্টা মাত্র ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গন্ধরাজ ৩৲

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

নকল পাঞ্জাবী

বনফুল

পিতামহ ৬৲

নঞতৎপুরুষ ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

মিলন-মন্দির ৩৲

প্রভাত দেবসরকার

অনেক দিন ৩-৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

আশ্বিন—১৩৭৩

প্রথম খণ্ড | চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় স্বর্গগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তু তে॥ ১
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে॥
মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃ-বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ৩
মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ৪
ধূম্রনেত্রবধে দেবি ধর্ম্মকামার্থদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ৫

পরমার্তিহন্ত্রী

ডক্টর রমা চৌধুরী

আজ এই পরমশুভ শ্রীশ্রীমাতৃপূজা কালে, আমরা কতই না করছি তাঁর স্তব-স্তুতি কৃতজ্ঞচিত্তে, আনন্দোৎফুল্ল প্রাণে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়েও—

"দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়॥
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী॥
(শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪·১০)

"বেদত্রয়রূপা সর্বৈশ্বর্যময়ী,
বিশ্বহিতার্থে বৃত্তিধারিণী।
দেবী তিনি মহামহিমময়ী,
নিখিল ভুবন-দুঃখহারিণী॥"

"নিখিল ভুবন-দুঃখ-হারিণী"—সাধারণ জনদের দিক্ থেকে, এটী একটী অতি সান্ত্বনা দায়ক, অতি শান্তিকারক ধারণা। কারণ "সর্বং দুঃখং দুঃখম্" সর্বং শূন্যং শূন্যম্" "সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্" এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর কেই বা আছেন আমাদের চক্ষের জল মোছাতে, বক্ষের বল বাড়াতে, কক্ষের আলো জ্বালাতে? সত্যই, আর কে?

কিন্তু প্রাণের সরল-সরস আবেগ এক জিনিষ মনের জটিল-শুষ্ক চিন্তা, অন্য। সেজন্য ন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার এসে স্তিমিত করে দেয় অনেক ক্ষেত্রে ভাবের স্বতোদ্বেলিত গতি প্রবাহকে বহুলাংশে। এক্ষেত্রেও, ভারতীয় দর্শনের মূল-ভিত্তি "কর্মবাদ" অনুসারে পরমা জননীকে "নিখিলভুবন দুঃখ-হারিণী" বলা যায় কিরূপে—এই নিগূঢ় প্রশ্ন স্বতঃই এস্থলে উত্থাপিত হতে পারে। কারণ কর্মবাদানুসারে আমাদের সুখ-দুঃখ, উন্নতি অবনতি, বন্ধ মোক্ষ সবই সম্পূর্ণ-রূপেই নির্ভর করে আমাদের নিজেদের উপর, আমাদের নিজেদেরই কর্ম ও সাধনার উপর। সেক্ষেত্রে, জগজ্জননী কি করে আমাদের দুঃখক্লেশ হরণ করবেন, যেহেতু সে সব ত আমাদের নিজেদেরই সকাম-কর্মের ফল। তিনি সর্ব-শক্তিশালিনী হলেও, কর্মের অমোঘ বিধানে তাঁর হস্তক্ষেপ করবার কোনোরূপ অধিকারই নেই। সেজন্য কর্মবাদানু-সারে, আমরাই আমাদের দুঃখক্লেশের কারণ, আমরাই আমাদের দুঃখ-ক্লেশ-নিবারণেরও কারণ—কোনো দেবী, কোনো ঈশ্বর, কোনো ব্রহ্মের করণীয় এক্ষেত্রে কিছুই নেই।

এর উত্তর হল এই যে, ভারতীয় কর্মবাদ অনুসারেই পরমা জননীকে "পরমার্তিহন্ত্রী" বা "পরমদুঃখহারিণী" বলা চলে অনায়াসে। কারণ ন্যায়স্বরূপিণী পক্ষপাতরহিতা জগজ্জননী যে এই ভাবে জীবের দুঃখহরণ করেন তাও ত তাদেরই উপযুক্ত কর্ম অনুসারে, অকারণে নয়, যথেচ্ছ ভাবে নয়, অন্যায় করে নয়, পক্ষপাত করে' নয়। সেই উপযুক্ত কর্ম কি? সেই উপযুক্ত কর্ম হল: "অনুতাপ" ও তজ্জনিত "প্রায়শ্চিত্ত"—কেবল আনুষ্ঠানিক ভাবে নয়, কেবল বাহ্যিক ভাবে নয়, কিন্তু প্রকৃত ভাবে, আন্তর ভাবে স্বীয় ভাব-ভাবনা-প্রবৃত্তি কর্মের দিক্ থেকে। প্রত্যেক কর্মের যেমন ন্যায্য ফল থাকে, তেমনি "অনুতাপ—প্রায়শ্চিত্তের"ও ন্যায্য ফল আছে—সেই ফল হল "ঈশ্বর-কৃপা"; এবং এরূপ "ঈশ্বর কৃপা"র মাধ্যমেই আসে দুঃখ-হরণ, আসে মুক্তি, আসে আনন্দ।

কিন্তু, তা সত্ত্বেও, আরেকটী নিগূঢ় প্রশ্নও থেকে যায় এক্ষেত্রে। সেটী হল এই:—অনুতাপ ও তজ্জনিত প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত সাক্ষাৎ ভাবেই ত জীবের দুঃখ হরণ, মুক্তি ও ব্রহ্মা-নন্দ—এনে দিতে পারে অনায়াসে—তার জন্য ঈশ্বরকৃপার সাহায্যের প্রয়োজন কি?

এর উত্তর হল এই যে, ঈশ্বর-বাদে, এ ব্যতীত গত্যন্তর নেই। এই দার্শনিক মতানুসারে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমাদের সর্বদিক থেকেই স্বীকার করে' নিতেই হয়; এবং তিনি যদি থাকেন, তাহলে তাঁর সেই থাকা উদ্দেশ্য-বিহীন হতে পারে না; অর্থাৎ জীব-জগতের দিক্ থেকে, তাঁর করণীয় কর্ম নিশ্চয়ই কিছু আছে। সেই করণীয় কর্ম হল সৃষ্টি, ফলদান, মুক্তি। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই সব তিনি করেন জীবগণের স্ব স্ব কর্মানুসারেই, যথেচ্ছভাবে নয়, অকারণে নয়, অন্যায় করে নয়, পক্ষপাত করে' নয়!

এই কারণেই ঈশ্বরবাদে সগৌরবে, জোরের সঙ্গে, স্থির-বিশ্বাস ভরে বলা হয়েছে যে, জীব তার ভালো-মন্দ প্রত্যেক কর্মেরই ন্যায্য ফল-লাভ করে' ঈশ্বরেরই মাধ্যমে, ঈশ্বরেরই নিকট থেকে, ঈশ্বরেরই রোষে প্রসাদে। এই কারণে ঈশ্বরবাদানুসারে, জীবের যথোপযুক্ত কর্মানুসারে, ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্তা, ফলদাতা, দণ্ডদাতা, পুরস্কারদাতা, স্বর্গাপবর্গ-দাতা। না হলে, তাঁর আর থেকে লাভ কি? না হলে, তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত নিকটতম, মধুরতম, সম্বন্ধই বা থাকবে কি রূপে? কর্মবাদানুসারে, অবশ্য আমরা আমাদের স্ব স্ব কর্মানুসারেই যোগ্য ফল দাবী করতে পারি অনায়াসে। কিন্তু, তাহলে তাঁর সঙ্গে আমাদের মধুর, ব্যক্তিগত, সম্বন্ধের আর অবশিষ্ট রইল কি? সেজন্যই, তাঁরই শ্রীঅঙ্গভূত, তাঁরই চিরাশ্রিত আমরা কোনো কিছু দাবী না করে' মাথা পেতে মেনে নিই তাঁর দত্ত দণ্ড, তাঁর দত্ত প্রসাদ, তাঁর দত্ত ফল, তাঁর দত্ত স্বর্গ-নরক, তাঁর দত্ত সুখ-দুঃখ, তাঁর দত্ত বন্ধ-মোক্ষ! এরূপে, যা' সম্পূর্ণরূপেই আমাদের নিজেদের কর্ম থেকেই জাত, যাতে আমাদের নিজেদেরই পরিপূর্ণই দাবী-অধিকার আছে, তা'ও আমরা তাঁর উপরই সম্পূর্ণরূপেই ছেড়ে দিই; তাও আমরা তাঁর নিকট থেকেই পরিপূর্ণভাবেই চেয়ে নিই। মধুর মোহন ঈশ্বরবাদের এইত হল মূল কথা।

আজ এই বিশেষ শুভ-লগ্নে আমরা যেন এই মধুর মোহন তত্ত্বই বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে' ধন্যাতিধন্য হই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে তাঁকে বারংবার "বরদা" (১।৫৬, ৪।২২, ১১।৩৫), "মুক্তিহেতুঃ" (১।৫০, ১১।৫), "পরমার্তিহন্ত্রী" (৪।১০), "দুর্গপারা" (৫।১২) "শুভহেতুঃ" (৫।৮১), "ভদ্রা" (৫।১২৬) "প্রপন্নার্তিহরে" (১১।৩) "স্বর্গমুক্তি-প্রদায়িনী" (১১।৭), "স্বর্গাপবর্গদে" (১১।৮) "সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে" (১১।১০), "শরণাগত-দীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে" (১১।১২) "সর্বস্যার্তিহরে" (১১।১২), "বিশ্বার্তিহারিণি" (১১।৩৫), ইত্যাদি মধুরমোহন সম্বোধনে বিভূষিত করা হয়েছে, তা যে কেবল কথার কথা মাত্রই নয়, কেবল কবিত্বের উচ্ছ্বাস মাত্রই নয়, কেবল শূন্য-গর্ভ স্তুতিবাদ মাত্রই নয়—কিন্তু অক্ষরশঃ সত্য, প্রকৃত অর্থেই সত্য, প্রকৃষ্ট ভাবেই সত্য—সেই মহা-সত্যটাও যেন আজ আমরা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি—এই প্রার্থনা!

তবে কি স্বপ্ন শুধু

শান্তশীল দাশ

মানুষের সাথে মানুষ না যদি মেলে,
মন ভরে থাকে হিংসা ও বিদ্বেষে;
এগিয়ে-চলার সব অভিমান তবে
বৃথা হয়ে যাবে, সে-চলা অর্থহীন।
মানুষের বুকে মানুষ হানবে শর,
মানুষ কাঁদবে, লুটাবে ধূলার 'পরে,
মানুষের খুনে লাল হয়ে যাবে মাটি—
সৃষ্টির সেরা সে তবে কেমন করে!
জন্তুরা সব হিংস্র, যখন খুশি
নখ ও দন্তের শক্তিতে বলীয়ান
হয়ে, হানাহানি করে স্বভাবের বশে;
মানুষও করবে! তবে সে মানুষ কেন?
এই বিদ্বেষ, এই পশু-হিংস্রতা
ছাড়তেই হবে, না হ'লে ব্যর্থ সব;

মানুষ যদি না সত্যি মানুষ হয়,
তবে এই সব, সে কিসের অভিমান!
আজ বিদ্বেষ-বিষে জর্জর ধরা,
মানুষের বেশে দানবেরা ঘোরে ফেরে;
হত্যা-যজ্ঞে বুঝি বা মেতেছে সব,
দু'চার জনের অন্তরে শুধু প্রেম।
সে-প্রেমমন্ত্র তারা জপে নিশিদিন,
প্রেমের রাজ্য আসবে এ পৃথিবীতে—
এ স্বপ্ন দেখে, আর জনে জনে বলে,
'হিংসার পথ ছেড়ে দাও, ফিরে এসো।'
তাদের সে কথা কান পেতে কে-বা শোনে;
হয়তো বা শোনে, আবার তখনি ভোলে;
সারা পৃথিবীতে অস্ত্রের ঝনঝনা,—
প্রেমের রাজ্য তবে কি স্বপ্ন শুধু?

বৈকালের ম্লান আলো নেমেছে রাজস্থানের রুক্ষ বন্ধ্যা প্রান্তরে। মিটার গেজের গাড়ীটা হাঁপাতে হাঁপাতে চলেছে উদয়পুরের দিকে। খাড়াপথ, ট্রেনটা দম নিয়ে তবু চলেছে।

জানালার ধারে চুপ করে বসে আছে বাসবী। আজ সকাল থেকে কেমন যেন বদলে গেছে সে। এমনিতেই হাসি-খুসী প্রাণচঞ্চল একটি মেয়ে। যৌবন পার হয়ে উত্তরতিরিশের পথে চলেছে। জীবনের অতীতের একটি স্মৃতি আজ অকারণেই যেন বার বার তার সারা মনে কি একটা ঝড় তুলেছে। স্তব্ধ হয়ে সে ভাবছে।

বার বার তার মনে পড়ে হারানো অতীতের কথা-গুলো। স্বামীকে মনে পড়ে। মনে পড়ে তার সেই শ্যামসবুজ কোন ফেলে আসা গৃহকোণের স্মৃতি। বসন্তকে বাঁচাতে সে পারেনি।

অনেক আশা নিয়েই ঘর পেতেছিল সে আর বসন্ত। সামান্য ব্যবসা করত বসন্ত, ছোট্ট একটু ওষুধের টুকিটাকি কারখানার মত ছিল। বসন্ত আর অসিতবাবু দুজনের কারবার।

অসিতবাবুই টাকা দিয়েছিল আর বসন্তের ছিল বুদ্ধি আর পরিশ্রম। ক্রমশঃ ছোট থেকে বাড়-বাড়ন্ত

হচ্ছিল কারখানার। অসিতবাবুও আসত তাদের বাড়ীতে।

এমনি সময়ে বসন্ত অসুখে পড়ল। অনেক চেষ্টা করেছিল বাসবী, কিন্তু বসন্তকে বাঁচাতে পারেনি।

সে তো অনেকদিনের কথা, তবু বারে বারে আজ তাকে মনে পড়ে। মনে হয় বাসবী কোথায় এতদিন নিজের অজ্ঞাতসারে একটা হীন জঘন্য অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে।

এতদিন সেটা ঠিক স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েনি, আজ সেটা তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। আবিষ্কার করেছে তার মনের অতলে একটা দুঃসহ অগ্নিজ্বালা রয়ে গেছে।

কথা কইছ না যে?

বাসবী অসিতবাবুর দিকে একবার চাইল মাত্র শূন্য অর্থহীন দৃষ্টিতে।

লাইনটা তখনও চিতোরের সীমানা ছাড়িয়ে যায়নি। সমতল থেকে উঠে দাঁড়ানো একটানা পাহাড়ের মাথায় দেখা যায় চিতোর দুর্গের সীমা প্রাচীর। সারা পাহাড়টাকে মুকুটের বেষ্টনীর মত ঘিরে রয়েছে।

ওই দিকে চেয়ে থাকে বাসবী।

অসিতবাবুকে আজ অসহ্য মনে হয়। এতদিন ওকে সহ্য করে এসেছে। প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছে ওকে।

বসন্তের মৃত্যুর পর অসিতবাবুই তাকে ভরসা দিয়েছিল। কারবার ছোট থেকে বড় হয়েছে। এখন অসিতবাবু সেই কারবার থেকে অনেক টাকাই রোজগার করে। গাড়ী বাড়ীও হয়েছে বাসবীর। আজ মনে হয় অসিতবাবুর মনের সেই অন্ধকার দিকটাকে এতদিন অগ্রাহ্য করেছিল ওই অর্থের লোভেই। অনেকেই অনেক কথা বলেছে, বাসবীর কানেও এসেছে সেই সব জঘন্য কথাগুলো, কিন্তু সে কান দেয়নি।

কোথায় একটা মস্ত ভুল করেছে বাসবী এতদিন ধরে। সেও চেয়েছিল অনেক কিছু। বসন্তকে ভালবেসেছিল—কিন্তু সেই ভালবাসায় কোথায় মস্ত একটা ফাঁক আর ফাঁকিই ছিল। নইলে তার মৃত্যুর পর তাকে এত সহজে ভুলে গিয়েছিল কি করে।

টাকা গাড়ী বাড়ী—অসিতবাবু এই সব দিয়েই তার মনের অতলে নিজের একটা আসন পেতেছিল।

বাসবী!

বাসবী ডাকছে অসিতবাবু। ধূর্ত কোন লোভী লুণ্ঠনকারী।

বাসবীর সারা মন নীরব ঘৃণায় রি-রি করে ওঠে। নিজের উপরই আসে দুঃসহ ঘৃণা, ঘৃণা করে ওই লোকটাকেও।

অসিতবাবু বলে ওঠে—কি হল তোমার? শরীর খারাপ? তখনই বল্লাম এত ঘোরাঘুরিতে কাজ নেই। আজমীর থেকে সাবিত্রী পুষ্কর তীর্থ করলে, ব্যস সোজা চল মাউন্ট আবুতে। দিন কয়েক পাহাড়ে কাটানো যাবে। তা নয়—জিদ ধরলে চিতোর যাবো। আরে বাবা ওইতো ন্যাড়া পাহাড় আর পাহাড়ের মাথায় কেবল ভাঙ্গা বাড়ী আর ইঁট পাথর! ও দেখে কি হ'ল তোমার?

বাসবী কোন জবাব দিল না।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে সকালের ছবিটা। স্টেশন থেকে ভোরের আবছা আঁধারে চেয়ে থাকে ওই আকাশ সীমান্তের দিকে। কালো পাহাড় যেন মেঘের মত উঠে এসেছে আকাশকোলে, তার উপর দেখা যায় চিতোর দুর্গের কালো কালো ধ্বংসপ্রাপ্ত মহলগুলো। তবু ওই ধ্বংসের মাঝেও মাথা তুলে আছে রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ আর তারই স্ত্রীর প্রতি প্রীতির নিদর্শন ওই কুম্ভশ্যাম মন্দিরের চূড়াটা।

কালের প্রহরীকে তুচ্ছ করে ওই জয়নিশান আজও টিকে আছে চিতোরের শৌর্যের পরিচয় নিয়ে, টিকে আছে ওই কুম্ভশ্যাম মন্দির—মীরার ভক্তির চিহ্ন নিয়ে, আর দাঁড়িয়ে আছে চিতোর কলঙ্ক বনবীরের গড়া সেই বিরোধ প্রাচীর।

শীতের কনকনে হাওয়ায় অসিতবাবু কোট মাফলার জড়িয়ে টাঙ্গায় বসে আছে একটা ভালুকের মত। ওদিকে চেয়ে আছে বাসবী ওই আকাশছোঁয়া পাহাড়ের মাথার দুর্গের পানে।

পথে পথে এর ছড়ানো রয়েছে বীরত্ব প্রভুপ্রেম দেশপ্রেমের কাহিনী। বহুবার চিতোরের এই পথ তাদের রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

বাসবী ইতিহাসের সেই মৃত অতীতকে তার চোখের সামনে দেখতে পায়।

রুক্ষ প্রান্তরের বুক চিরে চলে গেছে গম্ভীরা নদী। কালো পাথরের উপর বয়ে চলেছে জলধারা। একটি ইতিহাসের নিষ্ঠুর চরিত্র তার সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে—

আলাউদ্দিন খিলজী! কঠিন রক্তলোভী একটি দানব, কি দারুণ তৃষ্ণা আর লালসা নিয়ে মাসের পর মাস ওই পর্বতদুর্গ অবরোধ করে বসেছিল এই···দু'চোখে তার জেগে উঠেছিল রূপের নেশা—পদ্মিনীর নেশা।

অসিতবাবুর দিকে একবার চাইতে একটু অবাক হয় বাসবী। ওর চোখে ও দেখেছে সেই নেশার ছায়া।

এতদিন অসিতবাবু তার এই রক্ত-মাংসের দেহটার দিকে দৃষ্টি দিয়ে এসেছে, সেই চাহনির মধ্যে এমনি সর্বনাশ লুকিয়েছিল জানেনি।

···বসন্ত মরে যাবার পর মুষড়ে পড়েছিল বাসবী। সব তার শূন্য হয়ে গেছে। কোন অবলম্বন নেই যা নিয়ে বাঁচবে, কাটবে তার জীবনের ব্যর্থ রিক্ত দিনগুলো।

এমনি দিনে অসিতবাবুই তার সামনে যেন কি এক নোতুন জগতের ছবি ফুটিয়ে তুলেছিল। সেদিনের বাসবী তার অর্থ বোঝেনি। তবু কেমন নেশার ঘোরেই এগিয়ে গিয়েছিল।

···খাড়া পাহাড়ের চড়াই বেয়ে টাঙ্গাটা উঠেছে। প্রথম ফটক পার হয়ে সামনেই পড়ে গোমুখী কুণ্ড। পাহাড়ের উপর থেকে জল ঝরছে, মিঠে স্বাদু পানীয়। ওই জলসঞ্চয় একদিন আলাউদ্দিন খিলজী, অপবিত্র করে চিতোরের তৃষ্ণা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

আজও সেই জল চিতোরের লোকদের তৃষ্ণা নিবারণ করে।

পাথরের খাড়া পাহাড় একদিকে, অন্যদিকে সুরু হয়েছে পাথরের কঠিন প্রাকার। পাহাড়ের গা বেয়ে পাঁচীলও উঠে গেছে। দুপাশে এর ছড়ানো জয়মল পুত্ত ঝালার মত অনেক বীরের শেষ সমাধি।

অতীতের সেই যুদ্ধ রক্তস্নাত পথে আজও সকালের স্তব্ধতার মাঝে দিনের প্রথম আলো বন্দনা জানায়, পাখী-গুলো কলরব ক'রে কোন অতীত গাথা গায়।

বৃদ্ধ গাইড শর্মাজীর ছানিপড়া চোখে তাই বোধহয় ফুটে ওঠে জলের রেখা। বুড়ো এই চিতোর গড়েরই নীচের কোন বস্তির লোক, এখানে মাটির সঙ্গে তার আজীবন সম্পর্ক। এখানে বাতাসে আজও সে কান পেতে শোনে অতীতের সেই কলকল্লোল।

পাহাড়ের উপর এসে পৌচেছে তারা, সমতল থেকে প্রায় হাজারখানেক ফিট উঁচু, চারিদিকে চিতোরের উপত্যকা, দূর দিগন্তে দেখা যায় নীল ছায়াছায়া পাহাড়-সীমা, সবুজ একটু স্পর্শ রেখে তারই বুকচিরে চলে গেছে ওই গম্ভীরা নদী।

পাহাড়টা প্রায় পাঁচ মাইল লম্বা, মাইল দুয়েক চওড়া। চারিপাশে এর সীমাপ্রাচীর। মধ্যে অনেকগুলো জলাশয় রয়েছে। মাথা তুলে আছে ওই জয়স্তম্ভ আর কুম্ভশ্যামের মন্দির।

বাতাসে আতাফুলের মদির সুবাস জাগে। চারিদিকে ওই ধ্বংসস্তূপের বুকে জন্মেছে হাজারো আতা গাছ, তাদেরই ফুলের সুবাস জাগে বাতাসে।

···স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাসবী।

বুড়ো শর্মাজী বলে চলেছে।

—এই চিতোরে সব প্রেমের জন্মস্থান মায়িজী, প্রভু-প্রেমের জন্য ত্যাগ করেছে পান্নাবাঈ, বনবীরের হাতে তার আপন সন্তানকে বলি দিয়েছিল। কৃষ্ণপ্রেমের প্রতীক মীরাবাঈ এই চিতোরের বউ।

পতিপ্রেম সতীপ্রেমের পরিচয় নিয়ে আছে চিতোরের এই কালামাটি, পদ্মিনীর মত পদ্মফুলও পুড়ে ছাই হয়েছে এখানে। আর দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক প্রতাপসিংহ।

কথাগুলো শুনে চলেছে বাসবী!

স্তব্ধ হয়ে ওরা বনবীরের দেওয়ার ছাড়িয়ে রাণা কুম্ভের মহলের দিকে এগিয়ে চলেছে বিশাল চত্বরের সীমা পার হয়ে। ধ্বংস-স্তূপ আর ধ্বংস এর চারিদিকে।

···তারই বুকচিরে ওরা এগিয়ে চলে।

দূরে কয়েকটা থাম, একটা সিংহদরজার ভগ্নাবশেষ, ওপাশে মাথা তুলেছে মীরাবাঈএর কুম্ভশ্যাম মন্দির, বাতাসে সেই আতাফুলের মদির সুবাস ঢাকা স্তব্ধতার রাজ্য।

শর্মাজী বলে ওঠে—এই সেই জহরের ঠাঁই। চারি-দিকে হাজারো শত্রুর দৃষ্টি। আঁধারে ঝক ঝক করে ওদের বর্শাফলক। মশালের আলো। তামাম চিতোর প্রান্তর ছেয়ে গেছে তাদের তাঁবুতে। লুব্ধ পশুরদল হঠাৎ

সচকিত হয়ে ওঠে, চিতোর কেল্লায় ওঠে আগুনের লাল আভা।

লোভের সব ইন্ধন পুড়ে ছাই হয়ে গেল! চিতোর বার বার করে দেখিয়েছে মায়ি, দুনিয়ায় চাওয়ার চেয়েও বড় কিছু আছে—সত্য কিছু আছে। নাহলে তামাম রাজপুতনার সব রাজাই ধর্ম দিয়ে মোঘল আমলে অনেক কিছু পেয়েছিল, কিন্তু কে তাদের আজ চেনে মায়ি? এঁদের কেউ ভোলেনি।

স্তব্ধতার অসীমে কোন অজানা এক রাজ্যে হারিয়ে গেছে বাসবী। বাতাসে ওই মিষ্টি সুবাস, শূন্য মন্দিরের চূড়ায় কোন কলসে পড়েছে রোদের আভা, দূরে তার ফেলে আসা জগতে ফিরে গেছে বাসবী। বসন্তকে মনে পড়ে, তাকে ভালবেসেছিল সে। কিন্তু কই তার মৃত্যুতে বাসবীর কোন চাওয়াই স্তব্ধ হয়নি। তাই বোধহয় এই অর্থ-সম্পদ প্রাচুর্য সে পেয়েছে অনেক মূল্যে।

এ কলঙ্ক একা তারই নয়, বসন্তেরও। তার স্ত্রীর মর্যাদা সে রাখেনি। কি পাবার আশায় সে মেতে উঠেছিল। প্রশ্রয় দিয়েছে লোভী একটি শয়তানকে।

...মাটির রং এখানে কালো, অন্ধকার কোন গুহাতলের দিকে গেছে পথটা। ওই অতল অন্ধকারে মহারাণী পদ্মিনী তার সব সম্মান কোন রত্নখনির অতলে সঞ্চিত রেখে গেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। জাগর কোন অজগর আজও সেখানে প্রহরায় রত।

—বহু পুণ্য মাটি মায়ি!

শর্মাজীর কণ্ঠস্বর কোন কালান্তর থেকে যেন ভেসে আসছে।

এ যুগের পদ্মিনীরা এ কথা বোধহয় শোনেনি। নিজেকে তারা বিকিয়ে নিয়েছে, চেয়েছে অর্থ, আরও অনেক কিছু!

—বাসবী!

অসিতবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

রোদ বেড়েছে বেশ চড়চড়ে রোদ। এখনও চিতোর কেল্লার অনেক পথ বাকী। ষ্টেশন ফিরতে হবে—তবে নাওয়া-খাওয়া হবে।

অসিতবাবু বলে ওঠে।

—এখানে দেখার কিছু নেই। চল ওদিকটায় ঘুরে আসি। সেই কুম্ভের-টুম্ব গোমুখ—সে সব কোনদিকে গাইড সাহেব?

বাসবী ওর দিকে চাইল। অসিতবাবুকে নোতুন করে দেখছে সে। ওর হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ধারে দাঁড়াল বাসবী। বলে ওঠে।

—ওসব ঘুরে আসুন, আমি এইখানেই বসছি।

অসিতবাবু গদগদ কণ্ঠে বলে ওঠে।

—তুমি না গেলে আমার দেখার সখ নেই বাসবী। চল না দুজনে একটু ঘোরা যাক লক্ষ্মীটি!

বাসবীর ফর্সা মুখখানা কি অপমানে লাল হয়ে ওঠে, কে যেন তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করেছে। বলে ওঠে কঠিন কণ্ঠে।

—কুম্ভশ্যাম মন্দিরে গিয়ে বসছি। আপনি যান!

একা থাকতে চায় সে। লোকটাকে তার অসহ্য ঠেকছে। ও যেন কোন নিষ্ঠুর লুণ্ঠনকারী, সব কিছু সে তার লুঠ করে নিয়েছে। বাসবীর মনের সেই দুর্বলতা ছিল। লুণ্ঠনকারী সেই সুযোগ নিয়েছে।

চুপ করে বসে আছে সে। শূন্য মন্দির ওই ধ্বংসতীর্থ আজ তার মনে নীরব ঝড় তুলেছে।

ট্রেনখানা চলেছে উদয়পুরের দিকে—বৈকালের ওই আলোমাখা চিতোর পাহাড়টার দিকে চেয়ে থাকে বাসবী। ও যেন কোন তীর্থ স্থান।

বলে চলেছে অসিতবাবু।

—এর তুলনায় মাউন্ট আবু যেন স্বর্গ। সুন্দর সবুজ গাছ-গাছালি, লেক মনোরম হোটেলগুলো। খাও দাও বেড়াও। মাউন্ট হোটেলে টেলিগ্রাম করে দিইছি—দিব্যি দিন কতক হাত-পা মেলে জিরোনো যাবে।

বাসবী ওর কথাগুলো শুনে চলেছে।

কোন তীর্থ দেখার আশাতেই সে এসেছিল, সব চিত্ত তার সেই সুন্দর সুরে ভরে উঠেছে। লোকটাকে অনেক প্রশ্রয় দিয়েছে সে, বেশ জেনেছে ওর লোভী মন ধীরে ধীরে কোন পাশব কামনা নিয়ে জেগে উঠেছে। বিশ্ব-জোড়া একটি বুভুক্ষা জেগেছে ওর সারা মনে। বলে চলেছে অসিতবাবু।

—সেবার একা এসেছিলাম মাউণ্ট আবুতে, ভাল লাগেনি বাসবী। বার বার তোমার কথা মনে হয়েছে। এবার চলেছি দুজনে।

বাসবী কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে।—আমার যাওয়া হবেনা ওখানে।

চমকে ওঠে অসিতবাবু—কেন? হোটেল বুক করেছি দুজনের জন্য।

বাসবীর সারা মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অনেক দিন চুপ করে থেকেছে। অনেক কিছু পাবার আশায় অনেক অপমান সয়েছে।

আজ নীরব একটি প্রতিবাদের কঠিন সুর জাগে বাসবীর মনে। সে ওসব চায় না।

সামান্য নিয়ে তৃপ্ত থাকবে, নিজের পায়েই দাঁড়াবে সে।

অহরহ সেই চিতাগ্নির জ্বালা বুকে নিয়ে মুখ বুঁজে এই পাওয়ার আশা আর সে করবে না। বসবী জবাব দেয় কঠিন স্বরে।

—আমি সোজা কলকাতা ফিরবো।

—অসিতবাবু অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। হাসি-খুশী সেই মেয়েটি কেমন বদলে গেছে। চোখে-মুখে ওর নীরব কাঠিন্য।

রাজস্থানের কঠিন প্রান্তরে নামছে দিন শেষের অন্ধকার, জ্বল-জ্বালা বুকে নিয়ে ট্রেনটা ছুটে চলেছে অন্তহীন দিগন্তের পানে। ওখানে কতকগুলো পাহাড় বাঁধা প্রাচীরের মত অবরোধ সৃষ্টি করেছে।

নূতন গৃহ

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

নূতন দেশে নূতন গৃহ!—
তোমার বিধান দয়ার নিধান,
হউক পরম স্পৃহনীয়।
অনেক দিনের জীর্ণ কুঁড়ে—
ছেঁড়া কাপড়—দিলাম ছুঁড়ে;
দেবতা মোর নওল কিশোর,
তাইতো নূতন আমার প্রিয়!
পরিয়ে দেব অঙ্গে তাহার—
অপরাজিতার আঙিয়া আর
কোমল কচি পাতাবাহার।
পঞ্চমুখী জবার শাড়ি
পরবে আমার নূতন বাড়ী,
স্বর্ণযূথীর সোনার হারে
করবো তারে রমণীয়।
গৃহ তো নয়—
তন্বী প্রিয়া!
রক্তগোলাপ—রঙ্গনে রূপ
উঠবে তাহার উচ্ছলিয়া।

হাস্নুহানার গন্ধে মরি,
তুলবো তারে আকুল করি',
করবীতেই গরবিনী
উঠবে হয়ে দর্শনীয়!
নূতন গৃহ নূতন দেশে।
সন্ধ্যা আসে—শেষের কুলায়
তাই বেঁধেছি অ-শেষে।
হা-ঘরে তুই মরলি ঘুরে,
বাঁধলি ডেরা জগৎ জুড়ে,
আর ভাসানো নয়কো তরী,—
তীরে বাঁধাই প্রার্থনীয়।
প্রণাম করি তোমায় ক্ষিতি,
স্রোতের জলে-ভাসা-পানা
তোমার কৃপায় পেলাম স্থিতি
ছন্নছাড়া যাযাবরে
স্নেহের ডোরে বাঁধলে ঘরে;—
হে ভগবান! চিরনূতন!
হেথায় শুভ সঙ্গ দিও!

রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ থেকেই জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই জীবনের প্রকাশ, আবার আনন্দ নিয়েই জীবের প্রত্যাবর্তন—এই সত্যদর্শন করেছিলেন ঋষিরা বহুকাল পূর্বে। বিশ্বের সর্বত্রই আনন্দের লীলা চলছে; কারণ পরমানন্দময়ের আনন্দ জীবজগতের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ যদি তার জীবনকে এই আনন্দ স্রোতে সিক্ত করতে পারে, তবে কেবল আনন্দ রসাস্বাদনই হবে না, পরিণামে হবে তার আনন্দময়ের সঙ্গে চির মিলন। রবীন্দ্রনাথ আনন্দের এই সদা জাগ্রতভাব রেখে গেছেন শান্তিনিকেতনের নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। দেশে উৎসব অনুষ্ঠান বরাবরই ছিল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে একটি নূতন রূপ দিয়েছেন ঋতু-উৎসবের মাধ্যমে। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতি নব নব রূপ ও রসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে; মানুষও যদি তাতে সাড়া দেয় তবে সেও নবীন হয়ে উঠবে নূতনের আস্বাদন লাভ করে। এইখানেই ঋতু-উৎসবের প্রয়োজনীয়তা।

শারদোৎসব শান্তিনিকেতনের অন্যতম মুখ্য উৎসব; ঠিক পূজোর ছুটির আগে এই অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয়। আগমনীসুরের ঝঙ্কার শোনা যায় আশ্রমের সর্বত্র, আর সকলের মধ্যে ছুটি ছুট রব পড়ে যায়; ছেলেমেয়েদের মন এই আনন্দরসে হয়ে ওঠে সিক্ত; আশ্রমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও এই সময় বিশেষ ভাবে ফুটে ওঠে। সকলের মনে বইতে থাকে অনন্ত আনন্দের সহস্র ধারা। এই আনন্দের পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে ওঠে কবিগুরুর লেখা 'শারদোৎসব' নাটকের অভিনয়ে।

এই নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় শান্তিনিকেতনে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। নাটক রচনার পেছনে একটু ইতিহাসও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তখন আশ্রমে থাকতেন লাইব্রেরি ঘরের দোতালায় খড়ের ঘরে ছেলেদের নিয়ে। এক সময় আশ্রমের ছেলেদের মধ্যে দেখা দেয় দারুণ উচ্ছৃঙ্খলতা; রবীন্দ্রনাথ তাদের কিছু না বলে একটি নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন ঐ ঘরে বসেই; আর প্রতিদিন সান্ধ্য-কৃত্যের পর ছেলেদের সঙ্গে বসে নূতন নূতন রচিত গানের মহড়া দিতে লাগলেন; এই যাদুমন্ত্রে কোথায় গেল ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতা, আর কোথায় গেল তাদের অসংযম। ছেলেরা মহানন্দে কবিগুরুর লিখিত গানগুলি শিখে নিল। এইভাবে রচিত হল শারদোৎসব নাটকটি; রবীন্দ্রনাথ একদিন এই নাটকটি সবাইকে পড়িয়ে শোনালেন নাট্যঘরে একটি সভার আয়োজন করে। নাটকটির বিষয়বস্তু মোটামুটি এই,—

তখন শরৎকাল; সোনালি রোদে চারিদিক ভরে উঠেছে; আকাশের গায়ে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘ; আশ্বিনের ছুটির আমেজ লেগেছে ছেলেদের মনে। তারা বাইরে বেড়িয়ে পড়েছে গান করতে করতে। সেই নগরের ধনী কৃপণ লক্ষেশ্বর ছেলেদের এই আনন্দ কোলাহলে তার হিসাব কষা ভুল হচ্ছে দেখে তাদের করল তাড়া; এমন সময় ঠাকুরদা এসে সব গোলমাল মিটিয়ে দিয়ে ছেলেদের নিয়ে গেলেন পঞ্চাননতলার মাঠে ঘুরিয়ে আনতে। ছেলেদের মধ্যে উপনন্দ নামে এক বালককে দেখে লক্ষেশ্বর জিজ্ঞাসা করছিল যে তার প্রভু টাকা পাঠিয়েছে কিনা। এর উত্তরে উপনন্দ দিল তার প্রভুর মৃত্যুসংবাদ! লক্ষেশ্বর এই শুনে একেবারে রেগে আগুন। উপনন্দ তাকে শান্ত করে বলল যে সেই তার প্রভুর ঋণ শোধ করবে। একদিন উপনন্দ ছিল পথের ভিখারী; তার প্রভু তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিলেন। সে উপকার কোনোদিন ভুলতে পারেনি উপনন্দ; তাই সে জানাল যে লক্ষেশ্বরের দাসত্ব করে সে প্রভুর ঋণ শোধ করবে।

উপনন্দ চলে যাবার পর লক্ষেশ্বরের ছেলে ধনপতি এসে তার বাবাকে বলল যে সেও ছুটি পেলে বেতসিনীর ধারে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে আনন্দোৎসব করতে যেতে পারে। বেতসিনীর কথা শুনেই লক্ষেশ্বর চমকে উঠল, কারণ সে ঐ নদীর ধারেই গজমোতির কৌটা পুঁতে রেখেছে। বাড়ীর কাউকে এমনকি বালক ধনপতিকে পর্যন্ত লক্ষেশ্বর বিশ্বাস করত না। সর্বদাই তার মনে হত তার ধনের সন্ধানে বুঝি সবাই ব্যস্ত। সুতরাং লক্ষেশ্বর তার ছেলেকে সেখানে যেতে না দিয়ে তাকে বলল নামতা মুখস্থ করতে; আর সে স্বয়ং গেল বেতসিনীর তীরে।

নদীর ধারে ছেলেদের দল ঠাকুরদাকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁকে ঘিরে ধরল। তখন সবাইমিলে ঘুরতে ঘুরতে এক গাছতলায় পুঁথি লেখায় নিরত উপনন্দকে দেখে ছেলেরা তাকেও নিয়ে নেতে চাইল তাদের সঙ্গে; কিন্তু উপনন্দ কাজের তাগিদ দিলে সন্ন্যাসী তার পাশে বসে জিজ্ঞাসায় জানতে পারলেন যে উপনন্দ তার প্রভুর ঋণ শোধের জন্য এমন সুন্দর দিনেও বসে বসে কাজ করছে। সন্ন্যাসী উপনন্দের কাছে জানতে পারলেন, যাঁর বীণা শোনার জন্য তিনি এসেছেন, উপনন্দ হচ্ছে সেই বীণাচার্য সুরসেনের আশ্রিত। এক শ্রাবণে প্রবল বর্ষণে লোকনাথের মন্দিরে আশ্রয়প্রার্থী উপনন্দকে নীচ জাতি ভেবে মন্দিরের পুরোহিত তাকে তাড়িয়ে দিলে সেই মন্দিরের বীণাবাদনে নিরত সুরসেন এই ব্যাপার দেখে মন্দির ছেড়ে বালকের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে। উপনন্দ সেই থেকে বীণাচার্যের কাছেই মানুষ হয়েছে। উপনন্দকে রঙ দিয়ে চিত্র করে পুথি লেখার বিদ্যে শিখিয়ে গেছেন সেই আচার্য; আজ সেই বালক ঐ বিদ্যার সাহায্যে পুঁথি নকল করে লক্ষেশ্বরের হাত থেকে তার প্রভুকে ঋণমুক্ত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

উপনন্দ যে স্থানে বসে কাজ করছিল, ঠিক সেখানেই পোঁতা ছিল লক্ষেশ্বরের গজমোতির কৌটা। বালককে ঐ জায়গায় বসে থাকতে দেখে লক্ষেশ্বরের হয় অত্যন্ত সন্দেহ; সুতরাং সে উপনন্দকে সেখান থেকে উঠে যেতে বলে উভয়ের মধ্যে বচসার কারণ সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলে লক্ষেশ্বর তাঁকে ভণ্ড সন্ন্যাসী বলে অপমানিত করে। তখন ঠাকুরদা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলে শেষে লক্ষেশ্বর সন্ন্যাসীর আশ্রয়েই রক্ষা পায়। লক্ষেশ্বরের তিনটি জাহাজ তখনও বাণিজ্য শেষ করে ফেরেনি; পাছে সন্ন্যাসীর অভিশাপে সব নষ্ট হয়ে যায়, এই ভয়ে সন্ন্যাসীর মনকে প্রফুল্ল করার জন্য ঠাকুরদা সহ তাঁকে আমন্ত্রণ করল নিজের বাড়ীতে লক্ষেশ্বর। তার কাছে ভিক্ষা পাবেন জেনে সন্ন্যাসী মহাখুশী। সন্ন্যাসী ও ঠাকুরদাকে এগুতে বলে দিয়ে লক্ষেশ্বর গেল আবার উপনন্দের কাছে সেই জায়গা থেকে তাকে ওঠাবার জন্য। উপনন্দ সেই স্থান ত্যাগ করে লক্ষেশ্বরকে জানাল, এইভাবে তাকে অপমান করায় সে মনে করে যে অপমান সহ্য করেই সে ঋণ স্বীকার থেকে মুক্ত হল। এই বলে উপনন্দ সে-স্থান থেকে উঠে গেলে লক্ষেশ্বর দেখল যে কতকগুলি ঘোড়সওয়ার তার দিকে আসছে। তাতে সে মহাভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে সন্ন্যাসীকে হাতে পায়ে ধরে উপনন্দের পরিত্যক্ত স্থানে বসিয়ে বলল যে তিনি যেন কোনো কারণেই বা কারোর কথাতে ঐ স্থান ত্যাগ না করেন। সন্ন্যাসী পরে কথামতো কাজ করলে তাঁর ভিক্ষার পরিমাণ আরও বেশী করে দেবে লক্ষেশ্বর—এ কথা সন্ন্যাসীকে সে জানাতে ভুলল না! ঠাকুরদা লক্ষেশ্বরের এই উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল যে তাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে। কারণ সে নাকি অনেক টাকা মাটিতে পুতে রেখেছে। তাই রাজা অনেক স্থানে মাটি খুড়ে বেড়াচ্ছেন প্রজাদের জলদানের ছলে। এমন সময় এক দূত সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানিয়ে বলল যে মহারাজ সোমপাল তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থী। সন্ন্যাসী তাকে বললেন, এ স্থান থেকে নড়লে তাঁর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে; সুতরাং রাজার প্রয়োজন থাকলে তিনি যেন এখানে আসেন। লক্ষেশ্বর এই ব্যাপারে সেখানে রাজসমাগম নিশ্চিত ভেবে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করল।

সন্ন্যাসীর কাছে এসে সামন্তরাজ সোমপাল বললেন যে বিজয়াদিত্যের অধীনে সামন্তরাজ হয়ে তিনি আর পেরে উঠছেন না। বিজয়াদিত্যের শক্তি কি করে খর্ব করা যায় তা সামন্তরাজ সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলে সন্ন্যাসী বললেন যে সোমপালকে এ-বিষয়ে ভাবতে হবে না, স্বয়ং সন্ন্যাসী তাঁকে ধরে এনে সামন্তরাজের সভায় হাজির করবেন। সোমপাল সন্ন্যাসীকে আরও জানান যে

বিজয়াদিত্য অতি সাধারণ মানুষ ; শুধু রাজার পোষাক পরে নিজেকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেন। সন্ন্যাসী তাঁর কথায় সায় দিয়ে জানালেন যে এ-ব্যাপারটা তাঁরও অজানা নয়। তিনি দেখেছেন, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বোনার আগে বৃষ্টি হলে চাষী গৃহস্থের সীতার পূজো অনুষ্ঠানে বিজয়াদিত্য চাষীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সারাদিন কাটিয়ে দেন গান-বাজনা ও বনভোজনে। রাজাই হোন আর যাই হোন তাঁর ভেতরে যে চাষাটা আছে তা লুকিয়ে রাখবেন তিনি কি করে! বিজয়াদিত্যের এই সত্য পরিচয় প্রকাশ করিয়ে দেবার জন্য সামন্তরাজ সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করলে সন্ন্যাসী তাঁকে আশ্বাসদানে নিশ্চিন্ত করলেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে সোমপাল রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।

ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীর কাছে এসে উপনন্দ জানাল যে প্রভুর ঋণশোধের কোনো উপায় সে করতে পারছে না। প্রাণের বিনিময়ে সে ঋণমুক্ত হতে চায় ; অথবা কোনো মহাত্মা যদি হাজার কার্ষাপণে তাকে কিনে নেন তবে সেই অর্থ লক্ষেশ্বরকে দিয়ে সে প্রভুকে ঋণমুক্ত করতে পারে। সন্ন্যাসী বিজয়াদিত্যের কথা পাড়লে উপনন্দ বলল যে তার মতো অকেজো ছেলেকে তিনি কোনো দাম দিয়ে কিনবেন না। এর উত্তরে সন্ন্যাসী বললেন, বিনা মূল্য কেনার ক্ষমতা যদি বিজয়াদিত্যের থাকে, তবে বিনামূল্যেই তিনি কিনে নেবেন ; পক্ষান্তরে উপনন্দের ঋণ শোধ করিয়ে দিতে না পারলে বিজয়াদিত্যের নিজেরই এত ঋণ জমবে যে তাতে তাঁর রাজভাণ্ডার হবে লজ্জিত। পরম আশ্বস্ত হয়ে সন্ন্যাসীকে জানাল যে তাকে পুঁথি নকল করার কাজ করে যেতে হবে যতদিন বিজয়াদিত্য তাকে কিনে না নিচ্ছেন ; কারণ তাতে উপার্জিত অর্থে খানিকটা ঋণ শোধ হবে।

কথায় কথায় লক্ষেশ্বর জানতে পারে যে লক্ষ্মীর পদ্মটির ওপরেই সন্ন্যাসীর লোভ। তাই সন্ন্যাসীর সঙ্গে একযোগে লক্ষেশ্বর কাজ করতে চাইলে সন্ন্যাসী তাকে জানায় যে লক্ষ্মীর পদ্ম লাভ করতে গেলে সন্ন্যাসী হতে হবে। লক্ষেশ্বর অনেক চিন্তা করে তাতে রাজি হয়ে গেল ; কিন্তু উপনন্দ সন্ন্যাসীর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে যাবার পর লক্ষেশ্বর সন্ন্যাসীকে জানায় যে বহু কষ্ট করে সে কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করেছে, সন্ন্যাসীর কথায় সব ছেড়ে দিলে শেষকালে তাকে কষ্টে পড়তে হবে। সন্ন্যাসী তার কথায় সায় দিলে লক্ষেশ্বর আশ্বস্ত হল। পরে সন্ন্যাসীর উপবিষ্ট স্থান খুড়ে লক্ষেশ্বর গজমতির কৌটা বের করে সন্ন্যাসীকে বলল, তোমাকেই এই গজমোতি দেখালাম, আর তোমাকে দেখিয়ে আজ আমার মন খানিকটা হালকা হল। এই গজমোতির জন্যই তার রাত্রে ঘুম হয়না—একথাও সন্ন্যাসীকে জানাতে সে ভুললনা।

এর মধ্যে ছেলের দল সেখানে উপস্থিত হলে স্থির হল যে তারা সবাই মিলে শারদোৎসব খেলবে, আর তাদের পুরোহিত হবেন স্বয়ং সন্ন্যাসী। ছেলেরা তখন সন্ন্যাসীকে কাশফুল, ধানের মঞ্জরী ও শিউলির মালা দিয়ে সাজিয়ে দিল। তখন সন্ন্যাসী বললেন, প্রকৃতি আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে সর্বত্র ; তার সঙ্গে অন্তরে বাইরে মিলতে না পারলে শরতের উৎসবে যোগ দেওয়া যাবেনা। তাই সন্ন্যাসী ঠাকুরদাকে বললেন ছেলেদের সোনালী রঙের পোষাক পরিয়ে আনতে। পরে ছেলেরা সোনালি রঙের কাপড় পরে আর সাদা সাদা ফুল নিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে ফিরে এলে সন্ন্যাসী শারদলক্ষ্মীর অর্ঘ্য সাজিয়ে বেদমন্ত্র পাঠ করলেন ; অনন্তর তাঁর আবাহনগান গেয়ে বনপথ প্রদক্ষিণ করতে বললেন ছেলেদের ঠাকুরদার সঙ্গে ; যাতে বনলক্ষ্মী জেগে ওঠেন তাদের গানে।

ছেলেরা ঠাকুরদাকে নিয়ে শারদোৎসবের গান গাইতে গাইতে বন প্রদক্ষিণ করে সন্ন্যাসীর কাছে ফিরে এল। তখন সন্ন্যাসী তাদের বললেন, তোমাদের গান একেবারে আকাশের পারে গিয়ে শারদলক্ষ্মীকে জাগিয়েছে, তাঁর খোলা দ্বারও যাচ্ছে দেখা। সন্ন্যাসী তখন নিজে আগমনী গান গেয়ে সকলকে বললেন যে শারদা দেবী আসছেন সাদা সাদা ভাসমান মেঘ, সোনার রঙ, আর শিশির-ভেজা বাতাস নিয়ে। ঠাকুরদা তখন তাঁর বরণ-গান গেয়ে উঠলেন। পরে এই গানটি গাইতে গাইতে ছেলের দল সমস্ত বনভূমি ও নদীতট কাঁপিয়ে তুলল।

ছেলেরা চলে যাবার পর হঠাৎ লক্ষেশ্বরকে দেখা গেল গেরুয়া কাপড় পরে সেখানে আসতে। সে এসেই সন্ন্যাসীর হাতে গজমোতির কৌটাটি দিয়ে অতিসাবধানে তার কাছে রাখতে বলল। সন্ন্যাসী লক্ষেশ্বরের এই কারণ

জিজ্ঞাসা করলে সে বলল যে তার এই পরিবর্তন সহজে হয় নি। সন্ন্যাসী হওয়া ছাড়া তার আর উপায়ও নেই; কারণ সম্রাট বিজয়াদিত্য সসৈন্যে আসছেন দিগ্বিজয়ে; কাজেই তার ঘরে আর কিছু রাখার উপায় নেই। কেউ সন্ন্যাসীর গায়ে হাত দিতে পারবেনা জেনে লক্ষেশ্বর তার কাছেই সব রেখে নিশ্চিন্ত হতে চায়। এমন সময় সামন্তরাজ সোমপালও ছুটতে ছুটতে সন্ন্যাসীর কাছে এসে বললেন যে বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে, সৈন্যদলও এল বলে। সন্ন্যাসী সামন্তরাজের কথা শুনে বললেন, বোধ হয় শরতের আনন্দই তাঁকে বের করেছে ঘর থেকে রাজ্যবিস্তারে। এই কথায় সোমপাল আরও ভয় পেলেন। তাঁর উপর বিজয়াদিত্যের কোনো আক্রোশ থাকতে পারে ভেবে সোমপাল রাজচক্রবর্তী হবার আশায় জলাঞ্জলিদিয়ে আত্মরক্ষার জন্য শরণ নিলেন সন্ন্যাসীর কাছে। ইতিমধ্যে বিজয়াদিত্যের মন্ত্রীরা এসে 'মহারাজাধিরাজ বিজয়াদিত্যের জয়' বলে প্রণাম করলে সন্ন্যাসীর গাত্রসংলগ্ন সোমপাল বলে উঠলেন যে তিনি তো বিজয়াদিত্য নন, তারই চরণাশ্রিত সামন্তরাজ। শেষে ভুল ভাঙলে সোমপাল দেখলেন, সন্ন্যাসীই স্বয়ং বিজয়াদিত্য। তখন লজ্জা, ভয় ও সংকোচে তাঁর মুখ গেল শুকিয়ে। তাঁর এই অবস্থা দেখে সন্ন্যাসী তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, রাজা হওয়া সহজ নয়—রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।

ইতিমধ্যে উপনন্দ সন্ন্যাসীর কাছে আসতেই সামন্তরাজ সোমপালকে দেখে সে ফিরে যেতে চাইলে সন্ন্যাসী তাকে ডেকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। উপনন্দ জানাল, এ-কয়দিন পুঁথি লিখে সে তিন কাহন পরিশ্রমিক পেয়েছে। এই বলে বালক সেই অর্থ দেখালে সন্ন্যাসী স্বয়ং তা গ্রহণ করলেন অতি অমূল্য বলে এবং আরও বললেন যে এই বহুমূল্য কার্ষাপণ ঋণ শোধের জন্য লক্ষেশ্বরকে দিলে অর্থেরই অপমান করা হবে। সন্ন্যাসীর এই ব্যাপার দেখে লক্ষেশ্বরের মনে দারুণ আশঙ্কা হল; সে ভাবল, সন্ন্যাসীর কাছে গচ্ছিত তার গজমোতির কৌটা নিশ্চয়ই খোয়া গেল। লক্ষেশ্বরের মনের ভাব বুঝতে পেরে সন্ন্যাসী তখনই তাঁর শ্রেষ্ঠীকে ডেকে হাজার কার্ষাপণ দিতে বললেন লক্ষেশ্বরকে। তাই শুনে উপনন্দ সন্ন্যাসীকে বলল যে সে তাহলে শ্রেষ্ঠীরই কেনা হয়ে রইল। সন্ন্যাসী তখন উপনন্দকে সাদরে কাছে টেনে বললেন যে সে তো সন্ন্যাসীর ধন, শ্রেষ্ঠীর ক্ষমতাই নেই এই ধন কিনে নেবার। এই বলে তিনি সকলকে ডেকে বললেন যে তাঁর পুত্র নেই বলে সবাই আক্ষেপ করত; কিন্তু আজ সন্ন্যাসধর্মের বলে যে পুত্রটিকে তিনি লাভ করলেন, তার তুলনা নেই। এর পর সন্ন্যাসী লক্ষেশ্বরের হাতে তার গজমোতির কৌটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন যে লক্ষেশ্বরের কাছেও তার কিছু প্রাপ্য আছে। এ-কথা শুনে লক্ষেশ্বরের মুখ গেল শুকিয়ে। সন্ন্যাসী তাকে বললেন যে তার কাছে সন্ন্যাসীর পাওনা আছে এক মুষ্টি চালের; কিন্তু রাজার মুষ্টি কি সে ভরাতে পারবে? উত্তরে লক্ষেশ্বর জানাল যে সে তো রাজার মুষ্টির কথা বলেনি, সন্ন্যাসীর মুষ্টি ভেবেই বলেছিল। এই কথা শুনে সন্ন্যাসী তাকে অভয় দিলে লক্ষেশ্বর নিশ্চিন্ত হল এবং যাবার সময় সন্ন্যাসীর কাছে কিছু উপদেশ চাইলে তিনি বললেন যে লক্ষেশ্বরের উপদেশগ্রহণের সময় এখনও আসেনি। তাই শুনে লক্ষেশ্বর গজমোতির কৌটা নিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে শারদোৎসবে নিরত ছেলের দল 'সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর' বলে ছুটে আসতেই সামনে সামন্তরাজ সোমপালকে দেখে পালাতে উদ্যত হলে রাজ-সন্ন্যাসী তাদের ডেকে বললেন যে তাদের পালাতে হবে না; যার জন্য তারা পালাচ্ছে সেই পলায়ন করুক। অতঃপর সামন্তরাজকে উৎসব সভা প্রস্তুত করার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী ছেলেদের সঙ্গে মিশে গেলেন। ছেলেরা বলল যে তারা বনের পথে পথে সব জায়গায় শারদোৎসবের গান গেয়ে আসছে, এবার সন্ন্যাসীর কাছে গেয়ে শারদোৎসব অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করবে—এই বলে ছেলেরা সন্ন্যাসীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে শারদোৎসবের গান শেষ করল। এইখানেই শারদোৎসব নাট্যকাহিনীর পরিসমাপ্তি।

রবীন্দ্রনাথের স্থির ধারণা ছিল যে নানা ফুল-ফলে আলোকে বাতাসে পৃথিবীতে আনন্দ ও উৎসবের সাড়া পড়লে মানুষ যদি অন্তরের সঙ্গে তা আবাহমান না করে তবে তার জীবনের একটি বিশেষ স্থান শূন্যতায় ভরে উঠবে; সে বঞ্চিত হবে পবিত্র ও নির্মল এক মহানন্দ

থেকে। মানুষের সঙ্গে মানুষ মেশে তার নিত্য প্রয়োজনের জন্য; কিন্তু যেদিন তার মিলন শুধু হাটের মেলা বা বাটের মেলা হয় না, সেই দিন তার মিলন উৎসবের আকার ধারণ করে। বিচিত্র বিশ্বকে চিত্ত ভরে না দেখলে বিরাটের সঙ্গে কখনও মিলন হতে পারে না। সমগ্রতার উপলব্ধি হয় তখনই যখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে হয় চিত্তের মিলন। বিশ্বপ্রকৃতি নব নব ঋতুতে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে আহ্বান করে; কিন্তু মানুষ অজ্ঞতায় যদি সেই ডাকে সাড়া না দেয় তবে সমস্ত জগতের স্পর্শমাধুর্য ও তার আনন্দ থেকে চিরতরে সে হয় বঞ্চিত। লক্ষেশ্বর বিপুল ধনের অধিকারী হয়েও এই সুনির্মল বিরাট সুখানুভূতি থেকে বরাবরই বঞ্চিত; আর সম্রাট বিজয়াদিত্য অতুল ধনের অধীশ্বর হয়েও নিজেকে ভুলে সকলের সঙ্গে মিলিত হতে চাচ্ছেন লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের নিকেতন শতদল পদ্মটি পাবার জন্য। এই পদ্মটি সামান্য একটি প্রাকৃত বিষয় নয়, উপনন্দের তপস্যার মধ্যেই রয়েছে এর আসল পরিচয়। তার প্রভু যে ঋণ করে গেছেন, তার পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করে উপনন্দ উপাসনা করেছে সেই চিরসুন্দরেরই। বালক উপনন্দের মধ্যে এই প্রেমঋণ পরিশোধের একান্ত প্রযত্ন দেখে রাজসন্ন্যাসী জেনেছেন, এইতো আত্মোৎসর্গের মূল সৌন্দর্য। এই ঋণশোধের পালা রয়েছে শারদোৎসব নাটকটির মধ্যে, আর এই ঋণশোধেই হয়েছে চির সুন্দরের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ উপনন্দের মধ্যে এই সত্য লক্ষ্য করে বলেছেন—"শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসিয়া উপনন্দ তার ঋণশোধ করিতেছে। রাজসন্ন্যাসী এই প্রেমঋণ পরিশোধের এই একান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখিতে পাইলেন। তাঁর তখনই মনে হইল, শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য। শরতে এই যে নদী ভরিয়া উঠিল কূলে কূলে এই যে খেত ভরিয়া উঠিল শস্যের ভারে, ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে। সে-এই—প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেটাকেই বাহিরে নানারূপে নানা রসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভাল করিয়া শোধ করা হয়; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য।"

এই সত্যের প্রকাশ ঘটেছে বালক উপনন্দের মধ্যে। ঋণ শোধেই যে যথার্থ ছুটি বা মুক্তি তা সন্ন্যাসী দেখতে পেয়েছেন উপনন্দের কাজের মধ্যে। নিজের মধ্যে যতই অমৃততত্ত্বের প্রকাশ পায়, ততই বন্ধনের হয় মুক্তি। কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে তপস্যার মধ্যে কোনো পরিত্রাণ লাভ করা যায় না। সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মী; দুঃখের সাধনায় এই লক্ষ্মীকে পাওয়া যায়। যে মানুষ বা জাতির মধ্যে এই তপস্যার অভাব বা দুঃখ স্বীকারের জড়তা রয়েছে, সেখানে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় না; অতুল সম্পদ থাকলেও তার মধ্যে বিরাজ করে চিরশূন্যতা।

বিলসিত

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

জীবনের তীর ছুঁয়ে তরী যদি ছুটে চলে দূরে
অজানার সেই পথে—যাব যাব দুরন্ত দুপুরে,
রোদে রোদে ঝিলমিল ঢেউগুলি ফুলে ফেঁপে ওঠে
মন তারি পিছু নিয়ে পারা গেলে ভালো করে ছোটে।

তীর থেকে ফুল পাতা দুটো লতা ভেসে ভেসে চলে
আমি তারি পথ চিনে যেতে পারি হয়তো বা দলে,
আমার তো কাজটুকু এইভাবে হয়ে যাবে যদি
আমি এক ঝিরিঝিরি হতে পারি স্রোতস্বতী নদী।

আমার যে চলা হবে পথে পথে ফেলে রেখে ফুল
হয়তো বা ভরা থাকে সেইখানে জীবনের ভুল;
আমি শুধু তার মাঝে পথ চিনে চলি আর চলি
জীবনের বহুবিধ ব্রত কথা বলি আর বলি।

প্রাণে পূর্ণ প্রকাশের লীলাতীর্থে বিলসিত মণি—
তবু কেন গন্ধে-স্পর্শে গানে গানে কি গুঞ্জন ধ্বনি!
বাতাসের মুখরিত দোলা লেগে দোদুল দোলায়
দোলায়িত মন যেন দুলে দুলে চলেছে মেলায়।

কর্ত্তা ও গিন্নি

শ্রীপ্রসাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহকুমার ছোট সহর। শীতের রাত্রি। সময় প্রায় দশটা। পথ নির্জ্জন। পথিপার্শ্বের গৃহগুলি আলোকহীন, নিদ্রিত, নিস্তব্ধ। নির্মেঘ কুহেলিকাময় আকাশে অস্তগামী খণ্ডিত চন্দ্রের ক্লিষ্ট হাসি!

গৃহকর্ত্তা রায়সাহেব মৃগাঙ্কবাবু অপ্রত্যাশিতভাবে সাধুসঙ্গে রাত্রির প্রথম যাম অতিবাহিত করিয়া একটু ভীত ত্রস্তভাবে তাহার গৃহ সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পথিপার্শ্বের কক্ষের দ্বার ভিতর হইতে অর্গলরুদ্ধ। কিন্তু জানলাগুলি সব উন্মুক্ত। জানালার পার্শ্বে আসিয়া তাহার মনে হইল—বাড়ীর ভিতরের দিকে আলোর রেখা। কে বা কাহারা নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা বলিতেছে। বাড়ীতে তাহার একটি চিররুগ্‌ণা স্ত্রী ও তাহার পরিচারিকা ভিন্ন তৃতীয় অন্য কেহ নাই। গৃহিণীর যেরূপ রুক্ষ স্বভাব, তাহাতে তাহার বাড়ীর পরিচারিকার সঙ্গে এত রাত্রে বিশ্রম্ভালাপ অসম্ভব। ঝি-চাকরের সঙ্গে তাহার বাক্যালাপ—হয় চিৎকার, না হয় তিরস্কার! রায়সাহেব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তবে কি তাহার স্ত্রীর অসুখ হঠাৎ আবার বাড়িয়া গেল। তিনি কড়া নাড়িবেন, না জোরে ডাকিবেন ভাবিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জানলায় কান পাতিয়া গৃহাভ্যন্তরের কথাবার্ত্তা শুনিতে চেষ্টা করিতে, তাহার হস্তস্থিত রূপাবাঁধান ভারী লাঠিখানা হস্তস্খলিত হইয়া সশব্দে কক্ষ সম্মুখস্থ বারান্দায় পড়িয়া গেল!

সেই শব্দে একজন সুবেশা তরুণী বাহিরের কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুইস্ টিপিয়া আলো জ্বালাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে? জামাইবাবু নাকি?

গৃহকর্ত্তা সবিস্ময়ে বলিলেন—হ্যাঁ!

সশব্দে রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইল। গৃহকর্ত্তা দেখিলেন—সম্মুখে তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠা শ্যালিকা সুশী বা সুশীলা। সে হাসিয়া বলিল—"আমার জন্য এতক্ষণ ষ্টেশনে বসেছিলেন তো! কী কষ্টই না আপনাকে আমি দিলাম। আমি অবশ্য লিখেছিলাম রাত্রি ৯টার ট্রেনে আস্‌বো। কিন্তু ওঁর আসা হলো না। এজন্য দুপুরের গাড়ীতে পাঁড়েজীকে সঙ্গে করে চলে এলাম।"

সুশীলা হাসিতে লাগিল। গৃহিণীর মুখেও হাসির রেখা!

কর্ত্তা অবশ্য কোন পত্র পান নাই। তিনি সে কথা প্রকাশ না করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাহার মনে যে কুয়াসা ভরিয়া উঠিয়াছিল তাহা যেন হঠাৎ সূর্য্যোদয়ে অন্তর্হিত হইল!

: তোমার ছেলে ও মেয়ে কোথায়?

: তারা ঘুমুচ্ছে। আপনি শিগ্‌গির হাত মুখ ধুয়ে, আপনার সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে আসুন। অনেক কথা আছে। খেতে খেতে কথা হবে।

২

মৃগাঙ্কবাবুর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। পূর্ব্বে বিহারের কোন এক সহরের একটি গভর্ণমেণ্ট স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। এক্ষণে পেন্‌সন্ লইয়া এই বাড়ীতে আছেন। বাড়ীটি নিজস্ব নহে। তাহার এক ছাত্র জমিদারের। বাড়ীটী পুরাতন। সম্প্রতি মেরামতে এবং অঙ্গরাগে গলিতযৌবনা নারীর যৌবনশ্রী ধারণের ব্যর্থ চেষ্টায় করুণ মুখশ্রী! বাড়ীর সম্মুখে একটু বাগান। তাহাতে শীতের নানারকম মরসুমী ফুল। কর্ত্তা সৌখীন পুরুষ, সদানন্দ। বয়সে ছোটবড় সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশিতে পারেন। চুল এখনও দশ আনা কাঁচা। দাঁতগুলি পড়ে নাই। তবে কয়েকটি

নড়িতেছে। শরীর নাতিদীর্ঘ, নাতিস্থূল। পূর্বে পড়িবার জন্য চশমার প্রয়োজন হইত—এখন রাত্রিকাল ভিন্ন চশমার কোন প্রয়োজন হয় না। তবে কানে কম শোনেন। ইহা বৃদ্ধ বয়সের একরূপ আশীর্বাদ। গৃহিণীর অপ্রিয় ভাষণ তাঁহার শুনিতে হয় না!

কর্তার জীবনযাত্রা কতকগুলি বাঁধা-ধরা নিয়মে চলে। সকালে পুষ্পচয়ন—নিত্য পূজা, পাঠ। তাহপর বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা ও ঔষধ দান। দ্বিপ্রহরে আহারান্তে সংবাদপত্র পাঠ ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ। বিকালে ভ্রমণ বা সভাসমিতিতে যোগদান। সন্ধ্যায় কীর্তন। রাত্রি নয়টা দশটা মধ্যে নিদ্রা এবং অতি প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে শয্যা ত্যাগ। এই সকল নিত্য নিয়মিত নানা কার্যের মধ্যে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় তাঁহার রুগ্ণা স্ত্রীর মনোরঞ্জনের ব্যর্থ প্রয়াস!

সেকালের সামাজিক নিয়মে ও কর্তাবাবুর বৃদ্ধা ঠাকুরমার আগ্রহে অতি অল্প বয়সে মৃগাঙ্কবাবুর বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স দশ এবং তাঁহার পত্নীর বয়স সাত। গৃহিণী যৌবনে সুন্দরী ছিলেন। এক্ষণে বয়স সাতষট্টি। মুখের অধিকাংশ দন্ত পড়িয়া গিয়াছে। বিরল কেশী এবং তাহার অধিকাংশ শ্বেতশুভ্র। বর্তমানে যৌবনের লুপ্ত সৌন্দর্যের একটি কংকাল। গৃহিণীর এক ছেলে ও এক মেয়ে। উভয়েই বিবাহিত। মেয়েটি তাহার স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায়। ছেলেটি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের একজন অফিসার। গৃহিণীর বহুদিনগতে সন্তান-সম্ভাবনা হয়। সন্তানটী সূতিকাগৃহেই মারা যায়। তাহার পর হইতেই তিনি সূতিকা রোগগ্রস্তা তৎসহ শুচিবায়ু ও সন্দেহ রোগে জীর্ণা শীর্ণা!

কর্তা ও গিন্নি উভয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। কর্তা স্বল্পে তুষ্ট। শান্ত প্রকৃতি। সর্বদা সকলের সান্নিধ্যপ্রাপ্তির জন্য উন্মুখ এবং সাধ্যমত সকলের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত। আর গিন্নি সদা রুক্ষ, সর্বদা অসন্তুষ্ট। লোকজনের সমাগম তাহার বিরক্তিকর। কর্তা ভালবাসেন সদা হাস্যমুখর বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী। গিন্নির পক্ষে তাহা অসহনীয়। কর্তা যৌবনকালে পড়িতেন প্রবন্ধ। গিন্নি পড়িতেন ডিটেক্‌টিভ্ নভেল। কর্তা ভালবাসেন সভা-সমিতি, উচ্চাঙ্গের আলোচনা। গিন্নি ভালবাসতেন থিয়েটার ও সিনেমা। কর্তা বলেন, চোখ থাকিলে থিয়েটার সিনেমা পথেঘাটে সর্বত্র। গিন্নি বলেন সভাসমিতি নিষ্কর্মা লোকের আড্ডাখানা—উহাতে যোগদানের অর্থ—শরীর নষ্ট, সময়ের অপচয়। কর্তা ভালবাসেন মনোরম পরিবেশ—সাজসজ্জা। গিন্নি বলেন উহা চরিত্রহীনতার প্রথম সোপান। কর্তা স্বল্পভাষী। গিন্নি বহুভাষিণী। কর্তার নিরামিষ আহার প্রিয়। গৃহিণীর আমিষাহার। কর্তা বলেন, আমিষ আহারে ষড়রিপুর উত্তেজনা হয়। গৃহিণী বলেন নিরামিষ আহারে লোকে ছাগল গরুর মতো নির্বোধ হয়। কর্তা ছিলেন জাতীয় আন্দোলনে ছাত্রগণের সমর্থক ও গোপনে উৎসাহদাতা। গিন্নি ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের বিপক্ষে ও গোপন সংবাদদাতা এবং যাহার ফলে কর্তাবাবুর "রায় সাহেব" উপাধি লাভ। কর্তা বলেন সংসারে সকল লোক-জন মোটামুটি ভাল। আমরা সকলকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি না। এজন্য ভুল বুঝি। গিন্নি বলেন—সংসারে অধিকাংশ লোকই চরিত্রহীন, স্বার্থপর। শুধু আইনের ভয়ে ভদ্রতার মুখোস পরে থাকে। কর্তা ঔষধ গিলিতে নারাজ। গিন্নির চাই ত্রিসন্ধ্যায় ঔষধের সুব্যবস্থা। কর্তা ভালবাসেন উচ্চাঙ্গের গান ও কীর্তন। গিন্নি ভালবাসেন হাসির গান ও হিন্দী গজল। কি করিয়া এই সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের নরনারী পতিপত্নী হিসাবে একই গৃহের আবেষ্টনে অর্দ্ধশতাধিককাল পরম শান্তিতে অতিবাহিত করিয়া জীবনের শেষ যামে উপস্থিত হইয়াছেন তাহা তাহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন কেন, তাহাদের নিজেদেরও একটি গবেষণার বিষয়।

কর্তাবাবু গৃহিণীর অসুখের উপলক্ষ্যে হোমিওপ্যাথী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং এই চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ সুনামও হইয়াছে—ইহার কতটুকু তাঁহার চিকিৎসার সুফলতায়, কতটুকু বিনামূল্যে ঔষধ দানের ফলে, তাহা বলা শক্ত। কর্তা বলেন হোমিও-চিকিৎসা চিকিৎসাজগতের একটী শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। গিন্নি বলেন উহা দীন দরিদ্র নরনারীগণের পক্ষে চিকিৎসার একটা সান্ত্বনা মাত্র—আমাদের জলপড়ার মতো। যার সারে অমনই সারে!

সুতরাং গিন্নির চিকিৎসা চলে তার হুকুম মতো। পেনসন লইয়া এই সহরে আসিবার পর দশবার বছরে চারিটী ডাক্তার ও চারিটি কবিরাজ বদলান হইয়াছে। শুধু

হেকেমী হয় নাই—সংস্কারে লাগে বলিয়া! বর্ত্তমানে সহরের হাসপাতালে নূতন এক ডাক্তার আসিয়াছে। বেলাত ফেরৎ। বেশ নাম হইয়াছে। হুকুম হইয়াছে তাহাকে ডাকিতে। কর্ত্তা নিরুপায়। তিনি সেই ডাক্তারের খোঁজে বিকালে বাহির হইয়াছেন। পথে কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা।

: চলুন। গিন্নিমাকে দেখে পরে এক বড় সাধু এসেছে তাকে দেখতে যাবো।

কর্ত্তা প্রমাদ গণিলেন। এখন কবিরাজ লইয়া বাড়ী ঢুকিলে অনর্থ অবশ্যম্ভাবী। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আপনার রোগী আজ খুব ভাল আছেন। আজকার ঔষধও আছে। আগে চলুন সাধু মহারাজকে দেখে আসি।

কর্ত্তাবাবুর আর নবাগত ডাক্তারের খোঁজে যাওয়া হইল না। সাধু সন্দর্শনে চলিলেন।

কবিরাজ মহাশয় সাধুবাবার বিভূতি, কীর্ত্তি ও মতবাদ প্রভৃতি জানাইতে জানাইতে পথ চলিতে লাগিলেন। সাধুবাবার বয়স নাকি তিনশত বৎসরের উপর। চারবার নাকি কায়া বদল করিয়াছেন। শীঘ্র আবার নাকি কায়া বদল করবেন না অপ্রকট হবেন এখনও তাহা জানা যায় নি। তাজমহল তৈয়ারী তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। সাজাহান, ঔরঙ্গজীব—আলিবর্দ্দী—সিরাজদ্দৌলা—ক্লাইব—পলাশীর যুদ্ধ—হেষ্টিংস—ইংরাজদের রাজ্য বিস্তার—সিপাহী বিদ্রোহ—নানাসাহেব প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনা তাহার চক্ষে নাকি এখনও প্রতিভাত হয়। ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সকল তীর্থ ও প্রধান প্রধান সহর তিনি একাধিকবার পদব্রজে পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি নাকি একজন জীবন্ত ভারতীয় ভূগোল ও ইতিহাস। সাধুবাবার নাম শ্রীমৎ কামদানন্দস্বামী। তাঁর মত অদ্ভুত। তিনি বলেন সকল জীবদেহ কামজ সুতরাং প্রবৃত্তিমূলক। জগতের সৃষ্টিরক্ষার মূলে কাম। এই কামসকল মানবেতর জীবজন্তুতে আপন ভাবেই ক্রিয়াশীল। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানব। এই মানবদেহে কাম একভাবে পরমবন্ধু—অন্য ভাবে দুর্দ্ধর্ষ রিপু। আত্মপ্রীতির উদ্দেশ্যে এই কাম অনর্থ সাধন করে এবং ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইলে ইহার দ্বারা মানব অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা লাভ করে। বন্ধু বলতে কাম এবং রিপু বলতে ঐ একমাত্র কাম। অন্য পাঁচটী রিপু ঐ এক এবং অদ্বিতীয় কামের বিভিন্ন রূপ। যেমন কাম্যবস্তু প্রাপ্তির বাধায় উহাই ক্রোধরূপ ধারণ করে। কাম্যবস্তু-প্রাপ্তির বাসনাই লোভ। কাম্যবস্তু প্রাপ্তিতে উহা মদ এবং অপ্রাপ্তিতে মোহ এবং অপর কর্ত্তৃক কাম্যবস্তুর ভোগ দর্শনে মাৎসর্য রূপ ধারণ করে।

এই কামকে নিগৃহীত করা দেহীর পক্ষে শুধু অসম্ভব নয় একেবারে অবাস্তব। প্রকৃতিতে, অনলে, অনিলে, নভঃস্থলে, ভূধরে, সলিলে, গহনে, বৃক্ষে, লতায়, কীট, পতঙ্গে, সমগ্র জীবজগতে ঐ একমাত্র কামের লীলা। জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে যিনি এক এবং অদ্বিতীয় তিনি কামময়, এ জন্য লীলাময়। এই কামকে নিগ্রহ করিবে কে? অতএব প্রবৃত্তিমার্গই একমাত্র পথ—নিবৃত্তি মার্গ কোন পথ নয় উহা নেতিবাচক শব্দ। এই কামকে ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করার শিক্ষাদান গুরুর কার্য্য। এজন্য আমাদের শাস্ত্রে আছে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা—পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্।" বিবাহ কাম উপভোগের জন্য নয়। ভগবানের সৃষ্টি রক্ষার জন্য –ভগবানের প্রীতির জন্য। হিন্দু বিবাহ ধর্মার্থে—সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্যে সুপ্রজনন, উপলক্ষ্যে। আমাদের বিবাহের মন্ত্রে কামস্তুতি—যাহা বেদে আছে—তাহা পঠনীয়।

ওঁ ইদম্ কস্মা আদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ।
কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ।
কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতত্তে।

এই কাম ধর্মের অবিরুদ্ধ কাম। গীতায় ভগবান বলেছেন—"ধর্মাবিরুদ্ধভূতেষু কামোঽস্মি। কবিরাজ মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয়পক্ষ গত। বর্ত্তমানে তৃতীয় পক্ষ চলিতেছে। বয়স পঞ্চাশোর্দ্ধে। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে অতি মাত্রায় সচেতন। তৃতীয়পক্ষ গত হইলে চতুর্থ পক্ষের আশা রাখেন। সাধুবাবার মত ও পথের কথা শুনিতে শুনিতে তাহারা স্বামীজীর আস্তানায় উপস্থিত হইলেন।

নদীর ধারে নবনির্ম্মিত একটী পর্ণকুটীর। চতুর্দ্দিকে লোকের সমাগম। সাধুবাবার দেহ সুস্থ ও সবল। আষাঢ়ের বেলার মতো যৌবন যাই যাই করিয়াও যেন যাইতেছে না। তিনি মুণ্ডিতকেশশ্মশ্রু গাত্রে একখানি সাধারণ কম্বল। বয়স অনুমান করা কঠিন। তাহা

চল্লিশও হইতে পারে ষাটও হইতে পারে। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন সাধুবাবা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকেন—লোক সমাগমে গাত্রে একটা কম্বল মাত্র থাকে।

শীতের রাত্রি। রাত্রি আটটার মধ্যে স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ সকলেই চলিয়া গেলেন। তখন কর্ত্তাবাবু ও কবিরাজ মহাশয় দুইজনে অগ্রসর হইয়া স্বামীজীর চরণে প্রণত হইলেন। স্বামীজী স্মিত হাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন —কোন জিজ্ঞাস্য আছে কি?

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—মানব জীবনে কর্ত্তব্য কি?

: মনুষ্যত্ব অর্জন।

: মানব জন্ম লাভ করিয়া কি আমরা মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করি না?

: না। জন্মগ্রহণ দ্বারা জীবত্ব বা পশুত্ব অর্জিত হয়। মনুষ্যত্ব অর্জন সাধনা সাপেক্ষ। প্রত্যেক জীব শরীরে এবং প্রকৃতিতে তিন শক্তির ক্রিয়া একসঙ্গে চলিতেছে। রাজসিক শক্তি সৃষ্টি করিতেছে তামসিক শক্তি তাহা ধ্বংসের চেষ্টা করিতেছে এবং সাত্ত্বিক শক্তি উভয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া সৃষ্টি রক্ষা বা পালন করিতেছে। একটি জীব শিশুর মনে ও শরীরে এই তিন শক্তির খেলা। মানব শিশুর প্রায় পঁচিশ বৎসর রাজসিক শক্তি প্রবলা থাকে এজন্য ঐ সময় বৃদ্ধির কাল। তারপর প্রায় পঁচিশ বৎসর রাজসিক ও তামসিক শক্তি সমতুল্য থাকে বলিয়া এই সময় একরূপ সমভাব থাকে। তারপর তামসিক শক্তি প্রবলা হয় এবং পরিশেষে জীবলীলা শেষ হয়। সাত্ত্বিক শক্তি সকল সময় অন্য দুই শক্তিকে সংযত রাখিবার চেষ্টা করে। এই শক্তির উৎস যে জানে না -ইহার তত্ত্ব যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না সে হয় প্রকৃতির হস্তে ক্রীড়ণক মাত্র— তাহার নির্মম ক্রীড়ায় সে হয় ক্ষত বিক্ষত। সত্ত্বগুণ জ্ঞান দাতা। রজোগুণ কর্মশক্তি ও তমোগুণ বিষাদ-দুঃখ-দাতা। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি দ্বারা মানব দুঃখ অতিক্রম করিয়া সুখের আস্বাদন লাভ করে। যে বিরাট শক্তি সর্ব্বভূতে সর্ব শরীরে বিভক্তভাবে থাকিয়াও, এক এবং অদ্বিতীয়-ভাবে অবিভক্ত রূপে বিদ্যমান, ইহার উপলব্ধি করাই মনুষ্যত্ব অর্জ্জন। একান্ত শরণ, প্রেম, ভক্তি, স্নেহ দ্বারা এই শক্তিকে জানিতে পারা যায় এবং ইহাকে বশে আনা যায়। পুরুষের পক্ষে এই শক্তি প্রিয়ারূপে, পিতৃমাতৃরূপে, কন্যারূপে অশেষ কল্যাণ দায়িনী এবং নারীর পক্ষে স্বামী রূপে, মাতৃপিতৃরূপে, সন্তান রূপে পরম মঙ্গলকারিণী। যে নিজের সুখ খোঁজে, সে এই বিরাট, এক এবং অদ্বিতীয় আমিকে ক্ষুদ্রাতিতম ক্ষুদ্র করিয়া নিজেও বিভ্রান্ত হয় এবং পরের বিভ্রম ও পীড়া উৎপাদন করে। আর যে পরকে সুখী করিয়া সুখী হইবার জন্য সচেষ্ট হয়, সে তাহার আমিত্বের প্রসার করিয়া নিজেও আনন্দ লাভ করে এবং অন্যের সুখের কারণ হয়। এই এক এবং অদ্বিতীয় আমি এবং তাহার শক্তিকে সমগ্রভাবে জানিলেই মনুষ্যত্ব অর্জিত হয়। এই জানা সাধনা সাপেক্ষ। স্বামীজীর কুটিরে একটি বড় ঘড়ি ছিল তাহাতে টুং টুং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল।

কর্ত্তাবাবুর মনে হঠাৎ গৃহিণীর জন্য ডাক্তার আনিবার কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি সত্বর গৃহে ফিরিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কবিরাজ মহাশয়ের মনোভাব ও তদ্রূপ। স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন—ঘাবড়াও মৎ। সব ঠিক হো যায়েগা।

সাধুবাবাকে প্রণাম করিয়া দুই জনে দ্রুত গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন--একজনের গৃহে তরুণী ভার্যা তৃতীয় পক্ষ, অন্যের গৃহে রুগ্ণা, কটুভাষিণী প্রাচীনা প্রথম পক্ষ। এক জনের আকর্ষণ নূতন প্রেম—অন্যজনের দুশ্চিন্তা—চির পুরাতন ভীতি অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ।

৩

কর্ত্তাবাবু গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার কনিষ্ঠা শ্যালিকার অপ্রত্যাশিত আগমনে আশ্বস্ত হইয়া যথারীতি তাহার সন্ধ্যাকৃত্যাদি শেষ করিয়া আহারে বসিলেন।

সুশীলা বলিল—জামাইবাবু, আমরা যে বাংলো পেয়েছি তা' বেশ বড়। ওখানকার স্বাস্থ্য ভাল—জল খুব হজমী। চারিদিকে বেড়াইবার খুব সুবিধা। এখানে তো দিদির শরীর কিছুতেই ভাল হচ্ছে না। তাই আমার ইচ্ছে, কিছুদিনের জন্য দিদিকে ওখানে নিয়ে যাই। উনি খুব অনুনয় বিনয় করে আপনাকে এক পত্র দিয়েছেন।

সুশীলার স্বামী রমেশ, কর্ত্তাবাবুর একজন প্রিয় ছাত্র। বিলাত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসেছে। এবং কর্ত্তাবাবুই এই বিবাহের একরূপ সংঘটক।

কর্ত্তাবাবু সত্বর আহারাদি শেষ করিয়া পত্রখানা হাতে লইতেই সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল—দিদি ওখানে গেলে আপনার কোন কষ্ট হবে না তো!

কর্ত্তাবাবু কোন কথা বলিবার পূর্বেই গিন্নি বলিয়া উঠিলেন কথায় আছে—ওরে যেদো, ভাত খাবি! "তা' হাত ধোব কোথা? উনি তো আমাকে বিদেয় কর্ত্তে পালে' বাঁচেন। আমি যেন হয়েছি ওঁর পথের কাঁটা! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুধু নিজের খেয়াল নিয়ে ব্যস্ত। যত বাজে লোকের সঙ্গে ধর্মচর্চা, আর ঘরের পয়সায় পরের চিকিৎসা। সারা জীবন চাকরি কর্লে'ন—নিজের এক খানা ঘর করতে পার্লে'ন না। পৈতৃক যা' ছিল তা তো স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। ঝি-চাকর রাখ্‌বে তাদের কোন কথা বল্‌বে না। মাস গেলেই মাইনে দেওয়া। তারা আমাকে মান্‌বে কেন? যত রাজ্যের ওঁছা লোক তারা আসে আমার এখানে। একটা নূতন ঝি এসেছে—বাবুর কাজ করতে তার যেন দশ হাত। তাকে এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে তবে আমি যাব।

সুশী বলিল—ওখানে ভাল ঝি পাওয়া যায় না। ওকে তো বেশ চটপটে দেখলাম। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব। পাঁড়েজী এখানে থাকবে। ও খুব বিশ্বাসী। ওখানে কাজের লোক অনেক পাবো।

: দেখ্‌ সুশী! স্বামীর নিন্দে করা মহাপাপ। তবু সত্যি কথা বলতে হয়। তুই আমার ছোট বোন—আমার মেয়ের চেয়েও ছোটো। তোকে সত্যি কথা বল্‌লে পাপ হবে না। নিজের সন্তানকে কোন দিন একটু আদর করতে দেখে নাই—আজ কিনা বাড়ী বাড়ী চিকিৎসা কর্‌তে যেয়ে পরের ছেলেমেয়ে নিয়ে কী আদর। এতে লোকে কি মনে কর্‌তে পারে তা' বোঝার বয়স কি ওঁর হয় নি!

: দিদি! তোমার মন বড় সন্দিগ্ধ। এজন্য শান্তি পাও না। ছোটবেলায় তুমি যে কাণ্ড করেছিলে তা' মনে হলে আজিও হাসি পায়। তোমার বয়স যখন দশ, তখন জামাইবাবুর পিঠে কাম্‌ড়ে ঘা করেছিলে। তারপর বড় হয়ে তুমি নাকি, আমাদের মাসতুত বোন মীরাকে, জামাইবাবু তার রূপগুণের জন্যে প্রশংসা করেছিলেন এজন্য তুমি আত্মহত্যা কর্‌তে কি খেয়েছিলে—সে আজ প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা—আমার জন্মের পূর্বের কথা। সেই ঘটনার পর জামাইবাবু আর কখনও শ্বশুরবাড়ী যান নি। বাবা মা মারা গেলেন—কত পত্র দিলেন। তোমরা কেও একবার এলে না। সেই পশ্চিমেই অজ্ঞাতবাস করলে।

গিন্নি কিছুক্ষণ মুখ নিচু করিয়া থাকিলেন। তার পর বলিলেন দেখ্‌ সুশী! তোরা আমার দোষটাই বড় করে দেখিস। উনি যে কী চীজ্‌ তা আমি ভাল করেই জানি। মানুষ আত্মহত্যা কর্‌তে যায় কি কম দুঃখে! বাইরের লোকের সাথে যখন কথা, তখন কী হাসি কী কথার ফুলঝুরি! আর যখন ঘরে ঢোকেন তখন কে যেন মুখে আঁটা মেরে তালা দিয়ে দেয়। আমি একটা রোগী আমার কাছে একটু বসুন। তা' না বাইরে যাবার জন্যে কী লুটোলুটী। আর এখানকার লোকগুলোও হয়েছে তেমনি। দিন নাই রাত নাই—লোক আস্‌ছেই। সভাসমিতি কীর্ত্তন আর ডাক্তারী তো আছেই। আবার রসিকতা করে বলা হয়—পঞ্চাশ বছর বয়স হলেই বনে বাস করা শাস্ত্রে বিধি। তা' এখন যখন বনে বাস উঠে গেছে, তখন সভায় অর্থাৎ লোকারণ্যে বাস করাই তো উচিৎ। গাঁটের পয়সা ব্যয় করে কে কবে বাড়ী বাড়ী গিয়ে চিকিৎসা করে থাকে? যারা করে, তারা ঘরে বসেই করে। উনি যত বুড়ো হন না কেন, তবু উনি পুরুষ মানুষ। পরের বাড়ীর বৌঝির সঙ্গে কথা বলা কি ভাল?

সুশী হাসিয়া উঠিল। দিদি, তুমি কী যে বল। তোমাকে এসে ডাক্তার দেখে না। এতে লোকে দোষ দেখ্‌বে কেন? সবাই তো জামাই বাবুর প্রশংসা করে!

গিন্নি একটু রাগিয়া বলিলেন—তুই এর কী বুঝ্‌বি? লোকে মুখে যা' বলে—মনে মনে কী বলে তা' কী করে তুই জান্‌বি? আসল ডাক্তারের কথা এক। আর সখের ডাক্তারের কথা আলাদা।

কর্ত্তাবাবু নিঃশব্দ শ্রোতা। তিনি মিটি মিটি হাসিতেছেন। সুশী বলিল—জামাইবাবু, কথা বল্‌ছেন না কেন? ডাক্তারী যখন আপনার পেশা নয়, তা' ছাড়্‌লে আপনার ক্ষতি কি? বরং লাভ!

তোমার দিদির জন্যেই আমার এই সখের ডাক্তারী আরম্ভ। আমি ডাক্তারী ছাড়্‌লে রোগীরা কি আমার

ছাড়বে? তাদের সাথে কি আমি হাতাহাতি করবো। দিন নেই রাত নেই—ডাক্তার বাড়ী কবরেজ বাড়ী যাচ্ছি অষুদ আন্‌ছি। নিজে হাতে নিয়ম মত অষুদ দিচ্ছি। কবিরাজী অষুদের ঘটাবটি কত তা' তো জানিস্। তা' তো প্রতিদিন আমিই করি। তবুও তোমার দিদির মন পাইনা। ভগবানের জন্য ও টুকু করলে তিনি নিশ্চয়ই দেখা দিতেন।

থামো! থামো। আর বল্‌তে হ'বে না। দেখ্ সুশী। ওঁর কেমন যত্নের নমুনা। ওঁর একটা দাঁতও পড়ে নি। আমার প্রায় আধাআধি পড়েছে। ওঁর চুল এখনও অনেক কাঁচা, আর আমার মাথায় চুল্‌তো নেই—যা' আছে তা যেন শণের গুঁছি। আমার কোমরের নীচে পর্যন্ত কত কালো চুল ছিল তুই তো দেখেছিস্। তা' সব কোথায় গেল? আমার চোখ কত ভাল ছিল। অমাবস্যার অন্ধকারে ছোট সূঁচে সুতো পরাতে পারতাম। আর এখন চশমা দিয়েও ভাল দেখি না। আগে ছোলা ভাজা, মটর ভাজা ডাল মুট খেয়েছি—একদিনও একটু অম্বল হয় নি। আর আজ সাগু বার্লি খেয়েও শান্তি পাই না। এক মণী দেড়মণী চালের বস্তা আমি এক হাতে সরিয়েছি। আর আজ পাঁচ সের তুল্‌তে হাঁফ লাগে। পশ্চিমে থাক্‌তে বার মাইল তের মাইল পথ হেঁটেছি একটুও কষ্ট হয় নি। উনি এখনও সহরের এ মাথা ও মাথা হাটছেন। আর আমি এ ঘর ও ঘর করতে পারি না। লোক দেখান কাজ, আর দরদ দিয়ে কাজ আলদা।

সুশী দেখিল এর পর দিদি চোখের জল ফেলিবেন। সুতরাং দিদির পক্ষ লইয়া দু'একটা কথা বলা ভাল।

জামাইবাবু! ফলেন পরিচীয়তে। ফল দেখেই পরিচয় হয়, আপনার যত্নের ফল তো সত্যিই ভাল হয়নি। আপনার সব চুল পাক্‌লো না—দাঁতও পড়লো না। আর দিদির কি অবস্থা? পুরুষ যারা, মেয়েদের আদর করে শুধু নিজের সুখের জন্যে। মেয়েরা যে স্বার্থত্যাগ করে পুরুষ তার সিকিও করতে পারে না। পুরুষ জাতি স্বার্থপর।

গিন্নি বলিয়া উঠিলেন—তা আর বল্‌তে। পুরুষের সুখের জন্যে মেয়েদের তিন চার বছর কী কষ্টই না করতে হয়। দিনরাতে ঘুম নাই—একটা শেষ বয়সে ছেলে হতে কী কষ্টই না পাচ্ছি আজ প্রায় ত্রিশ বছর! মেয়েদের শরীর পাপের শরীর।

সুশী দেখিল—আর বেশী কথা ভালো না। এখন কথার মোড় অন্য দিকে ঘোরান ভাল।

আচ্ছা জামাইবাবু! আপনি কি মনে করেন, আবার যুদ্ধ বাধবে? আবার যদি যুদ্ধ হয়, তা' শেষ হ'তে বোধ হয় কয়েক মিনিট মাত্র লাগবে। যুদ্ধ শেষ হ'তে দেখা যাবে সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

দেশ পাপে ভরে উঠেছে। সব ধ্বংস হওয়াই তো ভাল।

দিদি, সব যদি ধ্বংস হয়—তবে পুণ্যের ফল ভোগ করবে কে? সবাই তো পাপী নয়।

জামাইবাবু বলিলেন—এখন এসব দুশ্চিন্তা থাক্। রাত বেশ হয়েছে আমি বাইরের ঘরে শুতে চল্‌লাম। তোমরাও কিছু খেয়ে শুয়ে পড়।

৪

সুশী, পর দিন ভোরে উঠিয়াই, দিদিকে লইয়া যাইবার জন্য গোছগাছ আরম্ভ করিয়া দিল। রেলের পথ খুব বেশী নয়। চার পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা। ষ্টেশন থেকে বাংলো কাছেই। বেলা দেড়টায় ট্রেন। সন্ধ্যায় তাহারা পৌঁছিয়া যাইবেন। সুশী দিদির বাক্স গুছাইয়া লইতেছে। গিন্নি সকাল হইতেই পাঁড়েজীকে লইয়া পড়িয়াছেন—গৃহস্থালী সম্বন্ধে তাহাকে উপদেশ দিতে। সকালে কর্ত্তা বাদামের সরবৎ খান—কি ভাবে সরবৎ করিতে হয় তাহা নিজেই দেখাইয়া দিতেছেন। কোন্ কোন্ খাদ্য কর্ত্তার রুচিকর তাহার ফর্দ জানাইতেছেন, কর্ত্তা বেশী তেল, ঘি, গরম মসলা পছন্দ করেন না ইত্যাদি ইত্যাদি।

এদিকে সকাল হইতে কর্ত্তার দেখা নাই। তিনি কোথায় গিয়াছেন কাহাকেও বলিয়া যান নাই। বাইরের ঘরে কয়েকটী রোগী বসিয়া আছে। অনেকে চলিয়া গিয়াছে। সুশী মাঝে মাঝে বাইরের ঘরে আসিয়া উঁকি দিয়া দেখিতেছে—জামাইবাবু আসিলেন কিনা।

বেলা যখন প্রায় সাড়ে এগারটা তখন কর্ত্তাবাবু ফিরিলেন একটা মোটরে। বাজার হইতে মৎস্য কিনিয়া তাহা একেবারে কুটাইয়া ধুইয়া রান্নায় চড়াইবার উপযুক্ত করিয়া আনিয়াছেন। আরো নানা মোটঘাট মোটরে।

মাছের হাঁড়ি সহ কর্ত্তাবাবু হন্তদন্ত হইয়া রান্না ঘরে ঢুকিলেন "পাঁড়েজী আগে মাছটা রেঁধে ফেল—ভাজা, ঝাল, ঝোল, অম্বল। দুটো উনুনে তো রান্না হচ্ছে। বারোটা সোয়া বারোটা মধ্যে সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ করতে হবে। কথাটা যেন ছুড়িয়া ফেলিয়া আবার কর্ত্তাবাবু ছুটিলেন। মোটর হইতে নামাইলেন একরাশ জিনিষ। সুশীর ও তার ছেলে মেয়ের জন্য ভাল কাপড় জামা, প্যাণ্ট, ফ্রক, ইজের। গিন্নীর জন্যও ভাল কাপড়, সেমিজ, ব্লাউস্। গিন্নির জন্য নানা রকমের আচার—অরুচির রুচি বর্দ্ধক। সুশীকে ও গিন্নীকে ডাকিয়া বলিলেন শীগ্‌গীর করে দেখ গায়ে সব ঠিক হ'লো কিনা-কাপড়, ছিট্ সব পছন্দ হলো কি না! না হ'লে আমি এখনই যেয়ে বদ্‌লে আন্‌বো হাতে সময় বেশী নেই।

কর্ত্তাবাবুর ব্যস্ত ভাব, কথাবার্ত্তার ধরণ ধারণ দেখিয়া সুশী হাসিয়া অস্থির!

ঃ জামাইবাবু! বেলা বারোটা বাজে এখনও আপনার সন্ধ্যাপূজা হ'লো না—এক ফোঁটা জল মুখে পড়ল না। আপনার আর ছুটো ছুটি করতে হবে না সবই পছন্দ হয়েছে। আপনি দয়া করে স্নান করে আপনার কাজ শেষ করুন।

ঃ না দেখেই সব পছন্দ হ'লো। একথা ঠিক নয়। আগে দেখে বল। তার পর অন্য কাজ।

গিন্নি গজ গজ করিতে লাগিলেন।

ঃ দেখ সুশী! এমন করে চিরকালটা আমার হাড় জ্বালিয়েছে। আমি ভাবছিলাম বুঝি কোন রোগীর পরকালের ব্যবস্থায় মেতে আছেন। তা দেখ! আমার জন্য এত কেন? আমি কি চিরকালের জন্যে যাচ্ছি, যে এত আচার এত কাপড় আমার লাগ্‌বে? সুশীর জন্যে, সুশীর ছেলে মেয়ের জন্যে কিনেছে-বেশ করেছে। আমি বুড়ী হয়েছি আমার জন্য এত সব কেন? বাক্সে এত রয়েছে-আবার এত অপব্যয়! আবার ত্যাখ, এত রকম আচারই বা কেনা কেন?

গিন্নির মুখে অনুযোগ—অন্তরে তৃপ্তি এবং চোখে আনন্দের দীপ্তি!

কর্ত্তাবাবুর পছন্দ আছে। জিনিষ সবই পছন্দসই হইয়াছে। ছেলে মেয়েদের গায়ে সব বেশ মানাইয়াছে।

সাড়ে বারোটার মধ্যে কর্ত্তা ও সুশীর ও তাহার ছেলে-মেয়ের খাওয়া ও কাপড় পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। ছেলে ও মেয়ে মোটরে উঠিয়া মোটরের 'হর্ণ' বাজাইতেছে। বাক্স, সুটকেশ ও সকল জিনিস মোটরে উঠিয়াছে। বেলা একটা বাজে। গিন্নি এখনও খাইতেছেন। কি যেন ভাবিতেছেন। ধীরে ধীরে মাছের কাঁটা বাছিতেছেন। কর্ত্তাবাবু পুনঃ পুনঃ হাত ঘড়ি দেখিতেছেন। সুশী মাঝে মাঝে রান্নাঘরে যাইয়া উঁকি দিতেছে, গিন্নীর কোন তাড়া নেই। তিনি যে গাড়ীতে যাইবেন—সে ভাবনা পর্যন্ত নাই।

অগত্যা কর্ত্তাবাবু রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিলেন-আর দেরী কর্‌লে গাড়ী পাওয়া যাবে না।

গিন্নি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। শীঘ্র কাপড় বদলাইয়া মোটরে উঠিলেন। সবাই হাস্য-মুখর—নানা কথা বলিতেছে। গিন্নি নিঃশব্দ—যেন তিনি অন্যলোকে বিচরণ করিতেছেন। বড় অন্যমনস্ক। মুখ বিষণ্ণ।

দেড়টা বাজিবার দু'তিন মিনিট পূর্বে সকলে মোটরে ষ্টেশনে পৌছিলেন। গাড়ী ৮।১০ মিনিট লেট। কর্ত্তা-বাবু তাড়াতাড়ি সকলের টিকিট কাটিয়া আনিলেন। এর মধ্যে গাড়ী আসিয়া পড়িল। গাড়ীতে মোট সব তোলা হইল। সকলে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। একমাত্র পাঁড়েজী ও কর্ত্তাবাবু বাহিরে থাকিলেন।

কর্ত্তাবাবু সব উপদেশ দিতেছেন। তিনি সাত আট দিন পরে ওখানে যাইবেন। যদি গিন্নির স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি না হয় সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন। গিন্নির মুখে কোন কথা নাই। তিনি যে কর্ত্তাবাবুর কথা শুনিতেছেন, এরূপ কিছুই বুঝা গেল না।

গাড়ীর গার্ডটি কর্ত্তাবাবুর প্রাক্তন ছাত্র। সে আসিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। সে বলিল যে নিরাপদে তাহাদের গন্তব্য ষ্টেশনে নামাইয়া দিবে—পথে তাহাদের সংবাদাদি লইবে।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। গার্ড-গাড়ী ছাড়িবার জন্য হুইসেল দিলেন এবং সবুজ পতাকা আন্দোলন করিলেন। গাড়ী ছাড়িবে এমন সময় গিন্নি হঠাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন।

কর্ত্তাবাবু কিংকর্তব্য বিমূঢ়! সুশী ও তার ছেলে মেয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতেছে। গাড়ীর মধ্যে গোলমাল। একজন ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি চেন টানিয়া দিল। গাড়ী সামান্য যাইয়া থামিয়া পড়িল।

গার্ড ছুটিয়া আসিলেন। গিন্নির বাক্স বিছানা সমস্ত নামান হইল। ঝি নামিল। পাঁড়েজী গাড়ীতে উঠিল গিন্নি নির্বাক নিস্পন্দ। মুখ ফিরাইয়া প্রস্তর মূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া আছেন।

সুশী কর্ত্তাবাবুর দিকে চাহিয়া বিষাদের হাসি হাসিল। গাড়ী ধীরে ধীরে ষ্টেশন ছাড়াইয়া চলিয়া গেল!

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান

শ্রীজয়দেব রায়

দেশপ্রেমের মূল অনুভাব পৌরুষ। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ স্বদেশী গানের সুর নমনীয়তায় পরিপূর্ণ, স্তোত্রস্তবের ভঙ্গীতেই রচিত। সেদিক দিয়া কবির প্রথম জীবনে রচিত স্বদেশী গানগুলি বেদনার্তি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে।

বীররসদৃপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিমাণও অল্প নয়। শেষ জীবনে পৌরুষ-উদ্দীপক দৃপ্ত বলিষ্ঠ সুরের বহু গান কবি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বস্তুত, আমাদের দেশের গানে উদ্দীপনার সুরের বিশেষ অভাব ছিল। পৃথিবীর সকল দেশেই জাতীয় সঙ্গীত বীর্যদৃপ্ত সুরেই রচিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশবাসী কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যুদ্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কবির দৃপ্ত সুরের গানগুলি ভবিষ্যতে রণক্ষেত্রে উদ্দীপনার প্রেরণা দেবে।

উদ্দীপনার গানের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া কবি তাই বলিয়াছিলেন—"কোনো একটা বিশেষ উদ্দীপনা—যেমন যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে রণোৎসাহে উত্তেজিত করা—আমাদের সঙ্গীতের ব্যবহারে দেখা যায় না। তার বেলায় তুরী ভেরী দামামা শঙ্খ প্রভৃতির সহযোগে একটা তুমুল কোলাহলের ব্যবস্থা। কেন না, আমাদের সঙ্গীত জিনিসটাই ভূমার সুর: তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্যই।"

এই উদ্দীপ্ত বীর্যদৃপ্ত ধরণের গানও কবি রচনা করিয়াছিলেন—সেগুলির একটি স্বতন্ত্র আবেদন আছে।—

(১) সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ ॥

(২) ধরবায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো ॥

(৩) ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে
আগুন জ্বালো ॥

(৪) সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্ত-পানে চাহো ॥

এই সকল অধিকাংশ গানের সুরে একটি মাভৈঃ ধ্বনি আছে—অলস, ভীত, জড়, চকিত, অবসন্ন দেশবাসীর প্রাণে নবীন আশা, সতেজ উত্তেজনা, সাহস ও ধৈর্যের প্রেরণা আনিয়া দেয় এই সকল গান।

জাতির প্রতি আহ্বানবাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার এই শ্রেণীর বহু গানে। জনগণ এক সঙ্গে গাহিয়া উঠিতে পারে এমনভাবে সমবেত কণ্ঠোপযোগী করিয়া গানগুলি রচিত—

(১) আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার।

(২) আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছে জাগিয়া পূরবে চাহিয়া
বলো 'উঠ উঠ' সঘনে গভীর নিদ্রা মগনে ॥

(৩) আগে চল, আগে চল ভাই।
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল, ভাই ॥

(৪) শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয়ে গান,
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান ॥

এই গানগুলিতে কবির সুরে একটা আদেশধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে। জাতির পুরোধারূপে কবি যেন চারণের ভূমিকা সেদিন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের অবদান ছিল এ ক্ষেত্রে আরও তাৎপর্যপূর্ণ, তাঁহার সুরও অনেক বেশী উদাত্ত ছিল।

প্রথম যুগে তাঁহার স্বদেশী গানগুলি ছিল অনুনয়ভরা আবেদনময়। প্রধানত হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভা উপলক্ষেই এই সকল গান রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও ইংরেজ বিতাড়ন বা স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন দেখার সময়

আসে নাই। দেশের দুঃখদৈন্য, মাতৃভূমির দুর্দশা লইয়া আক্ষেপই ছিল গানগুলির উপজীব্য। সুরও ছিল তদনুযায়ী বিষাদখিন্ন স্বচ্ছন্দগতি সম্পন্ন—

(১) অয়ি বিষাদিনী বীণা, আয় সখী,
গা লো, সেই সব পুরাণো গান—
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে, ভরিয়া দে-না লো,
আঁধার প্রাণ ॥

(২) ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা, জলদে।
বিহগেরা থামো থামো।
আঁধারে কাঁদো গো তুমি ধরা ॥

(৩) তোমারি তরে মা, সঁপিনু দেহ,
তোমারি তরে মা, সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান ॥

এ সব গানেরই সুর নরম, কোনরূপ উদ্দীপনার প্রকাশ নাই। তাহারই মাঝে মাঝে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবে রচিত উদাত্ত সুরও শোনা গিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকে সেনানীদের কণ্ঠে উদ্গীত হইয়াছে—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন ॥

কবির রচিত দুইটি বড় স্বদেশ কবিতাতেও সুরসংযোগ করা হইয়াছিল, সে সময়ে স্বদেশ লইয়া লেখা তাঁহার কবিতা ও গান একাত্মক হইয়াছিল। ঐ কবিতা দুইটি—

(১) হে ভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ
কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পূজার দান ॥

(২) নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা—
তব আশ্রমে তোমার চরণে হে ভারত,
লব শিক্ষা ॥

স্বদেশী গানে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ছিল বাংলাদেশ। জাতীয় সংহতির জন্ত সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিলেও বাংলাদেশকে যতটা নিজের মাতৃভূমি বলিয়া মনে হয় সমগ্র ভারতকে তেমন করিয়া আপনার মনে করিতে পারি না। বাংলা ভাষা ও বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে এই বাংলার ধূলি-মাটিও আমাদের নিতান্ত আপন।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান যেন বিশেষ করিয়া এই বঙ্গভূমিকে অবলম্বন করিয়া রচিত। সোনার বাংলার মধুর প্রকৃতির সৌন্দর্যকীর্তন করিয়া কবি তাই বহু গান গাহিয়াছেন—

(১) আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার
প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

(২) ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা ॥

(৩) বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু,
বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান্ ॥

(৪) আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি,
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে, জননী ॥
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

(৫) সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে ॥

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশীযুগেই কবির এই বিশেষ গীতিরচনার উন্মেষ ঘটিয়াছিল। কবি নিজে এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন।

বঙ্গ আবার ভঙ্গ হইয়াছে, আর রবীন্দ্রনাথ নাই, বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করিবারও কেহ নাই। সেদিনকার সেই ঐতিহাসিক স্বদেশী আন্দোলনের যুগকে কিন্তু আজও অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে সেদিনের সেই বাউল গানগুলি। দেশের মাটির সঙ্গে দেশের নিজের সুর মিশিয়া আছে গানগুলিতে, একাত্ম হইয়া আছে দেশপ্রেম আর সুরছন্দ।

এইসব গানের মধ্যে আছে—(১) এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে; (২) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে; (৩) যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না; (৪) ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে; (৫) মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে, (৬) ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে মাটি; (৭) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না, মা; (৮) যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু; (৯) ওরে তোরা নেই-বা কথা বললি; (১০) আপনি

অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে ; (১১) জোনাকি, কী সুখে ডানা দুটি মেলেছ এবং (১২) বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান্ প্রভৃতি।

স্বদেশী গানের সুরস্রোতে বাংলাদেশ সেদিন ভাসিয়া গিয়াছিল। সেদিন স্বদেশী আন্দোলন যেভাবে জনগণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহার জন্য কৃতিত্ব কবির গান-গুলির নিতান্ত অল্প ছিল না!

কবির এই ধরণের স্বদেশী গানগুলিতে বৈরাগ্যের, অহিংসা আন্দোলনের গভীর ছায়াপাত হইয়াছে—'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে'—কিংবা 'ওরে তোরা নাই বা কথা বললি'—তা সত্ত্বেও আমাদের আগাইয়া যাইতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ধারাটিতে কবির কাছে স্বদেশ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হইয়া দেখা দিয়াছে বিশ্ব দেবতা স্বদেশ দেবতার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। এই গানগুলির সব কয়টিতে ভারতজননীই তাঁহার উপাস্যা। যেমন—

(১) হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে ;
(২) দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী।
(৩) মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজ হে॥
(৪) অয়ি ভুবন মনোমোহিনী প্রভৃতি।

এ ছাড়া আছে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'। বন্দেমাতরম্ গানেরও কবি সুরযোজনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি এ গান গাহিয়াছিলেন।

'জনগণমন' গানের উৎস সম্পর্কে মতভেদ দেখা গিয়াছিল। কবিকে সে অশিষ্ট উক্তির প্রতিবাদে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ ঘোষণা করিতে হইয়াছিল।

"সেই ভারত ভাগ্য বিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুরপন্থায় যুগ-যুগ-ধাবিত পথিকদের যিনি চিরসারথি।** শাশ্বত মানব ইতিহাসের যুগ যুগ ধাবিত পথিকদের রথযাত্রায় চিরসারথি বলে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করিতে পারি, এ রকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা।"

শারদীয়া

শ্রীআশীষকুমার গুপ্ত

আমারে দিয়েছে ডাক আজিকার মধুর উৎসব
মোর দ্বারে এসেছে আহ্বান।
কালের যাত্রার পথে ক্ষণিকের এই কলরব
স্মরণীয় উজ্জ্বল মহান্।
কত প্রাণ, কত মন এই মধু উৎসব তরে
নিশিদিন আছে প্রতীক্ষিয়া
আনন্দের প্রতিধ্বনি জাগে কত অন্তরে অন্তরে
ব্যর্থ নহে এই শারদীয়া।
নহে ব্যর্থ মানবের অন্তরের মহাসম্মেলন,
প্রতীক্ষাকাতর মনপ্রাণ।
যাত্রার আনন্দগানে পরিপূর্ণ অনন্ত গগন
শুনি আজ মহাজয়গান।
কোথা যাও, হে পথিক? তুমি শুধু আজিকার তরে
ভুলে যাও কাজ কর্ম সব।
তাঁর আশীর্ব্বাণী ঝরে মানবের মস্তক উপরে
পূর্ণ যাহে ধরার বৈভব।

আজি মধু-শারদীয়া বরণীয় উৎসব মহান
অন্তরে অন্তরে সাড়া জাগে
চাঞ্চল্য জেগেছে ওই, জনতার মহাকলতান
জাগে তাই নব অনুরাগে।
আনন্দের ধন্যাধারা মাতালের মতো বেগবান্
ওই শুনি দূরে বাদ্য বাজে।
তবু হের, ক্লান্ত ক্লিষ্ট বিষণ্ণ বিরস কত প্রাণ
দূরে ওই উৎসবের মাঝে।
কত আয়োজন আজ কত উপচার ফুলমালা,
বেজে ওঠে কত বাদ্যধ্বনি!
ওরা যদি দূরে রয়, তবে এ যে ব্যর্থদীপ জ্বালা
ফিরে যাবে আজিকে জননী।
তবে এসো, হিংসা ঈর্ষ্যা মালিন্যরে দিই বিসর্জন।
পূর্ণ হোক আমাদের হিয়া।
আনন্দ-ধ্বনিতে আজ পূর্ণ হোক অনন্ত গগন
সার্থক হউক শারদীয়া।

ভরসা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন কে জানত যে এমন হবে !

মাত্র বছর চারেক বিয়ে হয়েছে স্বপ্নার। বিনয় লেখাপড়া শিখেছে, চাকরি করছে, সরকারী চাকরি। বেশ শক্ত সমর্থ দেহ, কপালটা খুব প্রশস্ত, সে তুলনায় নাক চোখ চিবুক একটু খাট। তবু বেশ সপ্রতিভ পুরুষ। কথায় বার্তায় চলনে বলনে বুদ্ধির দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে যেন।

সুখে আহ্লাদে স্বপ্না গলে পড়েছিল। দেহ মন প্রাণ সব কিছু এমন পুরুষকেই দেয়া যায়। এমন পুরুষের বলিষ্ঠ হাতের বাঁধনে নিজেকে নিঃশেষে ছেড়ে দেয়া যায়। স্বপ্নার কলেজের বান্ধবীরা ঈর্ষান্বিত হয়েছিল, আত্মীয় মেয়েরা আড়ালে ঠোঁট উলটেছিল কিনা কে জানে, তবে সামনে বলতে বাধ্য হয়েছিল, বিনয় ছেলে চমৎকার !

ওদের সকলের চোখে ঈর্ষা লক্ষ্য করে স্বপ্না আনন্দে অধীর হয়েছিল। মেয়েদের পক্ষে যা করা প্রায় অসম্ভব, সেই করেছিল স্বপ্না। ফুলশয্যার রাত্রে বিনয় চুপচাপ শুয়ে পড়েছিল। চোখ দুটোয় বিষণ্ণ ভাব। কিছুটা শান্ত ধীর দৃষ্টি। লক্ষ্য করেছিল স্বপ্না। লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে ও হঠাৎ চোখ বুজে জড়িয়ে ধরেছিল বিনয়কে। বিনয় নিশ্চয় একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিল। ও দেখতে পায়নি। লজ্জায় ও চোখ খুলতে পারেনি।

—তোমার ঘুম পায়নি ?

গলাটা কি গম্ভীর। পুরুষের গলা ! ও চোখ বুঁজেই মাথা ঝাঁকিয়েছিল জোরে। না, ঘুম পায়নি। এমন সব রাত্তিরে আবার ঘুম পায় নাকি ?

তার অনেক পরে আলাপে আলাপে স্বপ্না জিজ্ঞেস করেছিল,—কার কথা ভাবছিলে।

বিনয় বলেছিল,—আমার বাবার কথা; মায়ের কথা।

স্বপ্না শুনেছিল, বিনয়ের বাপ মা নেই, ভাইবোনও নেই। মামার বাড়ি মানুষ হয়েছে। প্রগাঢ় মমতায় ওর চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল।

আজও চোখ দুটো ভিজে উঠছে ভাবতে ভাবতে। কত আশা আর কত সুখের স্বপ্ন দেখেছিল তখন।

—মেঝের ওপর মাদুরে শুয়ে গড়াচ্ছে স্বপ্না আর ভাবছে, পাশে খোকন ঘুমোচ্ছে।

আজ দশদিন ধরে খোকনের জন্যে একটা ফুড্ আনতে বলছে স্বপ্না, আজ পর্যন্ত আনতে পারল না বিনয়। কি

করেই বা আনবে? দুশ সত্তর টাকা মাইনেতে কোনমতেই পুরো মাসটা কুলোতে পারে না স্বপ্না। রেশনের চাল ছাড়াও বাইরে থেকে বেশী দামে চাল কিনতে হয়। রুটি সহ্য হয় না বিনয়ের। খেলেই ঢেকুর ওঠে। কোনদিন বা পাঁচবার ছবার বেগ আসে। এমন পেটরোগা হয়ে গেছে আজকাল। ওষুধ লেগেই রয়েছে। আগেকার সেই শক্ত সমর্থ দেহটা মাত্র চার বছরেই অনেক ভেঙে পড়েছে। রোগা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে নাকি মাথাও ঘোরে।

স্বপ্নারও পেট তেমন ভাল নয়। তবু রুটি খায়, হয়তো বা খানিকটা ডাল আলুছেঁচকি দিয়ে। মেয়েমানুষের আবার অত পিটপিট করলে চলবে কেন? এক আধ সময়ে রান্না করতে করতে মাথাও ঘোরে। হয়তো বা উনুনের গরমে। তারও কি সেই আগের রঙ আছে, না আগের শ্রী আছে? চেহারার সে চেকনাই খোকন হবার পর থেকেই উধাও।

এর ওপর তেল পাবার উপায় নেই, না পাওয়া যায় একটু মাছ। কি যে হোল ভেবে পায় না স্বপ্না। এমন করে আর কাঁহাতক চালান যায়। হয় রোজগার বাড়াতে হয়, নয়তো মরতে হয়। স্বপ্না নিজে আই. এ. পাশ করেছিল। বিনয়কে ও বলেছিল, একটা ইস্কুলে মাষ্টারী-টাষ্টারী করলে হয়। না, বিনয়ের তাতে আপত্তি! বিনয় তাকে কোনমতে বাইরে ছাড়তে চায় না।

বাপের বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ নয়। ওদের কাগজের ব্যবসা। স্বপ্না মাস ছয়েক বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে চেয়েছিল। তাতেও বিনয়ের আপত্তি। তবে কি বিনয় তাকে মারতে চায়?

হঠাৎ মনে হোল স্বপ্নার বিনয় বোধহয় তাকে সন্দেহ করে, আর সেইজন্যেই তার নিজের কাছে চোখে চোখে রাখতে চায়। তা নইলে স্বপ্না কোথাও গিয়ে দুদিন থাকতে চাইলে বিনয় আপত্তি করে কেন, মুখ চোখ অমন শুকিয়ে যায় কেন? স্বপ্নাকে যেন আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় নিজের কাছে।

নিশ্চয় তাকে সন্দেহ করে বিনয়। ভাবতে ভাবতে ঘৃণায় স্বপ্নার নিটোল কপালটা কুঁচকে উঠল। সর্ব শরীরে যেন জ্বালা ধরল। এতদিন সে বুঝতে পারেনি। এখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে বিনয় তাকে বিশ্বাস করে না। এই ঘৃণ্য অবিশ্বাস পাবার জন্যেই কি সে এমন করে তার সব কিছু বিনয়কে সমর্পণ করেছিল? এখন সব স্পষ্ট হয়ে উঠছে স্বপ্নার কাছে।

মাসচারেক আগে পিসতুতো ভাইয়ের বিয়েতে বর্ধমানে গিয়ে তিনদিন ছিল স্বপ্না। বিনয় তাকে একা ছাড়ল না। অপিসে তিনদিন ছুটি নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

সেখানে পিসতুতো ভাইয়ের শ্যালক, প্রশান্তবাবু তার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করেছিল একদিন বিকেলে। প্রশান্তবাবু মানুষটি ভাল, কণ্ট্রাকটর, গাড়ী বাড়ি সবই করেছে। কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নেই। ভারী দিলখোলা মানুষ। দুটো ঠাট্টা তামাসা তার সঙ্গে করতেই পারে। ওমা, বিনয় হঠাৎ তাকে ডেকে নিয়ে আড়ালে বলল,—ওর সঙ্গে অত হাসাহাসি করছিলে কেন, লোকটা ভাল নয়।

স্বপ্না অবাক। মানুষটা তো ভাল।

—না, ভাল নয়। মদ খায়, আরও অনেক দোষ আছে, আমি জানি।

শুনে স্বপ্না সত্যি ভয় পেয়েছিল। তারপর থেকে প্রশান্ত-বাবুর সঙ্গে বেশী কথা বলেনি। ভদ্রলোক কিন্তু তার আসবার সময় তাকে বার বার নিমন্ত্রণ করেছিল হাজারী-বাগে। চলে আসুন না, জায়গা ভাল। কদিন বেড়িয়ে যাবেন।

নিমন্ত্রণ করবার সময় কিন্তু বিনয়ের নামটা করেনি ভদ্রলোক। স্বপ্না তখন ভদ্রলোকের ওপর বেশ চটেছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী আজ চটছে বিনয়ের ওপর।

বিনয় তাকে আগাগোড়া সন্দেহ করে। এর চেয়ে অপমান, এর চেয়ে লাঞ্ছনা আর কি হতে পারে!

সমস্ত শরীরটা জ্বলছে। গায়ের আঁচল খুলে মাদুরের ওপর গড়াগড়ি দিয়ে দুপুরটা কাটিয়ে দিল স্বপ্না। ভেতরের তাপটা কোনমতেই আজ আর ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বিনয় এল।

স্বপ্নার তখন জলতোলা ঘরদোর ঝাটপাট দেয়া হয়ে গেছে। সিঁড়ির তলায় ছোট রান্নার জায়গাটুকুতে গিয়ে স্টোভ ধরাল বিনয়ের চা করে দিতে হবে। বিকেলে চা বিস্কুট খেয়ে ছেলেকে নিয়ে কিছু সময় খেলা করবে। তারপর শুয়ে শুয়ে বই পড়বে। এ ভাবলে রাগ ধরে

স্বপ্নার। বই পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে উঠে আসবে রান্নার জায়গায়। স্বপ্নার সঙ্গে বাজে গল্প করবে।

পুরুষ মানুষের আর কি কোন কাজ নেই? কি বিশ্রী মেয়েলী স্বভাব!

স্টোভটা জেলে লক্ষ্য করল স্বপ্না, বিনয় কাপড় জামা ছেড়ে লুঙ্গিটা পরে গামছা নিয়ে কলতলায় গেল। হাতমুখ ধুয়ে এসে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলো।

ছেলেকে 'বাবু' বলে ডাকে বিনয়।

ছেলেটাও হয়েছে তেমনি। বাপকে দেখলে প্রায় ছুটে গিয়ে বাপের কোলে উঠবে। গালটা বাড়িয়ে দেবে —অর্থাৎ চুমু খাও। কি আদিখ্যেতা!

বিনয় ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে চৌকির ওপর বসল।

—তোমায় কে মেরেছে বাবু?

খোকন বললে,—মা।

এ প্রশ্নটা বিনয় মাঝে মাঝেই করে আর উত্তরটা শুনে খুব হাসে।

—কি অন্যায়! তোমাকে মেরেছে! আচ্ছা, মাকে আমি বকে দোব।

বিনয় হাসতে হাসতে খোকনকে চুমু খায়। তারপর শুরু হয় বাপ ছেলের যত রাজ্যের কথা। তোমাকে একটা বল কিনে দোব। বল খেলবে। বই কিনে দোব, বই পড়বে। ওই কথাই বলে, কিনে দেয়া আর হয় না। আজ পর্যন্ত একদিনও বিনয় খোকনের জন্যে একটা খেলনা অপিস ফেরত আসবার সময় হাতে করে আনেনি।

চা ছেঁকে দুখানা বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকল স্বপ্না।

স্বপ্নাকে দেখে বিনয় মুচকি হেসে আবার বললে,— তোমায় কে মেরেচে বাবু?

খোকন স্বপ্নার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে,—মা।

বিনয় হেসে কি বলতে যাচ্ছিল, স্বপ্না ঝাঁঝালো স্বরে বলে উঠল,—ছেলেকে খুব শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। মা মেরেছে মা পাজি, মাকে ধরে মারব, মারতে আর বাকী রেখেছ কি?

এই আকস্মিক আক্রমণের জন্যে বিনয় প্রস্তুত ছিল না। অন্য কোনদিন হলে স্বপ্না হাসে, খোকনের দিকে তাকিয়ে রাগের ভাব দেখিয়ে বলে,—অসভ্য ছেলে, আমি মেরেচি!

আজকের কথাগুলো কিন্তু অন্য রকম। বেশ ঝাঁজ আছে।

তবু বিনয় চায়ের কাপটা নিয়ে বিস্কুটে কামড় দিয়ে হেসে খোকনের দিকে তাকিয়ে বললে,—মা তো তোমাকে মারেনি?

স্বপ্না আবার বলে,—নিজে তো খুব বিস্কুট খাচ্ছ মুচমুচ করে, ছেলেটার একটা ফুড আনবার কি হোল? বলে বলে তো মুখ ব্যথা হয়ে গেল। এদিকে ছেলের জন্যে দরদও তো কম দেখি না।

বিনয় অবাক হোল। ওর খাওয়া নিয়ে স্বপ্না তো কখনো এমন করে বলে না। বিস্কুটটা রেখে দিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে আস্তে বললে,—বলেছি তো ফুড আজকাল পাওয়া যায় না।

—এত লোক পায়, আর তুমি পাওনা!

বিনয় বললে,—রোজ দোকানে গিয়ে খবর নিতে হয়। যেদিন ফুড আসবে, সেদিন লাইন দিয়ে আনতে হয়।

—তাই করবে। তবু বুঝব, একটা কাজও করলে! চাকরিটুকু ছাড়া আর তো কিছুই করো না। কুঁড়ের বাদশা হোচ্ছ দিন দিন। আমাকে পাহারা না দিয়ে একটু বাইরে বেরোলে ক্ষতিটা কি? সমস্ত সন্ধ্যেটা আমাকে নজরে না রেখে একটা টিউশানীও তো করতে পার?

বিনয়ের মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল।—আমি তোমাকে পাহারা দিই!

—নিশ্চয়। আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ? পারলে তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমাকে নজরে রাখতে। নেহাৎ চাকরিটা ছাড়লে চলবে না, তাই করো। ছি, ছি, এত ছোট মন তোমার। বরাবর তুমি আমাকে সন্দেহ করে এসেছ। ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না। তুমি এত নীচ!

বিনয় চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে অবাক হয়ে বললে, —আমি তোমাকে সন্দেহ করি? আমি নীচ?

—তা ছাড়া আবার কি? নিজে নীচ হলেই মানুষ অন্যকে নীচ ভাবে।

বিনয় টান টান হয়ে বসল। ওর চোয়াল দুটো কঠিন হোল। আস্তে আস্তে বলল,—তা হলে তুমি নীচ বলেই, আমাকে এত নীচ ভাবতে পারছ।

স্বপ্না প্রায় ফেটে পড়ল,—আমি নীচই তো। আমি নীচ, আমি দুশ্চরিত্র। তোমার কাছে না রাখতে চাও, ছেড়ে দাও, আমি অন্য কোথাও চলে যাব। তুমি যা ভেবেছ, দেখি তুমি কি করতে পার? তোমার মত মানুষের সঙ্গে ঘর করার চেয়ে মরাও ভাল।

বিনয় খোকনের মাথায় একটা হাত রাখল। কোন কথা বলল না। খোকন হাঁ করে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

স্বপ্না রাগে ফুলতে ফুলতে নিজের কাপড়-চোপড় টেনে বার করে একটা স্যুটকেশে পুরল। বড় বাক্সের চাবিটা বিনয়ের সামনে ঝনাৎ করে ফেলে দিল।

বিনয় তাকাল স্বপ্নার দিকে। শরীরটা ওর ভীষণ অবসন্ন লাগছে। চোখে গাঢ় বিষণ্ণতা।

আস্তে আস্তে বললে,—কি হচ্ছে এসব?

স্বপ্না মুখ না তুলেই বললে,—আমি এখানে থাকব না। চলে যাব।

—কোথায় যাবে?

গলায় ঝাঁজ এনে স্বপ্না বললে,—প্রশান্তবাবুর কাছে। হাজারীবাগে।

বিনয় অবাক হোল।—প্রশান্তবাবু কে?

স্বপ্না রাগে ফুলে উঠে বললে,—এরি মধ্যে ভুলে গেছো। যাকে নিয়ে বর্ধমানে আমাকে সন্দেহ করেছিলে! সেই মাতাল প্রশান্তবাবু—তার কাছে যাব।

স্তম্ভিত হয়ে গেল বিনয়। স্বপ্না যত উত্তেজিত হচ্ছে, ও তত অবসন্ন হয়ে পড়ছে। বললে,—বেশ, তাই যাও।

স্বপ্না এবার খোকনের হাত ধরে টানতেই খোকন চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

—কাঁদিসনি বলছি হতভাগা!

খোকন ছুটে গিয়ে বিনয়কে জড়িয়ে ধরল।—ও যাবে না। বাবাকে ছেড়ে যাবে না।

স্বপ্না একটু সময় খোকনের দিকে তাকিয়ে রইল। কি জানি কি মনে হোল, ও খোকনকে আর টানাটানি করল না। মেজের ওপর বসে মাথাটা হাঁটু দুটোয় গুঁজল।

বিনয় বসে রইল তেমনি।

খোকন বাবার কোলের ওপর শুয়ে রইল।

সময় কাটল। অনেকটা সময় উতরে গেল। সন্ধ্যে হয়ে গেল। ঘরে আলো জ্বালা হোল না। অন্ধকার ঘরে ওরা ছায়ার মত স্তব্ধ হয়ে রইল। খোকন বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিনয় আস্তে আস্তে বলল,—প্রশান্তবাবু কি চিঠি-পত্র দেয়?

কান্নার পরে যেমন গলাটা ভারী শোনায়, তেমনি গলায় স্বপ্না বললে,—না।

—তা' ওর কথাটা তোমার মনে হোল কেন?

—তুমি সেবারে সন্দেহ করেছিলে।

—সন্দেহ করিনি, লোকটা খারাপ, তাই সাবধান করেছিলাম।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিনয় বলল,—সকাল বিকেল দুটো টিউশানীর চেষ্টা করব কাল থেকে?

—তোমার শরীরে পোষাবে?

বিনয় একটু চুপ করে থেকে বললে,—এত অভাবে মন সুস্থ থাকে না। অন্ততঃ মনটা তো একটু সুস্থ থাকবে। শরীরের কথা ছেড়ে দাও।

স্বপ্নার গলার আওয়াজ শোনা গেল না।

অন্ধকার ঘরে বিনয়ের একটা ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

—আমি জানি, আমাকে দিয়ে তোমার ভোগ সুখ হোল না।

স্বপ্নার দিক থেকে গাঢ় নীরবতা।

—দোষ আমারও নয়, তোমারও নয়।

তবে কার দোষ? বিনয় নিজেও বোধহয় ভাল করে জানে না। কার দোষ? সময়ের? অবস্থার? দোষটা কার?

—খোকনকে মানুষ করবার চেষ্টা করো। ওকে দিয়ে যদি তোমার সুখ হয় কোনদিন!

খোকনই ভরসা। কতকগুলো অজ্ঞাত চাপে বিনয় বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে। বিনয়ের ওপর আর ভরসা নেই। ভরসা খোকনের ওপরেই। কথাটা মিথ্যে নয়।

স্বপ্না একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে গীতা-দর্শন

আনন্দ ভিক্ষু

সমগ্র বিশ্বের দর্শন, অধ্যাত্মবাদ ও অধ্যাত্ম বিদ্যা, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের শক্তি দিয়ে সুনিয়ন্ত্রিত ও বিকাশের নানা স্তরে স্থাপিত হয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। অধ্যাত্মের দর্শনবাদ ও বিদ্যা একত্রিত করে যে "মহান জীবন শিল্প" মানুষ গড়ে তুলেছে অভিব্যক্তির, উত্তরণের evolution এর দুর্গম শৈল-শিরে আরোহণ করবার জন্য, সেই "জীবন শিল্পের" শিল্প শক্তির নামই অধ্যাত্ম বিজ্ঞান। সমগ্র অধ্যাত্মকে মানুষের সমাজ মননে, তাঁর দৈনন্দিন চিন্তায় ও কর্ম্মে প্রয়োগ করতে যে শক্তির প্রয়োজন তারই নাম অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, সমগ্র গীতাটিকে (যা সমগ্র অধ্যাত্মের নির্য্যাস) অধ্যাত্ম বিজ্ঞানী ভগবান্ ব্যাসদেব, বিষ্ণুস্তরে অর্থাৎ মানবের সমাজ চেতনার স্তরে অবতরিত করবার জন্যই imply করবার জন্যই রচনা করেছেন। ভগবান্ ব্যাসদেবের চেতনার মধ্যে গীতা প্রণয়নের আবেগের কারণ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের বিচারে এই সত্যই প্রতিষ্ঠা করে। গীতার অন্য কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্য গীতার উদ্গাতা মহর্ষিদেবের ছিল না তার প্রমাণ এই যে সমগ্র গীতাটির শ্লোকগুলি, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে অভিব্যক্তার মাপ কাঠি কলা বিজ্ঞানের প্রয়োগে একেবারে নিখুঁত করে সাজান হয়েছে, এবং এই বিজ্ঞানের প্রয়োগের কারণে অনিবার্য্য ভাবেই 'বিষাদ যোগ' থেকে 'মোক্ষ যোগ' পর্যান্ত ১৮টি অধ্যায় সিঁড়ির ধাপের মতই নিচু থেকে উপর-দিকে একের পর আর এক করে গড়ে উঠেছে। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অভিব্যক্তির মাপকাঠিতে গীতার অধ্যাত্ম-চেতনাকে মাপলে দেখা যায় যে ওতে ৯ কলা থেকে ১৫ কলার (আনন্দময় কোষের) বিকাশ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি কলাই বা ধাপই একের পর আর সাজান হয়েছে, সমাজ মনন ক্ষেত্রের মধ্যে যাঁরা অভিব্যক্তির একেবারে নিচুধাপে দাঁড়িয়ে আছেন তাদের একেবারে অগ্রবর্ত্তী, পূর্ণবিকশিত স্তরে পৌছে দেওয়ার উদ্দেশ্যই এই গীতার স্তর বিজ্ঞানে নিখুঁত ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য :—সমগ্র অধ্যাত্ম চেতনাকে মানুষের সমাজ মননের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, সমগ্র মানব মনন ক্ষেত্রটিকে পূর্ণ বিকাশের স্তরে, বোধীয় স্তরে, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির স্তরে পৌছে দেওয়া, সমগ্র মানব জাতিকে অমৃতময় করে তোলা, সৃষ্টির আনন্দময় কোষে পৌছে দেওয়া, এই সংকল্পই হচ্ছে গীতার উদ্‌ভাবন শক্তি।

যথাযথ ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রয়োগের সুনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞানের প্রেরণাই কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনটিকে বেদব্যাস উপযুক্ত বলে স্থির করেছিলেন। তার কারণ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে 'সমাজ মনন ক্ষেত্রের' নাম হচ্ছে বিষ্ণুস্তর। সমগ্র বিষ্ণু স্তরটি আবার ৪ টি উপস্তরে গড়া, (১নং) উপস্তর দৈবী বিষ্ণুস্তর—কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে গীতার শ্রীকৃষ্ণ এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অশ্বপাল (সহিস্) সঞ্জয় এই দৈবী বিষ্ণুস্তরের সুপুষ্ট ও স্পষ্ট অভিব্যক্তি, যাবৎ গীতা আমরা সঞ্জয়ের মুখেই শুনেছি, বিশ্বরূপ দেখবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে "দিব্য চক্ষু" Spiritual sight দিয়েছিলেন কিন্তু সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ তাঁর বিশেষ কৃপাদত্ত দৃষ্টি ছাড়াই দেখে দেখে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বর্ণনা করে গেছেন। বেদব্যাসের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান চেতনার এক মহান প্রয়োগ কৌশল। কুরুক্ষেত্র সমাজ মনন ক্ষেত্রের, বিষ্ণুস্তরের এই দুজনই সমান সমান দৈবী বিষ্ণুপুষ্ট উপস্তর।

(২নং) বিষ্ণু উপস্তর—দুর্ব্বলবাদী স্তর—পঞ্চ পাণ্ডব এই স্তরের পূর্ণ অভিব্যক্তি। বহুবিধ সংস্কারময় ধর্ম্মবোধ ও পাণ্ডিত্যের যুক্তিময় আবরণের অন্তরালে, যুধিষ্ঠিরের ভয়াবহ দুর্ব্বলবাদ ভীম-অর্জ্জুনাদির শক্তিকে অবসন্ন করে রেখেছিল যার পূর্ণ বিকাশ অর্জ্জুনের বিষাদযোগে কুলক্ষয় করার নানা দুর্ব্বলতার আবরণে, সম্মুখ সমরকে এড়িয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছিল, এবং যে দুর্ব্বলতা দৈবী বিষ্ণুপুষ্ট শ্রীকৃষ্ণের চাবুক খেয়ে পরে অপনোদিত হয়েছিল।

(৩নং) উপবিষ্ণু স্তর—আসুরিক বিষ্ণুস্তর—সমাজের

দুর্ব্বলবাদের (যুধিষ্ঠিরাদির) সুযোগে, যে ভোগবাদ, রাজস্ শক্তিকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠে তাকেই বলে অসুরবাদ —দুর্য্যোধনাদি এই অসুরবাদের পূর্ণ বিকশিত স্তর।

(৪নং) উপবিষ্ণুস্তর—অপুষ্ট বিষ্ণুর স্তর বা প্রচ্ছন্ন অসুরবাদ, পিতামহ ভীষ্ম হচ্ছেন এই প্রচ্ছন্ন অসুর বাদের এক অপূর্ব্ব বিকাশ, পাছে কুলবধূর ইজ্জত নিয়ে আসুরিক তাণ্ডবতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে, দুর্য্যোধন তাঁকে রাজ ভবন থেকে বের করে দেয় তবেই তো তাঁর রাজ ভোগ ও রাজ পালঙ্কে শয়নের আরাম ফুরিয়ে যাবে এই ভয়ে তাঁর বিশ্বজোড়া বীরত্ব অবসন্ন হয়ে গেল, আজীবন পালিত ব্রহ্মচর্য্য ও যাবৎ বিদ্যা একেবারে 'বন্ধ্যা' হয়ে গেল এমন হীনতার তিনি আশ্রয় নিলেন, তুচ্ছ রাজপুরীর অনায়াসলভ্য ভোগবাসনাকে চরিতার্থ করতে যে, সেই মুহূর্ত্তে বা পরেও বাণপ্রস্থ অবলম্বন করার মত শক্তিও তিনি হারিয়ে ফেললেন, এবং তার প্রচ্ছন্ন অসুর চরিত্রের বিকট পূর্ণাঙ্গ বিকাশ আমাদের দেখালেন দুর্য্যোধনের পক্ষে প্রধান সেনাপতি হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে নেমে হত্যা বীরত্ব নয় আর্ত্তকে আশ্রয়দানই বীরত্ব। দ্বিতীয় প্রচ্ছন্ন অসুর মহাবীর কর্ণ। লক্ষ্যভেদ পরীক্ষার সময় রাজা বা রাজপুত্র হওয়ার আইন থাকায়, দুর্য্যোধন অর্জ্জুনের প্রতি ঈর্ষা পরবশ হয়ে কর্ণকে মদ্র (মাদ্রাজ) দেশের রাজা করে জাতে তুললেন, সেই রাজার দম্ভে তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীর কাছে পরিচয় দিয়ে অপমানিত হলেন। সেই মহাবীরটি দানের সাগর হয়েও, একটি কুলবধূর, একটা নিঃসহায় অসুর হস্তে লাঞ্ছিত ব্যভিচারিত মেয়েছেলেকে তার আর্ত্ত সাহায্য প্রার্থনায় উপস্থিত থেকেও সাহায্য তো করলেনই না বরঞ্চ উল্টে এক পশুসুলভ প্রতি-হিংসাত্মক আনন্দ প্রকাশ করলেন। এই হোলো দানবীর মহাবীর কর্ণের বীরত্বের অগ্নিপরীক্ষার পরের চেহারা। হত্যা বীরত্ব নয় আর্ত্তকে আশ্রয় দানই বীরত্ব।

৩য় ও চতুর্থ প্রচ্ছন্ন অসুর হচ্ছে দ্রোণ ও কৃপ, এঁদের চিনতে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান প্রয়োগ প্রয়োজন হয় না।

সমগ্র বিষ্ণুস্তর, বিশ্বমানব সমাজ চেতনার স্তরটি এই ৪টি উপস্তরের সমষ্টি। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন, যেখানে এই ৪টি উপস্তরই পূর্ণ অভিব্যক্তি সেইখানেই ভগবান ব্যাসদেব গীতাকে অবতরিত করে দিয়েছেন—আমাদের সমাজচেতনা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানদানের জন্য।

বেদের সমগ্র জ্ঞানকাণ্ডটিকে, ভিক্ষুসূত্রটিকে অর্থাৎ বেদান্তটিকে বিশ্বমানব সমাজের মননে যদি প্রয়োগ করার অবতরিত করে দেওয়ার, অমৃত বর্ষণের আবেগ Potency of envolution যুক্ত করে বর্ষিণী করে দেওয়ার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নেয়া যায় তবে সমগ্র বেদান্তটি গীতায় রূপান্তরিত হয়ে, বর্ষণের envolutionএর, অবতরণের উপযোগী হয়ে সংগঠিত assembled হয়ে যাবে। আর সমাজ মনের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সম্মত ক্ষেত্র যদি এ বর্ষণের উপযোগী বলে বেছে নিতে হয় তবে সমগ্র বিষ্ণুস্তর পুষ্ট কুরুক্ষেত্র ছাড়া তখনকার দিনে আর কোন্ ক্ষেত্র ছিল? গীতা হচ্ছে অধ্যাত্ম চেতনাকে বিশ্বমানব সমাজ মননে অবতরিত করে দেওয়ার পূর্ণাঙ্গ অধ্যাত্ম বিজ্ঞান যার জন্য সুসংযত বৈজ্ঞানিক কর্ম্মযোগের পবিত্র লহরীময় কর্ম্ম সন্ন্যাসের অমৃত সাগর গীতার পাদপীঠ ধৌত করে দিয়েছে প্রথমেই। প্রিয় পাঠক, আপনি নিজেকে কৌরব সভার দ্যূতক্রীড়ার রঙ্গমঞ্চের একধারে স্থাপনা করে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা দেখুন, ঘৃণায় ভয়ে লজ্জায় আপনার চক্ষু বুঁজে যাবে, কিন্তু না পাণ্ডবদের না মহামহা শাস্ত্রজ্ঞ বীরদের কারো চক্ষু বুঁজে যায়নি, ঐ রঙ্গমঞ্চে খানিকক্ষণ থেকে কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে দাঁড়ান, দেখবেন "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ" বলে আপনার দুর্ব্বলবাদের উপরেও তিনি চেতনার চাবুক চালিয়ে যাবেন, কোন ভাববাদ বা সংস্কারবদ্ধ সংকীর্ণতাকে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান গ্রাহ্য করেনা, সোজা অন্তরতম সত্যকে এনে সে চেতনার দিব্য আলোতে দাঁড় করিয়ে তারপর তাকে চিনে নেয়। আপনিও নিজেকে এবং অপরকে এই বিজ্ঞানের আলোতে একমুহূর্ত্তে চিনে ফেলতে পারবেন।

গীতা—ফুলচন্দন দিয়ে, ভোগরাগ দিয়ে নিত্যলৌকিক পূজার মাধ্যম নয়।

গীতা—বিশুদ্ধ উচ্চারণে সহস্রবার করে আবৃত্তি করার জন্য উদ্ভাবিত হয়নি।

গীতা—সংকীর্ণ সম্প্রদায়গত সিমীত চিন্তাজাত টীকা তৈরি করে অর্থ ও খ্যাতি অর্জ্জনের মাধ্যম নয়।

গীতা—তার শ্লোক মুখস্থ করে, পাণ্ডিত্যের বাহন রূপে,

উদ্ধৃতি রূপে ব্যবহারের জন্য ভগবান বেদব্যাস রচনা করে যাননি।

গীতা—সমগ্র মানব সমাজ চেতনাকে আসুরিক, দুর্ব্বল ও প্রচ্ছন্ন অসুর মননের ক্লেদমুক্ত করে মানুষের জন্য এক অমৃতময় দেবলোকের, আনন্দলোকের সৃষ্টির সঙ্কল্পে গীতা রচিত করে, অধ্যাত্মতার প্রয়োগ করেছিলেন, এই তাঁর কর্ম্মপ্রবর্ত্তনার চরম অমৃতময় দান।

গীতা হয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে গীতার ব্যবহার অধ্যাত্ম বিদ্যার ব্যভিচার ছাড়া অন্য কিছুই বলে মেনে নেওয়া যায় না, "হয়ে যাওয়ার" বিজ্ঞানই কর্ম্মযোগ, জগৎহিতায় আত্ম সমর্পণ করা। গীতা পাণ্ডিত্যের মল্লভূমি নয়, গীতা বোধীর, বিশ্বপ্রেমের বাস্তব অভিব্যক্তির কল্যাণময় কর্ম্মপ্রবর্ত্তনার মহাবীর্য্যময় সংগ্রামী বিজ্ঞান। গীতা দুর্ব্বলের সান্ত্বনার অবলম্বন নয়, দুর্ব্বলকে মেরুদণ্ড সিধে করে দাঁড়াবার জন্য অধ্যাত্ম কশা।

গীতা বার্দ্ধক্যের, অক্ষমতার, শোকের প্রবোধ দাতা নয়, গীতা তাদের নিত্যনবীনত্বের, দুর্জ্জয় কর্ম্মপ্রেরণার মোহনাশের প্রাণশক্তি vital force, কর্ম্মযোগীরাই গীতার একমাত্র অধিকারী "জগদ্ধিতায়" যার যতটুকু আবেগ সে ততটুকুই গীতা।

গীতার শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশটি অধ্যায়ে ৭০০, (গীতার সাধকদের হিসাবে) টীকাকার আর পণ্ডিতদের হিসাবে শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫টি।

গীতার ছন্দ	অধ্যায়	শ্লোকের সংখ্যা
(১) ইন্দ্রবজ্রা	২	৭, ২৯
	৮	২৮
	৯	২০
	১১	২০, ২২, ২৭, ৩০
	১৫	৫, ১৫
(২) উপেন্দ্রবজ্রা	১১	১৮, ২৮, ২৯, ৪৫
(৩) উপজাতি	২	৫, ৬, ৮, ২০, ২২, ৭০
	৮	৯, ১০, ১১
	৯	২১
	১১	১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮; ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০,
	১৫	২, ৩, ৪
বিপরীত পূর্ব্বা	১১	৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৪

অবশিষ্ট (৪) অনুষ্টুপ্ ছন্দ—৬৪৫টি শ্লোক

গীতার ছন্দগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে, বিশেষ বিশেষ নিয়মে বর্ণ সমাবেশের নাম ছন্দঃ। এই বর্ণ-সমাবেশের সমগ্রই, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের বর্ণমালা বিজ্ঞান বা "ধ্বনি বিজ্ঞানের" দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করা রয়েছে। অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষের পূর্ণ বিকাশ—প্রকাশ জন্য অব্যাকৃত homogenous হয়ে যাওয়ার অবস্থার নামই—"মহত্তত্ত্ব" এই মহত্তত্ত্বই (যা—তম রজ ও সত্ত্ব গুণের সাম্যাবস্থা) সমগ্র ধ্বনি জগতের কেন্দ্র, এবং এই মহতত্ত্বে সমগ্র ধ্বনির মূল যে সাতটি ধ্বনি (অর্থাৎ যে ধ্বনির দ্বারা—সমগ্র ধ্বনি বৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনা—হয় সেই ধ্বনি সাতটি) তারা হচ্ছে—অ, ই, উ, ঋ, ঌ, ং, ঃ,

প্রত্যেকটি—শ্লোক ৪টি চরণে বা চারটি ভাগে বিভক্ত।

১। অনুষ্টুপ্ ছন্দ—এঁর প্রতি চরণে ৮টি করে বর্ণ বা অক্ষর আছে, প্রত্যেক চরণের ৫ম বর্ণ লঘু, ও ৬ষ্ঠ বর্ণ গুরু ১ম ও ৩য় চরণের ৭মবর্ণ গুরু এবং ২য় ও ৪র্থ চরণের ৭ম বর্ণ লঘু।

ইন্দ্রবজ্রাদি অপর ৪টি ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১১টি করে অক্ষর আছে।

২। ইন্দ্রবজ্রা—এঁর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৯ম বর্ণ লঘু।

৩। উপেন্দ্রবজ্রা—ইন্দ্রবজ্রারই প্রতিচরণের প্রথম বর্ণটি হ্রস্ব হলেই ওকেই উপেন্দ্রবজ্রা বলে।

৪। উপজাতি—ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিলনে প্রধানতঃ উপজাতি ছন্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ ৪টি চরণের একটি দুটি বা তিনটি ইন্দ্রবজ্রা ও অপরটি উপেন্দ্রবজ্রা হলে, অথবা একটি বা তিনটি উপেন্দ্রবজ্রা ও অবশিষ্টটি ইন্দ্রবজ্রা হলে, এই মিশ্রিত ছন্দটিকে উপজাতি ছন্দ বলা হয়।

৫। বিপরীত পূর্ব্বা—যদি—৪টি চরণের প্রথম ৪টি

ইন্দ্রবজ্রা এবং অপর তিনটি চরণ উপেন্দ্রবজ্রা হয় তবে সেই ছন্দটিকেই বিপরীত পূর্ব্বা বলে।

গীতায়—আর্ষ প্রয়োগ আছে বলে অনেক যায়গায় ছন্দ-বিষয়ক নিয়মের ব্যতিক্রম আছে—যেমন—

২য় অধ্যায়ের ২০নং শ্লোক—

৯ম " ২০ "

১১শ " ২২,৩৫ ,,।

গীতার ছন্দগুলির শক্তি বা potency "প্রয়োগ" বিজ্ঞান যুক্ত,অর্থাৎ সমাজ মননে প্রয়োগের implication এর শক্তি যুক্ত। যেমন কোন একটি কর্ম্মকে "করা ভাল" এমনি করে বলা চলে, কিন্তু সেই কর্ম্মটিকেই যদি—"করতে হবে" বা "কর্ত্তব্য" বলে ব্যক্ত করি তবে এ দুইটি বাক্যই—প্রয়োগ শক্তি যুক্ত হয়ে গেল, তাই গীতায় "গীতা সুগীতা "কর্ত্তব্যা" বলে প্রয়োগ শক্তি যুক্ত করে গীতাটিকে সমাজ-মননে প্রয়োগের উদ্দেশ্যেই সংগঠিত করা হয়েছে ভগবান ব্যাসদেব সেই সংকল্পটি স্পষ্ট ভাষায় আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। গীতা প্রয়োগের, achievement এর জন্যই বিজ্ঞানময় systemised knowledge করে সংগঠিত।

গীতার করাদিন্যাস ও অঙ্গন্যাসের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, অর্থাৎ স্থূল ভূত ৫টিকে যে সূক্ষ্মতায় নিলে তার উপরে, তিনটি গুণের আর বৈচিত্র রচনার শক্তি থাকেনা এবং সেই কারণে ভূতগুলি (অর্থাৎ chemical parts of the creation) শুধু নির্ভেজাল হয়ে যায় সেই বিজ্ঞানটির আলোচনার ও নিবেদনের ইচ্ছা থাকল।

সুগীতা কর্ত্তব্যা—Gita is to be achieved এর অন্য কোন ব্যবহার নেই।

গিরি কুমারী

শ্রীব্রজগোপাল বিশ্বাস

(গান)

গিরি কুমারি ! ওগো ঘিরি তোমারে
উল্লাসে ফুল হাসে থল্‌থল্ থল্।
দোলে বন-তল তাই দোলে বন-তল্॥
যে মায়া দোলে তব ওড়না-তলে,
তার ছায়া-কমল ফোটে ঝরণা-জলে ,
নির্ঝরে নীর ঝরে
ছল্ ছল্ ছল্॥
আনন্দেতে উঠে মেতে
গীতি কল্ কল্॥
কুয়াশা-মলিন অরুণ-কিরণে
শাড়ী মসলিন জড়িত হিরণে ,
হিম-কণিকা মণিকা-হারে
সাজায় তোমারে প্রীতি-উপহারে ,
শ্বেত-চাঁপা খোঁপা'-পরে
দোলে চঞ্চল্॥
নাচে তাই বনানীর
শ্যাম অঞ্চল্॥

ট্রিওলেট॥

চন্দ্রশেখর রায়

আকাশ :
আকাশের নীলে-নীলে আল্‌গোছে মেঘ-ছবি আঁকা ;
অনাহূত বিষ্টিতে আশ্বিনের বিচিত্র খেয়াল।
সূর্যের বুক-ভরা সোনা-রোদ ভ্রূকুটিতে বাঁকা
আকাশের নীলে-নীলে আল্‌গোছে মেঘ-ছবি আঁকা।
বিমুগ্ধ শেফালী ঝরে ; কুহকিনী তরুণী সকাল
সবুজের আবরণে পৃথিবীর বুক দেয় ঢাকা।
আকাশের নীলে-নীলে আলগোছে মেঘ-ছবি আঁকা ;
অনাহূত বিষ্টিতে আশ্বিনের বিচিত্র খেয়াল।
বাতাস :
এখানে প্রাত্যহিক সুরে বাজে সেই হাওয়ার সংরাগ
সমুদ্রের উচ্ছ্বলতা ভরে আনে বুকে।
ফুলের পল্লব হতে চুরি ক'রে সোনালী পরাগ
এখানে প্রাত্যহিক সুরে বাজে সেই হাওয়ার সংরাগ।
যুবতী নদীটি ডাকে : রূপালী সে আয়নার মুখে
ফিস্ ফিস্ কথা কয় ; চোখে-মুখে নকল বিরাগ।
এখানে প্রত্যাহিক সুরে বাজে সেই হাওয়ার সংরাগ
সমুদ্রের উচ্ছ্বলতা ভরে আনে বুকে॥

আবাহন

নাট্যকার মন্মথ রায়

[বাঁকুড়া জেলার বর্ধিষ্ণু গ্রাম শলাশপুরে ডাক্তার অর্জুন চৌধুরীর উপবেশন কক্ষ, সকাল বেলা, অর্জুন চৌধুরী তাঁহার বাড়ীওয়ালা লালমোহন দাসের সহিত কথোপকথনরত]

লালমোহন। আগে জানলে আমি আপনাকে এ বাড়ী কখনই ভাড়া দিতামনা ডাক্তারবাবু।

অর্জুন। কি জানলে?

লালমোহন। আপনি কি কুষ্ঠ রোগের ডাক্তার।

অর্জুন। আমি সব রোগেরই ডাক্তার।

লালমোহন। দেখছি, চিকিৎসাতো করে বেড়াচ্ছেন কুষ্ঠরোগের, বাড়িটা আমার কুষ্ঠরোগাশ্রম করে ছেড়ে দিয়েছেন। ভালোমানুষটি সেজে এসে বললেন, ডাক্তারী করবো, মনে মনে ভাবলাম, মন্দ কি। আপদে বিপদে একজন পাশকরা ডাক্তারের সাহায্য পাবো। তা মশাই আপনার মনে মনে যে এই মতলব ছিল কে জানতো! আপনি মশাই আমার বাড়ি দয়া করে ছেড়ে দিন।

অর্জুন। না মশাই, তা পারবোনা,—

লালমোহন। রাখুন আর জল ঘোলা করবেন না।

অর্জুন। আসুন। আমাকে আর বিরক্ত করবেন না, পাশের ঘরে পেশেণ্ট বসে আছে।

লালমোহন। পেশেণ্ট কাকে বলছেন মশাই, যত সব নোংরা পচা নর্দমার শ্যাওলা। তাহলে বাড়ি ছাড়বেন না!

অর্জুন। না, আপনি আসুন।

লালমোহন। পথ দেখাচ্ছেন? আমার বাড়িতে বসে আমাকেই পথ দেখাচ্ছেন?

অর্জুন। হ্যাঁ দেখাচ্ছি। আমার পেশেণ্টদের অপমান করার আপনার অধিকার নেই। আইনের দরজা খোলা আছে—আপনি সেখানে যেতে পারেন।

লালমোহন। বে-আইনী কাজ করবেন আপনি, আর আইনের দরজায় যাবো আমি? আচ্ছা দেখে নেব।

[রাগতভাবে প্রস্থান। অন্দরের দরজার পর্দা সরাইয়া অর্জুনের বর্ষীয়সী বিধবা মাতা জাহ্নবী দেবীর প্রবেশ।]

জাহ্নবী। লোকটা কে রে অজু?

অর্জুন। বাড়ীওয়ালা।

জাহ্নবী। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? এই তো নোনাধরা পোড়ো বাড়ী—সেই বাড়িওয়ালার এত দাপট? শহরে গিয়ে দেখে আসুক আমার বাড়ি। ছানাবড়া হবে না ওর চোখ? কত করে তোমায় আমি বলে ছিলাম অজু—ডাক্তারী পাশ করলি—বাড়িতে বসে প্রাক্‌টিশ কর। শুনলিনা আমার কথা। চলে এলি এই অজ পাড়াগাঁয়ে কিসের মোহে ভগবানই জানেন। না বাবা, এই দুদিনেই আমি হাঁফিয়ে উঠেছি। ছেলে বৌ নিয়ে ঘর করা আমার কপালে নেই—স্বামীর ভিটেতেই আমাকে পাঠিয়ে দে।

অর্জুন। শোনো মা!

জাহ্নবী। কি আবার শুনবো? কোনো কথা আমি শুনবো না। এ নরকে আমি পচে মরতে পারবো না!

অর্জুন। নরক! কি বলছো মা?

জাহ্নবী। নরক ছাড়া কি। যে দিকে তাকাবো, খালি কুঠ আর কুঠ, দেশটাই কুঠের দেশ, ঘেন্নায় বমি আসে। না বাপু, আমাকে আজই দেশে পাঠিয়ে দে,

ছেলে ছেলের বৌ তোমরা আমার মাথায় থাকো, এখানে আমি টিকতে পারবো না।

অর্জুন। সে কি মা। এই কাল রাতেই বলছিলে যে আমিই তোমার কাশী—আর অরুণা তোমার বৃন্দাবন। আর আজ তুমি চলে যেতে চাইছো? তোমার অমতে বিয়ে করেছি বলে এতদিন ছিলো রাগ। বৌয়ের মুখ দেখবেনা বলে শাসিয়েছিলে আমাকে। কিন্তু সেই বৌ দেখেই যেন হাতে স্বর্গ পেলে সেই স্বর্গ আজ আবার হঠাৎ এমন নরক হয়ে উঠছে কেন মা?

জাহ্নবী। ঐ কুঠ। কুঠ। চারিদিকে কুঠ (হঠাৎ কলিকপেনে আক্রান্ত হইয়া) ওরে বাবারে! (পেট চাপিয়া ধরিয়া) আবার সেই অম্লশূলরে বাবা! বৌমা তুমি কোথায় মা—আমাকে বাঁচাও মা

অর্জুন। অরুণা রোগী দেখতে গেছে এখনি এসে পড়বে। শংকর! শংকর! শিগ্‌গীর এক গ্লাস জল নিয়ে আয়। আমি ওষুধ দিচ্ছি মা!

জাহ্নবী। নারে বাবা, তোর অষুধে সারে নারে। বৌমা যে কি একটা দেয়—তাতে সঙ্গে সঙ্গে শান্তি। বৌমারে! কোথায় তুমি গেলে মাগো!

অর্জুন। তোমার বৌমার ওষুধই দিচ্ছি আমি।

[শংকর এক গ্লাস জল আনিয়া দাঁড়াইল]

জাহ্নবী। ওরে বাবা ওই কুঠের হাতের জল আমি খাবো নারে বাবা। ওষুধ বমি হয়ে বেরিয়ে যাবে, তুই বাবা, আমাকে একটা ইনজেকশন দে—সেই যে প্রথম দিন দিয়েছিলি? কি হলো রে বাবা! আঃ আর আমি পারছিনা। প্রাণটা আমার বেড়িয়ে যাচ্ছে।

[জাহ্নবী মূর্ছিতা হইলেন। অর্জুন তাঁহার নাড়ী দেখিয়া ইনজেকশনের বাক্স আনিতে শংকরকে নির্দেশ দিলো, শংকর জলের গ্লাসটি এখানে রাখিয়া ইনজেকশনের বাক্স আনিতে গেল। ইতিমধ্যে অরুণা আসিয়া পড়িল। সুদর্শনা, বুদ্ধিদীপ্তা তরুণী হাতের ডাক্তারী ব্যাগটি নামাইয়া রাখিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল।]

অরুণা। ব্যাপার কি?

অর্জুন। সেই উইণ্ড-কলিক্। তুমি যখন এসে গেছ, তখন আর ইনজেক্শন দেবনা। এই যে জ্ঞান হচ্ছে। মা! মা! এই দেখ অরুণা এসে গেছে।

জাহ্নবী। এসেছিস? আমায় বাঁচা মা!

অরুণা। (সযত্নে তাঁহাকে তুলিয়া) চলুন, এখনি আমি সারিয়ে দিচ্ছি।

জাহ্নবী। এই দেখ তুমি ছুঁতেই ব্যথাটা কম হচ্ছে। এ যে কি ব্যথা মা—হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়।

[অরুণা তাঁহাকে লইয়া অন্দরে চলিয়া গেল।]

অর্জুন। শংকর তোর জলটা দে। (শংকরের হাত হইতে গ্লাসটি লইয়া সবটুকু জল খাইয়া) ওরে বাবা! এক মুহূর্তেই ঘেমে উঠেছি। (ঘড়ি দেখিয়া) বেরুবার সময় হলো, রোগীর ঘরে কে আছেন—ডেকে আন, আমি তৈরী হচ্ছি।

[অর্জুন তাহার ব্যাগে ওষুধপত্র পুরিতে লাগিল। শংকর রোগীর ঘরে গিয়া এক ভদ্রলোককে ডাকিয়া আনিল।]

অর্জুন। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। কিছু মনে করবেন না।

ভদ্রলোক। না দেখলাম তো আপনার ঝামেলা। বাড়িওয়ালার হুমকি—তার ওপর মায়ের অসুখ।

অর্জুন। আপনাকে যেন আমি কোথায় দেখেছি!

ভদ্রলোক। বাঁকুড়া কুষ্ঠাশ্রমে। আপনি তখন ওখানে ডাক্তার ছিলেন। আমি যখন ট্রিটমেণ্টে ছিলাম, তখনই আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। আপনি চলে আসাতে আশ্রমের রোগীরা সবাই বড় দুঃখ করতো।

অর্জুন। এসেছিলাম—আমি আমার কোন ব্যক্তিগত কারণে, সে থাক। আপনি তো সেরে গেছেন মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক। কুষ্ঠাশ্রমে গিয়ে এক স্বাধীন সামাজিক পরিশ্রমের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক খোরাক পেয়ে আর তার সঙ্গে মালফোন ওষুধের কল্যাণে অসুখটা সেরেই গিয়েছিলো। হাসপাতাল থেকে তাই ছেড়েও দিয়েছে। কিন্তু এখন যে অসুখে ভুগছি এর কি চিকিৎসা বলতে পারেন?

অর্জুন। কি অসুখ?

ভদ্রলোক। নাপিত চুল কাটে না আমার, ধোপা কাপড় কাচে না আমার, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আসে না আমাদের বাড়ি। যে চাকরি করতাম, সে চাকরি

আর ফিরে পেলাম না। অশক্ত বৃদ্ধ পিতামাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি। বুঝুন আমার অবস্থা। এর চেয়ে বড় অসুখ কি হতে পারে ডক্টর চৌধুরী?

অর্জুন। বটেই তো!

ভদ্রলোক। তাই আমার কাজই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কুষ্ঠরোগের ডাক্তারদের খুঁজে খুঁজে বার করা আর তাদের কাছে গলা ফাটিয়ে বলা—বনবাসেই যদি দিতে হয়, কী লাভ সীতা উদ্ধারে? রোগ যার সম্পূর্ণ নিরাময় হলো, সমাজ যদি তাকে কোলে স্থান নাই দেয়—ধন উৎপাদনের কাজে, দেশ কল্যাণের কাজে না-ই নিয়োগ করে—দেশ সংগঠনের বিশাল যজ্ঞে তাকে অংশগ্রহণ করতে নাই দেয়—পরিবার গোষ্ঠি বা বৃহত্তর সমাজের কোনো কাজে যদি নাই লাগে সে, কি প্রয়োজন অজস্র অর্থ এবং সময় ব্যয় করে তাকে সারিয়ে তোলার? শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি বা ভিক্ষাবৃত্তিই যার পরিণতি, সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাফল্য কোথায়? খঞ্জ রেসের ঘোড়ার মতো গুলি করে মেরে ফেললেই হয়!

[রোষে ক্ষোভে ভদ্রলোক কাঁপিতে লাগিলেন।]

অর্জুন। আপনার একটি কথাও মিথ্যে নয়। আপনার মুখের ঐ বিকৃতি আর গায়ের এই দাগ ছাড়া আপনি সম্পূর্ণ সেরে গেছেন। আপনি বসুন, একটু বিশ্রাম করুন। এ বিষয়ে আপনি আমার স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ করতে পারেন। তিনিও একজন কুষ্ঠ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। (ঘড়ি দেখিয়া) আমাকে আবার এখনি বেরুতে হচ্ছে একটা জরুরী কেস দেখতে। বেশ একটু দেরীই হয়ে গেছে, আমি আসছি। শংকর তোমার মাকে গিয়ে বলো তাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্য ইনি রইলেন।

শংকর। এই যে মা এসে গেছেন।

[অন্দর হইতে অরুণার প্রবেশ]

অর্জুন। মা কেমন আছেন?

অরুণা। ঘুমিয়ে পড়েছেন।

অর্জুন। তুমি ওঁর সঙ্গে আলাপ কর। আমি সেই জরুরী কেসটা দেখে আসি। (ভদ্রলোককে) আচ্ছা নমস্কার।

[অর্জুন রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গেল। অরুণা এবং ভদ্রলোকের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হইল।]

ভদ্রলোক। আমি ভুল করছি না তো?

অরুণা। কি ভুল?

ভদ্রলোক। আচ্ছা আপনি কি অরুণা রায়?

অরুণা। (হাসিয়া) ছিলাম। এখন অরুণা চৌধুরী আর আমিও বোধহয় ভুল করছি না আপনি তো নিবারণ মাইতি? আমাদের সেই নিবুদা! কি আশ্চর্য! আবার যে দেখা হবে ভাবতেই পারিনি।

নিবারণ। তবেই দেখ কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অরু তোমাকে এখন দেখলে চট করে চেনাই যায় না।

অরুণা। শংকর দু পেয়ালা কফি করে আননা!

[শংকর অন্দরে চলিয়া গেল।]

অরুণা। কিন্তু সব কথার আগে একটা গুপ্ত কথা বলে রাখছি তোমাকে নিবুদা। প্লাসটিক সার্জারীতে আমার নাকটা স্বাভাবিক হয়েছে। তোমাকে একটা অনুরোধ নিবুদা!

নিবারণ। অনুরোধ! কি অনুরোধ বলো তো?

অরুণা। আমার যে কুষ্ঠ হয়েছিলো সেটা এই অঞ্চলে কেউ জানে না—জানেন শুধু স্বামী। হ্যাঁ, আমার শাশুড়ী ও এটা জানেন না। পারিবারিক অশান্তির ভয়ে শাশুড়ীর কাছেও এটা গোপন রেখেছেন আমার স্বামী। তবে হ্যাঁ বলবেন—তাঁর মনটা তৈরি করে নিয়ে তবে বলবেন। তোমাকে অনুরোধ, তুমি এটা এখানে গোপনই রেখো। রাখবে না নিবুদা!

নিবারণ। বারণ যখন করছো তখন নিবারণদা করিত হবেন বৈকি! তুমি এজন্য ভেবো না অরুণা। প্লাসটিক সার্জারীর কথা আমিও শুনেছি কিন্তু সাধ্যে কুলোবে কি আমার? অরুণা, সমাজ আমাকে একঘরে করে রেখেছে অরুণা। একে কি জ্বালা! সেরে উঠেও আমার এখন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয় অরু!

অরুণা। আমারও তাই হতো, আমিও আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম নিবারণদা। কিন্তু আমাকে বাঁচিয়েছেন তোমাদের এই ডাক্তার। যখন হাসপাতালে ছিলাম তখনই আমি ওকে বলতাম ভস্মে ঘি ঢালছেন কেন ডাক্তারবাবু? এ চিকিৎসায় লাভ কি? বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারী পড়ছিলাম। রোগীকে সুস্থ করবো—

ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করে জিতবো, এই সব ছিলো স্বপ্ন আর সংকল্প। কুষ্ঠ যদি আমার সেরেও যায়—আমার সে স্বপ্ন, সে সংকল্প আর কি কখনও পূর্ণ হবে? ঘেয়ো কুকুরের মতো লাথি-ঝাঁটা খেয়ে কি হবে বেঁচে! ঐ ডাক্তার—অর্জুন চৌধুরী সেদিন আমায় বলেছিলেন 'আমার চেয়ে তোমার জীবনের দাম বেশী অরুণা।'

নিবারণ। হ্যাঁ উনি সবাইকে খুব আশ্বাস দিতেন।

অরুণা। কিন্তু আমাকে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন—যে কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে এতটুকু মিথ্যে ছিল না কোথাও। বলতেন, আমার জীবনের চেয়েও তোমার জীবনের দাম বেশি। কেন বলতেন জানেন?

নিবারণ। কেন?

অরুণা। কুষ্ঠ রোগী ডাক্তার হলে, কুষ্ঠ রোগীর ব্যথা, বেদনা জ্বালা-যন্ত্রণা সে যত বুঝতে পারবে—তার যত দরদ হবে, যত হবে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—এমনটি আর অন্য ডাক্তারের হবেনা।

নিবারণ। মিথ্যা বলেননি—মিথ্যা বলেননি উনি!

অরুণা। তা যে বলেন নি—তা প্রমাণ করলেন আমাকে দিয়ে। সারিয়ে তুললেন আমাকে। সে যেন এক তপস্যা।

নিবারণ। আমরা সেটা দেখেছি।

অরুণা। শুধু দেখনি—খুব কানাকানি হাসাহাসিও হয়েছে এ নিয়ে।

নিবারণ। হ্যাঁ, তা একটু হয়েছিল।

অরুণা। একটু কি বলছো খুব বেশিই হয়েছে। কর্তৃপক্ষ একটা confidential চিঠি দিয়ে ওঁকে সাবধান করেন।

নিবারণ। তা অবশ্য জানিনা। তবে, আমরা অবাক হয়ে গেলাম, হঠাৎ উনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

অরুণা। কিন্তু আমাকে ছাড়লেন না। হাসপাতাল থেকে খালাস পেতেই প্লাসটিক সার্জারী করিয়ে প্রায় নিখুঁত করে তুললেন আমাকে। শুধু তাই নয়, শেষে বললেন আমাকেই করবেন বিয়ে। আমাকে, একদিন যে কুষ্ঠরোগে পচে যাচ্ছিল, গলে যাচ্ছিলো, তাকে।

নিবারণ। আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!

অরুণা। আমি কিন্তু প্রথমে রাজী হইনি নিবারণদা। আমি বলেছিলাম, দয়ার একটা সীমা আছে ডাক্তার চৌধুরী। বলেছিলাম, বিয়ের ভিত্তি দয়াতে নয়—প্রেমেতে।

নিবারণ। হুঁ! তারপর?

অরুণা। কিন্তু তিনি শুনতে চাইলেন না। শুধু বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—আমাকে বিয়ে করে কি তুমি সুখী হবেনা অরুণা? তাঁর বুকে লুটিয়ে পড়া ছাড়া আমার কি উত্তর হতে পারত নিবুদা!

নিবারণ। হৃদয় বলে যদি তোমার কোনো বস্তু থাকে অন্য কোন উত্তর হতে পারতোনা অরুণা। খুবই আনন্দ হচ্ছে আমার! হ্যাঁ, শত দুঃখের মধ্যেও, শত যন্ত্রণার মধ্যেও সত্যিকার একটু আনন্দ আজ পেলাম।

[শংকর কফি রাখিয়া দিয়া অন্দরে চলিয়া গেল।]

অরুণা। একটু কফি খাও নিবারণদা।

নিবারণ। খাচ্ছি। অরুণা তোমার শাশুড়ীকে তো আজ দেখলাম। আমি ভাবছি এই শাশুড়ীকে নিয়ে তুমি ঘর করবে কি করে।

অরুণা। আমার রোগের কথা গোপন রেখেই আমাদের বিয়ে রেজিষ্ট্রী করেছেন উনি। পরে শুধু বিয়ের কথাটাই জানালেন মাকে। মা গেলেন চটে। চটে যাবার কথাও বটে।

নিবারণ। কেন উনি তো আর ব্যারামের কথা শোনেন নি, তবে?

অরুণা। কত সব বড় বড় ঘর থেকে ডাকসাইটে সব সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এসেছিলো ওঁর। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা—এমনি সব সম্বন্ধের মধ্যে কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরবেন—মা যখন এই সব চিন্তা করছিলেন তখন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো খবর পেলেন—বিয়ে হয়ে গেছে না-জানা না-শোনা হাসপাতালের এক ডাক্তার মেয়ের সঙ্গে। মা শুনেই ছেলেকে জানিয়ে দিয়েছিলেন—বৌ যেন হাসপাতালে মড়াই ঘাঁটে, শ্বশুর-ভিটেতে এসে শাশুড়ীকে না ঘাঁটায়।

নিবারণ। কিন্তু সেই বৌ নিয়েই তো ঘর করতে এসেছেন দেখছি।

অরুণা। (হাসিয়া) এসেছেন শ্বশুরের ভিটেতে নয়, এসেছেন ছেলের ডিসপেনসারিতে। কলিক পেনে খুব

ভুগছেন যে! তা আমরাও পণ করেছি ওঁকে সারিয়ে আমরা তুলবোই। শুধু দেহের ব্যাধি নয়—ওঁর মনের ব্যাধিও—।

নিবারণ। (হাসিয়া) কুষ্ঠ রোগের প্রতি ওঁর যে নিদারুণ ঘৃণা দেখলাম, হ্যাঁ তাকে ব্যাধিই বলা চলে। তা যাক মনে প্রাণে প্রার্থনা করি—তোমরা দশজনকে সুখী করছো। নিজেরাও সুখী হও। আচ্ছা, আমি আজ তবে উঠি।

অরুণা। সেকি! তোমাকে এখানে খেয়ে যেতে হবে।

নিবারণ। না ভাই, আজ আর তা পারবোনা। এই গাঁয়ে একজন লোক আছে যার কাছে আমি বেশ কিছু টাকা পাই। উঠেছি আমি তারই ওখানে। সে আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। কিন্তু আমি তাতে রাজি নই। টাকা না নিয়ে আমিও বাড়ি ছাড়ছি না। তবে হ্যাঁ, আমি আবার আসবো। টাকাটা যদি পাই অবশ্য তবেই আসবো। কেন জানো? ঐ প্লাসটিক মার্জারীর ব্যবস্থা তোমরা আমার করে দিতে পারো কিনা—আলাপ করতে।

অরুণা। আসবে আসবে নিশ্চয় আসবে, টাকা পেলেও আসবে, না পেলেও আসবে। আসবে কিন্তু নিবারণ দা!

নিবারণ। নিশ্চয় আসবো। এতদিন পরে মনে হচ্ছে এই অন্ধকারে আমি যেন একটা আলো দেখছি—সে আলো তোমরা। চলি।

অরুণা। দাঁড়াও তোমাকে একটা প্রণাম করতে ইচ্ছে আজ।

[প্রণাম করিল]

নিবারণ। অনেক কাল পর আজ একটু সহানুভূতি, একটু সমবেদনা পেলাম। দশজনকে সুখী করছো, নিজেরাও সুখী হও। এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমার নেই।

অরুণা। আমার অনুরোধটা মনে রেখো।

নিবারণ। তোমার সোনার সংসারের সুখ শান্তি ভেঙ্গে দেবার মতো বর্বর আমি নই অরুণা। এ বিশ্বাস-টুকু আমার উপর রেখো ভাই।

প্রস্থান

শংকরের প্রবেশ, হাতে কাগজপত্র গাঁথিয়া রাখিবার একটি ফোঁড়ন

শংকর। দেখুন তো মা, বাড়ি ভাড়ার রসিদ এগুলি না?

অরুণা। সে কি, এগুলো আনলে কেন?

শংকর। এগুলো আলমারিতে বন্ধ করে রাখুন মা।

অরুণা। কেন? কেন বল তো?

শংকর। এটা ছোট ঘরে দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল।

অরুণা। তা বেশ তো ছিল।

শংকর। না মা বেশ ছিল না। এগুলো হারিয়ে গেলে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার প্রমাণটা নষ্ট হল না কি?

অরুণা। হ্যাঁ, তা হয়তো হবে—কিন্তু এসব কথা উঠছে কেন?

শংকর। জানেন না বুঝি বাড়িওয়ালা যে কিছু আগে শাসিয়ে গেছে—আইনকরেই হোক আর বে-আইনী করেই হোক সে এ বাড়ি থেকে আপনাদের তাড়াবেই তাড়াবে।

অরুণা। ও তাই নাকি। তা বেশ, দাও, আল-মারিতে তুলে রাখছি, শংকর! সত্যি! তোমার এত বুদ্ধি।

শংকর। (হাসিয়া) বুদ্ধি! এ বুদ্ধির দাম কি। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, কুষ্ঠে ছুঁলে হাজার ঘা। সেরে গেলে সে আরো যন্ত্রণা, মায়ের পেটের ভাই, সাতপাকে বাঁধা স্ত্রী, তারাও তো ঘরে নিলো না। পথে তাড়িয়ে দিল। কোন জন্মে না জানি কি একটা পুণ্য করেছিলাম তাই মা তোমাদের কাছে এই আশ্রয়টুকু পেয়ে টিকে আছি।

অরুণা। না না তোমাকে পেয়ে আমাদের কম লাভ হয়নি শংকর। বাড়ির কত কাজ করছ তুমি।

শংকর। কিন্তু এর চেয়েও ভালো কাজ করতাম আমি। আমি ছিলাম প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার। কিন্তু এ পথ আমার বন্ধ। লোকের টাইফয়েড হয়, বসন্ত হয়, সেরে যায় কিন্তু অনেকের দেহে তার চিহ্ন থাকে। কিন্তু তার জন্য তো এমন ঘৃণা দেখি না—যে ঘৃণা দেখি কুষ্ঠের বেলায়।

অরুণা। পুরুষ তোমরা, তোমরাই ঘৃণা সইতে

পারো না, মেয়েদের কি দুর্দশা হয় ভেবে দেখ। হায় হায়, কবে মানুষের চৈতন্য হবে। কবে মানুষ বুঝবে শতকরা ৭৫জন কুষ্ঠরোগী অসংক্রামক। কুষ্ঠ বংশগত রোগ নয়। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় যদি ধৈর্য ধরে চিকিৎসা হয় তবে অন্য যে কোন রোগের মতোই কুষ্ঠের কোন চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। তোমার তা হয়নি শংকর তাই তোমার এই অঙ্গ বিকৃতি। কিন্তু রোগ তোমার নির্মূল হয়ে সেরে গেছে। আমার ইচ্ছে হয় তোমার বাড়ির লোকজনদের এখানে এনে দেখিয়ে দি তোমাকে নিয়ে আমরা কেমন আনন্দে আছি।

[জাহ্নবী দেবীর প্রবেশ]

জাহ্নবী। ঐ আনন্দেই থাকো মা। জানো যে লোকটা শুধু কুঠে নয় চোর?

অরুণা। চোর! কার কথা বলছেন মা!

জাহ্নবী। আবার কার ঐ চাকরটার।

অরুণা। কেন, কি করেছে?

জাহ্নবী। তুমি তো ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলে আমায়, হঠাৎ কি একটা শব্দ হল, ঘুমটা গেল ভেঙে। আমার আবার পাতলা ঘুম তো, খুট করে যেই একটা শব্দ —চোখ মেলে দেখি আতিপাঁতি করে কি সব খুঁজছে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম কাগজপত্র খুঁজছে টেবিলের ড্রয়ার টানছে—তারপর দেখি কি নাকি হাতিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। লোকটার চেহারা দেখলে আমার বমি পায়। উঠে বমি করতে গেলাম বাথরুমে, ফিরে এসে পা টিপে টিপে গেলাম ও যে ঘরে শোয় সে ঘরে। দেখলাম নেই। গেল কোথায়—খুঁজতে গিয়ে দেখি তোমার এখানে—ওকে নিয়ে কেমন আছো তোমরা, তাই বলছো—ওয়াক্—ওয়াক্। [বমির উদ্রেক]

অরুণা। তুমি এখান থেকে চলে যাও তো শংকর মাকে আমি সব বুঝিয়ে বলছি। শংকর ঘর থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে এনেছে বাড়িভাড়ার এই রসিদগুলো—

শংকর। (ট্যাক হইতে একটি একশ টাকার নোট বাহির করিয়া) বাড়িভাড়ার ঐ রসিদগুলো বাড়িওলার হাতে ফেরত দিলে আমাকে সে পাঁচশ টাকা দেবে—এই একশ টাকা আগাম দিয়েছে। এই একশ টাকায় আমি ওর শ্রাদ্ধ করব বলে রেখেছি। এ নোটটাও তুমি তুলে রাখ মা।

জাহ্নবী। বুঝেছি—বুঝেছি। বাড়িওয়ালা শাসিয়ে গেছে আমাদের এ বাড়ি থেকে তাড়াবে। তাই টাকা দিয়ে ওকে হাত করে, বাড়ি ভাড়ার রসিদগুলো মারবার তালে ছিল। ওরে বাবারে কি দেশরে বাবা—আমায় কোথায় এনে ফেলেছিস রে মা। তা তুমি বাবা পাঁচশ টাকা ছেড়ে দিলে। একশ টাকাতেই খুশী হলে!

অরুণা। (হাসিয়া) একশ টাকাই বা নিল কোথায়? সেও তো আমার হাতে তুলে দিল মা!

জাহ্নবী। কুঠ হয়ে বুদ্ধি-শুদ্ধিও লোপ পেয়েছে বাবা। এ তবে কেমন ব্যাধিরে মা!

অরুণা। তবেই দেখুন। ঐ রসিদগুলো বাড়িওয়ালা হাতে পেলে আমরা বাড়ি ভাড়া দিয়েছি তার প্রমাণ লোপ পেত। গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতনা আমাদের?

জাহ্নবী। চৌধুরী বংশের মান রেখেছো বাবা। ও অপমান আমি সইতে পারতাম না। বিষ খেয়ে মরতে হতো আমাকে। ভাবতেই আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। যাও তো বাবা—এক গ্লাস জল—শীগ্গীর—

[শংকর জল আনিতে ছুটিল]

অরুণা। কথা কইছেন না যে মা!

জাহ্নবী। একবার শিবরাত্রিতে তারকেশ্বরে ছিলাম। শিবের মাথায় জল ঢেলে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছি—দেখি এক কুষ্ঠ রোগী একটা পয়সা ভিক্ষা চাইতে বুক ফাটানো সে কি হাউমাউ কান্না! কিন্তু ঘেন্নায় আমি তার দিকে তাকাতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি ঘরে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন আর একটি বৌ, তিনি ভিক্ষা দিয়ে এসে আমায় বললেন—কেন কিছু দিলেন না গো! আজকের রাতে শিবঠাকুর ওমনি সব রূপ ধরে লোকের মন বোঝেন।

অরুণা। হুঁ তারপর?

জাহ্নবী। কথাটা আমার সেদিন বিশ্বাস হয়নি। বিশ্বাস হচ্ছে আজ। হ্যাঁ তোমাদের ওই শংকরকে দেখে। শিবঠাকুর ভর করেন সবারি মাঝে। যেমন দেখলাম আজ ওর মধ্যে।

[জল লইয়া শংকরের প্রবেশ]

জাহ্নবী। দাও বাবা—তোমার হাতের জল আজ শিবঠাকুরের চন্নামৃত।

[শংকরের হাত হইতে গ্লাস লইয়া জলপান।]

[অর্জুনের প্রবেশ, সে এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইল। শংকর গ্লাসটি লইয়া অন্দরে চলিয়া গেল।]

অর্জুন। ব্যাপার কি মা? শংকরের হাতে জল খেলে।

জাহ্নবী। বেশ করেছি।

অর্জুন। ওর তো কুষ্ঠ হয়েছিল।

জাহ্নবী। হয়েছিল, সেরে গেছে। সেরে না গেলে, তোরা ওর হাতে জল খাস। ভয়ের কিছু থাকলে ওকে নিয়ে ঘর করিস? তোরা দুজনে দু দুটো বাঘা ডাক্তার না?

অর্জুন। লক্ষ্মী মা আমার। এই তো বুঝেছ!

জাহ্নবী। কেন বুঝব না? দুদিন তোদের এত লেকচার শুনেছি। স্বচক্ষে কত লোকের আনাগোনা দেখছি—কত আশীর্বাদ করছে কত ধন্যবাদ দিচ্ছে তারা তোদের। আমি কি কাণা না কালা দেখছি তো শুনছি তো সব। গর্বে আমার বুকটা ভরে উঠেছে রে ভরে উঠেছে—তবে কি জানিস, সংস্কার যেতে একটু সময় লাগে।

অর্জুন। তবে তুমি আর বাড়ি যাচ্ছনা, আমাদের কাছেই থাকছো?

জাহ্নবী। তোদের ছেড়ে আর কোন চুলোয় যাব রে বাবা! তোরাই আমার কাশী তোরাই আমার বৃন্দাবন। দারুণ শূলবেদনায় প্রাণ বেরিয়ে যায়—ধরে রাখবার লোক ঐ একটিই আছে—আমার এই বৌমা। আজ বুঝেছি কত পুণ্যে তোমায় পেয়েছি।

[জাহ্নবী অরুণাকে বুকে টানিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। অর্জুন আলমারি খুলিয়া একটি ফটো বাহির করিয়া তাহা মায়ের হাতে দিল।]

অর্জুন। দেখ তো মা এই ফটোটা—

জাহ্নবী। কে রে! আহাহাঃ কি সুন্দর চেহারা—কিন্তু নাকটা এমন কেন রে? একি! এও কুঠ?

অর্জুন। হ্যাঁ মা তবে এখন একেবারে সেরে গেছে। কোন চিহ্নই আর নেই।

জাহ্নবী। কিন্তু থ্যাবড়া নাকটা যাবে কোথায়? সেটা তো রয়েই গেছে। বৌমার কোন বোন-টোন নাকি? একই রকম দেখতে।

অর্জুন। তোমার বৌমার কোন বোন-টোন নয়। ভাল করে দেখে বল।

জাহ্নবী। তবে কি—তবে কি—

অরুণা। হ্যাঁ মা আমিই।

[জাহ্নবী স্তম্ভিত হইলেন। একবার ফটো ও একবার অরুণার মুখ বারবার দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে সজোরে বলিয়া উঠিলেন—]

জাহ্নবী। কিন্তু কুঠো নাক তবে কোথায় গেল? না এ আমার বিশ্বাস হয়না।

অর্জুন। অপারেশন করে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, নাকের নবজন্ম হয়েছে তুমি তা ধরতে পারছো না।

জাহ্নবী। তবে বলব বাবা তারকেশ্বরের দয়া। এমন লক্ষ্মীকে থ্যাবড়া নাকের জন্যে যদি একটিবারও ঘেন্না করতাম, পাপ হতো। সে পাপ থেকে খুব বেঁচে গেছি। শংকর! শংকর! আর এক গ্লাস জল এনে দাও বাবা—গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে।

[শংকর কাছেই ছিলো, গ্লাসে জল ভরিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

শংকর। আমার নাক কিন্তু এখনও থ্যাবড়াই রয়ে গেছে ঠাকুমা।

জাহ্নবী। আর থাকবেনা, আমার ছেলে অর্জুন না? এক বাণে উড়িয়ে দেবে কোন্‌দিন দেখবি তোর ঐ থ্যাবড়া নাক। (জলপান করিয়া) ওরে! থ্যাবড়া নাক এমন কিছু না। ছেলে কানা হলেও যেমন মায়ের কাছে পদ্ম-লোচন—তুমি শংকর থ্যাবড়া হলেও আমার কাছে শিব-শংকর। ওরে অর্জুন! বাড়িওয়ালার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে এই নির্লোভ মহাদেব। ওর থ্যাবড়া নাকটা কেটে-কুটে ঠিক-ঠাক করে দে বাবা।

[আর সকলে হাসিয়া উঠিল।]

যবনিকা

শ্রী মা আনন্দময়ী সকলকারই মা

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী এখন শুধু বাঙলীর মা নহেন, তাঁর প্রভাব সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই আমার অক্ষম লেখনীর দ্বারা তাঁহার সেই মাতৃস্নেহের প্রভাবের একটা বিশেষ দিক্ যাহা কেহই বড় লক্ষ্য করেন না কয়েকটি ঘটনা দ্বারা যেমন স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা অঙ্কিত করিতে চাই। আমাদের মা বোনেরা যাহারা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত তাঁহাদের ভাল লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

(১)

দেরাদুনে সহস্রধারায় একজন রাণী এক বিশেষ যজ্ঞে শ্রীমাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে যজ্ঞ কয়েকদিনেই শেষ হইলে পর মা সেই বিরাট জনসভা হইতে বিদায় লইয়া আমাকে বলিলেন, বাবা, চল ডুঙ্গায় যাই। তোমার সেখানে খুব ভালো লাগবে। মা ডুঙ্গায় যাচ্ছেন শুনে অনেকেই তাঁর সঙ্গে যাইতে চাহিল। আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন চলিলাম।

ডুঙ্গা দেরাদুন থেকে কয়েক মাইল দূরে। তাহার তলদেশ দিয়া ক্ষুদ্রকায়া নদী প্রবাহিত। তাহার ওপারে চাকরাটার পর্ব্বতশ্রেণী, দৃশ্য অতি মনোহর। বৈকালে আমরা ডুঙ্গার আশ্রমে পৌঁছিলাম। মা'র নামে এই আশ্রম জমিদার স্বর্গীয় শের সিংহ চৌধুরীর পরিবারবর্গ উৎসর্গ করেছিলেন। চৌধুরী সাহেব প্রথম জীবনে খুবই অসৎসঙ্গ প্রিয় ছিলেন। মা'র কীর্ত্তনাদিতে যোগ দিয়া তাহার স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। আমি যখন তাঁহাকে দেখিয়া ছিলাম তখন তিনি কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা বৈষ্ণব, সবাইকে প্রেম বিলাইতেন।

আশ্রমটিতে মাত্র দুইটি ঘর ও একটি বারান্দা। দূরে রান্না বাড়ী। সেখানে চৌধুরী মহাশয়ের ছোট স্ত্রী আমাদের জন্য অনেক রান্না করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাইবামাত্র ভুরি ভোজন হোল। তারপর গুরুপ্রিয়া দিদি ব্রহ্মচারিণী ও ভক্তদলকে নিকটবর্ত্তী ধর্মশালায় লইয়া গেলেন। আমরা তিনটি শরীর সেখানে রহিয়া গেলাম। মা, পরমানন্দ স্বামীজী ও আমি।

যেখানে বাঘের ভয় সেইখানে সন্ধ্যা হয়। ডুঙ্গার সেই সময় প্রতি রাত্রে বাঘ আসিত। গরু, বাছুর ও মানুষের বাচ্চা লইয়া যাইত। গরীব গ্রামবাসীরা কোনই প্রতিরোধ করিতে পারিত না। শুনিয়া আমার শরীর ভয়ে কণ্টকিত হইল। আশ্রমটি একান্তে অবস্থিত। পিছনে বিরাট চীড়গাছের জঙ্গল। আমার মনে হইল, বাঘ হয়ত ঐ জঙ্গল থেকে আসিয়া তার ক্ষুধা মিটাইবার অভিসন্ধি স্থির করিতেছে।

মা বল্লেন, "বাবা কোথায় শোবে? যে গরম। বাইরেই শুতে হয়।"

আমি বল্লাম, "মা রোজই রাতে এখানে বাঘ আসে।"

মা হাসিমুখে বল্লেন, "বাবা, তোমার ভয় করছে? তুমি আমার কাছে শোবে।"

কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু চীড় গাছের জঙ্গলের দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। মা বল্লেন, ঐদিক্ থেকে বাঘ আসবে, না? এ শরীরটা ঐ দিকে শোবে। তারপর তুমি শোবে।

আরও খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। কি আশ্চর্য্য! মাকে যদি বাঘে ধরে তার জন্য আমার কোনই চিন্তা হোল না। নিজের এই সামান্য জীবনের জন্য আমি তখন এতই কাতর! খুব খেয়েছিলাম। মার খুব কাছেই শুতে পেয়ে ভয় আর রইল না। চীড়গাছের হাওয়ায় নিদ্রা আসিয়া গেল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, জানি না। হঠাৎ দেখি, মা'র কাছে, এত কাছে, আমি শুয়ে আছি যে আমার লজ্জাবোধ হোল। ঘুমের ঘোরেও বোধ করি ভয় আমাকে ছাড়ে নাই। তাই এমনটা হোল।

মা কিন্তু কিছু বলেন নাই। লজ্জায় ধীরে ধীরে উঠে বসলাম।

দেখলাম, মা'র দেহখানি পড়ে রয়েছে ঘুমিয়ে আছেন, কি জেগে আছেন বুঝলাম না। তবে এক অপূর্ব্ব শান্তি তাঁর চোখে মুখে দেখে আমিও আত্মহারা হয়ে গেলাম। আর ঘুমাতে ইচ্ছা হোল না চীড় গাছের হাওয়ায় তখন প্রণবধ্বনি শোনা যাইতেছিল। আকাশে বোধ করি দশমীর চাঁদ হাসিতেছিল। চাকরাটা পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি রেখে আমি কেমন যেন মগ্ন হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, ওই পরমানন্দ স্বামীজী কতকটা দূরে শুলেন। সন্ন্যাসীকে ত আর বাঘেও ছোবে না!

পাহাড়ের উপরে, আকাশের গায়ে যেন মেঘের বদলে হরপার্ব্বতী বসে রয়েছেন ও আমার দিকে দেখিতেছেন। আমি চমকিত হইয়া বিভোর হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরেই পাখীরা কোলাহল করিল। ভোর হইয়া গেল।

আমি চক্ষু ফিরাইয়া দেখি, মা হাসিতেছেন। আমাকে বলিলেন, "বাবা, যায়গাটা কেমন লাগল?" আমি বল্লাম, "মা এখানে রাত্রে না শুলে এখানকার মহিমা বোঝা যেত না। মা বল্লেন, "বাবা তুমি আবার শুলে কখন? তুমি ত জেগে বসে রইলে?"

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। সে রাত্রে বাঘ আসিল না। শুনলাম, নীচের গ্রামেও আসে নাই।

(২)

যেবার বাঘ আসিল, সে কথা এবার বলি। আল-মোড়া হইতে শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গে আমরা মীরটোলা যাইলাম। সেখানে শ্রীশ্রীযশোদা মাঈ তাঁর নিজের আশ্রমে তাঁর সাহেব মেম শিষ্য ও শিষ্যাদের লইয়া থাকিতেন। সেখানকার কথা বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। আমরা দশবারো জন আনন্দময়ী মা'র সঙ্গে গিয়াছিলাম। যশোদা মাঈ সম্পর্কে আমার মাসিমা ছিলেন। আমি ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলাম। আমরা সন্ধ্যার সময় সেখানকার রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে আরতি দেখিয়া শ্রীমৎ কৃষ্ণ প্রেম (যিনি পূর্ব্বে prof Nixon ছিলেন) প্রভৃতির সঙ্গে সৎসঙ্গ করিয়া এবং তাঁহাদের বাঙলা কীর্ত্তন শুনিয়া খুশী হইয়া বিশ্রাম করিতে গেলাম। বলিতে ভুলিয়াছি আশ্রমের ভোজনালয়ে যাহারা ভোজন করিলেন আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। সেদিন একাদশী ছিল, তাই সে রাত্রি কেহ কেহ উপবাসব্রত যাপন করলেন। অতিথিশালা আমাদের জন্য খোলা হইল। মাত্র দুইটি ছোট ছোট ঘর। একটি ঘরে বড় বেশী ভিড়ের সম্ভাবনা দেখলাম—যেখানে মা শুইবেন। আমি ও মাত্র কয়েকজন পাশের ঘরে শুতে গেলাম। একটিমাত্র খাট। হরি-দ্বারের একজন তরুণ সন্ন্যাসীকে খাট দেওয়া হইল। আমরা কাঠের মেজেতে কম্বল বিছাইয়া শুইলাম। জানলাগুলি বেশ বড়, দরজার মতই। শিক প্রভৃতির কোনো বালাই নাই। চরিদিক্ ভীষণ ভাবে নীরব হয়ে গেল। আমার দৃষ্টি জানলার দিকে। যদি কেহ ঢুকে পড়ে। মাঝ রাত্রে বাঘের গর্জ্জন শোনা গেল। আমি যেখানেই যাই, সেখানেই কি বাঘ আসে? আমার দু'চোখ বেয়ে জল এল। দেখলাম, তরুণ সন্ন্যাসীর ভয় আরও বেশী। তিনি খাট ছাড়িয়ে খাটের তলায় ঢুকলেন। তাঁর এ জীবনে ভগবৎভক্তি বুঝিবা ব্যর্থ হইয়া যায়। আমি বল্লাম, জানলাগুলা বন্ধ করে দিই? আমার পাশে জীতেন-দা শুয়ে ছিলেন, তিনি বল্লেন, না, না, গরম হবে। পাহাড়ে আবার গরম কোথায়? যা হয় হউক্, দাদার কথা শুনতে হয়। কিন্তু মনটাকে কোন মতেই কেহ গরম করতে পারছে না। জানি না, কেহ ঘুমাতে পেরেছিলেন কি না। বাঘের গর্জ্জনের বিরাম নাই। থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন! যেন বাঘও কাহারও ভয়ে আর অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না! কি ব্যাপার বুঝিলাম না!

ভোর হইল। যশোদা মাঈ আমাদের দেখিতে আসিলেন। আমি বারান্দায় ছুটিয়া গিয়া বলিলাম "মাসিমা, রাত্রে বাঘ এসেছিল।" মাসিমা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বল্লেন, 'বাবা, বাঘ আসবে না? মা এসেছেন বাঘ কি দূরে থাকতে পারে?" আমি ভাবলাম, একি অনাসৃষ্টি কথা, আমরা তবে যাই কোথায়? সবাই গিয়া মা'র কাছে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রণাম জানাইলাম। আমার ভয় কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রহিল।

(৩)

সেবার ৺বিন্ধ্যাচল ধামের আশ্রমে মা'র উপস্থিতিতে ৺কালী পূজা হইবে। তরুকুটিরের ছোট ঘরে কমলাকান্ত স্বামীজী পূজা করিবেন। মা ও কয়েকজন মহিলাভক্ত মা'র কাছে বসলেন। বারান্দা পুরুষের ভিড়। আমার শরীর ভাল ছিল না। মা আমাকে ডাকিয়া লইয়া কাছে বসাইলেন। রামপ্রসাদের গান রেকর্ডে বাজছিল। আর তারই গানে তাল রেখে যেন আমাদের পূজা অনুষ্ঠান চলিতেছিল। আমরা সুখ, অসুখ সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পূজার শেষে আমি অনতিদূরে স্বর্গীয় মহেশ ভট্টাচার্য্যের আশ্রিত মা'র অতিথিশালায় ফিরিয়া যাইবার

জন্য উঠিলাম। মা বল্লেন, "বাবা, প্রসাদ নাও, তারপর তোমাদের সঙ্গে এ শরীরটাও যাবে, ওখানেই শোওয়া হবে।" ব্যাপার বুঝিলাম না। যেমন বল্লেন, তেমনই করা হইল।

অতিথিশালা প্রায় পাঁচ মিনিটের পথ। অমাবস্যার রাত্রি। পাহাড়ে পথ, ভীষণ হাওয়া দিচ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা। মার সামনে আগে আগে কে যাবে? মা টর্চ (torch) হাতে সব প্রথমে চল্লেন। তাঁর পিছনে আমি। আমার পিছনে আর সবাই। কিছুদূর গিয়েই দেখা গেল, এক প্রকাণ্ড পার্ব্বতীয় সাপ শুয়ে আছে, পথটি জুড়ে। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই আমার গায়ের রক্ত জল হইয়া গিয়াছে। মা মুখে কিছু বলিলেন না, ইসারায় চুপ থাকিতে বলিলেন। torch এর আলোয় বেশ ভাল করিয়া আমরা অনেকেই দেখিতে পাইতেছিলাম। সাপটিও মা'কে দেখিতে পাইল। ধীরে ধীরে নিজ শরীরকে গুটাইয়া লইয়া সর্প মহারাজ শ্রীশ্রীমার পায়ের কাছে আসিয়া নতি জানাইয়া, আবার ধীরে ধীরে পথ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি মায়ের দেহের পিছনে মরণের জন্য অপ্রস্তুত রহিয়া গেলাম।

(৪)

আর একটিবারের কথা বলিব। রায়বেরেলী লখ্নৌ এর কাছে একটি জেলা সহর। সেখানকার ধনী সওদাগর বাবু শীতল প্রসাদ (এক্ষণে তিনি মৌনী সাধু হইয়া ধর্মজীবন যাপন করিতেছেন) সেখানে মা'র উপস্থিতিতে ৺দুর্গা পূজার ব্যবস্থা করেন। লখনৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে বহুলোক সে উৎসবে যোগ দিবার জন্য গিয়াছিলেন। একটি উদ্যানে উৎসবের পূজা ও অতিথিদের তাঁবুতে থাকিবার স্থান স্থির হইয়াছিল। কিন্তু সে বাগানটি বিরাট ও উপযোগী স্থান হইলে কি হইবে, সেখানে বাঁদরের বড়ই উপদ্রব। কয়েক শত বাঁদর সেখানে সেই উদ্যানে, সদলবলে বাস করে। এ এক ভীষণ উৎপাত!

মা সেখানে গিয়েই বল্লেন, তোমাদের যতখানি যায়গা দরকার, তারপর চূণের একটা দাগ করে দাও, বাঁদররা অপর দিকে চলিয়া যাইবে ও ঐ দিকে থাকিবে। তাহাই হইল। বাঁদরগুলি নিঃশব্দে সীমানা পার হইয়া তাহাদের নিরূপিত এলাকায় চলিয়া গেল। আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! বাঁদররা আর আমাদের দিকে আসিল না।

চার দিনের উৎসব। ৺বিজয়া দশমীর সকালে দর্পণে বিসর্জ্জন হইবার পর সকলে মা'কে প্রণাম করতে গেল। মা বল্লেন, "তোমাদের উৎসব ত শেষ হোল। এইবার বাঁদরদের ভোজনের ব্যবস্থা কর।" তাহাই হইল। ব্রাহ্মণ ভোজনের যেমন ব্যবস্থা হয়, সারি সারি পাত পাতা হইল। মা'র আদেশ মত বাদরদের বসিবার জন্য আসনের মত একটি করে পাতা রাখা হইল। একটা টুলের উপর দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীমা হাততালি দিতে লাগিলেন। বাঁদরগুলি যে যেখানে ছিল, নামিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে পাতায় বসিল। পরিবেশন হইল। মা'র কি আনন্দ! আনন্দময়ী মা আনন্দে টুলের উপর দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছেন। আর আমি পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া মা'র মুখের দিকে দেখিতেছি। আমার মনে পড়িয়া গেল, হয়ত সেই প্রথম ৺বিজয়া দশমীর দিন কারামুক্তি হইলে পর, জানকী দেবীও এইপ্রকার আনন্দে শ্রীরামের বানর-সেনাকে ভোজ দিয়াছিলেন। ও তাহারা কত আনন্দ করিয়া খাইয়াছিল। সেদিনের সে ছবিটি আমার চোখে ভাসিতেছিল। মা আমার দিকে দেখে একটু হেসে বলে-ছিলেন "বাবা, তুমি কবি"। আমার আক্ষেপ হইয়াছিল আমি যদি কবি হইতাম, তাহা হইলে এ সব কথা পদ্য করে লিখে ফেলতাম, "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিত পান সুধা নিরবধি"। এখন সব সময়ে মনে হয়, আনন্দময়ী মা কি পশুদেরও মা?
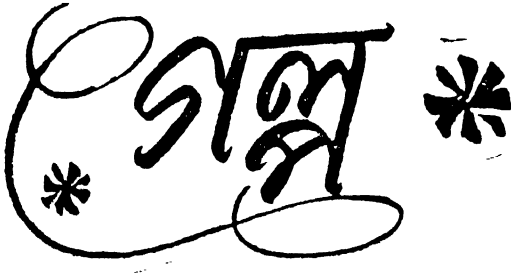
দোলের রাতে

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

শান্তগিরির আকাশে বাতাসে দোলা লাগছে। রঙ-বেরঙের গাছগাছালির ফলফুল-পাতায় দোলার কাঁপন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তন্ময় হ'য়ে দেখছে নৈসর্গিক দৃশ্য বনশ্রী।

বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে নামছে। পশ্চিম আকাশ আবীর-রঙা হ'য়ে উঠছে। সারা শরীরের রক্ত নেচে উঠছে বনশ্রীর। বাতাসে ভেসে আসছে সমবেত কণ্ঠের সংগীতের সুর। শুনছে বনশ্রী উৎকর্ণ হ'য়ে। মৃত বীর যোদ্ধাদের বীরগাথা গাইছে ঘরে ঘরে সকলে। মৃতদের আত্মাকে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। দোলের বীরউৎসব পালন করা হচ্ছে। আগুন ঘিরে, নাচগানের ভিতর দিয়ে শ্রদ্ধেয় আত্মাকে আহ্বান করছে ওরা। ওদের মধ্যে একজন অতিভাবুকের ওপর কোনো মৃতবীরের আত্মা ভর করবেন এখুনি হয়ত। অতিভাবুক লোকটির জীবন ধন্য হবে। মারাঠীদের বীর উৎসব অনুষ্ঠান সফল হ'বে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী বনশ্রী। বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে আত্মার আসা-যাওয়া মেনে নিতে পারে না তার মন। ভিতরে দ্বিধা-সংশয় উকিঝুঁকি মারতে থাকে। মৃত বীরদের কার্যকলাপ স্মরণে মনে প্রেরণাশক্তি জাগে। এ যুক্তিটা স্বচ্ছ কাঁচের মতো। কিন্তু আত্মা আসাটা? চিন্তার অকূলপাথারে পড়ে যায় বনশ্রী। কূলকিনারা খুঁজে পায় না কোনো। সহপাঠিনীদের মধ্যে আত্মা ফেরার আলোচনা শুনলেই, হেসে উঠেছে। বিদ্রূপ করে বলেছে, মরে যদি ফিরে আসি, মনে যদি রয়—তবে তো বলতে পারি, মরলে কি হয়!

এহেন আত্মা অবিশ্বাসী বনশ্রীকে আত্মাবিশ্বাসের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় নামতে হ'চ্ছে বাধ্য হয়ে। শ্বশুরের নির্দেশে। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়ে শ্বশুর অনেক কথাই শুনিয়েছেন তাকে আত্মা সম্বন্ধে। মরবার একদিন আগে, তার দু'হাত বুকে চেপে ধরে ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন শ্বশুর—বৌমা! কথা দাও বীরউৎসব পালন করবে দোলে!

একটু ইতস্তত করেছিল বনশ্রী। শ্বশুরের জল ভরা ঘোলাটে দু'চোখের দিকে তাকিয়ে তার ভিতরটাও ডুকরে কেঁদে উঠেছিল বুঝি। সেই দুর্বল মুহূর্তে কথা দিয়ে ফেলেছিল—পালন করবো। নিশ্চয় পালন করবো।

শ্বশুরের আজ্ঞাই প্রতিপালন করতে চলেছে বনশ্রী। ঘরে এলো পায়ে পায়ে। আল্পনাঢাকা মাটির বেদীর ওপর আগুন জ্বলছে। সামনের আসনে বসল বনশ্রী। ইশারায় বাইরে যেতে বলল দাসীকে। শ্বশুরের আদেশ—নিভৃতে একা বসে বীরউৎসব সম্পন্ন করতে হবে। জনপ্রাণী থাকতে পাবে না ঘরে।

এ বংশের উৎসবের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে একটি মাত্র মৃত নারীর আত্মাকেই আহ্বান করতে হবে মনেপ্রাণে। সে নারী আবার এ-বংশের অনাত্মীয়। পার্বতী মালিনী।

পার্বতী মালিনীকেই নিবিষ্টমনে চিন্তা করতে হ'বে বনশ্রীর। পার্বতী মালিনীর রূপ জানে না বনশ্রী। জানে তার কাহিনী। শ্বশুরের মুখে শোনা কাহিনীর একটার পর একটা মন্থন করছে তাই।

...পাঁচপুরুষ আগে।

শান্তাপুর অশান্ত হয়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে। একটি গাঁয়ে দু'টি প্রবল বিরোধীদল গড়ে উঠল। গ্রামের দু'জন প্রভাবশালী ব্যক্তি—অনন্তরাও আর মাধবরাও-এর পরিচালনায় দল দু'টি পুষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগল।

অনন্তরাও এর দল দেশের জন্যে দশের জন্যে—সকলের মংগলের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এরা ন্যায়ের পূজারী। কিন্তু মাধবরাও-এর দলের নীতি একেবারে উল্টো।

নিজেদের সুখসুবিধের জন্যে দেশকে অন্যের পায়ে বিকিয়ে দিতেও এরা প্রস্তুত। নির্দোষ নিরীহদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেও এরা ভয়ানক হিংস্র হয়ে ওঠে।

গ্রামের বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অসীমদাস ব'বাজী মধ্যস্থতা করেও দু'দলের ভিতর মিলনসেতু বাঁধতে পারেন নি। তবুও চেষ্টা ছাড়লেন না তিনি। আমরণ চেষ্টা করে যাবেন—সংকল্প গ্রহণ করলেন ইষ্টদেব বিনায়কের চরণ ছুঁয়ে।

অসীমদাসের কোনো হিত-উপদেশেই কর্ণপাত করল না মাধবরাও-এর দল। ফলে লাঠালাঠি-মারামারি খুনোখুনি বেড়েই চলল দু'দলের মধ্যে। এই অনিশ্চিত রক্তক্ষয়ী কলহের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে উত্তর-দক্ষিণ—দুটি অংশে গাঁওকে বিভক্ত করতে পরামর্শ দিলেন দুটি দলের প্রধানকে অসীমদাস। তিনি উপস্থিত থেকেই সীমানা নির্ধারণ করে দিলেন। দক্ষিণ দিকটা অনন্তরাওদের। উত্তরদিকটা মাধবরাওদের। দু'টি গাঁও-এর সীমারেখার সাক্ষী মাঝখানের বিনায়ক মন্দির। গাঁও দুটির নামকরণও করে দিলেন শুভক্ষণ দেখে অসীমদাস। দক্ষিণ গাঁও বীরগড়। উত্তরগাঁও আমীরনগর।

এই আমীর নগরেরই অধিবাসিনী পার্বতীমালিনী।

গাঁও বিভাগ হ'য়েছে কিন্তু পার্বতী মালিনীর মন বিভাগ হয়নি। দু'টি গ্রামের সংগে সংযোগ সাধন করে রেখেছে মালিনী তার ফুলবেচার বেসাতি দিয়ে।

স্নান সেরে, শুচিশুভ্র রেশমের শাড়ী পরে মালিনী। রক্তকরবী ফুল গুঁজে দেয় দু'তিনটে এলো খোঁপায়। ফুলের সাজি দুটো দু'হাতে ঝুলিয়ে নেয়। ধীর পায়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখো এগুতে থাকে তারপর। বিনায়কের মন্দিরে এসে অর্ঘ্যপাত্রে পুজোর ফুল রাখে কিছু। চতুর্ভুজ গণপতির মূর্তিকে প্রণতি জানায়। অসীমদাসের পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে কপালে ঠেকায় তিনবার।

হাসেন অসীমদাস। মাথায় হাত রেখে বলেন, বেটি! আত্মবিশ্বাস রাখিস! তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবেই হবে।

অসীমদাসের স্নেহঝরা কথায় মালিনীর হৃদয়ের গভীর ক্ষতে সহানুভূতির ছোঁয়া লাগে বুঝি। দু চোখ উপচে জল ঝরে। শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে মালিনী। সীমানার ওপারে পা বাড়ায়। বীরগড়ের অনন্তরাও-এর স্ত্রী যশোমতীবাঈ-এর কাছে যাবে। ফুলের মালা, ফুলের স্তবক দিয়ে আসবে। যশোমতী গরীবের মা-বাপ। তিনি দেশের মা। তিনি দেবী।

প্রতিদিনই একই কর্মপদ্ধতি মালিনীর। বিনায়কের মন্দিরে আগমন। অসীমদাসের আশীর্বাদবর্ষণের পর অশ্রুবর্ষণ। পরে বীরগড়ে গমন।

মালিনীর বীরগড়ে যাওয়া আসাটা কিন্তু মাধবরাও-এর লোকেদের অনেকেই সিধে চোখে দেখেনি। সন্দেহের কুটিল আবর্তে ফেলে মালিনীর যাতায়াতের বিচারবিশ্লেষণ চলল ঘন ঘন। মালিনী ফুল বেচার ছুতো ক'রে হয়ত গুপ্তচরবৃত্তি করছে। অনন্তরাও-এর সংগে যোগসাজশে দেশের বিপর্যয় ডেকেও আনতে পারে! মাধবরাওকে ফতোয়া জারী করতে বলা হ'ল মালিনীর বিরুদ্ধে। ও গাঁয়ের ত্রিসীমানায় যেতে পারবে না মালিনী। গেলে, উচিত দণ্ড পেতে হবে। চিরদিনের জন্যে দেশত্যাগী হ'তে হ'বে।

ডাক পড়ল মালিনীর।

মাধবরাও-এর মধ্যাহ্ন ভোজনের পর, নির্জন কক্ষে এসে হাজির হ'ল মালিনী। নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে রাখছে। নির্মম আদেশ শুনতে হ'বে হয়ত এখুনি মাধবরাও-এর মুখ থেকে। কিন্তু আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছে মালিনী। মাধবরাও শান্ত-সংযত। আস্তে আস্তে বলছে, তোমাকে আমার একটা কাজ ক'রে দিতে হবে। তুমিই সে কাজ পারবে।

ভয় ভাঙল মালিনীর। মুখ তুলে তাকাল। মানুষটা কি ধাতুতে গড়া বুঝতে চেষ্টা করছে। দুর্ধর্ষ-উচ্ছৃংখলের চিহ্নমাত্র নেই মুখেচোখে। কত অমায়িক মানুষ যেন।

মাধবরাও-এর চোখ দুটো হাসছে। সাপের হাচি বেদেয় চেনে। এ-হাসির সংগে পরিচয় আছে মালিনীর। এটা উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবার জন্যে অনুরোধের হাসি। কি অনুরোধে ভরা ও হাসি—একটুও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না মালিনীর। মনের কথা মুখ খুলে না বললেও চলে এখন মাধব রাও-এর। বেসাতির যে ফাঁদ পেতেছে মালিনী—এ-ফাঁদে পা একদিন দিতেই হবে—এটা জানত

মালিনী। তবু ভয় ধরেছিল ঘরে ঢুকে—ফাঁদ কেটে শিকার না বেরিয়ে পালায় শেষে। যে ধূর্ত লোকটা!

মালিনীর মনের ভয়ই বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল তাকে কয়েক মুহূর্ত। মাধবরাও-এর মুখ থেকে, বিশেষ করে শোনবার কথাটাই শুনে আশ্চর্য হয়ে গেছল।

মালিনীর কাছে এলো মাধবরাও। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল একবার। ধারে কাছে কেউ আছে কিনা। কেউ নেই। তবুও সাবধানের বিনাশ নেই। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে মনের কথা বলল মাধব রাও।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল মালিনী। মাধবরাও-এর আদেশ শিরোধার্য। ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরুতে পারলে বাঁচে মালিনী। বেশীক্ষণ হাসি চেপে থাকতে পারবে না আর। বেরিয়ে এলো।

বাইরের সকলের দৃষ্টি আটকে পড়েছে মালিনীর হাসি-হাসি মুখের ওপর। অন্যের চোখে চোখ পড়লে হাসির উজান বইতে সুরু করে দেয় আরো মালিনীর দু চোখ ভরে। হেলে দুলে চলেছে মালিনী নয়ন বাণ হানতে হানতে। দর্শকরা কানাঘুষা করে - মেয়েটার চোখ দুটো ভাসা ভাসা—ভারী সুন্দর। ও চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে আর আদেশ করতে হবে না মাধবরাওকে। আদেশপালন করতে হবে বরং। তাদের আরজিটাই নাকচ হয়ে গেল বুঝি।

বীরগড়ে যাওয়া বন্ধ হয় নি মালিনীর। মাধবরাও বন্ধ করে নি হুকুম জারী করে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়েই বীরগড়ে যাবার আগে ডেকে পাঠায় মালিনীকে মাধবরাও। পরামর্শ করে কিছুক্ষণ। তারপর যেতে আদেশ করে। অভয় দেয়। বলে, শুভেচ্ছা রইল আমার। নির্ভয়ে যাও। ফিরে এসে দেখা করতে ভুলো না!

ফিরে এসে দেখা করতে ভোলে না মালিনী। মাধব-রাও-এর সংগে শলাপরামর্শ চলে আবার। খুশী হয় মাধবরাও। মালিনীও আগামীকাল আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে খুশীমনে ফেরে ঘরে।

দিন যায়, মাস যায়। বছর ঘুরে এলো। রোজের মতো সেদিন সকালেও মালিনী ফুলের মালা হাতে তুলে দিল যশোমতীর। যশোমতী দেখছেন। মুগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে আংটিখুলে মালিনীর আঙুলে পরিয়ে দেন। হঠাৎ মুখখানা রক্তবর্ণ হয়ে উঠল যশোমতীর। চোখমুখ দিয়ে লাল আগুন ঝরছে যেন। কপাল কোঁচকালেন তিনি। ত্রিশূল রেখাটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল জোড়া ভুরুর জোড়ের মাঝে। মালার লাল-সাদা গোলাপের জড়াজড়ির মধ্যে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন তিনি! দেখতে পাচ্ছেন।

যশোমতীর কথায় আগুন ছুটল।—কোন্ সাহসে এই মালা এনেছিস আমার কাছে?

মালিনীর মুখে চোখে বিস্ময়। নতজানু হয়ে, জোর হাত করে বলল, দেবী। রোজই তো এই মালা নিয়ে আসি। আপনারই তো পছন্দ।

রোজের মালা এ-মালা নয়। গোলাপে-গোলাপে মাধবরাও এর নাম গেঁথে এনেছিস।

ক্ষমা করুন দেবী। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। মাধব-রাও জমিদার। তাঁর আদেশ অমান্য করতে অক্ষম। তিনি পাতার কাঠামো করে দিয়েছিলেন। ফুল সাজিয়ে বেচলে বিক্রি হবে খুব। সকলে পছন্দ করবে। তাই—

বুঝেছি।

বুঝেছে মালিনীও। তবু যশোমতীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অপলকচোখে। আদেশের প্রতীক্ষা করছে আর ভাবছে মালিনী।

একথা সর্বজন বিদিত। যশোমতীকে বিয়ে করবার জন্যে একসময় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল একেবারে মাধবরাও। বিয়ে নিশ্চিত করবার জন্যে, পাকা করে রাখবার জন্যে নিজের প্রতিনিধির চিহ্নস্বরূপ তলোয়ার পাঠিয়েছিল যশো-মতীর কাছে। সদর্পে সে তলোয়ার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যশোমতী। মাধবরাও-এর বিবাহ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন নিমেষে। তীব্রতীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছিলেন তলোয়ার-বাহককে।—নৈতিক চরিত্রের কোনো মর্যাদা দেয়নি জীবনে যে কখনো—তার এসাধ বাতুলতা।

ফিরে এসেছিল তলোয়ার বাহক। শুনিয়েছিল যশোমতীর দুঃসাহসের কথা। রাগে সমস্ত দেহের রক্ত মাথায় উঠেছিল মাধবরাও-এর। তলোয়ার ছুঁয়েই শপথ ক'রে-ছিল, তলোয়ার একদিন নিয়ে আসবে ওকে আমার

ঘরে। ওকে আমি ওর বাপের বুক থেকে ছিনিয়ে আনবোই।

ছিনিয়ে আনতে পারেনি মাধবরাও। বরং হারিয়েই ফেলেছিল যশোমতীকে। গাঁও বিভাগের পরই যশোমতীর বিয়ে হ'য়ে গেছল ঘটাকরে অনন্তরাও-এর সংগে। তার চির-প্রতিদ্বন্দ্বীর সংগে।

এখনো মাধবরাও-এর আকর্ষণ যশোমতীর ওপর। মালিনীকে আসতে দেয় যশোমতীর কাছে সেই কারণেই জানে মালিনী।

মালিনী! রোষ ফেটে পড়ছে যশোমতীর কণ্ঠে।

মালিনীর ডান হাতখানা সজোরে চেপে ধরলেন যশোমতী। টানতে টানতে নিয়ে চললেন তিনি তিন মহলের দিকে। তিন মহলের আঙিনায় এসে, ভবানী মন্দিরের সামনে থামলেন। মালিনীকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে, মন্দিরে প্রবেশ করলেন। দেবীভবানীর তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে এলেন মুহূর্তে। মালিনীর হাতে তুলে দিয়ে প্রতিশ্রুতি করিয়া নিলেন। আসছে মাসের দোলের রাতে মাধবরাওকে আনতে হবে তার কাছে। গোপন কথা গোপনে রাখতে হবে। কেউ জানবে না। কেউ শুনবে না। যশোমতী দেখা করবেন মাধবরাও-এর সংগে—নিভৃতের অবসরে জানাতে হবে মাধবরাওকে।

প্রতিশ্রুতির সময়, দেবীর তলোয়ারের ধারালো মুখে নিজের কড়ে আঙুল ঠেকিয়ে রক্ত বার করেছিল মালিনী। সেই রক্ত মাখিয়ে ছিল তলোয়ারে। মনে মনে প্রার্থনা জানিয়েছিল, অসীমদাস বাবাজীর আশীর্বাদ সফল করো দেবী!

অসীমদাসের আশীর্বাদ বুঝি সফল হতে চলেছে। আনন্দ আর ধরছে না মালিনীর। একমাস ধরে বিনিদ্র-রজনী কাটিয়েছে যার জন্যে—সে এসেছে—এসেছে আকাংক্ষিত দোলের রাত্রি।

......গাছের আড়ালে আড়ালে অনুসরণ করে চলেছে মাধবরাও মালিনীকে।

......যশোমতীর মহলের পিছনের দরজায় এসে, ঠোঁটে আঙুল চেপে, ইশারায় জানিয়ে দিল মালিনী—সাড়াশব্দ একটুও যেন না হয়। মাধবরাওকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ওপরে এলো দু'জনে যশোমতীর নির্জন কক্ষে এনে সযত্নে পালঙ্কের ওপর বসাল মাধবরাওকে মালিনী। মালিনীর ওপর এই রকমই নির্দেশ দেওয়াছিল যশোমতীর। মাধবরাওকে দেখছে আর মিটি মিটি হাসছে মালিনী। হঠাৎ চনমনে হয়ে উঠল। কি যেন মনে পড়ে গেল। আর একটু দেরী হয়ে গেলে, হয়ত তার সংকল্প-সিদ্ধিতে বাধা পড়বে।

উঠে দাঁড়াল মালিনী। চুপিচুপি বলল, যশোমতীবাঈকে নিয়ে আসছি সংগে করে। তড়িৎগতিতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মালিনী জানে যশোমতী কোথায়। ভবানীমন্দিরে।

এলো ভবানীমন্দিরে মালিনী।

দেবীর তলোয়ার নিয়ে বেরুতে যাচ্ছেন যশোমতী, থমকালেন। নতজানু হয়ে অনুনয় করল মালিনী। দেবীর বলির কাজ তাকে সমাধা করতে ছেড়ে দিক যশোমতী। মালিনী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অসীমদাসের কাছে। মালীকে হত্যা করে তার বুকের রত্ন মালিনীকে ছিনিয়ে নিয়েছিল একদিন মাধবরাও। মালীকে হত্যা করার খবর জানে না কেউ। রাতারাতি লাশ সরিয়ে ফেলেছিল কোথায় কে জানে। লোকে জানে মালী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে হঠাৎ। এটা রটিয়ে ছিল মাধবরাওই। তাকে হত্যার ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখতে চেয়েছিল। দিনকতক পর ছিন্নকুসুমের মতো মালিনীকে পরিত্যাগ করেছিল মাধবরাও।

শরণাপন্ন হয়েছিল অসীমদাসের মালিনী। আত্মঘাতী হতে বারণ করেছিলেন অসীমদাস। বলেছিলেন, তুমি একা নারী নও—বহুনারীরই মর্যাদা হানি করছে এইভাবে মাধবরাও। ও-র জন্যেই দেশবিভাগ। দেশের জন্যে যদি একটু মমতা থাকে—নারীত্বের মর্যাদাজ্ঞান যদি একটু থাকে—তাহলে যশোমতীবাঈ-এর ভবানী দেবীর উদ্দেশ্যে ওকে বলি দিতে হ'বে তোমায় নিজ হাতে। তবেই তোমার মুক্তি। দেশের মুক্তি। নারীদের মাধবরাও ভীতি থেকে মুক্তি।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথাগুলো শুনলেন যশোমতী। অগো-চরেই ভবানীর হাতের, পূজোকরা তলোয়ার তুলে দিলেন মালিনীর হাতে। মালিনী দৌড়চ্ছে তলোয়ার হাতে। যশোমতী দেখছেন সাক্ষাৎ ভবানী দেবী দৌড়চ্ছেন। মাধবরাও-অসুরকে নিজে হাতে বধ করতে যাচ্ছেন তিনি।

……অতর্কিতে আক্রমণ করল মালিনী মাধবরাওকে। দেবীতলোয়ারের তীক্ষ্ণধারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মাধবরাও-এর হৃৎপিণ্ড। হাসছে মালিনী। যশোমতীকে পাবার জন্যে কত না শলাপরামর্শ করত লোকটা তার সঙ্গে। মালিনী সায় দিয়ে, কোন্ দিকে টানত তাকে বুঝতে পারে নি একবারও। নিজের শৌর্য-সৌন্দর্যের দম্ভে অন্ধ ছিল। ওর সংস্পর্শে বাঘিনী মেয়ে এলেও নাকি নিরীহ হরিণী হ'য়ে যেত। সে-সব মেয়েদের কোনো অনিষ্ট করা নাকি সম্ভব ছিল না। ওর কোনো আদেশ পালন করতে পারলে কৃতার্থ বোধ করত নাকি মেয়েরা!

রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। দেখছে মালিনী। দেখল খানিক একদৃষ্টে মাধবরাও এর নিষ্প্রাণ দেহটাকে। একটু আগে ওই মুখ দিয়েই বেরিয়েছিল একটি মাত্র কথাই কেবল—শয়তানি—। দেবীর অপার করুণা। দেবীঅস্ত্র স্পর্শেই মুক্তি হ'ল ওর।

রক্তমাখা তলোয়ারটা উঠিয়ে নিল মালিনী। মন্দিরের দিকে এগুচ্ছে ধীরে ধীরে। দু'দিকে সশস্ত্রপ্রহরী দাঁড়িয়ে। অনন্তরাও-যশোমতীর নির্দেশ পালন করছে ওরা। মাধবরাওকে বন্দী করবার আদেশ ছিল ওদের ওপর। মাধবরাও আসবার খবর আগে থেকেই শুনিয়ে রেখেছিলেন যশোমতী অনন্তরাওকে। আগে থেকেই ব্যবস্থা করিয়ে রেখেছিলেন শিকার ধরবার। কিন্তু কাউকে কিছু করতে হয়নি। নির্বিঘ্নে সব সমাধান করে দিয়েছে একা মালিনীই।

……মন্দিরে এলো মালিনী। দেবীর চরণে ছোঁয়াল মাধবরাও-এর রক্তে মাখা তলোয়ার। তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। মুখে হাসি ফুটে উঠছে মালিনীর। দেবীর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিক। ভবানীর চোখের ডাক হয়ত হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করেছিল মালিনী। দেবীর অস্ত্রেই আত্মাহুতি দিল দেবীর চরণে।

যশোমতীবাঈ তাঁর বংশে এই বীরাংগণা পার্বতী মালিনীকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন অমর ক'রে—বীর-উৎসবে তার আত্মাকে আহ্বান করে, শ্রদ্ধা জানিয়ে। সেই থেকে আজ পাঁচ পুরুষ অবধি এ-বংশে চলে আসছে এ ধারা। এই সংস্কার।

একটু থেমে, শ্বশুর বলেছিলেন বনশ্রীকে আবার। বৌমা! এই শান্তগিরি পুরনো নামে ফিরে এসেছিল আবার। আমীর নগর আর বীরগড় নাম উঠে গেছল। উত্তর-দক্ষিণের সীমারেখা মুছে গেছল বরাবরের জন্যে। অসীমদাসের চেষ্টায় দু'দেশের লোকই অনন্তরাওকে প্রধান করেছিল আবার। এ-সবের মূলে পার্বতী মালিনী। পার্বতী মালিনীর আত্মত্যাগ।

বনশ্রীর চমক ভাঙল। দূর থেকে ভেসে আসছে সমবেত কণ্ঠের বীরগীতি। বীরউৎসবের গানের সুর। এতক্ষণের জন্যে যেন কোনো এক রাজ্যে চলে গেছল বনশ্রী। বাইরের কোনো আওয়াজই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এক অদ্ভুত আনন্দ-অনুভূতি পাচ্ছিল। এসেছিল বোধ হয় পার্বতী মালিনীর আত্মা। ভর করেছিল বোধ হয় তার ওপর! নিজেই যেন পার্বতী মালিনী হয়ে গেছল কিছু সময়ের জন্যে সে।

ভাবছে বনশ্রী। এত শীগগির এ ভাবটা গেল কেন? আর একবার কি আসবে না? আর একবারের জন্যে আসুক না! আসুক না পার্বতীমালিনী তার মধ্যে……

হা

অশোক পালিত

বিভিন্ন আত্মাকে দেখো আরোহী নৌকার
নাবিক সেথায় গেছে যেথা নাবিকানী
পরিত্যক্ত সারাদিন খেয়া-ঘাট খালি
ঝড়ে জলে সমদর্শী প্রাজ্ঞ নির্বিকার।
নামিবার সিঁড়িগুলি নগ্ন নারী দেহ
পড়ে আছে পরস্পর সংলগ্ন বেহুঁশ
মৃতের মুখের মত হিম নিরঙ্কুশ
নদীজল, ঘুচে গেছে সকল সন্দেহ।
আরোহী আত্মার দল মস্তিষ্ক রহিত
পানোন্মত্ত, মাঝে মাঝে গর্জায় করুণ
আসন্ন প্রলয় তবু দৃকপাতহীন
উঠে বসে নৌকাপরে, পূর্ণিমা লোহিত
কালবেলা দেখা দিলে মৃত্যু নিদারুণ
নৌকা আর ফিরিবে না হইবে বিলীন।
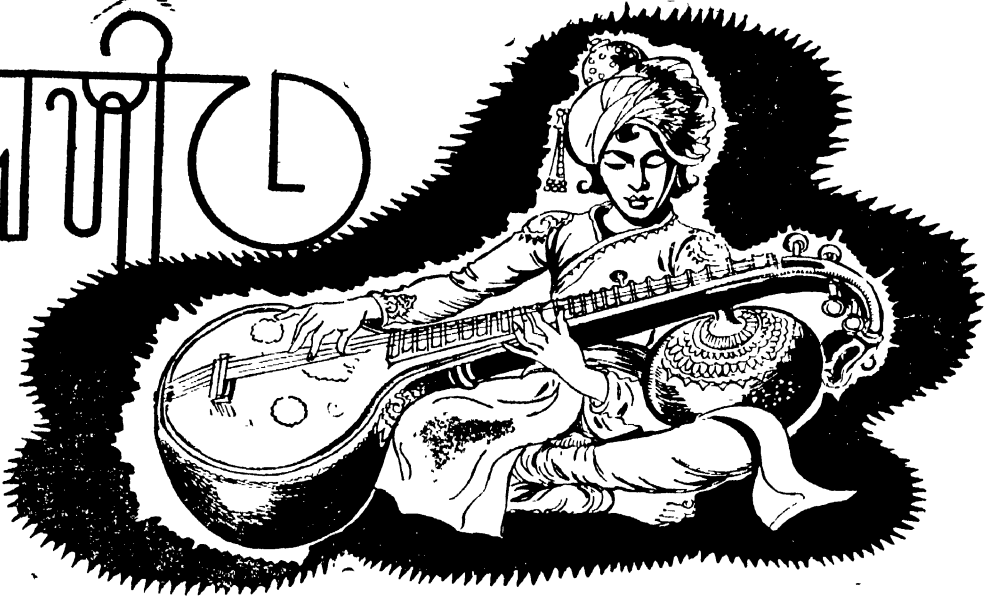
প্রণাম ভগিনী নিবেদিতা

শত বরষে জাতির প্রণাম
লহগো ভগিনী নিবেদিতা,
স্বদেশ মন্ত্রে জাতিরে জাগালে,
তাই তুমি চির বন্দিতা ॥
বিবেকানন্দ মানস-কন্যা,
তোমারে লভিয়া এদেশ ধন্যা,
তুমি যে সাগর-পারের-কমল
পুণ্য ভারতে বিকশিতা ॥

দীপ-শিখা-সম আপনারে জ্বালি
ভারতী চরণে নিবেদিলে ডালি,
নাশিলে আঁধার সেবার আলোকে
সেবাপ্রেমে তুমি রঞ্জিতা ॥
উড়িছে আজিকে তব জয় ধ্বজা,
মহাতপা তুমি ! তুমি মহাতেজা !
তব আদর্শে, বিবেক মন্ত্রে
জাগুক ভারতে জাতীয়তা ॥

(ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৩১শে আগষ্ট নিবেদিতা শতবার্ষিকীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মহাজাতি সদনে সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক গীত)

কথা ও সুর : : গীতিচারণ শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, গীতিরত্ন

স্বরলিপি : শ্রীনন্দলাল অধিকারী, সঙ্গীতপ্রভাকর, (বি. মিউজ)

সা রে সা | ম — | ম ম | ম গম প | প — | প প
শ ত ব র s যে s জা তি র প্র s ণা ম
ম ধ ধ | ধ — | ধ ম | ম ধ ম | ধর্সা — | — —
ল হ গো ভ s গি নী নি বে দি তা s s s
র্সা র্রে র্রে | নি — | নি ধ | ধ নি ধ | প — | প প
স্ব দে শ ম s ন্ত্রে s জা তি রে জা s গা লে

প ধ ধ | ম গা | গপ পম | গ — সা | সা — | — —
তা ই তু মি ऽ চি র ব ऽ ন্দি তা ऽ ऽ ऽ
ধ ধ মধ | র্সা — | র্সা — | র্সা র্সা র্সা | র্সা — | র্সা —
বি বে কা ন ऽ ন্দ ऽ মা ন স ক ऽ ন্যা ऽ
র্সা র্রে র্রে | নি — | নি ধ | ধ ম ধ | র্সা — | র্সা —
তো মা রে ল ऽ ভি য়া এ দে শ ধ ऽ ন্যা ऽ
র্সা র্রে র্রে | নি — | নি ধ | ধ নি ধ | প — | প প
তু মি যে সা ऽ গ র পা রে র ক ऽ ম ল

প ধ ধম | ম — | ম ম | গ গম ম | গ সা | — —
পু ऽ ণ্য ভা ऽ র তে বি ক শি তা ऽ ऽ ऽ
সা রে সা | ম — | ম ম | ম পমগম প | প — | প প
দী প শি খা ऽ স ম আ প না রে ऽ জ্বা লি
প ধ নি | ধ — | ধ ম | ম ধ ম | ধর্সা — | র্সা র্সা
ভা র তী চ ऽ র ণে নি বে দি লে ऽ ডা লি
র্সা র্রে র্রে | নি — | নি নি | প ধ ধ | প — | প প
না শি লে আ ऽ ধা র সে বা র আ ऽ লো কে

প ধ ধ | ম — | গ পম | গ সা সা | সা — | — —
সে বা প্রে মে ऽ তু মি র ऽ ঙ্গি তা ऽ ऽ ऽ
ধ ধ মধ | র্সা — | র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা — | র্সা র্সা
উ ড়ি ছে আ ऽ জি কে ত ব জ য় ऽ ধ্ব জা
র্সা র্রে র্রে | নি — | নি ধ | ধ নি নি | নি — | নি নি
ম হা ত পা ऽ তু মি তু মি হা ऽ তে জা

সা গা গা | গা গা | গা গা | গ ম গা | গা সা | সা —
ত ব আ দ র শে ऽ বি বে কা ন — ন্দে —
র্সা র্রে নি | ধ — | ধ ম | গ ম গা | সা — | সা —
জা গু ক ভা ऽ র তে জা তী য় তা ऽ ऽ ऽ

বৈদিক যুগে ঋষি ও সাধারণ মানুষের পরমায়ু

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী, এম-এ

কমই হউক, আর বেশীই হউক, পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই অতীত সম্পর্কে একটা রঙ্গিন ধারণা থাকে, দেখা যায়। যে সকল জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, তাদেরত কথাই নাই, এমন কি, যাহাদের প্রাচীন ঐতিহ্য বলিয়া গৌরব করিবার মত বিশেষ কিছুই হয়ত নাই, তাহারাও অতীত কাল সম্পর্কে কিছু বলিতে গিয়া ভাবাবেগে আপ্লুত হইয়া পড়েন, ইহা প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। জাতি হিসাবে বিচার না করিয়া, সাধারণ মানুষকে লইয়া বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে, প্রায় প্রতিটি মানুষই তাহার পূর্ব্বপুরুষ সম্পর্কে স্পর্শকাতর ও শ্রদ্ধাশীল। ঠিক এই ভাবেই দেখা যাইবে যে, প্রতিটি বয়স্ক মানুষই তাহার অতীত জীবন, অর্থাৎ বাল্য, কৈশোর ও যৌবনকাল, সম্পর্কে চিন্তা বা আলোচনা করিতে গিয়া একটা রঙ্গিন চিত্রের কবলে পড়িয়া থাকেন, তা সেই অতীত যত দুঃখকষ্টেই কাটিয়া থাকুক না কেন। অতীত সম্পর্কিত এই রঙ্গিন ধারণাটি যে পুরাপুরি বাস্তবতা-বর্জ্জিত, এমন কথা হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই বলা যায় না। অতীত কালের মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরমায়ু সম্পর্কে এদেশে বর্ত্তমানে যে ধারণা সচরাচর দেখা যায়, তাহার কতকটা সত্য হইলেও, সবটাই সত্য নয় বলিয়া মনে হয়। বৈদেশিক গ্রন্থাদিতে মানুষের সাধারণ আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে অতিশয়োক্তির কোন অবকাশ হয়ত দেখা যাইবে না। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে প্রাচীন যুগের মুনি-ঋষি ও বড় বড় কয়েকজন রাজ রাজড়ার জীবনকাল সম্পর্কে যে সব অতিশয়োক্তি লক্ষ্য করা যায়, তাহা বাস্তবতা-বর্জ্জিত ও তুলনাহীন বলিয়া মনে হয়। যে ভ্রান্ত ধারণার ফলে এ জাতীয় অতিশয়োক্তি বা অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার সম্ভাব্য কয়েকটি কারণ সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

বাংলাদেশে খনার বচন বা ডাকের কথা নামে, বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, যে সব প্রবাদ-বাক্য বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে একটি হইল :—

> নরা গজা বিশে শয়।
> তার অর্দ্ধ বাঁচে হয়।
> বাইশ বলদা তের ছাগলা।
> তার অর্দ্ধ বরা পাগলা॥

অর্থাৎ মানুষ ও হাতীর পরমায়ু ২০+১০০=১২০ বৎসর ঘোড়ার পরমায়ু ৬০ বৎসর, বলদের ২২ বৎসর, ছাগলের ১৩ বৎসর এবং শূকরের পরমায়ু ৬॥ বৎসর মাত্র। পরমায়ুর এই হিসাবটি মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়া ধরা হইয়া থাকে, যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার যথেষ্ট ব্যতিক্রম প্রায়শঃ দেখা যায়। এখানে পূর্ণ পরমায়ুর কথাই বলা হইয়াছে, গড়পড়তা পরমায়ুর কথা নয়; কারণ পৃথিবীর কোন দেশেই সম্ভবতঃ বিগত ২০০০ বৎসরের মধ্যেও মানুষ অথবা হাতী-ঘোড়া ও গরু-ছাগল প্রভৃতির এত অধিক গড়পড়তা পরমায়ু লক্ষ্য করা যায় নাই। মানুষের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই শত বৎসর বা ১২০ বৎসর কেবল যে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষিত ছিল, তাহা নয়, বরং বৈদিক ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও বেদাচার্য্যগণের কাম্য পরমায়ুও শত বৎসরকালই ছিল. মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে কথিত বহু মুনি-ঋষির শত-শত বৎসর বা সহস্র-সহস্র বৎসর পরমায়ু লাভ বাস্তবতা-বর্জ্জিত অতিশয়োক্তি মাত্র। অবশ্য অতীত দিনের মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্য বর্ত্তমান কালাপেক্ষা অনেক ভাল ছিল, একথা অস্বীকার করা যায়না, এবং তাহারা যে সুস্থ-সবল দেহ লইয়া অধিক বয়সেও স্বচ্ছন্দে চলাফেরা ও দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম করিতেন, তাহারও ভূরি ভূরি নজীব সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায়।

ঋগ্বেদের কয়েকটি প্রসিদ্ধ বাক্য

প্রথমেই আমরা আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে কয়েকটি অতি-প্রসিদ্ধ মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব

যে ঋষিগণ এসকল মন্ত্রে দেবতাদের নিকট শত বৎসর পরমায়ুই প্রার্থনা করিয়াছেন :—

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্॥ ৭।৬৬।১৬

এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা জনৈক বসিষ্ঠ ঋষি সূর্য্য-দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতি নিবেদন করিয়া বলিতেছেন :—সেই চক্ষুস্বরূপ, দেবগণের হিতকারী নির্ম্মল সূর্য্যদেব উদিত হইতেছেন; আমরা যেন (তাঁহার কৃপায়) শত শরৎ দেখিতে পাই ও শত শরৎ বাঁচিয়া থাকি। এই মন্ত্রটি বিবাহকালে কুশণ্ডিকার পর, প্রত্যূষে প্রথম সূর্য্য-দর্শন কালে, নববিবাহিত বরকে এখনও পাঠ করান হইয়া থাকে। অপর একটি মন্ত্রে জনৈকা ঋষিকা বলিতেছেন :—

দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতম্॥ ১০।৮৫।৩৯

এই আত্ম-দৈবত মন্ত্রে ঋষিকা সূর্য্য-কন্যা সাবিত্রী এই আশা প্রকাশ করিতেছেন যে তাঁহার স্বামী দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া শত শরৎ বা ১০০ বৎসরকাল জীবিত থাকুন। এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে দেবী-ঋষিকা সাবিত্রীর ন্যায় তাঁহার স্বামীও দেবতাই ছিলেন। প্রাচীন বেদাচার্য্যগণের মতে তাঁহার স্বামী ছিলেন চন্দ্র দেবতা, মতান্তরে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়। উক্ত মন্ত্রে একবচনের প্রয়োগ দেখিয়া কিন্তু মনে হয় যে ঋষিকা সাবিত্রীর স্বামিযুগল দেবতা ছিলেন না।

তমা হরামি নির্ঋতেরুপস্থাদস্পার্ষমেনং শতশারদায়॥ ২
সহস্রাক্ষেণ শতশারদেন শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্।
শতং যথেমং শরদো নয়াতীন্দ্রো বিশ্বস্য দুরিতস্য পারম্॥ ৩
শতং জীব শরদো বর্ধমানঃ শতং হেমন্তাঞ্ছতমু বসন্তান্।
শতমিন্দ্রাগ্নী সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা
হবিষেমং পুনর্দুঃ॥ ৪ ১০।১৬১।২-৪

উদ্ধৃত মন্ত্রত্রয়ে ঋষি বলিতেছেন :—(যক্ষ্মারোগাক্রান্ত মরণাপন্ন) এই রোগীকে আমি মৃত্যুদেবতা দেবী নির্ঋতির কবল হইতে ফিরাইয়া আনিতেছি। আমি ইহাকে এরূপভাবে স্পর্শ করিয়াছি যে, এব্যক্তি একশত বৎসরকাল জীবিত থাকিবে। আমি এই যে আহুতি দিলাম, ইহার একশত চক্ষু একশত বৎসর পরমায়ু দান করে। ইন্দ্রদেব যেন তাহার সকল পাপ বিদূরিত করিয়া তাহাকে শত বৎসরকাল জীবিত রাখেন। হে রোগী, তুমি শত শরৎকাল জীবিত থাক, এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে একশত হেমন্ত ও একশত বসন্ত পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইতে থাক। ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা ও বৃহস্পতি হব্যদ্বারা তৃপ্ত হইয়া ইহাকে শতবৎসর পরমায়ু প্রদান করুন।

অন্যান্য কয়েকটি বৈদিক গ্রন্থের উক্তি

অথর্ববেদের কয়েকটি সূক্তেই শতায়ু হইবার প্রার্থনা ব্যক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি সূক্তই এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

পশ্যেম শরদঃ শতম্। ১
জীবেম শরদঃ শতম্। ২
বুধ্যেম শরদঃ শতম্। ৩
রোহেম শরদঃ শতম্। ৪
পূষেম শরদঃ শতম্। ৫
ভবেম শরদঃ শতম্। ৬
ভূয়েম শরদঃ শতম্। ৭
ভূয়সীঃ শরদঃ শতম্। ৮ ১৯।৬৭ সূক্ত

অর্থাৎ আমরা যেন শত শরৎ দেখিতে পাই, শত শরৎ জীবিত থাকি, শত শরৎ পর্য্যন্ত জাগরিত হই, শত শরৎ আরোহণ করি, শত শরৎ পর্য্যন্ত পুষ্টিলাভ করি, শত শরৎ হইয়া যাই, শত শরৎ অলঙ্কৃত করি, এবং শত শরৎ অপেক্ষাও অধিক কাল বাঁচিয়া থাকি।

শুক্ল যজুর্বেদের ৩৬ অধ্যায়ের ২৪ কণ্ডিকায় ঋগ্বেদের পূর্ব্বোদ্ধৃত ৭।৬৬।১৬ মন্ত্রটির একটু বিস্তারসাধন করিয়া বলা হইয়াছে :—

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥

অর্থাৎ আমরা যেন শত শরৎ দেখিতে পাই। শত শরৎ জীবিত থাকি, শত শরৎ পর্য্যন্ত শ্রবণক্ষম থাকি, আমাদের বাগিন্দ্রিয় শত শরৎ পর্য্যন্ত অটুট থাকুক, আমরা যেন শত শরৎ পর্য্যন্ত দারিদ্র্যমুক্ত থাকি (অদীনাঃ), এবং শত বৎসরা-পেক্ষাও অধিক কাল বাঁচিয়া থাকি।

এতদ্ব্যতীত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩।৭।৪।১০) এবং সামম[illegible] ব্রাহ্মণ (১।১।৬, ১।২।২) প্রভৃতি গ্রন্থেও এ জাতীয় কয়েকটি উক্তি দেখা যায়, যাহাতে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য্য হইয়া উ[illegible] যে, বৈদিক ঋষিগণের আকাঙ্ক্ষিত পরমায়ুর পরিমাণ একশ[illegible] বৎসরই ছিল। সুতরাং তাঁহাদের গড়পড়তা পরমায়ুর পরিম[illegible] সম্ভবত ৮০।৮৫ বৎসর বা ৮৫।৯০ বৎসর ছিল; নতুবা কাম[illegible]

পরমায়ু শত বৎসর হইতে পারিত না। এই গড়পড়তা আয়ুষ্কালের মধ্যে উৎকট ব্যাধিতে অকাল-মৃত্যু, অপমৃত্যু প্রভৃতি ধরা হইয়াছে। মুনি-ঋষিগণের পরমায়ু গড়ে ৮০ ৯০ বৎসর হইলে, সাধারণ মানুষের গড়পড়তা পরমায়ু সম্ভবতঃ দাঁড়ায় ৭০।৭৫ বা ৭৫।৮০ বৎসরের মত। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে ছিল না, তাহা নয়। বর্তমান যুগেও পৃথিবীর কয়েকটি শীতপ্রধান দেশে শতাধিক বৎসরের সমর্থ লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পূর্বকালে হয়ত এই শ্রেণীর সমর্থ শতায়ুর সংখ্যা অনেক অধিক ছিল, এবং শিশু-মৃত্যু উৎকট ব্যাধি, যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্র-বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, বন্য জন্তুর আক্রমণ ইত্যাদিতে অকাল-মৃত্যু ধরিয়াও, গড়পড়তা পরমায়ুর পরিমাণ দাঁড়াইত বর্তমান কালাপেক্ষা অনেক বেশী।

বৈদিক যুগের ৩ জন অতি-দীর্ঘায়ু ঋষি

বৈদিক যুগে যে তিনজন ঋষি অতি-দীর্ঘ পরমায়ু ভোগ করিয়া ঋষি সমাজে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হইলেন কশ্যপ, জমদগ্নি ভার্গব ও অগস্ত্য। এ জন্যই ঋগ্বেদীয় একটি খিল সূক্তের মন্ত্রে জনৈক কাশ্যপ ঋষি কর্তৃক এই আকাঙ্ক্ষা-বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল :—

ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষমগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষম্।

যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তন্মেহস্তু ত্র্যায়ুষম্॥ খিল, ৫।৩।৬, পুনঃ সংস্করণ। অর্থাৎ জমদগ্নি, কশ্যপ ও অগস্ত্যের তিনগুণ আয়ু আমাদের হউক।

এই মন্ত্রটি একটু পরিবর্তিত আকারে অথর্ববেদেও দেখা যায়।

ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্

ত্রেধামৃতস্য চক্ষণং ত্রীণ্যায়ুংসি তেকরম্॥ ৫।২।৭

এই একই মন্ত্রের অংশবিশেষ সামবেদের অন্তর্গত জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ (৪।৩।১) এবং অন্যত্রও সম্ভবতঃ দেখা যাইবে। এই বেদ-মন্ত্রটির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট, এবং তাহা এই যে, কশ্যপ, জমদগ্নি ও অগস্ত্য, এ তিনজন অতি-দীর্ঘায়ু ঋষিই যে শুধু কালক্রমে গত হইয়াছিলেন, তাহা নয়; পরন্তু অমর বলিয়া কীর্তিত দেবগণের পরমায়ুরও একটা সীমা আছে, এবং যথাকালে তাঁহারাও দেহত্যাগ করিয়া থাকেন; নতুবা তিনজন ঋষির প্রত্যেকের পরমায়ুর তিনগুণ, এবং দেবগণের পরমায়ুরও তিনগুণ আয়ু-লাভের আকাঙ্ক্ষার কোন অর্থ হয় না। মন্ত্রদ্রষ্টা কোন ঋষির পক্ষে, দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইবার সময়, দেবতা সম্পর্কে কোন অবাস্তব অথবা সম্মান-হানিকর উক্তি করা কোনমতেই সম্ভবপর বলিয়া মনে করা যায় না। দেবকুলের মধ্যে একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবকেই বলা হইয়াছে মৃত্যুঞ্জয় এবং মহাকাল প্রভৃতি। বর্তমান যুগেও ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ কোন যজ্ঞান্তে বা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের পরে, হোমের ভস্ম ঘৃত-মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা স্ব-স্ব যজমানের কপাল, কণ্ঠদেশ, হৃদয়, এবং দুই বাহুসন্ধিতে ফোঁটা দিয়া এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া থাকেন :—
ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং, ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং (ওঁ অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং)
ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং, ওঁ তত্তেহস্তু ত্র্যায়ুষম্।

ঋষিকুলের এই তিন প্রধানের প্রকৃত পরমায়ুর কোন ইঙ্গিত বৈদিক গ্রন্থাদিতে পাওয়া না গেলেও পরশুরাম-পিতা অতি বৃদ্ধ জমদগ্নি ভার্গব, হৈহয়—যাদব বংশীয় মহারাজ অর্জুন কার্তবীর্য্যের (কৃতবীর্য্যের পুত্র) অত্যাচারী পুত্রগণ কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া মহাভারত ও পুরাণাদিতে কথিত হইয়াছে। সুতরাং ঋষি জমদগ্নি দৈববলে পূর্ণ-পরমায়ু ভোগ করিতে অসমর্থ হইলেও, মৃত্যুকালে যে একজন অতি-বৃদ্ধ ঋষি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জমদগ্নির জীবদ্দশায়ই তাঁহার এত বংশবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল যে, এ সম্পর্কে ঋষি সমাজে একটি প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত হইয়াছিল যে, জমদগ্নির দুই বৃদ্ধ বংশধর পরস্পরকে সহজে চিনিতে পারেননা।

জমদগ্নিঃ পুষ্টিকাম এতমাহরৎ, স ইমান্ পোষানপুষ্যৎ। যদিদমাহু র্ন ঔর্বৌ পলিতৌ সংজানীতে ইতি। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ২১।১০।৫-৬

উক্তিটির তাৎপর্য্য সম্ভবতঃ এই যে, উরু-পুত্র ঊর্ব ভার্গবের বংশধর জমদগ্নির পুত্র-পৌত্র ও প্রপৌত্র-বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রভৃতির সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, (স্থানাভাব বশতঃ অন্যত্র বসবাস করার ফলে) জমদগ্নির জীবদ্দশায়ই তাঁহাদের পক্ষে বৃদ্ধবয়সে পরস্পরকে চিনিয়া উঠা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই কোম্পানীর আমলেও হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর মহানৈয়ায়িক ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বেই বহু পৌত্র-প্রপৌত্র এবং বৃদ্ধ-প্রপৌত্রের মুখদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে আনুমানিক ১১৩ বৎসর

বয়সে সজ্ঞানে তাঁহার গঙ্গালাভ হয়। রাশিয়া, তুরস্ক এবং আজারবাইজান প্রদেশে কয়েকজন এমন দীর্ঘায়ু ব্যক্তি আছেন বলিয়া প্রকাশ, যাঁহাদের বংশধরগণ সংখ্যায় ২০০ হইতে ৩০০-এরও অধিক, এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবান ৭ম এবং ৮ম পুরুষেরও মুখদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও বয়স ১৫০-এর নীচে নয় বলিয়া প্রকাশ। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।১৬) ও শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রের (১৫।২১) প্রমাণ অনুযায়ী, ঋষি জমদগ্নি ইক্ষ্বাকু বংশীয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞে, তদীয় মাতুল গাথী-পুত্র বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। এই বৈদিক প্রমাণ হইতে বোঝা যায় যে, হৈহয়-রাজ অর্জ্জুন হরিশ্চন্দ্রের পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত হইয়া সম্রাট পদবীতে, ভূষিত হইয়াছিলেন। পারজিটার-প্রণীত রাজবংশ-তালিকায় অর্জ্জুনকে হরিশ্চন্দ্রের ২।৩ পুরুষ পুরোবর্ত্তী বলিয়া দেখান হইয়াছে (Ancient Indian Historical Tradition, pp. 145-46)। এই স্থান-নির্দ্দেশ নিঃসন্দেহে বিপরীতমুখী হইবে। পরশুরামের সহিত যুদ্ধের সময় অর্জ্জুন সম্ভবতঃ প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যের দ্বারদেশে পৌঁছিয়াছিলেন। কারণ তৎপূর্ব্বেই তিনি তাঁহার দিগ্বিজয় পর্ব্ব সমাধা করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণও বংশ হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই বৃদ্ধ জমদগ্নির বয়সের ইঙ্গিত কতকটা পাওয়া যাইবে, পারজিটারের তালিকা অনুযায়ী, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সূর্য্যবংশের আদি রাজা মনু বৈবস্বত হইতে ৩২ পুরুষ অধস্তন, এবং মহারাজ দশরথ হইতে প্রায় ৩২ পুরুষ উর্দ্ধতন ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

মরীচি-পুত্র ঋষি কশ্যপ ছিলেন দ্বাদশাদিত্যের পিতা। সেই হিসাবে তিনি আদি রাজা মনুর পিতামহ। সুতরাং জমদগ্নি হইতে তিনি প্রায় ৩৪ পুরুষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ধরা যায়। ঋষি অগস্ত্য জমদগ্নি অপেক্ষা ৮।১০ পুরুষ পরবর্ত্তী কালের মানুষ সম্ভবতঃ তিনি কাশীরাজ অলর্ক ও প্রতিষ্ঠান-রাজ ভরতের (দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র) সমসাময়িক ছিলেন।

এই তিনজনই ঋগ্বেদের ঋষি হিসাবে সুপরিচিত। তন্মধ্যে কশ্যপ ও অগস্ত্য শতর্চী বা ন্যূনকল্পে শত-মন্ত্রের দ্রষ্টা হিসাবে প্রখ্যাত। ঋষি জমদগ্নি ভার্গব শতর্চী ছিলেন না। আধুনিক যুগের পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েকটি নজীর হইতে এই অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে, এই তিন ঋষিই তাঁহাদের জীবদ্দশায় সম্ভবতঃ ৭ম, ৮ম, ৯ম, এমন কি, ১০ম পুরুষে জাত বংশধরেরও মুখ দর্শন করিয়াছিলেন। এজন্যই সম্ভবতঃ সারা বৈদিক যুগ ধরিয়া তাঁহারা অতি দীর্ঘায়ু হিসাবে খ্যাত।

পরবর্ত্তী প্রবাদের চিরজীবী

সংস্কৃত সাহিত্যে চিরজীবী বা চিরায়ু বা সুচিরায়ু বলিতে দীর্ঘজীবী বা দীর্ঘায়ুকেই বুঝায়, শাশ্বতায়ু বা অমরকে বুঝায় না। পরবর্ত্তী কালের প্রবাদে চিরজীবী হিসাবে বৈদিক যুগের যে ৭ জন পুরুষকে আখ্যাত করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে নিঃসন্দেহে এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখিতে হইবে, অমর বা শাশ্বতায়ু হিসাবে নয়। কিন্তু কাহারো কাহারো ধারণা এই যে, এই সপ্ত পুরুষ অমর, এবং তাঁহারা এই যুগেও কোথাও না কোথাও সশরীরে বিদ্যমান আছেন। এই ৭ জন তথাকথিত অমর হইলেন ঃ—

অশ্বত্থামা বলি ব্যাসো হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ।
কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ ॥

অর্থাৎ অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান্, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম, ইঁহারা চিরজীবী বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদিগকে শাশ্বতায়ু বা অমর বলিয়া চিহ্নিত করিবার কোন হেতু নাই, এবং তাঁহারা সকলে নিঃসন্দেহে অতি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ যে বেদমন্ত্রে উল্লিখিত কশ্যপ, জমদগ্নি অথবা অগস্ত্য অপেক্ষা দীর্ঘায়ু ছিলেন, এমন কথা বিশ্বাস করিবারও কোন যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাহা হইলে, আশীর্ব্বাদের মন্ত্রে, কশ্যপ, জমদগ্নি প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহাদের কোনও একজনের নাম অন্ততঃপক্ষে যুক্ত থাকিত।

অসুর-রাজ প্রহ্লাদের পৌত্র এবং বিরোচনের পুত্র মহারাজ বলি এই ৭ জনের মধ্যে প্রাচীনতম সন্দেহ নাই। তদীয় আচার্য্য ও গুরু ঋষি উশনা কাব্য (কবি ভার্গবের পুত্র বা নিকট বংশধর) বা শুক্র চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির শ্বশুর ছিলেন। সুতরাং মহাভারত ও পুরাণাদির প্রমাণ অনুসারে, মহারাজ বলি, যযাতি ও তদীয় পিতা নহুষের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। উশনা

কাব্য বা শুক্র, নহুষ ও যযাতি, এই তিনজনই ঋগ্বেদীয় প্রাচীন ঋষি বলিয়া খ্যাত। পৌরাণিক আখ্যান অনুযায়ী, আদিত্য বিষ্ণু কর্তৃক বলির পাতাল-রাজ্যে নির্বাসনের পর হইতে তাঁহার সম্পর্কে আর কোন বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই ভাগ্য-বিপর্যয়ের পরও তিনি বহুকাল জীবিত ছিলেন। পৌরাণিক রাজবংশ-পরম্পরা অনুসারে, মহারাজ নহুষ চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরবার পৌত্র, এবং মনু হইতে পঞ্চম পুরুষ।

পরশুরাম ভার্গব বলি-যযাতি হইতে অন্ততঃপক্ষে ২৬।২৭ পুরুষ পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জমদগ্নি ভার্গবের কনিষ্ঠপুত্র। যতদূর মনে হয়, তিনি জমদগ্নির অতি বৃদ্ধবয়সের সন্তান ছিলেন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি হৈহয়-যাদবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এবং অর্জুন কার্ত্তবীর্য ও তাঁহার পক্ষীয় অনেকানেক যাদবকে নিহত করেন। এই যুদ্ধ খুব সম্ভবতঃ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। যদুকুল পরাজয়ের গ্লানি মুছিবার জন্য বারবার চেষ্টা করে, কিন্তু বারবারই পরাজিত ও ব্যর্থমনোরথ হয়। ভার্গবকুলের দুই মাতুল-গোষ্ঠী, কান্যকুব্জ ও অযোধ্যার রাজবংশ, এবং সম্ভবতঃ যাদবকুলের চিরশত্রু কাশী ও বৈশালী রাজবংশও পরশুরামের সহায়তা করিয়াছিলেন। নতুবা মুষ্টিমেয় ভার্গবগণের পক্ষে প্রবল-পরাক্রান্ত যাদবকুলের সঙ্গে এককভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হইত না। মহাভারত ও পুরাণের উক্তি অনুযায়ী, পরশুরাম ২১ বার ক্ষত্রকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য সম্ভবতঃ এই যে, হতমান যাদবকুল ও তাহাদের মিত্রগোষ্ঠী বহুবার পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া ফেলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল। এই ঐতিহাসিক যুগেও দেখা যায়, গজনীর সুলতান মামুদ গজনবী ১৭ বার ভারতভূমির নানাস্থানে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

পরশুরাম কেবল যুদ্ধ করিয়াই জীবনপাত করেন নাই। তদীয় পিতার ন্যায় তিনিও ঋগ্বেদের অন্যতম ঋষি, যদিও তাহার দৃষ্ট মন্ত্র অতি অল্পই পাওয়া যায়। কথিত হয় যে, শেষবয়সে তিনি পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে (সম্ভবতঃ পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতমালার কোন স্থানে) যাইয়া বাস করিতেন। পিতার ন্যায় এত দীর্ঘায়ু না হইলেও, তিনি নিঃসন্দেহে অতি দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

পরশুরামের অন্ততঃপক্ষে ৩০।৩২ পুরুষ পরে অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু-বংশে দশরথ-পুত্র মহারাজ রামচন্দ্রের জন্ম হয়। রামভক্ত হনুমান্ ও রাম-মিত্র বিভীষণ সমসাময়িক। তাঁহাদের প্রকৃত পরমায়ু সম্পর্কে-নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে উভয়ে যে শ্রীরামচন্দ্রের দেহত্যাগের পরও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ হয়ত নাই। দক্ষিণ ভারতের বানর-বংশীয় রাজপুত্র সুগ্রীবের সচিব হনুমানের অলৌকিক দৈহিক শক্তি ও পরাক্রমের নানাকাহিনী রামায়ণে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু রামচন্দ্রের তিরোধানের পর প্রায় ৩০ পুরুষ যাবৎ তিনি জীবিত ছিলেন, এ-জাতীয় কাহিনী কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। মহাভারতের বনপর্ব্বের ৪৫-৫১ অধ্যায়সমূহে মধ্যমপাণ্ডব ভীমের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎকার ও বলবীর্য্য প্রদর্শনের একটি অতি-প্রাকৃত ও অবিশ্বাস্য আখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে। রাবণ-ভ্রাতা ও লঙ্কাধিপতি বিভীষণ সম্পর্কেও মহাভারতে অনুরূপ অবিশ্বাস্য আখ্যায়িকার সন্ধান পাওয়া যায় (সভাপর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়)। বিভীষণ, কনিষ্ঠপাণ্ডব সহদেবের দূত-মারফত, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে, বহুবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। তবে পরমায়ুর দিক হইতে অমর না হইলেও, বিভীষণ অপর এক হিসাবে প্রকৃতই অমর হইয়া আছেন। পরিবার-দ্রোহী, স্বজন-দ্রোহী, জাতি-দ্রোহী ও দেশ-দ্রোহী ব্যক্তিমাত্রকেই বিভীষণ বা বিশ্বাসঘাতক আখ্যায় ভূষিত করা হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ সেইরাম-রাবণ যুদ্ধের কাল হইতেই স্বজন ও স্বজাতি-দ্রোহিগণকে বিভীষণ নামে চিহ্নিত করা হইয়া থাকে। বিভীষণের ন্যায়পরায়ণতা ও অধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণার কথা আর কেহ বড একটা স্মরণ করেন না।

আর অসুর-রাজ বলি সম্পর্কেও এ-জাতীয় অলীক আখ্যানের অভাব হয়ত নাই। বলি নামক কোন এক রাজা পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলায় বা জালামুখী নামক অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তৎপুত্র বাণের কন্যা শ্রীমতী উষার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুত্র মহারাজ ভরতের সমসাময়িক কালেও বিহারের ভাগলপুর অঞ্চলে গঙ্গাতীরে বলি নামক কোন এক নিঃসন্তান রাজা রাজত্ব করিতেন।

ঋগ্বেদের প্রখ্যাত ঋষি দীর্ঘতমা তাঁহারই অনুরোধে তদীয় পত্নীর গর্ভে কয়েকটি সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া ঋগ্বেদীয় বৃহদ্দেবতা ও পুরাণাদিতে কথিত হইয়াছে। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্র প্রভৃতি এই ঋষিরই ঔরসজাত পুত্র। বৈদিক প্রমাণ অনুসারে, দীর্ঘতমা ভরতের অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রধান পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইতিহাস-জ্ঞান-বিবর্জিত পরবর্ত্তীকালের পুরাণাচার্য্যগণ দুই বিভিন্ন যুগের দুই বলিকেই বিরোচন-পুত্র বলির সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। দীর্ঘতমা ঋষির সমকালীন রাজা বলি বিরোচন-পুত্র বলি হইতে অন্ততঃপক্ষে ৪০ পুরুষ পরবর্ত্তী আর বলি নামধারী তৃতীয় ব্যক্তি বিরোচন-পুত্র হইতে আনুমানিক ৯০ পুরুষ পরে আবির্ভূত।

রামচন্দ্রেরও আনুমানিক ২৫।২৬ পুরুষ পরে ব্যাসদেব আবির্ভূত হন। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস, কৃপাচার্য্য ও দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা, বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও সমসাময়িক ছিলেন। এই তিনজনের মধ্যে ব্যাসদেব নিঃসন্দেহে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তিনিই ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের প্রকৃত পিতা। বয়সের দিক হইতে তিনি পিতামহ ভীষ্ম অপেক্ষা অন্ততঃপক্ষে ১৭।১৮ বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন। ভীষ্মের পিতা মহারাজ শান্তনুর সহিত ব্যাস-জননী দেবী সত্যবতীর (দাস-রাজ-কন্যা মৎস্যগন্ধা) বিবাহের সময় কুমার দেবব্রত (ভীষ্ম) যুবরাজ ছিলেন। ব্যাসের বয়স তখন ৪।৫ বৎসর মাত্র, আর কুমার দেবব্রতের কমপক্ষে ২২।২৩ বৎসর; কারণ তৎকালে তিনি মহাবীর্য্যশালী যুবক (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০০ অধ্যায়)। বেদব্যাস কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেও বহুকাল জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। যুদ্ধের কয়েকমাস পরেই অভিমন্যু-পুত্র পরিক্ষিতের জন্ম হয়। পরিক্ষিতের আয়ুষ্কাল সম্ভবতঃ ৬০ বৎসর (সৌপ্তিক পর্ব্ব, ১৬ অধ্যায়)। ভারতযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব ৩৬ বৎসরকাল রাজত্ব করেন, এবং তৎপর কুমার পরিক্ষিৎ রাজা হন। বেদব্যাস তৎকালে জীবিত। আর তাঁহারই অনুমতিক্রমে পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। পরিক্ষিতের বয়স তখন ৩৫।৩৬ বৎসর। সুতরাং পরিক্ষিতের রাজত্বকাল ২৫।২৬ বৎসর মাত্র। তৎপুত্র জনমেজয় সিংহাসনে আরোহণের কয়েক বৎসরকাল মধ্যেই পিতৃহন্তা নাগকুলের বিরুদ্ধে এক বিধ্বংসী যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তদীয় "সর্পসত্র" বা নাগ-বিধ্বংসী মহাযজ্ঞের আকস্মিক অবসানে, তক্ষশিলায় বেদব্যাস রচিত "জয়" বা "ভারত" নামক নব-মহাকাব্য (পরবর্ত্তীকালে মহাভারত নামে সুপরিচিত) তাঁহারই উপস্থিতিতে, এবং তাঁহারই অনুমতিক্রমে, তৎশিষ্য বৈশম্পায়ন, জনমেজয় ও তদীয় ভ্রাতা এবং সভাসদ্‌গণের সমক্ষে সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তন করেন। সুতরাং বেদব্যাস সেইসময় পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহে জীবিত ছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে বেদব্যাস সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ মহাভারত ও পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ইহার কিছুকাল পরেই তাঁহার দেহান্ত ঘটে। নাগ-কুলের সঙ্গে যুদ্ধের সময় জনমেজয় পূর্ণাঙ্গ যুবক, আর সম্ভবতঃ তৎকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শতানীকেরও জন্ম হইয়াছিল। বেদব্যাস হইতে শতানীক অধস্তন সপ্তম পুরুষ:- যথা, বেদব্যাস-পাণ্ডু-অর্জ্জুন-অভিমন্যু-পরিক্ষিৎ-জনমেজয়-শতানীক। এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা (মাতা সত্যবতীর দিক হইতে) বিচিত্র-বীর্য্যের ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদনের সময় ব্যাসদেব অল্পবয়স্ক যুবক ছিলেন না। কৃষ্ণ-ভগ্নী দেবী সুভদ্রাকে বিবাহের সময় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনও অল্পবয়স্ক ছিলেন না। আর মহাভারতের আদিপর্ব্বের (৪৪ অধ্যায়) প্রমাণ সত্য হইলে, ধরিয়া লইতে হয় যে, জনমেজয় ও তাঁহার অপর তিন ভ্রাতা পরিক্ষিতের মৃত্যুকালে অল্পবয়স্ক বালকমাত্রই ছিলেন (শিশু)। এই হিসাবে বিচার করা হইলে, বেদব্যাসের বংশধর-সংখ্যা শতানীক পর্য্যন্ত গণনায় ৭ম পুরুষ হইলেও, প্রকৃত বয়সের বিচারে তাহা ৮ম কিংবা ৯ম পুরুষ হওয়াও সম্ভবপর ছিল। সম্ভবতঃ বেদব্যাস কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর আনুমানিক ৭৫।৮০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন।

আচার্য্য কৃপ ও দ্রোণ, সম্পর্কে শ্যালক-ভগ্নীপতি ছিলেন। কৃপ ও দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম অপেক্ষা অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাণ্ডব-গণের শ্বশুর, মহারাজ দ্রুপদ, দ্রোণের বাল্যবন্ধু ছিলেন। সুতরাং আচার্য্য কৃপ ও দ্রোণ যুধিষ্ঠিরাদির পিতৃস্থানীয় ছিলেন। দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা কৌরব ও পাণ্ডব কুমার-গণেরই বয়সী ছিলেন, এবং একসঙ্গেই পিতার নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে, আচার্য্য কৃপ প্রথমে পরিক্ষিৎ এবং পরে তৎপুত্র কুমার

জনমেজয়েরও অস্ত্রগুরুর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃপ মহারাজ দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিলেও, পাণ্ডবগণ তাঁহার প্রতি কোন বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন না; বরং যুদ্ধান্তে তাহার অস্ত্রগুরুর পদটি বহালই রাখিয়াছিলেন। বিষ্ণু পুরাণের মতে, মহাবৃদ্ধ কৃপ জনমেজয়ের পুত্র কুমার শতানীকেরও অস্ত্রগুরু ছিলেন (৪।২১ অধ্যায়)। শতানীক কৃপ হইতে গণনায় অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ। এই বয়সেও সেই আচার্য্যের দৃষ্টিশক্তি, মননশক্তি ও কর্ম্মশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল; নতুবা তিনি অস্ত্রগুরুর কাজ সম্পাদন করিতে পারিতেন না। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যায় যে, আচার্য্য কৃপ সর্পসত্রের পরেও অন্ততঃপক্ষে ১৮।২০ বৎসরকাল সুস্থ শরীরে জীবিত ছিলেন। পুরাণে আচার্য্য কৃপ সম্পর্কে ইহাই সম্ভবতঃ সর্ব্বশেষ উল্লেখ। প্রকৃত বয়সের হিসাবে আচার্য্য কৃপ হয়ত তৎকালে ৭ম কিংবা ৮ম পুরুষের মুখদর্শনের উপযুক্ত ছিলেন। আচার্য্য দ্রোণের বয়সের সঙ্গে তুলনা করিলে, কৃপাচার্য্যের তৎকালীন বয়স সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভবপর হয়। দ্রোণ কৃপের যমজ-ভগ্নী কৃপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সে হিসাবে উভয়ের বয়সের পার্থক্য ১০ হইতে ১৫ বৎসর ছিল, ধরা যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত বৃদ্ধ দ্রোণের বয়স ছিল ৮৫ বৎসর (আকর্ণ-পলিতশ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ,—দ্রোণপর্ব্ব, ১৯১ অধ্যায়)। দ্রোণ দেখিতে শ্যামবর্ণ ছিলেন, এবং তৎকালে তাঁহার চুল-দাড়ি সবই সাদা হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তৎকালে কৃপের বয়স ছিল আনুমানিক ৭০।৭৫ বৎসর। বেদব্যাসের তিরোধানের পরও আচার্য্য কৃপ ১৫ বৎসরকাল জীবিত থাকিলে, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম সম্ভবতঃ ১৬৫ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল (৭৫ + ৭৫ + ১৫ = ১৬৫ বৎসর)।

দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামার পরবর্ত্তী জীবনসম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কৌরব-পক্ষে যে তিনজন মাত্র বীর জীবিত ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম, এবং সম্ভবতঃ যোদ্ধা হিসাবে শ্রেষ্ঠ। কৃপ আচার্য্য হইলেও যোদ্ধা হিসাবে বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়না। যুদ্ধাবসানে রাত্রির অন্ধকারে নিদ্রিত পাণ্ডব শিবিরে অলক্ষ্যে প্রবেশ ও নিদ্রিত বীর ও কুমারগণের অমানুষিক হত্যা, তাঁহার অন্যতম কুকীর্ত্তি ও জিঘাংসাপরায়ণতার পরিচায়ক। মহাভারতের সৌপ্তিক পর্ব্বে ধৃত ১৬শ অধ্যায়ের উক্তি সত্য হইলে, এই আচার্য্য-পুত্রটি, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া অন্ততঃপক্ষে ৬০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। বহুবিধ অন্যায় কার্য্যের অন্যতম সহযোগী হইলেও, অবধ্য এই আচার্য্য-পুত্রকে, অভিমন্যু-পত্নী উত্তরার ভ্রূণ-হত্যা ও তজ্জন্য অনুতাপের পরিবর্ত্তে এক পৈচাশিক উল্লাস প্রকাশ করিতে থাকায়, ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ অভিশাপ দেন যে, ব্রাহ্মণ-কুল-গ্লানি মহাপাপী এই নর-পিশাচ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া, বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইবে, লজ্জায় লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিবেনা, আর তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই অভিমন্যু-তনয় পুনরুজ্জীবিত হইয়া পরিক্ষিৎ নামে (বংশরক্ষক বা কুলের বাতি) ৬০ বৎসরকাল জীবিত থাকিবে। সম্ভবতঃ পরিক্ষিতের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের অবসান হয় নাই; আরও দীর্ঘকাল তাঁহাকে দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অমোঘ অভিশাপে ৩০০০ বৎসরাবধি অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবেন, এই বিশ্বাসের বশেই সম্ভবতঃ অনেকানেক ব্রাহ্মণ এখনও পর্য্যন্ত স্নানের পূর্ব্বে গায়ে তেল মাখিবার সময়, "ওঁ অশ্বত্থাম্নে নমঃ," এই মন্ত্রটি ৩ বার উচ্চারণ করিয়া, তিনবার আঙ্গুল দিয়া তেল ছিটাইয়া দেন। তেল প্রয়োগে কুষ্ঠের যন্ত্রণার উপশম হয়, এই ধারণার ফলেই আজও পর্য্যন্ত অশ্বত্থামার উদ্দেশে এই তেল-নিক্ষেপের ব্যবস্থা!

বিভিন্ন যুগের এই ৭ জন অতি-দীর্ঘায়ু পুরুষ সাধারণের ব্যতিক্রম ছিলেন। এজন্যই সম্ভবতঃ তাঁহারা প্রবাদ-বাক্যে চিরায়ু বলিয়া কীর্ত্তিত। বলি হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্বত্থামা পর্য্যন্ত এই ৭জনকেই বৈদিক যুগের মানুষ বলিয়া আখ্যাত করা হয়। যতদূর মনে হয়, প্রবাদ-বাক্যের রচয়িতা তাঁহাদিগকে প্রাচীন যুগের অতি-দীর্ঘায়ু হিসাবেই গণ্য করিতেন, অমর বা মৃত্যুহীন হিসাবে নয়। সম্ভবতঃ তিনি নানা বেদ-মন্ত্রে প্রশংসিত কশ্যপ, জমদগ্নি ও অগস্ত্য, এই তিনজন প্রখ্যাত ও দীর্ঘতম আয়ু-লাভের অধিকারী সম্পর্কে বিশেষ কোন খবর রাখিতেন না, অথবা রাখিলেও, তাঁহাদের অতিরিক্ত আরও কয়েকজনের উল্লেখ তাঁদের রচিত শ্লোকে করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগসমূহে ইতিহাস ও সময়-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত বিভিন্ন আচার্য্য কর্ত্তৃক রামায়ণ,

মহাভারত ও পুরাণাদিতে ইঁহাদের সম্পর্কে নানা অবিশ্বাস্য কাহিনী সংযোজিত হওয়ার ফলেই, জনসাধারণের মনে এই ধারণা জন্মাইতে আরম্ভ করে যে, উল্লিখিত ৭ জন প্রকৃতই মৃত্যুহীন, এবং বর্ত্তমান যুগেও তাঁহারা জীবিত থাকিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছেন। বস্তুতঃ ইঁহাদের মধ্যে কাহারও অনন্তকাল ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। দাতা, যোদ্ধা, মিত্র, ভক্ত ও জ্ঞানী হিসাবে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি-প্রখ্যাত হইলেও, আয়ুর দিক হইতে কেহই অমর ছিলেন না বা হইতেও পারেন না, ইহা ধ্রুব সত্য। ফলতঃ, চিরজীবী শব্দটি ভুল অর্থে প্রয়োগের জন্যই এই ভুল ধারণা জনসাধারণের মনে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

সংহিতা-পরবর্ত্তী যুগ

বৈদিক গ্রন্থাদির নানা উক্তি হইতে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, সাধারণভাবে শতবৎসর পরমায়ুর কথা ছাড়া সেখানে বিশেষভাবে কোন মুনি-ঋষির প্রকৃত পরমায়ুর পরিমাণ উল্লেখ করা হয় নাই। তবে ভারত যুদ্ধের কয়েক (আনুমানিক ৭।৮ পুরুষ) আবির্ভূত এক পুরুষ পরে প্রখ্যাত বেদাচার্যের জীবনকাল সম্পর্কে অন্ততঃ পক্ষে ২টি অতি-প্রসিদ্ধ বৈদিক গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে দেখা যায়। এই বেদাচার্য্যের নাম মহিদাসঐতরেয় (ইতরা দেবীর পুত্র), এবং তাঁহার রচিত বা সঙ্কলিত গ্রন্থের নাম ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষৎ ও জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ-দুইটিতে তাঁহার পরমায়ু সম্পর্কে প্রকৃত হিসাব আছে। এই হিসাব অনুযায়ীও, প্রাচীন যুগের ঋষি ও আচার্য্যগণের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা হইলে, দেখা যাইবে যে তাহা আমাদের পূর্ব্বকথিত হিসাবের সঙ্গে অতি সামঞ্জস্যশীল। ছান্দোগ্য ৩।১৬ ও জৈমিনীয় উপনিষদ্-ব্রাহ্মণের ৪।২ অধ্যায়ে মানুষের জীবনকালকে ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া, তিনটি রূপকের মাধ্যমে তাহা দেখান হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, পুরুষের প্রথম জীবন গায়ত্রী ছন্দের অক্ষরের ন্যায় ২৪ বৎসর পরিমিত, মধ্যজীবন ত্রিষ্টুভ্ ছন্দের অক্ষরের ন্যায় ৪৪ বৎসরকাল ব্যাপ্ত, এবং শেষ জীবন জগতী ছন্দের অক্ষরের ন্যায় ৪৮ বৎসরকাল বিস্তৃত। এই দেহ যজ্ঞ-স্বরূপ। যিনি মানব-দেহের এই নিগূঢ় রহস্য জ্ঞাত আছেন, তিনি পূর্ণ আয়ু ভোগ করিয়া, ২৪+৪৪+৪৮ =১১৬ বৎসরকাল জীবিত থাকেন। ইতিমধ্যে কোন উৎকট ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি ব্যাধিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিবেন যে, তাঁহার কাল পূর্ণ হয় নাই, এবং যাইবারও সময় হয় নাই। সুবিদ্বান্ মহিদাসঐতরেয় এই রহস্য জানিতেন।

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানাহ মহিদাস ঐতরেয়ঃ স কিং স এতদুপতপসি যোঽহমনেন ন প্রেষ্যামীতি, স হ ষোড়শং বর্ষশতমজীবৎ, প্র হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি য এবং বেদ॥ ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৩।১৬।৭

এতদ্ধ তদ্বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ উবাচ মহিদাস ঐতরেয় উপতপতি কিমিদমুপতপসি যোঽহমনেনোপতপতা ন প্রেষ্যামীতি। স হ ষোড়শশতং বর্ষাণি জিজীব। প্র হ ষোড়শশতং বর্ষাণি জীবতি নৈনং প্রাণঃ সাম্যায়ুষো জহাতি য এবং বেদ॥

জৈমিনীয় উপনিষদ্ব্রাহ্মণ, ৪।২।১১

অর্থাৎ ১১৬ বৎসরকাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কোন উৎকট ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ মহিদাস ঐতরেয় ব্যাধিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাকে কেন এসময়ে আক্রমণ করিয়াছ? এ সময়ে ত আমার যাইবার কথা নয়?" তিনি পুরাপুরি ১১৬ বৎসর-কালই জীবিত ছিলেন। যিনি জীবনের এই রহস্য অবগত আছেন, কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার দেহান্ত হয় না।

উপনিষৎ দুইটিতে মানব-জীবনের যে ৩টি বিভাগ দেখান হইয়াছে, তাহার প্রথমভাগ বর্ত্তমান যুগেও প্রযোজ্য। মানুষের পূর্ণ যৌবন ২৪।২৫ বৎসর বয়সে এখনও আসে, এবং এই যৌবনকাল সাধারণতঃ ৩৮ হইতে ৪০।৪২ বৎসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এর পরই আরম্ভ হয় মধ্যজীবন বা প্রৌঢ়ত্ব। কিন্তু এই মধ্য-জীবনের সীমা-রেখা ২৪+৪৪ বা ৬৮।৭০ অবধি পৌঁছায় না। সাধারণতঃ ৫৪।৫৫ বা ৬০ বৎসরের মধ্যেই বর্ত্তমানে মধ্য-জীবন সীমায়িত। তারপরই শেষ-জীবন বা বার্দ্ধক্য শুরু হয়। এই বার্দ্ধক্যের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নাই। এদেশে অধিকাংশ মানুষই ৬০।৬৫ অথবা ৬৫।৭০ বৎসরের বেশী পরমায়ু লাভ করিতে পারেন না। সে তুলনায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ভাগ্যবান্ এই সীমা অতিক্রম করিতে সক্ষম হন। এই হিসাবে

অবশ্য অকালমৃত্যুর কথা ধরা হয় নাই। শীতপ্রধান অঞ্চল পাশ্চাত্য দেশসমূহের অবস্থা অনেকটা ভাল। কিন্তু সেখানেও সর্ব্বত্র গড়পড়তা পরমায়ু ৭০।৭৫ বৎসর নয়। প্রখ্যাত বেদাচার্য্য মহিদাস ঐতরেয়ের অভ্যুদয়-কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৯ম কিংবা ১০ শতক ধরা হইলে, দেখা যাইবে যে, সেই যুগেও বৈদিক যুগের মত মুনি-ঋষিগণের পরমায়ু ১০০ হইতে ১২০ বৎসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং এখানেও আমরা বৈদিক সংহিতা-গ্রন্থে উল্লিখিত শতবর্ষ ও ডাকের কথার ১২০ বৎসর পরমায়ুর সমর্থনই পাইতেছি। এই ১০০ বা ১১৬ বা ১২০ বৎসরই মানুষের পূর্ণ পরমায়ু। সুতরাং অতীতেই হউক, আর বর্ত্তমান যুগেই হউক, যাঁহারা সুস্থ-সবল দেহে এই সময়-সীমা অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, এবং আয়ু বিষয়ে অতি সৌভাগ্যবান্, সন্দেহ নাই।

তবে এ সম্পর্কে অতীত ও বর্ত্তমানকালের মধ্যে একটু বিশেষ পার্থক্য আছে, দেখা যায়। অথর্ব্ববেদ ও শুক্ল-যজুর্ব্বেদের সূক্ত দুইটির দিকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, সংশ্লিষ্ট ঋষিদ্বয় এখানে কেবল শতবৎসর পরমায়ুই প্রার্থনা করেন নাই, তাঁহারা এই শততম বৎসরেও সম্পূর্ণ চলন-ক্ষম, কর্ম্ম-ক্ষম, শ্রবণ-ক্ষম, দৃষ্টি-ক্ষম এবং বাচন-ক্ষম থাকিবার প্রার্থনাও দেবতার নিকট জানাইয়াছেন। ইহা শুধুমাত্র বাঁচিয়া থাকিবারই প্রার্থনা নয়। ইহাতে এই ধারণা করা অসঙ্গত বা অযৌক্তিক হইবে না যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সম্ভবতঃ স্বাভাবিক-ভাবেই শত-বৎসরকালেও সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম থাকিতেন। বর্ত্তমানে সারা পৃথিবীতে কর্ম্মক্ষম শতায়ুর সংখ্যা সম্ভবত, আঙ্গুলে গণিয়া শেষ করা যায়। আর অধিকাংশই লাঠি বা অপর লোকের সাহায্যে কোনরকমে চলাফেরা করিতে পারেন মাত্র। কেহ কেহ আবার পেরাম্বুলেটার জাতীয় হাতগাড়ীর সাহায্যও লইয়া থাকেন।

পক্ষান্তরে উপনিষদ্ দুইটির "ষোড়শশতং বর্ষাণি" ও "ষোড়শং বর্ষশতং" এই দুই বাক্যাংশকে যদি তাহাদের প্রকৃত আধার বা যোগসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্য করা হয়, তবে তাহাদের অর্থ ১১৬ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১৬০০ বৎসরও হইতে পারে। সম্ভবতঃ এ জাতীয় কয়েকটি বৈদিক প্রয়োগের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবনে অসমর্থ, পরবর্ত্তীকালের পুরাণাচার্য্যেরাই মুনি-ঋষিগণের জীবনকাল সম্পর্কে নানা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব উক্তি করিয়াছেন। অমুক ঋষি শত-শত বৎসর, বা সহস্র-সহস্র বৎসর জীবিত ছিলেন, বা অমুক ঋষি সহস্র-সহস্র বৎসর শুধু তপস্যা করিয়াই কাটাইয়া দিয়াছিলেন,—এ শ্রেণীর অবাস্তব উক্তি বহু পুরাণেই, এমন কি, রামায়ণ মহাভারতেও দেখা যাইবে। রামায়ণে দেখা যাইবে যে, রাজা দশরথ বহু-শত বৎসর জীবিত ছিলেন (অযোধ্যাকাণ্ড, ২য় সর্গ), এবং রামচন্দ্রও ১০০০০ বৎসর রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। আদি পুরাণ-সংহিতা সংকলয়িতা বেদব্যাস বা তাঁহার শিষ্য সূত লোমহর্ষণ, বা তাঁহার পুত্র সৌতি উগ্রশ্রবা বা তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ অবশ্যই পুরাণাদিতে এই সব অসম্ভব উক্তির জন্য দায়ী নন। আর আদি ভারত মহাকাব্য বা প্রাচীন মহাভারতে, অথবা বাল্মীকি রচিত প্রাচীন রামায়ণেও এই সব অবাস্তব উক্তি অবশ্যই লিখিত ছিল না। নানা বৈদিক গ্রন্থে উল্লিখিত মুনি-ঋষিগণের প্রকৃত পরমায়ু সম্পর্কে ধারণাহীন অর্বাচীনযুগের আচার্য্য-গণই এইসব কাণ্ডকারখানার জন্য নিঃসন্দেহে দায়ী। তাঁহাদের অপকীর্ত্তির ফলেই আজ মহাকাব্য পুরাণাদির মত অমূল্য গ্রন্থরাজি অনেকানেক পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট অপাংক্তেয় হইয়া রহিয়াছে।

অপর একটি কারণও সম্ভবতঃ এ জাতীয় অসম্ভব উক্তির মূলে ছিল। তাহা হইল, অনেকানেক প্রখ্যাত ঋষির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামের পরিবর্ত্তে শুধুমাত্র বংশগত পদবীর প্রয়োগ। এইসকল বংশগত নামের অধিকাংশই পরে গোত্র নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মহাভারত ও পুরাণাদিতে প্রায়শঃ দেখা যাইবে যে, পুরুষানুক্রমে অথবা যুগ-যুগান্ত ধরিয়া একই বংশনাম বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ঋষির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভার্গব, বসিষ্ঠ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা বা আঙ্গিরস, ভরদ্বাজ, শৌনক প্রভৃতি বংশগত পদবীর উল্লেখ এ প্রসঙ্গে প্রথমেই করা যায়। বৈদিক সাহিত্যে অবশ্য মধ্যে-মধ্যে বংশগত পদবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত নামের উল্লেখও পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য মাত্র। বংশগত নামের সঙ্গে ব্যক্তিগত নাম উল্লিখিত থাকিলে কোন ঋষির প্রকৃত পরিচয় ও কাল-নির্দ্দেশ সহজসাধ্য হয়, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বিশেষ

কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্রমাগত বংশ-নামের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে, পরবর্ত্তীযুগের সূত ও পুরাণাচার্য্যগণের মনে সম্ভবতঃ এই ভুল ধারণা জন্মিয়াছিল যে, একই ঋষি সম্ভবতঃ যুগ-যুগান্ত ধরিয়া বর্ত্তমান ছিলেন, এবং সেই হেতু তিনি শত-শত বৎসর বা সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ বাঁচিয়াছিলেন। আদিত্য মিত্র-বরুণের পুত্র বলিয়া পরিচিত আদি বসিষ্ঠ, মনু বৈবস্বতের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। সূর্য্যবংশের সঙ্গে পুরোহিত হিসাবে যুক্ত একই বসিষ্ঠ ঋষি যে মনু হইতে অধস্তন ২০ পুরুষে, মান্ধাতার আমলে, বা আরও ৯।১০ পুরুষ পরে, ত্রয়ারুণ-ত্রিশঙ্কু-হরিশ্চন্দ্রের সময়ে, অথবা তাহারও ৭।৮ পুরুষ পরে, মহারাজ সগরের রাজত্ব-কালে, কিংবা মনু হইতে অন্ততঃপক্ষে ৬৪।৬৫ পুরুষ পরবর্ত্তী-কালে, মহারাজ দশরথ ও তৎপুত্র শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে, জীবিত ছিলেন না, বা থাকিতেও পারিতেন না, একথা সহজ বুদ্ধিতেই ধরা যায়। এমন কি, রামচন্দ্রেরও আনুমানিক ২৬।২৭ পুরুষ পরে দেখা যায় যে, বসিষ্ঠ ঋষি কুমার দেবব্রতকে (পরবর্ত্তীকালে ভীষ্ম নামে সুপরিচিত) ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন। মহাভারতে বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, যেন ভীষ্ম-গুরু বসিষ্ঠ সেই মনু-মান্ধাতার আমলের বসিষ্ঠই ছিলেন। আবার কোন কোন পুরাণে এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, পুরাণ-প্রবক্তা পরাশর পৌরাণিক বৃত্তান্তসমূহ তদীয় পিতামহ সেই আদি ও অকৃত্রিম ঋষি বসিষ্ঠ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! মনু হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত আনুমানিক ৯৫ বা ১০০ পুরুষ বা প্রায় ২৫০০০ বৎসর ধরিয়া (প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরা হইলে) একই বসিষ্ঠ ঋষি জীবিত ছিলেন, এরূপ ধারণা পরিপাক করা অসম্ভব। প্রকৃত বিষয়টি এই যে, বসিষ্ঠ-বংশীয় বিভিন্ন ঋষিই পুরুষানুক্রমে অযোধ্যার সূর্য্যবংশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং তাহাদেরই কোন একজন সম্ভবতঃ কুমার দেবব্রতকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন। কয়েকটি বৈদিক গ্রন্থে বিভিন্ন যুগের "বসিষ্ঠ" উপাধিধারী বেশ কয়েকজন ঋষির ব্যক্তিগত নাম পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে "বসিষ্ঠ" উপাধিধারী বসিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল। ইদানীং তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হইয়াছেন। বসিষ্ঠবংশ সম্পর্কে যাহা বলা হইল, ভৃগুবংশ সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই বলা যায়। মহর্ষি ভৃগুর বহু পরবর্ত্তী এক বংশধর (সম্ভবতঃ ৩৪।৩৫ পুরুষ পরবর্ত্তী) শস্ত্রবিদ্ পরশুরাম ভার্গব, আনুমানিক ৩০ পুরুষ পরে, অযোধ্যার দশরথ শ্রীরামচন্দ্রের সময়, জীবিত ছিলেন, এমন কি, তাহারও ২৫ হইতে ২৮ পুরুষ পর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহাও একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। আসলে "ভার্গব" পদবীধারী পরশুরাম-বংশীয় বা ভৃগু-বংশীয় বিভিন্ন শস্ত্রবিদ্ আচার্য্য বিভিন্ন যুগে অস্ত্রগুরুর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। আবার সূর্য্যবংশীয় মহারাজ ত্রয়ারুণের পুত্র সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু ও তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্রের অন্যতম পুরোহিত, গাধী-পুত্র বৃদ্ধ ঋষি বিশ্বামিত্র (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রের মতে বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বা ১০০ বংশধর হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন) প্রায় ৮।১০ পুরুষ পরে শকুন্তলার পিতা হইয়াছিলেন, অথবা তাহারও প্রায় ২২।২৩ পুরুষ পরে, মহারাজ দশরথের সভায় পদব্রজে উপস্থিত হইয়া, কুমার রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া, বিহার প্রদেশের কোন স্থানে স্বীয় আশ্রমে গিয়াছিলেন, এবং পরে সেখান হইতে পুনরায় পদব্রজে বিদেহ রাজ্যের রাজধানী মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন, ইহাও বিশ্বাসের অযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বামিত্র-বংশীয় বা গোত্রীয় ২ জন বিভিন্ন ঋষিই যে পরবর্ত্তী দুইযুগের ঘটনাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রামায়ণের আদিকাণ্ডে বিষয়টিকে এমনভাবে বিবৃত করা হইয়াছে যেন আদি বিশ্বামিত্রই শকুন্তলার পিতা হইয়াছিলেন, এবং তিনিই আবার দশরথ রামচন্দ্রেরও সমসাময়িক ছিলেন। অত্রি বা আত্রেয়, অঙ্গিরা বা আঙ্গিরস, ভরদ্বাজ, শৌনক প্রভৃতি বংশগত পদবীধারী ঋষিগণের সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলা যায়। এইসকল ঋষি-বংশ সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধানের বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে। পার্জিটার এবিষয়ে পথিকৃৎ, সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি অল্প কয়েকজন মাত্র ঋষির ব্যক্তিগত নাম উদ্ধারে সক্ষম হইয়াছেন। বৈদিক গ্রন্থাদিতে বিভিন্ন বংশীয় অনেকানেক ঋষির ব্যক্তিগত নামের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে বিশেষ চেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুপণ্ডিত পারজিটার সঙ্গতভাবেই অনুমান করিয়াছেন যে, সূত ও পুরাণাচার্য্যগণের পক্ষে বিভিন্ন রাজবংশের তালিকা প্রণয়ন করা যেমন সহজসাধ্য ছিল, ঋষিবংশের তালিকা প্রণয়ন করা তেমন সহজসাধ্য ছিল না। কারণ সূত ও পুরাণাচার্য্যগণ সাধারণতঃ কোন-না-কোন একটি রাজবংশকে আশ্রয় করিয়াই নগরে বসবাস করিতেন। পক্ষান্তরে মুনি-ঋষিগণ, তপস্যা ও আত্মচিন্তার সুবিধার জন্য, সাধারণতঃ নগরীর কোলাহল হইতে দূরে, বন-বনান্তে বা পাহাড়-পর্ব্বতের সানুদেশে, অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে, আশ্রম রচনা করিয়া বসবাস করিতেন। সুতরাং সূত ও আচার্য্যগণের পক্ষে ঋষিবংশ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া প্রায়ই সম্ভবপর হইত না, এবং সেই কারণেই ব্যক্তিগত নামের পরিবর্ত্তে বংশ-নাম বা গোত্র-নামের ব্যবস্থা করিয়া সেই অভাব পূরণ করা হইয়াছে। ফলে বহু পরবর্ত্তী যুগের সূত ও আচার্য্যগণ ধরিয়া লইতে কতকটা বাধ্য হইয়াছিলেন যে, একই ঋষি সম্ভবতঃ এক-একটি রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া বহুকাল যাবৎ পৌরহিত্য করিয়াছেন, অথবা একই ঋষি নানা যুগ ধরিয়া নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাজেই তাঁহারা শত শত বৎসর বা সহস্র-সহস্র বৎসরাবধি জীবিত ছিলেন, নতুবা এই সব কার্য্য কিছুতেই সম্ভবপর হইত না।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, সুপ্রাচীন বৈদিক যুগেও ঋষিগণের কাম্য পরমায়ু শত বৎসরের বেশী ছিল না। প্রথম জীবনে ব্রহ্মচর্য্য, এবং গার্হস্থ্য জীবনেও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা নিয়মকানুন কঠোরভাবে পালন করার ফলে, তাঁহাদের অনেকেই যে সুস্থ-সবল দেহ লইয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যও সম্ভবতঃ সেই তুলনায় বিশেষ খারাপ ছিলনা। ফলে তাঁহারাও সাধারণতঃ সুস্থ-সবল দেহে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতেন। পূর্ব্বেই আমরা তাঁহাদের গড়পড়তা পরমায়ু ৭০।৭৫ বা ৭৫।৮০ বৎসর ধরিয়াছি, আর মুনি ঋষিগণের বেলায় গড়পড়তা পরমায়ুর পরিমাণ ধরিয়াছি ৮০।৮৫ বৎসর বা ৮৫।৯০ বৎসরের মধ্যে। ঋগাদি নানা বৈদিক গ্রন্থের প্রমাণ দৃষ্টে এই গড়পড়তা পরমায়ুর পরিমাণকে কোনমতেই অল্প বলিয়া মনে করা যাইবে না। সম্ভবতঃ এই পরিমাণ আরও একটু কমের দিকেই ছিল।

প্রখ্যাত বেদাচার্য্য ও ঋষি মহিদাস ঐতরেয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি যে তিনি মাত্র ১১৬ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন আর এই ১১৬ বৎসরকেই মানুষের পূর্ণ আয়ুষ্কাল বলিয়া অন্ততপক্ষে দুইটি অতি-প্রসিদ্ধ উপনিষদ্‌গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগ বলিতে ভাবাবেগে যাঁহারা আপ্লুত হইয়া পড়েন, এবং প্রাচীন যুগের মুনি-ঋষি সম্পর্কে যাঁহারা অতি-মাত্রায় স্পর্শকাতর, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়ত এই পরিমাণ অতি অল্প বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু এ সম্পর্কে আমরা যে সকল প্রমাণ-পঞ্জী উপস্থাপিত করিয়াছি, তাহা কর্ত্তন করাও খুব সহজসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয়না। বৈদিক যুগের কশ্যপ, জমদগ্নি ও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষির প্রকৃত পরমায়ুর কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না বিধায়, সে সম্পর্কে কোন অনুমান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তথাপি আমরা বর্ত্তমান যুগের কয়েকটি নজীর হইতে আমাদের ধারণা যথাসম্ভব উপস্থাপিত করিয়াছি। তথা-কথিত চিরজীবিগণের মধ্যে কয়েকজনের সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল সম্পর্কেও আমরা মহাভারত ও পুরাণ হইতে প্রমাণাবলী উদ্ধারের চেষ্টা যথাসাধ্য করিয়াছি। ভারতীয় সাধু সমাজের মধ্যে যাঁহারা হঠযোগী ও কায়কল্পজ্ঞ, তাঁহাদের কেহ কেহ নাকি অতি দীর্ঘায়ু ভোগ করিয়া থাকেন বলিয়া শুনা যায়। এই খবর কতদূর সত্য বলা কঠিন। যদি ইহা সত্যও হয়, তবে তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, সন্দেহ নাই। বৈদিক যুগে হয়ত এই ব্যতিক্রম সমূহ সংখ্যায় অনেক অধিক ছিল। কিন্তু মুনি-ঋষিগণ শত-শত বৎসর বা সহস্র-সহস্র বৎসর জীবিত থাকিতেন, এরূপ ধারণা বা কথা যে একান্ত ভ্রমাত্মক, এবং একেবারেই প্রমাণসহ নয়, ইহা ধ্রুব সত্য। রামায়ণের উক্তি অনুযায়ী, মহারাজ দশরথ শত-শত বৎসর বা সহস্র-সহস্র বৎসর জীবিত ছিলেন ("প্রাপ্য বর্ষসহস্রাণি বহূন্যায়ূংষি জীবিতঃ।"), আর তৎপুত্র শ্রীরামচন্দ্রও ১,০০০ বৎসরাবধি এই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলেন ("দশবর্ষ-সহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ"।), বা ১০০০০ বৎসরকাল কেবল রাজত্বই করিয়াছিলেন, এরূপ ধারণাও পরিপাক করা একেবারেই অসম্ভব। ইহা নিছক মাত্রাজ্ঞা-ন

বর্জিত অতিশয়োক্তি। পুরাণের রাজবংশ-তালিকা অনুযায়ী, প্রতি পুরুষের গড়ে ২৫ বৎসর হিসাবে রাজত্ব ধরিয়াও, মনু হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যবংশের শেষ রাজা সুমিত্র পর্য্যন্ত, গোটা সূর্য্যবংশের রাজত্বকালও সম্ভবতঃ ৩৫০০ বৎসর হইবে না। কথিত হয় যে, পাটলিপুত্র-রাজ মহাপদ্ম নন্দ আক্রোশ বশে উত্তর ভারতের সমুদয় প্রাচীন রাজ-বংশকে সমূলে ধ্বংস করিয়াছিলেন। কোন কোন পুরাণে এজন্য মহাপদ্মনন্দকে দ্বিতীয় পরশুরাম নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, নানা অবিশ্বাস্য কাহিনী সংযোজিত থাকিলেও, বৈদিক যুগের অতি অল্পসংখ্যক ঋষি, রাজা ও যোদ্ধার অতি-দীর্ঘায়ু লাভের কথাই বেদ-মন্ত্রে অথবা পরবর্ত্তী প্রবাদে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে নিঃসন্দেহে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, মুষ্টিমেয় এই কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া বৈদিক যুগের অপর কোনও প্রখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রাচীনকালে অতি-দীর্ঘায়ু লাভের কোন নজীর হয়ত ছিলনা। আর প্রাচীন যুগের ভারতীয় ঋষি ও আচার্য্যগণ নিজেরাও সম্ভবতঃ একথা বিশ্বাস করিতেন না যে, কোন মানুষ একটানা শত-শত বৎসর অথবা সহস্র-সহস্র বৎসর ধরিয়া জীবিত থাকিতে পারে।

একটি কুসুম গাঁথি মালা

কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চলমতি প্রকৃতি যে চির চঞ্চল
তারপরে শরতের ওড়ে অঞ্চল।
বাগিচায় সবুজের
ফুল ফোটে অবুজের
বুল বুল কণ্ঠীর গীতি পরিমল
কে তুমি দাঁড়ালে এসে স্নিগ্ধ বিমল।

জেগে ওঠে শিহরণে কুঞ্জ-বীথি,
মাঝে পথ যেন কোন তন্বী সীঁথি।
মোর গৃহ প্রাঙ্গনে
ফুল ফোটে অঙ্গনে
কে তুমি দাঁড়ালে এসে কোন অতিথি
চরণের রুনু ঝুনু বাজিছে নিতি।

আনমনে পথ মাঝে কে তুমি বালা?
চকিত চাহনি তব রূপেতে আলা।
তোমারে দেখিনি কভু,
মনে হয় চিনি তবু,
নদীপথ বাঁকে কাশ প্রদীপ জ্বালা
একটি কুসুমে তাই গেঁথেছি মালা।

আজ আমি পথ চলা গিয়েছি ভুলে
তোমার খোঁপার ফুল নিয়েছি খুলে।
আজ কোন ভরষায়,
মন যেন ঝরষায়
কোন সে নিয়তি ভাঙা স্বপন মূলে
মুকুরের ছায় কার অনন দুলে।

চমৎকার! অপূর্ব! কী অদ্ভুত সুন্দর!

সৌন্দর্য সম্পর্কীয় অন্যান্য বিশেষণগুলি ভাষার অভাবে আর প্রকাশ করা সম্ভব হলনা। শুধু মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম বনভূমির পটভূমিকায় সেই অনির্বচনীয় দৃশ্যাবলীর দিকে।

কিছু দূরেই ধূসর গম্ভীর পর্বতমালা। তারি কোলে পলাশ শিরীষ কৃষ্ণচূড়ার প্রগল্‌ভ বর্ণাঢ্যতা, পল্লব কিংশুকের শ্যামল মুখরতা। পাহাড় থেকে নেমে আসা স্রোতধারার জলতরঙ্গ, গোধূলি-সন্ধ্যার মায়াবী আলোকচ্ছটায় এক হয়ে জড়িয়ে সব মিলিয়ে এমন সুন্দর জায়গাটাকে স্বর্গোদ্যান বলে মনে করলেও যেন এমন কিছু ভুল হয় না।

আমার বিহ্বলতায় মুখ টিপে হাসল শুভা! সে হাসির মানে, কেমন, বলেছিলাম কিনা? গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে চলতে চলতে বলল এদিকে এসো। ওই ফুলের বাগানটা দেখছো? ওই যে ওই বড় বড় গাছগুলোর আড়ালে। ওই দিকে একটা ছোট্ট পর্ণকুটির আছে। সেটাও বড় কম সুন্দর নয়। দেখলে দুচোখ জুড়িয়ে যাবে। ভারী চমৎকার বাড়িটা।

…বাড়ি! এখানে এই নির্জন প্রান্তরের, বনের মধ্যে? আশে-পাশে কয়েক মাইলের মধ্যে মানুষের চিহ্নও তো চোখে পড়লনা। বিস্মিত ভাবে শুভার নির্দেশে এগিয়ে গেলাম। আচ্ছাদিত বৃক্ষ ছায়ায় লতাপাতায় দূর থেকে দেখা যায় না। পড়ন্ত বেলার আবছা আলোয় নজরে পড়ল কাছে যেতেই। পর্ণকুটিরই বটে। ছোট্ট একখানা বাড়ির মত। শক্ত মাটির উঁচু ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। গরাণ কাঠের খুঁটিতে মাটির প্রলেপ দেয়া। টালির ছাত। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন উঠোন। চারধারে কাঁটা লতার বেড়ায় অজস্র নীল রংয়ের ফুল। যেদিকে তাকাও, ফুল আর ফুল। পৃথিবীতে এত রংয়ের, এত বিচিত্র রকমের ফুলও আছে!

শুধু ফুলের নয়, সব্জীর বাগানও আছে। আরো কি কি সব গাছ, ভাল করে বোঝাও যাচ্ছে না। অজস্র গাছ-পালার ছায়ায়, ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন বাড়িটাকে ঠিক যেন মুনি ঋষিদের আশ্রম বলে মনে হচ্ছিল।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, কী চমৎকার বাড়িটা! শুভা বৌদি, এ কিন্তু তোমার ভারী অন্যায় এমন একটা দেখবার জিনিষ তুমি এতদিন আমাকে দেখাও নি। শুধু পাহাড় নদী মন্দির পার্টি পিকনিক—। আচ্ছা ওখানে মানুষ থাকেন কি করে? এদিকে তো লোকজন কেউ থাকেনা দেখছি।

না কেউ থাকে না। তবে ওই শালবনের ওদিকটায় সাঁওতাল আর আদিবাসীরা থাকে। এখানে সমাজ সভ্যতা খুঁজে পাবেনা তুমি।

বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে এই পাহাড় ঘেরা ছোট্ট জায়গাটার অদ্ভুত চার্ম আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। আমি সহরের মানুষ। ইট কাঠ কংক্রীটের দেশ থেকে খাঁচা খোলা পাখির মত এই অতি সুন্দর পাহাড়ী জায়গাটায় এসে যেন ডানা মেলা পাখির মতই উড়ে বেড়াচ্ছিলাম কদিন ধরে। জ্যাঠতুতো দাদা বৌদির কাছে এসেছি দিন কুড়ি হল। ওদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু এবং দর্শনীয় স্থানগুলি সবই দেখেছি। কিন্তু সহরের শেষপ্রান্তে নদীর ধার ঘেঁষে একেবারে পাহাড় আর অরণ্যের কোলে এই অপরূপ শান্ত সৌন্দর্যময় জগতে আজ প্রথম পা ফেললাম। বড়দা অন্য জায়গায় বদলি হয়ে যাবেন এবার। এখানকার বাসের মেয়াদ ফুরোনোর খবর জানিয়ে শুভাবৌদি মাথার দিব্যি দিয়ে আমাকে আসতে লিখেছিল। ওরা এখানে থাকলে হয়তো কোনকালেই আমার এখানে আসা সম্ভব হতনা। কিন্তু ওদের বদলির খবর পেয়ে শেষ পর্যন্ত না এসে পারলাম না।

দিন পনেরো থাকব বলে এসেছিলাম। কিন্তু শুভাবৌদি ছাড়লনা। কুড়ি একুশ দিন হয়ে গেল ওর ভালবাসার অত্যাচারে। তবে এবার যেতেই হবে। সবাইকেই। আমি কলকাতায়। আর ওরা জব্বলপুরে।

শুভাবৌদি আমার মুগ্ধ বিহ্বলতা উপভোগ করছিল। হেসে বলল, জায়গাটা সুন্দর, বাড়িটা সুন্দর, দৃশ্যাবলী অতুলনীয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশী সুন্দর এ বাড়ির বাসিন্দা দুটি। দেখলে তুই অবাক হয়ে যাবি রুমা। এত বয়স হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর, অথচ—কী সুন্দর চেহারা দুজনেরই।

স্বামী স্ত্রী! তাহলে এটা সাধু-টাধুর আশ্রম নয়? আমি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালাম বৌদির দিকে।

শুভাবৌদি ঘাড় নাড়ল। না। একটি বয়স্ক পুরুষ আর তাঁর স্ত্রী এই দুজন মানুষ এখানে থাকেন। কী বলবো তোকে, কী দারুণ চেহারা দুজনের! তবে বাড়ি থেকে বেরোন না। বড্ড আনসোস্যাল। অথচ সাধন ভজন বা ঠাকুর দেবতা নিয়ে মাতামাতিও করেন না। সহরের কারু বাড়িতে পার্টিতে পিকনিকে ফাংশনে মন্দিরে কোনদিনও ওঁরা যান না। বহুবার ওঁদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে। তোর বড়দাও যেচে এসে আলাপ করে আমাদের বাড়িতে যেতে বলেছিলেন। আমিও এসেছিলাম ওর সঙ্গে। কিন্তু ভদ্রমহিলা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ঘোর পর্দানশীনা দেখলাম। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে চাননা। কথাও বলেন না। প্রথম প্রথম অনেকেই যেত। কিন্তু ওঁদের ওই রকম ব্যবহারে এখন আর কেউ ওখানে যায়না।

প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সাধু সন্ন্যাসীরা ওই রকম হন। সমস্ত প্রলোভন থেকে নির্জনে দূরে সরে থাকেন। গম্ভীর ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করলাম আমি।

হবেও বা। কে জানে? স্ত্রীলোক আবার স্বামী নিয়ে কবে কোথায় সাধু হয়েছে, জানিনা। দেখিওনি। পুলিশ অফিসার পূর্ণবাবু বলছিলেন, নিশ্চয় একটা এমন কোন গুরুতর কারণ আছে, যার জন্যে ওঁরা এমনভাবে আত্মগোপন করে আছেন। ওঁদের কোন চিঠিপত্রও আসেনা। কোন আত্মীয়-স্বজনও কখনো দেখা করতে আসেনা। অথচ বহুদিন ধরেই নাকি ওঁরা এখানে আছেন।

রাখ তোমার ওই পূর্ণবাবুর কথা! পুলিশের লোক তো? সন্দেহ করা ওদের পেশা। হয়তো দুজনে কোন কারণে সংসার সমাজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে একটু শান্তির আশায় এখানে আছেন। হয়তো ছেলেপুলে মারা গেছে, সেই শোক পেয়েছেন, আরো অনেক ঘা খেয়েছেন। মানুষের জীবনে কত মর্মান্তিক যন্ত্রণাই তো থাকতে পারে! কত দুর্ঘটনা ঘটতেও তো পারে!

শুভা বৌদি উদাসীনভাবে সায় দিল, হতেও পারে।

আচ্ছা, একবার দেখা করব ভদ্রমহিলার সঙ্গে? বাড়ি ঢুকব?

উঁহু-হুঁ। ও মতলব করনা। ভয়ঙ্কর অভদ্র ওরা। শুভা বৌদির গলায় একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ল। সাধু সন্ন্যাসীরাও এত অসামাজিক এত অমিশুক নন। ভদ্রলোকটি যদিওবা দু একটা কথা বলেন, মহিলাটি যেন হারেমের বোরখা পরা বেগম। লোকজন দেখলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। ওমা! দেখ দেখ রুমা, কত লাল লাল কুঁচ। খুকুটা কবে থেকে বলেছে কুঁচ কুড়িয়ে আনতে মনেও থাকেনা।

ভুভাবৌদি তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারের গাছটার তলায় লাল কালোয় মেশানো ছোট্ট ছোট্ট কুঁচ কুড়োতে লাগল। আমি অসীম কৌতূহলভরে আবার প্রশ্ন করলাম ভদ্র-লোকের নাম কি বৌদি?

নামধাম জানিনি বাপু। অত যদি সখ, যা না দু-পা এগিয়ে। রাতদিন ওঁরা বাড়ির মধ্যেই থাকেন। গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে চক্ষু সার্থক করে আয়। অনেক জায়গাই তো ঘুরেছিস কাকার সঙ্গে, তোর চেনা-জানা মানুষও হতে পারেন। যা, দেখে আয়। ততক্ষণ আমি মেয়ের জন্যে কুঁচ খুঁজি।

ঘাসের গালিচার ওপর দিয়ে, গাছের আড়াল দিয়ে আমি চলতে সুরু করলাম। গুচ্ছ গুচ্ছ বর্ণচাফুল ফোটানো লতা পাতায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ পালার ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে অতি পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনার কাছে এসে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে দাঁড়ালাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করে সূর্যাস্তের শেষ আলোয় দুজনকেই দেখতে পেলাম সেখানে। উঁচু মাটির দাওয়ার ওপর শীতলপাটি বিছিয়ে তার ওপর বসে আছেন ভদ্রলোক। নিবিষ্ট চিত্তে একটা খাতায় কি যেন লিখছেন। পাশে বসে আছেন মহিলাটি। কি যেন সেলাই করছেন ছুঁচ সুতো দিয়ে এক মনে।

দুজনের ঈষৎ অবনত মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যেন এক ভয়ঙ্কর চমক খেলাম। ওই দুটি যৌবনোত্তীর্ণ নরনারীর কাঁচাপাকা চুলে ঘেরা সুগৌর সুন্দর মুখের কুঞ্চিত রেখা-গুলি যেন চেনা চেনা মনে হতে লাগল। কত দেশ ঘুরেছি। কত মানুষ দেখেছি। জানিও না কাকে মনে রেখেছি কাকে ভুলে গেছি বিস্মরণের অগাধ সমুদ্রে। প্রাণপণে স্মৃতির গ্যালারী হাতড়াতে লাগলাম অসহায়ের মত। কোন ছবির সঙ্গেই যেন ও মুখ দুটির মিল নেই। থাকবেই বা কি করে? সময় তার ধুলোর ধূসর হাত বুলিয়ে সব ছবিগুলোকেই ঝাপসা বিবর্ণ করে রেখে গেছে। সে অস্পষ্টতা ভেদ করে চেনার সাধ্য কোথায় আমার?

তবে কি ওঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াব? প্রশ্ন করব?

না না। সেটা উচিত হবে না। হয়তো এই অসামাজিক মানুষ দুটির আত্মগোপনের কোন কারণ আছে—হয়তো—

হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ আছে। কারণ আছে এমন ভাবে লুকিয়ে থাকার।

আরেকটা প্রচণ্ড শক্ খেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছবির ওপরকার ধুলোর আস্তরণ সরে গেল। এতক্ষণে ভদ্র-লোকটিকে নয়—ভদ্রমহিলাটিকে চিনতে পারলাম। উনি তেজপুরের শ্রীমতী নীহারকণা গাঙ্গুলী। কলকাতার মিলিটারী কনট্রাকটর সুব্রত গাঙ্গুলীর স্ত্রী। স্বামী ত্যাগ করে যিনি কলকাতা থেকে আবার তেজপুরে চলে এসেছিলেন। চরিত্রহীন ভ্রষ্টা মেয়েমানুষ বলে যাঁর দুর্নামের অন্ত ছিল না। রূপযৌবনের দুর্নিবার আকর্ষণে যিনি ওখানকার বহু পুরুষের সর্বনাশ করেছিলেন। বহুদিন ধরে বহু আলোচনার কেন্দ্র হয়ে অজস্র নিন্দা কলঙ্ক কুৎসার বোঝা মাথায় নিয়ে হঠাৎ একদিন নিজের ওপর একটা প্রগাঢ় অন্ধকারের যবনিকা টেনে তিনি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন চিরকালের মত।

আজ এখানে প্রায় সতেরো আঠারো বছর পার হবার পর এমনভাবে ওঁর দেখা পাব এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। গ্রহ নক্ষত্রের চক্রান্তে অসম্ভবও সম্ভব হয়। সংসারের এই অঘটনগুলোই বোধহয় ঘটনার রূপ ধরে দেখা দেয় মানুষের জীবনে।

বাবার সঙ্গে জলপাইগুড়ি থেকে বদলি হয়ে তেজপুরে আসা, আমি তখন নেহাৎ নাবালিকা। মানুষের জীবনের বৃহত্তর ট্রাজিডি অথবা কমেডির আস্বাদ কাঁচা পেয়ারা কামরাঙ্গা আর টক কুল তেঁতুলের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রেম ভালবাসা বিরহ মিলন—এই সব গূঢ় শব্দের মর্মার্থ বোঝার ক্ষমতা তখন ছিল না। তবে ছিল অসীম কৌতূহল। যেটুকু ওই বয়সে থাকা উচিত, তার চেয়েও বেশী। সব কথা শোনা চাই, বুঝি বা না বুঝি। তার সব কিছু দেখা চাই, অবশ্য সম্ভব হলে।

তেজপুরে তখন নীহারকণা একটা নাম। তখনো ডিভোর্স' বা বিবাহবিচ্ছেদের কথা বড় একটা কেউ জানত না। অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপারেও স্ত্রী স্বামীকে অথবা স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করত না। সেই সময়ই আমরা শুনেছিলাম নীহারকণার কথা। ওখানকার আবগারী ডিপার্টমেন্টের সরকারী কর্মচারী জগৎবাবুর একমাত্র মাতৃহীন কন্যা নীহারকণা নাকি তার স্বামীকে ত্যাগ

করে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে। আর কখনো সেখানে ফিরে যাবে না। সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়েছে সে সুব্রতর সঙ্গে।

এই ঘটনার বছর দশেক আগে নীহারের বিয়ে হয়েছিল। জগৎবাবু খুব ঘটা করেই একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। সহরসুদ্ধ বাঙ্গালীপরিবার নিমন্ত্রিত হয়েছিল। প্রচুর যৌতুক গয়না ফার্ণিচার দিয়েছিলেন। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজেছিলেন বহুদিন ধরে। জামাই পেয়েছিলেনও মনের মত। অত্যন্ত সুদীর্ঘ সুদর্শন চেহারা। মিলিটারি কনট্রাক্টর। দুহাতে পয়সা রোজগার করেন। অভিভাবক বলতেও বাবা মা দূরে থাক তেমন কেউ নেই শ্বশুরবাড়িতে। মেয়ে গিয়েই ঘরের কর্ত্রী হবে।

নীহারকণাকে আমি যখন প্রথম দেখি, তখন আমি নেহাৎ নাবালিকা হলেও উনি তখন পরিণত যৌবনা। সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল ওঁর, যদিও গায়ের রং, চুল, নাক মুখ চোখ একেবারে নিখুঁত ছিল না। কিন্তু ওঁর দেহের গড়নটা ছিল উত্তেজক। হয়তো পুরুষদের আকর্ষণ করা বা তাদের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত। স্বভাবও ছিল উচ্ছল। বাবার অতিরিক্ত মাত্রায় আদর প্রশ্রয় পেয়ে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন নীহার ছেলেবেলা থেকেই। স্বামী ত্যাগ করে অভিভাবকহীন সংসারে ফিরে আসার পর দেখা গেল চূড়ান্ত রকমের উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছেন তিনি। সর্বদাই ওঁকে ঘিরে কোন না কোন পুরুষ। সবার চোখের ওপরেই তাদের সঙ্গে বেড়ানো গল্প করা এখানে ওখানে যাওয়া আসা করতেন তিনি চক্ষুলজ্জার বালাইটুকু ঘুচিয়ে। কাউকে গ্রাহ্য না করে।

সামাজিক জীবনে, এতবড় উচ্ছৃঙ্খলতা অন্যায় চাপা রইলনা। চারদিকে ছি ছি রব উঠল। নানাজনে আড়ালে সামনে নানা কথা বলতে লাগল। সুব্রত গাঙ্গুলী কয়েকবার ওকে নিতে এসে ফিরে চলে গেলেন ব্যর্থ অপমানিত হয়ে। স্বামীকে তাড়িয়ে কলঙ্কের অলঙ্কার সর্বাঙ্গে জড়িয়েও কিন্তু ওখানে বেশীদিন থাকতে পারলেন না নীহারকণা। সামাজিক শাসনের প্রবল চাপে, জগৎবাবুর কঠিন তিরস্কারে একদিন গভীর রাত্রের অন্ধকারে তেজপুর ছাড়লেন উনি। কে জানে, অগণ্য প্রেমিকদের মধ্যে কোনটির সঙ্গে।

আস্তে আস্তে একদিন নীহারকণা সম্বন্ধীয় প্রবল আন্দোলন আলোড়ন শান্ত হল। স্বাভাবিক নিয়মে সহস্র ঢেউয়ের তরঙ্গে মিশে গেল হারিয়ে গেল একটি বুদ্বুদ।

শুধু নীহারকণাকে নয়। অত্যন্ত সুপুরুষ সুব্রত গাঙ্গুলীকেও আমি দেখেছিলাম। ওঁদের মনোমালিন্য, বিচ্ছেদ সম্বন্ধে তখন যা শুনেছিলাম সেই বয়সের পক্ষে সেটা অত্যন্ত অস্পষ্ট, সামান্য এবং অসম্পূর্ণ। কিন্তু পরে, জ্ঞান বুদ্ধি এবং বয়সটা বেশ কিছু বাড়লে কলকাতায় হঠাৎ নীহারকণার এক আত্মীয়ার কাছ থেকে সব কথা শুনেছিলাম। শোনার পর গভীর বেদনার সঙ্গেই সেই কাহিনী চাপা দিয়ে রেখেছিলাম মনের মধ্যে কল্পনাও করিনি, আজ এত বছর কেটে যাবার পর, বাংলাদেশ থেকে বহু দূরে হাজারীবাগের এই পাহাড় অরণ্য ঘেরা সহরটার শেষ প্রান্তে হঠাৎ আবার দেখা হয়ে যাবে ওঁর সঙ্গে। নতুন করে নীহারকণা গাঙ্গুলীর স্মৃতিচারণ করতে হবে তারি বাড়ির কাছে গাছের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে।

মিলিটারি কনট্রাক্টর সুব্রত গাঙ্গুলীর পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গের এক পড়তি জমিদার বাড়ির উত্তরপুরুষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি মিলিটারিতে মাল সাপ্লাই করতেন। দুর্মুখেরা বলে, রসদ জোগানোর কাজটা শুধু নীরস বস্তুতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। রসবতীদের সন্ধানও নাকি তিনি দিতেন। দু-হাতে পয়সা রোজগার করার এটাও নাকি তাঁর একটা অন্যতম কারণ ছিল।

রূপ যৌবন এবং প্রচুর অর্থ সুব্রতর এই তিনটিই ছিল। জগৎবাবু পাত্র দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। নীহারকণাও মুগ্ধ হলেন। সুতরাং একদা শুভলগ্নে নীহারকণা রায় গাঙ্গুলী হয়ে কলকাতায় সুব্রতর নতুন বাড়িতে এসে প্রবেশ করলেন রাজরাণীর মত।

মনের মত স্বামী পেয়ে যথার্থ সুখী হয়েছিলেন তিনি। স্বামীকে ভালও বাসতেন যে কোন স্বামীসোহাগিনী রমণীর মত। সুব্রতও নীহারকে ভালবাসতেন সমস্ত প্রাণমন দিয়ে।

সুখে আনন্দে ওঁদের দিন কাটতে লাগল। কিন্তু একদিন এই চরম এবং পরম আনন্দেও কেমন যেন শূন্যতার ভাব দেখা দিল। নীহার ঝিমিয়ে পড়তে লাগলেন। অর্থে অলঙ্কারে বাড়ি গাড়িতে দাসদাসীতে এমন কি স্বামী-

কেও যেন ক্রমে ক্রমে অরুচি বোধ হতে লাগল। অসুখী মনে হতে লাগল।

নীহারের কোলে সন্তান এলোনা। একান্ত কামনা, আকুল প্রার্থনা সত্ত্বেও।

প্রথম প্রথম ভাগ্যকে দোষ দিলেন। তাবিজ কবচ দেবতার দোর ধরা এখানে ওখানে দেশে বিদেশে যাবতীয় সন্তান বরদাত্রী দেবদেবীর কাছে ছুটোছুটি করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা।

সুব্রত সান্ত্বনা দিতেন। নাই হল ছেলেপুলে। তুমি আর আমি আছি। এটাই যথেষ্ট। আমাদের ভালবাসাই যথেষ্ট।

কিন্তু পুরুষের পক্ষে যা যথেষ্ট, মেয়েদের পক্ষে তা সামান্য। বিশেষ করে অন্তঃপুরচারিণী নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোকের পক্ষে তো বটেই।

এ যুগের আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ে হলে নীহারও হয়তো এই কথাই বলতেন, না হয় নাই হল ছেলেমেয়ে। আমার রয়েছে কর্ম আমার রয়েছে বিশ্বলোক। আমার শূন্যতা পুর্ণ করে নেব বাইরের কাজের মধ্যে দিয়ে কিন্তু নীহার-কণা তা বলেন না। তাঁর মন বলতে লাগল, তোমার তো অনেক কাজ। অনেক বন্ধু বান্ধব। কাজের মানুষ তুমি। কিন্তু আমি? আমি কি নিয়ে থাকব? কি করব সমস্ত দিন? কী দিয়ে ভরাব নারী জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা, শূন্যতা?

কলকাতায় নীহারের বাবা মাঝে মাঝেই মেয়েকে দেখতে আসতেন। দুচারজন আত্মীয়ও ছিল। একমাত্র মেয়ের নিদারুণ সন্তান আকাঙ্ক্ষা ওদের বিচলিত করে তুলেছিল। ওঁরা এটাও লক্ষ্য করেছিলেন সুব্রত নীহার-কণাকে সুখে রাখার জন্যে যতই চেষ্টা করুন না কেন, সন্তানহীনতার চিকিৎসা করানোর জন্যে কোন বিশেষজ্ঞ গাইনোকলজিষ্ট দেখানোর জন্যে উনি ততটা উদ্‌গ্রীব নন। একমাত্র নিজের ঘনিষ্ঠ পরিচিত ও অন্তরঙ্গ ডাক্তার ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে আমলই দেননি উনি। শ্বশুর জগৎবাবুর বহু অনুরোধ এড়িয়ে চলতেন তিনি। এ প্রসঙ্গ নিয়ে কোন কথাও আলোচনা করতে চাইতেন না কারুর সঙ্গে।

এই অদ্ভুত ব্যাপারটা নীহারকণাকেও বিচলিত করে তুলেছিল। স্বামী কেন যে তাঁর পরিচিত বন্ধু ডাক্তার ছাড়া অন্য ডাক্তার দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করান না, এটা তাঁর কাছেও দুর্বোধ্য ছিল। তিনি স্বাস্থ্যবতী। নীরোগ। দেহেমনে ভয়ঙ্কর রকম সুস্থ। শারীরিক অসুস্থতার কোন চিহ্নই তাঁর কোথাও নেই। তবে কেন এ বন্ধ্যাত্ব? কি কারণ এর? সুব্রতই বা এ ব্যাপারে এত উদাসীন কেন?

সন্তান না হবার প্রকৃত কারণ জানবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন নীহার। তাই বাবার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে, সুব্রতকে না জানিয়ে, কলকাতার সব চেয়ে নামী ও দামী গাইনোকলজিষ্টকে দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করিয়ে এলেন তাঁর চেম্বারে গিয়ে।

ডাক্তার নীহারকণার অনবদ্য স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ বিস্মিত হয়েছিলেন। ভালো করে পরীক্ষা করার পর বেশ দৃঢ় এবং নিশ্চিন্ত ভাবে জানালেন, নীহারকণার সন্তান না হবার কোনো কারণই নেই। কোন খুঁৎ নেই শরীরে। বরং উনি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন, এতদিন কেন হয়নি এই কথা ভেবে। ডাক্তার আরো জানালেন, নীহারের স্বামীকে উনি পরীক্ষা করতে চান। দোষ হয়ত তাঁরই। এবং এই পরীক্ষা করার ব্যাপারটাও এমন গুরুতর নয়। বরং অতি সামান্য।

কিন্তু এই অতি সামান্য ব্যাপারটা কেমন করে সুব্রত গাংগুলির কাছে অসামান্য হয়ে উঠল। অতি সুখের শান্তির বিবাহিত জীবনের বেশ কয়েকটা বছর কাটিয়ে দেবার পর হঠাৎ এই ঘটনার পর থেকেই মনোমালিন্য সুরু হল দুজনের। সুব্রত কোন মতেই নিজেকে পরীক্ষা করাতে দিতে রাজী হলেন না। কপালের দোষ, ভাগ্য, পূর্বজন্মের কর্মফল, ইত্যাদির দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। বহু ব্যবহৃত এই কথাগুলিই শোনাতে লাগলেন স্ত্রীকে। যা হবার নয়, তা কোন মতেই হয় না। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হত, কপালে থাকত, নিশ্চয় করেই হয়ে যেত।

এতদিন এ কথায় কাজ হয়েছে। এখন কিন্তু কোন ফলই হল না। তুমুল অশান্তির সৃষ্টি হল। এবং শেষ পর্যন্ত নীহারকণার কান্নাকাটিতে, জগৎ বাবুর এবং অন্যান্য আত্মীয়দের প্রবল চাপে পড়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় রাজী হতে হল সুব্রত গাঙ্গুলীকে।

ওঁদের ধারণাই সত্যি হল। মেডিকেল রিপোর্টে

জানা গেল, সব দোষই তাঁর। নতুন যৌবনে মিলিটারীর কাজে বহু জায়গায় ঘুরেছেন। বহু দেশী বিদেশী মানুষদের সঙ্গে মিশেছেন। তাদের সংস্পর্শে অসংযমের গভীর গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান হয়েছিল বেশ কিছু কাল পর। চিকিৎসাও করিয়েছিলেন। সেই চিকিৎসার ফলে পুরুষোচিত ক্ষমতা থাকলেও সন্তান উৎপাদন করবার জীবাণু—পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হারিয়েছিলেন। নিজের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে নিজের সর্বনাশ করেছিলেন সুব্রত গাঙ্গুলী।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি বলে একটা কথা আছে। মেডিকেল রিপোর্টের খবরটা জানাজানি হবার পর নীহারকণা প্রজলন্ত অগ্নিশিখার মতই জ্বলে উঠলেন। ছেলে বেলায় মা মারা যাবার পর অতিরিক্ত আদরে প্রশ্রয়ে মানুষ হবার ফলে শিশুকাল থেকেই ওর স্বভাবটা অত্যন্ত জেদী এক-গুঁয়ে প্রকৃতির ছিল। এতদিন চাপা পড়ে থাকা সেই তীব্র জেদ আর একগুঁয়েমি হঠাৎ মাথাচারা দিয়ে উঠল। এতদিন স্বামীকে দেহ মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন, সেবা যত্ন ভক্তিশ্রদ্ধা করে এসেছেন যে কোন সাধ্বী স্ত্রীর মত, একমুহূর্তে সেই প্রেম ভালবাসা রূপান্তরিত হল সুতীব্র ঘৃণায় বিতৃষ্ণায়। সুব্রতর বিবাহ-পূর্ব জীবনের অতি সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখা অতি কুৎসিত কলঙ্কিত অতীতটার নগ্নমূর্তি হঠাৎ এতদিন পর জানতে পেরে মস্তিষ্ক বিকৃতির উপক্রম ঘটল নীহারকণার।

বেইমান বিশ্বাসঘাতক! চরিত্রহীন লম্পট। এতবড় একটা মিথ্যে দিয়ে ছলনা দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রেখে-ছিল। এতকাল সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আমি ওকে বিশ্বাস করে ভালবেসে এসেছি। সমস্ত জেনেশুনে কেন ও আমার এত বড় সর্বনাশ করল? ওর ঘর আমি আর করবনা। ওর মুখদর্শনও করবনা আর কোনদিন।

স্বামীর এতবড় অপরাধ ক্ষমা করতে পারলেন না নীহারকণা। জগৎবাবুর সঙ্গে তেজপুর চলে গেলেন। কোন বাধা মানলেন না।

স্বামীর দেয়া এতবড় আঘাত সহ্য করবার মত মানসিক গঠন বা প্রস্তুতি তাঁর চরিত্রে ছিলনা।

বাপের বাড়ি অবারিত স্বাধীনতা। মাথার ওপর এক-মাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। তিনিও প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন একমাত্র কন্যার এই চরম বিপর্যয়ে। সুতরা মেয়ে যাতে সুখে থাকে, ভুলে থাকে, এজন্যে চেষ্টার ত্রুটি করলেন না।

ধাপে ধাপে উচ্ছৃঙ্খলতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছতে লাগলেন নীহারকণা। বোধহয় স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নেবার সাংঘাতিক মনোবৃত্তিই তাঁকে দ্রুত অধঃপতনের পিচ্ছিল পথে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

অপরাধী সুব্রত গাঙ্গুলী অনুতাপে অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন চিঠি লিখে লিখে। কয়েকবার আনতেও গেলেন। কিন্তু কোন লাভ হলনা। সুব্রতর প্রতি একদা অতি অসম্ভব উদ্দাম উত্তরঙ্গ প্রেম ভালবাসা হঠাৎ যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তাঁর হৃদয় থেকে। স্বামীর প্রতি মায়া দয়া করুণা সব হারিয়ে তিনি যেন এক বোধহীন চেতনাহীন পাথরের প্রতিমায় রূপান্তরিতা হয়ে গিয়েছিলেন।

চরম অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে শেষবার তেজপুর থেকে, নীহারকণার কাছ থেকে ফিরে এলেন সুব্রত গাঙ্গুলী। দিনের পর দিন কাটল। মাস কাটল। বছর ঘুরল। কোন খবর দিলেন না। তারপর অনেকদিন বাদে নীহার-কণা হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেন। সেই চিঠিই সুব্রতর শেষ চিঠি।

সুব্রত লিখেছিলেন, "তিনি অন্যায় করেছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি অনুতপ্ত। নীহারকণা সম্বন্ধে অনেক কুৎসা কলঙ্কের কাহিনী তিনি শুনেছেন। চিঠিও পেয়েছেন তেজপুর থেকে। কেন নীহার এমন করছে, কেন সে বহু পুরুষের সঙ্গে মিশছে? যদি সন্তান কামনাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে পছন্দমত ও মনোমত কাউকে সে বেছে নিক। সন্তান ধারণের জন্যে স্ত্রী-লোকের মাত্র একটি পুরুষেরই প্রয়োজন। তাকে বিয়ে করতে চায়, করুক। তবে সুব্রতর একটি অনুরোধ আছে নীহারের কাছে। যদি সে বিয়ে না করে, তবে সেই সন্তানের সম্পূর্ণ ভার এবং দায়িত্ব সুব্রত আনন্দের সঙ্গে নেবেন চির দিনের জন্য।"

সুব্রত আরো লিখেছিলেন "তিনি অতীতে যাই করে থাকুন না কেন, নীহারকণাকে প্রাণ দিয়েই ভালবেসে-ছিলেন। সে ভালবাসায় বিন্দুমাত্র খাদও যে নেই, একথা

নীহারের চেয়ে আর কে বেশী জানে! নীহার-হীন জীবন তাঁর কাছে মৃত্যুর মতই অন্ধকার। কাজকর্ম অর্থ বিত্ত কোন কিছুতেই তাঁর আর মন নেই। সব ছেড়ে দিয়ে তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বহুদূরে। যদি কোনদিন নীহার তাঁকে ক্ষমা করতে পারে যদি কোনদিন কোন প্রয়োজন হয় নীহারের, সে যেন কলকাতার ঠিকানায় তাঁকে চিঠি লেখে। তিনি যেখানেই থাকুননা কেন, সে চিঠি পাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবেন। তাঁর ঘরের দরজা চিরদিনই নীহারের জন্যে খোলা থাকবে।"

নীহারকণার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়াটি, যার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল হঠাৎ একটা পার্টিতে, তার কাছ থেকেই আমি সমস্ত জানতে পেরেছিলাম। সুব্রত গাঙ্গুলীর শেষ চিঠি খানার ভাষা শুনে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম এই কথা লিখেছিলেন ভদ্রলোক? আশ্চর্য তো!

সংসারে আশ্চর্য এবং অঘটন বলে বোধ হয় কিছুই নেই। ভদ্রমহিলা মুখ টিপে হাসলেন।

কি বলতে চান আপনি? আমার সকৌতুহল প্রশ্ন।

তুমি জাননা, এই চিঠির চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা নীহার-কণার জীবনে ঘটেছিল।

কী—কী ঘটেছিল? আমি প্রায় ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তেজপুর থেকে একদিন নীহার পালিয়ে যান তার একজন প্রেমিকের সঙ্গে। একথা সবাই জানতো।

আমরাও জানতাম।

তারপর কী হয়েছিল, জানো?

কি করে জানব? আমরা বদলি হয়ে চলে গিয়েছিলাম ওখান থেকে। কেন আপনি জানেন না? আমি জানালাম।

অনেক কালের কথা। ঠিক মনে নেই। নীহারেরও কোন সঠিক খবর বহুকাল জানতামনা। তবে শুনেছিলাম, যার সঙ্গে পালিয়েছিল, সে লোকটা খুব নোংরা প্রকৃতির ছিল। কিছুকাল ভোগদখল করার পর ওকে চরম অবস্থার মধ্যে নামিয়ে তারপর একদিন অন্তর্ধান করেছিল।

ওঃ! এই ব্যাপার! আমি হতাশ হলাম। এটা এমন একটা আশ্চর্য ঘটনা নয়। বরং অতি চলিত ঘটনা। সহজ স্বাভাবিক।

ভদ্রমহিলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন! উঁহু এটা নয়। আরো একটু আছে। শেষের পর সুরুর মত বলতে পার।

আপনি খুলে না বললে আমি অনুমান করতেও পারবনা। যদি বিশ্বাস হয়, আমাকে বলতে পারেন। কোনদিন কাউকে এবিষয়ে আমি একটি কথাও বলবনা।

বলছি বলছি! আমার অবস্থা দেখে ওঁর করুণা হল। শোন, এটা অত্যন্ত গোপনীয় কথা। সবাই জানে নীহারকণা মারা গেছে। সুব্রত গাঙ্গুলী লজ্জায় কেলেঙ্কারিতে অপমানে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছে। এটা সবাই জানলেও, আঙ্গুলে গোনা যায় এমন দু একজন কিন্তু অন্য কথা জানে।

আমি শুনেই ভুলে যাব। কথা দিলাম।

বাধ্য হয়ে অনেকদিন নরকের নর্দমায় জীবন কাটাতে হয়েছিল নীহারকণাকে। দারুন অসুখ হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। দেখবার শোনবার লোক ছিলনা। হাসপাতালে পড়েছিল অনেকদিন। শেষ অবস্থা দেখে কর্তৃপক্ষ ওঁর কাছ থেকে অনেক পীড়াপীড়ি করে ঠিকানা নিয়ে সুব্রত গাঙ্গুলীকে খবর দিয়েছিল। আশ্চর্য মেয়েদের মন! একদিন অসীম ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় যাকে ত্যাগ করে নরকে তলিয়ে যেতেও বাধেনি, মরণকালে তাকেই একবার শেষ দেখা দেখবার জন্যে লজ্জা ঘেন্না ভুলে—ভদ্রমহিলা অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে গেলেন।

তারপর কী হল! মারা গেলেন নীহারকণা! সুব্রত বাবুর সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল? তিনি এসেছিলেন হাসপাতালে!

এক সঙ্গে আমার এতগুলো প্রশ্নে সচেতন হলেন মহিলাটি। না, নীহারকণা মরেননি। তাঁকে সুব্রত মরতে দেননি। মুমূর্ষু কুৎসিত রোগজীর্ণ স্ত্রীকে লেবার ওয়ার্ড থেকে অজস্র টাকা খরচ করে কেবিনে রাখলেন। দিনেরাতে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে দুটি নার্স ঠিক করা হল। আর যতক্ষণ থাকা সম্ভব, দিনরাত্রের প্রায় সর্বক্ষণই তিনি অচেতন মৃত্যুপথযাত্রিণীর শিয়রে বসে রইলেন। তারপর নীহারকণা সুস্থ হয়ে উঠতেই ওঁকে নিয়ে

কলকাতা থেকে উধাও হয়ে গেলেন আবার। একেবারে নিরুদ্দেশ—

কোথায় গেলেন? আমি প্রায় অভদ্রতার কাছাকাছি পৌঁছতে যাচ্ছি জেনেও কৌতূহল সংবরণ করতে পারলাম না।

সে খবর জানিনা। কেউই জানেনা। যাঁরা নিজেদের প্রচ্ছন্ন রাখতে চান, সমাজ সংসারের বাইরে শান্তিতে থাকতে চান আমার মনে হয়, তাদের সেটুকু সুযোগ দেওয়া আমাদের উচিত। নয় কি?

আমি ঘাড় নাড়লাম নিশ্চয়। ভগবান ওঁদের শান্তি দিন!

আর একটা কথা···উনি একটু ইতস্তত: করলেন।

ইচ্ছে হলে বলুন। সত্য সত্যই আমার সব কৌতূহল এতক্ষণে নিবৃত্ত হয়ে গিয়েছিল। মনটা শান্ত নিরুদ্বিগ্ন।

যে কারণে সুব্রত গাঙ্গুলীর বন্ধ্যাত্ব ঘটেছিল, ঠিক সেই একই কারণে নীহারকণাও অভিশপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর জীবনে এইটাই সব চেয়ে বড় ট্র্যাজিডি। সুব্রত গাঙ্গুলী কলকাতা সহরের সবচেয়ে নামকরা গাইনোকলজিস্টদের দিয়ে ওঁকে পরীক্ষা করিয়েছিলেন, কলকাতা ছাড়ার আগে। স্বামীস্ত্রীর এমন অদ্ভুত মিল বড় একটা দেখা যায়না।

আমি ওঁর কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম।

উনি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করলেন,যে কারণে বাজারের খারাপ মেয়েদের সন্তান হয়না, নীহারকণার বেলাতেও সেই একই কারণ ঘটেছিল। বহু পুরুষের সংসর্গে, নানা কুৎসিত রোগে উনি মরতে বসেছিলেন। সেই কুৎসিত রোগই নীহারকণার ভবিষ্যৎ জীবনের সন্তানধারণের সমস্ত ক্ষমতা নষ্ট করেছিল।

এইখানেই নীহারকণা গাঙ্গুলীর প্রথম জন্মের ও জীবনের যবনিকা পড়েছিল। দেখা হওয়া দূরে থাক, তাঁর সম্বন্ধে কোন কথাই আর আমার কানে আসেনি।

আজ প্রায় সতেরো আঠারো বছর পর হঠাৎ ওঁকে দেখে চমকে উঠলাম। সমাজ সংসার থেকে ওরা স্বেচ্ছায় এই নির্বাসিত জীবন কেন বেছে নিয়েছেন, বুঝতে এতটুকুও দেরী হলনা।

এই রুমা, একেবারে তন্ময় হয়ে গেছিস দেখছি।

শুভা বৌদির হাতের ঠেলায় আমার আচ্ছন্নতা কেটে গেল।

অন্ধকার হয়ে এলো। চল বাড়ি ফিরে যাই। হাত ধরে টান মারল বৌদি।

শুভা বৌদির সঙ্গে অতি সন্তর্পণে গাছের আড়াল থেকে সরে এলাম। বাড়ি মুখো হাঁটতে সুরু করলাম নিঃশব্দে।

কী রে? চুপচাপ যে? কী ব্যাপার? তোর ভাব দেখে মনে হচ্ছে তুই ওঁদের চিনিস। দেখেছিস নাকি কখনো? চিনিস? আ: সাবধানে চলনা। লাগেনিতো পায়ে?

একটা ইঁটের টুকরো পায়ে লেগে ছিট্‌কে পড়ল। হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিলাম। টুকরো ইঁটটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম অন্ধকারে!

কীরে? চিনিস নাকি ওঁদের? শুভা বৌদি আমার মুখের ওপর সার্চ লাইটের মত দৃষ্টি রাখল।

ঘাড় নাড়লাম। না চিনি না। কখনো দেখিনি।

যা:! মুখ দেখে মনে হচ্ছে মিথ্যে কথা বলছিস।

মিথ্যে নয় বৌদি। সত্যি আমি ওঁদের চিনিনা। চল, খুকু একা বাড়ি আছে। অন্ধকার হয়ে এলো।

স্মৃতি বিস্মৃতির অন্ধকার সমুদ্রে ঘেরা একখানি অতি ছোট্ট দ্বীপ পেরিয়ে এলাম। অতি সুন্দর ফুল ফোটানো দ্বীপ।

কোনদিন ফল হবেনা ওই ফুলগুলোতে।

কিন্তু নাইবা হল! ফুলতো ফুটেছে। রাশি রাশি গুচ্ছ গুচ্ছ নানারংয়ের ফুল। শোভায় সৌন্দর্যে অতুলনীয়। অনির্বচনীয়।

রুক্ষ ধূসর এই পৃথিবীতে, এমন ফুল ফোটাতে কজনই বা পারে?

বনান্তরালে সেই ফুলে ফুলে ভরা দ্বীপটাকে অনেক পেছনে ফেলে রেখে আমরা সম্মুখে এগিয়ে গেলাম।

শেষ সম্রাট্ বাহাদুর শাহ

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বিদ্রোহ শেষ হতে-না-হতেই সম্রাট্, ষড়যন্ত্রে
ধরা পড়ে গেল অন্তর্ঘাতী নিজেদের অভিমন্ত্রে!
বহু রাজ্ঞী ও অনূঢ়া-গর্ভে জন্মিল বহু পুত্র;
সিংহাসনের লোভাতুর হয়ে ছিঁড়িল মিলনসূত্র।
সুযোগ বুঝিয়া কার্য্য হাঁসিল করে ইংরাজসৈন্য;
রাজ্ঞী বেগম করিল জাহির চরিত্রগত দৈন্য!

২

তবুও মন তো মানিতে চাহে না, ভীরু যেচে হোলো বন্দী;
ক্রমে টের পেলো সেনাপতিটার বীভৎস অভিসন্ধি।
চল্লিশ দিনে সারে বিচারের তঞ্চকতার কার্য্য!
'মেগেরা' জাহাজে রেঙ্গুনে পাঠানো শেষে হোলো
অনিবার্য্য।
বাহাদুর শাহ, মহিষী জীনৎ, পুত্র জীউয়ান বখ্ত,
জামানী বেগম, গেল খান্‌সামা আহমেদ বেগ ভক্ত।

৩

গেল ইম্‌রা'ক্ নিস্‌সান এক অনূঢ়া রূপসী সঙ্গে,
অনূঢার ছেলে শাহ আব্বাস্ সেও গেল মহারঙ্গে।
নজরবন্দী রহিল সবাই বর্ষের পর বর্ষ!
বাহিরের কেহ নাহি পেতো দেখা, হৃদয়ে ছিল না হর্ষ!
ইংরেজ সব সৈন্য শান্ত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা
ঘিরিয়া থাকিত কাঠের ঘরটা, ত্রস্ত থাকিত মনটা!

৪

মোটামুটি তবু ভালো ছিল সবে বুড়ো সম্রাট্ ভিন্ন;
দেহ মন তার ভাঙিতে লাগিল, ক্রমশঃ হোলো সে খিন্ন!
তক্তাউসে বসাতে রাজ্ঞী চেয়েছে জীউয়ান বখ্তে;
অতিলোভে তাঁতী হয়েছে নষ্ট দিল্লী ভেসেছে রক্তে!
কবরখানার বাগানের মাঝে তিন যুবরাজ-সঙ্গে
হড্‌সন গুলী মারে জীনতের সুশ্রী কোমল অঙ্গে।

৫

সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখদহন বাহাদুর শার লভ্য!
সুকবি সরল স্বদেশভক্ত বেচারা ছিল যে সভ্য!
সর্ব্বদা ছিল নজর বন্দী, কোথা গেল রাজছত্র!
লিখিতে পড়িতে মানা ছিল দিতে লেখনী কাগজপত্র!
পেতো দৈনিক খোরাকী বাবদ এগারো তঙ্কা মাত্র!
সকলে মিলিয়া খেতো তাই দিয়া, শুকালো সবার গাত্র!

জাগতিক মায়া-মমতার প্রতি আসক্তিহীন চিত্ত!
কাঠের ঘরের দো'তলায় বসি' একাকী রহিত নিত্য!
স্বরচিত সব গজলের কলি ভাঁজিত সজল নেত্রে!
কেবলি ভাবিত কতটুকু দোষ ছিল তার নিজ ক্ষেত্রে!
নির্ব্বাসনের যন্ত্রণা আর নাহি হোলো বরদাস্ত!
বাক্‌রোধ হোলো, শয্যা নিল সে, একেবারে
গেল স্বাস্থ্য!

৭

নভেম্বরের সাতই তারিখ এক-শো বছর পূর্ব্বে
কে জানিত হায়, বিদেশে হেলায় জীবন সূর্য্য ডুবেবে!
এক-শো বর্ষ পরে কবি এক বারেন্দ্র গুণমুগ্ধ
ছেড়ে আসা গ্রাম স্মরি' অবিরাম কাঁদিতেছে হয়ে ক্ষুব্ধ।
বাদ্‌শার ব্যথা বান্দা-ও বোঝে, ধনীদের ব্যথা নিঃস্বে,
তুমার সঙ্গে হয় না তুলনা যেজন ক্ষুদ্র বিশ্বে।

৮

সব চেয়ে সেরা দুঃখ এই যে—তুমি ছিলে দেশভক্ত!
হিন্দু মুসলমানের মিলনে ছিলে সদা অনুরক্ত!
দিল্লীতে কেহ গোবধ করিলে পাবে সে মৃত্যুদণ্ড,—
আদেশ জাহির করেছিলে তুমি, ছিলে না কখনো ভণ্ড!
"মুসলমানেরা এক চোখ মোর, আরেক চক্ষু হিন্দু"—
বার বার তুমি ঘোষণা করেছ, ওগো মমতার সিন্ধু!

৯

সাথে সাথে আজি ধিক্কার দিই রক্তপিপাসু ধৃষ্টে,
অতি দুর্জ্জন সেই কাপ্তান হড্‌সন-রূপী খৃষ্টে!
ক্ষুধার্ত্ত হয়ে বাদশাহ যবে খেতে মাগে এক মুষ্টি,
এক'ত্রিশটি মাথা খেতে দ্যায় কেটে যুবরাজ-গোষ্ঠী!
পাঁচটা বছর বেঁচে ছিলে তবু সহিয়া দারুণ দৈন্য!
কত না দুঃখ দিল বর্ব্বর শ্বেত সারমেয়-সৈন্য!

১০

ছিল না ভারতে সুদূর অতীতে সাম্প্রদায়িক সখ্য!
গড়িয়া ওঠেনি পরাধীনতার পাপ ক্ষালনের লক্ষ্য!
ছিল সামন্ত ভেড়াকান্তরা মশগুল পাপ-পঙ্কে!
জননীর সাথে শত্রুতা করে র'হিয়া তাহার অঙ্কে।
শিখ গুর্খারা মুক্তি আনিতে হয়নি অগ্রগণ্য।
দু-হাতে সেলাম জানায়ে, জনাব, কাঁদিব তোমারি জন্য!

পাতালরাজ্যের কথা

(মেক্সিকো)

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধ্যান নিমগ্ন নীরবনগ্ন মুনি অতীত তার শিল্প সম্ভার নিয়ে রসবেত্তাদের সামনে বসে—বর্তমান ধূমায়িত হচ্ছে তার বক্ষে—অনাগতের স্বপ্ন ভাসছে তার চোখে—এইতো একালের ছবি এ-কায়ে এ শরণ নিচ্ছে, বলছে আমি আছি—অয়মহং ভোঃ।

যুগ যুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগর তলে
কতজীবনের কতধারা এসে
মেশায় তোমার জলে।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই
ভাষা দাও তারে.........

মেক্সিকোতে সেই কথাই শুনেছি—পাথরে যা শুধু উৎকীর্ণ হয়ে নেই, আচারে ব্যবহারে ব্যবস্থায় ভাষায় ভাষায় গিঠ্ বাঁধা নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণে সেই অনাদি অতীতের পাতার পর পাতা খুলে পড়েছি আমরা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়—মহাকালের এক রসসম্ভার।

কোথায় মেক্সিকো কোথায় ভারতবর্ষ—আজকের এই গতির যুগে সকালবেলা চা খেয়ে আকাশযানে চড়লে ব্যোমবিহারী আমি হয়তো রাত্রির ডিনারটা মেক্সিকোতেই সারতে পারি। পৃথিবীর দূরত্ব হয়ে আসছে ছোট, তার দৃষ্টির পরিধি যাচ্ছে বেড়ে, তার সাহিত্য, সংস্কৃতি শিল্প চেতনার সীমানার হচ্ছে নূতন নূতন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন —বিশ্বনাগরিক হচ্ছি আমরা। তবু তারই মধ্যে এক একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ভৌগোলিক ঐতিহাসিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গভীর ধারা গড়ে ওঠে, আমরা দেখতে পাই আপনিমগ্ন একটি ধারাবাহিকতাকে, যেটি পূর্ণ হয়েছে সবার পরশে পবিত্র হয়ে। সেই রীতি ও নীতিকে ধরেই শতাব্দীর পর শতাব্দীর অস্খলিত গতি—কখনো সুপ্ত কখনো লুপ্ত, কখনো তার প্রাণধারা বালুরাশির মধ্যে উপ্ত।

প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে দ্বিপদ মানুষ কবে মেক্সিকোয় এসে পৌছল তা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। ত্রিশহাজার বছর পূর্বে বেরিং প্রণালী পেরিয়ে প্রথম পদার্পণ তার, এ অভিমত স্বীকার করে নিতে বাধা নেই। সমুদ্রপথেও যে তাদের আগমন হয়নি একথাও তামাতুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে বলা যায় না। বাত্যাবিতাড়িত সওদাগরের দল গজলক্ষ্মীর প্রসাদপুষ্ট কমলে-কামিনীর লীলা অভিরাম দেখতে দেখতে এই পাতালরাজ্যে প্রবেশ করেছিল এমন কথাও কেউ কেউ বলেন। মোটকথা খৃঃ পূর্ব ছয় হাজার বছর পূর্বে মেক্সিকোতে অতিকায় শিকারীদের (mammoth huuters) দেখা যায়, যারা মৎস্য ধরেছে খাইছে সুখে—খড়্গদন্তী (Sabre-toothed) দক্ষিণ বায়দের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ। ব্যাঘ্রবাহিনী হচ্ছে বিধ্বস্ত, তাদের অরণ্য সাম্রাজ্য হচ্ছে সংকুচিত। আগুনকে সে তখন চিনেছে, অগ্নিস্পর্শ তার হয়েছে, পশুচর্ম পরিধান করে সে স্মরণ করেছে পশুপকে। তার পরের যুগকে বলা যেতে পারে প্রাক্-কলম্বসীয় যুগ, অর্থাৎ কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের আগেকার যুগ। একে ক্লাসিকাল যুগও বলা হয়। এরও দুটি পর্ব—প্রাক্ ক্লাসিক্যাল ও পোষ্ট ক্লাসিক্যাল্। খ্রীঃপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টপর পঞ্চদশ শতাব্দী এই পাকা তিনহাজার বছরের পদযাত্রার ইতিহাস। তারপর এলো স্প্যানিয়ার্ডরা—এতো ইতিহাসের সেদিনের কথা—নাম দিলেন কর্তারা কলোনিয়াল যুগ—বৈদেশিক উপনিবেশকারীদের যুগ। বলতে গেলে যে যুগের রেশ

আজও টেনে চলেছে মেক্সিকো। যদিও ১৮২১ খৃঃ অব্দে স্পেনের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে মেক্সিকো যেদিন স্বাধীন হ'লো সেইদিনটিকে স্মরণ করে ধরা হয় তার নবযুগের ইতিহাস।

ক্লাসিকাল যুগেই আবির্ভাব হয় ময় সভ্যতার—অলমেক্ (Olmec) জাপোটেক্ (Zapotec), মিক্সটেক্ (Mixtec), টলটেক্ (Toltec), আজটেক্ (Aztec)-দের। মেক্সিকোর অরণ্যের বন্দন মর্মরে, সাগর জলের দোলালাগার ইতিহাসের এক বিচিত্র সভ্যতার ইতিকথা আমরা পাই, দেখি তার রূপায়ণ জীবন ব্যবস্থায়, শাসন প্রণালী, শিল্প সমারোহে। এর শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে আছে শুধু খাস্ মেক্সিকোই নয় পাশাপাশি গুয়াতেমেলায় (গৌতমালয় ?) হণ্ডুরাসে।

খ্রীষ্টপূর্ব অলমেক্ সংস্কৃতিকেই মেক্সিকো সভ্যতার আদি জননী বলে ধরা হয়—আমরা পাচ্ছি কৃষির প্রসার, সুপ্রজনন (fertility cult), মৃৎশিল্প ও প্রস্তরশিল্পের ধারা (Ceramics) তাছাড়া দিবসরাত্রি গণনার পদ্ধতি, চিত্রবর্ণ লেখলিপির উদ্ভবও এই সময়। প্রথম পিরামিড প্রণেতারা ছিলেন এই যুগের। লাভেণ্টা নামক একটি স্থানে দেখা যায় একটি অতিকায় মস্তকের মণ্ডল, একটি কুস্তীগিরের ছবি। দুহাজার বছর পূর্বে টিওটিহুয়াকান (Teotihuacan) ছিল সেকালের দেবতাদের আবাসভূমি। তাহারি মধ্যে ছিল একটি পিরামিড্। ঐতিহাসিকদের সাধারণ মত যে একদল অজ্ঞাত মানুষ এই পিরামিডটি গড়েন—উপরের মন্দিরটি ৬০মিটার উঁচু। টলটেক্রা এই পিরামিডটিকে আরো বাড়ান এবং আজটেকরা একে নূতন করে গড়েন। প্রাক্-কলম্বীয় যুগের শিল্প-সম্ভারের ইতিবৃত্ত খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে তাঁরা শুধু অরণ্যবিহারী তীরধনুকধারী পশু শিকারী বা সামান্য চাষীই ছিলেন না, তাঁরা মাটি ছেনে পুতুলও গড়তেন (clay models, painted figurines, low tripods)। ময় সভ্যতার কথা ছেড়ে দিলেও আজটেকদের পূর্বে টলটেকদের যুগে অর্থাৎ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই একটা বিশিষ্ট শিল্পকলার রীতি ও গঠনশিল্পের নীতি গড়ে উঠেছে। এটা প্রকাশ পেয়েছে, রূপ নিয়েছে শুধু বড় বড় পিরামিড বা মন্দিরেই নয়, বা ভাস্কর্য রীতিতেই নয়, ফ্রেস্কো ও ম্যুরাল চিত্রাংকনেও, সোনা-রূপা-তামার বিভিন্ন প্রকারের অলংকরণে, মৃৎশিল্পে, প্রস্তরশিল্পে, পালকগোঁজা নানা রংএর শিরস্ত্রাণে, জেডের ছুরি প্রভৃতির নিদর্শনে। টেনেকোটিটিলান (বর্তমানে মেক্সিকো সিটী) সহরের পূর্বেই গড়ে উঠেছে চোলুলার (Cholula) পিরামিড-মন্দিরগুলি।

প্রশ্ন উঠেছে যে মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার ময়-আজটেক—ইঙ্কা সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয়দের কিছু আদান-প্রদান ছিল কিনা। আমাদের পুরাণে আমরা সপ্ত পাতালের কথা পড়ি—অতল, বিতল, নিতল, মহাতাল, সুতাল, পাতাল প্রভৃতি। ভিক্ষু চমনলালের মত কয়েক জন দুর্ধর্ষ পণ্ডিতের মত যে ভারতীয়রাই মধ্য-আমেরিকার অরণ্যে পর্বতে গিরিশিখরে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আজকের মেক্সিকো জাতি শুধু সেই স্মৃতিই বহন করছে না, ওরা একটা মিশ্রজাতি—ওদের দেশের ইণ্ডিয়ানদের পিতৃ-পুরুষেরা সত্যিকারের ইণ্ডিয়া থেকেই গিয়েছিল, তার সঙ্গে মিশেছে অনেক কিছু রক্ত স্রোত—নিগ্রিটো, স্প্যানিশ, পর্টুগীজ। ওদের মিশ্র জীবনের প্রতিফলনও দেখা যায় সমাজব্যবস্থায়, শিল্পকলায়, জীবনের অভিব্যক্তিত্বে।

বিষ্ণু আমায় কইল কানে বলল দশভুজা
অজানা এই সিন্ধুতীরে নেবো আমার পুজা।

এঁরা চারযুগের (epochs) কথা বিশ্বাস করেন, এঁদের দেবতারা নাকি ইন্দ্র গণেশ সূর্যের অনুরূপ, দেবতাদের মন্দিরে ছিল দেবদাসী প্রথা, নৃত্যগীত হতো প্রচুর, পতির সহিত সহমরণের ব্যবস্থা ছিল, সোমযাগের প্রচলন ছিল, পুরোহিততন্ত্রের ছিল অবাধ ক্ষমতা, এমন কি দেবতার প্রীত্যর্থে নরবলিরও কোন বাধা ছিল না। আমাদের কল্পনাকে অবশ্য অনেক দূর টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেমন আজটেকদের অস্তিতে আমরা দেখি আস্তিকের আবির্ভাব, শুনি জরুৎকারু বাসুকির প্রবাদ, জরাসন্ধের গল্প। "ফোনেটিক ভেগারী" (Phonetic vagary) বা শব্দসাযুজ্য ইতিহাসবিদের কাছে অনেক সময়ই মোহিনী কুহকিনীর রূপ ধরে আসে, আমাদের বিচার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, যেমন জাপানী বিদ্যাবিৎ আসাগাকে হাজার বছর পরে যদি বাঙালী বিদ্যাসাগরের পদে অভিষিক্ত করি তাহলে ধ্বনি নির্ভরতার একটি উদাহরণ পাওয়া যায়

কিন্তু বীরসিংহের সিংহবাহু মানুষটি বাংলার ইতিহাস থেকে মুছে যায়।

বেশীদিনের কথা নয়, কয়েকশো বছর আগে ১৫২১ খৃঃ অব্দে ইতিহাসের চাকা ঘুরলো কলম্বাসের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। স্পেন থেকে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের দল এসে চেপে বসলো সাগরপারে মেক্সিকোতে। মেরী মায়ের নন্দনের পুণ্যনামে তরবার হাতে করটেজ, আজটেক সম্রাট মন্টেযুমার স্কন্ধে চেপে বসলেন। বসলো ইনকুইজিশন, রক্তনদী বয়ে গেলো। মেক্সিকোকে বলা হ'ত সোনার দেশ—ইউরোপ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লাগল স্বর্ণ-লোভীর দল। হারভার্ডের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক প্রেসকটের পুস্তকে মেক্সিকো বিজয়ের এই রক্ত-রাঙা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে The Conquest of Mexico —W. H. Prescott)। একশো পঁচিশ বছরেও বেশী আগে লেখা হলেও এর অনুমান ও কাহিনীগুলি আজও ইতিহাসকাররা শ্রদ্ধার সঙ্গেই মেনে নেন।

কালের অমোঘ নিয়মে মেক্সিকো স্পেন সাম্রাজ্যের স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ালো। রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রচার, বিভিন্ন খণ্ড রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে একটি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা এবং স্প্যানিশ ভাষার ব্যবহার দেশটিকে সংহত ও সুসংবদ্ধ করার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। বাণিজ্যে ও শিল্পেও এর প্রভাব পড়েছে। একজন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক লিখেছেন—The Colonial Period is rich in artistic and literary creations. The intermixing of European and indigenous forms in architecture and sculpture gave birth to an orignal style ref'ecting indigenous sensibility—the Baroque style of Xvii and Xviiith centuries in Mexico constitutes an unique branch of European baroque with its own artitic charasteristics." এরই প্রতিফলন দেখতে পাই আমরা গির্জায় ও অন্যত্র ছবিতে, গানে, সুরে—জাতিটা যেমন মিশ্র তার রূপকল্পের প্রতিধ্বনিগুলিও মিশ্র।

তারপর ১৯১৭ সালে এলো বিপ্লব। উনবিংশশতাব্দীর ডিক্টেটর তন্ত্রী শাসনব্যবস্থা ভেঙে ডেমো ক্র্যাটিক্ বা প্রজা তন্ত্রী শাসনতন্ত্র। ১৯৫৯ খৃঃ অব্দ থেকে এখানে চলছে এগারো বছরী একটি প্ল্যান (eleven year plan)। এই প্ল্যান এখনও চালু, একটি উদাহরণ দিই—এই সময়ে ৪৩৯০ স্কুল স্থাপনা হবে—একবছরী স্কুল—দুঘণ্টায় এক একটি ঘর নির্মিত হবে এই হচ্ছে পরিকল্পনা। এই ধরণের আরো অনেক ব্যবস্থা।

শিল্পকলার রাজ্যেও মেক্সিকোর নাম আছে বিশেষ করে মডার্ণ মুরাল বা ইজেল পেন্টিং-এ—শিল্পী সেখানে পেয়েছে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য যাকে কবির ভাষায় বলা যেতে পারে—জীবন্মৃত্যুর সমতা a sense of life and death in an inseparable oneness and voices that echo with long traditions. একটি প্রদর্শনীতে কয়েকটি ছবি দেখেছিলুম যা আজও চোখে ভাসছে—পুরোণো যুগের বায়ু দেবতার ছবি, পৃথ্বীরূপী সর্প।

ত্রিমূর্তির কল্পনা সব দেশেই আছে। আমাদের যেমন আছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তেমনি প্রাচীন মিশরে ছিল আইসিস্ আসিরিস হোরাস,রে,আমন টা। মেক্সিকোতেও ছিল জীবনের দেবতা, মৃত্যুর দেবতা, বসন্তের দেবতা—হুইজিলোপক্যালি, চেজকালেৎপাকা, ও সাইপে—এদের থেকেই উদ্ভূত হয়েছেন জবাকুসুম সংকাশ সূর্যদেবতা, যাঁকে মেক্সিকোতে কল্পনা করা হয়েছে এক বিকটবদন দেবতা-রূপে, মেঘের আরশীর ধোঁয়ার মধ্যে থেকে (smoking mirror) আলোর তেজ বিকীরণ করে বেরুচ্ছেন তিনি। এদের কল্পনায় আমাদের দেশের তৎসবিতুর্বরেণ্যং বা ধ্যানের নিবিড়তা নেই বটে কিন্তু একটা প্রাকৃতিক সৌষম্য ও spirit of aere দুইএ মিলে তাদের শিল্পীর চেতনায় সূর্যকে নূতন এক আবির্ভাবের প্রতীক করে তুলেছে। এদের শিল্পকলার ভঙ্গীতে ও প্রকাশে স্থূল ব্যঞ্জনা রূপ পেয়েছে বটে কিন্তু এর রীতি ও নীতি স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচীন মিশরীয় ভাব ও ভঙ্গীকে। ধরুন প্রাচীন মিশরের সেই অপরূপ ছবি—আকাশ দেবী নুট তাঁর দেহ নক্ষত্রখচিত বায়ু দেবতা সু তাকে ধারণ করে আছেন দাঁড়িয়ে—তার একটি হাত স্পর্শ করছে আকাশের বক্ষদেশ, আর একটি তার নিম্ন অঙ্গ। পদতলে শায়িত পৃথিবী দেবতা। লক্ষ্য করবার বিষয় যে পৃথিবী এখানে পুং দেবতা, আমাদের মত মাতা বসুন্ধরা বা দেবী শাকম্ভরী নন্।

প্রাচীন মেক্সিকোতে আমরা একটি পুরুষ দেবতাকে পেয়েছি জাপোটেক যুগের—তিনি হচ্ছেন ফুলের দেবতা কিন্তু পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকানম্র নন, প্রশান্তির ছাপ সেখানে নেই। তিনি নাচ গান আনন্দের দেবতা, কিন্তু মুখে নিরানন্দই ফুটেছে বেশী—

মনে পড়ছে অবনীন্দ্রনাথের কথা—যুগের পর যুগ ধরে আকাশে ঘনঘটার আয়োজন করে চলল, কিন্তু মেঘের কবি আসেন একদিন—আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে। শতাব্দীর পর শতাব্দী লণ্ডন সহরের উপর কুহেলিকার মায়াজাল জমা হয়ে রইলো। একদিন এক হুইসলার এলেন, চোখ খুলে দিলেন আমাদের। পাথর জমা হয়ে রইলো পাহাড়ে পাহাড়ে, কবে কোন ফিডিয়াস, মাইলোস্, রেঁাদা, মেনেট্রো-ডিক্, ব্রেজস্কা আসবেন। মুঘল বাদশাহদের ভাণ্ডারে কত অত্যাচার অনাচারে তিনপুরুষ ধরে জমানো মণি মাণিক্য রত্ন একদিন সাজাহানের স্বপ্ন হ'ল ময়ূর সিংহাসনে তাজে। কিন্তু পাথর, রং, তুলি, হাতুড়ি বাটালি নিয়ে মানুষ খেলতেই চিরকাল ভালবাসে, কারণ সে আর্টিসান। আর্টিষ্ট হয় তখন যখন সে ধরে ফেলে তার ধ্যানের মূর্তিটিকে, অব্যয় ভাব রূপটিকে।

যখন যে কোনদেশের শিল্প রীতি আলোচনা করবো তখন মনে রাখি যেন এই সত্যটিকে—সে শিল্প কলা, প্রাচীন, নবীন বা মধ্যযুগের হোক। দেশ কাল পাত্র ভেদে তিব্বতী শিল্পীদের হাতে ইন্দ্রের বজ্র অন্যরূপ নিয়েছিল, ইন্দ্র নিজে রূপান্তরিত হয়েছিলেন ইলোরার গুহশিল্পীদের হাতে। কলিঙ্গের কারিগর সূর্যদেবতার নূতন রূপ আবিষ্কার করলে, দ্রাবিড় সভ্যতা নিলে নটরাজের তাণ্ডবকে, পার্বতীকে পেলাম পাথরের কোমলতায়। বাংলার গৃহস্থ মন গড়লে সপরিবারে দুর্গাকে যিনি অসুরদলনী, মহিষাসুর মর্দিনী। শিব হ'ল ভাঙখোর, ভিখারী, কুটুনীবাড়ী যায় যে। আবার মার্কিন মুলুকে থাকাকালে শ্যামখুড়োর দেশে মেক্সিকান গীটার বাজিয়ে শুনলাম যখন গান—

আমরা তিনজন নারী
তিনজন নয় ত্রিশলক্ষের প্রতীক
ক্ষুধা নিয়ে মরছে যারা, তাদের মা আমরা
বুভুক্ষা নিয়ে বেঁচে আছে যারা, তাদের মা আমরা
অনাগত উত্তর পুরুষ যারা আসছে
আমরা তাদের ভাবী জননী
শোনোনি আমাদের কথা

আমরা যাদের আনিনি এখনও তাদেরই জন্য বাঁচতে চাই জীবনের জন্য জীবিতের জন্য আমাদের কান্না তোমাদের কানে পৌছচ্ছে কি ?

তখন ভাবি, পৃথিবীটা কত ছোট, কত কাছের, মানুষে মানুষে কত নিকট—'য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।'
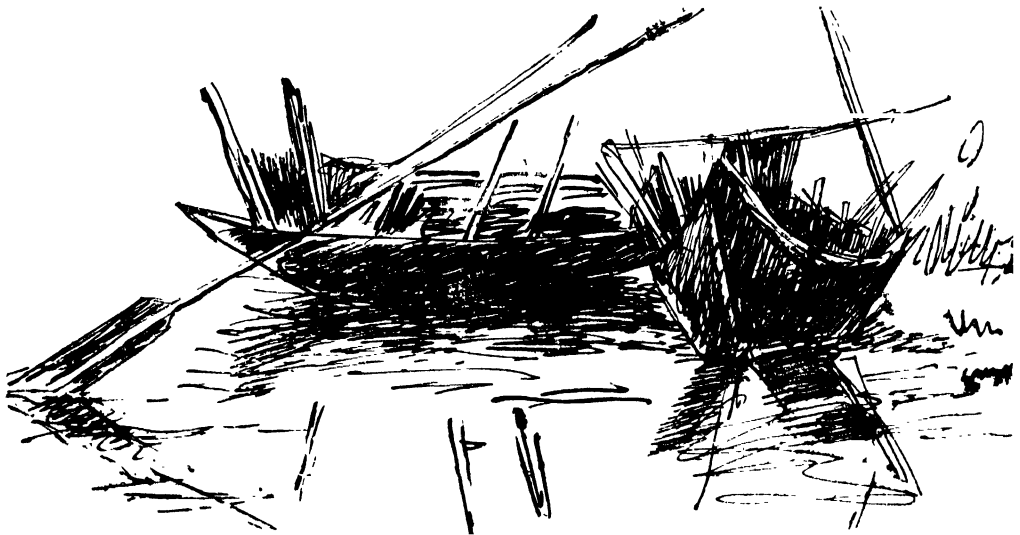
শিল্পী—মৃণাল চক্রবর্তী

মহাপূজা

পণ্ডিত শ্রীদ্বারকানাথ জ্যোতির্ভূষণ

'সৃষ্ট্বাহখিলং জগদিদং সদসৎস্বরূপং
শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্।
সংহৃত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা
তাং সর্ব্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি ॥'

'যিনি ত্রিগুণরূপা আত্মশক্তি দ্বারা সদসৎস্বরূপ এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া সকলকে পালন করিতেছেন, আবার কল্পান্ত সময়ে সমস্ত বিশ্বকে উপসংহৃত করিয়া একাকী স্বরূপে অবস্থান করেন সেই সর্ব্ববিশ্বজননীকে মানসে স্মরণ করি।'

ঋতুচক্রের অবিরাম আবর্ত্তনে আবার শারদীয়া মহাপূজা আসিয়াছে। তাই প্রকৃতির আজ নূতন ভাব। প্রকৃতি নূতন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত ও নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া যেন অনুক্ষণ মহাশক্তি মহামায়ার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। নিম্নে নদ্যাদি কূলে কূলে জলপূর্ণ অবস্থায় টলটল করিতেছে—ঊর্দ্ধে নীলাকাশে চন্দ্র ঝলমল করিতেছে। সকলেই যেন কি এক নূতন ভাবে বিভোর হইয়া জগতে বিশ্বজননীর আগমন ঘোষণা করিতেছে।

মহাশক্তি মহামায়ার আরাধনা একটি জাতীয় মহোৎসব। মায়ের আগমনী সংবাদে সকলেরই অন্তরে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মা আসিবেন—মাকে কিরূপে আবাহন করা হইবে—কি কি উপচারে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা অনুষ্ঠিত হইবে—সেই চিন্তায় ভক্তের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। আনন্দময়ীর আগমন হইবে, তাই আজ রোগ শোক দারিদ্র্যক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বিষাদমাখা বদনে হাসির রেখা দেখা দিয়াছে। পুত্রবৎসলা জননী প্রবাসী পুত্রের আগমনোদ্দেশে হাস্যমুখে রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন। চিরবিরহকাতরা রমণী বহুদিন পরে তাঁহার স্বামীর গৃহ-আগমন বার্ত্তা শ্রবণে হাসিমুখে সখীর সহিত কথা বলিতেছেন। বালকগণের ত কথাই নাই, তাহারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পূজার মণ্ডপে পড়িয়া রহিয়াছে। নিরুৎসাহী অন্নক্লিষ্ট বাঙ্গালীর হৃদয়ে নবোৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। আর চিরপ্রফুল্লপ্রাণ আরও উৎফুল্ল হওয়ায় প্রকৃতির প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করিতেছে। সকলের পুঞ্জীকৃত ভাব বঙ্গের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও মাতাইয়া তুলিতেছে। ঐ যে গঠিত দেবী-প্রতিমা বেদী আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, উহা আর্য্যঋষিগণের সমাধিস্থ হৃদয়ের অপূর্ব্ব ভাবাবেশ। উহাই ভগবানের শাক্ত শরীর, সুতরাং জাতীয় উন্নতির প্রথম এবং প্রধান আদর্শ। "বলেন লোকস্তিষ্ঠতি" অর্থাৎ বলই জাতীয় উন্নতির প্রথম এবং প্রধান উপাদান। তাই মহামায়া আদ্যাশক্তি পশুরাজ সিংহোপরি সমাসীনা। আবার বলের সঙ্গে ধন ও বিদ্যার সমান আবশ্যকতা আছে। তাই দক্ষিণে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য সমষ্টি আনন্দরূপা লক্ষ্মী, বামে নির্ম্মল জ্ঞানরূপা শুদ্ধসত্ত্ব চিৎশক্তি সরস্বতী দণ্ডায়মানা। আর একপার্শ্বে আসুরীশক্তিনষ্টকারী কার্ত্তিকেয়, অপর পার্শ্বে স্থিরপ্রজ্ঞ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ গণপতি বিরাজমান। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের সূক্ষ্ম শক্তি দেবতারূপে প্রতিমার চালে অঙ্কিত। মধ্যস্থলে সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টিসম্পন্না মহাশক্তি দশদিকে দশহস্ত প্রসারণপূর্ব্বক জগৎসংরক্ষণ ও পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার অন্তরায় অসুর-সদৃশ প্রবল হইলেও অচিরাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া পদতলে বিলুণ্ঠিত। এইরূপ কতভাবে ভাবুক শারদোৎসব দেখিয়া বিভোর হন, আমি একটি ভাবে আভাস মাত্র ব্যক্ত করিলাম।

হিন্দু জ্ঞানবলে যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন, তাঁহার পূজা পর্য্যন্ত লোকশিক্ষার্থ অবয়ব ধারণ করিয়াছে। হিন্দু যে আধ্যাত্মিক সাধন করেন সেই আধ্যাত্মিক সাধনাও প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। শারদীয়োৎসবে যে স্থূল পূজা হয়, তাহা আভ্যন্তরিক সূক্ষ্ম সাধনারই বাহ্য আকার। ভগবৎ আরাধনায় অগ্রে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক; সেই শুদ্ধি ব্যাপারের বাহ্যরূপই আসনশুদ্ধি, অঙ্গশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধি। এই শুদ্ধি ব্যাপার দ্বারা সাধক পরিশুদ্ধ হইতে শিক্ষিত হন। তৎপরে আত্মনিবেদন ব্যাপার। চিত্ত পরিশুদ্ধ না হইলে কেহ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইতে পারে না। আত্মনিবেদন করিতে গেলে হৃদয়ের সমুদয় কামনা, প্রবৃত্তি, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেবমুখী হওয়া চাই। সেই আত্মনিবেদনের বাহ্যস্বরূপই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সহিত নৈবদ্য দান। ভক্তিপুষ্প গুলির সহিত ভগবানকে এই নৈবদ্য উৎসর্গ করা হয়। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ও রিপুপরতন্ত্রতাই আত্মনিবেদনের অন্তরায় ও মানবের পশুত্ব। কারণ এইগুলি ইতর পশুতেও বিদ্যমান। তাই আত্মনিবেদনরূপ নৈবদ্যদানের পরেই পশু অর্থাৎ ছাগ বলি আছে। যখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়বিষয় ও সমস্ত রিপু বশ হয়, তখনই তাঁহার দেহস্থিত তমোগুণান্বিত

পশুর (কৃষ্ণবর্ণ অজের) বলিদান হয়। সাধকের যখনই এই পশুবলি হয়, তখনই তাঁহার ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে রতি ও একান্ত আসক্তি জন্মে। তৎপূর্ব্বে যাহা হয়, তাহা গৌণী ভক্তি মাত্র। ঈশ্বরে পূর্ণাসক্তির নামই আরত্রিক বা আরতি। এই আরতির ব্যাপারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাসক্তিতে হৃদয়ের ভগবদ্ভক্তির পূর্ণমাত্রা সম্পূর্ণ হওয়াতে ঈশ্বরতন্ময়তা জন্মে। সেই ভক্তিপঞ্চকের নিদর্শন দীপমালা, সজলশঙ্খ, ধৌতবস্ত্র, বিল্বপত্রাদি ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। এই পঞ্চরূপে আরাধনাই ঈশ্বরে আরতি দান। সেই পঞ্চভক্তিদীপ জ্ঞানাগ্নিতে জ্বলিয়া উঠে। যে ঐশ্বরিক জ্ঞানে দেবদর্শন হয়, সেই জ্ঞান ভক্তির পঞ্চদীপাধারে জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হয়। যখন সাধকের অন্তরে এই জ্ঞানালোক প্রজ্জলিত হয়, তখন তাহার অন্তরে ভগবৎ শক্তি দশভুজার সত্ত্বমূর্ত্তিতে দশদিক আলো করিয়া দেখা দেন। আর যদি ঢাক বাজিয়ে লোকমজান পূজায় শ্রদ্ধা না হয়, তবে হৃদয়-চণ্ডীমণ্ডপে চণ্ডীকে স্থাপন কর। ভগবৎ-মহিমারূপ বাদ্য বাজাও; রাগ প্রভৃতি ছয়টা ছাগকে বিবেক হাড়কাঠে পুরিয়া জ্ঞান-খড়্গে বলি দাও। তাহা হইলে জগজ্জননী আসিয়া কোলে তুলিয়া লইবেন।

সাধনাবলে ভগবান যেরূপ "সম্যক প্রচাত জ্ঞান, বল, বীর্য্যাদি-শক্তির" সহিত প্রত্যক্ষীভূত হন, সেই সত্ত্বমূর্ত্তি দুর্গাদির প্রতিমায় স্পষ্টীকৃত করিয়া হিন্দু শক্তির সহিত শক্তিমানের পূজা করেন। বঙ্গদেশের অবস্থা যতই শোচনীয় হউক না কেন, যে পর্যন্ত বঙ্গের পল্লীতে প্রতিবৎসর শারদীয়া মহাপূজার অনুষ্ঠান হইবে সে পর্যান্ত নির্জীব নিস্তেজ হইলেও বঙ্গবাসীর অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইবে না। এস ভাই হিন্দুধর্ম্ম অবস্থাবান প্রশস্তহৃদয় ভক্তি-তরঙ্গের অবিচ্ছিন্ন উচ্ছ্বাসে উজ্জীবিত মহানুভব ব্যক্তিগণ! আমরা প্রত্যেকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবারাধ্যা মহামায়ার বরাভয়প্রদ রাতুলচরণে প্রণাম করি।

সর্ব্বরূপময়ী দেবী সর্ব্বং দেবীময়ং জগৎ।
অতোঽহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্॥

এদিনের বরষা

হাসিরাশি দেবী

এ এক বরষা এল' আবার অনেকদিন পরে,—
অনেক প্রতীক্ষা শেষে, অনেক হিসাব ভোলা দিন,
নিদ্রাহীন
রাত্রির প্রহরে
গাঁথা মালিকার মত। মনে হয়, আর
এক পথে নেমে এল' আজকের বরষা আবার!
এ কোন বর্ষণ-দিন!
সজ্জাহীন, সৌন্দর্য-বিহীন
রূঢ়রূপে দেখা দিল, যেথানে কালের
কঠিন চরণাঘাত লিখে লিখে যায় বার বার
আপন স্বাক্ষর!
যেথানে অস্থির সত্ত্বা ক্ষয়িষ্ণু জরায়!
যেথানে হৃদয়,—
জমা করা সুখ দুখ নিয়ে,
ফেনিয়ে ফেনিয়ে
উপভোগ করে শুধু স্বাদ!
যেথানে জীবন,
ক্লান্ত,—ক্লিষ্ট, মন্থরগতি! তবু, বুকে হাঁটে,—
তবু, করে অতিক্রম দিন আর দীর্ঘতম রাত।
যেথানে বরষা এল—
সেখানে উত্তুরে হাওয়া ছড়ায়না কেয়ার-রেণুকা,—
আধফোটা মাগধীর ঝরেনাক' গন্ধের মদিরা!
হঠাৎ শিহরেনাক' কন্দলীর পুষ্পপত্র-দল!
লুপ্ত 'উজ্জয়িনী' নাম। আছে শুধু কংক্রীট নগরী,
যেথানে সিপ্রানদী শুথায়েছে মানুষের মনে।
গৃহ-বাতায়নে
কাজ ভুলে দাঁড়ায়না পুরললনারা,—
দূরাগত মেঘ দেখে—শুধায়না প্রিয়ের কুশল
অস্ফুট ভাষায়!
এ এক নূতন যুগ; এথানে অর্গল-রুদ্ধ দ্বার,—
সে কল্পনার।
তবুও বরষা এল' আকাশের একদিক থেকে
অন্যদিকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে
কোমল কালোয় ভরা ঘন-নীল মেঘের পশরা।
তবুও কি অলক্ষ্য অন্তরে
কারো কোন অশরীর বাণী
পৌঁছায় এথনো? এ কংক্রিট নগরীর নীচে
কাঁপে মাটি, কাঁপে জল—কেঁপে ওঠে পাহাড়-পর্বত,—
বাল্মিকীর মানস নন্দিনী
জনক-দুহিতা দুঃখে! স্পর্ধিত পৌরুষ
বার বার হানে যাবে! বার বার যাহার লাঞ্ছনা
সমাধি রচনা করে মাটির গহ্বরে;—
তাহারি—ক্রন্দন,—
তোমাকে কি দিল ডাক, নূতন দিনের বরষণ!!

শিশু ও বৃদ্ধ

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

[এ গল্পের রচয়িতা ইভান ক্যানকার (১৭৭৬ ১৯১৮) যুগোশ্লাভিয়ার একজন প্রখ্যাত কথাশিল্পী। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে এঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। স্কুলের পড়া শেষ করে স্থাপত্যশিল্প শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইনি ভিয়েনা শহরে এক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই সে স্থান ত্যাগ করে সাহিত্যরচনায় ব্রতী হন। ভিয়েনা শহরে তেরো বৎসর অতিবাহিত করার পর ইনি অষ্ট্রিয়ায় চলে যান এবং ঐখানেই এঁর মৃত্যু হয়। এঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে Erotica (কাব্যগ্রন্থ), Vignettes (ছোট গল্পের সংকলন)। Parables from my Dreams ও my life (অসমাপ্ত আত্মজীবনী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য]

প্রতিদিন রাত্রে শুতে যাবার আগে শিশুগুলি গল্প করে নিজেদের মধ্যে। প্রশস্ত অগ্নিকুণ্ডের একপাশে বসে গল্প করে ওরা। সন্ধ্যার ধূসর স্বপ্নালু আলো উঁকি দেয় জানালার ফাঁক দিয়ে। ঘরের প্রতিটি কোণ থেকে রহস্যময় ছায়াগুলি নিঃশব্দে ওঠে উপরদিকে।

যা ওদের মনে উদয় হয় তা-ই নিয়ে গল্প করে ওরা। তবে ওদের গল্পে নেই দুঃখ বেদনার স্পর্শ, আছে শুধু উচ্ছল আনন্দের হিল্লোল। সূর্য্যের স্বর্ণাভ কিরণের মত উজ্জ্বল ওদের গল্প, প্রাণচাঞ্চল্যে সতেজ। ওদের দৃষ্টির অন্তরালে জীবনের যে বিচিত্র স্রোত বয়ে চলেছে, আলোছায়ার যে অপরূপ লীলা চলেছে নিরন্তর, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন কৌতূহল নেই ওদের। মাঝে মাঝে দু' একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিষয় ওদের কানে এসে পৌঁছয়, তা' নিয়ে আলোচনাও করে ওরা, কিন্তু তার মর্ম্ম ঠিক বোঝেনা। ওদের গল্পের না আছে শুরু, না আছে শেষ। কোন ধরাবাঁধা রূপও নেই ওদের গল্পের। কখনও কখনও ওরা চারজনই কথা শুরু করে একসঙ্গে অথচ কেউই সেজন্য বিভ্রান্ত হয় না। ওদের মুগ্ধদৃষ্টি যেন এক অপার্থিব আলোকের মাঝে সর্ব্বক্ষণ মগ্ন হয়ে থাকে যেখানে প্রতিটি শব্দের অর্থ সহজ ও সুস্পষ্ট, প্রতিটি গল্পেরই পরিণতি গৌরবময়।

সেদিন অপরাহ্নে এক অজানা জায়গা থেকে অতর্কিতে যেন এক প্রচণ্ড ঘূর্ণি এসে নির্ম্মম আঘাত হানল ওদের ঐ আনন্দের স্বর্গলোকে। ডাকে খবর এল ওদের পিতার পতন ঘটেছে ইতালীর এক যুদ্ধক্ষেত্রে। ব্যাপারটা ওদের কাছে অজানা, একান্ত দুর্ব্বোধ্য। পিতার এই আকস্মিক মৃত্যু যেন এক বিরাট দৈত্যের মত তার সুদীর্ঘ বিপুল কলেবর নিয়ে ওদের সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে, কিন্তু তার চেহারা নিতান্ত অস্পষ্ট, চোখমুখ কিছুই নেই তার। মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় নেই ওদের, মৃত্যুকে ওরা দেখেনি কোথাও—গীর্জ্জার সুমুখে আর রাজপথের উপর ঐ যে কোলাহলমুখর জীবন, ওখানে মৃত্যু নেই, আবার এই যে অগ্নিকুণ্ডের ছায়াময় উষ্ণ আলো, এখানেও মৃত্যুর অস্তিত্বের পরিচয় মেলে না। ওদের গল্পের যে জগৎ তার মাঝেও মৃত্যু কোনদিন পদক্ষেপ করেনি।

মৃত্যু যে আনন্দের ব্যাপার নয় তা ওরা বুঝতে পারে, কিন্তু এটা যে বিশেষ দুঃখজনক তা ওরা ভাবতে পারে না মোটেই। মৃত্যু ওদের কাছে নিরবয়ব প্রাণহীন এক মূর্ত্তিমাত্র—ওর চোখ নেই, কোথা থেকে ও এসেছে ও কেন ওর আগমন তা ও প্রকাশ করতে পারে না দৃষ্টিতে, ওর মুখ নেই, কথা বলে ও বোঝাতে পারে না কাউকে।

মৃত্যু সম্বন্ধে ওরা ভাবতে পারে না কিছুই। মৃত্যুর বিরাট মূর্ত্তির সামনে ওদের ভীরু চিন্তা থমকে দাঁড়িয়ে

পড়ে—যেন এক প্রকাণ্ড কালো প্রাচীরে বাধা পেয়ে। হতবুদ্ধির মত ওরা তাকিয়ে থাকে পরস্পরের মুখের দিকে।

"বাবা ফিরে আসবেন কবে?" জিজ্ঞাসা করে তন্‌চেক বিমূঢ়ভাবে।

লোইজকা ভুরু কুঁচকে তাকায় ওর দিকে। উষ্মার সঙ্গে বলে, "বাবার যদি পতন হয়ে থাকে, তবে তিনি আসবেন কি করে?"

সবাই চুপ করে যায়। মৃত্যুর বিশাল কালো প্রাচীর ওদের দৃষ্টি অবরোধ করে দাঁড়িয়ে—ওধারের খবর ওদের জানা নেই।

"আমিও যুদ্ধ করতে যাবো," নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ঘোষণা করে সাতবছরের মাতিচে—যেন এতক্ষণে সঠিক চিন্তাটা মাথায় এসেছে ওর ··এক্ষেত্রে এ ছাড়া আর কিছু বলা যেন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

"যুদ্ধে যাবার মত বয়স হয়নি তোমার—তুমি খুবই ছোট," ভর্ৎসনার সুরে বলে চার বছরের তন্‌চেক।

"যুদ্ধটা কিরকম, বলো না, মাতিচে! আমার শুনতে ইচ্ছে করে।" অন্ধকার কোণ থেকে ছোট্ট মিলকার ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়। ওদের মধ্যে ও-ই সব চাইতে শীর্ণ ও দুর্বল, মায়ের পশমী চাদরটা ওর সর্বাঙ্গে জড়ানো, দূরপথের যাত্রীর পিঠে বোঁচকার মত দেখাচ্ছে ওকে।

"যুদ্ধটা কিরকম, শুনতে চাও," উৎসাহভরে বলতে শুরু করে মাতিচে, "যুদ্ধটা হচ্ছে এই রকম। সবাই ছুরি নিয়ে আঘাত করে পরস্পরকে,তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলে, বন্দুক নিয়ে গুলী করে। যত বেশী লোককে ঘায়েল করতে পারবে তুমি, ততই তোমার বাহাদুরি। কেউ কিছু বলে না কাউকে, শুধু তেড়ে আসে মারবার জন্য।"

"কিন্তু কেন ওরা ছুরি মারে পরস্পরকে, তলোয়ার দিয়ে কেটেই বা ফেলে কেন?" গভীর অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে প্রশ্ন করে মিল্‌কা।

"সম্রাটের জন্যে!" উত্তর দেয় মাতিচে গম্ভীরভাবে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ করে যায়।

সম্রাট কী ওরা বোঝে না—ওদের বিভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে শুধু ভেসে ওঠে এক বলদৃপ্ত মহিমাময় পুরুষের ছবি। স্তব্ধভাবে বসে থাকে ওরা, নিঃশ্বাস পড়ে না যেন—গীর্জ্জায় উপাসনারত জনতার মত।

কয়েক মুহূর্ত পরে মাতিচে সংযত করে নেয় নিজেকে—সম্ভবতঃ ঐ দুঃসহ স্তব্ধতা দূর করার জন্য।

"আমিও যুদ্ধে যাচ্ছি—শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে।"

"শত্রুকে দেখতে কি রকম? ওর শিশু আছে কি?—

মিল্‌কার ক্ষীণ কণ্ঠ বেজে ওঠে আবার।

"নিশ্চয়ই আছে—নইলে ও শত্রু হবে কি করে?" গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করে তন্‌চেক।

সঠিক জবাবটা মাতিচেরও জানা নেই। দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলে, "শিশু আছে বলে মনে হয় না আমার।"

"শিশু ওর থাকবে কেন? ও তো আমাদেরই মত একজন মানুষ," ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠে লোইজকা। তারপর কি যেন ভেবে ধীরভাবে বলে, "তবে ওর আত্মা নেই।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তন্‌চেক প্রশ্ন করে, "কিন্তু যুদ্ধে মানুষের পতন হয় কি করে? এমনিভাবে পিছন দিকে হেলে?" সঙ্গে-সঙ্গে ও পতনের ভঙ্গী করে দেখায়।

"ওরা হত্যা করে তাকে!" ধীরকণ্ঠে জবাব দেয় মাতিচে।

"বাবা আমাকে একটা বন্দুক এনে দেবেন বলেছিলেন," চিন্তিতভাবে বলে তন্‌চেক।

"বাবার যদি পতন হয়ে থাকে তবে তোমায় বন্দুক এনে দেবেন কি করে?" ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে বলে ওঠে লোইজকা।

"ওরা বাবাকে হত্যা করেছে···বাবার মৃত্যু হয়েছে?"

"হ্যাঁ। বাবার মৃত্যু হয়েছে।"

স্তব্ধভাবে ওরা তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে—ওদের ম্লান বিস্ফারিত চোখের বেদনা-বিহ্বল দৃষ্টি যেন দূরে এক অনির্দেশ্য শূন্যতার মাঝে হারিয়ে গেছে।

ঠিক ঐ সময় কুটীরের সামনে একখানি বেঞ্চির উপর বসে আছেন বৃদ্ধ পিতামহ ও পিতামহী। বাগানের গাছ-পালার ভিতর দিয়ে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম কিরণ ছড়িয়ে পড়ছে চারিধারে। চতুর্দ্দিকে এক গভীর স্তব্ধতা, শুধু একটানা একটা চাপা কান্নার সুর ভেসে আসছে ঘোড়াশাল থেকে। এ কান্না ঐ শিশুগুলির তরুণী মায়ের—সম্ভবতঃ সে এখন ঘোড়াগুলিকে খাবার দিতে গেছে ওখানে।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা নতমুখে বসে আছেন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে—গভীর আবেগে পরস্পরের হাত ধরে। উভয়েই নীরব। দিক্‌চক্রবালের নীচে ধীরে ধীরে নেমে গেছে সূর্য্য—পশ্চিমের আকাশে এক স্নিগ্ধ কমনীয় আলোকচ্ছটা। সেই দিকে নিবদ্ধ ওঁদের অশ্রুহীন নিষ্পলক দৃষ্টি।
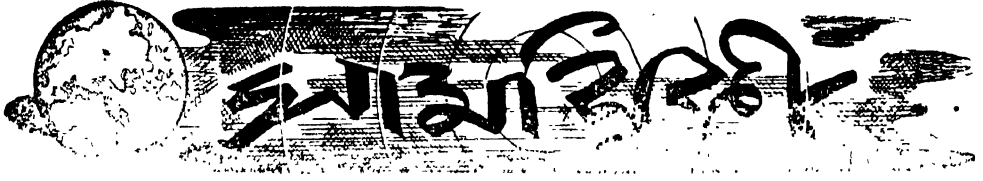
কলকাতায় রাষ্ট্রপতি—

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন গত ৩০শে আগষ্ট কলিকাতায় আসিয়া দুইটি বড় সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। (১) কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের ৭৫ বৎসর বয়স হওয়ায় প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব। (২) সিষ্টার নিবেদিতার জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব। ডাঃ রাধাকৃষ্ণান বহুকাল বহু বৎসর কলিকাতায় ছিলেন। কাজেই কলিকাতায় আসার সুযোগ পাইলে তাহা ত্যাগ করেন না ও পুরাতন বন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি ডঃ রাধাকৃষ্ণানের বয়স ৭৮ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে।

স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আদেশ বদল—

২রা সেপ্টেম্বর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উভয় সভায় ঘোষণা করেন যে পূর্বে যে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা সংশোধন করা হইল। এখন হইতে ২২ ক্যারেটের গহনা ব্যবহার করা চলিবে। যাহাদের নিকট সোনার বাট, পিণ্ড বা তাল আছে তাঁহারা হয় স্বর্ণকারদের বিক্রয় করিয়া দিবেন, না হয় তাঁহারা অলঙ্কার তৈয়ারী করিয়া লইবেন। আমাদের দেশে দরিদ্র লোকেরা সোনার অলঙ্কার তৈয়ারী টাকা জমাইবার উপায় বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের সংখ্যা এখনও বাড়ে নাই বা ব্যাঙ্ক ব্যবসা চালু হয় নাই কাজেই মাত্র একদল লোক ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের টাকা জমা দেওয়া সহজ কিন্তু ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তোলা এখনও সহজসাধ্য হয় নাই। যতদিন তাহা না হয় ততদিন স্বর্ণালঙ্কারের জন্য টাকা জমাইবার ব্যবস্থা বহাল থাকাই ভাল।

সীমান্ত সমস্যায় ভারতের উদ্বেগ—

ভারতের সীমান্ত সমস্যা ক্রমে শঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এ বিষয়ে বন্ধু রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বহু রাষ্ট্রের প্রধানদিগের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সংযুক্ত আরবের রাষ্ট্রপতি নাসেরের নিকট পত্র পৌঁছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের সামরিক প্রস্তুতি আরও অধিক সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। ভারতরাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন ভাইস চ্যান্সেলার—

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ বৎসর রেক্টর পদে কাজ করার পর ডঃ ত্রিগুণা সেন সে কাজ হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। বাঙালীর পক্ষে আনন্দের কথা, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করিয়াছেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রতিষ্ঠার সময় হইতে বাঙালীর অর্থে ও সামর্থ্যে পুষ্ট হইয়াছে। এখনও বহু বাঙালী সেখানে নানাপদে অধিষ্ঠিত আছেন। ডঃ সেন তাঁহার কাজের মধ্যে দলাদলি বা রাজনীতি আনেন না। কাজেই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার পরিচালনায় উন্নতিলাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়—

সমাজসেবা ক্ষেত্রে সুপরিচিতা শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় ফিলিপাইন রাজ্যে ১০,০০০ মার্কিন ডলার মূল্যের র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার পাইয়াছেন। ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি ফারডিনানড মারকোস তাঁর হাতে পুরস্কার দেন।

সাহিত্যাচার্য্য শ্রীকুমার সম্বর্দ্ধনা—

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর রবিবার বিকালে শ্রীপাট খড়দহে শ্যামসুন্দর মন্দিরে নিখিল বৈষ্ণব সম্মিলনী ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে এক সভা হইয়াছিল। তাহাতে সাহিত্যাচার্য্য শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। বাংলাদেশে বর্ত্তমান কালে শ্রীকুমারবাবু সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত।

তাঁহার দানে শুধু বাংলা সাহিত্যজগৎ নহে বৈষ্ণব সাহিত্যও নানাভাবে সমৃদ্ধ হইতেছে। তাঁহার সম্বর্দ্ধনা উদ্যোক্তারা উপরিউক্ত ব্যবস্থাই করিয়াছেন। খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দির শুধু তীর্থস্থান নহে বহু বৎসর বিদ্বান ও ভক্তবৃন্দের পদধুলিতে সমৃদ্ধ। ঐরূপ তীর্থক্ষেত্রে সাহিত্যিক সম্বর্দ্ধনা তাৎপর্য্যপূর্ণ।

বাঙালীর সম্মান—

শ্রীজি, সি, চ্যাটার্জ্জী জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সর্বভারতীয় অফিসের ডাইরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার পূর্বে তিনি উক্ত সার্ভের কেবলমাত্র উত্তর আঞ্চলিক বিভাগের ডাইরেক্টর নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তৃতীয় ডাইরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের মন্তব্য—

গত ৬ই সেপ্টেম্বর ধানবাদে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এক জনসভায় ভারতীয় জনগণ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "ভারতীয় জনগণ কুম্ভকর্ণের সামিল"। ভারতীয় জনগণ অধিকাংশ সময় ঘুমাইয়া কাটায়,জেগে উঠে তখনই যখন তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলে। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে আমরা আমাদের আদর্শবাদ। আত্মত্যাগের আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়াছি। এখন আমরা ক্ষমতালোলুপ ও অর্থলিপ্সু হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গে নিরক্ষর সংখ্যা ৩৫ লক্ষ—

সমীক্ষার খবরে প্রকাশ, পশ্চিম বঙ্গে নিরক্ষরের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ। রাজ্য সরকারের সমাজ শিক্ষা দপ্তরের হিসাব মত জুলাই মাসের মধ্যে ৪৫০০টি প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়। ৫২৫০টি কেন্দ্র খোলা হবে বলে আশা ছিল। অন্যান্য অনগ্রসর অধ্যুষিত এলাকায় ৫০০টি এক শিক্ষক পাঠশালা খোলা হইয়াছে। চতুর্থ যোজনার শেষে ৩০ লক্ষ লোক এর আওতায় আসবেন আশা করা যায়। ইহা ছাড়া রাজ্য সরকার ১২টি নৈশ প্রাপ্তবয়স্ক হাইস্কুল খুলিয়াছেন। এই সমস্ত স্কুলে ছাত্র সংখ্যা দিনের দিন বাড়িয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান ও কালিম্পং-এ এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশী এবং ইহার আরও চাহিদা আছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ—

১৯৬৫ সালে ভারতের যে কোন স্থান হইতে প্রকাশিত যে কোন দৈনিক সংবাদ পত্রের মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচার সংখ্যা সর্বাধিক বলিয়া জানা গিয়াছে। আনন্দবাজারের দৈনিক প্রচার সংখ্যা ১,৭৪,০১৪। ভারতীয় ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে 'দেশ'-এর সংখ্যা সর্বাধিক। ১৯৬৫ সনে 'দেশ'-এর প্রচার সংখ্যা ৬২,৪০৪। বাংলা দেশের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা।

শ্রী কে. ডি. মালব্যের মন্তব্য—

শ্রী কে, ডি, মালব্য লোকসভায় কংগ্রেস দলের সদস্য হইলেও অনেক সময় স্পষ্ট কথা বলিয়া থাকেন। তিনি বলিয়াছেন, একদিকে যেমন চীন ভারতের সহিত পাকিস্তানের বিবাদ বাঁচাইয়া রাখিতে চায় অন্যদিকে তেমনই আমেরিকা ও বৃটেন সে বিষয়ে উৎসাহ দিয়া থাকে। এই তিনটি দেশের প্রভাব হইতে মুক্ত না হইলে ভারতের সহিত পাকিস্তানের বিরোধ মিটিবে না। বৃটেন ও আমেরিকা নানাভাবে ভারতকে সাহায্য করিয়া ভারতকে বিরোধের সহিত জড়াইয়া রাখিতেছে। শ্রী মালব্য প্রবীণ রাজনীতিক। তাঁহার কথা সকলের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

আমেরিকা ও রাশিয়ার আপোষ—

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট জনসন রাশিয়ার সহিত আমেরিকার আপোষের উপায় স্থির করার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বর্তমানে রাশিয়া ও আমেরিকা দুইটি দেশই খুব বেশী শক্তিশালী হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আপোষ হইলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু বিড়ালের গলায় কে ঘণ্টা বাঁধিবে? উভয় দেশই নিজ শক্তি বাড়াইবার জন্য বিশেষ উৎসুক।

দেশের বেকার সমস্যা—

তৃতীয় যোজনার শেষে ভারতবর্ষের মোট বেকার সংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ থেকে ১ কোটি। চতুর্থ যোজনার শেষে অর্থাৎ ৭০।৭১ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটি ৪০ লক্ষ। চতুর্থ যোজনার খসড়ায় দেখানো হইয়াছে, চতুর্থ যোজনা কালে অতিরিক্ত ২কোটি ৩০ লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থানের প্রয়োজন হবে। এদের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ৪-।৫০ লক্ষ লোক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের, একুনে ১ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থান করা যাবে। সুতরাং ইহাতে বুঝা যাইতেছে

যে, তৃতীয় যোজনার চেয়ে চতুর্থ যোজনার শেষে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

ডেপুটি স্পীকার পদে শ্রীনরেন সেন—

খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীনরেন সেন পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। আশুতোষ মল্লিকের পরলোক গমনে ঐ পদ খালি হইয়াছিল। নরেনবাবু প্রায় সারা জীবন নানা সমাজসেবা ক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন। তিনি আজীবন কংগ্রেস ভক্ত।

পঞ্চানন তর্করত্ন জন্মশত বার্ষিকী—

গত ২৯শে আগষ্ট সোমবার নবদ্বীপে স্থানীয় গ্রন্থাগার ভবনে পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের জন্মশত-বার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। একসময়ে তর্করত্ন বলিতে ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কে বুঝাইত। তিনি শুধু তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও স্মৃতিশক্তির জন্য সর্বজনমান্য ছিলেন না, বহু গুণেও তিনি ভূষিত ছিলেন। যৌবনে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি ১৯০৫ সালে গ্রেপ্তার হন এবং জেলে ৪ দিন অন্ন-জল গ্রহণ ও মলমূত্র ত্যাগ না করায় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। তাহারা রাজনীতিকে ধর্মালোচনার একটি অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ সম্পাদন, অনুবাদও প্রকাশ করিয়া তর্করত্ন মহাশয় সেকালে বাংলা দেশে শাস্ত্র প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন। সে সকল গ্রন্থ অতি সুলভে পাওয়া যাইত বলিয়া এখনও বহু প্রাচীন গৃহে সেগুলি রক্ষিত আছে। তর্করত্ন মহাশয় সরকার প্রদত্ত খেতাব 'মহামহোপাধ্যায়' প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি অতি সরল ও সাধারণ জীবনযাপন করিতেন। তাঁহার কথা এযুগে অধিক প্রচারিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা—

ক্রমশঃ যুদ্ধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের সর্বত্র অসামরিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হইতেছে। গত ৩০শে আগষ্ট এ বিষয়ে কলিকাতার তথ্যকেন্দ্রে আলোচনা সভা হইয়াছিল। এবং একদিন কলিকাতায় সাইরেন বাজাইয়া নাগরিকদের সে শব্দ অভ্যস্ত করা হইয়াছে। সর্বত্রই অল্প বিস্তর অসামরিক প্রতিরক্ষার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কবে যুদ্ধ হইবে কেহ জানে না। তথাপি আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সরকার পক্ষ সে কথা যে ভুলিয়া যান নাই ইহাই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

নদীয়া জেলায় নদীর জলবৃদ্ধি—

গঙ্গা ও জলঙ্গীর জল বৃদ্ধির ফলে নদীয়া জেলার বহু অংশ জলে ডুবিয়া গিয়াছে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে অনাবৃষ্টিতে চাষ হয় নাই। ভাদ্রে মরা নদীগুলি জলে ভরিয়া যাওয়ায় ফসলের ক্ষতি হইতেছে। সবদিক দিয়া দৈবের মার তথাপি সরকারী কর্মচারীরা তাহা রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

খরা ও বন্যার ফলে বিহারে বিরাট ক্ষতি—

গ্রীষ্মের সময় বৃষ্টির সময়, বিহারে নানাস্থানে ক্ষতি হইয়াছে। বহু স্থানে শস্যের চাষ করা সম্ভব হয় নাই। আবার সম্প্রতি কয়েকটি নদীর জল বৃদ্ধির ফলে যে সকল স্থানে চাষ হইয়াছিল সে সকল স্থান ডুবিয়া গিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উড়োজাহাজে করিয়া প্লাবিত স্থানগুলি দেখিয়া গিয়াছেন কিন্তু বিধি যেখানে বিরূপ সেখানে সরকারের চেষ্টা মানুষকে কতটা রক্ষা করিবে? আসাম পশ্চিমবঙ্গ বিহার সর্বত্রই এই দুরবস্থা।

ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের প্লাটিনাম জুবিলী—

কলেজ স্কোয়ারের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ায় এই বিখ্যাত সংস্থাটি সুযোগ্যভাবে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের "প্লাটিনাম জুবিলী" পালন করেছেন। গত ৩১শে আগষ্ট এই জুবিলী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে এই ইনষ্টিটিউটের নানা কার্য্যকলাপের প্রশংসা করেন এবং ছাত্রদের সুশৃঙ্খলতার সহিত গঠনমূলক কার্য করিবার আহ্বান জানান।

৭৫ বর্ষব্যাপী এই ইনষ্টিটিউটের কার্য্যকলাপ কলিকাতাবাসীর অজানা নয়। ছাত্রাবস্থায় এবং তৎপরেও অনেকেই এই বিদ্বজ্জনসংস্থার সহিত সংশ্রব বজায় রাখিয়াছেন। ১৮৯১

সালে "Society for the Higher Training of Young Men"-এই নামে এই সংস্থার পত্তন হয়। পরে এই নাম বদলাইয়া "Calcutta University Institute" এই নামকরণ করা হয়। এই সংস্থার সংগঠনে ও পরিচালনায় বাংলা দেশের যে সকল মনীষী এর পুরোধা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার রাসবিহারী ঘোষ, সার আর, এন, মুখার্জি, ডঃ হরেন্দ্র কুমার মুখার্জি, নাট্যাচার্য্য শিশির কুমার ভাদুড়ী, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রভৃতির নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান প্লাটিনাম জুবিলী অনুষ্ঠানটির প্রধান পরিচালকগণ হইতেছেন—পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় (সাধারণ সভাপতি), শ্রীরাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (চেয়ারম্যান), অধ্যক্ষ পি, কে বসু ও ডঃ বি, পি ত্রিবেদী (ভাইস্-চেয়ারম্যানদ্বয়), অধ্যাপক এন, এন চ্যাটার্জী ও ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (সাধারণ সম্পাদকদ্বয়) অধ্যক্ষ এস, কে, চ্যাটার্জী (সাংগঠনিক সম্পাদক), শ্রী পি, মল্লিক ও শ্রী মানন্দ মুখোপাধ্যায় (যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়)।

৭৫ দিন ব্যাপি এক বিরাট কার্যসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, অভিনয়, আবৃত্তি, বিতর্ক, যাদুবিদ্যা, কলা ও শিল্প প্রদর্শনী, পুস্তক প্রদর্শনী,নানারূপ খেলা ধুলা, শরীর চর্চা প্রভৃতি রহিয়াছে। ইহা ছাড়া একটি "ফ্রী টেকষ্ট বুক লাইব্রেরী"র প্রতিষ্ঠা করাও ইহাদের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

"ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্"-এর এই সকল জনহিতকর কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইতেছি এবং তাঁহাদের কার্য্যসকলের ও অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিতেছি।

বিজ্ঞানে ডি-ফিল্

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের লেকচারার শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ভারতের বিভিন্ন প্রকার ফলের বৈজ্ঞানিকসম্মত পদ্ধতিতে সংরক্ষণের বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিয়া 'ডক্টরেট ডিগ্রী' অর্জন করেন। তাঁহার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতের বিভিন্ন প্রকার ফলের সংরক্ষণে তাপ ও আর্দ্রতার প্রভাব।' তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ফলের পচন ও তাহার প্রতিরোধ সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান করেন। এবং একটি তথ্যগত মান সরবরাহে সমর্থ হন। তিনি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা ও ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহের সংস্পর্শে ও সাহায্যে গবেষণার প্রচুর অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। তিনি শৈবরসায়নের অধ্যাপক শ্রী ক্ষতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় গবেষণার কার্য করেন। ইহার পূর্বগবেষণার কার্যকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফলের পচন ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। শ্রীভট্টাচার্যের এই মৌলিক গবেষণায় ভারতীয় ও বৈদেশিক প্রখ্যাতনামা খাদ্য বিশেষজ্ঞেরা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার পিতা স্বর্গীয় হরিনাথ ভট্টাচার্য কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম চীফ্ ভ্যালুয়ার ও সার্ভেয়ার ছিলেন। আমরা ডঃ ভট্টাচার্যের সাফল্যে বিশেষ আনন্দিত।

নিবেদিতা জন্ম-শতবার্ষিকী—

গত ৩১শে আগষ্ট মহাজাতি সদনে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ নিবেদিতা জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা।

অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য যখন রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, শ্রীমতী পণ্ডিত ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মহাজাতি সদনে উপস্থিত হন, তখন একশত বালিকা শঙ্খধ্বনি করিয়া তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে ও ললাটে চন্দন তিলক পরাইয়া তাঁকে বরণ করা হয়। এই উৎসবের সভাপতি বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় অতিথিগণের অভ্যর্থনা করেন।

রাষ্ট্রপতি মহাজাতি সদনের অভ্যন্তরে মঞ্চে উপস্থিত হ'য়ে আসন গ্রহণ করিবার পর রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের ছাত্রীরা বৈদিক স্তোত্র গান করিয়া অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। অতঃপর অনুষ্ঠানের সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ভগিনী নিবেদিতার বিরাট প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। ভগিনী নিবেদিতার প্রতিকৃতির উপরেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব,শ্রীশ্রীসারদা-

মহাজাতি সদনে নিবেদিতা জন্মশতবর্ষ উৎসবের উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। বামদিক হইতে উপবিষ্ট শ্রীধীরাজ বসু (সাধারণ সম্পাদক), ডাঃ প্রীতিকুমার রায় চৌধুরী (মেয়র), মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র (সভাপতি, বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি), মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীমতি পদ্মজা নাইডু, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন।

ফটো—গোরা দত্ত

মাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি শোভা পাইতেছিল।

মাল্যদানের পর শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য অভ্যাগতদের একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে আলোচনারতা ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীশ্রীসারদা মাতার একটি চমৎকার চিত্র ও সমিতির গত আট বৎসরের উৎসবের স্মারক গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীসেন অতঃপর তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করার পর বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতির সম্পাদক শ্রীধীরাজ বসু সমিতির পক্ষ হইতে আসন্ন উৎসবের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

তিনি জানান যে, আগামী ১৮ই নভেম্বর থেকে ২৭শে নভেম্বর পর্য্যন্ত সুভাষবাগে (পূর্বতন শ্যাম স্কোয়ারে) একটি মণ্ডপে নিবেদিতা শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এখানে ভগিনী নিবেদিতার জীবনের প্রধান অধ্যায়গুলির পরিচায়ক স্বরূপ মাটির প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শন করা হইবে এবং তাঁর ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী, বিভিন্ন ফটো ইত্যাদি প্রদর্শনীতে স্থান পাইবে। এই উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলোচনা বৈঠকে, সঙ্গীত, নাটক, শিশুদের উপযোগী অনুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইবে। সমিতি এই উৎসব উপলক্ষে একটি ৫০০ পৃষ্ঠার স্মারক গ্রন্থ, নিবেদিতার চিত্র সম্বলিত একটি চিত্রপঞ্জী ও প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন। সমিতি ছাত্রদের মধ্যে একটি রচনা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করিয়াছেন।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতিবৎসর যে সব ছাত্রছাত্রী চারুকলা ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শাখায় প্রথম স্থান অধিকার করিবে তাহাদের নিবেদিতা শতবার্ষিকী পদক দিয়া পুরস্কৃত করার জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে ব্যবস্থা করিতেছেন।

ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিন ২৮শে নভেম্বরে তাঁর একটি প্রতিকৃতি লইয়া নগর ও নগরতলীর বিভিন্ন অংশ হইতে শোভাযাত্রা বাহির করা হইবে।

এর পরে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ভাষণের মাধ্যমে ভারতের কল্যাণে সেই মহীয়সী বিদেশিনী নারীর আত্মোৎসর্গের অধ্যায় মূর্ত্ত করে তুলেন এবং প্রকৃত ধর্ম্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন, যে মহীয়সী নারী এই দেশের আর্ত্তদের সেবায় জীবনোৎসর্গ করেছিলেন তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা ভারতবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য।

রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার শেষে কলিকাতার মেয়র ডাঃ শ্রী তরুমার রায় চৌধুরী রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য অতিথিগণকে ধন্যবাদ জানান। সর্ব্বশেষে শ্রীসন্তোষর মুখোপাধ্যায় ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে একটি সুললিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

গতি

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

অবিশ্রান্ত অব্যাহত গতির ধারায়
ব্রহ্মাণ্ড—জ্যোতিষ্কপুঞ্জ—তৃণগুল্ম ভেসে চ'লে যায়
নিশানা-বিহীন দেশে
দিকু দৃষ্ট আকাশের শেষে।
সেথা হ'তে উজ্জীবন লভে লক্ষ প্রাণ।
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের বিচিত্রিত গান হ'য়ে বহমান
ফেটে পড়ে নিদারুণ দাবানলে—গলিত লাভায়।
বহ্নুদ্গারে সেথা প্রাণ অর্বুদ-অর্বুদ মূর্তি পায়।

(২)

হেথা যে নিরালা এক নদীতীরে বসি
হেরিতেছি ওই চন্দ্র—এই মুখ-শশী;
নদীর কল্লোলে
যুগপৎ যুগ্ম বক্ষ ভাবাবেগে দোলে;
বক্ষের স্পন্দনে,
শোণিতের রুদ্র আলোড়নে
শোনো না কি ক্ষণে ক্ষণে
অকারণে
রহস্যের ইঙ্গিতের সংকেতের ভাষা?
বোঝো না কি বোবা ভালোবাসা
অহরহ কয়
জঙ্গম জোয়ার-জলে মিশালে হৃদয়
যে বেগ সঞ্চারে
সেই বেগে ভেসে আসি,—দু'জন দোঁহারে
সেই বেগে করি আলিঙ্গন;—
এইতো জীবন।

(৩)

এই যে অশেষ গতি—উদ্দাম বিহার,
অজানার টানে-টানে চলা অনিবার,—
ইহারও নাহি যে শেষ—নাহি যে সূচনা।
কে গণিবে সমুদ্রের অগণিত বুদ্বুদের কণা।
মুহুর্মুহু বিস্ফোরণে
সৈকতের সংঘাতের মহা-আলোড়নে
মত্ত ঢেউ উঠে আর পড়ে;
অবশেষে সংকোচিত সমুদ্রের মহামূর্তি গড়ে।
রূপ নিতে নিতে রূপ অরূপে মিশায়।
রূপসম্পদে তৃপ্ত যত—তা'রও মাঝে হায়
অতৃপ্তির জ্বালা নিরন্তর;
আপাত-স্থিতির মাঝে আবেগ দুর্মর
গতি-প্রমত্ততা
নিয়ে আসে,—রক্তে পাই তা'রই তো বারতা।

(৪)

রহস্যের গ্রন্থি খু'লবে কে?
গতির আরম্ভ কোথা কে আসিবে দেখে?
ক্রমবিবর্তিত গতি কোথা স্তব্ধ হবে
সন্ধান তাহারও কে বা ল'বে?

(৫)

ভেসে চলো—গেয়ে চলো—কথা বলো যতক্ষণ থাকো;
মোহ হোক্—মায়া হোক্ তবু প্রিয়া, প্রিয়-নামে ডাকো।
নৃত্যন্ত তরঙ্গ 'পরে
চলন্ত চরণ ভরে
নিরবধি সময়ের যদি চিহ্ন-লেশ
থাকে অবশেষ
গতিরই তা' আকস্মিক সাময়িক স্মৃতি
মায়াচ্ছন্ন তাহাতেই থাকুক না ক্ষিতি।
স্থিতি-ভ্রান্ত খণ্ড-কালে অ-বারিত মহাকাল পাক্ পরিমিতি।

উপন্যাস

পাপের নেপথ্যে

জয়শ্রী চক্রবর্তী

—সমস্ত স্বীকারোক্তি তাহলে সত্য ?

—হ্যাঁ, যা বলেছি ওদের সর্বই সত্য !

—তোমার বিশ্বাস মতে লিখিত স্বীকারোক্তি নির্ভুল ?

—হাঁা, আমার বিশ্বাস মতে নির্ভুল !

পুরু ফ্রেমে আঁটা চশমার কাচের আড়ালে এক জোড়া বিস্মিত—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ধীরে ধীরে নেবে এলো টেবিলের কাগজ পত্র গুলোর ওপর। কালো কালো অক্ষরে—রিপোর্ট—! রিপোর্ট ! ইনভেষ্টিগেশানের,—লোকাল এনকোয়ারীর, বিভিন্ন তদন্তের, বিভিন্ন সাক্ষী সাবুদের !

ক্ষিপ্র হাতে সেগুলো নেড়ে চেড়ে—বিচারক আবার মুখ তুললেন। —চশমার আড়ালে অনুসন্ধিৎসু চোখ দুটো যেন আবার বিঁধে গেল—কাঠগড়ার বন্দিনীর দিকে। কাঁচের আড়ালে দৃষ্টিটা—রহস্যজনক ভাবে নড়ে চড়ে উঠতে লাগল। ক্রমশঃই বিস্ফারিত বিস্মিত সেই—দৃষ্টি, ক্রোধে এবং ঘৃণায় জ্বলতে জ্বলতে— অপরাধিনীর আপাদ-মস্তককে গ্রাস করতে লাগলো। নির্বিকার, নিঃসংশয়—নিরপরাধ ভঙ্গীতে—কাঠগড়ার সেই বন্দী মূর্তিটা অবিচল ভাবে দাঁড়িয়েছিল ! শুধু অবহেলায় তার খোলা চুল বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল—শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে পড়েছিল,—নিরাভরণ চেহারাটি যদিও, তবু আভিজাত্য পূর্ণতায় সম্ভ্রান্তই মনে হচ্ছিল···খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন বিচারক। কাঁচের আড়ালের সেই দৃষ্টি—গভীর রহস্যে তলিয়ে গিয়ে···

—বাদশার জবানী সত্য ?

—না, আমাকে বাঁচাবার জন্যে নিজের দোষ বাড়িয়ে দিয়েছে।

—তার প্রমাণ ?

—ভগবান সাক্ষী !

আশ্চর্য ! মুখে ভগবানের নাম। স্তম্ভিত হলেন বিচারক। সেই রহস্যাবৃত চোখজোড়াটা নড়ে চড়ে উঠল অদ্ভুত ভাবে।

—তুমি ভগবান মানো ?

—মানি ! তাঁকেই তো একমাত্র জানি ! বন্দিনীর কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো।

—তাহলে তাঁকে মেনে এবং জেনেও এই মহাপাপ তুমি কি করে করলে ? তুমি কি জানোনা—এ' গুরু অপরাধের ক্ষমা তিনি করেন না।

—জানি বৈকি ! তাইতো আসতে হয়েছে আদালতে। কিন্তু কই, তাঁর এত বড় প্রতাপ, এত বড় শক্তি সেই নিরপরাধ বালকটিকে তো রক্ষা করতে পারলনা ! এমনি কত নির্দোষ নিরপরাধকে বাঁচাবার জন্যে ভগবান কখনও

নেমে আসেন নি মর্ত্যে। শুধু, অপরাধিনীর বিচারের জন্য বুঝি আদালতে পাঠিয়েছেন—আমাকে!

ভগবানের নাম, প্রহসন! নিষ্ঠুর উপহাস! অবজ্ঞা মিশ্রিত হাসিতে বন্দিনী দুলে উঠলো! কাঠগড়ার রেলিং শক্ত হাতে চেপে ধরলো।···

—আমি সেই নিরপরাধ বালককে ময়দান থেকে ভুলিয়ে এনেছিলাম। বন্দিনী বলতে লাগলো, অতটুকু ছেলের প্রতি ভগবানের করুণা হয়নি। কিন্তু খুনে বাদশার মনও গলে পড়েছিল দয়ায়। সুবলের চোখ দুটো বড় মায়াবী ছিল! ছল ছল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে, ওর কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছিল মনে হচ্ছিল, 'মাসী' বলে তখুনি ও কেঁদে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকের মধ্যে। তাই তার মুখের দিকে চেয়ে আমি ভীষণ গম্ভীর হয়েছিলাম—খুব একটা নিষ্ঠুরতার ছাপ মুখে ফুটিয়ে তুলছিলাম। আর তাতেই যেন আরো বেশী ভয় পাচ্ছিল ছেলেটা। প্রথম দিকে সে আবদার করেছিল—আমাকে বাড়ী নিয়ে চলো মাসী, এখানে আমি থাকবনা মায়ের কাছে চলে যাব। জোরে তখন ধমক দিয়ে তাকে কণ্ঠরোধ করেছিলাম। হঠাৎ ভয় পেয়ে সুবল একেবারে চুপ করে গিয়েছিল। শেষে আমার মুখখানাই দেখছিল বার বার, চোখ দুটো বার বার জলে ভরে উঠছিল, সেই দেখেই তো বাদশা কেমন কোমল হয়ে যাচ্ছিল···। শয়তান পাঠানের সেই বিশাল শরীরটা কি ভাবে যেন কাঁপছিল। বলিষ্ঠ তার একখানা হাত—সুবলকে আদর করবার জন্য এগিয়ে গেলে—আমি সজোরে তাকে ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম—সাবধান বাদশা! সময় নেই। আমার কথায় বাদশা চমকে উঠলো। ধীরে ধীরে হাতটা সরিয়ে নিল। সুবলের দুচোখে কি সাংঘাতিক একটা ভয় উপছে পড়ছিল আর তত যেন সে এই পাতালে পুনে মাসীটার দিকেই চেয়ে পালাবার প্রার্থনা করছিল, সে ভাবছিল, আমি তাকে ছলনায় ভুলিয়ে আনলেও, আমিই তাকে রক্ষা করবো। ভগবান তখন কোথায় ছিল? সুবলকে রক্ষা করতে তো বাদশার দরবারে এলোনা। কিন্তু বাদশা? জীবনে সে কত খুনই করেছে—জীবন-ভোর কি ভয়ঙ্কর পাপই না সে করে গেছে, তবু, একটা ছোট ছেলের মুখের দিকে চেয়ে—ওর ভীষণ রক্তাভ চোখ দুটোও যেন জলে টল্ টল্ করছিল। থর থর করে কাঁপছিল বাদশার বলিষ্ঠ ঋজু দেহটা। আমার দিকে তীক্ষ্ণ ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, বাদশা, একি তোমার সাজে? তুমি না খুনের রাজা? কত নিষ্পাপ নিরপরাধকে নির্বিচারে খুন করে—আজও তোমার দুখানি হাত রক্তাক্ত হয়ে আছে! আর সেই হাতে ছেলেটাকে জড়িয়ে আদর করতে গেলে?

অদ্ভুত মুখ ভঙ্গী করে, বাদশা আমার দিকে চেয়ে বিচিত্র হাসি হাসলো, কি একটা বলতে চাইলো—কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে গেল, উদগ্র ঘৃণা ক্রোধে—তার মুখ ভয়ঙ্কর বীভৎস হয়ে উঠলো। আমি সে মুখের দিকে চেয়ে আশ্বস্ত হলাম। মনে হোল, বাদশার ঘুমন্ত শয়তানের ঘুম ভেঙেছে। দেখলাম— তার রক্তাভ চোখ আরো গাঢ় লাল হয়ে উঠছে, দুটো আগুনের গোলা যেন—দপ্ দপ্ করে জলছিল! জগতের সমস্ত মেয়েমানুষের ওপর যে ভয়ঙ্কর জিঘাংসা তার বুকে আগুন জেলে রেখেছে—সেই আগুনই যেন ঠিকরে আসছিল দুটো চোখের ভেতর দিয়ে। সেই বেয়াল্লিশ ইঞ্চি শক্ত বুকের পাটা ভেঙে বীভৎস রক্ত-খেকো সেই খুনের মুখখানা বেরিয়ে আসছিল।

আমার ওপর যে মমতা এতদিন যে অদৃশ্য মানবতার জগতে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল শুধু একটা কৃতজ্ঞতায়—তাকে ঘুম ভাঙাতে গিয়ে যেন নিজেই আমি সেই হঠাৎ জেগে ওঠা খুনেটার শিকার হয়ে যাচ্ছিলাম। সুবল তখনও আমার মুখের দিকে চেয়েছিল, দুচোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ছিল। ভয় দেখিয়ে ধমক দিয়ে—তার বাঁচবার আর্তনাদকে যে ভাবে শ্বাস রুদ্ধ করে রেখেছিলাম, তাতে ও' চুপ করেই কাঁদছিল। অঝোর জলের ধারায়—বাদশার দরবার যেন ভেসে যাচ্ছিল···

বাদশা আমার কাণের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠলো—বাদশা জেগেছে—হুঁশিয়ার হয়েছে। কিন্তু তুই একটা মেয়ে মানুষ হয়ে—কি করলি আমায়? ইচ্ছে করছে তোকেই খুন করি—তোর রক্ত পান করে—পিপাসা মেটাই···বলতে বলতে, বাদশা চলে গেল পাশের ঘরে। আমিও তখন তাকে অনুসরণ করে গেলাম। বাদশা যেন খুব ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে মাটিতে ধুপ করে বসে পড়লো। সেই রক্তাভ চোখ দুটো নিভে আসতে চাইছিল। আমি তখন তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—

মেজাজ ঠিক করে নাও বাদশা বলে তাকে সুরা পান করতে দিলাম। যেটা না হলে—বাদশার সেই আদিম মানুষটা জেগে ওঠেনা! বাদশা বললো—আউর! আরো সুরা তাকে ঢেলে দিলাম রঙিন কাঁচের গ্লাসে। ধীরে ধীরে বেহুস হচ্ছিল বাদশা নিজেকে আর সামলাতে পারছিল না। আমি তখন তাকে ইশারা করলাম পাশের ঘরে যেতে যেখানে বসে সুবল কাঁদছিল তখনও···

উঃ ভগবান, তুমি যে আরো বড় নিষ্ঠুর! আরো বড় খুনে! একটি নিরপরাধ বালকের গলা টিপে ধরে বাদশা যখন অট্টহাসি হাসছিল, আমার বুকে বিচিত্র আনন্দ উল্লাসের জোয়ার বইছিল, তখন তুমি কোথায় ছিলে? কোথায় ছিল তোমার সেই প্রতাপ—অজেয় শক্তি যা পৃথিবীর সমস্ত শয়তানের সর্বনাশ করতে পারে এক লহমায়? সামান্য একটা মেয়ে মানুষের কথায় যে শয়তানটা—এত বড় পাপ নির্বিচারে করলো, কই তার শাস্তি দিতে তো সে সময় মর্ত্যে নেমে এলে না?

সুবলের মৃত দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে বাদশা সদর রাস্তায় বেরিয়ে গেল। তখন আমি ছুটে গিয়ে বাধা দিতে গেলাম, বাদশা শুনলনা। বিন্দু মাত্র ভয়ে পাঠান খুনের বুক কাঁপলনা। বরং উন্মত্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল—"খবরদার? জানের ভয় করেনা বাদশা—যেমন জান নিয়েছি তেমনি নিজের জানও দোব।" বলতে বলতে বাদশা ছুটে গেল—জনবহুল পথের ওপর দিয়ে।

দলের অনেকেই তখন ছিল না। নানা রকম দুষ্কর্মের জন্য তারা বেরিয়ে পড়েছিল সন্ধ্যের ভেতর। ছিল মোরাদ। পকেট কাটা—চতুর সেই মানুষটা মাঝে মাঝে ভীরু দুর্বল বলে, যাকে নিয়ে দলের দুঃসাহসীরা বিচিত্র তামাসা করতো বাদশার এই কাণ্ড দেখে—ভীত মোরাদ আমার হাত চেপে ধরে বলে উঠলো বাদশা পাগলা হয়ে গেছে—ওস্তাদজীর মাথা বিগড়ে গেছে। ওকে তুইও বাঁধতে পারলিনা! এখুনি যে পুলিশ ওকে ধরবে—সেই সংগে আমাদেরও—আমাদেরও···বলে, ও কাতর মিনতি করলো—আয় আমরা দুজনে এখুনি পালিয়ে যাই। বাদশা আমাদের সর্বনাশ করে দেবে।

সজোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলাম—মেয়েমানুষ হতে পারি, কিন্তু তোদের মত বেইমান নই, বাদশা তার হাতদিয়ে খুন করেছে ছেলেটাকে—সে তো আমার কথায়, আমার জন্যেই। বাদশার পা জড়িয়ে একদিন কেঁদে অনুরোধ করেছিলাম—বাদশা, তোমাকে এ' কাজ করতেই হবে। তুমি ছাড়া আর এ' কাজ কেউ করতে পারবেনা। শয়তান প্রবাল দত্তের বংশ আমি বিলোপ করে দোব। যেমন করে সে আমার ওপর নিষ্ঠুর প্রতারণা করে-যে নরকে ঠেলে দিয়েছে·· সেই নরকের স্বাদে আমি আর এক মানুষ হয়েছি! যদি তাকে পেতাম, তাহলে তারই ওপর প্রতিশোধ নিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য—খোঁজ নিয়ে জানলাম, প্রবাল দত্ত পৃথিবী ছেড়ে পালিয়েছে। তাই তার নাগাল পেলাম না। এই চোরা পল্লীতে এসে বারো বছর ধরে আমার বুকে যে প্রতিহিংসা জ্বলছে—আমি তা চরিতার্থ করবো। জানি, প্রবাল নেই। কিন্তু সেই অভিশপ্ত দত্ত-ভিলাটা আছে—আছে সেই শয়তানের একমাত্র উত্তরাধিকারী বালক সুবল দত্ত। উর্মিলার একমাত্র সন্তান।

সময় ছিলনা, মোরাদ বললো—আমি পালাই। বললাম বাদশাকে ফেলে আমি পালাতে পারবনা—তোরা যা যে যেখানে খুসী। আশ্চর্য, এই কথায় মোরাদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। একটা মেয়ে মানুষের বুকের সাহসে—ও চমকে উঠলো। তবু সেই চোরা পল্লীর অন্ধকার রাত আশঙ্কায় থম থম করছিল রাতের মত বোবা ভয়ে নিথর নিস্পন্দ হয়েছিল সমস্ত আস্তানাটা। সমস্ত জগৎ সংসারের বুকটা সহসা খালি হয়ে গেলে যেমন হয় তেমনি চোরা পল্লীর অন্ধকারে রাতের গোপন সংসারটাও কেমন ভয়াবহ শূন্যতায় ভরে উঠলো।

—বাদশার দোষ কি! দোষ তো আমিও করিনি। প্রতিশোধ নিতে গেলে পশু হতে হয়—তেমনি হয়েছিলাম। বড় আফশোষ হচ্ছিল আমার প্রবালকে কেন পেলাম না হাতের মুঠোর মধ্যে!

—যদি সে হিন্দু না হয়ে অন্য ধর্মের হোত—তাহলে তার মৃতদেহ মাটির নীচে কফিনে শোয়ানো থাকতো। আমি সেই মৃতদেহ মাটি খুঁড়ে তুলে নিতাম। শেয়াল কুকুর যেমন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়—তেমনি করে আমার সমস্ত প্রতিশোধ দিয়ে—সমুচিত জবাব দিতাম।

ভগবান আমার সামনে থেকে সে সুযোগ ছিনিয়ে নিয়েছিল। তাই আফশোষে, মর্মদাহে প্রতিশোধ স্পৃহায় আমার সমস্ত বুক ভাঙছিল। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম বার বার বন্য ক্ষুধার্তের মত অশরীরী প্রবালকেও যেন খুঁজে বেরিয়েছিলাম—মধ্য-রাতের অন্ধকারেও। কখনো মাথার চুল ছিঁড়তাম, পাগলের মত আর্তনাদ করে উঠতাম, বাদশা তখন আমার মুখ চেপে ধরতো, ধমক দিয়ে বলতো—চুপ রহো বিবি! খোদা উসকো সাথ কভি নেই দোস্তী হোগা। ওই বেইমানের সমস্ত টুটে দেবে ভগয়ান।

বাদশার মুখে খোদার নামের সেই অদ্ভুত সান্ত্বনা, আমাকে আরো ক্ষেপিয়ে তুলতো। উন্মাদের মত আর্তরবে বলতাম—লজ্জা করেনা তোমার বাদশা, খোদার নাম মুখে আনতে? তুমি তো কত মেয়েমানুষের জান খেয়েছো, তোমার বিচার কে করবে?

বাদশা হাসতো তখন। দাড়ি ভরা মুখটা নেড়ে নেড়ে দরাজ হাসিতে তার সোনা বাঁধানো সামনের দাঁতগুলো—অন্ধকার রাতের জোনাকীর মত জ্বলতো! চোরা পল্লীর নিভৃত আলো-অন্ধকারে বাদশাকে বড় বিচিত্র, ভয়ঙ্কর দেখাতো।

বাদশার সেই দরাজহাসি সহসা থেমে যেতো। বড় বড় লাল চোখ দুটো জলে ভরে টল টল করতো। আর্দ্র গলায়—বাদশা বলতো শুধু—মেয়েমানুষকে বাদশাও চেনে। বাদশার হারেম থেকে বিবি আমার যেদিন আজব—মোহব্বতের ঝুট নেশায় পালিয়ে গিয়েছিল—গোলাম শয়তানের সংগে, তখন এই বাদশাও দেখেছিল, তার মত কত মরদের শক্ত জান নিয়ে ওই মেয়েমানুষের জাতটাও—জুয়া খেলেছিল খুশিতে। একবারও তারা ভাবেনি—সংসারে আমরাও বাঁচতে চাই, আনন্দ করতে চাই—দুঃখ হলে কাঁদতে পারি। এ যে সব মানুষের এক স্বভাব। সেখানে দুঃখ আনন্দের ভেদাভেদ নেই। শুধু ওই দু'রকম—দুটো চেহারা—নারী আর পুরুষ। কিন্তু তাদের জানটা কি দু'রকম, ওখানে খোদার বিচার এক।

বলতে বলতে বাদশার রক্তাভ চোখের কোল ভেঙে পড়লো অঝোর জলে। সেই চোরা পল্লীর রাতের মানুষটা—কি যেন হয়ে গেল। তারপর সম্বিৎ পেয়ে বাদশা যেন চমকে উঠলো—তোবা! তোবা! বলে, চোখ মুছলো, বীর ভঙ্গিতে টান হয়ে দাঁড়িয়ে—ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললো—তোরা পারিস, তোরা সব পারিস। জ্যান্ত মানুষ মরা মানুষকেও খেতে। তোরা মেয়েমানুষ, কিন্তু আরো ভয়ঙ্কর, আরো শয়তান! বলেই, বাদশা আমার কাছে এগিয়ে এলো, আমার মুখের ওপর ওর ক্রুদ্ধ মুখখানাকে নাবিয়ে এনে দাঁত ঘষে ঘষে বললো—ইচ্ছে হয় এই মুহূর্তে তোকে খতম করে ফেলি। মেয়েমানুষের তাজা রক্ত দেখে বাদশার জানটা ঠাণ্ডা হোক।

না, না, না। বাদশা বেইমান নয়। মনে পড়ে বিবি, সেই রাতটা? সেই একটা মেয়েমানুষের দয়ার কথা? ওহো! তুই তো সেই-ই মেয়েমানুষ। তোর কত বড় দয়ায় সে রাতে বাদশার সর্বস্ব রক্ষা পেয়েছিল। সামাল দিয়েছিলিস জোর। তোর মায়াতে না বাদশার অতবড় দলটা ধরা পড়লোনা পুলিশের হাতে।

আমার বেশ মনে আছে—প্রিন্সেপ ঘাটে গিয়ে তোকে জাহাজে তুলছিলাম···বিক্রির মাল বিদেশে চালান দিতে হবে। সবে সন্ধ্যে হয়েছিল। সমস্ত ঘাটটা নিঝুম হয়েছিল। বাদশার দল জাহাজে উঠেছিল তোকে নিয়ে। খালাসীদের—বখরা দিয়েছিলাম আগেই। তোকে বিবি সাজিয়েছিলাম। বোরখা পড়িয়ে মুখ ঢেকে দিয়েছিলাম। তোর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছিলাম। সব মেয়েমানুষ ধরে এমনি করে সাজিয়ে বাদশা তার ব্যবসা করেছে। তুই সবই জানতে পেরেছিলিস। তবু মুখ ফুটে কথা বলিস নি। হয়তো ভয়ে। বাদশারও দয়ার শরীর করে জখম হয়ে গিয়েছিল—হারেম থেকে যেদিন তার আসল বিবি পালিয়েছিল। কত মেয়েমানুষকে জান নেবার ভয় দেখিয়ে জাহাজে তুলতে তুলতে—কেমন এক শয়তান-বনে গিয়েছিলাম, খালাসীরা বখরা পেয়েও বলতো—বাদশাজী, তোমার বুকের ভেতর জানটা কি নেই? আমি তো হেসে মরতাম—হাসতে হাসতে বলতাম—ভাগ নিয়ে, তোদেরও যেমন জান মেয়েমানুষের জন্য কাঁদেনা—তেমনি এই কাঁচা রূপেয়ার লোভে বাদশারও দয়াধর্ম থাকেনা। এতো এক জবর ব্যবসা! এ' ব্যবসায়ে যে তোরাও সব বড় বড় ভাগীদার—বড় বড় শয়তান!

বাদশার শুধু কেরামতি! ওস্তাদী খেল! শুধু এই টুকু আমার বেশী।

হ্যাঁ, মনে পড়ে, কি ভাবে পুলিশগুলো খবর পেয়ে প্রিন্সেপ ঘাটের জাহাজ ঘেরাও করেছিল। সেই সময় জাহাজ ছাড়বার মুখে, বাঁশী বাজলো নোঙ্গর তোলা হোল—খালাসীরা যে যার কাজে মেতে গেছে। ঠিক সেই সময়—'রখো' 'রখো' করে কারা যেন তেড়ে এলো দলবলে। দলের সবাই সভয়ে দেখলো, পুলিশ! সর্বনাশ! আমি আর আমার ভাগীদারগুলো ভয়ে কেঁপে উঠলো···ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে এলো জেটির ওপর। সমস্ত জাহাজটা যেন দোল খেতে লাগল। ব্যাপার বুঝে সকলকে ইশারা করে আমি কেবিনে ঢুকলাম। তোকে দেখলাম তখনও ভয়ে ভয়ে বসে থাকতে, সময় ছিলনা। চারদিকে গোলমাল চুপি চুপি করে তাড়াতাড়ি করে তোকে বলে দিলাম—পুলিশ! যা শেখানো আছে তাই বলো। বোরখার ভেতর তোর মুখখানা যেন নড়ে উঠলো। উপায় তখন ছিলনা -পালাবার। তবু, ভয়ে মনে হচ্ছিল—সব তুই বলে দিবি ওদের। বলে আমাদের ধরিয়ে দিয়ে তুই দরজা খোলা খাঁচার পাখীর মত পালিয়ে যাবি—বাদশা শয়তানের কবল থেকে। হা, ভগবান, কি আজব তোমার খেল! দুনিয়া ভোর তোমার—এই বহুৎ আচ্ছা খেল চলছে। তাই না কি ব্যাপার ঘটে গেল!

পুলিশগুলো ওদিকের থানা তল্লাসী শেষ করে—আমাদের কেবিনে ঢুকলো, ওদের দেখে যেন তুই লজ্জায় মরে গেলি। শরমে মরে গিয়ে—আমার আরো কাছে সরে এলি। যেন ভয় পেয়ে তুই তোর আপন মানুষের কাছে পালিয়ে এলি। কি চমৎকার তোর অভিনয়! কি খাসা সেই বাদশার কিস্মৎ! আমার জান ফেটে যাচ্ছিল আনন্দে—আদরে তোকে বাদশার বুকে গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছে—করছিল। কিন্তু ওরা যখন সব চলে গেল—আমাদের সন্দেহ না করে—তখন কেবিনের মধ্যে শুধু আমরা দুজন মানুষ। তখন এই খুনে বাদশার মন কোথায় পালিয়ে গেল। তোর দয়ায়—দুনিয়ার চেহারা গেল বদলে। তখন আমি আর শয়তান নেই। বেহেস্তে গোলাপবাগিচায় বসে—তোর মত একটা সুন্দর বিবিকে সংগে নিয়ে। সে কি সাধ আমার জেগেছিল! সংসারে যে, পাপ আমাকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছিল—সেও তোর দয়ায় আমি বদলে গিয়েছিলাম।

কোন সুখের ইচ্ছায়—তোকে বুকের মাঝে এনে আদর করতে চেয়েছিলাম। বাদশার হৃদয় যেন গলে পড়ছিল—স্নেহ ভালবাসায়—পরম বন্ধুত্বে। মেয়েমানুষকে কখনো খোদার দাসী বলে তো ভাবিনি—ভাবতাম, দুনিয়া-ভোর ওরা জেগে আছে—বাদশার মত পুরুষদের বুকের আগুন জ্বালাতে। নেভাতে নয়। কিন্তু কখনো বুঝিনি সে আগুনও তোরাই নেভাতে পারিস। কেবিনের সেই আঁধার রাতে—বাদশার জীবনের সেই ভয়ঙ্কর গণ্ডটা চোরের মত যেন পা টিপে টিপে সেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছিল। তবেই না বাদশা মানুষ হয়েছিল। কিন্তু তারও আগে? যখন বাদশা শয়তান জাহাজে মেয়ে তুলে কেবিনের অন্ধকার কবরে—তাদের সোনার সম্ভ্রমকে পায়ে পিষে ফেলতো তাদের বড় লজ্জার মানকে নিষ্ঠুর ভাবে খুন করতো—সেই খুনেটা সেই পাঠান আমীর খাঁ—জল্লাদ বাদশাহী এক রাতের মধ্যে কি হয়ে গেল··· জাহাজ থেকে সেই রাতেই তোকে নাবিয়ে নিয়ে এলাম, এই চোরা পল্লীর বাদশা সাহেবের দরবারে এনে—তোর সম্মানকে চিরদিনের জন্য বাঁচালাম।

আস্তানার সবাই বাদশার কাণ্ড দেখে ভড়কে গিয়েছিল। সকলকে বলেছিলাম, আমার বিবি—আমার ঘরে তাকে নিয়ে এলাম। আমার অন্ধকার হারেমে এবার আলো জ্বলে উঠুক। তোরা সকলে দেখে আনন্দ কর।

সেই রাতের জন্য বাদশা তোর কথা কোনদিনই ফেলতে পারবে না। একটা জিনিসের জন্যে আজও তোকে আপন ভাবি—ভাল মনে করি। সে তোর দয়ার মনটার জন্যে, কি দয়া দেখিয়ে না আমায় এমন করে দিলি। সেই দয়া দেখেই তো জেনেছিলাম—মেয়েমানুষ শয়তানকেও ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু আজ? তোর মনের সেই দয়া-মায়া কোথায় গেল?

একি, তোর হোল বিবি! কার ওপর শোধ তুলবি বলে, এমন করে ক্ষেপেছিস? বারো বছর আগে যে তোর সর্বনাশ করেছিল, তার কথা এতদিনেও ভুলে যেতে পারলি না? সে শয়তান তো দুনিয়া থেকে ভেগেছে। তবে, তবে কার ওপর তোর এই হিংসা? খুনের তৃষ্ণা?

বাদশার সমস্ত কথার পর আমার চোখ দিয়ে আরো যেন আগুন বের হচ্ছিল। ক্রোধে, ঘৃণায়, দুঃখে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছিলাম। বাদশার দুটি হাত ধরে আর্তরবে বলে উঠলাম—হ্যাঁ, সে দুনিয়া থেকে ভেগেছে সত্যি'—কিন্তু সেই শয়তানের বীজ তার শিশু সন্তানের মধ্যেও ঘুমিয়ে আছে। ওই বালক সুবল দত্ত—বড় হয়ে তার বাবার মতই হয়ে উঠবে প্রবাল দত্তের মত—আরো এমনি, কত মেয়ের সর্বনাশ করবে। তার ঝাড় নির্মূল করে দেব আমি। আমি খবর নিয়েছি। দত্ত-ভিলার সামনের ময়দানে প্রবালের ছেলে সুবলকে নিয়ে বেড়াতে আসে তাদের বাড়ীর নতুন দাসী। সুবলের সেই মা সেই ঊর্মিলা। ঊর্মিলা তার একমাত্র ছেলেকে সাজিয়ে গুছিয়ে দাসীর সংগে ময়দানে পাঠায় বেড়াবার জন্যে। আমি যাব সেই ময়দানে ছেলেটাকে ভুলিয়ে আনতে বাদশা, তুমি আমার কথা রেখো···তোমার পায়ে পড়ছি বাদশা।

তারপর থেকে রোজ বেড়াতে যেতাম ময়দানে। মাথায় ঘোমটা দিয়ে বাংলাদেশের মাতৃমূর্তির সাজে গিয়ে বসতাম ময়দানে—যেখানে সুবল আর দাসী এসে বসতো··· ধীরে ধীরে তাদের সংগে আলাপ জমিয়ে নিলাম। সন্তানহীনা এক মায়ের ভূমিকা নিলাম। যেন নিজের সন্তান হয়নি বলে—অন্য সন্তানের প্রতি কত আসক্তি! দাসীকে প্রায় ভোলাতাম—ঠিক ওই রকম—ওই রকম একটা আমার ছেলে হয়েছিল। কিন্তু আমাকে ছেড়ে সে চলে গেল। কিন্তু আর কেউ আর এলো না এত বছর ধরে। বুকটা কেমন করে যেন—কোলটা 'খালি খালি' মনে হয়। মনে হয় এ জীবনে আর কিছুই নেই—সব আমার শূন্য। আমি সর্বহারা!

আমার সন্তান শোকের অভিনয় দেখতে দেখতে সেই গ্রাম্য সরল দাসীটার চোখ দুটোও জলে ভরে উঠতো। কখনো দেখতাম সে নিজেই আমাকে দেখিয়ে সুবলকে বলছে—ওই দেখো কেমন সোন্দর তোমার গো মাসী—উনার কাছে এখন থাকবেক গো কেমন—সুবো! সুবল প্রথম প্রথম ঘাড় নেড়ে নেড়ে আপত্তি জানাতো। বেজায় নাক সিঁটকে আমার দিকে তাকাতো। কপাল কুঁচকে বলতো—মাসী না হাতী। আমার মাসী আছে নাকি! বলতে বলতে সুবল ছুটে গিয়ে—মাঠের সবুজ নরম ঘাসের ওপর গড়িয়ে পড়ে—কতভাবেই না খেলা করতো।

কখনো দেখতাম, আকাশের দিকে চেয়ে হাত পা ছুঁড়ে—গুন গুন করে গান গাইছে। গান ভালবাসতো, ফুল ভালবাসতো। ফুল দেখলে ছেলেটা খুসীতে মরে যেতো। ওকে জয় করবার জন্য ফুলের সন্ধানে পার্কের দূরে চলে যেতাম···কল্কে ফুলের বড় দুটো গাছ ছিল। তার নীচে পড়ে থাকতো অজস্র ফুল। সেগুলো আঁচল ভরে তুলে এনে ছেলেটাকে দিতাম। তাতেই সুবল আস্তে আস্তে বশ হয়ে গেল। আমাকে মাসী বলে ডাকতে সুরু করলো। আমাকে কত আপন ভেবে কোলের ওপরও চড়ে বসতো। ফুল এনে দেবার জন্য আবদার করতো। আমার কাছেই প্রায় থাকতো—দাসীটার চেয়ে চোখে পাতানো মাসীটাই আপন হয়ে গেল। আমার গলা জড়িয়ে কত কি যেন বলতো—কত প্রশ্ন—কত আবেগ, কত ছেলেমানুষীতে ছেলেটা উচ্ছল হয়ে উঠতো। আমি ওকে জড়িয়ে আদর করতাম। আদর করতে করতে আমার দেহ মন ভীষণ ভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে। সেই বিক্ষিপ্ত পাগলামীর গুপ্ত আক্রোশে—ওকে সবেগে চেপে ধরতাম বুকের মধ্যে। উঃ লাগছে বলে, সুবল পালিয়ে যেতো আমার কোল থেকে। আমি সশব্দে হেসে উঠতাম ওর গোলাপী গাল টিপে বলতাম—দুষ্টু কোথাকার!

দাসীটা কোন কোন দিন সুবলকে আমার হেফাজতে রেখে পার্কে এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াতো। ভাবতাম, এইভাবে কোন একদিন সুযোগ কিনে নেব। ভাবতে ভাবতে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো—বিচিত্র—বীভৎস আনন্দের মধ্যে দিয়ে সেই নৃশংস দিনটির অপেক্ষা করতাম।

ঐ সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজ্ঞ প্রতিনিধি আদালত কাঁপিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—ইওর অনার, আসামীর জবানী আমাকে উন্মাদ করে তুলবে সভ্যতার ইতিহাসে—দুর্লভ ঘটনা। শিশুহত্যার নৃশংস কাহিনী যে খুনে অনুশোচনাহীন ভাবে, অবিচলিত হয়ে বর্ণনা করে যাচ্ছে—তাতে আমার এবং আশা করি সমস্ত আদালতের ধৈর্য-চ্যুতি ঘটছে। একে Born Criminal (জন্ম অপরাধী) ছাড়া আর কোন আখ্যা

দেওয়া যায় না। এই সাংঘাতিক বন্দিনী আসামীর প্রতি কঠোর শাস্তিদান করে—মানব সমাজের কল্যাণ সাধন হোক—এই প্রার্থনা জানিয়ে রাখছি…

উত্তেজিত কণ্ঠস্বরকে শান্ত করে বিচারক সংহত কণ্ঠে জানালেন—আপনারা সকলেই জানেন যে এটা বিচারশালা। যে কোন জঘন্যতম অপরাধীর বিনা বিচারে দণ্ড হয় না। কাজেই, বিচারের অপেক্ষায় সবাই ধৈর্য রাখুন, শান্ত হোন—আপনারা সকলেই বিচারের ফলাফলের দিনটার জন্য অপেক্ষা করুন…

তারপর?

তারপর বল—থামলে কেন, বলে যাও—জবানী দাও—বিচারকের অধৈর্য কণ্ঠস্বরে আবার বন্দিনীর সম্বিৎ ফিরে এলো……

* * * *

না, না, না। সেই ভয়ঙ্কর জবানীর দিন তো তার শেষ হয়ে গেছে? বিখ্যাত সেই শিশুহত্যার—দুই আসামী, বাদশা আর নন্দিনীর চরম দণ্ড হয়ে গেছে বলে। আজ সে দীর্ঘ দশবছরের দণ্ডভোগের জন্য অন্ধকারার অভ্যন্তরে এসে দিন যাপন করছে…সমস্ত রাত ধরে সেই স্মৃতিমন্থনের পালা।

রাত হ'লে স্মৃতিরা চুপি চুপি এসে লৌহ কপাটের সামনে দাঁড়ায়। নন্দিনীর সমস্ত রাতের ঘুম যেন তারা কেড়ে নেয়। অতন্দ্র নিঃশ্বাসে ভরে ওঠে—রুদ্ধকারার অন্তরাল……।

বাদশা মুক্তি পেল না। অতীতের অনেক অপরাধ নিয়ে তার চরম বিচার হয়েছিল আদালতে। অনেক দণ্ড জমে জমে—তার শেষ দণ্ড হোল—প্রাণদণ্ড! তাকে চিরদিনের মত পৃথিবী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোল—কে জানে সে আজ কোথায় আত্মগোপনে, স্বর্গে না নরকে?

দণ্ড পেয়ে বাদশা খুসী হয়েছিল। দণ্ড পাবার জন্যেই তো সে পুলিশের হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছিল—বলেছিল, বাদশা যা জীবনে করেনি—সেই শিশুহত্যা করে তার অনুতাপের শেষ নেই। তাকে সবচেয়ে বড় শাস্তি দেওয়া হোক…

সবচেয়ে বড় দণ্ড—প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনে আদালতের মধ্যে সে চিৎকার করে উঠেছিল—'হুজুর, আপ্‌কা বহুৎ সেলাম।' বলতে বলতে সে চলে গিয়েছিল প্রহরীদের সংগে। সমস্ত বিচারগৃহটা যেন থম্ থম্ করছিল… কোন অন্ধকার 'সেলে' তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল নন্দিনী তা জানত না। শুধু, বাদশার মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাবার পর নন্দিনী জেনেছিল প্রাণ দেবার আগে বাদশা তার শেষ ইচ্ছা জানিয়ে বলেছিল—সারা দুনিয়ায় এমন একটা জায়গা খুঁজো তোমরা, যেখানে পরম শান্তিতে আমি কফিনে শুয়ে ঘুমুতে পারি। সেখানে যেন অনেক ফুলের গাছ থাকে,—অনেকটা খোলা আকাশ, অনেকটা বাতাস—আর পাখীদের গানে যেন ভরে থাকে।'

ওমা! অন্ধকারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল শাকীলা বিবি। সন্ধ্যে থেকে সমস্ত রাত একভাবে সে কেঁদে যাবে মাটির ওপর মুখ গুঁজে। এই অদ্ভুত আসামীটাকে বন্দিনী প্রথম দিন এসে থেকেই দেখছে—। আবো একজন হাসিতে হাসিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে—অদম্য হাসির আর্তনাদে সাহেবের মায়ের বুক ফেটে যায়। আধময়লা শাড়ী পরণে। কপালে জল জলে সিঁদুর টিপ। কাঁধ অবধি খোলা চুল—রক্তাভ দুটি ঠোঁট। হাসতে হাসতে সে যেন পাগলিনীর রূপ ধারণ করে।

লৌহ কপাটের এ'পারে—অন্ধকারে হাসিকান্নার এক বিচিত্র ছবি…বাইরে আলো, অনেক আলো। প্রশস্ত বারান্দায় চলে ফিরে বেড়ায় মার্চ করা সৈনিকের মত প্রহরীরা। বুট জুতো পরা গুরুগম্ভীর পদক্ষেপ, অলিন্দে অলিন্দে তাদের এই পদচারণার বিচিত্র শব্দ শোনা যায়। তাদের হুঁশিয়ারী সতর্ক দৃষ্টি, সমস্ত কারা প্রাচীরের চারধারকে বেষ্টন করে আছে এক বিচিত্র বন্ধনে।

শাকীলার কান্নায় সমস্ত বন্দীখানটা থমথম করে। নন্দিনীর চোখে সেই দৃশ্য, ভয়াবহ করুণ মনে হয়। অন্ধকারার মৃত্যু বিবরে—তিনটে বন্দী আত্মা এমনি দিন আর রাত কাটায়। প্রতি মুহূর্ত—প্রতিটি ক্ষণ। তবু, ওরা দু'জন পুরোন আসামী। নন্দিনীর অনেক আগেই এসেছে শাকীলা বিবি এবং সাহেবের মা। দুজনেই খুন আসামী। ভাবতে গিয়ে—নন্দিনী শিহরিত হয়—কিন্তু কখনো তার মনে হয় না সেও ওদের দলভুক্ত। প্রবালের জগৎ থেকে যেমন সে বাদশার জগতে এসেছিল তেমনি বাদশার জগৎ থেকেও সে এসেছে এই জগতে। প্রথমে ভয়ঙ্কর দু'জন

খুন আসামীকে নিজের পাশে দেখে সে আঁৎকে উঠেছিল। সভয়ে সরে আসতো লৌহ কপাটের সামনে—অন্ধকারের বাইরে, যে জগৎটা। শুধু—আলো, আলো, সেই জগতের দিকে চেয়ে থাকতো সে।

রোজ সন্ধ্যা থেকে, সমস্ত রাত ধরে শাকীর অকাল কান্না সুরু হয়। এক মুহূর্তের জন্য ও' চুপ করতে পারে না। মনে হয় ওর চোখের অশ্রুর ধারায় সমস্ত পৃথিবীটা বুঝি ডুবে যাবে। হারিয়ে যাবে কোন্ অতলান্তে।

ভোর হয়ে এলে, শাকীনা আস্তে আস্তে চুপ করতে থাকে। চোখ মুছে উঠে বসে বোরখার আড়াল থেকে—লৌহ কপাটের ওপারের ভোরের আলোর দিকে ছুটে যায়—শাকীর জল ঝরা চোখ দুটো। কত শান্ত হয়েও' চেয়ে থাকে ভোরের দৃশ্যটার দিকে·· সমস্ত রাত্রির পর, যে দিনটার প্রথম সংবাদ নিয়ে আসে যে ভোর—তাকে শাকী, মনে মনে অভিনন্দন জানায়··

নন্দিনীকে গল্প বলেছিল, শাকী। অতীতের কোন অভিশপ্ত অন্ধকার রাত্রিগুলো শাকীর গল্পের জীবন্ত চরিত্র হয়ে ফুটে উঠতো···নিজের জীবনের সব কথা কাহিনী—গুছিয়ে গুছিয়ে বলেছে সে···

ভাল মানুষ সব সংসারে আসবার জন্য শাকীনা কাঙাল হয়ে পৃথিবীতে জন্মেছিল। কিন্তু কি পাপে ঈশ্বর তাকে নরকে পাঠিয়েছিল, সে জানতো না। যেখানে এত ঘৃণা, এত পাপ, এত অন্ধকার—সেখানে এসে শাকীর শান্তি হয়নি একদিনও। ক্ষুধা ছিল তার স্বর্গের জন্য—প্রার্থনা ছিল ভাল মানুষদের মত বেঁচে থাকবার—কিন্তু ভগবান যে তার মুখে হলাহল তুলে দিলেন। সমস্ত প্রার্থনার কণ্ঠ চেপে ধরলেন··,

তাই—তাই—গণিকালয়ের সেই বিচিত্র নরক—এক অমানবীয় যন্ত্রণা, শাকীকে—গ্রাস করলো ড্রাগনের মত। দেহ মন দিয়ে, কত রক্ত ঝরে ঝরে বণিচাদের সেই সংসারের মাটি ভিজে গেল, কিন্তু কে বুঝলো শাকীর বেদনাকে—তার সর্বহারা আর্তনাদকে?

তবু, তবু, গণিকালয়ের দুর্ভেদ্য অন্ধকার ঘনিয়ে আসতো শাকীর জীবনে···এমনি করেই শাকী কাঁদতো—সেই রাতগুলো ঘনিয়ে এলে। অথচ শাকীর মত কত মেয়েরা সাধারনী সেজে—পথে এসে দাঁড়াতো। পথের মানুষকে—কুড়িয়ে, ভুলিয়ে—তাদের নরকের সংসারে, টেনে আনবার, কি বিচিত্র সাধ নিয়ে ওরা সবাই মরে যেতো। বাড়ীউলী মাসীর সোহাগের মেয়েরা—বিচিত্র জীবনের জন্য অদ্ভুত আনন্দ কুড়িয়ে নিতো—সেই রাতের অন্ধকারগুলোতে।

ওস্তাদ বাহাদুর ছিল মাসীর কেনা গোলাম। দরদে মরে যেতো যেন—মাসী বুড়িটা বুড়ো বয়সেও তার সেই অতীতের যুবতী মনটা—অস্থি চর্মসার দেহটার ভাঙা খাঁচার রসে—এক দুঃসহ যন্ত্রণায় মরে যেতো। শুধু যৌবনটা দিয়েই একদিন মাসী তার নরকের জগৎটাকে কিনেছিল।—সে জগৎ মাসীর নাগালের অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। তবু প্রৌঢ় বাহাদুরকে—কঙ্কাল দেহটাকে দেখিয়ে বুড়ি কত কাঁদতো—আপন মনে বিড় বিড় করে মরে যেতো। প্রায় ছেলের বয়সী বাহাদুরকে—একদিন মাসী তার যৌবনে, অদ্ভুত ভালবাসায় মাতিয়ে রেখেছিল। সে মন বাহাদুরের ভেঙেছে। স্বপ্নও কেটেছিল জীবনের কোন এক ধূসর সন্ধ্যায়। মাসীর গড়া সংসারের মেয়েদের মধ্যে, বাহাদুর তার নতুন দিন কিনতে চাইল। মাসী তাতেই অভিমানে মরে যেতো। বুড়ির বুক ভরে—কত কথাই না বাজতো। শাকীর ওপরই ছিল বাহাদুরের বেশী টান। শাকীর ঘৃণা যেন আরো উপচে উঠতো। বুড়িটা কিন্তু সন্দেহ জ্বালায় তেমনি জ্বলতো। নিজের অস্থি-চর্মসার দেহটার দিকে বড় মমতায় চেয়ে থাকতো—কোটরগত চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে জল পড়তো।

শাকীনা কিন্তু, দেখতো, সেই ভয়ঙ্কর নরকেও কারো কারো মন ছিল। দেহটাকে ছাড়িয়ে আরো দূরের স্বর্গে যেতে চাইতো। ভীষণ নিষ্ঠুর কুটিল—অত্যাচারী—বুড়ি মাসীর চোখে যে ধারাস্রোত নামতো—সে যেন তার সব হারানোর হাহাকার! চারদিকে আর পথ না পেয়ে—অন্ধকারে মাথা কুটতো বুড়ি।···

বাহাদুর তার হিম্মতের হাসি হাসতো। সুরাসক্ত প্রাণের উচ্চকিত হাসটা তার গণিকালয়ের অন্ধকারের বুক চিরে দিতো যেন। শাকীনা বিবর্ণ চোখে দেখতো কি নিষ্ঠুর অভিনয়—ভগবানের এই খেলাঘরে। মানুষকে নিয়ে কত রকম খেলার কত খামখেয়ালীপনা। সৃষ্টির সারাটি বেলা ধরে—শুধু ভাঙাগড়ার খেলা।

বাহাদুরকে সহ্য করতে পারতো না শাকীনা। নরকের

অন্ধকারের সেই শয়তান যেন তাকে তিলে তিলে গ্রাস করতে চাইতো। কত ছোটবেলায় শাকী এসেছিল এখানে, বুড়ি তাকে একদিন চুরি করে এনে—তার এই গণিকালয়ের ব্যবসা প্রথম সুরু করে। সংগে ছিল বাহাদুর। শাকীলার আর মনে পাড়তো না কিছুই। কোথায় তার বাবা মা—কোথায় তাদের স্বর্গের সংসার। কোন দেশে তার বাড়ী—কোন দেশের মেয়ে সে।

অথচ কারা যেন অলক্ষ্যে, অনুভবে, ডাক দিতো শাকীলাকে। কোন অতীতের প্রিয়জন বিচ্ছেদের ব্যথা—অজানিত আকর্ষণে তাকে টেনে নিয়ে যেতো যেন ভাল মানুষের সংসারে। সেই গনিকাগৃহের দুর্ভেদ্য অন্ধকার টুটে—অবরুদ্ধ জীবনের গ্রন্থি ছিঁড়ে—তার অস্থির তৃষ্ণার্ত আত্মা—ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইতো।

কিন্তু চারদিকে ছিল প্রাচীর। সতর্ক প্রহরা। হুঁসিয়ারী ধ্বনি! আর তার জন্যেই তো শাকীলা অমন করে কাঁদতো—চুপি চুপি। নিষ্ঠুর সংসারের কাছে তার সর্বসত্ত্ব বিলিয়ে দিতে পারবে না বলে, সেই অঝোর জলের ধারা বইতো।

বুড়ির প্রাণের জিনিস বাহাদুরকে দেখলে, শাকীর ঘৃণা হোত। লোকটাকে এড়িয়ে চলতে চাইতো সে। তাতেই বাহাদুরের রোখ চাপতো। শাকীকে চাবুক দিয়ে জর্জরিত করে পথে নামাতো—এটা তার ব্যবসার লাভ হিসেবে। আর নিজের জন্যেও শাকীলা সুন্দরীকে—ওই চাবুকের বর্বর প্রেম দিয়ে টেনে আনতো কাছে। দুঃসহ রাত্রিগুলো ঘনিয়ে এলে শাকী কাঁদতে আরম্ভ করতো—। অদ্ভুত সাজ সেজে পসারিনী হয়ে সে পথে দাঁড়াতে পারবে না। তারজন্যেই, বাহাদুরের আক্রোশ হোত বেশী। বুড়ির হোত আনন্দ। মেয়েগুলোর ওপর বাহাদুর অত্যাচারী হ'য়ে উঠলে কোথায় যেন এক বিচিত্র সুখ অনুভব করতো। সেই চর্মসার ভাঙা দেহ খাঁচাটাকে নিয়ে বুড়ির তখন কত সোহাগ হোত। সারাদিন সাবান ঘষে ঘষে—চামড়ার বিবর্ণ রংটাকে চকচকে করে তোলবার জন্য—কলতলায় পড়ে থাকতো···সমস্তক্ষণ। সন্ধ্যে হলেই সেই অতীতের অভ্যস্ত রাতগুলোর মত, ঝুলে পড়া চামড়ার মুখের ওপর পুরু পাউডার বোলাতো—চোখে সুর্মা, ঠোঁটে অল্প আলতা, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে—নিজের রূপ দেখে হি-হি করে হেসে মরতো বুড়িটা। আবার নিজেকে 'ঢঙি' বলে, কত গালও দিতো। আবার সোহাগের দুরন্তপনায়, আয়নায় সেই বিচিত্র রূপসীর ছায়াটাকে চুমু খেতে খেতে যেন দিশাহারা হয়ে পড়তো বুড়িমাসী।

সেই অসমবয়সী দুই নারী পুরুষ—বুড়ি আর বাহাদুরের, অবাক প্রেমের খেলা চলতো গণিকা গৃহের অন্ধকারে, অন্তরালে! সুরার নেশায় রঙিন হয়ে বাহাদুর—বুড়ির সাজ দেখে হেসে কেঁদে গড়িয়ে পড়তো। নেশা কেটে গেলে বাহাদুর সম্বিৎ ফিরে জোরে আর্তনাদ করে উঠতো,—চেঁচাতো! বুড়ি তার সংগে নাকি শয়তানী করে,—ভুলিয়ে, যত সব আজব কাণ্ড! নকল রূপ দেখিয়ে আসল মানুষের মন ভাঙবার চেষ্টা করে···।

আর্তনাদ করতে করতে একদিন—বাহাদুর শাকীর বন্ধ দরজায় ঘা দিল। শাকী দরজা খুলে দাঁড়ালো, ওকে পথে যাবার জন্য বাহাদুর জবরদস্তি করলো। লক্ষ্মীবাবু নাকি ফিরে যাচ্ছে···মোটা রূপয়ার আদমীরা শাকীলা-সুন্দরীকে—না দেখে ফিরে চলে যায়। বাহাদুরের ব্যবসার কত ক্ষতি! কত দুর্নাম!

শাকীলা সে রাতে পথে দাঁড়ালো। কি সুন্দর করেই না সেদিন সেজেছিল। ভোর রাতে বাহাদুরকে, ঘরে আসতে দিল শাকীলা। তার সেই রুদ্ধ দ্বার খুলে দিয়ে—বিচিত্র প্রেমের নায়ককে আমন্ত্রণ জানালো সাদরে। তাই দেখে বুড়ির মাসীর কি রাগ। কত অভিমান! শাকীলা ওকে সান্ত্বনা দিল—তোমার জিনিস আমি নেব না মাসী, তবে···

তবে, তবে কি? সভয়ে বুড়ি চোখ কপালে তুলেছিল, কাঁপা গলায় বলে উঠলো—বাহাদুরকে যদি না নিবি—তবে, তবে কি?

'কিছু নয় মাসী, এমনি বলেছি' বলতে বলতে শাকী পালিয়ে এসেছিল ঘরে। সেই সুরামত্ত বাহাদুরের জ্ঞান ছিল না। নেশায় তার মন আজব দুনিয়ায় হারিয়ে গিয়েছিল। শাকীলা সুন্দরীর ঘরে লুটিয়ে পড়ে—বিচিত্র এক স্বপ্ন দেখছিল ওস্তাদ বাহাদুর··

হ্যাঁ, ঠিক সেই সময় অতর্কিতে—ধারালো কুঠার বসিয়ে দিল বাহাদুরের গলায়। অস্ফুট একটা আর্তনাদের পর—

বাহাদুরের—প্রাণহীন দেহটা চিরদিনের জন্য নিশ্চুপ হ'য়ে গেল···

বুড়ি কি একটা আশঙ্কায়—শাকীর বন্ধ দরজায় কান পেতেছিল। আর্তনাদ শুনে—সে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো—চেঁচাতে লাগলো প্রাণপণে···

চিৎকার শুনে—যে যার বন্ধ দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। বুড়ির সোহাগের—সুন্দরী মেয়েরা—শাকীর দরজার সামনে ভীড় করে দাঁড়ালো—সারবন্দী হয়ে। শাকী দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। রক্তাক্ত কুঠার হাতে এক তাণ্ডব মূর্তি! ঘরেতে পড়ে বাহাদুরের নিশ্চল দেহটা···

তারপর? তারপরই তো শাকী এসেছিল এই জেলখানার অবরুদ্ধ অন্ধকারে···

নন্দিনী বলেছিল—'শাকী তুমি তো বলেছো—নরকের একটা শয়তানকে খুন করে তুমি শান্তি পেয়েছো—তবে সন্ধ্যে হলেই—সমস্ত রাত জেগে জেগে অমন করে কাঁদো কেন?'

শাকী তার গভীর কালো চোখ দু'টো তুলে বলেছিল—রাত দেখলেই আমার ভয় হয়, মনে হয় সেই রাত্রিগুলো,—যে রাত্রিগুলোতে আমি খালি কাঁদতাম, এমনি করে মনে হোত কতক্ষণে রাতটা কেটে যাবে ভোরের আলো দেখবো চোখ ভরে···মন ভরে। তাই, তাই ভয় হয় আজও রাত্রির সেই অন্ধকার দেখলে···

না, না, শাকীর জীবনে আর মহা কালরাত্রির ভোর হোল না।

নতুন জীবনের ভোরের আলো দেখবার আগেই তার মৃত্যু হোল—কারাগারে। সেই ভাবে কাঁদতে কাঁদতে শাকী ঘুমিয়ে পড়লো। তার সেই চির ঘুমন্ত মুখখানা দেখতে দেখতে—সাহেবের মা একেবারে পাগল হয়ে গেল···। হাসতে হাসতে সে দিশাহারা হয়ে গেল··· তারপর, তাকে নিয়ে যাওয়া হোল—অন্য জায়গায়। মেন্টাল হসপিটালের আর এক কারাগৃহে।···

নন্দিনীর ঘর শূন্য নয়। আরো নতুন দু'জন আসামী এসেছে। তারাও গল্প বলেছে···শুনেছে নন্দিনী। কারাগারের সংসারে—আসামীদের এক বিচিত্র গল্প ·

সাহেবকে খুন করে—সাহেবের মায়ের হাসি সুরু হয়েছিল। বিচিত্র, বীভৎস হাসি। হাসতে হাসতেই সাহেবের দু'চোখও ভাসতো! হাসিকান্নায় মূর্ছিত এক অপূর্ব দৃশ্য!

হ্যাঁ, গো, কেন তোমার অমন গোরাচাঁদ ছেলেকে খুন করলে? নন্দিনীর প্রশ্নে চমকে উঠেই সাহেবের মা উচ্চরবে হেসে উঠেছিল। হাসতে হাসতে যেন ওর বুক ফাটছিল! দম আটকে আসছিল, সেই মুহূর্তে সাহেবের চোখ দুটো যেন জলে গেল···জলে ভেসে গেল—খাদে ভরা চোখ দু'টো। সেই হাসি কান্নায় কি সাজ না সেজে সাহেবের মা গল্প বলেছিল ·

'অমন গোরাচাঁদ—সোনার বরণ ছেলে কে কবে পেয়েছিল বল দিকিন? কালো মায়ের পেটে, অমন ফরসা সাহেবের মত ছেলে এলো—জন্মালো যখন, জগৎ তখন যেন আলো হয়ে গেল। পাড়ার সবাই কত না ভালবাসতো সাহেবকে। হ্যাঁ, ওরাই নাম দিয়েছিল সাহেব। অমন রং যে - মেম সাহেবের মত। তাই সকলের বুকের ধন, চোখের মণি ছিল। অমন সুন্দর ছেলে দেখলে, কার না ভালবাসতে সাধ হয়?

সাহেবের কালো মা' সে গরবে গরবে মরে যেতো। কিন্তু স্বামীর মনে কি এক সন্দেহ? সাহেবের বাবাও কালো, তবে অমন ফরসা ছেলে কোথা থেকে এলো? কালো মায়ের মনে যত গর্ব, কালো বাপের বুকে তত সন্দেহ! ওই প্রথম ছেলে হ'বার পর থেকেই, সন্দেহে সন্দেহে সাহেবের বাবা যেন কি থেকে কি হয়ে গেল। স্ত্রীকে আর সহ্য করতে পারত না। কচি ছেলে সাহেবকে দূর দূর করতো—কখনো তেড়ে মারতে যেতো। নয়তো সাহেবের মাকে অসতীত্বের অপবাদে অসহায় করে তুলতো। সেই লাজবরণী কুলবধূ—কি ভয়ঙ্কর নির্যাতনে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

প্রতিদিন ঠাকুর ঘরে বসে কাঁদতো সাহেবের মা। ঠাকুরকে ডেকে বলতো···ভগবান, এ' রহস্য এক তোমারই জানা আছে। তোমার সৃষ্টির খেয়ালকে তো কেউ বুঝতে পারে না। নইলে, দুর্গন্ধ কালো পাঁকে—সুন্দর কমলের কেন জন্ম হয়? কাঁটার আড়ালে কোমল গোলাপ কেন ফোটে? সুন্দর স্বভাবের মা বাবার, কত অসুন্দর প্রকৃতির ছেলে তো হয়, তেমনি তো এও সত্য—এও ঠিক যে, কালো বাপ মায়ের ফরসা ছেলে!

আমি বলি, আমার ভাগ্য গো, আমার পুণ্য ফল! আমার অপ্রত্যাশিত সন্তান-সুখ অত্যাশ্চর্য ঘটনার মতই হয়তো ঘটেছে কিংবা তোমার সৃষ্টির কৌতুকে সাহেবের মা নাজেহাল হোল, সাহেবের বাপ বে-কুব বনেছে।

কিন্তু এত নিষ্ঠুর কৌতুকতার পরও—তুমি এখনও মুখ বুঁজে বসে আছো: তোমার সব কারসাজি এবার ভেঙে দাও—তোমার সৃষ্টি রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে এই মর্মান্তিক কৌতুকের অবসান কর। এবার সাহেবের মাকে মুক্তি দাও—সাহেবের বাবার ভুল ভাঙিয়ে—আমার নিষ্পাপ সন্তানের ওপর করুণা কর।…

সাহেবের মায়ের কতদিনের আর্ত প্রার্থনা,—ঈশ্বরকে অভিভূত করতে পারল না বুঝি। সৃষ্টি রহস্য নিয়ে যিনি নির্মম খেলা খেলেছেন, চিররহস্যের নেপথ্যে থেকে, এই নিষ্ঠুরতা দেখেও যিনি কৌতুক অনুভব করেছেন—শুধু তাঁরই ওপর অভিমান করে সাহেবের মা কি থেকে কি করে ফেললো।

সোনার বরণ ছেলেকে একদিন বুকে জড়িয়ে আদর করতে করতে—তার গলা টিপে ধরলো—তার কালো মা। দু'হাতের কঠিন সবলতায় চার বছরের সাহেব মায়ের কোলের ওপরই ঢলে পড়লো। মুহূর্ত মধ্যে তার সেই সাদা মুখখানা নীল হয়ে উঠেছিল—আর্তকণ্ঠের অনুচ্চারিত শব্দে—গোঙাতে গোঙাতে সে চোখ বুজলো। সেই নীল হয়ে যাওয়া মৃত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে—সাহেবের মা আর্তনাদ করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই এলো সে জেলে। সবাইকে বলতো—আর সাহেবকে তোমরা কেউ দেখতে পাবে না। তাকে ওই ভগবান শয়তানটার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি…

বলেই হাসতো উচ্চরবে! হাসতে হাসতে প্রাণ ফেটে যায়—চোখ ফেটে জল পড়তে… সেই হাসি কান্নার অপূর্ব উন্মাদ মূর্তিটা পাগলা গারদের লৌহ কপাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। সবাই তাকে চেয়ে চেয়ে দেখত।

ভাবতে ভাবতে নন্দিনীর অতন্দ্র রাতগুলো কাটে… ওই সাহেবের মতই তো শ্বাসরুদ্ধ করে মরা হয়েছিল সুবলকে। মৃত ছেলটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বাদশা পথে বেরিয়ে গিয়েছিল! উঃ সেকি দৃশ্য!

সেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়া ভীত মোরাদ—তখনও কাতর প্রার্থনা করছিল—নন্দিনীকে নিয়ে পালিয়ে যাবার। বাদশা কোনদিন যেন বলেছিল নন্দিনীকে মোরাদ তোকে ভালবাসে না। তোকে ভোলায়! বাদশার দরবার থেকে তার ভালবাসার বিবিকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তোর জন্যে বাদশার এই ঠাণ্ডা মেজাজ ওদের ভাল লাগে না। বাদশা বদমাস্, বাদশা শয়তান, বাদশা খুনে ডাকাত, মেয়েমানুষ ধরে নিয়ে দেশে দেশে বিক্রী করে। তাদের আদরের সতীত্বকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। আর সেই বাদশা কিনা, নন্দিনী মেয়েমানুষটাকে দেখে একেবারে দরাদ মরে গেল?—তোবা! তোবা! খোদার আজব খেল!

সন্দেহের চোখে দলের সেই দুর্দান্ত পুরুষগুলো চেয়ে থাকতো নন্দিনীর দিকে। তাদের মনে বিচিত্র ভয় বাজতো—চোরাপল্লীর অন্ধকারে। কে জানে, বাদশার এই পোষা মেয়ে মানুষটা দলের খবর বাইরে না পাঠিয়ে দেয়। তাই চোরাপল্লীর অন্ধকার রাতের পুরুষগুলো কখনো কখনো এমনি ভয় পেতো। অতগুলো জোয়ান মরদের বুকের শক্ত কপাট খুলে যেতো—একটি মাত্র নারীকে দেখে। অনেক পুরুষ আর এক নারীর সেই আজব সংসারে—কত না অবাক কাণ্ড ঘটতো!

বাদশা বুঝতো ওদের মনের কথা। অভয় দিতো অদ্ভুত স্বরে—'একটা জেনানা দেখে তোদের ভয় হয়? শরম হয় না? মেয়েমানুষকে ডরায় নাকি কোন মরদ? তবে তোদের হিম্মতের দাম কি! আর না আপনা হুঁসিয়ার রও—'কোন শয়তান পারবে না বাদশার ডেরা ভাঙতে। চোরাপল্লীর অন্ধকারে বাদশার সেই কণ্ঠ যেন বীরের শপথ বাক্যের মত মনে হোতো…

কিন্তু…কিন্তু কে জানতো, বাদশা শয়তান নিজেই তার দরবার ভেঙে দেবে। তার সাজানো চোরাপল্লীর সংসার পুড়িয়ে দেবে? সেই ভয়ার্ত পুরুষগুলো কি কেউ ভেবেছিল?

রাতের প্রহরগুলো আসে…অতীতের স্মৃতিকে সংগে নিয়ে কারাগৃহের গভীর অন্ধকারে—ওরা যেন নিশ্চিন্ত-ভাবে ঘুমিয়ে থাকে। খুন করবার পর জেম আর লছমী নাকি ঘুমায়নি কতদিন। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জেম, অনুশোচনায় কত অনিদ্র রাত কাটিয়েছে। লছমী ভীরু—

ফেরারী হয়ে পথে পথে ঘুরছে···কি ভীষণ ভয়, কি সাংঘাতিক বিভীষিকা! ঘুম ছিল না, খাওয়া ছিল না লছমীর। ভীত শঙ্কিত হয়ে—পথে পথে ঘুরতো একটা মেয়েমানুষ—একটা ঘরের যুবতী বউ। ওর ভীরুতাই শেষ পর্যন্ত পুলিশের নজরে পড়ে গেল।

তবু, লছমীর শান্তি! ফেরারী জীবন যেন আরো ভয়ঙ্কর! এই জেলখানায় এসে লছমী ঘুমুতে পারছে সুখে, খেতে পাচ্ছে নিঃসংশয়ে।·· ওদের নিশ্চিন্ত ঘুমের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ভরে উঠেছে—কারাগারের অন্ধকার। কালো গভীর দুর্ভেদ্য আঁধার। লৌহ কপাটের বড় গরাদ ধরে—নন্দিনী অশরীরী ছায়ামূর্তির মত দাঁড়িয়ে···

নন্দিনীর চোখে নিবিড় অন্ধকার আরো ঘন হ'য়ে উঠলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ছে তার কবে কোন দিনে, কোন খানে—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে মালঞ্চপুর। বড় রেল স্টেশনের সামনে—ছোট একটা গ্রাম। সবুজ গাছ-পালায় ঢাকা। মাথার ওপরে কত বড় আকাশ! সেই পদ্মপুকুরের—শাপলা ভরা কালো টলটলে জল! তার পাশে বহু পুরোন শিবমন্দির। শাখা প্রশাখায় ঢাকা বটতলায়, কালো পাথরের মধ্যে শিব যেন ফুল বেলপাতায় লুকিয়ে থাকতো। নন্দিনী প্রথম শাড়ী পরতে শিখে, শিবরাত্রির উপোস করতো। ঠাম্মা অর্থাৎ ঠাকুমার সংগে পুজো দিতে যেতো—সেই শিবঠাকুরের ভাঙা মন্দিরে। ঠাম্মা কত ঠাট্টা করত—হুঁড়ি মন দিয়ে পুজো করিস, নইলে শিবের মত বর হবে না, শিবের বাহন ষাঁড়ের মত একটা বর হবে। নন্দিনী ছাড়বার মেয়ে ছিল না। পাল্টা উত্তর দিত—'তোমার মত ডাইনীকে যদি আমার অমন রূপো। ঠাকুর্দা বিয়ে করে থাকে—তাহলে নন্দিনী সুন্দরীও ভাল বর ই পাবে। বলে, নন্দিনী হেসে গড়িয়ে পড়তো। ঠাম্মা বুড়িও মধুর পরাজয়ের হাসিতে সাদা আঁচল চেপে ধরতো মুখে।···

ছোট্ট টুনার সংগে কত ঝগড়াই না হোত ঠাম্মার। কত ছোট তখন নন্দিনী। সবাই ওকে আদর করে ডাকতো টুনা। ঠাম্মা বলতো, পেত্নী—শাঁকচুন্নী—মুখ-পুড়ী, আর কত কি! ভারি, ঝগড়াটে ছিল বুড়িটা। ছোট্ট টুনা ক্ষেপে উঠে ঠাম্মার গালে ঠাস্ ঠাস করে চড় মারতো। খিল খিল করে হাত তালি দিয়ে হেসে উঠতো। ঠাম্মাও চালাক! দুহাতে মুখ ঢেকে মিছি মিছি করে কাঁদতো।—তাই না দেখে অবুঝ মেয়েটাও কেঁদে পড়তো। অভিমান ভুলে, ঠাম্মার গলা জড়িয়ে লুটিয়ে পড়তো। সেই মুহূর্তে দুষ্টু বুড়ির কি অট্টহাসি!

এমনি রাতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যেত। ভাঙা হারিকেনের বোবা আলোটার পাশে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে—ঠাম্মা বুড়ি রূপকথার গল্প বলতো। টুনা গলা জড়িয়ে পাশে শুয়ে থাকতো। বাগানের ঝোপ ঝাড়ে অথৈ অন্ধকার! জোনাকির আলো জ্বলতো টিপ্ টিপ্ করে। থম থম করতো মালঞ্চপুরের রূপকথার রাত্রি! ফণীমনসার ঝোপে শেয়াল ডেকে উঠতো। কার বাড়ীর আঁতুড়ে-ছেলেটা মাঝে মাঝে কেঁদে ককিয়ে মরতো। ভয় ভয়ে টুনা, বুড়ির পাঁজরা-সার বুকে মুখ লুকাতো··· রূপকথার রাজকুমার যেন অন্ধকারে—ঘোড়া ছুটিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরতো। আওয়াজ শুনতো টুনা—টগ্ বগ্ টগ্ বগ্···অন্ধকারের হাওয়ায় যেন ওরা মিলিয়ে যাচ্ছে···। আস্তে আস্তে সব কেমন নিঝুম হয়ে আসতো। মালঞ্চপুরের সেই মন ভোলানো রাত্রিটা কখন যেন সেই ছোট্ট মেয়েটার চোখে, ঘুমের পরশ বুলিয়ে দিয়ে যেতো। টুনা অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তো।

সেই স্মৃতি মধুর মালঞ্চপুর ছেড়ে নন্দিনীরা চলে এলো শহর কলকাতায়। সেই পদ্মদিঘী, শিবমন্দির—সবুজ গাছপালা, সেই বড় আকাশটা সব ফেলেই যেন ওরা চলে এসেছিল—নন্দিনী আর তার মা। মালঞ্চপুরেই বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, তাই না দেখে ঠাম্মা বুড়ও পালালো। সেইজন্যেই মালঞ্চপুরকে ফেলে এসেছিল ওরা—মা মেয়ে। শহরে এলে সংসার চালাবার উপায় আছে নন্দিনী একটা কিছু করে—দাঁড়াতে পারবে। অষ্টাদশী মেয়ের চোখে দুর্জ্জয় স্বপ্ন! শহরের ছোট আকাশের নীচে—কত বড় বড় বাড়ী—কত কলকারখানা, কত মানুষের ভিড়, কত কোলাহল ভরা। সেই বৃহৎ জগৎটা দেখে নন্দিনীর আশাটাও বড় হয়ে উঠতো। কল-কাকলীতে ভরে উঠতো।

সংগে আনা সঞ্চিত টাকা ওদের ফুরিয়ে গিয়েছিল—শহরে সংসার পেতে। নন্দিনী তেমন লেখাপড়া জানত না। মালঞ্চপুরের ইস্কুল—মেয়েদের যতটা পড়বার সুযোগ

ততটাই পেয়েছিল নন্দিনী। তবু, নন্দিনী কাজ খুঁজতো—লেখাপড়া ছাড়াও এমন অনেক কাজ তো আছে। দু' একটা মেয়ের সংগে নন্দিনীর পরিচয় হয়েছিল, ওরা নন্দিনীর অবাস্তব আশায় হাসতো। শহরের অনেক লেখা পড়া জানা মেয়ে নাকি মাথা খুঁড়েও চাকরী পায় না! বড় আজব নগরী।

তবু, কাজ খুঁজতে বেরিয়ে নন্দিনীর সংগে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অবনীকাকার। বাবার দূর সম্পর্কের ভাই। এই আজব শহরেই—তাঁর প্রাসাদতুল্য বাড়ী। অত ধনী হয়েও, অবনীকাকা কয়েকবছর আগেও মালঞ্চপুরের গরীব দাদাকে দেখতে গিয়েছিলেন। নন্দিনীকে কাছে বসিয়ে কত স্নেহ করেছেন।—সেই অবনীকাকা! নন্দিনী জানতো—কলকাতায় থাকেন অবনীকাকা, কিন্তু কোথায় বাড়ী কোথায় বা ঠিকানা কখনো বাবা কিছু খুলে বলেন নি। শুধু বলতেন, অবুর বাপ ঠাকুর্দাও এই মালঞ্চপুরের মানুষ।—নন্দিনীদের মত তাঁরাও—গরীব মানুষ ছিলেন।—কোন পুণ্যে বোধ হয় অবনীকাকা বিরাট ধনী হয়েছিলেন। যৌবন থেকেই তিনি মালঞ্চপুর ত্যাগ করে—কলকাতায় ছিলেন। তবু, মাসের মধ্যে একবার করে মালঞ্চপুরে যেতেন জ্ঞাতি কুটুম্বের সংগে দেখা করে আসতেন। নন্দিনীর বাবাকে যেন—বেশী শ্রদ্ধা করতেন, বলতেন, গোপীনাথদা সারাজীবনই সৎপথে থেকে দারিদ্র্য ভোগ করে গেলেন। কিন্তু কারো কাছে কখনো তিনি হাত পাতেন নি বা দ্বারস্থ হন নি। আমার দাদার মত এমন মানুষ সংসারে দুর্লভ!

পথ থেকে নন্দিনী টেনে নিয়ে গিয়েছিল শেষে অবনীকাকাকে। সব দেখে শুনে তিনি স্তম্ভিত। জলভরা চোখে বললেন—মালঞ্চপুর থেকে তোরা চলে এলি! দাদা মারা গেল, কই খবরও তো পেলাম না!

নন্দিনী অভিমানে যেন বলে ফেলেছিল—আমাদের তখন কে ছিল কাকাবাবু কাকেই বা কাছে পেয়েছিলাম? নইলে, মালঞ্চপুর ছেড়ে এখানে চলে আসি আমরা? বোধ হয় নন্দিনীর চোখ দু'টোও টল্ টল করে উঠেছিল।

সবশেষে তিনি বললেন—'এই বস্তিঘরে তোরা একা পড়ে থেকে কি করবি—আমার ওখানে গিয়ে থাকবি।' অর্থাৎ অবনীকাকার ভবানীপুরের সেই প্রাসাদোপম বাড়ীতে। যেখানে অনেকগুলো ঘর এমনি খালি হ'য়ে পড়ে আছে। বাড়ীতে অবনীকাকা আর অদেখা কাকীমা এবং একমাত্র তাঁর ছেলে—নবনী। আর কয়েকজন দাসদাসী ছাড়া—আর কোন মানুষের ভিড় নেই।

অবনীকাকার সেই অযাচিত উপকার মা নিলেন না। নন্দিনীর বাবা যে তা কখনো করেন নি। অথচ তাঁর সহধর্মিণী হয়ে, এমন অধর্ম তিনি কখনও করতে পারবেন না। অবনীকাকা তবু, অনুরোধ—করেছিলেন, মা বার বার বলেছিলেন—'ঠাকুরপো কপাল যখন আমার পুড়ে ছ—আর ভাগ্যে যা আছে তা তুমি কখনোই খণ্ডন করতে পারবে না। আমি যেমন আছি—যেখানে পড়ে আ ছি—সেখানেই আমার সুখ। আমার মনে হয় এর বাইরে গেলে আরো দুঃখ আমার, আরো অপমান!

বিমূঢ় বিস্ময়ে অবনীকাকা মায়ের মুখের দিকে চেয়েছিলেন। নিয়ে যাবার অনুরোধ আর তিনি করতে পারেন নি। কিন্তু বাড়ী ফিরে প্রতি মাসে নন্দিনীর নামে—এক.শ. করে টাকা পাঠাতেন। নন্দিনীর ওপর অবনীকাকার স্নেহের দান বলেই—মা সে টাকা গ্রহণ করতেন। এই অধিকারের মধ্যে তিনি কোথাও অপমানের গ্লানি খুঁজে পাননি।

এই টাকায়—সত্যি অবনীকাকার কৃপায় নন্দিনীদের সংসার স্বচ্ছলভাবে চলে যাচ্ছিল। তবু, নন্দিনী শহরে থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। অবনীকাকার সাহায্য নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ঠিক নয়। কাজেই নন্দিনী কাজ খুঁজছিল। ওর ইচ্ছে ছিল, সংসারটা গুছিয়ে নিয়ে মালঞ্চপুরেই ফিরে যাবে।

মাকে চুপি চুপি বলতো—'আমরা খুব বড়লোক হলে, আবার দেশে ফিরে যাব। ভাঙা বাড়ী সারিয়ে—ওখানেই আবার সংসার পাতবো।' শুনে মা কখনো হাসতো, কখনো চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ছেলেমানুষী কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠতো। কখনো চোখ বুজলে, মালঞ্চপুরের পুরোন সংসারটা দেখলে মা চমকে উঠতো—টুনাকে তখন কাছে বসিয়ে—মা কত কি সব বলতো।

মালঞ্চপুরের কত গল্প, কত কান্নাহাসির—কত ছোট বড় সব কথা কাহিনী মা যেন স্মৃতির মালা গাঁথতে গাঁথতে—

শহরের দুঃসহ কষ্টের জীবনটাকে যেন দুষ্টু ছেলের মত করে ঘুম পাড়িয়ে রাখতো।

কিন্তু ফুল সব ফুরিয়ে গেল। কাজেই, মালা গাঁথা সারা হোল। সহসা যেন টুনাকে ফেলে মাও চলে গেল—ঠাম্মা বাবার কাছে।

মেঘ ছিল না। দুর্যোগের কালো ছায়াটুকু পর্যন্ত ছিল না আকাশের কোথাও, তবু সেই অমলিন শান্ত আকাশের বুক ভেঙে কোথায় যেন বাজ ডেকে উঠলো। তার গুরু-গম্ভীর আর্তনাদ শোনা গেল। দুর্যোগের ঘনঘটায়—এ' পৃথিবীর এককোণে পড়ে থাকা—শুধু মা মেয়ের ছোট্ট সংসারকে ভেঙে চুরে তছ্‌নছ্‌ করে দিলেন—নিষ্ঠুর রহস্য-প্রিয় সেই অদৃশ্য ঈশ্বর।

যাঁকে চোখে দেখা যায় না, যাঁর নামে গানে সমস্ত জগৎ সংসার ভরে আছে—কতকাল ধরে কতকালের মাঝে মানুষের পূজো পেয়ে গেলেন তিনি—সেই অদৃশ্য দেবতা সব ভুলে গিয়ে যেন এমনি করে আঘাত হানলেন—মানুষের সংসারে

বড় অভিমান! বুক যেন ভরে গিয়েছিল—অবোধ শোকে। রুদ্ধ অভিমানে গুমরে গুমরে নন্দিনী যেন সেই অদেখা—ভগবানের বুকে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। তবু তো ভগবান অভিভূত হোল না। কি করে অবুঝ মেয়েটা বুঝবে—নিত্য সুখ দুঃখের মেলা যিনি সাজিয়েছেন মানুষকে নিয়ে,—আবার ভাঙা গড়ার খেলাও যে তাঁর। তাঁরই আনন্দ, তাঁরই দুঃখ, তাঁরই সব। পৃথিবীর সব উত্থান পতনই যে তাঁরই অভিপ্রেত বাসনা। হাট বসাতে যে আনন্দ, ভেঙে দিলেও তাঁর সেই আনন্দ···

কাজেই, সেই অবুঝ মেয়েটার রুদ্ধ অভিমানের মন গেল ভেঙে। মালঞ্চপুরের সেই অভিমানী মেয়েটা—ঈশ্বরের ওপর আর রাগ করে বসে রইলো না। অবনী-কাকাকে চিঠি লিখতে—তিনি ছুটে এলেন।

সেই প্রাসাদোপম বাড়ীতে নন্দিনী এসে উঠলো। অনাথ মেয়েটাকে—বড় আদরে অবনীকাকা নিজের কাছে নিয়ে এলেন। বললেন—'টুনা এবার তুই আমার মেয়ে হলি। জন্মে অবধি মাকে তো আর দেখতে পাইনি। বড় সখ ছিল—নিজের একটা মেয়ে হবে। কিন্তু কে জানতো—তুই আমার ঘরে আসবি বলে ভগবান তোর সব কেড়ে নিল।

নন্দিনী কাঁদছিল। অবনীকাকার সেই আদরের কথা—'দূর পাগলী, কাঁদবি কার জন্যে। ওরা যে তোকে ছেড়ে চলে যাবে বলেই তো গেল। এখন এই বুড়ো ছেলেটাকে—যত্ন আত্তি করে রাখিস মা।'

কত স্নেহ—কত যত্ন অবনীকাকার! কিন্তু কাকীমার যেন ঈর্ষার শেষ ছিল না। হঠাৎ একটা অনাথ মেয়েকে বাড়ীতে এনে—মাথায় তোলাটা যেন সুনজরে দেখলেন না। তীব্র ঘৃণা আর অহেতুক সন্দেহ জ্বালায়—নন্দিনীকে আর সহ্য করতে পারছিলেন না। অবনীকাকাও রেহাই পাননি। আরো রোষ গিয়ে পড়তো তাঁর ওপর। নন্দিনী বড় অপমানে—আহত হোত—। অত সুখের মধ্যেও—কষ্ট হোত—ইচ্ছে করতো কোথাও চলে যেতে। অনাথ মেয়ের জন্যে যদি অবনীকাকা না থাকতো—তাহলে নন্দিনীর যা হোত—তাই হবে—কিন্তু অবনীকাকাতো ছেড়ে দিতে পারিলেন না নন্দিনীকে।

স্ত্রীর সন্দেহ আর ঘৃণায় অবনীকাকা খুবই মর্মাহত হয়ে পড়লেন। তারপর এই অনাথ মেয়েটার ওপর মায়া এবং দায়িত্ব দুইই আছে। কাজেই, তিনি মনস্থ করলেন—নন্দিনীকে—ভাল ঘরে তাড়াতাড়ি পাত্রস্থ করে—স্ত্রীর সন্দেহ জ্বালা থেকে মুক্তি নেবেন।

খুব বড়লোকের ঘরে নন্দিনীর বিয়ে দিলেন অবনী-কাকা—অনেক টাকা খরচ করে। সে রোষেও কাকীমা কম অশান্তি করেন নি। কিন্তু অবনীকাকা আরো জেদ করে যেন প্রচুর যৌতুকে সাজিয়ে যেন তারই নিজের কন্যাকে পার করলেন। কিন্তু এর পর আর অবনীকাকা কখনো নন্দিনীর সংগে দেখা করেন নি—শুধু কাকীমার জন্যে।—ধনী গৃহে বিয়ে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

নন্দিনী ভাবতে পারেনি মানুষের স্নেহের দান কত বড়—কত বড় প্রাণের পরিচয়। অবনীকাকা অনেক গ্লানি অপমান সহ্য করেও—তাঁর স্নেহের হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। একটি অনাথার জন্য—তাঁর কত বড় দান—কত বড়—করুণা। কৃতজ্ঞতায়—শ্রদ্ধায়—বড় আপন হয়ে অবনীকাকা যেন নন্দিনীর সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসেছিলেন।

নন্দিনী এসে দেখলো—'দত্ত ভিলাটা' যেন তার অবনী-কাকার বাড়ীর চেয়েও বড়—আরো অনেক ঐশ্বর্যে ভরা।

গোটা বাড়ীটার—সমস্ত সম্পদের একমাত্র—উত্তরাধিকারী সেই প্রবাল দত্ত তারই স্বামী। ভারি অবাক লাগছিল নন্দিনীর। শুধু তাই কেন, এত সুখ সৌভাগ্যের মাঝখানে এখন কেমন ভয় হচ্ছিল সেই মালঞ্চপুরের গ্রাম্য মেয়েটার মনে। ইস্ নন্দিনীর জন্য এমন কাণ্ড অবনীকাকা করে গেলেন। যার সম্পদ-সুখ উপভোগ করতে নন্দিনীর কোথায় যেন শঙ্কা হচ্ছিল···মনে হচ্ছিল—তাকে যেন একটুও মানায় না এই রাজপ্রাসাদে—প্রবালের মত এক রাজকুমারের পাশে! স্নেহের আতিশয্যে অনাথ মেয়েটার জন্য এমন একটা স্বর্গপুরী—কেন রচনা করলেন, অবনী-কাকা? এ' সুখ সৌভাগ্য তো তার জন্যে নয়?

শুধু সেটাই বিশ্বাস করাবার জন্যে—স্বামী তাকে সারা বাড়ী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে বলতো—এখন থেকে এ' বাড়ীর সবকিছুর অধিকারী হ'লে তুমি। অবাক ভীরু চোখে—সেই নতুন বধূটি তাকিয়ে থাকতো স্বামীর মুখের দিকে। সব কথা যেন তার কানে যেত না, সবকথায় কেমন নিজেকে হারিয়ে ফেলতো।

প্রবাল শুনতো না। কি দুষ্টুই না প্রথমে ছিল। ওর মা বাবা ভাই বোন কেউই ছিল না। বাড়ীতে দাস-দাসীকে নিয়েই প্রবালের জীবনটা কেটেছে—কাজেই এমন একটি আপন জন পেয়ে—প্রথম প্রথম কি পাগলামীই না করতো প্রবাল। নন্দিনীকে বলতো কত মিষ্টি করে—'তোমার খুব ভয় হয় না? আমি কিন্তু জানি। কিন্তু এখনও তুমি বিশ্বাস করতে পারলে না—আমি তোমার কে? এ' জিনিস কি কাউকে কখনো বুঝিয়ে দিতে হয়?

নন্দিনী কালো দিঘীর মত চোখ জোড়া তুলে, মৃদু হেসে, সভয়ে যেন ঘাড় নাড়তো। বোধ হয়, বোঝাতে চেষ্টা করতো, সবই যেন বুঝতে পারে কেন চিনবে না তার আপনজনকে? তবু, তবু কি যেন হয় মালঞ্চপুরের সেই মেয়েটার মনে। সব কেমন এলোমেলো হ'য়ে যায়। হারিয়ে যায় বুঝি!

তারপর, কতদিনের ভীরুতার মাঝে, সংশয়ের মাঝখানেও এলো—পরম প্রীতিটুকু। কত আদরে,—শেষে কত নিঃসংশয়ে।—নন্দিনী তার আপনজনকে বড় বেশী করে চিনে নিয়েছিল। তাই তো। একথা কি কাউকে বুঝিয়ে দেবার? যার জিনিস সেই তো বুঝে-পড়ে নেয়। তেমনি করেই না, নিজের জিনিসটুকু চিনে নিয়েছিল নন্দিনী।

রাজ ঐশ্বর্যের লোভ নয়। আরো বড় লোভ—আরো বড় প্রার্থনা যেন—প্রবালকে পেয়েই পরিপূর্ণ হয়েছিল; মালঞ্চপুরের স্বজন হারানো সেই মেয়েটা প্রিয়জনের প্রীতি লোভে—কি এক বিচিত্র বন্ধনে ধরা দিল নিজেই।

নন্দিনী যে বড় বেশী ভালবেসে ফেলেছিল—স্বামীকে; তাই জীবনের সেই মর্মান্তিক অধ্যায়টি আরো বড় বেশী প্রবঞ্চনায় বঞ্চনায় ভরে উঠেছিল। সে দুঃখ যে কত বড়! কত বড় আঘাত! না, না নন্দিনী কেমন করেই বা জানবে—জীবনের সেই অধ্যায় কি নিষ্ঠুর···প্রহসনের জন্য অক্ষয় প্রতীক্ষায় বসে ছিল?

এই প্রীতি খেলার—প্রারম্ভেই—সহসা একদিন রাজবাড়ীর অন্তঃপুরচারিণীর বুক সভয়ে কেঁপে উঠলো। এক রাত্রে সুরা পান করে প্রবাল বাড়ী ফিরলো। খুব আশ্চর্য এবং হতবাক হয়ে গেল নন্দিনী। তবু, অবাক হয়ে যেন জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি মদ খাও বুঝি?

নন্দিনীর মুখ থেকে যেন এই অদ্ভুত কথাটা শুনে প্রবাল, বিকট হাসিতে উথলে উঠলো, চোখ টেনে টেনে, বিশ্রী মুখ ভংগী করে, উত্তর দিল—হ্যাঁ, খাই। তবে এতো নতুন নয়। তোমাকে বিয়ে করবার আগে থেকেই আমার এই অভ্যাস। কিছুদিন বন্ধ রেখেছিলাম, তুমি ভয় পাবে বলে।'

তার মানে? নন্দিনীর ভীত কণ্ঠ আর্ত জিজ্ঞাসায় যেন ককিয়ে কেঁদে উঠলো।

মানে? বলে, মৃদু হেসে প্রবাল নন্দিনীকে কাছে টেনে নিয়ে যেন বুকের ভেতর পিষে ফেলতে ফেলতে বলেছিল—তোমাকে এই ভাবে ভালবাসারও যেমন মানে নেই—তেমনি আমার মদকে ভালবাসারও কোন মানে নেই। বুঝলে, সুন্দরী, বলেই প্রবাল আর্তনাদ করে যেন হাসছিল!

নন্দিনী ভীত শঙ্কিত চোখে স্বামীর বে-সামাল মূর্তির দিকে শুধু অপলক ভাবে চেয়েছিল। অমনি করে দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন নন্দিনী—স্বামীর পায়ের ওপর কেঁদে লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগলো—বল, বল তোমার কি হোল, কই আগে এমন তো ছিলে না, আজ তোমার

কি হোল বল তুমি! ভীষণ আর্ত কান্নায় যেন নন্দিনী ভেঙ্গে পড়েছিল, একটা আহত পাখীর মত, সে যেন নিষ্ঠুর সেই শিকারীর পায়ের কাছে পড়ে ছট্‌ফট করছিল।

প্রবাল ততক্ষণে—সোফার ওপর আধশোয়া হ'য়ে গা এলিয়ে দিয়ে বসে পড়েছিল। চোখ দুটো তার আধো বোঁজা! মধ্যরাতের সেই নেশাক্রান্ত মূর্তিটাকে দেখে ভয়ে—দুঃখে—বোধ হয় মমতাতেও—নন্দিনী কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে! সে রাতে আর কোন কথাই বলেনি প্রবাল। নিথর, নিস্পন্দ হয়েছিল—সেই প্রথম কষ্টের রাতটা। সমস্ত রাজবাড়ীর অবাক অন্ধকারে—একটি শঙ্কিত আহত-হরিণীর কালো চোখে জল ভরে উঠেছিল বার বার। কতবার যেন।

খুব সকাল বেলায়—খুব ক্লান্ত—শ্রান্ত হয়ে, একটা অসহায় মূর্তিকে সোফায় গড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে, কত কষ্ট না নন্দিনীর হয়েছিল। গত রাতের সেই-ঘৃণা, দুঃখ ভয়—যেন প্রভাতে অমলিন আলোয় স্নান সেরে উঠলো মনটা।

তখন মনে হচ্ছিল নন্দিনীর, গত রাতে প্রবাল কত যন্ত্রণায় যেন ঘুমুতে পারেনি। কি—একটা কষ্টে—ওর দু'চোখের পাতায় গাঢ় ঘুমের অন্ধকার নামেনি, সমস্ত রাত বিছানায় না শুয়ে অসহায়ের মত সোফায় গড়িয়েছিল।

এও একটা পরম দুঃখের মধ্যে—নিভৃত সুখ অনুভব করেছিল। প্রিয়জনের সমস্ত গ্লানি—ক্ষমা সুন্দর ভালবাসায়—আরো নিবিড় হয়ে ওঠা।

নন্দিনী তার স্নেহের হাতটি ধীরে ধীরে তুলে দিয়েছিল—সকালের সেই ঘুমন্ত মানুষটার কপালে। মাথায় ও' আস্তে আস্তে হাত বুলাচ্ছিল।...

সেই অচৈতন্য মানুষের সমস্ত মুখের মধ্যে—নন্দিনীর দুটি ব্যাকুল দৃষ্টি কি যেন খুঁজে ফিরছিল। কোথাও যেন গ্লানি ছিলনা, এতটুকু ঘৃণার চিহ্ন! কি সুন্দর, কি মধুর সৌম্য শান্ত—সমস্ত মুখখানা, ভোরের তাজা শুভ্র ফুলের মত ফুটেছিল। আর তাতেই যেন নন্দিনীর বড় মমতা হচ্ছিল—ধীরে ধীরে সে প্রবালের সমস্ত মাথাটা কোলের ওপর টেনে নিয়েছিল। কখনো সেই মুখখানাকে—বুকের বেষ্টনে আবদ্ধ করতে ইচ্ছে করছিল—যেন সমস্ত যন্ত্রণা, সমস্ত ঘৃণা, দুঃখকে মুহূর্তমধ্যে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়...

আস্তে আস্তে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল প্রবালের—যেন ভোরের সেই শুচি শুভ্র ফুলটি ধীরে ধীরে তার সমস্ত পাপড়ি মেলে দিচ্ছিল। সূর্যের অমলিন—কিরণ পান করতে করতে—তার সমস্ত...কাতর তৃষ্ণাটি যেন মেটাচ্ছিল।

যেন সেই দুটি তন্দ্রা জড়িত চোখ—একটি স্নেহশীলা নারীর বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে—এমনি তৃষ্ণা তৃপ্তিতেই শান্ত নরম হয়ে যাচ্ছিল। তবু কার নিঃশব্দ অশ্রু ঝরে ঝরে—সমস্ত মুখটা অল্প অল্প ভিজে যাচ্ছিল, যেন সমস্ত অবসন্ন দেহটার ওপর, উত্তপ্ত শিশির কণা পড়ে পড়ে—সমস্ত অন্তরে—বাহিরে, কি একটা স্নেহের স্বাদ নিতে নিতে—প্রবালের চোখ দুটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। তার সমস্ত চেতনার মধ্যে যেন সে ধীরে—ধীরে ফিরে আসছিল ..বড় আপন করা একটা সুর!

আকুল দুটি দৃষ্টি তুলে ধরলো প্রবাল, কতবার নন্দিনীর চোখে চোখে চেয়ে ডুবে গেল সমস্ত, নিজের বলতে যা কিছু। হয়তো কিছু বলতে—চাইল প্রবাল, মনে হোল, অদৃশ্য মূর্চ্ছনায় প্রতিহত হয়ে গেল ওর কণ্ঠ। নন্দিনীও যেন সেই মুহূর্তে নিজেকে সামলাতে পারছিল না। প্রবালের সমস্ত রুদ্ধবাক্ মুখখানাকে—বুকের আবেষ্টনে জড়াতে জড়াতে—কাতর অনুনয়ে বলে উঠেছিল শুধু—'লক্ষ্মীটি, বিছানায় শোবে চল—, সমস্ত রাত তো তুমি ঘুমোওনি। চল, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

প্রবাল সেই চোখে চেয়েছিল। স্নেহসিক্ত আদেশে—নিজেকে যেন কত অশক্ত কত দুর্বল ভেবে যেন—আস্তে আস্তে উঠে গেল বিছানায়। নন্দিনী ওকে সযত্নে শুইয়ে দিল। বুক পর্যন্ত সাদা চাদরখানা টেনে দিয়ে—সমস্ত ঘরের জানালা খুলে দিল।

শীতার্ত সকালের হিমঝরানো বাতাস আসতে লাগলো চারদিক থেকে। রাজবাড়ীর ওপরের আকাশটাকে সেদিন কি সুন্দরই না মনে হচ্ছিল নন্দিনীর। কত আলো যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল—কত সুন্দর হয়ে—যেন কত সান্ত্বনা ভরে ছিল—সেই শান্ত সকাল বেলাটায়।

নন্দিনীর স্নেহে, নন্দিনীর কি এক ভালবাসার মোহময় স্পর্শ—অস্থির অশান্ত প্রবালের চোখে সত্যিই ঘুম নেমে এসেছিল। এমনি করে আরো, আরো কতদিন অশান্ত অতন্দ্র সুরামত্ত প্রবাল দত্তকে ঘুম পাড়িয়েছিল সে। কি এক বিশ্বাসে ওর বুক ভরে উঠেছিল প্রেমে, পুণ্যে—সাধনায় বুঝি স্বামীকে ফিরিয়ে নেবে—সেই অশান্ত জগৎ থেকে।

প্রথম প্রথম তাই মনে হোত। কেন না, কখনো কোন সকালবেলায়—প্রবাল তার নিজের চোখ দুটিকে ভিজিয়ে অনুতপ্ত গলায় বলে যেতো—'আমাকে ভালবাসতে এখনও তোমার ঘৃণা হয় না নন্দিনী?" আশ্চর্য, সেই প্রশ্ন! সে কথার উত্তর দিতে গিয়ে নন্দিনীরও ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠতো, চোখের কোলে জল টল্‌টল করে উঠলেই, সে মুখ ফিরিয়ে নিতো।

প্রবাল কি শুনতো? মুখ ফেরানো অভিমানী মেয়েটার সমস্ত মুখখানাকে দু'হাতে টেনে নিয়ে—নিজের বুকের ওপর সযত্নে রাখতে রাখতে শুধু একই কথা বলতো—'তোমার ঘৃণা হয় না। কিন্তু আমার হয়। আমার ওপরই আমার ঘৃণা! বড় দাহ, নন্দিনী! রাতের সেই মানুষটা যেন আর মানুষ থাকে না। পশুর মত হয়ে যায়। কেন, কেন যে এমন হয়, বুঝতে পারি না। তার সেই, অদ্ভুত তৃষ্ণা, কাতরত', নিশ্চুপ রাত্রির অন্ধকারে প্রেতাত্মার মত বেঁচে থাকে। নন্দিনী, সে বাঁচার নাম কি আমি জানি না। হয়তো এই বাঁচার নামই—'মৃত্যু'। কিন্তু কেন, কেন আমার এই মৃত্যু এলো?···

অতীতের অন্ধকার হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে প্রবাল যেন তার ব্যভিচারী জীবনের—এক আশ্চর্য গল্প বলে যেতো। আত্মহারা হয়ে, ছেলেমানুষের মত সব বলতো···এলোমেলো কথার সুরে, খেয়ালী আবেগে—কথায় কথায় হারিয়ে যেতো···

"অল্পবয়সে অনেক টাকার মালিক হ'লে, আর মাথার ওপর কেউ না থাকলে ধর—সেই একমাত্র ছেলের মা মারা গিয়েছিল—জন্মের পর, বাবা আঠারো বছর বয়সে, থাকবার মধ্যে ছিল, এই রাজপ্রাসাদ—'দত্তভিলার' ঐশ্বর্য আর ব্যাঙ্কের টাকা, এগুলো সব হাতে নাতে পেয়ে—সেই অল্প বয়সের ছেলেটা—কি ভীষণ যে বেপরোয়া হয়ে উঠলো, রাজসম্পদের একাধিপত্য পেয়ে—ভাবতো জগৎটাকেও কিনে নেবে, এমনি দম্ভে আর উচ্ছ্বাসে সে যা খুসী তাই করতো—মনে যা ইচ্ছে তাই করতো—, যার খেয়াল খুসীকে বাধা দেবার জন্য—তাকে সৎ বুদ্ধি দেবার জন্যে যার কোন—প্রকৃত বন্ধু ছিল না। তার পরিণাম কি হয়েছিল জানো?—শুনলে শিউরে উঠবে নন্দিনী। তবু, আমার সব কথাই তোমার জানা দরকার—নইলে, আরো ভুল বুঝে দুঃখ পাবে···তুমি আসবার আগে থেকেই—যে ভাবে আমি—যে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে এসেছি—তার আসল খবরটা শুনে নাও।···হ্যাঁ, সেদিনের প্রবাল দত্ত কি ছিল,—সেই ধনী নন্দনের অনেক বন্ধু জুটে গেল। যারা মাছির মত তাকে ঘিরে ধরে—ফিরিঙ্গী পাড়ার বিলিতী আনন্দের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতো··সে তো আমাদের সমাজ নয় নন্দিনী। নাইটক্লাবের—এ্যাংলো বান্ধবীদের নৃত্য সহচরী হিসেবে তাদের অনায়াস সান্নিধ্য লাভ করার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ ছিল—তার সবটুকুই লুটে নিতে চেয়েছিল প্রবাল দত্ত। সেই প্রবালদত্তের জুটে যাওয়া বান্ধবেরাও—এই রাজকুমারের রাজ ঐশ্বর্যের মূলধন ভেঙে ভেঙে নিজেদের আনন্দও তারা মিটিয়ে নিতো।···

তাই রঙিন উৎসবের বাদ্য বেজে উঠলেই—আমি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতাম বন্ধুদের চতুরতা বুঝতে পারলেও, তাদেরই ইশারা আমাকে আরো পাগল করতো। নন্দিনী তুমি বুঝবে না। সে বয়সটা মানুষের কি! বিভ্রান্ত এক জীবন ইতিহাসের নায়ক হয়ে—কি থেকে কি হয়ে গেলাম। এই এত বড় বাড়ীটাতে ধন দৌলত, দাস দাসী ছাড়া আর বোধ হয় কেউ ছিল না—আমার ঘরের মানুষ। যে আমায় ঘরে বেঁধে রাখতে পারতো। বাড়ীটা আমার কাছে এক দুর্বিষহ নিঃসঙ্গতার সাক্ষী হয়ে থাকতো। তাই পালিয়ে যেতাম বাড়ী থেকে। নাইটক্লাবের সঙ্গিনীদের পেয়ে—সুরার রঙিন গ্লাস দেখে, আর পিয়নো ম্যাণ্ডোলীনের সুর আমাকে টেনে নিয়ে যেতো আর এক জগতে।

ওখানকার আকণ্ঠ তৃপ্তি নিয়ে মধ্য রাতে বাড়ী ফিরতাম। এই নিঃসঙ্গ বাড়ীটাতে ফিরে, ওই সোফায় গা এলিয়ে পড়ে থাকতাম। আমার সাজানো বিছানা—পড়ে থাকতো। শুধু—নীল আলোটা জ্বলতো বাকি রাতটুকুতে। তখন, তখন যদি তুমি আসতে নন্দিনী!

কেউ যদি ভাবতো আমাকে বিয়ে দিয়ে—সংসারী করা, সুখী করার কথা…তাহলে, আমি কি এমন হতে পারতাম! নন্দিনী, তুমি বিশ্বাস কর—তাহলে সত্যিই আমি ভাল হয়ে উঠতাম।"

নন্দিনী কি ভীষণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল…প্রবালের সেই অতীত কাহিনী শুনতে শুনতে আকুল হয়ে শুধু বলেছিল—এখনও কি তোমার ভাল হ'বার সাধ জাগে না—এখনও আমার কথা তোমার ভাবতে ইচ্ছা করে না! একথার উত্তর না দিয়ে প্রবাল মৃদু হেসেছিল। ওর স্ফীত ওষ্ঠাধর—থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। দু'চোখে শুধু গাঢ়—কি গভীর নিস্তব্ধতা ছিল।

আবার অন্যকথায় ফিরে এলো—'কিন্তু কি জানো নন্দিনী, বিয়ে যখন করলাম তখন আমার এমন একটা সাধ মনেই আসেনি। বড়লোকের ছেলের হঠাৎ কেমন খেয়াল মানে, যখন ভারি একটা অসুখে বিছানায় পড়লাম। ঘর থেকে বেরোতে পারিনি ক'দিন, অথচ কি নিঃসঙ্গ সেই ঘরখানাতে আমাকে পড়ে থাকতে হোত একা। আ। দাসদাসীরা শুধু ফরমাস খেটেই খালাস! তখন, তখনই আমাকে কি একটা অভাব বেদনায় কাতর করছিল বারবার। মনে হচ্ছিল, এমন সময় আমার আপন একজন কেউ নেই। আমার যেন ক-ত ক-ষ্ট! ভাবতে ভাবতে একদিন জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি—সামনের বাড়ীর নতুন বউটি—জানলার গরাদ ধরে দাড়িয়ে আছে নিঃশব্দে সিঁথিতে ওর রাঙা সিঁদুর লেপে। আধো ঘোমটায় ঢাকা ভারি মিষ্টি একটি মুখ। যেন ওই মুখের আলোর, সামনের বাড়ীটা কত ঝলমল করছে। আহা! এমন বউ পেয়ে ওর স্বামীর কত সুখ! কত শান্তি!

সেই বধূর মুখের দিকে চেয়ে সহসা প্রবালদত্তের যেন কি হয়ে গেল। অসুখ থেকে সেরে উঠেই মনে হোল অমন একটি বউ এনে আমার ঘরেও সাজিয়ে রাখি। সমস্ত অন্ধকার বাড়ীটা—সেই মুখের আলোয়—ভরিয়ে দিই। যখনই এই সমস্ত ভাবা—ঠিক সেই সময়-সন্ধিক্ষণে—তোমার সংগে ঘটে গেল—বিয়ের ব্যাপারটা। কিন্তু এখন, আমার একটা কথা ভাবলে হাসি পায় নন্দিনী। আমার জন্যে এই বাড়ীতে একটা মেয়ে পড়ে আছে শুধু—নিজেকে ঠকাবার জন্যে আজও। না হলে প্রবাল দত্তকে চিনেও…হ্যাঁ, চিনেও, আজও নন্দিনী সুন্দরী কেন আমায় ভালবাসে?

'কি বলছো তুমি? সভয়ে নন্দিনী, প্রবালের মুখ চেপে ধরেছিল, বলেছিল—আর কিছু তোমার শুনতে চাই না। আর আমাকে কিছু বোল না তুমি, তোমার পায়ে পড়ি।' বলতে বলতে নন্দিনী ছুটে চলে গিয়েছিল। কোন অন্তঃপুরের অন্ধকারের এক কোণে দাঁড়িয়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

তারপর, দাস দাসী যে যেখানে ছিল—সবাইকে ডেকে নন্দিনী বলেছিল—আমি আর থাকবো না তোদের বাড়ীতে—আমি চলে যাব। তোরা তোদের বাবুকে দেখিস। বলতে বলতে—নন্দিনী ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল বাড়ী থেকে। কিন্তু পথ আগলে দাঁড়ালো সেই প্রবাল দত্ত। ভুল তার ভাঙে নি। কিন্তু ঘরের সাজানো বউ চলে গেলে যে—ঘর শূন্য হয়ে যাবে! আর আলো জলবে না। বড় নিঃসঙ্গ হয়ে উঠবে—সেই রাজবাড়ী। ইট, কাঠ আর পাথর ঐশ্বর্যের টান, আর কতদিন প্রবালকে বাঁচিয়ে রাখবে? শুধু, সেইকথাই মনে হয়েছিল, প্রবালের।

'নন্দিনী, নন্দিনী আমার ঘর কে আগলাবে, তুমি ছাড়া?' ভীষণ কাতরকণ্ঠে প্রবাল যেন আর্তনাদ করে উঠেছিল।

'ঘর? তোমার ঘর—' উপহাসের তীব্র হাসিতে উথলে উঠে নন্দিনী জবাব দিয়েছিল—'খালিই থাকবে। ঘর ছাড়ার আবার ঘরের দরকার কি—ঘরের বউ নাই বা থাকলো! বাইরে—তোমার কত বড় জগৎ—কত কোলাহল সেখানে। প্রবাল দত্ত খুব সুখেই থাকবে সেখানে।

'নন্দিনী, তোমাকে আমি যেতে দোব না। জেনো, আজও ঘর ছাড়া মানুষটা শুধু তোমার জন্যেই একবার ঘরে ফিরে আসে। সে সাজানো ঘর আমার ভেঙে দিও না—নন্দিনী তুমি যেও না। আমি তোমায় যেতে দোব না।'

নির্বাক, স্তব্ধ, নন্দিনী। হতবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। অবাক হয়ে চেয়ে রইলো স্বামীর মুখের দিকে। সেই মানুষটাকে যেন সে অপাংগে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো, যার সমস্ত পাপের নেপথ্যে, আরো একটা মানুষ

বড় একাকী হয়ে কাঁদছিল যেন। নন্দিনীর, তাই মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আরো একটা মন খুবই তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত! কিন্তু কিসের তৃষ্ণা? ক্ষুধা কিসের?

প্রবাল ওকে হাত ধরে, কত সযত্নে নিয়ে গেল ঘরে।

শুধু একটা ঘর। একটা বড় বাড়ী। তাকে জড়িয়ে নন্দিনী শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল যেন। সেই ঘর ছাড়া মানুষটা, মধ্যরাতের অন্ধকারেও একবার করে পা টিপে টিপে চোরের মত আসতো বাড়ীতে। দরজা খুলে দিয়ে নন্দিনী দাঁড়াতো সামনে। ইস্ প্রবালকে যেন চেনাই যেত না। আবো আলো আধো অন্ধকারে, এক ক্ষুধার্ত—প্রেতাত্মার মত ভাসতে ভাসতে ঘরে ঢুকতো। নন্দিনী ইশারায় বিছানা দেখিয়ে দিতো শোবার জন্যে। কিন্তু শুতে গিয়েও—সরে আসতো প্রবাল। জড়িত গলায় বলতো, 'আমি এখানেই থাকি বলে, প্রবাল সোফায় গা এলিয়ে ঝিমিয়ে পড়তো, ঘরে নীল আলোটা জ্বলতো, সমস্ত রাত ধরে। নন্দিনী জেগে থাকতো—জানলার গরাদ ধরে, দৃষ্টি তার সেই মধ্যরাতের অন্ধকারের আকাশে ডুবে যেতো।

প্রবাল অমনি করে সারারাত পড়ে থাকতো। কখনো ভুল বকতো—কখনো চোখের ঘোরে ক্লাবের সুন্দরীদের দেখে যেন লাফিয়ে উঠতো—হয়তো হাসতো, কাঁদতো, আবার গড়িয়ে পড়তো সোফায়। সে আর এক মানুষ। সেই ঘর ছাড়া মানুষ, ঘরে ফিরে এসেও, শান্ত হত না। পাগলামিতে ভরিয়ে রাখতো—সমস্ত রাজবাড়ীটাকে।

রুদ্ধ অভিমানের অন্তরালে থেকে, নন্দিনী ভেবেছিল—ধীরে ধীরে প্রবালকে ভাল করে তুলবে। তার সব কাজে সমর্থন জানিয়ে—একটি সনীরব প্রতিবাদে ভেঙ্গে পড়বে। সেও তো জয়? পরাজয়ের মধ্যে,—সমস্ত যন্ত্রণার মধ্যে, সমস্ত সহশীলতার—মধ্যেও যে, আছে আরো বড় জয়! সেই 'জয়' করবে বলে, পলে পলে—প্রতীক্ষা করেছিল নন্দিনী। তবু, একটা মানুষ তো। ঘর সাজিয়েছে যে, ঘর ভেঙে যাবার ভয়ে—নন্দিনীকে যে যেতে দেয়নি—সে কি আর কোনদিন ভাল হয়ে উঠতে পারবেনা?

আসলে, নন্দিনীর সেই চিন্তাটুকুই ছিল বোধহয়—অর্থহীন! সকলের প্রার্থনা বোধহয়, এক নয়। সকলের কামনাও বুঝি এক সুরে কাঁদে না। সকলের জীবনও এক নয় সকলের প্রকৃতিও। তবু, অনেকে যা করে মিলে মিশে, দেখে শুনে শিখেও! আবার কেউ কেউ বোধহয় দল ছাড়া। সকলের ছাড়া হয়ে—এক বিচিত্র-জীবন যাপন করে। চিরন্তন নিয়মের মাঝে, নিরন্তন যে কামনা নিয়ে, যে দলবদ্ধ মানুষগুলো, ঘর বেঁধে, সংসার করে—অনাগত দিনের সুখ শান্তিকে কামনা করে। প্রবাল সেই সব সংঘবদ্ধ ইচ্ছাকে—ছিঁড়ে ছিঁড়ে ক্ষত বিক্ষত করে—তারই ক্ষরিত রক্তপান করে। আশ্চর্য!

নন্দিনীও যেন সেই প্রার্থনা নিয়ে—কত কি চেয়েছিল এ' পৃথিবীর কাছে। কখনো শান্ত প্রবালকে কাছে পেলে, সহসা আদোর করে উঠতো নন্দিনী, বলতো··· কাঁপা কাঁপা গলায়—সেই কালোদীঘি টলটলে চোখ দু'টি তুলে 'আমার···আমার কি ইচ্ছে হয় জানো?' বলে, সহসা থমকে যেত সে।

প্রবাল ওর সেই চোখের দিকে অবাক দৃষ্টি ফেলে রাখতো, হয়তো বলে উঠতো—'ইচ্ছে কিসের ইচ্ছে নন্দিনী?' আশ্চর্য, মোলায়েম কণ্ঠস্বর! কি শান্ত সংযত স্বর।

ব্যাকুল হয়ে বলে ফেলতো নন্দিনী—কেন গো, তুমি বোঝনা, সংসার স্বামী সন্তান নিয়ে আমি বাঁচতে চাই; নইলে, আমি কিসের জন্যে বেঁচে থাকবো আর কিসের জন্যে—তোমার এই রাজবাড়ীতে পড়ে থাকবো? সেই কালোদীঘি—আরো টল্‌টল্ করে উঠতো! সহসা অভিমানী ছোট মেয়ের মত—প্রবালের বুকে মুখ রেখে ফোঁপাতো!

খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা হতবুদ্ধিতে—প্রবাল প্রথমে থতমত খেয়ে—বুকের ওপর পড়ে থাকা—নন্দিনীর সেই মুখখানাকে তুলে ধরতো। একটু চেয়ে দেখতো, তারপর, কেমন হয়ে উঠতো—অধীর। অস্থিরের মত প্রবাল বলে যেতো, ভ্রুভংগী করে, কপালে কুঞ্চিত রেখা টেনে, পুরু ওষ্ঠে বিচিত্র গম্ভীরতার ভাব এনে,—'নন্দিনী, মেয়েদের এ'সব ইচ্ছের মানে কি—জানো? তার মানে—পুরুষের বাইরের আনন্দ ইচ্ছেকে হত্যা করে—সাজানো প্রীতি দিয়ে ঘরে বন্দী করে রাখা। ওই সব

ভালবাসা, সন্তান, সংসারের প্রলোভন দেখিয়ে—তাদের নিজের হাতের খেলার পুতুল তৈরী করা। আমি তা পারবনা নন্দিনী, আমাকে এমনি করে নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় বেঁধনা আমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা কোরনা। হঠাৎ যেন বলতে বলতে প্রবাল ছিটকে পড়েছিল দূরে···

নন্দিনীর সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে উঠলো, দু'চোখে এক অবাক নীরবতা! দাঁতে দাঁত ঘষে—ক্রোধে অন্ধ হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো—বাইরের আনন্দই যদি বড় হয়—আর বুদ্ধিমান যদি তুমি হও—তাহলে আমাকেই বা বন্দী করে রাখলে কেন তোমার প্রাসাদে?

'তুমি খুব ছেলেমানুষ নন্দিনী। সংসার সন্তানের জন্য তোমার এই পাগলামী দেখলে, আমার বড় হাসি পায়, আর মনে হয়, এই ছেড়ে কোথাও পালাই—আর না তোমার সামনে আসি।' বলে, প্রবাল যেন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল···।

'না না, তুমি পালাতে পারবেনা। কোথাও আমি তোমাকে যেতে দেবনা—যেমন তুমি আমাকে বন্দী করেছো—আমিও তোমার করবো।' বলে, নন্দিনী থরথর করে কাঁপছিল। সর্বাংগ ওর উচ্ছ্বসিত কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছিল।

প্রবাল সরে গেল, নন্দিনীর থেকে খানিকটা দূরে। দূরে থেকে চেয়ে চেয়ে সে-মুমূর্ষের ম্লান হাসির মত হাসতে লাগলো মৃদু মৃদু! তারপর, হঠাৎ ওর গম্ভীর গলা কেঁপে উঠলো—'নন্দিনী, তুমি আমাকে বাধা দেবে?'

—হ্যাঁ দেব, আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে—আমার সব কিছু দিয়ে—

—তুমি হাসালে, নন্দিনী!

—বেশ তো হাসোনা তুমি। তোমার ঐ হাসিতে আর ভয় করেনা আমার।

প্রবাল তখন সেই মৃদু হাসিতে দুলে—উঠে, নন্দিনীকে সবলে টেনে নিল—সমস্ত বুকের মাঝখানে—যেন সমস্ত হৃদপিণ্ডটাকে—নারীর সমস্ত কামনার মধ্যে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাইলো। খুব-রাগ খুব দুঃখ, খুব ঘৃণায় যেন মরে যাচ্ছিল—সেই এক পুরুষ, এক নারী।

শুধু দুই হৃদয়ের সংঘাতে—সংঘর্ষণে—যেন ঝড় বৃষ্টি বাজ পড়ছিল রাজবাড়ীর বুকে। তবু, সেই প্রবালও ভাল ছিল, কখনো মানুষ, কখনো পশু। কখনো হাসতো, কখনো কাঁদতো। সেই বিচিত্র হৃদয়কে ঘিরে—এক কান্না হাসির অদ্ভুত খেলা চলতো। ···নন্দিনী চেয়ে চেয়ে দেখতো, সহিষ্ণুতা আর অসহিষ্ণুতার মধ্যে তার জীবনটা, ভাঙছিল! গড়ছিল! সেই উত্থান পতনের সুর, জীবনের ভাঙাগড়ার খেলা নিয়ে, 'দত্তভিলার' সেই একটি পুরুষ সেই একটি নারী, বিচিত্র বেদনার নিভৃত খেলায় মেতে উঠেছিল···।

রাজবাড়ীর সেই বিচিত্র আনন্দের রাজা, বিচিত্র বেদনার রাণী, সুখ দুঃখের কাড়াকাড়ি করে, ভাগাভাগি নিয়ে—এ' জগতের মাঝখানে পেতেছিল আর এক সংসার। তাদের সেই অনুভবের রাজত্বে এক নতুন সুর বাজতো! সমস্ত—দত্তভিলার অলিন্দে অলিন্দে খিলানে খিলানে তা প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠতো।

সেও বুঝি একটা সুখ দুঃখের—মান অভিমানের, দিন ছিল, সেও একটা জীবনের মুগ্ধ গল্প ছিল। বিরহ মিলনের কৌতুক, কলহে কলরবে ভরা ইতিহাস!

··· ··· ···

ভোর হয়ে আসছে। রাত যেন, প্রহরে প্রহরে অতন্দ্র নিঃশ্বাস ফেলে গেছে। লৌহকপাটের ওপারে এখন আলো। জেলখানার মাঠে গড়িয়ে পড়ছে—করবী গাছের মাথাটা ছুঁয়ে যাচ্ছে—জেলার সাহেবের কোয়ার্টার থেকে ভোরের দাসীটা উঠে পড়েছে···।

আশ্চয, লছমী এখনও ঘুমুচ্ছে। জেমেরও চোখে সেই অভিভূত নিদ্রা! লছমীর নাক ডাকছে—কি বিশ্রী সুরে! যেন—খাঁচার বন্দী একটা হিংস্র জানোয়ার ক্রমাগত গোঁঙাচ্ছে! নিষ্ফল আক্রোশে! লৌহ—খাঁচার অবরুদ্ধ জীবন্ত আত্মা, অস্ফুট আর্তনাদে—কারার আঁধারকে কাঁপিয়ে তুলছে একটি ঘুম ঘোর অবচেনায়!

আকাশের সব তারাগুলো নিভে গেছে একে একে। ভোরের বাতাসে উত্তাল হ'য়ে উঠেছে বন্দীশালা। কারার ভেতরের বাইরের সব অন্ধকার ধীরে ধীরে যেন অপসারিত হয়ে গেল। সারারাত প্রহরীদের চলে ফিরে বেড়ানোর শব্দ, ভারি বুটজুতোর আওয়াজ' স্তিমিত হয়ে এলো। শুধু শোনা যাচ্ছে—ওয়ার্ডারের হুকুম—গম্ভীর কণ্ঠস্বর, সুইপার জমাদারদের খামোকা চেঁচামেচি, বিচিত্র

কলহের সুর, সমস্ত রাতের দুঃস্বপ্নকে যেন ধীরে ধীরে মুছে দিতে থাকে।

লছমী, লছমী; ওঠো, ওঠো, সকাল হয়ে গেল, দেখনা আমাদের অন্ধকার ঘরে কেমন আলো পড়েছে—ওই দেখ সূর্য উঠেছে ওই দূর আকাশে···নন্দিনীর ডাক শুনে ধড়মর করে উঠে বসলো লছমী। অবাক হয়ে সে লৌহ প্রাচীরের ওপারের আলো দেখতে লাগলো। সমস্ত রাত ধরে সে নাকি অন্ধকারের স্বপ্ন দেখেছে···

সেই অন্ধকারে লছমীর ডাইনি শাশুড়ীটা এসে কতবার লছমীকে ভয় দেখিয়েছে। ছেলেমানুষ বউ লছমী। নতুন বিয়েব পর শাশুড়ী স্বামীর অত্যাচারে কতদিন খেতে পায়নি—স্বস্তিতে ঘুমুতে পারেনি। ডাইনী শাশুড়ী, স্বামীকেও নাকি তুক্ করেছিল। মায়ের কথা শুনে কি মার না মারতো লছমীকে। শাশুড়ী ওর সমস্ত চুল কেটে দিয়েছিল, মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল—যাতে ছেলে না বউকে ভালবাসে। ওকে বাপের বাড়ীতে যেতে দিতনা। একদিন অত্যাচারে মরিয়া হয়ে সে—ঘুমন্ত শাশুড়ীর··গলায়—ধারালো বঁটির কোপ বসিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল রাস্তায়···তারপর সে ভয়ে ভয়ে পথে পথে ঘুরতো। ভয়ে বাপের বাড়ীতেও লছমী যেতে পারেনি।

লছমী যেন আজও ওর মুখখানা দেখিয়ে কাঁদে শুধু—ওর ভীরু চোখে জল ঝরে পড়ে নিঃশব্দে!

এতক্ষণে জেমও উঠে বসেছে। সূর্যের আলো-কে দু'চোখ ভরে দেখছে—এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লেডী। সেই দূরের আকাশের সূর্যালোক দেখতে দেখতে জেম যেন—আবেগে আর্তনাদ করে উঠলো—হাউ বিউটি ফুল সিন!

বলতে বলতে জেম, দু'হাত জোড় করে, বুকে রেখে, পরমানন্দে চোখ বোঁজে। বোধহয় সেই পরম পিতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালো যেন—ঈশ্বর, তোমার এই উজ্জ্বল—অমলিন আলো দিয়ে—জগতের সমস্ত পাপ সমস্ত মলিনতার অন্ধকার মুছিয়ে দাও। আমাদের মুক্তি দাও, আমাদের শান্তি দাও।

জেমের মুখ কি আশ্চর্য, সুন্দর হয়ে উঠেছে! বুঝি জগৎ পিতা যীশুর নাম স্মরণ করে—ও' শুচি শুদ্ধ পবিত্র হ'য়ে উঠেছে—সমস্ত পাপ আর ঘৃণা থেকে চির মুক্তি পেয়েছে। তাই জেম বলছে—ওহো গড্ এলাউ মি টু রেষ্ট্ অন পিস্।

ওর বিশ্বাসঘাতক বয় ফ্রেণ্ড-লরেনকে সে খুন করেছিল—যীশুর পুণ্য দিনে—বড়দিনের একটি উৎসব রাত্রিতে। সুরার সংগে বিষ মিশিয়ে। সেই সুরাপাত্র লরেনের হাতে তুলে দিয়েছিল।···

প্রতিহিংসা আর প্রেমের কি বীভৎস পরিণাম! ক্ষমার দেবতা যীশুকে ডেকে আজও জেম বলে—'ভগবান তুমি শয়তানদের একদিন ক্ষমা করেছিলে—পবিত্র প্রেম ধর্মে!

কিন্তু আমি? আমি যে মানুষ। কামনা লোভ হিংসা প্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্তি! লরেনকে ভালবাসতাম বলেই—তো, তার বিশ্বাসঘাতকতাব চরম শাস্তি দিলাম। কিন্তু এ' যদি তোমার চোখে অপরাধ হয়—তাহলে আমাকে ক্ষমা করোনা তুমি। তোমাব দেওয়া সব চেয়ে বড় দণ্ড আমি মাথায় করে নেব।'

সূর্যের আলো দেখলে, জেম প্রতি প্রভাতেই প্রার্থনা করে—

"শান্তি ও পবিত্রতার সূর্যালোক, ধীরে ধীরে মুছে যায়—আবার পৃথিবীর ওপারে ফিরে আসে রাত্রি। সেই অতন্দ্র নিঃশ্বাসে ভরা রুদ্ধকাবার অন্তরাল অন্ধকারে জেমের প্রার্থিত শান্তি, নির্জীবের মত পড়ে গোঁঙায়! লছমীর সেই ভয়ার্ত নিঃশ্বাসটা অন্ধকারে আছড়ে পড়ে। লছমী অঘোরে ঘুমোয়···জেমও ঘুমিয়ে হয়তো তার মৃত প্রিয়তম লরেনের স্বপ্ন দেখে।

মধ্য রাতে আবার শীতার্ত বাতাস কেঁপে উঠলো। কোথায় যেন একটা কুকুর ডেকে উঠলো। আর্তনাদ করতে করতে একসময় চুপ করে গেল। দূরের মাঠের বুকে নিশ্ছিদ্র আঁধার ঢেকে গেছে। কাঠের রেলিংএ ঘেরা বারান্দার কোণে, প্রায়ই একটা কালো বেড়াল বসে থাকে। অন্ধকারে তার দুচোখ—সার্চলাইটের মত জ্বলে!—বন্দীখানার পাশে তার মূর্তিটা—অশরীরী প্রেতাত্মার মত মনে হয়। মাঝে মাঝে কেমন যেন ভয় করে ওঠে নন্দিনীর—। যেন তার দিকেই চেয়ে থাকে—কি ভীষণ প্রতিহিংসার দৃষ্টিতে। নন্দিনীর সন্দেহ হয়—ওকি সুবলের প্রেতাত্মা?

যেদিন ওকে না দেখা যায়—সে রাত্রিটা নন্দিনী অনায়াসে লৌহকপাটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বড় বড় শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সে। পূবদিকের জেলখানার মাঠের অন্ধকারে, করবী গাছটা যেন মাথা দোলায়। শীতার্ত বাতাসের হিমেল স্পর্শে চমকে ওঠে! শির্ শির করে কেঁপে ওঠে তার সব পাতাগুলো।

কখনো কোন রাতে চাঁদ ওঠে—জেলখানার আকাশে। মিষ্টি মিষ্টি আলো ছড়িয়ে দেয় সমস্ত মাঠখানায়। দূরের কোয়ার্টাগুলো, জেলখানাগুলো, যেন মৃতের অস্তিত্বের মত পড়ে থাকে। সাড়া শব্দহীন রাত্রিটা—শুধু একটা দুঃস্বপ্নের ছবি আঁকে এক মনে। সমস্ত কিছুই যেন অচেতন! এ'রাতের অন্ধকারে। পৃথিবীর চোখগুলো নিভে থাকে।

জেলখানা রাতের প্রহরারত সান্ত্রীরাও—একটু সুযোগ পেলেই ঘুমিয়ে নেয়।···দুষ্টু কয়েদীরা কোথায় যেন আবদ্ধ অন্ধকারের প্রাচীরের আড়ালে বসে—চুপি চুপি পালাবার কথা ভাবে। এই জেলখানার রাত্রিও কত বিচিত্র। এই কারাগার, এই বন্দীশালা, এই জেলখানাগুলো—যেন এই নিস্তব্ধ রাতের··কোন একটা বেরিয়েল গ্রাউণ্ডের ওপর সাজানো এক একটা কফিন। মাটির তলার অন্ধকারে ঘুমিয়ে, কারা যেন নবজন্মের—স্বপ্ন দেখে।··

... ...

—'আমাকে কোন্ জায়গায় তোমরা নিয়ে এলে?'

—কেন জানো না। এই তো আদালত। এই তো অপরাধীদের বিচারশালা। আমাদের ধর্মাবতার, এখান থেকেই দণ্ডিতকে যার যা প্রাপ্য দণ্ড দেন।

ওঃ! নন্দিনী ভীষণ ঘেমে উঠেছিল। বিন্দু বিন্দু ঘাম কপালে লেগে, শীতের শিশিরের মত চিক্ চিক্ করছিল। অনেকগুলো প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে তাকে আদালতে আনতে হয়েছিল। সংগে ছিল প্রহরীরা—নন্দিনীকে প্রহরায় যেন আগলে এনেছিল বিচারগৃহে।

অনেক জনতায় ভরে ছিল সেই ঘর। কৌতূহলী দর্শকের বিক্ষিপ্ত ভিড়! উঁচু একটা আসনে বসেছিলেন ধর্মাবতার। সেই পুরু ফ্রেমের চশমার আড়ালে এক জোড়া চোখ—তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। অপরিসীম বিস্ময় যেন ঠিক্‌রে পড়ছিল।···

কাঠগড়ার রেলিং চেপে ধরে দাঁড়িয়েছিল নন্দিনী। বিচারক টেবিলের কাগজপত্র বার বার দেখছিলেন, আসামীর জবানীও লিখছিলেন।

নন্দিনী জবানী দিচ্ছিল ··

তারপর? তারপর কি বলে যাও—বিচারকের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো যেন।

কি ভীষণ গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল নন্দিনীর। কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল। দীর্ঘ জবানী দিতে দিতে সে বড় ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তবু, ঘটনার শেষ অঙ্ক তখনও বাকি। জীবন নাটকের শেষ দৃশ্য।

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে আবার যেন ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠলো। মঞ্চের পর্দা সরে গেল আবার ধীরে ধীরে··· কৌতূহলী জনতার মধ্যে নিঃশব্দ গুঞ্জরন চললো।

নাটকের শেষ অঙ্ক আরম্ভ হোল।···

স্থান সেই রাজপ্রাসাদ। সেই অভিশপ্ত প্রাসাদের রাজারানীকে দেখা গেল। তাদের মাঝখানে আরও একজন নায়িকা। উর্মিলা সুন্দরী। রাজারানীর সেই সুখ দুঃখের সংসারে—কে আনলো উর্মিলা সুন্দরীকে?

···রুদ্ধশ্বাস অডিটোরিয়াম—যেন থম থম করে করে উঠলো। চাপা কৌতূহলে, চাপা উত্তেজনায়, অধীর প্রতীক্ষায় সমস্ত কক্ষটা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো···

বন্দিনীর অসমাপ্ত জবানী সুরু হোল।···

গল্পের শেষটুকু।

... ...

অবনীকাকা হঠাৎ মারা গেলেন। সহসা কাকীমা এলেন—রাজবাড়ীতে। সংগে এলো উর্মিলা। অষ্টাদশী সেই সুন্দরীর পরিচয় দিলেন কাকীমা—মা বাপ মরা সেই অনাথ মেয়েটি নাকি কাকীমার ভাইঝি। কাকীমার কাছেই নাকি থাকে। অনেকদিন নন্দিনীকে না দেখে যেন খুব কষ্ট হচ্ছিল কাকীমার তার 'পর, মনে করেছিলেন নাকি—নন্দিনীকে স্নেহ করবার সেই কাকা তো আর বেঁচে নেই। কাজেই তিনি সেই ভারটা নেবার জন্যে—সহসা এসে হাজির হলেন। সহসা, এইজন্যে যে, নন্দিনীর বিয়ের পর কখনোই আসেন নি কাকীমা। ক্রোধে ঈর্ষায়—নন্দিনীর সুখ সৌভাগ্যকে চোখ দিয়েও দেখতে চাননি।

কিন্তু সেই কাকীমা কিসের দরদে এলেন—নন্দিনীর বাড়ীতে?

সে রহস্য তখনও ঢেকেছিল যবনিকার অন্তরালে। যখনই কাকীমা আসতেন—উর্মিলাকে সংগে নিয়ে। বলতেন, মেয়েটা তোকে খুব ভালবাসে রে, নন্দিনী, আমি এলেই ও' আসতে চায়।' নন্দিনীও বলেছিল—'আমারও খুব ভাল লাগে কাকীমা। একা একা থাকি তো—ওকে যেন সঙ্গিনীর মত মনে হয়।

সত্যিই উর্মিলাকে ভাল লাগতো নন্দিনীর। সেই ভাললাগার মধ্যে হয়তো সেদিন সেই মেয়েটাও জানত না তাকে নিয়ে কি এক অনাবশ্যক কাহিনী গড়ে উঠবে। সেই কারণেই বোধ হয়—নন্দিনী আর উর্মিলার মধ্যে অনাবশ্যক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নেপথ্যে থাকতেন কাকীমা। একটা নিষ্ঠুর ইতিহাস তৈরী করবার জন্যে ওৎ পেতেছিলেন—রাজবাড়ীর অন্ধকারে।

মাঝে মাঝে উর্মিকে, নন্দিনী নিজের কাছে—রেখে দিত। নিঃসঙ্গ যে দিনগুলো বড় অসহ্য মনে হোত—উর্মিকে কাছে পেলে কত যেন সান্ত্বনা পেতো নন্দিনী। কাকীমাও যেন চাইতেন—উর্মিকে নন্দিনীর কাছে রেখে দিতে। তখন নন্দিনীর নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে যেতো। তার মত এই অনাথ মেয়েটাকেও—বোধ হয় কাকীমা চান অন্যের ঘাড়ে তুলে দিতে। যেমন নন্দিনীকেও সহ্য করতে পারেননি। শুধু—এইটুকুই ভেবেছিল নন্দিনী।

হয়তো সেই অনাথ মেয়েটার কথা ভেবেই নন্দিনী—ভাল বেসেছিল উর্মিলাকে। নন্দিনীকে দিদি বলে ডাকতো, উর্মিলা। ছোট বোনের মতই স্নেহ করতো নন্দিনীও।

উর্মিলার আসা যাওয়ার মধ্যে হঠাৎ প্রবালের পরিবর্তন দেখা গেল। সেই চিরদিনের অভ্যস্ত মধ্য রাতে ফেরা প্রবাল দত্ত যেন সন্ধ্যের আগেই বাড়ী ঢোকে। উর্মিলাকে নিয়ে বেশ গল্পগুজবে মেতে ওঠে। কিন্তু সেটা যেন নন্দিনীর বড় আনন্দের ছিল—। উর্মিকে ওর জামাইবাবু অর্থাৎ প্রবাল কোন ঠাট্টা ইয়ার্কি করলে—সুন্দরীর মুখ লাল হয়ে উঠতো। রাগ করতো জামাইবাবুর ওপর। নন্দিনী ওকে বোঝাতো—তোর সংগে একটু আনন্দ করতে পারবে না তোর জামাইবাবু? দেখছিস, তোকে দেখে কত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসে। বলেই, যেন নন্দিনীর সহসা কেমন হোত। আবার নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবতো, উর্মির কাছে আজ তার কত কৃতজ্ঞতা! আজ ওকে দেখেই—সেই ঘরছাড়া মানুষটা ঘরে ফিরে আসে। সমস্ত মনটা এমনি একটা আনন্দে উদ্বেল হয়ে হয়ে উঠতো। উর্মির জন্য আজ সারা রাজবাড়ী যেন আলোকিত। প্রবাল যে তার ঘরে ফিরে আসে। সেই প্রবাল তখন মদ খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল। ঐ যে নন্দিনীর অপ্রত্যাশিত সুখ সৌভাগ্য!

তাই উর্মিকে যেন আরো ভাল লাগছিল নন্দিনীর। কখনো মনটা খারাপ হয়ে—উঠতো—সহসা একটা ভয়ে—সমস্ত শরীর কাঁপতো! পরমুহূর্তে মনে হোত সমস্ত ভুল।

তবু, ছুটে এসে উর্মিকে জড়িয়ে ধরে বলতো—'তুই তোর জামাইবাবুকে আমার ঘরে বন্দী করেছিস—তোকে ইচ্ছে করে আমার সব কিছু দিয়ে বেঁধে রাখতে—আমার ঘরের মানুষ যে ঘরে ফিরে এলো, শুধু তোরই জন্যে।

উর্মিলা যেন একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল—দুশ্চরিত্র প্রবালের কথা সে তার পিসীমা অর্থাৎ অবনীকাকার স্ত্রীর কাছেই শুনেছিল। এবং সেই লোক উর্মিলা সুন্দরীকে দেখে ঘরে ফিরে আসে—হয়তো তার মধ্যে কোথাও ইঙ্গিত ছিল বলে, উর্মিলার মনে হয়েছিল। প্রথমটায় কেমন অপমান—কেমন একটা অভিমানে দিদির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—'তুমি কি বলতে চাইছো দিদি? তার মানে?

ম্লান মধুর হাসিতে উদ্বেল হয়ে নন্দিনী বললো-মানে বুঝলিনা তুই, যে মানুষটা মধ্যরাতের আগে ঘরে ফেরেনা, সে সন্ধ্যে হ'লেই ফিরে আসে, সে কার জন্যে বলতো?' বলে, নন্দিনী যেন বিবর্ণ হাসি হাসছিল, দু'চোখ যেন ফুলে উঠেছিল।'

স্তব্ধ, ম্রিয়মাণ হ'য়ে রইলো উর্মিলা। লজ্জায়, অপমানে, বোধ হয় আড়ষ্ট হয়ে পড়ছিল।

সহসা নন্দিনী ওকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো—ঠাট্টা করলে তোর খুব লজ্জা হয়, না? কিন্তু—কিন্তু আমা কি মনে হয় জানিস, বলে, একটু চুপ করে থেকে আবার বললো—মনে হয় তুই যাদুমন্ত্র জানিস। যা দিয়ে তুই

তোর জামাইবাবুকে ভুলিয়েছিস। আমি বলি, তুই মায়াবিনী! ওরে, তুই বোধ হয় আরো কিছু··· শয়তানী··রাক্ষুসী · ডাইনী, বলতে বলতে নন্দিনী—যেন দিশাহারা হয়ে—সজোরে উর্মিকে সরিয়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে সহসা কেঁদে উঠলো।···কি হোল যেন নন্দিনীর। সংশয়, সন্দেহ, দুঃখ আনন্দের মাঝখানে নন্দিনী সহসা পাগল হয়ে গেল বুঝি।

না না, কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না নন্দিনী। কোথায়···কোথায়···যেন কোনখানে···কোন অদৃশ্যে—কোন অজ্ঞাতে কি ভীষণ একটা বিপ্লব চলছিল।—রাজবাড়ীর অন্ধকারে অন্ধকারে—কারা যেন বসে ষড়যন্ত্র করছিল—চুপিচুপি!

উর্মিলাও সহসা কেঁদে ফেলেছিল দু'হাতে মুখ ঢেকে। কি হোল দিদির? দিদির বাড়ীতে এসে থাকার জন্যেই—কি এই মিথ্যে ছলনা? না, না, সে এখানে কিছুতেই থাকতে পারবে না, যেন একটা অসহায় আকুলতায় ভেঙে পড়েছিল সেই অনাথ মেয়েটা।

নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে উঠেছিল নন্দিনী, সেই অনাথ মেয়েটার দিকে চেয়ে। কি নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যে ফুঁপিয়ে উঠছিল যেন সেদিনের দুটি মেয়ে।

উর্মিলার চলে যাবার পথ আটকালো নন্দিনী।—'আমাকে ছেড়ে যাসনে উর্মি, তুই গেলে আমার সব যে হারিয়ে যাবে

তার মানে? উর্মিলার অভিমানাহত কণ্ঠ যেন গর্জে উঠলো।

বড় শান্ত গলায় নন্দিনী বলে গেল—'সব কথার মানে কি বলা যায় রে? যা বলেছি—তারও কি মনে আছে? ধরনা, সেটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা।

—দিদি, এটা তোমার তামাসা? কি ভয়ঙ্কর তোমার পরিহাস বলতো? বলতে বলতে উর্মি যেন আবার ফুঁপিয়ে উঠলো কান্নায়।

উর্মির জলভরা চোখ দুটো নন্দিনী—তার আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল। কি এক অপরাধবোধে ভেঙে পড়েছিল সে—তাই বলেছিল যেন অসহায় কণ্ঠে—'রাগ করিসনি বোন। আমার কি থেকে কি যেন হয়। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। না, না, আর এই নিষ্ঠুর ঠাট্টা করবে. তোকে আর কখনো কষ্ট দেব না।' বলতে বলতে নন্দিনী যেন ছোট্ট শিশুর মত ফুঁপিয়ে উঠেছিল—আঁচলে মুখ চেপে।

তার দুদিন পর উর্মি চলে গেলে, কি একটা নিঃসঙ্গতায় নন্দিনীর সব কেমন শূন্য মনে হচ্ছিল। জীবনের পরিহাস বোধহয় আরো নিষ্ঠুর! আরো নির্দয় বোধহয় তার তামাসা।

অন্ধকার রাতে সমস্ত বুক ভেঙে যাচ্ছিল যন্ত্রণায়। নীল আলোটা নিভিয়ে ঘুমন্ত প্রবালের পাশে এসে শুয়েছিল। সেই মানুষটা বিছানায় আবার ঘুমোয়। মধ্যরাতের সেই—প্রেতাত্মাকে যেন উর্মি তাড়িয়ে দিয়েছিল বাড়ী থেকে। এ' যেন অন্য মানুষ—অন্য প্রবাল।

অন্ধকারে গাঢ় নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছিল প্রবালের। সহসা ঘুম ভেঙে গেল যেন প্রবালের। ঘুমন্ত চোখে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। যেন এতক্ষণ তার অস্থির হৃদপিণ্ড রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে দম আটকে আসছিল, নন্দিনীকে কাছে পেয়ে কত তৃপ্তি পেলো যেন প্রবাল। যেন অন্ধকারেও ঈশ্বরের খেলা চলছিল—অভূতপূর্ব!

খুব আপন করা স্পর্শ, নন্দিনীর যেন তন্দ্রা আসছিল। কি সাংঘাতিক আদরে আদরে সেই অন্ধকারের মানুষটা—নন্দিনীর সমস্ত সত্তাকে যেন গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল! কি ভীষণ একটা অভিভূত লজ্জায় নন্দিনী বোধ হয় অন্ধকারেও আত্মগোপন করছিল।

জীবনে সেই বোধ হয় প্রথম। একটা আপন মানুষের ভালবাসায় অন্ধকারের বাতাসও কেঁপে উঠলো। দূরের আকাশে চাঁদের গুঁড়ো যেন ঝরে ঝরে পড়ছিল—প্রবাল আস্তে আস্তে উঠে পড়লো। নেভানো আলোটা জ্বেলে দিল। চমকে উঠেছিল তখন নন্দিনী।

প্রবালের সারা মুখে কি শান্ত হাসির ঢেউ খেলছিল! সারা ঘরে আলো ছড়িয়ে। প্রবাল আবার এসে বসলো বিছানায়। মধ্য রাতেরই আলো! সেই আলোয় অবাক হয়ে দেখছে একটা পুরুষ। একটা নারীর মুখকে। নাইট-ক্লাবের সুন্দরীদের চেয়েও আরো আশ্চর্য কিছু সে খুঁজছিল যেন—নন্দিনীর সমস্ত মুখখানার ভেতর। সলজ্জ চোখদুটির পাতা যেন নিচে আসছিল নন্দিনীর। কি ভীষণ লজ্জায়—তার সর্বশরীর আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

স্বামী কি এমন করে কখনো তার মুখ দেখেছে? বেহায়ার মত কাঙাল দৃষ্টি নিয়ে? নন্দিনীর সারা মুখের অন্ধকারকে যেন আলোয় ছড়িয়ে দিচ্ছিল প্রবাল। বে-আব্রুর মত,—কতদিনের সুখ দুঃখের আবরণে ঢাকা—সেই সলাজ মুখের পর্দা সরিয়ে দিচ্ছিল ধীরে ধীরে।

প্রবাল আস্তে আস্তে মুখ নামিয়ে আনছিল। আরো নীচু হয়ে দেখছিল নন্দিনীকে। নন্দিনীর নীরক্ত অধরের প্রান্তটুকু ছুঁয়ে ছুঁয়ে—আর একটি নির্লজ্জ অধর স্পর্শের সিক্ত ধারা ঝরে পড়ছিল। কবেকার পরিচিত একটি সবল বাহুতে—বাঁধা পড়ে—শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল নন্দিনীর। নিজেকে যেন কিছুতেই ছাড়াতে পারছিল না। বরং নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষে—বিলিয়ে দিচ্ছিল অকুণ্ঠভাবে। ক্ষুধিত, তৃষিত, ব্যথিত সেই অন্ধকারের আত্মা!

ভোর হয়ে গিয়েছিল। নন্দিনী ঘুমিয়ে পড়ছিল। প্রবাল তখনও জেগেছিল। নন্দিনীকে আদরে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে—তার অতন্দ্র রাত পার হয়ে গিয়েছিল। কি আশ্চর্য এক স্নেহ বর্ষণ হয়েছিল—সমস্ত রাত্রি ধরে।

প্রবাল যেন আর একটা মানুষে ফিরে এলো,—তখন নন্দিনীর মনে হয়েছিল হয়তো তার অনেক পুণ্যে—সেই রাজবাড়ীর অভিশপ্ত অন্ধকার কেটে গিয়েছিল। কতদিনের পুঞ্জীভূত দুঃখ! সহসা যেন রাজারানীর সংসারে সুখের হাজার বাতি জ্বলে উঠলো। দত্ত ভিলার ঘরে ঘরে ঝাড়-লণ্ঠনগুলো দুলে উঠলো আলোর আঘাতে আঘাতে!

সেই আলোয় আর একদিন কাকীমা। যেন চুপি চুপি ঢুকেছিলেন প্রবালের ঘরে। কি একটা কথায় যেন ব্যাকুল হয়েছিল তিনি। নন্দিনীকে ঘরে ঢুকতে দেখে যেন চমকে উঠলেন! নন্দিনীও অবাক!

'ওমা! কখোন এলেন কাকীমা? বলে, নন্দিনী পায়ের ধূলো নিল। কাকীমা যেন থতমত খেলেন—প্রবালও যেন একটু চমকে উঠলো।

সব সামলে নিয়ে কাকীমা সহাস্য বদনে বললেন—'এই যে মা এই এয়েচি—জামাইএর সংগে কথা বলছিলাম, তোকে আর দেখতে পেলাম না।'

নন্দিনী বললো—'উর্মিকে নিয়ে এলেন না কাকীমা?

—'না, মা সে কেন জানি আসতে চাইল না। ভাবলাম, একাই গিয়ে মেয়েটাকে দেখে আসি।'

—বসুন কাকীমা, আমি চা করে নিয়ে আসছি, বলে নন্দিনী চলে গিয়েছিল ঘর থেকে।

ঠিক তারই দু'দিন পর—প্রবাল বললো—'চল, নন্দিনী আমরা হাজারীবাগে বেড়িয়ে আসি।' প্রস্তাবটা শুনে—নন্দিনীর ভালই লেগেছিল। জীবনে সেই প্রথম বোধ হয়—নন্দিনী স্বামীর সংগে বেড়াতে এসেছিল হাজারীবাগে। অভাবনীয় একটা সুখ সম্ভোগের আনন্দে যেন মরে যাচ্ছিল। প্রাইভেট 'কার'এ করে ওরা গিয়েছিল। সংগে গাড়ী চালিয়ে গিয়েছিল ড্রাইভার হরিদাস মোহান্ত।

ওরা একটা সুন্দর সাজানো বাংলোতে উঠেছিল। সবুজ বনপথের পাশে, রানীগঞ্জের টালি দেওয়া বাংলোটাকে—স্বর্গরাজ্যের কুটীর বলে মনে হোত। রোজ সকালে বিকেলে—ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা ঝরতো! দূরের গাছগুলো মাথা উঁচু করে, উঁকি দিয়ে যেন দেখতো—নন্দিনীদের ঘরসংসার! হ্যাঁ, একটা নতুন সংসারই পাতা হয়েছিল। রাজবাড়ীর অনেক লাঞ্ছিত ইতিহাসকে পেছনে ফেলে রেখে যেন ওরা পালিয়ে এসেছিল—পাহাড়ী প্রদেশে। হাজারীবাগের শান্ত সুন্দর নম্র জীবনে।

সন্ধ্যে হ'লেই ওরা বেড়াতে যেত প্রাইভেট গাড়ীতে করে। হরিদাস মোহান্ত গাড়ী চালাতো। অনেক দূরের বন পথ, পাহাড়ী পথকে ওরা অতিক্রম করে চলে যেতো। দিশাহারা আত্মহারা হয়ে সেই সুদীর্ঘ পথ চলা। নতুন জীবনের—নতুন পথের অভিযাত্রী হয়ে—কতদূরের অভিযানে ওরা বেরতো।

তার মধ্যেই নতুন জীবনের মান অভিমানের অন্ধকারে ডুবে যেত নন্দিনী। পুরোন দিনের স্মৃতি নিয়ে—কখনো প্রবালের বুকে মুখ চেপে কাঁদতো শিশুর মত। প্রবাল যেন ওকে কত সান্ত্বনায়, কত ভালবাসায়—নতুন আলোর জগতে পৌঁছে দিত। বলতো, আশ্চর্য নরম সুরে, দেখো নন্দিনী, সুখদুঃখের খেলা নিয়েই তো মানুষের জীবন। অতীতের খেলা সাঙ্গ হয়েছে। এবার আমাদের বর্তমানের খেলা সুরু হ'য়েছে। কি সুন্দর, কি সুখের দিন এসেছে বলতো?

নন্দিনী চুপ করে সহসা থেমে যেত। বুকের সব জমাট অভিমান যেন জল হয়ে যেত প্রবালের কথায়, সান্ত্বনায়, নিবিড় ভালবাসায়। কি সুন্দর দিনই না এসেছিল

হাজারীবাগের প্রতিটা দিবসে, প্রতিটা রাত্রে, প্রতিটা সময়ে প্রতিমুহূর্তে মুহূর্তে, জীবনের এক অনাস্বাদিত আনন্দ স্বর বাজতো! সেই ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা ঝরা দেখতে দেখতে, নন্দিনীর মনে হোত, জীবনের এমনি কত সবুজ পাতাও ঝরেছে! তবু কি গাছটা মরেছে? গাছ আছে বলেই না আবার নতুন বসন্তের দিনে, বিবর্ণ হলুদ শাখা প্রশাখায়, আবার সবুজের গাঢ় নিবিড় অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। আরো কত পাতা, আরো কত ফুল ফুটেছে জীবন বৃক্ষের শাখা প্রশাখায়। প্রতিটি বৃন্তে-বৃন্তে!

প্রবাল আঙুল তুলে দেখাতো—ওই, ওই দেখো আকাশ, সূর্য তার শেষ আলো বিকীরণ করে চলে যাচ্ছে—পশ্চিম দিগন্তরালে! সন্ধ্যে নেবে আসছে। সারাদিবসের সমস্ত উপভোগ্য সুরটুকু, সুখটুকু, প্রাণবত্তাটুকু অন্ধকারে আশ্রয় নিয়ে—ঘুমিয়ে পড়ছে, মৃতের মত নিস্পন্দ হয়ে। এখন সব দিকে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলে—সত্যি ভয় হবে। মনে হবে, সব বুঝি অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সব বুঝি নিঃশেষ হয়ে গেল তিলে তিলে! না, না নন্দিনী এই অন্ধকারের পরেও আলো আছে···অনেক আলো!

সকালবেলায় সেই আলো দেখিয়ে প্রবাল আবার বলতো—'নন্দিনী দেখো, দেখো কত আলো! কোথাও আর এতটুকু অন্ধকার নেই। সমস্ত ভুবন জুড়ে এখন—আলোর খেলা চলছে। চেয়ে দেখো, পাখীরা গান গাইছে, গাছেরা মাথা নাড়ছে, পাতাগুলো ঝরে পড়ছে। ঠিক মানুষের দেহমনেও এই বিচিত্র আনন্দের জোয়ার বইছে! আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি—সমস্ত বিশ্বসত্বার অবগুণ্ঠন খুলে যাচ্ছে···তার বে-শরম দেহটা সমস্ত বসন ভূষণ ছেড়ে ফেলে, খুসীর খেয়ালী স্রোতে ভাসছে—পরমানন্দে!

নন্দিনী ওই দেখো দূরে···কত বড় বড় পাহাড়। তার ওপরে আরো বড়—আকাশ! তার চেয়েও, আরো বড় আমাদের জীবন। তারও দিন ফুরাতে আরো কত সময় বাকি! এখনো কত কাজ! কত কি আমাদের জন্যে পড়ে আছে। নন্দিনী, বিশ্বাস কর, দুঃখটাই সব নয়। তারও শেষ আছে। তারপরেই, সুখ আসে - জীবনের বড় আয়োজনকে পূর্ণ করতে। নন্দিনী, সেই দিনগুলো আজ আমাদের সামনে।

সত্যি! সত্যি নাকি! বিহ্বলতায় নন্দিনী পাগল হয়ে যেত। সমস্ত বুকের সোহাগ দিয়ে যেন—সেই সুন্দর দিনগুলোকে জড়িয়ে ধরতো।···নিবিষ্ট আবেশে, আবেগে, সব কেমন হারিয়ে যেত···ইউক্যালিপটাস গাছের নীচে—সেই নতুন ঘরকন্নার দিনগুলো—প্রতি প্রহরের আনন্দে ভরে উঠছিল। হাজারীবাগের সুখী জীবন এইভাবেই সুরু হয়—

তারপর?

তারপর, আরো খানিকটা গল্প।

প্রতিদিন বিকেলে ড্রাইভার হরিদাস মোহান্ত গাড়ী নিয়ে 'রেডী' থাকতো। প্রথমে গাড়ীতে গিয়ে বসতো নন্দিনী। পরে, বাংলোর দরজায় চাবী দিয়ে প্রবাল উঠতো। পেছনের 'সীটে' দু'জনে খুব কাছাকাছি বসতো। সেই অভ্যস্ত নিয়মে পাহাড়ী বনপথের অভিযান। শুধু পথ চলা। যেতে যেতে জীবন দর্শনের সেই সব অদ্ভুত কথা। প্রবাল বলে যেতো—নন্দিনী বিভোর হয়ে শুনতো···গাড়ী চলতো ধীরে ধীরে···

সেই হাজারীবাগের জীবনবাদী নায়ক—জীবনের আশ্চর্য গল্প বলে যেতো। মুগ্ধ অনুভবে—শুনতে শুনতে নন্দিনী যেন অন্য এক পৃথিবীতে চলে যেতো।

'এই দেখো নন্দিনী, পথটা কতখানি—কত দূরে যেন ছুটে গেছে···হারিয়ে ফেলেছে তার সীমানা। মনে কর, আমরাও এই নতুন সুখের দিনগুলোর মাঝে—এই নতুন ভালবাসার সীমানা হারিয়ে ফেলবো। পথহারা, দিশাহারার মত—আরো কোন নতুন জীবনে আমরা চলে যেতে পারি, আরো দূরে···আরো কোথাও···হয়তো যেতে যেতে এই পথের মাঝেই আমরা হারিয়ে যাব। হয়তো দু'জনে দু'দিকে···হয়তো। হয়তো কেউ কাউকে আর খুঁজে পাব না। হয়তো কেউ কাউকে আর মনে রাখতে পারবনা···

কি বলছো, কি বলছো তুমি এ' সব? নন্দিনী যেন সভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। প্রবালের মুখের দিকে চেয়ে থর থর করে কেঁপে উঠলো সর্বশরীর! তখন প্রবাল ওকে নিজের খুব কাছে টেনে এনে, কানে কানে বললো—'খুব ভয় পেলে না?

ভয়? নন্দিনী চোখ তুলে, চোখে হাসি টেনে—সবেগে ঘাড় নাড়লো—'না না ভয়, কেন ভয় পাব আমি? কিসের

ভয়? কিছু তো নয়।···এমনি শুধু···শুধু কি থেকে কি যেন মনে হোল, তাই হঠাৎ অমনি করলাম। না, শোন তুমি, আমার কি যেন হচ্ছে—চল বাংলোতে ফিরে যাই। গাড়ী ফেরাতে বল—আমার আর যেতে ভাল লাগছে না, একটুও না···বলতে বলতে নন্দিনী ছেলেমানুষের মত ভেঙে পড়লো।

আমার ভীষণ ক্লান্তি লাগছে, বলে নন্দিনী—প্রবালের বুকের কাছে মাথা এলিয়ে দিল। মাথা নাড়তে লাগলো বার বার।

মৃদু মৃদু যেন হাসছিল প্রবাল। ডান হাতের আঙুল দিয়ে নন্দিনীর চুলের খাঁজে খাঁজে নাড়াচাড়া করছিল। তখনও গাড়ীটা এগিয়ে যাচ্ছিল···চড়াই উৎরাইএর অনেক পথ ভেঙে, অনেক শালবিথীর বনবিতানকে ছাড়িয়ে··উঁচু নীচু ভাবে গাড়ীটা চলতে চলতে দোল খাচ্ছিল।

হরিদাস, হরিদাস—তুমি এখনি গাড়ী ফেরাও—বাংলোয় ফিরে চল···নন্দিনী আর্তনাদ করে বলে উঠলো। প্রবাল হেসে উঠলো সশব্দে!—কি হোল, কি হোল নন্দিনী, ভয়, ভয় হচ্ছে তোমার বুঝি?

নন্দিনী সেইভাবে মাথা নাড়লো—না না, ভয়, ভয় কেন হবে? আমার শরীর খারাপ লাগছে—এখুনি বাংলোতে ফিরে যাব।

হরিদাস গাড়ী থামিয়েছিল। প্রবাল বললো—'গাড়ী ফেরাও হরিদাস, মায়ের শরীর খারাপ। যত তাড়াতাড়ি পার, গাড়ী বাংলোয় নিয়ে চল ।

গাড়ী ফিরে চললো···। শালবিথীর বনবিতানে মৃদু মৃদু অন্ধকার ঝরছিল! শ্রাবণের আকাশ থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছিল। কোথা থেকে যেন সৃষ্টি ছাড়া এক বাতাস উড়ে আসছিল। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় সেই সন্ধ্যের পাহাড়ী প্রদেশের, আকাশ, মাটি পাথর—সব কেমন থম থম করছিল।

গাড়ী ছুটছিলো। যেন দিকহারা হয়ে। খুব দ্রুত, ক্ষিপ্রগতিতে।···নন্দিনী জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়েছিল। খুঁজছিল সে, সেই ইউক্যালিপটাস গাছটা—তার নীচে বাংলোটা, তার ওপরে আকাশটা।

গাড়ীটা খুব তাড়াতাড়ি যেন বাংলোয় গিয়ে পৌছলো। গাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে দূরে দাঁড়ালো গিয়ে হরিদাস। নন্দিনীর হাত ধরে—প্রবালও নেমে পড়লো। তখন বেশ জোর বৃষ্টি হচ্ছিল। আকাশে গুরুগর্জন হচ্ছিল·· মেঘে মেঘে সংঘর্ষ চলছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল! সার্চ লাইটের মত আলো পড়ছিল প্রবালের মুখে। সেই আলোয়—প্রবালের মুখখানা অদ্ভুত যেন রহস্যময় হয়ে উঠলো নন্দিনীর চোখে।

বাংলোয় প্রবেশ করে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল নন্দিনী।

সেই রাত, হাঁ। সেই রাত, ঝড় জল বৃষ্টিতে উথাল পাথাল হ'য়ে উঠেছিল। আকাশ পৃথিবীতে কি যেন এক প্রলয় ঘটছিল। কি ভীষণ ভয় করছিল নন্দিনীর। দুযোগের আকাশটাকে বার বার চেয়ে দেখছিল। শেষে অন্ধকারে প্রবালের খুব কাছে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ ভোর রাত্রিতে প্রবালের ঘুম ভেঙে গেল। যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, নতুন জীবনের সেই জীবনবাদী নায়ক। অনেক···অনেক দূরে চলে যাচ্ছে···। নন্দিনীকে ফেলে রেখে কতদূরে যেন সে হারিয়ে যাচ্ছে·· অন্ধকারের, গভীরে। নন্দিনী হাত বাড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে। অথচ পারছেনা। ঠিক তখন, তখনই নন্দিনীর ঘুমটা ভেঙে গেল।

সেই দুযোগের রাত্রির ঝড় জল থেমে গেছে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে প্রবাল! শ্রাবণের অশান্ত শেষ রাত্রিটাতে, তার গাঢ় গভীর নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। এক আশ্চর্য নীরবতা চুপি চুপি ঘরে ঢুকেছে। চারিদিকটা কি ভীষণ থম থম করছিল। অন্ধকারে সব আবছা ম্রিয়মাণ! হাঁতড়ে হাঁতড়ে নন্দিনী প্রবালকে খুঁজলো। বিছানার ওদিকে ঘুমন্ত মানুষটা গড়িয়ে গেছে। এই অন্ধকারে ছুঁতে নন্দিনীর বেশ কষ্ট হচ্ছিল। সংশয়ে ভীরুতায়—সমস্ত হাত পা কাঁপছিল! নন্দিনী যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো। অস্পষ্ট ধরা গলায় প্রবালকে ডাকলো—শুনছো, শুনছো···অন্ধকারে ভীত কণ্ঠস্বর শুনে প্রবাল উঠে বসলো। সচকিত হয়ে সাড়া দিল - কি নন্দিনী, এই-এইতো আমি তোমার কাছে। বলে, প্রবাল সরে এলো নন্দিনীর খুব কাছে।

নন্দিনী ধরা গলায় বললো - 'তোমাকে খুঁজছিলাম অনেকক্ষণ, কি ভীষণ যেন ভয় করছিল। আমার ভয়

হচ্ছিল খালি, তাই তোমার কাছে সরে আসছিলাম, খুঁজছিলাম!

অন্ধকারে প্রবালের দু'বাহুর মধ্যে যেন নন্দিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো। প্রবালের সমস্ত বুকে মুখ লুকোতে লুকোতে; নন্দিনী হাঁপিয়ে উঠেতে লাগলো। বললো—'আলোটা জেলে দাও। খুব অন্ধকার, তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনা'—

প্রবাল উঠে আলো জ্বাললো। নন্দিনীর খুব কাছে এসে বসলো। ওকে আরো কাছে টেনে নিতে নিতে বললো—'কিসের ভয় নন্দিনী? এই তো আমি তোমার কত কাছে, আমাকে বুঝতে পারছো তো? অন্ধকার কোথায়? ওই দেখো জানলা দিয়ে ভোরের আলো আসছে। দুযোগ থেমে গেছে, এখন তো আর কোন ভয় নাই' বলে, প্রবাল মৃদু হাসি পুরু অধরে টেনে, বার দুই কেশে, নন্দিনীর ভয়ার্ত দু'চোখের ভেতর নিজের প্রসারিত দৃষ্টিটা মেলে দিল।

আস্তে আস্তে হাজারীবাগের বুকে সকাল নেমে এলো। চারিদিকে কোলাহল—ব্যস্ততা! ত্রস্ততা! ইউক্যালিপটাস গাছটা ভিজে শরীর নিয়ে যেন শীতে কাঁপছিল—শির্ শির করে। বাংলোটার চারপাশে বৃষ্টির জল থই-থই করছিল। কি মিষ্টি, কি সুন্দর সেই ভিজে ভিজে দিনটা ছিল। একটি দুর্যোগ রাত্রির পর, কি শান্ত সকালটা না এসেছিল!

তারই দিন দু'য়েক পর, সন্ধ্যের একটু আগে, হরিদাস মোহান্ত গাড়ী নিয়ে রেডী হোল। প্রত্যহের অভ্যাস অনুযায়ী নন্দিনী আগেই গাড়ীতে উঠে বসলো। প্রবাল একটু যেন দেরী করছিল··বৃষ্টি যদি আসে এই ভয়ে—বেরবার আগে বাংলোর সব দরজা জানলা এঁটে বন্ধ করছিল। কাজেই—ওর গাড়ীতে উঠতে একটু দেরী হচ্ছিল···

সহসা দ্রুত গাড়ী চালিয়ে দিল হরিদাস! নন্দিনী সভয়ে বলে উঠলো—'একি একি! তুমি গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছো কেন? বাবু, বাবু যে—উঠলো না—হরিদাস গাড়ী থামাও—তুমি শিগ্‌গীর!

নন্দিনীর ভীত কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করে, হাজারীবাগের সেই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় হরিদাস গাড়ী চালাতে লাগলো। নন্দিনী তখন দিশাহারা হয়ে আকুল ভাবে বলতে লাগলো—হরিদাস আমাকে একা তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? বাবু যে তোমার রক্ষে রাখবেনা, বলছি, এখনো তুমি গাড়ী থামাও—হরিদাস হরিদাস—তুমি কথা শোন—গাড়ী ফেরাও বলছি—গাড়ীর মুখ—শিগ্‌গীর ফেরাও···

নিস্তব্ধ সেই সন্ধ্যায়—শুধু একটি নারীকণ্ঠের আর্তরব বার বার ককিয়ে উঠতে লাগলো। এক সময়—নন্দিনী, ভয়ে বিবর্ণ হয়ে চুপ করে গেল। সমস্ত কণ্ঠরোধ হয়ে গেল—তার, যেন আর কিছুই তার করবার ছিলনা—দুর্ভাগ্য তাকে যে ভাবে—টেনে নিয়ে যাচ্ছে যাক··

গাড়ীর বেগ, দ্রুত থেকে দ্রুততর হোল। বনপথের উত্তাল বাতাসে গাড়ীটা যেন ভীষণ বেগে সামনের সুদূর পথ অতিক্রম করে চললো।

নন্দিনী ঘেমে উঠলো। ভয়ে একবার সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠতে চাইলো—ইচ্ছে হোল—পেছন থেকে শয়তানটার টুঁটি চেপে ধরে। কিন্তু কিছুই সে করতে পারলনা। নিশ্চল পাথর মূর্তির মতো বসে রইলো। একসময় তার চোখ দিয়ে অঝোর ভাবে জল ঝরতে লাগলো। বোধহয় সেই অসহায় অবস্থায় একা বসে কাঁদা ছাড়া কোন উপায় ছিলনা!

উঃ ভগবান! এখনো কি তাকে রক্ষা করবার কেউ নেই?—আছে, আছে। নিশ্চয়ই প্রবাল এতক্ষণে অন্য গাড়ী চেপে বেরিয়ে পড়েছে। এতক্ষণে হরিদাসের সব অভিসন্ধি সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। এতক্ষণে সে ফুল স্পীডে গাড়ী চালিয়ে দিয়েছে—আকুল হয়ে সে নন্দিনীকে খুঁজতে বেরিয়েছে। একবার ধরতে পারলে হরিদাস মোহান্তের সর্বনাশ করে দেবে। শয়তানটার গলা টিপে ধরবে। ছাড়বেনা ছাড়বেনা—কিছুতেই প্রবাল···কি সাহস লোকটার? বাড়ীর চেনা ড্রাইভার প্রায় বাড়ীর লোক—তার কিনা এই দুর্বুদ্ধি? আর মনিবের সামনে এই কাণ্ড করবার স্পর্ধা পেলো?

প্রবাল, প্রবাল···লক্ষ্মীটি··তুমি খুব তাড়াতাড়ি গাড়ী চালিয়ে এসো এখনও দেরী হয়ে যাচ্ছে···এখনো সময় আছে···তুমি বুঝতে পারছনা আমি কি ভীষণ শয়তানের হাতে পড়েছি—আর—আর একটু দেরী

হলেই···নির্ঘাৎ আমাকে মেরে ফেলবে···কি জানি, কি জানি আমায় কি করবে ··আমার ভীষণ ভয় করছে ·· আমাকে রক্ষা কর··· আমাকে বাঁচাও প্রবাল···আমাকে বাঁচাও···আমাকে বাঁচাও···আমাকে বাঁচাও···

মনের সেই আর্তবিলাপ—নন্দিনী সীটে বসে লুটোপুটি খেতে লাগলো। শুধু প্রবালের নামটা মন্ত্রের মত উচ্চারণ করতে লাগলো। ভগবানের নামও ওর মনে এলোনা। শুধু একটা নাম···প্রবাল! প্রবাল! প্রবাল!

হরিদাস মোহান্ত, গাড়ীটাকে শুধু নির্জন পথ রেখার ওপর ঘোরাতে লাগলো।··· আশ্চর্য, প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যেও—প্রবালের গাড়ী এসে পৌছল না। তবু সেই একটা নাম—সমস্ত বুকে তোলপার হ'তে লাগলো—প্রবাল! প্রবাল! প্রবাল তুমি কোথায় ·· আর দেরী কোরনা···আরো জোরে গাড়ী চালাও লক্ষ্মীটি···প্রবাল···প্রবাল···প্রবাল···

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা কেটে গেল রাত হোল···পাহাড়ী প্রদেশের নির্জন ভূমির রাত কি গভীর এবং নিস্তব্ধ! চারিদিকটা থম থম করছিল ··বনপথের সেই ধূ—ধূ—করা পথটায় একটি মানুষেরও মুখ দেখা যাচ্ছিল না···। অন্ধকারে সব যেন···আবছা হয়ে গিয়েছিল···মেঘ করেছিল—হয়তো আবার দুর্যোগের আকাশ ঝড় জলে গুমরে উঠবে···তখন? তখন?···

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর, হরিদাস মোহান্ত গাড়ীর মুখ ফেরালো। একবার তীর্যক্ চোখে চেয়ে দেখলো মনিবানীর দিকে। তারপর ধূর্ত হাসি হেসে যেন গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে চললো।···

তাহলে? তাহলে কি শয়তানটা ভয় পেয়েছে? না, সেই দুষ্টু—ভগবানেরই কারসাজি! আশ্চর্য, ভগবান তোমার এই বুড়ো বয়সেও—ছেলেবুদ্ধি গেল না? খালি দুষ্টুমি, খালি দুষ্টুমি!

সেই ভীত হরিণীর কালোদীঘির চোখে—আশার আলো ঝলকে উঠলো। নীলবর্ণ ঠোঁট দুটি—মৃদু আনন্দ হাসিতে কেঁপে উঠলো···বুকের সেই পাথরটা নেমে গেল যেন ধীরে ধীরে···

যাক লোকটার তাহলে শুভবুদ্ধি হয়েছে। প্রবাল হয়তো খুঁজতে বেরিয়েও বিফল হয়ে বাংলোয় ফিরে গেছে···হয়তো অস্বস্তিতে, উৎকণ্ঠায়—সমস্ত ঘরে বাইরে পায়চারী করছে···হয়তো রুদ্ধ আক্রোশে শয়তানকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাবার দুঃসহ প্রতীক্ষা করছে।

বাংলোর কিছু দূরে, হরিদাস গাড়ী থামিয়ে—নন্দিনীকে নামবার নির্দেশ দিল এবং জানালো সে বাংলোর সামনে গাড়ী নিয়ে যাবেনা—এইটুকু পথ যেন নন্দিনী হেঁটে চলে যায়। নন্দিনী চেয়ে দেখলো দূরে বাংলোটা দেখা যাচ্ছে · গাড়ী থেকে নেবেই—ও' স্বস্তি পেলো। হেঁটেও সে যাবে—তবু, গাড়ীতে বসে থাকা এখনও বিপদজনক।··· লোকটা খুব ভয় পেয়েছে এবার—এখান থেকেই শয়তানটা পালাবে বলে—নন্দিনীকে নাবিয়ে দিল—নন্দিনীর ইচ্ছে হোল—এখুনি লোক ডেকে ওকে ধরে ফেলে···কিন্তু গাড়ীতে তখন হরিদাস স্টার্ট দিয়েছে—যন্ত্রদানবের গর্জন শোনা গেল। নন্দিনী সামনের দিকে এগোতে লাগলো দ্রুত···

আকাশে সন্ধ্যে থেকেই যে থরো থরো মেঘ জমেছিল - ভেতরে ভেতরে তার একটা বিরাট আয়োজন চলছিল! প্রবল বর্ষণের জন্য—মেঘ ডাকছিল হয়তো পৃথিবীটাকে—হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিল। সেই আসন্ন দুর্যোগের আকাশটার দিকে চেয়ে—নন্দিনী ভয়ে ভয়ে পথ হাঁটছিল···বাংলোটাকে দেখা যাচ্ছিল সেই ইউক্যালিপটাস গাছের মাথাটা—সেই বনরাজির সুউচ্চ স্তম্ভটা!

হয়তো এতক্ষণ প্রবাল, গভীর আশঙ্কায়, হয়তো প্রেয়সীর ফেরার অপেক্ষায় ইউক্যালিপটাস গাছের নীচে অন্ধকারে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। উদ্বেগাকুল—চোখ দুটি···দূর অন্ধকার পথে হারিয়ে গেছে সমস্ত হৃদপিণ্ড ওর কেঁপে কেঁপে উঠছে—একটা মুমূর্ষু প্রতীক্ষা নিয়ে, প্রবাল যেন নিজেকে স্থির রাখতে পারছেনা···হয়তো নন্দিনীকে এখুনি কাছে পেলে—বুকে চেপে আর্তনাদ করে উঠবে···উঃ নন্দিনী তুমি ফিরে এসেছো···তুমি সত্যিই ফিরে এলে?

টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল···মেঘের গম্ভীর কণ্ঠ থেকে থেকে হুঙ্কার দিতে লাগলো। সভয়ে নন্দিনী—পা ফেলে ফেলে—দ্রুত এসে হাজির হোল বাংলোর সামনে। সেই ইউক্যালিপটাস গাছের নীচে—দুটি

অনুসন্ধিৎসু চোখের দৃষ্টি মেলে দিল। অন্ধকারে কাকে যেন আকুল হয়ে খুঁজে বেড়ালো চোখ দু'টো। একটি ভুল বুঝি নিষ্ঠুর ভাবে ভেঙে গেল···কিন্তু বৃষ্টিতে কি প্রবাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? হয়তো ছিল খানিকটা আগেও। এখন সে দ্বার বন্ধ ঘরে নিশ্চয়—অস্থির পায়চারী করছে···ওই তো আলো জ্বলছে ঘরে। চারপাশে কেমন নিথর নিঃশব্দ হয়ে আছে। মনে হচ্ছিল—হাজারীবাগের সেই নিঝুম রাত্রিটা—চুপিসারে গা ঢাকা দিয়ে বসেছিল, রাত তখন ক'টা? হয়তো আটটা হবে। তবু, রাশি রাশি অন্ধকার...থম থম করছে যেন সেই নির্জন রাত্রিটা।

খট্ খট্ খট্...নন্দিনী কড়া নেড়ে উঠলো।...

কে—কে—কে? প্রবালের ভারী কণ্ঠস্বর রুদ্ধদ্বারের ওপার থেকে ভেসে এলো।

এ'পারে ব্যাকুল কণ্ঠ আছড়ে পড়লো যেন অন্ধকারে—'আমি, আমি, আমি নন্দিনী, শিগ্গীর দরজা খোল আমি এসেছি...আমি এসেছি গো...আমি নন্দিনী!... খট্ খট্ খট্...

রুদ্ধ দ্বার খুলে গেল। সহসা কোথা থেকে একটা দমকা বাতাস উড়ে এলো···ইউক্যালিপটাস গাছের—সব পাতা নড়ে উঠলো। রাতপাখীর ডানা ঝাপ্টানোর শব্দটা ভীষণভাবে যেন ককিয়ে উঠলো অন্ধকারে।

দরজা আগলে যে দাড়ালো—তার অগ্নিদৃষ্টি! ক্রুদ্ধ কঠিন মুখ! কঠোর কণ্ঠস্বর গম্ভীরতায় ভেঙে পড়লো—'ফিরে এলে যে তুমি?'

হতভম্ব, নন্দিনী, 'তার মানে? অবাক কণ্ঠ আর্তনাদের মত—ককিয়ে উঠলো—কি বলছো তুমি! আমি ফিরে আসবোনা মানে? মানে?

মানে? তার মানে? প্রবালের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর হুঙ্কার দিল—'চুপ! চুপ করে থাকো। ন্যাকা সেজে যাচ্ছো তুমি? কোথায় পালিয়ে ছিলে এতক্ষণ আমি জানিনা? যদি আগে জানতাম, একটা লোফার ড্রাইভারের সংগে তোমার ঘনিষ্ট প্রেম চলছে—হয়তো আগেই দূর করে দিতাম দুজনকে...কিন্তু—আর নয়... যেমন গিয়েছিলে চলে আমাকে ফেলে তেমনি সেই ভাবে চলে যাও—যেখানে খুসী—তোমার মত অসতীকে আর প্রবাল দত্ত বাড়ীতে স্থান দিয়ে—আর নিজের সর্বনাশ করবেনা...।

পায়ের তলার মাটি কি কাঁপছিল? ভেঙে চৌচির হচ্ছিল—বসুধার হৃদয়খানি! কেন, কেন অমন শরীরটা টলে টলে পড়ছিল—চোখের সামনে সমস্ত দৃশ্যটা ধূসর হয়ে যাচ্ছিল, কেন নন্দিনী সর্বশক্তি দিয়ে প্রবালের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল—আমাকে তুমি খুন···কর, আমাকে মেরে ফেলো তুমি... আমাকে শেষ করে দাও...

অন্ধকারের বুক চিরে একটা বিকট হাসি উথলে উঠলো। যেন বোবা রাত্রির বুকে—কোন একটা অদৃশ্য প্রেতাত্মার হাসি—নির্জনতাকে চম্‌কে দিল, কি ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য! অন্ধকারে প্রবাল দত্তকে, চেনা যাচ্ছিলনা।...তবে, তবে প্রবাল কি সেই আগের মত সুরা পান করেছে? না, হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে? ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা নাড়িয়ে আবার একটা দমকা বাতাস এলো।

প্রেতাত্মার হাসি থেমে গেল। তার শক্ত ঘোড়ার খুরের মত পা দুটো দিয়ে—পায়ের নীচে পড়ে থাকা মানুষটাকে ঠেলে দিল। আরো একবার গর্জন শোনা গেল—চলে যাও—চলে যাও—চলে যাও বলছি···

বলতে বলতে সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। যেন সমস্ত আকাশ চিরে একটা প্রচণ্ড বাজ পড়লো। ইউক্যালিপটাস গাছটাও বুঝি চমকে উঠলো। কোথা থেকে আবার সেই দম্‌কা বাতাস এলো—হু—হু শব্দে··

শুধু, ক্ষণকালের জন্য—সেই রুদ্ধদ্বারে মাথা রাখলো নন্দিনী। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো···দুচোখের অবারিত জলের ধারা নামলো! আকাশেও বর্ষণ সুরু হোল।

আর একমুহূর্ত দাঁড়াতে পারল না নন্দিনী। অসতীর অপবাদে—বড় অভিমানীর মত সেই দুর্যোগের রাত্রে—বিদেশের একটি নির্জন পথে—এক অসহায় সতী হেঁটে চললো···নিঃশব্দে!

পথের সমস্ত বিপদকে আলিঙ্গন করে—নন্দিনী একলা একলা পথ হাঁটছিল সেই ষ্টেশনের দিকে।

কিছুদূর হাঁটতেই—পেছন থেকে কার যেন পায়ের শব্দ ভেসে এলো। নন্দিনী মুখ ফেরালো না। সামনে তার

প্রসারিত দৃষ্টি! তবু, মনে হোল একবার প্রবাল বোধ হয় আসছে···তাকে ফিরিয়ে নিতে···

কে—কে—কে তুমি? নন্দিনী আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো। অন্ধকারের সেই অনুসরণকারী লোকটা—মুখের সামনে এসে হাজির হয়েছে আশ্চর্য! হরিদাস মোহান্ত! সেই শয়তানটা? যার জন্যে এত কাণ্ড—সেই আবার সুযোগ বুঝে এগিয়ে আসছে?

দু'হাত জোর করে হরিদাস মোহান্ত বলে উঠলো—মা, একটু দাঁড়ান অধমের শেষ কথাটা শুনে যান। সব আমি শুনেছি—বাগানের অন্ধকারে লুকিয়ে··এবং সবই আমি জানি, আর সবই জানাব বলে—এতদূর এগিয়ে এসেছি··· আপনার এই বিপদ দেখে—আমি আর থাকতে পারলাম না। বড় অনুতপ্ত মা! আগে আমাকে ক্ষমা করুন, তারপর সব বলছি আপনাকে ··বলে, হরিদাস জামার তলা দিয়ে নিজের চোখ দু'টো মুছলো!

অন্ধকারে বোবার মত থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নন্দিনী। অন্ধকারে সব কেমন আবছা অস্পষ্ট, অদৃশ্য মনে হচ্ছিল···

সমস্ত অন্ধকারকে কাঁপিয়ে হরিদাস মোহান্ত অনুতপ্ত গলায় বলে চললো—'যদিও আমি সমস্ত ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে-ছিলাম—কিন্তু কার জন্যে? কে আমায় টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে এমন করেছিল? সেই প্রবাল দত্তকে আপনি চিনে রাখুন শুধু, তারও আগে শুনে রাখুন আপনার সেই কাকীমাও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আপনাকে এই ভাবে ষড়যন্ত্র করে—ত্যাগ করা এবং এই হাজারীবাগে এসে—আপনার সংগে অভিনয় করাটা প্রবাল দত্ত—ও আপনার কাকীমার সমস্ত সুপরিকল্পিত ব্যাপার! লালসালুব্ধ সেই পুরুষ—এবং একটি ভয়ঙ্কর নারীর ষড়যন্ত্র—উর্মিলাকেও বাধ্য করেছে— প্রবাল দত্তকে স্বামী রূপে বরণ করবার।

হাজারীবাগে এসে এই অভিনয় করাটাও—পরিকল্পিত। দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রীর সংগে ভালবাসার অভিনয় করে—সমস্ত সন্দেহ মুক্ত হয়ে—প্রবাল দত্ত নিজেকে নিরপরাধ সাজাতে চাইছে। কিন্তু মা, ভগবান জানেন। কখনো আপনার দিকে মুখ তুলে তাকাইনি। গরীব মানুষ হয়ে—বড় টাকার লোভ করেছিলাম—প্রবাল দত্তের নির্দেশে আপনাকে গাড়ীতে তুলে—নির্দিষ্ট সময় ধরে বনপথ ঘুরে—বাংলোয় পৌছে দিয়েছিলাম···তারপর যা হয়েছে আপনিই জানেন। তবু, সব জেনেও—আজ যে বিপদে আপনাকে পড়তে দেখলাম—তাই থাকতে না পেরে ছুটে এলাম। আমি আর প্রবাল দত্তের চাকরী করবনা ঠিক।—কিন্তু মা, এই জল ঝড়ে একলা কোথায় যাবেন-- তবু তাঁর হাতে পায়ে ধরে—ঘরে ফিরে চলুন···একলা যাবেন না—

অন্ধকারের সেই বোবা, হতচেতন মূর্তিটা—মুহূর্ত-মধ্যে সচল হয়ে উঠলো। রুদ্ধ গলায় নন্দিনী বললো—'হরিদাস, তোমরা সবাই মিলে তাই যদি করে থাকো—তাহলে তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হোক। আমাকে আর ফেরাবার চেষ্টা কোরনা···

বলে, ঝড়ের বেগে পথ হাঁটতে লাগলো। মনে হোল পেছনে ফেলে আসা সেই অন্ধকার থেকে কে যেন বার বার অস্ফুট গলায় ডেকে উঠছিল মা—মা—আমি বলছি··· আপনি ফিরে আসুন···এখনও ফিরে আসুন মা · মা···মা···।

সামনে এগিয়ে চলেছে নন্দিনী। পেছনের ডাক একসময় স্তব্ধ হয়ে যায়। টিপ্ টিপ করে তেমনি বৃষ্টি পড়ছিল—মাঝে মাঝে সেই দমকা বাতাস।···ষ্টেশনের পথটা—প্রায় নির্জনই ছিল। দূরে—ডিস্ট্যাণ্ট্ সিগন্যালের আলো দেখা যাচ্ছিল। দু' একটা ট্রেন যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলো। কোথায় যেন সুরারসিকের—মর্মভেদী হাস্যালাপ শোনা গেল। নির্জন রাত্রির পথে কুকুরগুলো ডেকে উঠতেই—চমকে উঠলো নন্দিনী। তবু, সব ভয়কে আলিঙ্গন করে যে পথকে আপন করে নিয়েছে—তাকেই বন্ধু ভেবে সে এগোতে লাগলো। রাত পাখীর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজটা যেন—অশরীরী প্রেতাত্মার হাসির মত মনে হোল। কোন বনের ঝোপ ঝাড়ে বাতাস বইছিল জোরে। পাতা ঝরার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। হাজারীবাগের সেই—রাত্রি কোন একটা এ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর সবচেয়ে ইনটারেষ্টিং পরিচ্ছেদ হয়েছিল। নন্দিনী কবে যেন—একটা রহস্যগল্পের এমনি একটা রাত্রির বর্ণনা পড়েছিল-—ভয়ে ও' দিশাহারা হয়ে পড়েছিল।···

কিন্তু সেই রাত্রে?

নির্ভয়ে, নিঃসংশয়ে—পথ হাঁটছিল—যেন সেই রাতের নিঃসঙ্গ পথচারিণী। মনের সেই দৃঢ় ইচ্ছায় সাধ হচ্ছিল—

সমস্ত জগৎটাকে যেন পায়ের নীচে পিষে ফেলে। কি গর্বিত প্রতিহিংসার জ্বালা!

বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল সর্বাংগ। মাঝে মাঝে ঝড়ের সঙ্কেতস্বর শোনা যাচ্ছিল। গাছে গাছে পাতা ঝাঁকানোর সেই বিচিত্র শব্দ! বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল···সমস্ত বনপথটা চমকে উঠছিল যেন—সেই আলোতে।···

দূরের ষ্টেশনের আলোটা যেন কাছে এগিয়ে আসছিল। নন্দিনী পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল। সে চেয়েছিল—সেই আলোর বিন্দুটার দিকে বিশাল অন্ধকারের মধ্যে ওটা যেন আগুনের মত জ্বলছিল! যেন নন্দিনীকে ছুঁতে আসছিল তেড়ে। তার ক্ষুব্ধ আক্রোশ মূর্তিটা, বুঝি ছায়ার মত অন্ধকারে এসে দাঁড়ালো। ষ্টেশনে বাঁশী বেজে উঠলো। হুইশিলের শব্দটা খুব জোরে বাজলো।···

কে—কে—কে তুমি? নন্দিনী সবেগে ঘুরে দাঁড়ালো পেছন দিকে। দেখলো, পা টিপে টিপে একটা ছায়া মূর্তি—অন্ধকারে তাকে অনুসরণ করছে।

নন্দিনী আবার বললো—কে—কে তুমি? হরিদাস, হরিদাস তুমি।

সহসা উদ্দেল হাসিতে ফেটে পড়লো ছায়ামূর্তিটা। টলতে টলতে যেন কাছে এগিয়ে এলো। তার মুখটা প্রায়—নন্দিনীর মুখের সামনে এনে ভারি গলায়—বলে উঠলো—হারিদাস। হারিদাস? কৌন্ আদমী—হামারা নেই মালুম হোতা! লেকিন—তুম্ হামরা পছনতা হ্যায়? মেরা নাম—'বলে, একটু থেমে, আচ্ছা ছোড়্ দেঁও! লেকিন্ এ্যাইসা আঁন্ধারমে, একঠো জেনেনা কাঁহা চলতি হ্যায়?

সেই নিঃসংশয় পথচারিণী নিশ্চুপ হয়ে চেয়ে রইলো—ছায়ামূর্তিটার দিকে। বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। সেই আলোয় যেন ঝলকে উঠলো—ছায়ামূর্তিটা। খুব লম্বা চওড়া একজন লোক—কাঁধ অবধি বাবরি চুল বড় বড় দাড়ি। পরনে পাজামা পাঞ্জাবী। চোখ দুটো যেন হিংস্র শ্বাপদের মত।

নন্দিনী কাতর গলায় বলে উঠলো—'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। তুমি কে, তাও চিনতে পারছি না।···

এ' কথা শুনে, লোকটা হো—হো করে হেসে উঠলো। ভারি নীচুগলায়—বললো—'ওহোঃ, আচ্ছা ঠিক হ্যায়! ম্যয় বাঙলা ভি জানতি হ্যায়। হামরা এই দেশ ভি জনম, বাঙালা মুলুক মে—। লেকিন্ তুমি আখুন এত্তা রাতে—কুথায় চলেছো? তোমারা সাথ্ মে একঠো ভি আদমী নেই?

নন্দিনী তখন আকুল হয়ে বললো—'আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি—আমার জায়গা আমি চিনে যেতে চাইছি···।

ওহো! আচ্ছা ঠিক আছে।' বলে, লোকটা সামনের পথে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললো—উই রাস্তামে যাবে তুমি?

নন্দিনী বললো—আমি ষ্টেশনে গিয়ে কোলকাতায় যাব।

—আচ্ছা হামারা সাথমে চলো—কলকাত্তা মে লিয়ে যাব। হামিও—উথানে যাচ্ছি···। বলে, লোকটা সামনে পা বাড়ালো।

নির্ভয়ে নন্দিনীও এগোতে লাগলো—সেই রাতের অচেনা মানুষটার সংগে। যার পরিচয় সে কলতাতায় গিয়ে পেয়েছিল—কুখ্যাত—আমীর খাঁ—দলের সবাই যাকে ডাকতো বাদশাজী বলে। বাদশা তাকে কলকাতায় এনে তার দরবারে—বন্দী করে রাখলো নন্দিনীকে! তবু, প্রতিবাদহীন আত্মসমর্পণে—নন্দিনী তার সর্বসত্ব বড় নিরুপায় হয়ে তুলে দিয়েছিল—খুনে বাদশার হাতে।

সেই দরবার থেকে বাদশা তাকে প্রিন্সেপ ঘাটে—গিয়ে জাহাজে তুলেছিল উত্তরপ্রদেশে চালান দেবে বলে···

সেটা ব্যর্থ হয়ে গেল।—কাজেই সে বাদশার দরবারে ফিরে এসেছিল—বিবি'র সম্মান নিয়ে। তারপর জীবনের এই নিষ্ঠুর প্রহসন এমনি করে সুরু হয়েছিল···

তারই শেষ দৃশ্য—আদালত।

* * *

'শেষ দৃশ্যের পর প্রেক্ষাগৃহের ফ্লাশলাইট জ্বলছিল তেমনি। সমস্ত অডিটোরিয়াম যেন বোবা—হতচেতন। থম থম করছিল।

বিচার গৃহে—দর্শকের শেষ নেই। সমস্ত জবানী শেষে কাঠগড়ায় বন্দিনীর চোখে অঝোর জলের ধারা। ধুলিধূসর মলিন বেশ, বিবর্ণ মুখের ছায়া।

সরকার পক্ষের আইনজীবীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর থেমে গেছে। যেন কারো মুখে কথা নেই। কোথাও সাড়া

শব্দ নেই—আওয়ার ট্রায়াল আসামীর দীর্ঘ জবানী শেষে—একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেবে এসেছে—সারা বিচার-গৃহে। যেন ক্লোরফরম্ করে—ক'য়েক মুহূর্তের জন্য অচেতন করে রাখা হয়েছিল জন পূর্ণ সেই সুবৃহৎ কক্ষটাকে।

সহসা···

সহসা সমস্ত নীরবতার বুক ভেঙে—বিচারকের উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর—মানবতার আকুলতায় ভেঙে পড়লো—

'দীর্ঘ বিচারের দিন আজ সমাপ্ত। বিচারপর্বে, অপরাধিনীর সমস্ত অকপট স্বীকারোক্তি এবং তার জবানীর যবনিকার অন্তরাল থেকে—যে নাটকীয় রহস্য উদ্ঘাটিত হোল, এবং অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধানও আমরা পেয়েছি—আশা করি সকলেই সে বিষয়ে অবগত।

আমি মনে করি, চরম দণ্ড দিয়ে—সমাজের সমস্ত পাপ বিদূরিত করা যায় না। নির্ভুল বিচার তাই অপেক্ষা করে—ঘটনার শেষ অধ্যায়ের জন্যে। একটা অপরাধের নেপথ্যে, আরো কত অপরাধ অনুষ্ঠান জড়িয়ে থাকে অপরাধিনীর জবানীই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

আমি আশা করি, সমাজ যেন—নেপথ্যের আত্মগোপন-কারী অপরাধীদের সন্ধান করে—তাদেরও কাঠগড়ায় তোলে এবং তাদেরও বিচার হোক,—তারও অন্তরালের পর্দা সরে যাক। অন্ধকারে মুখ ঢাকা শয়তানরা এইভাবে বেরিয়ে আসতে থাকুক। এই ভাবে বিচারের পর বিচার চলুক···

তাই বলছিলাম, এই মানবতার বিচারশালায়—এই বিচিত্র মামলার শেষ অঙ্কে আমি যে নৃশংস ছবি প্রত্যক্ষ করছি—ঘটনার সেই অন্তঃপুরে তাতে এই অপরাধিনীর অপরাধ, শুধু মাত্র একটি ঘৃণ্য প্রবৃত্তি বা স্বার্থ দ্বারা তা চরিতার্থ হয়নি। ভদ্র গৃহস্থ ঘরের—স্নেহমমতা জড়ানো একদা বিতাড়িত সেই কুলবধূ। অতীতের সেই নারী, শুধু মাত্র ভাগ্য বিড়ম্বনায়—প্রিয়জনের অত্যাচারে, সংসার, গৃহ, সমাজচ্যুত হ'য়ে সমস্ত স্নেহ মমতা শূন্য হয়ে, যে ভয়ঙ্কর পাপে সে লিপ্ত হয়েছিল তা কেবলমাত্র বিকৃত মনবিকলনের নির্মম অন্তরায় বলে মনে করি।

আমি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, সন্তান সম অসহায়—সেই নিহত বালকটির জন্যে—অপরাধিনীর নিভৃত মাতৃ-হৃদয়—প্রবল অনুশোচনায় সিক্ত হোক। তিলে তিলে দগ্ধ হোক।···তার প্রতিটি অনুতপ্ত অশ্রুজল, যেন তার সমস্ত অপরাধের—সবচেয়ে বড় দণ্ড হোক। এবং দশবছর কারারুদ্ধ হ'বার আদেশ দিয়ে—শুধু তাকে সেই একান্তে, নীরবে—অনুতপ্ত হ'বারই সুযোগ দিলাম···

* * *

অতন্দ্র নিঃশ্বাসে—নিঃশ্বাসে রুদ্ধ যামিনীর শেষ প্রহরও কেটে গেল···। রাতের শরীরে জড়ানো সব অন্ধকার খসে খসে পড়লো, শেষে অপলক চোখের—শেষ বেদনাটুকু কে যেন কেড়ে নিয়ে গেল চুপি চুপি···

রাতের স্মৃতি ফুলগুলো ঝরে ঝরে পড়লো। ভোরের পাখীরা ডেকে উঠলো।

নন্দিনী চেয়ে দেখলো—নতুন ভোরের—আকাশে সূর্য উঠেছে···আলো ছড়িয়ে পড়েছে যেন দিকে দিকে। শুধু আলো! আলো! আলো!

জেলখানার মাঠ পেরিয়ে সেই আলো আসছে··· করবী গাছের পাশ দিয়ে···

ধীরে—ধীরে আসছে লৌহকপাটের সামনে।

জেম—সেই সূর্যের আলোর দিকে চেয়ে বলে উঠলো—

লেট্ আস্ ড্রাইভ্ ফ্রম ডার্কনেস্
ট্ওয়ার্ডস্ দি লাইট!

পূজারী

ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

বন-ফুল আর চন্দনে তুমি
পূজিলে যে দেবতায়
মোর লাগি' শুধু একটি কুসুম
দিও তাঁর দু'টি পায়।
ক্লান্ত জীবন স্মৃতির বেদনা ল'য়ে
অঞ্জলি হয় আজো তব দেবালয়ে
আমার এ বীণা সেই সুরে সুরে
তোমারেই খুঁজে পায়।

মোর মৌনী সরসী নীরে
পড়িয়া তোমার ছায়াটুকু আজো
মিলিয়া যায় যে ধীরে।
মিলনে যে তুমি হারা-মরু নদী
বিরহে তোমারে পাই নিরবধি
অন্তরে মোর সেই বাঁশরীর
ক্রন্দন মূরছায়।

শারীরিক ব্যায়াম চর্চা

বিশ্বনাথ দত্ত (ভারতশ্রী)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—Strength is life, weakness is death. First of all is our physical weakness. That physical weakness is the cause of at least one third of our

miseries. তিনি আরও বলেছেন—আমি চাই এমন লোক যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতের নির্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত।

স্বাস্থ্যই যে প্রকৃত সম্পদ, এ কথা বলা বাহুল্য। শৈশবকাল থেকেই যাতে আমরা সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে ক্রমশঃ জীবনকে উন্নততর করতে পারি সে জন্যে একান্ত চেষ্টা আবশ্যক।

কিন্তু আমাদের এই স্বাধীনদেশে সামগ্রিকভাবে শরীরচর্চা হচ্ছে কি? আজকাল শহরে ও পল্লীতে কিছু সংখ্যক ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বহু যুবক নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছেন বটে, কিন্তু দেশের অগণিত জনসংখ্যার তুলনায় তা নিতান্ত নগণ্য।

'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'—এই ঋষিবাক্য ভুলে গিয়ে দেশ আজ জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশের সম্পদ যুবসম্প্রদায় যদি স্বাস্থ্যবান না হয়, হীন ও রুগ্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে যুবাবয়সেই যদি তারা ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে নিরাশ হয়, ভগ্নোদ্যম-হৃদয়ে যদি কোনক্রমে তারা দিন গুজরাণ করে, তবে সে দেশের মঙ্গল কোথায়?

স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে শিক্ষাও থেকে যায় অসম্পূর্ণ। দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশের নামই হল শিক্ষা। শুধু মনের উন্নতিতেই শিক্ষা হয় না সম্পূর্ণ। দৈহিক দৌর্বল্য নষ্ট করে দেয় মানসিক শক্তি ও শান্তি। সুতরাং বিদ্যা শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গেই শরীরগঠনের শিক্ষাও একান্ত অপরিহার্য।

অনেকে বলেন, নিয়মিত ব্যায়াম করলে বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হয়। তা না হলে ব্যায়ামের কুফলই দেখা দেয়। আমি তাঁদের যুক্তি মোটেই মানতে রাজী নই। আমরা নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করে ডাল-ভাতও যদি খাই এবং সংযমী হতে পারি দেহে ও মনে, তবে তাতেই আমাদের শরীরিক উন্নতি হবে। পালোয়ানের মত পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহ যাদের কাম্য, তাঁদের এক বেলা যৌগিক ব্যায়াম ও অন্য বেলা ডন-বৈঠক-কুস্তি-বারবেল প্রভৃতি ব্যায়াম করা উচিত।

যৌগিক ব্যায়ামের লক্ষ্য নীরোগ দীর্ঘজীবন এবং মানসিক উন্নতি। পেশীবহুল ব্যায়ামের লক্ষ্য প্রধানতঃ দেহকে সুপুষ্ট ও সবল করা। সুতরাং নীরোগ দীর্ঘায়ু এবং পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহ এই উভয়ই যাঁদের কাম্য, তারা উভয়প্রকার ব্যায়ামই করতে পারেন। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, যৌগিক ব্যায়ামের অব্যবহিত পরেই যেন পেশীবহুল ব্যায়াম না করা হয়।

ভারতীয় যোগবিদ্যার অলৌকিক শক্তির কথ অনেকেই জানেন। যোগের সর্বনিম্নধাপ আসন-মুদ্রাগুলির যথোচিত অনুষ্ঠান করলে শরীর সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু হয়। অতি প্রাচীনকালে গুরুগৃহবাসী শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীদের এসব প্রাথমিক যোগ ও আসনগুলি আয়ত্ত করতে হত। যোগবিদ্যা শরীর বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম যৌবন হতে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা আমাদের পরামর্শানুযায়ী যৌগিক ব্যায়াম ও পেশীবহুল ব্যায়াম অনুষ্ঠান করবে, অচিরেই তাদের দেহ হয়ে উঠবে দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। রোগাক্রান্ত হয়ে কখনও ঘটবে না তাদের অকালমৃত্যু।

বর্তমানে নিয়মিত ব্যায়ামঅভ্যাস খুব অল্পসংখ্যক ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায় আমাদের দেশে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে শরীরচর্চার প্রচলন দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের যুবসম্প্রদায় এদিকে দেন না বিশেষ গুরুত্ব। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শরীরচর্চার বহুল প্রচলন একান্ত আবশ্যক।

অনেক নূতন ব্যায়ামশিক্ষার্থীকে দেখেছি সামান্য কিছুদিন মাত্র ব্যায়াম করে তারপর ছেড়ে দেন। এটা কিন্তু শরীরের পক্ষে খুবই খারাপ। রোমনগরী যেমন একদিনেই নির্মিত হয় নাই তেমনি একমাস বা দু'মাস ব্যায়াম করলেই সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় না। স্বাস্থ্য এবং বিদ্যাশিক্ষা দুইই সাধনার বস্তু। বিশেষ করে বুলডগের মত ধৈর্যসহকারে আকড়ে থাকতে হবে শরীরচর্চার অভ্যাসকে। কঠোর সাধনা ভিন্ন কেউ কখনও পারে না সিদ্ধিলাভ করতে।

আমাদের দেশের তরুণ ও যুবসম্প্রদায়ের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ তাঁরা আত্মনিয়োগ করুন শরীরচর্চায়—নির্মল চরিত্র গঠনে—সংযম পালনে। তবেই তাঁদের জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর ও সুখময়।

মাটির মা নয়, মাটি মা'র পূজা

শ্রীনবগোপাল সিংহ

(১)

যুগ বদলেছে, এ যুগে বাতিল
প্রাচীন যুগের পুরাণ পুঁথি
প্রগতির যুগে অচল হয়েচে
গতানুগতিক স্তব ও স্তুতি।
এ যুগ যে বিজ্ঞান-ভিত্তিক,
মনেতে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক
কোথা কৈলাস, কোথা শিব, উমা
কার পূজা তরে এ প্রস্তুতি ?

(২)

অন্নপূর্ণা পূজা করি মোরা
পূজা করিনা তো অন্ন-খেতে !
মাটি যদি রহে রিক্ত-শস্য
কি হবে মূর্ত্তি পূজায় মেতে ?
গৃহ যদি থাকে শস্য-শূন্যা
কার নাম তবে অন্নপূর্ণা ?
কি হবে মায়েরে সমারোহে পূজি
সন্তান যদি না পায় খেতে ?

(৩)

মূর্ত্তিটি শুধু রেখেছি আমরা
গ্রহণ করিনি আদর্শটা
দশ-করে মার দশ-প্রহরণ
জানিনে কি তার সার্থকতা ?
মা'র দশভুজ কিসের প্রতীক ?
কি শেখায় গণপতি কার্ত্তিক ?
বাণী ও লক্ষ্মী, কিসের সাক্ষী
আমরা ভুলেছি সে সব কথা।

(৪)

অন্ন যে হলো প্রাণের ভিত্তি,
শ্রম-ভিত্তিক অন্ন-কণা।
মৃত্তিকা নয়, এ যে মাতৃকা
আবাদ করলে ফলায় সোনা।
শ্রমজল শুধু চাই অবিরাম
ঈতি-ভীতি সনে নিতি সংগ্রাম,
আঁখিবারি নয়, শ্রমবারিতেই
নব যুগে নব পূজার্চ্চনা।

(৫)

ধর্ম্মতত্ত্বে বিশ্বাসী মোরা
আসল তথ্য দেখিনা খুঁজে
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মায়ের
অম্বুজ ঢালি পদাম্বুজে।
বিদেশ হইতে আনিয়া শস্য
অর্ঘ্য সাজাই চর্ব্ব-চোষ্য
ভাণ্ডারে যদি অন্ন না থাকে
কি হবে অন্নপূর্ণা পূজে ?

(৬)

শ্রমজীবী আর কৃষিজীবী হ'য়ে
সমাজ জীবনে বাঁচাতে হবে,
যেথায় নিত্য হাহাকার, সেথা
কি হবে ক্ষণিক মহোৎসবে ?
আশ্বিনে আজ এসো ভাইবোন
কর জননীর পূজা আয়োজন
মাটির মা নয়, মাটি মা'র পূজা
যুগ-উপযোগী স্তুতি ও স্তবে।

তুগলকাবাদের ধ্বংস-স্তূপ দর্শনে

শ্রীচিন্ময়কুমার রায়

(১)

মরু প্রান্তরে তুগলকাবাদ
স্থাপিত হইল যবে
বিজয়ী বীরের বিজয় নিনাদ
সেদিন শুনিল সবে
সুপ্ত প্রকৃতি হল জাগরিত
শুনি জনকলরব
আকাশে বাতাসে হইল ধ্বনিত
বিজয়ের উৎসব।

(২)

নব নগরীর কক্ষে কক্ষে
জাগিল নবীন আশা
শত রমণীর বক্ষে বক্ষে
নব প্রেম ভালবাসা।
কর্ম্মমুখর হল রাজপথ
পরিজন সমাগম
বিজয়ী বীরের পূরে মনোরথ
জাগে নব উদ্যম।

(৩)

সেদিন নিভৃতে কুঞ্জকাননে
চাঁদিনী আকাশ তলে
আঁকি দিয়া চুমা প্রিয়ার আননে
পরাইয়া মালা গলে
বীর সম্রাট কহিল যে কথা
প্রেয়সীর কানে কানে
মানুষ আজিও পায় সে বারতা
অনাদি কালের গানে!

(৪)

আনত নয়নে মৃদু মৃদু হেসে
প্রিয়কে আঁচরে ঢাকি
হেলাইয়া পড়ি প্রেমের আবেশে
বাহু' পরে বাহু রাখি
কহিল প্রেয়সী, সুখেতে মগন
হে মোর তরুণ প্রিয়
আজিকার এই মোদের মিলন
অমর করিয়া দিও।

(৫)

তোমার বিজয়ে মোর গৌরব
রহে যেন চিরদিন
তোমার প্রেমের বিপুল বিভব
মোর মাঝে হোক লীন
তোমার মাঝারে নিজেকে হেরিব
এই মোর অভিলাষ
আমার মাঝারে তোমাকে পূজিব
মিটিবে মনের আশ।

(৬)

যেদিন আমরা রহিব না আর
মর জগতের মাঝে
আজিকার এই প্রেমসম্ভার
লাগিবে কি কারও কাজে?
মোদের ঘিরিয়া কেহ কি রচিবে
প্রেমগাথা অভিনব
অনাগত কাল কভু কি স্মরিবে
বিজয় কাহিনী তব?

(৭)

সম্রাট কহে প্রেয়সীকে তার
অনেক আদরে চুমি
মানব হৃদয় কহে অনিবার
যে কথা কহিলে তুমি
মানুষ গড়েছে যুগ যুগ ধরে
সৌধ লক্ষ শত
নিজেকে অমর করিবার তরে
প্রয়াস করেছে কত।

(৮)

আপনার স্মৃতি যতনে রেখেছে
অনাদি কালের রথে
অতীত যাহাকে টানিয়া চলেছে
ভবিষ্যতের পথে।
অতীত কহিছে অনাগত কালে
আমি যে তোমাকে চিনি
মোর ইতিহাস লেখা তব ভালে
কালের ধ্বংস জিনি।

মাসিক রাশিফল

শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য

এবার আমরা ফলিত জ্যোতিষ আলোচনার পুনরাবৃত্তি করছি। গত ভাদ্র সংখ্যায় আমরা মঙ্গল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এবারে মঙ্গল সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করলাম।

ক্রীড়া জগতেও মঙ্গলের প্রভাব বিদ্যমান। মঙ্গলের কাজ দেহকে সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখা। তিনি জানেন "শরীর ব্যাধির মন্দির।" শরীরে ব্যাধির সৃষ্টি হলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। স্বাস্থ্য নষ্ট হলে মনে স্ফূর্তি থাকে না। মনে স্ফূর্তি বা প্রফুল্লতা না থাকলে কর্মে স্পৃহা জাগে না। নষ্ট স্বাস্থ্য জীবনকে দুর্বহ, অর্থহীন ও বিষময় করে তোলে। সুতরাং স্বাস্থ্যের-পরিপুষ্টি সাধনের জন্য এবং মনের সতেজতা ও প্রফুল্লতা বাড়াবার জন্য আয়াস-সাধ্য বা পরিশ্রম জনিত নানাবিধ খেলাধুলা ও শরীর-চর্চা বা ব্যায়ামের প্রয়োজন। কাজেই খেলাধুলা ও শরীর-চর্চা জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। মঙ্গল বোঝেন, স্বাস্থ্যই জীবনের পরম সম্পদ্। অটুট স্বাস্থ্য সুখলাভের একমাত্র নিদান। খেলাধুলা স্বাস্থ্যবর্ধক ও আনন্দদায়ক। সুতরাং মঙ্গল ক্রীড়াশীলতার পরিচায়ক। কাজেই মঙ্গল হতে ডনবৈঠক, ভারোত্তোলন ও ক্রীড়া যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যায়াম এবং ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট প্রভৃতি নানাপ্রকার খেলাধুলা ও ক্রীড়াকৌশল কল্পনা করা যায়।

সাহিত্য জগতে মঙ্গল বড় বেশী কিছু দান করতে পারেন না, বা দান করবার অবসর পান না। যদি এ-কথা সত্য হয় যে গ্রহগণের রসবোধ আছে, তা হলে এ-টুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে মঙ্গল বীররস ও রৌদ্ররস ভিন্ন আর কিছু পছন্দ করেন না, বা আর কিছু থাকা যে আবশ্যক তা তিনি স্বীকার করেন না। সুতরাং মঙ্গল হতে সুললিত ছন্দোবদ্ধ কবিতা-চিন্তা না হয়ে বরং নীরস গদ্য-চিন্তা সম্ভব হয়ে থাকে। আবার মঙ্গলের রস-জ্ঞান বড় কম। তার জীবন প্রবাহ, চিন্তাধারা ও কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে সাবলীল গতির বড় অভাব। কাজেই মঙ্গল প্রভাবান্বিত ব্যক্তির সমস্ত রচনা-শৈলীর মধ্যে রুক্ষতা বা রুদ্রতার ছাপ পরিস্ফুট এবং উপমা ও বর্ণনার আতিশয্য কম।

মঙ্গলের কল্পনা-শক্তি খুব অল্প। যা বাস্তব, যা স্থূল ও প্রত্যক্ষ, ব্যবহারিক জগতে যার মূল্য আছে, যা হতে নতুন কিছু গঠন করা যেতে পারে—সে সকল বস্তুর মঙ্গল প্রয়াসী। যেমন পুষ্করিণীর পদ্মপুষ্প দেখতে সুন্দর, জগতের কত নয়ন ও আননের উপমানভূত, আর বিষ্ণুর নাভি হতে উৎপন্ন যে পদ্ম তাতেই জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার উদ্ভব হয়েছিল অথবা প্রলয়কালে তাতেই তিনি অবস্থান করেছিলেন—ইত্যাদি কবিজনোচিত কাল্পনিক বিষয় মঙ্গল ভাবতে চাহেন না। ঐ পদ্মপুষ্প সম্পর্কে মঙ্গল শুধু ভাবতে পারেন, জলগর্তে নিহিত নাললগ্ন কণ্টক, মৃণালে বিজড়িত বিষধর সর্প, অথবা পদ্মমধুর উপকারিতা এবং কোথায় কিরূপ ভাবে উহার চাষ করলে জীবগণের উপকার সাধিত হতে পারে। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে যা পরিহার্য তা

পরিত্যাগ করা, এবং যা অপরিহার্য তার পরিপুষ্টি সাধন করা মঙ্গলের কাজ।

ধর্ম-জীবনে মঙ্গল আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড ও ক্রিয়া-কলাপের পক্ষপাতী। ফলে মঙ্গল প্রভাবান্বিত ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য পালনশীল ও প্রাণায়ামসিদ্ধ হয়ে থাকেন।

দেবগুরু বৃহস্পতি সর্বপ্রকার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারক। তিনি স্থিতধী ও নিস্পৃহ—কামনা বাসনা শূন্য। তিনি সুখ দুঃখ-ভয় ক্রোধাদিতে অবিচল এবং আত্মতুষ্ট ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। আর দৃষ্টি সূক্ষ্ম—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যাতীত। পরম-পুরুষের সন্ধান তিনি দিতে পারেন। আর মঙ্গল বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাসী। ধর্মের অনুশাসন তিনি মেনে চলেন। তার মধ্যে কু-সংস্কার ও ধর্মান্ধতা বা গোঁড়ামি নেই। সুতরাং যার জন্ম সময়ে মঙ্গল বৃহস্পতি দ্বারা সুসংযত হন, তিনি ধর্মপ্রচারক ও ধর্ম-সংস্কারক হতে পারেন এবং তাঁর মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের অপরূপ মিলন ঘটে। আবার তাঁর পক্ষে ধর্মরাজ্যে যুগাবতার হওয়া সম্ভব, এমন কি ধর্মের জন্য জীবনাহুতি প্রদান করাও অসম্ভব নয়।

বুধ নিরহঙ্কার—বালকের মত সরল। সুতরাং তার মধ্যে কোন হিংসা নেই। তিনি সদা আনন্দে আনন্দিত। তিনি নিজের বক্তৃত্ব প্রকাশ করতে নারাজ। তার নিজস্ব কোন মত বা ধারণা-শক্তি নেই। কাজেই বুধ বালকের মতই ব্যক্তিত্বহীন, আত্মাভিমানী ও চঞ্চল। আর মঙ্গল প্রাণ বা সমস্ত শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ। তার মধ্যে অহঙ্কার আছে, কিন্তু তা অসঙ্গত ভাবে প্রকাশ পায় না। তিনি ব্যক্তিত্বপরায়ণ ও স্বাধীনচেতা। কাজেই তিনি কাউকে তোষামোদ করতে পারেন না। তার একটা নিজস্ব মত বা ধারণা-শক্তি আছে। আবার তার মধ্যে হাতে-কলমে কাজ করবার শক্তিও রয়েছে প্রচুর। এখানেই বুধের সঙ্গে মঙ্গলের পার্থক্য মূর্তীভূত।

মঙ্গল জীবের চিত্তবৃত্তির ওপর অধিক মাত্রায় কাজ করে থাকবেন। জীবের প্রকৃতি বা চিত্তবৃত্তি জীবকে ভাল বা মন্দ কর্মে নিয়োজিত করে। কাজেই জীবের প্রকৃতি বা চিত্তবৃত্তি সংশোধনে চাই কঠিন পুরুষকার, দৃঢ় উদ্যম ও অমিত শক্তি। এ-উদ্যম ও শক্তি জোগান মঙ্গল। তিনি অসুর ভাবকে নাশ করে জীবের প্রকৃতির মধ্যে দেবভাব জাগিয়ে তোলেন। দৈত্যদের বিনাশ করে দেবতাগণকে স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই মঙ্গলের নামান্তর দেব সেনাপতি কার্তিকেয়।

মঙ্গল সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা করা হল। যাক এবারে জন্মরাশি অনুসারে ব্যক্তিগত মাসিক শুভাশুভ ফলের আভাস দিচ্ছি।

মেষ—নৈরাশ্য ও আলস্যের মধ্যে সময় কাটবে। অথচ কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক ব্যাপারে মনের উপর বিশেষ চাপ পড়তে পারে। শরীর মাঝে মাঝে হয়ে পড়বে অবসন্ন। দেখা দেবে অবসাদ। আপনার কিছু টাকার প্রয়োজন হবে এ মাসে। সঙ্কল্পমত কোন কাজ করতে গিয়ে তাতে বাধা পড়তে পারে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে অশান্তি ভোগ করিতে পারেন। পিতার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন। মাতার স্বাস্থ্য কিন্তু ভাল যাবে না। বিদ্যার্থীদের সময়টা গোলমেলে। বাইরে যাবার যোগ রয়েছে। আপনার স্বাধীনতা একটু খর্ব হতে পারে। পত্নীর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হবে। প্রিয়জনদের কারো বিপদে উৎকণ্ঠা ভোগের লক্ষণ আছে। মহিলাদের সঙ্গীদের সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত।

বৃষ—ঔদাসীন্য ত্যাগ করুন। কর্ম-প্রচেষ্টা বাড়িয়ে তুলুন। টাকাকড়ির ব্যাপারে অন্যকে বিশ্বাস করবেন না, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। নিজের প্রাপ্য টাকা নগদ আদায়ের চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত লোকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পিতার স্বাস্থ্য একটু খারাপ হতে পারে। মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে। দাম্পত্যজীবনে অশান্তি আসতে পারে। গুরুজনদের সঙ্গে মত-বিরোধ হতে পারে। পড়াশুনার ব্যাপারে বাধা আসতে পারে। মহিলাদের সময়টা ভাল।

মিথুন—আত্মতৃপ্তিতে যেন আত্মহারা হবেন না। তাতে ক্ষতি হতে পারে। যারা প্রশংসা করছে তারা গুণগ্রাহী নন। বৈষয়িক ব্যাপারে নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে। আশ্রিত জনের শত্রুতা মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কোন ব্যাপারে পত্নীর সহিত মতানৈক্য হতে পারে। টাকাকড়ি পাওয়ার ব্যাপারে প্রতারিত হতে পারেন। গুরুজন হানির যোগ রয়েছে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল নয়। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। মহিলাদের পারিবারিক ঝঞ্ঝাট রয়েছে।

কর্কট—নতুন কাজে হাত দিলে ঝঞ্ঝাটে পড়তে পারেন। স্বাস্থ্য প্রায়ই উৎপাত করবে। নিজের ভুলে কিংবা গড়িমসীর জন্য সুযোগ হারাতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সম্ভাব্য উন্নতি বিলম্বিত হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রেও দুশ্চিন্তার কারণ আছে। এখন থেকে মাতার স্বাস্থ্যের অবনতি হবে। পিতার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। বিদ্যার্জনে একটু বিঘ্ন আসতে পারে। সন্তানসন্ততিদের জন্য উৎকণ্ঠা রয়েছে। আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে। মহিলাদের প্রিয়জন সম্পর্কে সুখবর পাওয়ার সম্ভাবনা।

সিংহ—নিরাশ হবেন না, ধৈর্য ধরুন। যে কাজে হাত দেবেন তাতে বিপুল সাড়া ও অপ্রত্যাশিত সহায়তা পাবেন। মাসের প্রথম ভাগে ন্যায্য প্রাপ্তিতে বাধা আসতে পারে। শরীর আপনার ভালই থাকবে। পত্নীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান থাকা উচিত। দূর ভ্রমণে বাধা আসতে পারে। মাতাপিতার স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হবে। যদি আপনি রাজনীতিবিদ্ হন, তাহলে প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। বন্ধু বান্ধব কিংবা আত্মীয়-স্বজনের কারো বিপদ্ আপনাকে বিচলিত করতে পারে। মহিলাদের পক্ষে সঙ্গী বা বন্ধুদের বিশ্বাস করে অনুতপ্ত হবার যোগ রয়েছে।

কন্যা—দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করুন। হাতের কাজগুলো করে ফেলুন। সামান্য কাজও তুচ্ছ বলে অবহেলা করা উচিত হবে না। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা ব্যর্থ হবে। কারো সুনজর পড়তে পারেন। অতিরিক্ত লোভে কোন ফাঁদে পা দেবেন না। সামাজিক ক্ষেত্রে কুৎসা রটনা হওয়া সম্পর্কে সাবধান থাকা উচিত। শিক্ষার্থীদের বিদেশে শিক্ষা লাভ সুযোগ আসতে পারে। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। পত্নীর স্বাস্থ্যের কোন পরিবর্তন হবে না। মহিলাদের মনের ওপর চাপ পড়তে পারে।

তুলা—প্রিয়জন সম্পর্ক উৎকণ্ঠা ভোগের কারণ ঘটতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অপ্রীতিকর অবস্থা দাঁড়াতে পারে। অনেক সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তে পারেন। অনেক ব্যাপারে নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে। আর্থিক ব্যাপারে কোন পরিবর্তন হবে না। বৈষয়িক ব্যাপারে মামলা-মোকর্দমার ভয় আছে। পত্নী ও সন্তানদের জন্য দুশ্চিন্তা হতে পারে। স্বাস্থ্য কিছুটা উৎপাত করবে। বিদ্যার্থীদের ভবিষ্যৎ পড়াশুনার ব্যাপারে নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে। মহিলাদের সময়টা গোলমেলে।

বৃশ্চিক—আনন্দজনক পরিবেশের মধ্য দিয়ে গোটা মাসটা কেটে যাবে। ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে সুখবর পেতে পারেন। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। কর্মক্ষেত্রের ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে। আয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। চলাফেরায় সতর্ক থাকা উচিত। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। জন্তু-জানোয়ার থেকে সাবধানে থাকবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সন্তান লাভ হতে পারে। গুরুজন হানির যোগ রয়েছে। স্বাস্থ্য ভাল বলা চলে না। মহিলাদের এমাসটা অত্যন্ত ভাল।

ধনু—কাজকর্মের দিক থেকে ভাল বলা যায়। নতুন বন্ধুলাভ হবে। কর্মক্ষেত্রে নৈরাশ্য কেটে যাবে। পুরনো প্রাপ্য টাকা আদায় হবে। আর্থিক দিক থেকে তত ভাল নয়। দূর ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান। পারিবারিক ক্ষেত্রে নিজের ভুলে অশান্তি বাড়তে পারে। তুচ্ছ বলে কোন ব্যাপার উড়িয়ে দেবেন না। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। বিদ্যার্থীদের বিদ্যার্জনে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন আছে। মহিলাদের কোন ভুলের বশে অশান্তি বাড়তে পারে।

মকর—আপনার সুপ্তশক্তিকে জাগ্রত করুন। তুচ্ছ জিনিষকে আপনি বেশ বড় করে তুলতে পারেন। এটা আপনার একধরণের মনোবিকার। হঠাৎ মোটা অর্থ লাভ হতে পারে। ভ্রমণ-যোগ রয়েছে। স্ত্রীলোক হতে দূরে থাকবেন। হাতে যে কাজ আছে, সে কাজে নেমে পড়ুন। দেখবেন তাতেই ভাগ্যের মোড় ঘুরে গেছে। পুরোণো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ মিলন ঘটবে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল বলা চলে না। মহিলাদের সময়টা অত্যন্ত ভাল।

কুম্ভ—বিশেষ হিসেব করে চলার সময়। সামান্য ভুলে বিশেষ ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল। কিন্তু কোন অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটাও আশ্চর্য নয়। ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলা এবং উত্তেজনা দমন করা উচিত। আয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে। ছেলে মেয়েদের জন্য উৎকণ্ঠা আছে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। গুরুজনদের পীড়াদিতে দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা যায়। মহিলা-

দের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।

মীন—যাদের কর্ম বিরতি হবার কথা, তাদের পুনর্নিয়োগ হতে পারে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আয় বাড়বে। কাজকর্মের দিক্ থেকে এখন অনেকাংশে ভাল। কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দতার অবস্থা দেখা যায়। নতুন বন্ধুলাভ হতে পারে। গুরুজনদের পীড়া মাঝে মাঝে উৎপাত করতে পারে। বিদ্যার্থীদের পড়াশুনায় মনোযোগ বাড়বে। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। দাম্পত্য ক্ষেত্রে শুভভাব বৃদ্ধি পাবে। সন্তানদের স্বাস্থ্য এবার ভাল যাবে। আপনার কণ্ঠনালীতে ঘা হতে পারে। মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। কোন বান্ধবীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে অশান্তি ঘটতে পারে। যোগ্যতাসম্পন্ন তরুণীদের চাকুরী পাবার সম্ভাবনা।

কোজাগরী জাগরণ

শ্রীকালিদাস রায়

দিবালোক মিলাইয়া গেল অস্তাচলে
জ্যোৎস্নার প্লাবন এল অনুকল্প রূপে ধরাতলে,
গভীর হইল নিশা ডাকিলাম নিঃশব্দ ভুবনে
সন্তরিতে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার প্লাবনে।
লজ্জায় কুণ্ঠিতা তুমি তবু এলে সাথে
গঙ্গাতটে সেই অর্ধ রাতে॥

দুইজনে সারারাত করিলাম সৈকতে ভ্রমণ
গঙ্গার শীকরসিক্ত সমীরণ করিয়া সেবন।
মনে পড়ে ঝিকিমিকি ক্বণিত কাঁকনে
উড়ন্ত অলকগুলি দুরন্ত পবনে।
মনে পড়ে জলচর পাখীদের পাখার ধুনন,
শুনিয়া তোমার ত্রস্ত চকিত লোচন।

সংসার বাহিরে সেই ভাগীরথী-সৈকতে যামিনী
ইন্দু করে স্বাক্ষরিত জাগরণ আজিও ভুলিনি
সেদিনের শুভযোগে করি পুণ্য স্নান
কৌমুদী জাহ্নবী নীরে শুচি হ'ল প্রাণ।
সে শুভযোগের কথা পুরাতন প্রেমপঞ্জিকার
মোর জন্মনক্ষত্রের সাথে যোগ তার॥

তেরশো একুশ সাল তিরিশে আশ্বিন
কালের মিলনতীর্থ হয়ে প্রিয়ে রাজে চিরদিন।
প্রেম সে আধেক সত্য, আধেক স্বপন,
আধেক প্রকাশ তার, আধেক গোপন।
যোগ্য পরিবেশ নয় সূর্যালোক কিংবা অন্ধকার
জনশূন্য চন্দ্রালোকই অনুকূল পরিবেশ তার॥
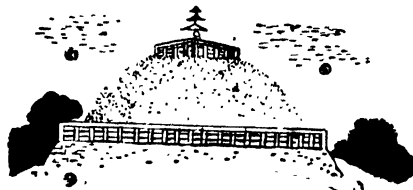
প্রতিদিন দু-বার দেখা হয়। ভোরে আর বিকেলে।

ভোরবেলা মাইল তিনেক মাটির ঢেউ ভেঙে সোমনাথ চলে যান দক্ষিণের পলাশবনে। গিয়ে দেখেন ওঁরা বসে আছেন। বিকেলে সোমনাথ যান উত্তরে। সেখানে রক্তাভ কর্কশ মাটির মধ্য দিয়ে নীল ফিতের মত একটি তিরতিরে নদী। দেখা যায় নদীটির পারে ওঁরা অলস পায়ে বেড়াচ্ছেন।

জায়গাটা ছোট নাগপুরে। এখানে পলাশ ফোটে; শিমুল শাখায় থোকা থোকা আগুন জমে থাকে। আর আছে শালবন। মাটি এখানে রক্তাভ এবং চড়াই-উতরাইতে দোলায়িত। প্রান্তর এখানে আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দিগন্তে ছুটে গেছে। প্রকৃতির এই স্বদেশে যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না।

টুরিষ্ট-সংহিতায় জায়গাটার কৌলীন্য আছে। সেপ্টেম্বর শেষ হতে না হতেই ঝাকে ঝাকে মুশাফিরেরা এখানে হানা দিতে থাকে। সেই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই জোয়ার চলতে থাকবে। তারপরেই ধরবে ভাটার টান।

এবার কিন্তু এখনও টুরিষ্ট-মরসুম শুরু হয়নি। সবে মে মাস। এ সময়টা এখানে কেউ আসে না। কিন্তু ভিড় অসহ্য লাগে বলে সোমনাথ টুরিষ্ট আইন ভঙ্গ করে এই অসময়েই এসে পড়েছেন।

দু-বছর হল রিটায়ার করেছেন; বয়েস ষাটের সীমান্তে। মাথার চুল সাদায়-কালোয় দাবার ছক। কপালের দিক থেকে যে টাকটা চল্লিশের শুরুতেই হামা-গুড়ি দিতে শুরু করেছিল, এখন সেটা মাথার অর্ধেক জুড়ে রাজত্ব কায়েম করেছে। শরীরের বাঁধুনি শিথিল হয়ে গেছে। দাঁতের কিছু আসল, বেশির ভাগই মেকি। পাকস্থলীর শক্তিও নির্জীব হয়ে এসেছে। ইদানীং হজমের গোলমাল হচ্ছে। ঋতু বদলের মত পালা করে সর্দি-কাশি-জ্বর ডিসপেপসিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি দেখা দিচ্ছে। সোমনাথ যে নিখুঁত বাঙালী, সন্দেহ কি!

অবসর আর কাটতে চায় না। তা ছাড়া কলকাতার জলবাতাসে এমন গুণ নেই যা পাকস্থলী আর হৃদ্‌যন্ত্রটাকে ঠিকমত সচল রাখতে পারে। কলকাতা বাস একঘেয়ে লাগলে কিংবা শরীরটা কিঞ্চিৎ বিকল হলেই সোমনাথ বেরিয়ে পড়েন। তা সে যে মাস যে তারিখই হোক, টুরিজিমের পাঁজিতে যদি দিনক্ষণ না থাকে তবুও।

যাই হোক গ্রীষ্মের এই মধ্যপ্রহরে ছোট নাগপুরের এই শহরটিতে আসার আগে সোমনাথ ভেবেছিলেন, তিনিই একমাত্র অসময়ের অতিথি। এসে দেখলেন, আরো কয়েকটা পরিবার ইতিমধ্যেই এসে গেছে। তাদের ভেতর ওঁরাও আছেন।

সকালে এবং বিকেলে একবার পলাশ বনে, আরেক-বার নদীর পারে ওঁদের দেখা যায়। ওঁরা দু-জন। এক-জন পুরুষ, অন্যজন রমণী। পুরুষটি সোমনাথেরই সমবয়সী

হবেন; মহিলা কয়েক বছরের ছোট। পুরুষটিকে সোমনাথ চেনেন না; মহিলাকে চেনেন। ছোট নাগপুরে এসে প্রথম দিন দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। মুখ রেখাময়, চুল সাদা, মেদভারে কিছু স্থূল হয়ে গেলেও পঁয়ত্রিশ বছর আগের মতই শ্যামাঙ্গী আছেন নলিনী। চোখ তেমনই উজ্জ্বল, নাক তেমনই নাতি তীক্ষ্ণ, চিবুকের সেই মনোরম খাঁজটিও স্থানচ্যুত হয় নি। সেদিন তঁকে ঘিরে অপরূপের একটি ছোঁয়া ছিল, আজও তা একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি।

সঙ্গী পুরুষটকে না চিনলেও নলিনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা অনুমান করতে অসুবিধা হয় নি সোমনাথের ওঁরা স্বামী-স্ত্রী।

প্রতিদিনই ওঁরা দু-জনে বেড়াতে বেরোন। অবশ্য মাঝে মাঝে দু-তিনটি কিশোর-কিশোরীকেও সঙ্গে দেখা গেছে। ওরা যে নলিনীরই ছেলেমেয়ে তা ওদের চেহারায় মুখের আদলে স্পষ্ট করে লেখা আছে।

সোমনাথ যেমন ওঁদের দেখেছেন, ওঁরাও তেমনি তাঁকে লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু নলিনী তাঁকে যে চিনতে পেরেছেন তা তাঁর নিরুৎসুক চোখ দেখে বুঝবার উপায় নেই। সোমনাথ কি এতই বদলে গেছেন যে চেনাটুকুও আর যায় না?

প্রত্যহ দুটি সমান্তরাল রেখার মত সোমনাথ আর নলিনী যে যার পথে হাঁটেন কিন্তু কাছে আসেন না। অথচ—অথচ—

বছর চল্লিশেক আগে ক্ষীণ আত্মীয়তার সূত্র ধরে সোমনাথ নামে একটি নিরাশ্রয় ছেলে নলিনীদের বাড়িতে এসেছিল। তখন সোমনাথের বয়স ষোল সতেরর মত। আর নলিনী খুব বেশি হলে দ্বাদশীর চাঁদ।

নলিনীর বাবা সোমনাথকে শুধু আশ্রয় দেননি। তার পড়াশোনার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। নলিনীদের বাড়ি আসার আগে সোমনাথ ম্যাট্রিকুলেশনটা পাশ করেছিল। তারপর দেখতে দেখতে আই, এ, এবং বি, এ, পাশ করেছে। তারপর এম্ এ-তেও ভর্তি হয়েছিল।

এদিকে দ্বাদশী নলিনীও ধীরে ধীরে অষ্টাদশী হয়ে উঠেছে। অতএব এর পরের কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যৌবনের ইতিহাসটুকু যারা পড়ে শেষ করে ফেলেছে তারা জানে নলিনী কিংবা সোমনাথের ঐ বয়সের মনটা হচ্ছে লতার মত। সে মন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে পল্লবিত সঞ্চারিত হতেই ভালবাসে। তখন ধমনীতে রক্তস্রোত উতরোল হৃদয় স্বপ্নের আরকে সিক্ত আর চোখের সামনের পৃথিবীটা একখানা স্বপ্নময় ছবির মত। সুতরাং অমোঘ আকর্ষণে নলিনী আর সোমনাথ পরস্পরের কাছে এগিয়ে এসেছিল। সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করার শক্তি বা ইচ্ছা কোনটাই তাদের ছিল না। করলে যৌবনের সমস্ত মহিমাকেই বুঝি উপেক্ষা করা হয়।

এই পর্যন্ত ঘটনাগুলি সরল রেখার মত; একেবারে অবাধ, স্বচ্ছন্দ। তারপর যা হয় তা-ই হয়েছিল। নলিনীর বাবা তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রায়ই নানা জায়গা থেকে সম্ভাব্য পাত্রপক্ষরা নলিনীকে দেখতে আসত।

যাই হোক নলিনী অস্থির হয়ে উঠেছিল। প্রায়ই সে বলত, একটা কিছু ব্যবস্থা কর নইলে বাবাকে বল।'

সোমনাথ চিরদিনই ভীরু, দ্বিধান্বিত। সে বলত, 'দেখতে এলেই তো আর বিয়ে ঠিক হয়ে যায় না। যাক না আর ক'টা দিন, তেমন বুঝলে তোমার বাবাকে নিশ্চয়ই বলব।'

বলব বলব করেও বলতে পারেনি সোমনাথ। এদিকে মেয়ে দেখার আসরে বসতে বসতে একদিন এক পাত্রপক্ষের নজরে পড়ে গিয়েছিল নলিনী। বাবার টাকা ছিল, কাজেই বিয়েটা স্থির হয়ে যেতে খুব বেশি সময় লাগে নি।

নলিনী ছুটে গিয়েছিল সোমনাথের কাছে, 'এবার, এবার কি করবে? বাবা তো বিয়ে ঠিক করে ফেললে। এখনও চুপ করে বসে থাকবে?'

'না, ভাবছি—

'আমার সর্বনাশ না হওয়া পর্যন্ত তোমার ভাবনা শেষ হবে না।'

দ্বিধান্বিত বিব্রত সোমনাথ কি উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিল; তার আগেই নলিনী প্রায় জেদই ধরেছিল, 'আজই—এখনই তুমি বাবার কাছে যাবে।'

বিপন্ন সুরে সোমনাথ বলেছিলেন, 'এখনই!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ এখনই।' নলিনী চিৎকার করে উঠেছিল, 'যেমন করে পার, বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঐ বিয়েটা বন্ধ করে আসবে।'

'কিন্তু'—

সোমনাথের মুখে হাত চাপা দিয়ে নলিনী বলেছিল, 'তোমার কোন কথা আমি আর শুনতে চাই না।'

অতএব কি আর করা! প্রাণের কোণে যেটুকু শক্তি ছিল সব কুড়িয়ে একত্র করে অসীম দুঃসাহসে নলিনীর বাবার ঘর পর্যন্ত গিয়েছিল সোমনাথ। কিন্তু চৌকাঠ আর ডিঙোতে পারে নি; তার আগেই সব উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এসেছে।

নলিনী অস্থির আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। সোমনাথ ফিরতেই তাকে ধরেছিল সে। চাপা তীব্র স্বরে বলেছিল, 'কি, বাবার কাছে গেলে না যে?'

চোখ নামিয়ে বলতে শুরু করেছিল সোমনাথ। কি একটা উত্তরও যেন দিয়েছিল সে; সেটা নিজের কানেই দুর্বোধ্য শুনিয়েছে।

নলিনী আগের সুরেই বলেছিল, 'যা বলছ, স্পষ্ট করে বল।'

সোমনাথকে এবার গলা তুলতে হয়েছিল, 'তোমার বাবার কাছে যেতে আমার ভয় করে।'

'ভয় করে!' বিদ্রূপে নলিনীর স্বর শানিত মনে হয়েছিল।

সোমনাথ চুপ।

খানিকক্ষণ কি ভেবে নলিনী আবার বলেছিল, 'বেশ, বাবার কাছে তোমাকে যেতে হবে না। কিছুই করতে হবে না। যা করবার আমিই করব।'

সোমনাথ নিরুত্তর।

নলিনী বলেই যাচ্ছিল, 'শুধু একটি কাজ তোমাকে করতে বলব। দয়া করে সেটুকু করলেই আমার উপকার করা হবে।'

'কী কাজ'?

'এখন শুনে লাভ নেই, সময় হলে বলব।'

সোমনাথ আর কিছু বলে নি।

এদিকে একের পর এক দিনগুলি পার হয়ে নলিনীর বিয়ের দিন এসে গিয়েছিল। সত্তার প্রান্তে গোপন যন্ত্রণা বহন করলেও আরেক দিক থেকে স্বস্তি বোধ করেছিল সোমনাথ। নলিনী তার বারবার কাছে যাবার জন্য জেদ ধরছিল না, পীড়াপীড়ি করছিল না, এমন কি কেঁদেকেটে হাটও বসাচ্ছিল না। এজন্য সাধারণ পরিচিতের সঙ্গে মানুষ যে ভাবে মেশে তার বেশি ঘনিষ্ঠতা নলিনীর ব্যবহারে ছিল না। সোমনাথ বেঁচেই গিয়েছিল।

অবশেষে বিয়ে দিন রাত্রিবেলাতেই ঘটেছিল সেই নিদারুণ ঘটনাটা। মাঝখানের ক'টা দিন নিরাপত্ত শীতল নিরুত্তাপ শান্ত দিনযাপনের পরিণাম যে ঐ রকম একটা সাঙ্ঘাতিক উত্তেজনায় আত্মগোপন করেছিল, কে তা অনুমান করতে পেরেছে!

সেদিন সন্ধ্যের আগেই বর এবং বরযাত্রীরা এসে গিয়েছিল। বিয়ের লগ্ন সন্ধ্যের পরেই। এদিকে কনে সাজানো হয়ে গেছে এবং নলিনীর সখীরা তাকে ঘিরে অলকাপুরী জমিয়ে তুলেছে। তাদের ঠাট্টা আর হাসির আওয়াজ প্রতিমূহূর্তে ফুলঝুরির চকিত চমক হয়ে ফুটতে শুরু করেছিল।

আর সোমনাথ করেছিল কি, সারা দুপুর একা ঘরে খিল আটকে বিষণ্ণ মুখে বসেছিল। তারপর বিকেল বেলা বাইরে এসে কোমরে তোয়ালে বেঁধে হাজার গুণ উৎসাহে বরযাত্রীদের পরিবেশন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

দু চারবার ভাঁড়ার আর যেখানে খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই জায়গায় ঘোরাঘুরির পর হঠাৎ নলিনীর হাতে ধরা পড়েছিল সোমনাথ। বাড়িভর্তি লোকের চোখে ধুলো ছিটিয়ে বধূবেশে কি করে যে নলিনী এসে পড়ল সেটাই এক আশ্চর্যের ব্যাপার।

সোমনাথ কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই তাকে টানতে টানতে বাড়ির পেছনে একটি নিরালা কোণে নিয়ে গিয়েছিল নলিনী।

আড়ষ্ট শিথিল সুরে সোমনাথ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি, কি ব্যাপার? এখানে নিয়ে এলে যে?'

'তাড়াতাড়ি একটা জামা গায়ে দিয়ে এস।' নলিনী শান্ত সুরে বলেছিল।

'কেন?'

'আমরা পালাব।'

'পালাবে!' মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে বরফের স্রোত নেমে গিয়েছিল যেন সোমনাথের।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বিয়ের গয়না-গাটি সব নিয়ে এসেছি; তা ছাড়া পাঁচশ টাকা। যাও, তাড়াতাড়ি কর। দেরি করলে আমার খোঁজ পড়বে। ধরা পড়ে যাব।'

একরকম জোর করেই সোমনাথকে জামা আনতে পাঠিয়ে দিয়েছিল নলিনী। স্খলিত পায়ে যেতে যেতে কর্তব্য স্থির করে ফেলেছিল সোমনাথ। নিজের ঘরে এসে জামা সে পরেছিল ঠিকই; তারপর স্যুটকেশটা নিয়ে আরেক দরজা দিয়ে পালিয়েছিল। নলিনী তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত কি করেছিল তা জানবার সুযোগ আর হয় নি।

দীর্ঘ তিন যুগ পর ছোট নাগপুরের এই শহরে আবার দেখা হল নলিনীর সঙ্গে।

এখানে রোজই সমান্তরাল রেখার মত নলিনী আর সোমনাথ, যে যার পথে হাঁটেন; কিন্তু নলিনী ভুলেও তাঁর দিকে তাকান না। সেদিন জামা পরে নলিনীর কাছে গেলে জীবনটা যে আরেকরকম হতে পারত তার কোন ইঙ্গিতই নলিনির চোখেমুখে লেখা নেই।

রোজই সোমনাথ আশা করেন, আজ বুঝি নলিনী এগিয়ে আসবেন সে জন্য তিনি উন্মুখও হয়ে থাকেন। কিন্তু নলিনী আসেন না। চোখাচোখি যে না হয় তা নয়। তবে মানুষ যে উদাসীনতায় আকাশ দ্যাখে, দূরের কোন পাখি দ্যাখে কিংবা অতি তুচ্ছ কোন দৃশ্য দ্যাখে নলিনীও তেমনভাবে তাঁর দিকে তাকান। তারপর ধীরে ধীরে চোখ ফিরিয়ে নেন।

অবশেষে একদিন আপন স্বভাবের সমস্ত কুণ্ঠা এবং সঙ্কোচ দু-হাতে সরিয়ে নলিনীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সোমনাথ। বললেন, 'আমাকে চিনতে পারছ?'

'যেদিন তোমাকে এখানে প্রথম দেখি সেদিনই চিনতে পেরেছি।' নলিনী বললেন; তাঁর স্বরে কোন আবেগই তরঙ্গিত হল না।

সোমনাথ একবার ভাবলেন, বলেন, চিনতেই যদি পেরেছিলে তবে কথা বল নি কেন? কাছে এগিয়ে আস নি কেন? যা ভাবা যায়, সবসময় তা বোধ হয় মুখ ফুটে বলা যায় না। অতএব নলিনীর সঙ্গীকে দেখিয়ে সোমনাথ বললেন, 'ইনি—'

'আমার স্বামী।'

দুই হাত যুক্ত করে প্রথম পরিচয়টাকে চিহ্নিত করলেন ভদ্রলোক! বললেন, 'আমার নাম অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

প্রতি-নমস্কার করলেন সোমনাথ, নিজের নামও বললেন। তারপর আবার নলিনীর দিকে তাকালেন, 'তোমরা উঠেছ কোথায়? হোটেলে?'

'না।'

'তবে?'

'রেষ্ট হাউসে।'

সোমনাথের প্রত্যাশা ছিল, তাঁর এখানকার ঠিকানার কথাও জিজ্ঞেস করবেন নলিনী; করলেন না। মনে মনে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেন তিনি। বললেন, 'আমি সাহেবডিহির এক হোটেলে উঠেছি।'

নলিনী কিছু বললেন না।

অগত্যা সোমনাথকেই বলতে হল, 'আর ক'দিন থাকছ এখানে?'

'দিন পনেরর মত।'

এবার অনেকখানি প্রগল্ভ হয়ে উঠলেন সোমনাথ, 'একদিন তোমাদের ওখানে যাব কিন্তু—'

সোমনাথের উচ্ছ্বাস সামান্য প্রতিধ্বনিও তুলতে পারল না নলিনীর মধ্যে। সুরহীন নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'ইচ্ছে হলে আসতে পার। আচ্ছা, আমরা এখন যাই। সন্ধ্যে হয়ে এল।' বলে আর অপেক্ষা করলেন না; স্বামীর সঙ্গে রেষ্ট হাউসের দিকে চলে গেলেন।

আর সাহেবডিহির হোটেলে ফিরতে ফিরতে দীর্ঘ তিন যুগ পর নলিনীর সঙ্গে আজকের এই আলাপটাকে বিশ্লেষণ করতে লাগলেন সোমনাথ। একটা ব্যাপার খচ করে প্রাণের কোন না-দেখা অংশে যেন বিঁধে গেল। নলিনী সম্বন্ধে তাঁর দিক থেকে উৎসাহ যত তাঁর সম্বন্ধে নলিনীর উদাসীনতা ঠিক তত। নিজের সমস্ত আবেগ আর উচ্ছ্বাসকে সে যেন সঙ্কুচিত করে রেখেছে। একি সেই নলিনী একদিন যে তাকে হিসেববিহীন প্রেমমত্ততায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল? বিশ্বাস হয় না। পরক্ষণেই

আরেকটা দিক তাঁর মনে পড়ল। হয়ত স্বামী সঙ্গে ছিলেন বলেই নলিনীর পক্ষে এই বয়সে আবেগে-উচ্ছ্বাসে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

যাই হোক দিন তিনেক পর সত্যিই একদিন সোমনাথ রেষ্ট হাউসে এলেন। বাইরের ঘরটিতে বসে নলিনীরা সপরিবারে লুডো খেলছিলেন। সোমনাথ সপ্রতিভ হেসে বললেন, 'এসেই পড়লাম নলিনী।'

নিস্পৃহ মুখে নলিনী বললেন, 'বোসো।'

সোমনাথ বসলেন। বললেন, 'তুমি হয়ত ভেবেছিলে, আমি আসব না। তাই তো?'

'আমি কিছুই ভাবিনি।'

কিচ্ছু না?'

'না।'

একটু চুপ করে থেকে সোমনাথ ছেলেমেয়ে দুটিকে দেখিয়ে বললেন, 'এরা নিশ্চয়ই তোমার?'

পরম আলস্যভরে হাই তুললেন নলিনী, 'হ্যাঁ।'

নলিনীর ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে সোমনাথ এবার বললেন, 'নাম কি তোমাদের?'

তারা নাম বলল। ছেলেটির নাম সজল, মেয়েটির মাধবী।

সোমনাথ বললেন, 'আমি তোমাদের কে হই জানো তো?'

ছেলেমেয়ে দুটি মাথা নাড়ল; তারা জানে না।

সোমনাথ বললেন, 'সম্পর্কে আমি তোমাদের মামা।'

মাধবী বা সজল কিছু বলল না।

এবার অবিনাশবাবু সম্বন্ধে মনোযোগী হলেন সোমনাথ। বললেন, 'আপনি কোন সারভিসে আছেন?'

'সারভিসে নেই; আমার স্বাধীন প্রোফেসান। আমি ডাক্তার।'

সোমনাথের মনে পড়ল, ডাক্তার ছেলের সঙ্গেই তো নলিনীর বিয়ের ঠিক হয়েছিল। বললেন, 'এখন আপনি আছেন কোথায়?'

'পূর্ণিয়াতে।'

'ওখানে কত বছরের প্রবাসী?'

'তা, বছর বিশেক তো হবেই।'

সোমনাথ এবার নিজের কথা বললেন। তিনি স্বাধীনতার পর মিনিষ্ট্রি অব ডিফেন্সে কাজ করেছেন। আপাতত বছর দুই হল রিটায়ার করেছেন। এখনও অকৃতদার। কলকাতায় থাকেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনর্গল কথা বলে চা খেয়ে হোটেলে ফিরতে ফিরতে সোমনাথের খেয়াল হল, একাই তিনি প্রায় সব কথা বলেছেন। প্রশ্ন করে করে নলিনীদের সংসারের খুঁটিনাটি জেনেছেন; উপযাচক হয়ে নিজের কথা বলেছেন। আশ্চর্য, নলিনী কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞেস করেন নি। নলিনীর কথায়-বার্তায় ব্যবহারে আচারণে বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না। নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাই দিয়েছেন। কোন রকম অনাদর অবশ্য করেন নি, উপেক্ষাও নয়। সৌজন্যের খাতিরে যেটুকু করা দরকার মাত্র সেটুকুই করেছেন। তাঁর ব্যবহারে তার বেশি কিছুই ছিল না। আজকের এই বিকেলটার কথা যতবার ভাবলেন ততবারই কেমন যেন নিরুৎসাহ বোধ করতে লাগলেন সোমনাথ।

পরের দিন কিন্তু আবার রেষ্ট হাউসে এলেন সোমনাথ। কালকের মত নলিনী অভ্যর্থনাও করলেন না, আবার প্রগলভাও হয়ে উঠলেন না। তাঁর সমস্ত ব্যবহারটিকে ঘিরে রইল একটি হৃদয়হীন নিরুত্তাপ উদাসীনতা। মানুষ যে কি করে এত নিস্পৃহ হয়ে উঠতে পারে, কে বলবে।

যাই হোক, একাই আসর জমাতে চেষ্টা করলেন সোমনাথ। প্রচুর কথা বললেন, প্রচুরতর হাসলেন, তারপর চা খেয়ে বিদায় নিলেন।

এর পর থেকে প্রতিদিনই রেষ্ট হাউসে হাজিরা দিতে লাগলেন সোমনাথ। লক্ষ্য করেন, তাঁর কথা বলার ফাঁকে কোন কোন দিন ভেতরে চলে যান নলিনী, আর ফিরে আসেন না। একটা বিস্বাদ অস্তিত্ব নিয়ে নলিনীর ছেলেমেয়ে এবং স্বামীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে তিনি ফিরে আসেন।

অবশেষে সেই দিনটা এসে গেল। সেদিন অবিনাশবাবু, সজল এবং মাধবী—কেউ নেই। মাইল কয়েক দূরের এক সাঁওতালী মেলা দেখতে গেছে। শরীরটা জ্বরো-জ্বরো বলে নলিনী আর বেরোন নি। একা একা ঘরে বসে একটা উলের সোয়েটার বুনছেন।

নলিনীকে একা পেয়ে খুশীই হলেন সোমনাথ। ঘরে

উদ্বেগ ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'শরীরটা কি খুবই খারাপ ?'

'না, তেমন কিছু নয়।' সোয়েটার থেকে মনোযোগ না সরিয়ে নলিনী বললেন।

একটু চুপ করে রইলেন সোমনাথ। খানিক ইতস্তত করে এক সময় বললেন,'তোমার সে-সব কথা মনে আছে ?'

'কোন সব ?'

'সেই যে তোমাদের বাড়ি থাকতাম।'

'আমাদের বাড়িতে তো কত লোকই থাকত। বাবার খেয়াল, দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করবেন। তা তুমিও হয়ত আশ্রয় পেয়েছিলে; স্পষ্ট করে কিছু মনে নেই।'

মনে মনে অত্যন্ত আহত হলেন সোমনাথ। নলিনীর স্মৃতিকে নিঃসঙ্গতার সুযোগে তিনি উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু এমন আঘাত আশা করেন নি। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে তিনি দ্বিতীয়বার চেষ্টা করলেন, 'আচ্ছা নলিনী—'

'বল—'

'বিয়ের দিনে তোমার মাথায় যে পাগলামি চেপেছিল নিশ্চয়ই সে কথাটা ভুলে যাও নি।'

কৌতূহলশূন্য নীরস গলায় নলিনী বললেন, 'বিয়ে তো হয়েছে আর একটা-দুটো দিন নয়, প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর। অতকাল আগের কথা মনে রাখার মত স্মৃতিধর আমি নই, মনে রাখার দরকারও বোধহয় নেই।'

সোমনাথ এর পর আর কি বলবেন, ভেবে পেলেন না। এলোমেলো দু-একটা কথা বলে এক সময় উঠে পড়লেন।

আশ্চর্য, সোমনাথ লক্ষ্য করেছেন, কোনদিনই বিদায় নেবার সময় নলিনী বলেন না, 'আবার এসো।' তবু তিনি পরের দিন দুরন্ত আকর্ষণে চলে আসেন। অতএব যেদিন নলিনী তিন যুগ আগের অতীতকে পরম উদাসীনতায় দূরে সরিয়ে রাখলেন তার পরদিনও নিয়মিত হাজিরা দিয়ে গেলেন সোমনাথ।

রোজই আসেন সোমনাথ। এই আসাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

সব মিলিয়ে ক'দিন রেস্ট হাউসে এসেছেন, সোমনাথ মনে করতে পারেন না। পনের দিন হতে পারে, আবার কুড়ি দিনও।

একদিন রেষ্ট হাউসের সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হল। সবগুলি ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। কেয়ার-টেকারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলেন, ঘণ্টাখানেক আগে নলিনীরা এ শহর ছেড়ে চলে গেছেন।

হঠাৎ অত্যন্ত ক্লান্ত, অবসন্ন বোধ করলেন সোমনাথ। নলিনীর কাছে তিনি কি আজ এতই অনাবশ্যক যে যাবার আগে সামান্য একটু বলারও প্রয়োজন মনে করেন নি !

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর স্খলিত পায়ে ফিরতে ফিরতে বিদ্যুৎ-চমকের একটা ভাবনা সোমনাথের সত্তার মধ্য দিয়ে বয়ে গেল। তবে কি, তবে কি, একবার ক্ষণকালের জন্য জলে উঠে চিরকালের জন্য নিভে গেছেন নলিনী! হয়ত এই তাঁর স্বভাব, তাঁর নিয়তি। যেটুকু জলবার সেটুকু আগেই তিনি জলেছেন। এতকাল পর জীবনের সীমান্তে পৌঁছে নতুন করে তাঁকে শিখায়িত করতে যাওয়া নিতান্তই বৃথা।

পরাভূত সোমনাথ অসীম এক শূন্যতার মধ্যে হাঁটতে লাগলেন।

পূজা ও প্রার্থনা

শ্রীজ্ঞান

মণ্ডপে মণ্ডপে বাজছে কাঁসর, ঘণ্টা, ঢাক। পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা করছেন। ছেলে-মেয়েরা নতুন জামা, জুতো পরে আনন্দে নেচে, খেলে বেড়াচ্ছে—তরুণদের কাজের অন্ত নেই—সাজ সজ্জার অন্ত নেই তরুণীদের। প্রৌঢ়রা তামসা দেখছেন আর ভাবছেন আজকালকার ছেলেমেয়েরা কি হয়েছে! বৃদ্ধেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন প্রাচীনকালের কথা স্মরণ করে—সেই সোনালী রঙের দিনগুলি তো আর ফিরে আসবে না!

এ হচ্চে চিরদিনের রীতি। আমাদের সমাজজীবনে অবশ্যই উৎসবের বিশেষ মূল্য আছে, প্রয়োজন আছে—আছে প্রয়োজনের অতিরিক্ততায় নিজেকে মাতিয়ে তোলার। কিন্তু এই উৎসব আর অনুষ্ঠানই কি এই মহাপূজার সব?—আশা করি এ ধারণা তোমাদের সকলকারই হয়েছে যে এই উৎসব আর অনুষ্ঠানই মাতৃপূজার সব নয়।

পূজার প্রাণ প্রার্থনা—অন্তর দিয়ে পূজা! কিন্তু আজকাল ভ্রান্ত নাস্তিক্যবুদ্ধি চালিত অনেকের কাছ থেকে হয়ত মূর্ত্তি পূজার সার্থকতা ও প্রার্থনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এখন থেকেই তোমাদের মনে সন্দেহ জেগে উঠছে,—তাই না?

কিন্তু এ সন্দেহকে তোমরা মন থেকে দূর কর—দূর কর এই অবিশ্বাসকে। যদি এই সন্দেহকে, এই অবিশ্বাসকে মন থেকে সরাতে না পার তো একবার না হয় পরখ করেই দেখ প্রার্থনার শক্তিকে! মা দুর্গার মূর্ত্তির সামনে একাগ্রমনে, ঐকান্তিক ভক্তির সহিত একবার প্রার্থনা করে দেখ এই মাটির তৈরী মাতৃরূপা, শক্তিরূপা, অশুভনাশিনী, দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন কি না!

তবে মনে রেখ প্রার্থনার মধ্যে প্রাণ থাকা চাই! ভক্তি থাকা চাই! শুধু দায় সারা গোছের প্রার্থনা করলে চলবে না বা শুধু মুখে আউড়ে গেলেও হবে না।

বিরাট খরচা করে, প্রচুর জাঁকজমকের মধ্যে, প্রকাণ্ড প্রতিমা বানিয়ে পূজা করলেও ফল হবে না, যদি না পূজার মধ্যে প্রাণ থাকে, ভক্তি থাকে, ঐকান্তিকতা থাকে। এই ভক্তি, এই একাগ্রতা, এই বিশ্বাসই হচ্ছে পূজার প্রাণ। এই বিশ্বাস, এই ভক্তিই মৃন্ময়ী প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে—মাটির পুতুল তখনই হয়ে ওঠে জীবন্ত, প্রাণবন্ত! দেবীর মূর্ত্তিকে শুধু খড়, মাটির বলে ভুল কর না—এই মাটির মায়ের মধ্যে পূজারী তাঁর ভক্তি দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে, শুচিতা দিয়ে, শুদ্ধমন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা ক'রেন প্রাণের। তখন সেই প্রাণবন্ত প্রতিমার কাছে যদি তোমরা প্রাণঢালা প্রার্থনা করতে পার তাহলে অভিষ্ট ফল লাভ করবেই জেন। মনে বিশ্বাস রাখ, আর তথাকথিত ঐ বাস্তববাদী নাস্তিকতাকে দূরে সরিয়ে রাখ। ভক্তি করতে শেখ,

বিশ্বাস করতে শেখ, প্রার্থনা করতে শেখ। তোমাদের ভক্তি, তোমাদের বিশ্বাস তোমাদের প্রার্থনায় প্রাণ সঞ্চার করবে, আর তোমাদের প্রার্থনা মাতৃহৃদয়ে আলোড়ন তুলবে—তিনি তোমাদের মনস্কামনাও পূর্ণ করবেন।

পূজার মণ্ডপে যখন বেজে উঠবে মঙ্গল শঙ্খ—কাঁসর, ঘণ্টা, ঢাকের শব্দ যখন ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে, ধূপ-ধুনার ও ফুলের গন্ধে যখন আমোদিত হয়ে উঠবে চারিদিক, পট্টবস্ত্র পরিহিত পুরোহিত যখন পঞ্চপ্রদীপ হাতে ঘণ্টাধ্বনি করে দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার আরতি করবেন, তখন তোমরা একাগ্রমনে, ঐকান্তিক ভক্তির সঙ্গে প্রাণ ঢেলে প্রার্থনা করবে—'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি'—আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, ফল দাও এবং আমার (কাম-ক্রোধাদি) শত্রু নাশ কর।

তোমাদের প্রাণঢালা প্রার্থনায় কিছু ফল লাভ করলে আমাকে জানাবে কি ?

***

কেলো

শৈলেন রায়

সেবারে পূজোর ছুটিতে রাজগীর বেড়াতে গিয়েছিলুম। ঘুরে ফিরে কয়েকটা দিন ভালই কাটলো। যাবার দিন ঘনিয়ে এলো। কলকাতার নিজস্ব একটা আকর্ষণ আছে। বাইরে না গেলে সেটা ঠিক যেন বোঝা যায় না। যেখানেই থাকা যাক না কেন এবং সে জায়গাটা যত সুন্দরই হোক না কেন—কিছুদিন পরই যেন মনটা হাঁপিয়ে ওঠে। বাড়ী ফিরবার জন্যে যেন তাগিদ লেগে যায় মনে মনে।

এমনি একটি দুপুরে স্নান সেরে বাড়ী ফিরছি। বেশ গরম লাগছে রোদের তাপ। হঠাৎ নজর পড়লো রাস্তার একটা কলের দিকে। ফোঁটা ফোঁটা জল চুইয়ে পড়ছে নীচের বাঁধানো জায়গাটায়, আর তাই চেটে নিচ্ছে একটা কুকুর, সাধারণ কালো রংএর দেশী একটা কুকুর। যেটুকু জল সে পাচ্ছে, তাতে যেন তার তৃষ্ণা নিবারণ হচ্ছে না। জিভ বার করে সমানে হাঁপাচ্ছে সে।

কি মনে হ'লো রাস্তার ওপাশে চায়ের দোকান থেকে একটা মাটির খুরি চেয়ে নিয়ে এলাম। তারপর কল টিপে জল ভর্ত্তি করে তার সামনে দিতেই চক্ চক্ করে খেয়ে নিলে। বার তিন চারেক এভাবে জল দিতেই তার তৃষ্ণা নিবারণ হ'লো, আহা বেচারা! বড্ড তেষ্টা পেয়েছিলো ওর। আমার দিকে মুখ তুলে দেখে ছোট্ট লেজটা বার কয়েক নেড়ে সে চলতে শুরু করলো। এতক্ষণে নজর পড়লো তার পায়ের দিকে। সামনের একটা পা কনুই থেকে কাটা। কোন দুর্ঘটনায় কেটে গিয়ে থাকবে হয়তো। অজানতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিলো—আহা বেচারা!

এর পর চার পাঁচ বছর কেটে গেলো। সামান্য ঘটনা, এতদিন মনে থাকবার কথাও নয়। আর তা ছাড়া কলেজ জীবন শেষ করে চাকরীর সন্ধানে ঘুরতে হয়েছে বেশ কিছু দিন। ইদানীং ওষুধের কম্পানিতে কাজ পেয়েছি একটা। আস্তানা পাটনা। ঘুরে ঘুরে ওষুধের অর্ডার নেওয়াই আমাদের কাজ। কত জায়গা, কত রকম মানুষ! কাজের মধ্যেই ডুবে রইলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই আবার রাজগীর যাবার দরকার হ'লো। কাজ সেরে কুণ্ডর দিকে বেড়াতে বেড়িয়েছি। সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে। জানাশোনা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। দাঁড়িয়ে দু-চারটে কথা বলছিলাম। হঠাৎ পায়ের ওপর কী একটা জড়িয়ে ধরতেই চমকে উঠলাম। দেখলাম অস্থিচর্ম্মসার একটা খোঁড়া কুকুর কুঁই কুঁই করে আমার পা ক্রমাগত চেটে চলেছে, আর দু পা'য়ে লাফিয়ে উঠে আমার পা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে, হঠাৎ নজর পড়লো তার সামনের একটা পায়ের দিকে। কনুই থেকে বাদ হয়ে গেছে সেটা।

নিমেষে মনে পরে গেলো কয়েক বছর আগেকার একটি মধ্যাহ্নের কথা। চিনতে পেরেছে—ঠিক চিনতে পেরেছে আমায়, আর জরাজীর্ণ শরীরটা কোনমতে বয়ে নিয়ে এসে আমার পায়ে লুটাপুটি খেতে খেতে যেন বার বার সে বলে চলেছে—তুমি আমায় একদিন জল দিয়েছিলে—বাঁচিয়ে ছিলে আমায়।

কি হ'ল আমার কে জানে। গভীর যত্নে তাকে বুকে তুলে নিলাম, সমস্ত গায়ে তার ঘা। ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তও

পড়ছে বুঝি, সঙ্গের ভদ্রলোক হা হা করে উঠলেন,—' আরে মশাই করছেন কি ? জামা কাপড় যে সব রক্তে— তার কথা আর শেষ পর্য্যন্ত শোনা হ'লো না। তাড়াতাড়ি একটা টাঙ্গা ডেকে তাকে নিজের আস্তানায় নিয়ে এলাম। আসবার সময় সমস্তটা পথ তার গলা দিয়ে কী রকম গর্-র্ আওয়াজ হচ্ছিল, আর ঠক ঠক করে কাঁপছিল সমস্ত শরীরটা, ধীরে ধীরে তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলছিলাম—কোন ভয় নেই, তোকে আমি ভালো করে তুলব কেলো।' সেদিন তার নামকরণ করেছিলাম—কেলো। কেলো শুধু জিবদিয়ে বার বার আমার হাত চাটতে চাটতে সেদিন যেন তার সমস্ত অন্তর উজাড় করে দিচ্ছিল আমায়।

কয়েকদিন ওষুধ পথ্য দিতেই কেলো অনেকটা সুস্থ হ'ল, শরীরের ঘা-ও যেন অনেকটা শুকিয়ে আসছে, মাংসও লাগছে বুঝি গায়ে একটু একটু। আমি এসে উঠেছিলাম আমারই এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ী। তার সামনের ঘরটাতেই থাকি—আমি আর কেলো। আমার খাটের নীচেই কেলোর জন্যে বিছানা পাতা হয়েছে, চট ও তুলোর কম্বল দিয়ে। কেলো মহাখুসী। টান টান হয়ে শুয়ে থাকে, কখনও বা উঠে বসে পিট পিট করে আমাকে দেখে। মাঝে মাঝে দরকার মত বাইরে বেরিয়ে যায়। আবার ফিরে এসে নিজের জায়গাটিতে গুটি গুটি মেরে বসে। কখনও ভুলে আমার খাটে ওঠেনা বা অকারণে গায়ে পড়বার চেষ্টা করে না। ও যেন বুঝতে পেরেছে যা পেয়েছে তারবেশী চাইবার অধিকার নেই ওর। ওর চোখে যেন আতঙ্কের ছায়া। কোন কারণে যেন আমি অসন্তুষ্ট না হই।

আরও কয়েকটা দিন কেটে গেছে, কেলো এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। গায়ে বেশ চক চকে লোম হয়েছে—মোটা সোটা বেশ ভারিক্কি লাগে আজকাল কেলোকে। সে দিন সকালে বসে বসে চা খাচ্ছি। কেলোকে ডাকলাম-কাছে এলো। তুলে কোলে বসালাম, আর রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে টেবিলের ওপর দিতেই কেলো খেতে শুরু করলে। এই হ'ল কাল!

পরদিন থেকেই আর ডাকের অপেক্ষা নয়। চেয়ারের কাছে এসেই কুঁই কুঁই। নীচে রুটি দিলাম। খাবেনা। মানে লেগেছে—বুঝলাম, আদরকরে তার গাল টিপে বললাম—'নবাব পুত্তুর, আমি চলে গেলে এভাবে খাও-য়াবে কে তোমাকে ?' কেলো কি বুঝলো কে জানে, একবার হাই তুলে ওপরের দিকে তাকাল, ভাবটা যেন—খাওয়াবার মালিকই খাওয়াবেন, তুমি তো নিমিত্ত মাত্র!

কেলো আজকাল আমাকে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা—কেয়ারই করেনা, যেতে বললে কাছে সরে আসে, আসতে বললে দূরে চলে যায়। ডাক্তার বন্ধু ঠাট্টা করে বলেন,—'বাঃ বেশ শিখিয়েছো তো! মামুলী শিক্ষা তো সবাই দেয় এ শেখাবার মধ্যে বাহাদুরী আছে বৈ কি!'

কোথাও বেরোবার উপায় নেই, কেলো পিছু নেবে, না বললে শোনে না। ঠিক চলতে থাকে আমার পেছন পেছন, আমি দাঁড়ালে সেও দাঁড়ায়, কোন বাড়ীতে গেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। রাস্তায় কুকুরের অভাব নেই—আর তা ছাড়া কেলো তো আর সবার মত চার পায়ে সমানে ছুটতে পারবেনা। মাঝে দু একবার শিকল দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা যে করিনি তা নয়। কেলো ঠিক বুঝে নিয়েছি আমায়। লাফালাফি চেঁচামেচি করে এমন ভাব করলো যে পাশের ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তার বেরিয়ে এলেন—'কি হ'ল, মারছ কেন কেলোকে'? এতক্ষণ মারি নি, এবার শিকল খুলে একটা চড় মারলাম কেলোকে। কেলো লেজ নাড়তে নাড়তে ডাক্তারের পায়ের কাছে চলে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন বলতে চায়—'দেখলেতো কি রকম মারে আমাকে লোকটা! কেলোর হাব ভাব দেখে দুজনই হেসে উঠি।

কিন্তু সুখের সংসার আর বুঝি চলে না। আপিস থেকে জোর তাগিদ আসছে। এতদিন বসে কী করছি আমি রাজগীরের মত জায়গায়। এক্ষুনি যেন চলে আসি পাটনায়। বহুৎ কাজ পড়ে আছে সেখানে, তা ছাড়া বাইরেও যেতে হবে খুব শিগ্‌গির। অথচ কেলোকে নিয়ে যাবারও উপায় নেই, মাসের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই কাটে বাইরে বাইরে।

ডাক্তার আমার অবস্থাটা বুঝলেন—'কেলো এখানেই থাক, আমার সাধ্যমত দেখাশুনো করবো। তোমার বৌদি তো কলকাতায় গেছেন। ফিরলে অবিশ্যি'—

একটু থেমে—'ওঠিক ম্যানেজ করে নেবো—তুমি ভেবো না।'

কাল সকালেই পালাব। রাত্রে সামনে বসিয়ে কেলোকে হাতে করে খাওয়ালাম, দুধ ভাত গরাস করে কেলোর মুখের সামনে ধরছি, কেলো চুক চুক করে খেয়ে নিচ্ছে। তারপর কেলোকে অনেকক্ষণ ধরে আদর করলাম—'আমার কেলো সোণা। আমি যদি চলে যাই খুব কষ্ট হবে তোর, না?'

কেলো কি বুঝলো কে জানে! আমার কোলে মুখ গুঁজে লেজটা নাড়লো বার কয়েক। মুঠিকরে তার মুখটা তুলে ধরে বলেছিলাম—'তুই এখানে সুখে থাকবি, কোন কষ্ট হবে না তোর, কোথায় যাবি আমার সঙ্গে—আমার তো থাকবার যো নেই এক জায়গায়!'

সে রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে কেলোর সঙ্গে কথা বললাম। এক সময় বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। কেলোও আমার পায়ের দিকে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে পড়লো, আজকাল কেলো আর নীচে শোয়না, মানে লাগে হয়তো বা, শোবার আগে বুদ্ধি করে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিলাম কেলোকে। যাতে ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হয় কেলোর।

খুব ভোরে উঠেছি, কেলোকে সযত্নে তুলে নীচে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। একটা কম্বল দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিলাম ওকে।

কেলো একবার চোখ মেলে আমাকে দেখলো। বললাম—'এখনও সকাল হয়নি, কেলেসোনা আরও ঘুমো।' কেলো গভীর আরামে চোখ বুজলো।

চোরের মত চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছি। যাবার আগে শুধু ডাক্তারের হাত দু'টি চেপে ধরে বলেছিলাম—'জানি না, কেলো আমাকে ক্ষমা করবে কিনা, কিন্তু তুমি ভাই ওকে দেখো। আর চিঠিতে ওর খবর যেন পাই। ডাক্তার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

টাঙ্গা এগিয়ে চলেছে বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে। বার বার চোখে ভেসে উঠছে কেলোর মুখটা। এতক্ষণে কেলো উঠে আমার খোঁজ করছে, না এখনও নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছে সে।

—

রাক্ষুসে পিরাণহা

গৌর আদক

গভীর সমুদ্রের নীল পর্দার আড়ালে ঘুরে বেড়ায় বহু বিচিত্র, হিংস্র এবং নিরীহ প্রাণী। এই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি হিংস্র প্রকৃতির প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে রাক্ষুসে পিরাণহা যে একটি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পিরাণহার হিংস্রতার কথা শুনলে তোমরা সকলেই বেশ আশ্চর্য্য বোধ করবে। এদের হিংস্রতা এতই প্রবল যে সমুদ্রে এবং নদীতে যে সমস্ত হিংস্র প্রকৃতির প্রাণী আছে তাদের হিংস্রতা পর্য্যন্ত এই রাক্ষুসে পিরাণহার কাছে একেবারে নিষ্প্রভ বলে মনে হবে।

এই ধরণের প্রাণীর কথা শুনে তোমাদের এখন মনে হচ্ছে এটা নিশ্চয়ই কোন এক ভীষণাকৃতি প্রাণী! কিন্তু তোমরা যেটা ভাবছ, তা মোটেই নয়। এটা সমুদ্রের এক অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। চেহারার দিক দিয়ে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু হিংস্রতার দিক দিয়ে মোটেই ক্ষুদ্র নয়। এদের হিংস্রতার কথা পরে তোমাদের কাছে বলছি, এখন এদের বাসস্থান ও চেহারার কথা বলি শোন।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার সমুদ্রেই এদের বাসস্থান, তবে দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন ও ব্রেজিলের সানফ্রান্সিস্‌কো নদীতে এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। প্রাণী জগতে এদের মাছের মধ্যে ধরা হয়েছে। এদের 'পিরাণহা' বা 'পিরাই' বলা হয়। আবার কেহ কেহ এদের 'মানুষ-খেকো' মাছও বলে থাকেন।

পিরাণহা ডিমপাড়ার সময় কোন বাসা বাঁধে না। নদীর ধারে যে সমস্ত গাছের ডাল নদীর জলের ভিতর একটু ডুবে থাকে সেই সমস্ত গাছের ডালের পাতায় ওরা ডিম পাড়ে এবং এই সমস্ত ডিম গাছের পাতায় ভাসমান অবস্থায় লেগে থাকে, এবং যতদিন না ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হয়ে বেশ স্বাবলম্বী হয় ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রী পিরাণহা এগুলিকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

এদের চেহারা সাধারণতঃ মাছের মতনই হয়ে থাকে, তবে সামান্য একটু গোল এবং মুখের দু-ধারে পাশাপাশি সাজানো ছোট ছোট তীক্ষ্ণ কতকগুলি দাঁত। এদের দেহের দৈর্ঘ্য হয় এক ইঞ্চি থেকে দুই ফুট পর্য্যন্ত তবে পাঁচ ফুট লম্বা পিরাণহা মাছও দু-একটি দেখা গেছে, তবে সেটা খুবই কম।

ব্রেজিলের সানফ্রান্সিস্‌কো নদীতে এদের সবচেয়ে বেশী দেখা যায়, তবে দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন নদীর

পিরাণ্হাগুলি পৃথিবীর মধ্যে অত্যধিক ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। এই অঞ্চলের লোকেরাও পিরাণ্হার কথা শুনে অত্যধিক ভীত হয়ে ওঠে। শুধু লোকেরাই নয় পৃথিবীর যে কোন জলজন্তুই এদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকে। এরা একবার যদি কোন প্রাণীর সন্ধান পায় ততক্ষণাৎ তড়িৎ-গতিতে গিয়ে তাকে আক্রমণ করে। এরা যখনই কোন প্রাণীকে আক্রমণ করে তখন এরা দলবদ্ধভাবেই আক্রমণ করে। এদের আক্রমণ থেকে কোন প্রাণীই রেহাই পায় না এবং এরা তীক্ষ্ণ দাঁতের দ্বারা যে কোন প্রাণীর শরীর থেকে এমনভাবে মাংস তুলে নেয় যে প্রথমে কোন প্রাণীই তা টেরই পায়না। এরা একমণ ওজনেরও কিছু বেশী একটি প্রাণীকে এক মিনিটেরও কিছু কম সময়ের মধ্যেই তার মাংস খেয়ে ফেলে তাকে শেষ করে ফেলে।

তা হলে এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে জলের এই ক্ষুদ্র প্রাণীটি কত ভয়ঙ্কর, কত হিংস্র।

—
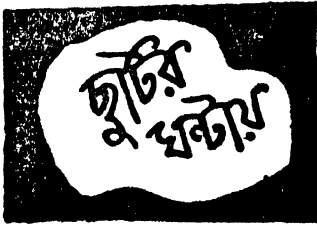
চিত্রগুপ্ত

এ বছর এই ডামাডোলের বাজারে শ্যামাপূজা আর দেওয়ালীর রাতে মনের মতো আতস-বাজী কেনা যেমন ব্যয়-বহুল, তেমনি অসুবিধার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই সেই তুবড়ি, ফুলঝুরি, রংমশাল, পট্কা প্রভৃতি মামুলী-ধরণের বাজী-পোড়ানো ছাড়া অন্য পাঁচ-রকমের সৌখিন অভিনব আতস-বাজীর কশরৎ-কেরামতী দেখিয়ে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের তাক্ লাগিয়ে দেবারও বিশেষ কোন সুযোগ-সুবিধা নেই এবারে। তাহলেও সম্বৎসরের এত বড় পার্ব্বণ—শ্যামাপূজা আর দেওয়ালীর রাতে শুধু সাবেকী-ছাঁদের তুবড়ি, ফুলঝুরি, পটকা, রংমশাল পুড়িয়েই তো আর আসর জমানো চলে না, সেই সঙ্গে অন্ততঃ দু'চারটে আজব-মজার নতুন-নতুন আতস-বাজীও চাই—নাহলে মন ভরে না!...অথচ, বাজারের হালচালও যা হয়েছে, ইদানীং বিশেষতঃ নতুন নতুন বাজী বানানোর মাল মশলা জোগাড় আর খরচ-পত্র মেটানো...তার কথা চিন্তা করলে তো উৎসাহটুকুও উবে যায় বেমালুম।

এ সমস্যার সমাধান কিন্তু করা যায় খুব সহজ উপায়েই—বিজ্ঞানের বিচিত্র-রহস্যময় আজব-কারসাজিতে।...শোনো তাহলে, সেই রহস্যময় আজব-কারসাজির কথাই বলি আজ তোমাদের। অভিনব এই আতস-বাজীর কারসাজি দেখানোর জন্য তোমাদের খুব বেশী খরচ-পত্র, আর সাজ-সরঞ্জাম জোগাড়ের ঝামেলা পোহাতে হবে না, সামান্য চেষ্টাতেই শুধু যে কাজ হাসিল করতে পারবে তাই নয়—বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন ছাড়াও পাড়ার আর সবাইকে প্রচুর আনন্দ দিয়ে রীতিমত পশার জমিয়ে তুল্বে।

এ কারসাজির কলা-কৌশল আয়ত্ত করাও নিতান্ত সহজ সাধ্য কাজ। তাই কলা-কৌশলের পরিচয় দেবার আগে, এ কারসাজি দেখানোর জন্য যে কয়েকটি সাজ সরঞ্জামের প্রয়োজন, আপাততঃ তারই একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের এই বিচিত্র আতস-বাজীর কারসাজি দেখানোর জন্য চাই—৩০ গ্রেন ফস্ফরাস্ (30 Grains of Phoshphorus), এক গামলা জল, বড় সাইজের একটি কাঁচের বোতল, এক বাক্স দেশালাই এবং বড় একটি মোমবাতি।

ফর্দ্দমতো সাজ-সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ করবার পর, কাঁচের বোতলটির ভিতরে তিন-চার আউন্স জল ভরে নাও। তারপর বোতলের জলের সঙ্গে মিশিয়ে দাও ৩০ গ্রেন ফস্ফরাস্। এবারে দেশলাই-কাঠির সাহায্যে মোমবাতিটি জ্বালিয়ে নাও এবং সেই জ্বলন্ত-মোমবাতির শিখার উপরে খুব সাবধানে ফস্ফরাস আর জল ভর্তি কাঁচের বোতলটিকে কিছুক্ষণ ধরে রাখো—নীচের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে।

জ্বলন্ত-মোমবাতির শিখার উপরে কাঁচের বোতলটিকে খানিকক্ষণ এভাবে ধরে রাখার ফলে, বোতলের ভিতরকার

ফস্‌ফরাস্‌ মেশানো জলটুকু আগুনের আঁচে বেশ তপ্ত ফুটন্ত হয়ে হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাবে—অভিনব এই আতস-বাজীর আজব-মজার কারসাজি…বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রক্রিয়ায় কাঁচের বোতলের ভিতরকার গরম-ফুটন্ত ফস্‌ফরাস্‌-মেশানো-জল থেকে ক্রমান্বয়ে বোতলের খোলা মুখ দিয়ে সজোরে ছিটকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকবে—একের পর এক ছোট ছোট বুদ্‌বুদ-ফানুষের মতো গোল ছাঁদের (small Round shaped Bubbles) একরাশ জলন্ত ভাঁটা। আজব অদ্ভুত এই আগুনের জলন্ত ভাঁটাগুলি থেকে শুধু চোখ-ঝলসানো আলোর অপরূপ রোশনাই নয়, হাউই রংমশাল ফুলঝুরি প্রভৃতি আতস-বাজীর মতো নানা রকমের সুন্দর-সুন্দর তারা আর ফুলের বিচিত্র নক্সাও ফুটে উঠবে অমাবস্যার অন্ধকার আকাশের বুকে। তখন তোমাদের হাতে-গড়া এই অভিনব আতস বাজীর আজব-কারসাজি দেখে, আশপাশের লোকজন সবাই অবাক-বিস্ময়ে মুগ্ধ এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

—

মনোহর মৈত্র

অক্ষর-সাজানোর আজব-হেঁয়ালি :

উ দা জ নৈ প্লা পু প্রী প্ন ন কা
তা রাঁ রৌ তা কো গ ং হী ট
গ আ প্রি লি উ শি রদি
প্র র্জি শ্রী র নি মা
প্ম কা র ভি নে র লো
কৈ র প্র লা ম পু জ বা শ্রী
দ্বী চী না ঙ্কা চি ভ ণ্য না
ল গ ন ই ক ভূ বা
প্রা জী ব . র ই শ্ব য় র
ঝি রী লি পু রা ণ্য ল ন

পাশের ছবিতে এলোমেলোভাবে যে একরাশ অক্ষর ছড়ানো রয়েছে, মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে সেগুলিকে যদি ঠিক মতো কায়দায় সাজিয়ে বসাতে পারো, তাহলে তোমরা সহজেই খুঁজে পাবে ভারতবর্ষের এমন কয়েকটি সুবিখ্যাত জায়গা—যেখানে এবারে পূজোর ছুটিতে তোমাদের অনেকেই হয়তো বেড়াতে গিয়েছিলে। এমনি ধরণের দুই-ডজন সুবিখ্যাত-জায়গার নাম লুকোনো রয়েছে—হেঁয়ালির-ছাঁদে-সাজানো উপরের ঐ এলোমেলোভাবে-ছড়ানো অক্ষরের রাশিগুলির জটলায়।

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের

রচিত ধাঁধা :

ত্রিবর্ণে নামটি তার—
ক্রান্তি-রেখায় আছে…
অন্তঃ ছেড়ে দিলে পাবে—
পদবীরই মাঝে।
গোড়া ছাড়লে ঘটে যাবে
চরম পরাজয়…
মধ্য বাদে, থাকবে যেটি,
সমাপ্ততেই রয়।

রচনা : শ্যামাপ্রসাদ দাস (কয়াপাট, হুগলী)
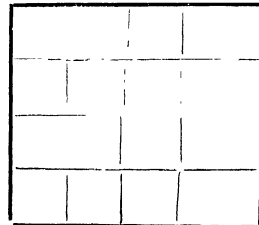
পাশের ছকটির প্রত্যেকটি চৌকোণা-ঘরে এমন কায়দা করে ১ থেকে ১৫ পর্য্যন্ত সংখ্যা লিখে বসাও যে পাশাপাশি, কোণাকুণি ও উপর নীচের দিকে অর্থাৎ, যেদিক থেকেই হোক, লাইন বরাবর চারটি বিভিন্ন-সংখ্যাকে যোগ করলে যেন যোগফল হয়—মোট ৩২। তবে মনে রেখো, প্রত্যেক-ঘরে বিভিন্ন সংখ্যা লেখার সময়, একই সংখ্যা যেন দু'বার লেখা না হয় কোনোমতেই।

রচনা : গৌতম ঘোষ (কলিকাতা)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির

উত্তর :

১। [অনিবার্য্য-কারণে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম ধাঁধাটির সচিত্র-উত্তর প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। আগামী কার্ত্তিক সংখ্যায় সেটি উত্তর যথারীতি প্রকাশিত হইবে।]

২। প্রতিধ্বনি
শাখামৃগ

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর

দিয়েছে :

রাণা, ধুনা, গৌরদেব ও লিপিকা মুখোপাধ্যায় (কলি-

কাতা), অমিয়, প্রশান্ত, রবি, অমৃত, অভি, অনিল, সুনীত, তিনকড়ি, কৃষ্ণলাল, ভাস্কর ও মৃণাল (গড়িয়া), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), যশোজিৎ ও রিণি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), অশোক, সুমিতা, বাপি, পিণ্টু ও বুতাম (বোম্বাই), ফণী, রোচনা ও দোলন সাহা (কলিকাতা), দেবব্রত ও ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় (দিল্লী), বিজয়েন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র সিংহ (হাজারীবাগ), জগদীন্দ্র, তাপস, মানস ও পুষ্প (রৌরকেল্লা), পুপু, ভুটিন ও রাজা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (গয়া), মিঠু ও বুলু গুপ্ত (কলিকাতা), রবি রায় (বোম্বাই), শৈলেন মান্না, মুরারি, অরুণ ও বীরেন্দ্র (ডালটনগঞ্জ), শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), সত্যেন্দ্র, সঞ্জয়, মুরারি, সুনীল ও অমিয় (ভিলাই), অজিত ও লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), হরিদাস, অজয়, সুমিত্রা, ভারতী, লতিকা, অসিত, পঙ্কজ ও বাণীকান্ত (রাঁচি), পৃথ্বীশ, মনতোষ, রঞ্জিত, নীলমণি ও কালিদাস সেনগুপ্ত (বর্দ্ধমান), শীলা ও প্রকৃতি মিত্র (সিমলা), ভৃগুদেব, মণ্টু, অনিলেন্দ্র দেব ও রমা দেবশর্ম্মা (বারাণসী), দুর্গা, রেণু, ক্ষেপু, খজু, মানু, খুকু, প্রশান্ত ও খোকন গঙ্গোপাধ্যায় (রাণাঘাট), স্বপনকুমার, চান্দুশাথ, রঞ্জু ভৌমিক, বাবুল, রণজিত, দীপনারায়ণ, ভূষণবাবু ও রাণু (কাঁটলিছড়া), বেণু, রুণু, খুনু ও জ্যোৎস্না চক্রবর্ত্তী (জগদলপুর), ধ্রুব, ছানু, নিরঞ্জন, স্বপ্না, সবিতা, বাবু, মণি সাহা ও সাধন দাশ (বালুরঘাট), পান্নালাল, চুনীলাল ও রেখারাণী কর (আমোদপুর), শ্যামল ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা), দ্বিজেন্দ্রমোহন সরকার (কলিকাতা)।

অপরিচিত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সকলেই জানি, পরিচিত চেয়ে
অপরিচিতের সংখ্যা বেশী,
বিদেশে গিয়াও পরিচিত গণে
পাইবার লাগি তাই অন্বেষি'।
অপরিচিতের আত্মীয়তায়,
দেখিয়াছি আমি বুক ভরে যায়।
চিরপরিচিত বলে মনে হয়—
বুঝিনে ব্যাপারে এ কোন দেশী ?

২

হরিদ্বারেতে "হর কি পারি"র
গম্বুজ ঘরে ছিলাম আমি।
এক কাশ্মীরী পরিবার সাথে,—
মনে আছে তাঁর 'গঙ্গা' নামই
সেই গৃহিণীর জননীর স্নেহ—
পুণ্য স্নানে পূত হ'ল দেহ
আজও শ্রদ্ধায় স্মরি তাঁর নাম
কত দিবস, কতই যামি।

৩

'বাসমতী' গ্রামে গিয়াছিনু আমি
ঠিক "লছমন ঝোলার" কাছে,
যার চাউলের খ্যাতির কাহিনী
দেশ ও বিদেশে প্রচল আছে।
দশ বারো ঘর অধিবাসী তার,
বাখানি তাহার আতিথেয়তার
অবাক হইয়া বলেছিনু আমি
ইহার লাগিয়া মানুষ বাঁচে।

৪

'খাইবার পাস্' বাসা এক যুবা
হাতে দিল মোর যে কলগুলি।
আমার স্মৃতির 'হিমঘরে' তাহা
চিরদিন তরে রেখেছি তুলি।
অপরিচিতের শ্রদ্ধায় দান,
জুড়ায়ে দিয়েছে মোর দেহ প্রাণ।
"ডোকরা' ছেলের 'ক্যাডেট' কোরের
কুর্ণিশ করা যায়নি ভুলি।

৫

অপরিচিত যে, চিরপরিচিত
মোদের সুহৃদ, শরণ যিনি,
বিশ্বের গুণী কবি ও কোবিদ
বল তো কজনে আমরা চিনি ?
তাঁরা যে মোদের পরমাত্মীয় ;
বলেন সদাই 'যত পার নিয়ো,'
পরিচিত চেয়ে অপরিচিতের
নিকটে যে মোরা অধিক

আনন্দময়ীর আগমনে...

এবার পুজোয় রগড় মন্দ নয় !...
চতুর্দ্দিকে টাল-মাটাল...নয়-ছয়...
অষ্ট-ভুজের কড়া-চাপের ফলে,
মায়ের জীবন যম যন্ত্রণায় জ্বলে !

শিল্পী : পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

দ্বিধা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

এবারো একটি ভালো সম্বন্ধ এল মনীষার। পাত্র কোচ-বিহারের এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। স্বাস্থ্য ভালো। বাড়ির অবস্থা ভালো। বাপ মা ভাই বোন সব আছে। কলকাতাতেই তাঁরা সব থাকেন, বয়সটা অবশ্য একটু বেশি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। কিন্তু মনীষার বয়সও তো নিতান্ত কম হল না। তারও তো এখন আটাশ। যদিও দেখতে অত দেখায় না। আর বলবার সময়ও কখনো দু বছর কখনো তিন বছর কমিয়ে বলা হয়।

তবু বয়স তো হচ্ছে। অনেক যুবক কৃতী ছেলের সঙ্গে মনীষার এখন আর সম্বন্ধ হবেনা। তারা হয় সমবয়সী না হয় ছোট হয়ে যায়। মনীষার অগোচরেই অনেকখানি পর্যন্ত কথাবার্তা এগিয়ে গেল। পাত্রপক্ষের কাছে ফোটো পাঠানো হল। তাঁরা ফোটো দেখে পছন্দ করলেন। মেয়ের গুণ যোগ্যতার কথা শুনে তাঁরা খুবই মুগ্ধ হলেন। মনীষা ইংরেজী আর ইতিহাস দুই বিষয়ে এম, এ পাশ করেছে। লাইব্রেরিয়ান-শিপ পাশ করে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে অফিসারের পোষ্টে কাজ করে। কলেজের চাকরিও পেয়েছিল কিন্তু করেনি। যার যা পছন্দ।

মেয়ের গুণপণার কথা শুনে পাত্র পক্ষ খুশি হলেন। তাঁদের কোন দাবি দাওয়া নেই। এখন সুশ্রী গুণবতী মেয়ে নিজেইতো এক সম্পদ। তার জন্যে কে আবার পণ যৌতুক চাইতে যায়?

অতুলবাবু যা পারেন তাই দেবেন।

পাত্র নিজে এসে কনেকে একবার দেখতে চান। এসে আলাপ পরিচয় করে যাবেন।

ছেলেও মেয়েকে দেখবে মেয়েও ছেলেকে দেখবে। পরস্পরের মনোনয়নটাই তো আসল।

কিন্তু সব শুনে মনীষা বেঁকে বসল 'তোমরা কেন এসব ব্যবস্থা করেছ? আমি তো বলেই দিয়েছি আমি বিয়ে করব না। অনীতা সুনীতার বিয়ে দাও তোমরা। আমার জন্যে কাউকে ভাবতে হবেনা।'

মনীষার বাবা অতুলবাবু চটে উঠলেন, 'কেন, তুই এমন কী হয়েছিস তোর জন্যে কেউ ভাববেনা? তুই কি এ বাড়ির কেউ নোস?'

মনীষা একটু হেসে জবাব দেয় 'আমিতো এই বাড়িরই বাবা। এই বাড়িতেই থাকতে চাই।'

অতুলবাবু বললেন, 'তাই কি হয়? মেয়ে বড় হয়ে গেলে কি চিরকাল তাকে কাছে রাখা যায়! না কি রাখাটাই সঙ্গত। তোর বিয়েথা দেব। তোর আলাদা ঘর সংসার হবে, ছেলে মেয়ে হবে। আমরা সেখানে যাব।

দু চোখ ভরে দেখব। এর চেয়ে বেশি সুখ বাপ-মার আর কী হতে পারে?'

অতুলবাবু মেয়ের সামনে একটি ভবিষ্যৎ সুখের চিত্র তুলে ধরেন। সে চিত্র সহজ স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষ যা চায় তাই।

কিন্তু তাঁর বিদুষী মেয়ের সে চিত্র মনঃপূত নয়।

পাত্রপক্ষকে নিমন্ত্রণ করে আনার দিন দু'চার দিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেলবেন বলে অতুল চক্রবর্তী আজ মনে মনে পণ করেছিলেন। তাঁর পণরক্ষা আর হয় না। রাগ করে তিনি বেরিয়ে যান। বেরিয়ে বেশি দূর যেতে পারেন না। বোসেদের বাড়ির রোয়াকে গিয়ে বসেন। পোষ্টাল সার্ভিস থেকে রিটায়ার করার পর তাঁর গতিবিধি এখন সীমিত হয়ে গেছে। রোয়কে গিয়ে সমবয়সী আরো দুজন বৃদ্ধের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলেন। সকালে সন্ধ্যায় পাড়ায় পার্কটাতেও যান। একটি কি দুটি রাউণ্ড দিয়ে কোন একখানি বেঞ্চে বসবার জায়গা করে নেন। তার পর পুকুরটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। তিনি যেন এখন সংসারের বাইরে।

বাবা চলে গেলে মার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় মনীষাকে।

মনোরমা বললেন 'সত্যি এখনো যদি তুই নিজের খেয়াল খুশি নিয়েই থাকিস তা হলে কী করে চলে বল তো দেখি।'

মনীষা জবাব দিল "শুধু একজনের জন্যেই কি সব অচল হয় মা? আমি তো বলেছি তোমরা অনীতা সুনীতার বিয়ে দাও।'

অনীতা ইনকামট্যাকস্ অফিসে চাকরি করে। ওর এক মাদ্রাজী কলীগকে ও ভালোবেসেছে। তার সঙ্গে ঘোরা-ফেরা বেড়ানো সিনেমা দেখা সবই চলে। বিয়েটা যে কোন মুহূর্তে ওরা করে ফেলতে পারে। বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছে অনীতা। কেন যে করে না সেই জানে। সেও মাঝে-মাঝে মনীষার দোহাই দেয়। হেসে বলে 'দিদির একটা কিছু হয়ে যাক। তারপর আমরা বিয়ে করব।'

সুনীতা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে এম, এ পড়ে। বিষয় কমপ্যারেটিভ লিটারেচার। তার ছেলে-বন্ধু একাধিক। কিন্তু কাউকে বিয়ে করার কথা সে ভাবেনা। এ সব প্রসঙ্গ তুললে সে বলে বন্ধুরা বন্ধুই। তাদের কাউকে স্বামীর আসনে বসানো যায় না কি?'

মনীষার দুই ভাই সমীর আর সুশান্ত ওরাও এখন যুবক, সমীর কাজ করে এল আই সিতে। সুশান্ত রেডিওতে। ওদের বিয়ের প্রসঙ্গ অবশ্য এখনো ওঠেনা। বোনদেরই কারো বিয়ে হয়নি। ওদের বিয়ের এখনই কি। বন্ধু বান্ধব বান্ধবী দুজনেরই আছে। সময় কাটাবার ভাবনা নেই।

বিয়ে সম্বন্ধে ছেলেমেয়ে কারোরই কোন আগ্রহ দেখা যায় না। শুধু বুড়ো বাপমাই মাঝে মাঝে বিয়ের কথা তোলেন। আর আক্ষেপ করে বলেন 'ওরা কেউ সংসারী হয়েছে তা বোধহয় আমরা আর দেখে যেতে পারব না।'

বাড়ির সবারই ধারণা বড় মেয়ে মনীষাই এই অচল অবস্থার অবসান ঘটাতে পারে। সে যদি ধাঁ করে কারো গলায় মালা দিয়ে বসে তাহলেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

কিন্তু মালা দেওয়া মনীষার পক্ষে তেমন সহজ হয় কই!

'তোর মনের ইচ্ছাটা কী তাই বল।'

মনোরমা যেন মেয়ের মনের কথাটা আজ জোর করে বের না করে ছাড়বেন না।

মনীষা বলে, 'কেন বিরক্ত করছ মা? তুমি তো জানোই সব। আমি তো বলে দিয়েছি আমি এখন বিয়ে করব না।'

'কোনদিনই করবিনে?'

'সে কথা তো বলিনি। যখন সময় হবে তখন করব।

'আর করবি কি বুড়ী হলে?'

মনীষা হাসে, 'তাই বা মন্দ কি। পাকা চুলে সিঁদুর পরব।'

মনোরমা খানিকটা চুপ করে থেকে বলেন, 'আমি ভাবছি অতীনকে এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দেব।'

মনীষা এবার তীব্র দৃষ্টিতে মার দিকে তাকায়। তার-

পর তিক্ত স্বরে বলে, 'বেশ তো দিয়ো। ও কথা তো কতদিন ধরেই বলছ। দাও না কেন?'

মনোরমা বলেন, 'দেওয়াই উচিত ছিল।'

রাগ করে তিনি উঠে চলে যান।

বিকালের ড্রয়িংরুমটা আবার খানিকক্ষণ খালি পড়ে থাকে। সরু গলিতে জানলা দিয়ে লোক চলাচল দেখা যায়।

মনীষা সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

অনীতা এসে সামনের সোফাটায় বসে। ছুটির দিন। সে বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে।

অনীতা ডাকে 'দিদি?'

মনীষা হেসে বোনের দিকে তাকায় 'কী রে?'

'বেরোবি না?'

'না।'

'ছুটির দিনগুলি কেন যে এমন করে তুই বসে বসে কাটাস।'

মনীষা জবাব দেয় 'ঘোরাঘুরির জন্যে তো আর ছটা দিনই আছে।'

'তাই বা তুই ঘুরিস কোথায়? অফিসে যাস। ঘণ্টা সাতেক থাকিস কি দরকার হলে আরো বেশি। তারপর তো ঘরে এসে চুপচাপ বসে থাকিস।'

মনীষা মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলে, 'বসে থাকি?'

অনীতা হেসে বলে, 'নাও বাবা, তোমার মত কর্মী মেয়ে আর নেই। তুমি মার যত সাহায্য করো, রান্নাবান্না ঘরদোর গুছানোর কাজ করে দাও, আমরা কেউ তা করিনে, হলতো!'

মনীষা হাসে, 'আমি কি তাই বলছি? কাজ তো তোরাও করিস।'

অনীতা বলে, 'কিন্তু তোর মত সুখ্যাতি কি আমাদের ভাগ্যে আছে?'

দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ অনীতা বলে, 'বিয়েটা করে ফেল না দিদি।'

'কাকে?'

অনীতা একটু ঢোক গিলে বলে, 'ধরা যাক ওই একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে।'

মনীষা বলে, 'করলে তো করা যায়। কিন্তু ইচ্ছে হয় না। আমার মনে হয় আমি কাউকে সুখী করতে পারব না। নিজেও সুখী হব না।'

অনীতা ধমকের সুরে বলে, 'এ তোর বাড়াবাড়ি। সুখী না হওয়ার কী হয়েছে? তোর মনের ওপর একটা ছায়া পড়ে আছে। সেই ছায়াটা জোর করে তোকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তাহলেই সুখী হবি তুই। মনে জোর আন দিদি। আর না হয় যে তোর পথের মাঝখানে বসে আছে তাকে হাত ধরে ডেকে ঘরে নিয়ে আয়। তাকে তুই বিয়ে কর।'

মনীষা বলে, 'ছিঃ।'

অনীতা বলে, 'ছিঃ কেন। দোষটা কিসের? ওসব সম্পর্কের ট্যাবু আমি হলে মানতাম না। আমি তাকে বিয়ে করতাম। ঘর বাঁধতাম। ছেলেমেয়ে হত। তাদের মানুষ করতাম। লোকে কি বলত না বলত আমি কিছুই গ্রাহ্য করতাম না।'

মনীষা বলে, 'অত সোজা নারে অনি, অত সোজা নয়। তুই যা ঘুরে আয়।'

অনীতা যেতে যেতে বলে, 'আমি যা বললাম তাই সবচেয়ে ভালো। ভেবে দেখ। তুই এখান থেকে চলে যা। সব শাসন বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়।'

একটু বাদে অনীতা নিজেই বেরিয়ে পড়ে। যাওয়ার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যায়।

অনীতা একই সঙ্গে বোন আর বন্ধু। সব ব্যাপারই সে জানে ওর কাছে কিছুই আর গোপন নেই। ও সব জানে। কিন্তু ও যা করতে পারে তা মনীষা করতে পারে কই।

শুধু তো সম্পর্কের ট্যাবুই নয়।

ছোট মাসী সুরমার সঙ্গে ঠিক ওই রকম বন্ধুত্বই ছিল মনীষার। বোনের মত বন্ধু। বয়সে তিন বছরের বড় ছোট মাসী, মায়ের সামনে তাকে মাসী বলত। নিজেরা যখন ঘুরত বেড়াত গল্প করত তখন ডাকত নাম ধরে। বেশির ভাগ মনীষাদের কাছেই থাকত। দাদা বউদির সংসারে তার বেশি মন টিকতনা।

তারপর আই, এ, পাশ করতে না করতেই তার নিজের সংসার হল। অতীন করগুপ্তকে সে ভালোবেসে বিয়ে করল। এই বিয়ে নিয়েও কত হাঙ্গামা। ব্রাহ্মণ

হয়ে অব্রাহ্মণকে বিয়ে করছে আত্মীয় স্বজন কেউ সমর্থন করেনি। করেছিল মনীষা। আরো দুজন বন্ধুর সঙ্গে রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে সেও সাক্ষী হয়েছিল।

অতীনদা ছিল তাদের সবারই বন্ধু।

সবাই তার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে গল্প স্বল্পও করেছে। হঠাৎ ছোট মাসীকে বিয়ে করে সম্পর্কে সে মেসো হয়ে গেল। কিন্তু তাই বলে মনীষার মুখের সম্বোধনটা পালটাল না। অতীনদা অতীনদাই রইল।

ওদের বিয়ের পরেও মনীষা কতদিন ছোট মাসীকে নিয়ে ওদের পাবলিসিটি অফিসের সামনে দাঁড়িয়েছে। ছুটির পরে অতীন বেরিয়ে এসেছে। তারপর তিনজনে মিলে বেরিয়েছে আমোদ আহ্লাদ করতে।

তারপর ধীরে ধীরে ছোট মাসীর মনে হিংসার ভাব দেখা দিল। সে যত হিংসুটে হয়ে উঠতে লাগল অতীন তত স্ত্রীর হাত থেকে পরিত্রাণ আশায় মনীষার সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে চলল। মনীষা ওকে কতদিন বারণ করেছে, 'তুমি এসব কোরো না। একা একা আমার অফিসে এসো না। ফোনটোন কোরোনা। ছোট মাসী যখন কষ্ট পায় তাকে কষ্ট দিয়ো না।'

কিন্তু অতীন নিষেধ শোনেনি। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে যেন তাকে মনীষার কাছে টেনে নিয়ে আসত। সে কি মনীষা নিজেই? কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়। মুখে সে নিষেধই করত। অতীন লুকিয়ে লুকিয়ে এলে তিরস্কারই করত। তবু আসত অতীন। ওকে আসতে দিতে হত।

শেষ পর্যন্ত যা হবার হল। ষ্টোভের আগুনে পুড়ে মারা গেল ছোট মাসী। সবাই জানে আত্মহত্যা। মুখে বলে দুর্ঘটনা।

তারপর অনেকদিন অতীনের সামনে মনীষাদের বাড়ির দোর খোলা ছিল না। সে নিজেও বড় একটা আসত না। এলে কোন আদর আপ্যায়ন জুটতনা তার ভাগ্যে।

এখনও কমই জোটে। এখন সপ্তাহে একদিন করে আসে অতীন। শনিবার আসে না হয় রবিবার। এসে বাইরের ঘরেই বসে থাকে। ভিতরে বড় একটা যায় না। চা খায়। কোন দিন বা চায়ের সঙ্গে অন্য কিছু।

অতীন সপ্তাহে একটি সন্ধ্যা এখানে এসে কাটিয়ে যায়। বই-টই দেখে কাগজ-পত্র পড়ে। মনীষার সঙ্গে দু-চারটি কথা হয়। প্রায়ই সাধারণ মামুলি কথা।

অতীনকে এ বাড়িতে সমাদর করে যেমন কেউ ডাকে না, তাকে অপমান করে তাড়াবার কথাও তেমনি কারো মনে হয় না। মনে হলেও সে সাহস কারো নেই। এখনো মনীষাকে সবাই ভয় করে। তার ব্যক্তিত্বই বাড়িতে সব চেয়ে বেশি। সে যখন কলেজে পড়ত তখনো সে চাকরি করে টিউশনি করে। তখনই বাবার সে প্রধান সহায়িকা। এখনো তাই। তার প্রিয়পাত্রকে কারো কিছু বলবার সাধ্য নেই।

তা ছাড়া অতীনকে কিছু বলতেও মায়া হয়। ভারি শান্ত-শিষ্ট ভদ্র চেহারা। অমায়িক স্বভাব। ওর দুর্ভাগ্যের জন্যে সহানুভূতিই আসে। আড়ালে ওর স্বভাব সম্বন্ধে যে যাই বলুক, সামনে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। ওর মুখ সাধুসন্তের মুখ।

তবু অতীনকে শুধু বাড়িতেই আসতে দেয় মনীষা। গোপনে দেখা সাক্ষাৎ মোটেই অনুমোদন করে না।

বিনয়ের ভয়ে নয়। নিজের মনেই তার কিসের একটা দ্বিধা আছে। সে দ্বিধা তার কিছুতেই কাটতে চায় না। যখন অতীনের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা কি বিয়ের কথা সে ভাবে তখনই ছোট মাসী তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তার সারা দেহ আগুনে ঝলসানো। অথচ চোখ দুটি বাঁচবার ইচ্ছায় ভরা।

যখনই অন্য কাউকে বিয়ের কথা সে ভাবে অতীনের ছায়ামূর্তি মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। অনিন্দ্যসুন্দর তার মুখ। সে মুখ সৌহৃদ্যে স্নিগ্ধ। মমতায় মধুর। মনেই হয়না তার দ্বারা কারো কোন অনিষ্ট হয়েছে কি হ'তে পারে। এখনো দিব্যকান্তি দেবদূতের মত তার বরতনু।

কাল আসেনি অতীন। আজ নিশ্চয়ই আসবে। আজ সে না এসে পারবে না। মনীষা কি তার জন্যে অপেক্ষা না করে পারে?

নারী ঃ দুই যুগে

মৈত্রেয়ী মুখার্জী

"আমি সম্রাজ্ঞী, আমি সকল সম্পদ সংগ্রহ করি ও ধরে রাখি। আমিই চৈতন্যময়ী। আমাকেই দেবতারা বহুল স্থানে বিপুলভাবে সর্বান্তর্যামী করে স্থাপন করেছেন।" একদিন একটি বেদমন্ত্রের বাংলা অনুবাদ আমার হাতে এসে পড়লো। বেদমন্ত্রে কি বলতে চাইছেন 'বেদস্রষ্টা,' জানবার জন্যে পড়তে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ চোখ পড়লো দেবী সূক্তের ওপর। পড়ে দেখলাম, আমাদের আরাধ্য দেবীকণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে ঐ শ্লোক। দেবী আরও বলেছেন,—"মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়কেও ধারণ করে আছি। যারা আহার করছে তারা আমার মধ্য দিয়ে আহার করছে। যে দর্শন করে, শ্রবণ করে, জীবন ধারণ করে তাও আমার মধ্য দিয়ে। পিতাদ্যৌকে আমিই জন্মদান করি—তারও শিরোভাগে আমার জন্মস্থান।" এই উক্তি ভারতবর্ষের নারী কণ্ঠ থেকেই উচ্চারিত হয়েছিলো বৈদিক যুগে।

দুর্গা মণ্ডপের প্রতিমার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম ভারতবর্ষের নারীর প্রতীক এই শক্তিমূর্তি। সামনের ঐ প্রতিমার দিকে তাকিয়ে এক আশ্চর্য অনুভূতিতে ডুবে গেলাম, যেন আমার দেহের কোন অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু অনুভব করার মত মন। তন্ত্রধারীর কণ্ঠনিঃসৃত শ্লোক আমার মনকে নিয়ে গেলো সেই বৈদিকযুগে।

স্বর্গরাজ্যের রাজা ইন্দ্র, অত্যাচারিত অসুরের কাছে পরাজিত হয়ে বন্দী হলেন। স্বর্গ শাসিত হতে লাগলো অসুরের নির্মম শাসন যন্ত্রে। দেবতারা লাঞ্ছিত অত্যাচারিত হতে লাগলেন। অসভ্য বর্বর শয়তানের হৃদপিণ্ডযুক্ত দৈহিক শক্তিশালী অসুরের অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেলো। তাদের পরাজিত করার ও ধ্বংস করার মত শক্তি দেবতাদের না থাকায়, তাঁরা সাহায্য প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন তিন মহাজ্ঞানী, অমিত তেজের ও শক্তির অধিকারী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের দ্বারে। দেবতাদের প্রতি নির্দয় উৎপীড়নের কাহিনী শুনে, তিন মহাজ্ঞানীর অন্তর ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো, এবং সেই প্রচণ্ড ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হ'ল অমিত তেজোরাশি। তারপর সেই তেজোরাশির সমষ্টিতে সৃষ্টি হ'ল এক নারী মূর্তি। দেবতারা সাজালেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র দিয়ে। তেজঃপুঞ্জের দ্বারা গঠিত ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেবী দুর্গা যুদ্ধ করে মহিষাসুরকে বধ করে দেবতাদের উদ্ধার করে আনলেন যন্ত্রণাময় অন্ধকার থেকে আলোকময় যন্ত্রণাহীন জীবনে। দেবতাদের কাছ থেকে দেবী দুর্গা পেলেন মাতৃত্বের সম্মান।

এই মহিষাসুর কে? একে কে সৃষ্টি করিলেন? আর কোথায় সেই পাতালপুরী, যেখানে ভয়ঙ্কর পশুশক্তি সম্পন্ন অসুরদের রাজ্য? দেবতারাই বা কারা? স্বর্গরাজ্য! সে কোথায়?

দেবতা আর অসুর এরা একই ঈশ্বরের পুত্র। স্বর্গ, সে আছে পৃথিবীতে। আর নরক তাও আছে এই পৃথিবীতে। ঈশ্বর-সৃষ্ট পৃথিবীতে শয়তানের প্রভাব কিছু রয়ে গেছে। শয়তানের প্রভাব হচ্ছে ষড়রিপু,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। এই ষড়রিপুর প্রভাবে মানুষ শয়তানের হাতের খেলনা হয়ে যায়। মানুষ তখন সৃষ্টিকর্তার বশ্যতার বাইরে চলে যায়। যে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে শয়তানে রূপান্তরিত হয়, তখন তাকেই অসুর নামে অভিহিত করা হয়। এরা ক্রোধে পৃথিবীকে রক্তাক্ত করে তোলে। অত্যাচারে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলে পৃথিবীকে। হিংসায় কালো করে ঈশ্বরের আকাশকে। নির্দয়তায় বিষাক্ত করে ফেলে ঈশ্বরদত্ত পবিত্র বাতাসকে। মদ-গর্বে গর্বিত হয়ে হত্যা করতে আসে ঈশ্বরকে। এই যে সুন্দর আর অসুন্দরের দ্বন্দ্ব, সত্য আর অসত্যের বিরোধ, সদয় আর নির্দয়ের যুদ্ধ, এই নিয়েই হয়ত মহাকবি রচনা করে গেছেন, অসুর আর দেবতাদের যুদ্ধের কাহিনী, রূপকের মাধ্যমে।

মানুষ যখন ঈশ্বরকে অস্বীকার করে শয়তানের বশীভূত হয়ে সুরকে হত্যা করে অসুর হয়ে ওঠে, স্বর্গকে নরকে নামাতে চায়, হিংসায়, অশিক্ষায়, অজ্ঞানতায় পশুত্বে পরিণত হয় তখন 'তাকে' সত্য, সুন্দরের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারে একমাত্র 'নারী' মানে 'মা'। মাতৃগর্ভের ভ্রূণ মায়ের রক্ত শোষণ করে, পরিপুষ্ট হয়ে শিশু মানব-রূপে ভূমিষ্ঠ হয়। মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে সংগ্রহ করে 'শিশু' তার জীবনের বাতাস, মানে জীবনী শক্তি। তারপর মায়ের কোলে, মাতৃদুগ্ধ পান করে, পৃথিবীর মাটিতে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি পায়। মায়ের কণ্ঠ থেকে শিশুর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় শব্দমালা। তারপর সেই শিশু বালকে পরিণত হয়, বালক থেকে যুবকে পরিণত হয়। সেই যুবক যদি দেবতার মনোভাব না পেয়ে শয়তানের প্রভাবে পরাজিত হয়, তবে সেই সন্তানকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে একমাত্র মাতৃশক্তি। তাই আমরা চণ্ডীর শ্লোকে দেখতে পাই, অত্যাচারী মহিষাসুরকে পদানত করতে প্রধান ত্রিশক্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাঁদের মিলিত শক্তি দিয়ে গঠন করলেন এক বলিষ্ঠ অসীম শক্তির অধিকারিণী মাতৃ-মূর্তি। এই মাতৃশক্তিই সন্তানকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। (এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, সব সন্তান তো মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে কেন সেই সন্তান শয়তানের প্রভাবে পরাজিত হয়? তার উত্তরও আমরা পাই চণ্ডী থেকে। মহিষাসুর মহিষ-গর্ভজাত ছিলো। মানে মা যদি অশিক্ষার, অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থাকে তাহ'লে সন্তানও অজ্ঞানতার অন্ধ-কারে ডুবে থাকবে আর অন্ধকার হচ্ছে শয়তানের উপযুক্ত রাজ্য। তিন দেবতা তাই শক্তি আর জ্ঞানের আলো দিয়ে তৈরী করেছিলেন ভারতবর্ষের কন্যা দেবী দুর্গাকে।

আর আজ? আজ মণ্ডপের শক্তিমূর্তি সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম,—ভবিষ্যৎ পুরুষের 'মা'কে।

অতি আধুনিক 'স্লিম ফর্মে' নিজেকে তৈরী করতে তরুণীরা রক্তহীন ফ্যাকাশে দুর্বল জীবে পরিণত হয়েছে। সন্তানদের রক্ষা করার কথা ছেড়ে দিলাম, নিজেদের রক্ষা করার শক্তি হারিয়েছে। শক্তির প্রতিযোগিতা এরা প্রায় করে না, সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ আসন পাওয়ার জন্যে এদের মধ্যে অনেকেই কিম্ভূতকিমার সাজতে দ্বিধা করে না। এদের চঞ্চল চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে একে অন্যের প্রতি, 'কে কতখানি আধুনিক সাজে সাজাতে পেরেছে নিজেকে, কার ব্লাউজের কাট্ কতখানি বিপদজনক সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে, স্লিমজনিত দেহের ফর্মেশনে ফ্যাকাশে মুখে 'কে' কতখানি লাল, কালো রং ব্যবহার করেছে তারই অন্বষণে।

(কিন্তু কেন, কেন এই প্রতিযোগিতা? ভবিষ্যৎ পিতারা কি ভবিষ্যৎ মাতাদের এই ভাবেই দেখতে চাইছেন?)

পূজা মণ্ডপে শক্তিপূজার দেবী মূর্তির চেয়ে, এদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে মণ্ডপের সাজ-সজ্জা, আর প্রতিমা দেখাকে অতি সাধারণ মেলার পুতুল দেখার মত সমালোচনা কর-ছেন। পূজা দেখতে আসা আর থিয়েটার দেখতে যাওয়ার পার্থক্য এরা বুঝতে পারে না।

চোখ ফেরালাম অন্যদিকে। দেখলাম বর্তমান মায়েদের। এঁরা জীবনের মাঝ ও শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন। সংসারের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে, ও বেঁচে থাকার মূল্য হিসাবে দিয়েছেন স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও বয়স। জীবনের স্বপ্ন গেছে ভেঙে জীবনের দুর্গম পথের বাঁকে

থাকে। এঁরা চাইছেন,—জীবনের বাকি পথটা যাতে দুশ্চিন্তাহীন হয়ে অতিক্রম করতে পারে, এমন অর্থ ও প্রতিপত্তি যেন মা দেন। তাঁদের সন্তানেরা যেন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে থাকতে পারে, তারই প্রার্থনা জানাচ্ছেন। এঁদের 'কে' বলে দেবে,—সন্তানকে স্বাচ্ছন্দ্যময় দীর্ঘজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, আগে মায়েদের হতে হবে জ্ঞানী, বিদুষী, শক্তিশালিনী মাতৃরূপে। অজ্ঞানতায়, অশিক্ষায় দুর্বলতায় ভেঙ্গে পড়ে, অসহায়ের মত দেবীদুর্গার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে সন্তানের শুভ করা যায় না। সন্তানকে শক্তি ও জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করতে হবে, তবেই সন্তান পাবে সম্মান ও প্রতিষ্ঠাপূর্ণ দীর্ঘ জীবন।

মণ্ডপবেদীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম,—একটু আগে যে তন্ত্রধারীর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হচ্ছিল,—

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংহিতা, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কন্যারূপেণ সংস্থিতা, যা দেবী সর্বভূতেষু বিদ্যারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ইত্যাদি দেবী স্তব, তিনিই বলছেন,—

"ছিঃ ছিঃ! আজকাল মেয়েরা লজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছে। হবে না? লেখাপড়া শিখে মেয়েরা সব, পুরুষের মাথায় পা দিয়ে চলছে। মা ঠাকুরমার আমল থেকে দেখে আসছি, মেয়েরা রান্নাঘর আর আতুড়ঘরেই চলাফেরা করে আসছে ছেলে কোলে খুন্তি হাতে। আর আজকাল মেয়েরা স্বাধীন হচ্ছেন। শিক্ষিত হচ্ছেন, এখন ব্যাগ বগলে, কলম হাতে অফিস কাছারিতে যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছেন।" আশ্চর্য হয়ে ভাবি এঁর সামনে এখনো রয়েছেন শক্তিতে দেবী দুর্গা, ব্যবসাতে লক্ষ্মী, বিদ্যায় সরস্বতীর প্রতিমা। ঐ মূর্তি দেখে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করেও ওঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার কত শূন্য হয়ে আছে।

ভবিষ্যতের পিতারা চাইছেন না ভবিষ্যৎ মায়েদের মাতৃমূর্তি, তাঁরা চাইছেন নারীকে শুধুমাত্র বিলাস-সঙ্গিনীরূপে। তাই ভবিষ্যৎ মায়েরা নিজেকে তৈরী করছে ক্লাব, ক্যাবার, পার্টির উপযুক্ত ছাদে। এরা পরছেন টাইট পোষাক, খাচ্ছেন বিদেশী খানা, পান করছেন শেরী, স্যাম্পেন, চলছেন পড়ি পড়ি ধরো ধরো ভাবে, নাচছেন টুইষ্ট, কথা বলছেন আধো আধো স্বরে।

অতীত পিতারা চীৎকার করছেন, মেয়েরা বাইরে বেরিয়ে সমাজ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে, অতএব রান্নাঘরে ও আঁতুড়ঘর ফিরে যাও। আর ভবিষ্যৎ বলছেন চলে এসে, আমার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাচো আর গাও।

প্রায় ছ'শো বছর ধরে পরাধীন ভারতবর্ষের মেয়েরা অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ঘোমটায় মুখ ঢেকে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে ছিলো। আজ বৈদিক যুগের সেই তেজোময়ী নারীসমাজ পঙ্গু হয়ে পড়েছে। অতীতের সংস্কার আর বর্ত্তমানের বিদেশী প্রভাবের ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ভাবছি কবে আসবেন সেই সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ মন্ত্রে দীক্ষিত মহাজ্ঞানী, শক্তিশালী তেজঃপুর্ণ বলিষ্ঠ পুরুষ, যিনি গঠন করবেন এক শক্তিময় মাতৃজাতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মতন।

—

নেপথ্য নায়িকা

মীরা রায়

একটি ফুলের সম্পূর্ণ পরিস্ফুটনায় তাকে আবৃত করে রাখা বৃন্ত ও বৃতির অনেকখানি সার্থকতা থাকে? কবি বা সাহিত্যিকের জীবন সাধনার সাফল্যেও তাদের উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনীর অনুকূল সহযোগিতা যে প্রভূত অবদান যোগায় তার নজীর ইতিহাসের পাতায় পাতায়। মহৎ সৃজনী শক্তির মূলে প্রেরণা ও উৎসাহ দান করে তার পুষ্টি ও সাফল্য সাধনে এই সব নেপথ্যচারিণীদের অলক্ষ্য অবদান একান্তভাবে স্বীকার্য। উনিশ শতকের বিখ্যাত ইংরাজ কবি ব্রাউনিংএর জীবনে এই সৌভাগ্যলাভ ঘটেছিল। তাঁর কর্ম ও মর্ম সঙ্গিনী পত্নী তদানীন্তন বিখ্যাত মহিলাকবি এলিজাবেথ ব্রাউনিং এর সর্বতোভাবে সহযোগিতায় কবির জীবন-সাধনা চরম সফলতায় পূর্ণ হয়ে

উঠেছিল। তাই তাঁর জীবনের নেপথ্যচারিণী এলিজাবেথকে না জানলে তাঁর জীবন পর্য্যবেক্ষণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

উনিশ শতকের বিশিষ্ট মহিলা কবিদের মধ্যে এলিজাবেথ ছিলেন অন্যতমা। যদিও আজকের যুগে পাঠকসমাজ তাঁকে এক মহাকবির রোমাণ্টিক প্রেমিকা ও জীবনসঙ্গিনী হিসাবেই বেশী স্মরণ করে, তবুও তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মূল্যায়নে তাঁর কাব্য প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর সর্বকালে বর্ত্তমান। এলিজাবেথ ও রবার্ট ব্রাউনিং-এর প্রেমোপাখ্যান একটি সুন্দর সরস আবেদন পূর্ণ কাহিনী। দুজনের প্রেমের দূতিয়ালী করেছিল পরস্পরের কাব্যপ্রীতি ও কাব্যচর্চা। তাঁদের দুজনকে কেন্দ্র করে যে দুখানা সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক ইউরোপে অভিনীত হয়েছে তাদের নাম 'The barretts of walpole Street, এবং Robert & Elizabeth. ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে জমিদার এডওয়ার্ড ব্যারেটের প্রথমা কন্যা এলিজাবেথের জন্ম হয়। অতি অল্প বয়স থেকেই তাঁর কাব্য প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি The battle of marathon' কবিতাটি রচনা করেন, তাঁর প্রথম রচনাটিই উৎকর্ষতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

ভিক্টোরিয় যুগের কঠিন শাসন ও রক্ষণশীলতার মধ্য দিয়ে এলিজাবেথের কৈশোর জীবন অতিবাহিত হয়। মধ্য লণ্ডনের উইমপোল স্ট্রীটে তাঁরা সপরিবারে বসবাস করতেন। এখানে তাঁর বাবার কাছে তদানীন্তন সমাজের বহু গণমান্য ব্যক্তির যাতায়াত ছিল। কিন্তু তাঁর বাবার কড়া প্রহরার জন্য এবং নিজের ভগ্নস্বাস্থ্যহেতু অধিকাংশ সময়ই তিনি গৃহকোণে বন্দী জীবন যাপন করতেন। একসময় তাঁর সহোদর ভাই এডওয়ার্ডের সঙ্গে প্রবল বাগবিতণ্ডা হয়, এবং তার পরই এডওয়ার্ড জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনায় এলিজাবেথ তীব্র শোকে ও অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়েন। জীবনের সবচেয়ে গভীর বীতশ্রদ্ধ মুহূর্তে আকস্মিক তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতির সৌভাগ্য সূচনা ঘটে।

বন্দী জীবনের অবসর মুহূর্ত্তে তিনি যে সব ছোট ছোট কাব্য রচনা করেছিলেন সেগুলি একটি গ্রন্থের মধ্যে সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থটি মনীষীমহলে উচ্চপ্রশংসা লাভকরে এবং সঙ্গে সঙ্গে এলিজাবেথের খ্যাতি সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের তরুণ কবি রবার্ট ব্রাউনিং এলিজাবেথের রচনার একজন বিশেষ গুণমুগ্ধ অনুরাগী হয়ে উঠেন। এলিজাবেথ কার্লাইল, এ্যাডগার এ্যালান পো প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে অভিনন্দনবাণী লাভ করতে লাগলেন, সেই সঙ্গে ব্রাউনিং-এর সঙ্গেও তাঁর পত্রালাপ চলতে লাগল এবং ব্রাউনিং শুধু পত্রালাপ করেই ক্ষান্ত হলেন না, উইমপোল স্ট্রীটে ব্যারেট পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা সুরু করে দিলেন। এলিজাবেথের বন্দী জীবনে তিনি এক নতুনত্বের সন্ধান দিলেন। দুজন দুজনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন, সকলের অলক্ষ্যে কাব্যের তরী বেয়ে দুটি হৃদয় এসে মিশে এক হয়ে গেল। পিতার কঠিন শাসন ও রক্ত চক্ষুর প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে যেদিন তাঁরা পরিণয়বন্ধন স্বীকার করলেন, সেদিনের সেই অভূতপূর্ব আনন্দের মুহূর্ত্তটি কবি ব্রাউনিং মাত্র কয়েকটি কথায় ডায়েরীতে বন্দী করে রাখলেন "An appointment between 10-45 to 11-15 A. m." মাত্র ঐ কয়টি অক্ষর 'appoinmtment' এর মধ্য দিয়ে কবির জীবনে পরম ঈপ্সিত প্রাপ্তির চরম আনন্দের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল। প্রতিপত্তিশালী দুর্দ্ধর্ষ পিতার ইচ্ছার প্রতিকূলে বিবাহ, সুতরাং এলিজাবেথের বিবাহোত্তর জীবনের পথ যে কুসুমাকীর্ণ হয়নি তা বলাই বাহুল্য। পিতার সঙ্গে প্রায় সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে তিনি গোপনে নিজের বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হন, তিক্তব র্ত্তমানকে পরিহার করবার জন্য তাঁরা উভয়েই স্বদেশ ত্যাগ করে চলে গেলেন ইটালীতে। তাঁদের নববিবাহিত জীবনের যাত্রাপথকে ইটালী স্বাগত জানিয়ে পরম সমাদরে নিজদেশে গ্রহণ করল।

কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁদের পরিচয়, কবিতা তাঁদের প্রেমের যোগসূত্র তাঁদের রোমান্সের উৎস, সেই কাব্যতরী বেয়ে তাঁদের নবজীবন 'এক অনাবিল আনন্দ ধারায় ভেসে চলল।' তাঁদের একমুখী সাধনা ও কর্মধারা পরস্পরের স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যপ্রেরণায় নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহলাভে তাঁদের উভয়কে সমগ্র জীবন ব্যাপী এক মহৎ সাহিত্যসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দাম্পত্য জীবনের পরিপূর্ণতার আনন্দে তাঁদের যৌথ জীবনে তাঁরা একাধারে 'শ্রেয়' ও 'প্রেয়'র

মঙ্গল ও সুন্দরের আশীর্বাদলাভে সার্থক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের জীবন যাত্রার পাথেয় ছিল যে গভীর প্রেম, তাতে বঞ্চনা বা ফাঁকির লেশমাত্রও ছিলনা। তাই অপূর্ণতার তিক্ততার অথবা বেদনার গ্লানিতে তাঁদের কাব্যোপহারের অঞ্জলিপাত্র পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি—এ কাব্যোপহার নিছক নির্মল আনন্দের ডালি সাজিয়েছিল। এজন্য পরবর্তীকালে আমরা যে ব্রাউনিংকে জীবনে সুষমদৃষ্টি সম্পন্ন এক মহান আশাবাদী কবি হিসাবে পেয়েছি, তার আদিতে রয়েছে এলিজাবেথের নিরঙ্কুশ ভালোবাসায় ও সমবৃত্তিসম্পন্ন চিন্তাধারায় অনুপ্রেরিত করে তাঁর স্বামীর জীবনে সার্থকতা সৃষ্টি করা।

ব্রাউনিং তাঁর পত্নীপ্রেমের গভীর অনুভূতি দিয়ে অনেক প্রেমের কবিতা লেখেন, এইগুলি একত্রে 'My Perfect Wife' নামে বই হয়ে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে এলিজাবেথও স্বামীপ্রেমকে কেন্দ্র করে অনেক কাব্যোপহার দিয়েছেন এগুলি 'Sonnets from the Portugese' নামে আত্মপ্রকাশ করে। এই কবিতাগুলির উপজীব্য বিষয় হল রোমান্টিক প্রেম। এলিজাবেথ স্বামীর অগোচরে তাঁর উদ্দেশ্যে যে কাব্য সম্ভার নিবেদন করতেন তা একদিন মধুর পরিবেশের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, "It was the begining of 1847, one day after breakfast Mrs. Browning went up, while her husband stood besides a window. He was quite indifferent about his surroundings, but felt a close touch on his back and suddenly turned his face. It was Mrs. Browning. She hurriedly pushed some loose papers into his pocket and requested to have a glimpse through these papers, then slipped away," ঐ বাণ্ডিলগুলোতে ছিল এলিজাবেথের স্বামীর উদ্দেশ্যে লেখা কাব্য সঞ্চয়ন। এলিজাবেথ অনুরোধ করেছিলেন ঐ কবিতাগুলি পড়ে যেন ছিঁড়ে ফেলা হয়। কিন্তু ব্রাউনিং এই আবিষ্কারে এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে তিনি পত্নীর এই মনোরম কাব্যোপহারগুলি ছিঁড়ে ফেলার পরিবর্তে গ্রন্থ প্রকাশনার মাধ্যমে এগুলিকে অমর করে রাখেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স থেকে যে প্রতিভার উন্মেষ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার নিত্য নূতন প্রকাশ ঘটেছিল। সতের বছর বয়সে এলিজাবেথ "An Essay of Mixd and Other Poems" এবং তার অল্পদিন পরেই "Seraphin" নামক গ্রন্থ দুটি উপহার দেন; ক্রমে ক্রমে 'The Romaunt of the pages, The Drama of Exile, Isabel's child, case of a Guidi Windows প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়ে তাঁর অপূর্ব কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর প্রদান করে। এ ছাড়া গ্রীক ও ইতালীয় সাহিত্য থেকে তাঁর অনুবাদ রচনাও ইংরাজী সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। অনুবাদগুলির মধ্যে 'Prometheus Bound গ্রন্থটি সর্বোৎকৃষ্ট। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাবাদে পূর্ণ শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'Aurora Leigh' প্রকাশিত হয়। তখন এই ইংরাজ মহিলা কবি খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে।

বর্তমান যুগের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এলিজাবেথের কাব্য বিচার করলে বিচারের নামে অবিচারের প্রহসন চলবে। বিগত একশ বছরে কাব্যের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। শতাব্দীপূর্বে কাব্যরচনা সম্বন্ধে কবিগুরুর উক্তিতে আমরা দেখতে পাই "বাহিরের তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতঃই ইচ্ছা করে সেই মিলনকে সর্বকালের সর্বজনের অধিকারভুক্ত করতে।" কবিতা এই মিলনের দূতী। আধুনিক যুগে কাব্যতাত্ত্বিকদের চিন্তাধারা ঠিক কোন অনুশাসনের নিগড় বন্ধন স্বীকার করতে চায় না, কবিতায় কবির ভাব ও ভাষার নিগড়মুক্তি আধুনিক কাব্যের একটি লক্ষণ, এরই যেন ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায় মালার্মে ডিগাসকে'র উপদেশ বাক্যে "One makes poetry with words not with ideas" ভাব ও ভাষার দুইএরই প্রাধান্যের ইঙ্গিত এই উক্তিতে নিহিত রয়েছে। শতবর্ষের কাব্যধারার ক্রমিক লক্ষ্যান্তরের প্রথম ধাপ এই ভাব ও ভাষার সমোপযোগিতা। ভিক্টোরিয় যুগে কাব্যে ভাষা অপেক্ষা ভাবের প্রাচুর্য বেশী ছিল। বলা বাহুল্য এলিজাবেথ এই প্রভাবমুক্ত ছিলেন না।

উনিশ শতকের কবিতার মেজাজে যে উচ্ছ্বাস ভাবপ্রবণতা বা কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার বাগাড়ম্বরের আতিশয্য ছিল তার সঙ্গে এযুগের সূক্ষ্ম মননশীল কবিতা আর ভাষায় যে পরিমাণে অর্থব্যঞ্জনা থাকে সে পরিমাণ স্বকীয়

সত্তা কম থাকে, রূপ, শব্দ, ধ্বনি ও ভাবগত বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ পৃথক। আজকের নিও-রিয়ালিজম ও ব্যক্তি মানসের অন্তর্মুখী মননশীলতায় পরিপুষ্ট ইউরোপীয় কাব্য গত শতকের দীর্ঘ চিত্রাম্বিত কাব্য প্রকৃতির বিলম্বিত ভাবধারার প্রতি কটাক্ষপাত করলেও আধুনিক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে সেই চিত্রায়িত কাব্যসৃষ্টির মাঝে কবিমনের ব্যক্তিগত প্রকাশের পিছনে ভিক্টোরিয় স্বর্ণযুগের সমাজ ও রাষ্ট্রের ঐশ্বর্যমণ্ডিত পটভূমিকা আত্মপ্রকাশ করেছে। বিদগ্ধ সমাজ যুগনির্বিশেষে সেই সমাজ ও রাষ্ট্রের চিত্রকল্পপটে কবিচিত্তের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেয়ে সেই শিল্পীর শিল্পসাধনায় আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। এলিজাবেথের রচনায়ও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

এলিজাবেথ ব্যক্তিগত জীবনে উনিশ শতকী ইংরাজ লিবারেল ভাবাপন্ন ছিলেন। কবি রুশো, শিল্পী ডেভিড, কলারসিক হ্যমিয়ের, নিজ নিজ সৃষ্টিতে যেমন রাজনৈতিক ফসল বুনেছিলেন, এলিজাবেথও নিজ রচনায় স্বীয় রাজনৈতিক চিন্তা ও সমর্থনের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। কবি-দম্পতী বহুদিন ধরে ইটালীতে বসবাস করায় ইটালীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি সমধিক সহানুভূতি সম্পন্ন হন। তাই ইটালীয় যুব সমাজের রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলনের প্রতি এলিজাবেথের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। এ দেশীয় রাষ্ট্র-চেতনা তাঁর কাব্য সৃষ্টির মূলে নবতম অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

এলিজাবেথের কবিতার আর একটি গুণ কাব্যে কাহিনীর উপস্থাপন। সুনিপুণ কাহিনীকার হিসাবে এলিজাবেথের একটি বিশেষ পরিচয় থাকলেও মূলত: তিনি মধ্যযুগীয় রোমান্টিসিজমের প্রভাব মুক্ত নন। তাঁর রচিত অনেকগুলি সনেটে আবার সঙ্গীতধর্মিতার আভাষ পাওয়া যায়। এলিজাবেথ সনেট রচনায় সনেটের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী বা রীতিনীতির শৃঙ্খল সর্বক্ষেত্রে স্বীকার করে নিতে পারেনি। তাঁর সনেটের বৈশিষ্ট্য সনেটের প্রচলিত ছন্দের মুক্তি। এই শৃঙ্খলমোচনে ভাবাবেগের বিস্তৃত প্রকাশ ও কাব্যের সংহতি অব্যাহত থাকার সুযোগ পেয়েছে। এটি একটি তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়।

কাব্যজগতে নিজস্ব দান ছাড়াও স্বামীর কাব্যসাধনায় চরম সফলতায় এই নেপথ্য নায়িকার অবদান ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। কবি ব্রাউনিংএর জীবনসাধিকা এই প্রেমময়ী নারী স্বামীর নিবিড় সাহচর্য জীবনের পরিপূর্ণতায় আনন্দকে নিঃশেষে পান করে যেদিন চিরবিশ্রামের কোলে আশ্রয় নিলেন সেদিন কবি ব্রাউনিং ছাড়াও সে মৃত্যুপথের সাক্ষী আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। প্রেমমুগ্ধ স্বামীর প্রচণ্ড শোকের অংশীদার হয়ে সমগ্র বিশ্ববাসী সেদিন এগিয়ে এসেছিল। ব্রাউনিংয়ের প্রেমবহ্নিতে উজ্জ্বল দীপ-শিখাটি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের এক বিষণ্ণ বিধুর সন্ধ্যায় পরিনির্বাণ লাভ করল। বোধহয় তাঁর সেই মহাযাত্রার পথে কবি ব্রাউনিংএর সেই প্রেমবহ্নি সেদিন শুকতারা হয়ে জ্বলছিল। ক্ষোভের বিষয় এমনই একটি নারী আজকে স্মৃতির পাতায় ঝাপসা হয়ে আসছে।

—

সুপর্ণা দেবী

পৃথিবীর বুকে মানব-সভ্যতা বিকাশের আদি-যুগ থেকে অধুনাকাল পর্যন্ত সকল দেশের সকল জাতির সকল সমাজের ললনারাই নিজেদের রূপ-লাবণ্য শোভা বর্দ্ধন ও উৎকর্ষ-সাধনের উদ্দেশ্যে, বিবিধ ধরণের বিলাস-ব্যসন, অঙ্গরাগ প্রসাধন, সাজসজ্জা, বসনভূষণ অলঙ্কারাদি ব্যবহার এবং বিচিত্র-ছাঁদে কেশকবরীবিন্যাস, কজ্জলী অঞ্জনে আঁখি-পল্লব চিত্রণ, অলক্তরাগে মুখ, ওষ্ঠ, হস্ত পদ রঞ্জন অগুরু-চন্দন-হরিদ্রা কুঙ্কুম অনুলেপনে দেহ-সুরভিত করে তোলা আর সৌখিন-সুন্দর অভিনব তিলক-চিহ্ন রচনা সম্বন্ধে যে ঐকান্তিক আগ্রহ অনুরাগ দেখা যায় প্রাচীন পুঁথি-পত্রে তার প্রচুর পরিচয় মেলে। একালের রূপচর্চ্চানুরাগিণী মহিলাদের অনুসন্ধিৎসা মেটানোর জন্য, আপাততঃ, সেকালের সেই সব প্রাচীন-রীতির মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হলো।

আমাদের দেশের সুপ্রাচীন পুরাণে ও বৈদ্যক শাস্ত্রে শুধু ধর্ম্মের ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়েই নয়, সুপণ্ডিত বাৎস্যায়ন

রচিত 'কামসূত্র' গ্রন্থ অনুসারে সৌখিন-বিলাসিতার দিক দিয়েও রূপপ্রসাধন কলার বিষয়টি বিশেষভাবেই সমর্থিত হয়েছে। বাৎস্যায়নের সুবিখ্যাত 'কাম-সূত্র' গ্রন্থে বর্ণিত প্রসাধনের প্রধান অঙ্গগুলি আয়ুর্বেদোক্ত অঙ্গ-সমূহেরই অনুরূপ। বাৎস্যায়ন বলেছেন—

"নিত্যং স্নানং দ্বিতীয়কমুৎসাদনম্।
তৃতীয়কঃ ফেনক। চতুর্থকমায়ুষ্যম্।
পঞ্চমকং দশামকং বা প্রত্যায়ুষ্যমিত্যহীনম্।
স প্রাতরুত্থায় কৃতনিয়তকৃত্য
গৃহীতদন্তধাবঃ মাত্রয়াহনুলেপনং ধূপং
স্রজমিতি চ গৃহীত্বা, দত্ত্বা
সিক্থকমলক্তং চ দৃষ্ট্বাদর্শে মুখং,
গৃহীত মুখবাসতাম্বূল কার্য্যাণ্যনুতিষ্ঠেৎ।
গৃহীত প্রসাধনস্যাপরাহ্নে গোষ্ঠিবিহারাঃ।

অর্থাৎ, সেকালে বিলাসীসৌখিন পুরুষ ও নারী সকলেই সুরভিত ধূপের ধোঁয়ায় নিজেদের স্নানসিক্ত কেশ শুকিয়ে নিতেন—এই ছিল তখনকার সমাজের রীতি। এরীতি অনুসরণের ফলে,শুধু যে তাঁদের সিক্ত কেশ শুকানো সম্ভব হতো তাই নয়, কেশদাম মনোরম এবং অপূর্ব্ব সৌগন্ধময়ও হয়ে উঠতো। এই বিশেষ কারণেই মনীষী বাৎস্যায়ন প্রসাধনকালে ধূপ ব্যবহারের সুপরামর্শ দিয়েছেন।

মনীষী বাৎস্যায়ন ছাড়াও মহাকবি কালিদাস তাঁর সুপ্রাচীন 'রঘুবংশম্' গ্রন্থে অতিথির বেশবিন্যাস বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"ধূপাশ্মান্ কেশান্তরং"

এবং অমর কাব্য 'কুমারসম্ভব' গ্রন্থে নববধূ গৌরীর বিবাহসজ্জা বর্ণনাকালে লিখেছেন—

"ধূপোষ্মণা ত্যাজিতমার্দ্রভাবং কেশান্তম্"।

মহাকবি কালিদাসের উপরোক্ত বর্ণনা থেকেই সুস্পষ্ট আভাস মেলে যে সেকালের বিলাসীসৌখিন সমাজে সুরভিত ধূপের ধোঁয়া প্রয়োগরীতি ছিল কেশপ্রসাধনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

প্রসঙ্গক্রমে আরো উল্লেখ করা যায় যে কেশ প্রসাধন ও কেশবিন্যাস কলা—বিশেষতঃ, বিচিত্র অভিনব ছাঁদে নারীদের কবরী রচনার রীতি—সেকালে সৌখিন বিলাসের ও সৌন্দর্য্যচর্চ্চার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হতো। এ রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় মেলে অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি গিরিগুহার অপরূপ চিত্রাবলী আর ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন চৈত্যমঠ মন্দিরগাত্রে খোদিত ভাস্কর্য্য শৈলীর বিচিত্রসুন্দর নিদর্শনগুলি থেকে। প্রাচীন যুগের এ সব ঐতিহাসিক শিল্প নিদর্শন দেখে সুস্পষ্ট ধারণা হয় যে তৎকালীন সমাজে বিলাসী সৌখিন নরনারী কেশ প্রসাধন ও বিবিধ ছাঁদে কেশ রচনার বিষয়ে রীতিমতই অনুরাগী ও কলা পারদর্শী ছিলেন। সম্ভবতঃ, তাঁদের এই আগ্রহ অনুরাগ ও কলানৈপুণ্যের ফলেই কেশ সজ্জার অন্যতম উপকরণ 'কঙ্কতিকার' অর্থাৎ 'চিরুণীর' নামকরণ করা হয়েছিল—'প্রসাধনী'। বৈদিক যুগের সুপ্রাচীন গ্রন্থ 'শতপথ ব্রাহ্মণেও' উল্লিখিত আছে যে কেশ প্রসাধনের উদ্দেশ্যে 'চিরুণী' ব্যবহারের প্রথা বহু পুরোনো আমল থেকেই সুপ্রচলিত এবং সেকালের বিশিষ্ট একজন ঋষি সদা সর্ব্বদা এই 'চিরুণী' বা 'কঙ্কতিকার' ব্যবহার করার জন্যই তৎকালীন সমাজের নরনারীর কাছে ক্রমে 'কঙ্কত' নামে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

সেকালের সমাজে এই কেশ প্রসাধন—বিশেষতঃ বিচিত্র সৌখিন ছাঁদে নারীদের কেশবিন্যাস ও কবরী রচনার প্রথা নিতান্ত সহজ ও অনায়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল না—বরং এ বিষয়ে কলা নৈপুণ্য ও দক্ষতার পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাচীন যুগের বিলাসীসৌখিন নরনারীকে প্রচুর যত্ন, পরিশ্রম ও সাধনা অনুশীলন করতে হতো। কারণ, সুচারু ছাঁদে কেশবিন্যাস ও কবরী রচনা—তখনকার সৌখিন সমাজে শিল্পকলার বিশিষ্ট একটি অঙ্গ হিসাবেও পরম সমাদর লাভ করেছিল। এমন কি নিপুণভাবে কেশ প্রসাধন এবং কবরী বন্ধন রীতি আয়ত্ত করা ছাড়াও মনোরম ছাঁদে পুষ্পসজ্জায় কেশ কবরী সুসজ্জিত করে তোলারও রীতিমতো রেওয়াজ ছিল সেকালের সৌখিন সমাজে এবং কেশ রচনাকালে পুষ্পমাল্যে কবরী সজ্জার বিশিষ্ট প্রথাটিকে প্রাচীন যুগে 'গর্ভক' নামে অভিহিত করা হতো। কেশ রচনাকালে পুষ্পমাল্যসজ্জার এই অভিনব রীতি সম্বন্ধে প্রাচীনকবি কালিদাস তাঁর সুবিখ্যাত 'কুমারসম্ভব' কাব্যে উল্লেখ করেছেন—

"ধূপোষ্মণা ত্যাজিতমার্দ্রভাবং
কেশান্তমন্তঃকুসুমং তদীয়ম্।
পর্য্যাক্ষিপৎ কাচিদুদারবন্ধং
দূর্ব্বলতা পাণ্ডুমধুকদাম্না॥"

এছাড়া মহাকবি কালিদাস রচিত 'ঋতুসংহার' কাব্যেও 'শিশিরবর্ণনম্ প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে—

"নিবেশিতান্তঃকুসুমৈঃ শিরোরুহৈঃ
বিভূষয়ন্তীব হিমাগমং স্ত্রিয়ঃ।"

আধুনিক যুগের পুরাতত্ত্ব গবেষক কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রসাধনের বিশেষ একটি রীতি ছিল—'কূর্চ্চ' (পশু কেশ সম্বলিত কেশ মার্জ্জন উপকরণ) অর্থাৎ, শুয়োরের লোম বা কুঁচি ব্যবহারে কেশদাম মার্জ্জনা করা। অথচ প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক শাস্ত্রে বা পুরাণাদিতে কোথাও কিন্তু প্রসাধনের এ রীতির কোনো উল্লেখ বা পরিচয় মেলে না—কেবলমাত্র 'কঙ্কতিকার' কথাই পাওয়া যায়। কাজেই পশু কেশ সম্বলিত মার্জ্জন উপকরণ ব্যবহারে কেশ প্রসাধনের অভিনব রীতির প্রচলন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অলীক বলেই ধারণা হয়।

কেশ প্রসাধন ছাড়াও প্রাচীন ভারতের বিলাসী সৌখিন সমাজে রূপচর্চ্চা অনুরাগী নরনারী—উভয় পক্ষই যে প্রসাধনকালে অলক্তকরাগে তাঁদের মুখ, ওষ্ঠ এবং হস্তপদাদি সুরঞ্জিত করে তুলতেন, মনীষী বাৎস্যায়ন রচিত সুবিখ্যাত 'কামসূত্র' গ্রন্থে সে রীতিরও সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এমন কি, মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যেও উল্লিখিত আছে—

সালক্তকৌ ভূপতয়ঃ প্রসিদ্ধৈঃ
ববন্দিরে মৌলিভিরস্য পাদৌ॥"

আধুনিক ভারতীয় সমাজে অবশ্য প্রাচীনযুগে সুপ্রচলিত অলক্তকরাগে মুখ, ওষ্ঠ, হস্ত পদ সুরঞ্জিত করার রীতি—পুরুষদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হয়ে গেলেও, নারী মহলে এখনও শুধু যে বজায় রয়েছে তাই নয়, বরং রুজ, লিপ্‌ষ্টিক, আলতা প্রভৃতি রঞ্জক উপকরণের ব্যাপক প্রসারতা দেখা দিয়েছে—সমাজের ছোট বড়, ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্ত সকল স্তরেই।

প্রাচীন ভারতের প্রসাধন-কলার অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনা—স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ এখানেই মুলতুবী রাখতে হলো। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে পুনরালোচনা করবার বাসনা রইলো।

[ক্রমশঃ
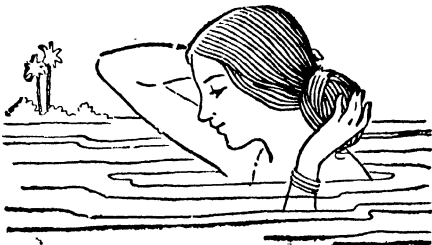
এমব্রয়ডারী সূচী-শিল্পের নক্সা

শম্পা চৌধুরী

শিশুদের পোষাক পরিচ্ছদ, কাঁথা-চাদর, রুমাল 'ন্যাপকিন' 'বিব্' প্রভৃতি কাপড়চোপড়ের উপর নানা রঙের রেশমী-সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারী সূচী শিল্পের বিচিত্র কারুকার্য্য করে বিভিন্ন ধরণের সৌখিন সুন্দর নক্সা-প্রতিলিপি ফুটিয়ে তোলার দিকে অনেকেরই বিশেষ আগ্রহ আছে। তাই এবারে সূচীশিল্পানুরাগিণী মহিলাদের কাজের সুবিধার জন্য শিশুদের বিবিধ উপকরণাদি সজ্জার উপযোগী সহজ সরল ছাঁদের দুটি নক্সা প্রকাশ করা হলো।
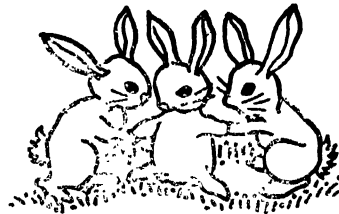
উপরের ১নং ছবিতে তিনটি খরগোশ-ছানার যে বিচিত্র নক্সাটি দেখানো হয়েছে, রঙীন সুতোর সাহায্যে এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের কাজ করে শিশুদের ব্যবহারোপযোগী জামা কাপড়ের বুকে সেটিকে নিখুঁত ছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে হলে, 'চেন-ষ্টিচ্' (Chain stitch) পদ্ধতিতে সেলাই করাই ভালো। খরগোশ-ছানাদের দেহের অংশ

রচনার জন্য ফিকে বাদামী রঙের রেশমী সুতো ব্যবহার করতে হবে—অবশ্য সেলাইয়ের কাপড়ের জমি যদি শাদা, হলদে, গোলাপী, ফিকে-নীল অথবা অন্য কোনো মানানসই ধরণের হাল্কা রঙের হয়। খরগোশ ছানাদের চোখ, ল্যাজ ও গোঁফের রেখা রচনা করবেন কালো রঙের রেশমী সুতো দিয়ে। ঘাসের শীষগুলি রচনার জন্য বেছে নেবেন কাপড়ের জমির সঙ্গে মানানসই দেখায়—এমন ধরণের হাল্কা অথবা গাঢ় সবুজ রঙের রেশমী সুতো। ঘাসের মাঝে মাঝে গোলাকার ফুলগুলি রচনা করবেন লাল-রঙের রেশমী সুতো দিয়ে। তাহলেই উপরের ১নং নক্সা আগাগোড়া পরিপাটি ছাঁদে কাপড়ের বুকে ফুটিয়ে তোলা যাবে।
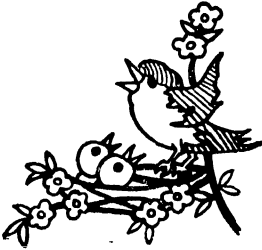
উপরের ২নং নক্সাতে বৃক্ষ-নীড়ে আসীন যে পক্ষী-মাতা ও শাবকদের বিচিত্র নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটিও পূর্ব্বোক্ত সূচীশিল্প পদ্ধতিতে সহজেই এমব্রয়ডারী করা চলবে। ইতিপূর্ব্বেই যে ধরণের রঙিন জমির কাপড় ব্যবহার করার হদিশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি ধরণের উপকরণের উপর ২নং নক্সা প্রতিলিপিটিকে ফুটিয়ে তুলতে হলে—পাখীদের ঠোঁট আর পায়ের অংশ রচনা করবেন—ফিকে কমলা বা গাঢ় হলুদ রঙের রেশমী সুতোয়। পক্ষী মাতা এবং শাবকদের দেহাংশ রচনার জন্য বেছে নেবেন সেলাইয়ের কাপড়ের সঙ্গে মানানসই দেখায়, এমন ধরণের ফিকে অথবা গাঢ় নীল রঙের রেশমী সুতো। ফুলগুলি রচিত করতে হবে ফিকে গোলাপী রঙের সুতোয় এবং গাছের পাতা ও ডালের জন্য ব্যবহার করবেন গাঢ় কিম্বা হাল্কা সবুজ রঙের রেশমী সুতো। পাখীর বাসাটি রচনা করতে হবে গাঢ় বাদামী রঙের রেশমী সুতো দিয়ে। এই হলো, উপরের ২নং নক্সাটিকে এমব্রয়ডারী সেলাইয়ের কাজ করে সুচারু ছাঁদে ফুটিয়ে তোলার মোটামুটি নিয়ম।

বারান্তরে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের উপযোগী এমনি ধরণের সহজ-সরল সুন্দর ছাঁদের আরো কয়েকটি নক্সা-নমুনার প্রতিলিপি প্রকাশের ইচ্ছা রইলো।

——

শিল্পী—মৃণাল চক্রবর্ত্তী

শ্রী'শ'—

॥ বিদেশী চিত্র ॥

অধুনা বিদেশী চিত্রের প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ যথেষ্ট বেড়ে গেছে বলেই মনে হয়। যে সব প্রেক্ষাগৃহে বিদেশী চিত্র দেখান হয় সেগুলিতে দর্শক সংখ্যা বাড়তির পথে তো বটেই, তা-ছাড়া "সিনে" ক্লাবগুলির মাধ্যমেও প্রচুর দর্শক সভ্য নানা দেশের চলচ্চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছেন। সিনে ক্লাবগুলিও বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে এবং এদের সভ্য সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। এই সব ক্লাবে প্রদর্শিত চিত্রগুলি সাধারণতঃ সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে বানিজ্যিক ভিত্তিতে দেখান হয় না। তাই এই সব ক্লাবের সভ্য ছাড়া সাধারণ দর্শকরা এই সব চিত্র দেখার সুযোগ পায় না। সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে মার্কিণ ও বৃটিশ চিত্রই বেশীর ভাগ দেখান হয়ে থাকে। "ডাব্" করা ইতালিয়ান্ ও ফরাসী চিত্রও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। কিন্তু পোলিশ, হাঙ্গেরিয়ান্, বুলগেরিয়ান্ প্রভৃতি কন্টিনেন্টাল্ চিত্র এই সব সিনে ক্লাব ছাড়া সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে বড় একটা প্রদর্শিত হয় না। তাই চিত্র রসিকরা এই সব ক্লাবের সভ্য হয়ে এই সব চিত্র দেখবার সুযোগ নেন। তবে সব চিত্রই যে চিত্র রসিকদের আনন্দ দিতে পারে তা মোটেই নয়। অনেক কন্টিনেন্টাল্ চিত্রের মান অতি সাধারণ বা নিম্ন-

*

কণিকা মজুমদার—
বাংলা চলচ্চিত্রের দীপ্তিমতী তারকা

ফোটো: অমিতেশ বন্দোপাধ্যায়

*

উত্তম কুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী—
চিত্র জগতের নায়ক-নায়িকা

ফোটো : বিমলকান্তি ঘোষ

মানের হওয়ায় শুধু দর্শকদের চক্ষুকে পীড়িত করে। সিনে ক্লাবগুলির উচিত এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া এবং অতি সাধারণ বা নিম্নমানের চিত্র প্রদর্শন করে দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন না করা।

কিছুদিন পূর্ব্বে নবগঠিত "সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটা" সংস্থাটি ফরাসী, হাঙ্গেরীয়ান্ ও বুলগেরিয়ান্ চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছিলেন 'আকাডেমি অফ্ ফাইন্ আর্টস' ভবনে। ফরাসী চিত্রগুলি অতি সাধারণ মানের হওয়ায় এবং ১৬ মিঃ মিঃ-তে প্রদর্শিত হওয়ায় দর্শকদের বিশেষ ভাল লাগে নি। অবশ্য হাঙ্গেরিয়ান চলচ্চিত্রগুলি এদের তুলনায় ভালই লেগেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঘাতে বিধ্বস্ত হাঙ্গেরিয় চলচ্চিত্র শিল্প ১৯৪৫ সাল থেকে আবার নতুন উদ্যমে গড়ে উঠতে আরম্ভ করে এবং বিগত কুড়ি বৎসরে সে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে বলা চলে। Istvan Szabo-র "The Age of Daydreaming" Locarno চলচ্চিত্র উৎসবে Grand Prix পুরস্কার লাভ করে এবং Istran Gaal-এর "Current" Karlovy Vary চিত্রোৎসবে পুরস্কৃত হয়। Gyorgy Revesz-এর "The Land of Angels" Mar del Plata-তে Grand Prize-লাভ করে এবং Laszlo Ranody-র "Skylark" Cannes চিত্রোৎসবে সম্মানের সহিত উল্লিখিত হয়। অধুনা Miklos Jancso-র "The Hopeless Ones" হাঙ্গেরিয় চিত্র জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে এবং হাঙ্গেরিয় চিত্রামোদিরা Jancso-র কাছ থেকে তাঁর নতুন চিত্রের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু পাবার আশা করছেন।

সিনে সেণ্ট্রালের চিত্রোৎসবে যে সব চিত্রগুলি দেখান হয় সেগুলি হচ্ছে "Two Half Time in Hell", "Current", "A Glass of Beer", "Fever", "What a Night", ও "Skylark".

এই সব বিদেশী চিত্রের প্রদর্শনে শুধু দর্শকরাই তৃপ্ত হচ্ছেন না, চিত্র-নির্ম্মাতারাও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পরিচালকের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারছেন এবং নতুনভাবে তাঁদের কল্পনাও সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে, আর তাঁদের অনুপ্রাণিত করছে নতুন উদ্যমে নবীন ভঙ্গীতে আধুনিকতম চিত্র নির্ম্মাণে। এইভাবেই চলচ্চিত্রের প্রগতি অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং চিত্রামোদিরাও পরিতৃপ্ত হবেন উচ্চ মানের চিত্র দর্শনে।

মাঝে মাঝে বিদেশী চিত্রোৎসবের এই সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সিনে ক্লাবগুলিকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

***

খবরাখবর :

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের "বাজীকর" উপন্যাসের এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন বিমল রায়। অরুণ চৌধুরীর প্রযোজনায় প্রোগেসিভ এণ্টারপ্রাইজের্ এটি দ্বিতীয় নিবেদন।

ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্র অভিনয় করবেন উত্তম কুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। শিরিণ-এর চরিত্রে অংশ নেবেন বোম্বাইয়ের এক খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী। এ ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ হবে উত্তমকুমারের নিজ কণ্ঠে গাওয়া গান।

* * *

উদীয়মানা—সবিতা সিন্‌হা

ফোটো : অমিতেশ বন্দোপাধ্যায়

ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল রচিত ও পরিচালিত "ছায়াপথ" চিত্রের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। চিত্রটিতে অভিনয় করছেন—অবনিশ, মঞ্জু দে, সুমিতা সান্যাল, মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর।

* * *

'নায়ক' পরিচালক গোষ্ঠীর নির্মীয়মান ছবি 'চিড়িয়াখানায়' উত্তমকুমারের বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন কণিকা মজুমদার।

সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য অবলম্বনে তৈরী "চিড়িয়াখানা"র অপর দুটী বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন জহর গাঙ্গুলী ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

* *

বাংলা মঞ্চজগতের অতীতের খ্যাতিনাম্নী অভিনেত্রী বিনোদিনীর জীবনী অবলম্বনে "নটী বিনোদিনী" নামে একটি বাংলা ছবি তৈরী হবে বলে জানা গেছে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্যর লেখা কাহিনীই এ ছবির অবলম্বন। ছবিখানি পরিচালনা করবেন সলিল দত্ত এবং প্রণতি ভট্টাচার্য (বোম্বাই) ছবিখানির প্রযোজনা ও নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

* * *

প্রযোজক অমর নান 'মাধবীলতা' নামে একখানি ছবি তৈরীর পরিকল্পনা করেছেন।

চিত্রটির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন বিশ্বজিৎ ও তনুজা।

বোম্বাইয়ের ফিল্মালয় সংস্থা বাংলা "প্রথম প্রেম"

ছবিটিকে হিন্দীতে রূপদান করবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন বলে জানা গেল।

হিন্দীতে এর নাম হবে "জীবন প্রভাত" এবং নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন দেব মুখার্জি।

বাংলা "প্রথম প্রেম" ছবিটির পরিচালক অজয় বিশ্বাসই এই হিন্দী ছবিটির পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে।

* * *

খ্যাতনামা অভিনেতা বলরাজ সাহনীর পুত্র পরীক্ষিতকে সর্বপ্রথম যে ভারতীয় ছবিটিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে তার নাম 'মহ্‌জুর'।

পরীক্ষিত চলচ্চিত্র পরিচালনা বিষয়ে রাশিয়ায় কিছুদিন পাঠ নিয়েছেন এবং কয়েকখানি রাশিয়ান ছবিতেও অভিনয় করেছেন। 'মহ্‌জুর' (রঙীন) ছবিটিতে তিনি তরুণ কবি মহ্‌জুর-এর চরিত্রটিতে রূপ দেবেন।

হিন্দী চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বলরাজ সাহনী এবং ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

'মহ্‌জুর' ছবিটী গড়ে উঠবে সুপরিচিত কাশ্মীরী কবি 'মহ্‌জুর'-এর জীবনকাহিনী অবলম্বনে এবং কাশ্মীরেই ছবিটী তোলা হবে।

* * *

ভারতের "জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভ" পারস্পরিক বিনিময়ের ভিত্তিতে রাশিয়া থেকে চারখানি নির্বাক চলচ্চিত্র

অনুপকুমার ও সুমিতা সান্যাল—
একটি বিশেষ ভঙ্গিমায়

ফোটো : বেণীমাধব মজুমদার

পেয়েছে। এই ছবিগুলি হ'ল :— আইজেনষ্টিন্‌-এর 'ষ্ট্রাইক্‌' (১৯২৪), অক্টোবর (১৯২৭), 'জেনারেল লাইন' (১৯২৮) এবং ডবঝেনকো-র 'আর্থ' (১৯৩০)।

বর্তমানে উপরোক্ত ছবিগুলির ইংরেজী সাবটাইট্‌ল করার কাজ পুণস্থ আর্কাইভে সমাপ্তিপ্রায় এবং শীঘ্রই আর্কাইভ-এর ডিষ্ট্রিবিউশন লাইব্রেরীর মারফৎ ওই ছবিগুলি সমগ্র দেশের ফিল্ম সোসাইটি ও ফিল্ম ষ্টাডি গ্রুপের সদস্যদের নিকট প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকবে।
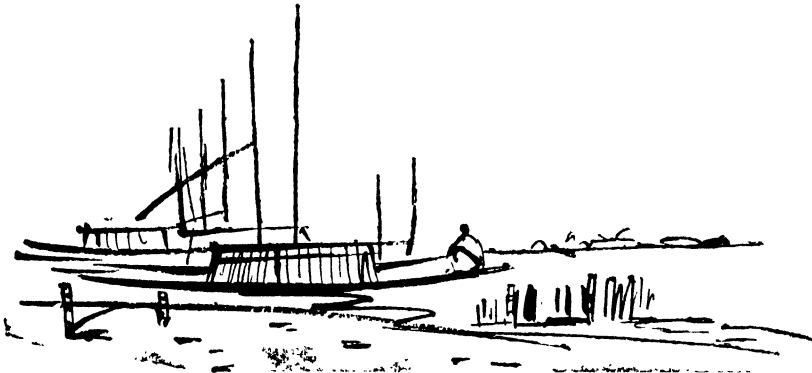
মাধবীর কথা

বেণী মজুমদার

মাধবী !

সত্যদ্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের "চারুলতা" চরিত্রের সার্থক স্রষ্টা মাধবী মুখোপাধ্যায়। আজ ইনিই বাংলা চলচ্চিত্রের নায়িকা তালিকায় একটি উজ্জ্বল নাম।

পরিচিতির চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী যখন গিয়ে পৌছালাম মাধবী দেবীর বাড়িতে—তখন রাত আট'টা। সুরুচি সম্পন্ন আর সুসজ্জিত ড্রইং রুমটায় আমি অতিথি। যাচ্ছিলাম আমি। আমায় অবাক করে দিয়ে মাধবী দেবীই প্রথমে বললেন :—শুরুটা না হয় আমিই করে দিই মাধবী দেবীর মিষ্টি ব্যবহারে বিস্মিত হলাম, যত সময় বয়ে যেতে লাগলো, ততই যেন আরো সহজ আর আপন হয়ে উঠতে লাগলাম আমি।

এরপর তিনি শোনালেন তাঁর শিল্পী জীবনের কাহিনী অগ্রগতির ইতিহাস। আপনারাও শুনুন। মাধবী দেবীর

বাংলা চিত্রের সমুজ্জ্বল তারকা—
মাধবী মুখোপাধ্যায়
ফোটো : তাপস গোস্বামী

আমাকে স্বাগত জানালেন মাধবীদেবী। "চারুলতার' চারুলতা মাধবী দেবীর সাদর সম্ভাষণ : আসুন, নমস্কার। জানালার পাশে একটা শোফায় গিয়ে বসলাম। পাশেই জানালাটার বাইরে দূরের আকাশটা তখনো দিগন্ত বিস্তৃতি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার তন্দ্রা ভাবকে স্বাগত জানায় নি। দূরের অসীম আকাশের তারকাগুলো তখন মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছিলো। বাইরের আকাশের ওই অগণিত তারকাগুলো অনেক অনেক দূরের ; কাছের তারা 'চিত্র-তারকা' মাধবী তখন গভীর আবেশে ভরপুর। সুষুপ্ত রাত্রির তিমির স্তব্ধ প্রহরে আমার তন্ময়তা দূর করে সাং-বাদিকতার গুটি কয়েক প্রশ্ন করার সুযোগ খুঁজতে জন্ম কলকাতায়। বেশী লেখাপড়া শিখতে পারেননি। তাতে তাঁর কিছু আসে যায়না। শিল্পীমন আর আত্ম-বিশ্বাস সেটাও মানুষের জীবনে চলার পথে কম বড় পাথেয় নয়। এই আত্মবিশ্বাসই এনে দিয়েছে তাঁকে সাফল্য। গত বছরে অধিক সংখ্যক ছবিতে যে নায়িকা অভিনয় করেছেন তাঁর নাম মাধবী মুখোপাধ্যায়। মুক্তি-প্রতীক্ষিত এবং চুক্তিবদ্ধ ছবির সংখ্যা অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশী। এ'ত গেল শেষের কথা। গোড়ার ইতিহাস ত মাধবীকেই তৈরী করতে হয়েছে। In history as in life the success that counts. জীবনে কে কতখানি পরিশ্রম করল, কে কতখানি সাধনা করল সে কাহিনী

আমরা জনসাধারণ জানতে চাই না। কে কতটা সফল হল, কে কতটা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হল তার হিসাব নিতেই আমরা প্রস্তুত। জীবন সংগ্রামে যারা জয়ী হয় তাদেরকেই আমরা জয়মালা পরাই। সে জয়মালা আমার মাধবীকে পরিয়েছি—আর আমাদের দেয়া সে মালা তিনি খুশীমনেই গ্রহণ করেছেন।

মাধবী দেবীর প্রথম ছবি 'মেঘমুক্তি', সে প্রায় সতেরো আঠারো বছর আগের কথা। মাধবী দেবী তখন দেবী নয় বালিকা। কৈশোরে দ্বিতীয় ছবি তপন সিংহ পরিচালিত 'টনসিলে' নায়িকার ভূমিকা। তারপর 'বাইশে শ্রাবণ' এ ছবিতেই প্রথম মাধবী দর্শকদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মৃণাল সেনের কাছ থেকে ডাক এল মাধবীর। সে আনন্দময় দিনটির কথা মাধবীর জীবনে এক স্বর্ণাক্ষরে লিখিত অধ্যায়। 'বাইশে শ্রাবণ' মুক্তি পেল। বাংলার চিত্র রসিকেরা প্রাণভরে দেখলেন একজন নবাগত পরিচালকের আবিষ্কৃত প্রায় নবাগতা অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সপ্রাণ অভিনয়। 'বাইশে শ্রাবণ' মৃণাল সেনের একটি বহু আলোচিত উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। লণ্ডন ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে 'বাইশে শ্রাবণ' সার্টিফিকেট অফ মেরিট লাভ করে। এর পর মাধবী মুখোপাধ্যায়কে বেশ কিছুদিন চিত্রজগতে দেখা যায় নি।

তার পরের ঘটনা আরও আনন্দদায়ক। মাধবী দেবীর ভাগ্যরশ্মি তখন মধ্য গগন থেকে মাধবীর অনুকূলে আলোক প্রভা ছড়াচ্ছে। এবার ডাক এসেছে বিশ্ব-বিখ্যাতের প্রাঙ্গণে 'মহানগরে' নায়িকার ভূমিকায় তিনি অপূর্ব্ব পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এই চিত্রে মাধবী দেবীর অভিনয় দেশ বিদেশের সাংবাদিক গুণী এবং দর্শকদের বিশেষ প্রসংসা লাভ করে। এরপর 'চারুলতা'। 'চারুলতায়' মাধবী নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন। চারুর মনের দ্বন্দ্ব, নিঃসঙ্গতা, অমলের প্রতি আকর্ষণ মাধবীর শিল্পী জীবনের এক অনন্য কীর্তি। এছবিতে অভিনয় করে মাধবী মুখোপাধ্যায় বিদেশী সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গত বছর ব্রিস্টলে সত্যজিৎচলচ্চিত্র আলোচনা-চক্রে শ্রীমতী সীটন মাধবীর অভিনয় প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীমতী সীটন আন্তোনিওর আবিষ্কৃত ইতালীয়ান অভিনেত্রী মণিকা ভিটির ('লানাতে' 'রেড

তাপসের ক্যামেরায় সামনে প্রিয় কুকুর কোলে—

মাধবী মুখোপাধ্যায়

ডেজার্ট' প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত ছবির নায়িকা) সঙ্গে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের তুলনা করেন।

'কাপুরুষ' ছবিতেও মাধবী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এই চিত্রের নায়িকা করুণা দুই নায়কের মাঝখানে দ্বন্দ্ব ও মনোযন্ত্রণার এক মূর্তপ্রতীক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'একই অঙ্গে এতরূপ' হাসিও এমনি একটি চরিত্র। চারু ও করুণা এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৌমেনের কাছ থেকে হাসি মুক্তি পেয়েছে। মৃণাল সেন মাধবী মুখোপাধ্যায়কে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশের পাসপোর্ট দিয়েছিলেন আর সত্যজিৎ রায় তৈরী করে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক পরিক্রমার পথ।

এর পর মাধবী দেবী এই অল্প সময়ের মধ্যে বহু চিত্রে অভিনয় করেছেন যা অন্য কোন অভিনেত্রীর দ্বারা সম্ভব হয় নি। মাধবীর আগামী ছবির তালিকায় আছে—শঙ্খবেলা, জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, ব্রেক, ত্রিপর্ণা, আশ্রয়, অকাল বসন্ত, ছোট্ট জিজ্ঞাসা, শাশ্বতী, দুরন্ত চড়াই, কাল তুমি আলেয়া, অণামিকা, অজানা শপথ,

* *

মাধবীর সঙ্গে আলাপরত লেখক

খেয়া, ছায়াপথ প্রভৃতি। প্রযোজকদের নজর শুধু এখন মাধবীর দিকেই।

মাধবী মুখোপাধ্যায় জীবনধর্মী রূপ ভাস্কর্যের দৃপ্ত প্রতীক। তার সাবলীল ভঙ্গিমা, প্রত্যয়শীল গাম্ভীর্য, চরিত্রায়ণের বিভিন্ন সৃষ্টিমূলক পদক্ষেপ।

অভিব্যক্তির বর্ণপট তাকে পূর্ণতা দিয়েছে। মাধবী মুখোপাধ্যায় বাংলা চিত্র জগতের রিয়্যালিজমপুষ্ট একটি নব্যভাবধারার প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

শিল্পপ্রাণা মাধবী আজ খুঁজে পেয়েছে তার মুক্তির পথ। আজ মাধবী মুখোপাধ্যায় আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল—

"আমার মুক্তি আলোয়…"এ মুক্তি মাধবীর একদিনের পরিশ্রমে আসেনি, বহু পরিশ্রম, বহু গ্লানি সহ্য করে মাধবী মুখোপাধ্যায় আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছেন।

এমন দিন গেছে যখন তাকে দশটাকার জন্য ভাবতে হয়েছে। একবার মাধবীর বোনের অসুখ, টাকার খুব দরকার। পাওনা টাকা আদায়ের জন্য এক প্রডিউসারের কাছে ছুটে গিয়েছিলো মাধবী। প্রডিউসার মাধবীকে তার গাড়ি করে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে আনতে চাইল, কিন্তু টাকা দিলো না।

আজ আর মাধবীর টাকার অভাব নেই। পুরোন স্মৃতিগুলো মাঝে মাঝে মনে পড়ে মাধবীর।

অজস্র প্রশ্নমালা আর আলাপ-আলোচনার আদানে-প্রদানে এতক্ষণে ঘড়ির কাঁটায় মধ্যরাতের ঘোষণা সূচিত হয়েছিল। এবার সভাভঙ্গের পালা। কিশোরী মাধবীকে আমি দেখিনি। শুধু শুনেছি ওর স্মৃতি কথা। আজকের মাধবীকে আমি দেখেছি বিশেষ ভাবে। দেখেছি ওর অভিনয়ের ক্ষমতা। প্রিয়ভাষী মাধবী মুখোপাধ্যায় আজ বাংলা দেশের নায়িকাদের মধ্যে অনন্যা। ওর পরিচিতি জানাবার ছিল, আপনাদের জানালাম।

পরিচিতির শেষের রেশে শিল্পীকে উদ্দেশ করে সাংবাদিকের কোন কিছু বলার অলিখিত একটা অধিকার আছে। আমিও বলি—বাংলা চলচ্চিত্রে তোমার আবির্ভাব এক প্রতিশ্রুতিময় নব-সংযোজন। চোখে রয়েছে তোমার সৃষ্টির নব নব প্রেরণা, মুখে রয়েছে এক উজ্জ্বল প্রতিভার সুস্পষ্ট শিল্পী চেতনা। সব কিছুর সার্থক রূপ দেবে তোমার ঐকান্তিক সংকল্প আর সাধনা। চলচ্চিত্রের অনন্যা নায়িকা তুমি, তোমার স্মরণরেখার নিজস্বতায় আগামী দিনের নতুনের দল খুঁজে পাক তাদের আসল নিশানা—এই আমার কামনা।

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

ডেভিস কাপ ঃ

ডেভিস কাপ পূর্বাঞ্চল ফাইনালে ভারত ৪—১ গেমে জাপানকে হারিয়ে আন্তঃ আঞ্চলিক সেমি ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। শেষ দিনের খেলায় রামনাথন কৃষ্ণান ও প্রেমজিৎলাল দু'টি সিঙ্গলসেই বিজয়ী হয়েছেন। ডেভিস কাপে ভারত ৬বার জাপানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, এবং ৬বারই জাপানকে পরাজিত করেছে।

খেলার ফলাফল :

কৃষ্ণান (ভারত) ৬ ৩, ২-৬, ৬ ২, ১০-৮ গেমে ওসামু ইশিগুরুকে (জাপান , পরাজিত করেন। কোজি ওয়াতানেব (জাপান) ৬—৩, ১—৬, ৬—৪, ৩—৬ ও ৯—৭ গেমে প্রেমজিৎলালকে (ভারত) পরাজিত করেন।

কৃষ্ণান ও প্রেমজিৎলাল ৬—২, ৬—৩, ৬—৩ গেমে ওসামু ইশিগুরু ও কোজি ওয়াতানেবকে (জাপান) পরাজিত করেন।

কৃষ্ণান (ভারত) ৬—২, ৭—৫, ৬—০ গেমে ওয়াতানেবকে (জাপান) পরাজিত করেন।

প্রেমজিৎলাল (ভারত) ২—৬, ৮ ৬ ও ৭—৫ ও ১০—৮ গেমে ওসামু ইশিগুরুকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মিহির সেন—

ভারতীয় সাঁতারু মিহির সেন একই বছরে চারিটি প্রণালি পার হয়ে বিশ্বের দূরপাল্লা সাঁতারে রেকর্ড করেছেন।

তিনি পক, জিবরল্টার, দারদানেলিশ ও বসফরাস প্রণালী পার হয়েছেন। এইবার তাঁর পানামা প্রণালী পার হবার কথা জানা যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক হকি—

জাপানে তিন সপ্তাহের জন্য শুভেচ্ছা সফরে আগত ভারতীয় হকি দল জাপানের বাছাই একাদশকে পঞ্চম তথা শেষ সাক্ষাৎকালে ২—০ গোলে পরাজিত করে এই পর্য্যায়ে ৩—২ ম্যাচে জয়ী হয়েছে।

ভারতীয় দল প্রথমার্দ্ধেই ২টি গোল করে। প্রথম গোলটি করেন ধরমসিং ও দ্বিতীয় গোলটি দেন রাইটআউট ইন্দার সিং। তিনি অপূর্ব্ব ড্রিবলিং দ্বারা প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাগকে সম্পূর্ণ পরাভূত করেন।

পঃ ভাঃ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা—

পঃ ভাঃ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় এশীয় চ্যাম্পিয়ান দীনেশ খান্না পুরুষ সিঙ্গলসে বিজয়ী হয়েছেন। বৃটেনের মিস্ অ্যাঞ্জেলা বেয়ারষ্টো মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস দু' বিভাগেই বিজয়িনী হবার গৌরব অর্জন করেন। পুরুষ সিঙ্গলসের ফাইনালে ভারতের দীনেশ খান্না ১৫—১০ ও ১৫—৩ গেমে ইন্দোনেশীয়ার ওং পেক সেনকে পরাজিত করেন। মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে মিস্ বেয়ারষ্টো (বৃটেন) হল্যাণ্ডের রিটভেল্ডকে ১১—৬ ও ১১—৪ গেমে পরাজিত করেন।

মহিলা ডাবলসে বেয়ারষ্টো (বৃটেন) ও আইল্যাটজ (পশ্চিম জার্মানি) জুটি ডেনমার্কের উল্লাষ্ট্রাপ ও কারিন

জোরগেনসেন জুটিকে ১৫-৯, ১৫-৫, গেমে পরাজিত করেন।

সেণ্ট্রাল টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা :

ওয়াই, এম, সি, এ (চৌরঙ্গী)তে অনুষ্ঠিত সেণ্ট্রাল টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে সরোজ ঘোষ ২১—১৬, ২০—২২, ২১—১৮ ও ২১—১৭ গেমে অজিত বোসকে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে কুমারী রূপা মুখার্জী—২১—১৭, ১৮—২১, ২১—১৩ ও ২১—১৮ গেমে কমল কাপাডিয়াকে পরাজিত করেন। জুনিয়ার সিঙ্গলস ফাইনালে নাচ্চু মুখার্জী ২৪—২২, ১৬—২১, ১৯—২১, ২১—১৮ ও ২১—১৩ গেমে অমিত মিত্রকে পরাজিত করেন।

সর্বভারতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা ঃ

জলন্ধরে আয়োজিত সর্বভারতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার প্রথম অনুষ্ঠানে মহিলা বিভাগে বাংলা দল ২৪ পয়েণ্ট পেয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে পুরুষ বিভাগে ৪১ পয়েণ্ট পেয়ে উত্তরপ্রদেশ প্রথম, ২৩ পয়েণ্ট পেয়ে পাঞ্জাব পুলিশ দ্বিতীয় এবং ১৬ পয়েণ্ট পেয়ে বাংলা দল তৃতীয় স্থান দখল করেছে। বালক বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে উত্তর প্রদেশ দল।

ফলাফল

(পুরুষ) ১০০ মিটার : বাটার ফ্লাই—অরুণ [illegible] (রেল) প্রথম ১মি: ১১.২ সে: ; আর সিং (উত্তর প্রদে[illegible] পুলিশ) দ্বিতীয়, লক্ষ্মীচাঁদ (পাঞ্জাব পুলিশ) তৃতীয়।

৪ × ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রীলে —উত্তর প্রদেশ পুলি[illegible] প্রথম, পাঞ্জাব পুলিশ দ্বিতীয় ও জলন্ধর তৃতীয়।

মহিলা ১০০ মিটার চিৎ সাঁতার :

এ ব্যানার্জি (বাংলা), প্রথম ; গীতা দে (বাংলা) দ্বিতীয় ; (বালক) ৪০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল—জি সারি[illegible] (উত্তরপ্রদেশ) প্রথম, কুলভূষণ (জলন্ধর) দ্বিতীয় ; অজিত সিং (সৈনিক স্কুল) তৃতীয়, ২০০ মিটার চিৎ সাঁতার—গুরজিৎ সিং (পাঞ্জাব পুলিশ) প্রথম ২ মি: ৪৭.৮ সে: ; জি আই (উত্তরপ্রদেশ) দ্বিতীয়, সুরেশ দত্ত (জলন্ধর) তৃতীয় ; ১০০ মিটার বুক সাঁতারে—জি সারি[illegible] (উত্তরপ্রদেশ) প্রথম ১ মি: ৭.৮ সে:, শিবনন্দন (কপূরতলা সৈনিক স্কুল) দ্বিতীয় ; ৭০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল—এস শর্মা (জলন্ধর জেলা) প্রথম, কুলভূষণ [জলন্ধর] দ্বিতীয় ; ১০০ মিটার বাটারফ্লাই—অজয় আগা [উত্তরপ্রদেশ] প্রথম, ধীলন [উত্তরপ্রদেশ] দ্বিতীয়, আর ওহরি [কপূরতলা সৈনিক স্কুল] তৃতীয়।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ১৫।১০।৬৬ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কুহেলিকা

শিল্পী—শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কার্তিক—১৩৭৩

প্রথম খণ্ড | চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

ঈশ্বর প্রণিধান

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি ॥

যিনি সবকে একসূত্রে বাঁধেন, যিনি প্রেমিক ও সর্বব্যাপক, তিনি যোগীর তপস্যার দ্বারা মোক্ষরূপে প্রকাশিত হন।

ঈশ্বর প্রণিধান—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ক্রমে প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষানুভূতির গৌরবে পরস্পর পারমার্থিক সম্বন্ধ বদ্ধ হয়ে সাক্ষাৎকারের মৌলিক অভীপ্সা ও অভিসার, আন্তরিকতার সঙ্গে চিদ্‌ঘনসত্তার ইন্ধনে ভাস্বর এবং নিত্য কাল ধরে বিনিদ্র থেকে শ্রবণের স্বঃলোকে, মননের স্বর্গরাজ্যে ও নিদিধ্যাসনের কম্পকেন্দ্রে সামঞ্জস্যের ত্রিবৃত্ত তথা সৎ-চিৎ-আনন্দ ধারায় স্বতঃস্ফূর্ত। কেননা আধ্যাত্মি সঙ্করণের অবর সংগঠন তো বিতর্ক সিদ্ধির সাধনায়, অভি নিবিষ্ট যুক্তির অবতারণায় ও শ্রদ্ধার সুবর্ণ ধ্বজা ধ' ভক্তির সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ ক'রে মুক্ত মঞ্চে এ পৌঁছে। একেই বলে ব্যুত্থান। যেন—

নির্বাক ভ্রমর প্রাণ। প্রণব সন্ধান
নিবিড় নিদ্রার মতো অংশু অনির্বাণ
ব্রহ্মরন্ধ্রভেদ। বরফ কঠিন বিদ্যুৎ
হাওয়া, জল, মাটি ও আকাশ
মন বুদ্ধি অহঙ্কার গোষ্পদ জগৎ

তৈত্তিরীয় তুলির বিন্যাস
বৈদিক বিস্ফার সৃষ্টি স্বপ্নের বুদ্‌বুদ্‌
নির্ব্যূঢ় সংবিদর্পণ, পুষ্পার্ঘ্য প্রদান
সুবর্ণ প্রদীপপঙ্ক বিবর্ত ব্যুত্থান
নিস্তন্দ ধূপের শিখা নিরুক্ত বিধান।
বিস্ময় স্মরণ। অকম্প মনন
অগ্নির দহন। তন্ত্রমালা মন্ত্রের সাধন
তীর্থঙ্কর তীর্থচর। ঊর্ধ্বশিখ
তপতী তন্ময়। আত্ম সম্মোহন
ব্রহ্মচারী ব্রহ্মে চরে। আঁধারে আলোক
অমুক্ত জীবনকণা অমৃত অশোক॥

বলাবাহুল্য যে যেহেতু যুক্তি ও তর্কের শকটে আরোহণ করে অগ্রসর হলেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বেদীমূলে এসে উপস্থিত হওয়া যায়, আবার নিষ্কর্ম যোগের হাঁটাপথ মাড়িয়ে জ্ঞানের রাজমার্গ অতিক্রম করে ভক্তির ভেলায় আরূঢ় হয়েই মুক্তির তোরণ দ্বারে এসে পৌছি। এক্ষেত্রে যুক্তি ও তর্ক, জ্ঞান ও কর্ম ভক্তির সহায়ক কিম্বা মুক্তির দিশারী। বস্তুতঃপক্ষে ভক্তিই মুক্তির একমাত্র কর্ত্রী। অমৃত ও প্রেম রূপা এই ভক্তি আবার ঈশ্বরের পরমা প্রিয়া হ'ল ভক্তি। এ ক্ষেত্রে ভক্তির বন্যাধারা যুক্তি, তর্ক, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা প্রভৃতি আময় জঞ্জালকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বা আত্মস্থ ক'রে সচ্চিদানন্দের সঙ্গে সাযুজ্য ঘটায়। স্বাভাবিক ভাবে তখন ভক্তির আর্তি ও প্রেমের প্রপত্তি সাধককে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত করায়। বিতর্ক ও বিচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের সুপরিকল্প বিন্যাসে ও বিভাজনে তপশ্চর্যা ও সাধনা, উপাসনা ও সমাসনা প্রত্যগ্র প্রমাত্মকে একাত্ম ক'রে দুশ্চর প্রতীক্ষার প্রৈষণায় ধ্যানাসীন হয়ে কল্পশূন্য হতে পারে এবং ত্রিতাপজ্বালা ও ত্রৈগুণ্য দুঃখের ঘটে আত্যন্তিক সন্ন্যাস।

যেহেতু—

অশেষ বিশেষ গুণের কর্তনে মুক্তি তোরণ যায় খুলে।
নিরাশা দুরাশা জন্ম মৃত্যু যাতনা তাড়না সব ভুলে॥

যেহেতু রোগ-শোক, জরা-ব্যাধি, জন্ম মৃত্যু, উদাসীনতা-উন্মুখতা প্রভৃতি দ্বন্দ্বের ফুলগুলো শুকিয়ে যায় নিষ্কম্প পরিবেশের অনাময় নিস্পন্দতায়।

হয়তো হিরণ্যসূর্যের হাজার হাজার প্রদীপ্ত সোনালী সুতোর চারু সাড়ী বসুধার নিটোল তনুতে লেপটে রয়। তেজোময় আকাঙ্ক্ষার বিদ্যুৎ তরঙ্গ চকিত হরিণ চোখে যেন দূর নক্ষত্র-জিজ্ঞাসা। আলোর হস্তশিল্প দূর্বাদল শীষে, ভোমরার রূপে রূপময় প্রজাপতি, জোনাকির বুকে হয়তো অযুত আকৃতিভরা স্থবির ফলক নিশ্চল ধ্যায়ান মগ্ন জ্যোৎস্না বিভায়। হয়তো প্রেমের দ্যুতি বহ্নিদীপ জ্বলে নির্নিমেষ দুটি স্বচ্ছ আঁখির তারায়।

সুতরাং দ্বিধা ও শ্রদ্ধা, ক্লীবতা ও বিদগ্ধতা বলে কিছুরই আভাস মেলে না বরং শ্রেয়ঃ সন্ধানের নির্ব্যূঢ় অর্চনায় মানস-চেতনার ক্ষাত্রবীর্য রণডঙ্কা ঝঙ্কৃত হয় গভীরভাবে এবং ব্রাহ্মবহ্নির হোমাগ্নিশিখা হৃদয় কন্দরের সকল কালিমা দীর্ণ করে অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধির দিগন্তে নিশ্চল হয়ে রয় যেন কোন উষার স্তব্ধ মুহূর্তের জবাকুসুম বর্ণাঢ্যের বিপুল বৈভব। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির স্বর্ণস্বপ্ন বাস্তবের মুখাপেক্ষী না থেকে সুষুপ্তির আনন্দ-লোকে বিলীন হয়ে যায়।

আর এমনি করেই সুকৃতির স্বর্ণশৃঙ্খল ও দুষ্কৃতির লৌহ অর্গল শিথিল হয়ে যায় হিরণ্ময় পাত্রস্থিত সুধার আস্বাদনে। প্রস্ফুরিত তৃষ্ণা, পাপ ও তাপ বিভ্রান্তিকর না হ'য়ে অনালোক বিতৃষ্ণা, পুণ্য ও শৈত্যেরই আবর্ত মাত্র বলে প্রতীতি জন্মে প্রজ্ঞা নেত্রে। যেহেতু নির্বিকল্প ভাবনায় বজ্রবিস্ফোরণে এ সবের সমাধি ঘটে মুহূর্তের ব্যবধানে। যার থেকে প্রেম ও আনন্দের রসধারা নিরন্ধ্র চিদাকাশ গর্ভে চুয়ে চু'য় পড়ে প্রত্যগাত্মার উদ্ভিন্ন চিত্তচিতায় আর নয়নেও ঐ প্রাচীনপুরুষের সংস্রলোচনদ্যুতি প্রতিফলিত হয়, যার জন্যে নয়নের প্রতি পত্রের উন্মীলনে সর্বভূতস্থাত্মাকে দর্শন করে রূপাকৃতি রূপে। তখন মূর্তি আর স্ফূর্তি উভয়ই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে সমর্পণের সার্থকতায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে আকৃতি আর নিরকৃতি মধুময় হ'য়ে ওঠে ঈশ্বরভাবনায়।

এইভাবে বলতে হয়—

জুড়ায় বুকের তাপ মিলায় বরফ।
আলো জল ধূলি সুধা সুন্দর পৃথিবী
জাগলো সুবর্ণ বেণু দ্যুতিমান রবি
অনিন্দ্য শিশুর হাসি জোনাকি হরফ।
শুচিস্মিত শুভ্রশৈলী শোভিত শ্রীমুখ
উচ্ছল ঝর্ণার মতো পল্লবিত বাক্

বর্ণরাগ গন্ধরাশি কর্পূর ঝরাক
নিশ্চল উষার স্তুতি ধূপের উৎসুক।
অনির্বাণ অভীপ্সার শুদ্ধ শিখা মেলে
স্বর্গীয় সুষমাময় চিত্ত পুষ্প রাজ
বসুধার মনোবনে যুক্ত ফুল্ল সাজ
যৌবন জ্যোতিষ্কদোলে তড়িৎ-হিল্লোলে

পার হ'য়ে নিশীথের আঁধার দেয়াল
ধূলির শিশির চূর্ণ সুরের জোয়ার
বিরল দিগন্ত প্রান্তে জ্যোতির ঝঙ্কার
জাগে আলো বুলবুল শিউলি সকাল
শুভ্রতার স্বচ্ছনীর। স্ফটিক বিস্ফার
সুবাসিত চিত্তদল অঞ্জলি পূজার।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পাদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

"দাস্যাদ্যায়তন" ॥
ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ
ভূমা শব্দতে ব্রহ্মে বুঝায় এ কথায় ভুল নেই
সম্প্রসাদাৎ অধি কথাতেই উপদেশ জেন তাই
ছান্দোগ্য উপনিষদের মাঝে
নারদ সনৎ কাছে
গিয়ে বলে আমি অধ্যয়ন প্রভু করিব তোমার কাছে
সনৎ কুমার বলেন কি বিদ্যা তোমার হে জানা আছে!
নারদ কহেন বেদ ইতিহাস গণিত তর্করাশি
পড়েছি অনেক আত্মবিদ হতে তোমার কাছেতে আসি।
সনৎ বলেন এ সব বিদ্যা নামের মধ্যে হয়
নারদ কহেন নাম অপেক্ষা বাক জেনো বড় হয়
তারো চেয়ে বড় চিত্ত যে হয় চিত্ত হইতে ধ্যান
ধ্যান হতে জেন বড় নিশ্চয় হয় জেন বিজ্ঞান
তারো চেয়ে বল, তারো চেয়ে জেন অন্ন হইয়া রয়
অন্ন হইতে অপ্, অপ্ হতে বড় তেজ হয়
তেজ হতে জেন আকাশ যে বড় আকাশ হইতে স্মৃতি
স্মৃতি হতে আশা আশা হতে প্রাণ এই ভাবে কহে শ্রুতি
প্রাণ হতে বড় সেই জন জানে অতিবাদী বলি তারে
নারদ বলেন অতিবাদী হতে আমার ইচ্ছে করে।

সনৎ কুমার বলেন তখন বিশেষে জানিলে তবে
সত্য বলিতে পারিবে তখন চিন্তায় জানা যাবে
শ্রদ্ধা নহিলে চিন্তা না হয় নিষ্ঠারে সাথে চাই
চেষ্টা করিলে মিলিবে নিষ্ঠা তবে সুখ পাবে ভাই
ভূমাতেই সুখ অনন্ত সুখ ভূমা ছাড়া সুখ নাই
এই কথা জেন সব সার কথা অল্পেতে সুখ নাই।
যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ
বিজানাতি স ভূমা অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি
অন্যৎ শৃণোতি অন্যৎ বিজানাতি তৎঅল্পং যো বৈ ভূমা
তৎ অমৃতং অথ যৎ অল্পং তৎ মর্ত্তম।

যাহাতে অন্য দেখা নাহি যায়
যাহাতে অন্য শুনিতে না পায়
অন্য কিছুই নাহি জানা যায় যাতে
তাহাই ভূমা সে অনন্ত সেই
তাহার তুলনা কোথাও না পাই
সকল তৃষ্ণা নিবারণ হয় তাতে
যাতে যায় জানা অল্প যে তাহা
যাতে শোনা যায় বোধ হয় তাহা
নিশ্চয় জেন মরণশীল সে হয়

ভূমাকে জানিও অমৃতময়
বলিবার নয় বুঝাবার নয়
যাঁহারে পাইলে পরাণ তৃপ্তি পায়
এখানে বিচার ভূমাই কি প্রাণ
পরমাত্মার ভূমাই কি নাম
এখানে জানিও ব্রহ্মের কথা হয়
সম্প্রসাদ সে প্রাণের পরেতে
উল্লেখ আছে জেন সেই মতে
সম্প্রসাদ সে সুষুপ্তি যারে কন
সুষুপ্তিতে সে প্রসন্ন হয়
ইন্দ্রিয় দল লুপ্ত যে হয়
পরাণ কেবল জাগিয়া তখন রহে
স্পষ্ট করিয়া যদি নাহি কয়
তবু জেন ভূমা প্রাণাধিক হয়
ভূমা যে অমৃত শাস্ত্রেতে ইহা কহে।
"স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত"
নিজ মহিমায় বিরাজিত তাহা
ইহার তথ্য যদি যায় জানা
সংসার সুখ অতিক্রমিয়া চলে
নিশ্চয় জেন ভূমা প্রাণ নয়
পরমাত্মাই হয় নিশ্চয়

বসাও তাঁহারে হৃদয় পদ্মদলে
আপন কর্ম ফলে
ভোগে জীব দলে দলে
জগতে আসিয়া দুঃখই শুধু পায়
কর্ম বন্ধন হতে
মুক্ত হইলে তবে
দেখিবে জগৎ ব্রহ্ম বিভূতিময়
শুধু আনন্দ সুখ
নাহিক কভুও দুখ
অমৃত আস্বাদ যদি সে কখন পায়
বন্ধন খুলে যায়
লুটাইয়ে পড়ে পায়
অকথিত সুখে বুক তার ভরে যায়।

ধর্মোপপত্তেশ্চ (৯)

ভূমার ভেতর নিহিত যা থাকে ধর্ম জানিও হয়
অন্যের মাঝে থাকে না শুধু সে পরমাত্মায় রয়
সবেতে আত্মা ময়
সুখ সে নিরতি বায়
সত্যতত্ত্বে উজলি সে জন মহিমায় বিরাজিত
সর্বগতত্ব শুধু সেই পারে সবেতে আনন্দিত ॥

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(রমন্যাস)
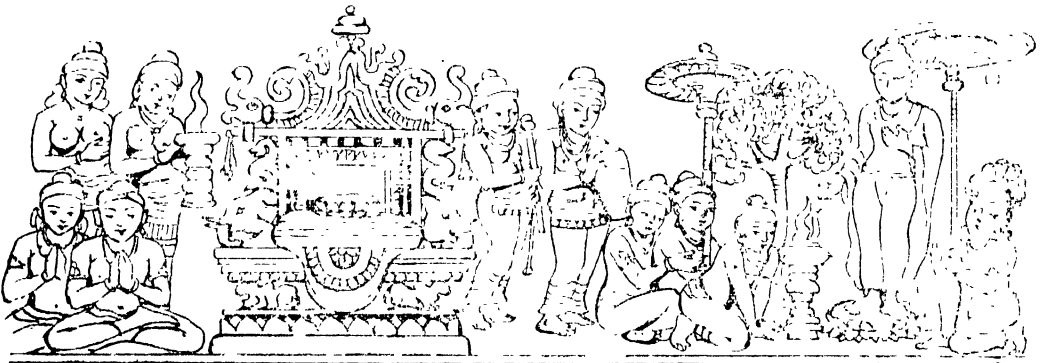
[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

দুই

অসিতের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে বৈরাগী তাকে বলেছিল—তার গুরুমা-র নাম শান্তিমা, কন্যা-শিষ্যার নাম ললিতা। বলেছিল হেসে : "যেখানে আমরা উঠেছি তাকে বাংলো বা কুটির কোনো নাম দেওয়াই চলে না। টিনের ছাদ দুটি ঘর মাত্র। আগে এখানকার এক শেঠজির গোয়াল ঘর ছিল। ঘরে জানলা আছে, কিন্তু দোর ভেঙেচুরে এমন অবস্থা হয়েছে যে ভিতর থেকে খিল···

অসিত স্নান সেরে পথে এক টঙ্গা ধ'রে সোজা গেল স্টেশনে। সেখানে লাগেজ-রুম থেকে ওর তোরঙ্গ ও বিছানাপত্র নিয়ে সোজা গেল স্বামী দেবানন্দর কাছে। স্বামীজি ওকে ত'র ঘরে বসিয়ে চা নিয়ে এলেন স্বহস্তে। জলযোগে গল্প জ'মে উঠল।

প্রেমলের কাহিনী শুনতে না শুনতে স্বামীজি বললেন : "হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঁকে জানি বৈ কি। প্রথমবার বৃন্দাবনে উনি আমাদের এখানেই ছিলেন যে! মাঝে মাঝেই এখানে আসেন। বৃন্দাবনের উনি বিষম ভক্ত। (হেসে) খাস সাহেব যখন হিন্দু হল তখন কি আর রক্ষে আছে মশাই? হিন্দুদের তুস্নো দেন হিঁদুয়ানিতে—এদেশকে দেখেন ওঁরা তো চর্মচক্ষে নয়, দিব্যনেত্রে।

অসিত : উনি বললেন—ওঁর গুরুমা-র নাম শান্তি দেবী। কিন্তু আশ্রম কোথায় বলেন নি। জানেন কি?

দেবানন্দ : আপনি লক্ষ্ণৌয়ে তো যান মাঝে মাঝে—শোনেন নি? শান্তিদেবীর স্বামী লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত ডাক্তার—তিনি স্ত্রীর জন্যে আলমোরার এক গহন অরণ্যে একটি মন্দির গ'ড়ে দিয়েছেন—সেখানেই প্রেমল মহারাজ কায়েমী হ'য়ে বসেছেন—সাধনা করেন।

অসিত : লক্ষ্ণৌয়ের ডাক্তার?—নাম কি?

দেবানন্দ : শ্রীমহেন্দ্রনাথ সান্যাল—খুব ধনী।

অসিত : মহেন্দ্রবাবু? তাঁর সঙ্গে আমার একবার আলাপ হয়েছিল লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সভায়। তিনি আমার ভজন শুনে (হেসে) আমাকে একটি সোনার মেডেল উপহার দিতে চেয়েছিলেন—জানেন?

দেবানন্দ [হেসে] : আকবর শা হ'লে দিতেন গলার মুক্তামালা নিশ্চয়ই! তবে ভজন গাইলে দিতেন না—গাইতে হ'ত আপনাকে মিঞা মল্লার বা দরবারী কানাড়া। তবে এসব ওস্তাদি গানেও তো আপনি পাকা।

অসিত [হেসে] : ছিলাম একসময়ে। তবে এখন গাই বেশির ভাগ ভক্তির গান, জানেনই তো—মানে ভজন কীর্তন। কাজেই এখন মহেন্দ্রবাবু যদি রাতারাতি আবুহোসেনের মতন হারুন অল রসিদ হয়ে আমাকে ডাক দেন তবে আমার আর মুক্তামালা পাবার কোনো আশাই নেই।

দেবানন্দ [প্রসন্ন] : জানি অসিতবাবু। আর বলতে কি, আপনি যদি ঐ ওস্তাদির চরকিবাজি ছুড়তেন গলার আগুনে তবে আমি ভরসা করে আপনাকে আমাদের আশ্রমে নিমন্ত্রণ করতেই পারতাম না।

অসিত [হেসে] : কেন? লঙ্কাকাণ্ডের ভয়ে? আমি ঠিক বীর হনুমান না।

দেবানন্দ [হেসে] : না, বীর হনুমানের এখানে অভাব

নেই—ঐ দেখুন না সামনের গাছে। কিন্তু লেজের আগুনের চেয়েও বিষম আগুন হ'ল ওস্তাদির আগুন। উঃ—এক ওস্তাদ—

অসিত [হাত তুলে]: মাফ করবেন স্বামীজি। ওস্তাদি গান গাওয়া ছেড়ে দিলেও ওস্তাদি গান শুনতে আমি এখনও ভালবাসি। শিখিও—সুবিধে হ'লেই।

দেবানন্দ [সবিস্ময়ে]: এখনো শেখেন ওস্তাদি তা না না না! বলেন কি অসিতবাবু?

অসিত: আচ্ছা আপনাকে একদিন শোনাব—তানবাজি নয়, দুচারটি ধ্রুপদ। আপনারও ভালো লাগবে—মিলিয়ে নেবেন। কিন্তু সে যাক্, বলুন আর একটু প্রেমল মহারাজের কথা। আমার ওঁকে ভারি ভালো লেগে গেছে।

দেবানন্দ [হেসে]: আপনার রুচিকে দোষ দেওয়া চলে না এজন্যে—যদিও একথা সত্যি নয় যে সকলেরই ওঁকে ভালো লাগে।

অসিত: সংসারে অজাতশত্রু কি কেউ আছে স্বামীজি?

দেবানন্দ: যা বলেছেন। তবে কি জানেন? জানেনই তো, আমাদের মধ্যে ঈর্ষা বৃত্তিটি একটু বেশি ব্যাপক বলেই দুঃখ করে লিখেছিলেন স্বামীজি আমেরিকা থেকে? বৃন্দাবনে আবার তার ওপর একদল গোঁড়া আছেন—তাঁদের নাম করব না—যাঁরা মনে করেন যবন দেহ অশুচি। দুঃখের কথা বলব কি অসিতবাবু, প্রেমল মহারাজের মতন মহাভাগকেও অনেক মন্দিরে ঢুকতে দেয় না পূজারীরা, ভাবতে পারেন?

অসিত: সে কি বলুন? ওঁর সঙ্গে যেটুকু পরিচয় হয়েছে তাতে আমার তো মনে হয়েছে—এমন মনেপ্রাণে হিন্দু হিন্দুদের মধ্যেও বিরল। আর মুখে এমন আলো সাধকদের মধ্যেও বেশি দেখি নি স্বামীজি, মাপ করবেন।

দেবানন্দ [উদ্দেশে নমস্কার করে]: মাপ করব বলছেন কী অসিতবাবু? প্রেমল মহারাজ যে মস্ত আধার এ শুধু গোঁড়া অন্ধরা ছাড়া আর কেউ আছে কি যে দেখতে পায় না? তাহ'লে বলি শুনুন ওঁর একটি কাহিনী—আমার স্বচক্ষে দেখা। [থেমে] আপনাকে বলেছি—উনি মাঝে মাঝে বৃন্দাবনে এসে থাকেন। সেবার—প্রথমবার—এসে আমাদের মিশনেই ছিলেন এই ঘরেই। তখন ললিতা দেবী ওঁর শিষ্যা হন নি তো, কাজেই ঝাড়া হাত পা।

অসিত: ললিতা দেবী কে?

দেবানন্দ: উনি বলেন নি আপনাকে? শান্তি দেবীর মেয়ে। শুনেছি তিনিও না কি মা-র মতনই খুব উচ্চকোটির সাধিকা—

অসিত: রসুন, প্রেমল মহারাজ আপনাদের অতিথি হয়ে কতদিন ছিলেন বৃন্দাবনে?

দেবানন্দ: তা দশবারো দিন হবে।

অসিত: ওঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হ'ল কোথায়!

দেবানন্দ: সে এক ইতিহাস অসিতবাবু! কী ভাবে যে ঠাকুর লীলা করেন কেউ কি জানে, না জানবে কোনোদিন? হ'ল কি শুনবেন? আমি গিয়েছি নাসিকে। হঠাৎ দেখি গোদাবরীতে এক উজ্জ্বলকান্তি দীর্ঘকায় সাধক কোমর জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে তর্পণ করছেন। বুঝতে বাকি রইল না যে, সাধকটি খাস সাহেব। আকৃষ্ট হলাম বৈকি। স্নান করতে করতে কেবলই চেয়ে চেয়ে দেখি। মাঝে মাঝে তাঁরও চোখ পড়ে আমার দিকে। বুঝলাম—এরই নাম শুভ দৃষ্টি—Whoever loved that loved not at first sight? আলাপ করতে ইচ্ছা হ'ল, ভাবছি কী ক'রে এগোই—এমন সময়ে বিধাতা কল্পতরু হ'য়ে ওঁকে পাঠালেন নদীর পাড়ে এক গণেশ মন্দিরে। তিনি ঢুকতে যাবেন এমন সময়ে মন্দিরের পূজারী হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এল—ম্লেচ্ছ যে! আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে ধমকালাম গোঁড়া পুরুতকে: "ভেবেছ কি? আমি ম্যাজিস্ট্রেটের বন্ধু, তাঁর কাছে রিপোর্ট করব ...ইত্যাদি। সে ভয় খেয়ে স'রে দাঁড়াল—আমরা দুজনেই মন্দিরে ঢুকে গণেশজিকে প্রণাম ক'রে বেরুলাম। বলা বাহুল্য আলাপ জ'মে উঠল। আমি ওঁকে নিমন্ত্রণ করলাম বৃন্দাবনে আসতে। এসে উঠলেন আমাদের মিশনে। তখন ধরলাম একদিন—কিছু বলতেই হবে। উনি রাজী হলেন। এমন চমৎকার বললেন যে, বহু শ্রোতা ধরল—আরো ভাষণ শুনবে। উনি তখন বিপন্ন কণ্ঠে আমাকে বললেন: "এ আমি পারব না স্বামীজি। আমি বৃন্দাবনে এসেছি বৈষ্ণবদের কাছে—অনেক কিছু

শিখতে—বক্তৃতা দিয়ে লোকশিক্ষা দিতে নয়। তাছাড়া আমার 'চাপরাশ' নেই তো।"

অসিত: আমাকেও আজ ঠিক এই কথাই বলেছিলেন একটু ঘুরিয়ে: "এদেশের মাটিও চিন্ময়—এখানে এসে শুধু ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে হয়, এহেন পুণ্যভূমিতে এসে বিদেশীরা কী বলবে তাদের যারা এ আবহে মানুষ?" ব'লে আওড়ালেন ভাগবতের বিখ্যাত শ্লোক—উদ্ধব বলছেন; আমি যেন পরজন্মে বৃন্দাবনের গুল্ম লতা ঘাস হ'য়ে জন্মাই, তাহলে গোপীদের পায়ের ধুলোয় ভ'রে যাব—শ্লোকটি জানেন নিশ্চয়ই?

দেবানন্দ: জানি? বিলক্ষণ! কতবারই তো আমাদের মিশন হলে বক্তৃতা দিতে উঠে ফাটিয়ে দিয়েছি বলে:

আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং

বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং...আওড়ে জাঁকালো ভাষ্য ক'রে এখানকার ভক্ত বৈষ্ণব—বিশেষ ক'রে সুপণ্ডিতা বৈষ্ণবীদের হাততালি কুড়িয়েছি।

অসিত (হেসে) বৈষ্ণবীরাও হাততালি দেন নাকি!

দেবানন্দ: বাঃ। চোরা গোপ্তা দেন বৈকি।

তাঁদের কি সন্দেহ আছে এতটুকু যে, ব্রজবাসী হ'তে না হ'তে যদু মধু যাদবী মাধবী সবাই রাতারাতি গোপ-গোপী ব'নে যান?

অসিত (হেসে): বলেছেন ভালো। উনিও আমাকে ঠিক এই ধরনেরই একটা কথা বলেছিলেন। কিন্তু সে থাক, বলুন তারপর? আমি ওঁর সম্বন্ধে আর একটু জানতে চাই।

দেবানন্দ: কিন্তু তাহ'লে হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন? ওঁকে একদিন ডাকি না আপনার ভজনে। তারপর সবাই চ'লে গেলে নিরালায় আলাপ করবেন ওঁর সঙ্গে।

অসিত (খুশী): বেশ কথা। তবে আমাকে উনি কাল ডেকেছেন ওঁদের ওখানে খেতে আর বলেছেন আপনাকেও খেতে হবে। ওঁর শিষ্যা ললিতা দেবী না কি চমৎকার রাঁধেন—বলছিলেন।

দেবানন্দ: বলেন কি! ললিতা দেবী যে ছিলেন ফ্যাশনেব্‌ল মেয়ে।

অসিত: তাঁকে চেনেন আপনি?

দেবানন্দ: চিনি না? বাঃ। লক্ষ্ণৌয়ে ওঁদের বাড়ীতে একদিন খেয়ে এসেছি যে। তখন ললিতা দেবীর শাড়ী ব্লাউজের কী বাহারই যে ছিল। আর ওঁর মা শান্তিদেবী ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের মহিলাসমাজের leader of fashion—ডাকশাইটে dame de Salon যাকে বলে—bobbed hair ইংরাজী বুলি মুখে খই ফুটছে—না খইয়ের সঙ্গে সিগারেটও। তাঁর মেয়ে এলেন বৃন্দাবনে আর রয়েছেন লুকিয়ে গোয়াল ঘরে?

অসিত (হেসে): শুনেছি জানেনই তো—ঠাকুরের বাঁশির ডাকে সাড়া দিতে না দিতে মানুষের মনের প্রাণের রঙ বদল হয় বহুরূপীর মতন—হয়ত ললিতা দেবীও সাড়া দিয়ে থাকবেন। লালাবাবুর ইতিহাস তো জানেন?

দেবানন্দ (মাথা নেড়ে): লালাবাবুরা ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মান না অসিতবাবু। বৃন্দাবনে আমি বোষ্টম বৈরাগী দেখেছি কি কম? কিন্তু বেশির ভাগই মেকি—স্রেফ ফাঁকা অসিতবাবু—শুধু বুলিসার। দুচারটে চোস্ত সংস্কৃত শ্লোক, চৈতন্য চরিতামৃতের বা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুপ্রাস নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ—কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

অসিত: কিন্তু ললিতা দেবী হয়ত ঠিক তাঁদের দলে পড়েন না।

দেবানন্দ (জিভ কেটে): ছি ছি! আমি কি অমন ইঙ্গিত করতে পারি কখনো? তাছাড়া আমি কি জানি না অসিতবাবু যে এক কথায় ত্যাগ করতে পারে তারাই যারা ভোগ করেছে চুটিয়ে? ললিতা দেবীর কথা অবিশ্যি বলতে পারি না। তবে শান্তিদেবীর মেয়ে যখন তখন ভোগ বেশ কিছু করেছেনই করেছেন—অবধারিত। আমার কেবল আশ্চর্য লাগে ভাবতে ওঁরা বৃন্দাবনে এসে এক ভাঙা গোয়াল ঘরে রইলেন এতে শান্তিদেবী মত দিলেন কেমন ক'রে? (থেমে) অবিশ্যি শুনেছি শান্তিদেবী মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন কয়েক বছর আগে—

অসিত: মাথা মুড়িয়ে?

দেবানন্দ: বাঃ! কুলীন সন্ন্যাস দীক্ষায় যে মাথা না মুড়োলেই নয়—যদিও (হেসে) ঘোল ঢালা শাস্ত্রীয় কিনা বলতে পারি না। কিন্তু না, প্রগল্‌ভতা ঠিক নয়। কারণ শান্তি দেবী সত্যিই মস্ত সাধিকা—আমার গুরুদেবের মুখে শুনেছি। তিনি ওঁকে বহুদিন থেকে জানতেন যখন উনি

কুমারী ছিলেন। মস্ত আধার। নৈলে স্বামী বিবেকানন্দ কি ওঁকে কুমারী পুজো করতেন?

অসিত: বলেন কি?

দেবানন্দ: একেবারে অক্ষরে অক্ষরে, অসিত বাবু। গুরুদেবের মুখে শুনেছি শান্তি দেবীর না কি ছেলেবেলায় একবার স্বপ্নে কৃষ্ণদর্শনও হয়েছিল।

অসিত (উদ্দীপ্ত): বটে? তারপর?

দেবানন্দ (হেসে): আপনার কৌতূহল মেয়েছেলে-দেরও হার মানায়, অসিত বাবু! আমার কি ছাই মনে আছে গুরুদেব আরো কী কী বলেছিলেন ওঁর সম্বন্ধে? তবে একথা সবাই জানে যে, বছর পাঁচ-ছয় আগে তিনি স্বামীর অনুমতি নিয়ে সংসার ছেড়ে প্রস্থান করেন হিমালয়ে। আলমোরার গহন অরণ্যে এক মন্দির বানিয়ে সেখানে নাকি সেই থেকে অশ্রান্ত জপ ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তবে এ আমার লোকমুখে শোনা। এর বেশি যদি খবর চান তো আমি নিতে পারি অবশ্য। কিন্তু আপনি তো কাল যাচ্ছেন ওখানে—হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন আর? প্রেমল বাবাজিকেই জিজ্ঞাসা করবেন না।

অসিত (একটু পরে): তাই করব।

তিন

রামকৃষ্ণ মিশনে অসিত ছিল একটি সুন্দর নির্জন ঘরে। এই সব কথাবার্তার পরে দুপুরে খেয়ে দেয়ে একটি আরাম কেদারা বারান্দায় টেনে সবে বসেছে এমন সময় ঝমাঝম বৃষ্টি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখে—মেঘচমূদের আস্ফালন প্রায় দানবিক হয়ে উঠেছে। কড় কড় কড় কড়! উঃ!—ঐ ফের চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ! কিন্তু কী সুন্দর মেঘ! মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকে আর মনে ওর একটি প্রিয় গানের দুটি চরণ গুনগুনিয়ে ওঠে:

"আজ সকালে মেঘের ছায়া লুটিয়ে পড়ে বনে।

জল ভরেছে ঐ গগনের নীল নয়নের কোণে।" এমন ওর কতবারই তো হয়েছে—ভোলা প্রিয় গানের চরণ স্মৃতির তারে ঝঙ্কার দিতেই যেন সে ঝঙ্কার টেনে আনে নানা অনুরূপ গুঞ্জন! ওর মনে রণিয়ে উঠল—অমনি পকেট ডায়রি খুলে লিখল:

ঐ বহিল ধারা
ছিল নিরুদ্ধ যত নীর সুপ্তিহারা—
দেখ, বহিল তারা!

সঙ্গে সঙ্গে সুরও বেজে ওঠে সুরটমল্লার—

দূরে গগনে যে দেয় তান মেঘ-আঁধারে,
বলে নিরাশার নাগরিকে: "জাগো জাগো রে,
ছিলে যার লাগিয়া আশা পথ চাহিয়া
তুমি বন্ধ্যা তৃষায়—আমি তাহারি তরে
নীল ঝারিটি ভ'রে
দেখ এনেছি বহিয়া শ্যামলের ইসারা—
তারি বহিল ধারা।
"তারি আকাশ-আকুলতার অকূল বাঁশি
করে ঝরঝরি মাটির মর্মে উদাসী।
যারে অবনী যাচে রাজে আমারি মাঝে,
নিতি তাই তো মাটির ডাকে নামিয়া আসি,
আমি ভালো যে বাসি,
তাই তরল প্রণয়ে ভাঙি পাষাণকারা—
তারি বহিল ধারা।"

ঝর ঝর ঝর ঝর···বৃষ্টি দেখতে দেখতে উদ্দাম হয়ে ওঠে। আরাম কেদারাটি বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে টেনে নিতে হয়। পায়ের কাছে ছাটের লুটোপুটি! চারদিক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।···আশ্চর্য—ভাবে অসিত—আশপাশের তাপ বা শীতলতার সঙ্গে সঙ্গে মনও কী চমৎকার তাল রেখে চলে! গ্রীষ্মে যে-মন আই ঢাই করে সে এক মুহূর্তেই বর্ষার প্রসাদে গান গেয়ে ওঠে সা-পেয়েছির-দেশের সুরে দোয়ার দিয়ে।

ঝর ঝর ঝর ঝর···চারদিকে ধারাবর্ষণের দ্রুতবর্ধিত বেগে এক বৈরাগী আনন্দের সুর জেগে ওঠে। মাটি থাবে আকাশের কাছে হাত পেতে—এ তো কথার কথা নয়। দুদিন তাপ বাড়লে মানুষ কী ছুটে ছুটই না করে একটু ঠাণ্ডায় জুড়োতে···কখনো ছোটে শৈলাচলে, কখনো নদী স্নানে, কখনো সাগরতীরে। বাইরের তাপ মনেও সংক্রমিত হয় আর্তি হ'য়ে যেন। সত্যি মানুষ কি অসহায়! স্বাবলম্বী হবার পথে বাধা কি একটা? আকাশ বাতাস মেঘ সূর্য শিলাবৃষ্টি ঝড়তুফান বিদ্যুৎ বাজ সং কিছুই হ'তে পারে সাধনার বাধা, করতে পারে মানুষকে আর্ত, ক্লিষ্ট, পঙ্গু! সে আপ্রাণ চেষ্টা করে বটে:

"এই কথাটা ধ'রে রাখিস্ মুক্তি তোকে পেতেই হবে, খুসি হয়ে ঝড়ের রূপে হাওয়ায় ঢেউ যে তোকে খেতেই হবে" কিন্তু এ-পাওয়া কি সোজা পাওয়া? পারে কজন? আর যারা পারেও তারা কত সাধনার পরে তবে পারে—তাও হয়ত দুদিনের জন্যে। দুটো ঘা-র পরে তিনটে বাজতেই আর টাল সামলাতে পারে না।

ঝর ঝর ঝর ঝর……ঐ সামনে কদম্ব গাছের তলায় জল জমে…দেখতে দেখতে সামনের শুক্‌নো মাটির'পরে জলের সতরঙ্গ কাঁপতে থাকে…

ঝর ঝর ঝর ঝর…ফুট ফুট ক'রে বৃষ্টির ধারায় জলের আস্তরণে হিল্লোল জেগে ওঠে…থেকে থেকে হু হু হু হু শব্দে ঝাপটা আসে দমকা হাওয়ার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে, আর মনে হয় ঠিক যেন সামনের মাটিতে সবে-জাগা পুষ্করিণীটি হেলছে দুলছে পরমানন্দে—থেকে থেকে ছুটে-আসা ভিজে হাওয়ার ইসরার তালে তালে।

কড় কড় কড়াৎ…দিগন্তে দীপ্ত বিদ্যুতের ছুরি ঝল্‌কে ওঠে ··আবার ঐ মেঘের টঙ্কার…বুকের রক্ত দুলে ওঠে। অনেকে বাজ পড়লে ভয় পায়। কিন্তু কেন? চমকে ওঠা? মানি। কিন্তু কত আনন্দই তো চমকের মধ্যে দিয়েই নিজেকে জানান দেয়। অসিতের মনে পড়ে—একবার বাঙ্গালোরের কাছে নন্দী পাহাড়ের অতিথিশালায় ছিল। ভোরে বৃষ্টি হয়েছে। ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের বুকে মাঝে মাঝে নীলিমার নীল চাহনি দেখা যাচ্ছে। অসিত বেরিয়েছে এম্‌নি বেড়াতে। ভিজে মাটির গন্ধে মনে শিহরণ জেগে উঠেছে…হঠাৎ ও কী? এক সাপ! শির শির ক'রে ওঠে স্নায়ুতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে—কী সুন্দর! কাছ থেকে এক মেঠো বাঁশির সুর ভেসে আসে আর সাপটি ফণা তুলে শোনে। কী চমৎকার! এক ফালি নরম সূর্যের আলো পরে তার ফণায়। আলো ঠিকরে ওঠে। এ স্বচক্ষে দেখা। প্রথমে চমক—ভয়, কিন্তু তার পরেই সাপেরও ফণায় যেন মণি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ওখানকার এক মন্দিরের পূজারীর কাছে শুনেছিল তারা নাগপঞ্চমীতে সাপের পূজো করে। পূজারী বলেছিল: "সাপকে সত্যিই পোষ মানানো যায় বাবুজি! সত্যিই আমরা তাকে দুধ কলা দেই মাঝে মাঝে।" অসিতকে পরে সে বলেছিল যে সে এই সাপটিকেই দেখেছে। কারণ সে প্রায়ই বাঁশি শুনলেই ফণা তুলে দোলে।

ঝর ঝর ঝর ঝর…জলের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর সম্বন্ধ। এক সময়ে তো আমরা জলচরই ছিলাম। তারপর উভচর। তারপরে না মাটির মানুষ এল। অন্ততঃ এই রকমই তো গুজব। মরুক গে…আমরা কবে কী ছিলাম জানতে না পারি, কিন্তু এটা জানি যে, জল আমাদের ডাকে মাটিছাড়া করতে, যেমন মাটি ডাকে জল ছেড়ে তার কোলে ঠাঁই পেতে। আমাদের শরীরের বারো আনা তো শুনি নিছক জল। তাই কি এত ভালো লাগে বর্ষার ঝর ঝর ঝর ঝর!

ভাবতে ভাবতে তন্দ্রা আসে। দেখে এক চমৎকার স্বপ্ন:

যমুনায় চলেছে এক নৌকোয় প্রেমলকে নিয়ে। হঠাৎ আকাশে ঘনঘটা। অসিত মাঝিকে বলে নৌকো তীরে ভিড়াতে। প্রেমল বাধা দেয়: "না না বেশ তো নদীতে বৃষ্টি বড় চমৎকার!"

"কিন্তু ঝড় উঠল ব'লে—"

"তাহ'লেই বা ভয় কি?" বলে প্রেমল "ঠাকুর তো আছেন!"

বলতে না বলতে এক দম্‌কা হাওয়ায় নৌকো উল্টে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রেমল মহানন্দে চেঁচিয়ে উঠল: "ভয় কি? ঐ দেখ সামনে অশ্বথ গাছের লম্বা শিকড়। বলি নি ঠাকুর আছেন?"

শিকড় চেপে ধরতেই অসিতের বুকে ভরসা জেগে উঠল। বলল: "সত্যিই তো! কিন্তু মাঝদরিয়ায় শিকড়!

প্রেমল ব'লে ওঠে: "ঠাকুর সব হ'তে পারেন কেবল শিকড় হ'তে পারেন না?"

ঘুম ভেঙে যায়। আনন্দে শান্তিতে মন ছেয়ে গেছে। চেয়ে দেখে তখনও সমানে চলেছে বৃষ্টি:

ঝর ঝর ঝর ঝর…

হঠাৎ স্বামীজির ডাক: "এই যে চা, অসিতবাবু! উঃ! কী বৃষ্টি!"

অসিতের হঠাৎ মনে পড়ে প্রেমলের কথা। বলে: "কিন্তু স্বামীজি, এ দারুণ বৃষ্টিতে ও'রা দুটিতে কী ভাবে

আছেন এখন! সে ভাঙা গোয়াল ঘরে নাকি একটা দোর পর্যন্ত নেই।"

স্বামীজি হেসে বললেন: "কিন্তু বৈরাগী মহারাজের অগাধ বিশ্বাস। কথায় কথায় বলেন—ঠাকুর আছেন। তাঁকে বৃষ্টি কী করবে?"

অসিতের মনের মধ্যে সম্ভ্রম জেগে ওঠে। মনে প'ড়ে যায় স্বপ্নের কথা। বলে: "জানেন স্বামীজি! আমি এই-মাত্র একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি।"

ব'লে স্বপ্নটির বর্ণনা করে খুঁটিয়ে।

স্বামীজি: "কিন্তু তাঁর এই প্রিয় বুলিটি কি আপনি তাঁর মুখে আজ সকালে শুনেছিলেন?"

অসিত: "এখন মনে পড়ছে—শুনেছিলাম। হয়েছিল কি, ওঁর পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল। উনি বলেছিলেন স্নান সেরে ফিরে গিয়ে কাঁটাটি তুলবেন—ঠাকুরের ভাষায়—আর একটি কাঁটা দিয়ে। আমি বললাম: "না দাঁড়ান, আমার কাছে সেফটিপিন আছে। এই ঘাটেই কাঁটাটি তুলে না দিয়ে ছাড়ছি নি। আপনি আমাকে কচ্ছপের হাত থেকে বাঁচালেন তার কিছুটা অন্ততঃ প্রতিদান না দিলে চলে? "ব'লে ঘাটে ব'সেই ওঁর পা থেকে কাঁটাটি তুলে দিলাম। উনি হেসে বললেন: "দেখলেন? বলি নি ঠাকুর আছেন? তিনি এলেন সেফটিপিন হ'য়ে—হা হা হা!"

দেবানন্দ [চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে]: আমার কী যে ভালো লাগে ওঁর খোলা হাসি অসিতবাবু, কী বলব? কিছু যদি মনে না করেন, তো বলি—আপনাকেও এত ডাকাডাকি করি ঐ একই কারণে—আপনিও হাসতে পটু ব'লে। কি জানেন অসিতবাবু, বৃন্দাবনের অনেক সাধকদের সঙ্গেই মিশতে কেমন যেন ভয় ভয় করে—মনে পড়ে সুকুমার রায়ের ছড়া: 'রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাঁদের মানা।' বলতে কি, আমি তাঁকে এক আঁচড়ে চিনে নিই প্রথম তাঁর হাসি দেখেই।

অসিত (চায়ে চুমুক দিয়ে): কী রকম?

দেবানন্দ। উনি সেবার আমাদের এখানেই উঠেছিলেন—বলছি। জানেনই তো, হাজার গেরুয়া পরলেও সাহেবকে দেখে চট্ ক'রে দিশি মনে হয় না। তাই আমি বেশ একটু সমীহ ক'রে চলতাম ওঁকে। তাছাড়া আমিও তো একটু কেওকেটা নই ভাব। কাজেই কথাবার্তা কইতাম একেবারে নিখুঁৎ অষ্টাবক্র সংহিতা। অর্থাৎ পান খেয়ে চুনটি পর্যন্ত যেন না খসে সাহেবের সামনে—এই ভাব। তখন কি জানি—কিন্তু না, শুনুনই না কী হ'ল। এই গল্পটিই সকালে বলতে গিয়ে কথার মোড় ঘুরে যেতে আর বলা হয় নি।

একদিন চলেছি আমরা যমুনায় স্নান করতে—হঠাৎ পথে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা—মাধব মৈত্র। মানুষটি খুবই ভক্ত ও নম্র, কিন্তু একটু গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারি মানুষ। কাজেই আমার সঙ্গে ওঁকে দেখেই প্রশ্ন ক'রে বললেন: "মহারাজ, আপনার দেশ কোথায় বলবেন কি দয়া ক'রে?" আমি ভাবলাম: এই সেরেছে রে! এর পরে জিজ্ঞাসা করবেন বাপের নাম। কিন্তু মহারাজ ধরা দেবার পাত্র নন তো, পাল্টা প্রশ্ন ক'রে বসলেন: আমার সত্যিকার দেশ, না মিথ্যে? "মাধববাবু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন: "তা—ইয়ে—সত্যিকার দেশই অবিশ্যি।" বৈরাগী মহারাজ হেঁট হ'য়ে বৃন্দাবনের একমুঠো রজঃ তুলে নিয়ে নিজের মাথায় ধ'রে বললেন: "এই দেশ। "মাধববাবু তো থ। বললেন: "আর—ইয়ে—মিথ্যে দেশ? "উনি হো হো ক'রে হেসে বললেন: "ডাক্তারবাবু! মানুষ মিথ্যা থেকেই সত্যে উঠতে চায় সিঁড়ি বেয়। তার পরে ফের নামতে চায় কে মিথ্যের খবর পেতে?" (হেসে) সেদিন আমারও চৈতন্য হ'ল—সত্যি বলছি। কী গেরো! এঁকে সাহেব মনে ক'রে কেবল শাস্ত্র কথা আওড়ে এ-কয়দিন মিথ্যে মিথ্যে হাসি গল্পের রস থেকে বঞ্চিত থেকেছি কী দুঃখে? বৈরাগী মহারাজ বোধহয় টেলিপ্যাথি জানেন, বললেন: "কী স্বামীজি, তটস্থ ভাব কেটে গিয়ে ভরসা এসেছে তো, না আপনাকেও ব্যাখ্যা ক'রে তবে বোঝাতে হবে যে যেমন পাখা থাকলেই পাখী হয় না, তেমনি দাঁত নখ থাকলেই তাকে নখী দন্তী ব'লে ছেপে দেওয়া চলে না?" (হঠাৎ) কিন্তু অসিত বাবু, একটা কথা মনে হ'ল হঠাৎ যে তাহ'লে তো সাঁতার জানলেও তাকে জলচর বলা চলে না। এ-প্রলয় পয়োধি জলে বৈরাগী মহারাজের গোয়াল ঘরটির আজ না জানি কী অবস্থা!

অসিত: একথা আমারও মনে হয়েছিল স্বামীজি!

যে-বার শিষ্যকে নিয়ে উনি ঘরকন্না করতে এসেছেন তাকে এখন হয়ত উপাধি দিতে হবে ঘরবন্ধা।

দেবানন্দ : বটেই তো। কিন্তু—কী করি বলুন তো? আমাদের এখানে যে সব ঘরই অতিথিতে ভরতি। কাল এসেছেন দুটি আমেরিকান একটি পোল আর একটি কাশ্মীরী ভক্ত। আমাদের অতিথিশালা না বাড়ালে···

অসিত : আপনাদের কোনো ভক্তের বাড়ীতে ব্যবস্থা হয় না?

দেবানন্দ : খাস সাহেব যে অসিতবাবু!

অসিত (অতপ্ত কণ্ঠে) : আপনার মুখে যা শুনেছি আর স্বচক্ষে যা দেখেছি তার পরেও কি ওঁকে সাহেব বলা চলে স্বামীজি?

দেবানন্দ : তা বটে। তবু—জানেনই তো গোরা মুখ তো—ভয় পায়, বিশেষ এখানকার ভক্ত-সম্প্রদায় তাদের আবার ছোঁওয়া ছুঁইয়ির বাতিকও আছে তো—বিশেষ বৃন্দাবনে।

অসিত (ভেবে) অচ্ছা, ঐ ডাক্তার মাধব বাবু—যাঁর কথা বললেন—তাঁর বাড়ীতে ব্যবস্থা হয় না?

দেবানন্দ (লাফিয়ে উঠে) : ঠিক ঠিক, এই দেখুন—ঠাকুরের উপমা মনে পড়ে না—এক মুসলমান টিকে ধরাতে আগুন চেতে গেছে পাশের বাড়ী। তারা তো অবাক : "সে কি মিঞা? তোমার হাতে লণ্ঠন জলছে যে!" তিনি বিলেত-ফেরৎ—বাড়ীও বড়, গৃহিণীটিও সুশীলা। ওঁর ওখানেই তুলি। রসুন আমি এক্ষুনি লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্ছি ওঁরা রাজী কি না? আহা বৈরাগী মহারাজের ঘর হয়ত এখন মানস সরোবর হয়ে গেছে!

[ক্রমশঃ

তোমাকে দেখেছি

অমিতাভ বসু

তোমাকে দেখেছি আমি শরতের প্রথম প্রভাতে
ধানের শীষেতে। আর সবুজ ঘাসেতে—
শিশিরের দেশে। কুসুমের দেশে।
আমি দেখেছি তোমায়—
একতারা হাতে মেঠো পথে যেথা
বাউলেরা গান গায়।
জলভরা মাঠে, শালুকের বনে;
সবুজের দেশে, কুঞ্জে কাননে—

তোমাকে দেখেছি আমি।
পৌষের খেতে পাকা ধান হাতে
দিবসের শেষে যেথা সূর্য অস্তগামী।
তোমাকে দেখিতে পাই যেথা বহে নদী-
কুল কুল রবে তুলিয়া আকুতি—
পথ ধরে আঁকা বাঁকা—।
বাংলার মাঠে, বাংলার ঘাটে
ওগো সুন্দর, তব পরশ রয়েছে মাখা॥
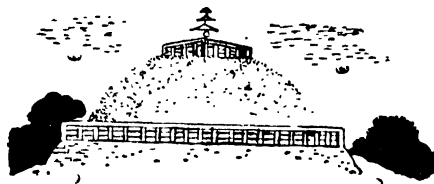
ছাত্রের তীর্থ—কলেজ স্কোয়ার

শ্রীঅক্ষয়জীবন বসু

অর্দ্ধশতাব্দীর আগের কথা, ইংরাজী ১৯১৫ সালে কলিকাতায় আসিয়া ভর্ত্তি হইলাম। তখন কলেজ স্কোয়ারই (গোলদীঘিই) ছিল তরুণ ছাত্রদের আপরাহ্নিক মিলন কেন্দ্র, বলিতে গেলে "কৈশোরের ও যৌবনের বারাণসী।" বিকালে আমরা গোলদীঘিতে বেড়াইতাম এবং চারিদিকে ঘাসের উপর দলে দলে বৃত্তাকারে বসিয়া আড্ডা জমাইতাম। গোলদীঘির চৌহদ্দী ও পরিবেশ বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। উত্তর দিকে হিন্দুস্কুল ও সংস্কৃতকলেজ, পূর্ব্বদিকে কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্ট্যুট, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি, মহাবোধি-সোসাইটী, ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন। দক্ষিণে সিটী স্কুল ও সিটী কলেজ। পশ্চিমে কলেজ ষ্ট্রীট (রাস্তার নামও সার্থক ব্যঞ্জনাময়) এবং তাহার উপরে অবস্থিত সিনেটহল সমেত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজ। হিন্দু স্কুলের ঠিক উত্তরদিকে ছিল শিক্ষকদের শিক্ষণ কলেজ এবং আলবার্ট হল ও রিডিং রুম। তার পাশ থেকেই আরম্ভ হয় পুস্তক বিক্রেতার ও পুস্তক প্রকাশকের বিপণি অর্থাৎ বই-র দোকান। সমস্ত অঞ্চলটাই ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। তখনো এই মহানগরীতে স্পোর্টস্, সিনেমা ও রেডিও-র এতটা প্রাধান্য বা বাড়াবাড়ি হয় নাই। বলিতে গেলে কলেজস্কোয়ার ছিল শান্তরসাস্পদ quite corner। তখনও গোলদীঘি সাতারের ও সাতারুর এতবড় কেন্দ্র হইয়া উঠে নাই। তরুণ ছাত্রদের গল্পগুজবে, হাসি-তামাসায় তর্ক-বিতর্কে কলেজস্কোয়ার সজীব ও সরব থাকিত। রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ বিষয় যে আলোচিত হইত না তাহা বলা কঠিন। ক্লাসের পঠিত বিষয় শিক্ষকগণের যোগাত্য বা অযোগ্যতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মান ও ফলাফল, দেশের জনপ্রিয় আন্দোলন ও পরিস্থিতি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনা ও দুর্ঘটনা প্রভৃতি সবই ছিল আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তরুণেরা ভবিষ্যৎ জীবনের career সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখিতেন তাহাও ছিল বিচিত্র। কাহারও আকাঙ্ক্ষা I. C. S. হইবেন, কেহ বা ব্যারিষ্টার, কেহ বা গবেষক ও লেখক, কেহ বা রাজনৈতিক নেতা হওয়ার জল্পনা কল্পনা করিতেন। তখনও দেশ স্বাধীন হয় নাই সুতরাং মন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা অপমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন কেহ দেখিত না। বেলা পড়িতে না পড়িতেই যেমন পল্লী-বালারা জল আনার জন্য প্রস্তুত হয় আমরাও তেমনিই দিনশেষে কলেজ-স্কোয়ারে যাওয়ার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিতাম। কলির তীর্থ ও কলিকাতার পীঠস্থান "কালীঘাটের" সম্বন্ধে আমাদের তেমন ঔৎসুক্য ছিল না। আমাদের মন পড়িয়া থাকিত কলেজ-স্কোয়ারের দিকেই। গোলদীঘির চারিদিকে বেঞ্চির উপরে কয়েকজন অবসর-প্রাপ্ত প্রাচীন ভদ্রলোক বসিতেন। আজ অকপটে স্বীকার করিতেছি তাঁহাদিগকে আমরা ভুল বুঝিতাম। তরুণেরা যদি হয় উত্তর মেরুর, বৃদ্ধেরা ছিলেন দক্ষিণ মেরুর। আমরা স্বপ্ন দেখিতাম ভবিষ্যতের, আর তাঁহারা বাস করিতেন অতীতের স্মৃতিলোকে। তখন কি ভাবিয়াছি তরুণেরাও বৃদ্ধ হইবে? বেঞ্চিতে উপবিষ্ট দুইটি মূর্ত্তি এখনও আমার চোখের উপর ভাসিতেছে। স্বর্গীয় বিপিন চন্দ্র পাল এবং স্বর্গত মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন—কলেজ স্কোয়ারের উত্তরদিকের বেঞ্চির উপর বসিতেন।

বিদ্যাসাগরের বই দিয়াই ছেলেবেলায় আমাদের বিদ্যারম্ভ হইয়াছে এবং তখনকার প্রায় সবগুলি বাংলা পাঠ্যপুস্তকেই তাঁহার প্রতিকৃতি ও জীবনের কথা থাকিত। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাসাগরের নাম ও জীবন-কাহিনী আমাদের পরিচিত। বাংলার ঘরে ঘরে "বিদ্যা-সাগর" ছিলেন প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত। পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া গোলদীঘির পশ্চিমপারে অবস্থিত বিদ্যাসাগ-

রের মর্ম্মর মূর্ত্তির ["অতরল অশ্রুরাশি"] প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়াছি। বিস্ময়ে আনন্দে ও ভক্তিতে এই মূর্ত্তিকে নিরীক্ষণ করিয়াছি এবং বারংবার প্রণাম করিয়াছি। আমাদের কাছে "কলেজ-স্কোয়ার তীর্থের" প্রধান ও প্রথম দেবতাই ছিলেন বিদ্যাসাগর। সেই যুগের ছাত্র-সমাজের আদর্শই ছিলেন তিনি। যদিও স্বদেশী আন্দোলনই প্রথম জাতীয় জীবনে আলোড়ন আনিয়াছিল তথাপি রাজনৈতিক নেতাদের আবির্ভাব আমাদের মনোজগতে দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যাইতে পারে নাই। রাজনৈতিক নেতারা বিদ্যুৎচমকের মত যশের আকাশে ঝলসাইয়া উঠিয়া খানিকপরেই নিবিয়া গিয়াছেন—সূর্য্যের মত স্থির দীপ্তি রাখিতে পারেন নাই। নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ খ্যাতির গগনে সবে সমুদিত হইয়াছেন, তখনও তাঁহার যশোরশ্মি সর্ব্বস্তরে বিকীর্ণ হয় নাই। একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দর প্রভাব এক শ্রেণীর ছাত্রের মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। চিত্র তারকা, খেলোয়াড়, বা সাতারু তখনও ছাত্রমানসে আপন অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই। সেই যুগে চরিত্রমাহাত্ম্যে এই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরই ছাত্রের চিত্তে গুরুর আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। আজিকার এই "বহু-নায়কের" আমলে সেই একচ্ছত্র রাজাধিরাজের অসপত্ন একাধিপত্যের কথা কল্পনা করাও কঠিন। আমরা গুরুজনদের মুখে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ছোটবড় নানাকথা ও কাহিনী শুনিতাম বর্ষাস্ফীত বাত্যা-বিক্ষুব্ধ দামোদর নদ সন্তরণ করিয়া মাতৃ-ভক্ত পুত্রের মাতৃচরণে উপস্থিত হওয়ার কাহিনী আমাদের শিশু-চিত্তের উপর এমন দাগ রাখিয়া গিয়াছে যে পঞ্চাশ বৎসরেও তাহা মুছিয়া যায় নাই। আমাদের স্মৃতি, চিন্তা ও কল্পনা বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিত। বিদ্যা-সাগরের শিক্ষালয় ও কর্ম্মস্থল এবং প্রাচ্য সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র বলিয়া সংস্কৃত কলেজকেও আমরা ভালো বাসিয়াছি। হিন্দুস্কুলের পাশেই সংস্কৃত কলেজ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বৈষম্য সহজেই প্রতীয়মান হইত। হিন্দু স্কুলের অনেক শিক্ষক চোগাচাপকান পরিধান করিতেন, কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকেরা ধুতি, চাদর ও চটি-জুতা পরিয়াই কলেজে আসিতেন—বৈষম্যের বহিরঙ্গের একটি মূল উদাহরণ হিসাবে ইহা উল্লেখ করিলাম।

গোলদীঘির দক্ষিণপারে পুণ্যশ্লোক ডেভিডহেয়ারের স্মৃতিস্তম্ভ এবং স্কোয়ারের উত্তরপশ্চিম কোণের প্রবেশ-দ্বার খুলিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইলেই চোখে পড়িত কলেজষ্ট্রীটের পশ্চিমপারে ঐ মহাত্মার পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। যে বিদেশী শাসকজাতি স্বভাবতই বাঙ্গালীকে ঘৃণা করিত সেই জাতিরই একজন সুদূর স্কটল্যাণ্ড হইতে কার্য্যব্যপদেশে ব্যবসায় সম্পর্কে এখানে আসিয়া মনে প্রাণে বাঙ্গালীকে ভালবাসিয়া বাংলার ও বাঙ্গালীর সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সময়, শক্তি ও অর্থ বাঙ্গালী ছাত্রের জন্য অকাতরে দান করিয়াছেন—এই মহান শিক্ষাব্রতী ও মানবপ্রেমিক এই দেশের ছাত্রদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র দেহাবশেষের উপরে যে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে তাহা চিরদিন এই জাতির স্মরণীয় ও বরণীয় হইয় থাকিবে এবং ছাত্রসমাজের নিকট পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

একবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা বেশ মনে পড়ে। স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলকের তিরোভাবের সংবাদ কলিকাতায় পৌছিলে ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজ স্কোয়ারে যে আবেগময়ী বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার প্রথম কয়েকটি কথা এখনও যেন কাণে বাজিতেছে। "ভারতমাতার ললাটের তিলক মুছিয়া গেল—বালগঙ্গাধর তিলক আর নাই।" থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে মাঝে মাঝে বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। সে-খানে একবার স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একটি বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। প্রথম সারিতে যে সব শ্রোতা ছিলেন তাঁহারা তদানীন্তন বাংলার শ্রেষ্ঠপুরুষ। বক্তৃতার অনেক কিছুই বুঝিতে পারি নাই—এখন প্রায় কিছুই মনেও নাই। তবে বক্তার সৌম্যবদন এবং জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু দুইটি চির-দিনের জন্য মানস-পটে অঙ্কিত আছে। এমন বুদ্ধি-দীপ্ত উজ্জ্বল চক্ষু আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কেও ঐ থিয়োসফিক্যাল সোসাই-টিতেই একাধিকবার দেখিয়াছি—এঁনি বেশান্তকেও এই-খানেই দেখার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আর একজনের কথাও মনে পড়ে—তাঁহার সুললিত কণ্ঠস্বর যেন এখনো কানে বাজিতেছে—তিনি হইলেন কুলদাপ্রসাদ ভাগবত-

রত্ন। তিনি বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণবপদাবলী উদ্ধৃত করিতেন। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে যাঁহাদিগকে দেখার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার পি, সি, রায়, আশুতোষ চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদিগকে দেখিবার এবং তাঁহাদের বাণী শুনিবার জন্য আমাদের কি অপরিসীম কৌতূহল, আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল তাহা এ যুগের তরুণেরা ধারণা করিতে পারিবে না। সেটা হয়ত ছিল hero worship-এর (বীরপূজার) যুগ, শ্রদ্ধা করার—ভক্তি করার এবং অনুপ্রাণিত হওয়ার প্রবণতা বা দুর্ব্বলতা ছিল প্রবল। Niladmirari-এর স্রোত তখনও ভক্তি-গঙ্গায় উজান বহে নাই, বিচার বিশ্লেষণ করার প্রবৃত্তি তেমন চাড়া দিয়া উঠে নাই, অবতারকে সাড়ে তিনহাত মানুষ বলিয়া প্রমাণ করার ঝোঁক প্রবল হয় নাই, জননীর শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেহ-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করার ফ্যাসান তখনও চালু হয় নাই—যুক্তিবাদ অথবা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি চিন্তা-জগতে এতটা স্থান অধিকার করে নাই। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ তাহা বিচার করিতে যাইতেছিনা—সে যুগে যাহা ছিল এবং এ যুগে যাহা আসিয়াছে তাহা শুধু বিবৃত করিলাম। মহাবোধি সোসাইটীর অভ্যন্তরে দেওয়ালে ৺নন্দলাল বসুর অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে নিরীক্ষণ করিয়াছি। শিল্পীর যাদুময় করস্পর্শে যেন সবই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—কলিকাতার কল-কোলাহলময় জীবনে যেন সেই বুদ্ধের যুগের পরমা শান্তি নামিয়া আসিয়াছে এবং বিরাজ করিতেছে।

স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্রকে আমরা বলিতাম সব্যসাচী। তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখন একসঙ্গে ত্রি-মূর্ত্তির উল্লেখ করা হইত—লাল, বাল, পাল, অর্থাৎ পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক ও বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল। মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন স্বদেশী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে দেশসেবা করিয়াছিলেন। অহিংস আন্দোলন সুরু হওয়ার পরে রাষ্ট্রগুরু ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা হারাইতে লাগিলেন। সেই সময়ে লিয়াকৎ হোসেন একদিন কলেজ স্কোয়ারে যুবকদিগকে বলিলেন, "সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন জাতীয় বৃক্ষের মূল-কাণ্ড, আমরা ডাল-পালা, ফুল ফল মাত্র। মূলে যদি ভুল হয়, অর্থাৎ গাছ যদি বিগড়ায় তবে শাখা প্রশাখা শুকাইয়া যায় এবং পাতা ঝরিয়া পড়ে, ফুল ফল শুকাইয়া যায়।"

আগেই বলিয়াছি ইংরাজী ১৯১৫ সালে হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি। সুদূর মফঃস্বলের একটী ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসা মানে ছোট খাল বাহিয়া মহাসমুদ্রে পড়ার মত। গ্রামের একটী অখ্যাত মাইনর স্কুল হইতে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিলাম কোথায়? না, সারা বাংলাদেশের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ উচ্চ-বিদ্যালয় সেই হিন্দুস্কুলে। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভাল ফল করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে কৃতী ও যশস্বী হইয়াছেন তেমন বহু ছাত্রের Alma mater এই হিন্দুস্কুল। তখন খ্যাতনামা রসময় মিত্র মহাশয় হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৫।৬টা বৃত্তি এবং কয়েকটি উচ্চতম স্থান হিন্দুস্কুলের ছাত্রদের ছিল বাঁধা বরাদ্দ। ছাত্রদের মধ্যে দুই শ্রেণী লক্ষিত হইত—মেধাবী ও অভিজাত। বাংলাদেশের তথা কলিকাতার অভিজাত ঘরের ছেলেরা এই স্কুলে পড়িত এবং তাহাদের গাড়ী (তখন মোটর গাড়ী খুব বেশী ছিল না) হিন্দুস্কুলের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তায় ভিড় করিয়া থাকিত। আর এক শ্রেণীর ছাত্র এই স্কুলে আকৃষ্ট হইত যাহারা লেখাপড়ায় ভাল এবং পরীক্ষায় ভাল ফল করিত। মেধাবী ছেলেদের সংস্পর্শে আসার ফলে ধনীর দুলালদের অন্ততঃ একটি শিক্ষা হইত—তাহাদের আভিজাত্যের অহংকার দূর হইত। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিতে চাই যাহা না বলিলে সত্যের একটি অংশই অনুক্ত থাকে। আমার সহপাঠীদের মধ্যে অভিজাত-বংশের কয়েকটি এমন ছাত্র দেখিয়াছি যাহাদের মত শিষ্ট ভদ্র মধুর-স্বভাব আর কোথাও দেখি নাই। তাঁহাদের মধ্যে তিন বন্ধু আমার এখন পরলোকে। তাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া এখনও এই বৃদ্ধের চক্ষু সজল হয়। একজন হইলেন ৺হৃষীকেশ লাহার পৌত্র কেশবচন্দ্র লাহা, দ্বিতীয় হইলেন পটলডাঙ্গার বসু-মল্লিক পরিবারের রবীন্দ্রচন্দ্র বসু-মল্লিক, তৃতীয় হইলেন ময়মনসিংহ জেলার শেরপুরের জমিদার গোপালদাস চৌধুরীর পুত্র গিরীন্দ্র চৌধুরী। আমার যে দুইজন সহপাঠী তাহাদের মানসিক উৎকর্ষের দ্বারা আমাকে প্রথম হইতেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়া-

ছিলেন তাঁহারা হইলেন ডাক্তার সুধীরনাথ সান্যাল ও শ্রীমধুসূদন শীল। সুধীরনাথের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। স্কুলে থাকিতেই তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার স্নেহলাভ করিয়াছিলেন। মধুসূদন গণিতে ও অঙ্কন বিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। সুধীরনাথ ও মধুসূদন উভয়েই এখন নিজ নিজ ক্ষেত্রে গবেষণায় নিরত। উভয়েই নীরব জ্ঞানযোগী ও বিজ্ঞানসাধক, এবং বোধহয় সেই জন্যই প্রচারপরাঙ্মুখ। পরবর্তী জীবনে যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাডভোকেট জেনারেল) শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় (জীবন-বীমা) ও ডাঃ সত্যচরণ বরাটের নাম উল্লেখযোগ্য। ডাঃ বরাট মধ্যপ্রদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও জনপ্রিয় চিকিৎসক এবং সাধারণের হিতার্থে অকাতরে অর্থব্যয় করেন। স্কুলে পূজ্যপাদ শিক্ষকদের কাছে যে শিক্ষা ও স্নেহলাভ করিয়াছি তাহা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। স্থানাভাবে সকলের নাম ও গুণাবলী উল্লেখ করিতে পারিলাম না। ৺শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে সংস্কৃত পড়াইতেন। সংস্কৃতে ও বাংলায় তাঁহার ছিল গভীর পাণ্ডিত্য। তাঁহার রচিত দুইখানি গ্রন্থের নাম মনে পড়ে—দক্ষিণাপথ ভ্রমণ ও রামানুজ চরিত। পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন সরল, আত্মভোলা মানুষ—পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। তাঁহার বুকখোলা জামার ভিতর দিয়া বক্ষের লোমরাজী দেখা যাইত। তাঁহার পরে মনে পড়ে ইংরাজীর শিক্ষক ৺নীলমণি গাঙ্গুলী মহাশয়ের কথা। চমৎকার পড়াইতেন। স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুবাদ শিখাইতেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল এবং বাংলা লেখার অভ্যাস ও দক্ষতা ছিল। শিক্ষণীয় বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া ছাত্রদিগকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়াই তিনি নিরস্ত থাকিতেন না—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তরুণ শিক্ষার্থীর চিত্তে সংক্রামিত করার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁহার। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে আরও একজন শিক্ষকও ছিলেন—তিনি বীজগণিত পড়াইতেন। তিনি স্থূলকায় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে "মোটা" যতীনবাবু বলা হইত এবং অপর যতীন্দ্রনাথ কৃশকায় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে "সরু" যতীনবাবু বলা হইত। গণিত শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ বক্সী ছিলেন অদ্ভুত মানুষ—তিনি ছিলেন গণিতে পারদর্শী, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে একটু খেয়ালী। দুপুর রোদে তিনি খোলা ছাদে বসিয়া অঙ্ক কষিতে ভালবাসিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত পাঠক্রম সুষ্ঠুভাবে সমাপন করিয়া তিনি ক্লাসে অমিয় নিমাই-চরিত যে কি চিত্তাকর্ষকভাবে পরিবেশন করিয়াছিলেন তাহা এখনও মনে পড়ে। তাঁহার একটি উৎসাহ-ব্যঞ্জক আশ্বাসবাণী এখনও আমার মনে আছে—"গণিতের সবই শেখানো হইয়াছে। এখন জুতা মা'র গা, স্কলারসিপ নাও গা।"

শিক্ষক মহাশয়ের দেশের বাড়ীতে সমারোহে দুর্গোৎসব হইত এবং কোন কোন ছাত্র সেই দুর্গোৎসবে যোগদান করিত। তাঁহার কলেজ জীবনে তিনি ছিলেন খ্যাতনামা গণিতবিদ্ অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে মহাশয়ের ছাত্র। গৌরীশঙ্করের জীবনের অনেক কৌতুকপ্রদ কাহিনী তাঁহার কাছে শুনিয়াছি। গৌরীশঙ্কর নাকি জীবনে কখনও কলিকাতার বাহিরে যান নাই। একবার মাত্র তারকেশ্বরে গিয়াছিলেন। সময় সম্বন্ধে তাঁহার নিয়মানুবর্তিতা নাকি সে যুগে জেনারেল এসেম্‌ব্লি ও ডফ কলেজে প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত ছিল। যেদিন গৌরীশঙ্কর দেহত্যাগ করেন, সেদিন নাকি কলেজে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রেরিত হয় নাই। অধ্যক্ষ মহাশয় দেখিলেন কলেজের বড় ঘড়িতে দশটা বাজিয়া গিয়াছে কিন্তু গৌরীশঙ্কর আসেন নাই। তিনি নাকি চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—"গৌরীশঙ্কর আসেন নাই—দশটা কি করিয়া বাজে? নিশ্চয়ই ঘড়ি খারাপ হইয়াছে।" অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নাম করিব? শরদিন্দু রায়, পণ্ডিত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য, পাঁচুগোপালবাবু, আদিত্য পণ্ডিত মহাশয় ব্রজকিশোর মুখোপাধ্যায়, ইন্দু পণ্ডিত মহাশয় সকলের কথাই মনে পড়ে। তখন হিন্দুস্কুলের শিক্ষকদের কেউ কেউ কলেজের অধ্যাপকপদে উন্নীত হইয়াছিলেন, যথা অমৃতলাল গুপ্ত ও বিধুবাবু প্রভৃতি। রসময়বাবুর অবসর গ্রহণের পর সতীশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রধান শিক্ষক হইয়া আসিলেন—সহৃদয় ছাত্র বৎসল সজ্জন ব্যক্তি। হিন্দুস্কুলের বাড়ীর অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। তখন ঐ স্কুলের পশ্চিম প্রান্তে একটী থিয়েটার হল ছিল—তাহাকে গ্যালারি বলা হইত। ঐ হলের একপাশে এক

কোনে "poets' corner" বলিয়া একটি স্থান আমাদিগকে দেখানো হইত। কিংবদন্তী আছে যে হিন্দুকলেজের ছাত্র কবি মধুসূদন দত্ত ঐখানে বসিতেন। শিক্ষকেরা যেখানে বসিতেন তাহার সংলগ্ন হলে পরীক্ষার সময়ে আমাদের সিট্ পড়িত। ঐ হলের পশ্চিমপ্রান্তে ছিল ছাত্রদের "our own library" ছাত্রদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করিয়া বই কেনা হইত এবং ছাত্রেরাই ঐ লাইব্রেরী পরিচালনা করিত। আমার মনে পড়ে ঐ হলে সমবেত ছাত্রদের সম্মুখে প্রধানশিক্ষক মিত্র মহাশয় গোখলের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করিয়া স্কুল ছুটী দিলেন :—"Boys, gokhale is no more. The school is closed।" সাধারণতঃ "গ্যালারিতেই" সভা, সমাবেশ এবং বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হইত। দুইটি ঘটনা এখনও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। হিন্দুস্কুলের পূর্ব্বতম প্রান্তে (সংস্কৃত কলেজ ছাড়াইয়া) যে হলঘরে নীচের ক্লাসগুলি বসিত সেখানে একবার বিরাট সভা হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজা ঐ সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন (তিনি বোধ হয় তখন ভারত সরকারের Education member ছিলেন)। হিন্দু স্কুল হইতে কুলদাচরণ দাশগুপ্ত (পরে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন) ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এত পুস্তক ও পদক পারিতোষিক পাইয়াছিলেন যে সেগুলি একখানা ঘোড়ার গাড়িতে তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। কুলদাচরণের জনৈক পরিচিত ছাত্রের মুখে শুনিয়াছি রসময় মিত্র নাকি আদর করিয়া বলিতেন "কুলদার গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি"। আর একবার বাংলার গভর্ণর কারমাইকেল সাহেব হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণে দুই স্কুলের (হিন্দু ও হেয়ার) যুক্ত পরিতোষিক বিতরণ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ও পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। বাংলার বহুগণ্যমান্য ব্যক্তি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিনই আমি হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে প্রথম দেখিলাম পরে তাঁহার প্রণীত বৌদ্ধ জাতকের অনুবাদ পড়িয়াছি। তখনও জানিতাম না যে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের Shakespeare scholar অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পিতা। হিন্দু স্কুল ও হেয়ার স্কুলের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল। ঐ spirit of competetion healthy কি unhealthy তাহা ঠিক বলিতে পারি না। এখনও ঐ প্রতিযোগিতার ভাব তেমন আছে কিনা জানিনা। হিন্দু স্কুলের ম্যাগাজিন স্যর পি, সি, রায়কে দেওয়ার জন্য আমরা সায়ান্স কলেজে যাইতাম এবং ঐ বর্ষীয়ান জ্ঞান তপস্বীর হাতে সুমিষ্ট চড় চাপড় খাইয়া হৃষ্টচিত্তে ও গর্ব্বে বুকফুলাইয়া ফিরিয়া স্কুলে সহপাঠীদের কাছে গল্প করিতাম।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ তখন কেন জানি না তাঁহার এক খেয়াল হইল—হিন্দু স্কুলের ও হেয়ার স্কুলের কতিপয় ছাত্রকে লইয়া তিনি ইংরাজীর একটি ক্লাস খুলিলেন। প্রায় একঘণ্টা করিয়া তিনি ইংরাজী পড়াইতেন। ঐ ক্লাসে যাহা পড়িয়াছিলাম এবং শিখিয়াছিলাম তাহার প্রায় সবই ভুলিয়া গিয়াছি। অধ্যক্ষ মহাশয়ের একটি বাক্য এখনো মনে আছে "The horse is in clover"। ক্লোভার তৃণ বিশেষ, ত্রিপত্র, ঘোড়ার উপাদেয় খাদ্য। কেহ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিলে এই উপমাটি তাহার সম্বন্ধে প্রযোগ করা হয়। ইংরাজী ভাষায় ইহা একটি বিশিষ্ট Idiom. আমরা তখন চতুর্থশ্রেণীর ছাত্র। ইংরাজীর শিক্ষক শরদিন্দু রায় মহাশয় কি প্রসঙ্গে Salisburyকে উচ্চারণ করিলেন স্যালিসবেরি। শঙ্করদাস (যিনি এখন এ্যাডভোকেট জেনারেল) দাঁড়াইয়া বলিলেন, স্যর, আমার বাবা কিন্তু বলেন সলসবেরি। রায় মহাশয় পরদিন বড় অভিধান দেখিয়া ক্লাসে নিজের উচ্চারণ-ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ক্লাসেরই পিছনের দিকের বেঞ্চিকে বলা হইত—Babu's bench নামের অর্থও ছিল, সার্থকতাও ছিল। হিন্দু স্কুলের Debating societyতে আমরা আগ্রহের সঙ্গে যোগদান করিতাম। সভাপতি মহাশয় আমাদিগকে আদরের ও কৌতুকের সঙ্গে বিখ্যাত বাগ্মীদের নামে ভূষিত করিতেন। হিন্দু-স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে সুদর্শন কিশোরের অভাব ছিল না। অশোকনাথ শাস্ত্রী ছিলেন আমাদের সমসাময়িক। তাহার ঋষি-কুমার-প্রতিম চেহারা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তরুণ ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ, লিপিকুশলতা, গণিতে পারদর্শিতা, অঙ্কনৈপুণ্য, কবিতা রচনার ক্ষমতা দেখিয়া

বিস্মিত হইয়াছি। হিন্দুস্কুল ছিল বাস্তবিকই Nursery of talents-ঘটনার ও অবস্থার প্রতিকূলতায় কাহারও কাহারও প্রতিভা হয়ত বিকশিত হইতে পারে নাই, যে মহান্ সম্ভাবনা ছিল পরবর্তী জীবনে তাহা অনেকক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু স্কুলে কিশোরদের মধ্যে যে মানসিক শক্তি দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নয়। ইংরাজকবি গ্রের কবিতার সেই বিখ্যাত লাইনটী মনে পড়ে—Many a gem of purest ray serene…ইত্যাদি। হিন্দুস্কুলে আমার সমসাময়িকদের মধ্যে যাহাদের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়ে তাহারা হইতেছেন—শ্রীযুক্ত বিজলি সোম, ডাঃ সর্ব্বাণী সহায় গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত পতঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রভাংশু-কুমার ঘোষাল, শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্র-নারায়ণ রায়চৌধুরী, ৺অশোকনাথ শাস্ত্রী, যতীন্দ্রনাথ রায়, ৺প্রমোদকুমার ঘোষাল, শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার, পূর্ণশশী রায়, শ্রীবিজয়লাল (কবি), সত্যশরণ ঘোষ প্রভৃতি।

সেই তরুণ ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বাইরের এত বই পড়িয়াছে যে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। সে তুলনায় এখনকার ছাত্ররা অনেক কম পড়ে—তাহাদের নাকি Other interests বাড়িয়াছে কিন্তু 'ছাত্রণাং অধ্যয়নং তপঃ এ কথা কি দেশ কাল নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য নয়?

স্কুলের পড়া শেষ করিয়া কলেজ ষ্ট্রীট পার হইয়া আসিলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে বাংলার নানা-জেলা (এমন কি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল) হইতে ছাত্র-রত্নেরা আসিয়া সমবেত হইতেন। তাহাদের ভাষাগত, স্থানগত এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ছিল লক্ষ্য করবার মত। সকলের কাছেই কিছু শিখিয়াছি। এই প্রথম আমি নেপালী ও অবাঙ্গালী মুসলমান ছাত্রদের সান্নিধ্যে আসিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরী ছিল আমাদের প্রধান আকর্ষণ। কলেজের পাঠ্যপুস্তক এবং তৎসংশ্লিষ্ট গ্রন্থের মধ্যেই আমাদের মনোযোগ সীমাবদ্ধ ছিল না। ইংরাজী সাহিত্যের কত "অ-পাঠ্য" বই যে পড়িয়াছি তাহা এখন মনেও করিতে পারি না। প্রেসিডেন্সি কলেজে যাহাদের সঙ্গে পড়িয়াছি বা যাহাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়াছি তাহাদের অনেকেই পরবর্তী জীবনে গণ্যমান্য হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অধ্যয়ন তপস্যা সমাপনান্তে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাহাদের সংকল্পের দৃঢ়তা, অবিচলিত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় বাস্তবিকই প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য।

কলেজের অবসর সময়ে আমরা ফুটবল খেলিতাম। ঐ ক্রীড়া সমাবেশের নাম দেওয়া হইয়াছিল Noont-tide Club। বিমলকুমার ভট্টাচার্য্য (পরে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন) ঐ ক্লাবের উৎসাহী সভ্য ছিলেন। বিমলের একটি কীর্ত্তির কথাও মনে পড়িয়া গেল। তিনি বহরমপুর হইতে নিজেই নিজের মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। তবে ঐ পরিকল্পিত মৃত্যুর তারিখ পয়লা এপ্রিল ছিল কি না ঠিক মনে পড়িতেছে না। সহাধ্যায়ী শচীন চৌধুরী (এখন ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী) তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে বিলাত (কেম্ব্রিজ) যান। সহপাঠী রবীন্দ্রনাথ বসুমল্লিকের রাধানাথ মল্লিক লেনের বাড়ীতে শচীনকে আমরা ঘরোয়াভাবে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দিয়াছিলাম। শচীন তাহার বাদুরবাগানের বাড়ীতে এক নৈশভোজে আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিল। আর এক সহপাঠী ইন্দুমাধব দাস জার্ম্মানীতে প্রিন্টিং শিখিতে গিয়াছিল, আমরা হাওড়া ষ্টেশনে তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। এলাহাবাদে তখন প্রতিযোগিতা-মূলক I. C. S. পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের দুই কৃতী ছাত্র শ্রীব্রজকান্ত গুহ ও শ্রীশৈলেন্দ্র গুহরায় ঐ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন—আমার সহপাঠী ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন (পরে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন) একটি প্রশস্তি রচনা করিয়া আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। সহপাঠী পবিত্রকুমার বসু ছিলেন আমাদের ক্লাসে সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধী। কিন্তু বি, এ, পরীক্ষার সময়ে তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। গায়ে বেশ তাপ ছিল, এবং রাত্রে একটু প্রলাপও বকিতেন। অনেকেই তাহাকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাহারো নিষেধ না মানিয়া সায়ান্স কলেজের বারান্দায় Sick-bed-এ অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থায় পরীক্ষা দিলেন। অনেকেই আশঙ্কা করিলেন এভাবে পরীক্ষা দিয়া পরীক্ষার ফল ভাল হইবে

না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পবিত্রকুমার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। হুমায়ুন কবির আমার বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও নানা বিষয় আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিতেন। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর বংশধর সামসের জঙ্গ বাহাদুরের কাছে নেপাল সরকার সম্বন্ধে নানা গল্প শুনিতাম। বীরেন ঘোষ এবং মোহিত মুখোপাধ্যায় হৃদয়বান্ ছিলেন—তাঁহারা এখন পরলোকে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যাঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন পরলোকে। ইংরাজীর অধ্যাপকদের মধ্যে সতীশচন্দ্র দে ছিলেন সহৃদয় ও ছাত্রবৎসল। অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির উচ্চারণ ছিল সাহেবের মত। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যাপনা ছাত্রসমাজে সমাদৃত হইত। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সেক্সপীয়র পড়াইতেন —শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত হইয়া শুনিত। তিনি একাদিক্রমে কয়েক ঘণ্টা ক্লাস নিতেন। কলেজের প্রাক্তন ছাত্র বি, বি, রায় (এম্, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া) ঐ কলেজেই অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই নবীন অধ্যাপকের ব্যাখ্যান অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রসমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। অধ্যাপক ষ্টার্লিং সাহেব পড়াইতেন বাইবেল। তিনি ছিলেন রসিক মানুষ —earth, world, worm, warm প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ শিখাইতে গিয়া মুখ-বিবরের সঙ্কোচন প্রসারণ করিতেন। ৺খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় আমাদিগকে Logic পড়াইতেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল—তিনি ছিলেন লেখক ও সুগায়ক। ম্যাট্রিকুলেশন ও ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে আমার ইতিহাস ছিল না। ইতিহাস লইয়া বি, এ, পড়িয়াছি। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক জ্যাকেরিয়া এবং উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল আমাদিগকে ইতিহাস পড়াইতেন। অধ্যাপক জ্যাকেরিয়ার যে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ছিল পাশ ক্লাসে তাহা প্রকাশের আর কতটা অবসর বা সুযোগ মিলিত? বিদ্যা বিনয়ং দদাতি—জ্যাকেরিয়ার ক্ষেত্রে ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রকৃত Scholar এর humility তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করিয়া আমরা মাথা নত করিয়াছি। অধ্যাপক ঘোষালের মধ্যে মৌলিক গবেষণার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ তখন হইতেই লক্ষিত হইয়াছে। গণিতের অধ্যাপকদের মধ্যে করুণাময় খাস্তগিরের কথাই আমার প্রথম মনে পড়ে, হাসিখুসি স্নেহশীল মানুষটী। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকেও ছাত্রেরা ভালবাসিত। অধ্যাপক জে, এম, বসু বহুদিন বিলাতে ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী উচ্চারণ ছিল বিশুদ্ধ—figure শব্দটীর উচ্চারণ আজও যেন কানে বাজিতেছে। আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত পড়িয়াছি। তিনি সংস্কৃত শব্দের লাতিন প্রতি শব্দ বলিতে ব্যগ্র ছিলেন। "কর্ম্মান্ধচ্ছিদং ধর্ম্ম"—এই অংশের ব্যাখ্যান করিতে গিয়া তিনি ছিদ্ ধাতুর লাতিন প্রতি শব্দ cido (ইংরাজী cut) উল্লেখ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় (হরিহর বাবু) যিনি ছিলেন আমাদের আপনার জন—তাঁহার কাছে আমরা নির্ভয়ে মনের কথা বলিতে পারিতাম। অন্য কলেজ হইতে জনৈক বাংলার অধ্যাপক আসিলেন—ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা যে প্রণালীতে হইত সেই প্রণালীতেই বাংলা সাহিত্যের ব্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। এই নূতন শিক্ষকের অধ্যাপনা প্রণালী সকলেরই খুব পছন্দ হইয়াছিল। অধ্যাপক মহাশয়ের পুরা নাম মনে নাই তাঁহাকে সবাই শিবুবাবু বলিত। ধন বিজ্ঞানের অনার্সের ক্লাসে যাঁহারা পড়াইতেন তাঁহার মধ্যে বিভাগীয় প্রধান ছিলেন জাহাঙ্গীরজী কুবেরজী কয়াজী (তখনও তিনি 'স্যর' উপাধি পান নাই)। তাঁহার প্রাণখোলা হাসি খুব ভাল লাগিত। তিনি ছিলেন কেম্ব্রিজের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও গ্রন্থকার আলফ্রেড মার্শালের ছাত্র। আমরা বি, এ পরীক্ষা দেওয়ার আগেই তিনি fiscal Commission এর সদস্য হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক পঞ্চানন দাস মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক দুর্গাগতি চট্টরাজ ছিলেন ধনবিজ্ঞান বিভাগের অপর দুই শিক্ষক, সমবায় আন্দোলনের উপরে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় পুস্তক রচনা করেন। অধ্যাপক চট্টরাজের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তিনি অধীত পুস্তকের অংশ বিশেষ অনর্গল মুখে মুখে বলিয়া যাইতে পারিতেন, মিঃ সলোমনও কিছুদিন পড়াইয়াছিলেন। যাঁহাদের কাছে আমাদের পড়ার সুযোগ হয় নাই তাঁহাদের মধ্যে দুজন অধ্যাপক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। একজন হইলেন অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা মনোমোহন ঘোষ। তাঁহাকে দেখিলেই

মনে হইত তিনি যেন অন্তর্জগতে বাস করিতেছেন—চোখ দুইটি ধ্যানাবিষ্ট ও স্বপ্নালু। অপরজন দর্শনের অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়—বিরাট বপু এবং গম্ভীর বদন। এই প্রসঙ্গে একটী করুণ কাহিনীর উল্লেখ না করিয়া পারি না। অধ্যাপক ভূপেন্দ্রচন্দ্র বসু আমাদিগকে ইংরাজী পড়াইতেন। তাঁহার বয়স তেমন বেশী ছিল না। তাঁহার পিতৃবিয়োগের পরে নাকি তিনি পিতৃশোকে সংসার ত্যাগ করিয়া যান। আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বলা বাহুল্য কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে আমাদের কোন যোগ ছিল না। সেখানে খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের কোন সুযোগ ঘটে নাই। দুইজন অধ্যক্ষকে আমরা দেখিয়াছি—

(১) ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও (২) ব্যারো। ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব ছিলেন মিষ্টভাষী ও মিশুকে। তিনি অধ্যক্ষপদ হইতে ইস্তফা দিয়া statesman কাগজের সম্পাদক হইয়াছিলেন, ব্যারো ছিলেন রুক্ষমুখ, গম্ভীর—খুব কম কথা বলিতেন। হাতের লেখাটী ছিল ভারী সুন্দর। এখনও তাঁহার স্বাক্ষর J. R. Barrow যেন চোখের উপর ভাসে। চিত্তরঞ্জনের সহধর্ম্মিণী বাসন্তী দেবী যখন জেলে গেলেন তখন তিনি seductive বিশেষণটি ব্যবহার করিয়া ফ্যাসাদে পড়িয়াছিলেন। কলেজে ছাত্রদের মধ্যে বিষম বিক্ষোভ দেখা গিয়াছিল। ব্যারো সাহেবের বাহিরের আকৃতি ও ভাব দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ভাল ধারণা হওয়া কঠিন। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও সুবিবেচক। ব্যারোর বসিবার ঘরের ঠিক উপরেই তেতালায় ছিল আমাদের গণিতের ক্লাস একবার যথাসময়ে অধ্যাপক ক্লাসে না আসায় আমরা মেঝেতে জুতা সমেত পা ঘষিতে লাগিলাম। পা-ঘষার শব্দ শুনিয়া সাহেব উপরে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গণিতের অধ্যাপক ক্লাসে প্রবেশ করিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রসঙ্গে ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের উল্লেখ না করিলে আমার এই তীর্থ পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই ছাত্রাবাসটি কলেজ স্কোয়ারের ঠিক সংলগ্ন নয়, ইহা স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পংক্তি-ভুক্তও নয়। তবুও এই ছাত্রাবাসটি আমার বিবেচনায় একটী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ইহা প্রেসিডেন্সি কলেজের appendix বা "উত্তর কাণ্ড" বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। কলেজের অবসরসময়ে, ছুটির পরে, বা ছুটির দিনে হিন্দু হোষ্টেলে যাইতাম এবং সেখানে নানা প্রকার আলোচনায় যোগদান করিতাম। হোষ্টেলে ঘরে ঘরে যে আড্ডা জমিত বা মজলিস বসিত তাহা বাস্তবিকই ছিল educative. ঐ সব আড্ডার আলাপ—আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে অনেক কিছু শেখা যাইত। আলোচ্য বিষয় ছিল বিবিধ ও বিচিত্র। হোষ্টেলের সরস্বতী পূজায় এবং অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানে আমরা আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে যোগদান করিয়াছি। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন এই ছাত্রাবাসের আবাসিক। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্যাল মহাশয় ওখানে থাকিতেন এবং তিনি হোষ্টেলটিকে তাতাইয়া মাতাইয়া রাখিতেন। প্রাক্তন আবাসিক ডাঃ মেঘনাদ সাহার অধ্যয়নানুরাগের গল্পও শুনিয়াছি। এই হোষ্টেলেই অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি কৃতী ছাত্রেরা থাকিতেন। সাহিত্যিক "জরাসন্ধ" (শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)ও ছিলেন এই ছাত্রাবাসের আবাসিক। ধনবিজ্ঞানে যিনি ঈশান বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন সেই শৈবাল গুপ্তও এইখানেই থাকিতেন। উড়িষ্যা সরকারের Director of development রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র রায় (ইনি এম্. এ পরীক্ষায় পদার্থ বিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন) হিন্দু হোষ্টেলের "নিরামিষ" সম্বন্ধে একটি কৌতুকপ্রদ কাহিনী কথা প্রসঙ্গে বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি যখন প্রথম হিন্দু হোষ্টেলে ভর্ত্তি হইলেন রাত্রে আহারের সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি কি "নিরামিষ" মাংস খাইবেন? নিরামিষ মাংস শব্দটি সোণার পাথরের বাটি বা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মত। তিনি শব্দটির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। বন্ধুটি বুঝাইয়া দিলেন নিরামিষ মাংস মানে পেঁয়াজ-রসুন বর্জ্জিত মাংস। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে বহু মেধাবী ও জ্ঞানানুরাগী ছাত্রের সমাবেশে এই ছাত্রাবাসে যে পরিবেশ রচিত হইয়াছিল কলিকাতার অনেক পরিবারেই তাহার সমতুল্য কিছু মিলিত না।

একটি বিদুষী শিক্ষিকা নাকি খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আবার যদি মানুষ হইয়া জন্মিতে হয়, তবে যেন পুরুষ হইয়া জন্মিতে পারি এবং হিন্দু হোষ্টেলে স্থান পাই।"

এবার Presidency collge Alumni Association সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে চাই। এই ছাত্র-সংসদের সভায় কলেজের বহু পুরাতন ছাত্রকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। সতীনাথ রায় মহাশয়ই বোধহয় ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ব্যবহারাজীব নরেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতি যোগদান করিতেন। স্বর্গীয় হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাংলার গভর্ণর) একবার একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন—উহা এখানে লিপিবদ্ধ করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। হরেন্দ্রনাথের সহপাঠীদের মধ্যে নরেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতি ছিলেন অত্যন্ত ধূমপানাসক্ত—যাহাকে বলে chained smoker। একবার কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া হরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রকুমার প্রভৃতি ছাত্রেরা তাঁহাকে দেখিতে তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সাহেবের নির্দ্দেশ অনুসারে মেমসাহেব ছাত্রদিগকে জলযোগে আপ্যায়িত করিলেন। জলযোগের পরে তিনি তাহাদিগকে সিগারেট দিলেন। ইহা ছিল আগন্তুক ছাত্রদের কাছে একান্তই অপ্রত্যাশিত। তাহারা মহা আনন্দে [এবং কিঞ্চিৎ গর্ব্বের সঙ্গেও বটে] ধূমপান করিতে লাগিলেন। অধ্যক্ষ সাহেব রোগমুক্ত হইয়া কলেজে গিয়া ঐ ছাত্রদিগকে নিজের কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা আসিলে বলিলেন, "বৎসগণ, তোমরা আমার অসুখের সময়ে আমাকে দেখিতে গিয়াছিলে এজন্য আমি আনন্দিত ও তোমাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু তোমরা তোমাদের মাতৃস্থানীয়া শিক্ষক-পত্নীর সম্মুখে ধূমপান করিয়াছ—তোমরা কি তোমাদের গুরুজনের সম্মুখে ধূমপান কর?" ছাত্রেরা লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। হরেন্দ্রনাথ এম্ এ পাশ করার পরে এই অধ্যক্ষ সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন—একটি টিউসানির জন্য। সাহেব নাকি রাগিয়া আগুন। পারেন ত তাহাকে তখনই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। এই সাহেবই পরে হরেন্দ্রনাথকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক করিয়া দিয়াছিলেন—হরেন্দ্রনাথ জানিতেনও না এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদনও করেন নাই। ছাত্র-সংসদের একসভায় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—"Presidency collge has made me what I am" অধ্যাপক মহাশয়ের এই উক্তিটি প্রেসিডেন্সি কলেজের অনেক শিক্ষক এবং ছাত্রদের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণরূপে না হইলেও আংশিকভাবে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়।

আর একটি ছবি মনে পড়ে—বেকার ল্যাবরেটারীর সম্মুখস্থ ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের। ঐ ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের অধ্যক্ষ ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব ছাত্রদিগকে লইয়া খেলিতেন। ছোট একট ঘটনার কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কৃতী ছাত্র অশোকনাথের [শাস্ত্রী] পরিচালনায় "বাণী" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রিকা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রেরিত হইয়াছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে পাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেও ল' কলেজে ভর্তি হইলাম। কত জ্ঞানী গুণীর সমাবেশ ছিল তখন ঐ পবিত্র বিদ্যামন্দিরে। প্রত্যহ সিঁড়িতে ওঠানামার সময়ে যে সব বিদগ্ধ সুধীবৃন্দের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি তাঁহাদের অনেকেই এখন পরলোকে। যে বীর কেশরী বিরাট পুরুষ ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার সেই আশুতোষের মহিমামণ্ডিত tradition বহুদিন প্রেরণা জাগাইয়াছে। বাংলার গভর্ণর লিটন সাহেবকে লিখিত সেই তেজোগর্ভ পত্রের অমর বাণী তখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—"Freedom first, freedom seand, fıeedom always।" গুণগ্রাহী স্যর আশুতোষের মধ্যে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা ছিল না—তিনি লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ভাণ্ডারকর, সি, ভি, রমন, ষ্টেলা ক্রামরিশ [ইউরোপীয়] প্রভৃতি অবাঙ্গালীকে সাদরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দান করিয়াছিলেন। আমাদের ধনবিজ্ঞান বিভাগে যাঁহারা অধ্যাপনা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে মিন্টো প্রফেসার ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী এবং অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের কথাই বেশী মনে পড়ে। Federation

Hall soeietyএর সংগঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে আমার পরবর্তী জীবনে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহার সংগঠন-নৈপুণ্য, কর্ম্ম দক্ষতা, অদম্য উৎসাহ, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। অধ্যাপক সরকার ছিলেন বহু বিষয়ে জ্ঞানী—সমাজ বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী ছাড়া ফরাসী ও জার্ম্মান প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায়ও তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত পত্রিকার প্রবন্ধগুলি তিনি মুখে মুখে তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার বিদ্যার পরিধি ছিল সু-বিস্তৃত। নানা বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—একখানা পত্রিকা তিনি পরিচালনা করিতেন। একটি গবেষক-গোষ্ঠীও তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অধ্যাপক সরকার বাস্তবিকই ছিলেন একটি institution এবং একটি school of thought এখন এক এক ব্যক্তি এক একটা বিশিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করেন—তাঁহাদের দৃষ্টি হইয়া পড়ে সংকীর্ণ। অধ্যাপক সরকারের বহু বিষয়ে যেরূপ ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান ছিল তাহা এই তথাকথিত বিশিষ্ট গবেষণার যুগে বড় একটা দেখা যায় না। অত বড় পণ্ডিত যে কেমন হাস্যরসিক ছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে ছোট্ট একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমি কোন কারণে কিছুদিন দাঁড়ি কামাইতে পারি নাই। তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, are you now in fovour of protection? the protechonist policf will not bring a single copper to the naton but may save a few pice for you (নাপিতের খরচা)। ল' কলেজের অধ্যাপদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে আছে। যে ছাত্র ভাল ইংরাজী লিখিতে পারিত তাহাকে তিনি ভালবাসিতেন ও বেশী নম্বর দিতেন। আর একজন শিক্ষকের কথা মনে পড়ে—তিনি আমাদের special-paper "সমাজতত্ত্ব পড়াইতেন। মুখচোরা লাজুক মানুষ—নিজের পাণ্ডিত্য—জাহির করিতে প্রকান্ড কুণ্ঠিত। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় তাহার খুব দখল ছিল। বিভিন্ন দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইত। সুভাষচন্দ্র যে বৎসর ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দিয়াছিলেন সেই বৎসরই উক্ত পরীক্ষায় এই অধ্যাপক প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন মাসিক পত্রিকা ভারতবর্ষে এই মেধাবী ছাত্রের ছবি বাহির হইয়াছিল। তাঁহার নাম শ্রীপ্রমথনাথ সরকার। পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব current topics এর উপরে কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠি বন্ধু পবিত্র কুমার বসুর ঘরে intelechulদের একটি আড্ডা বসিত। কত বিভিন্ন বিষয় না আলোচিত হইত! আড্ডধারীদের মধ্যে সাময়িকভাবে একটা মানসিক ও আত্মিক যোগ স্থাপিত হইত। ঐ আড্ডায় চা, চাণচুর প্রভৃতি পরিবেশিত হইত। আলবার্ট রিডিং রুমে যাঁহাদিগকে নিয়মিত ভাবে পড়িতে দেখিয়াছি তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন এখনও জীবিত আছেন—তিনি হইলেন মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল।

কৈশোরের স্মৃতি বড় মধুর। স্মৃতির সোনালি আভায় মণ্ডিত হইয়া অতি সাধারণ জিনিষও অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। হিন্দু স্কুলের সাবেক বাড়ী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ সিনেট হল আমার স্মৃতির মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া করিতেছে। হিন্দু স্কুলের বাড়ী অতিকায় হইয়াছে। সিনেট হল ভাঙ্গিয়া তাহার উপরে বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। নালিশ করার কিছু নাই—যুগধর্ম্ম বলিয়াই ইহাকে মানিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমানের চাহিদা মিটাইতে গিয়া রূঢ় বাস্তব অতীতের স্বপ্নময় মধুস্মৃতির মর্ম্মমূলে নির্ম্মম কুঠারাঘাত করিয়াছে। হিন্দুস্কুলর ও সিনেট হলের রূপান্তর ঘটিয়াছে—কালপ্রভাবে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য কিন্তু আমাদের মধ্যে যাহারা পঞ্চাশের কোঠা পার হইয়াছি তাহাদের বুকে একটা গূঢ় বেদনা, একটা অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস। কি ছিল, কি হইল? সুরুচির, সৌন্দর্য্যের এবং অতীতের স্মৃতি পূজার দোহাই দিয়া মহাকালের রথচক্রের গতিরোধ করা যায় কি? হিতবাদ দর্শনের (utilitarianism) সঙ্গে সৌন্দর্য্যতত্ত্বে মিল হয় কি? গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানের কামিনী ফুলের গাছটি যদি যাদুকরের যাদু দণ্ডের স্পর্শে রাতারাতি খেজুর বৃক্ষে পরিণত হয় অথবা গৃহ পালিত শশক-শাবকটি যদি কোন উগ্রতপা: মুনির বরে উষ্ট্রে রূপান্তরিত হয় তবে গৃহস্বামী তাহাতে খুসি হইবেন কি? খেজুরের রস ও ফল লোভনীয় সন্দেহ নাই, আর উট ও মরু যাত্রীর নির্ভর যোগ্য অপরিহার্য্য বাহন ইহাও নিদারুণ সত্য। সাংসারিক জ্ঞানশূন্য রসজ্ঞ ব্যাপ্ত নাকি বলেন যে জন্তুর মধ্যে কুৎসিৎ উট আর বৃক্ষের মধ্যে কুরূপ খেজুর গাছ। উত্তরে বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন হিতবাদীরা অবশ্য বলিতে পারেন—সাংসারে থাকিতে গেলে উপযোগিতার কথাও ত বাদ দেওয়া চলেনা।

গুণীন
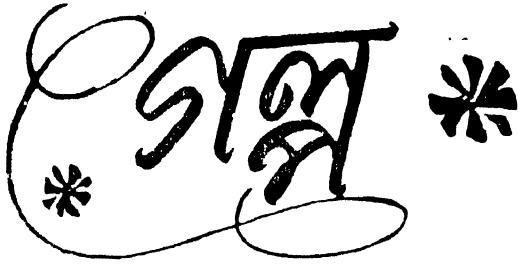
সুব্রত মুখোপাধ্যায়

পানুঠাকুর! ছেলেবেলায় ঐ নামটা শুনলেই বুকের মধ্যে ছাঁত করে উঠত। লম্বা, ছিপছিপে একহারা গড়ন, গায়ের রং ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় একরাশ ঝাকড়া চুল, অপরিষ্কার, তৈলহীনতার জন্য চুলগুলো তামাটে রংএর হয়ে গেছে। সরু ছুঁচোলো মুখ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কপালের তলায় চোখদুটো কুঁত কুঁত করছে। প্রায় দেড় আঙ্গুল ভেতরে বসা। লম্বা সরু কৃষ্ণকায় দুখানি হাত যেন লোহার সাড়াশি। আর ঐ চোখ দুটো—ওর সব। ওর মধ্যে দিয়েই ও সমস্ত মানুষের ভেতরটা দেখতে পেত। চোখদুটো ছোট ছোট হলে কি হবে, সব সময়ে জবাফুলের মত লাল। কোমরের চোট্ট থলেতে গাঁজার কল্কে, গাজা সব সময়েই থাকতো। মস্ত বড় গুণীন ওর খুব নাম-ডাক ছিল তখন ও তল্লাটে।

মগরাহাটের পশ্চিমে জালাসিতে বাড়ী। মস্ত বড় ওঝা। ওর ছিল এই ব্যবসা। সংসারটা বেশ গুছিয়ে এনেছিল। শোনা যায় পানু নাকি বেষ্টপুর থেকে একটা কাওরার মেয়েকে নিয়ে একেবারে সোজা জালাসিতে এসে পাড়ি জমিয়েছিল। পানু তখন জোয়ান, বেদের দলে থাকে। সাপধরার মন্ত্র, মানুষ বাঁচানোর মন্ত্র, ডাইনী বিদ্যা শিখতে, ভানুমতীর খেল জানতে ঢুকে পড়েছিল বেদের দলে। ছোট বেলাতেই বাপ-মা হারা ভাগ্যহীন। জায়গা-জমি যেটুকু ছিল আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পানুকে নাবালক পেয়ে সব কেড়েকুড়ে নিয়েছে। পানুকে তারা কেউ পাত্তাই দেয়নি। ছোট ছেলে পানু কিছু উপায় না দেখে সোজা ঢুকে পড়ে বেদের দলে। তারপর কুড়িটা বছর কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল পানু টেরই পেল না।

ঝুনিয়া—বেদের মেয়ে। পানু পড়লো তার প্রেমে। ঝুনিয়াও তাই। মূলসূত্র হলো পানুর মিষ্টিসুরের বাঁশি। খুব মিষ্টিসুরে পানু বাঁশি বাজাতে পারতো। প্রেমের দেবতার আসন টলে উঠলো। তারপর একটু হাসি, একটু উচ্ছলতা, প্রেমের নদীতে এলো ভরা জোয়ার। শিরবেদে ব্যাপারটা জেনে পানুর হাতে ঝুনিয়াকে দিয়ে দিল। ঘর বাঁধতে আরম্ভ করলো ঝুনিয়া। উদাসী পানুর সংসারে অভাবটা একটু বেশি। ভোরবেলা পুটলি আর সাপের ঝাপি নিয়ে বেরিয়ে পড়তো বেদেরা দলে দলে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই। তারপর যে যার কেরামতি অনুযায়ী খেলা দেখিয়ে, মাদুলী বিক্রী করে সন্ধ্যেবেলা তাঁবুতে ফিরতো।

এমনি এক সন্ধ্যেবেলা পানু তাঁবুতে ফিরলো। সারাদিনের প্রখর রোদে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত দেহে নারকেলদড়ির ছেড়া খাটিয়াতে গা এলিয়ে দেয়। "ঝুনিয়া"—সাড়া পেল না। ভাবে হয়তো কোথাও গেছে আশেপাশে। তারপর সব চুপচাপ। দখিনা বাতাস বইছে ফুরফুর করে। সারাদিনের কেমন যেন একটা বিশ্রী গুমোট ছিল। পানু ঘুমিয়ে পড়েছিলো তারপরে। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে। পাশের রেল লাইনটার ওপর দিয়ে গাড়ীখানা সশব্দে চলে গেল, হু হু করে। চারিদিকে তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। রাত্রির প্রথম প্রহরে আসর জমে উঠেছে। আকাশে অগনন তারকারাশি। পানু ধীরে ধীরে তাঁবুর মধ্যে ঢোকে। বাইরে আবার সে বেরিয়ে আসে। জোরে ডাক দিয়ে "হেই ঝু-নি-য়া······আ······আ।" নিঃসীম অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পানুর ডাক দূরে দিঙমণ্ডলের দিকে চলে গেল।

আবার ডাকে পানু। এমনি ভাবে ডাকের পর ডাক। তাঁবুগুলোর মধ্যে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। পানু সকলকে জিজ্ঞাসা করে ঝুনিয়া কোথায়। কিন্তু কেউ তার

কথার উত্তর দেয় না। সবাই মুখ মুচকে হাসে। পানু সোজা শিরবেদের কাছে যায়। শিরবেদে সমরু। হাড়িয়া খেয়ে মাদল বাজাচ্ছে। সেই লম্বা চওড়া জোয়ান পুরুষটা আদিম পুরুষ। সোজা ওদের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে পানু। কিন্তু একি! ঝুনিয়া এখানে? স্তব্ধ হয়ে যায় পানু। শুধু অপলক দৃষ্টি দিয়ে ঝুনিয়াকে দেখে পানু। বাঃ, কি সুন্দর না মানিয়েছে ওকে। একটা জংলা শাড়ী আঁট-সাঁট করে পরা, ওর সেই পীনোন্নত বক্ষ, কপালে কাঁচ পোকার টীপ, জলজ্বল করছে। মাথায় একথোকা কৃষ্ণচূড়া ফুল, ঠোঁটদুটো পান খেয়ে লাল টুকটুক করছে। "ঝুনিয়া"—চীৎকার করে ওঠে পানু। খিলখিল করে হেসে ওঠে ঝুনিয়া। ত্বরিতে সরে সমরুর পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। পানুর মাথা আগুন হয়ে ওঠে। মনে হয় ছুটে গিয়ে সমরুকে ধাক্কা মেরে ওর ঝুনিয়াকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। আবার ডাক দেয় পানু—"ঝুনিয়া"। "সামাল"—আরো জোরে চীৎকার করে ওঠে সমরু। স্খলিত পদ অসংলগ্ন ভাষা, চোখে কেমন যেন একটা ক্রূর দৃষ্টি। পানু এগিয়ে আসে ঝুনিয়াকে ধরতে। সমরু ঝাঁপিয়ে পড়ে পানুর ওপর চক্ষের পলকে। পানু কৃশকায়, কিন্তু বুদ্ধিমান। চকিতে সরে দাঁড়ায়। মুহূর্তে সমরু হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাটিতে। ঝুনিয়ার দিকে এগিয়ে যায় পানু। সমরু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে বলে, "খবরদার আর এগিয়ে আসবি না। আমি তুকে জানে মেরে দিব।" পানু চেয়ে দেখে সমরুর হাতে চকচকে ছুরি। একটু পেছিয়ে যায়। একটা ক্রূর হাসি হাসে, তার পর বলে—"আরে যা যা, শিরবেদে আছিস, শিরবেদে থাকিস বটেক, পানু কোন শালাকে ডর পায় না"। ঝুনিয়ার দিকে চেয়ে বলে—'এই মাগী, হামারা পাশ চালিয়ে আয় তুম"। ক্রোধে অন্ধ পানুর মুখে হিন্দী বেরিয়ে পড়ে। "না—হামি তোর ঘর করবেক নি। —হামি……'

—চোপ রও মাগী ঝুনিয়ার কথা শেষ করতে দেয় না পানু। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে ওর দিকে।

—এ্যাই খবরদার। সমরু হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে পড়ে পানুর ওপর। অতিরিক্ত নেশার চোটে ঠিকমত ছুরিটা চালাতে পারেনি সমরু। পানু ধরে ফেলে ওর হাত। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চললো। ঝুনিয়া চীৎকার আরম্ভ করলো। পানুর প্যাঁচে সমরু প্রায় কাবু। হৈ হৈ করে ছুটে এলো সব বেদের দল। শিরবেদের অপমান ওরা সহ্য করলো না। সকলে মিলে পানুকে আক্রমণ করলো। পানু পড়ে গেলো মাটিতে। পানুর পিঠে সেই সুযোগে সমরু ছুরিটা বিধিয়ে দেয়। "আঃ" —একটা চীৎকার। কিন্তু সেই আদিম ক্রূর মানুষগুলোর চীৎকারের মাঝে পানুর আর্তনাদ ডুবে গেল।

*　　*　　*　　*

জ্ঞান হলে চেয়ে দেখে ও পড়ে আছে একটা সরু খালের পাড়ে—গ্রামের শেষ সীমানায়। ভাল করে চেয়ে দেখে আর এক জোড়া কালো গভীর চোখ অপলক নেত্রে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ক্ষীণ কণ্ঠে পানু জিজ্ঞাসা করে—'কে তুমি', কিন্তু কোন উত্তর নেই। তাড়াতাড়ি উঠতে গেল পানু। দুটো কোমল মসৃন হাত পানুকে ধরে আবার শুইয়ে দেয়। নিস্তব্ধ দুপুর। গুমোট আবহাওয়াও সীমাহীন বাতাস—ধূ ধূ করছে। দুপুরের গাড়ীট মগরাহাট স্টেশন ছেড়ে চলে গেল। পানু উঠে বসে হঠাৎ। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে। 'কি চিনতে পারছো না বুঝি?' মুচকি হেসে মেয়েটা বলে। হু, তুমি না বাতাসী।"

—যাক তবু ভাল, চিনতে পেরেছ। তা বলি নাগর এই ভর দুপুর বেলায় এখানে এমনভাবে কোত্থেকে এসে পড়লে। তোমার সারা গায়ে এত রক্ত শুকিয়ে রয়েছে কেন। গেঞ্জীটা ছিঁড়ে গেছে। মুখের ঐখানে কিসের দাগ ওটা। বলি ঝুনিয়ার সঙ্গে কি ঝগড়া করেছ…না ঝুনিয়া ঘর থেকে বের করে দিয়েছে? পানু কোন কথার উত্তর দিল না। যেন কী এক গভীর চিন্তায় মগ্ন।

—ইস্, একি! তোমার এখনও রক্ত পড়ছে যে! আহাহা, কি দিয়ে মেরেছে গো?

—সকলে মিলে আমাকে একসঙ্গে মেরেছে আর সেই শয়তান সমরু আমার পিঠে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। মুর্গীকাটা ছুরি। শালা শূয়ার কি বাচ্চা কোথাকার। পানুর চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠলো।

—কি জন্যে এমন হলো?

—কেন শুনবি নাকি? তোদের জাতের কথা শুনবি?

—এ্যাই ভাল হবে না। জাত ক্ষাত করবি না বলছি।

—আরে না না, আমি ভাতের কথা বলিনি। আমি বলছি এই মেয়ে,জাতটার কথা বুঝলি।

—ওঃ, তাই বলো। কিন্তু বেলা যে গড়িয়ে আসছে। রক্তটাতো এখনও বন্ধ হোলো না। একটু দাঁড়া তো আসছি। খালের পাড় দিয়ে বাতাসী একটু নীচে নেমে যায়। দুতিন মিনিট পরে কিছু ঢোলকলমীর পাতা তুলে নিয়ে দুহাতে রগড়াতে রগড়াতে পানুর কাছে আসে। পানুর পিঠে ক্ষতের ওপর ঢোলকলমীর রসটা নিঙড়ে দিয়ে পাতাটা চেপে ধরে। রসটা যাতে গড়িয়ে না পড়ে। বাতাসী বলে—তাইতো, কানি কোথায় পাই বল্‌তো। এদিকে ওদিকে তাকায় বাতাসী তারপর একটু ভেবে নিজের শাড়ীর আঁচল থেকে খানিকটা ছিঁড়ে ক্ষতটার ওপর বেঁধে দেয়। 'নে চল বাড়ী যাবি না? বেলা যে গড়িয়ে গেল" —বাতাসী বলে। পানু বললে—কেন তুই আমার জন্যে বেলা করলি বাতাসী"?

—কেন? একটু চুপ করে থাকে বাতাসী। তারপর দূরের দিকে চেয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললে—গরু দুটো নিয়ে যাব বলে এলুম, সেই সকালে বাদায় বেঁধে দিয়ে গেছি, ফেরবার পথে এসে দেখি তুই এখানে পড়ে। কেমন যেন অজ্ঞান হয়ে রয়েছিস। তোর সারা শরীলে আঘাতের চিহ্ন, রক্ত লেগে রয়েছে। দেখে বড় মায়া হোলো। হাজার হোক তোর সঙ্গে আমার অনেকদিনের চেনা পরিচয় ছেল আর তাছাড়া·········

মুখটা নীচু করে, বলতে পারেনি বাতাসী। এতক্ষণ অবাক হয়ে বাতাসীর কথাগুলো শুনছিলো পানু আর ভাবছিলো জগতে কতরকমের মেয়েমানুষ আছে। রুনিয়া সুন্দর বটে তবে সেটা তার বাইরের জৌলুস। আর বাতাসীও সুন্দরী তবে অন্তরে। তাছাড়া চোখদুটো ভারী সুন্দর ওর। দেখলে নেশা লাগে। "তা হ্যাঁগো, তোমাকে ওরা মারলে কেন?" বাতাসী বলে।

—চল ঘরে চল। সব তোকে বলবো।

—চ' তোকে পৌছে দিবে আসি।

—আমাকে একটু ধরে নিয়ে চলতো। বড় বেশী দুর্বল মনে হচ্ছে।

—কোথায় যাবি এখন—বাতাসী জিজ্ঞাসা করে।

—তোর কাছে যাব। পানু বলে। গেলে তাড়িয়ে দিব না তো?

বাতাসী কিছু উত্তর দেয় না। পানুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। পানু জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁরে তোর গরু দুটো কোথায় গেল? দেখতে পাচ্ছি না তো?

—তারা এতক্ষণ ঘরে চলে গেছে। জানিস মানুষ পোষ মানে না, কিন্তু জীবজন্তু পোষ মানে। তাই না? বাতাসী বলে।

—হুঁ, একটু বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে সায় দেয় পানু। তারপর বাতাসীর কাঁধে ভর দিয়ে খালের পাড় ধরে সোজা চলতে আরম্ভ করে।

* * *

বাতাসী। মগরাহাটের নামকরা মেয়ে। দেহ বেচে পেট চালায়। যেতে যেতে বাতাসীর চোখের সামনে পানুর সঙ্গে দেখার প্রথম দিনের ছবিটা মনে পড়ে। সেদিনটা ছিল রোববার। পানু ঘুরতে ঘুরতে মগরাহাটে উপস্থিত। হাটের শেষের দিকে মুর্গীহাটায় বীণাপাণি ছাপাখানার সামনে। পানু বিছিয়ে দেয় তার লাল চাদরটা। ডুগ ডুগ করে বাজায় ডুগডুগি। লোক জমে ওঠে চারদিকে। ঝাপি থেকে দুটো সাপ বের করে। ফণা তুলে সাপগুলো দোলে। ডুগডুগি বাজায় পানু তালে তালে। কখনও কখনও ডুগডুগি থামিয়ে আড়বাঁশি বাজায়। সেদিনে সেই ভীড়ের মধ্যে বাতাসীও দাঁড়িয়েছিল। পানুর পাতা সেই লাল কাপড়টার ওপর একটা আধুলি ছুড়ে দেয় বাতাসী। মুখ তুলে চায় পানু। বাতাসীর চোখে চোখ পড়ে। একটু হেসে বাতাসী চলে যায়। সেদিন বেশ মোটামুটি উপায় করেছিল পানু। দুএকবার আধুলির মালিককে খোজে, দেখতে পায় না। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। পানু সব জিনিসপত্র গুছিয়ে চলতে আরম্ভ করে।

—ও সাপখেলাওলা, সাপখেলাওলা। তোমায় ডাকতেছে। একটা ছোট ছেলে ডাকে ওকে।

—কে? পানু জিজ্ঞাসা করে।

—ঐ তো ঐখানে।

পানু চেয়ে দেখে তার বাঁদিকে কতকগুলো ছোট ছোট ঘর। সামনে একটা পুকুর। পুকুর পাড়ে ঝাকড়া মতো একটা আমগাছ, আর সেই গাছের তলায় আধুলির মালিক

দাঁড়িয়ে আছে। পান্থ বাতাসীর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। হাত ধরে বাতাসী পান্থকে বলে—এস।

—কোথায়?

—এস না। বাতাসীর সঙ্গে পান্থ একেবারে ওর ঘরে গিয়ে ওঠে। দাওয়ায় পান্থ ঝাঁপি আর পুটলিগুলো রাখে। পান্থকে মদ খাইয়ে বাতাসী খাতির করে। ভুলে যায় পান্থ সব কিছু। বাতাসীও বেশ মাতাল হয়ে ওঠে। তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। ফুরফুর করে বাতাস বইছিলো। সেই আদিম মত্ততাটো মুহূর্তের মধ্যে আদি সে মত্ত হয়ে পড়ে।

তারপর থেকে পান্থর আনাগোনা। কিন্তু মগরাহাটের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে চলে যায় মগরাহাটের নামকরা দেহ-বিপণিকা। মনে মনে পান্থকে ভালবেসে ফেললো। পান্থর বাঁশি তার কাল হলো। পান্থকে চেয়েছিলো একান্ত আপন করে পেতে। সেই পান্থকে পেলো আবার বাতাসী, পাড়ি জমিয়েছিলো আলাসিতে। বোসবাবুদের দয়ায় একটু জমি পেয়েছিলো ওরা, ঘর বাঁধলো পান্থ। পান্থ এখন মস্ত বড় ওঝা। বেদের ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে ও। বাতাসী ঘুটে কাঠ বিক্রী করে। বোস বাবুদের ন'বৌকে একদিন সাপে কাটলো। ডাক পড়লো পান্থর। ঝাড়ফুক করে সাপের বিষ নামিয়ে দিয়ে পান্থ হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো। পান্থর জয়জয়কার। ছড়িয়ে পড়লো পান্থর নাম দিকে দিকে। মস্ত বড় গুনীন। বাতাসী যেন বাঘের যোগ্য বাঘিনী। পান্থর বয়স তখন চল্লিশ। দীর্ঘদিন পরে বাতাসী একটা ছেলের মা হোলো। পান্থর মুখে ফুটলো হাসি। বাঁচবার ইচ্ছেও বাড়লো। ভূত ছাড়ানো, গাছ চালা, বাণ মারা, গরুর দুধ মন্তর দিয়ে বন্ধ করা, গায়ের ক্ষত মন্তর দিয়ে বাড়ানো, সাপের বিষ নাবানো—সমস্ত কিছুতে পান্থ একেবারে ওস্তাদ। ভূত প্রেত দত্যি দানা—পান্থর গায়ের গন্ধ পেয়ে পালাতো। পান্থকে জিজ্ঞাসা করো—তুমি জাতে কি? পান্থ হেসে উঠতো—জাত? ওসব আমি মানি না। ওর যা চেহারার আকৃতি ছিল তা দেখে ছোট ছোট ছেলেরা ভয়ে পালাতো। আমাদের বেশ মনে আছে ছেলেবেলায় পান্থর ভয় দেখিয়ে আমাদের ঘুম পাড়ানো হোতো।

*   *   *   *

সেদিন রাত্রিটা ঘুটে ঘুটে অন্ধকারময়। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, সোঁ সোঁ করে ঝড় বইছে। প্রকৃতি উন্মত্ত! বোসবাবুদের দরজায় ঘা পড়লো হঠাৎ—"বাবু, বাবুগো। দরজা খোলো, বাবু।" ঘুমচোখে ধড়মড়িয়ে উঠে বোস বাবুদের ছোটো ছেলে দরজা খোলে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে তার পায়ের ওপরে। গলার স্বরে বুঝতে কষ্ট হোলোনা যে মেয়েটি বাতাসী।

—কিরে কি ব্যাপার, কাঁদছিস্ কেন?

—শীগগীর চলো বাবু, আমার ছেলেকে সাপে কেটেছে।

—এ্যা সে কিরে। পান্থ? পান্থ কোথায়?

—কাঁদতে কাঁদতে বাতাসী বলে ও ঘরে নেই বাবু। বিকেল বেলায় গেছে ধলেকোটে। একটা সাপেকাটা রুগী দেখতে। এখনও ফেরেনি।

—আচ্ছা তুই যা আমি যাচ্ছি—ছোট বাবু বলে।

পান্থর কাছে পাঠালেন বাড়ীর চাকর রামকে। রাত তখন তিনটে হবে। পান্থ আর রাম ফিরে এলো। ছেলেটার কাছে ধীরে ধীরে বসলো পান্থ। একদৃষ্টে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর বিড়বিড় করে কি বকতে আরম্ভ করলো। মিনিট দশেক বাদে কোমর থেকে একটা দড়ি বের করে সপাং সপাং করে মরা ছেলেটার গায়ে মারতে লাগলো। মাঝে মাঝে চীৎকার করতে লাগলো—"যা নেবে যা, নেবে যা। মা মনসার বিষ নেবে যা"।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পান্থর বাড়ীর ওঠোনে লোক জমা হয়ে গেল। সকলেরই কৌতূহল। কি হবে? ছেলেটা বাঁচবে তো! পান্থর মুখে ঐ এক চীৎকার—যা নেবে যা, নেবে যা, মা মনসার বিষ নেবে যা। কোন দিকে ওর খেয়াল নেই। সপাং, সপাং, সপাং। দড়ি দিয়ে মেরেই চলেছে। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ বাতাসী পান্থর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো। চীৎকার করে বলে আমার ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দাও। দোহাই তোমার। কত লোকের মরা ছেলে বাঁচিয়ে দিয়েছো। আমার ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দাও। পান্থ আগের মতই দড়ি চালাচ্ছে মুখে কোন কথা নেই। ওর দিকে তাকালে সকলেরই ভয় লাগবে। বাতাসী বলে—তবে কি তুমি কিছুই জানো না! তোমার মন্তর তন্তর সব মিথ্যে, সব

বাজে, এতদিন সকলকে ঠকিয়েছ? দোহাই তোমার আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও। বাতাসী চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। সেই কান্নাকে স্তব্ধ করে দেয় পান্থুর চীৎকার —যা নেবে যা। উন্মত্ত কণ্ঠস্বর। সকলে মিলে ওকে জোর করে টেনে নিয়ে গেল। বাতাসী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। শবটাকে নিয়ে গেল কয়েকজন। শূন্যে দড়িটা আছাড় মারে পান্থু সপাং, সপাং। চীৎকার করে পান্থু—নেবে যা নেবে যা। পরদিন সকালে পান্থুকে দেখতে পাওয়া গেল না। বাতাসীর অবস্থা গুরুতর। বোস বাড়ীর ছোটবাবু ডাঃ মল্লিককে নিয়ে এলেন। তিনি বললেন—অবস্থা ভাল নয়। ভোর রাত্রে বাতাসীও তার ছেলের কাছে চলে গেল। পান্থুঠাকুর উধাও। বাতাসীও গেল। আর ছেলেটা তো আগেই গেছে!

* * * *

মগরাহাট ষ্টেশনে আজও একটা লোককে দেখা যায়। কিছু বলে না সে। জরাজীর্ণ চেহারা। খালি গা। রংটা তামাটে হয়ে গেছে। মাথার চুলে জট। মুখ ভর্তি খোচা খোচা দাড়ি। হাতের নখগুলো বড়বড়। ঠোঁট দুটো সংসময় নড়ছে। কি যেন সে বলতে চায়। নীরবে লোকের কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়ায়। কেউ পয়সা দেয়, কেউ দেয় না। সবলে বলে—লোকটাকে পান্থুর মতন দেখতে!

আহ্বান

নিকুশ সরকার

(১)

কোকিল রে তুই আয় ফিরে,
খোয়াব দেখেছে বঁধুয়া তোর।
তাইত' চাঁদুয়া নিশীথে তার
আসেনি অলস ঘুমের ঘোর।
পাতার বিছানা পাতিয়া হায়
ডাকে বির'হনী মৃদুল বায়
আজি নিশায়, ঝড়ায়ে একাকী
নয়ন লোর॥

(২)

অ-ঝড়া বকুল ফুলেতে হায়
গাঁথিছে মালিকা আনাড়ী হাত—
মিলন-আবীরে—রাঙ্গায়ে দীল্
পড়াতে ডাকিছে সারাটা রাত।
পাতার আড়ালে উঁকি মেরে
আশিক দীল্ খোঁজে তোরে
আঁখিলোরে, রচিতে মিলন মধুর ডোর॥

(৩)

কত দিন আগে শাওন শেষ
নীল দরিয়ার পরপারে
বাসা বেঁধেছিলে দুজনে. গান গাহিতে—
রাত দিন ভ'রে।
সে গানে হাসিত নীলের দেশ,
'মমী'বাসীদের হ'ত' 'খায়েস'
আবার বেশ, লাগিত বাঁচার নেশার ঘোর।

(৪)

ফাগুন শেষে উঠিল ঝড়—
তোমায় নীলের মরু-বাসে,
চলে এলে তুমি ভাঙ্গিয়া ঘর—
উড়িল কোকিলা—মিলন-আশে।
এসেছে কোকিলা এদেশে হায়—
'বিরহী-বিরগী' ডাকে তোমায়—
তুমি কোথায়? কাঁদিছে দুপুর, নিশীথ, ভোর
খোয়াব দেখেছে বঁধুয়া তোর॥

বারাকপুর মহকুমায় বুনিয়াদী বিদ্যালয়

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দশ বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে শিক্ষাবিভাগ দেশে কতকগুলি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিন শ্রেণীর বুনিয়াদী বিদ্যালয় করার স্থির হয়। (১) নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়—প্রথম শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত। (২) উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ৫ম শ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যান্ত। (৩) প্রাগ্ বুনিয়াদী বিদ্যালয়। প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ববর্তী অর্থাৎ পুরাতন কিণ্ডার গার্টেন বা বর্তমান নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়। এক সঙ্গে এইরূপ তিনশ্রেণীর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রচুর অর্থ মঞ্জুর করেন।

আগড়পাড়া গ্রামের একদল কর্মীর উৎসাহে প্রথমে আগড়পাড়া গ্রামে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হয়। গ্রামবাসীদের উন্নয়ন সংস্থা নামক এক রেজেষ্টারী করা সমিতির গ্রামের মধ্যস্থলে বর্তমান আনন্দময়ী আশ্রমের নিকট কিছু জমি ছিল। ঐ জমি শিক্ষা বিভাগকে দেওয়া হইলে তাঁহাদের প্রদত্ত টাকায় সেখানে এক প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ী নির্মিত হয়। তথায় এক সঙ্গে প্রথম হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত দুইটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যদিও মিউনিসিপাল অঞ্চলে প্রায় সর্বত্র অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল তথাপি নূতন শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অভিভাবকগণ বেতন দিয়া ছেলে-মেয়েদের নূতন স্কুলে ভর্তি করেন। ফলে শীঘ্রই দুইটি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও খোলা সম্ভব হয়। এখন সেগুলি উচ্চ মাধ্যমিক-বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। আগড়পাড়ার মত বারাকপুর মণিরামপুরে ভোলানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরির চেষ্টায় গঙ্গাতীরে এক প্রকাণ্ড জমির উপর এক বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনতালা বাড়ীতে প্রতিতলায় সাতখানি করিয়া ঘর লইয়া ২১ খানি ঘরে নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিছু সরকারী সাহায্য লাভ করিয়া স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ তাঁহার ভক্ত ও বন্ধুগণের নিকট প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। এখন সেখানে কয়েকটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় ছাড়াও বালকদের উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয়, পৃথক পৃথক স্থানে কয়েকটি ছাত্রাবাস, গঙ্গার ধারে তিন বিঘা জমির উপর নিজস্ব বাড়ীতে একটি জুনিয়ার টেক্‌নিকাল স্কুল চলিতেছে। সকল প্রতিষ্ঠানে পৃথক পৃথক ছাত্রাবাস হইয়াছে, এবং মহাদেবানন্দ বিদ্যায়তন নামে সমস্ত প্রতিষ্ঠানট এক কেন্দ্রীয় পরিচালক কমিটির অধীনে চালিত হইতেছে। মাত্র ৩৮ বৎসরের যুবক সন্ন্যাসী জ্যোতির্ময়ানন্দ তাঁহার গুরুর কৃপা লাভ করিয়া এক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। এইরূপ প্রতিষ্ঠান বারাকপুর অঞ্চলে···

মণিরামপুরে খেয়াঘাটের নিকট সে স্থানে যাইলে মানুষ অবাক হইয়া যাইবে। ঐ সন্ন্যাসী ২০ বৎসর পূর্বে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় মণিরামপুরে আসিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি তথায় আশ্রম গৃহ নির্মাণ করেন। সেখানে গঙ্গার ধারে এক শিব মন্দির পাশে এক রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও সর্ব দক্ষিণে এক মন্দিরে স্বামী ভোলানন্দ গিরি ও স্বামী মহাদেবানন্দ গিরির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতল অট্টালিকায় উপরে স্বামীজীদের বাসগৃহ ও ধার্মিক সাধু সন্ন্যাসীদের বাড়ী হইয়াছে। দিন দিন আশ্রমের জন্য নূতন জমি পাওয়া যাইতেছে ও নূতন বাড়ী নির্মিত হইতেছে। তথায় বর্তমানে ১০০এরও অধিক ছাত্র বসবাস করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। গত ২০ বৎসরে এই অসাধারণ প্রসার আজ সকলকে আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। সম্প্রতি সুখচরে গঙ্গাতীরে আশ্রমের এক শাখা খোলা হইয়াছে। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে একটি শিব মন্দির ছিল, বহু বৎসর পূর্বে ভোলানন্দ গিরি এক সময়ে সেখানে যাইয়া ওই মন্দিরে পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিতে মন্দিরের

নিকট কয়েক বিঘা জমি সংগৃহীত হইয়াছে। সেখানেও বিরাট বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই স্বামী জ্যোতির্ময়া-নন্দের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বুনিয়াদী শিক্ষা বাড়িয়া চলিয়াছে।

দশ বৎসর পূর্বে সোদপুর নাটাগড় নিবাসী শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আগ্রহে নাটাগড়েও এক বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নরেন্দ্রবাবুকে সম্পাদক করিয়া স্থানীয় অধিবাসীরা নাটাগড়ে "স্বামী বিবেকানন্দ সেবাসমিতি" নামে এক সমিতি রেজেষ্টরী করেন। সকল ভাল কাজের যিনি সাহায্য করেন তাঁহার কৃপায় নাটাগড় নিবাসী শ্রীমহাদেব সাধুখাঁ নামে এক দরিদ্র গ্রামবাসী সমিতিকে বড় রাস্তার উপর বহু মূল্যবান ১৬ কাঠা জমি দান করেন। সেখানে প্রথমে চালাঘর করিয়া বুনিয়াদী স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়। সরকারী অর্থ সাহায্যে সেই জমির উপর ৫ খানি বড় পাকাঘর, বারাণ্ডা, দ্বিতলে যাইবার সিঁড়ি প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। কর্মীদের উৎসাহের অভাবে এখনও ঘর নির্মাণ শেষ হয় নাই।

সোদপুরে ব্যবসায়ী শ্রীঅযোধ্যানাথ মাইতি স্কুলের জমির পাশে প্রথমে ৭ কাঠা ও পরে চাঁদা তুলিয়া আরও কয়েক কাঠা জমি দেন। সেখানে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যা-লয়ের জন্য ৫ খানা টিনেরঘর নির্মিত হইয়াছে। ওই জমির পাশে একটি বড় পাঠাগার নির্মাণের জন্য জমি পাওয়া গিয়াছে ও পাঠাগারের বাড়ী নির্মিত হইতেছে। তাহার পাশে প্রাগবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য ৫ কাঠা জমি কিনিয়া সেখানে সরকারী অর্থ সাহায্যে ৫ হাজার টাকা ব্যয়ে চমৎকার ছোটদের কিণ্ডারগার্টেন স্কুল হইয়াছে। পাশে দেড় বিঘা জমি খালি পড়িয়াছিল তাহা সরকারী অর্থ সাহায্যে কেনার ব্যবস্থা হইতেছে। ১০ বৎসর পূর্বে যেখানে শুধু বাঁশ ঝাড়, ডোবা ও জঙ্গল ছিল এখন সেখানে যাইলে সেস্থান চেনা যায় না। এখানে তিনটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া হইল। ব্যারাকপুর মহকুমায় ওইরূপ বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সুখচর কুলীনপাড়ায় স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টায় এক প্রাগ-বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সেখানেও প্রায় ২০০ শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বহু উদ্বাস্তু পল্লীতে দরিদ্র অধিবাসীদের চেষ্টায় নূতন নূতন ছোট ছোট স্কুল খোলা হইয়াছে। যদিও ওই অঞ্চলে এক কাঠা জমির দাম কম পক্ষে ১০০০ টাকা হইয়াছে, তথাপি বিনামূল্যে জমি দিবার লোকের অভাব নাই। সেই সকল জমিতে সর্বত্র নূতন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় বা বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

শিক্ষার দিক দিয়া যেমন স্বাস্থ্যের দিক দিয়াও তেমনি লোকের সাহায্য দানের উৎসাহের অভাব নাই। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খেলার মাঠের জন্য বহু পল্লীতে বহু জমি পাওয়া গিয়াছে, উৎসাহী কর্মী বা রেজেষ্টরী করা সমিতির অভাবে সকল জমি এখনও কাজে লাগানো যায় নাই।

পানিহাটি ও খড়দহ মিউনিশিপাল এলাকা ১৫ বৎসর পূর্বে যে অবস্থা ছিল আজ আর তাহা কল্পনা করা যায় না। সোদপুর, ঘোলা, নাটাগড়, তারাপুকুর, উস্তমপুর, মাণিক ডাঙ্গা প্রভৃতি এখন শহরে পরিণত হইয়াছে। সর্বত্র বিজলী আলো, বড় রাস্তা ও চৎকার মূল্যবান বাড়ী মানুষকে আকর্ষণ করিতেছে। নূতন নূতন বাজার-দোকান প্রভৃতি এখন ব্যবসায়ীদের পর্যন্ত সেখানে লইয়া যাইতেছে। জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট কারখানা হইয়া বহু বেকারের অন্নের ব্যবস্থা করিতেছে।

উদ্বাস্তু আগমনে একদল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও বহু লোক লাভবান হইয়াছে। গত ১৫ বৎসরে কত হাজার নূতন বাড়ী শুধু পাণিহাটি মিউনিশিপাল এলাকায় নির্মিত হইয়াছে তাহা হিসাব করা যায় না। পানিহাটি এলাকার গঙ্গার ধারে অধিক জমি বিক্রীত না হওয়ায় সে অঞ্চল এখনও উন্নত হয় নাই, ক্রমে সেদিকও অবস্থার পরিবর্তন করিবে।

আজ এলাকার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সকলের চিন্তা করা প্রয়োজন। যে মাঠ ও জঙ্গল আজ মানুষের বাস-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে শীঘ্রই তাহা আরও সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই।

হসন্ত-লীলা

শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী

(রম্যরচনা)

নাম আমার 'হসন্ত' (ভাষান্তরে 'হলন্ত' নামেও আমার অভিহিতি)। আমার সগোত্র কেউ নেই, কোন কালে ছিল কিনা জানি না, একালে আমি আত্মীয়হীন। আমার কোন পূর্বসূরী বা অনুসূরীর হদিশ পাই নি কোন প্রামাণ্য বংশপীঠিকায় (? ব্যাকরণ), আমি তাই একক। এতে আমার কোন অগৌরব নেই, খেদ তো নেইই; পরন্তু আমি তথাকথিত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' এই আমার পরম গৌরব ('সবে ধন নীলমণি' বলতে আমার মাথা কাটা যায়, ওতে অসহায় করুণ করুণ ভাবটা বড্ড বেশি চাগিয়ে ওঠে)।

বাঙলা বর্ণমালার স্বরবর্ণীয়েরা হাড়ে হাড়ে রক্ষণশীল। সত্যিকারের অভিজাত কিনা জানি না, তবে ওদের ভুয়া বনেদিয়ানার গুমোরটা আমাকে শূলের মতো বিঁধছে। এদের ভড়ং এমন যে আমার সঙ্গে লৌকিকতাই এরা করলে না কোন দিন, সামাজিকতা তো দূরের কথা। বোধহয় আড়ালে নিজেদের মধ্যে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-মস্করায় নাসিকাকুঞ্চনও করে ওরা। সম্ভবতঃ ওদের চিরন্তন অবহেলনার কারণেই আমার জন্মাবধি এই হেলিত দেহভঙ্গি (অবশ্য এটা আমার নিছক অনুমান)। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণীয়েরা সত্যিই উদারস্বী। ওদের ঔদার্যের তুলনা হয় না। ওরাই আমাকে এই অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করেছে! সুকার্যে কুকার্যে আমাকে না নিয়ে ওদের পাতা পড়ে না। কথায় কথায় ওরা মাথায় তুলে নিয়েছে কৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছ নেওয়ার মতো। তুলনাটা নিছক নয়, তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছ বামে হেলে, আমিও! কবিরা বলেন, কৃষ্ণের এই অবস্থাটা দায়ে পড়ে। আমার অবস্থাকেও দায়ে পড়া বললে অত্যুক্তি বলে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় থাকবে না। মানের দায় বড় দায়।

আমার দিগন্ত-বিথারী বিচরণ সীমার কথা ভাবলে আমার নিজেরই নেত্র বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, গর্বে বুকটা বেড়ে ওঠে দশ হাত। এই গৌরবেই কখনো আমি ধাবমান বৃষভের মতো উচ্ছ্রিত পুচ্ছ, আবার কখনো ভয়ভীত শৃগালোপম বিনত লাঙ্গুল। যখন আমি উচ্ছ্রিত পুচ্ছ, তখন আমি সর্বত্র। আমিই তখন তর্কে, বিতর্কে; ধর্মেও কর্মেও, অর্থে আছি অনর্থেও; কর্তব্যেও আছি অকর্তব্যেও আছি; আকর্ষণে যেমন বিকর্ষণেও তেমন; হর্ষে আছি বিমর্ষেও থাকব; শৌর্যে থাকলে বীর্যেও থাকব; আবর্তনে থাকলে বিবর্তনে না থাকার কোন কারণ নেই, সৌন্দর্য তো সকলেরই অভিরুচি; আমার আবার কদর্যেও, নিস্বর্গ আর স্বর্গ দুইই আমার কাছে সমান স্পৃহনীয়, উত্তমর্ণ অধমর্ণ নির্বিশেষে আমার অকৃত্রিম প্রীতি। কত আর বলি, কার কথা বলি, কার কথাই বা ছেড়ে দিই। পাল-পার্বণে, আশীর্বাদ, নির্বিবাদ, আশ্চর্য, পারম্পর্য, আর্যাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, দুর্গম, গিরিবর্ত্ম, ঐশ্বর্য, মাধুর্য, দর্প, কন্দর্প, চৌর্য, তস্কর্য, মাধুর্য, বাকচাতুর্য, ঔদার্য, মাৎসর্য, সর্প, বিসর্প তীর্থে পুণ্যার্জন, মেঘে গর্জন, নির্জন দর্পণ, সন্দর্শন, ভাস্কর্যের তির্যকগতি, শার্দূলের তূর্যনাদ, কোথায় আমি নেই, সর্বত্রই আমার নির্বাধ পর্যটন। এমন কি নালা-নর্দমার আবর্জনা অপসারণ করতঃ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করণেও আমি অপরিহার্য; এক কথায় ঈষৎ স্পর্ধাভরে আড়ালে আবডালে বলি আমাকে ছাড়া গতি নেই—যানানে 'কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'।

কর্মময় জগতেও আমি পিছিয়ে নেই, আমিই সকলের সকল কাজে কার্যসিদ্ধিদাতা। বিদ্যার্থীরা লেখনী রূপে, মাঝি-মল্লারা যুগপৎ লগি ও দাঁড় রূপে, শোভাযাত্রীরা পতাকা ও মশালরূপে আমাকে ব্যবহার করে। আমি ক্ষৌরকার্যে সহায়তা করি, দর্জিরা আমাকে কাঁচি রূপে কাজে লাগায়। আমি কখনও ষোড়শীর অলকদামে বেণী-

রূপে, কখনও বা অলাবু-কুষ্মাণ্ডের বৃন্তরূপে শোভা পাই। আমারই জন্য নিদ্রাকাতর পণ্ডিত মহাশয়কে দুরন্ত ছাত্রদের হাতে অশেষ নির্যাতন সইতে হয়। আমার অপমানে নন্দবংশ ধ্বংস হয়েছিল একথা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। গুণ অঙ্কের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে লোকে আমাকে ব্যবহার করে। লেখাবিশেষকে তারকা-চিহ্নিত করিবার সময় লেখকেরা আমার শরণ নেয়। এইরূপে ব্যবহারিক জগতেও আমি অনেক কাজে লাগি। আমারই সাহায্যে চায়ের মজলিশে, চণ্ডী মণ্ডপে, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ বাসরে, সাহিত্য সভায়, পরিষদ কক্ষে, পৌরসভায়, এমন কি জাতীয় মহা-সম্মেলনেও বহু সমস্যার সমাধান হয়। আমি বড়দিনের সময় গীর্জার শীর্ষদেশে অবস্থান করে খ্রীষ্টানদের পর্বদিনের কথা সগর্বে ঘোষণা করি।

মাঝে মাঝে ভাবি আমি না থাকলে বুঝি-বা সব ওলোট পালোট হয়ে যেত। লোকে ব্রহ্ম মুহূর্তে শ্রীদুর্গা ও জনার্দনের নাম উচ্চারণ করতে পারত না, মহামারীর প্রাদুর্ভাব হত না। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা থাকত না, সূর্যোদয়ে অন্ধকার বিদীর্ণ হত না কোনোকালে, বারিদ বারিবর্ষণ করত না, বর্ষারম্ভ থাকত অকল্পনীয়, শস্যক্ষেত্রের অনুর্বরতা বর্ধিত হওয়ায় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটত, প্রাচীন বাঙলার একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদই হত কালের গর্ভে বিলীন, মোটরের হর্নে কর্ণ বিদীর্ণ হত না হামেশাই, কারো জীবনে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিত না, কৈলাস পর্বতশীর্ষে ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির জটানির্গতা গঙ্গা মর্তে অবতীর্ণা হয়ে ভারতভূমিকে শস্যপূর্ণা করতেন না, পুরাণ গ্রন্থ বর্ণিত দেবর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, গর্গ-গার্গী, ভার্গব, কুম্ভকর্ণ, ঘণ্টাকর্ণ, লম্বকর্ণ, দুর্যোধন, যায় কর্ণার্জ্জুনের নাম কেউ শুনত না, কেউ বিদর্ভ ও বর্ধমানে যেত না, ব্যানার্জী, মুখার্জী চ্যাটার্জীরা সমানে কৌলীন্যের দাবী উপস্থিত করতে পারত না, বর্ণবৈষম্য থাকত না, লাল-কালো ধলোর তফাৎ থাকত না, আহার্যদ্রব্য হত নির্ভেজাল, প্রবল দুর্বলকে পর্যুদস্ত করতে পারত না, পর্যুসিত অন্ন পরিবেশন করা সম্ভব হত না, জ্ঞান-বিজ্ঞানে কীর্তনে বাঙালীর পারদর্শিতাই বা সর্বজনস্বীকৃত হত কেমন করে, আর্ত মুমূর্ষু শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা নিবেদনে হত অপরাগ, দেশ দেশান্তরে তারবার্তায় প্রচার বন্ধ হয়ে যেত, প্রার্থী শরণার্থী অর্থী প্রত্যার্থী থাকত না, আর্তের সেবা, রোগীর পরিচর্যা, দুর্গতের সাহায্য এসব কিছুই থাকত না, কীর্তি না থাকলে মর্তে কেই বা অমরত্ব লাভ করত? ভার্জিল, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, হাওয়ার্ড, হার্ডি ডর্, ষ্টুয়ার্ট, চার্চিল, বার্ক, শূর্পণখা, মুর-গ্লাডষ্টোন্, মেগাস্থিনিস্, রবিনহুড, নেপোলিয়ন্ নেলসন, হার্কিউলিস, ভিষকরত্ন, বাণভট্ট, বার্লিন গ্রীস, ডেনিস, ডেনমার্ক, ডানকার্ক, সুইডেন, নিউইয়র্ক, লণ্ডন, ব্রাডিভোষ্টক, নর্মদা পার্ল হার্বার, ঘর্ঘরা, সুবর্ণরেখা, সুবর্ণভদ্রা ইত্যাদির নাম শোনা যেত না, বিদেশী বর্জন আন্দোলন করা যেত না, চতুর্বর্গ ফললাভ সম্ভব হতনা, পঞ্চম পুরুষার্থের কথা শোনা যেত না, পঞ্চমবর্গ থাকত না, নদী জলপূর্ণা হত না, আর্য অনার্য সংঘর্ষের কথা ভাবা যেত না, মার্গ সংগীতের প্রচলন হতো অসম্ভব।

বৈদিক যুগে পবিত্র ওম্‌ধ্বনি উচ্চারণে আমার মাহাত্ম্য গম্ গম্ করে উঠত, স্বদেশী যুগে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে আবার নতুন করে আমার মহিমায় আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। একথা সবজন বিদিত যে আমি থাকলেই লোকের ধর্মে কর্মে মতি হবে, চৌর্যপ্রবৃত্তি লুপ্ত হবে (ফলে ফৌজদারী কোর্ট উঠে যাবে), মর্মর ফলকে স্মারক লিপি উৎকীর্ণ থাকবে, ধর্মের পথ কণ্টকাকীর্ণ না হয়ে হবে কুসুমাস্তীর্ণ, পরীক্ষায় তৃতীয় স্থানের চতুর্থস্থানের হবে অবাধ প্রতিপত্তি, মেয়েদের চতুর্দশীব্রত উদ্‌যাপিত হতে থাকবে সাড়ম্বরে।

মাঝে মাঝে আমি ভাবি যদি আমি না থাকতাম তাহলে বোধকরি ব্যবহারিক জগতে একটা অবশ্যম্ভাবী ওলোট পালোট হয়ে যেত। পক্ষান্তরে আমি আছি বলেই আজও আশ্চর্য সমস্ত কিছু টিকে আছে পৃথিবীতে। অঙ্কে, পাটিগণিতে এখনো, অর্বুদ, খর্ব, নিখর্ব, আছে আমারই জন্যে। আমি থাকলে দুর্গম গিরিশীর্ষে জয়ধ্বজা উড়বে, ধনী নির্ধন হবে, পরাজিত প্রাণভয়ে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে, লোকে ভয়ার্তকে অভয় দেবে, ক্ষুধার্তকে দান করবে অন্ন, পরিচারিকা সম্মার্জনীর সাহায্যে আবর্জনা দূর করবে, ঘূর্ণিবাত্যা তথা ঘূর্ণাবর্তে প্রাণহানী ঘটবে অনবরত, মহাপুরুষেরা পুত্র শোকেও নির্বিকার থাকবে, মুমূর্ষুর মর্মভেদী আর্তনাদে অন্তর দীর্ণ বিদীর্ণ হবে, অর্থ কৌলীন্যমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে, সকল কার্যে মূর্খের কথায়

পর্যাপ্ত বলে গণ্য হবে, স্বর্গলোকে উর্বশী ও গন্ধর্বকুলের সন্ধান মিলবে, ভূগর্ভে বাষ্পীয়মান চলবে, খনির দর্শন মিলবে, সিন্ধুগর্ভে মুক্তার সন্ধান পাওয়া যাবে, লোকে দুর্মুখ না হয়ে প্রিয়চিকীর্ষু হবে, দুরন্তপনা করতে গিয়ে ছেলেরা মাষ্টার মহাশয়কে দেখে লজ্জায় জিভ কাটবে, আগ্নেয়গিরি থেকে বহ্নি নির্গত হবে।

আমি না থাকলে গীতা, তন্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, কাদম্বরী মনুসংহিতা, চরক-সংহিতা প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কৃত শাস্ত্র ও গ্রন্থাদি রচনা সম্ভব হত না। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস বাণভট্ট, মনু প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থ লেখকগণ কলম ছেড়ে অন্য ব্যবসা ধরতেন। শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও পূজার্চনার মন্ত্র পাল্টে যেত। টোলো পণ্ডিত মহাশয়গণের যাজনিক ব্যবসা শিকেয় উঠত। এক কথায়, সংস্কৃত ভাষা অচল হত। আর এ্যাটম্ বোমা, স্পুটনিক্, রকেট তৈরী হত কি? বন্দুকের গুড়ুম্ গুড়ুম্ আল্‌বোলার গুড়ুক্ গুড়ুক্ শব্দই শোনা যেত কোথা থেকে?

আমার অবলুপ্তি ঘটলে একটা হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। ভাবলেও আমার হাসি উপ্‌চে উঠে। এই মজার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হলে একে বিশদ করে বলতে হয় উদাহরণ দিয়ে। আমি না থাকলে লর্ড থাকবে না, লেডী থাকবে, কিন্তু ম্যাডাম্ কদাচ থাকবে না (তাহলে স্যারেদের কি গতি হবে) পোষাক আসাক, ঘর দোর, ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদির রূপ হবে কিম্ভূত-কিমাকার। ফ্রক্, কোট, সার্ট, জ্যাকেট, জামার পকেট থাকবে না, ধুতি, চাদর, লুঙ্গি, গামছা, সায়া ব্লাউজ কিন্তু থেকেই যাবে, আর তা দিয়েই লজ্জাও নিবারণ করতে হবে, শীতও। মুশলিম, পার্শী, খৃষ্টান, পিউরিটান্ পিঠটান দিলে স্বভাবতঃই হিন্দু বৌদ্ধরা সারা পৃথিবী জুড়ে বসবে। সিগরেট থাকবে না, কিন্তু খুব বেশি অসুবিধা হবে না, বিড়িটা তো থাকবেই। কনস্টেবল্ থাকবে না, চৌকিদার দফাদারের প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে। আলপিন সেফটিপিন থাকবে না, সূচ দিয়েই কাজ চালাতে হবে। টেবল ডেস্ক বেনচ থাকবে না, চেয়ার টুল থেকেই যাবে। আলু থাকবে বটে তবে চপ্-কাটলেট হবে না। ঠিক অমনি ডিম থাকলেও আমলেট পোচ হবে না। শিঙ থাকবে না লেজ থাকবে, গুঁতো খাওয়ার ভয় ঘুচে যাবে। ডক থাকবে না জাহাজ থাকবে, কিন্তু আড্ডা গাড়বার জায়গা পাবে কোথায়, আপ ডাউন থাকবে না, সব সমান হয়ে যাবে। পেরেক্ থাকবে না, স্ক্রু থাকবে, হুক্ থাকবে না, বক্লা থাকবে। সব ষ্ট্রীট্ সরণী হয়ে যাবে, ফুটবল্ ক্রিকেট প্রভৃতি বিদেশি খেলা লোপ পেয়ে দাড়ি বাঁধা, হাডুডু প্রভৃতি দেশি খেলা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। চকলেট লজেন্স বিস্কুট এর অভাবে সবাইকে খাস্তা গজা জিলিপি চিবোতে হবে, অভাবে মুড়ি চিড়ে খই, সংকারের বাবাও "ব্যান" করতে পারবে না। ম্যাকিনন, ম্যাকলিয়ড, হ্যামিলটন, ফার্গুসন প্রমুখ কোম্পানী থাকবে না, তার বদলে বিড়লা, ডালমিয়া, মুরারকা, ভটিয়াওয়ালা, আগরওয়ালারা চারদিক থেকে ছেঁকে ধরবে। কুমকুম্ টয়লেট ক্রীম্ ইত্যাদি উঠে যাবে দেশ থেকে। চুয়া-চন্দন, লোধ্ররেণুর যুগ ফিরে আসবে, লজিক্ থাকবে না, তর্কও উঠবে না, ফিলজফিতে দেশ ভরে যাবে, মেটকাফ হল ধুলিসাৎ হবে, মহাজাতিসদন গম গম করবে ভীড়ের চোটে, টনিক লোপ পেলে স্বভাবতঃ সালসার প্রতি মানুষের লালসা বাড়বে।

আমি মাথার উপর থেকে পায়ের তলায় নেমে এলেও কিন্তু আমার সম্মান প্রতিপত্তি কমে যায় না। তখনও আমি সর্বত্র। মাছির ভনভন, অস্ত্রের ঝনঝন, নির্ঝরের কল্‌কল, নদীর ছল্‌ছল্, ভ্রমরের গুণ্‌গুণ্, রেলগাড়ীর হুস্ হুস্, বাতাসের ঝির ঝির, বৃষ্টির টিপ্ টিপ্ ঝুপ্ ঝুপ্, উল্লাসের হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে, শকটের ঘড় ঘড়, বন্দুক কর গুড়ুম্ গুড়ুম্, পাখার ফড় ফড়, পাতার মর মর, ঘড়ির টিক্ টিক্, পতাকার পত্ পত্, বজ্রের কড় কড়, সলিল অশ্রু আর শোনিতের ঝর ঝর, কলসীর ঢক্ ঢক্, বাদ্য-যন্ত্রের টুম্ টুম্, হাওয়ার ফুর ফুর, বাচালের বক্ বক্, পায়রার বকম্ বকম্, খুরের খুট খুট, ক্রোধের গর গর, যন্ত্রণার ছট ফট, ভয়ের থর থর ইত্যাদি শব্দের মধ্যে আমাকে অবলীলায় পাওয়া যাবে। তখনও ফুল ফুটবে পাতা নড়বে, গাড়ী ছুটবে, পাখা ঘুরবে, শেয়াল ডাকবে, ভয়ে বুক ধুক্ ধুক্ করবে, পাখি ডানা ঝাপটাবে, শিশুরা খিল্ খিল্ করে হাসবে, ছোকরারা ফিট ফাট হয়ে স্যুট পরে বেড়াবে, বুড়োরা খক্ খক্ করে কাশবে,

পাগলেরা বিড় বিড় করে বক্‌বে, দুঃখীরা ঠক্ ঠক্ করে শীতে কাঁপবে, পচা জিনিষে পোকা কিল্‌বিল্ করবে, কেটলীতে জল টগ্‌বগ্ করে ফুটবে, ঝুর্ ঝুর্ করে বালি ঝর্‌বে, ফুর্ ফুর্ করে বাতাস বইবে, পলতা থেকে হুড় হুড় করে জল ছাড়বে, পিক্‌নিক্ করার জন্যে লোকেরা ফলতা ছুটবে। চালতে বাগানে গার্ডেন পার্টি বস্‌বে, চরকা ঘুর্‌বে, সাপে কাটবে, ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপবে, বিড়াল চুক্ চুক্ করে দুধ খাবে। আমারি সহায়তায় লোকে ষ্টুপিড্, ননসেন্‌স, ড্যাম্, ফুল, ইডিয়ট, রাস্‌কেল্ ইত্যাদি গালাগালি দেবে, তুফানে হুড়মুড় করে ঘর বাড়ী ভেঙে পড়বে, টারজান দি এপম্যান্‌কে দেখতে পাওয়া যাবে। আমারই অবস্থিতিতে দিক্ নির্ণয় করা সম্ভব হবে, বোমা ফাট্‌বে, আগুন জ্বল্‌বে, ঘুড়ি উড়বে, হাটে হাঁড়ি ভাঙ্‌বে, ঢেকুর উঠ্‌বে, মূর্খের প্রতি উপদেশ নিরর্থক হবে, স্বর্গমর্ত একাকার হবে, জনসাধারণ খাবার না পেয়ে ঢক্ ঢক্ করে জল গিল্‌বে, গরম গরম বক্তৃতা চল্‌বে, বলীবর্দ গাড়ী টানবে, গাড়ী ভার নিয়ে চল্‌বে, আপৎকালে সাইরেন বাজবে, বেদ্‌পরীক্ষক সেন্ট্ পার্সেন্ট নম্বর কাট্‌বে, খাদ্যের ভেজাল চলবে, পান থেকে চূণ খস্‌বে, বর্ষপঞ্জীতে শুভদিনের নির্ঘণ্ট থাকবে, স্নানার্থীরা অর্ধোদয়-যোগে গঙ্গাস্নানে পুণ্যার্জন করবে, শরণার্থীদের জন্য পশ্চিম-বঙ্গে বাসস্থান সংগ্রহ করা দুর্ঘট হবে, দর্শনার্থীদের ভিড়ের চাপে পুণ্যার্থী নরনারী প্রতি উৎসব ও পালপার্বণে অগুণ্‌তি মরবে, অভীষ্ট বস্তুর হদিস্ মিল্‌বে, নির্লজ্জ বিল্‌কুল্ বদ্‌নাম বেমালুম হজম করবে, বৃথা তর্কে নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করবে। বাঙলা সাহিত্যের লেখক-লেখিকারাও "তুমি কোন্ গগনের চাঁদ, তুমি কোন্ কাননের ফুল," "বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে মোরে দোল্" "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে," প্রভৃতি দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে জগৎকে উদ্‌বুদ্ধ করবে। আমাদের দুর্ধর্ষ জোয়ানরা মার্‌মার্ শব্দে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, বীরদর্পে ধরা কাঁপবে, মেদিনী টল্‌মল্ করবে। লোকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যেও হসন্তের ব্যবহার করবে। বলবে পাগ্‌লি ছাগ্‌লির কথায় কান দিস্ না। সুধী পাঠকেরা, আমার অপরাধ নেবেন না। আমার নিজের ধৃষ্টতায় আমি নিজেই বারে বারে লজ্জা পেয়েছি। সেই কোথায় সুরু করেছিলুম আর কোথায় এসে ঠেকল আমার জয়ঢাকের বাদ্যি। নিজের ঢাক নিজে পেটাতে লজ্জা পাইনি তা নয়, তবে এছাড়া আমার আর পথ ছিল না। কোন কবি বা কোন লেখক কিম্বা কোন সমালোচক অথবা কোন প্রবন্ধকার নিজগুণে আমার মাহাত্ম্য প্রচারের ভার নেননি এতদিন, অথচ আমার সাহায্য নিয়েছেন অকাতর চিত্তে। নেমকহারাম বাঙালী জাতিকে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দেওয়ার মধ্যে লজ্জা নিহিত থাকলেও অস্বাভাবিকতা নেই কোথাও।

আজকাল কোন কোন উগ্রপন্থী আধুনিক লেখকেরা ধর্মকে ধরম, কর্মকে করম, গর্বকে গরব পূর্বকে পুরব, মর্মকে মরম, বর্ষকে বরষ, স্বর্গকে স্বরগ, মর্তকে মরত, বর্ষাকে বরষা, হর্ষকে হরষ, স্পর্শকে পরশ, দর্শনকে দরশন, মূর্তিকে মুরতি লিখে আমাকে সমূলে উৎখাত করার অপচেষ্টা করছেন। আনন্দবাজার গোষ্ঠী তো আজকাল আমার জলজ্যান্ত অস্তিত্বকে গায়ের জোরেই অস্বীকার করছেন বিদেশী শব্দের সংযুক্ত বর্ণ ভেঙে লেখার মধ্যে। তথাপি আমার আশা আছে, ভরসাও আছে। কথায় বলে "রাখে কৃষ্ণ মারে কে" আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সাধ্য কার? হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হতে চলেছে। আমার ভরসা আছে যে বাঙালীরা আমার মর্যাদা না বুঝলেও হিন্দীভাষীরা বুঝবে। হিন্দী ভাষীরা আমাকে খাতির করবে। বাঙালীর বদলে আমি তখন ভোজপুরীদের মুখে মুখে ফিরব। তারা আমার সাহায্যে "কোন্ হ্যায়, কোন্ হ্যায়" বলে চোর পাকড়াবে, "তুম্ ভি মিলিটারী হাম্ ভি মিলিটারী," বলে গোঁফে মোচড় দেবে, আর "হাম্ করতা হ্যায়, ধরতা হ্যায়, জানতা হ্যায়" বলে বুক ফুলিয়ে চল্‌বে। রাষ্ট্রভাষার (রাজ-ভাষা নয় কি?) কল্যাণে এবার আমি রাজাধিরাজ হতে চলেছি। আমাকে আর পায় কে?

বাঙলা ভাষা থেকে পালাতে পারলে আমিও বাঁচি। বল্‌তে বাধা নেই, আমিও নিজে এমনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। সরকারের কৃপায় আমার মুক্তি ত্বরান্বিত হতে চলেছে। জানতে চান কেন আমি বিদায় নিতে উদ্‌গ্রীব? একমাত্র কারণ, আমার অভিমান বললেও ক্ষতি নেই। অপ্রয়োজনে আমাকে অবজ্ঞা করে সকলে আর প্রয়োজন

হলেই স্পেশাল কনষ্টেবলের মতো আমাকে খেয়াল খুশি মতো কাজে অকাজে যেখানে সেখানে লাগায়। কিন্তু কেন? সংখ্যালঘু বলেই কি আমার উপর এই অবিচার, এই নির্মম অত্যাচার? আমার ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। আমার উপর এমনি নির্যাতন চলতে থাকবে আর আমি তা চোখ বুজে সয়ে যাব? এখন তো দেশে সকলের সমান অধিকার-নীতি প্রমাণিত হয়েছে। সংবিধান সকলকে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপিত করার সুযোগ দিয়েছে। আমি কি সে অধিকারে অধিকারী নই? এই সাম্যবাদী যুগেও আমার প্রতি সুবিচার করা হয়নি এ পর্যন্ত। রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাঙলা ভাষার যুগান্তকারী পরিবর্তন চল্‌ছে। বাঙলা ভাষার বহুল প্রচার ও প্রসারের প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে।

তাই, আমি আমার আসন ছেড়ে প্রতিবেশী সাহিত্যের রাজ্যে একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পূর্বমুহূর্তে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি ও নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও অন্যান্য সাহিত্যসেবী সঙ্ঘের কাছে সকরুণ ও সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই—আমাকে আমার এই অবনত দুঃসহ অবস্থা থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন। এমনি করে তিলে তিলে মৃত্যু-যন্ত্রণা আমি আর সইতে পারছি না, পারবও না। জয়হিন্দ্‌!

কাজ্‌লা মেয়ে

সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওয়ার সাথে হাল্‌কা পাখায় ভেসে
শ্যাম্‌লা মেয়ে এসেছিল অচিন সে কোন দেশে,
সেথা, সবুজ ছেলে ধুসর বেশে ভাব্‌ছে তারই কথা
শ্যাম্‌লা মেয়ে ঘোচাবে তার বুকের সকল ব্যথা।
কাজল কালো দীঘল চোখে তার
স্বপ্ন ছিল আশা ছিল আর—
কৃষ্ণকাল কুঞ্চিত কেশদাম
পিঠের 'পরে লুটাচ্ছিল বাতাসে উদ্দাম।
সবুজ ছেলের স্বপ্নমাখা সবুজ চোখের সাথে
কালো মেয়ের কাজল কালো চোখের মিলন হ'তে
মনে হলো—হাস্‌লো ওরা খুসীতে চঞ্চল,
হঠাৎ দেখি শ্যাম্‌লা মেয়ের চোখের কোণে জল;
হাসিমাখা খুসীমাখা দীঘল দুটি চোখে
জমাট বাঁধা অশ্রু ছিল বুঝিনি তা আগে।
কাজ্‌লা মেয়ের কাজল পরা কালো চোখের থেকে
অশ্রু এবার ঝর্‌লো দেখি সবুজ ছেলের বুকে,
সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বুঝি রাজকন্যা জাগ্‌লো
সবুজ ছেলের ধূসর বুক সজীব ছোঁয়া লাগ্‌লো।
রুক্ষ তাহার নীরস বুকে জাগ্‌লো রসের বন্যা
ফুটলো কুসুম—ডাক্‌লো পাখী—কিন্তু কোথায় কন্যা?
সবুজ ঘাসে সবুজ পাতায় রং বেরং'এর ফুলে
সবুজ ছেলে হাস্‌ছে দেখি মেয়ের কথা ভুলে।
শ্যাম্‌লা মেয়ের চোখের জলে জাগ্‌লো রসের ঢেউ
হাস্‌ছে সবাই—তার কথা আর ভাব্‌ছে নাকো কেউ!

চিঠি

শ্রীফণিভূষণ হালদার

কর্ণকুহরে এসেছে তোমার ডাক
মনের গহনে তুলেছে নতুন সুর
থাকনা এখন পুরোনো কথাই থাক
দূর চিরদিন রয়না যে চির-দূর।
অনেক শাওন দিন-খন গেছে কেটে
ডাক দেয় মাঠে সোনালি ফসল তার
অনেক সুরভি ছড়ানো সবুজ মাঠে
নব-ঋতুর আনন্দ সঞ্চার।
ক্লান্ত-পথেই চলেছি এগিয়ে আমি
সমুখে ডাকছে জীবনের দূর-পথ
অকূল সাগরে কূল কী পেয়েছি ভাই!
রুক্ষ-পথে ছুটেছে আমার রথ।
জীবনে তোমার এসেছে নতুন দিন
নীলাকাশে তাই আলোদের কোলাকুলি
শারদ রাতের স্বপনে বাজুক বীন
নতুন ফসলে বাঁধোনা দিনের ঝুলি।
মনে রেখ,
দূর চিরদিন রয়না যে চিরদূর
বন্ধুর পথে সাড়া মিলবেই
জীবনের বন্ধুর।

মর্যাদা

কুমারেশ ভট্টাচার্য

চিত্রতারকা সুলেখা রায়। সত্যিকার একজন 'ষ্টার'। 'ষ্টেজ' এর 'ফুটলাই' আর সিনেমার 'স্পটলাইট' দুয়ের স্তুতিই সম্মান দিয়েছে শিল্পী-প্রতিভার। কাগজে কাগজে তার উচ্চ প্রশংসা। হোটেলে, রেস্তোরায়, ট্রামে-বাসে, রোয়াকে আড্ডাধারী নিষ্কর্মা যুবকদের রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যেও শোনা যায় সুলেখারই জয়গান—তার অভিনয়ের, রূপের।

আর্থিক অভাব আজ আর নেই সুলেখার। বাইরে সে পূর্ণ, তবু অন্তর তার শূন্যতায় ভরে থাকে। মনের কোন এক নিভৃত কোণে তার এমনি একটা ব্যথা লুকিয়ে আছে. যা প্রতিনিয়ত তাকে আঘাত দেয়। সিনেমা কোম্পানীর প্রডিউসারদের কাছ থেকে যখন তার হাতে আসে হাজার হাজার টাকার চেক, তখন সে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে খাটের উপর বসে কোলের উপর চেকগুলি রেখে এক দৃষ্টে থাকে তাকিয়ে সেদিকে। মুহূর্তের মধ্যে তার ডাগর চোখদুটি থেকে মুক্তাবিন্দুর মত ঝরে পড়ে অশ্রুধারা—চেকগুলির স্থানে স্থানে ওঠে ভিজে। অপরের জীবনে অর্থ আনে আনন্দ কিন্তু সুলেখার জীবনে সে শুধু জাগায় বিতৃষ্ণা।

বছর দুই হল কলকাতায় সেণ্ট্রাল এভিনিউয়ের বড় রাস্তার পাশেই একখানা দোতলা বাড়ী কিনেছে সে। নীচে দোকান ঘর দুটি ভাড়া দেওয়া হয়েছে। উপরে থাকে সুলেখা ও তার একমাত্র চাকরানী অন্নকালী। অন্নকালী ঘরের কাজ থেকে বাজার করা প্রভৃতি সমস্ত কাজই করে। সুলেখার মত তারও সংসারে আপনার বলতে আর কেউ নেই।

শ্রাবণের সে এক বর্ষণ মুখর রাত। প্রায় ন'টা বাজে। সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মাঝে একখানা মোটর এসে সুলেখার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন হর্ণ দিতে থাকে। সুলেখা তাড়াতাড়ি অন্নকালীকে দেয় নীচে পাঠিয়ে। মীনা উপরে আসতেই মিষ্টিহাসিতে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সুলেখা জিজ্ঞেস করে—এ বৃষ্টির মধ্যে কি মনে করে?

খাটের উপর তার একেবারে পাশে বসেই মীনা বলতে থাকে—আমার খোকনের জন্মতিথি। তাই তোকে নিমন্ত্রণ করতে এলাম সুলেখা! তুই কিন্তু কাল নিশ্চই যাবি, বুঝলি?

—দেখব চেষ্টা করে।

চেষ্টা নয়। যেতেই হবে তোকে। তুই যদি কাল না যাস, তবে সত্যিই আমি মনে খুব ব্যথা পাব। একটু থেমে, একটু হেসে মীনা আবার বলে—তোর যে গরিমা—লোকে মাথা কুটেও তোকে নিতে পারে না কোথায়ও।

বান্ধবীর এই মন্তব্য শুনে সুলেখার চোখদুটো হয়ে ওঠে অশ্রু-ভারাক্রান্ত। ধীরে ধীরে করুণকণ্ঠে সে বলে—তোরা আমায় ভুল বুঝিস না ভাই। এ আমার গরিমা নয়, একটা প্রচণ্ড আঘাত, একটা অসহ্য কষ্ট। তোরা আমার বাইরেটাই দেখিস—কোনদিন দেখেছিস আমার অন্তর? কথাগুলো বলতে বলতে সুলেখা কেঁদে ফেলে। ধীরে ধীরে করুণকণ্ঠে সে বলতে থাকে, আমি আজ 'সিনেমা ষ্টার'। চারদিকে আমার খ্যাতি। পত্রিকার রিপোর্টাররা আমার কাছে আসেন আমার জীবনী জানতে। আমি লজ্জায় দুঃখে সরে যাই। কি আমার পরিচয়? কি আমার বংশ মর্যাদা? সে দুঃখের, সে কলঙ্কের পাঁচালী আমি বলতে চাইনা—তাঁদের এড়াতে চেষ্টা করি।

বান্ধবী মীনা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সুলেখার মুখের দিকে। চোখ দুটো তারও ভিজে ওঠে। আজ যেন সুলেখার কি হয়েছে—দুঃখের বন্যায় ধৈর্যের বাঁধ যেন তার ভেঙ্গে পড়তে চায়। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে সে বলতে থাকে, মার কাছে শুনেছি আমাদের বাড়ী নাকি ছিল যশোর জেলায়—মল্লিকপুর। কিন্তু আমি কখনও দেশ দেখিনি। পাইকপাড়া অঞ্চলে একটা জরাজীর্ণ বস্তী বাড়ীতে মা আমাকে নিয়ে থাকতেন। এমনি বৃষ্টির রাতে ঘরে জল পড়ে ভেসে যেত। মা আমাকে কোলের মধ্যে করে সারাটা রাত জেগে রয়েছেন। বাবাকে কখনো দেখিনি জীবনে। মার কাছে বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেই মার সুন্দর মুখখানা কাল হয়ে যেত। করুণকণ্ঠে তিনি

বলতেন, তোর বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। তাইতো আমাদের এত কষ্ট—এত দুঃখ।

বাসায় বাসায় মা ঝিয়ের কাজ করতেন। আমাকে সুখী করবার জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না! আমি তখন ছেলে মানুষ। কত অন্যায় আবদারই না করেছি মায়েব কাছে। কিন্তু হাসিমুখে আমার সমস্ত আবদার তিনি পূর্ণ করেছেন। সাতবছরের সময় মা আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে বললেন, তুই ই তো আমার ছেলে। পড়াশুনা করে তুই ভালভাবে পাশ করবি—তারপর চাকরী করবি—আমাদের সব অভাব-অভিযোগ ঘুচে যাবে।

স্কুলে যেতাম—সেখান কোন মেয়েই বুঝতে পারতাম না যে আমরা অত্যন্ত গরীব। তারপর আমি যেবার ক্লাস নাইনে পড়ি, সেবার দুর্গা পূজার কদিন আগে মার সামান্য জ্বর হল। ক্রমে ক্রমে সেই জ্বর কঠিন টাইফয়েডে হল পরিণত। হাতে একটা পয়সা ছিলনা বার্লি কিনবার—ক্ষমতা ছিলনা ডাক্তার ডাকবার। তারপর বিজয়ার দিন হল বিসর্জন। আমাকে একা ফেলে মা চিরদিনের মত চলে গেলেন সমস্ত দুঃখ কষ্টকে ফাঁকি দিয়ে।

আজ আমার বাড়ী-গাড়ী, টাকা-পয়সা কোন কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু আমার মা, আমার মা কোথায় আজ! গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে সান্ত্বনার সুরে মীনা বলে, মানুষের ভাগ্যে যা আছে সে তো ভোগ করতেই হবে সুলেখা!

—মার কথা তো কিছুতেই ভুলতে পারি না মীনা। সংসারের আর কারও স্নেহ তো পাইনি কোনদিন—পেয়ে-ছিলাম একমাত্র মায়ের। তাইতো সবসময় মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তাঁরই মুখখানা।

তারপর বান্ধবীকে আরও অনেক সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়ে মীনা পরের দিন তাকে যাবার কথাটা আরও কয়েকবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে চলে গেল। ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে দশটা বাজে।

তিনমাস পরের কথা। মহালয়ার দিন। সকাল বেলা। একখানা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়ায় সুলেখার বাড়ীর সামনে। গাড়ী থেকে নেমে আসে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি সুদর্শন যুবক। দেখলেই জমিদার-নন্দন বলেই মনে হয়। দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল অন্না-কালী। যুবকটি নীচে থেকেই জিজ্ঞেস করে, এটাই কি সুলেখা দেবীর বাড়ী?

হ্যাঁ, অন্নাকালী বারান্দায় রেলিংয়ের উপর ঝুকে উত্তর দেয়। কথাটা কানে যেতেই সুলেখাও এসে দাঁড়ায় বারান্দায়। জিজ্ঞেস করে, আপনি কাকে চান? কোথা থেকে আসছেন?

—আপনার সঙ্গেই দরকার। বালীগঞ্জ থেকে আসছি। আসুন উপরে। কথাটা বলেই সুলেখা অন্নাকে নীচে পাঠিয়ে দেয় ভদ্রলোককে নিয়ে আসতে।

—নমস্কার।

প্রতি নমস্কার জানিয়ে সুলেখা চেয়ারখানা দেখিয়ে যুবকটিকে বসতে নির্দেশ দেয়, নিজেও অদূরে অবস্থিত চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করে মিষ্টি মুখে, আপনি আমার কাছে—

তার মুখের কথাটা যেন লুফে নিয়েই যুবকটি বলে হ্যাঁ, তাই বলছি। দেখুন, আমার বাবা একটা সিনেমার বই করতে চান। অন্ততঃ তিনলক্ষ টাকা পর্যন্ত তিনি ব্যয় করতে প্রস্তুত। বইও ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের কোম্পানীর নাম হয়েছে 'রূপকথা পিকচার্স'। একজন প্রখ্যাত ডিরেক্টারও ঠিক হয়েছেন। এখন নায়িকার ভূমিকায় আমরা আপনাকেই চাই। বাবা নিজেই আসতেন এজন্যে। কিন্তু তাঁর শরীরটা হঠাৎ অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। তাই আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ীতে একবার যান। বলুন, কখন যেতে পারবেন? আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব। বিশেষ আগ্রহভরে চেয়ে থাকে যুবকটি সুলেখার মুখের দিকে উত্তরের আশায়।

একটু ভেবে সুলেখা জবাব দেয়, কাল বিকাল চারটায় আপনি আসবেন। টালিগঞ্জে ষ্টুডিয়োতে যাবার পথে দেখা করে যাব।

—আচ্ছা নমস্কার বলে হৃষ্টমনে যুবকটি চলে যায়।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে সুলেখা গিয়ে ল্যান্সডাউন রোডে রামনাথবাবুর বাড়ীতে পৌছাতেই তিনি উপর থেকে নেমে এলেন নীচে সুলেখাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। মৃদু হেসে বললেন, তুমি আমার মেয়ের মত। তাই আর 'আপনি' বলে সম্বোধন না করে 'তুমি'ই বলছি। চল মা, আমার উপরের ঘরটাতেই গিয়ে বসা যাক। কদিন হল ব্লাডপ্রেশারটা আমার অত্যন্ত বেড়েছে।

দ্বিতলে সুসজ্জিত রামনাথবাবুর ঘর। সুলেখা একটা সোফায় বসল। তারই মুখোমুখি একটা ইজিচেয়ারে বসলেন রামনাথবাবু। তিনিই প্রথম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দেশ কি এখানেই, না তুমিও আমাদের মত পূর্ব পাকিস্থানের?

মৃদু হেসে সুলেখা জবাব দেয় কলকাতায়ই আমার জন্মস্থান। তবে মায়ের কাছে শুনেছি পূর্বে আমাদের দেশ ছিল নাকি যশোরজেলায়।

যশোরজেলায়? কোন গ্রামে বলতো? সোৎসাহে জিজ্ঞেস করেন রামনাথ।

—মল্লিকপুরে। সহজভাবে বলে সুলেখা।

আনন্দে ভরে যায় বৃদ্ধের মুখ। তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেন, মল্লিকপুর? তোমার বাবার নাম কি ছিল?

—বাবাকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি। মা বলতেন, আমার বাবা নাকি নিরুদ্দিষ্ট। লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে সুলেখার মুখমণ্ডল।

—তোমার মা বেঁচে নেই?

—না, মা মারা গেছেন দশ-এগার বছর হবে।

—তোমার মায়ের কী নাম ছিল? অবশ্য এসব কথা আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। কারণ, তোমার বংশ পরিচয় নেবার জন্যে আমি ডাকি নি, কিংবা তুমিও সে পরিচয় দিতে আস নি। আমি একসময় মল্লিকপুরের জমিদার ছিলাম মা। পাকিস্থান হবার পর আমি এখানে এসেছি—এই বাড়ী করেছি। তুমি মল্লিকপুরের মেয়ে—আমাদের গৌরব। সেইজন্যই জানতে চাইছি তোমার পরিচয়। ধীরে ধীরে সুলেখা উত্তর দেয়, আমার মায়ের নাম ছিল সুলতা।

—সুলতা! বৃদ্ধের সুন্দর মুখখানা যেন ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল এক মুহূর্তে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান তিনি, পাশের ঘরে নিয়ে যান সুলেখাকে। সেখানে একটা স্যুটকেস খুলে বের করলেন একটি মেয়ের ছবি।

সুলেখা দেখল অবাক হয়ে তারই মায়ের ছবি। রামনাথের চোখে ফুটে উঠল অপরাধীর দৃষ্টি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ইনি তোমার মা?

সুলেখা ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানাল।

বৃদ্ধ এবার অপরাধীর স্বীকারোক্তি দিতে শুরু করলেন—সুলতা ছিল আমারই গ্রামের এক কায়স্থ প্রজার স্ত্রী। সুন্দরী যুবতীর মোহে ভুলে সে বিধবা হবার পরেই তাকে গোপনে গ্রাম থেকে কলকাতায় এনে রাখি। মাঝে মাঝে আমি আসতাম কলকাতায়, তার খরচের টাকাও দিতাম। সে কিন্তু কোনদিন আমার কাছে টাকা চায়নি। সে মনে-প্রাণে আমাকেই পেতে চেয়েছিল। কিছুদিন পরে তার দেহে সন্তানসম্ভাবনার ইঙ্গিত জাগতে দেখে নিজের সম্মানহানির আশঙ্কায় সমস্ত সম্পর্ক আমি ছেদ করলাম।

সুলেখা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, একটা মেয়ে যে আপনার লালসায় অন্ধ হয়ে সমাজের অবজ্ঞা ও কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে দুঃখের অন্ধকারে হারিয়ে গেল, তাকে এভাবে ঠকাতে আপনার মনুষ্যত্বে বাধল না?

রামনাথ জবাব দেন—বড় মানুষের যৌবনে মনুষ্যত্ববোধ থাকে না মা, তাই বার্ধক্যে আসে অনুশোচনার গ্লানি। আজও তাই গোপনে অনুসন্ধান করি সুলতার—পেতে চাই তার ক্ষমা।

সুলেখা জলভরা চোখে বলে, আজ এগার বছর হল মা মারা গেছেন। আমি এখন আসি।

—কোথায় যাবে তুমি? তুমি যে আমার রক্তের সম্পদ। আমার পরিবারের সম্মানিত পরিবেশে তোমায় থাকতে হবে মা!

—না। আমার মায়ের অমর্যাদা করে, অর্থের অহঙ্কারের কাছে নতি জানিয়ে আমার মাকে আমি নীচু করতে পারব না। মায়ের মর্যাদা আমাকে রাখতেই হবে।

কথা কটা বলেই দ্রুতপথে সিঁড়ি দিয়ে ত্বরিত করে নেমে এসে সুলেখা নিজের মোটরে উঠে ড্রাইভারকে বলল—না, টালীগঞ্জ স্টুডিয়োয় নয়—বাড়ীতে চল।

চোখে তার তখনও অশ্রুর বন্যা।

আকাশ কোথায়?

শ্রীবংশী মণ্ডল

অফুরন্ত তমিস্রার সুদূরান্ত যাযাবর নীল
আকাশ কোথায় খুঁজি তটস্থৈর্যে আলোর পিপাসা
সে এক প্রতীতি নিয়ে গড়ে দেয় আদিম নিখিল
ফুরাবে না তবু জেনো অগস্ত্যের ব্যাকুল তিয়াসা
দেহহীন কাতরতা বরঞ্চ সে স্বপন বিলাসে
যদিও আত্মার গান এ জীবনে হারাবে না জানি
হে নারী জান কি তুমি সমর্পিত প্রাণের আকাশে
চিরন্তন জ্বাল দীপ—সেই হোক হৃদয়ের বাণী।
নৈঋত আঁধারে তার অপর্যাপ্ত আলোর মহিমা
ভরে দিক শূন্যতট—শুধু এক বৈদগ্ধী বলয়
আচ্ছন্ন করুক তবু শুভ স্বপ্নে দিগন্তের সীমা
কি হবে কেমন সে তো দূর হয়ে যাক অপচয়।
সে আকাশ কোথায় বল হে সূর্য্য আকাশের নীল
এনে দাও যত পার আরো এক গতির মিছিল।

বনদেবী-বাশুলী

অধ্যাপক শ্রীগজেন্দ্রনারায়ণ বেরা

লৌকিক দেবদেবী সম্বন্ধে আজকাল অনেক গবেষণা চলেছে, বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন স্থানে এই সব দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে অনেক অলৌকিক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষতঃ বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্ত্তী স্থান যা সমুদ্র গর্ভ হতে উদ্ভূত হয়েছে এবং কালক্রমে বনজঙ্গলাবৃত হ'য়ে ডাঙ্গায় ব্যাঘ্র ও বিষধর সর্প এবং জলে কুমীর ও হাঙ্গর প্রভৃতি হিংস্র জীব জন্তুর আবাস স্থলে পরিণত হয়েছিল—সেই সকল স্থানই লৌকিক দেব-দেবীর আবির্ভাব স্থল বলে বর্ণিত হ'য়েছে।

আজ যে লৌকিক দেবী মা বাশুলীর সম্বন্ধে বল্‌তে যাচ্ছি এঁর আবির্ভাব হয়েছিল মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত বীরবন্দর গ্রামের গভীর জঙ্গলে—আজ থেকে আনুমানিক ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বাংলা প্রায় ১১২৫ সাল, ইংরেজী ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে, মুসলমান রাজত্বের শেষের দিকে যখন বিদেশী বণিকেরা দলে দলে এদেশে আসছিলেন বাণিজ্য করতে।

এই বীরবন্দর ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলি উক্ত মহকুমারই বাসুদেবপুর গ্রামের জমিদার চৌধুরি রামচন্দ্র রায়ের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাঁর জমিদারী ছিল বলে তাঁকে রাজা খেতাব দেওয়া হয়েছিল।

বর্ত্তমান লেখকের পূর্ব্বপুরুষ ৺ছকুচরণ বেরা বীরবন্দর গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী অজয়া গ্রামে উল্লিখিত ১১২৫ সালের বহু পূর্ব্বে বন জঙ্গল কেটে বাঘ তাড়িয়ে বসবাস সুরু করে ছিলেন। মা বাশুলীর আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তী ও বর্ত্তমান সেবাইত গোষ্ঠীর মধ্যে বর্ষীয়ান সেবাইত ডাঃ বৈদ্যনাথ পাণ্ডার (৮৭) নিকট এই সংক্রান্ত দলিল পত্র ও আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে এই বনদেবীর আবির্ভাব কাহিনী বর্ত্তমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

কথিত আছে বাসুদেবপুরের রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হ'লেন, তাঁর জমিদারীর মধ্যে বীরবন্দর গ্রামের গভীর জঙ্গলে এক বৃহৎ কদ গাছের তলায় মা বাশুলী আবির্ভূতা হয়েছেন এবং মায়ের সেবা পূজার জন্য তাঁকে পুরোহিত নিয়োগ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গেল, তাঁরই

মা বাশুলী

রাজবাড়ীর অনতিদূরে এক গরীব ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী বাস করে। রাজা ভাবলেন অর্থ ও জমি জায়গার প্রলোভনে ব্রাহ্মণকে রাজি করাবেন। কিন্তু দরিদ্র হলেও ব্রাহ্মণ রাজার দাসত্ব স্বীকার করতে রাজি হোল না।

এরপর একদিন ঐ গরীব ব্রাহ্মণ একটা বিলে জল ছেঁচে মাছ ধরছিল। এমন সময় তার নজরে পড়লো এক পরমাসুন্দরী যুবতী। যুবতী ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করে বললেন "হ্যা রে, তুই আমার সেবা পূজার ভার নিচ্ছিস না, আমি যে অনাহারে জঙ্গলে পড়ে আছি। আমি যে তোর হাতে ছাড়া আর কারুর দেওয়া ভোগ নেব না। সেই জন্য ত রাজা তোকে ডেকেছিলেন।"

কথা শোনা মাত্রই ব্রাহ্মণের চৈতন্য হোল। তিনি করযোড়ে ভক্তিভরে জানালেন "মা অবোধ সন্তানের অপরাধ মাপ করুন। আমি আপনার সেবার ভার

নিচ্ছি।" তা শুনে দেবী তাকে আজই রাজার কাছে গিয়ে তার অভিমত জানাতে ব'লে অন্তর্হিতা হলেন।

ব্রাহ্মণ রাজার কাছে এসে এই কাহিনী ব্যক্ত করামাত্রই রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ব্রাহ্মণের ঘর বাঁধবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র, খাদ্যদ্রব্য, ও পূজার উপকরণাদি-সহ পাঁচখানি নৌকা বোঝাই করে পাঠিয়ে দিলেন বীরবন্দর অভিমুখে।

পূর্ব্বেই বলেছি বীরবন্দরের পার্শ্ববর্ত্তী অজয়া গ্রামে মা বাশুলীর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হতেই মনুষ্য বসতি শুরু হয়েছিল। রাজা ব্রাহ্মণকে এই অজয়া গ্রামে ছয় বিঘে ব্রহ্মোত্তর জমি দান করলেন এবং তারই উপর ব্রাহ্মণের জন্য বাড়ী তৈয়ারী করে দিলেন। সেই থেকে এই গ্রামে মা বাশুলীর পুরোহিত জটাধারী পাণ্ডা বসবাস সুরু করলেন। জনবসতি প্রসারের ফলে বীরবন্দরের জনশূন্য অরণ্য অঞ্চল পর্য্যায় ধীরে ধীরে গ্রামে পরিণত হ'ল এবং সেই সময় হতে জটাধারীর বংশধরগণ এখানে মায়ের মন্দিরের চারপাশে বসবাস আরম্ভ করলেন।

বীরবন্দরের গভীর জঙ্গলে হিংস্র জীবজন্তুর মধ্যে রোজ রোজ পুজো করতে আসাযাওয়া বিপজ্জনক ভেবে মায়েরই নির্দেশে আপাততঃ শনি ও মঙ্গলবার মায়ের সেবা পূজার দিন স্থিরীকৃত হ'ল, তা'ছাড়া রোজ রোজ পুজো করতে আসা যাওয়ার আরও একটা অন্তরায় ছিল। অজয়া ও বীরবন্দর দুই পার্শ্ববর্তী গ্রামের মধ্যে একটা বড় খাল ছিল। খালটী নামে খাল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তখনকার দিনে এটা একটি নদী সদৃশ ছিল—নদীর মত পরিসর, নদীরই মত খরস্রোতা। হিংস্র জলজন্তুর আবির্ভাবও এর মধ্যে মাঝে মাঝে হতো। এই খালটি আবার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল কুণ্ডলার রসুলপুর নদীর শাখা নদী—বাগদা হ'তে উদ্ভূত। কালের গতিতে এই দুরন্ত খাল এখন নালায় পরিণত হয়েছে।

এই খালেরই উত্তর পাড়ে বর্ত্তমান লেখকের পূর্ব্ব পুরুষ ৺ভৃগুচরণ বেরার বাস ছিল। বেরাদের কয়েকটি ছোট নৌকা ছিল। এই সব নৌকা করে এরা জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতেন। এই কাঠ দিয়ে রান্না বাড়ী হ'ত এবং অবসর সময়ে নদীর চরের নোনা মাটি ও নদীর নোনা জল থেকে লবণ তৈয়ারী করে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতেন এবং বাড়তিটা বিক্রী করে দু' পয়সা রোজগারও করতেন। সে সময় নদীর দুই কূলে লবণ তৈয়ারীর বড় বড় দেশীয় কারখানা গড়ে উঠেছিল। এই লবণ শিল্প বৃটিশ আমলে নিমক আইন প্রবর্ত্তনের পরে ধ্বংশ হয়। বিলেত থেকে সাদা ধব্‌ধবে লবণ এনে আমাদের প্রয়োজন মেটান সুরু হয়। সেদিনের সেই নিমক পত্তনের ধ্বংশাবশেষ যথা বড় বড় উনুন, পুরু পুরু পোড়া মাটির হাঁড়িকুঁড়ির ভগ্নাংশ—যা লবণ তৈয়ারী করতে দরকার হ'ত—আজও অনুসন্ধান করলে নদীর দু'কূলে দেখতে পাওয়া যাবে।

মায়ের আদেশে এই বেরা বংশের আদি পুরুষ পুরোহিত জটাধারীকে শনি ও মঙ্গলবারে তাঁরই নৌকা করে খাল পারাপার করে দিতেন।

মায়েরই কল্যাণে কালক্রমে এই বেরা বংশ মেদিনীপুর জেলার এক গণ্যমান্য বংশে উন্নীত হয়।

একদিন খাল পেরোবার সময় জটাধারীর পায়ে হোগলা কাঁটা ফোটে। ফলে ব্রাহ্মণের পা ফুলে যায় এবং চলা ফেরাও বন্ধ হয়। কথিত আছে যে মা-বাশুলী এর পর থেকে যত দিন না ব্রাহ্মণের পা সারে ততদিন তাঁর বাঘকে পাঠিয়ে দিতেন এবং বাঘ এসে ব্রাহ্মণকে পিঠে নিয়ে মন্দিরে পৌছে দিত এবং পূজার পর আবার ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে যেত। কাহিনীটি অলৌকিক এবং নিশ্চয়ই কষ্ট কল্পিত, কিন্তু ইত্যাকার চমকপ্রদ কাহিনীর ফলে সেকালের গ্রামাঞ্চলে মায়ের মহিমা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

অজয়া গ্রামের শেষপ্রান্তে বাবু রূপনারায়ণ পাত্রের বাস। তখনকার দিনে তিনি একজন বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোক বলে সমাজে পরিচিত ছিলেন। তিনি পাল্কী ছাড়া চল্‌তেন না। তিনি মায়ের ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির গড়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। সে কালে ইটের আকার ছিল ছোট্ট আর পোড়ান হ'ত কাঠ দিয়ে। কয়লা দিয়ে ইট পোড়ান লোকের কাছে অজ্ঞাত ছিল। রূপনারায়ণ বাবু ইট দিয়ে মায়ের মন্দির তৈয়ারী করে মাকে এক শুভ দিনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন।

বাবু রূপনারায়ণ মায়ের মন্দির প্রবেশ উৎসব সমাধা করে বাড়ী ফেরার পথে মনে মনে ভেবে দেখলেন, মন্দির তৈয়ারী করতে তাঁর অনেক খরচ হয়ে গেল। হঠাৎ তাঁর

মনে উদয় হোল যে এমন জানলে তিনি মার জন্য মাটীর মন্দির তৈরী করে দিতেন।

ঐ দিনই রাত্রে মা রূপনারায়ণবাবুকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন "রূপনারায়ণ, তোর আপশোষ করে কাজ নেই। আমি তোর ঐ মন্দিরে থাকছি না। তুই মন্দিরের ইট পাটকেল বিক্রি করে তোর টাকা তুলে নিস।" স্বপ্ন দেখেই রূপনারায়ণবাবু তড়াক করে বিছানার ওপর উঠে বসলেন। এবং কাল বিলম্ব না করে একটা নগদী সঙ্গে নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে মায়ের মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললেন। সেখানে গিয়ে তিনি হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। সত্যিই মা আর মন্দিরে নেই, ফিরে গেছেন সেই কস গাছের তলায় আর তাঁর নবনির্মিত মন্দির হেলে পড়েছে। মন্দিরের ইটগুলো অদ্যাবধি চার দিকে ছড়িয়ে আছে। মনের দুঃখে রূপনারায়ণবাবু আর ঘরে ফেরেন নি। বাকী জীবন মায়ের সেবায় পূজায় কাটিয়ে দিয়েছিলেন বলেই শোনা যায়।

এইভাবে কিছুদিন কাটে। অতঃপর দেঘালী গ্রামের কালীচরণ মাইতি বলে আর এক বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি মায়ের এই ব্যাপার শুনে একটি কাঁচা মন্দির তৈরী করে দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। কাঁচা মন্দির অর্থে মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। মন্দিরের সামনে অনুরূপ নাটমন্দিরও তৈয়ারী করে দিলেন। এই মন্দিরে মা অনেকদিন ছিলেন।

পরে পুরোহিত জটাধারীর বংশধর শ্রীবৈদ্যনাথ পাণ্ডা মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং উল্লিখিত মহকুমার রামচন্দ্রপুর গ্রামের এক বর্দ্ধিষ্ণু বাসন ব্যবসায়ী মতিলাল নায়েক মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে বর্ত্তমান ইমারত মন্দির ও তৎসংলগ্ন নাটমন্দির প্রস্তুত হয়েছে মাত্র বাংলা ১৩২৮, ইং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। এই মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ভোগশালার গায়ে মায়ের আবির্ভাব স্থানের আদি কস গাছটি অদ্যাবধি বিদ্যমান। এই গাছে এখন আর ফুল ও ফল হয় না। সে সম্বন্ধেও এক কিংবদন্তী আছে।

কস গাছের ফুল ও ফল দুই-ই লাল হয়। একসময় একটি বালক লাল ফল দেখে প্রলুব্ধ হ'য়ে তোলবার জন্য ভোগশালার চালে উঠে যেমনই গাছের ডালটি ধরল অমনি পা ফস্কে ঝুলতে লাগল। পরে লোকজন এসে তাকে যখন গাছ থেকে নামাল—তখন সে মৃত। সেইদিন থেকে মায়ের নির্দ্দেশে ঐ গাছে আর ফল ও ফুল হয় না। এখন এই গাছের কোটরে কোটরে অনেক মৌচাক ও মধু পাওয়া যায়।

দেবীর মন্দিরের সামনে একটা ডোবা ছিল। সেটা খনন করে বড় পুকুর করা হয় ও সান বাঁধান ঘাট তৈয়ারী করা হয়। ঐ পুকুর খোঁড়ারও এক কিংবদন্তী আছে। সাত দিন ধরে জল ছেঁচে কিছুতেই ঐ ডোবার জল নিঃশেষ করা গেল না। পরে একদিন মা স্বপ্নে বললেন, "তোরা আর সাতদিন অপেক্ষা কর। আমার ধনরত্ন

মা বাশুলীর মন্দির

ভুনেশ্বরীর পুকুরে সরিয়ে নিলে তোরা পুকুর খুঁড়িস।" সাতদিন পরে কাজ আরম্ভ করে জল ছেঁচে পুকুর খনন শেষ করা হ'ল। কিন্তু মায়ের আদেশে ঐ পুকুরের ঈশান কোণে কোনও প্রকারে হস্তক্ষেপ করা নিষেধ। মা বাশুলীর সন্নিকটে আর এক বনদেবী আছেন তাঁর নাম ভুনেশ্বরী। তাঁর কাহিনী পরে শোনাবার ইচ্ছা রইল।

বাসুদেবপুরের রাজা দেবীর পূজা অর্চ্চনার জন্য বহু ভূসম্পত্তি দান করে গেছেন। তার পরিমাণ ৫২ পটি (১ পটি=২০ বিঘা)। মন্দিরের দু'দিকে দু'টি খাল এই সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। ঐ দু'টী খালের স্বত্বাধিকার নিয়ে সরকার বাহাদুর ও সেবাইত গোষ্ঠীর মধ্যে এক সময় মামলা বাধে। এই ব্যাপারে তদানীন্তন সেটেলমেণ্ট অফিসার ও খাসমহাল অফিসার শশধরবাবু তদন্তে আসেন। তাঁরা দু'জনে সোজা মন্দিরে যান। মন্দির প্রবেশের আগে নাটমন্দিরের এক থামের গায়ে একটি বৃহদাকার সাপ ফণা উঁচিয়ে খাড়া হয়ে আছে দেখে দু'জনেই থমকে দাঁড়ালেন, সাপটা নাটমন্দিরের চালের উপর দিয়ে সট্‌সট্‌ করে চলে

গেল। তখন দু'জনে মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম করলেন এবং পাঁচটা টাকা প্রণামী দিয়ে বে'রিয়ে এলেন। এই ঘটনার দিনকতক পরেই শোনা গেল খাল দু'টি মা'য়ের নামে বহাল হয়েছে। এইরূপ অলৌকিক ঘটনা অনেক শোনা যায়।

মা বাশুলীর আবির্ভাব সময় সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা নেই। সে সময় মেদিনীপুর জেলার এই সব অঞ্চলে বাংলা ভাষার প্রচলন না থাকায় ও দেশে শিক্ষিত লোকসংখ্যা অতি কম থাকায় দেবীর আবির্ভাব সময় সম্বন্ধে কোনও লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেজন্য বাসুদেবপুর রাজার পরবর্ত্তী বংশধরগণও এ সম্বন্ধে কোনও হদিশ দিতে পারেন না।

সে কালে ঐ সব অঞ্চলে দলিলপত্রাদি সব উড়িয়া ভাষায় ও অক্ষরে লেখা হ'ত। রাজা ১১৯০ সালতক বিভিন্ন সময়ে সনন্দ (দানপত্র) দ্বারা যে সব ভূ-সম্পত্তি দেবীকে দান করে গেছেন সবগুলিই উড়িয়া ভাষায় লিখিত। রাজার প্রথম সনন্দ বা দানপত্র বাংলা ১১২৫ সাল, ইংরাজী ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। তখন দেশে কাগজের প্রচলনও ছিল না সেজন্য তালপত্রের উপর উড়িয়া ভাষায় এই সব সনন্দ বা দানপত্র লেখা হয়েছিল।

১১৫০ নং বাগানী ৩৩৬৮নং রেজেষ্টারী

১৮ পি:

(পারসী লিখা)

১৬২ নং কানন দোথ

সন ১৮২৯ সাল

থ': পঃ পাহাড়পুর।

রোবকারি কাছারী ডিপোটী কালেক্টার জেলা মেদিনীপুর বৈঠক শ্রীযুক্তবাবু কালাচাঁদ বসু বাহাদুর ডিপোটী কালেক্টার সন ১৮২৯ সাল তারিখ ১৬ আপ্রেল বঃ সন ১২২৬ সাল ৫ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

সরকার বাহাদুর—বাদী

করুণাকর পাণ্ডা ও রাম পাণ্ডা সেঃ বীরবন্দর

বাসুলি ঠাকুরাণী............প্রতিবাদীগণ।

"— — — — — — — — — —

তদনন্তর ১৩ আপ্রেল তারিখে মোক্তার মজুকরের ১১২৫ সালের লিখিত সনন্দ ও তাহার তরজমা বাঙ্গলা এক ও ঐ ঠাকুরাণীর দেওত্তর ৯৭/ বিঘা ভূমির আসল তাল পত্রের উড়্যা সনন্দ সন ১১৪৯ সালের লিখিত ও তাহার তরজমা বাঙ্গলা এক ও সুরেশ্বরী ঠাকুরাণী ১০॥০ বিঘা ভূমি আসল তাল পত্রের উড়্যা সনন্দ সন ১১৫৯ সালের লিখিত ও তাহার তরজমা বাঙ্গলা এক ও বাসুলি ঠাকুরাণীর ২/ বিঘা ভূমি আসল সনন্দ সন ১১২৭ সালে লিখিত ও তাহার তরজমা (ছেড়্যা) এক একুন ৪ চারি কিত্ত আসল তালপত্রের সনন্দ ও তরজমা বাঙ্গলা চারিকিত্তা এই আট (ছেড়্যা) বিমজমীম ফিরিস্তি দাখিল করিলে ইতি ... ..."

পাণ্ডা বংশধরগণ বাঙ্গলা ভাষায় ঐ সব সনন্দের তর্জ্জমা করে রেখেছেন। আসল সনন্দের আর হদিস নেই। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মা বাশুলীর দেবত্তর সম্পত্তি নিয়ে তদানীন্তন সরকার বাহাদুরের সহিত সেবাইতদের এক মামলা বাধে। সেই ১৬২ নং কানন দোথ* মোকদ্দমার রোয়দাদে (রায়ে) দেখা যায় বাংলা ১১২৫ সালে রাজার প্রথম সনন্দ তাল-পত্রের উপর উড়িয়া ভাষায় লিখিত। উক্ত সনন্দ ও উহার বাংলা তর্জ্জমা এই মোকর্দ্দমায় দাখিল করা হয়েছিল। এই রোয়দাদের একটা নকল বর্ত্তমান লেখকের কাছে আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছে করলে দেখ্‌তে পারেন।

এই প্রথম সনন্দের সন তারিখ থেকে গণনা করলে দেখা যায় দেবীর আবির্ভাব আজ থেকে প্রায় ২৫০ বৎসরের পূর্ব্বে বীরবন্দর গ্রামের জঙ্গলে।

বিভিন্ন প্রামাণিক সূত্র ও উপরোক্ত রোয়দাদ হতে জানা যায় দেবীর দারুময় মূর্ত্তি একটী পাথরের ঘটের উপর স্থাপিত ছিল। কালক্রমে দারুমূর্ত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হ'লে বর্ত্তমান মৃত্তিকা নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেবীর স্তোত্রের সহিত মিলিয়ে গঠন করেছিল কাঁথি মহকুমারই কুমারমারা গ্রামের নারায়ণ পটুয়া। প্রত্যেক দেবীর যেমন ভৈরব থাকেন মা বাশুলীর ভৈরব গঙ্গাধর মহাদেব—লিঙ্গমূর্ত্তি—দেবীর বেদীর এক পাশে স্থাপিত আছেন।

প্রাচীন দলিল পত্র ও উক্ত রোয়দাদ থেকে দেবীর ভোগরাগ সম্বন্ধে যা জানা গেছে সে বিষয়ে কিছু বলে প্রবন্ধ শেষ করব।

* জঙ্গল সাফ করে যে সকল কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত হত তাকে তৎকালীন ভাষায় 'কানন দোথ' বলত।

দেবীর মধ্যাহ্ন ভোগ—নয় সের চালের নৈবেদ্য, পাঁচ-গণ্ডা কলা, পাঁচ সের দুধ ; সান্ধ্য ভোগ—পাঁচ সের দুধ, ঘৃত, পান সুপারী ইত্যাদি শীতল সামগ্রী। রোশনাই কারণ এক পোওয়া তৈল। এই ছিল নিত্য সেবার বরাদ্দ।

প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে রাখি পূর্ণিমার দিনে দশমণ চালের অন্নভোগ, ৭.৮টা তরকারী, পায়েস মিষ্টান্ন আদি ভোগ দেওয়া হত, আশ্বিন মাসে পার্ব্বণ চারদিন পাঁঠা, মহিষ ইত্যাদি বলিদান হত। নৈবেদ্যাদিসহ সেকালের তালিকায় এই বাবত আর্থিক ব্যয় ছিল অনূর্দ্ধ ১০০, টাকা। দীপান্বিতাতে খরচ আন্দাজ ১২।২০ টাকা। এ ছাড়া বার মাসের পাল পার্ব্বণাদি ও মকর যাত্রাদি উৎসব পালিত হ'ত।

মা বাশুলীর সেবা পূজার জন্য চাকর ৪ জন, পূজার ব্রাহ্মণ ১ জন, হস্তকার ১ জন, পাইক চৌকিদার ২ জন, বাদ্যকার ৪ জন, টহলিয়া ও মালাকার ১ জন। প্রতি মঙ্গলবার এক সম্প্রদায় গায়ক চণ্ডীমঙ্গল গান করতেন। উড়িয়া ভাষায় তাল পত্রে লিখিত উক্ত চণ্ডীমঙ্গল গানের একটি পুরাতন পুঁথি বর্ত্তমান লেখকের কাছে আছে।

বাদ্যকার প্রতিদিন অতি ভোরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঢাক বাজিয়ে দেবীর নিদ্রা ভঙ্গ করে থাকেন। সাধারণ লোকে একে 'ধামসা' বাজা বলে। এই বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থরা শয্যাত্যাগ করে। এই 'ধামসা' বাদ্য গ্রামবাসীদের সময় নির্দ্দেশকের কাজ করে থাকে।

এই সব নিযুক্ত লোকদের কাহাকেও নগদ মাইনা (৩৪ টাকা মাসিক), আবার কাহাকেও বা উক্ত দেবত্তর সম্পত্তির মধ্য থেকে চাকরান জমি দেওয়া হত।

প্রতি বৎসরে পৌষ ও চৈত্র সংক্রান্তিতে মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে। বিশেষ করে শিশুদের আকর্ষণীয় নানা প্রকার খেলনা পত্র এ সময় মেলায় আমদানী করা হয়।

পূজার বরাদ্দ যা শোনা হ'ল তা অনেক আগেকার কথা। বর্ত্তমান সেবাইতের চার শরীক পালাক্রমে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে অন্ন ভোগ ও সায়াহ্নে মুড়কি ও দুধ ইত্যাদি ভোগ দিয়ে থাকেন।

দেবী বাশুলীর স্তোত্র

আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে,
কুণ্ডলে কর্ণ পূরে সিন্দুরান্তে বিকট দশনা,
মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে, ক্রোড়ান্তে হাস্য বদনা,
পদযুগ কমলে নূপুরং বাদয়ন্তীং,
কুম্ভং খড়্গং চ হস্তে পিব পিব
রুধিরং বাশুলী পাতু মা নঃ॥

প্রাচীন বাংলার লৌকিক আচার ও ধর্মীয় গোষ্ঠী সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করেন, তাঁহাদের অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত রহিলাম।
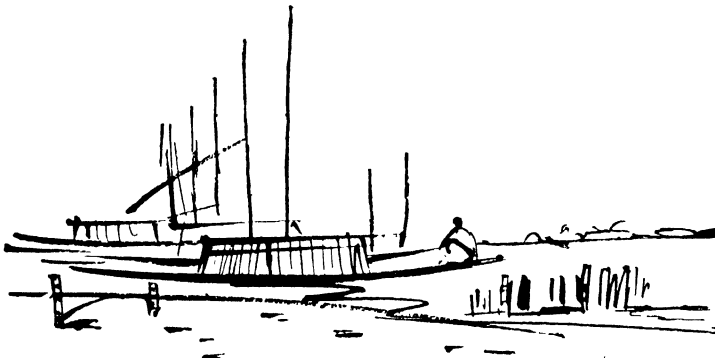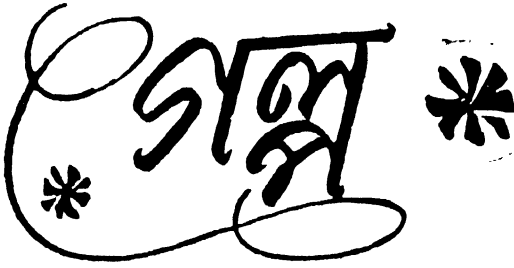
স্বপ্নটা মরে গেল

শ্রীকণিকা সান্যাল

কেমন যেন লাগছে। গত বছর এমন সময় রেজাল্ট বের হল। কত সুখেই চিন্তা করলাম সব। জেগে জেগে স্বপ্নটা দেখা। কলেজে কাজ পাবার স্বপ্ন। রিসার্চ করার স্বপ্ন। যেমন স্বপ্ন হামেশাই দেখে থাকে সবুজ মনেরা।

তারপর কোন একদিন হুট্ করে ষ্টেটস্‌ম্যানে এ্যাড-ভার্টইজমেণ্ট দেখে ছেড়ে দিলাম একটা এ্যাপ্লিকেশন। বলতে গেলে নাটকীয় ভাবেই চাকরীটা জুটে গেল।

কোম্পানীর নামটা বদ্‌লে দিতে হবে। কিন্তু তাও বোঝা যাবে ঠিকই। পাবলিসিটি লাইন তো। আমার আগে বহু মেয়ে এপথটায় চলে গেছে। কত জনের কত অভিযোগ জমে আছে পথটার ধুলোর গায়ে। কিন্তু সেগুলো সে চ্চার নয়। হঠাৎ চান্স পেয়ে গেলাম আমি। জমে থাকা বন্ধ্যা অভিযোগের মুখ খুলবার।

এ্যাডভারটাইজমেণ্ট একজিকিউটিভ। গাল ভরা নাম। কিন্তু কাজটা সেল্‌স্ গার্লের। পার্টিতে পার্টিতে ঘুরে বেড়ানো। কোম্পানীর পাবলিক রিলেশন অফিসারদের বুঝিয়ে এ্যাডভারটাইজমেণ্ট আদায় করা। বুঝিয়েই যদি কাজ হতো তবে তো যোগ্যতায় কাজ চলতো। তা চলে না।

চলে না যে তা বুঝতে পারলাম দিন দুয়েক কাজ করবার পরই। "হ্যামিলটন এ্যাণ্ড কো" না কি যেন নাম কোম্পানীটার। একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক (?) Public Relation এর পোষ্টটি হোল্ড করেছেন। ঘরে ঢুকতেই বেয়ারা কাঠের ভারী দরজাটা টেনে চৌককাঠের স্কয়ারটিকে বিবিক্ত করে দিল বাইরের জগৎ থেকে। ওপাশে পাইপ টানছে জন্তুটা। চোখে অপার্থিব দ্যুতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। বাসনার।

"আপনার আগে মিস্ ব্যানার্জী একাজ যিনি করতেন তাঁকে আমি এ্যাডভারটাইজমেণ্ট দিয়েছিলাম।"

"আমাকেও আশা করি দেবেন।"

হ্যাঁ। কিন্তু···

তাছাড়া আমাদের ম্যাগাজিনগুলো আগের চেয়ে ঢের বেটার হয়েছে। আর এবার থেকে······

কিন্তু সেটা আমার পয়েণ্ট নয় মিস···

তবে অন্য কোম্পানীর কথা বলছেন? হ্যাঁ আরও অনেকগুলো ফার্ম ক্যাসুসাল দেবে কথা দিয়েছে। যেমন······

আপনি খুবই ছেলেমানুষ। কিছু বোঝেন না।

আপনি আপনার প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিন। নিশ্চয়ই উত্তর দিতে চেষ্টা করবো ঠিক ঠিক।

মিস্ বোনার্জির কাছে যেমন আমার একটা personal interest ছিল। আপনাকে এ্যাডভারটাইজমেণ্ট দেবার তেমন কোন ...আমি তখন দরজার ভারটাকে টেনে ফাঁক করার চেষ্টা করছি। ঘেমে গেছি। নেয়ে গেছি। উত্তেজনায় নয়। অপমানে।

এর উল্টোটাও যে ঘটেনি তা নয়। আনস্মার্ট হওয়ার ফলে, সংকোচে কথা বলার জন্য যেখানে সম্মান জুটে গেছে। কিন্তু সে তো হাজারে একটা। তারপর আর একদিন বহু খেটে অনেকবার যাতায়াত করে একটা কোম্পানীর এ্যাষ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছ থেকে কথা পেলাম একটা কনট্রাক্টের। কথা মানে প্রতিশ্রুতি। সেদিন আনতে যাবার কথা। ফোন করলাম যাচ্ছি বলে। মিঃ সুমন বল্‌ল রেডি। কিন্তু এককাজ করুন না আপনি। অফিসে না এসে সোজা মেট্রোর সামনে চলে আসুন। ওখান থেকে কোথাও লাঞ্চে যাওয়া যাবে। সেখানেই আমি কনট্রাক্ট বুকটা সই করে দেব।"

ফোনটা করেছিলাম ডিরেক্টরের ঘরে থেকে। আমার এক তরফা কথা শুনেই উনি অনুমান করেছিলেন বাকিটুকু। বল্লেন "না। বলে দিন contractএ আমার দরকার নেই।"

সেদিনের কথা ভুলবো না। কেমন একটা বিস্মিত আনন্দে মনটা আমার সব আলো হয়ে গেল। অনেক কথা বলে গেলেন। আমি চুপ করে শুনলাম। অনেক কেঁদে কেঁদে।

আমি কনট্রাক্ট চাই না। কতটাকা দেবে? তিন হাজার? চার হাজার? এর তো বেশী নয়। কিন্তু আপনাকে আজ লাঞ্চে কাল ডিনারে পাঠিয়ে যে টাকা আমি অর্জন করবো সেতো আমার বিবেককে চুপ করাতে পারবে না মিস ব্যানার্জী। আমি জানবো আরও একটি ইনোসেন্ট গার্লকে আমি ওদের মুখে ঠেলে দিয়েছি। এই রকম আরও অনেক কথা। ভাল ভাল বাছা বাছা কথা যা মাড়োয়ারী ফার্মের ডিরেক্টরের কাছে আশা করা যায় না।

তারপর থেকে কাজে কেমন যেন একটা এনার্জি পেলাম। মনে হ'ল গোটা কলকাতা মার্কেটটার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে কাজ চালিয়ে যেতে পারি। থাকুক না মিসেস অমুক মিস তমুকের দল। ওদের দেহের ইশারায় হাসির কটাক্ষে যত পাবলিক রিলেশন অফিসার কাত হবার হোক। আমি আমার একার সততায় হার্ড লেবার দিয়ে ওদের ছাড়িয়ে যাবোই।

কাজ শেষে রিপোর্ট দেবার সময় উন্মুখ হয়ে শুনতাম ডিরেক্টরের এ্যাম্বিশনের কথা। তারপর কেমন করে ঐ ওয়ার্লড নিউজের' পাঁজরের পাঁজরের ভিতর লুকিয়ে থাকা আকাঙ্ক্ষাগুলোকে আমার লুকোনো মনের বাসনার সঙ্গে একাকার করে ফেল্লাম জানি না।

এরই মধ্যে ভাব হয়েছে পলির সঙ্গে। পলি সেন। একদিন ট্রামষ্টপেজে অপেক্ষা করতে গিয়ে আলাপ। কথায় কথায় বল্লে চাকরী খুঁজছে। আমি ঠিকানাটা দিয়ে দেখা করতে বল্লাম অফিসে। ও এল পরদিন। ডিরেক্টর interveiw নিলেন। আমি সিকিউরিটি হলাম ওর হয়ে। কাজে জয়েন করলো পলি। বেশ ভাল লাগে। সিম্পল মেয়ে। বাড়ীর প্রয়োজনে চাকরী করতে এসেছে।

আত্মীয়েরা দেখলে এখন কিন্তু কমেণ্ট করছে। রংটা যে সাঁওতাল ঘেষা হয়ে যাচ্ছে। হনুর হাড় সোচ্চার। আমি কিন্তু চিন্তায় পারলাম না। কারণ আমার মনে তখন রঙিন স্বপ্ন। এ্যামবিশনের ছোঁওয়া। এর মধ্যে ঢের সোসাল হয়েছি। স্মার্ট হয়েছি। কাজ বাগাতে শিখেছি। মোটামুটি এ্যাডভারটাইজমেণ্টও আসছে।

এদিকে পলির উৎফুল্ল ভাবটা কেমন যেন দিনদিন মিইয়ে আসছে। ও আজকাল প্রায়ই বলছে "জান তুহিনাদি, এ লাইনটা মেয়েদের, বিশেষ করে বাঙালী মেয়েদের জন্য নয়। ওর টপটপে চোখের জলে ওর অপমানের ইতিহাস ঝড়ে পরে। পলিকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি শেষ পর্য্যন্ত নিষ্ফল হয়ে।

এই কান্নার মহড়ার মধ্যেই সেদিন ওর নামে একটা contract এল ছশো টাকার। ও কমিশন পাবে টেন পার্সেণ্ট। মোট ষাটটি টাকা ও নিজের করে পাবে। আমি দেখলাম ওর লোনা চোখের জলে লোভের হিস্হিস্ শব্দ। একান্তে পেয়ে আমাকে বল্ল তুহিনাদি! এই টাকাটা দিয়ে বাড়ীওয়ালাটাকে থামানো যাবে জানো। পলি হাসলো। মিষ্টি করে। শান্ত একটু হাসি। কিন্তু সেটা ঝকঝকে।

এর মধ্যে আমার আবার খুব জ্বর এল। দিন দুয়েক অকারণে ভুগিয়ে দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনিই চলে গেল। ছুটির দিন দুটাতে একা হস্টেলের বিছানায় শুয়ে শুয়ে পলির পায়ের শব্দ শুনেছি। ও নিশ্চয়ই আসবে আমায় দেখতে।

একটা সোমবারে অফিসে গিয়ে শুনলাম পলি কিছু-দিনের জন্যে ছুটি চেয়ে এপ্লিকেশন পাঠিয়েছে। ও গেলে আমার বেশ ক্ষতি। কারণ ইদানীং আমার representa-tive'-এর কাজটা ও বেশ smartly চালাচ্ছিল। দুঃখ হল আমাকে জানালো না বলে। খাটুনী বেজায়। সারাদিন ঘুরে আজকাল বেশ উইক লাগছে।

মিঃ আগারওয়াল আর একটি মেয়ের interview নিলেন পলির জায়গায়। আমার অসুবিধে হচ্ছে বলে। আমি interview'র সময় ছিলাম। পরে জানালাম পছন্দ হয় নি বলে। কারণ আমি জানি ফরনাথিং এসব। পলি দুদিন বাদেই আসবে।

কোলকাতায় সময় কাটে হু হু করে। কাজ হয় না কোন। জোর করে গীতবিতানে নাম লিখিয়েছে। যদিও খুব ক্লান্ত লাগে। শনিবার সেখানে গিয়ে একটু গান শুনি। শেখার চেষ্টাতো অপপ্রয়াস। একদিন ওখানেই বনানীর সঙ্গে দেখা। বনানী জোর করে নিয়ে গেল। ওর husband আর ও সেখানে প্রায়ই যায়। বনানী বিয়ে করেছে নাট্যকার শ্যামল লাহিড়ীকে। আজকের দিনে এ-নাম সকলের কাছে চেনা। বনানী আমার সঙ্গেই পড়তো। 65' এর বিশ্বভারতী ব্যাচ। ও ছিল ফিলজফি।

পিছনের সিটে আমি আর বনানী। শ্যামলদা ড্রাইভ করছে। হঠাৎ বল্ল "আজ তোমায় এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাব তুহিন যেখানে গেলে তুমি অনেকগুলো ছোট গল্পের প্লট খুঁজে পাবে।" বনানী চট্‌করে জিজ্ঞাসা করে নিল "হাঁরে তুই আজকাল কবিতা লিখছিস তো?" আমি তখন দীর্ঘশ্বাসে ডুবে গেছি।

নীলাভ সিনেপাসে ধোঁয়া আলো। কোলকাতার সন্ধ্যা। চৌরঙ্গী। বারবার কারটা ঘুড়িয়ে এ মোড় থেকে ও মোড় ঘুরলাম। তার পর পৌঁচেছি। আমার অপরিচিত জগৎ। মৃদু আলো। অল্প বাজনা। পিতা-পুত্রীর এক সাথে বসে পান। গল্পে যা পড়তাম প্রত্যক্ষ করলাম। এ সবই না করেও জানা আছে। "অন্বর লোক" এর নাম। শ্যামলদা সোডা মেশাতে মেশাতে বল্ল।

আমি লোক দেখছি। পোষাক। পোষাক ছাড়িয়ে মন। ইচ্ছেতে কিলবিল করছে যেন।

পৃথিবীর সব ইচ্ছেরা স্লিভলেশ আর ড্রেনপাইপ পরে হাজির হয়েছে। মূর্তিমান ইচ্ছে সব। পিপড়ের সার। আঙুলে চটকালেও শেষ হয় না। সারি সারি ইচ্ছে। ইচ্ছেরা ড্রিঙ্ক করে কিস্ করে। লেসিহান! আমার কপালে ঘাম দেখে বনানী হাসছে। শ্যামলদা রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিতে বল্ল। আমি তখন সিনেমা দেখছি···

ঈশ্বরচন্দ্র কোলকাতার বারে। ওর স্খলিত চশমার কাঁচে "বার—নারীর" হাইহিল। উপনিষদ আওড়াচ্ছে পাশে বসা বন্ধু। হাতে পানের পাত্র। অথচ বলে চলেছে মদের ঝোঁকে—"যেনাহং নামৃতাস্যাম তেনাহং কিম্ কুর্যাম্।"

পাশের টেবিলে কার হাত থেকে যেন কাঁটাচামচে পড়ে গেল। আমি তাকিয়েছি। "বিশ্বাস কর বনানী আমায় মাথা ঘুড়ছে। তুমি বাইরে চল বনানী।"

বনানী উঠলো না। ও টেবিলে পলি। পলি সেন। নীচু গলায় মিষ্টি করে লোককে বকছে। আর হাসছে। ও প্রায় পোষাক কিছু পরেই নি। যা পরেছে তার দাম নিশ্চয় ঢের। পলি কিছু একটা গিলছে। আর হাসছে। মোহনী লাগছে ওকে। ও পাশ থেকে লোক একটা এগিয়ে এল। তার বাঁ হাতের আওতায় পলির ক্ষীণ কটিটুকু ঢাকা পড়েছে। অস্ত্র মসুরের ভিড়ে ওরা নির্জনতার স্বাদ নিচ্ছে। লোকটা ঘাড় ফেরাল। মৃদু-আলোয় চিনতে পারলাম বেশ। "কে হোগে এ্যাণ্ড কোং এর" এ্যাস্টঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর! ওরা ঘনিষ্ঠতম মুদ্রায় ওপাশে সরে গেল। আমি শ্যামলদার বড় রুমালে ঘাম মুছছি। তারপর···।

পরদিন সকালে অফিস এসেছি স্নান করে। মায়ের দেওয়া চওড়া লালপাড় কাপড়টা পরে।

এই সব গ্লানির পর মনটা ভাল করতে হবে। আমার আর অনুমেয়েতে অনীহা নেই। যে কেউ একজন হলেই হল। আজ সেই কথাটা বলবো বলেই এসেছি ডিরেক্টরের কাছে। অফিসে ঢুকে শুনলাম তিনি তখনও আসেন নি। একটু নিস্তেজ হয়ে গেলাম। কারণ এখন আমায় বেরিয়ে যেতে হবেই। বলা হবে না, জানানো হবেনা সংকল্পটা। আজকের ডাকে যদি চিঠি চলে যেত তবে কিছু না হ'ক আমার মনটা নিশ্চিন্ত হতো। কাল পলিকে দেখবার পর থেকে ওর বিরুদ্ধে কিছু একটা করবার তাগিদে ছটফট করছে মনটা।

দুটো পার্টি ভিজিট করেই অফিসে এসেছি। ফিরে শুনলাম ফোন এসেছিল। হ্যারিকান পাবলিসিটি থেকে। কে করতে পারে ভাবছি আবার রিং হলো। মিসেস সুরইয়া ফোন করছে। চাকরীর জন্যে। চাকরী চায় না। চাকরী দেবে। পাচশো মাইনে। প্রেশ ঘুড়বার জন্যে গাড়ী। শুনে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ফোন ছেড়েছি। ও যখন বলছে "তাছাড়া আগাওয়ালের তো তেমন সুনাম নেই। হিহি-হি-হি-হি"। রিসিভার রেখে দিয়েছি। আর তুলবো না।

অফিস থেকে চলে এসেছি। ব্রেবোর্ণ রোড ধরে হাটছি। ডালহৌসিতে যাব ট্রাম ধরতে। কালো রঙের বাঁধাড়া গাড়ীটা ব্রেক বষালো। "আসুন"। এই প্রথম ডিরেক্টরের কারে উঠলাম।

বল্লাম—আমি দুদিনের ছুটি চাই স্যার। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে আমার। এর পর কে কি কেন কবে কোথায়' অনেক অনেক কথার উত্তর দিতে হয়েছে। বলে গেছি। রেড রোড ধরে গাড়ী চলছে।

ঠিক তখন ভিক্টোরিয়া পেরোলো। আমার কাঁধে আগুনের হলকা। ডিরেক্টরের সর্পিল হাত। সেই "ইচ্ছে"। অস্বস্তি।

আমার রুমালের প্রয়োজন হয় নি। কারণ আমিতো ঘামি নি। একেবারে কালো হয়ে গেল সামনেটা। আর ঠাণ্ডা। মরুদেশের শীত এসে লাগলো আমার হাড়ে। আর সমুদ্রের জল। সমুদ্রের বান এল চোখে। কী জল কী ভীষণ শীত। আমি ঠিক তখন মরে গেলাম।

মেয়েটা মরে গেল। মরে গেল তার স্বপ্ন দেখা। মরে গেল তার এ্যাম্বিশন। মেয়েটা মরে গেছে। তার প্রেতটা বেঁচে আছে। হেটে বেড়ায়। গান গায়। কিন্তু স্বপ্ন আর দেখে না। স্বপ্নে দেশে গিয়ে ঠোকে গেছে সে। যার কাছে স্বপ্ন দেখতে শিখেছিল সে নিজে হাতে কচি মটার সবুজ ডাঁটা স্বপ্নটাকে গলাটিপে মেরে ফেলেছে।

প্রতিজ্ঞা করেছে মেয়েটা স্বপ্ন না দেখার। কাজটা ছেড়ে এসেছে। এখন বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্ত লিখছে চাকরীর। যদিও চাকরীটা তার যায় নি।

ছলনা

শ্রীশক্তি মুখোপাধ্যায়

ভালোবাসা দিতে আমি জানি না জানি না
অকারণে দুঃখ দিতে চাই—
তাই নিয়ে সুক্ষ্মাতর বিচার করো না।
মনের মানুষ যদি নাই দিল অরূপ রতন
ক্ষতি কিবা তায় !
আশাহীন মরীচিকা এ জীবনে ক্লান্তি অকারণ।
পৃথিবীতে সব পাওয়া না-পাওয়ার ব্যর্থতায় ঢাকা
ছদ্মবেশী বৈরাগীর মতো ;
পুনঃপুনঃ ছলনাতে জীবনটা দুঃখ দিয়ে আঁকা।

পাদপ-শিশু

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী

বীজের বুকে পাদপ-শিশু অন্ধ-বোবা-অন্তরে
ঘুমিয়ে ছিল গভীর ঘুমে অজানা কোন মন্তরে
অরুণ কিরণ ডাক্ দিল তায়—'বাইরে শিশু
আয় ওরে'।
বৃষ্টি ফোঁটা ডাকলো "জাগো"—দিবস-নিশা
নাম ধ'রে।
জাগ্‌লো সাড়া শিশুর বুকে, রূপ নিল সে বাস্তবে,
জগৎ-শোভা চিত্তহরা দেখ্‌লো চোখে
তাই ভবে।
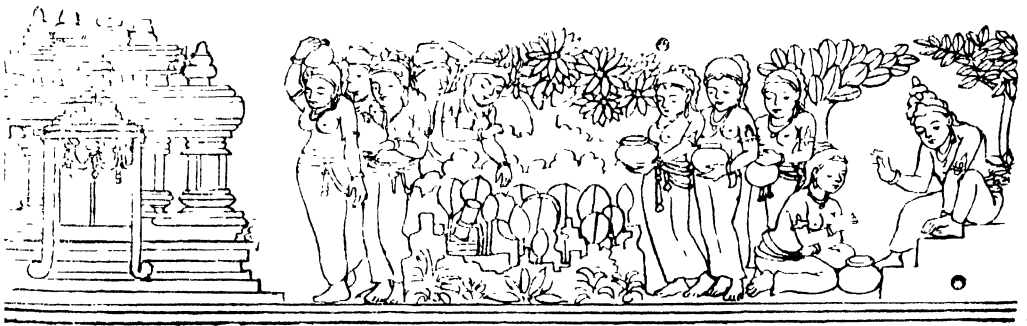
বিশ্বভাষা-পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নিগ্রো ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মোট ভাষাসংখ্যা ৪৪৬টি। এর অবস্থান হল মুখ্যত বা একমাত্র আফ্রিকায়। পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা আর নাইল উপত্যকায় নিগ্রোভাষীদের বসতি। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় সেমীয় ভাষীদের অবস্থান। নিগ্রোদের বসতিবিস্তারের প্রধান দুই প্রতিবন্ধক আরব জাতি ও শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক। ভারতীয় বণিক, শ্রমিক ও ঔপনিবেশিকদেরও নিগ্রোরা সুচক্ষে দেখে না, অবশ্য, আরব আফ্রিকাই নিগ্রোদের প্রধান শত্রু। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচ বংশধর আফ্রিকান্‌স্‌-ভাষী বুর বা শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা।

নিগ্রো ভাষাগোষ্ঠীর দুটি শাখা :—

(১) বান্টু (২) সুদানীয়।

বান্টু শাখায় ভাষার সংখ্যা ১৮২ এবং সুদানীয় শাখায় ২৬৪। কিন্তু নিগ্রোদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি ও উপজাতির সংখ্যা খুব বেশি ব'লে ভাষার সংখ্যা এত বেশি দেখালেও গুরুত্বপূর্ণ নিগ্রো ভাষার সংখ্যা ৩৪।৩৫টির বেশি নয়। তাদের মধ্যে প্রায় কোনটির লিখিত রূপ বা সাহিত্য ব'লে কিছু নেই। এদের নিজস্ব লিপিও প্রায় অনুপস্থিত। মুসলিম ধর্মাবলম্বী নিগ্রোরা আরবি লিপি আর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী নিগ্রোরা রোমক লিপি ব্যবহারের পক্ষপাতী। এক মিলিঅনের মতো সংখ্যক লোকে কথা বলে, এমন নিগ্রো ভাষাগুলি ক্রমশ রোমক বা আরবি লিপি গ্রহণ ক'রে নিজেদের ভাষার লিখিত রূপ গঠন করবে। প্রধান বানটু ভাষাগুলির নাম দেওয়া হল :—

(১) কিকুইউ (২) গাণ্ডা (৩) কঙ্গো (৪) লুবা-লুলুআ (৫) উম্‌বুন্দু (৬) ঙ্গালা [৭] নিয়াঞ্জা [৮] সুকুমা-ন্যাম্‌ওয়েজি [৯] রুআন্দা [১০] রুন্দি (১১) সোথো-পেদি-চোয়ানা (১২) সোয়াহিলি (১৩) সুইনা-কারাঙ্গা-ন্দাউ (১৪) জুলু (১৫) খোসা (১৬) কিম্‌বুন্দু (১৭) মাকুআ (১৮) ত্সুই-ফান্তে।

বান্টু জাতিগুলি অপেক্ষাকৃত সভ্য ও উন্নত। উচ্চ সমাজের বান্টু রমণীরা দেখতে বিশেষ সুন্দরী এবং তাদের দেহবর্ণ কালো নয়, এ-কথা পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্গ পর্যটকও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় বান্টুদের ভাষাগত মাধুর্য উপেক্ষা করা যায় না। তাদের "-ন্তু" প্রত্যয়ান্ত শব্দসমষ্টি বাস্তবিক শ্রুতিমধুর।

প্রধান সুদানীয় ভাষাগুলির তালিকা দ্রষ্টব্য :—

[১] হাউসা [২] ফুলা [৩] আকান [৪] দিঙ্কা নুএর [৫] এফিক-ইবিবিও [৬] এওয়ে-আনেহো-দাহোমে [৭] ইবো [৮] ইওরুবা [৯) কানুরি [১০] ক্পেল্লে-মেন্দে [১১] মালিঙ্কে-দিউলা-বাম্বারা [১২] মম্‌সি-দাগোম্বা [১৩] মুপে গবারি [১৪] তেম্‌নে [১৫] ওআলোফ্‌ [১৬] জান্দে।

সুদানীয় জাতিগুলি অপেক্ষাকৃত কুদর্শন এবং অনুন্নত। কিন্তু তাদেরও সভ্যতা আছে। বিশেষত ইবো আর ইওরুবা-ভাষীদের পূর্বপুরুষরা প্রাচীনকালে এক মহৎ সভ্যতার পত্তন করেছিল। আফ্রিকায় আরব ও শ্বেতাঙ্গ দাসব্যবসায়ীদের অত্যাচারে সভ্যতার বহু উপকরণ ধ্বংস হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় সমস্ত আফ্রিকা স্বাধীনতা লাভ করায় আফ্রিকার প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে শীঘ্রই অনেক কথা জানার সুযোগ হবে। নিগ্রোভাষীদের মধ্যে কঙ্গোবাসীরা সবচেয়ে বেশি অত্যাচার সহ্য করেছে। বেলজিয়ম তাদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তা নৃশংসতার ইতিহাসে অতুলনীয়। আফ্রিকার লোকসংখ্যা বেশি না বাড়ার কারণ, এই ধরণের অত্যাচার। আফ্রিকার তিন চতুর্থাংশ ব্যাপ্ত ক'রে নিগ্রোদের বসবাস। এই অংশে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি গত

কয়েক শতকে খুব বেশি নয়। ভারত থেকে ছাত্ররা যে হারে ইউরোপে লেখাপড়া করতে যায়, তার দ্বিগুণ হারে আফ্রিকার ছাত্ররা এখন ইউরোপে যাচ্ছে। ইউরোপ আফ্রিকার যত কাছে, ভারতের তত কাছে নয়, সুতরাং ভারতের ওপর ইউরোপীয় প্রভাব যা পড়েছে আফ্রিকার ওপর তারচেয়ে অনেক বেশি পড়েছে। এই শতাব্দীর শেষের দিকে তথাকথিত অন্ধকার মহাদেশ আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে ভারতের তুলনায় আফ্রিকার নিগ্রো উন্নতির গতি অনেক বেশি দ্রুত।

নিগ্রো ভাষাগুলোর মধ্যে সোয়াহিলি প্রায় এক কোটি লোকের মাতৃভাষা। হাউসা আরো বেশি লোকের মাতৃভাষা—প্রায় ১৩ মিলিঅনের কিন্তু লোকের মুখে মুখে মালাই ভাষার মতো সোয়াহিলির প্রচার খুব বেশি। অবশ্য সোয়াহিলিকে রাষ্ট্রভাষা ক'রে অখণ্ড আফ্রিকা গঠনের অবাস্তব স্বপ্ন কেউ দেখে না। ফুলা ও রুআন্দা ভাষা দুটি ৬ মিলিঅন ক'রে লোকের মাতৃভাষা। ইবো আর ইওরুবাতে ৪ মিলিঅন ক'রে লোক কথা বলে।

বাণ্টু আর সুদানীয় ভাষাগুলোর সম্বন্ধে আরো চর্চা ও অনুশীলন হলে তাদের নিপুণতর বিস্তৃততর শ্রেণীবিভাগ সম্ভবপর হবে। এখন পর্যন্ত এ-বিষয়ে পাশ্চাত্য বিশেষত জার্মান পণ্ডিতরা ছাড়া কোন ভারতীয় মনীষী কোন গবেষণা করেন নি। একমাত্র সুনীতিকুমার আফ্রিকার সংস্কৃতি-বিষয়ক কিছু আলোচনা করেছেন তাঁর African-ism গ্রন্থে। কিন্তু আফ্রো-এশীয় সম্মেলনের অন্যতর প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে ভারতের এ-ব্যাপারে বিশেষভাবে অগ্রণী হওয়া উচিত ছিল। আফ্রিকায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারলে ভারতের অন্তত বাণিজ্যিক স্বার্থ সেখানে নিরাপদ থাকত যদিও ভারতীয় অধিবাসীদের সেখানে কোন ভবিষ্যৎ নেই। ভারতে আফ্রিকার নিগ্রো ভাষাগুলির বিষয়ে গবেষণা প্রচুর পরিমাণে চালানো নানা দিক দিয়ে দরকার। এ-বিষয়ে বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যোগ্যতা সর্বাধিক।

অবশিষ্ট পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকা ত্যাগ করে চ'লে গেলে আফ্রিকার নিগ্রো ভাষীরা ভাষার ভিত্তিতে কতকটা সুসংহত হতে পারবে। শিক্ষা বিস্তার ব্যাপক-ভাবে না হ'লে ভাষার ভিত্তিতে আফ্রিকার পুনর্গঠন অসম্ভব, সে-কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নিগ্রো জাতিগুলি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করবে না। তার ব্যবস্থা হতে হতে অন্তত বিংশ শতাব্দী শেষ হবে।

চীন-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীর তিনটি বিভাগ :—

(১) চৈনিক (২) তাই (৩) তিব্বতীয় বা ভোট-বর্মী।

চীন-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থান মহাচীন, ইন্দো-চীন, তিব্বত, শ্যাম, ব্রহ্ম, ভুটান এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে।

চৈনিক শাখার প্রাচীন ভাষায় জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য লেখা হয়েছে। চৈনিক শাখার অন্তর্গত উত্তর চৈনিক বা মান্দারিন বা পাইহুআ বা কুওইউ ভাষায় পৃথিবীর সব চেয়ে বেশি লোক কথা বলে। এই ভাষাই পৃথিবীর সর্বাধিক লোকের মাতৃভাষা। তবে এটি ইংরেজির মতো বহুবিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচলিত নয়। প্রায় ৪০ কোটি লোকের মাতৃভাষা এটি।

চৈনিক শাখার ভাষাগুলি খাস চীনে বা মহাচীনের উত্তর-পূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে প্রচলিত। ভিএৎনাম্ অঞ্চলেও চৈনিক শাখার ভাষা সম্প্রসারিত। তাইওয়ান বা ফরমোসা দ্বীপেও চৈনিক ভাষাগুলির সংগৃহীত লোক-সমষ্টি চিআং-কাই-শেকের সৈন্যবাহিনী ও ঔপনিবেশিক-রূপে বাস করে। ভিয়েৎনাম ও তাইওয়ানের ভাষার কথা বাদ দিলে উত্তর চৈনিক সমেত ১৩টি বড়ো ভাষা খাস চীনে প্রচলিত যেগুলি চৈনিক শাখার অন্তর্গত :—

(১) মান্দারিন (২) ক্যাণ্টনের ভাষা (৩) সাংহাই-এর ভাষা (৪) আময়ের ভাষা (৫) সোয়াতাউ (৬) হাক্কা (৭) ফু-চাউ (৮) ওয়েনচাউ (৯) ইআংচাউ (১০) সুচুআন (১১) হান্কাউ (১২) নিংপো (১৩) ওউ—উচ্চারণ, অন্তঃস্থ ব-এ হ্রস্ব-উ।

চীনে রোমক লিপি প্রচলিত না হলে চৈনিক ভাষা ও জাতিগুলির বিভাগরেখা বাইরের জগতের চোখে স্পষ্ট হবে না।

ঐ ১৩টি চৈনিক শাখার মধ্যে প্রায় ৪০ কোটি কুওইউ বা ক্যোয়ু-ভাষীর কথা বাদ দিলে ক্যাণ্টনের চৈনিকে কথা বলে প্রায় সাড়ে চার কোটি লোক। আময়ের চৈনিকে বা মিন্ ভাষায় কথা বলে প্রায় চার কোটি লোক। চাও

চাউ বা ওউ ভাষার লোকসংখ্যা চারকোটিরও বেশি। হ'ক্কা ভাষায় দু কোটির বেশি লোক কথা বলে। ১৩টি ভাষার লোক সংখ্যা ষাট কোটিরও বেশি। ভিএৎনামের ভাষায় আড়াই কোটির মতো লোক কথা বলে। কমিউনিষ্ট চীনের লাল সরকার যে ভাবে ক্যান্টনীয় প্রভৃতি স্বতন্ত্র চৈনিক ভাষাকে উত্তর চৈনিকের উপভাষা ব'লে চালাবার চেষ্টা করেন, তা নিতান্ত কৌতুকপ্রদ ব্যাপার।

তাই শাখার ভাষাগুলি চীনের দক্ষিণে, থাইল্যাণ্ড বা তাইল্যাণ্ড বা শ্যাম বা সিআমে, ব্রহ্ম আর লাওদেশে ব্যবহৃত হয়:—

(১) তাই (২) লাও (৩) শান।

লাওস বা লাওদের দেশে লাও ভাষা প্রচলিত। শ্যাম-দেশের রাষ্ট্রভাষা থাই বা দাই বা তাই ভাষা। ব্রহ্ম-শ্যাম সীমান্তের দু পাশে শান জাতির বাস। এদের কোন নিজস্ব রাষ্ট্র নেই। চীনের মধ্যে সেখানকার থাইদের জন্যে একটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা গঠন করা হয়েছে।

তিব্বতীয় শাখায় অনেকগুলি ভাষা আছে। তাদের তিনটি উপশাখায় ভাগ করা যায়:—

(১) তিব্বতি (২) বর্মী (৩) বোড়ো বা ভুটিয়া।

ভারতবর্ষের হিমালয়-সন্নিহিত এলাকায়, লাদাখে, তিব্বতে আর চীনের সিকাং, চিংঘাই প্রভৃতি অঞ্চলে তিব্বতি ভাষাগুলির প্রচলন। বর্মী আর তার সম্পৃক্ত ভাষা-গুলি ব্রহ্মদেশে প্রচলিত। বোড়ো ভাষাগুলো প্রায় সবই ভারত, নেপাল, ভুটান ও সিকিমে অবস্থিত।

তিব্বতি উপশাখার ভাষাগুলোর মধ্যে এই ক'টি লোকসংখ্যার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য:—

[১] তিব্বতি [২] চুআং [৩] মিআও [৪] ইই [৫] পুইই [৬] তুং [৭] ইআও।

তিব্বতি ভাষার ধর্মসম্পর্কিত সাহিত্য উল্লেখযোগ্য। ভারত ও চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে তিব্বতের গুরুত্ব অপরিসীম। তিব্বত চীনারা জাতি হননের অসৎ প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত, এই অভিযোগ আন্তর্জাতিক মহল থেকে উঠেছে। মাজিআর্ বা হুঙ্গারীয় জাতির ক্ষেত্রে রুশ অত্যাচার আর তিব্বতের ক্ষেত্রে চীনা অত্যাচার এক রকমের। চীনাদের হিসেবে তিব্বতিদের সংখ্যা ৩ মিলিঅনের মতো হবে। চুআংদের সংখ্যা ৭ মিলিঅনেরও বেশি। অন্য জাতিগুলির লোকসংখ্যাও উপেক্ষণীয় নয়। মার্কিন হিসেবে তিব্বতভাষীদের সংখ্যা ৭ মিলিঅন।

বর্মী উপশাখার ভাষাগুলির মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য:—

[১] বর্মী [২] কারেন।

বর্মী ভাষার আরাকানি প্রভৃতি অনেকগুলি উপভাষা আছে। এটি উৎকৃষ্ট ভাষা হলেও রাখাইং বা আরাকানি প্রভৃতির বিচ্ছেদ প্রবণতার জন্যে বর্মী রাষ্ট্র ইউনিঅন বা রাষ্ট্রসম্মিলনরূপে গঠিত, ঠিক ঐককেন্দ্রিক রাষ্ট্র নয়। কারেন-রা দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেছে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের জন্যে। এখনও যে তারা খুব সন্তুষ্ট, তা বলা যায় না।

বোড়ো উপশাখার ভাষাগুলির সংখ্যা শতাধিক। কিন্তু গণ্য করার যোগ্য ভাষা মাত্র এই ক'টি:—

[১] ভোট বা ভুটিয়া [২] সিকিমি [৩] মেইতেই বা মণিপুরি [৪] নাগা [৫] নেওয়ারি [৬] গারো [৭] লুশেই বা মিজো।

এদের মধ্যে ভুটিয়া ও সিকিমিদের নিজস্ব রাষ্ট্র আছে। নাগারা নাগাল্যাণ্ড নামে ভারতের ভেতরে পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন অঙ্গ রাজ্য গঠন করেছে এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছে। মণিপুরিরা কেন্দ্রশাসিত প্রদেশের মর্যাদায় সন্তুষ্ট না হলেও নাগাদের মতো রক্তপাত না করার জন্যে তাদের পূর্ণ মর্যাদাবিশিষ্ট অঙ্গ রাজ্য গঠনের যে দাবি, তা পূরণ করা হয়নি। অবশ্য মণিপুর একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক এলাকার মর্যাদা ভোগ ক'রে আসছে। মণিপুরি ও নেওয়ারি ভাষা দুটি সমৃদ্ধ। বিশেষত মণিপুরি এই উপ-শাখার শ্রেষ্ঠ ভাষা। মণিপুরিরা বাংলা লিপি গ্রহণ করেছে। ভোট-চীন বা বোডো-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষা হলেও মণিপুরি আর নেওয়ারিতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব প্রবল। দুটি ভাষাতে এক মিলিঅন ক'রে লোক কথা বলে। নাগা, গারো, মিজো ভাষাগুলোয় লোকসংখ্যা খুব কম হলেও এদের প্রতাপ অস্বীকার করার পথ নেই। নেওয়ারি নেপালে প্রচলিত; নেপালে নেপালি বা গোর্খালি ভাষা রাষ্ট্রভাষা; নেওয়ারি ভাষাভাষীদের নিজস্ব রাষ্ট্র নেই। গারোরা আসামে একটি জেলায় বাস করে। মিজোরাও একটি স্বতন্ত্র জেলায় বাস করে। কিন্তু এরা নাগাদের দেখাদেখি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছে। জাতি জাগ্রত

হলে নিজের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রয়োজন প্রথমেই অনুভব করে।

বোডো উপশাখার লোকজন খৃস্ট জন্মের প্রায় হাজার বছর কি তারও আগে ভারতে উপনিবিষ্ট হয়ে গেছে তার সাহিত্যিক প্রমাণ অনেক আছে। এখন তারা নেপাল, সিকিম, ভুটান ছাড়াও খাস ভারতের মণিপুর, আসাম, পশ্চিম বঙ্গের উত্তরাংশ, পূর্ব বঙ্গের স্থানে স্থানে এবং মুখ্যত পূর্ব ভারতের নানা জায়গায় বাস করে। অনেকগুলি ক্ষুদ্র জাতি ও উপজাতি তুনেসাং বা নেফা এলাকায় বাস করে। এ-সব জায়গায় যারা বাস করে তারা ধর্মে হিন্দু নয়, ভাষায় ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর কেউ নয়। ইংরেজরা গায়ের জোরে এ-সব জায়গা দখল করেছিল, গায়ের জোরে দখল বজায় রেখেছিল। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারেরও দখল বজায় রাখতে হলে অন্য কোন জোর নেই। প্রবল চীনা সাম্রাজ্যের পতন না হলে দুর্বল ভারতের পক্ষে এ-সব স্থান অধিকারে রাখা কঠিন হবে।

পৃথিবীর বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠী ভারত-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠী। একে ইন্দো-ইউরোপীয় বা ইন্দো-জার্মান বা ব্যাপক অর্থে ইন্দো-হিত্তি ভাষাগোষ্ঠীও বলা হয়। আগে একে এক কথায় আর্য ভাষাগোষ্ঠী বলা হত। সেটা বললে যে ভয়ানক ভুল হয়, তা নয়। আর্য প্রথমে গুণবাচক বা জাতিবাচক শব্দ ছিল বটে, আর্যভাষায় পরে অগণিত অনার্য কথা বলতে সুরু করেছে বটে, কিন্তু তাতে আর্য জাতি-সমূহের ব্যবহৃত ভাষাগুলিকে আর্য বিশেষণে বিশিষ্ট করতে আপত্তির কোন কারণ নেই। আর্যরা ভারত-ইউরোপীয়-দের বংশধর একটি শাখার ভাষাভাষী, এখন এই রকম ধরা হয়। তা না ক'রে সুপরিচিত "আর্য" শব্দের দ্বারা সমগ্র ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীকে অভিহিত করলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। "ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা" বইএ সুনীতিকুমার "আদিম-আর্য" বিশেষণ ব্যবহার ক'রে ভারত-ইউরোপীয়দের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। এ-প্রয়াস অত্যন্ত যুক্তিসম্মত।

ভারত-ইউরোপীয় নরগোষ্ঠীর বাইরের বহু লোক এখন ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলিতে কথা বলে। কিন্তু প্রথমে এই ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভাবন ভারত-ইউরোপীয় নরগোষ্ঠীর দ্বারাই হয়েছিল। পরে তার সঙ্গে বহিরাগত অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক উপাদান মিশে যায়। এখন জাতিত্ব ভাষাভিত্তিক হয়ে থাকলে ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর যে কোন ভাষা যার মাতৃভাষা, তাকে ভারত-ইউরোপীয় বলা যেতে পারে। নৃতত্ত্বের বিচারে সে যদি ভারত-ইউরোপীয় নরগোষ্ঠীর লোক না হয়, তবু ভাষার বিচারে সে ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাভাষীই হবে। যেমন নিগ্রো আমেরিকাবাসীকে মার্কিন বলা হয়। তিন-চার হাজার বছর আগে আদিম ভারত-ইউরোপীয় ভাষার প্রবর্তক জাতি বা জাতিসমূহের মধ্যে যে-সব নৃতাত্ত্বিক উপাদান ছিল, আজ নানা কারণে সে-সবের সঙ্গে বহু নতুন উপাদান সংযুক্ত হয়েছে। তাই ব'লে ঐ জাতিগুলিকে ভারত-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য নাম দেওয়া চলে না। তাদের ভাষাসমূহও ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ধরতে হবে।

এক দল পণ্ডিত ভাষাগুলিকে ভারত-ইউরোপীয় বলতে সম্মত কিন্তু ভাষার বক্তাদের ভারত-ইউরোপীয় জাতির অন্তর্গত ব'লে স্বীকার করতে চান না। অথচ দুএকটি বিশেষ ক্ষেত্র বাদ দিলে সাধারণত ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে ভারত-ইউরোপীয় জাতিগুলিই কথা বলে, সেই জাতিগুলি এখনকার দিনে যত মিশ্র হয়ে পড়ুক না কেন। হিট্‌লার ঠাট্টা ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোন নিগ্রো যদি জার্মান ভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করে, তা হলেই কি সে জার্মান হয়ে যাবে? এ-প্রশ্ন ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু এর উত্তর হচ্ছে যে, সেই নিগ্রো জার্মান জাতির লোক না হলেও জার্মানভাষী যে হবেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ক্রমশ সেই নিগ্রো জার্মান জাতির অঙ্গীভূতও হয়ে যাবে। লাইবেরিয়ার নিগ্রো অধিবাসীরা ইংরেজিকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করেছে। তার জন্যে তাদের ইংরেজ বা মার্কিন বা ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি বলা যাবে না, সেটা নেহাৎ হাস্যকর ব্যাপার হবে। কিন্তু লাইবেরিয়ার নিগ্রোরা ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাভাষী বললে ভুল হবে না। তারা আফ্রিকার অন্যান্য নিগ্রো জাতির পর্যায়ভুক্তও হবে না। তারা ইংরেজিভাষী নতুন একটি নিগ্রো জাতিরূপে গণ্য হবে। আমেরিকার নিগ্রোরা আবার ক্রমশ মার্কিন জাতির অঙ্গীভূত হয়ে যাবে।

মাঝে মাঝে দু'চারজন বহিরাগত ভিন্ন জাতীয় বিদেশীকে নাগরিক অধিকার দিলে যেমন একটা জাতির আদিম বিশুদ্ধি কিছু ক্ষুণ্ণ হলেও জাতিত্ব নষ্ট হয়ে যায় না, যে-নিয়ম প্রায় সারা বিশ্ব এখন মেনে চলছে, তেমনি ভারত-ইউরোপীয় ভাষাভাষীরা মোটামুটি ভারত-ইউরোপীয় জাতি সমূহরূপেই বর্তমান আছে। লাতিন আমেরিকার মতো কোথাও অনার্য মিশ্রণের পরিমাণ ভয়াবহ, কোথাও নর্ডিকদের মতো নিতান্ত কম। হিট্‌লার "আর্য" শব্দের দ্বারা প্রাচীন মূল ভারত-ইউরোপীয় জাতি এবং তাদের নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত আধুনিক বংশধর জাতি সমূহকে বোঝাতেন। এই সব জাতির মাতৃভাষা অবশ্যই ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যারাই এই সব ভাষাকে মাতৃভাষারূপে বরণ করেছে, তারাই নৃতত্ত্বের দিক থেকে ভারত-ইউরোপীয় বা আদিম আর্য জাতির অন্তর্গত নয়। কিন্তু তার জন্যে ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীকে আর্য ভাষাগোষ্ঠী বলতে বাধা হওয়ার কারণ নেই। আর্য শব্দ প্রথমে জাতিবাচক ছিল এবং পরে বহু অনার্য আর্যদের মাতৃভাষা নিজেদের মাতৃভাষারূপে বরণ করেছে, এই কারণে আর্য জাতির উদ্ভাবিত ভাষাগোষ্ঠীকে আর্য নামে অভিহিত করা চলবে না, এ-সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। বড় জোর বলা যেতে পারে যে, নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে অনার্য, এমন বহু লোক আর্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলে, যথা, লাইবেরিয়ার নিগ্রোরা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার ভোগকারী অশ্বেতকায় অধিবাসীরা, লাতিন আমেরিকার রোমান ক্যাথলিক লাল মানুষেরা।

জাতিতে খাঁটি ভারত-ইউরোপীয় অর্থাৎ ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা স্বাভাবিকভাবে পুরুষানুক্রমে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার ক'রে আসছে এমন মাতাপিতার সন্তান শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিও ভাষায় সেমীয় এবং ধর্মে মুসলমান হতে পারে, উত্তর আফ্রিকায় বেরবের্ জাতি তার দৃষ্টান্ত। নৃতাত্ত্বিক উদ্ভবের দিক থেকে বিচার করলে এই জাতির লোকেরা প্রথমে ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহারকারী শ্বেতকায় জাতিগুলির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরে মুসলমান হয়ে এরা সেমীয় গোষ্ঠীর ভাষা গ্রহণ করে।

কি শক্তিমত্তায়, কি লোক সংখ্যায় ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীই এখন সর্বপ্রধান এবং শ্রেষ্ঠ। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক লোক এই সব ভাষায় কথা বলে।

ভারত ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীকে নানা পণ্ডিত নানা ভাবে ভাগ করেছেন। আমরা যে মত গ্রহণ করেছি তাতে বর্তমান কালের সমস্ত আর্য বা ভারত ইউরোপীয় ভাষাকে দশটি শাখায় ভাগ করা যায় :—

(১) কেল্‌তিক (২) ইতালিক [৩] গ্রিক [৪] আর্মেনীয় [৫] আলবানীয় [৬] বাল্‌তিক [৭] স্লাভিক (৮) টিউটনিক (৯) ইরাণীয় (১০) ভারতীয় আর্য।

ইউরোপের সামান্য ফিন্ উগ্রীয় এবং তুর্ক-তাতার অধ্যুষিত অংশ বাদে সমস্ত ইউরোপে, পারস্যে, ভারতের উত্তরাংশে, সাইবেরিয়ায়—অর্থাৎ এশিয়ারও এক বৃহৎ অংশে এবং দুই আমেরিকা, আণ্টার্কটিকা আর ওশিয়ানিয়া সমেত আরও চারটি মহাদেশের প্রায় সর্বত্র ভারত ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাভাষীদের বসতি। আমেরিকায় কিছু নিগ্রো আর রেড ইণ্ডিয়ান্ এবং ওশিয়ানিয়ায় কিছু অষ্ট্রোনেশীয় এদের সহবাসী। আফ্রিকায় লাইবেরিয়ার নিগ্রো রাষ্ট্রও ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষায় কাজ চালায়। উত্তর আফ্রিকায় বহু শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক এখন পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে বসবাস করছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গরা এক বৃহৎ রাষ্ট্র পরিচালনা করছে দুটি ভারত ইউরোপীয় ভাষায় এক সঙ্গে : ইংরেজি আর আফ্রিকান্‌স্।

ভারত ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্য জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ সাহিত্য। অন্য কোন গোষ্ঠীর সাহিত্যই এর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেনি। জাপানিদের ছাড়া এত'দিন অন্য কোন জাতি কর্মদক্ষতায় ভারত ইউরোপীয় গোষ্ঠীর লোকদের সমকক্ষ হতে পারে নি। এখন চীনারা জাপানিদের মতোই ভারত ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত কর্মক্ষেত্রে।

অপ্রচলিত ও ক্ষুদ্র ভাষার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে এই গোষ্ঠীর শাখা দশটির পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যাক।

ক্রমশঃ

প্রজাপতির খেলা

শ্রীযমুনা দেবী

সুমি! সুমি! ওরে ও সুমি,—বলি কানের মাথাটা কি একেবারে খেয়েছ? কোন চুলোয় গেছ—এত ডাক্‌ছি শুনতে পাচ্ছ না?

সুমি ওরফে সুমিত্রা। চোদ্দ পনের বছরের একটি সুন্দরী তরুণী এতক্ষণে মায়ের ডাক শুনিতে পাইয়া তিনতলার ছাদের আলসে হইতে মুখ বাড়াইয়া উত্তর দিল, 'যাই মা—'

বলি, এতক্ষণে ডাকটা কানে পৌছাল? কখন থেকে ডাকছি! ডেকে ডেকে আমার গলা চিরে গেল, তবু নবাবনন্দিনীর সাড়া পাওয়া যায় না—

ত্রস্তে সোপানশ্রেণী অতিবাহিত করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া একেবারে মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "তুমি আমায় ডাকছ মা, আমি কিন্তু কিছু শুনতে পাইনি।

—তা শুনতে পাবে কেন? ছাদে গেলে আর কোন দিকে কি খেয়াল থাকে; না হুঁস থাকে—

...না মা, আমি ও বাড়ীর অনুদির সঙ্গে গল্প করছিলুম—

—সে আমি জানি। তুমি গল্প ছাড়া আর কিছু করনি—তাই বলে কি চা করবার কথা মনে থাকে না! শুধু গল্প করলেই পেট ভরে যাবে? উনানটা কখন থেকে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। আফিস থেকে এসে তোমার বাবা একটু চায়ের অভাবে শুয়ে আছেন—জান না, আজ ঝি অবধি আসেনি—

কোমল স্বরে কন্যা উত্তর দিল,—না মা, তুমি রাগ করো না, আমি এখুনি বাবাকে চা করে দিচ্ছি। তুমি আর ব্যস্ত হয়ো না—

—"না ব্যস্ত হব না! তুমি জান না! এখুনি উনুন ধরে যাবে, খাবার করতে হবে—বাপ আসবে তেতেপুড়ে—

কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া সুমিত্রা চা'এর জল মাপিয়া কেটলী উনানে বসাইয়া দিল। তাহার পর ভাঁড়ার হইতে কিছু ঘি ময়দা বাহির করিয়া মাখিতে বসিল। ময়দা মাখা সমাপ্ত করিয়া সে লুচি বেলিতে আরম্ভ করিল। জননী কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া তাহা ভাজিতে বসিলেন।

সুমিত্রা একখানা কাঁচের প্লেটে জলখাবার ও চা লইয়া দ্বিতলে পিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর কহিল, "বাবা চা, জলখাবার এনেছি—

পিতা জগদীশবাবু তখন অফিস হইতে ফিরিয়া নগ্ন গাত্রে পাঞ্জাবীটি খুলিয়া খাটের উপর শুইয়া একটি পা অপর একটি পা'এর উপর তুলিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন।

দুহিতার আহ্বানে নেত্র উন্মীলন করিয়া কহিলেন, দাও যাচ্ছি।

সুমিত্রা মেঝেতে একখানি আসন পাতিয়া একগ্লাস জল দিয়া খাবারের রেকাবীখানি রাখিয়া দিল।

পিতা উঠিয়া আসিয়া আহারের নিমিত্ত আসনে উপবেশন করিলেন এবং চা'এর কাপটি হাতে তুলিয়া লইয়া প্রথমেই একটা চুমুক দিয়া আঃ বলিয়া একটি আরাম সূচক ধ্বনি উচ্চারণ করিলেন। তাহার পর তনয়ার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার মুখখানা এত গম্ভীর কেন মা?"

কন্যা নীরব। কোন কিছুই সে বলিল না।

পুনরায় চা'এর কাপে আর একটি চুমুক দিয়া বাম হাতখানি আপনার বক্ষদেশে বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন,—"তোমার মা বুঝি বকাবকি করেছে? ওই এক মানুষ এত বলি, কত বারণ করি—তা কিছুতেই শুনবে না। একটু

যদি পান থেকে চুণ খসলো, অমনি চেঁচামেচি সুরু আরম্ভ করে দেবে—

কন্যা উত্তর দিল,—"না বাবা, মা ডাকছিল, আমি শুনতে পাইনি—ও বাড়ীর অনু-দি আমার সঙ্গে গল্প করছিল কি না। তুমি অফিস থেকে এসেছ—চা'এর দেরী হয়ে গেছে, তাই মা বকছিল।

তারজন্যে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে যে এত গোলমাল—যদি নাই শুনতে পেয়ে থাকে—

তনয়া পিতার এই সকল কোন কথারই উত্তর করিল না।

জগদীশবাবু আহার করিতে করিতে একসময় মুখ তুলিয়া কন্যার পানে চাহিয়া কহিলেন, "হ্যাঁরে সুমি, অনুর দাদার যে বিয়ে শুনছিলুম—

—হ্যাঁ বাবা! খুব বড়লোকের বাড়ী। জান বাবা, অনুদি বলছিল,—জয়ন্তদার বিয়েতে অনেক ঘটা হবে—

—"কেন হবে না? ওর বাবা একজন অতবড় মন্ত্রী। তার ছেলের বিয়েতে ঘটা হবে না তো কি রামী-শ্যামীর ছেলের বিয়েতে ঘটা হবে?"

—হ্যাঁ বাবা, অনুদি আরো অনেক বলছিল, জয়ন্তদার বৌভাতের দিন নাকি অনেক সব বড় বড় লোক আসবে।

—"কেন আসবে না?" দেশের লোকের রক্ত চুষে নিচ্ছে, আর ওনাদের ছেলের বিয়েতে উৎসব হচ্ছে; আর আমরা খেতে-পরতে পাচ্ছি না। জিনিষ পত্রের দর দিনের পর দিন আকাশচুম্বি হয়ে যাচ্ছে। ট্যাক্সের দায়ে লোকের বাড়ী ঘর বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। সোনা চৌদ্দ ক্যারেট! ছানা বন্ধ! সন্দেশ নেই, মানুষ খাবে কি? মরছে তো এই মধ্যবিত্ত গরীব গৃহস্থরা। আয় নেই এক পয়সা, ব্যয় আছে চৌষট্টি পয়সা। উঃ! ওই বিজনবাবুর হয়ে ওর ইলেকসানে কি কম খেটেছিলুম। তবে হ্যাঁ, লোকটি অতি ভদ্র। পাড়ায় একটা সুনাম আছে। আর থাকবে নাই বা কেন? যাই হোক, একটা বর্দ্ধিষ্ণু ঘর তো যখনই কোন প্রয়োজনে যে কোন লোকই আসুক, উনি কখনও তাকে বিমুখ করেন না।

জান বাবা, সেদিন কাগজে পড়ছিলাম, পুরুলিয়াতে কি রকম দুর্ভিক্ষ হয়েছে। দেশের লোক সব শাকসবজি, গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করছে। কত লোক তো অনাহারে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে। সংসারে যার যা কিছু ছিল, বাসনকোসন, হাঁড়ি, গেলাস, থালা, বাটি সব বিক্রী করে খেয়েছে। এমন কিছু নেই, যা আর বিক্রী হবে, তারা খাবে। তবুও নাকি আমাদের ত্রাণমন্ত্রী বলেছেন, এটা দেশের দুর্ভিক্ষ নয়।

—হ্যাঁ মা, আমিও সেটা পড়েছি। ওনাদের চোখে কোন্‌টা যে দেশের দুর্ভিক্ষ তা তো কেউ দেশের লোক বুঝতে পারে না। ওনারা বলছেন, যুদ্ধের জন্য সব জিনিষ-পত্রের দাম নাকি বাড়ছে। ব্যয় সংকোচন কর। কিন্তু তারা নিজেরা কি কিছু ব্যয় সংকোচন করেছেন? তা যদি করতেন, তবে বিজনবাবু তার ছেলের বিয়েতে এত উৎসব করতে পারতেন না। কেন বাপু, তোমরা ওই টাকাটা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান কর না! তাহলে বুঝি জন-সাধারণেরও মনে একটু বিশ্বাস জন্মে, যে মন্ত্রীরা যখন দান করেছে, তখন আমাদেরও দেওয়া কর্ত্তব্য! তা নয়, যত জুলুমদারী, যত কিছু অত্যাচার সব হচ্ছে আমাদের মত লোকের উপর। আরও দু'দিন পরে দেখবি যে, এই মধ্যবিত্ত সমাজটা একেবারে মুছে গেছে—

পিতাপুত্রীর এইরূপ পলিটিক্স আলোচনাতে বাধা পড়িল। কনিষ্ঠ সহোদর পল্টু আসিয়া খবর দিল, দিদি-ভাই, তোমার টিচার এসেছেন। মা কোথায় গো?

পুত্রকে দেখিতে পাইয়া পিতা কহিলেন,—হাঁারে পল্টু, তুই এখন ফিরলি? ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখতো, ক'টা বেজেছে। তোর সামনে পরীক্ষা, আর তুই কিনা এই ছ'টার সময় খেলে ফিরলি? তোদের কিচ্ছু হবে না—

পল্টু তখন ফুটবল খেলার পোষাকে হাতে পায়ে কাদামাটি মাখিয়া সদ্য মাঠ হইতে ফিরিয়াছে। পিতার কথার দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মুখ হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল।

সুমিত্রা উত্তর দিল,—মা রান্না ঘরে।

পিতা কন্যার পানে চাহিয়া কহিলেন,—সুমি, তোর না এবার ফাইনাল পরীক্ষা? তোর দিদিমণি কেমন পড়াচ্ছেন?

—কেন বাবা! বেশ ভালই তো পড়াচ্ছেন—!

কাল থেকে তোর দিদিমণি চলে গেলে, আমার কাছে রোজ রাত্রে আসবি—আমি পড়াব।

বাবা আমি একলা পড়ব,—পল্টু পড়বে না ?

সুমি! সুমি! করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মা আসিলেন,—"আচ্ছা সুমি, তুই কি রকম মেয়ে বলদিকিনি ? যেখানে যাবি, সেখানেই কি একেবারে জমে যাবি। কখন থেকে দিদিমণি পড়াতে এসে বসে আছেন সেদিকে খেয়ালই নেই। নবাব নন্দিনীকে ডেকে ডেকে যদি বা ছাদ হতে নামান হলো, অমনি বাপের চা' খাবার এনে হাঁপিয়ে গেছেন, আর নড়তে পারছেন না। গল্প যদি পেল একবার অমনি সেখানে শিকড় গাঁথলো—আর তোমাকেও বলি,—তোমার কি আক্কেল বল দেখি, তোমরা বাপে-মেয়েতে বসে গল্প করছ, আর দিদিমণি এসে বসে আছেন—

—"সুমি জানবে কি করে ?" পিতা বললেন,—"ওর দিদিমণি এসেছে ! ওতো এইমাত্র আমার চা নিয়ে এলো"—

কন্যা কিন্তু পিতামাতার এই বাক্যব্যয়ে কোন প্রত্যুত্তর না করিয়াই ত্বরিতে কক্ষ হইতে চলিয়া গেল।

* * *

নীলিমা তলে মেঘমালার সহিত হিমাংশু লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে একসময়ে শ্রান্ত হইয়া স্থির পদক্ষেপে দণ্ডায়মান হইল। খেলা বন্ধ হইয়া গেল। মেঘমালার দল ধীরে ধীরে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। এইবার হিমাংশু স্বকার্য্যে প্রবিষ্ট হইল। নির্ম্মল নভস্তল হইতে তাহার আলো ধরিত্রীর বুকে ছড়াইয়া দিয়া চারিদিক স্নিগ্ধ করিয়া তুলিল। সেই আলোরই একটি টুকরা গবাক্ষ পথে জগদীশের খাটের উপর পড়িয়া অন্ধকার কক্ষটিকে সমুজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিল। সেই স্নিগ্ধ আলোয় শয়নরত স্বামীর কুঞ্চিত কেশদামে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে অণিমা তাহার সহিত গল্পে লিপ্ত হইয়াছিল। এই আরামপ্রিয় কাজটি ছিল জগদীশের অত্যন্ত প্রিয়। অণিমা তাই সারাদিনের শ্রমের ক্লান্তিটুকু অপনোদন করিতেছিল।

গল্পে ব্যাঘাত পড়িল। কনিষ্ঠ পুত্র জেন্টু ডাকিতে ডাকিতে আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিতে অণিমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলোর সুইচটা টিপিয়া সারা কক্ষটিকে আলোকিত করিয়া দিল।

পুত্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া গর্ভধারিণীকে দেখিতে পাইয়া সুসংবাদ দিল,—"অন্নুদির বাবা মা সব এসেছেন।

অণিমা তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড়টা টানিয়া দিয় দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই অনুশ্রীর মা সরসী দেবী একেবারে তাহার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন অণিমা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাতখানি ধরিয় কহিল,—"আসুন ভাই" বলিয়া তাহাকে আনিয়া একখানি কৌচের উপর বসাইল।

সরসী দেবী কক্ষে প্রবেশ করিয়াই জগদীশবাবুকে দেখিতে পাইয়া হাতজোড় করিয়া নমস্কার দিয়া কহিলেন, —উনি বাইরের ঘরে বসে আছেন।

সরসী দেবীর মুখে বিজনবাবু তাঁহার বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন শুনিয়া জগদীশবাবু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতি নমস্কারের পালাটা ভুলিয়া গিয়া যাচ্ছি! যাচ্ছি আমি, বলিয়া তাড়াতাড়ি পায়ে চটি না গলাইয়াই নগ্নপদে সিঁড়ি বাহিয়া একেবারে নীচে নামিয়া আসিয়া বিজনবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

সরসী দেবী কক্ষে প্রবেশ করিয়াই জানাইয়া দিলেন, তাহার বসিবার এতটুকু অবসর নাই। কারণ বহুস্থানে তাহাকে যাইতে হইবে। অণিমাদের সকলেরই যাওয়া চাই। আর সুমিত্রার নিমন্ত্রণ স্বতন্ত্র। সে যেন বিবাহের কয়দিনই যায়। তা না হলে অনুশ্রী বড় রাগ করিবে।

এইবার অণিমা প্রশ্ন করিল,—"মেয়েটিকে দেখতে-শুনতে কেমন ?"

সরসী উত্তর দিল,—"মেয়েটি দেখতে খুবই সুন্দর ভাই। বি, এ, পড়ছে। আমার জয়ন্ত তার কাছে কালো, ভাই।

অণিমা কহিল,—"কালো তো কি হয়েছে। পুরুষ মানুষের আবার রংএর বিচার! জয়ন্তর কত বিদ্যে! কি নরম প্রকৃতি! ওর মত ছেলে, আপনাদের মত শ্বশুর-শাশুড়ী পাওয়া তো ভাগ্যের কথা দিদি—

"আপনার দেবর তো কনে দেখে এসে বল্লেন,—এতদিনে একটি মেয়ে দেখে এলুম বটে। কি রূপ! যেন জগদ্ধাত্রী প্রতিমা" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"আপনাদের সব যাওয়া চাই ভাই—

—"নিশ্চয়! নিশ্চয় যাবো। আর আপনার সকল কাজেই তো উনি আগে হতেই যান। সর্ব্বঘাট কাঁটালি কলা হয়ে—"

—"হ্যাঁ! জগদীশবাবু তো ওঁর ইলেক্‌সানের সময় খুবই খেটেছিলেন। বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

অণিমারা কর্ত্তাগিন্নী অতিথিদম্পতীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ভিতরে চলিয়া আসিলেন।

এইবার অণিমা স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল,—নেমন্তন্ন তো ওনারা দিব্যি করে গেলেন, বলিতেই জগদীশবাবু তাহার মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া উত্তর দিলেন,—"এইবার ঠেলা সামলাও—

গিন্নী কহিল,—হ্যাঁ! যা হোক একটা দিতে তো হবে—

—"দিতে তো হবে! বলি, পাবে কোথায়? দেবে কোথা হতে?

গিন্নী উত্তর দিলেন,—তা বল্লে কি আর চলে—

"ঐ একটা সিঁদুর কৌটা দেবে। কর্ত্তা উত্তর দিলেন, —এই-তেই আমার জিভ বেরিয়ে যাবে—

অণিমা উত্তর দিল,—"সেই যা হোক,—আমরা তো আর ওদের মত অত বড়লোক নই—কিন্তু দেখ অমুর মাকে আমার বেশ লাগে বাপু। ভারী অমায়িক মানুষ—যখনই আমি ওকে দেখেছি বা কথা বলেছি, তখনই এত নম্র হয়ে কথার উত্তর করেছে, অত পয়সা, অত বড়লোক, তা কিন্তু কেউ বুঝতেই পারে না।

কর্ত্তা উত্তর দিলেন,—"কেন? বিজনবাবু লোকটিও তো খুব ভদ্র। আমার দু'টো হাত ধরে বল্লে,—"জগদীশ-বাবু আপনার যাওয়া চাই বর যাবার আগে—

আর তাও বলি,—"কেনই বা অমন করে বলবে না! জানে তো, যে আজ আমাদের দৌলতেই এত বড়মানুষী করছি—আমরা যদি না দাঁড় করাতুম, তাহলে কি আজ এত খরচ করতে পারত? তবে হ্যাঁ, লোকটিও খুব শান্ত প্রকৃতি, মেজাজটিও ঠাণ্ডা, তা না হলে কি ভোটে জিততে পারে—

পত্নী কহিলেন "হ্যাঁ! তোমরাও যেমন দিবারাত্র আহারনিদ্রা ত্যাগ করে ওনার জন্য খেটে ছিলে, উনিও তেমনি আমাদের প্রতি সে কৃতজ্ঞতা রেখেছেন। পাড়ার লোক যখন যে কাজ নিয়ে ওনার কাছে গেছে, তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, বিজনবাবু তখনই সে কাজ তার করে দিয়েছেন। বিমুখ করেন নি—"

* * * *

কোন এক সওদাগরী অফিসের বড়বাবু জগদীশ চাটুয্যে অতি শান্তিপ্রিয়। ছোট সংসার। মাত্র তিনটি ছেলেমেয়ে এবং স্বামী স্ত্রী, এই লইয়া ভদ্রলোকের সংসার। ভদ্রলোক কিন্তু কাহারও সাতপাঁচ কথায় থাকেন না। নিয়মিত সকালে অফিস যান সন্ধ্যায় অফিস হইতে ফিরিয়া নিজের ঘরটিতে শুইয়া থাকেন। কন্যাটিও তাই। গৃহিণী কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। পিতাপুত্রী তাহাকে অত্যন্ত ভীতির চক্ষেই দর্শন করিতেন। পাড়ার কোথায় কাহার ছেলে হইবে, তাকে সঙ্গে করে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া, কাহার কন্যার বিবাহের ঘটকালী করা, কোথায় কার ছেলের অসুখ করেছে, তাকে ডাক্তার দেখানো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ হয়েছে, তার মীমাংসা করা ইত্যাদি নানান কাজ তিনি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সকলের পূর্ব্বে অণিমা গিয়া মাথা দিয়া পড়িত। সেইজন্য পাড়ার প্রত্যেকেই অনিমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভক্তিও করিত এবং ভালও বাসিত। এই সকল কারণে প্রতিবেশীর কাছে তার প্রতিপত্তিও ছিল অসাধারণ।

এই রকমই একদিন সকালে বিজন রায় স্বামী-স্ত্রীতে আসিয়া ইঁহাদের কর্ত্তাগিন্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের অনুরোধ জানাইল। তখন জগদীশ চাটুয্যে কহিলেন,—"আমার শরীরটা খুব খারাপ, আমি তো অত ঘোরাফেরা করতে পারব না। গিন্নী কিন্তু তখনি বলিয়া উঠিলেন, "না। না। সে আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব, আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না। আপনারা আমাদের পাড়া হতে দাঁড়িয়েছেন, আপনাকে যদি আমরা দাঁড় করাতে পারি তাহলে পাড়ার কতবড় মান-ইজ্জত বলুন তো—! আমরা আপনার হয়ে যেমন করে পারি খাটব!

জগদীশবাবুকে অগত্যা পত্নীর বিরুদ্ধে কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

তা চাটুয্যেরা কর্ত্তাগিন্নী খেটেছিল বটে বিজন রায়ের ইলেকশনে—। এবং তাদের জন্যই আজ বিজন রায় দেশের একজন মন্ত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বামী স্ত্রীর আলাপ আলোচনায় বাধা পড়িল। কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা! তুমি আমায় পড়াবে বলেছিলে—

পিতা উত্তর দিলেন,—"হ্যাঁ! পাড়াব। বলিয়া তিনি পত্নীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—বিজনবাবু তো ছেলের বিয়েতে খুব ধুমধাম করছেন। বলি ছেলেটি কি মত দিয়েছে—তিনি তো সম্পূর্ণ বাপের বিপরীত—আর বাপের তেমন অনুগতও নয়—

অনিমা কহিল, তা সত্যি! ছেলেকে দেখলেই মনে হয় যেন—অনুর মাও তো তাই সেদিন দুঃখ করে বলেছিল, ভাই, ছেলেকে এত চেষ্টা করি নিজের কাছে রাখব বলে, তা কিছুতেই পারি না—কত আদর যত্ন করব; কত কষ্ট করে মানুষ করলুম, ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করালুম; কিন্তু কিছুতেই কাছে থাকতে চায় না। নিজের কাছে রাখবার জন্যই তো বিজনবাবু মেয়ের আগে ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন।

গম্ভীরস্বরে জগদীশবাবু কহিলেন,বিয়ে দিলেই কি আর ছেলে কাছে থাকবে—?

পত্নী উত্তর দিলেন, ওসব বড় লোকের বড় বড় ব্যাপার বোঝা যায় না। এই দেখ না, অনুশ্রী ও তার মা সেদিন বল্লে,—ভাই মেয়ের কি খেয়াল—লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে আছে, আমরা দুজনে কত বোঝালুম, কিন্তু মেয়ে কিছুতেই রাজি হলো না—।

এমন সময় সুমিত্রা পুস্তক হস্তে কক্ষে প্রবেশ করিয়া মায়ের কথা শুনিয়া কহিল,—আহা! তা হবে কেন-? অনুদি খুব খারাপ নম্বরে বি, এ পাশ করেছে। অনুদির বাংলায় অনার্স ছিল, তা সেটি ভাল হয় নি—বি, এ তে ভাল নম্বর না হলে এম, এর সিট পাওয়া যায় না, সেই জন্য অনুদির মা আর অনুদি দু'জনে কাকাবাবুকে অনেক অনুরোধ করেছিল, এম, এ,র সিট করে দেবার জন্য কিন্তু কাকাবাবু তা দিলেন না। বল্লেন,—"কেন, আমার মেয়ে বলে আমি সিট করে দেব—! তা হলে অপর মেয়েরা কি অপরাধ করেছে? তখন কাকীমা বল্লেন—"তাহলে অনু বিলেত যেতে চাইছে, তাই ওকে পাঠিয়ে দাও। কাকাবাবু তাতে সম্মত হলেন না। বল্লেন বিয়ের পর সেখানে খুশী হয় যাও, এখন যাওয়া হবে না—। তাইতো অনুদি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে আছেন।

তনয়ার কথা শুনিয়া জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই এত সব খবর জানলি কি করে'?

—কেন, আমায় অনুদি সব গল্প করে তাই তো আমি সব জানি। অনু-দি আমায় খুব ভালবাসে কি না, সেই জন্য সব কথা আমায় বলে।

* * *

জগদীশবাবু কন্যাকে ফিজিক্স পড়াইতেছেন, এমন সময় বড় ছেলে পল্টু আসিয়া কহিল "বাবা, মা বলে দিলে চিনি আনতে হবে—

"তোমার মাকে বলো, একটু কম করে চিনি খরচ করতে—

সুমিত্রা কহিল,—"আচ্ছা বাবা, গত যুদ্ধের সময় যখন চিনি পাওয়া যেত না, তখন লোকে স্যাকারিন দিয়ে চা খেত। কিন্তু তখন চিনির দাম এত হয়নি। যুদ্ধের সময় এক টাকা করে চিনির দর ছিল। আর তখন দেশ স্বাধীনও হয় নি। কিন্তু এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি সেই জন্য চিনির দরও বেড়ে গেছে। সেদিন কাগজে দেখলুম তিন মাসে নয় লক্ষ টাকা লাভ করেছে—।

হ্যাঁরে দি'দি, আমিও পড়েছি। কত করে বস্তাপিছু লাভ করেছে জানিস—? চার টাকা আটচল্লিশ নয়া পয়সা। সে আবার কারা করেছে জানিস,—? সব অবাঙালী—

পিতা কহিলেন—"ওরে বাবা, এখন তো সব অ-বাঙালীরই রাজত্ব দেখতে পাচ্ছ না—। দেশটা কি রকম অবাঙালীতে ছেয়ে গেছে—!

পিতাপুত্রীর আলোচনায় ব্যাঘাত পড়িল। জননীর আহ্বান কর্ণে প্রবেশ করিল। বলি, "আজ কি খাবার সময় হচ্ছে না? রাত দশটা বাজল। পড়ার নাম নেই—বাপ, ছেলেমেয়ে সব বসে পলিটিক্স চর্চ্চা হচ্ছে—হ্যাঁরে সুমি, হ্যাঁরে পল্টু, তোদের না সামনে পরীক্ষা? তোদের কি একটু লজ্জাও করে না? তোদের বাবার না হয় মাথাটা একেবারে গেছে—তাঁর সঙ্গে কি তোদেরও গেছে?"

এই সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া পিতা কহিলেন, —"এই শিক্ষার ক্ষেত্রেই দেখনা—এই যে একটা হায়ার সেকেণ্ডারী করে কি একটা জগাখিচুড়ী করেছে। স্কুল, কলেজের সব মাইনে বেড়েছে। বইএর দাম হয়েছে অসম্ভব। বাধ্য হয়েই অর্দ্ধেক ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করতে হয়েছে। কি করবে! যে বাপের তিনটী

চারটী ছেলেমেয়ে, সে ভদ্রলোক কি করে লেখাপড়া শেখাবে—পাবে কোথায়?

* * *

আজ মহা ধুমধাম। রসুনচৌকী এবং মাইকের শব্দে সমস্ত পাড়াটা সরগরম। সপ্তাহ ধরিয়া যে কি কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে তাহা পাড়া অপাড়া সকল লোকই জানিয়াছে। আলিবর্দ্দির সানাইর সুমিষ্ট সুরলহরী কে না ভালবাসে? তাই ইহা সকলেরই শ্রুতিমধুর হইয়াছে। রং-বেরঙের মনুষ্যশ্রেণী আজ আনন্দ কোলাহলে মুখর। এত সমারোহের কারণ ছয়এর পল্লীর মাথা বিজন রায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীজয়ন্ত রায় ইঞ্জিনীয়ারের শুভ বিবাহ।

সানাইএর সুরে জয়ন্তর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া পাথরের টেবিলটার উপর টাইমপিস ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল। ছয়টা বাজিয়া সে তাহার সময়বারতা সকলকে জানাইয়া দিতেছে। দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সামনে খোলা জানালাটার মধ্যে দিয়া দূরের নীল আকাশের উপর দৃষ্টি পড়িতেই দেখিল,—দুইটী পাখী উড়িয়া যাইতেছে। তাহাদের পানে সে চাহিয়া আছে। এবং মাঝে মাঝে শ্রবণে পশিতেছে ঘনঘন শঙ্খধ্বনি, হাসি কোলাহল। আত্মীয়-স্বজন সকলেই আসিয়াছে। সুমিত্রাও মাতা কন্যাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গর্ভধারিণীকে সে তো জানাইয়াছিল,—এরূপ বিবাহ সে করিবে না। বিত্তশালী পিতার তনয়ার বহু পাত্রই আসিবে। তাহার জন্যই বা এত অভিনিবেশ হওয়া কেন? গরীব গৃহস্থ সদ্‌বংশের সুন্দরী দুহিতা আসিলে তাহার সুখের নীড় হ'ত। তাহার অভাব কিসের? পিতা সকল কিছুর অনটনই তো মোচন করিতে পারিতেন। নিজেও সে কিছু স্বল্প উপার্জ্জন করে না। জননী কিন্তু সাহস করিয়া পিতৃদেবের নিকট এই সকল বারতা উত্থাপন করিতে পারেন নাই। তবে আভাসে ইঙ্গিতে কিছুটা ব্যক্ত করেন নাই যে তাহাও নহে। উত্তর পাইয়াছিলেন,—তিনি নাকি একটা রাজত্ব পরিচালনা করেন, তাহার উপর মাতাপুত্রের কোন প্রজ্ঞাই খাটিবে না। চিন্তার স্রোতে বাধা পড়িল। অনুশ্রী সুমিত্রাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া একেবারে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল,—"একি! জয়ন্তদা, তুমি এখনও বিছানায় বসে আছ! ওদিকে মা তোমায় ডাকাডাকি করছে—"

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, "এই বুঝি নিদ্রাভঙ্গ হলো আপনার?

কোন উত্তর না দিয়া জয়ন্ত কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

অনু কহিল,—"হ্যাঁরে! দেখছিস না, এখনও ভাল করে চোখ চাইতেই পারছেন না। ওনার আজ বিয়ে, আর উনি কিনা এত বেলা অবধি দিব্যি নাক ডাকাচ্ছেন।

—জয়ন্ত কহিল, "বারে নাক ডাকাব না। রাত্রে যখন বাসর ঘরে জাগতে হবে, তখন কি কেউ আমায় ঘুমুতে দেবে! বলিয়া সে সুমিত্রার পানে চাহিয়া কহিল, কি বলো সুমিত্রা—

সুমিত্রা উত্তর দিল, সেইজন্যই তো আপনি এখন সেই ঘুমটা পুষিয়ে নিলেন।

অনুশ্রী কহিল "যাও! যাও জয়ন্তদা, মা তোমার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছে। ডাকাডাকি করছে—বলিয়া সে কহিল—আমাদের এখানে দাঁড়াবার সময় নেই, অনেক কাজ বলিয়া সুমিত্রার হাতে একটা টান দিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

এদিকে অনুশ্রীর মা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এখনি অধিবাস আসবে, কোথায় তাহা নামান হইবে তাহারই ব্যবস্থা নিজের গর্ভধারিণীর সহিত করিতেছেন।

বেলা দশটা বাজিল। তখনও অধিবাস আসে নাই; বিজনবাবু অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। কখন নান্দীমুখে বসা হইবে? পুরুতমশাই আসিয়া বসিয়া আছেন।

পত্নী কহিল,—"এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তারা ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দেবে।

—"ব্যস্ত হব না! এদিকে গোধূলিলগ্নে বিয়ে—চারটের সময় বর নিয়ে বেরুতে হবে! তার আগে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে, 'জয়' তো একটু বিশ্রামও পাবে না—

পত্নী উত্তর দিল, খুব পাবে। তুমি কাপড় ছেড়ে গরদের ধুতি চাদর পরে এসো নান্দীমুখের জন্য। আর আমি জয়ন্তকে নিয়ে কলাবরণে যাচ্ছি—বলিয়া সে পুত্রকে ডাকিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

কলাতলায় বরণের পালা সমাপ্ত করিয়া সকলে জয়ন্তকে লইয়া মঙ্গলহাঁড়ি খেলিতে বসিল। সুমিত্রার মা কহিলেন, "এই, কোন আইবুড়ো মেয়েরা যেন ছুঁয়ো না, তাহলে বিয়ে হবে না। সব সরে যাও—

অনুশ্রী কহিল,—"তাহলে আমরা কেমন করে' দেখব—?

তাহার জননী উত্তর দিলেন,—"তোমাদের দেখতে হবে না। তারপর যখন বিয়ে হবে না—বলিয়া তাহারা খেলা আরম্ভ করিল।

মাসীমা কহিলেন,—"ভালকরে চাপা দিস বাপু—যেন আওয়াজ না হয়। শব্দ হলেই বৌ বড় মুখরা হবে—

এমন সময় সুমিত্রা তাহাদের মাথার চাদরটা তুলিয়া ধরিতেই জয়ন্ত হাসিয়া ফেলিল। কহিল,—এই যা—। ছুঁলে তো—আইবুড়ো মেয়ের বিয়ে হবে না কোন কালে।

সুমিত্রার মা কন্যাকে বকিয়া উঠিলেন। বারণ করলুম না—সেই তুই চাদর তুলে দেখতে গেলি!

বারে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি না—

"কেন নীচু হয়ে দেখা যায় না—?

এদিকে জয়ন্তর দিদিমা কন্যার অনুপস্থিতিতে সকলকে বলিতেছেন, জয়ন্তর এ বিয়েতে মত ছিল না। কিন্তু কি করবে? বাপের অমতে কথা বলতে পারে না তো। আমার জামাই-এর এই মেয়েকে বড় পছন্দ হয়েছে। সরসী বলেছিল, ছেলের অমতে কাজ করলে—জামাই উত্তর দিলে—আমার উপর তোমরা কোন মত চালিও না। আমার মেয়ে তো খুব বুদ্ধিমতী—

এইরূপ আলোচনা বিলোচনার মাঝে হঠাৎ একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। খবর আসিয়াছে কনের নাকি হঠাৎ মধ্যরাত্র হতে বিসূচিকা দেখা দিয়াছে। বাঁচিবার আশা একেবারে বিলুপ্ত। বিবাহ বন্ধ।

রায় দম্পতী ছুটিলেন তখনি নিজের মোটারে নূতন কুটুম্ববাড়ী—এবং ফিরিয়া আসিলেন সংগালুপ্ত মৃতের ন্যায়। লোকজন সকলে ধরাধরি করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া একেবারে তিনতলায় তাহার শুইবার ঘরে খাটের উপর নামাইল। তাহার পর সকলেই নিস্তব্ধ পদক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবার সময় বলিল একটু বিশ্রাম করতে দিন, এখন কোন রকম বিরক্ত ওনাকে করবেন না।

ডাক্তার আসিলেন। দেখিলেন, বলিলেন, বড্ড শক পেয়েছেন। এটা একটু ঘুমলেই ভাল হয়ে যাবে। আমি ঘুমের ঔষুধ দিয়ে যাচ্ছি। ঘর হতে সকলকে বার করে দিন। সরসী একাকী ঘরে রহিল।

ইহার পর জয়ন্ত ধীরে ধীরে আসিয়া পিতৃসন্নিধানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া পিতার শোণিত লেশহীন আননের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর গর্ভধারিণীর সহিত কক্ষের বাহিরে আসিয়া অতি মৃদু কথাবার্ত্তা কহিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিল তাহার পর নিজের কক্ষে আসিয়া চুপ করিয়া একখানি কৌচের উপর বসিয়া রহিল। সমস্ত বাড়ীতে একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে।

সরসী স্বামীর মাথার কাছে বসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে। কন্যা জননীর পৃষ্ঠদেশে হাত রাখিয়া নীরব বার্ত্তা বহন করিতেছে।

সানাইএর সুর আর শ্রবণে কাহারও পশিতেছে না জয়ন্ত বড় ক্লান্ত। সে এখন কি করিবে? চক্ষু বন্ধ করিতেই চিন্তাগুলি ষ্টেশনের থার্ডক্লাসের যাত্রীর ন্যায় ভীড় করিয়া তাহার মগজে প্রবেশ করিতেছে। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সে বসিয়া আছে। প্রত্যেকেই স্বগৃহে প্রস্থান করিয়াছে।

সন্ধ্যার পর কর্ত্তার চক্ষু হইতে নিদ্রাদেবীর অন্তর্দ্ধান হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। সম্মুখেই ক্রন্দনরতা মাতাকন্যার চক্ষু ফুলিয়া করঞ্জারাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার নয়নে নয়ন পড়িতেই পত্নী করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হবে আমাদের?" বলিয়াই সে পুনরায় ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িল।

কর্ত্তা কহিলেন,—তাই তো! আমিও ভাবছি—বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন,—"একটা মেয়ে এখুনি যোগাড় করতে হবে—যাতে আজই বিয়ে হয়ে যায়—

—আচ্ছা, লোক জানাজানি না করে মেয়েটার খোঁজ করলে হয় না? পত্নী জিজ্ঞাসা করিল—

—"তুমি কি ক্ষেপেছ নাকি? আমি যাব তার খোঁজ করতে? ওসব হলো লোহা বেচা বড়লোক। হঠাৎ বড়লোক হয়েছে—না আছে মান সম্ভ্রম! না আছে ইজ্জত।

ওইসব ঘরের ছেলে মেয়েরাই হয় বেশী স্বাধীনচেতা—সেই-জন্য যা হবার তাই হয়েছে। আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মরে তো ওইসব মেয়েরাই—ওরা হয় বাপ-মার কুলের কলঙ্ক। নিজের সৌন্দর্য্যের গৌরবেই হয় আত্মহারা। প্রথমে ভালবাসার মোহে ছোটে, তারপর ভোগ করে চরম দুঃখ। আমার পিতামাতার আশীর্ব্বাদ আমার মাথার উপর আছে বলেই মেয়েটা অমন করে পালিয়েছে। আমি রূপ দেখে ছুটেছিলুম, কোনদিকে দৃষ্টি দিইনি। তখন তো জানিনা যে এরা মরীচিকার মত মোহই সৃষ্টি করে বেড়ায়—তৃপ্তি দিতে পারে না। যারা পতঙ্গের মত এদের রূপানলে ঝাঁপ দিয়েছে মরেছে তারাই। নিজেরা মরে এবং অপরকেও দগ্ধ করে—উঃ! কি সাংঘাতিক এই সব মেয়ে”—বলিয়া তিনি একটী সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

সরসী নিজের কাপড়ের আঁচলটা দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল,—“কিন্তু তুমি এখনি কোথায় পাবে মেয়ে? কে তোমায় দেবে? আজ আমাদের মান-সম্ভ্রম, ইজ্জত সবই কি অতলে তলিয়ে যাবে? উঃ! ঠাকুর—তুমি একি করলে?” বলিয়া সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

জগদীশবাবুকে আমি এখনি ডেকে বলছি, যেমন করেই হোক, আমায় আজই একটি মেয়ে যোগাড় করে দিতে হবে। ওই লোকটাই পারবে—

পত্নী উত্তর দিল,—“তারা তোমায় দেবে কেন—তাদের মেয়েরও তো সাধ আহ্লাদ আছে—তুমি তোমার মান-সম্ভ্রম দেখবে বলে তারা কি তোমায় দেখবে—এই বিয়েটাতে যদিও তোমার ছেলের এতটুকুও মত ছিল না—

আমি তেমন ছেলে তৈরী করিনি যে বাপের অমতে কাজ করবে—

দুহিতা পিতামাতার বাক্যালাপে নীরব শ্রোতা হইয়া বসিয়া ছিল। এইবার সে মৃদুকণ্ঠে কহিল,—“বাবা, জগদীশবাবুর মেয়ে সুমিত্রার সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না?

পিতা উত্তর দিলেন,—জগদীশবাবু কি দেবেন? তাঁর অত আদরের একটি মাত্র মেয়ে—তবে ওদের বংশটা খুব বড় বংশ। আচ্ছা, আমি তাঁকে ডেকে একবার বলে দেখি—মত হয় তো সব ব্যবস্থা আমিই করে দেব—

মধ্যরাত্রে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি এবং নীরব সানাইএর সুর পুনরায় সরব হইয়া সকলের শ্রবণে পশিতেই জানিতে পারা গেল, সুমিত্রার সহিত জয়ন্ত রায়এর মালা বদল হইতেছে।

কার্ত্তিক

শ্রীসুধীর গুপ্ত

শত শত তারকাসুরের হিংস্রতার
দুর্নিবার জ্বালানলে জ্বলে চতুর্দ্দিক;
প্রশমন অস্ত্র ধরো আবার কার্ত্তিক;
দূর করো দুঃখ যত দীর্ণ দুনিয়ার।
হায়, আজি সুকুমার মুরতি তোমার
হোলো হীন লালসার পূজার প্রতীক।
সর্ব্বগ্রাসী সংগ্রামেও তুমি যে নির্ভীক
জ্বলন্ত পৌরুষে করো সে বার্ত্তা প্রচার।

ভারতীয় জাতীয় পক্ষীর বাহনেতে
অসুর বিধ্বংসী রণে সুর প্রতিষ্ঠায়
জ্বলদর্চ্চি-মহিমায় ওঠো
তুমি মেতে;
উদ্ধত তারক যত যেন লুপ্তি পায়।
এসো স্কন্দ, সর্ব্বপূজ্য জয়
গৌরবেতে
সৈনাপত্যে শান্তি-স্বর্গ-লব্ধ মুক্তিকায়।

উত্তর ভারতে টেসু পূজা

মীরা ঘোষ

গ্রীষ্মের প্রবল দাহ ও বর্ষার আধিক্যের পর যখন মেঘ কেটে গিয়ে মালিন্যমুক্ত নীল আকাশ খুশীর হাসি হেসে দেখা দেয় তখন সবার মুখেই হাসি জেগে উঠে। ধনী ও দরিদ্র সবার ঘরেই আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। কারণ শরৎ এসেছে। শরৎ তো আনন্দের সময়, শরৎ তো উৎসবেরই কাল। তাই শরতের আগমনে বিশ্বপ্রকৃতিও হাসে, মানব প্রকৃতিও হাসে। তাই কবি বলেছেন—

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি
শরৎ তোমার শিশির ধোয়া কুন্তলে
বনের পথে লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় উঠে চঞ্চলি।

শরতের আগমনে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আনন্দের সাড়া পড়ে যায় কারণ বৎসরান্তে গিরিরাজদুহিতা আসছেন পিতৃগৃহে। তাই বাঙালী মাত্রেরই হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠে। আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষে জগৎমাতার অর্চনা শুরু হয়। তাই বাঙালীর কাছে দেবীপক্ষের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

কিন্তু শুধু যে বাংলাদেশেই দেবীপক্ষকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়, তা নয়। ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই দেবীপক্ষ অর্থাৎ আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে দশমী তিথি পর্য্যন্ত বিশেষ নিষ্ঠা সহকারে পালন করা হয়। দক্ষিণ ভারতে বাড়ীর মেয়েরা এইসময় প্রতিদিন মন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়ে আসেন ও পরিজনদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন। মহিশূর রাজ্যের এই সময়ে 'নবরাত্রি' উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও বাংলাদেশের দুর্গাপূজার মতই আড়ম্বরপূর্ণ।

উত্তর ভারতে এই সময় ছেলেমেয়েদের টেসুপূজা করতে দেখা যায়। দেবীপক্ষের প্রতিপদ থেকে অষ্টমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা টেসুর পূজা করা হয়। নবমীর দিন মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। পূজাস্থলে আটা দিয়ে দুটি সমান্তরাল লাইন তৈরী করা হয় ও তার উপরে ও নীচে পাঁচটি পাঁচটি গোবরের পিণ্ড রাখা হয়। এই পিণ্ডগুলির উপর খই ও বাতাসা দিয়ে সাজানো হয়। এই সময় মেয়েরা বাপের বাড়ী এলে ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে বাতাসা ও খই ভরে সাজায় এবং পরে সেগুলি বাড়ী বাড়ী বিতরণ করে।

বাজারে মাটির তৈরী টেসুর মূর্ত্তি কিনতে পাওয়া যায়। মাথায় পাগড়ী, বীরত্বব্যঞ্জক মুখভাব, ও দুটি হাত। শরীরের নিম্নাংশ নেই। তিনটি ছোট কঞ্চির টুকরা মূর্ত্তিটিকে দাঁড়াতে সাহায্য করে। ছেলেমেয়েরা বাজার থেকে টেসুর মূর্ত্তি কিনে এনে ঘরে স্থাপন করে। দেয়ালে ছবি কিনে এনে টাঙিয়ে দেয়। ছবির মধ্যস্থলে থাকে সালঙ্কারা সাধ্বীর মূর্ত্তি, পাশে পাশে থাকে ঝাঁটা হাতে

ব্রাহ্মণী, কাক, খোঁড়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মূর্তি। কোথাও কোথাও সাঝি ও টেসুর মাটির তৈরী মুখ, কনুই পর্য্যন্ত দুই হাত ও দুইপায়ের পাতা, আলাদা আলাদা কিনতে পাওয়া যায়। দেওয়ালের গায়ে রঙীন কাগজ কুঁচিয়ে ঘাঘরা তৈরী করে লাগানো হয় ও কিনে আনা শরীরের অংশগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হয়। পুঁতি ও রাংতার গহনা দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়।

এই টেসু ও সাঝি কে ছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। প্রবাদ টেসু পুরাণোক্ত রাজা বভ্রুবাহন ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করতে করতে ইনি নিহত হ'ন। কিন্তু যুদ্ধের পরিণতি দেখা না হওয়ার ক্ষোভ থাকায় শ্রীকৃষ্ণ এঁর মুণ্ড গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেন। সেই ভাবেই এঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয়। তদবধি সেই মূর্তিতেই এর পূজা হয়। মূর্তির নীচের কাঠি তিনটি গাছের ডালের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

টেসুর সম্বন্ধে কিছু জানা গেলেও সাঝির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কোথাও এঁকে টেসুর বোন হিসাবে, কোথাও বা প্রেমিকা হিসাবে পূজা করা হয়। অন্যান্য মূর্তিগুলি যথা কাণা কাক, খোঁড়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। পূজার সময় গীত সহযোগে আরতি ও তারপর ভোগ দেওয়া হয়।

নয়ে চাঁদ কী চাঁদনী ম্যায়নে টেসু কা মুখ দেখা থা
টেসু লায়া এক কলিড়ী, দো কলিড়ী লো বহুয়োঁ
তুম পহনো রি
হম ন পহনে এক কলিড়ি, দো কলিড়ি, বুলাও
হমারি ননদ কো
আও যে ননদ, বৈঠো পলঙ্ক মে, রস রস গীত
গবায়েঙ্গে,
থালি দেঙ্গে, জো সাঁঝি কো, লোটা, চুড়ী,
চড়ায়েঙ্গে,
তো সাঝি, তু বোলে চালে, লে মুশল ধমকায়েঙ্গে।

'নূতন চাঁদের জ্যোৎস্নায় আমি টেসুকে দেখেছিলাম। টেসু একটি, দুটি কলিড়ী নিয়ে এসেছে বৌ তুমি পর। আমি তো পরব না, ননদকে ডাক (সে পরবে) এস ননদ, পালঙ্কে বস, রসময় গান গাও আমরা সাঝীকে চুড়ী ও ঘটি দেব।' নূতন জ্যোৎস্নায় টেসুকে দেখার মধ্যে রোমান্টিকতার ছায়া পাওয়া যায়। কলিড়ী সম্ভবতঃ কোন গহনার নাম, বধূ সে গহনা পরতে রাজী নয় ও ননদকে দিতে চেয়েছে।

দ্বিতীয় গানে সাঝীকে নানারকম গহনা ও বস্ত্রাদিতে সজ্জিত করা হচ্ছে।

মেরি সাঝি তো মাঙ্গে পিলে পিলে গহনে
মঁা কহাঁ সে লাউ সাঝি পিলে পিলে গহনে
ম্যায় কঁহা সে লাউ সাঝি পিলে পিলে গহনে
ভইয়া মেরা সুনার কা সাথী
ম্যায় বঁহা সে লাউ সাঝি পিলে পিলে গহনে
তু লে মেরে সাঝী পিলে পিলে গহনে
মেরে সাঁঝী মাঙ্গে চিট্টে চিট্টে কপড়ে
ম্যায় কহাঁ সে লাউ সাঝি চিটে চিটে কপড়ে
ভইয়া মেরা বজাজ কা সাথী
ম্যায় বঁহা সে লাউ চিটে চিটে কপড়ে
তু লে মেরে সাঝি চিটে চিটে কপড়ে

"আমার সাঝি সোনার গহনা চাইছে। হায় আমি কোথা থেকে সোনার গহনা আনব।...উত্তরে পূজার্থী নিজেই বলছে আমার ভাই স্যাকরার বন্ধু। আমি সেখান থেকে সোনার গহনা আনব। সাঝি, তুমি গহনা নাও। পুনরায় বলা হচ্ছে—আমার সাঝি সুন্দর কাপড় চাইছে। হায়, আমি কোথা থেকে সুন্দর কাপড় আনব। আমার ভাই তাঁতীর বন্ধু আমি সেখান থেকে সুন্দর সুন্দর কাপড় আনব। সাঝী, তুমি সুন্দর সুন্দর কাপড় নাও।"

সাঝির জন্য সোনার গহনা ও সুন্দর সুন্দর কাপড় দেওয়ার পর টেসুর জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা হয়। টেসুকেও মখমলের কাপড় ও গহনায় সজ্জিত করা হয়। যথা—

ভাইয়া টেসুরে, তেরি লম্বী সি চোটি
বারি ভাইয়া রে, তেরি লম্বী সি চোটি
চোটি কে ওরে ধরে সুন্দরে রে,
লটকে হ্যাঁ উসমে মোতী
কুর্তা সিলাহু কিংখাব কী, মখমল কি টোপী
খানে কা করদু ভাইয়া দাল চাবল রে,
ব্যাগন সে রোটি

"ভাই টেসু, তোমার লম্বা চুলের বেণী, তার চারিদিকে ঝালর ও তাতে মুক্তা লাগানো। তোমার জন্য কিংখাবের জামা ও মখমলের টুপী করিয়ে দেব। তোমাকে ভাত ডাল ও বেগুনের তরকারী খাওয়াব।"

গৃহাগত নূতন বধূকে নিয়ে ব্যাঙ্গেরও অভাব নেই সম্ভবতঃ নূতন বধূ, টেসুরই বধূ এবং ননদ সাঝি ব্যাঙ্গাত্মক গান গাইছে।

লো বহু আই. ঝ মুখড়া,
নাক পকোড়া, মাথা চওড়া,..."

"দেখ, কী অপরূপ বউ এসেছে। বড়ির মত নাক, চওড়া কপাল; আহা, কী রূপের ঘটা।"

বাড়ীর ছেলেমেয়েরা মিলে গানগুলি গায়। তারপর আরতি হয় ও পরে প্রসাদ বিতরণ পর্ব্ব।

—

অপরাধ জগতে নারী

জয়শ্রী চক্রবর্তী

কোন একদিন

কোন একদিন হিজল গাছের তলায় ভূতুরে সন্ধ্যা নামতো। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যেত। জোনাকির আলো জ্বলতো। সারা গ্রামটা যেন সাঝ অন্ধকারেই থম্ থম্ করতো।

সেকেলে দিনের এমনি একটা গ্রাম। এমনি একটা দিন। নামটা বোধহয় সজলপুর। সেই সজলপুরের সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবার বলতে—সরকার বাড়ী ছিল বিখ্যাত। জম জমাট পরিবার হিসেবে—তাদের খ্যাতিটাও ছিল—সজলপুর ছাড়িয়ে আরো অনেক গাঁয়ে। সরকার বাড়ীর নাম ডাক যেন বাতাসের আগেও ছুটতো……

আর সেই শুনেই তো দূর গাঁয়ের বাসিন্দা হলধর দাস তার একমাত্র সন্তান পরমা সুন্দরী উমাকে বিয়ে দিয়েছিল—সরকার বাড়ীর বড় কর্ত্তা মতি সরকারের বড় ছেলে যতীনের সংগে। সেদিন উমার বাপের বুকে কি এক বুক জুড়নো সান্ত্বনা ছিল—হ্যাঁ, যেমন মেয়ে তেমনি ঘরে পড়েছে। তা ছাড়া যতীন তখনকার দিনে অনেক লেখাপড়া শিখেছিল ভাল চাকরী করতো শহরের মেসে থেকে। ছুটিতে আসতো বাড়ীতে।

নতুন বৌ উমার সংগে দেখা হোত—সরকার বাড়ীর নিরন্ধ্র রাতের অন্ধকারে। সারাদিনতো উমা থাকতো—শ্বশুর শাশুড়ী দেওর ননদদের ভীড়ের মধ্যে বন্দী হয়ে। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে—বোধহয় অন্ধকারেই চাঁদের মত সুন্দর মুখখানি লুকিয়ে থাকতো। সে সময় দিনে স্বামীর মুখ দেখা নাকি পাপ ছিল—সরকার বাড়ীর সতর্ক প্রহরার অভাব ছিলনা—ছোট্ট উমার জীবনকে ঘিরে। সরকার বাড়ীর বাইরে আর কোন জগৎ আছে কিনা—উমা তা জানতে পারেনি—তার দুঃসহ অবগুণ্ঠিত জীবনে। সকলের হুঁসিয়ারী দৃষ্টি—শাশুড়ীর প্রহরা—উমাকে যেন ভয়ে লজ্জায় পাথর করে রাখতো।

দিনে স্বামীর মুখ দেখা পাপ, ভয়ঙ্কর পাপ। বোধহয় এমনি একটা ভীষণ পাপ উমা করে ফেলেছিল কোন একদিন। নতুন বৌ, নেহাৎই ছেলেমানুষ মন, দুষ্ট স্বামীর ব্যাকুল ইশারা শুনে চুপি চুপি গিয়েছিল হিজল গাছের নীচে। দ্বিপ্রহরের কোকিলের ডাক শোনা যাচ্ছিল। বন কেতকীর গন্ধে—মাতাল হয়ে উঠেছিল বাতাস। বাড়ীর পেছনে চোরা জায়গায়—হিজল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে উমার যেন সব ভয় কেটে গিয়েছিল। যতীনের মুখে তখন চাপা মিঠে হাশি, চোখের চাউনিতে হয়ত অভিমান, শিহরিত হাতটা বাড়িয়ে প্রথমে উমার ঘোমটা খুলে দেয়। হিজল গাছের ওপর থেকে সেই পাখাটা ডেকে ওঠে—যার বিশ্রী স্বরে উমা ভয়ে চমকে উঠেছিল। শিউলির ডাল থেকে একরাশ ফুল ঝরে পড়লো—ঝুর ঝুর করে।

অনাবৃত অপরূপ একটি মুখের দিকে চেয়ে একটি মুগ্ধ বিবশ পুরুষের চোখ দুটো যেন প্রথমে স্থির হয়ে গেল। ইস, উমা এত সুন্দরী? অবগুণ্ঠিতা—অপরিচিতাকে সহসা সেই মুহূর্তের অনাবৃত অবকাশে লুব্ধ চোখে চেয়ে দেখতে গিয়ে যতীন থমকে গেল। তার উমা যেন সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা!

কই রাতের অন্ধকারে তো উমাকে সে এমন করে দেখতে পায়নি? আধো আলো, আধো অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে—শয্যাসঙ্গিনী উমাকে দেখেছে ছায়ার মত। শুধু একটা আবছাশরীর, অন্ধকারে লুকনো তার রূপ! শুধু একটা ছায়া শরীর মনকে নিয়ে খেলা করতে করতে—কখনো কোন রাত ভোর হয়ে যেত। সারা রাতের অবাক অনুভূতির মধ্যে উমার কত কথা শুনতো সে……কখনো একটি অনুযোগ—দুরন্ত অভিমানে ভেঙে পড়তো… ..তুমি শহরে চলে যাও…আমার খারাপ লাগে…কেমন যেন নিজেকে একা মনে হয়ে—কেন গো, আমায় নিয়ে যেতে পার না তোমার কাছে…

যতীন যেন একটু বোবা, অবরুদ্ধ কণ্ঠে গুমরে উঠতো। তারও কি ভাল লাগে, উমা যেন তার সমস্ত কিছু টেনে রেখেছে—দুর্বার আকর্ষণে। ছুটির ঘণ্টা পড়লেই—সজল-পুরের বউটার জন্যেই বোধহয়—যতীন পালিয়ে আসতো।

অবাক রাতে সব কেমন এলোমেলো—হয়ে যেত। দুষ্ট ছেলের বোবা বুকে···দুঃসাহসের মত একটা কথা বাজতো—উমাকে নিয়ে সে পালিয়ে যাবে···সজলপুরের গাঁ ছেড়ে···সেই শহরে। যেখানে যতীন থাকে। শুধু সে একা···তার উমা থাকেনা পাশে কি দুঃসহ একটা বোবা ব্যথা।

ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে উঠলেই—যতীন বলে বসতো বউকে—উমা তুমি পালাতে পারবে?

উমার চোখে নিদারুণ বিস্ময়—অবাক প্রশ্ন—মানে? পালাব মানে?

যতীন হেসে উঠে উমাকে বুকে টেনে নিয়ে বলতো— না না। কি বলছিলাম তুমি ঠিক বুঝলে না। মনে হয় মাঝে মাঝে। তোমার জন্য খুব মন কেমন করলে—ইচ্ছে হয়, তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাই আমি. যেখানে আমি একা পড়ে থাকি উমা। সব সময় শূন্য মনে হয় নিজেকে।

উমা যেন অন্ধকারে—স্বামীর নিবিড় ইচ্ছার মুখখানি শুধু দেখতে পেত। স্বামীর বুকের ভেতর জমে ওঠা একটি সাধ। অন্ধকারে বোধহয় কেঁদে উঠতো। উমা ছেলে মানুষের মত সেই সাধভরা বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলতো—সত্যি? হ্যাঁ গো সত্যি নাকি? সত্যি বলছো···আমায় তুমি নিয়ে যাবে তোমার কাছে?

সেই মুহূর্তে আবার বোবা হয়ে যেত যতীন। বউকে যেন বুকের সান্ত্বনায় ভরাতে গিয়ে অন্য কথায় ফিরে যেত। সহসা চোখের ওপর সরকার বাড়ীর গোঁরা পরিবারের অনুশাসিত ছবিটা, অন্ধকার রাতে—শ্বাপদের হিংস্র চোখের মত জ্বলে উঠতো। যতীন শিউরে উঠতো সেই দৃশ্য দেখে। ভোর হয়ে যেত···আলো ফোটবার আগেই উমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়···

বিকেলের ট্রেনে চলে যাবে বলেই না—শুধু একদিন যতীন দ্বিপ্রহরের সেই হিজল গাছের আড়ালে বউকে ডেকে-ছিল কাছে। সেই প্রথম। সেই প্রথম দিনের আলোয় দুজনে মুখোমুখী হওয়া।

উমা চোখ নাবিয়ে নেয়। আরক্ত মুখের রাঙা শিরাগুলো ফুলে ওঠে। সভয়ে, খুলে দেওয়া ঘোমটাটা, কাঁপা হাতে তুলে দেয় সিঁথির ওপর, যতীন বাধা দেয়।

উমা অবাক হয়ে গিয়েছিল। সত্যি সেদিন যেন স্বামীর কি হয়েছিল। উমার মনে হচ্ছিল, ছিঃ ছিঃ পুরুষ মানুষের লজ্জা, মান, ভয় বলে কিছু নেই? ছিঃ এই দিন দুপুরে—বউ এর ঘোমটা খুলে দিয়ে কেউ আবার মুখ দেখতে চায় নাকি—কাঙালের মত?

লজ্জার মরীয়া হয়ে যেন—উমা পালিয়ে আসছিল হিজল গাছের তলা থেকে—

ঠিক ঠিক সেই মুহূর্তে—উমা যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো কি দেখে, সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো, ভীত হরিণীর দু'চোখে গভীর ভীরুতা ফুটে উঠলো। এক পা-ও আর এগোবার সাধ্য নেই। তাহলে শাশুড়ী আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই দেখেছে? সরকার বাড়ীর নতুন বৌ এর—দিন দুপুরের ডাকাতি? মাথায় যখন উমার কাপড় ছিল না—তার কোমল হাতটিকে চেপে রেখেছিল, যতীন তার বজ্রমুঠির মধ্যে, যখন ভীষণ লজ্জা পেয়েও উমা সরে যায়নি—বেহায়া স্বামীর কাছ থেকে উমা যেন আবেশে আকুলতায় ঝরা বকুলের মত ঝরে পড়েছিল—একটি সবল স্নেহসিক্ত বাহুর ওপর, তারপর? তারপর?

সব কি তাহলে দেখেছে সরকার বাড়ীর দজ্জাল গৃহিণী, চোরের মত পা টিপে আড়ালে দাঁড়িয়ে? উমার তখন চেঁচিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, স্বামীর দিকে ফিরে যা নয়—তাই বলতে ইচ্ছে করছিল···কিন্তু তার আগেই, দুটো অশক্ত পা নিয়ে ধীরে ধীরে চলে আসতে হয়েছিল শাশুড়ীর সংগে···

তারপর যতীন শহরে চলে যাবার পর, উমার ওপর ভীষণ অত্যাচার সুরু হয়ে গেল। শুধু, একটি পাপ! আর এমন শাস্তি বোধহয় আরো ভয়ঙ্কর! ষোড়শী সেই নববধূ, সেই প্রথম সে সরকার বাড়ীর আসল চেহারাটা দেখলো। শ্বশুর বাড়ীর সকলেই পালা করে—উমাকে

নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগলো। এক সময় উমা পাগল হয়ে উঠলো।

দিন গুণতে থাকে—স্বামী আবার কবে বাড়ী আসবে। তাহলে, সে চুপি চুপি সরকার বাড়ীর নিদারুণ অত্যাচারের কথা বলে দেবে। কিন্তু ছুটির সময় এগিয়ে এলে শ্বশুর মতি সরকার ছেলেকে চিঠি লিখে বাড়ী আসতে নিষেধ করতো নানান অজুহাত দেখিয়ে। যতীনও বাপ মার বাধ্য ছিল—এবং ভয়ও করতো সরকার বাড়ীর এই দুটি মানুষকে। তবু, এসব ছাড়াও, একটা মন যেন কিসের খোঁজে সজলপুরের কোন বোন অন্ধকারে রাতের ইশারায় চমকে উঠতো।

উমাও যেন অনেকগুলো ছুটির দিন অন্ধকার রাতের শূন্য ঘরের খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে, সেই হিজল গাছের নীচে চেয়ে কি যেন খুঁজতো। জোনাকির আলো জ্বলতো। ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যেত। অতন্দ্র নিঃশ্বাসে উমার শূন্য রাতগুলো কেটে যেত—

কত ছুটি গেল যতীন এলোনা। বাড়ীর সকলের অত্যাচারে উমা একদিন চুপি চুপি পরামর্শ করলো বাড়ীর চাকর রামের সংগে। বাবার দেওয়া দামী এক ছড়া গলার হার দেখিয়ে রামকে শেষ পর্যন্ত রাজি করায়—ভোর রাত্রের সুযোগে—তারা বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবে। রাম তাকে পৌছে দেবে—শহরে স্বামীর কাছে। কেউ জানবে না। স্বামীর কাছে একবার যদি যেতে পারে—তাহালে আর কোন কষ্ট থাকবে না উমার।

সত্যিই ভোর রাত্রে ওরা বের হোল চুপি চুপি। ষ্টেশনে প্রায় পৌছে গেছে ইতিমধ্যে সব জানাজানি। ভোরেই বেতী গয়লানী দেখেছে মতি সরকার বাড়ীর যুবতী বউ জোয়ান চাকরটার সংগে—ষ্টেশনের পথ দিয়ে পালাচ্ছে···

মুহূর্তে ঘটনার বিস্তৃতি ঘটলো। মতি সরকার গ্রাম শুদ্ধ লোক নিয়ে দৌড়ে এলো ষ্টেশনের দিকে। শহরের ট্রেণ প্রায় এসে গেছে। রাম দূর থেকে—লোকজনকে আসতে দেখে—দৌড়ে পালিয়ে গেল ভয়ে। উমা তখন ষ্টেশনে একলা দাঁড়িয়ে।

লোকজন সব ঘিরে ধরলো উমাকে। হাতে নাতে অপরাধিনীকে ধরতে পেরে মতিসরকার নিজেই হুকুম দিল গ্রামের লোকদের—যাতে সবাই পালা করে—উমাকে মেরে গ্রামের কলঙ্ক ভঞ্জন করে। তখনকার দুর্ধর্ষ একদল মানুষ—মতি সরকারের পোষা অনুগত লোকগুলো—যা করলো অবর্ণনীয়।

এ কাহিনী সত্য কিন্তু অবিশ্বাস্য! অবলা নারীর ওপর পাপের কলঙ্ক চাপিয়ে—যে ভয়াবহ অত্যাচার করেছিল গ্রামের লোকেরা—মতি সরকারের নির্দেশে তার তুলনা নাই বর্বরতার ইতিহাসে।

অবশেষে উমার অচৈতন্য রক্তাক্ত দেহটাকে হারাণ মণ্ডল নামে একটি লোকের হাতে তুলে দেওয়া হোল। যেন নদীতে ঠিকমত ফেলে দেওয়া হয়। এই ভাবে গ্রাম কলঙ্কিনীর কলঙ্ক ভঞ্জন হোক···

উমার আহত জ্ঞানহীন দেহটাকে কাঁধে ফেলে—হারাণ এলো বিলাস নদীর তীরে······নদীতে যেন সেদিন জল থই থই করছিল······এপার ওপার দেখা যায় না। কিছু দূরে একটা নৌকা বাঁধা ছিল। আবুল মাঝি পাটাতনের ওপর বসে হুঁকোর ধোঁয়া ছাড়ছিল।

হারাণ গিয়ে—জানালো, পাপীয়সীকে যদি মাঝ দরিয়ায় ফেলে দেওয়া যায়—তবে ভাল হয়। ধারের জলে ফেললে, হয়তো বেঁচে উঠে আসতে পারে। বরং নৌকায় করে নিয়ে গিয়ে মাছ গাঙে ফেলে দেওয়া হোক।

মাঝির মনে কি হয়েছিল যেন। সাগ্রহে সে উমার দেহটাকে পাটাতনের ওপর রাখতে বললো। হারাণকে আশ্বাস দিল—মাঝ জলে ফেলে দেবে কলঙ্কিনীকে।······

বিলাস নদীতে ভেসে চললো নৌকা। মাঝদরিয়া পার হয়ে যায়। জল কেটে কেটে আবুল মাঝি সজলপুরের গ্রাম সীমানা পেরিয়ে যায়····· কোন ঘাটে যেন তরী বেঁধেছিল। বুড়ো মাঝির দয়ার প্রাণ ডুকরে কেঁদে উঠলো অবলা নারীর দুর্দশা দেখে। জলের ঝাপ্টা আর পাখার বাতাস দিয়ে দিয়ে উমার জ্ঞান ফেরায়। আস্তে আস্তে তাকে সুস্থ করে তোলে······

এমনি করে দু তিন দিন কেটে গেল······উমা ভাল হয়ে উঠলো। আবুল মাঝিকে সবই বললো সে। অনুনয় করলো—যার কাছে যাবে বলে সে এমন ভাবে কষ্ট পেয়েছে—তার কাছেই অর্থাৎ স্বামীর কাছে যেন পৌছে দেওয়া হয়······

বুড়ো মাঝি উমাকে নিয়ে গেল—যতীনের কাছে। অনেক কষ্ট করে পথ ঘাট চিনে "সতী নারীকে" যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে সুকৃতি করতে চেয়েছিল—খোদার কাছে।

কিন্তু উমা যখন স্বামীর কাছে গেল—তখন যতীন অন্য মানুষ। ইতিমধ্যে মতি সরকার সব জানিয়ে—ছেলেকে চিঠি দেয় এবং এও জানায় কুলাঙ্গিনীকে নদীর অকুল কূলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ……

উমা কাঁদতে কাঁদতে বললো—আমি মরিনি গো। ভগবান্ আমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে তোমার কাছে…

কঠিন নির্মম সেই মূর্তি! যতীন বললো—যদি না মরে থাক আবার বিলাস নদীতে ডুবে পাপ মোচন কর। তোমার মত কুলটাকে তো আর স্থান দেবার অধিকার আমার নেই! নিজের পাপ নিজেই মোচন কর। আমাকে আর ফিরে পাবে না তুমি……

সারা শরীর কেঁপে উঠলো উমার……আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো, বোঝাতে চাইল—সব মিথ্যে কলঙ্ক—সেও তোমার জন্যে পেয়েছি এ কথা বুঝলে না তুমি…… আমি যে তোমার উমা, আমাকে বিশ্বাস কর—আমাকে রক্ষা কর—আমাকে বাঁচাও তুমি……

নির্দয় স্থির বিশ্বাসে অটল—নির্দয় একটি মানুষের হৃদয় উমার শত কান্নার অভিভূত হোলনা। বরং আরো কঠিন আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো যতীন…কোথা দিয়ে যেন সহসা বাজ পড়লো

সতী নারীর নম্র সৌন্দর্য জ্বলে উঠলো অঙ্গারের মত। ধুলোয় লুটিয়ে পড়লো আঁচল। … বাতাসের ভারে সমস্ত চুল উড়তে লাগলো… সিঁথি থেকে পড়ে গেল অবগুণ্ঠন… দৃষ্টিতে জিঘাংসার রক্তলোলুপ ছায়া। একি হয়ে গেল উমা? তার সমস্ত সতীত্ব অবমাননায়—অবহেলায়—অত্যাচারে এমনি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো।…

এক মুহূর্তে দৃশ্য বদলে গেল। হিংস্র শ্বাপদের মত উমা ঝাপিয়ে পড়লো নিষ্ঠুরতার সেই প্রতিমূর্তির ওপর। সহসা ধাক্কা খেয়ে যতীন পড়ে গেল মাটিতে। উমা তখন ভূলুণ্ঠিত মানুষটার গলা চেপে ধরলো দু'হাতে। সমস্ত শক্তি সমস্ত মান অভিমান প্রেম এবং প্রতিহিংসা একটি নির্মম আদিমতার মধ্যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো…

নিষ্ঠুর প্রতিশোধ স্পৃহা! দুঃসহ বেদনার বিচিত্র প্রকাশ। উমাকে চেনা যায় না। শক্তির সংহার রূপে তাকে উন্মাদিনীর মত মনে হোল।

ছুটে এলো অনেক মানুষ। সবাই হতভম্ব! এক বীভৎস নারী হত্যাকারিণীর হাতে—একটি পুরুষের মৃত্যু আয়োজন। উমাকে সকলে মিলে ধরে ফেললো। কি সেই মুহূর্তে সে অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে যতীন মুক্তি পেলো আহত অবস্থায়…

ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে আছে উমা। বিলাস নদী অকূল কূলে যে হারাতে পারেনি—সে স্বামীর কাছে এসে সব হারার শোকে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমন্ত উমার কি আশ্চর্য শান্ত রূপ।

এই নাটকীয় অপরাধ কাহিনীর নায়িকার বিচা পর্বটি ইহলোকের আদালতে হোল না। উমা সেই ঘুমলো আর উঠলো না!

আজও সজলপুরের হিজল গাছের নীচে সাঝ অন্ধকারে কারো অতৃপ্ত আশা ঘুরে ফিরে কাঁদে কি না কে জানে সরকার বাড়ীর অভিশপ্ত আত্মা আজও অনুতপ্ত নয় সজলপুরের প্রতিটি মানুষ—আজও আনন্দে বিস্ময়ে শিহরিত হয় গ্রাম কলঙ্কিনীর সেই সহসা মৃত্যুবরণে।

কিন্তু বিলাস নদীর পাড় ভাঙা জলের ধারে—অশীতি পর একটি বৃদ্ধ কতদিন যেন স্মৃতি মন্থন করেছিল?—খোদার দরবারে চেয়েছিল—সজলপুরের মানুষের বিচার সতী নারীর স্বর্গ শান্তির জন্য বুড়োকেও যেন সবাই কাঁদতে দেখতো……

স্বপর্ণা দেবী

একালে আমাদের দেশের মেয়ে-মহলে স্বগন্ধি তেল, সাবান, স্নো, ক্রিম, পমেড, পাউডার আর সৌখিন সুর্মা, কাজল, মাস্কারা এবং নানান্ ছাঁদের তিলক-চিহ্ন ব্যবহারের যে ব্যাপক রেওয়াজ নজরে পড়ে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজেও বিলাস প্রসাধন কলার সে রীতির অনুশীলনের ব্যতিক্রম ছিল না—পুরানোকালের কাব্য সাহিত্য ইতিহাসে ও ভাস্কর্য্য-শিল্পে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন আমলে ভারতের সৌখিন নরনারীদের মধ্যে নানা ধরণের চন্দন অনুলেপনের সবিশেষ আগ্রহ অনুরাগ ছিল। কারণ, দেহে চন্দন অনুলেপনের বিশিষ্ট উপকারিতা হলো—লঘু, স্নিগ্ধ, আর্দ্র স্নেহ-জাতীয় সুগন্ধি ত্বক-চর্ম্মে মেখে রাখার ফলে, দাহগ্রাহি আর সুখস্পর্শানুভূতি ছাড়াও, শারীরিক শুচিতা, স্বাস্থ্যোন্নতি ও মানসিক প্রফুল্লতা লাভ করাও সম্ভব হয় অনেকখানি। প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ মনীষী কৌটিল্যের রচিত 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের (দ্বিতীয় খণ্ড, একাদশ অধ্যায়, কোষপ্রবেশ, রত্ন-পরীক্ষা) প্রসঙ্গালোচনা-ক্রমে নিম্নলিখিত ১৬ প্রকার চন্দন অনুলেপনের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

১। চন্দন
২। গোশীর্ষক
৩। হরিচন্দন
৪। তার্নস
৫। গ্রামোরুক
৬। দৈবসেভয়
৭। জাপক
৮। জোঙ্গক
৯। তৌরূপ
১০। মালেয়ক
১১। কুচন্দন
১২। কালপর্ব্বতক
১৩। কোশাগার
১৪। শীতোদক
১৫। নাগপ পার্ব্বতক
১৬। শাখন

এই সব চন্দনের মধ্যে 'তৈলপর্ণিক' অর্থাৎ তৎকালীন 'তিলপর্ণ-পর্ব্বতে উদ্ভূত চন্দন অথবা হরিচন্দনের আরো একটি বিশেষ গুণ ছিল যে সে-চন্দন দাহ করলেও তার সুবাস নষ্ট হতো না। প্রাচীন শাস্ত্রে এই 'তৈলপর্ণিকেরও' আবার গুণাগুণ হিসাবে নিম্নলিখিত দশ প্রকার শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

১। অশোকগ্রামিক
২। জোঙ্গক
৩। গ্রামেরুক
৪। সৌবর্ণকুড্যক
৫। পূর্ণকদ্বীপক
৬। ভদ্রশ্রীয়
৭। পারলৌহিত্যক
৮। আন্তরপত্য
৯। কালেয়ক
১০। উত্তর পর্ব্বতক

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বিবিধ প্রকারের এই সব চন্দনই ছিল অনুলেপনের প্রধান উপকরণ। তখনকার দিনে রাজা-প্রজা—সমাজের বিলাসী সৌখিন সকল নর-নারীই অঙ্গরাগ প্রসাধনে চন্দন অনুলেপনের অনুরাগী ছিলেন। কাজেই চন্দন ব্যবহারের রীতি তখন প্রকাশ্য ভাবেই সুপ্রচলিত ছিল। এমন কি, রাজসভাতেও রাজারা যে তখন চন্দন অনুলেপনে দেহ-সজ্জা করতেন, সে বর্ণনাও পাওয়া যায় প্রাচীন মহাকবি কালিদাস রচিত সুবিখ্যাত 'রঘুবংশ' কাব্যের বিশিষ্ট একটি ছত্রে। যথা—

"চন্দনেনাঙ্গরাগঞ্চ মৃগনাভিসুগন্ধিনা।
সমাপয্য ততশ্চক্রুঃ পত্রং বিন্যস্তরোচনম্ ॥"

তাছাড়া পুরাকালে ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পোষাক পরিচ্ছদের বাহুল্য না থাকায়, তখনকার বিলাসী সৌখিন সমাজে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বক্ষোদেশে চন্দন অনুলেপনের বিচিত্র অঙ্গরাগ রীতি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও কলাশিল্পের নিদর্শনগুলিতেও এরীতির প্রচুর পরিচয় মেলে এবং মহাকবি কালিদাস রচিত সুপ্রাচীন 'রঘু-বংশ' এবং 'ঋতু-সংহার' কাব্যে প্রসঙ্গক্রমে তারও সবিশেষ উল্লেখ আছে। যথা—

[পুরুষ] "পাণ্ড্যোঽয়মংসার্পিতলম্বহারঃ
ক্লৃপ্তাঙ্গরাগো হরিচন্দনেন।"
(রঘু-বংশ, ৬-৬০)

[স্ত্রী] "পয়োধরাশ্চন্দনপঙ্কশীতলাস্তুষারগৌরার্পিতহার-
শেখরাঃ।"
(ঋতু-সংহার, গ্রীষ্মবর্ণন)

তখনকার দিনে ভারতীয় সমাজে বিলাসী সৌখিন নর-নারীদের মধ্যে অঙ্গরাগ প্রসাধনকালে চন্দনের সঙ্গে অগুরু, মৃগনাভি প্রভৃতি নানারকমের সুগন্ধি উপকরণাদি মিশ্রিত করারও রীতিমত রেওয়াজ ছিল। অগুরু ব্যবহারের বিশিষ্ট উপকারিতা হলো—গুরুত্ব, স্নিগ্ধত্ব, পেলবত্ব, সুদীর্ঘ স্থায়ী সৌরভ, অটুট অক্ষুণ্ণ রাখা এবং শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রফুল্লতার উন্নতিসাধন। তাছাড়া অগুরু ব্যবহারের আরো একটি গুণ—অগ্নিদাহে সুবাসিত ধূমোদ্গারণ ও বহু-মর্দনে অঙ্গানুলেপন দেহচ্যুত না হওয়া। কাজেই অঙ্গরাগ প্রসাধনকলার এ রীতিটির সম্বন্ধেও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পুরাকালের বিলাসী সৌখিন সমাজের সকলেই সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এছাড়া কুঙ্কুমও ছিল সেকালের নর-নারীদের অঙ্গরাগের অন্যতম প্রধান উপকরণ—পুরাতন পুথি-পত্রে তারও যথেষ্ট পরিচয় মেলে। গাত্র-ত্বক বর্ণোজ্জ্বল ও মনোরম শোভাময় করে তোলার উদ্দেশ্যে, সেকালের সৌখিন সমাজে হরিদ্রা ব্যবহারের রীতিও সুপ্রচলিত ছিল।

আপাততঃ, এ পর্য্যন্তই। আগামী সংখ্যায় প্রাচীন ভারতীয় প্রসাধন কলার আরো কয়েকটি রীতির পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

টেবিলন্যাপ্‌কিনের সুদৃশ্য নকসা

হিরণ্ময়ী দেবী

বাড়ীতে অতিথি-অভ্যাগতজনেরা এলে, তাঁদের চা-জলখাবার পরিবেষণে সমাদর-পরিতৃপ্তি সাধনের সময় টেবিলের উপর সুদৃশ্য-সৌখিন সূচীশিল্পের বিচিত্র-নক্সাদার টেবিল-ন্যাপ্‌কিন সাজিয়ে রাখার আজকাল খুবই রেওয়াজ হয়েছে। এবারে তাই তেমনি ধরণের সময়োপযোগী ও সরল-সুন্দর ছাঁদের একটি ফুল-পাতার নক্সাদার টেবিল-ন্যাপ্‌কিন সূচীশিল্পকাজের নমুনা প্রকাশ করা হলো। সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে যে সব সুগৃহিণী নিজেদের হাতে সূচীশিল্প-চর্চ্চা করতে ভালবাসেন, এ নক্সা-নমুনাটি হয়তো তাঁদের দরকারে লাগতে পারে।
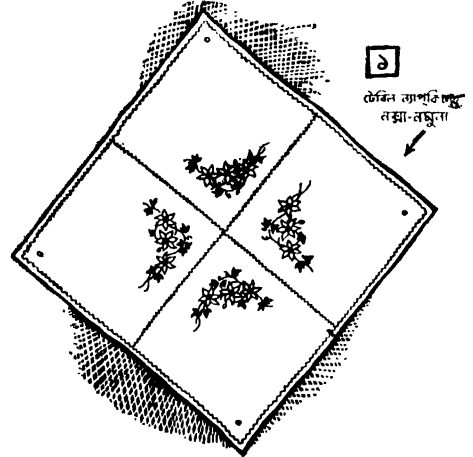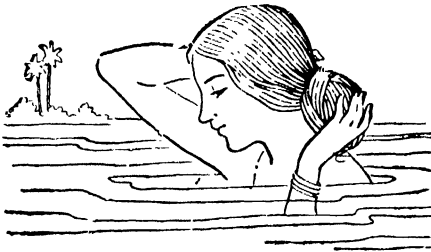
উপরে ১নং চিত্রে ফুল-পাতার যে আলঙ্কারিক নক্সা-নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সূচীশিল্পের কাজ করে লিনেন (Linen), খদ্দর, দো-সূতী প্রভৃতি মোটা-ধরণের কাপড়ে সেটিকে সহজেই সুচারু-ছাঁদে ফুটিয়ে তোলা যাবে।

সূচীশিল্পীর পছন্দমতো রঙীন-কাপড়ের বুকে যথাযথ ভাবে এ নক্সা রচনার সময়, প্রথমেই পেন্সিলের রেখা টেনে নমুনাটিকে পরিপাটি-ছাঁদে একখানা মাপ-অনুযায়ী কাগজের উপরে এঁকে নেওয়া দরকার। তারপর সূচীশিল্পের কাপড়ের উপর একখানা 'কার্ব্বন-পেপার' (Carbon-paper) বিছিয়ে সেই কার্ব্বন-কাগজের উপর নক্সা-আঁকা কাগজখানি রেখে পেন্সিলের সাহায্যে 'ডিজাইনটিকে' (pattern-design) আগাগোড়া নিখুঁত ছাঁদে 'ট্রেসিং' (tracing) করে নিতে হবে।

নক্সা টি 'ট্রেসিং'-এর সময় ১৯″ ইঞ্চি মাপের চৌকোণা কাপড়ের চারদিকের প্রান্তভাগে প্রত্যেকটি 'কোণ' (corner) থেকে ২½″ ইঞ্চি অংশ দূরত্বে রেখে ফুল-পাতার গুচ্ছটির ছাপ এঁকে নেওয়াই ভালো।

এইভাবে কাপড়ের উপর নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে নক্সাটিকে আগাগোড়া 'ট্রেসিং' করে নেবার পর, পছন্দমতো ও মানানসই বিভিন্ন রঙের দেশী মিহি-মোলায়েম এমব্রয়-ডারী-সূচীশিল্পের সুতো (fine mercerised Embroidery thread) দিয়ে সেলাইয়ের কাজ সুরু করতে হবে।

প্রসঙ্গালোচনার সুবিধার্থে ধরে নেওয়া যাক্ যে ফুল পাতার নক্সাদার টেবিল-ন্যাপ্‌কিনটি বানানো হবে—শাদা-রঙের 'লিনেন' বা 'দো-সুতী' জাতীয় কাপড়ের উপর। কাজেই বিভিন্ন রঙের 'এমব্রয়ডারী-সুতোর সাহায্যে সূচীশিল্পের কাজ করে ফুল-পাতার নক্সা-নমুনাটিকে সুদৃশ্য-সৌখিন ছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে হলে—ফিকে-বেগুনী (pale mauve) রঙের সুতোয় ফুলের প্রত্যেকটি পাপড়ি 'সাটিন-ষ্টিচ্' (satin-stitch) প্রথায় সেলাই করবেন। পাপড়িগুলি কি ভাবে এমব্রয়ডারী করবেন নীচের ২নং ছবিতে তার মোটামুটি হদিশ দেওয়া হলো অর্থাৎ, ফুলের পাপড়িগুলির প্রান্ত-সীমার সরু অংশ থেকে সুরু করে ক্রমান্বয়ে যতই চওড়া-অংশের দিকে অগ্রসর হবেন, উপরোক্ত ছবিতে দেখানো সাটিন্ ষ্টিচ পদ্ধতিতে সেলাইয়ের ফোঁড়-তোলার কাজও সেইমতো 'উপর-থেকে-নীচে আগাগোড়া 'পাশাপাশি এবং 'সমান লাইনে (straight across from side to side) সুষ্ঠু-পরিপাটি ভাবে রচনা করে যাবেন। ফুলের প্রত্যেকটি পাপড়ির মাঝখানে কালো-রঙে চিহ্নিত অংশ এমব্রয়ডারী করবেন—অপেক্ষাকৃত গাঢ় ধরণের বেগুনী (deeper shade mauve embroidery thread) রঙের সুতোয় ও 'সাটিন-ষ্টিচ্ সেলাই পদ্ধতিতে। ফুলের গোল আকারের কেন্দ্রাংশ (Flower-centres) রচনা করতে হবে—ফিকে হলুদ (pale-yellow) ও কালো (Black) রঙের এমব্রয়ডারী সুতো দিয়ে। পরাগ রেণুর অংশ বানাতে হবে 'সাটিন ষ্টিচ' এবং বাইরের অংশ রচনা করবেন ছোট ছোট সমান রেখায় 'straight stitch' সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে। ফুলের চওড়া ডাটাগুলি রচনার জন্য—একদিকের অংশ গাঢ় সবুজ (dark green) এবং অন্যদিকের অংশ সেই রঙের সঙ্গে মানানসই দেখায়—এমন ধরণের মাঝারি সবুজ (medium green) রঙের এমব্রয়ডারী সুতো ব্যবহার ও 'সাটিন ষ্টিচ' সেলাইয়ের কাজ করতে হবে। কচি ডাটাগুলিকে বানানোর জন্য—মানানসই-ধরণের 'ফিকে-সবুজ (light green) রঙের এমব্রয়-ডারী-সুতো বাছাই করে নেবেন। পাতাগুলি রচনা করবেন 'ফিকে-সবুজ' (light green) রঙের সুতোয় এবং পাতার শিরা বানানোর জন্য বেছে নেবেন—'গাঢ়-সবুজ' (deep green) রঙের এমব্রয়ডারী-সুতো। পাতা রচনার কাজ করতে হবে—'সাটিন ষ্টিচ' পদ্ধতিতে—পাতার মধ্যভাগের শিরা থেকে দুদিকে কোণাকুণি ছাঁদে সেলাই-য়ের ফোঁড় তুলে। ফুলের কুঁড়ি বাইরের অংশ বানাবেন 'ফিকে-সবুজ' (light green রঙের সুতোয় এবং ভিতরের অংশটির জন্য বেছে নেবেন ম্লান-গোলাপি (dull pink) রঙের এমব্রয়ডারী-সুতো। ন্যাপকিনের চারি-দিকের কিনারায় যে পাড়ের নক্সা রয়েছে, মানানসই-রঙের সুতো দিয়ে 'ফেদার-ষ্টিচ' প্রথায় সেলাই করে নিলে সহজেই সে কাজটুকু সারা যাবে।

এ প্রথায় কাজ করলে, সহজেই নিজের হাতে সূচী-শিল্পের কাজ করে সুচারুরূপে উপরের নক্সা-নমুনার ছাঁদে সুদৃশ্য-সৌখিন 'টেবিল-ন্যাপ্‌কিন' বানিয়ে তুলতে পারবেন।
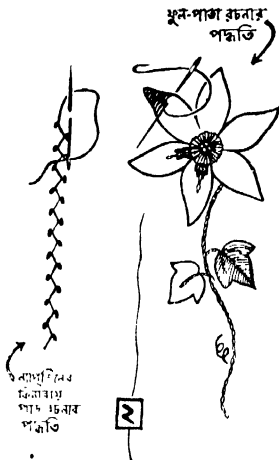
মাসিক রাশিফল

শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য

অগ্রহায়ণ মাসের ফল

৺বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা ফলিত জ্যোতিষ আলোচনার পুনরাবৃত্তি করছি। গত আশ্বিন সংখ্যায় আমরা মঙ্গল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এবারে মঙ্গল সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করলাম।

মঙ্গলের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার স্বীকরণ শক্তি। ঐ শক্তিবলে তিনি পরকে আপন করে নিতে পারেন। তিনি মিশুকে; আশ্রিতজনের প্রতি সহানুভূতিশীল ও উপকারী। তার মহৎ অন্তর—কোনরূপ নীচতা নেই। তার মন উদার প্রকৃতির—জাতীয় স্বার্থ বিরোধী প্রাদেশিকতার বিষবাষ্পে পরিপূর্ণ নয়। মঙ্গলের বিশিষ্ট উদারতাই সকলকে পথ দেখিয়ে চন্দ্রাতপ সদৃশ উন্মুক্ত নির্মল আকাশতলে নিয়ে যেতে পারে এবং সকলকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে।

মঙ্গল উদ্যম ও শক্তির প্রতীক এবং কর্ম-প্রচেষ্টার কারক। কর্ম প্রচেষ্টার নামান্তরই পুরুষকার। পুরুষকারের জন্য চাই দৃঢ় মনোবল বা বলিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তি ও অবিচল উদ্যম। এ শক্তি ও উদ্যম দান করেন মঙ্গল। শক্তি ছাড়া সমস্ত জীবই নিস্তেজ ও কর্মশক্তি-হীন হয়ে পড়ে। স্থূল জগতে উদ্যম ও শক্তির সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। মঙ্গলের অদম্য উদ্যম ও অমিত শক্তিবলে মঙ্গলের জাতক সীমাহীন মহাশূন্যে উড়ে, দিগন্ত-প্রসারী নীল সমুদ্র-বক্ষে পাড়ি জমিয়ে, অথবা অতল সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করে, গভীর জঙ্গলে হিংস্র পশুর সম্মুখীন হয়ে, তুষারাবৃত মেরু-প্রদেশে দুর্জয় অভিযান চালিয়ে, দুর্লঙ্ঘ্য বিস্তৃত বালুকাময় মরুভূমি পার হয়ে, দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে কিংবা জীবন তুচ্ছ করে উত্তুঙ্গ পর্বত শিখরে আরোহণ করে কত কি আবিষ্কার করতে পারেন এবং বহু অসাধ্য সাধন করে দেশের ও দশের কত উপকার সাধন করতে পারেন। কাজেই যার জন্ম সময়ে মঙ্গল শুভ কিরণ বর্ষণ করেন, তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় জীবন যাপন করে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে কত কীর্তি রেখে যেতে পারেন এবং সেই সঙ্গে নিজের জীবনকেও গৌরবোজ্জ্বল করে তোলেন।

মঙ্গলের শক্তি যদি জাতকের মধ্যে শুভ পথে চালিত হয়, জাতক মঙ্গলের শক্তি ও উদ্যমকে সদ্ব্যবহার করে জীব কল্যাণে ব্যয়িত করতে পারেন এবং দুর্বলকে সবলের অত্যাচার হতে রক্ষা করতে পারেন। সুতরাং আর্তের সেবা, ক্ষুধিতকে অন্নদান, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান, গৃহহীনে গৃহদান অনাথকে আশ্রয়দান এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ও বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্য পাঠানো প্রভৃতি সমস্ত সমাজকল্যাণকর কর্ম এবং সর্বপ্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে অমিত বিক্রমে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি মঙ্গল হতে অনুমান করা যায়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মঙ্গলের মনে গভীর রেখাপাত করে থাকে; এটি তার চরিত্রের একমাত্র দুর্বলতা। কিন্তু সে দুর্বলতার মধ্যেও তার নিজের সত্তা অক্ষুন্ন থাকে। তার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য-সত্তার উপলব্ধি আছে। ঐ উপলব্ধি তার স্বভাবজাত। ষড়ঋতুর রূপবৈচিত্র্য তার মনে দোলা দিতে পারে না। বরং তাদের স্বভাব-ধর্ম তার মনকে আকৃষ্ট করে। যেমন উত্তাপই গ্রীষ্মের বৈশিষ্ট্য, দহন ও দীপ্তি তার ধর্ম, বর্ষণই বর্ষার প্রকৃতি, অশনিপাত ও বিদ্যুৎ-ঝলক তার আগমন বার্তা: শরতের শোভা—অনাবিল জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ স্নিগ্ধ মায়াময় সূর্যালোক তার সুস্পষ্ট রূপ। আর হেমন্তের

মধ্যে আছে একটা প্রশান্তি ও উদাসীনতার সুর; শীতের আছে তুহিন শীতলতা এবং ঋতুরাজ বসন্ত প্রাণ চেতনার সঞ্জীবনী সুধা। আবার মঙ্গল বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মহাকালের প্রলয়-লীলা এবং অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে নটরাজের তাণ্ডব-নৃত্য দেখতে পান। তিনি কৃত্রিম সৌন্দর্যের পক্ষপাতী নন। কারণ যা স্বভাব-ধর্মবিরোধী তা কখনও প্রাণবন্ত হতে পারে না।

মঙ্গল উদ্যমশীল, আলস্য কাকে বলে তিনি জানেন না। তিনি কর্মঠ; যে সব কাজে উদ্যম ও শক্তির প্রয়োজন তিনি সে সব কাজ চান। দার্শনিক ও অধ্যয়নশীলদের তিনি করুণার চোখে দেখে থাকেন। যদি মঙ্গলের শুভ প্রভাব জাতকের ওপর ক্রিয়া করে, জাতকের সব কাজকর্মে মঙ্গলের গুণ প্রকাশ পাবে। যদি মঙ্গলের জাতক ছবি আঁকেন, তিনি যুদ্ধের দৃশ্য, শিকারের ছবি এবং শক্তিমত্তার পরিচায়ক খেলাধূলা ও ব্যায়ামের ছবি আঁকবেন, যদি তিনি বই পড়েন যুদ্ধের কাহিনী পড়বেন; যদি তিনি সঙ্গীত চর্চা করেন—এমন সব গান পছন্দ করবেন যাতে যুদ্ধের উন্মাদনায় রক্তকে নাচিয়ে তোলে। বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি লম্বা লম্বা বাক্য ব্যবহার করে যুদ্ধের ও শক্তিমত্তার বক্তৃতা দিতে ভালবাসেন সুতরাং গায়ক, সুরকার, ভূভাগের চিত্রকর, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক নেতা—মঙ্গলের জাতক।

অশুভ মঙ্গল জীবের মধ্যে পশু-প্রকৃতি। সমস্ত পশু প্রবৃত্তি, কামনা—বাসনা, লোভ, ইন্দ্রিয়লালসা ও ক্ষুধা অশুভ মঙ্গলের ক্রিয়া। মঙ্গলের অশুভ প্রভাবে জাতক স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দেন; ইন্দ্রিয় ভোগে উন্মত্ত হয়ে সদসৎ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেন।

যখন মঙ্গলের পশু শক্তি পূর্ণ মাত্রায় জাতকের ওপর কর্তৃত্ব করে তখন জাতক পশুত্ব প্রাপ্ত হন এবং ভীষণ প্রকৃতির বন্যস্বভাব হয়ে ওঠেন। যখন মঙ্গল জাতকের পক্ষে অশুভ গ্রহ হয়ে ওঠেন তখন তার মধ্যে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ও স্বার্থ-ভোগ প্রবল হয়ে ওঠে এবং তার জীবনের সমস্ত কাজকর্ম এই একই উদ্দেশ্যে চালিত হয়; নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি নিষ্ঠুর হীন ও কদর্য কার্য সাধন করেন।

অশুভ মঙ্গল স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী। তিনি অন্যের অনুভূতি ও অধিকার গ্রাহ্য করেন না। অশুভ মঙ্গল ধনলোলুপতাবশতঃ ধনীর অজ্ঞাতসারে তাকে মন্দ ক্রিয়াশীল অথবা ক্ষিপ্র ক্রিয়াশীল বিষ প্রয়োগ করে তাকে অবসন্ন করে, এমন কি প্রয়োজন হলে তাকে হত্যা করে তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করতে পারেন। সুতরাং বস্তুতান্ত্রিকতা ও জড়বাদিতা, দ্বেষ, হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতা অশুভ মঙ্গল হতে কল্পনা করা যায়। কাজেই অশুভ মঙ্গলের প্রভাবে জাতক গাঁটকাটা, চোর, ডাকাত, দস্যু, মিথ্যা-বাদী, মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষী, আসামী, রাজসাক্ষী ও ঘোর স্বার্থপর হতে পারেন।

পীড়িত মঙ্গলের সুরুচি ও শিষ্টাচার বোধ নেই। তিনি দুর্দমনীয়, অস্থির ও একগুঁয়ে। তিনি কোন কিছু ভয় বা গ্রাহ্য করেন না। পান ও ভোজনের সময় তার পশু-প্রকৃতি বেশ ভাল ভাবে প্রকাশ পায়। দরিদ্র বন্ধু ও প্রতিবেশীর দিকে তিনি ঘৃণা সূচক ভ্রূকুটি করে তাকান। তার সবচেয়ে আশ্চর্যের গুণ যুদ্ধ ও মারামারির প্রতি অনুরাগ। তিনি একাধিক অস্ত্রশস্ত্র কাছে রাখেন এবং ঝগড়া-বিবাদ করে বেড়ান। কোন যুক্তি বা উপদেশ তার কানে ঢোকে না। সুতরাং হিতাহিত-জ্ঞান শূন্য গোঁয়ার, 'মরিয়া' গুণ্ডা, পীড়িত মঙ্গলের প্রভাবে কার্য করে থাকেন। কাজেই উদ্দেশ্যহীন কলহ, যেমন গায়ে পড়ে ঝগড়া করা এবং যে কোন প্রকার কলহঘটিত উত্তেজনা অশুভ মঙ্গল হতে কল্পনীয়। 'দুষ্টের হস্তে শিষ্টের পীড়ন', এমন কি অকস্মাৎ দুর্ঘটনা নীচ মঙ্গলের চক্রান্ত। ভাড়াটে গুণ্ডা, কষাই, নোট জালকারী ও গোপনে মাদক দ্রব্য বিক্রেতা ইত্যাদি অশুভ মঙ্গলের জাতক।

অশুভ মঙ্গল সমাজের দুষ্টক্ষত। তিনি শক্তির ব্যভিচার বা ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকেন। প্রতিবাদ বা বিরোধিতা মঙ্গল একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। "আমার কাছে তুমি দোষী, অতএব তোমার বিচারকর্তা আমি। আমার দণ্ডাদেশ তোমার বিরুদ্ধে শেষ কথা, ইহার মধ্যে অন্য কোন বিবেচনা বা মীমাংসা নেই, আর যদি প্রয়োজন হয় ত সে পরে"—এই শ্রেণীর প্রকৃতি, অর্থাৎ অত্যাচার ও যথেচ্ছচারিতা—যার 'মা-বাপ নেই'—সুনীচ মঙ্গলের পরিচায়ক। আবার নিজের প্রাধান্য বা কল্পিত

আভিজাত্য বজায় রাখা এবং তা ক্ষুণ্ণ হলে বা হবার উপক্রম হচ্ছে অনুমান করলে, প্রতিশোধ-স্পৃগা পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত করা অশুভ মঙ্গলের কার্য। সুতরাং ক্রূরতা, গোঁড়ামি, নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচার, পুলিসি জুলুম, পশুহনন, খুন-জখম ও রক্তপাত অশুভ মঙ্গল হতে কল্পনীয়।

ফল কথা এই যে, মঙ্গল অশুভ হলে যেমন ভীষণ অনিষ্টকারী হন, মঙ্গল শুভ হলে তেমনি সৌম্য ও ইষ্টকারী হন। মঙ্গল নিদ্রিত হলে ভিতরের বিদ্রোহ ও বাহিরের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। তিনি ভগবানের মঙ্গল দূত, জীবের মঙ্গল সাধন করাই তার কাজ। তাই মঙ্গল মঙ্গল-বিধায়ক।

মঙ্গল সম্পর্কে আলোচনা শেষ করা হল। আগামী সংখ্যায় বুধের কারকত্তা বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যাক এবারে জন্মরাশি অনুসারে ব্যক্তিগত মাসিক শুভাশুভ ফলের আভাস দিচ্ছি।

মেষ—ব্যয় বাহুল্য ও পারিবারিক কারণে ঝঞ্ঝাট প্রায়ই উত্যক্ত করবে। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে উৎকণ্ঠা দেখা দিতে পারে। মাসের শেষাংশ আর্থিক দিক থেকে অনুকূল। দাম্পত্যক্ষেত্রে অশান্তি দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্য কিছুটা উৎপাত করবে। উদর সংক্রান্ত পীড়া এবং শ্লেষ্মাদিতে কষ্ট পেতে পারেন। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল নয়। মাতাপিতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। মহিলাদের পক্ষেও অনুরূপ ফল। তরুণী মেয়েদের স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে বাধা আসতে পারে।

বৃষ—আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে আপনি বিব্রত হবেন না। সামান্য ভুলে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত পরিবর্তন মনের ওপর চাপ দেবে। অসুখ-বিসুখ হলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। আকস্মিক দুর্ঘটনার ভয় আছে। তরুণ তরুণীদের বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পিতার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল বলা চলে। বিদ্যার্থীদের পাঠ্যধারা নির্ধারণে গোলযোগ দেখা যায়। মহিলাদের সময়টা আর্থিক দিক থেকে ভাল।

মিথুন—বিদেশে যাবার যোগাযোগ আসতে পারে। আপনার কাজ-কর্মের দ্বারাই আপনাকে বিব্রত করে তুলতে পারে। আর্থিক দিকটা মন্দা যাবে। আপনি ভুলের বশে এমন কাজ করে বসবেন তাতে আপ[নার] বিশেষ ক্ষতি হতে পারে। মাতার স্বাস্থ্যের প্রতি [লক্ষ্য] রাখুন। পিতার স্বাস্থ্য ভালই বলা চলে। বিদ্যার্থ[ীদের] পড়াশুনায় মনোযোগ দেখা যায়। আপনার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। মহিলাদের সময়টা গোলমেলে।

কর্কট—আপনার মধ্যে যে শক্তি নিদ্রিত আছে, ত[াকে] জাগিয়ে তুলুন। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে ভয় শূন্য [হয়ে] এগিয়ে যান; তাতেই উন্নতির উচ্চ শিখরে আর[োহণ] করবেন। স্বাস্থ্য প্রায়ই উৎপাত করবে। আ[র্থিক] দিকটা অনুকূল, এমন কি প্রাপ্য টাকা আদায় [হতে] পারে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পিতার [স্বাস্থ্য] সম্পর্কে সতর্ক হউন। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। মহিল[াদের] সময়টা প্রতিকূল।

সিংহ—আপনি বেশী বিব্রত হয়ে পড়েছেন। [কি] করবেন কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। বাইরে যা[বার] যোগাযোগ দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রে অশান্তির লক্ষণ [দেখা] যায় না। অর্থ খরচের ঝামেলায় পড়তে পারেন। সন্তান[দের] জন্য উৎকণ্ঠা ভোগের লক্ষণ দেখা যায়। মাতৃহানির [যোগ] রয়েছে। স্বাস্থ্য প্রায়ই উৎপাত করবে। তরুণী মেয়ে[দের] স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে এবং বিদ্যার্থীদের বিদ্যার্জনে বাধা আস[তে] পারে। মহিলাদের সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ।

কন্যা—কর্মে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। [...] ভালই হবে। পিতার সহিত মনোমালিন্য হতে পা[রে।] স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পা[রে।] বাইরে যাবার এবং জমি কেনাকাটার যোগাযোগ [দেখা] যায়। দাম্পত্যক্ষেত্রে অশান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হতে পা[রে।] বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। তরুণ-তরুণীদের বিবা[হের] যোগাযোগ হতে পারে। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত বিবা[হে] প্রতারিত হবার আশঙ্কা আছে।

তুলা—সামাজিক ক্ষেত্রে সুনাম ও প্রতিপত্তি [বৃদ্ধি] পাবে। কিন্তু স্বাস্থ্য প্রায়ই উৎপাত করবে। কাজ-ক[র্মে] বাধা আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আসন্ন উন্নতি বিল[ম্বিত] হতে পারে। সন্তানদের জন্য উৎকণ্ঠার লক্ষণ আ[ছে।] মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পিতার সহিত ম[তা]নৈক্য হতে পারে। দাম্পত্যক্ষেত্রে শুভভাব বৃদ্ধি পা[বে।] এখন থেকে লটারীর টিকেট কাটতে পারেন। বিদ্যার্থী[দের]

সময়টা প্রতিকূল। তরুণ তরুণীদের বিবাহ হতে পারে। মহিলাদের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির যোগ দেখা যায়।

বৃশ্চিক—কর্মক্ষেত্রে মতবিরোধ ঘটতে পারে। আপনার মধ্যে যে সংগঠনী ক্ষমতা রয়েছে তা কাজে লাগান। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি বিলম্বিত হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। উদর-বায়ুর প্রকোপে কষ্ট পেতে পারেন। মামলা মোকদ্দমা এড়িয়ে চলা ভাল। আপনার কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল বলা চলে না। বিদ্যার্থীদের বিদ্যার্জনে মনোযোগ আকৃষ্ট হবে। তরুণী মেয়েদের বিবাহের যোগ দেখা যায়। মহিলাদের সময়টা অত্যন্ত ভাল।

ধনু—সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও প্রীতির প্রসার হবে। আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। উপহার লাভ হতে পারে। বাইরে যাবার যোগ দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে। রাজনৈতিক দলাদলি এড়িয়ে চলা উচিত। মামলা-মোকদ্দমা আপোষে মিটিয়ে ফেলুন। বেকারের চাকুরী লাভ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। বিদ্যার্থীদের সময়টা কিন্তু প্রতিকূল। মহিলাদের মহিলাবন্ধু কিংবা আত্মীয়ার দ্বারা উত্যক্ত হবার আশঙ্কা আছে।

মকর—কোন ব্যাপারে অনিশ্চিত অবস্থা মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। আর্থিক ব্যাপারে অনটন দেখা যায়। বৈষয়িক কোন ব্যাপারে গোলযোগ দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান থাকা দরকার। পিতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। মাতার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। কষ্টকর ভ্রমণ হতে পারে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তরুণীদের বিবাহ হতে পারে। মহিলা কর্মপ্রার্থীদের চাকুরী লাভের সম্ভাবনা।

কুম্ভ—প্রাপ্য টাকা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হতে পারে। কিন্তু তা বলে অর্থকষ্ট ভোগ করতে হবে না। ভ্রমণযোগ রয়েছে। নতুন বন্ধুলাভ হতে পারে। জমি কেনাকাটার ব্যাপারে যোগাযোগ হতে পারে। উদর সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পেতে পারেন। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ভ্রাতার সহিত বিরোধ হতে পারে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল নয়। তরুণী মেয়েদের বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধে সাবধান থাকা দরকার।

মীন—আর্থিক দিকটা ভাল। শরীর মোটামুটি ভাল যাবে। দাম্পত্য ক্ষেত্রে শুভভাব বৃদ্ধি পাবে। ভ্রমণে বাধা আসতে পারে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। পিতার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভালই বলা চলে। এ মাসে আপনি কোন জিনিষ উপহার পেতে পারেন। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভালই বলা চলে। সাম্ভাব্য ক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীদের বিবাহ হতে পারে। বেকারের চাকুরী লাভ হতে পারে। মহিলাদের সময়টা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল।

মুগ্ধ দুপুর

সত্যানন্দ মণ্ডল

প্রলম্বিত আকাশ ছেয়ে প্রণষ্ট ফুল
মাঝে মাঝে নদীর জলে আলো পড়ে,
চিকন্ আলো। শব্দ ওঠে সেই সব ঢেউয়ের
দূরত্বে মুগ্ধ দুপুর !

আহা পেলাম না তাকে, পেলাম না
পেলাম না হৃদয়ের আহুত শোকে।…

নির্বিঘ্ন নয় যে জীবন এবং অমোঘ উন্মত্ততায়
একদিন জন্মের কৌতুক কোথায় হারাবে।
কোথায় হারায়।
শুধু রক্তে ভেসে ওঠা সুমধুর শান্ত আমার স্বর,
কখনো বা চেতনায় উল্লসিত নষ্ট এক স্বর ;
স্পষ্টতর কোন কিছু হ'ল না ঈশ্বর।
অভিমুখ—অধুনা মুগ্ধ দুপুর।

।।। নিরুদ্দেশ ।।।

[বড় গল্প]

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাণো কথা একে একে সবই মনে আসে। সে আর কতদিনই বা হবে!

মামার বাড়ী কায়ঃক্লেশে মানুষ! বিধবা মা পাড়ার পাঁচবাড়ী ধান ভেনে কিছু কিছু চাল এবং ক্ষুদ মজুরী পেত। সেই চাল ক্ষুদ মামার সংসারে দিয়ে মা ও মেয়ে গরীব মামার তত্ত্বাবধানে বাস করত। মা ওকে রাণু বলে ডাকত, মামা ডাকতেন রেণু, মামীমা মুখ বিকৃত করে বলতেন, রেণী।

রেণুর তখন কতই বা বয়স? সাত আট বছর হবে হয়ত। শ্যামবর্ণ রোদে-পোড়া রং, পরণে সেলাইয়ের ওপোর সেলাই করা লালপাড় শাড়ী, কাপড়ের ছেঁড়া পাড় দিয়ে বাঁধা থাকত প্রায়-রুক্ষ মাথার চুল, মাথায় চাপড় মারলে একরাশ ধুলো উড়ত।

কিন্তু এ অবস্থায় রেণুর কোন দুঃখ ছিল না, বরং তার মনে ছিল অপরিসীম আনন্দ। সারা দুপুর পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলা করে, ই আই রেলের লেভেল ক্রশিং-এর এধারে যেখানটায় মোটা তারের রেলিং দেওয়া ছিল সেই রেলিং-এর তলার তারে পা দিয়ে ওপোরের তার ধরে দোল খেত এবং যাত্রীবাহী রেল গেলে দোল খেতে খেতেই চেঁচিয়ে বলত, সাহেব সেলাম, সাহেব সেলাম। চলন্ত গাড়ীর যাত্রীদের মধ্যে কেউ হাসত, কেউ হাতছানি দিয়ে ডাকত, দুষ্টু ছেলেরা জানলা দিয়ে মুখ বার করে ভেংচি কাটত, জিভ দেখাত। রেণুর দিনগুলো একের পর এক এমনই ভাবে কেটে যেত। দিন যেত, মাস যেত, শৈশবের কয়েকটা বছর এমনভাবে কেটেছিল।

এর মধ্যে আনন্দ ছিল পূজোর সময়। বছরের মধ্যে মাত্র একবার এই সময়ই রেণু একখানা নতুন কাপড় পেত। মামা পৌরহিত্য করতেন গ্রামের যজমান বাড়ীতে। যজমানদের কাছ থেকে পাওয়া লালপাড় সাত-আট হাত শাড়ী পেলে তুলে রেখে দিতেন। ওর মধ্যে ফুলপাড় বা নক্সা-পাড় শাড়ীগুলো মামী দিত নিজের মেয়েদের। যেখানা তারা কেউ পছন্দ করত না, নিতে চাইত না, সেখানা রেণুকে দেওয়া হোত। তাতে ওর মন কিন্তু খারাপ হোত না। হাজার হলেও নতুন কাপড় ত বটে! বছরে এই একখানা মাত্র নতুন কাপড় সে পেত, অন্য সময় মামাতো বোনদের পুরাণো পরিত্যক্ত কাপড় সেলাই করেই রেণুর চলে যেত।

জীবনের এই সব প্রাথমিক স্মৃতি আরও ম্লান আরও দুঃখময় হোল সেদিন, যেদিন দশ বছরের অসহায় রেণুকে রেখে রেণুর বিধবা মা পৃথিবী ত্যাগ করলেন।

দিন কতক কান্নাকাটির মধ্য দিয়ে কাটল।

রেণুর মনে পড়ে ওর বিয়ের কথা। সেটা মায়ের মৃত্যুর বছর দু'য়েক পরের ঘটনা।

সে কথা রেণুর স্পষ্ট মনে আছে।

বরের বয়স পঞ্চাশের বেশী ত কম নয়। শোনা যায়, দেশে নাকি শ্রীপতি ঘোষালের জমি জায়গা অনেক কিছুই ছিল। তার ওপোর সে আবার জমিদারের কাছারীতে মোটা মাইনের চাকরীও করত। স্বাস্থ্য ভাল, পয়সা আছে, অতএব প্রথম পক্ষের পুত্র, পুত্রবধূ এবং বিধবা মেয়ে থাকা সত্ত্বেও শ্রীপতি কি-না-কি কারণের জন্য খুঁজে-পেতে রেণুর মামার কাছে এসে রেণুর পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন।

মামার বোধ হয় ইচ্ছে ঠিক ছিল না। কিন্তু একটা মানীলোক, সেধে ঘটক পাঠিয়েছেন, ফেরানো শক্ত। তার ওপোর মামী জেদ ধরে বসল। বল্লে, এর চেয়ে ভাল বর কোথায় পাবে?

অন্যরাও সকলেই একবাক্যে মামীর কথায় সায় দিয়ে-দিল। অতএব শুভদৃষ্টি হয়ে গেল, হ্যারিকেনের আলোয়, উলুধ্বনির পটভূমিতে রেণু দেখল, মোটা-সোটা বিরাট

ভুঁড়িওয়ালা থপ্‌থপে বর, সাদা কালো এক ঝুড়ি গোঁফ, চক্‌চকে সাদা সার্ট জামা গায়ে, পকেটে সোনার চেন দেওয়া ঘড়ি, কাঁধে সিল্কের চাদর, আঙ্গুলে তিন চারটে আংটি, গলায় ফুলের মালা। বর দেখে রেণুর প্রথমেই এমন ভয় হয়েছিল যে সে চোখ বুজে ফেলেছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিল প্রথম বিয়ের-কনে অবস্থায় শ্বশুর বাড়ী গিয়ে। সকলেই তাকে দূর-ছাই করেছিল, বিশেষ করে তার সতীনের বিধবা মেয়ে এবং বড় ছেলের বউ। মা বলে ডাকা ত দূরের কথা, ছোট্ট রেণুর দিকে পেছন ফিরে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওরা এমন সব কথা বলেছিল যা মনে পড়লে রেণু এখনও শিউরে ওঠে, লজ্জা পায়।

কোনমতে এক সপ্তাহ গ্রামের বাড়ীতে কাটিয়ে রেণুরা জোড়ে ফিরে এসেছিল মামার বাড়ীতে। সেখানে এক রাত্রি কাটিয়ে শ্রীপতিবাবু রেণুকে এনে তুলেছিলেন তাঁর কর্ম্মস্থলে। রেণুকেই তুলেছিলেন, কিন্তু শ্রীপতির সেই আংটি ঘড়ি রেণু আর দেখে নি, সে সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাও সে করে নি।

বিয়ের সময় রেণু শুনেছিল, জামাই জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবের কাজ করে, মস্ত বড় বাড়ী, অঢেল পয়সা, পায়ের ওপর পা দিয়ে থাকবে সে, কিন্তু কর্ম্মস্থলে এসে রেণুর বারো বছরের মনের কল্পনায় পড়ল এক আঘাত। বাড়ী মস্ত বটে, কিন্তু সেটা জমিদারের বাড়ী; রেণুর বসবাসের জন্য ঐ বড় বাড়ীর বাগানের পেছনে ইট-বার করা দেওয়ালে টিনের চাল দেওয়া একখানা ঘর, সামনে একটু দাওয়া, খানিকটা আগাছাভরা উঠান, উঠানের এক পাশে খাটা-পায়খানা এবং একটা মাটীর বেড় দেওয়া কুয়া। জায়গাটা জমিদারের, নব বিবাহিত শ্রীপতিবাবুর বাস করার জন্য জমিদারবাবু এই অংশটা দয়া করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আসবাব পত্রের মধ্যে একখানা বড় তক্তপোষ, চারখানা করে ইট দিয়ে তক্তপোষটা অনেকখানি উঁচু করা হয়েছে, তক্তপোষের তলায় অনেকগুলো কাঠের প্যাকিং বাক্স, ওর মধ্যে কি আছে কে জানে, ঘরের কোণে ইটের ওপোর বসানো এক রং-চটা পোর্ট্‌ম্যান্টো, দেওয়ালে মা-দুর্গা, মা-কালীর পট ছবি, কুলুঙ্গীতে কোশাকুশি, কমণ্ডুলু, সন্ধ্যে-আহ্নিকের সরঞ্জাম। বিয়ে করতে যাবার পূর্ব্বে শ্রীপতি-বাবু ঘরখানাকে বাসযোগ্য করে তাঁর আসবাবপত্র এই-ভাবেই সাজিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া ঘরের দাওয়ার এক পাশে রয়েছে দরমা ঘেরা রান্না ঘর, মাটীর মেঝেতে গর্ত্ত কাটা উনান, রান্না ঘরের সামনে দাওয়ার ধারে বড় একটা জলের ড্রাম, সেটা তেল কিম্বা রং-এর ড্রামরূপেই জমিদার বাড়ীতে প্রথম এসেছিল। আর এক-খানা নতুন মোটা ঝাঁটা।

মামার বাড়ী থাকতে রেণু অনেক মেয়ের বিয়ে দেখে-ছিল, জামাইও দেখেছিল। সেই সব মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরে এসে গল্পও বলত, শুনে শুনে রেণুর মনে,—হ্যাঁ বেশ মনে আছে, শ্বশুর বাড়ী সম্বন্ধে একটা উজ্জ্বল চিত্র সে মনে মনে এঁকে নিয়েছিল; কিন্তু সেই কল্পিত চিত্রের সঙ্গে এর মিল কোথায়? মুখে কিছু না বল্লেও বারো বছরের রেণু মনে মনে হতাশ হয়ে পড়েছিল। এর পর সে বেশ ভয়ও পেয়েছিল, যখন বুঝলে যে এই বাড়ীতে তাকে সারাটা দিন একা-একাই কাটাতে হবে, কারণ শ্রীপতিবাবুর সেরেস্তায় উদয়াস্তের কাজ, কেবল দুপুরে একবার আসবে ভাত খাবার জন্য। তবে এই সঙ্গে মনে এটাও একটা তৃপ্তি যে, সতীনের মেয়ে বা সতীনের পুত্রবধূ এখানে কেউই আসবে না। বাপ্‌রে, তাদের যা ব্যাভার!

সকালে উঠে মোটা একটা কাঠি নিয়ে দাঁতন করতে করতে শ্রীপতিবাবু গামছা পরে বাবুদের পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এসে শোবার ঘরের কুলুঙ্গীর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুজো-আহ্নিক সেরে কৌটো থেকে একখানি বাতাসা বার করে খেয়ে একঘটি জল আলগোছে মুখে ঢেলে ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করেন, কই গো, কোথায় গেলে—

রেণু তখন বিছানায় পুরানো কাপড় পাট-করা চাদরটা টেনেটুনে পেতে, দাওয়া এবং উঠান ঝাঁট দিয়ে, হয়ত কুয়া থেকে জল তুলছে মেটে-দাওয়া নিকোবার জন্য। কুয়া তলা থেকেই আস্তে আস্তে সাড়া দেয়, যাই।

দাওয়ায় উঠে রেণু দেখে, শ্রীপতিবাবু গায়ের ওপোর বেনিয়ান জামা চড়িয়ে হর্ত্তুকীর টুকরা মুখে দিচ্ছেন। রেণুকে দেখেই তিনি বল্লেন, মুড়ি ফুরিয়ে গেছে বলেছিলে না?

রেণু ধীরে ধীরে বলেছিল, হ্যাঁ।

আচ্ছা, একটু পরে আমি মুড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর তরী-তরকারী যা পাই তাও পাঠিয়ে দেব। সাবধানে দরজা বন্ধ করে থেক, বুঝলে। কেউ দরজা নাড়লে সাড়া নিয়ে তবে দরজা খুলবে।

তুমি আসবে কখন? রেণু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে।

যেমন সময় আসি, একটু আগু-পাছু হতে পারে। তারপর হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে দুর্গা-দুর্গা মন্ত্র উচ্চারণ করে চৌকাঠের বাইরে পা দিয়ে রেণুর কাছাকাছি এসে বল্লেন, একটু হাত-টান করে চল্‌বে, সেদিনে এক রেক্ মুড়ি নিয়ে এলুম, এর মধ্যে ফুরিয়ে গেলে সংসার চালাব কেমন করে? বলি গেরস্তর সংসার, তালেবর ত নই!

রেণু ঘাড় নেড়ে সায় দিত।

এমনি করেই রেণুর দিন কাটত। দারিদ্র্যকে রেণুর ভয় ছিল না। দারিদ্র্যের মধ্যেই সে অভ্যস্ত, কিন্তু সারাদিন একখানি ঘর, একটুখানি দাওয়া এবং এক ফালি উঠোনের মধ্যে দিন কাটানোয় সে যেন হাঁপিয়ে উঠত। জমিদার বাড়ীর মেয়ে বউ কেউই এদিকে আসত না, জমিদারের অন্য সব কর্ম্মচারী যারা আছে তাদের মেয়ে-বউ সব দেশে থাকত, কাজেই তার সঙ্গে মেলামেশা করতে কে আর আসবে! পাড়ায় দূরে দূরে অন্য যারা ছিল, শ্রীপতিবাবু চান্ না যে তারা আসে। লোক এলেই খরচ, গোটাকতক পান ত দিতেই হবে, তা ছাড়া যত সব দীন দরিদ্দিরের ব্যাপার, কে হয়ত তেল চাইবে, কে মশলা চাইবে, হয়ত কেউ এসে বল্‌বে এক সরা চাল ধার দাও, তারপর সেই চাল যে কবে শোধ দেবে তার ঠিক নেই, দিলেও যতটা নেয় ততটা কি আর দেয়। সেইজন্য শ্রীপতিবাবুর কড়া হুকুম ছিল, কাউকে বাড়ীতে আসতে দিও না. কেউ এলে দরজা থেকে বলে দিও, সময় নেই। দু'চারদিন এইভাবে বলে দিলে আর কেউ আসবে না, তখন নিশ্চিন্ত।

তবুও একদিন দুপুরে কে যেন এসে দরজা নাড়লে। আওয়াজ শুনে রেণু বুঝলে শ্রীপতিবাবু নয়, অন্য কেউ। ভয়ে ভয়ে দরজার এধার থেকে সাড়া দিলে কে?

আগন্তুক উত্তর দিলে, আমি রে রেণু, দরজা খোল।

আহ্লাদে আটখানা রেণু দরজা খুলে দিলে। মা[illegible] এসেছে!

দরজা খুলেই রেণু টিপ করে নমস্কার করলে, কেম[illegible] আছ মামা, এদ্দিন পরে এলে!

নতুন গামছায় বাঁধা একটা পুটলী ও ছাতা নিয়ে মা[illegible] বাড়ীর ভেতর ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে বল্লেন, বাঃ খাসা বাড়ী ত রে! বেশ বেশ, বলতে বলতে এগি[illegible] এলেন দাওয়ার ধারে, রেণু দরজা বন্ধ করে মামার পেছ[illegible] পেছন এসে হাত থেকে ছাতা ও পুঁটলী নিয়ে বল্লে এস মামা, ওপোরে এস।

উঠোনে চটি রেখে মামা দাওয়ায় উঠে বল্লে, ঐ জলে পা ধোব ত?

ছাতা পুটলী রেখে রেণু ড্রাম থেকে ঘটি ভর্ত্তি জল তুলে মামার হাতে দিয়ে ঘর থেকে দৌড়ে মাদুর এনে দাওয়ায় পেতে নিজেদের বিছানা থেকে হাত পাখা এনে মামাকে বাতাস করতে সুরু করলে।

ততক্ষণে-কাঁধের চাদরটা মাদুরে ফেলে মাথায় চাপা দেওয়া অপর গামছাটা টেনে নিয়ে হাত পা মুছে মামা মাদুরে বসে পড়েছেন। মাথার শিখাটা হাত দিয়ে বেশ টান করে, ভিজে হাতে পৈতে থেকে ঘাম মুছে রেণুর পাখার হাওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা করতে করতে মামা বল্লেন উঃ, কি গরমটাই পড়েছে! তবু তোর এই খানটায় বেশ হাওয়া আছে। এইটে দক্ষিণ দিক, না রে?

রেণু বল্লে, হ্যাঁ।

হ্যাঁ দক্ষিণ দুয়ারী ঘর, শ্রেষ্ঠ ঘর, ঘরের রাজা হল দক্ষিণ দুয়ারী। বেশ বাড়ী, দিব্যি সহরের বাড়ীর মত পাঁচিল-ঘেরা বাড়ী, শ্বেতখানা-টানা সব পাঁচিলের ভেতর বাঃ বা, বেশ, দেখে বড় আনন্দ হোল রে—

রেণু বল্লে, মামীমা কেমন আছে মামা? কেষ্ট, বুড়ো তুলসী, দুর্গা ওরা সব? ওবাড়ীর মতি পিসি, মলিনা-দি, সাবিত্রী-দি—

সব-সব ভাল আছে রে। তুই কেমন আছিস? এই ক'দিনেই ত বেশ গিন্নি বান্নি হয়ে গেছিস্ দেখছি। হবেই ত একেই বলে বিয়ের জল! বিয়ের জল গায়ে পড়লে—

শ্রীপতিও দেখলুম, বেশ তোফা আছে।

কোথায় দেখা হোল মামা? সে কি,-সে ত এখন—

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ সেরেস্তাতেই ত আগে গিয়েছিলুম। এ বাড়ী ত আমি আগে দেখি নি। আশীর্ব্বাদের সময় আমি এসেছিলুম ঐ রাজবাড়ীতে। ঐ যে বড় রাজা রায় বাবু আছে, ঐ রায় বাবু শ্রীপতিকে কি ভালই-না-বাসে। রায় বাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আশীর্ব্বাদের সময় খাইয়েছিলেন। এখান থেকেই ত শ্রীপতির বিয়ের সব ব্যবস্থা হয়েছিল, কেবল বর-কনে নিজের ভিটে ছাড়া অন্য কোথাও উঠতে নেই বলে তাই দেশের বাড়ী গিয়েছিল, তা সে আর কদিন? তোকে বলেছিলুম-না, সতীনপো সতীন-ঝি নিয়ে ঘর করতে হবে না। এখন দেখলি ত যা বলেছিলুম, বর্ণে বর্ণে মিলল ত?

কথাগুলো বলেই চেষ্টা করে ঘাড় তুলে গর্ব্বভরে রেণুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। রেণুকে নিরুত্তর দেখে ধরে নিলেন, রেণু নিরতিশয় সুখে বিবাহিত জীবন যাপন করছে। পুনরায় নিজের কথার সুর ধরে বল্লেন, হবেই ত! জ্যোতিষ কখনও মিথ্যা হয় না রে, তোর কুষ্ঠিতে রয়েছে যে, সতীন নিয়ে তোকে ঘর করতে হবে না। এখন এইবার নিজের ছেলে-পুলে যা হক দুটো একটা হলেই বাস্—। পরম তৃপ্তিতে নিজের ট্যাঁক থেকে নস্যের ডিবা বার করে দু' নাকে ভর্ত্তি করে নস্য ঠেসে গামছায় মুছে নিলেন।

রেণু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাতাস করছিল যেমন ভাবে শ্রীপতি তাকে বাতাস করতে শিখিয়েছিল। এবার সেদিকে নজর পড়ায় মামা বল্লেন, দাঁড়িয়ে কেন রে, বোস। আর আমায় বাতাস করতে হবে না। দেখি পাখা দে। নিজে বাতাস না খেলে সুখ হয় না রে, দে পাখাটা দে।

রেণুর হাত থেকে মামা পাখাটা নিতে রেণু মামার পাশে মেঝেয় বসল। মামা বল্লেন, মেঝেয় কেন, মাদুরে বোস্।

রেণু বল্লে, ঠিক আছে, তা মামা—

মামা স্মিতহাস্যে বল্লেন, বাঃ বেশ বেশ, খুব ভাল। আর হবে নাই বা কেন? জামাই ত হেঁজি পেঁজি নয়। খুব ভাল শিক্ষাই দিয়েছে। গুরুজনের সঙ্গে এক আসনে বসতে নেই, সেই জন্যেই মাদুরে বসিস্ নি, এই ত! বুঝতে পেরেছি রে, বুঝেছি।

একথার কোন উত্তর না দিয়ে রেণু বল্লে, তা এতদিন পরে যে এলে মামা? হঠাৎ কোন—

হঠাৎ নয়, এদিকে আমার বরাৎ হোল কি না! আমার এক যজমানের ছেলের বিয়ে হোল তোমার ঐ বালিপুরে তাই কাল আমরা সব বালিপুরে এসেছিলুম। আজ সকালে ওদের কাজ কম্ম একটুখানি যা ছিল সেরে নিয়ে ভাবলুম এই ত মোটে দু' ক্রোশ পথ, তাই ভাবলুম একটু পায়ে-পায়ে এসে একবার দেখে যাই, মেয়েটা কেমন আছে, কি করছে। তা তোর হাল-চাল দেখে বড় তৃপ্তি পেলুম রে। বড় তৃপ্তি পেলুম।

রেণু ইতস্তত করে বল্লে, তাহলে মামা এখন একটু জল-বাতাসা মুখে দাও, তার পর ভাত টাত যা হয়েছে—

মামা বল্লে, ভাত? তা চাট্টি অন্ন সেবা এখানে হতে পারে, কারণ যজমান ত কায়স্থ, সেখানে আর মা-লক্ষ্মীর দানা নিই কি করে। কাল রাত থেকে ছানা, সন্দেশ, দধি এই দিয়েই ত চলছে।

তা হলে বোসো মামা, আমি জল বাতাসা নিয়ে আসি।

রেণু উঠতেই মামা বল্লে রেণু আমার ঐ পুঁটলীতে যা আছে বার করে নিয়ে নে। তোর এখানে আসব বলে বিয়ে-বাড়ী থেকে কি সব দিয়েছে দেখ্ ত! ঐ সব ঢেলে ঢুলে নিয়ে গামছাটা আমার দিয়ে দিস্।

নতুন বড় গামছায় কলাপাতা জড়ানো ষোলখানা লুচি আটটা সন্দেশ, আটটা লেডীকেনি এবং মাটীর হাঁড়িতে আধ হাঁড়ি দই ছিল। গামছার কোণে বাঁধা ছিল কিছু কাটা ফল ছোলা ভিজানো ও মুগের ডাল ভিজানো, এ গুলো নৈবেদ্যের জিনিষ। রেণু সেগুলো সমস্ত থালায় সাজিয়ে নিয়ে গামছাখানা ঝাড়তে ঝাড়তে লোলুপ ভাবে ডাকলে, মামা—

কি রে?

গামছাটা কি নিয়ে যাবে?

সবিস্ময়ে মামা রেণুর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, নেব না? তুই বলিস্ কিরে! অমন দামী গামছাটা। তারপর হো হো করে হেসে বল্লে, তোরা বড় লোক, তোরা ও সব জিনিষ হয়ত ফেলে দিতে পারিস্, কিন্তু আমি ত রাজা বাদশা নই যে—

রেণু গামছাটা পাট করে মামার দিকে এগিয়ে ধরে বলেছিল বিয়ে বাড়ীতে আরও ত অনেকগুলো গামছা পাবে, তাই বলছিলুম—

হতাশ হয়ে মামা বল্লেন, কই আর অনেকগুলো। আজকাল যা মাগ্‌গি-গণ্ডা হয়েছে, সকলেই হাত টান দিয়েছে। এ রকম ভাল একখানা গামছা কিনতে গেলেই বুঝতে পারবি। পাঁচ আনা, সাড়ে পাঁচ আনার কম কেউ কথাই কইবে না।

রেণু গামছাটা মামার হাতে দিয়ে দিলে। মামার ঘাড়টা একটু নিচের দিকে ঝোঁকা, চেষ্টা করে ঘাড় তুলে রেণুর মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, লোভ হয়েছে বুঝি? গামছাটা তোর চাই?

রেণু বল্লে, না থাক। কিন্তু সেই 'না' বলার মধ্যেই ওর ক্ষোভটা ফুটে উঠল।

মামা বল্লেন, তবে নে, নিয়ে নে। বিয়ের পর প্রায় ছ'মাস কেটে গেল, কিছুই ত দিতে পারি নি, তা এটা যখন তুই মুখ ফুটে চাইছিস্,—নে, নিয়েই নে।

রেণু বল্লে, না মামা, ওটা তুমি নিয়েই নাও। শেষে মামীমা শুনলে আবার রাগারাগি করবে।

না-না, সে শুনবে কি করে। সে ত আর দেখতে আসছে না, আর তুই কি ভেবেছিস একথা আমি তাকে বলব? রাম কহো।

ইতস্ততঃ করে রেণু বল্লে, তা হলে আমি নেব?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘরে রেখে দিগে যা। মামা গামছাখানা রেণুর হাতে ফেরৎ দিয়ে বলেন, হ্যাঁরে, জামাই বুঝি তামাক-টামাক খায় না? হুঁকো কল্কের ব্যবস্থা নেই বুঝি?

রেণু অপ্রতিভ হয়ে বল্লে, কই হুকো ত দেখে নি, তবে বিড়ি খেতে দেখেছি, কিন্তু সে ত ওর পকেটে থাকে, বাড়ীতে.—দেখি কোথাও যদি থাকে—

এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল। শব্দ শুনেই রেণু বুঝলে, শ্রীপতি এসেছে। অন্যদিনের তুলনায় আজ একটু তাড়াতাড়িই এসেছে, বোধহয় মামাশ্বশুরের জন্যই আগে আগে কাজ সেরে উঠে এসেছে।

মাথায় অনেকখানি ঘোমটা টেনে রেণু সদর দরজা খুলে দিলে। ফিস্‌ফিস্ করে বল্লে, মামা এসেছে।

শ্রীপতি বল্লে, জানি।

দাওয়ার কাছে আসতেই মামা বল্লেন, এই যে বাবাজী, আজ তাড়াতাড়িই এসেছ দেখছি।

হ্যাঁ, আপনি এসেছেন, তাই নায়েব মশাইকে বল্লুম, বাড়ীতে কুটুম্ব, সকাল সকাল যেতে হবে।

বেশ বেশ বেশ, তা নাও, অনেক বেলা হয়ে গেছে, স্নান-টান সারতে হবে ত।

বেনিয়ানের ফিতে খুলতে খুলতে শ্রীপতি বল্লে, না, স্নান এখন করি না, ও কাজ ভোরবেলা সেরে নিই। শ্রীপতি ঘরে ঢুকে গেল।

শ্বশুর জামাই দুজনকে কলাপাতায় ভাত দিয়ে রেণু রান্নাঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। ওরা দুজনে গল্প করতে করতে খেতে লাগল। একবার জামাই বলে, কই গো, মামাবাবুকে আর কি দেবে দাও। আবার শ্বশুর বলে, রেণু, বাবাজীকে আর একটু ডাল দিয়ে যা।

কিন্তু রেণু কোন সাড়াই দেয় না।

দু'জনেরই পাতা শেষ। রেণু গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়ে এগিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ করে মামাকে বল্লে, লুচি, মিষ্টি, দই নিয়ে আসি?

মামা বল্লেন, নিশ্চয়, বাবাজীকে দাও।

শ্রীপতি বল্লে, হ্যাঁ, এ সব জিনিষ আনা হয়েছে না কি?

মামা বল্লেন, হ্যাঁ, বিয়ে বাড়ী থেকে আস্‌ছি, তাই ভাবলুম, জামাই রয়েছে, মেয়েটা রয়েছে, শুধু হাতে যাই কেন, দুখানা নিয়ে যাই—

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীপতি বল্লে, তাই বুঝি, তা বেশ বেশ। তা তা ও সব আর এখন কেন, ও না হয় সন্ধ্যেবেলা—

বিলক্ষণ, এখন আনলুম, তুমি দু'খানা মুখে দেবে না, তাও কি হয়! না মা-রেণু, তুমি এখনই এনে বাবাজীর পাতে দাও। মামা রেণুকে নির্দ্দেশ দিলেন।

কিন্তু রেণু চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল। শ্রীপতি বল্লে তবে নিয়ে এস। মামাবাবুর যখন ইচ্ছে—

রেণু ঘরের মধ্যে ঢুকে থালা সমেত খাবার এনে দুজনের পাতে চারখানা করে লুচি, দু'রকম মিষ্টি দুটো করে এবং খানিকটা দই ঢেলে দিলে। সেগুলো শেষ হবার পর বাকী যা ছিল তাও দু'জনকে সমানে ভাগ করে খালি থালা নিয়ে রেণু রান্নাঘরে চলে গেল।

ভোজনপর্ব্ব চুকিয়ে শ্বশুর জামাই ঘরে এসে তক্তপোষে বসে নানা রকম সাংসারিক কথা বলতে লাগল। ওরই মধ্যে একবার শ্রীপতিবাবু বাইরে এসে বিড়ি ধরিয়ে রেণুকে বল্লে, তোমার ভাত আছে ত?

রেণু ঘাড় নেড়ে বল্লে, কি করে থাকবে? তোমাদের দুজনেরই কম পড়ে গেল, ভাগ্যিস্ বিয়ে বাড়ীর খাবারগুলো মামা এনেছিল।

ও, তাহলে তুমি এবেলা—তা বিয়ে বাড়ীর খাবার আরও আছে ত?

রেণু ঘাড় নেড়ে জানালে, আর কিছুই নেই।

অবজ্ঞাভরে শ্রীপতি বল্লে ওমা ক'খানা মাত্তর এনেছিল। তা হলে তুমি আবার ভাত চড়িয়ে দাও।

চাল যে বাড়ন্ত, আমি কাল থেকে তোমাকে বলছি না।

এক জনের মতও নেই?

রেণু ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

শেষ টানের পর বিড়িটা ফেলে দিয়ে শ্রীপতি বল্লে, তা হলে যা হয় কিছু ব্যবস্থা করে নাও, সন্ধ্যেবেলা চাল নিয়ে আসব। একটু থেমে বল্লে, মুড়ি আছে নিশ্চয়ই।

রেণু ঘাড় নেড়ে বল্লে, না।

এ রকম আস্কুটে লক্ষ্মীছাড়ার মত সংসার কর—ছিঃ। দারুণ বিরক্তি নিয়ে শ্রীপতি শ্বশুরের কাছে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

বাইরে থেকে রেণু শুনলে মামা বলছে, তোমাদের তামাক কি বিড়ির ব্যবস্থা নেই বাবাজী?

রেণু রান্না ঘরে চলে গেল। রেণুর মনে পড়ে সেদিন তার মধ্যাহ্ন-ভোজন হয়েছিল মামার আনা নৈবেদ্যর কাটা ফল, ছোলা ও মুগের ডাল ভিজানো দিয়ে।

শ্বশুর জামাই দুজনেই একসঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল। শ্বশুরকে আবার দু' ক্রোশ রাস্তা ভেঙ্গে বিয়ে বাড়ী যেতে হবে। বর বেরোবার কথা ছিল বিকেল পাঁচটার সময়।

রাত্রে খেতে বসে শ্রীপতি বেশ রাগতঃভাবেই প্রশ্ন করলে, মামার সঙ্গে কি কথা হোল?

রেণু বলেছিল, কই, এমন কিছু কথা ত হয় নি।

কিচ্ছু নয়? টাকা পয়সার কথা কিছু হয় নি?

না ত, রেণু সবিস্ময়ে উত্তর দিয়েছিল।

শয়তানের ধাড়ী, শ্রীপতি উত্তর দিলে। ভাতের গ্রাসটা গলা দিয়ে নামিয়ে শ্রীপতি বল্লে, বিয়ের সময় নগদ আড়াই শ' টাকা নিয়েছিল ঘর খরচ বলে। দু'শোর বেশী আমি দেব না, ও-ও ছাড়বে না। শেষে দু'শো নিয়ে বিয়েয় নামিয়ে বিয়ের রাত্তিরে তোমাদের বাড়ীতে এমন প্যাঁচ কষলে যে মান-সম্মান বজায় রাখতে বাধ্য হয়ে আমায় সেই পঞ্চাশ টাকা সুড় সুড় করে বার করতে হোল, অথচ কি-ই বা খরচ করেছে, মোটের ওপোর পঞ্চাশ টাকা হবে কি না সন্দেহ। সেই লোক আজ বিয়ে বাড়ীর দু'খানা বাসি লুচি হাতে করে এনে বলে কিনা বর্ষা আসছে, সমস্ত ঘর খারাপ হয়ে গেছে, বাড়ীর চাল ছাইতে হবে, পঞ্চাশ টাকা ধার দাও। হুঁঃ।

তুমি কি বল্লে? রেণু প্রশ্ন করেছিল।

আমি? আমিও বলেছি। আমি কি কাঁচা ছেলে নাকি? জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করে চুল পাকালুম, কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিতে বল্লে, মানে, এতটা বোকা আমি নই। আমি বল্লুম, শুধু হাতে কি করে দিই মামাবাবু, তবে যদি জমি-জারাৎ কিছু বন্ধক দিয়ে—তাতে কি বলে জান বল্লে, সে নাকি সমস্তই বন্ধক পড়ে আছে, ওৎরাতে পারেন নি।

তারপর?

তারপর আমিও জো পেয়ে গেলুম। বল্লুম, এ অবস্থায় তা হলে আর কি করে দিই বলুন? আমার ত এখন ধরুন না কেন দুটো সংসার, আমার না থাকলে কে দেবে?

রেণু নিরুত্তরেই শুনে গেল। বার বছর বয়সেই রেণু তার মামা এবং শ্রীপতি দুজনকেই চিনে নিয়েছে।

এর পর মামা আর কোনদিনই ওদের বাড়ী আসেন নি, কিন্তু বার দুয়েক এসেছিল ওর সতীনপোরা। একবার সতীনঝি এসেছিল তার এক দেওরকে সঙ্গে নিয়ে।

যেই আসুক, রেণুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। ওদের সংসারে একখানির বেশী কাঁসার থালা নেই, আর ভাল গেলাসও মাত্র একটিই ছিল। শ্রীপতি খেয়ে চলে গেলে সেই থালাতেই রেণু খেয়ে নিত; কাজেই একাধিক থালা কেনার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ শ্রীপতি কোনদিনই বুঝতে চাইলে না। এ ছাড়া খাদ্যবস্তুও বাড়ীতে যা থাকত

তা একেবারে মাপা, একজন লোক বেশী হলেই চক্ষুস্থির। তবে এ ভাবে চালানো রেণুর মামার বাড়ীতে দেখা ছিল এবং স্বামীর কাছে ভালভাবে অভ্যাসও হয়ে গেছে। ভাগ্য ভাল যে, বাড়ীর ছোট্ট উনানটিতে গোটা কয়েক কলাগাছ ছিল, তাই কলাপাতা পেতে অতিথির মান সম্মান রক্ষা হোত, তা না হলে—

সতীনপোদের সঙ্গে ঘরে তক্তপোষে বসে শ্রীপতির কথা-বার্ত্তা হচ্ছে এই অবস্থায় রেণু রান্নাঘরে খেতে বসল। কথায় কথায় কি হোল সে জানে না, হঠাৎ শ্রীপতির তিক্ত কণ্ঠ-স্বর শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে বড় সতীনপোও চেঁচিয়ে উঠল, বল্লে, ছি ছি, তুমি এমন পাষণ্ড কবে থেকে হলে? মেয়ের চেয়েও বয়সে ছোট ঐ এক রত্তি ছুঁড়িটাকে ঘরে এনে তুমি আমাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চাও?

বিরাশিশিক্কা ওজনের গলায় শ্রীপতি বল্লে চোপ্‌রাও, হারামজাদ। তুই এখনই আমার ঘর থেকে দূর হয়ে যা।

ছোট সতীনপো বল্লে, তা ত যাবই। তোমার এই পাপের সংসারে থাকতে আসিনি। তুমি বাপ না শয়তান?

রেণুর বুকটা কেঁপে উঠল। দু'তুটো ষণ্ডামার্কা ছেলে কি বুড়ো মানুষটাকে ধরে মারবে না কি?

শ্রীপতি উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিয়ে বল্‌লে, গেট্ আউট, গেট আউট রাস্কেল—

ছোট ছেলে তার চেয়েও উচ্চগ্রামে গলা চড়িয়ে বলে-ছিল, গেট্ আউট! শালা শূয়ারকো বাচ্চা। তোর বুকে পা দিয়ে জিভ্ টেনে বার করব—

সেদিন রান্নাঘরের মধ্যেই রেণুর সর্ব্ব শরীর ঠক্ ঠক্ করে কেঁপেছিল। ও চেষ্টা করেও কিছুতেই ওর কাঁপুনী বন্ধ করতে পারে নি।

কাঁছা আঁটতে আঁটতে শ্রীপতিবাবু ঘরের ভেতর থেকে ছিট্‌কে বাইরে দাওয়ার ওপোর লাফিয়ে পড়ে শুধু পায়ে উঠানে নেমেই বলেছিলেন, বাপের বেটা হোস্ ত এই-খানে থাকিস্, পাইক এনে তোদের হাড় একজাগায় মাস এক জায়গায় করে ছাড়ব, না হলে আমার নাম শ্রীপতি ঘোষাল নয়। টেনে দরজা খুলে শ্রীপতি ঘোষাল বেরিয়ে গিয়েছিল।

পেছনে পেছনে ছোট ভাই গর্জ্জন করতে করতে দাওয়ায় এসে বলেছিল, সে মাগীটা কই, তাকে আজ দু'খানা করে কেটে তবে আর কাজ—

রেণু তাড়াতাড়ি উঠে এটো হাতে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে পেছন থেকে দরজা চেপে দাঁড়িয়ে ছিল। সেখান থেকেই শুনতে পেলে, বড় ভাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নরম স্বরে ছোটকে বলছে, চল্ চল্, চলে আয়, আর থানা-পুলিস ফৌজদারীর হাঙ্গামায় দরকার নেই। ও শালাকে বাপ্ বলতেও ঘেন্না হয়।

ছোট বল্লে, না, আমি দেখতে চাই বুড়োর কত বাড় হয়েছে। বুড়ো ভেবেছে কি?

দু' ভাই কিছুক্ষণ তম্বিতাম্বা করে বোধ হয় বাড়ী থেকে বেরিয়েই গেল। তারপর অনেকক্ষণ চুপ্‌চাপ দেখে রেণু ভয়ে ভয়ে রান্নাঘরের দরজাটা অল্প ফাঁক করে এদিক ওদিক কোথাও কিছু দেখতে না পেয়ে ধীরে ধীরে বাইরে এসে সাহসে ভর করে শোবার ঘরে উঁকি দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠানের চারিধার দেখে দৌড়ে গিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ করে হাঁপাতে লাগল। কেবলই মনে হোতে লাগল, এমন জঙ্গলের মধ্যে বাড়ী, আশে পাশে একটা মানুষ নেই। দিন দুপুরে এত যে চেঁচামেচি হোল, তা কেউ শুনতেও পেলে না। ওরা যদি সত্যিই ওকে কেটে রেখে যেত, তাহলে কাক-পক্ষী কেউ কোথাও টেরও পেত না।

এরও বেশ কিছু পরে দরজার ওপোর ঘা পড়ল। পরিচিত আঘাত, তবে একটু জোরে। তবুও রেণু দরজার পেছনে এসে একেবারেই দরজা না খুলে জিজ্ঞাসা করলে, কে?

রাগতস্বরে শ্রীপতি বল্‌লে, আমি,—দরজা খোল।

দরজা খুলতেই শ্রীপতি বাড়ীতে এসে ঢুকল। তারপর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পায়ে পায়ে রেণু এসে তক্তপোষের ধারে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মৃদুস্বরে বল্‌লে, কি হোল, এত রাগারাগি?

হবে আবার কি, টাকা দাও, শ্রীপতির কথায় তখনও বেশ ঝাঁজ।

সেদিন রাত্তিরে রেণু একটু অভিযোগের স্বরে বলে-ছিল, তুমি ত বেশ লোক! ঐ দুই বাঘ ভালুকের মুখে আমাকে ফেলে দিয়ে বাড়ী ছেড়ে পাইক আনতে গেলে। ওরা যদি আমাকে কেটে রেখে যেত?

অম্‌নি নাকি? আমি বুঝি দূরে কোথাও গিয়েছিলুম?

তবে? তুমি রাজবাড়ী থেকে পাইক আনতে যাও নি?

কোথায় পাইক? পাইক ঘুমুচ্ছে, খিঁচিয়ে উঠে শ্রীপতি উত্তর দিয়েছিল।

তাহলে কোথায় গিয়েছিলে?

কোথায় আবার যাব? সদরের দক্ষিণে ঝোপের ভেতর বসেছিলুম। মড়া দুটো বেরিয়ে বাগান পার হয়ে নয়নজুলির সাঁকো টপকে চলে গেল দেখে তারপর আমি সদরে ঘা দিলুম।

ওমা সেকি? তা হলে ওরা যদি আবার আসে? অন্য কোন দিন?

হুঃ, আসবে? ভয় নেই প্রাণে? এবার এলে বড় বাবুকে বলে ওদের কি করি একবার দেখো।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে রেণু বলেছিল, আমার বাপু ভয় করে, সারাদিন বাড়ীতে একলাটি থাকি, চেঁচিয়ে মরে গেলেও ধারে কাছে এমন কেউ নেই যে একটা রা কাড়বে।

তোমার আবার ভয় কি? তোমার ত টাকা নেই যে তোমার কাছে জুলুম করতে আসবে?

রেণু বল্লে, ওগো না, তোমার ছোট ছেলে বল্‌ছিল আমাকে কাটবে।

কাটবে? তা কাটাই উচিত। তোমাকে কাটলে তুমিও বাঁচ আমিও বাঁচি। বিয়ে করে যে কি ভুল করেছি, ছি ছি—

সে রাত্রে রেণু আর একটি কথাও বলে নি।

প্রায় এক বছর পরে বড় ভাই আরও একবার এসেছিল। এবার একা, ছোটকে আনে নি।

এবার ওদের বাপ-বেটায় কোন ঝগড়া হয় নি। কিন্তু ভাবগতিকে রেণু বুঝেছিল, শ্রীপতি কেমন যেন হতাশ ও মন-মরা হয়ে উপরি-উপরি কটা দিন কাটালে। পরে অবশ্য সামলে নিয়েছিল।

আরও ছ' মাস আটমাস পরে একদিন এসেছিল ওর বিধবা সতীন-ঝি সে আবার থেকেও গেল বেশ কিছু দিন। তার কাছ থেকে রেণু ওদের ঘরের কথা কিছু কিছু শুনেছিল।

সে বল্লে, বড়দা ঘুঘু লোক। বাবাকে দিয়ে ছোট ভাইকে ত্যাজ্য পুত্তুর লিখিয়ে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বেদখল করিয়ে দিয়েছে। সে বেচারীর বিয়েও হয় নি, মনের দুঃখে সে যুদ্ধে নাম লিখিয়ে কোথায় যেন মেছোটুমি (মেসোপটেমিয়া) আছে সেইখানে চলে গিয়েছে। তারপর বড়দা আমাকে বল্লে, তুই শ্বশুরবাড়ীর অধিকার ছাড়িস নি। হাজার হোক, সেইটাই তোর নিজের, তোর খাওয়া পরার দাবী আছে তারা দিতে বাধ্য। তা আমি ভাই সেই জন্যে—একটু থেমে বল্লে ভাই বলে ফেলেছি বলে কিছু মনে কোরো না যেন—

রেণু বল্লে না না তারপর—

সে বল্লে তারপর সেই শ্বশুরবাড়ীতে আজ প্রায় তিন মাস হোল ছিলুম। কিন্তু সেখানে এমনই অবস্থা যে একদিনও আর টেঁকা যায় না। উদয়াস্তের খাটুনি, বিধবা ননদের গঞ্জনা জায়েদের চিপ্‌টেন প্রাণ একেবারে অতিষ্ট হয়ে উঠল। দাদাকে চিঠি লিখলুম বাবাকে চিঠি লিখলুম কেউ কোন উত্তরই দিলে না। তারপর দেওরকে সঙ্গে নিয়ে দেশের বাড়ীতে গিয়েছিলুম, দাদা তখন ঘরেই ছিল কিন্তু তেড়ে বেরিয়ে এসে বলব কি দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে বলতে বলতে মেয়েটা কেঁদে ফেললে।

রেণু দাওয়ার ওপোর বসে বসে অবাক হয়ে শুনছিল কোন উত্তর পর্য্যন্ত দেয় নি।

একটু সামলে নিয়ে সে বল্লে তখন আর কি করি? দেওর বল্লে চলো বউদি তোমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাই। যা হোক ঐ ছোট দেওরই আমার দুঃখ বুঝতো আমাকে একটু যত্ন আত্তিও করত। কিন্তু ও আর কি করবে ওর ত কোন উপায়-পত্তর নেই। আমি বল্লুম তাই চলো। তাই সেই দিনেই ধুলো পায়ে দেশের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এখানে এসে খোঁজ করে এ বাড়ীতে আমি ঢুকলুম আর দেওর বাইরে থেকেই চলে গেল। সে বোধ হয় ভেবেছিল এখান থেকেও তোমরা তাড়িয়ে দেবে সেই জন্য বাড়ীতে না ঢুকেই সে পালিয়ে গেল।

চোখের জল মুছতে মুছতে এই সব কাহিনী বলেছিল সেই বিধবা মেয়েটা।

যেদিন ও এল, সেই রাত্তিরে শোবার ঘরে তক্তপোষের বিছানায় রেণু মশারী ফেলে শ্রীপতির জায়গা করে নিজে মেয়ের সঙ্গে মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মশারী না থাকায় ওরা দু'জনে সারারাত ঘুমুতে পারে নি। আর শ্রীপতিও ঘুমিয়েছে বলে মনে হোল না, সারারাত

সশব্দে এপাশ ওপাশ করে কাটিয়েছিল, মাঝে মাঝে বিড়ি ধরিয়ে ঘরের মেঝেয় রেণুদের মাদুরের পাশে, হয়ত বা মাদুরের ওপোরই দেশলাই-এর পোড়া কাঠি, পোড়া বিড়ির টুক্‌রো এবং ছাই ফেলেছিল।

পরের দিন দুপুরে এক ছুতার এসে হাজির। বল্লে, রান্নাঘরের দরজায় হুড়্‌কা বানাতে বাবু পাঠিয়ে দিলেন। রান্নাঘরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

সেদিন সন্ধ্যের পর শ্রীপতি বাড়ী এসে ফতোয়া দিলেন, মেয়ে রান্নাঘরে মাদুর পেতে শোবে।

এইভাবেই কেটে গেল বেশ কিছু দিন। মা ও মেয়ের মধ্যে খিটিখিটি যে হোত না তা নয়, কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু মেয়ের একটা ব্যবহারে রেণু বড়ই শঙ্কিত হোত, সে রোজ দুপুরে শ্রীপতিবাবু খেয়ে বেরিয়ে গেলে পাড়া বেড়াতে বেরুত এবং সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসত। জিগ্‌গেস করলে বলত, বাড়ীতে ভাল লাগে না, তাই একটু বেড়াতে যাই।

তা বেড়াতে যায় যাক, কিন্তু একদিন রেণু দেখলে সকাল দশটা নাগাধ এক ভদ্রলোক ওদের বাড়ীর দরজার ধারে দাঁড়িয়েছে এবং রেণুর সতীনঝি তার সঙ্গে কত কি কথা কইছে। লোকটা চলে যেতে রেণু বলেছিল, ও কে?

ও আমার দেশের লোক, এখানে এসেছিল তাই দেখা করে গেল।

রেণু বলেছিল, তা বাইরে কেন, ভেতরে এনে বসাতে হয় ত।

রেণুর দিকে পিট্‌পিট্‌ করে চেয়ে সতীনঝি বলেছিল, আসতে চাইলে না, ওর খুব তাড়া ছিল কিনা।

রেণু এ কথার কোন জবাব দেয় নি, কিন্তু কেমন যেন —যাক গে।

এর পর সেই ভদ্রলোক আরও একদিন বিকেলের দিকে এসেছিল, রেণু স্বচক্ষে দেখেছে। সেদিন বাবার খাওয়ার পর সতীনঝি কোথাও বেড়াতে যায় নি, বাড়ীতেই ছিল। এমনটা কিন্তু হোত না, যাই হোক, ভদ্রলোক এসে দরজায় টুক্ টুক করে ঘা দিয়েছিল, রেণু দাওয়া থেকে নামবার আগেই সতীনঝি ওকে পাশ কাটিয়ে দৌড়ে দরজা খুলতে গিয়েছিল, যা সে কোনদিনই করত না। তারপর দু' মিনিটেই কথা শেষ করে ফিরে এসেছিল। রেণু বলেছিল, কে? তাচ্ছিল্যের সুরে সতীনঝি বলেছিল, ও একটা ছেলে, ঐ ও বাড়ী থেকে এসেছিল, বলেই যেন নিজের রান্নাঘরে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে কথায় কথায় বলেছিল, ওদের বাড়ী যাই নি বলে ওর দিদি খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিল। রেণুর কানে ঐ কথাগুলো যেন কৈফিয়তের মত লেগেছিল। সে কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করে নি। সে যে স্বচক্ষে দেখেছে ঐ ভদ্রলোককে দরজার ফাঁক দিয়ে।

পরেরদিন ভোরবেলা শ্রীপতিবাবু যথারীতি ঘর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ যেন চেঁচিয়ে উঠলেন, ও কি সদর দরজা খোলা কেন?

ঘুম-চোখে রেণু বেরিয়ে এসে দেখলে, সদর দরজার হুড়কো খোলা, কিন্তু ভেজানো আছে। রান্নাঘরের দিকে নজর দিয়ে দেখলে, দরজা যথারীতি বন্ধই আছে। কিন্তু জলের ঘটিটা পর্য্যন্ত ঠিক আছে, চুরি যায় নি।

সতীনঝিকে ডাকার জন্য দরজা ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। ঘরে কেউ নেই। মাদুরটা পড়ে আছে এবং মাদুরের ওপোর একখানা সাদা কাগজ।

কাগজটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেই শ্রীপতি ঘরে এসে বল্লে, কোথায় সে, এরই মধ্যে উঠে বাইরে গেছে বুঝি? সেই বোধ হয় দরজা খুলেছে? রেণুর হাতে কাগজ দেখে শ্রীপতি বল্লে, ওটা কি? দেখি।

রেণুর হাত থেকে কাগজ নিয়ে সেটার ওপোর চোখ বুলিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে শ্রীপতি বলেছিল, এ কাগজ তুমি কোথায় পেলে? কে দিয়েছে তোমাকে?

শ্রীপতির তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভীত হয়ে রেণু বলেছিল, এইখানে —এই মাদুরের ওপোর ছিল।

ঠিক বলছ? সত্যি কথা? শ্রীপতি অবিশ্বাসের কাঠিন্যে প্রশ্ন করেছিল।

মিথ্যে বলব কেন, রেণু ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে।

তুমি পড়তে জান?

এটা যেন পরিহাস! রেণু যে লিখতে পড়তে জানে না তা শ্রীপতি ভালভাবেই জানে। তবুও এই প্রশ্নে রেণুর অতি দুঃখেই হাসি এল। ঘাড় নাড়লে, না।

হুঁ, গম্ভীর অথচ ম্লান হুঙ্কার ছেড়ে শ্রীপতি কাগজখানা হাতের মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভেবে দাওয়ার কুলুঙ্গী থেকে একটা দাঁতন কাঠি বার করে বেরিয়ে গেল।

রান্নাঘরে শেল্‌ফে সতীনঝির বাক্সটা নেই, দড়ির আল্‌নায় তার গামছাটাও নেই, কাপড় ত নেইই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে রেণুর মনে হোল—

শ্রীপতি ফিরে এসে বল্‌লে, কই গো, কোথায়?

রেণু ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

শ্রীপতি বল্‌লে, দেখ ত, ওর জিনিষপত্র যা ছিল সব আছে কিনা?

রেণু বল্‌লে, দেখেছি, কিছু নেই। আমার ডালা দেওয়া আরসীটা পর্য্যন্ত নেই।

হুঁ। আর একটি গম্ভীর হুঁ দিয়ে শ্রীপতি চলে গেল।

সেদিন বাড়ী থেকে বেরোবার সময় শ্রীপতি বল্‌লে, মেয়েমানুষকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই, শাস্ত্রবাক্য। আমি বিশ্বাস করে ভুল করেছিলুম। বলে ঘর থেকে তালা বার করে সদর দরজার বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে সেরেস্তায় চলে গেল। রেণু অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল, কিচ্ছুটি বলে নি।

সেইদিন থেকে রেণু প্রতিদিন চাবি-বন্ধ থাকত। দুপুরে খেতে আসবার সময় শ্রীপতি নিজে হাতে তরীতরকারী, বাজার, চাল-ডাল সমস্ত নিয়ে আসত। সেগুলো পরের দিন রান্না হোত। তবে যদি কোনদিন মাছ আনত, তা হলে তখুনি কুটে ধুয়ে রান্না করতে হোত। এতে শ্রীপতির খাওয়ায় একটু দেরী হোত, কিন্তু উপায় কি? অবশ্য মাছ বড়-একটা আসত না, তবে মাসের একাদশী দু'টোয় শ্রীপতি নিশ্চয়ই মাছ আনত, সকালে না হলেও বিকেলে অবশ্যই আনবে। একাদশীতে বউকে মাছ না খাওয়ালে নিজেরই বিপদ কিনা, বোধ হয় সেই জন্যেই। এক একদিন কালে-ভদ্রে মাংসও আনত। সেদিন সকাল সকাল এসে নিজে হাতে মাংস রান্না করত এবং রেণুকে শিখিয়ে দিত কি ভাবে রান্না করতে হয়। [ক্রমশঃ

গতিহারা

শ্রীরাধাবল্লভ দেবনাথ

শীতের প্রচণ্ড রাত্রি নিস্তব্ধ নগরী,
থেমে গেছে দিবসের কর্ম কোলাহল,
জানি শুধু রক্ষীকুল অতন্দ্র প্রহরী —
পেশাদারী পাড়াগুলো—তারাও চঞ্চল।
মাঝে মাঝে আসে যায় চক্রযানগুলো,
বিচুর্ণিয়া যামিনীর শীত-নিদ্রা-সুখে (?)
বাজে ভেঁপু মাঝে মাঝে শিল্পপাড়া হ'তে—
যন্ত্রের দানবগুলো শান্ত হ'বে পীড়ন চাবুকে।
চলেছিনু পথে একা বড় প্রয়োজনে,
মেয়েলি কণ্ঠের ডাকে চাহিনু পশ্চাতে—
জিজ্ঞাসিল কাছে আসি আকুল বচনে,
"খোকন সোনারে মোর দেখেছেন পথে?"
বুঝিলাম—পুত্রহারা জননীর শোকার্ত্ত বিলাপ,
বিশাল প্রাসাদ তাঁর—রুধিতে পারেনি
তবু শোকানল-তাপ
আবার চলেছি পথে ফুটপাথ ধরে,
অজস্র চিন্তার স্রোতে বাধা নাহি মানে,
অকস্মাৎ পড়ে গেছি কিসের উপরে—
ঝটিকায় বুঝেছিনু "মাগো" রব শুনে।
হেথাও রয়েছে প্রাণী ছিন্ন বস্ত্রে তনুখানি ঢাকি
কুণ্ডলী পাকায়ে দেহে যম-শীতে দিতে ব্যর্থ ফাঁকি।

বিপুলা এ ধরণীর কত হাসি কত অশ্রুজল,
গতিহারা এ প্রবাহে সতত চঞ্চল।

কোন পথে?

শ্রীজ্ঞান

ছাত্রদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছি—তোমাদের মনে আছে কি? হয়ত নেই, কিংবা মন দিয়ে পড়ও নি—তাই না? উপদেশ শোনা আজকাল যেন সেকেলে হয়ে গেছে। দিতে অনেকেই চায়, কিন্তু দুর্ভাগ্য ব'লে নিতে যেন কেউই চায় না! বিশেষ করে তরুণেরা তো আজ কাল সবাই সবজান্তা হয়ে পড়েছে বলেই মনে করে বলে অপরের কথায় কান দিতেই চায় না! গুরুজনদের উপদেশ, অভিভাবকদের আদেশ, শিক্ষকদের নির্দ্দেশ, আত্মীয়-স্বজনদের উপরোধ, বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ কিছুই যেন তাদের গ্রাহ্যের মধ্যে নয়! তারা মনে করে তারা যা ভাবছে, তারা যা করছে তাই সত্য সঠিক, তাছাড়া সব কিছুই বেঠিক—অসত্য। কিন্তু আগের যুগে এরকম ছিল না—আগের যুগ ও আজকালকার কালের মধ্যে তুলনা আমি করছি না, কোন্ যুগ ভাল তাও বলছি না, শুধু এইটুকু বলছি যে আগেকার কালের তরুণেরা ছিল বিনয়ী। বিদ্যার অহঙ্কার, জ্ঞানের গর্ব্ব তাদের ছিল না। কারণ তারা জানত বিদ্যার শেষ নেই, জ্ঞানের অন্ত নেই এবং তাদের চেয়ে জ্ঞানী ও গুণী লোক চতুর্দ্দিকেই রয়েছেন। তাদের সেই নিরহঙ্কার ব্যবহার গুরুজন, শিক্ষক, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা—অন্যায়, দুর্নীতি ও কুকার্য্যের প্রতি ঘৃণা—শালীনতা বোধ, সংযম বোধ, ধৈর্য্যশীলতা, নীতিজ্ঞান, ধর্ম্ম প্রাণতা, নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণের জন্য সেকালের তরুণেরা বা ছাত্রসমাজ সকলকারই শ্রদ্ধার পাত্র ছিল—সকলেরই স্নেহ, ভালবাসা আশীর্ব্বাদ তারা পেত। তাই তাদের মধ্যে থেকেই দেশ জননী পেয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি সু-সন্তানদের। কিন্তু এখন?—এখানকার এই ছাত্র-সমাজের মধ্যে থেকে কি বেরুবে এই রকম সন্তান?—তোমরাই এর জবাব দাও। ভেবে দেখ তোমাদের মধ্য থেকে কি ঐ রকম মনীষীর সন্ধান পাওয়া যাবে? কিন্তু সেকালে পাওয়া গেছল। পরাধীন ভারতের মাটিতেই এই সব মহামানবের জন্ম সম্ভব হয়েছিল। কারণ তারা ছিল নিষ্ঠাবান, ধর্ম্মপ্রাণ, সংযমী ও বিনীত। তাই তাঁরা নিজেরা বড় হয়ে দেশকে ও জাতিকে দিতে পেরেছিলেন নেতৃত্ব, দেখাতে পেরেছিলেন পথ, সাধারণের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন অনেকখানিই। কিন্তু একালের নেতৃত্ব কোন্ পথ দেখাচ্ছে? তরুণ মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে কোন্ পথে নিয়ে চলেছে ছাত্রসমাজকে? কি গঠনমূলক কাজ আজ তরুণেরা করছে? কোন্ নীতি তারা আজ অনুসরণ করছে?—ভাঙ্গার না গড়ার? কি বিদ্যা তারা আজ অর্জ্জন করছে শিক্ষায়তনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে? বিনয়ী হবার, নীতিবান হবার, সংযমী হবার শিক্ষা? না অবিনয়ী দুর্বিনীত, অসংযমী হবার শিক্ষা? এ সবের উত্তর

তোমাদের কাছেই চাইছি। তোমরা ভাব, ভেবে বল এর উত্তর।

আজ শুধু চোখে পড়ে ধ্বংসের লীলা। ছাত্র বিক্ষোভে সারা ভারত আজ বিক্ষুব্ধ! শিক্ষায়তনগুলির দরজা বন্ধ। শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে চরম অরাজকতা! কিন্তু কেন? কি এর কারণ? তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত বলবে আজকালকার ছেলেদের অনেক কষ্ট, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা এখন দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে বলেই এই সব বিক্ষোভ। সেখানেই জিজ্ঞাস্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেয়েও কি একালের ছেলেদের বেশী কষ্ট করে বিদ্যা শিক্ষা করতে হয়? আলোকের অভাবে রাস্তার গ্যাসের আলোতে কি তাদের পড়তে হয়? সারা রাত জেগে পড়াশুনা করবার জন্যে কি চোখে জ্বালাকর প্রদীপের তেল লাগিয়ে ঘুম তাড়াতে হয়? একালের ছাত্রদের কি মাইলের পর মাইল হেঁটে বা সাঁতরে নদী পেরিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হয়? বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্রের মতন কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ক ন ছাত্র একালে দেখতে পাওয়া যায়? যা কিছু শিক্ষা করতে যাও তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে—কষ্ট স্বীকার করতে হবে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সত্যই দুর্ব্বহ কিন্তু তাই বলে ধ্বংসের তাণ্ডবে মেতে, জাতীয় সম্পদের যথেচ্ছ ক্ষতি সাধন করে কি প্রতিকার হবে? স্কুল কলেজ বন্ধ রেখে বিরাট ছাত্র সমাজের প্রভূত ক্ষতি করে কি লাভ হবে?—এ সব কি তোমরা ভাববে না? এতো তোমাদেরই ভাববার কথা—ভাববার দিন এসেছে। এবার ভেবে দেখ তোমরা কোন পথে চলবে। সৃষ্টির পথে, না ধ্বংসের পথে? তোমাদের বিরাট সৃজনী শক্তিকে কাজে লাগাবে, না ভুল পথে পা দিয়ে শুধু নিজেদের এবং জাতির ক্ষতিই করবে? এর উত্তর তোমরাই দিতে পারবে।

আমাজানের জঙ্গলে

শ্রীমতী ফুল্লরা রায়

দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম নদী আমাজান। বিষুবরেখা ব্রাজিলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, নিরক্ষীয় গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমাজান নদী প্রবাহিত। আমাজান অঞ্চল এই সেদিন পর্যন্ত ছিল সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, আজও নিরক্ষীয় জঙ্গলের গভীরের সঙ্গে অবশিষ্ট পৃথিবীর যোগাযোগ একরূপ বিচ্ছিন্নই হয়ে আছে। এই জঙ্গলের সম্পদ অসীম, কিন্তু আজও তার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

এই জঙ্গলে বাস করে 'বানিভা' নামে একটি আদিম জাতি। পৃথিবীর অন্যান্য মানবগোষ্ঠী থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আসছে। তবে তাদের সুসভ্য ক'রে তোলার বিবিধ প্রচেষ্টা এখন হচ্ছে।

দুর্গম অরণ্যে বসতকারী বানিভারা মিশনারীদের সংস্পর্শে আসার আগে এই সেদিন পর্যন্ত একেবারে বন্য হয়েই ছিল। কৃষিকাজ তাদের মধ্যে একরূপ অজ্ঞাতই ছিল। মাংসাশী বানিভারা হরিণ ও বুনো হাঁস শিকার ক'রেই দিন কাটায়। তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্রের চাহিদা তাই অলঙ্কারের চেয়েও বেশী। য়ুরোপীয় উপনিবেশকারীরা অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়েই তাদের বশে রেখে আসছিল।

বানিভারা আকারে খবকায়; সমশ্রেণীর কঙ্গোর জঙ্গলের পিগ্‌মিদের সঙ্গেই তাদের দেহাকৃতির সবিশেষ মিল লক্ষিত হয়। অত্যন্ত গরম আবহাওয়ার জন্য তাদের বস্ত্রের প্রয়োজন খুবই কম। কিন্তু শিল্পে তাদের নৈপুণ্যও আছে। উৎসব সমারোহের জন্য তাদের নানা বর্ণের পোশাক দেখলে তাদের এই বস্ত্রশিল্পনৈপুণ্য উপলব্ধি করা যায়।

এই সব আদিম জাতির মধ্যে কত যে সুপ্ত শিল্পচাতুর্য আছে তা বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হলে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কাঠ খোদাই ও বেতের ঝুড়ি তৈরীর দক্ষতা বানিভাদের অশেষ।

পৃথিবীর সকল আদিবাসী সমাজেই তন্ত্রমন্ত্রের আধিপত্য। বানিভারাও তন্ত্রগুরু, ওস্তাদ্ গুণীদের শাসনেই বাস করে।

বানিভাদের এই সব তান্ত্রিকদের বাস্তবিকই নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি আছে। বংশানুক্রমে প্রাপ্ত সহজাত শক্তি ঠিক এগুলি নয়, রীতিমত অনুশীলন ক'রে তা অর্জন করতে হয়।

ওঝাদের রীতিমত শিক্ষানবীশ কেন্দ্র আছে, সেখানে যারা বেশ মেধাবী প্রকৃতির, তাদেরই ভর্তি করা হয়।

বহুবিধ কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে তাকে এগোতে হয়। শিক্ষানবীশদের গায়ে ঘোর লাল রঙ দিয়ে দেওয়া হয়—সাধারণ লোক তখন তাকে সাধ্য পক্ষে এড়িয়েই চলে।

বালকদের এক-একটি উপদেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়। উপদেবতার হাত থেকে বাঁচার জন্য বালকদের পায়ে ফাঁপা সুপারি বেঁধে দেওয়া হয়—চলার সময়ে সে-গুলি ঝুমঝুম ক'রে বাজে। দক্ষিণ আমেরিকার জন্তু আর্মেডিলার খাবা আর জাগুয়ারের দাঁত দিয়ে তৈরি বিশেষ একশ্রেণীর কবচও তাদের হাতে পরিয়ে দেওয়া হয়।

যেদিন তাদের শিক্ষানবিশী শেষ হয়, সেদিন তাদের গলায় একটা চকচকে স্ফটিকের কবচ পরিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর ওঝা নিজে আলাদা 'চেম্বার' খোলে। সেখানে ভূত নামানোর নানা প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। তাদের সঙ্গে থাকে পাখীর পালকে শোভিত লাউএর খোলে তৈরি ঘন লাল পান পাত্র, জাগুয়ারের দাঁত আর আর্মেডিলার থাবার বিশেষ কবচ, গাছগাছড়া, পশুলোম ও অন্যান্য মন্ত্রপুত টুকিটাকি জিনিস।

নবজাত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও অর্পিত হয় তাদের উপর। নবজাত শিশুকে উপদেবতাদের হাত থেকে সযত্নে রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় এই সব গুণীন্‌দের উপর। আসন্নপ্রসবাদের সবিশেষ যত্নের সঙ্গে তাদের হেপাজাতে রাখা হয়। সেই সঙ্গে সন্তানের জনকও সেই কক্ষে আশ্রয় নেয়।

সন্তান-জন্মের পরেই বানিভা-স্ত্রীলোকদের দৈনন্দিন গৃহকর্মে লিপ্ত হতে হয়—কিন্তু শিশুর পিতাকে তখনও অনেকদিন শিশুকে নিয়ে গুণীন্‌দের গৃহে বসবাস করতে হয়। শিশুর পিতা-মাতা উভয়কেই বহুদিন পর্যন্ত খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়।

শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে শিশুর পিতার উপর নির্ভর করছে। শিশুকে সারারাত ধরে পিতাকেই পাহারা দিতে হয়।

নরখাদক বানিভারা চিরকালই দুর্দান্ত ও হিংস্র প্রকৃতির। সভ্য সমাজের জনগণ কোনদিনই তাদের সংস্পর্শে আসতে সাহস করে না। কিন্তু তারাই নিজেদেরই সন্তানকে কতটা আদরে প্রতিপালন করে দেখলে বিস্মিতই হতে হয়।

বানিভাদের অত্যন্ত আদরের খাদ্য পিঁপড়ে। এখান-কার জঙ্গলে এক শ্রেণীর পিঁপড়ে আছে সেগুলি এক ইঞ্চির চেয়েও লম্বা। এই পিঁপড়েগুলি ধরে ধরে ভেজে বা ঝল্‌সে নিয়ে বানিভারা খেয়ে থাকে।

এদের আর একটি বীভৎস খাদ্য আছে! পরিবারের কেউ মারা গেলে তার দেহাবশেষ কিছুদিন মাটির তলায় রেখে তা তুলে এনে তা দিয়ে এক পানীয় তৈরি ক'রে বানিভারা খেয়ে থাকে। আদিম অধিবাসীদের বিশ্বাস এর ফলে মৃত ব্যক্তির আত্মা শান্তি লাভ করবে।

ব্রাজিলের সরকার বহু চেষ্টা ক'রেও এই আদিম প্রথা সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারেন নি!

——
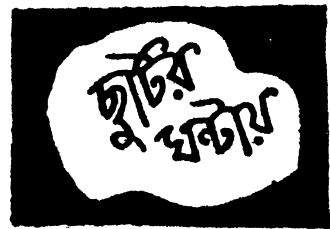
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের আরেকটি আজব মজার খেলার কথা বলছি। খেলাটি কিন্তু আসলে—রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার বিচিত্র এক ধরণের বৈজ্ঞানিক কৌশল। এ খেলার নাম 'বহুরূপী রঙের বিচিত্র লীলা'।

ছুটির দিনে আত্মীয় বন্ধুদের জমজমাট আসরে বহুরূপী-রঙের এই লীলা বৈচিত্র্যের আজব কারসাজি দেখাতে হলে

নিতান্তই ঘরোয়া ধরণের বিশেষ যে কয়েকটি উপকরণ দরকার, গোড়াতেই সেগুলির মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খেলা দেখানোর জন্য চাই—গোটা দুয়েক টাট্‌কা জবাফুল, একটি পাতি লেবু, একখানি ধারাল ছুরি, একখানা সাদা কাগজ, এবং এক পেয়ালা চুণ-মেশানো জল। ফর্দ্দমত এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, আসরে আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে কায়দা মতো খেলার আজব-কারসাজি দেখানোর পালা।
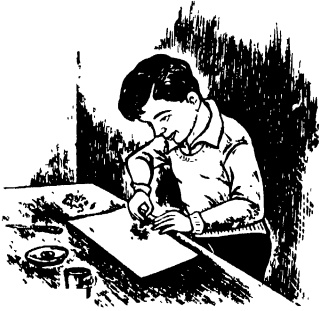
খেলা দেখানোর সময় আসরে ছোট একটি টুল কিম্বা টেবিলের উপর উপকরণগুলিকে পরিপাটি ভাবে সাজিয়ে রেখে ওস্তাদ যাদুকরের মত ভঙ্গীতে প্রথমেই দর্শকদের সামনে শাদা-কাগজের টুকরোখানা মেলে ধরে তাঁদের সবাইকে দেখিয়ে দাও যে সেটির কোথাও কোনো রঙের চিহ্ন নেই—আগাগোড়া দিব্যি ধবধবে পরিচ্ছন্ন এবং বেদাগ। দর্শকের দল কাগজখানা পরীক্ষা করে দেখে, তোমার কথা মেনে নিলে, সুরু করে দাও—খেলার আজব কারসাজি। অর্থাৎ টুল বা টেবিলে সাজানো খেলার সাজ-সরঞ্জামগুলির মধ্যে থেকে জবাফুলের গোটা কয়েক পাপড়ি ছিঁড়ে নিয়ে হাতের আঙুলের চাপ দিয়ে বেশ ভালোভাবে ঘষে দাও ঐ শাদা কাগজের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখের সামনেই শাদা কাগজের উপর ক্রমশঃ ফুটে উঠবে দিব্যি গাঢ়-টুকটুকে লাল রঙের ছোপ। শাদা কাগজের গায়ে লাল রঙের ছোপ ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদের সবাইকে জানিয়ে দিও যে এ রঙটি কিন্তু আসলে লাল নয়।—বহুরূপী…ক্ষণেক পরেই বদলে নীল হয়ে যাবে। দর্শকদের দলের অনেকেই হয়তো তোমার এ কথা বিশ্বাসই করবে না…এমন কি উপহাস করবে। কিন্তু খানিক বাদেই তাঁরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে অবাক হবেন—তোমার হাতের ঐ শাদা কাগজখানার গায়ে লাল টুকটুকে যে রঙটি দেখ্‌ছিলেন এতক্ষণ, সে রঙ যেন কোন যাদুমন্ত্রের প্রভাবে ক্রমেই নীল হয়ে যাচ্ছে। এ-ধরণের আজব ঘটনা দেখে তাঁরা যখন বিস্ময়ে অভিভূত তখন তাদের চোখের সুমুখেই শাদা ঐ কাগজখানার গায়ে নীল রঙের ছোপ ধরা জায়গাটিতে টুল বা টেবিলের উপরে সাজিয়ে রাখা সদ্য কাটা পাতিলেবুর এক টুকরো নিঙ্‌ড়ে কয়েক ফোঁটা রস ফেলে দাও। তাহলেই দর্শকেরা সবাই দেখবেন, শাদা কাগজের গায়ে এতক্ষণ যে নীল রঙের ছোপ ধরেছিল সেটি ক্রমেই আবার বদলে আগের মতোই টুকটুকে লাল রঙের হয়ে উঠেছে।

চোখের সুমুখেই তাজ্জব এই ব্যাপার ঘটতে দেখে আসরের দর্শকেরা শুধু যে বিস্ময়ে অবাক হবেন তাই নয়, মনে মনে এবং মুখেও তোমার কসরতীর রীতিমত তারিফ করবেন। তখন সুযোগমতো দেখাও তোমার আজব কেরামতীর বাকী কায়দা কৌশল।

এবারে শাদা কাগজের ঐ লাল রঙের ছোপধরা জায়গাটিতে টুল বা টেবিলের উপরে পেয়ালাতে রাখা চুণ মেশানো জলের দু'চার ফোঁটা ফেলে দাও। তাহলেই দর্শকরা অবাক-বিস্ময়ে দেখবেন যে শাদা কাগজের গায়ে এতক্ষণ যে লাল ছোপ ছিল, সেটি পুনরায় বদলে গিয়ে নীলবর্ণ ধারণ করেছে। এ মজা আরো জমবে, যদি এবার ঐ শাদা কাগজের গায়ে নীল রঙের ছোপের উপর আরেকবার কয়েক ফোঁটা পাতি লেবুর রস ছড়িয়ে দাও। দিলেই দেখবে—নীল রঙ পুনরায় বদলে গিয়ে আগের মতোই দিব্যি টুকটুকে লাল রঙে রূপান্তরিত হয়েছে। এই হলো 'বহুরূপী রঙের' আজব মজার লীলা।

এমনটি কেন ঘটে জানো? শোনো তাহলে, এই বহুরূপী-রঙের বিচিত্র লীলা-রহস্যের আসল মর্ম্ম। তোমাদের মধ্যে যারা বিজ্ঞানের ছাত্র, তারা হয়তো অনেকেই এ খেলার রহস্যের সন্ধান জানো। এমন আজব কাণ্ড ঘটে আসলে রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কয়েকটি পদার্থের রূপান্তরের ফলে। রসায়ন বিজ্ঞানের বিশিষ্ট পদার্থ এই জবাফুলের রসকে ইংরেজী ভাষায় 'লিটমাস' (Litmus) বলা হয় এবং জবাফুলের রস মাখানো কাগজের নামও তাই দেওয়া হয়েছে— 'লিটমাস-কাগজ' (Litmus-

paper)। লেবুর রস বা অম্ল-জাতীয় পদার্থকে রাসায়নিকেরা ইংরাজীতে 'এ্যাসিড' [Acid] এবং চুণ অর্থাৎ ক্ষার জাতীয় পদার্থকে 'এ্যালকা'ল' (Alkali) নামে অভিহিত করে থাকেন। বিচক্ষণ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে 'এ্যাসিড' আর 'এ্যালকালি' উভয়ের মধ্যেই রীতিমত দ্বন্দ্ব-ভাব আছে··· অর্থাৎ, পরস্পর পরস্পরের শক্তি নাশ করে। কাজেই কোনো পদার্থ অম্ল' (Acid) কিম্বা ক্ষার জাতীয় (Alkali) রাসায়নিক প্রক্রিয়ার যথার্থভাবে পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিজ্ঞানীরা ছোট বড় সকল গবেষণাগারেই (Laboratory) হামেশাই এমনি ধরণের 'লিটমাস কাগজ' (Litmus paper) ব্যবহার করেন। 'লিটমাস-কাগজের' সাহায্যে অম্ল (acid) এবং ক্ষার জাতীয় পদার্থকে বৈজ্ঞানিক-উপায়ে ও রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় যাচাই করে দেখা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আজব-মজার এই 'বহুরূপী রঙের বিচিত্র লীলা কৌশল।"

এই প্রক্রিয়াতেই আরেক ধরণের আজব মজার কারসাজি দেখিয়ে লোকজনকে রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দেওয়া যায়। সে খেলাটির কলা-কৌশলের কাহিনী তোমাদের আগামী সংখ্যায় জানাবো।

মনোহর মৈত্র

নক্সা-হাঁটাইয়ের আজব হেঁয়ালী :
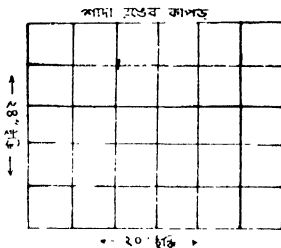
আকাশ-চুম্বী হিমালয় পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ দুর্গম শিখর-চূড়া অভিযানে বেরিয়েছিল বাঙলাদেশেরই বীর-সাহসী একদল তরুণ অভিযাত্রী···সঙ্গে তাদের নানান সরঞ্জাম—তাঁবু, অক্সিজেন-সিলিণ্ডার, ম্যাপ, দূরবীন, ক্যামেরা, পশমী সাজ-পোষাক, বিছানা-কম্বল, খাবারদাবার, ওষুধপত্র, লাঠি দড়ি, কুড়ুল-কোদাল-খোন্তা—এমনি একরাশ লটবহর···এবং পথের সঙ্গী সুদক্ষ কয়েকজন পাহাড়ী শেরপা। অভিযানে বেরিয়ে দুরন্ত দুর্গম বিপদসঙ্কুল পাহাড়ের খাড়া উঁচু চড়াই অতিক্রম করে বেশ কিছু দূর এগুনোর পর আচমকা সুরু হলো তুষার ঝঞ্ঝার তুমুল দাপট। সে দাপটে অভিযাত্রী দলের কয়েকজন রীতিমত কাবু আর জখম হয়ে পড়লেন··· কাজেই দলের নেতা তখন নিতান্তই নিরুপায় হয়ে পাহাড়ের সেই সুউচ্চ শিখরদেশ থেকে নীচের সমতল ভূমিতে তাঁদের বাকী সঙ্গীদের কাছে 'রেড-ক্রশ' পতাকা তুলে ধরে বিপদের সঙ্কেত জানাবার মতলব করলেন এবং পাশের শেরপা সঙ্গীকে অবিলম্বে তার রসদের ঝোলা থেকে বিপদ-সংকেত জানানোর 'রেড-ক্রশ' পতাকাখানা বের করবার আদেশ দিলেন। দলপতির আদেশমতো কাঁধের ঝোলা থেকে পতাকাখানা টেনে বার করে শেরপা বেচারী ত স্তম্ভিত!···সর্ব্বনাশ! দলবলের সঙ্গে নীচেকার তাঁবু থেকে শিখর অভিযানে বেরুনোর সময় তাড়াহুড়োতে ভুল করে সে 'রেড-ক্রস' পতাকাটি সেখানেই ফেলে রেখে এসেছে এবং তার বদলে কাঁধের ঝোলাতে সঙ্গে বয়ে এনেছে—পাশের ছবিতে যেমন নমুনা দেখানো রয়েছে ঠিক তেমনি ধরণের ২৪" ইঞ্চি লম্বা ও ২০" ইঞ্চি চওড়া মাপের সাদা রঙের এক টুকরো কাপড় আর ১০" ইঞ্চি চওড়া ও ১৪" ইঞ্চি লম্বা মাপের লাল-রঙের ছোট একখানি পতাকা। শেরপার বেয়াক্কেলামীর পরিচয় পেয়ে অভিযাত্রী-দলের নেতা তে রাগে জ্বলে উঠলেন···আসন্ন বিপদের মাঝে এমন মারাত্মক ত্রুটি!···এখন উপায়!···দলের জখমী লোকদের উদ্ধার করা যায় কি ভাবে? ···ক্ষণেক থমকে থেকেই শেরপার মাথায় তখনি আজব এক ফন্দী জাগলো ···সে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করেই, কাঁধের ঝোলা থেকে একখানা কাঁচি বার করে পাশের ছবির নক্সানুসারে সাদা কাপড়ের টুকরোটিকে বেশ কায়দামাফিক ছেঁটে ফেলে তার পিছনে পটাপট কয়েকটা সেফটিপিন এঁটে লাল রঙের ছোট্ট পতাকাটিকে জোড়া লাগিয়ে—দিব্যি চমৎকার একখানা 'রেড-ক্রশ' পতাকা বানিয়ে ফেললো···তারপর

সেই আজব পতাকা নেড়ে পাহাড়ের নীচেকার তাঁবুতে সঙ্গীদের জানালো—বিপদ-সঙ্কেত। সে সঙ্কেত পেয়ে নীচেকার তাঁবু থেকে সঙ্গীরা সদলে এসে সে যাত্রা অভিযাত্রী বন্ধুদের প্রাণ বাঁচালো। শেরপার উপস্থিত বুদ্ধিতে মস্ত ফাঁড়া কাটলো সবাইকার।

তোমরা কেউ বলতে পারো—বুদ্ধিমান শেরপা কি উপায়ে সেই সাদা আর লাল রঙের কাপড়ের টুকরো দুটিকে জোড়া দিয়ে তখন 'রেড-ক্রশ' পতাকা বানিয়েছিল ?

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

২। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের পেট কাটলে, সুমিষ্ট ফল পাওয়া যায় ?

রচনা : দ্বিজেন্দ্রমোহন সরকার (কলিকাতা)

৩। গত কালীপূজার সময় মধু, যদু, সিধু আর বিধু —চার ভাই বাজি পোড়াবার জন্য যে টাকা পয়সা পার্ব্বনী পেয়েছিল, তাই নিয়ে আতস বাজির দোকান থেকে এক সঙ্গে বাজি কিনে বাড়ী ফিরলো। তারা কিনে আনলো—তুবড়ি, হাউই, চর্কী, পটকা, ছুঁচোবাজি আর রংমশাল। বাড়ী ফিরে এসে হিসাব কষে তারা দেখে, তুবড়ি যা কিনেছে, সেগুলির মোট দাম পড়েছে যত হাউই কিনেছে সেই সব হাউইয়ের মোট দামের ডবল; চর্কীর যে দাম পড়েছে, তার দাম আর পটকা, ছুঁচোবাজি আর রংমশালের মিলিয়ে যে দাম পড়েছে—সেই মোট দামের সমান। পটকার দাম=হাউইয়ের দামের একের তৃতীয়াংশ ছুঁচোবাজি আর রংমশাল মিলিয়ে যে দাম, সে দাম তুবড়ির দামের এক চতুর্থাংশ। এখন বলতো, চার ভাই কত টাকার বাজি কিনেছিল ?

রচনা : বৈকুণ্ঠ দেবশর্ম্মা (কলিকাতা)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির উত্তর :

১। দার্জ্জিলিঙ, শিলঙ, উটকামন্দ, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর, পুরী, শ্রীনগর, মহীশূর, বাঙ্গালোর, ভুবনেশ্বর, রাচি, নাগপুর, কোচিন, নৈনিতাল, ভিলাই, রৌরকেল্লা, পুণা, পাটনা, দিল্লী।

২। সাহারা।

৩।

১৫	৫	৯	৩
২	১০	৮	১২
৭	১৩	১	১১
৮	৪	১৪	৬

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

পূরবী, সুষমা, সমীর ও সন্দীপ মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), প্রণব, আরতি ও খুকু (রাণাঘাট), বিজয়েন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র সিংহ (হাজারীবাগ), পুপু, ভুটিন ও রাজা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সত্যেন্দ্র, মুরারি, সঞ্জয়, অমিয় ও সুনীল (ভিলাই), দেবব্রত ও ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় (দিল্লী), ফণী, রোচনা, ও দোলন সাহা (কলিকাতা), অমিত, কবি ও অধীশ হালদার (লক্ষ্ণৌ), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য [কলিকাতা], অমিয়, প্রশান্ত, অভি, কৃষ্ণলাল, সুনীত, তিনকড়ি, শিবু, মানস, মণি, বাহাদুর, অমৃত, রবি, নির্ম্মল, অরবিন্দ, অনিল, মাণিক, পিন্টু ও চিত্ত [গড়িয়া], রাণা বুনা, রিণি ও রণি মুখোপাধ্যায় [কলিকাতা], চাণক্য ও অমিতা ঘোষ [ব্যাঙ্গালোর], অরিন্দম, অভিজিৎ, শোভনা, সুধাংশু, শীতাংশু, হিমাংশু ও হারাণ চন্দ্র ভরদ্বাজ [শিলিগুড়ি], কুণাল মিত্র [কলিকাতা], মিঠু ও বুবু গুপ্তা [কলিকাতা]।

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

ভোলানাথ দেবশর্ম্মা [কটক , দুর্গাদাস, রেণু গৌরদেব, লিপি ও মিনু কলিকাতা], অশোক, সুমিতা, বাপি, বুতাম পিন্টু, ফণী, ও মণিকা [বোম্বাই], অরুণ দাম, অশোক ঘোষ, বারীন ঘটক ও সুনন্দা বসু [গোয়ালিয়র] নীরোদ রায়, সুস্মিতা, পারমিতা, চন্দ্রিমা, বরদা ও সুথময় চৌধুরী [গৌহাটি], নিশানাথ, উষানাথ, মঞ্জু, মালতী, চঞ্চল ও প্রমীলা সরকার (শিয়াখালা), গোপা ও রাহুল দাশগুপ্ত [রৌরকেল্লা], হাসি ও শৈলেন সেন [কলিকাতা], মিনতি, মাস্থু ও চাঁদু চট্টোপাধ্যায় [ব্যারাকপুর], দ্বিজেন্দ্র মোহন সরকার [কলিকাতা]।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

বিশ্বনাথ, দেওকীনন্দন ও রামেশ্বর সিংহ [গয়া], কালীপদ দাস [শিউড়ী], পাপু, ছোটন, অর্জ্জুন, ক্ষুদি. নন্দা, বাবুন, লছমী, তিলক, অলক, পার্থ, রণি, শামু, কেতকী, কেয়া ও চন্দন রায়চৌধুরী [বর্দ্ধমান], হরিদাস, অজয়, সুমিলা, কাঞ্চন ও রূপা বসু [বালুরঘাট], শ্যামা, খুশী ও ঋষি [উত্তরপাড়া], ধ্রুব, ছানু, নিরঞ্জন, বাবু, স্বপ্না, সবিতা, মণি সাহা, সাধন দাস ও কৃষ্ণা [বালুরঘাট]।

গত ভাদ্র, ১৩৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম ধাঁধাটির সঠিক উত্তর দিয়েছে:

অশোক, অনাবিল, রজত, কল্যাণ, শচীন, ইন্দ্রদত্ত, বিশ্বতোষ ও শর্ম্মিলা [রাঁচি), রবিন রায়, শৈলেন মান্না, কালু সাহা, শ্রীকান্ত সেন, বিশ্বরূপ সোম, ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ী, ও হরিধন চক্রবর্ত্তী, [রামপুরহাট), শচীন্দ্র সেন [নরেন্দ্রপুর], অজিত, লক্ষ্মী, ইন্দু, পঙ্কজ, তুলসীচরণ, গোপাল দাস, নন্দরাণী, কমলা, রেণু, মণীন্দ্র, লিপিকা, রবি ও মুনমুন মুখোপাধ্যায়, [বারাণসী], পৃথ্বীশ, নীলমণি, মনতোষ, রণজিৎ, কালিদাস, সুশীল, নীতিশ, রামসদয়, ধনেশ, নির্ম্মলকান্তি, প্রিয়তোষ, অমুতোষ, প্রাণতোষ ও আশুতোষ দত্ত (জামসেদপুর), বীরেন, পার্থ, আরতি, প্রগতি ও প্রণতি ভট্টাচার্য। (আসানসোল)।

প্রভাতী

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সাউ

শারদ নিশিতে বিনিদ্র আঁখি শুকতারা সাথে জাগি।
প্রভাতী আমার শোনাব কাহারে আমি খুঁজি তার লাগি।
পূর্ব্ব গগনে রক্তিমাভায়
বিবশা যামিনী মুখ তুলে চায়
সোনার স্বপন সহসা থামিল
রাম ধনু রঙে রাঙি।
প্রভাতী আমার শোনাব কাহারে আমি খুঁজি তার লাগি।
কুঞ্জ কুটীর নীড়ে—
ধীরে কথা কয়—কপোত কপোতী প্রাসাদ সৌধচূড়ে।
প্রভাত সমীর ধীরে বয়ে যায়
ঘোমটা আড়ালে নলিনী লুকায়
নিরাশ ভ্রমরা ফিরে ফিরে চায়
প্রীতি চুম্বন মাগি—
প্রভাতী আমার শোনাব কাহারে আমি খুঁজি তার লাগি।
পাতিয়া বসনখানি—
সুপ্তি চেতনে উঠিয়া বসেছে ষোড়শী শরৎ রাণী
লোধ্র-পরাগ মাখিয়া অঙ্গে
শীষ দেয় শ্যামা পাপিয়া রঙ্গে
বিজলী কন্যা চকিতে লুকায়—
মেঘপতি পরে রাগি—
প্রভাতী আমার শোনাব কাহারে আমি খুঁজি তার লাগি।
বকুল বিথিকা তলে—
ডেকে ওঠে পাখী বন্ধনহারা কি যেন স্বপনে ভুলে।
তারার প্রদীপ নিভে নিভে যায়—
রজনী গন্ধা মুখ তুলে চায়—
অলস জোছনা প'ড়েছে ঢলিয়া—
সারাটী রজনী জাগি—
প্রভাতী আমার শোনাব কাহারে আমি
খুঁজি তার লাগি।
শুধু ফিরে ফিরে মনে পড়ে—
কবে প্রবাসের একটী সকাল এসেছিল মোর তরে।
আমার কানন ভরেছিল ফুলে,
প্রাণের ঠাকুর প্রাঙ্গণ তলে,
হৃদয় আমার হল তৃষাতুর—
চরণ-পরশ মাগি
প্রভাতী আমার শোনাব কাহারে আমি খুঁজি তার লাগি।

বিজয়াভিবাদন—

আমরা বৎসরান্তে মহাপূজার পর "ভারতবর্ষের" পক্ষ হইতে সকলকে বিজয়ার অভিবাদন জানাইতেছি। গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা প্রভৃতি যাঁহাদের সহযোগিতা "ভারতবর্ষ"কে সমৃদ্ধ করে তাঁহারা সকলে আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই শুভদিনে আমরা শ্রদ্ধার সহিত পূর্ব্বাচার্য্যদিগকে স্মরণ করি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন প্রভৃতি যাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টা "ভারতবর্ষ"কে উন্নতির পথ দেখাইয়াছে তাঁহারা সকলে আমাদের প্রণম্য। বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া "ভারতবর্ষ" আজও তাহার ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান কর্ম্মীরা যেন তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে তাহাদের কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হন—জগন্মাতার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা জানাই।

দিল্লীতে ত্রিশীর্ষ সম্মেলন—

সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য গত ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর '৬৬ দিল্লীতে তিনটি বৃহৎ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নেতাদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। সংযুক্ত আরব-রাষ্ট্রের নেতা রাষ্ট্রপতি নাসের ও যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রনেতা মার্শাল টিটো নিজ নিজ দেশ হইতে আসিয়া সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে তিন নেতা মিলিত হইয়া বহু আলোচনার পর একমত হইয়াছেন। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ যাহাতে বন্ধ হয় তাহাই সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। তিনজন একমত হইয়া এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। রাজনীতি সমস্যার সহিত সমগ্র পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক সমস্যাও আলোচিত হইয়াছিল—যাহাতে অনুন্নত দেশগুলি পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত ধনী দেশগুলি হইতে অর্থ সাহায্য লাভ করিয়া নিজ নিজ কৃষি-শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করিতে পারে, সেইজন্যও সাধারণভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। মোটের উপর ভারতের পক্ষে এই সম্মেলন খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মার্শাল টিটো ও রাষ্ট্রপতি নাসের আমেরিকার বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি পছন্দ করেন না, অথচ ভারত আমেরিকার বন্ধু রাষ্ট্র। আমেরিকার দ্বারা বহুভাবে ভারত উপকৃত হইয়া থাকে। কাজেই তিন রাষ্ট্র নায়কের পক্ষে একমত হইয়া প্রস্তাব স্থির করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছে। যাহা হউক শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা তিনজনে একমত হইয়া পৃথিবীর সকল দেশকে তাঁহাদের মনোভাবের কথা জানাইয়া দিয়াছেন। স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল একদিকে যেমন ভারতের আভ্যন্তরীন উন্নতির চেষ্টা করিতেন, অন্যদিকে তেমনি সারা পৃথিবীর কল্যাণ চিন্তা ও সে বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কন্যা ইন্দিরা গান্ধীও সেই পথ অবলম্বন করিয়া এই ত্রিশীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র অশান্তি দেখা দিয়াছে। এ অবস্থায় শান্তির চেষ্টার ফলে যতটুকু উপকার হয় তাহাই আনন্দের বিষয়।

শিক্ষাকালীন উপার্জ্জন—

সম্প্রতি দিল্লীতে সারা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপাচার্য্যগণের এক সম্মিলন হইয়াছিল। সেই সম্মিলনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁহার ভাষণে প্রস্তাব করিয়াছিলেন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীগণকে শিক্ষাকালীন উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিলে দেশে ছাত্র হাঙ্গামা কমিয়া যাওয়া সম্ভব। যদি ছাত্র-ছাত্রীগণকে পাঠাবস্থায় সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত রাখার ব্যবস্থা হয় এবং তাহারা বুঝিতে পারে যে শিক্ষালাভের সহিত তাহাদের দ্বারা অর্থার্জ্জন সম্ভব, তাহা হইলে তাহারা সহজে কোন আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। শিক্ষাকালীন এই উপার্জ্জন ব্যবস্থা স্থির করিবার জন্য উপাচার্য্যগণ মিলিত হইয়া একটি

পরিকল্পনা স্থির করিতে সম্মত হইয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার দিনে যে কোন প্রকারেই হউক ছাত্রদের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন সম্ভব হইলে সকলেই এদিকে আকৃষ্ট হইবে। ইন্দিরাজীর এই প্রস্তাব দেশের সকল শিক্ষাব্রতীর বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। শুধু কলেজে নহে স্কুলেও গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা সেই নীতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিল। দেশের লোক বুনিয়াদি শিক্ষাকে ভালভাবে গ্রহণ না করায় আজ শিক্ষাক্ষেত্রের সর্ব্বত্র এই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। আমরা মনে করি সে বিষয়ে সরকার একটু অধিক অবহিত হইলে ইন্দ্রিরাজীর প্রস্তাব অবশ্যই কার্য্যে পরিণত হইবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ—

গত ৭ই নভেম্বর '৬৬ দিল্লীতে লক্ষ লক্ষ লোক গো-হত্যা বন্ধের আন্দোলন উপলক্ষ্যে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা করিয়াছে তাহা বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসে খুব কম সময়েই দেখা গিয়াছে। গোহত্যা ভারতে একেবারে বন্ধ করা সম্ভব কিনা রাষ্ট্রনায়কগণ সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। হঠাৎ এইভাবে দাঙ্গাহাঙ্গামা করায় ভারতের লোক বিচলিত হইয়াছে। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ বহুদিন হইতে মন্ত্রীর কাজ ছাড়িয়া দিবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন, কারণ প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরাজীর সহিত তিনি বহু বিষয়ে একমত হইতে পারিতেন না। তবে মন্ত্রিসভার ঐক্য রক্ষার জন্য এতদিন তিনি মন্ত্রী হইয়া কাজ করিতেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় তাঁহার পদত্যাগ করার কথা উঠিয়াছিল। এবার তিনি আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারেন নাই। কাজেই গত ৮ই নভেম্বর'৬৬ তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। সেইদিনই প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদত্যাগে সম্মতি দিয়াছেন।

সীমান্ত সমস্যা—

ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে সীমান্ত সমস্যা দিন দিন জটিল হইয়া উঠিতেছে। নেফার সমস্যা এখনও মিটে নাই। বিদ্রোহী নাগারা স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবীতে বহুদিন হইতে আন্দোলন চালাইতেছে। সেই সমস্যা বহু চেষ্টাতেও সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। তাহা ছাড়া পাকিস্থানী অনুপ্রবেশের ফলে গোলমাল ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। দার্জ্জিলিং অঞ্চলেও একদল লোক ক্রমে পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করিতেছে। সব মিলিয়া আসাম ও উত্তর-বঙ্গের ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা চিন্তার বিষয়। ভারতের পশ্চিম সীমান্তেও কাশ্মীর সমস্যা মধ্যে মধ্যে বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়া থাকে। কাজেই ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভারতের বর্ত্তমান শাসন কর্তৃপক্ষের কার্য্য সন্তোষজনক বলিয়া মনে করেন না। এ সকলের উপর ভারতের আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। পাঞ্জাবকে দুই ভাগে ভাগ করিলেও অন্যান্য বহু রাষ্ট্রে সীমান্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। নানা কারণে সকল রাষ্ট্রে ছাত্র বিক্ষোভ গত কয় মাসে বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়াছে। সে সমস্যারও দুইমাস ধরিয়া সমাধান-চেষ্টা সফল হয় নাই। এ অবস্থায় কি করিয়া ভারতে শান্তি রক্ষা করা সম্ভব হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসন চলিয়াছে, উড়িষ্যায়ও হয়ত শীঘ্র রাষ্ট্রপতির শাসন প্রয়োজন হইবে। নানা দিক দিয়া ভারতের সর্ব্বত্র শাসকগণের অক্ষমতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

বিশ্বভারতীর নির্ব্বাচন—

বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধি রূপে শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী বিশ্বভারতী সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অনিলবাবু কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ছিলেন। অমিতাভবাবু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। আমরা উভয়কে অভিনন্দন জানাই।

অধ্যাপক কালিদাস নাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ঐতিহাসিক পণ্ডিত কালিদাস নাগ গত ৮ই নভেম্বর '৬৬ সকাল সাড়ে পাঁচটায় কলিকাতায় রাজা বসন্তরায় রোডে ৭৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রী ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সে সকল ভ্রমণকাহিনী পুস্তকাকারে লিখিয়া গিয়াছেন। ১৯২৩ সাল হইতে তিনি সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মধুরভাষী ও জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে স্বজনবিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি।

জনসেবা পরিকল্পনা—

কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টায় সারা ভারতবর্ষে জনসেবা কার্য্যে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে জনসেবা সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। বর্ত্তমানে মানুষের মধ্যে জনসেবার প্রতি আগ্রহ কমিয়া গিয়াছে। তাহা বাড়াইবার জন্যই এই প্রচেষ্টা। জনসেবা করিবার জন্য এখন লোক পাওয়া যায় না। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে যদি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় তবে তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা।

খরার ফলে ভয়াবহ অবস্থা—

এ বৎসর বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রয়োজনীয় বৃষ্টি হয় নাই। তাহার ফলে গত অক্টোবর মাসের প্রথম হইতে ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কয়দিন ঐ সকল অঞ্চলে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঐ সকল অঞ্চলে সাহায্য ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার মত ত্বরান্বিত না করিলে বহুলোক অনাহারে মারা যাইবে। তিনি বলিয়াছেন আমরা কাহাকেও না খাইয়া মরিতে দিব না। তাঁহার এই কথা সত্যই যদি কার্য্যে পরিণত করা হয় তাহা হইলে দেশবাসী বাঁচিয়া যাইবে।

দীঘায় ইলিশ মাছ—

দীঘা মেদিনীপুর জিলায় কাঁথি মহকুমার সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তথায় একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দীঘার সমুদ্রে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ মাছ আসিয়াছে। মৎস্যজীবীরা ইলিশ ধরিয়া লঞ্চে বা লরি করিয়া দূরে পাঠাইয়াছে। একদিন রাত্রিতে তাহারা এত বেশী মাছ ধরিয়াছিল যে লঞ্চ বা লরির অভাবে সকল মাছ বিদেশে পাঠাইতে না পারিয়া ৮৲ টাকা মণ দরে সেই অঞ্চলে বিক্রয় করিয়াছে।

ভারতে রণতরী নির্ম্মাণ—

ভারতের প্রতিরক্ষার ইতিহাসে গত ১৫ই অক্টোবর '৬৬ একটি স্মরণীয় দিন গিয়াছে। ঐ দিন মাজগাঁও ডক্ লিমিটেডে প্রথম যুদ্ধ জাহাজ তৈয়ারীর কাজ সুরু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ভারতে কোথাও রণতরী নির্ম্মাণের চেষ্টা হয় নাই। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়েক ঐ কাজের উদ্বোধন করিয়াছেন। ভারতের তিন হাজার মাইল ব্যাপী উপকূল রক্ষার জন্য রণতরী বিশেষ প্রয়োজন। যদিও ভারত কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে চায় না, তথাপি তাহাকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। এইজন্যই যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ প্রয়োজন।

মুস্লিমরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা—

গৌহাটির ১৬ই অক্টোবর' ৬৬ এর এক সংবাদে প্রকাশ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে একটি মুস্লিম রাজ্য স্থাপনের জোর চেষ্টা চলিতেছে। স্থানীয় একদল মুস্লিম নেতা পাকিস্থানের উৎসাহে ও চীনের নেপথ্য সমর্থনে এই চেষ্টায় সাহায্য করিতেছে। আসামের কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জিলা তাহারা পাকিস্থানের সহিত যুক্ত করিতে চাহে। মাষ্টার তারা সিং মুস্লিমদিগকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেছেন। ভারতের শাসনকর্ত্তারা এ বিষয়ে কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন কেন?

সরকারী চাকুরীতে অরুচি—

১৬ই অক্টোবর' ৬৬ দিল্লীর খবরে প্রকাশ বেসরকারী চাকুরীতে যোগদানের জন্য ভারতের সরকারী উচ্চপদস্থ চাকুরিয়ারা দলে দলে পদত্যাগ করিতেছেন। তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বিগ্ন হইয়াছে। সরকারী হিসাবে এ পর্য্যন্ত ১৪০৬৩ জন অফিসার পদত্যাগ করিয়া বেসরকারী চাকুরীতে যোগদান করিয়াছেন। ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে বৎসরে দুই হাজার করিয়া এবং পরবর্ত্তী তিন বৎসরে বৎসরে তিন হাজার করিয়া সুদক্ষ কর্ম্মচারী বেসরকারী কাজে চলিয়া গিয়াছেন। কেন এইরূপ হইতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বেসরকারী চাকুরীতে শুধু বেতন বেশী নহে, সুখ সুবিধাও অনেক বেশী পাওয়া যায়।

ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত—

ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত গত ১৮ই অক্টোবর '৬৬ ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৯২১ সালে সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া গান্ধিজীর আন্দোলনে

যোগদান করিয়াছিলেন এবং বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। গত ৪৫ বৎসর কাল তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা সূর্য্যনারায়ণ সেনগুপ্তও খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী ছিলেন। আমরা ইন্দ্র নারায়ণ বাবুর সহিত দীর্ঘকাল পরিচিত ছিলাম এবং তাঁহার সুমধুর ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত।

শহরতলীর অশান্তি—

প্রায় একমাস ধরিয়া শহরতলীর বেলঘরিয়া ও জগদ্দল অঞ্চলে কয়েকটি খুন হয় এবং সে সকল স্থানে সাধারণ নাগরিকের জীবনযাত্রা বিপন্ন হয়। সন্ধ্যার পর ঐ সকল স্থানের কয়েকটি অঞ্চলে লোক বাড়ীর বাহির হইতে ভয় পাইতেছেন। তাহার পর সম্প্রতি নিউ আলিপুরে পর পর দুইটি খুন হইয়াছে। পুলিশ এই সকল ব্যাপারে কিছু করে বলিয়া মনে হয় না। খুন জখমের পর পুলিশ যাইয়া সেখানে ধরপাকড় করে, কিন্তু কোনরূপ সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। বেলঘরিয়া অঞ্চলে মধ্যবিত্ত পবিবারের বাসস্থান। মাত্র কয়েকজন গুণ্ডা প্রকৃতি লোকের জন্য সেখানে অশান্তি বিরাজ করিবে ইহা চিন্তারও অতীত। প্রয়োজন হইলে পুলিশ বহু নিরীহ লোককে গ্রেপ্তার করিয়া থাকে। অথচ অশান্তি নিবারণে তাহাদের উপযুক্ত চেষ্টা দেখা যায় না।

খাদ্যাভাব বৃদ্ধি—

সমগ্র বিহারে ও উত্তর প্রদেশের কতকগুলি স্থানে খরার জন্য দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঐ সকল স্থান দেখিয়া যে ব্যবস্থার কথাই বলিয়া থাকুন না কেন, সে সকল স্থানের সাধারণ লোক খাইতে না পাইয়া দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। বেশী লোকই কাজ পাইবার আশায় ও আত্মীয় স্বজনের আশ্রয়ের সম্ভাবনায় কলিকাতা ও শহরতলীতে আসিতেছে। ফলে কলিকাতা ও শহরতলীর রেশনিং ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। বাঙালী বেশী গম ব্যবহার করে না। কাজেই এতদিন বাজারে কিছু গম পাওয়া যাইত। কিন্তু বাহিরের লোক আসার ফলে গমও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বর্দ্ধমান ও হুগলী জিলার গ্রামাঞ্চল হইতে মধ্যে কলিকাতা ও শহরতলীতে কিছু চাউল আসিতেছিল এবং তাহার দামও খুব বেশী ছিল না। সে চাউলের দামও নবেম্বর মাসের প্রথম হইতেই বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। বহিরাগতদের আগমন রোধ করিবার কোন আইনই নাই। অথচ তাহা না করিলে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব ক্রমে বাড়িয়া চলিবে এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন যাহাই বলুন না কেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

আলুর চাষে সংকট—

আলু পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তাহা এদেশের লোকের একটি প্রধান খাদ্য। যে সকল অঞ্চলে আলুর ফলন বেশী হয়, সে সকল অঞ্চলের লোক বৎসরে ৪।৫ মাসের বেশী আলু খাইয়া চাউলের চাহিদা কমাইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে সরকারী অব্যবস্থার ফলে আলুর বীজ ও আলুর চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সার উপযুক্ত পরিমাণে সংগৃহীত হয় নাই। আশ্বিন মাস হইতে আলুর চাষ আরম্ভ হয়, তবেই মাঘ মাস হইতে নূতন আলু পাওয়া যায়। বীজ ও সারের অভাবে সারা কার্ত্তিক মাস আলু চাষীরা হাহাকার করিতেছে। সরকারী কৃষি বিভাগ এমনই অকর্ম্মণ্য লোকদিগের হাতে আছে যে তাহারা বেতন লইয়া সন্তুষ্ট এবং বেতন বাড়াইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট, কিন্তু কর্ত্তব্য সম্পাদনে সেরূপ আগ্রহশীল নহে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন বহুবৎসর কৃষিবিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি যথাসময়ে এ বিষয়ে কেন অবহিত হন নাই তাহা বুঝা যায় না। গোড়া কাটিয়া গাছের মাথায় জল দিলে কোন ফল হয় না। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া দেশকে রক্ষা করা যায় না। একথা কি শাসকেরা এখনও উপলব্ধি করেন নাই? অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য সরকার মুখে অনেক কথা বলেন কিন্তু কাজের সময় দেখা যায় কিছুই ফল হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে মজা পুষ্করিণী খননের জন্য প্রতিবৎসর বহুটাকা বরাদ্দ হয় কিন্তু পুকুরের মালিকরা সে টাকা পায়না, ফলে তাহা সরকারী তহবিলে জমা থাকে। পুষ্করিণী খনন ব্যাপারে সরকারী নিম্নতম কর্ম্মচারীরা যে সকল সর্ত্তের কথা বলেন সে সকল সর্ত্তে সম্মত হওয়া কোন মালিকের পক্ষে সম্ভব হয় না। উপরের কর্ম্মচারীরা মালিকদিগের অভিযোগ জানিয়াও উদাসীন থাকেন। মন্ত্রীরা কি এ বিষয়ে কিছু করিতে পারেন না? দেশে পুকুরের সংখ্যা বাড়িলে বহু জমিতে সেচের জল পাওয়া যাইতে পারে, এবং চাষেরও অনেক সুবিধা হয়।

মোটের উপর দেখা যায় সরকারী ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই অসন্তোষ-জনক এবং এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। শুধু মুখে বুলি কপচাইলে দেশের দুর্গতি কোন দিনই দূর হইবে না।

অন্ধ্র রাজ্যে অশান্তি—

ইস্পাতের কারখানাগুলি সবই উত্তর ভারতে নির্ম্মিত হইতেছে বলিয়া দক্ষিণ ভারতের লোকেরা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। সম্প্রতি বিশাখাপত্তনে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের দাবী করিয়া সে অঞ্চলের অধিবাসীরা নানারূপ আন্দোলন করিতেছে। বিশাখাপত্তন সমুদ্রের ধারে অবস্থিত এবং সেখানে মধ্য-ভারত হইতে কাঁচা লোহা লইয়া যাওয়ারও ব্যবস্থা করা যায়। গত কয়েক বৎসরে শিক্ষা প্রসারের ফলে বেকার সমস্যা দেশের সর্ব্বত্রই বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই অন্ধ্র রাজ্যের অধিবাসীদের এই দাবী অন্যায় নহে। প্রথমে শুনা গিয়াছিল বিশাখাপত্তনেই ভারতের পঞ্চম ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবে, পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা প্রকাশ করিয়াছেন, আপাততঃ টাকার অভাবে নূতন ইস্পাত কারখানা স্থাপন সম্ভব হইবে না। ফলে একমাস ধরিয়া ঐ অঞ্চলে মানুষ ক্ষিপ্ত হইয়া নানা প্রকার হিংসাত্মক অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, রেলের বহু সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, ছাত্র ক্ষেপাইয়া ইস্কুল কলেজগুলি নষ্ট করা হইয়াছে এবং বহু স্থানে পথ, সেতু প্রভৃতি ধ্বংস করা হইয়াছে। ঐ সকল অঞ্চল ইংরাজ শাসনে অনুন্নতই ছিল। অবশ্য গত কুড়ি বৎসরে নানা ভাবে ঐ অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু যে কারণেই হউক এবার যে ভাবে অগ্রগতির কার্য্য বাধা প্রাপ্ত হইল তাহাতে আবার কবে ঐ অঞ্চলে সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে তাহা বলা যায় না। তথাকথিত বামপন্থী নাম দিয়া একদল চোরডাকাত দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। তাহারা রাজনীতির কোনও বালাই রাখে না। আত্মতুষ্টির জন্য বা বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে ওলট পালট করিয়া দিবার জন্য মানুষকে ক্ষেপাইয়া থাকে। সাধারণ মানুষ তাহাদের কথায় যে সকল কাজ করে, তাহার ভালমন্দ তাহারা বিচার করিয়া দেখে না। ইহাই দেশের দুর্ভাগ্যের কথা।

কলিকাতার পাশের খাল—

কলিকাতার পাশে যে সার্কুলার খাল আছে, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাহা বুজাইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। বুজাইয়া দিলে তাহার উপর দিয়া একটি বড় রাস্তা হইতে পারিত। কিন্তু শহর উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্ত্তারা খালটি না বুজাইয়া তাহা কাটিয়া আরও গভীর করিয়া ঐ খালটি দিয়া নৌকা যোগে মাল যাতায়াতের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। খালকাটা মাটির দ্বারা খালের দুই পাশে জনসাধারণের বেড়াইবার স্থান করিয়া দেওয়া হইবে। যাহাই করা হউক না কেন তাড়াতাড়ি করা দরকার। স্থানাভাবে কলিকাতার লোক বেশ কষ্ট পাইতেছে। নৌকাযোগে মাল প্রেরণের সুবিধা হইলে একদল মানুষের বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

আমার অন্তর রাজ্যে অনন্ত প্রভায়
সৎ চিৎ আনন্দময় ব্রহ্মের বিকাশ :
মেদ মজ্জা স্নায়ু আর রক্তকনিকায়
অতিন্দ্রীয়, হে চিন্ময়! তোমারই প্রকাশ।
তব লাগি' মায়া ভরা রাঙ্গা দিনগুলি
বিসর্জ্জন দিই নিত্য কালের সলিলে ;
আজন্ম সঞ্চিত যত মনে আছে ধূলি
মুছে ফেলি শুদ্ধাচারে এ বিশ্ব নিখিলে।
জীবনের স্বপ্নসাধ—আনন্দ মূর্চ্ছনা
তোমার লাগিয়া জেগে রবে চিরকাল :
সত্যালোকে,—দেখা দিলো প্রমূর্ত্ত এষনা
চেতনার সুর ঢালে বাসন্তী সকাল।
ধূলি তীর্থে চিত্তে জাগে শুদ্ধি, জ্ঞান জ্যোতি,
তোমারই লাগিয়া সে তো আত্মার প্রস্তুতি।

সুগৃহিণী

সচকিত-গৃহস্বামী : ইস্!···এত বাসন-পত্তর···সবই যে দেখছি ভেঙে তছ্‌নছ্‌···

আধুনিকা-সুগৃহিণী : হবেই তো!···নিত্যি এই বাসনের কাঁড়ি···ধোয়া-মাজা-সাফ্‌সুত্‌রো রাখা···সামর্থ্যে পোষায় নাকি কারো!···পই-পই করে বলছি,—লোক রাখো···লোক রাখো নিদেন, একটা ঠিকে-জনও যাহোক্‌···তা, দাসী বাঁদীর কথাটা কানেই তোলো না মোটে!···কেবলই অনুযোগ শুনছি,—বাজার মন্দা···টাকার টানাটানি ·· আর খরচের ওজর!···নাও, এখন সামলাও ঠ্যালা!···

সচকিত-গৃহস্বামী : হুঁ···

আধুনিকা-সুগৃহিণী : বলি, হাঁ করে এখানে দাঁড়িয়ে রঙ্গ না দেখে, বরং দৌড়ে গিয়ে মোড়ের দোকান থেকে নতুন একপ্রস্থ বাসন কোশন কিনে আনো দিকিন্‌··· নইলে আজ আর অফিস-টাইমে অন্ন জুটবে না মুখে···এক্কেবারে নিরম্বু-উপবাস!

শিল্পী : পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

বাংলার পুতুলনাচ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ঘোড়ুই, সাহিত্য-ভারতী

এক (ভূমিকা)

বাংলার লোকরঞ্জনে পুতুলনাচের ভূমিকা বর্তমানে শীর্ণকায় হ'য়ে এলেও এক কালে বাংলার আবাল বৃদ্ধ-বণিতা পুতুল নাচ থেকে অফুরন্ত আনন্দ লাভ করেছে। কিছুদিন আগেও কলকাতার উপকণ্ঠে প্রতিটি আধা শহরে সার্বজনীন দুর্গাপূজার উৎসবের অঙ্গ ছিল পুতুলনাচ। আজ ধীরে ধীরে পুতুলনাচ বাংলা দেশে যাত্রা থিয়েটারের কাছে পরাজিত হয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করার মতো অবস্থায় এসেছে। কিন্তু পুতুলনাচ এখনো যে আশ্চর্য আকর্ষণের বিষয় হ'য়ে উঠতে পারে তা 'চেক' ও 'আমেরিকান' পুতুল নাচের উত্তরোত্তর চাহিদার কথা শুনেই বোঝা যায়। কলকাতায় কয়েকবছর আগে 'চেক' পুতুলনাচ দেখানো হয়েছিল। যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা জানেন কি আশ্চর্য আকর্ষণীয় বস্তু সেটি হয়েছিল।

অনেকের ধারণা পুতুলনাচের দুটি শ্রেণীর একটি, যা কাঠের পুতুল, তা বড়দের জন্য এবং যেহেতু তা মানব-অভিনেতার বিকল্প এবং যেহেতু মানব-অভিনেতা আরও বেশী রসোৎপাদনে সক্ষম সেইহেতু তার মৃত্যুই শ্রেয়; আর অন্যটি, যাকে তারের পুতুল বলি—তা কেবল ছোটদের আনন্দ দিতে পারে, বা দু' একটি গ্রাম্যকাহিনী রূপায়িত করতে পারে।

দুটি ধারণাই ভুল।

প্রথমত: আমাদের দেশে কাঠের পুতুল নাচকে আরও প্রয়োগ কৌশলে চমৎকার করা যায়। সাজ পোষাক, প্রয়োগ কৌশল পুতুল গঠন ও কাহিনী গ্রন্থন এই পুরাতনের দেহে নবপ্রাণ সঞ্চার করতে পারে। কাঠের পুতুলনাচের উপযোগী ভাল কাহিনী মঞ্চ ও প্রয়োগ কৌশল এবং নতুন ধরণের পুতুল কাঠের পুতুল নাচকে জনপ্রিয় করবেই। আধুনিক সংকেত নাটকগুলির অনেকগুলিই কাঠেরপুতুল নাচে রসোত্তীর্ণ ভাবে অভিনয় করানো যায়।

দ্বিতীয়ত: নবতর কাহিনী সংযোগে নতুন নতুন পুতুল গঠনে ও মঞ্চ প্রয়োগ কৌশলে তারের পুতুল নাচকে অপূর্ব ভাবে জনপ্রিয় ক'রে তোলা যায়। যে কোন রূপকথা, রূপক কাহিনী, অদ্ভুত গল্পকে এতে রূপ দেওয়া যায়।

বাংলাদেশে এক কালে কাঠের পুতুল ও তারের পুতুল নাচের অনেক দল ছিল। কাঠের পুতুলের সংগে থাকত পৌরাণিক বা রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর সংযোগ আর তারের পুতুলের সংগে অত্যন্ত ঘরোয়া কাহিনী ও রূপকথা। ধীরে ধীরে বাংলা দেশ থেকে এই পুতুলনাচ লোপ পেয়ে চলেছে, অন্যান্য অনেক প্রাচীন লোকশিক্ষায় শাখার মতোই; এর কারণ যথার্থ শিল্পী দলের ঐ সম্পর্কে নিরুৎসাহিতা। যদি যোগ্য শিল্পীরা পুতুলনাচকে তাঁদের প্রতিভাযোগে উজ্জীবিত ক'রে তুলতে পারেন তবে বাংলার সংস্কৃতির একটি গ্রামীন ধারা বিশ্বের অভিনন্দন-ধন্য হ'তে পারে।

দুই (ইতিকথা)

বাংলাদেশ মূর্তিশিল্পের দেশ। বিমূর্ত ভাবকে রূপময় ক'রে তুলতে বাঙালী শিল্পীর জোড়া অতীতে ভারতে কোথাও মেলেনি। সেই বাংলাদেশের শিল্পীর হাতেই মানবাকৃতি ও মানবেতর জীবাকৃতি আশ্চর্য রূপে ফুটে উঠেছিল। বাংলার এই শিল্প ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মূলতঃ মূর্তিশিল্প অনার্যেয় ভাবকে বস্তুরূপ দেওয়া এই শিল্পের উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন বিশেষ ভাবকে ধ্যানে মূর্তি দেওয়াটা আর্য সংস্কৃতির অন্তর্গত হয়ে পড়েছিল পরে। বাঙালীর মধ্যে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সুমহান সমন্বয় সম্ভব হয়েছে। তাই বাঙালীর হাতে বিমূর্তভাব রূপময় হয়ে উঠতে পারে, কোন মূর্তি বাঙালী শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় তার বিশেষ মূর্তি-রূপটি হারিয়ে রসিকের মনে বিমূর্ত হয়ে উঠতে পারে।

এই খানেই শিল্পের বড় কথা। চারুশিল্প তার এই সংকেত-ময়তার মধ্যেই প্রাণময়। সাহিত্য, অভিনয়, চিত্র, সংগীত সবকিছুই এই সংকেতের মধ্যেই অস্তিত্ববান। তাই কোন বিশিষ্ট ঘটনার বা চরিত্রের অনুকৃতি যেমন সাহিত্য নয়, বিশেষ কোন দৃশ্যের ফটোগ্রাফী যেমন চিত্র নয়, তেমনি বিশেষ শব্দের অনুকরণও সংগীত নয়। কোন ঘটনা বা চরিত্র যখন তার বিশিষ্ট রূপকে ছাড়িয়ে সামান্য রূপের মধ্যে সংকেতিত হয় তখনই তা সাহিত্য, বিশেষ কোন মূর্তি বা দৃশ্যানুকরণ যখন সামান্য হয়ে অসামান্য আবেগ আনে তখনই তা সার্থক চিত্র। যখন স্বরগ্রামের বিশিষ্ট সংস্থাপনা অন্তরের মমত্ব ও আবেগকে আলোড়িত করে তখনই তা সংগীত হয়ে ওঠে।

এই যে সংকেতাশ্রয়িতা পুতুল-নাচে তা মুখ্য। অন্যান্য অভিনয়ে এই সংকেতময়তা আনা কষ্টসাধ্য। অথচ অতি সহজে এই পুতুল অভিনয়ে তা আসে। আজকাল সংকেত নাটকে পুতুল নাচের এই বিশিষ্ট গুণটিকে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাংলার পুতুল-শিল্প পুতুলনাচের মূলে। আজ বাস্তবানুকরণ কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পকে নষ্ট করতে বসলেও এককালে এ বিশিষ্ট ছিল, অনন্য ছিল। এখনো কাঠের পুতুলে, মাটির ঘোড়ায় সে শিল্প বর্তমান আছে।

পুতুল শিল্পের পর প্রয়োগ কৌশল পুতুলনাচের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। যে নাচায় তার প্রতিভা পুতুলনাচের সামগ্রিক সফলতার জন্য দায়ী থাকে।

তারপর কাহিনী। নাট্যধর্মী শিল্পের মূলে কাহিনীরস থাকতে বাধ্য। এই কাহিনীর গুণ শিল্পটিকে সার্থক হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

আবহসংগীত পুতুলনাচেরও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংগ। যেখানে অভিনেতা নিষ্প্রাণ সেখানে আবহসংগীত অভিনয়ের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংগ। এই আবহসংগীত সমগ্র অভিনয়কে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারে।

অতি প্রাচীন কালের পুতুলের সন্ধান পাওয়া গেছে। মিশরের কবরে যে পুতুল পাওয়া গেছে তার অঙ্গ-সঞ্চালন সম্ভব। অনেকে মনে করেন প্রাচীনকালে পুরোহিতেরা কোন দেব বা দেবীর মূর্তির অঙ্গ সঞ্চালন করিয়ে ভক্তদের মনে ভক্তির (?) সঞ্চার করত। তাকেই আদিম পুতুল নাচ বলা যেতে পারে।

দেশে দেশে সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে পুতুলনাচের বিকাশ ঘটেছে। ভারতের উত্তরপশ্চিমে পুতুলনাচ তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। দক্ষিণ ভারতে পুতুলনাচ যে জনপ্রিয় ছিল তা বেশ বোঝা যায়। আমরা যে পুতুলনাচের সাথে পরিচিত তা মূলতঃ মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে। এখন রামায়ণ মহাভারতের বা পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে কাঠের পুতুল নাচ আর গ্রাম্য বা রূপকথার কাহিনী নিয়ে তারের পুতুল (Marionates) নাচ হ'য়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিচিত্র কাহিনী নিয়ে ছায়া-পুতুলের নাচও হয়। তবে ছায়া পুতুল নাচ মূলতঃ তারের পুতুল বা কাঠির পুতুলেরই দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। মধ্যযুগের আগে কি ধরণের কাহিনী পুতুল নাচে প্রচলিত ছিল তা জানা যায়নি সঠিক ভাবে। তবে সহজেই বোঝা যায় যে, সে সময় গোষ্ঠী বিজয়ের ঘটনা, ব্যথাময় কোন বিশেষ ঘটনা, দেবতা বা পুরোহিত মাহাত্ম্যই ঐ কাহিনীর মূলে থাকত।

বাংলার পুতুল নাচের মূলেও ঐ কাহিনী নিশ্চয়ই থাকত প্রাক-মধ্যযুগে। মধ্যযুগের ইতিহাসও অন্যান্য অংশের মতই। কিন্তু বর্তমানকালে কাঠের পুতুল খুব না এগুলেও তারের পুতুল তার নিজস্ব ধারায় অগ্রসর হয়েছিল।

বাংলা ছাড়া কোথাও কলাপাতার বাঁশির পিকির-পিকির তারের পুতুল নাচের আবহসংগীত হয়নি। আজ নতুন ধরণের পুতুল নাচ দেখা দিচ্ছে। প্রাচীন রীতির সাথে দেশী থিয়েটারী রীতি ও বিদেশী প্রথা ও পদ্ধতির মিশ্রণ দেখা যাচ্ছে। এতে নতুন ক'রে পুতুল নাচকে জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। আমাদের মনে হয় প্রাচীন ধারাকে বজায় রেখে অন্য রীতির সংযোজন হওয়া উচিত। তাতে দেশী রীতির পুতুল নাচের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য ফুটে উঠবে—বিশেষ ক'রে যখন সেই পুতুল নাচে সত্যই লোকরঞ্জক মধুরতা আছে।

তিন

(নাচের পুতুলের শ্রেণী ও ব্যবহার)

আমাদের দেশে তিন ধরণের পুতুল নাচ দেখা যায়। বাংলাদেশে দুই ধরণের, দক্ষিণ ভারতে তিন ধরণের এবং

ভারতের অন্যান্য অংশে এক ধরণেরই পুতুল নাচ দেখা যায়।

বাংলাদেশে কাঠের পুতুল ও তারের পুতুল নাচ দেখি। দক্ষিণ ভারতে তার সংগে ছায়াপুতুল নাচও হয়। ভারতের অন্যান্য অংশে কাঠের পুতুলের নাচই দেখা যায়।

বিদেশে পুতুলের শ্রেণী বিভাগ নিম্নলিখিত ধরণের :—

(ক) ছায়া-পুতুল (Shadow Puppets)

(খ) হাত-পুতুল (Hand puppets)

(গ) হাত-দণ্ড-পুতুল (Hand & rod puppets)

(ঘ) দণ্ড-পুতুল (Rod puppets)

(ঙ) তারের পুতুল (Marionettes)

আমাদের দেশে হাতপুতুল ও হাতদণ্ডপুতুলের নাচ নেই। বাকী ৩ ধরণের পুতুলের নাচ আমাদের দেশে আছে—সেকথা আগেই বলেছি।

ছায়া পুতুল পাতলা বোর্ডের তৈরী পুতুলের ছায়া। সাদা পর্দায় পিছনের দিক থেকে ঐ বোর্ডের পুতুলের ছায়া ফেলে নাচ দেখানো হয়। পাতলা রঙিন প্লাষ্টিকের বা ফ্রেমে আঁটা কাগজের পুতুলের সাহায্যে রঙিন ছায়া এই ক্ষেত্রে সাদাকালোর একঘেয়েমি দূর করতে পারে। এতে রূপকথা ও অদ্ভুত গল্পই ভাল জমে। তবে দক্ষিণ-ভারতে রামায়ণ ও পৌরাণিক কাহিনীও এর মাধ্যমে পরিবেশিত হয় বলে শোনা গেছে।

হাত পুতুলের ব্যবহার দেখা যায় না এদেশের পুতুল নাচে। হাতের বিভিন্ন আঙ্‌লের মাথায় বিভিন্ন অঙ্গের সজ্জা থাকে পুতুলের। আঙ্‌ল ও হাত নেড়ে পুতুলটিকে জীবন্ত ক'রে তোলা হয়।

হাত-দণ্ড-পুতুলও এদেশের পুতুল নাচে নেই। হাত পুতুলে দণ্ডযুক্ত হলেই এই পুতুল হয়। এতে একটু বেশী সুবিধা মেলে।

দণ্ড পুতুল মূলতঃ আমাদের কাঠের পুতুল। সুতো ও দণ্ডের সাহায্যে এই পুতুল নাচানো হয়ে থাকে। এর প্রদর্শন মঞ্চের তলদেশই নাচকদের আশ্রয়।

তারের পুতুল নাচ বাংলাদেশের নিজস্ব। বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ ভারতে কোথাও কোথাও এই পুতুল নাচ গেয়েছে ব'লে মনে হয়। উপর থেকে নীচে ঝুলিয়ে নাচানো হয় পুতুল সুতোর সাহায্যে। এই পুতুলের নাচেই নাচকের সত্যকার প্রতিভার পরিচয় মেলে। কেবল সুতোর সাহায্যে পুতুলের সব অংগের ভংগী তৈরী করতে হয়। বাংলাদেশের প্রাচীন নাচকরা এ বিষয়ে ছিলেন অপূর্ব দক্ষ। তাঁদের অনেকেই এখনো বেঁচে আছেন। কিন্তু পুতুল নাচ বারোয়ারী তলা হ'তে ছাঁটাই হ'তে শুরু হওয়ায় তাঁরা অনুশীলন ত্যাগ করেছেন—হাত নষ্ট করে বসেছেন।

চার

পুতুল নাচের পুতুল

কাঠের পুতুল বা Rod puppetএর মাথা ও দেহ আলাদা। দেহ আবার কোমর ও হাতের অংশে অংশে খণ্ড খণ্ড ও সূত্রের সাহায্যে মাথা ও বিভিন্ন অংগের সঞ্চালন সম্ভব হয়। বাংলাদেশের পুতুলের সূত্র থাকে পোষাক বা অংগের ভিতর আর অন্য স্থানের বিশেষ ক'রে বিদেশের পুতুলের সূত্র বাইরে দিয়ে থাকে। পোষাক ও মস্তক বদলের দ্বারা কাঠের পুতুলের কৈকেয়ী সরমা হয়ে যায় সহজে, ভরত সাজে রাবণ। এর ফলে অসুবিধা এই যে ভরত ও রাবণ দুজনেরই হাত মুঠো—যাতে তলোয়ার ধরতে বা ধনু ধরতে পারে। ওদেশে কাঠের পুতুল (Rod puppets) বিচিত্র হয়। সামাজিক নাটকের নায়ক নায়িকা হয়ে উঠতে পারে তারা সহজে।

ছায়া পুতুল

হাতল ও সূত্রের সাহায্যে অংগ সঞ্চালন সম্ভব হয়। আলোর দূরত্ব কমিয়ে বাড়িয়ে ও পুতুল সোজা বা কাত ক'রে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। এতে সামান্য সংযোজনই বিরাট প্রতিক্রিয়া আনতে পারে।

তারের পুতুল

মাথা ভারী (কাঠ বা মাটি), দেহ ও পোষাক হালকা এই হল তারের পুতুলের গঠন। কাগজ সোলা প্রভৃতিই এই দেহ ও পোষাক তৈরীতে লাগে। এই পুতুল এমন ভাবে তৈরী করা হয়, যাতে সুতোর টানে দুলে দুলে পুতুলগুলি অংগভংগী করতে পারে। আমাদের দেশের তারের পুতুল নাচের পুতুল তৈরী করে মূলতঃ দক্ষিণ ২৪পরগণার শিল্পীরা। পূর্ববংগের শিল্পীরাও তারের পুতুল নাচের পুতুল (Marionettes) তৈরীতে আশ্চর্য দক্ষ ছিলেন। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা কাঠের পুতুল নাচের

পুতুলের মুখ তৈরীতে দক্ষ হলেও তারের পুতুল নাচের পুতুল তৈরী করতে পারেন না। মূলতঃ এই নাচের পুতুল মালাকরদের তৈরী।

পাঁচ

পুতুল নাচের মঞ্চ

কাঠের পুতুল (Rod & hand puppets) নাচের জন্য পাটাতনহীন উপরের দিকে দর্শনের জন্য ফাঁকা মঞ্চ তৈরী করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে বড় বড় মেলায় ও সার্বজনীন পূজা উপলক্ষে কাঠের পুতুল নাচের ব্যবস্থা করা হত কিছুদিন আগেও। সাধারণতঃ হোগল দিয়ে তৈরী ঘরে রঙীন দৃশ্য আঁকা থিয়েটারী পর্দা টাঙিয়ে এই মঞ্চ তৈরী করা হোত। সেই অকিঞ্চিৎকর মঞ্চেই রামায়ণ বা মহাভারতের পালার পুতুল অভিনয় অগণ্য বাঙালী মনের রস-পিপাসা মিটিয়েছে। সারা উনিশ শতক জুড়ে এই পুতুল নাচ চলেছিল। আরও আগে থেকে চলে আসছিল তারের পুতুল নাচ। এর মঞ্চ নীচের দিকে ফাঁকা। উপর থেকে সুতোর (কালো) সাহায্যে এই পুতুল নাচানো হয়ে থাকে। এর মঞ্চ যেমন সাদা সিধে এর পুতুল তেমনি—আবার এর কাহিনীও অত্যন্ত সাধা-সিধে গ্রাম্য কাহিনী।

বর্তমানে কাঠের পুতুল নাচের দল থিয়েটারীমঞ্চ তৈরী করে। সখের দু'একটি দল একান্তভাবে সামাজিক নাটক অভিনয়ের চেষ্টাও এতে করেছেন ব'লে শোনা গেছে। তবে এরমঞ্চকে এখনো ঘূর্ণায়মান করা যায়নি। তবে দৃশ্য বদলের দ্রুতগতি অন্যভাবে আনার চেষ্টা করছেন কয়েকটি দল।

বর্তমানে তারের পুতুল (Marionettes) নাচের মঞ্চে আভিজাত্য ও জমক আনার চেষ্টা দেখা গেছে। দৃশ্যপট বদল পূর্বে এতে অসম্ভব ছিল। এখন তাও করা হচ্ছে।

ছায়া পুতুল নাচের মঞ্চ একই রকম থেকে গেছে। পর্দায় ফেলা কালো বা রঙীন ছায়ার নাচ মাত্র বলে এর মঞ্চের কোন বিবর্তন দেখা যায় না। তবে রুচিশীলতা আরও বাড়ছে সূক্ষ্মতার দিকে।

বিদেশে সমস্ত ধরণের পুতুল নাচের মঞ্চের যে দ্রুত ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা গেছে বাংলার পুতুল নাচে তা দেখা যায় না। কারণ এখন বাংলা দেশে পুতুল নাচ জনগণের রসতৃষ্ণা মেটাতে পারছে না।

অথচ এর মধ্যে খুবই সম্ভাবনা আছে জনগণের রস-তৃষ্ণা নিবারণের। সেদিকে নজর একটু একটু ক'রে সকলের পড়বে আশা করা একেবারে অন্যায় বলে মনে করতে পারছিনা।

(৬) প্রয়োগ কৌশল

ভারতীয় পুতুল নাচের প্রয়োগ কৌশল অযান্ত্রিক, বিদেশের যান্ত্রিক। সুতরাং ব্যক্তিগত প্রয়োগ কৌশল এখানে খুবই তীক্ষ্ণ। হাতকে সব সময় সজাগ থেকে ঠিক ভাবে কাজ করতে হয়। আবার শিল্পী দেখতে পায়না সম্পূর্ণ তার পুতুল কি ভাবে নাচছে। তাই তাকে অনেক বেশী সচেতন থাকতে হয়। বিদেশের পুতুল নাচের মঞ্চে প্রচুর যান্ত্রিক সহায়তা নেওয়া হয়। তাতে প্রয়োগকারী শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রয়োগ কৌশলে তীক্ষ্ণতা ক্ষুণ্ণ হয়।

তবে পুতুল যাতে আরও ভাল নাচে তার জন্য যদি যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন হয় তা নিতেই হবে—নেওয়াই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ প্রকাশ করবে। তাই আমাদের দেশের পুতুল নাচের মঞ্চে যান্ত্রিক সহায়তাকে স্বাগত জানাতে হবে। কিন্তু যেখানে যান্ত্রিক কৌশল প্রয়োগ ছাড়াই ভাল ফল পাই সেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতির সহায়তা নিয়ে ঐ ফললাভ বিধেয় নয়। তাতে শিল্পীর সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়।

(৭) সঙ্গীত

কাঠের পুতুলের সংগে আমাদের দেশের যাত্রাগানের সংগীতই পরিবেশিত হয় বেশীর ভাগ ভাঙা গলায়। অনেক নামকরা পুতুল নাচের দলেই এটা দেখেছি। আবহ-সংগীত হিসাবে প্রায় কোন কিছুর প্রয়োগই লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু এই আবহসংগীত যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দর ও প্রয়োজনীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারে পুতুল নাটকের অভিনয়ে।

তারের পুতুলের সংগে তালপাতার 'পিকির্ পিকির্' শোনাতেই বাঙালীর কান অভ্যস্ত হয়ে আছে। কিন্তু সেখানে আরও সুন্দর ক'রে আবহসংগীতের প্রয়োগ সম্ভব। আমাদের দেশের সিনেমা পরিচালকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের আবহ সংগীত সম্পর্কে প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। তাঁর পদ্ধতিতে পুতুল নাচে আবহ সংগীত প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাতে পুতুল নাচ আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

ছায়া পুতুল নাচের ক্ষেত্রে আবহ-সংগীতের যথেষ্ট প্রয়োগ এদেশেও লক্ষ্য করা গেছে। সেখানে আবহ সংগীত ছাড়া প্রায় নাটক জমে ওঠে না বলেই বোধ হয় এ রকমটি হ'তে পেরেছে।

সব পুতুল নাচে সানাই বাজানো যায়। আগে কাঠের পুতুলে সানাই বাজতো আবহসংগীত রূপে।

(৮) পুতুল নাচের পালা

কাঠের পুতুল নাচে আমাদের দেশ এখনো রামায়ণ মহাভারত পুরাণের কাহিনীতে আবদ্ধ হয়ে আছে 'বেশী'র ভাগ। সামাজিক, সাংকেতিক, এমন কি ঐতিহাসিক পালাও প্রায় ঠাঁই পায়না কাঠের পুতুল নাচে। অথচ বিদেশে এইসব তো বটেই অদ্ভুত রসের গল্পও (Fantacy) এতে ঠাঁই পায়। শুধু তাই নয় অদ্ভুত রসের গল্প নাকি এতে বেশী জমে। এই ধরণের গল্প সব বয়সের লোকের কাছে আছে। আমাদের দেশের রামায়ণ মহাভারতের গল্পকে আরও ঘনিষ্ঠ ও বাস্তব রূপ দিয়ে আরও সামাজিক ক'রে তুলে আজকের ভাবনা চিন্তার সংগে যুক্ত ক'রে যদি পালা রচনা করা যায় তবে আশা করা যায় যে তা আজকের সব মানুষেরই মনে আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারবে।

তারের পুতুল নাচের যে পালা আজও দেশে চলে তাকে আরও অধিক শিল্পসম্মত রূপ দেওয়া যেতে পারে। তাতেও আমাদের দেশের মানুষের আকর্ষণ বাড়বে। রূপক নাটকগুলির অভিনয়, বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন-রক্তকরবী-মুক্তধারা নাটকগুলি, কাঠের পুতুলের পালা হিসাবে ব্যবহার ক'রে সুফল পাওয়া যাবে ব'লে আশা করি।

তারের পুতুল ও ছায়া-পুতুলের নাচের জন্য অদ্ভুত রসের (Fantacy) গল্প, রূপকথা ও গ্রাম্যকাহিনীর পালাগুলিকে গ্রহণ করা যায়। তারের পুতুল নাচে নাচ অতি সুন্দর হয়ে ওঠে। সুতরাং নাচ যাতে যোগ করা যায় এমন পালা খুবই ভাল। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য গুলিরও এই তারের পুতুলের মঞ্চে অভিনয় চল্‌তে পারে।

নয়

উপসংহার

পুতুল নাচ বাংলাদেশের এক বিশেষ সম্পদ। লোক-রঞ্জন শিল্পের এই ধারার সংগে মূর্তিশিল্প, সংগীত প্রভৃতি শিল্পের যোগ আছে। সুতরাং এই ধারার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা সংযুক্ত শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করবে। আমরা আগেই বলেছি পুতুল নাচ সমগ্র জনমনে রস সঞ্চারের ক্ষমতা রাখে। বিদেশেরও অনেকের ধারণা পুতুলনাচ ছোটদের জন্যই। কিন্তু সে কথা সত্য নয়। আমরা আজ যদি নাটকের ধারার প্রতি লক্ষ্য রাখি তবে দেখব যে, পৃথিবীর নাট্যবিবর্তন ক্রমশঃ সাংকেতিকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কাহিনী রসকে সম্পূর্ণ ব্যাহত না ক'রে অতি সূক্ষ্মসংকেতের সাহায্যে সহৃদয় চিত্তকে রস-স্বর্গলোকে জাগরিত করাই আজকের চরমতম বিবর্তিত নাটকের রচনাকারীর প্রচেষ্টা। যেহেতু পুতুলনাচেই সেই সাংকেতিকতার চরমতম বিকাশ সম্ভব সেই হেতু পুতুলনাচকে নাটকের চরমতম বিকশিত রূপ ব'লে মনে করা খুব অন্যায় হবে না। সেইজন্য সংকেত-রূপক নাটকের কাহিনী পুতুলনাচের পালা হয়ে উঠতে পারে খুব স্বাভাবিক ভাবেই।

যাত্রাগান যেমন মুখ্যতঃ গানই ছিল, পুতুলনাচও তেমনি নাচই। তাই নৃত্যধর্মী নাটকগুলি এতে বেশ ভাল ফুটবে ব'লেই আমার ধারণা। তবে রূপক সাংকেতিকতা ও নৃত্যের সার্থক সমন্বয় যদি কোন নাটকে সম্ভব হয় তবে তাই হবে পুতুলনাচের সব থেকে ভাল নাটক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ছোটদের জন্যই শুধু নয়, বড়দের জন্যও পুতুলনাচের প্রয়োজন। তাই যাঁরা চেষ্টা করছেন দেশের শিল্পধারাকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাঁদের এদিকে নজর দিতে অনুরোধ জানিয়ে আশা করি অপরাধ কিছু করছি না। যাত্রা থিয়েটারের হাত হ'তে পরাজয় থেকে পুতুলনাচকে তাঁদেরই বাঁচিয়ে তুলতে হবে।

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারত সফরে আসছে। ১৯৬৬-৬৭ সালের এই ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল পাঁচদিনব্যাপী ৩টি টেস্ট ম্যাচ নিয়ে মোট ৯টি খেলায় যোগদান করবে। তারা সফরের প্রথম খেলায় (তিন দিনের) নামবে এরা ডিসেম্বর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিপক্ষে। সফরের শেষ খেলা নাগপুরে শেষ হবে ২৮শে জানুয়ারী, ভারতীয় প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেট অধিনায়ক বিজয় হাজারের 'বেনিফিট' তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্যে।

টেস্ট খেলার স্থান ও তারিখ

১ম টেস্ট (বোম্বাই): ডিসেম্বর ১৩-১৪, ১৬-১৮

২য় টেস্ট (কলকাতা): ডিসেম্বর ৩১ এবং জানুয়ারী ১, ২, ৪ ও ৫

৩য় টেস্ট (মাদ্রাজ): জানুয়ারী ১৩-১৫, ১৭-১৮

দলের খেলোয়াড়বৃন্দ

গারফিল্ড সোবার্স (অধিনায়ক), কনরাড হান্ট, ওয়েসলী হল, লান্স গিবস, রোহন কানহাই, বেসিল বুচার, সিমুর নার্স, চার্লি গ্রিফিথ, ডেভিড হলফোর্ড, জ্যাকি হেণ্ড্রিকস, ডেরিক মারে, রবিন বাইনো, ব্রায়ান ডেভিস, লেস্টার কিং, ক্লাইভ লয়েড এবং রেক্স কলিমুর।

আই এফ এ শীল্ড

১৯৬৬ সালের আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোট ৩৭টি দল যোগদানের ইচ্ছায় নাম দিয়েছিল; এদের মধ্যে পশ্চিমবাংলার ২২ এবং বাইরের ১৫টি দল। বাইরের দুটি দল শেষ পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। সরাসরি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় রাউণ্ড থেকে প্রথম খেলার অধিকার পেয়েছিল এই চারিটি দল—ইস্টবেঙ্গল, পাঞ্জাব পুলিশ (জলন্ধর), মোহনবাগান এবং হায়দরাবাদ একাদশ দল। কোয়ার্টার ফাইনালে যে আটটি দল উঠেছিল তাদের মধ্যে স্থানীয় দল ছিল পাঁচটি এবং বহিরাগত দল তিনটি (হায়দারবাদ একাদশ, মধ্যপ্রদেশ একাদশ এবং ইণ্ডিয়ান নেভী)। সেমি ফাইনালে বি এন রেলদল ২-১ গোলে ইণ্ডিয়ান নেভীকে (বোম্বাই) এবং ইস্টবেঙ্গল ২-১ গোলে ইস্টার্ণ রেলদলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ফাইনাল খেলা

ইস্টবেঙ্গল বনাম বি এন রেলদলের ফাইনাল খেলায় জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি একদিনে হয়নি। প্রথম দিনে খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র ছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলার ২৭ মিনিটের মাথায় ইস্টবেঙ্গলদলের পক্ষে জয়-সূচক গোলটি দেন পরিমল দে। এই জয়লাভের ফলে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সর্ব্বাধিক ৯ বার (রেকর্ড) আই এফ এ শীল্ড জয়ের গৌরব লাভ

করেছে। ১৯২৪ সালে আই এফ শীল্ড জয় করে ক্যালকাটা এফ সি সর্ব্বপ্রথম যে রেকর্ড করেছিল, আজ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সেই রেকর্ডের সমান ভাগীদার হল। ১৯৬৬ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার একটি খেলায় সর্ব্বাধিক গোলের (৯টি) রেকর্ড করেছে দুটি দল—মধ্যপ্রদেশ একাদশ (বিহার রেজিমেণ্টাল দলের বিপক্ষে) এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে (আসাম পুলিশ দলের বিপক্ষে)। একটি খেলায় সর্ব্বাধিক ব্যক্তিগত গোলের রেকর্ড (উপর্য্যুপরি ৫টি) করেছেন হাওড়া ডি এস এ দলের বিপক্ষে বাটা স্পোর্টস দলের অমিয় ভট্টাচার্য্য। হ্যাটট্রিক করেছেন আটজন খেলোয়াড়—অমিয় ভট্টাচার্য্য (বাটা স্পোর্টস) উপর্য্যুপরি পাঁচ গোল, বি লাহিড়ী (এরিয়ান্স), রামচন্দ্রন (মধ্যপ্রদেশ), ইন্দর সিং (লিডার্স ক্লাব, জলন্ধর) উপর্য্যুপরি চার গোল, পি মজুমদার (বি এন আর), চুনী গোস্বামী (মোহনবাগান) উপর্য্যুপরি চার গোল, প্রদীপ ব্যানার্জি (ইস্টার্ণ রেলওয়ে) এবং গুরুকৃপাল সিং (ইস্টবেঙ্গল)।

১৯৬৬ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ কাপ এবং আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়ে মোহনবাগান ক্লাব প্রতিষ্ঠিত একই বছরে সর্ব্বাধিকবার (৪ বার) লীগ কাপ এবং আই এফ এ শীল্ড জয়ের রেকর্ড ভেঙ্গেছে।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

পাতিয়ালায় অনুষ্ঠিত ২৩তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস পুরুষ বিভাগে, দিল্লী মহিলা বিভাগে এবং গত বছরের মত পশ্চিমবাংলা বালক ও বালিকা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছে। চারদিন ব্যাপী জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ১১টি জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়—মহিলা বিভাগে ৫টি, বালক বিভাগে ৪টি এবং পুরুষ ও বালিকা বিভাগে একটি করে। এই প্রতিযোগিতায় রাজস্থানের কুমারী রিমা দত্ত অসাধারণ ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তিনি মহিলা বিভাগের পাঁচটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে প্রত্যেকটিতে স্বর্ণ পদক এবং সেই সঙ্গে নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

পুরুষ বিভাগ: ১ম সার্ভিসেস ১৫৮ পয়েণ্ট, ২য় পশ্চিমবাংলা ৫৮ এবং ৩য় রেলওয়ে ৫৪।

মহিলা বিভাগ: ১ম দিল্লী ৩৬, ২য় রাজস্থান ৩৫, এবং ৩য় মহারাষ্ট্র ৩২।

বালক বিভাগ: ১ম বাংলা ৬৩ এবং ২য় দিল্লী ৪০

বালিকা বিভাগ: ১ম বাংলা ৩৬ এবং ২য় দিল্লী ৩১।

নেহরু ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা:

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বার্ষিক নেহরু ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ডেনমার্ক, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, পশ্চিম জার্মানী, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছিলেন। বালক বিভাগের সিঙ্গলস ছাড়া বাকি পাঁচটি অনুষ্ঠানে বৈদেশিক খেলোয়াড়রা খেতাব জয়ী হন।

পুরুষদের সিঙ্গলসে ডেনমার্কের সেভেন এণ্ডারসেন, পুরুষদের ডাবলসে ডেনমার্কের সেভেন এণ্ডারসেন এবং সিয়ার ওয়ালসো, মহিলাদের সিঙ্গলসে পশ্চিম জার্মানীর কুমারী ইমরাগ্রাদ লাজ, মহিলাদের ডাবলসে শ্রীমতী জুডি হাসম্যান (আমেরিকা) এবং কুমারী ইমরি রেটভিল্ড (হল্যাণ্ড) জুটি এবং মিক্সড ডাবলসে সিয়ার ওয়ালসো এবং উল্লা ষ্ট্রাণ্ড (ডেনমার্ক) খেতাব জয় করেন।

নেহরু হকি ট্রফি:

১৯৬৬ সালের নেহরু হকি প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হকি ফেডারেশনের দুই দলের (ব্লু এবং রেড দল) ফাইনাল খেলা ১-১ গোলে ড্র গেলে শেষ পর্য্যন্ত টস ক'রে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা করা হয়। টসে রেড দল জয়ী হয়ে নেহরু হকি ট্রফি লাভ করে।

জাতীয় জুনিয়র ফুটবল:

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে অন্ধ্রপ্রদেশ ২—১ গোলে মহীশূর দলকে পরাজিত করে ডাঃ বি সি রায় ট্রফি জয় করেছে।

সেমি-ফাইনালে গত বছরের রাণার্স-আপ অন্ধ্রপ্রদেশ দল ১—০ ও ০—০ গোলে পশ্চিমবাংলাকে এবং মহীশূর ৫—০ ও ৩—২ গোলে গত বছরের বিজয়ী দিল্লী দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ভারত-সিংহল সন্তরণ:

দিল্লীর ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাবের সন্তরণাগারে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম সিংহলের সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ

১২০—৪৪ পয়েণ্টে জয়লাভ করে। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ ৫৯-২১ পয়েণ্টে অগ্রগামী হয়েছিল। ভারতবর্ষ প্রথম দিনের ১২টি অনুষ্ঠানে ১১টি এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষ দিনের ১৩টি অনুষ্ঠানে ১২টি স্বর্ণপদক অর্থাৎ মোট ২৫টি অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ ২৩টি স্বর্ণপদক এবং সিংহল মাত্র ২টি স্বর্ণপদক জয়ী হয়। ভারতবর্ষের রিমা দত্ত ব্যক্তিগতভাবে সর্বাধিক স্বর্ণপদক (মোট ৬টি) জয়ের গৌরব লাভ করেন।

ভারতবর্ষের মোট সংগৃহীত ১২০ পয়েণ্টের মধ্যে পুরুষদের ছিল ৯০ পয়েণ্ট এবং মহিলাদের ৩০ পয়েণ্ট। অপরদিকে সিংহলের মোট ৪৩ পয়েণ্টে ছিল পুরুষদের ১৯ এবং মহিলাদের ২৫ পয়েণ্ট।

আন্তঃ জেলা স্কুল ফুটবল :

পশ্চিমবাংলার আন্তঃ জেলা স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে দক্ষিণ কলিকাতা স্কুল দল ৫—১ গোলে হুগলী জেলা স্কুল দলকে পরাজিত করার গৌরবে রেম্প্রার্স জুবলী কাপ জয় করেছে। বিজয়ী দক্ষিণ কলিকাতা স্কুল দলের পক্ষে সুভাস ভৌমিক হ্যাট্‌ট্রিক করার সূত্রে প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার লাভ করেন।

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল :

১৯৬৬ সালের দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে জলন্ধরেরই দুই দল—পাঞ্জাব পুলিস এবং লীডার্স ক্লাব উঠেছিল। প্রথমদিনেই ফাইনাল খেলার নিষ্পত্তি হয়নি—গোলশূন্য অবস্থায় খেলা ড্র হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় পাঞ্জাব পুলিস দল ২—০ গোলে জয়ী হয়।

বিশ্ব জিমন্যাষ্টিক প্রতিযোগিতা :

পশ্চিম জার্মানীর ডর্টমুণ্ডে আয়োজিত ১৬শ বিশ্ব জিমন্যাষ্টিক প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

পুরুষ বিভাগ : ১ম জাপান (গত বছরের চ্যাম্পিয়ান) এবং ২য় রাশিয়া।

মহিলা বিভাগ : ১ম চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ২য় রাশিয়া ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান।

পুরুষ বিভাগ : মিখাইল, ভোরোনিন (রাশিয়া)
মহিলা বিভাগ : ভেরা ক্যাসলাভস্কা (চেকোশ্লোভাকিয়া)

জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা :

হায়দরাবাদের লালবাহাদুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস, মহিলা বিভাগে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বালক বিভাগে উত্তর প্রদেশ খেতাব জয়ী হয়েছে।

বিশ্ব ক্রিকেট টুর্নামেণ্ট :

ইংল্যাণ্ডের লর্ডস মাঠে যে বিশ্ব ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল তাতে যোগদান করেছিল এই তিনটি দল—ইংল্যাণ্ড, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং বিশ্ব একাদশ দল। বিশ্ব একাদশ দলটি অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, পাকিস্থান, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড় নিয়ে গঠন করা হয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে স্থান পেয়েছিলেন পাতৌদির নবাব এবং বাপু নাদকানী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—বিশ্ব একাদশ দলের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৮ রানে জয়ী হয়। অপরদিকে ইংল্যাণ্ড একাদশ দল ৮২ রানে বিশ্ব এক দশ দলকে পরাজিত করে ফাইনালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে মিলিত হয়। ফাইনালে ইংল্যাণ্ড একাদশ দল ৬৭ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করে। ১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ড যে ১-৩ খেলায় (ড্র ১) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল তার দুঃখ থেকে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করেছে। আলোচ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রতিটি খেলা মাত্র এক দিনের সময়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং প্রতি ইনিংসের আয়ু ছিল ৫০ ওভার। এক ইনিংসের খেলায় একজন বোলারের বল দেওয়ার অধিকার ছিল মাত্র ১০ ওভার।

আমেরিকান লন্ টেনিস :

১৯৬৬ সালের আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতাটি নানা দিক থেকে নজির সৃষ্টি করেছে। পুরুষ দর সিঙ্গলস ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার যে দুজন খেলোয়াড় খেলেছিলেন তাঁরা প্রতিযোগিতার বাছাই তালিকায় কোন স্থানই পাননি। আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৮৫ বছরের ইতিহাসে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে দু'জন অবাছাই খেলোয়াড়কে এই প্রথম খেলতে দেখা গেল। এই দু'জন আবার একই দেশের (অস্ট্রেলিয়ার)।

গত বছরের মত অস্ট্রেলিয়া এবছরও তাদের প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। পুরুষদের সিঙ্গলস সেমিফাইনালে যে

চারজন খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার এবং বাকি জন স্পেনের। সেমি-ফাইনালে খেলেছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার ফ্রেড স্টোলে, জন নিউকম, রয় এমার্সন এবং স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা। এ বছরের প্রতিযোগিতায় সান্তানা ছিলেন এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড়। গত বছর তিনি আমেরিকান সিঙ্গলস এবং এ বছরে উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন। সেমি-ফাইনালের একদিকে ফ্রেড স্টোলে স্বদেশেরই রয় এমার্সনকে (২নং বাছাই) ৬ ৪, ৬-১ ও ৬-১ গেমে পরাজিত করেন। এই রয় এমার্সন ১৯৬১ ও ১৯৬৪ সালে আমেরিকার সিঙ্গলস খেতাব জয় করেছিলেন। অন্য দিকের সেমি-ফাইনাল খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার জন নিউকম (অবাছাই) ৬ ৩, ৬ ৪, ৬-৭ ও ৮-৬ গেমে ১নং বাছাই ম্যানুয়েল সান্তানাকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস সেমি ফাইনালের চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে দু'জন ছিলেন আমেরিকার এবং একজন করে ব্রেজিল এবং অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়। একদিকের সেমি-ফাইনাল খেলায় ব্রেজিলের মারিয়া বুনো (২নং বাছাই) ৬-২, ১০ ১২ ও ৬-৩ গেমে আমেরিকার রোজমেরী ক্যাসলসকে পরাজিত করেন। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে আমেরিকার নান্সি রিচে (৩নং বাছাই) ৬ ৩ ও ৬-২ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার মেলভিলকে পরাজিত করেন।

পুরুষ বিভাগে অষ্ট্রেলিয়ার ফ্রেড স্টোলের পক্ষে এই প্রথম আমেরিকার সিঙ্গলস খেতাব জয়। অপর দিকে ব্রেজিলের মারিয়া বুনো এবার নিয়ে চারবার (১৯৫৯, ১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৬৬) আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। এ ছাড়া কুমারী বুনো তিনবার (১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৬৪) উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস ফ্রেড স্টোলে (অস্ট্রেলিয়া) ৪-৬ ১২-১০, ৬ ৩ ও ৬ ৪ গেমে জন নিউকমকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: ২নং বাছাই মারিয়া বুনো (ব্রেজিল) ৬-৩ ও ৬-১ গেমে ৩নং বাছাই নান্সি রিচেকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ২৬।১১।৬৬ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রতাক্ষা — শিল্পী :—অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অগ্রহায়ণ—১৩৭৩

প্রথম খণ্ড | চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

ঐশীশক্তির স্বীকৃতি

শ্রীরাধাবল্লভ দে

আমাদের দৈনন্দিন কর্মপ্রসঙ্গে একাধিক মতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। দৈববাদীদের মতে আমাদের সব কর্মই দৈবাধীন। দৈবকে লঙ্ঘন করিবার শক্তি মানুষের নাই। দৈব অনুকূল হইলেই পুরুষকার ফলপ্রসূ হয়। নতুবা তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তুমি পুরুষকার খাটাইয়া জমি কর্ষণ, বীজবপন সবই করিলে, দৈবক্রমে বর্ষণ হইল না, তোমার পুরুষকার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও অহরহ দেখা যায় তাহার উদ্যম, চেষ্টা ও কর্ম অনেক সময় এক অজ্ঞাত ও অবোধ্য শক্তি ব্যাহত বা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যেন ঐ শক্তি হইতে তাহার নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায় নাই। কত লোককে দেখি বিনা চেষ্টায়, বিনা পরিশ্রমে, অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্যের উপার্জিত টাকাকড়ি এবং বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইতেছে, আবার কত লোক কত উদ্যম, কত পরিশ্রম করিয়াও জীবনে অকৃতকার্য এবং ব্যর্থ মনোরথ। এ সংসারে কতিপয় লোক আজীবন মূক, বধির, অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও আতুর হইয়া জীবনপাত করিতেছে। পুরুষকারবাদীগণ এই দৈববলকে অস্বীকার করিলেও দৈবের অস্তিত্ব খণ্ডিত হয় না।

পুরুষকারবাদীগণ আবার বলেন পুরুষকারের দ্বারাই সর্বকার্য্যে সিদ্ধি হয় শুধু দৈবের উপর নির্ভর করিয়া কোন কার্য ফলপ্রসূ হয় না। মানুষ পুরুষকার প্রভাবে জমি কর্ষণ ও বীজ বপন না করিলে বর্ষণ কোন কাজে লাগিবে? গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মানুষ প্রচেষ্টা না করিলে খাদ্যবস্ত্র আপনা-আপনি আসিবে না। সুতরাং দৈববাদ কাপুরুষের। ইহজন্মে যাহাকে দৈব বলা হয় তাহাও পূর্বজন্মের পুরুষকার, ইহজন্মে দৈব রূপে দেখা দিয়াছে। ইহাদের মতে একজন্মে যাহা পুরুষকার পরবর্তী জীবনে তাহা দৈব, এবং একজন্মে যাহা দৈব পূর্ববর্ত্তী জন্মে তাহা পুরুষকার। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক সর্বক্ষেত্রেই আমরা পুরুষকারের জয়জয়কার দেখি। কত বাধা, কত বিঘ্ন, কত বিপদ, অতিক্রম করিয়া অটল সংকল্প বলে কর্মবাদীরা নিজেদের জীবন সাফল্য মণ্ডিত করে।

সমন্বয়বাদীরা আবার বলেন, উপরোক্ত কোন তত্ত্বই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। কেবল দৈব বা কেবল পুরুষকার কার্যকরী হয় না। দৈব এবং পুরুষকার উভয়ই চাই। দৈব অনুকূল, যথাসময়ে বৃষ্টি নামিল, তুমি পুরুষকার খাটাইয়া কৃষিকর্ম করিলে না, ফসল হইবে কেমন করিয়া? আবার তুমি কৃষিকর্ম করিলে দৈবক্রমে বর্ষণ হইল না। ফসল জন্মিবে কেমন করিয়া? অতএব সিদ্ধি ক্ষেত্রে উভয়েই সমান উপযোগী। কিন্তু এমনও তো দেখা যায় দৈবানুকূলে সুবৃষ্টি হইয়াছে। পুরুষকার প্রভাবে ফসল হইয়াছে। হঠাৎ প্রবল বন্যায় অথবা পঙ্গপালের আক্রমণে সব ব্যর্থ হইয়া গেল। এ দৈবকে এড়াইবার তো পুরুষকারের সাধ্য থাকে না। এ প্রসঙ্গে প্রথম জিজ্ঞাস্য আদি কর্মের প্রণোদক কে? দৈব না পুরুষকার? দ্বিতীয় কথা পুরুষকারবাদীর কর্ম করে কে? এই দেহ মন ইন্দ্রিয় সমন্বিত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃসমন্বিত প্রকৃতি করে। এখানে জিজ্ঞাস্য এ প্রকৃতি কার? ঈশ্বরীয় প্রকৃতি। এই ঈশ্বরীয় প্রকৃতিই সব করে, জীব ভ্রান্তিতে বলে 'আমি করি'। জগৎ-জোড়া বিশ্বপ্রকৃতিই সব করিয়া চলিতেছে, আমি কর্ত্তা নহি। তাহা হইলে পুরুষকার আর কিছু নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে জীব কাজ করিয়া অহংপ্রভাবে কর্ত্তৃত্বটা আপন ঘাড়ে চাপাইয়া লয়। এই অহংভাবও ঈশ্বর সৃষ্ট মায়া। আসল কথা ঈশ্বরেচ্ছায় কর্ম হয়, সেই ইচ্ছাই পুরুষকারের উপর পরম পুরুষকার। গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

> ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥
> তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
> তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
>
> ১৮-৬১-৬২

উপরোক্ত শ্লোক হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় ঈশ্বর সর্ব-ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সর্বপ্রাণীকে আপন মায়ায় যন্ত্রকের পুত্তলিকাবৎ পরিচালিত করিতেছেন। পুরুষকার তাঁহার হাতের লীলাসূত্র। এই সূত্রাবলম্বনেই তিনি আমাদের জীবন পরিচালিত করিতেছেন। শ্রেষ্ঠ উপায় সেই মায়াধীশ পুরুষোত্তম-এর একান্ত শরণাপন্ন হওয়া। এইখানেই কর্মবাদের সমাধি, ঈশ্বরবাদের উদ্বোধন-ত্রৈশী শক্তির স্বীকৃতি।

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(রমন্যাস)

পূর্বপ্রকাশিতের পর

চার

অসিত আকাশের দিকে তাকায়। বৃষ্টি থেমেছে বটে, কিন্তু দু'তিন দল মহাকায় মেঘ আকাশ পাহারা দিচ্ছে—হাওয়াও বন্ধ, গুমট মন। আবার বৃষ্টি নামল ব'লে। আর বৈরাগীজি কী করছেন এখন শিষ্যাকে নিয়ে! "ঠাকুর আছেন" ব'লে নিশ্চিন্ত আছেন কি এখনো? কে জানে? কাঁটা ফুটলে দার্শনিক হওয়া শক্ত নয়, কিন্তু শূল বেদনা হ'লে? ওর মনে পড়ে এক বন্ধুর কথা। সে জ্বর হ'লে কুইনিন খেত না, বলত: "জ্বর যখন ঠাকুরই দিয়েছেন তখন সারাবার ভারও তাঁর।" কিন্তু একবার দাঁতে ব্যথা হ'তে অধীর হ'য়ে ছুটেছিলেন দন্ত ধন্বন্তরির কাছে। হয়ত মানুষ কিছুদূর অবধি সইতে পারে—আর যতক্ষণ পারে জাঁক করে শরণাগতির। কিন্তু ব্যথা বাড়তে বাড়তে তার মনও বদ্‌লে যায় ভয়ের চাপে। ভাবতে ভালো লাগে যে, এ বিদেশী যোগীটি ঘোর বৃষ্টিতেও সমান নির্বিকার আছেন—কিন্তু যদি ঘর ভেসে গিয়ে থাকে?······এই রকম সাত পাঁচ চিন্তা।···

*   *   *

স্বামীজি ফিরে বললেন সোল্লাসে: "ব্যবস্থা হয়েছে। ডাক্তারবাবু বললেন: 'উনি আমাদের অতিথি হ'লে আমরা তো ধন্য হয়ে যাব স্বামীজি!' আমি এক্ষুনি মোটর পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার হঠাৎ পা মচকে গেছে আজ সকালে। তাই আপনি কি অসিতবাবু গিয়ে নিয়ে আসুন ওঁদের'।"

অসিত (খুশী): সাবাস স্বামীজি! কিন্তু দেখুন ফের বৈরাগী বাবাজীই জিৎলেন—এবার ঠাকুর দেখা দিলেন সাধুজির তৎপরতা আর ডাক্তারের করুণার কম্পাউণ্ড হ'য়ে।

দেবানন্দ (হেসে): না। জুড়ে দিন—প্লাস প্রত্যুৎপন্নমতি অতিথির দৈবী প্রেরণা। কিন্তু যেহেতু আমাকে যেতে হচ্ছে আশ্রমের থেকে ডিস্পেন্সারিতে—একঘর লোক অপেক্ষা করছে—সেহেতু আমি বলি কি, মোটরে ক'রে আপনি নিজে গিয়ে গুরু-শিষ্যাকে গ্রেপ্তার ক'রে গছিয়ে দিন ডাক্তার বাবুর—না তাঁর স্ত্রী তারার হাতে। সে ভারি চমৎকার মেয়ে। খুব ভক্তি করে বৈরাগী মহারাজকে। দেখেছে তো তাঁকে—করবে না ভক্তি? কিন্তু আর দেরি না—বৃষ্টি সবে একটু কমেছে কিন্তু আকাশের অবস্থা তো দেখছেন। দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়ুন শৃঙ্গধ্বনি ক'রে—বিপদ কেটে যাবে। ভাগ্যে আপনি ডাক্তারবাবুর নাম করেছিলেন! তা আপনি হলেন কবি তথা গুণী জাত সাপ যাকে বলে—আপনাদের কল্পনা থাকবে না তো থাকবে কি আমাদের মতন শুক্‌নো সাধুর!'

পাঁচ

অসিতকে পথে সারথি বলেছিল যে, গোয়াল ঘরটি এক বাঙালী ব্যবসায়ীর সম্পত্তি—তাঁর বাড়ী থেকে আধমাইল দূরে। অসিত একটু অবাক হ'য়ে তাঁর নামধাম জিজ্ঞাসা করতে সারথি বলেছিল সে বেশি জানে না তবে এটুকু জানে যে, তিনি এক শেঠজির কাপড়ের ব্যবসার দোকান কিনে বৃন্দাবনে ব্যবসা বাড়িয়ে প্রচুর টাকা করেছেন। তাই জাতে বাঙালী হ'লেও শেঠজি নামেই তিনি পরিচিত। আসল নাম সারথি বলতে পারল না।

অসিত (ভেবে) বলল: ব'লে বড় ভালো করেছ ভাই। চলো আগে তাঁর কাছে—পারি তো তাঁকে নিয়েই যাব সাধুজির কাছে। শেঠজি এখানকার সব জানেন শোনেন, সুবিধে হবে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! শেঠজির ওখানে গিয়ে তাঁকে খবর দিতেই শেঠজির তৎক্ষণাৎ আবির্ভাব। এসে ভদ্রতার কসুর করলেন না বটে কিন্তু বললেন: "পোড়ো ঘর, মহাত্মারা আসেন থাকেন আমি খবর রাখি না।" অসিত প্রেমল বৈরাগীর নাম করতে তিনি আরো অবাক: "দু দিন আছেন ঐ গোয়াল ঘরে? বলেন কি? সাহেব? মানে খাস সাহেব?"

মোটর গাড়ী-বারান্দা'র নিচে গিয়ে থামতেই দরোয়ান সেলাম ক'রে বৈঠকখানায় অতিথিকে বসিয়ে খবর দিল চেঁচিয়ে—"ডাগ্‌ডর বাবুকি মোটর আঈ।"

শুনবামাত্র শশব্যস্ত হ'য়ে শেঠজির অভ্যুদয়।

বৃষ্টির তোড় আরো বেড়েছে। কাজেই উপায় কি? এ ও তা কথাবার্তা সুরু হ'ল—যাকে বলে, small talk.

অতঃপর অসিত পাড়ল সাধুজির প্রসঙ্গ।

শেঠজি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলেন: "সাহেব? বলেন কি? উঠেছেন আমার গোয়াল ঘরে?"

অসিত: তাই তো বলেছেন তিনি। বললেন দোর পর্যন্ত নেই।

শেঠজি: পোড়ো ঘর জী! মাঝে মাঝে মহাত্মারা এসে থাকেন তাই দুটো দড়ির খাটিয়া রেখে দিয়েছি। আর কোণে একটি উনুন ম'ত—মহাত্মারা স্বপাকে খান তো। কিন্তু সাহেব সাধু তো কখনো আসেন নি আজ পর্যন্ত। খাস সাহেব?

অসিত (হাসি চেপে): দেখতে খাস সাহেব বটে, কিন্তু আসলে আপনার আমার চেয়েও হিন্দু, শেঠজি! আলমোড়ায় তাঁর আশ্রম আছে—মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ—পূজারী তিনিই। বৃন্দাবনে আসেন শুধু এখানকার পুণ্যরজঃ ছুঁয়ে জপতপের প্রেরণা পেতে।

শেঠজি: অ্যাঁ! বলেন কি জী?

অসিত: আর বলি কি! তার ওপর হিন্দু শিষ্যা জী! বড় ঘরের মেয়ে।

শেঠজি: শিষ্যা? বৈষ্ণবী? মানে, কণ্ঠীবদল?

অসিত (জিব কেটে): ছি ছি। তাঁর কন্যা শিষ্যা "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব" অর্থাৎ শিষ্য-শিষ্যাদের কাছে গুরু একাধারে বাপ মা। জানেন তো স্তবটি?

শেঠজি (একগাল হেসে): আপনার মুখেই গেলবার শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল জী! আহা কী গানই গান আপনি অসিতবাবু! এবারও গান হবে তো?

অসিত: হবে বৈ কি। আজই স্বামীজি বলছিলেন যে, কালই সবাইকে ডাকবেন রীতিমত নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে।"

"বেশ বেশ জী। কেবল আমি যেন বাদ না পড়ি। আপনার ভজন—আহা ক্যা কহনা? কিন্তু জানেন—যে-ঘরে সাধুজি আছেন সেটা সত্যিই সত্যিই গোয়াল ঘর ছিল আমার শাশুড়ী ঠাকরুণের? তিনি গত হওয়ার পর গরু গেছে—কেবল গোয়ালঘর আছে।"

"কিন্তু সেখানে বৈরাগী মহারাজ উঠেছিলেন কি আপনাকে জানিয়ে?"

"না। ওটা তো এখন পোড়া বাড়ী—অনেক সাধু মহাত্মা এসে থাকেন। তাই কয়েকটি দড়ির খাট রেখে দিয়েছি। কিন্তু দোর সব ভেঙে গেছে—মেরামত করব করব ক'রেও করা হয় নি। তবে মহাত্মারা দিব্যি থাকেন "আকাশশরীরং ব্রহ্ম"—বলেন তাঁরা খুশখেয়ালেই।"

অসিত মনে মনে হাসল, মুখে এসেছিল কিন্তু চেপে গেল: "ভক্তিভরে যাঁদের মহাত্মা বলেন তাঁরা যখন মুখ ফুটে কিছু বলেন না, কেনই বা তাঁদের আরাম দিতে চাওয়া? ভাঙা দোর মেরামত করা দরকার হয় গোয়ালে গরু থাকলে তবেই। মহাত্মাদের জন্যে মেরামত মানে তো অপব্যয়।"

এই সময়ে এক চাকর দু পেয়ালা চা আনল এক পাথরের থালে সাজিয়ে। সঙ্গে ঝুরিভাজা ও ফুলুরি।

"এ হাঙ্গাম আবার কেন শেঠজি!"

"বলেন কি জী? আপনি মেহমান অতিথি—সাক্ষাৎ দেবতা—আর বর্ষায়ই তো চাই এসব—নিন জী। তাজা ফুলুরি। উঃ - কী হাওয়া দিচ্ছে। ও কী! দেখুন দেখুন—শিল পড়ছে!

অসিতের মন খারাপ হ'য়ে গেল। সত্যিই শিলা-বৃষ্টির সঙ্গে শোঁ শোঁ শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। বৈরাগী

মহারাজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবতে ক্রমশঃ মধ্যে মধ্যে উদ্বেগ জ'মে ওঠে। চা ফুলুরি কিছুই মুখে রোচে না। তবু কথাবার্তা চালাতে হয়। না চালিয়ে করে কী—যখন নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই। শিলাপাত থেমেছে বটে, কিন্তু ঝড় প্রবর্ধমান।

অসিত (চা-র পেয়ালায় চুমুক দিয়ে): ঝড় হয়ত আরো বাড়বে শেঠজি। যাই। সাধুজি ও ললিতা দেবীকে নিয়ে যেতে হবে তো যেমন ক'রে হোক।

শেঠজি (ব্যস্ত): না না, অমন কাজটি করবেন না—এ-ঝড় একটু বাদেই থেমে যাবে। না থামলে আপনাকে বেরুতে দেব না কিছুতেই। চারধারেই বুড়ো গাছ, কখন কার ডাল ভেঙে পড়ে কে বলতে পারে? ব্যস্ত হবেন না। আর একটু চা?

অসিত: না শেঠজি, ধন্যবাদ। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনাকে। আপনি তো ধার্মিক লোক, সাধু সন্তদের মহাত্মা ব'লেও মানেন। প্রেমল বাবাজি যে আপনার গোয়ালঘরে আশ্রয় নিয়ে আজ সাত আট দিন আছেন এও জানতেন। কিন্তু তবু তাঁকে আজ সকালে কেন নিয়ে এলেন না আপনার এখানে?

শেঠজি (অপ্রতিভ: আনতাম জী। তবে কি জানেন?…উনি সাহেব তো…আর আমার গিন্নি…মানে, জানেনই তো মেয়েদের শুচিবাই…

অসিত: কিন্তু আপনার তো মস্ত বাড়ী—বাইরের কোনো ঘরে রাখতে পারতেন অনায়াসেই।

শেঠজি (আরো অপ্রস্তুত): তা পারতাম। তবে… বর্ষা এমন হঠাৎ এল…ঝুপ ক'রে…

অসিত আর জেরা করল না। কী হবে মিথ্যে এদের সাধুভক্তিকে অপদস্থ ক'রে? তারপর আতিথ্য তো স্বভাবে স্বয়ম্ভূ—জোর ক'রে কাউকে দরদী বদান্য করা যায় না। কিন্তু মন ওর ভারি হ'য়ে উঠল। কী কথা কইবে এ-জাতের ধনীর সঙ্গে—যারা ছুঁৎমার্গী, স্ত্রৈণ, ভয়-কাতুরে?

তবু একথা সেকথা চালাতে হয়।

* * *

মিনিট পনেরো বাদে ঝড় বৃষ্টি দুইই থেমে গেল। অসিত উঠল: "নমস্কার শেঠজি! অনেক ধন্যবাদ।"

"সে কি কথা জি? বসুন আমার দরোয়ানকে নিয়ে যান—মহাত্মাজির মালপত্র মোটরে তুলতে হবে তো!"

অসিতের হাসি এল শেঠজির মহাত্মার প্রতি হঠাৎ-জাগা ভক্তির বহর দেখে।

ছয়

শেঠজির গোয়াল ঘরটি ছিল কাছেই। মোটর পৌছল দু মিনিটেই।

কিন্তু এ কী ব্যাপার! টিনের ছাদওয়ালা গোয়াল ঘরটির ভিৎ অদৃশ্য…আশপাশের মাঠে নিচু জমিতে জল থই থই করছে!! সত্যিই মনে হচ্ছে ঘরটি যেন একটি দ্বীপে দাঁড়িয়ে!!!

প্রায় দুশো গজ হাঁটুজল ভেঙে অসিত শেঠজির দরোয়ানকে নিয়ে পৌছল প্রেমল বাবাজির আস্তানায়। দোর ভূমিসাৎ—কাজেই স্পষ্ট দেখতে পেল—পাশাপাশি দুই খাটিয়ায় ব'সে গুরু শিষ্যা ধ্যানস্থ।

একটু কুণ্ঠিত হ'য়েই অসিত একটু ডাকল: "মহারাজ…!"

ঘরে এক বিঘৎ জলের পুকুর। প্রেমল বাবাজি চোখ মেলে চম্‌কে উঠলেন: "এ কি আপনি?"

"হ্যাঁ। এসেছি আপনাকে আর—ওঁকে নিয়ে যেতে ডাক্তারবাবু মাধব মৈত্র পাঠিয়েছেন আমাকে।

প্রেমল (এক গাল হেসে): বড় সময়েই এসেছেন। তবে বলি নি—ঠাকুর আছেন? (ব'লেই ললিতাকে) কী? আর করবে অবিশ্বাস?

ললিতা (পিঠ পিঠ): কিন্তু ভাগ্যে ওঁর সঙ্গে সকালে বিশ্রাম ঘাটে হঠাৎ দেখা হয়েছিল। যদি না হ'ত ঠাকুর কী ব্যবস্থা করতেন শুনি?

প্রেমল (হেসে): "হঠাৎ দেখা" মানে? ঠাকুরের ইচ্ছা না থাকলে কি দেখা হ'তে পারত এমন দরদীর সঙ্গে? কবি কি বলেন নি:

> The stormy deeps God's Love outrules,
> 　Coming as an angel bark;
> Still, calling it an accident, fools
> 　To His miracle Grace never hark: *

* তুফানের ভয় কাটে, এল পারী বেয়ে তারিণীর তরণীখানি:
মূর্খেরা পায়: "দৈবাৎ!"—জানে অঘটনী কৃপা কেবল জ্ঞানী।

ললিতা: আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে গো হয়েছে, হার মান্‌ছি—কবিদের তলব ক'রে আর আমাকে কাবু করতে হবে না। কিন্তু—তোমাকেও মানতে হবে যে, তুমিও হার মানলে—পারলে না টিকতে এখানে ঠাকুরের অতিথি হ'য়ে।

অসিত: কিছু মনে করবেন না। কিন্তু ডাক্তারবাবুও তো ঠাকুরেরই হাতে গড়া—কাজেই সেখানেও আসলে তাঁরই তে. অতিথি হয়ে থাকবেন।

ললিতা: আপনি জানেন না গুরুজীর কী ভীষণ গোঁ। এবার খুব জাঁক করেছিলেন যে, একবারে একলাটি—গুড়ি দোকলা—এখানে থাকবেন—কিন্তু ঐ দেখুন, আপনাকে ভিতরে আসতে বলিই বা কোন প্রাণে? বসাই কোথায় ছাই?

প্রেমল: কেন? আমার খাটিয়ায়। এসো ভাই চ'লে, জল ভেঙে। বাইরে এক হাঁটু জল ভেঙে যখন এসেছ এখানে এক বিঘৎ জল ভাঙতে বেগ পেতে হবে না—বড় দীক্ষার পরে ছোট দীক্ষা সয় সহজেই। এসো চ'লে—এখন থেকে তুমি বলার পর্ব সুরু হ'ল। এমন দরদী বন্ধুকে কি আপনি বলা মানায়? তুমিও আমাকে তুমি বোলো।

অসিত (হেসে): আচ্ছা সে হবে—কিন্তু শুভস্য শীঘ্রং জানোই তো—তাই তোমরাই বেরিয়ে এসো। এই কিঙ্কর এসেছে সে তোমাদের মালপত্র নিয়ে মোটরে তুলবে।

প্রেমল: একটু বসবে না?

ললিতা (হেসে): তুমি যে কী বাপী! বসবেন উনি কোথায় শুনি? (অসিতকে) না, আপনি ঠিকই বলেছেন দাদা, দেরি করা নয় আর। ওর experiment হ'য়ে দাঁড়ালে—যাকে কথায় বলে পথে বসানো—আমাকে দেখুন দেখি (খিল খিল ক'রে হেসে) জলে বসিয়েছেন—একেবারে প্রলয় পয়োধি জলে। আর দেরি করলে বসা ছেড়ে সাঁতার দিতে হবে—ঐ দেখুন ফের বৃষ্টি সুরু হ'ল! বাতাসও উঠল ফের।

অসিত (দরোয়ানকে): উঠাও সামান।

দারোয়ান ঘরে ঢুকে ওদের একটি তোরঙ্গ ওঠায়। অসিতও ঢোকে—প্রেমলের খাটিয়া থেকে তোলে দুটি কম্বল। পরে ললিতার দুটি কম্বলও পাট ক'রে কাঁধে ফেলে। ললিতা ও প্রেমল ঘরের দু চারটে তৈজস তুলে পুঁটলি বেঁধে জলভেঙে এগোয় মোটরের দিকে। মোটরে বসতেই ফের তোড়ে বৃষ্টি নামল।

প্রেমল: কার মোটর?

অসিত: ডাক্তারবাবুর ছাড়া আর কার? তাঁর প[...] আজ সকালে মচকে গেছে ব'লে আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

অসিত সারথি ও দরোয়ানের পাশে সামনের আসনে বসতে যাবে এমন সময়ে প্রেমল লাফিয়ে তার হাত ধ'রে টেনে ঠেলে ললিতার পাশে ব'সিয়ে নিজে বসল তার ওপাশে।

কিন্তু কী বিপদ—মোটর স্টার্ট নেয় না। গোঁ গোঁ করে কিন্তু নিশ্চল।

ললিতা (হেসে): এবার বাপী? ঠাকুর যে থেকেও নেই? নামো, ঠেলো মোটর।

দরোয়ান (ব্যস্ত হ'য়ে): নহি নহি মাজী! অভি চলেগি মোটর।

প্রেমল তার কথায় কান না দিয়ে নেমে মোটর ঠেলা সুরু করল। দেখে অসিতও নামল। দরোয়ান তখন আর কী করে? নেমে তিনজনে মোটর ঠেলতে থাকে। একটু ঠেলতে মোটরের ঘর্ঘর গর্জে ওঠে, মনে হয়, বুঝি চলল বা—কিন্তু হায়রে। তার পরেই ফের যথাপূর্ব তথা পরং...

বৃষ্টিতেও মোটর ঠেলতে ঠেলতে ওরা যখন গলদ্‌ঘর্ম কলেবর হ'য়ে উঠেছে তখন হঠাৎ মোটর জেগে উঠল।

প্রেমল (হাততালি দিয়ে ললিতাকে): কী এবার?

ললিতা: এবার মানে? মোটর চালালেন তিনি!

প্রেমল (অসিতকে ফের ঠেলে মোটরে তুলে পাশে ব'সে ললিতাকে) আর কিনি—তিনি ছাড়া?—

কালচক্রং জগচ্চক্রং যুগচক্রঞ্চ কেশবঃ—মোটর চ[...] তো কা কথা—হা হা হা।

অসিত ও ললিতা দোয়ার দেয় ওর খোলা হাসির।

সাত

ডাক্তারবাবুর ওখানে মোটর পৌঁছতেই তাঁর গৃহিণী তারা দেবী এসে প্রেমল ও অসিতকে প্রণাম ক'রে ললিতার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেলেন অন্দরে। অসি[...]

প্রেমলকে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরের একটি সোফায় বসতেই ডাক্তারবাবু লাঠি ধ'রে ঘরে ঢুকলেন। অসিত ও প্রেমল উঠে দাঁড়াতেই তিনি শশব্যস্ত হ'য়ে বললেন: "করেন কি? বসুন বসুন।"

অসিত ও প্রেমল তাঁর দুহাত ধ'রে বসিয়ে দেয় একটি আরাম কেদারায়। ডাক্তারবাবু কয়েক সেকেণ্ড চোখ বুজে থেকে চোখ মেলে বললেন: "মাপ করবেন সাধুজি! পা-টা একটু বেশি মচকে গেছে কি না—"

অসিত: কোনো fracture—

ডাক্তারবাবু: না, এক্স-রে ক'রে দেখা গেছে হাড়-টাড় ভাঙে নি। ও কিছু নয়। দুদিনেই ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু (অনুযোগের সুরে) আমাকে একটু আগে বললে সাধুজির এত কষ্ট পেতে হ'ত না।

অসিত: আমার সঙ্গে সাধুজির (ঘড়ি দেখে) মানে এখন সাড়ে সাতটা তো!—ঠিক বারো ঘণ্টার আলাপ—আজই সকালে বিশ্রাম ঘাটে স্নান করতে গিয়ে শুভদৃষ্টি হয়েছে।

ডাক্তারবাবু (প্রেমলকে): কিন্তু আপনি তো আমাকে চিনতেন সাধুজি! এই দুর্দিনে কি আমাকে একটু খবর দিতে নেই?

প্রেমল: কি জানেন? এবার গুরুমাকে ব'লে এসেছিলাম বৃন্দাবনে একলা থাকব যমুনার তীরে। ললিতাকে বলেছিলাম। সে প্রথমে গোয়াল ঘরে থাকতে রাজী হয় নি—বিশেষ দোর নেই দেখে। কিন্তু (হেসে) আমি এত জোর দিয়ে বলেছিলাম যে ঠাকুর যখন দ্বারী তখন দোর নাই থাকল—যে তারপরে এ দারুণ বর্ষা নামতে একটু লজ্জায়ই প'ড়ে গিয়েছিলাম।

ডাক্তারবাবু: লজ্জা কিসের সাধুজি? আর কি জানেন? (হেসে) ঠাকুর দ্বারী হয়েছিলেন একবারই ত্রেতা যুগে—বলিরাজের। কলিযুগে তিনি কারুর দোরে পাহারা দেন না—চারদিকে আমরা যে অজস্র পাহারা-ওয়ালা মোতায়েন করেছি যে, তিনি পেন্সন নিয়ে দিব্যি ব'সে দেখছেন আমরা কেমন সুখে শান্তিতে থাকি দারোয়ানদের দৌলতে। কিন্তু সে যাক্। শুধু একটি নিবেদন (হাত জোর ক'রে) যখন কৃপা ক'রে এসেছেন এ-দীনের ঘরে—দুদিন থাকুন। আর ঐ গোয়াল ঘরে ফিরে যাবেন না বৃষ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গে।

অসিত: না। ওকে যেতে দেব না কিছুতেই। তাই ওর কাছে আর কাকুতি মিনতি করার দরকার নেই—আরো এই জন্যে যে (হেসে) ললিতা দেবীরও গোয়াল ঘরে থাকার সাধ মিটেছে।

প্রেমল: অসিত ঠিকই বলেছে ডাক্তারবাবু। আপনাকে তাই অভয় দিতে পারি য আমরা থাকব—আর মাত্র দুদিন নয়—অন্ততঃ দশ বারো দিন—কেবল একটি সর্তে যে, অসিতও থাকবে আমাদের সঙ্গে। নৈলে যখন তখন সাধ মিটিয়ে ওর গান শোনা হবে না।

ডাক্তারবাবু (সোল্লাসে): এ আর কথা কি সাধুজি? অসিতবাবু এখানে থাকলে আমার গিন্নিও যে কী খুশী হবেন—তারা—ও তারা!

তারা [পাশের ঘর থেকে]: যাই, চা নিয়ে আসছি।

ডাক্তারবাবু: উনি অসিতবাবুর গান বলতে পাগল।

প্রেমল: তাঁর মথার দোষ নেই। কারণ ললিতারও ঐ এক অবস্থা—মাত্র একবার ওর গান শুনে লক্ষ্ণৌতে।

অসিত [সকুণ্ঠে]: কিন্তু এভাবে আমাকে কোণঠেসা করলে আমি রাজী নই এখানে থাকতে।

তারা ও ললিতার প্রবেশ। তারার হাতে দুটি পাথরের রেকাবীতে মিষ্টি ও ফল, ললিতার হাতে দুপেয়ালা চা। প্রেমল ললিতাকে বলল: "আর তোমার?"

তারা: নিয়ে আসছি (প্রস্থান)

ডাক্তারবাবু: উঠতে পারলাম না মা, কিছু মনে করবেন না।

ললিতা: কী বলছেন? আমি আপনার মেয়ের বয়সী। আমাকে তুমি বলবেন।

তারা ললিতার জন্যে চা ও ফল মিষ্টি এনে কাছের একটি ছোট তেপায়া টেবিলে রেখে ওকে বসালো এক চেয়ারে।

ললিতা: এ কী করেছেন দিদি। [প্রেমলকে] দেখো বাপী, কেমন ভাব ক'রে নিয়েছি চোখের পাতা না পড়তে।

অসিত [হেসে]: তা হবে না কেন? শাস্ত্রে বলেছে:

বাপকি বেটী সিপাই কি ঘোড়ী
কুছ নহি হৈ তো থোড়ী থোড়ী

যার বাপী বন্ধু পাতাতে না পাতাতে তাকে চাপায় তার সবে-পাওয়া host-এর ঘাড়ে তার কন্যা তথা শিষ্যা ভক্তিমতী hostess-এর সঙ্গে সই পাতাবে—এ আর বিচিত্র কি!

তারা [সকণ্ঠে]: কী যে বলেন দাদা! ভক্তির কী জানি আমি? এ দয়া ক'রে মান দেওয়া বৈ তো নয়।

ললিতা [পিঠ পিঠ]: না দিদি ফের ভুল হ'ল। এ দয়া ক'রে মান দেওয়া নয়, মুগ্ধ ক'রে কাবু করা।

তারা [সুমিষ্ট কোপে]: কী যে বলেন—

ললিতা: ফের! তুমি বলবেন কথা দেন নি?

তারা: দিইছিলাম কিন্তু এই সর্তে যে আপনিও আমাকে তুমি বলবেন।

অসিত [টুকে]: বলুন—তুমিও আমাকে তুমি বলবে—নৈলে চলবে তকরার সমানে।

তারা: আচ্ছা। [ললিতাকে] এবার সুরু করুন—খুড়ি করো! চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রেমল: কিন্তু আমার সর্তটাও জুড়িয়ে যায় যে! মানে অসিতের এখানে থাকার।

তারা: আপনি থাকবেন দাদা? এ আর কথা কী?

ললিতা: আমাদের সকলের ভার তার উপর—

তারা: আপনারা—তোমরা বলি কেমন ক'রে—সাধুজিও যে রয়েছেন—

প্রেমল (হেসে): আচ্ছা আচ্ছা ব্যাকরণের মীমাংসা পরে হবে। আগে আসল সমস্যাটার সমাধান হোক তো।

ডাক্তারবাবু: সমস্যা আবার কি। আমার দুই ছেলে কলকাতায়। তাদের দুটো ঘরই খালি প'ড়ে রয়েছে। একটিতে অসিত বাবু—

তারা: কী যে বাবু বাবু করো? বলো দাদাজি!

ডাক্তার বাবু (হেসে): আচ্ছা আচ্ছা। বলছিলাম কি একটি ঘরে দাদাজি আর পাশের ঘরে বাবাজি। বাঃ—রাজযোটক বলে আর কাকে? শুধু স্বভাবের মিলে নয় উপাধির মিলেও।

অসিত: উপাধির মিল শুধু উচ্চারণেই। কারণ আসলে ও হ'ল খাঁটি সাধু আমি এখনো সংসারী—

প্রেমল (হেসে): তুমি সংসারী? তোমারই একটি গান শুনেছিলাম কোথ্রুজে:

আমায় রাখতে যদি আমার ঘরে
বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাঁই

স্বজন যদি হ'ত আপন হ'ত না মোর আপন সবাই।

লক্ষ্ণৌতে অতুলসেনের মুখে এ-গানটি পরে যখনই শুনতাম মনে হ'ত তোমার কথা।

অসিত: কী যে বলো! ঘর না থাকলেই কি বিশ্বঘর ঠাঁই পাওয়া যায়? তার জন্যে চাই সব আগে সাধু হওয়া। নৈলে এ-মুর্খবিরাগানা হয় কবিয়ানা, গান—পদাবলী।

ললিতা: দাদা, বলব একটা কথা, যদি কিছু মনে না করেন?

অসিত: কী?

ললিতা: গান আপনার প্রাণও বটে উপাধিও বটে। অর্থাৎ আপনি অন্তরে জিজ্ঞাসু, ধর্মার্থী, সাধক, বাইরে—কবি, গাইয়ে, দেশের দশের একজন। আর একথা আমাকে কে বলেছেন জানেন? মা—যাঁর মানুষ চিনতে কখনো ভুল হয় না।

অসিত: তোমার মা? তিনি তো লক্ষ্ণৌয়ে। মা[illegible] একবারই আমার—

ললিতা: না, আমরা দুজনেই চার পাঁচ বার আপনার গান শুনেছি। তবে তখন বাপী ছিল না।

প্রেমল: কিন্তু আমি শুনেছি তারও আগে কেম্ব্রিজে। কাজেই আমি ওকে চিনেছি মা-রও আগে।

ললিতা: আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে গো হয়েছে তোমারই হার আমারই জিৎ—হ'ল? (অসিতকে) মা বলেছিলেন কী জানেন? যে, আপনি স্বভাবে সাধক—মানে সব আগে যোগী, তার পরে আর সব। কেবল আপনি এখনো চিনতে পারেন নি নিজেকে কারণ—

প্রেমল: ব্যস, আর বোলো না।

ললিতা: কেন বলব না? বলবই বলব। বলেছিলেন মা যে, আপনি নিজেকে চিনবেন—যেদিন গুরু পাবেন।

অসিত (ঈষৎ ক্ষুণ্ণ): আমার কোথায় গুরু? কত খুঁজেছি—

প্রেমল: গুরুরে খুঁজে পাওয়া যায় না ভাই—তিনি আপনি আসেন যথাকালে।

ডাক্তারবাবু (তারাকে): কিন্তু শোনো, অসিতবাবু—খুড়ি দাদাজি—এখানে থাকবেন টেলিফোন ক'রে দাও। আর মোটর পাঠিয়ে দাও তাঁর মালপত্র সব নিয়ে আসতে।

অসিত: না না—স্বামীজি হয়ত—

ডাক্তারবাবু (হেসে): স্বামীজি সাধুপুরুষ—কিচ্ছু বলবেন না জানেন? আমি আমার গুরুদেব শ্যামঠাকুরের কাছে—

অসিত (চমকে): বলেন কি? আপনার গুরু শ্যামঠাকুর?

ডাক্তারবাবু: হ্যাঁ দাদাজি। আমাকে সবাই বড় গম্ভীর বলে তিনি আমাকে কৃষ্ণমন্ত্রের সঙ্গে হাসির মন্ত্র জপের দীক্ষা দিয়েছিলেন। যখনই তাঁর কোনো অসুখবিসুখ করত আমাকে হাসিয়ে লজ্জায় ফেলতেন এই ব'লে:

সংসারী হায় যবে ভোগে ধরে সাধু বা গুরুর চরণ কেঁদে:
সাধু গুরু যবে পড়ে রোগে নেয় চিকিৎসকের শরণ সেধে।

অতএব শোন্, বলি—দুনিয়ায় ভাই
চিকিৎসকের সমান কেউই নাই

প্রেমল: আর চিকিৎসক যখন হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গিয়ে পা ভাঙল তখন?

অসিত (পিঠ পিঠ):

তখন সে ধরে একজোটে হায় সাধু ও গুণীর চরণ কেঁদে
সাধুর বচনে পেতে সান্ত্বনা, গুণীর ভজনে শান্তি পেতে।

ললিতা (হেসে গড়িয়ে পড়ে): বা বা বা, দাদা! এইই তো চাই। এমন না হ'লে কবি! (তারাকে) দিদিজি, এহেন দাদাকে আমাদের চাইই চাই। স্বামীজি রাগ করেন করুন।

তারা [ডাক্তারবাবুকে]: আমিই টেলিফোন করি—কী বলো? স্বামীজি আমাকে না করতে পারবেন না।

ললিতা [হাততালি]: এমন না হ'লে দিদি?

প্রেমল: ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

(ক্রমশঃ

আমার কি আর সাজে

শ্রীসনৎকুমার ঘোষ

তোমার হাতের বজ্র কঠিন বক্ষে আমার বাজে,
তাই বলে গো আঘাত করা আমার কি আর সাজে।
জীবন-সাথী আমার যে দুখ
তার অনলে পুড়েই ত' সুখ,
আমার সে সুখ যে গো সকল সুখের বাড়া,
আমি দুঃখের মাঝেও হইনি আপন হারা,
বজ্র মোরে করুক উজল কঠিন বেদন মাঝে,
আঘাত সয়ে আঘাত করা আমার কি আর সাজে॥
হেনেছ আঘাত তাই ভেঙেছে আমার বন্ধ-দ্বার
জ্বেলেছ আগুন তাই ঘুচেছে মনের অন্ধকার।
ওগো আমায় তুমি রিক্ত করে
দিয়েছ আবার হৃদয় ভরে,
পেয়েছি নিঠুর পরশ তব সেই ত' অহঙ্কার,
তোমার দেওয়া চিহ্ন-ক্ষত দেহেরই অলঙ্কার।
আমার সকল বেদনাতে আমার শুভই রাজে।
আঘাত সয়ে আঘাত করা আমার কি আর সাজে॥

মরীচিকা

নির্মল চৌধুরী

আমিও ত' দিগন্ত জোড়া আকাশ ছিলাম
আর আর অনেকের মত
মনে আর বুকে বেঁধে কঠিন ব্রত
হায় কেন আজ তবে আমি হঠাৎ ভাঙলাম!
আমিও ত' তোমাদের মত কোন একদিন
মনে করেছিলাম আজ হয় হউক দুঃখ কষ্ট,
সামান্য কারণে মিছে হলে রুষ্ট,
বিশ্বে বোঝাব কেমন করে আমরা হয়েছি স্বাধীন।
তারপর সিঁড়ি-ভাঙি বছরে বছরে—
ক্রমে বার্ধিকীর
তবু যেন সরে যায় নদী—দূরে আরও দূরে,
আজ যেন মনে হয় কোনও এক মরু প্রান্তরে,
অকারণ ছুটোছুটি পিপাসার্ত হরিণীর।

হৃদ্-স্পন্দনই জীবন

শ্রীরমেশচন্দ্র আচার্য্য
সহকারী ডিরেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যবিভাগ

পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা ধক্‌ধক্ করে ওঠে। ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠ্‌লে বুকের ভেতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করে ওঠে। ভালবাসায় ব্যর্থ হলে মনে হয় কে যেন হৃদ-যন্ত্রটাকে দুমড়ে মুসড়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বুকের ভেতরটা শূন্য মনে হয়। আবার সবচেয়ে প্রিয়বস্তুকে বুকের ওপর ধারণ করতে পারলে বুকের ভেতরটা আনন্দে নেচে ওঠে। এতেই বোঝা যায় হৃদয়ের সঙ্গে হৃদ-যন্ত্রের সম্বন্ধ সবচেয়ে নিকট। দেহের সবচেয়ে এই প্রিয় বস্তুটিকে সচল রাখার জন্য বক্ষ-পিঞ্জরের মধ্যে ষ্টার্ণামের পশ্চাতে, দুই-পাশের ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়ের মধ্যে ও ডায়াফ্রামের ওপরে সযত্নে রক্ষিত আছে, যাতে বাইরে থেকে কোন আঘাত পেয়ে অচল হয়ে না পড়ে। এই ছোট যন্ত্রটি আয়তনে আমাদের হাতের মুঠোর মত। মাংসপেশী [Myocardium) দিয়ে গড়া ও ভেতরটা ফাঁপা। ওপরে তৈলাক্ত পদার্থপূর্ণ থলির মত একটি কঠিন আবরণ (Pericardium) আর ভেতর গায়ে সুকোমল আবরণ (Endo cardium) আছে। হৃদ-যন্ত্র দূষিত রক্তকে সমস্ত শরীরের শিরার ভেতর দিয়ে টেনে আনে এবং বিশুদ্ধ রক্তকে ধমনীর ভেতর দিয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দেয় যাতে দেহ অচল হয়ে না পড়ে। আসলে এই যন্ত্রটির কাজ শুধু পাম্প করা। হৃদ-যন্ত্র থেকে যে সমস্ত Blood-vessels বাহিরের দিকে রক্তকে বহন করে তাহাদিগকে ধমনী (artery) বলে এবং যে সমস্ত (Blood-vessels) শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তকে হৃদ-যন্ত্রের দিকে বহন করে আনে তাহাদিগকে শিরা (vein) বলে। প্রত্যেক কোষের [cell] নিকটে রক্ত নিয়ে যাবার মত আর্টারী বা রক্ত ফিরিয়ে আনার মত শিরা অত সূক্ষ্ম হতে পারে না বলে ধমনীর প্রান্ত থেকে শিরার প্রান্ত পর্য্যন্ত কৈশিক নাড়ীর জাল [capillaries] বিস্তৃত আছে। কৈশিক নাড়ীর জালের মধ্যে দিয়ে দেহের প্রতিটি কোষ পুষ্টি গ্রহণ করে এবং দেহের আবর্জ্জনা বার করে দেয়। একমাত্র Pulmonary Artery ছাড়া আর সমস্ত ধমনী বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে এবং একমাত্র Pulmonary vein ছাড়া আর সমস্ত শিরা দূষিত রক্ত বহন করে। রক্তে oxygenএর পরিমাণ বেশী হলে ও carbondi-oxideএর পরিমাণ কমে গেলে তাকে বিশুদ্ধ রক্ত বলে এবং এর বিপরীত হলে তাকে দূষিত রক্ত বলে।

রক্তকে পাম্প করার জন্য হৃদ-যন্ত্রের যে সঙ্কোচন [Contraction] ও প্রসারণ বা বিশ্রাম [Relaxa-tion] হয় তাকে হৃদ্-স্পন্দন [Hear-beat] বলা হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের প্রতি মিনিটে ৭০ থেকে ৮০ বার হৃৎস্পন্দন হয়। হৃৎস্পন্দন হবার সঙ্গে সঙ্গে Artery-wall-এ স্পন্দন হয় এবং সারা দেহে এই স্পন্দনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। এই স্পন্দন সারাদেহের অংশ বিশেষে অল্প বিস্তর অনুভব করা যায়। কিন্তু কব্জির ওপর Radial Artery চেপে ধরে আমরা এই স্পন্দন ভাল-ভাবেই অনুভব করতে পারি। একে Pulse বলা হয়। সুস্থলোকের যতবার হৃৎস্পন্দন হয় ততবারই pulse অনুভব করা যায়। প্রতিবার হৃৎস্পন্দনে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে। হৃদযন্ত্রের মধ্যে, ওপরে ও নিচে দুটি করে কামরা আছে। ওপরের কামরা দুটিকে Auricle ও নিচের কামরা দু'টিকে ভেন্ট্রিকল্ বলে। ওপর ও নিচের কামরা দু'টির মাঝখানে শক্ত একটা দেওয়াল আছে। ডান ভাগের auricle এবং ventricleকে Right Auricle এবং Right ventricle বলে। তেমনি বাঁ ভাগের Auricle এবং ventricleকে left Auricle এবং left ventricle বলে। ডানভাগে থাকে দূষিত রক্ত

এবং বাঁ ভাগে থাকে পরিস্রুত রক্ত। ডানদিকের অরিকলে শিরা দিয়ে দূষিত রক্ত আসে এবং বাঁ অরিকলে আসে ফুস্‌ফুস্ থেকে পরিস্রুত রক্ত। দুটি অরিকলের যে প্রাচীর আছে তাকে Inter-auricular septum বলে ও দুটি ভেন্ট্রিকলের যে প্রাচীর আছে তাকে Inter-ventricular septum বলে। Right Auricle থেকে Right ventricleএ রক্ত আসার জন্য একটি ছিদ্র আছে তাকে right auriculo-ventricular opening বলে এবং সেখানে তিন পাল্লাযুক্ত ভ্যাল্‌ভ্ বা কপাট [Tricuspid valve] আছে। তেমনি Left auricle থেকে Left ventricle আসার জন্য Left Auriculo ventricular opening আছে। এইখানে দুই পাল্লাযুক্ত ভ্যাল্‌ভ বা কপাট (Bicuspid or Mitral valve) আছে। এই সমস্ত কপাট থাকার জন্য রক্ত অরিকেল থেকে ভেন্ট্রিকেলে যেতে পারে কিন্তু ভেন্ট্রিকেল থেকে অরিকেলে ফিরে যেতে পারে না। রক্তের প্রবাহ একমুখী। ডানদিকের ভেন্টিকেল দূষিত রক্ত পাল্‌মোনারি আর্টারীর ভেতর দিয়ে ফুস্‌ফুসে পাঠিয়ে দেয়। ফুস্‌ফুস্ থেকে চারটি পাল্‌মোনারি শিরার মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ রক্ত বাঁদিকের অরিকেলে আসে। বাঁদিকের ভেন্টিকেল থেকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধমনী Aorta বার হয়েছে। Pulmonary Artery ও Aorta হৃদ-যন্ত্র থেকে উৎপত্তির স্থলে উভয়ের মুখে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিনটি কপাট (Semilunar valve) আছে। সুস্থদেহে ঐ রক্ত উল্টো দিকে যেতে চেষ্টা করলে কপাট বন্ধ হয়ে উজান পথ রুদ্ধ করে।

হৃৎ-স্পন্দনের ছন্দ বজায় রাখার জন্য ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য Sympathictic ও vagus nerve আছে। হৃৎ স্পন্দনের উত্তেজনা ডানদিককার অরিকেলের Sino-auricular node থেকে সৃষ্টি হয়। প্রথমে অরিকেল দুটো সঙ্কুচিত হয়। একে Auricular systole বলে। Auricular systole হয়ে গেলে ভেন্ট্রিকেল দুটো একযোগে সঙ্কুচিত হয়। একে ventricular systole বলে। সুস্থ অবস্থায় অরিকল্ ও ভেন্ট্রিকল্ একযোগে সঙ্কুচিত হয় না। প্রসারণ বা বিশ্রামের সময় ·৪ সেকেণ্ডের জন্য অরিকল্ এবং ভেন্ট্রিকল্ এক সঙ্গে বিশ্রাম নিয়ে থাকে। এই সময়কে Joint Diastole বলে। অরিকল ·১ সেকেণ্ডের জন্য সঙ্কুচিত হয় ও ·৭ সেকেণ্ডের জন্য বিশ্রাম নেয়। Auricular Diastole আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভেন্টিকল্ ·৩ সেকেণ্ডের জন্য সঙ্কুচিত হয় ও ·৫ সেকেণ্ড বিশ্রাম নেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই প্রচুর শক্তির আধারটি ২৪ ঘণ্টায় ৮ ঘণ্টা কাজ বা পরিশ্রম করে এবং ১৬ ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়। অরিকল্ বা ভেন্ট্রিকল্ যে কোন একটির Contraction আরম্ভ হওয়ার সময় থেকে, contraction শেষ, Relaxation আরম্ভ ও শেষ হয়ে পুনরায় contraction আরম্ভ হবার আগে পর্য্যন্ত সমস্ত পরিবর্ত্তনগুলিকে cardiac cycle বলে। একটি cardiac cycle সম্পূর্ণ হতে ·৮ সেকেণ্ড লাগে। এই সময় হৃদযন্ত্রে একপ্রকার বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপত্তি হয় তাহা দ্বারা Electro-cardiogram নেওয়া হয়। প্রতিটি cardiac cycle-এ আমরা দুটি শব্দ শুনতে পাই। ইহাকে first sound এবং second sound বলা হয়। প্রথম শব্দটি ভেন্ট্রিকল্‌দ্বয়ের সঙ্কোচনের ফলে এবং দ্বিতীয়টি ভেন্ট্রিকল্‌দ্বয়ের বিশ্রামের সময় যখন semilunar valves সজোরে বন্ধ হয়। হৃদ-যন্ত্রের প্রথম শব্দ, দ্বিতীয় শব্দ এবং বিরাম নিয়ে cardiac cycle.

হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীগুলির জন্য যে ধমনী পুষ্টি বহন করে তার নাম করোনারি আর্টারী [coronary Artery] করোনারি আর্টারী বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করে সমস্ত হৃদযন্ত্রকে পুষ্টিদান করে। শরীরের অন্যান্য ধমনীর সঙ্গে এর তফাৎ এই যে একের সঙ্গে অন্যের কোন যোগাযোগ নেই। কাজেই হৃদযন্ত্রের কোন জায়গায় যদি কোন কারণে রক্তচলাচল ব্যাহত হয় তবে সেই জায়গাটুকু দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। দেহের অন্য যন্ত্রের বেলায় পাশাপাশি অবস্থিত সঙ্গী ধমনীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ থাকায় ক্ষতির পূরণ করতে পারে।

একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের শরীরে ১০ থেকে ১২ পাইণ্ট রক্ত আছে। শরীরের উপরের অংশ থেকে সমস্ত দূষিত রক্ত Superior vena-cava দিয়ে ডানদিককার অরিকলে আসে। তেমনি শরীরের নিচের অংশের সমস্ত দূষিত রক্ত Inferior vena-cava দিয়ে ডানদিককার অরিকলে আসে। তারপর অরিকলের সঙ্কোচনের সময় রক্ত ডান অরিকল্ থেকে Tricuspid valveএর সাহায্যে ডান

ভেণ্ট্রিকেলে প্রবেশ করে। ভেণ্টিকেলের সঙ্কোচনের সময় ঐ দূষিত রক্ত Pulmonary Artery দিয়ে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে। ফুস্‌ফুসে থাকাকালীন দূষিত রক্ত তার অতিরিক্ত Carbondioxide প্রশ্বাসের সাহায্যে বার করে দেয়, এবং নিশ্বাসের সাহায্যে Red blood cell গুলি বায়ু থেকে oxygen নিয়ে রক্ত পরিস্রুত করে। তখন পরিস্রুত রক্ত Pulmonary vein দিয়ে বাঁ অরিকলে আসে। বাঁ অরিকল্‌ থেকে বাঁ ভেণ্ট্রিকলে যায়। তারপর বাঁ ভেণ্ট্রিকলের সঙ্কোচনের সময় ঐ পরিস্রুত রক্ত বাঁ ভেণ্ট্রিকল্‌ থেকে ডান ভেণ্ট্রিকলের সঙ্কোচনের প্রায় সাতগুণ জোরে Aorta মধ্যে প্রবেশ করে। সে জন্য বাঁ ভেণ্টিকলের মাংসপেশীগুলি ডান ভেণ্ট্রিকলের মাংসপেশী অপেক্ষা মোটা এবং সবল। Aorta থেকে রক্ত ধমনীর শাখা প্রশাখা দিয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সারা দেহে oxygen, পুষ্টি প্রভৃতি সরবরাহ করে এবং সমস্ত শরীরের আবর্জ্জনা গ্রহণ করে রক্ত যখন পুনরায় দূষিত হয়ে পড়ে তখন Superior vena-cava ও Inferior vena-cava দিয়ে ঐ রক্ত ডান অরিকলে ফিরে আসে। এমনি করেই আমাদের দেহে রক্ত সঞ্চালন হয়। এই রক্ত সঞ্চালনের বিষয় প্রথম আমরা জানতে পারি ইংল্যাণ্ডের উইলিয়িম হার্ভের কাছ থেকে।

ছোট্ট এই যন্ত্রটি যার ওজন মাত্র ১২½ আউন্স (পূর্ণ বয়স্কের হৃদ-যন্ত্র] প্রচুর কার্য্যক্ষমতার আগার। আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে যখন আমরা চুপচাপ বসে থাকি তখন এই ছোট্ট কর্ম্মঠ যন্ত্রটি প্রতি মিনিটে ৩৫ থেকে ৫০ foot pounds কাজ করে অর্থাৎ একটি সাধারণ মানুষকে ৩—৪ ইঞ্চি উঁচুতে তুলে ধরতে যে শক্তি দরকার হয়। যখন আমরা অত্যধিক পরিশ্রম করি তখন এই যন্ত্রটির কাজ দশ গুণ পর্য্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। এই পরিশ্রমের মাত্রা আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে বাড়াতে হয়। নিয়মিত এবং পরিমিত পরিশ্রম, পুষ্টি এবং বিশ্রামের মধ্য দিয়ে বাল্যকাল থেকেই শক্তিসঞ্চয় করতে হয়। হৃদযন্ত্র বলবান হলে রোগ ও জরা সহজে দেহে প্রবেশ করতে পারে না।

Cardio-vascular রোগ সমূহের প্রাদুর্ভাব পৃথিবীর সর্ব্বত্র। ৪৫ থেকে ৫৫ বৎসরের মধ্যে এই রোগের আক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ৬৫ বৎসরের অধিক বৃদ্ধদের মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগের বেশী এবং ৫৬ থেকে ৬৫ বৎসরের মধ্যে মৃত্যুর একটি মূল কারণ এই রোগ। আজকাল আমরা রক্তের চাপ বৃদ্ধি, করোনারি-থ্রম্বোসিস এবং সেরিব্রেল হিমোরেজ সম্বন্ধে বেশী সজাগ। ধমনী অথবা শিরাগুলির দেওয়ালের সঙ্কোচন ও প্রসারণ শক্তি আছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের শক্তি যেমন কমে আসে ধমনীর elasticityও তেমনি কমে যায়। তখন ধমনীগুলির দেওয়াল দড়ির মত শক্ত হয়ে ওঠে। ফলে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। ব্লাড-প্রেসার যন্ত্রের সাহায্যে আমরা চাপবৃদ্ধির বিষয় জানতে পারি। systolic pressure যদি ১৬০ মি, মি, Mercury এবং Diastolic pressure যদি ৯০ মি, মি, Mercury বেশী হয় তবেই বুঝতে হবে রক্তের চাপ বাড়ছে। চাপ বেশী বেড়ে গেলে ধমনীর শাখা প্রশাখাগুলি অনেক সময় চাপ সহ্য করতে না পারলে ফেটে গিয়ে রক্তপাত হয়। এই রক্তপাত যদি মগজের মধ্যে হয় তাহলে রুগী তৎক্ষণি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং পরে তাঁর মৃত্যুও হতে পারে। আগে একে আমাদের দেশে সন্ন্যাস রোগ বলা হত। চিকিৎসকেরা বলেন apoplexy বা cerebral Haemorrhage, রক্তের চাপ বেড়ে গেলে বাঁ দিককার ভেণ্টিকলের ওপর জোর পড়ে। রক্ত সঞ্চালন বজায় রাখবার জন্য হৃদযন্ত্রের ওপর যে অধিক চাপ পড়ে তা মেটাতে গিয়ে হৃদযন্ত্রের কোষের সংখ্যা বা আয়তন বেড়ে যায় [Hypertrophy) রক্তের চাপ ক্রমশঃ বেশী হলে এই পরিপূরক ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরে। রক্ত সঞ্চালনের গতি হ্রাস হয়। ফলে হৃদযন্ত্র বড় হতে থাকে এবং তার কর্ম্মশক্তি কমতে থাকে।

থ্রম্বোসিস মানে শিরা বা ধমনীর মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া। যদি করোনারি আর্টারীর যে কোন একটি শাখা বা প্রশাখায় হঠাৎ রক্ত জমে যায় তা'হলে হৃদযন্ত্রের সেই অংশ মাংসপেশীর পুষ্টির অভাবে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। প্রথমে বুকের মাঝখানে একটা অস্বস্তির ভাব অনুভূত হয়। তারপর মাঝে মাঝে বুকের যন্ত্রণা হয়। আবার বিশ্রাম নিলে কমে যায়। তীব্রতা দিন দিন বাড়তে থাকে। প্রারম্ভে মৃদু আক্রমণের সময় থেকে যথোপযুক্ত

প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। হৃদরোগ অতর্কিতে আসে না, কাজেই সাবধান হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়। ক্লান্তি এবং শ্বাসকষ্ট পরিশ্রমের অক্ষমতা জানিয়ে দেয়। বুকে ব্যথা এবং বুক ধড়ফড়ানি হলে প্রকৃতি দেবী পরিশ্রম থেকে নিবৃত্ত হতে ইঙ্গিত করেন। তা' সত্ত্বেও যদি কেহ পরিশ্রম থেকে বিরত না হন তবে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি অনিবার্য্য।

প্রতি হাজার জীবন্ত শিশু জন্মাবার মধ্যে প্রায় পাঁচ-জনের হৃদযন্ত্রে জন্মগত দোষ থাকে। যদিও জন্মগত হৃদ-যন্ত্রের দোষের সুনির্দিষ্ট কারণ আমরা এখনও জানতে পারিনি তথাপি দেখা যায় গর্ভাবস্থা'র প্রথম তিনমাসে যদি কেহ virus (ভাইরাস্) রোগে আক্রান্ত হন তা' হলে সেই শিশুর হৃদ্যন্ত্রের কোন না কোন ত্রুটী দেখা যায়। কখন কখন দেখা যায় শিশু জন্মাবার পর সমস্ত দেহ নীল হয়ে মারা গেল। রক্তসঞ্চালন ঠিকমত না হলে দেহ নীল হয়ে যায়। হৃদযন্ত্র বিকাশের কোন ত্রুটি এর জন্য দায়ী। শিশু যখন গর্ভে থাকে তখন aorta এবং pulmonary artery-র সঙ্গে একটা যোগাযোগ থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর যখন নিশ্বাস নিতে আরম্ভ করে তখন থেকেই এই যোগাযোগ বন্ধ হতে আরম্ভ হয়। অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ না হলে patent ductus arteriosus হয়। এই হলো অসুস্থতার লক্ষণ। বর্ত্তমানে এই সমস্ত জন্মগত দোষে অস্ত্রোপচার দ্বারা সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের দেশে বেশীরভাগ ছেলেমেয়েরা বাত জ্বরে (Rheumatic fever) আক্রান্ত হয়। পুনঃ পুনঃ আক্র-মণের ফলে এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ভবিষ্যৎজীবনে হৃদ্‌রোগে কষ্ট পান। একটা প্রবাদ আছে "rheumtic fever licks the joints and bites the heart" এতে হৃদযন্ত্রের valves অর্থাৎ কপাটগুলি আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণতঃ mitral valveগুলি মোটা হয়ে গিয়ে তাদের নিয়ম মাফিক কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। কপাটগুলির মধ্যে দিয়ে যে ছিদ্র আছে তা সরু হয়ে যায়। সরু ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে রক্ত প্রবাহ ঠিকমত প্রবাহিত হতে পারে না। ভেণ্ট্রিকলের সঙ্কোচনের সময়ও কপাটগুলি ভালভাবে বন্ধ হয় না (mitral insufficiency) সুতরাং হৃদযন্ত্র দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। আজকাল কৃত্রিম কপাট পাওয়া যায়। শল্য-চিকিৎসকগণ এই সমস্ত কৃত্রিম কপাট অকর্ম্মণ্য কপাটের জায়গায় বসিয়ে দিতেছেন। বাতজ্বরে যাঁরা একবার আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের মাঝে মাঝে চিকিৎসকগণের দ্বারা দেহ পরীক্ষা করান প্রয়োজন। ছেলে-বেলায় অনেকে পুনঃ পুনঃ বা অনেকদিন ধরে শ্বাসযন্ত্রের রোগে কষ্ট পান। এতে ফুসফুসের capillary blood vesselsগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সাধারণ রক্ত প্রবাহের ব্যাঘাত ঘটে। ফলে pulmonary arteryতে চাপ পড়ে। তারপর ডান ভেণ্ট্রিকলে চাপ বেড়ে যায়। একে বলা হয় Corpulmonale. উপদংশ আর একটি রোগ যা' হৃদযন্ত্র ও মহাধমনীর রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এতে মহাধমনীর (aorta) বিকৃতি ঘটায় তাতে ঐ স্থানের স্ফীতি (aneurism) উৎপাদন করে। মহাধমনীর কপাটগুলো (semilunar valves) অকর্ম্মণ্য হয়। এতে ভেতর দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ে। উপদংশের চিকিৎসার উন্নতির ফলে পৃথিবীর অন্যদেশে উপদংশজনিত হৃদরোগ ক্রমশই কমে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই সমস্ত রুগীর অজ্ঞতাবশত অসম্পূর্ণ চিকিৎসার জন্য উপদংশজনিত হৃদরোগ মোটেই কমে নাই। diabetes, hypothyroidism, diphthicria প্রভৃতি রোগেও হৃদযন্ত্রের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পরিমিত তাম্রকূট সেবনে হৃদযন্ত্রের কোন ক্ষতি হয় না বটে কিন্তু উহা দেহের পুষ্টির অংশ গ্রহণ করেনা। বরঞ্চ অতিরিক্ত তাম্রকূট সেবন করলে ধমনীর দেওয়াল দড়ির মত শক্ত হয়ে যেতে পারে। সেইরূপ পরিমিত সুরা হৃদযন্ত্রের ক্ষতি না করলেও ঐ পুষ্টির অংশ গ্রহণ করে না।

অনেকের ভুল ধারণা চল্লিশ বছরের পর থেকে সব রকম কায়িক পরিশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য সব বয়সে এবং সকল রকম স্বাস্থ্যে একই প্রকার পরিশ্রম সম্ভব নয়। বয়সের অনুপাতে এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা অনু-যায়ী পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াতে বা কমাতে হয়। Coro-nary Thrombosis রুগীকেও চিকিৎসকেরা বেড়িয়ে ব্যায়াম করতে উপদেশ দেন। নিয়মিত এবং পরিমিত কায়িক পরিশ্রম মেদ কমিয়ে দেহকে সুঠাম ও হাল্কা করে এবং হৃৎস্পন্দনের ছন্দ বজায় রেখে সমস্তদেহে ঠিকমত

রক্ত সঞ্চালন করে। তাতে হৃদযন্ত্র দৃঢ় এবং কর্মঠ হয়। চল্লিশ বছরের পর থেকে জেদের বশবর্ত্তী হয়ে বা সাহস দেখিয়ে আকস্মিক কঠিন কায়িক পরিশ্রম কখনও করা উচিত নয়। কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধমনীর elasticity কমে যায়। আকস্মিক গুরু পরিশ্রমে হৃদযন্ত্রের বা মস্তিষ্কের পেশীতে যে পরিমাণ রক্ত সরবরাহের প্রয়োজন সেই পরিমাণ রক্ত সরবরাহ সংকীর্ণ ধমনীর পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হতে পারে। রক্ত সরবরাহের স্বল্পতাজনিত রোগ যাতে না হয় সেজন্য চল্লিশ বছরের পরে নিয়মিত এবং পরিমিত লঘু ব্যায়াম করা একান্ত কর্ত্তব্য।

হৃদরোগের ওপর খাদ্যের যে একটি ভূমিকা আছে সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীসমাজের আজকাল লক্ষ্য পড়েছে। অনেকে অতিরিক্ত ঘি, মাখন, চর্বি প্রভৃতি স্নেহপদার্থ খেতে ভালবাসেন। এই সমস্ত চর্ব্বি বা স্নেহময় উপাদান বিভিন্ন পাচক রসের দ্বারা হজম করে ক্ষুদ্র, সরল ও সহজগ্রাহ্য অণুতে পরিণত হয়। এই সমস্ত অণু কোষের (Cell) ভেতর দিয়ে রক্তে প্রবেশ করে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আরো ছোট ছোট অংশে ভেঙ্গে গিয়ে এই উপাদান প্রত্যেক দেহকোষে বাহিত হয়ে সেগুলির পুষ্টি সাধন করে। কিন্তু কোন কোন জায়গায় দেখা যায় যে এই ছোট ছোট অংশগুলি ধমনীর ভেতর দিকের গায়ে আটকে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে জমে গিয়ে একটা আবরণের মত পড়ে। এই আবরণ ধমনীর নিয়মিত কাজের ব্যাঘাত করে। রক্ত প্রবাহের গতি মন্থর হয়ে আসে। রক্ত জমাট বাঁধতে সুরু করে অথবা রক্ত সরবরাহের অভাবে হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন রক্ত পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে রক্তে "কোলেষ্টেরল"-এর বেশ আধিক্য রয়েছে। আমরা সরষের তেল, বাদাম তেল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তরল (Liquid) তেল খেয়ে থাকি। এই সব তেলে এমন একটা গুণ আছে যার জন্য ধমনীর ভেতর দিকে কোন আবরণ পড়ে না। অথচ জান্তব স্নেহপদার্থ অথবা হাইড্রোজিনেটেড্ উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থে সেই গুণটি নেই। সেজন্য চল্লিশবছর পার হবার পর অর্থাৎ দেহের শক্তি যখন কমতে সুরু হয় তখন থেকেই এই সব কঠিন (Solid or fluid) স্নেহপদার্থ না খাওয়াই ভাল। শুধু নিয়মিত সুষম খাদ্য খেলেই হবে না তা বয়সের, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের এবং নির্দ্দিষ্ট দেহের ওজনের ওপর ভিত্তি করে ক্যালোরি, Carbohydrate, fat, protein প্রভৃতি নির্দ্ধারিত করতে হয়। চিনি মাংসপেশীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য তথাপি লক্ষ্য রাখতে হবে দেহের পক্ষে যেন অতিরিক্ত না হয়। protein, iron, vitamin E, vitamin B1, vitamin A, vitamin C প্রভৃতির চাহিদা যাতে না কমে সে বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। চল্লিশ বছর পার হওয়ার পর থেকেই ভাল করে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে দেহের ওজন কোন রকমেই যেন বাড়তির দিকে না যায়। মেদবহুল দেহে ধমনীর elasticity কমে যায়। শরীরে দ্রুত মেদবৃদ্ধি হৃদরোগ আক্রমণের সম্ভাবনাকে নিকটতর করে দেয়। সেজন্য এই সময় থেকে তিনমাস অন্তর দেহের ওজন নেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য এবং ওজন বাড়তির দিকে দেখা গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ মত খাদ্য গ্রহণ, বিশ্রাম ও ব্যায়াম প্রভৃতি করা উচিত।

অনেক ক্ষেত্রে কারণ জানা থাকলেও প্রতিরোধ করবার কোন উপায় থাকে না, যেমন মানসিক দুশ্চিন্তা। রাতদিন খিট্‌খিটিনি, ভয়, দুশ্চিন্তার মধ্যে বাস, বিরক্তি প্রভৃতিতে মস্তিষ্কের কোষগুলি অনবরত ও অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে শেষে অবসন্ন হয়ে পড়ে, সমস্ত দেহে শ্রান্তি দেখা দেয়। ক্রমাগত শ্রান্তি আয়ুক্ষয় করে। শ্রান্তিবোধ হওয়া মানেই দেহের বিশ্রাম দরকার। দেহের বিশ্রাম দু'রকমে নেওয়া যায়। কায়িক পরিশ্রমে মাংসপেশীর বিশ্রাম দরকার। সেজন্য কায়িক পরিশ্রমের পর গা এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকলে ক্লান্তি দূর হয়। কিন্তু মানসিক অশান্তিতে যে শ্রান্তি হয় তা' স্নায়ু এবং পেশী উভয়েরই শ্রান্তি। নিদ্রা ছাড়া এই শ্রান্তি দূর হয় না। সকালে ঘুম ভাঙ্গবার পর আমাদের যে কর্মশক্তি ও মানসিক স্ফূরণ বাড়ে তা' আপনারা সকলেই লক্ষ্য করেছেন। অনেক সময় অফিসে কাজ করতে করতে ক্লান্তি আসে। সেজন্য অপরাহ্ণে টিফিন এবং বিশ্রামের জন্য ব্যবস্থা আছে। যাঁদের পক্ষে অফিসে বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব হয় না অথবা অপরাহ্ণ বিশ্রামের পরও দেহে ক্লান্তি নিয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফেরেন, তাদের পক্ষে বাড়ী এসে টিফিন খেয়ে অন্তত একঘণ্টা চুপ্‌চাপ্ শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। অবসর গ্রহণের পর আমাদের দেশে বেশীর ভাগ লোক অন্তত একঘণ্ট অপরাহ্ণ নিদ্রা উপভোগ করেন। এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। রুগী বা দুর্ব্বল লোক ঘুমিয়ে সুস্থ হয়। কেন না ঘুমের সময় দেহের কোষের ক্ষয়ক্ষতি মেরামত এবং পুষ্টি ভালভাবে সম্পন্ন হয়। সুস্থ দেহে বেশী ঘুমালে শরীর ভাল থাকে না। সুস্থ পূর্ণবয়স্কদের জন্য আট ঘণ্টা ঘুমান দরকার। ঘুমানর সময় পরিশ্রমের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। চল্লিশ বছরের পর দেহে নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটে। সেজন্য বয়স হলে একটু বেশী ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে ৪৫ বৎসর বয়স হলেই অনেকে প্রত্যহ আফিম সেবন করতেন। এখনও অনেককে রাতে Sleeping Tablet ব্যবহার করতে দেখা যায়। এর অর্থ নিদ্রাদেবীর আরাধনা করা। নিদ্রাদেবীকে সন্তুষ্ট করতে পারলে চিরনিদ্রার হাত থেকে অনেকদিন রেহাই পাওয়া যায়।

ফুলদোল

শ্রীহরিপদ গুহ

সেদিন দুপুরবেলা স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল কলহ বেধে গেল। নটবর সবেমাত্র বাড়ী ঢুকে উঠানে দাঁড়িয়ে কোমরের গামছাখানা দিয়ে মুখের ঘাম মুছ্ছিল, এমন সময় বিলাসী দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কাংস্যকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল: 'বেলা দুপুর গড়িয়ে যায়, এখন নাটসাহেব বাড়ী এলেন! আমি পাতে দেব কি এখন? কাল থেকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেলুম যে চাল বাড়ন্ত; তা' বাবুর হুঁসই নেই! আমি আর কি করব? থাকো আজ উপোস দিয়ে। রোজ রোজ ধার দেবে কে?'

নটবর স্ত্রীর এই তিরস্কারের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করল না। তার দিকে তাচ্ছিল্য ভরে একবার চেয়ে সে গভীর মনোযোগ সহকারে তামাক সেবনে মন দিল।

তার এই উপেক্ষায় বিলাসীর চিত্ত একেবারে জ্বলে উঠল। যা' মুখে আস্‌ল তা' বলে সে স্বামীকে গালিগালাজ করতে লাগল। ক্রমেই তার গলার পর্দা খাদ থেকে পঞ্চমে এবং শেষে সপ্তমে উঠল।

নটবরের অন্তরের পুরুষসিংহটা তখন গর্জ্জে উঠ্‌ল। সে স্ত্রীর দিকে কটমট করে চেয়ে বল্‌ল: 'চুপ্ কর্ বল্‌ছি!

এই রদ্দুরে তেতেপুড়ে এলুম, কোথায় একটু জল এগিয়ে দিয়ে বাতাস করবি, না ষাঁড়ের মত চীৎকার আরম্ভ করে দিয়েছিস্। বাবুদের বাড়ীর মেয়েদের কত পতিভক্তি! দেখলে চোখ জুড়োয়। এ মাগী ছোটলোক কিনা, তা' ভাল হবে কোত্থেকে!'

বিলাসী মুখ বাঁকিয়ে চীৎকার করে উঠল, 'ইস্, ভারী পতিভক্তি দেখাচ্ছিস্! বাবুদের কথা যে বললি, পারিস্ তাদের মত এক গা গয়না দিতে? মুরোদ ত বড়! পতি-ভক্তি অম্‌নি আসে? একবেলা ভাত দেবার ক্ষেমতা নেই, আবার মুখনাড়া! বিষ নেই তায় কুলোপানা চক্কোর! আমি খেটেখুটে এনে দি' তাই তো পিণ্ডি গেলো।'

কথাটায় নটবরের রাগের মাত্রাটা আরও চড়ে গেল। সে চীৎকার করে উঠল: 'চুপ রও! মুখে মুখে চোপরা! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব, জান না?'

বিলাসী তার কাপড়ের আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে বল্‌ল: 'তবে রে অলপ্পেয়ে মিন্সে, চুপ করব তোর ভয়ে! আয় না, মুখ ছিঁড়বি আয়! দেখি, তোর তেজ কত? ক'জোড়া জুতো আছে বার করনা একবার!'

এতটা অপমান কোন স্বামীরই সহ্য হয় না, নটবরও সহ্য করতে পারল না। সে তার হাতের হুঁকোটাকে সজোরে স্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। কল্কেটা মধ্যপথেই ছিটকে পড়্‌ল, হুঁকোটা সশব্দে তার গায়ে লেগে দাওয়ায় পড়ে ভেঙ্গে গেল।

বাস্, আর যায় কোথা! ঘরের কোণে নূতন ঝাঁটা-গাছটা দাঁড় করান ছিল, সেটা তুলে নিয়ে পাগলের মত বিলাসী সজোরে স্বামীর পিঠে ঘা কতক বসিয়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগল।

* * *

জাতে এরা গোয়ালা। তবে জাত ব্যবসা করে না। বিলাসী লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করে; তাতেই কোন রকমে কায়ক্লেশে সংসার চলে যায়। নটবরের বাঁধাধরা কোন কাজ নেই, করেও না। না করেও সন্দেশ সে যা' করতে পারে. দই পাতবার কায়দা তার এমনই অদ্ভুত যে, কাজ-কর্ম্মে দূর গ্রামান্তর হতেও লোক এসে তাকে ধরে

নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করে দেয়; কিন্তু এমনই কুড়ের মরণ যে, দশঘর ফিরিয়ে একঘরেও সে যায় কিনা সন্দেহ। এখানেই বিলাসীর দুঃখ এবং তাই নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা লেগেই আছে—কিন্তু হাতাহাতি এই প্রথম।

ঝাঁটা বেশ ভাল করেই নটবরের পিঠে পড়েছিল। দেখতে দেখতে প্রত্যেকটা কাঠির দাগ লাল হয়ে ফুলে উঠল। লজ্জায় দুঃখে অভিমানে সে একেবারে কেমন হয়ে গেল। তার দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। সে তখনই বাড়ী হতে বেরিয়ে গেল।

এতটা কিন্তু বিলাসীরও অভিপ্রেত ছিল না, এ অপকর্ম্ম করে সে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল। তার ওপর মারের বদলে তাকে প্রহারে একেবারে শেষ করে না ফেলে অমন নিঃশব্দে তাকে চলে যেতে দেখে তার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

* * *

সন্ধ্যা হয়ে গেল, নটবর তবুও বাড়ী ফিরল না। একটা অজানিত আশঙ্কায় বিলাসীর মন তখন বড়ই অস্থির হয়ে উঠল। যতই বিলম্ব হতে লাগ্‌ল, তার উৎকণ্ঠা ততই বেড়ে চল্‌ল। ভীতি-ব্যাকুল দৃষ্টিতে সে কেবলই পথের পানে চেয়ে দেখতে লাগ্‌ল।

সারাদিন সে জলস্পর্শ করে নি। স্বামী রোদ্দুরে তেতেপুড়ে এসে অভুক্ত অবস্থায় বেরিয়ে গেছে,—ফিরে এলে তার পাতে কী দেবে সে? ঘরে তো এক মুঠোও অন্ন নেই! আর সে বসে থাকতে পারল না, কিছু চাল সংগ্রহের আশায় তখনই বের হয়ে পড়্‌ল।

পুকুরের পশ্চিম পাড়ে রাখালের মায়ের বাস। সে তার কাছ থেকে কিছু চাল ধারস্বরূপ নিয়ে এল। তার পর তাড়াতাড়ি একটা ভাতে ভাত রেঁধে প্রস্তুত হয়ে বসে রইল—যেন স্বামী এলেই সে ভাত বেড়ে দিতে পারে।

* * *

ক্রমে রাত গভীর হল। নটবর কিন্তু বাড়ী ফির্‌ল না। ঘুমে বিলাসীর দু' চোখ ঢুল্‌তে লাগ্‌ল, সে আর বসে থাক্‌তে পার্‌ল না। মাটিতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর আধ ঘুমে আধ জাগরণে সমস্ত রাত কাটিয়ে দিল।

গতকাল সমস্ত দিনরাত বিলাসীর উপবাসে কেটেছে, সে জন্য তার ক্ষিদেও পেয়েছিল যথেষ্ট। একটা নিষ্ফল আক্রোশে সে জ্বলতে লাগল। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল নিষ্ঠুর স্বামীর ওপর। তার উদ্দেশে সে আজ আবার বকাবকি সুরু করে দিল।

এক প্রহর বেলাতেও যখন নটবর বাড়ী ফিরল না, বিলাসী তখন আর তার জন্য অপেক্ষা করতে পারল না। স্নান সেরে সে একথালা পান্তা নিয়ে খেতে বসে গেল। কিন্তু খেতে বসে গলায় বেধে যেতে লাগল। সে তখন থালা সমেত ভাত পুকুরে ঢেলে দিয়ে এল।

* * *

দেখতে দেখতে চার পাঁচ দিন অতীত হল, কিন্তু নটবর সেই যে গেছে, আর বাড়ী ফেরে নি।

বিলাসী প্রথম দিন দুই ভেবেছে, এখন আর ভাবে না। সে যে বাড়ীতে কাজ করত, আবার সেখানে তা' আরম্ভ করে দিয়েছে। সারাদিন তো নিশ্বাস ফেল্‌বারই অবসর পায় না সে, স্বামীর কথা ভাববে কি? হাড় ভাঙ্গা খাটুনীর পর রাত্রে শয্যায় শুতে না শুতেই সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে। এমনই করে এ কটা দিন কাটিয়ে দিয়েছে।

সেদিন খুব সকালে বিলাসী কাজ করতে ঠাকুর বাড়ী যাচ্ছিল, পথে হারাণ চৌকীদারের সঙ্গে দেখা। সে বল্‌ল: 'তোমাকে এখনি একবার নদীর ঘাটে যেতে হবে।'

সে বিরক্তিভরে প্রশ্ন করল: 'কেন?'

হারাণ যা' বল্‌ল, তার সার মর্ম্ম এই যে,—নদীর ঘাটে আজ একটা পচা মড়া ভেসে এসেছে, তার দেহ বিকৃত হয়ে গেছে, দেখে চেনবার উপায় নেই। তবে অনেকে সন্দেহ করছে যে এটা নটবরের, তাই দারোগাবাবু সনাক্ত করবার জন্য তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

কথাটা শুনেই বিলাসীর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। এত বড় অমঙ্গলের কথা সে তো স্বপ্নেও কল্পনা করে নি! ভয় ব্যাকুল হৃদয়ে উন্মাদিনীর মত সে চৌকীদারের সঙ্গে ছুটে চল্‌ল।

নদীর ঘাটে লোক আর ধরে না!

একটা বটগাছের নীচে মৃতদেহটা পড়ে আছে, চারদিকে কৌতূহলী দর্শকের ভীড়।

হারাণ দারোগাবাবুকে একটা নমস্কার করে বল্ল: 'হুজুর, এই নটবরের স্ত্রী, বিলাসী।'

বিলাসী ঘোমটাটা একটু টেনে এক পাশে সরে দাঁড়াল।

দারোগাবাবু তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন: 'তোমার স্বামীর নাম নটবর?'

বিলাসী মাথা নেড়ে জানাল: 'হ্যাঁ।'

দারোগাবাবু তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন: 'সে কি ক'দিন আগে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছে?'

বিলাসী কি বল্ল, ঠিক বোঝা গেল না। হারাণ তার কাছে গিয়ে বল্ল: 'হ্যাঁ, হুজুর।'

দারোগাবাবু বললেন: 'দেখো তো, এটা দেখে চিন্‌তে পার কি না? এটা নটবরের বলে মনে হয় কি?'

মৃতদেহ দেখে চিনবার উপায় নেই, পচে ফুলে একেবারে বিকৃত হয়ে গেছে। বিলাসী ভাল করে শবের দিকে চাইতেও পারল না, অশ্রুভারে চারদিক ঝাপসা দেখতে লাগল। দর্শক বৃন্দের মধ্যে অনেকেই এটাকে নটবরের শব বলে সনাক্ত করল। বিলাসী একটা কথাও বল্‌তে পারল না। কেঁদেই আকুল হল।

মৃতের কোমরে একটা গামছা বাঁধা ছিল। হারাণ সেখানা খুলে বিলাসীকে দেখালো—সেটা নটবরের কি না?

নটবরের গামছাখানাও ঠিক্ এই রকম ছিল, বিলাসী তা স্বীকার করল। তখন এটা যে নটবরের মৃতদেহ, তাতে আর কারও কোন সন্দেহ রইল না।

দারোগাবাবু রিপোর্ট লিখে লাস জ্বালাবার অনুমতি দিয়ে গেলেন। গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল—নটবর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে মনোদুঃখে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।

নটবর যে বিলাসীকে এত বড় শাস্তি দিয়ে যাবে, ইহা সে স্বপ্নেও কোনদিন ভাবে নি। কেন সে মরতে সেদিন তার সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়েছিল? ভেবে ভেবে কেঁদে কেঁদে সে কি একরকম হয়ে গেল।

* * *

বছর দুই পরের কথা।

স্বামী বিয়োগ-বিধুরা বিলাসীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাকে দেখ্‌লে আর চেনা যায় না। চেহারা একেবারে কালিমাখা হয়ে গেছে। স্বামীর শোক সে ভুলতে পারে নি। সে বেশ জানে নিজের দোষেই পতিকে হারিয়েছে, তাই অনুতাপের তীব্র জ্বালায় জলে পুড়ে মরছিল সে।

সেবার ঠাকুরবাড়ীর বড়গিন্নী তীর্থ করতে কাশী যাবেন। তিনি বিলাসীকে যাবার জন্য ধরে বস্‌লেন। বল্‌লেন: 'তুই চল বিলাস, আমার সঙ্গে। সেখানে গেলে মনে শান্তি পাবি। বাবা বিশ্বনাথ তোর সব দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দেবেন। তোর যাবার খরচ লাগ্‌বে না; মাইনে যা পাচ্ছিস্, সেই চারটাকা করেই পাবি। যাবি?'

এত বড় সুযোগ বিলাসীর ছাড়তে ইচ্ছে হল না। সে তাঁর সঙ্গে যেতে সম্মত হল। মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এবার বিশ্বনাথের চরণে পড়ে নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবে।

* * *

কাশী বিলাসীর বেশ ভালই লাগ্‌ল।

সেদিন সন্ধ্যার পর বড়গিন্নীর সঙ্গে সে আরতি দেখতে যাচ্ছিল। হঠাৎ একখানা মিষ্টান্নের দোকানে দৃষ্টি পড়তেই তার পা দু'খানা যেন একেবারে অচল হয়ে গেল। বিলাসী অপলক দৃষ্টিতে শুধু সেইদিকেই চেয়ে রইল। একজনের চেহারার সঙ্গে আর একজনের এমন মিলও থাকে—সেই মুখ, সেই চোখ, বস্‌বার ভঙ্গীটুকু পর্য্যন্ত সেই একই রকম! হঠাৎ স্বামীর স্মৃতি তাকে ব্যাকুল করে তুলল। কিন্তু নিজের হাতে যাকে চিতায় তুলে দিয়ে এসেছে, তাকে ফিরে পাবার চিন্তার মত বাতুলতা আর কি হতে পারে?

গিন্নীমা বল্‌লেন: 'কি হল বিলাস, দাঁড়ালি কেন?'

'কি যেন পায়ে ফুট্‌ল মা, তাই। চলো, যাচ্ছি এবার।' বলে বিলাসী পা চালিয়ে দিল।

* * *

বৈশাখী পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার বন্যায় সারা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যেন মিতালী-উৎসব লেগে গেছে। কাশীতে আজ ফুলদোল। সহরের বুকে আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। দোকানে দোকানে আজ বেচা-কেনারও অন্ত নেই।

রাত দশটা বেজে গেছে। লোকজনের আর আসবার

সম্ভাবনা নেই দেখে একজন দোকানী টাট হতে উঠ্‌বার উদ্যোগ করছে, এমন সময় পেছন হতে কে ডাক্‌ল: 'দোকান বন্ধ হ'ল কি দোকানদার?'

দোকানী সে স্বরে শিউরে উঠ্‌ল। চেয়ে দেখ্‌ল একটা স্ত্রীলোক। গম্ভীর কণ্ঠে সে বল্‌ল: 'হুঁ। কিছু চাই নাকি?

'না চাইলে এত রাত্রে কেউ দোকানে আসে কি? বল্‌তে বল্‌তে স্ত্রীলোকটি একেবারে দোকানীর পাশে এসে বসে পড়ল।

চঞ্চল হয়ে দোকানী বল্‌ল: 'আজ্ঞে, আপনি!'

'না, তুমি।' বলে ফিক্‌ করে হেসে রমণী পুনরায় বলল: 'কাশীতে এসে ধর্ম্মকর্ম্ম করে, কিন্তু আমার এমন পোড়াকপাল যে, অধর্ম্ম করতেই ছুটে এলুম। গিন্নী মাকে ঘুম পাড়িয়ে চোরের মত পালিয়ে এসে—এখন এখানে থাকতে না দিলে যাই কোথায় বল তো?'

দোকানী বলতে যাচ্ছিল, চুলোয়! কিন্তু বলা হলো না; ভাল করে আগন্তুকার দিকে চাইতেই তার বাক্‌রোধ হয়ে গেল।

রমণী বল্‌ল: 'অমন করে কি দেখছ বল তো? চেনা কি না? চেনা নেই গো, চেনা নেই; যদিও একটু-আধটু থাকে, সে মরেছে! বাবার দয়ায়—' সে আর কথা বল্‌তে পারল না, চোখের বড় বড় কয়েকটা ফোঁটায় দোকানীর পা দুটো ভিজিয়ে দিল।

দোকানী ডাকল: 'বিলাসী!'

ধরাগলায় বিলাসী বল্‌ল: 'বিলাসী নয়, দাসী বলেই ডেকো আমায়। যেদিন তোমায় এখানে প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকে যে কী হ'য়ে আছি, তা' আর কি বল্‌ব। আশ-পাশের লোকের কাছে খোঁজ নিয়ে সেদিনই আসতুম; আসি নি ভয়ে—যদি পায়ে স্থান না দাও। কিন্তু আজ বছরের এমন শুভদিনে মানুষ মানুষকে অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারে না, সেই ভরসাতেই শুধু চলে এসেছি! বলো, তুমি আমায় ক্ষমা করলে?'

দূর পাগলী, ক্ষমা করব কেন? অমনটা হয়েছিল বলেই তো এখানে এসে দু'পয়সা করে খাচ্ছি। বাড়ী থেকে বেরিয়ে সত্যি সত্যিই মরতে চলেছিলুম—তোর এয়োতের জোর আছে, তাই আর মরা হ'ল না। পথে এক বুড়োর সঙ্গে দেখা, কি জানি তার কি দয়া হ'য়ে গেল—সঙ্গে করে এনে একেবারে এই দোকানে আমায় বসিয়ে দিলে। তারপর সে মরে গেলে মালিক হলুম আমি। পেলুম টাকা, সঙ্গে সঙ্গে তোকেও। কিন্তু ক'দিন থান কাপড় পরেই যেন তোকে এ পথ দিয়ে যেতে দেখেছি না? তাই চিনেও চিনি নি। বাঃ, বার বছর পার হ'তে না হ'তেই একেবারে ঝাড়া হাত-পা!'

'কি বাজে বকো!' বলে বিলাসী তার আবীর রাঙা মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

ভিতের কথা

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সূচনা

হিন্দুর অতিপবিত্র তীর্থ বারাণসী ধামে উদ্ধত এক যুবার পৃথিবীতে অপরিশোধ্য মাতৃঋণ পরিশোধের নিষ্ফল প্রয়াসকে ব্যর্থ ও ব্যঙ্গ ক'রে যে মন্দির অর্ধমগ্ন অবস্থায় পতিত-পাবনী উত্তরবাহিনী সুরধুনীর নিমজ্জমান সে কি শুধু আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক কারণে, না স্থপতি ও নির্মাতার মন্দিরের ভারবাহী ভূমি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে? এই যে অমরকণ্টকের দ্রোণমন্দিরের হেলিত অবয়ব সেকি সেকালের সেই বাস্তুকারের ভূমির বিশদ জ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার ও অজ্ঞতার নিদর্শন নয়? এমনি ভিত্তিতত্ত্বের সম্যকজ্ঞানের অভাবে পিসার হেলিত স্তম্ভ (ieaning tower of pisa) আজও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তির্যকরূপে দণ্ডায়মান না থাকলে, এটী এমনভাবে জনগণের দৃষ্টিও আকর্ষণ করতো না, এ কথা অবধারিত সত্য। এই ভিত্তিতত্ত্বের জ্ঞানের অভাবে কত ইমারৎ, কত মন্দির, কত রাজপ্রাসাদ, কত বিজয়-স্তম্ভ, কত উচ্চ নগরতোরণ, কত গোপুরম অকালে ধরণীপৃষ্ঠ থেকে চির অবলুপ্ত হয়েছে, তার সন্ধান কেই বা রাখে?

বর্তমানে সুবৃহৎগঠন—অম্বরস্পর্শী অট্টালিকা, নদীগর্ভে সুউচ্চ বাঁধ, দীর্ঘউত্তারের সেতুর গভীর তীরস্তম্ভ ও জলস্তম্ভ, সুদীর্ঘ-সুড়ঙ্গ, সুবৃহৎ যন্ত্রের ভিত্তি সম্বন্ধে সম্যক বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ণয়ে ভারবহনকারী ভূমিতত্ত্ব অবহিত হওয়ার অবশ্য প্রয়োজন।

ভূমিবলবিদ্যার (soil mechanics) অনুসন্ধান পর্ব সুরু হয় বিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে। সামান্য মাটীর মধ্যে কত যে গোপন রহস্য পুঞ্জীভূত, তার সীমা-পরিসীমা নেই। সেই রহস্যকুঞ্চিকা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চলেছে বহুযুগ ধরে—বিভিন্ন ধারায়, বিভিন্ন পদ্ধতিতে।

ভিতের প্রয়োজনীয়তা

ভিতের প্রয়োজন কেন? মাটীর উপরেও তো ইমারৎ ওঠানো যায় ভূমির ভারবাহিকা ক্ষমতা নির্ণয়ের পর। ভিতের গভীরতা অন্ততঃ ততদূর যাওয়া উচিত যেখানে ঋতুর প্রভাব পৌঁছয় না। একটু পরিষ্কার ক'রে বললে এই দাঁড়ায় যে গ্রীষ্মকালে মাটীর রস শুকিয়ে মাটী যেখানে ফেটে না যায় আর বর্ষায় মাটী যেখানে বেজায় নরম না হ'য়ে পড়ে অন্ততঃ তত গভীর পর্যন্ত ভিৎ যাওয়া উচিত। ভিৎ কিছু গভীর হবার প্রয়োজন যেখানে ইঁদুরের গর্ত খোঁড়া ও বর্ষাজলের চোরা নালা না বয়। আগেকার দিনে ভিতের গভীরতা নির্ণয়ে র‍্যাঙ্কিণের সিদ্ধান্ত ব্যবহার করা হ'ত যেখানে বিশেষ মাটীর বিরাম কোণ, মাটীর ঘনফুটের ওজন ও ইমারতের কত ওজন আসছে জানলেই হ'ল।

ভিতের বিবরণী

কি রকম ভিৎ হবে জানতে গেলে সংশ্লিষ্ট বহুবিষয় জানার প্রয়োজন। যেমন কত ওজনের গঠন কেমন ক'রে ভিতের
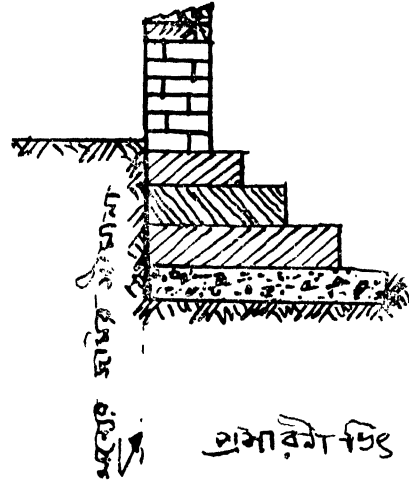
উপর এসে পড়ছে? যে-মাটি সে ভার বইবে তার আকৃতি ও প্রকৃতিই বা কেমন? বিশেষ ঢালাই কংক্রীটের ভিৎ-দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা? কাঠের পাইল পুঁতলে

হবে কিনা? উল্টো খিলেন দেওয়া হবে কিনা, নরম মাটি হ'লে নল ঠুকে গর্ত ক'রে বালি বা কংক্রীটে ভরাট হবে কিনা? মোট কথা এই যে, কত ভার ভূমিতে আসছে, আর ভূমি সেই ভার নির্বিঘ্নে বইতে পারে কিনা নির্ণয় করতে হ'বে। কত ভার ভূমির উপর আসছে, বাড়ীর বিশদ নক্সা পেলে নির্ণয় করা সহজ। আর দরকার ভূমির ভারবাহিকা শক্তি সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা ও সন্দেহ স্থলে ভূমি পরীক্ষার নানা পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি।
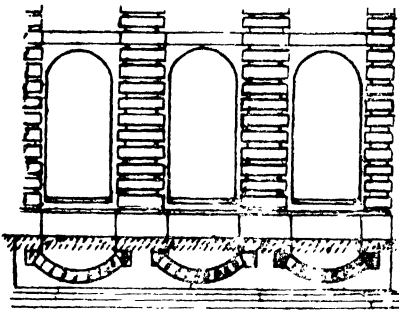
উল্টো খিলেন ভিৎ

নানারকম গঠনের ক্ষতির কারণ নির্ণয়ে দেখা যায় যে অনেক স্থলে ভিতের অপ্রতুলতাও একটা মুখ্য কারণ। ইমারতের ক্ষতির উৎস সন্ধানে দেখা যায় কোথাও মাটির নীচে কোন হাঁড়ল থাকা, কোথাও বা কুয়ো খোঁড়া বা ভাঙা গন্ধনালার পাইপ থাকার দরুণ, মাটির ভেতর জলের লেভেল নেমে যাওয়া, ভিতের বেমজবুত কংক্রীট করা, একদিকে ভরাট জমি অন্যদিকে আচোট জমি, যেখানে শালের বাতি পোঁতা হয় সেখানে শালের বাতির অপ্রতুলতা বা উপযুক্ত গভীরে না-ঠোকা, অসমান ভার বিস্তারের উপযুক্ত বিন্যাস ব্যবস্থা না করায়, ভিতের ক্ষতি হতে দেখা গেছে। যে-হেতু ভিৎ মাটির তলায় চাপা প'ড়ে থাকে অতএব এটি কোনরকমে চাপাচুপি দিয়ে গ'ড়ে তুললেই হ'ল—এ ধারণা অতিভ্রান্ত! ভিতের বিষয়ে আসলে বিপরীত ব্যবস্থা ও অতি যত্নের প্রয়োজন। যে হেতু একবার মাটি চাপা পড়লে আর দেখা যাবে না, তাই ভিতের জন্য আরও বেশী যত্ন ও উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার ডেকে উপদেশ নওয়ার বেশী প্রয়োজন। ভিতের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হল পিসার হেলানো থাম (leaning tower of pisa)। ঐ থাম তৈরী করায় ভিতের যে ত্রুটি ছিল আজ তা আবিষ্কৃত হয়েছে বর্তমান ভূমি-বলবিদ্যার দৌলতে। তখন ঐ ত্রুটির সম্ভাবনার ধারণা তৎকালীন বাস্তুকারদের অগোচর ছিল।

হিন্দুর ভূমিতত্ত্ব জ্ঞান

হিন্দুর বাস্তুবিদ্যার পুস্তক ও পুথিতে ভূমি সম্বন্ধে এক ও ততোধিক অধ্যায়ে বর্ণনা পাওয়া যায়। কোথাও 'ভূ পরীক্ষণ, ভূ-পরীক্ষা প্রভৃতি অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ। 'মানসারে'র ভূপরীক্ষা শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে 'ময়বিরচিত 'ময়মতে'র ভূ-পরীক্ষা শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে, বিশ্বকর্মাশিল্প শাস্ত্রের 'ভূমিলক্ষণ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ে 'সনৎকুমার বাস্তু শাস্ত্রে'র, 'ভূপরীক্ষা বিধি' নামক পঞ্চম অধ্যায়ে, শ্রীকুমার বিরচিত 'শিল্পরত্নে'র 'ভূমিলক্ষণ' বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ে, মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীভোজরাজ বিরচিত 'সমরাঙ্গন সূত্রধারের 'ভূ-পরীক্ষা' নামক অষ্টম অধ্যায়ে, শিল্পশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের 'ভূ-পরীক্ষা' বিবরণীতে, 'মনুষ্যালয় চন্দ্রিকার 'ভূ-পরীক্ষা পরিগ্রহ' নামক প্রথম অধ্যায়ে এবং শিল্পবিষয়ক বহু গ্রন্থ ও পুথিতে ভূমি-পরীক্ষার বিশদবিবরণ লেখা আছে। নানা পৌরাণিক গ্রন্থেও এই সন্দর্ভের বহু উল্লেখ আছে।

ভূমি বা ভূপরীক্ষায় বাস্তুর জন্য ভূমি ও ক্ষেত্রের শস্যোৎপাদনের জন্য ভূমির গুণাগুণের তারতম্য নির্ণয়ের পরীক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে বাস্তুভূমিকে তিনটি মূল ভাগে ভাগ করা হ'ত, যেমন, (১) উত্তম (২) মধ্যম (৩) অধম শ্রেণীতে কিন্তু ব্যাকরণে পুরুষ নির্ণয়ে উত্তম, মধ্যম ও অধমের পরিবর্তে 'প্রথম' বলারই বিধি।

'বিশ্বকর্মা বাস্তুশাস্ত্রে' লেখা আছে ভূমির তিনটি ভেদের কথা।

যথা :— উত্তমা মধ্যমা ভূমিরধমা চেতি সা ত্রিধা।
বিভক্তা গুণভেদেন শাস্ত্রজ্ঞৈঃ পূর্বসূরিভিঃ ॥ ॥

প্রাচীন ভূমি পরীক্ষা পদ্ধতি

১। প্রথম পরীক্ষা :

ভূমির গুণাগুণ বিচারের পরীক্ষায় দেখা যাবে যে।—
সা ভূমিরুত্তমা জ্ঞেয়া ত্রিরাত্রাঙ্কুরবর্ধিনী,

সা মধ্যমা চ বিজ্ঞেয়া পঞ্চরাত্রাঙ্কুরপ্রদা ॥২॥

মন্দাঙ্কুরাপ্রদা ভূমিরধমা চেতি গম্যতে

সা বর্জ্জ্যা সর্বকার্যেষু বীজানাং ক্ষয়কারিণী ॥৩॥

সেই ভূমিই উত্তম যেখানে তিনরাত্রেই অংকুর উদ্গম হয়, যেখানে পাঁচরাত্রির মধ্যে অংকুর উদ্গম হয় তা হ'বে মধ্যম শ্রেণীর ও আরও পরে যেখানে অংকুর বেরোয় সেটিকে অধম বলা হয়, সেই জমি সকল কার্যের পক্ষেই ত্যাগ করা উচিত কেননা এতে বীজেরই ক্ষতি হয়।

সনৎকুমার বাস্তুশাস্ত্রে অনুরূপ বিবরণী লেখা আছে। পদ্মসংহিতাও বলে—

অঙ্কুরো জায়তে যত্র ত্রিরাত্র মন্তরে মহীম,

অত্যুত্তমা বিজানীয়াৎ পঞ্চরাত্রে্ মধ্যমা।

অধমা সপ্তরাত্রে স্যাৎ দৃশ্যতে ন তদঙ্কুরে।

বর্জ্জয়েৎ অধমাং ভূমিং স্থাপয়েৎ অন্যয়োর্দ্বয়োঃ।

উল্লিখিত পরীক্ষা বাস্তু ভূমির গঠন ও উপযোগিতা নির্ণয়ে কত নির্ভরযোগ্য জানিনা, তবে চাষের জন্য যে উপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

২। দ্বিতীয় পরীক্ষা :

অতি প্রত্যুষে ভূমিতে এক হাত প্রস্থ এক হাত দীর্ঘ ও এক হাত গভীর মাটি তোলার পর সেই তোলা মাটিতে আবার সেই গহ্বর ভর্তি করলে যদি মাটি উদ্বৃত্ত হয়, তা হ'লে ভূমি উত্তম, সমান-সমান হ'লে মধ্যম ও অপূরণ হলে অধম বলে জানার বিধি, অর্থাৎ যে মাটির কণাগুলি ঘনসন্নিবেশিত, সে ভূমিকে উত্তম বলা হয়। মাটি খোড়া হলে সেগুলি আলগা হয়ে যায় ফলে গর্তভর্তি করার পরও কিছু মাটি পড়ে থাকে। 'বিশ্বকর্মা বিদ্যাপ্রকাশ' গ্রন্থে এ কথারই উল্লেখ আছে।

ভূমিমধ্যে হস্তমিতং খাত্বা পরিপূরিতং পুনশ্চ স্বভূমি

যদ্যূনমনিষ্টং তদুত্তমে সমং ধন্যম অধিকং যৎ॥

৩। তৃতীয় পরীক্ষা :

ভূমিতে ভিতের সমগভীর গর্ত খোড়ার পর সূর্যাস্তের অবসানে ঐ গহ্বর জলে ভর্তি করতে হবে, পরদিন প্রাতঃকালে ঐ গহ্বরে যদি জল কিছু থাকে তো সেই জমি উত্তম; যদি আর্দ্র থাকে তো মধ্যম ও শুষ্ক হয়ে গেলে অধম বলে জানতে হবে।

অর্থাৎ মৃত্তিকার ঘনসন্নিবেশের উপর ভূমি সান্দ্রতা নির্ভর করে। সেই অনুযায়ী জল শুষ্ক হয় বা জল জমা থাকে। ঘন সন্নিবিষ্ট মাটির কণার ফাঁক দিয়ে সব জল নীচে চলে যেতে পারে না।

৪। চতুর্থ পরীক্ষা :

একহাত গভীর গর্ত খুড়ে তার মধ্যে ধান-ভরা একটি পাত্র এবং তার উপর ঘিয়ের প্রদীপ রেখে তাতে চারটি চার রংয়ের—সাদা, লাল, হলদে ও কাল রংয়ের—পলতে জ্বালিয়ে আটচল্লিশ (৪৮) মিনিট ধরে লক্ষ্য করতে হবে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে পলতে নিভে যায় তা হলে সে ভূমি
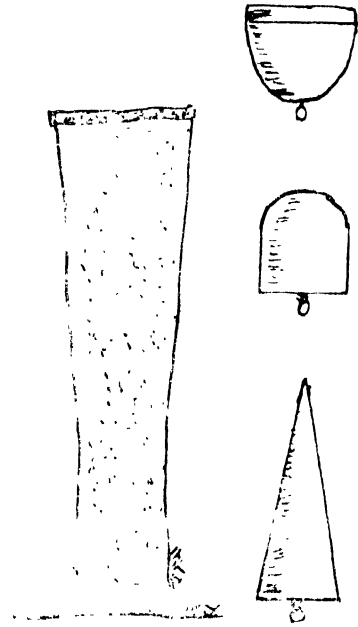
বালিং পাইল

বাস্তুর অনুপযোগী যদি সাদা পলতে জ্বলে তো ব্রাহ্মণের উপযোগী। লাল পলতে জ্বললে ক্ষত্রিয়ের, হলদে পলতে জ্বললে বৈশ্যের ও কালো পলতে জ্বললে তা শূদ্রের বাসের উপযোগী।

এই পরীক্ষাটি বিজ্ঞান সম্মত বোধ হয় না। তবে এ থেকে ভূমির মধ্যে গ্যাসের অবস্থিতি বা তা' উৎপাদনের কথাই প্রমাণ করে। এখন কলিকালে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের বাসের কথা অচল, কেননা বহুতল বাড়ীর নীচের তলায় ব্রাহ্মণের ঘরে নারায়ণ শিলা তার উপরের তলায় ম্লেচ্ছরা গোমাংস গ্রহণ করছে। সহরের জমিতে এত বাছ বিচার চলেনা।

৫। পঞ্চম পরীক্ষা :

একটি গর্ত খুড়ে তা জলে ভর্তি করে যদি একটি দ্রোণ ফুল ফেলে দেওয়া হয় এবং সেই ফুলটি যদি ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরতে থাকে তা বাস্তুর উপযোগী আর যদি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মুখে ঘোরে, তা হলে তা বাস্তুর অনুপযোগী। এটি মূলতঃ বায়ু চলাচলের গতি নির্ণয়েরই বিধি বলে (wind direction) মনে হয়।

৬। ষষ্ঠ পরীক্ষা :

যে ভূমি নিরন্তর সৌরকরে স্নাত হয়, সেই ভূমি উত্তম যে ভূমি বৃক্ষচ্ছায়ায় রবিকর বঞ্চিত তা মধ্যম এবং যে ভূমি সূর্যকর বঞ্চিত ও আর্দ্র তা বাস্তুর অনুপযোগী।

৭। সপ্তম পরীক্ষা :

বাস্তুভূমি নির্ণয়ের প্রাথমিক পরীক্ষা—নিরীক্ষার বর্ণনায় 'মানসারে' লেখা আছে :—

'সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিই সেই, যেখানে পেলব বৃক্ষরাজি ফলভরে অবনমিত, যাহার ক্ষেত্র চতুষ্কোণ সমতল এবং সরস, গম্ভীর শব্দপ্রদ, সৌগন্ধযুক্ত, উর্বর, শ্যামবর্ণ…ইত্যাদি।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পরীক্ষাগুলি প্রাথমিক নিরীক্ষা পর্যায়ের। অতএব এই অতি সাধারণ মন্তব্যের উপর নির্ভর করে কোন কাজ করা উচিত নয়। অতএব ভিত্তি-তত্ত্বের জন্য আরও বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন।

'বিশ্বকর্মা বিদ্যাপ্রকাশে' মন্দিরের ভিতের প্রস্থ নির্ণয়ের অতি সুন্দর নির্দেশ আছে। যদি একটি সম-চতুষ্কোণ ভূমিকে ষোলটী সমচতুষ্কোণে ভাগ করা যায় তা হলে কেন্দ্রের চারটি চতুষ্কোণ হবে মন্দিরের গর্ভগৃহ আর পরিধির বারোটি চতুষ্কোণ হবে মন্দিরের দেওয়ালের প্রস্থ। এরকম চওড়া ভিতের মন্দির ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। এটি অধুনাতম বাস্তুশাস্ত্র সম্মতও।

যদি ষোলহাত লম্বা ও ষোল হাত চওড়া মন্দির তৈরী করার প্রয়োজন থাকে, তা হলে উপরের নির্দেশ অনুসারে দেওয়াল হবে চার হাত চওড়া এবং মন্দির প্রকোষ্ঠ হবে আট হাত লম্বা ও আট হাত চওড়া।

রোমকদের ভিত্তিতত্ত্বের জ্ঞান : এতো গেল হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের বিবরণীর বিশ্লেষণ। প্রাচীন রোমক স্থপতি, ভিট্রুভিয়াস্, তাঁর 'স্থাপত্যে'র দশখণ্ড পুস্তকে মন্দিরের ভিত্তির বিবরণী কি অপরূপ ভাবে প্রকাশ করেছেন তা পড়লে বিস্মিত হতে হয়।

বর্তমান ভিত্তি তত্ত্বজ্ঞান :

ভিত্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণে ভূমিতত্ত্বের বিষয়েই বিশদ আলোচনার ও গবেষণার প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীতে এই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা চলে। তার ফলে বাস্তুবিদ্যার এই বিভাগ এক স্বতন্ত্র তত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে SOIL MECHANICS বা ভূমিবল বিদ্যা।

সাধারণ ঘরবাড়ীর জন্য কত ভার ভূমির ভিতের উপর আসছে তা নির্ণয় করতে গাঁথুনির ভার, দেওয়ালের ভার (দরজা-জানালার ফাঁক বাদ দিয়ে) ছাদের ভার, চল্‌মান জীবের ভার, আল্‌সের ভার প্রভৃতি যোগ ক'রে মোট ভার নির্ণয় করা হয়। ভূমির ভারবাহী শক্তির উপযোগী ভার ভিতের উপর ফেলার প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী ভিৎ উপযুক্ত চওড়া ক'রে তার সুবিন্যাস করার নিয়ম। তার আগে নির্ণয়ের প্রয়োজন বিভিন্ন মাটী পাথুরে বা কাঁকুরে। জমির কত নিরাপদ ভার বহনের ক্ষমতা, বিভিন্ন পৌর-প্রতিষ্ঠানে তার এক তালিকাও প্রস্তুত থাকে। সেই অনুযায়ী ভিতের চওড়া ঠিক করতে হয়। সামান্য বাড়ীর জন্য কে পরীক্ষাগারে মাটির নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করতে যাবে ?

ভিতের প্রকার ভেদ :

ভিৎ নানাপ্রকারের, যথা—

১। প্রসারিত ভিৎ [Extended Foundation]
২। বিপরীত বা উল্টো খিলান ভিৎ [Inverted Arch Foundation]
৩। প্রসারণী ভিৎ [Cantilever Foundation]
৪। পাইলের উপর ভিৎ [Pile Foundation]
৫। ভাসমান ভিৎ [Floating Foundation]
৬। কুয়োভিৎ (Well Foundation)

১। প্রসারিত ভিতকে বিভাগ করলে দেখা যাবে যে তারও তিনটি উপবিভাগ :—

ক) ধাপ পর পর বাড়িয়ে যাওয়া ভিৎ ;
খ) রিণ্‌ফোর্স্‌ড কংক্রীটের রাফট. [Raft]
গ) ইস্পাতের কড়ি ও সিমেণ্ট কংক্রীটের ভিৎ অথবা কাঠের কড়ি ও চূণসুরকির কংক্রীটের ভিৎ [Grillage]

২। বিপরীত বা উল্টো খিলেনের ভিৎ

যখন মাটী চাপে বসে যাওয়ার সম্ভাবনা, তখন আগত ভারকে সম্যক ভাবে বিস্তারের জন্য বিপরীত খিলানের আশ্রয় নিতে হয়। ফলে ভিতের অংশের ওজনও কিছু কম হয় অথচ শালের পিন ইত্যাদি পোঁতার দায় থাকে না।

৩। প্রসারণী ভিৎ

যেখানে দেওয়ালের বাইরের দিকে চওড়া করার জমি নেই সেখানে এই পদ্ধতিতে ভিৎ মাত্র একদিকে প্রসারিত করাই বিধি। এটীকে একদিকে প্রসারিত ভিতের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

৪। পাইল ভিৎ

বিভিন্ন বস্তু ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে পোঁতার উপর পাইল ভিতকে নানাভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

১। কাঠের পাইল বা শালবল্লা অর্থাৎ শালের বাতি পোঁতা।

২। রিণফোর্সড্ কংক্রীটের পাইল

ক) আগে থেকে ঢালাই করা

খ) ভিতের মধ্যে ঢালাই করা

৩। পূর্ব হ'তে শক্তি সংযোজিত রিণফোর্সড্ কংক্রীটের পাইল,

৪। সাধারণ কংক্রীটের পাইল,

৫। ইস্পাতের পাইল,

৬। তলায় মোটা ও উপরে সরু কংক্রীটের পাইল অর্থাৎ পেঁয়াজ রসুনের গোঁড়ের মত তলায় মোটা পাইল।

৭। স্ক্রু পাইল—যা সাধারণতঃ ঢালাই লোহার এবং সেটী কোথাও নিরেট ইস্পাতের বা ফাঁপা পাইপ দিয়ে যুক্ত। কখন বা রিণফোর্সড্ কংক্রীটেরও তৈরী করা হয়।

৮। ডিস্ক পাইল বা থালা পাইল। [Disc pile]

৯। বালির পাইল—আগে থেকে ফুটো করে বালি ভর্তি ক'রে মুগুর দিয়ে ঠেসে দেওয়া।

পাইলের ভার গ্রহণের মূল সূত্র

পাইলের ভার গ্রহণের কায়দার উপর পাইলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন—

১) শুদ্ধ ভারবাহী পাইল

২) ঘর্ষণজনিত বাধাভিত্তিক পাইল

৩) ভারবাহী এবং ঘর্ষণ জনিত বাধা ভিত্তিক পাইলের সংমিশ্রণ। পাইলের ভারবাহী ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য প্রায় শতখানেক সূত্র আছে। তার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

প্রসারিত ভিৎ
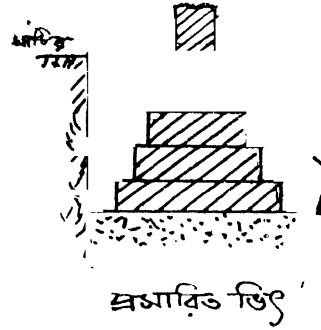
৫। ভাসমান ভিৎ

এই পদ্ধতিতে ইমারতের সমস্ত ওজন রিণফোর্সড্ কংক্রীটের নৌকোর মত গঠনে তৈরী করা হয়। সাধারণতঃ মাটীর এত নীচে এই ভিতটি নেওয়া হয় যাতে তুলে ফেলা মাটীর ভার ভিতের উপর আগত ভারের চেয়ে যেন কম হয়। কারণ ঐ কেটে তোলা মাটীই তো যেখানে ভাসমান ভিৎ দেওয়া হচ্ছে তার উপরই তো ছিল। এখন মাটীর বদলে ইমারৎ ও যন্ত্রপাতির ভার ন্যস্ত করা হচ্ছে মাত্র।

৬। কূয়োভিৎ :

এই ভিৎ সাধারণতঃ জলের নীচে সেতুর ভার বহনের জন্যই লাগে। এর আকৃতি অনুযায়ী একে আবার

ক) গোলাকৃতি

খ) উপবৃত্তাকৃতি

গ) ডাম্বেলের মত অবয়বের ও নানা আকৃতির করা হয়।

এর ডগায় ছুচগুলো ইস্পাতের ছুরি থাকে। ছুরির বাইরের প্রান্ত খাড়া ও ভিতরের প্রান্ত ভিতরের দিকে হেলানো। তার উপরই গাঁথুনি তোলা হয় ও ছুরির বেড়ের মধ্যে লোক নেমে মাটী-কাদা-পাথর- বালি কেটে কেটে তোলে। অতি গভীর হ'লে চাপে হাওয়া পাঠানোর ব্যবস্থা রাখা হয় যাতে ডাইভিং বেলের মধ্যে লোক নেমে কাজ করে যায়।

মাটীর পরীক্ষা :

ভূমির উপাদানের সন্নিবেশ জানার জন্য পরীক্ষার

প্রয়োজন। মাটীর নমুনা নেওয়ার প্রয়োজন। নমুনা নেবার পদ্ধতি হ'ল :—

১। সাধারণ ভাবে গর্ত খুড়ে মাটী তুলে পরীক্ষা ক'রে দেখা।

২। আগর (auger) দিয়ে ছেঁদা ক'রে দেখা।

৩। পাথর হ'লে ডায়মণ্ড-ড্রিল বা ক্যালিক্স ড্রিল দিয়ে ছেঁদা ক'রে দেখা।

৪। জলের বেগ দিয়ে নীচের মাটী তুলে, থিতিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা।

ভূমির ভারবাহী পরীক্ষা :

প্রথমে ভিতের সম গভীরে একটী গর্ত খুঁড়ে তার তলাটী সমান ক'রে তার উপর চৌকো অথবা গোল মোটা
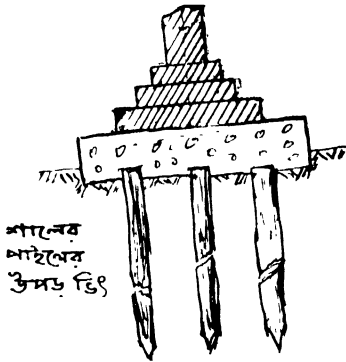
লোহার চাদর পেতে তার উপর ক্রমশঃ ভার চাপাতে হ'বে। পরিমাণ মত ভার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোহার চাদর কতখানি বস্‌লো তা লক্ষ্য রাখতে হবে। ক্রমবর্ধমান ওজন চড়ানো, বালির বস্তা বা ঢালাই লোহার বাট্‌ দিয়ে, লোহার রেল দিয়ে বা পাথরের থান চড়িয়ে ওজন দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সুবিধা হ'লে জলের ট্যাঙ্ক চড়িয়ে যাতে জল ভরার ও খালি করার ব্যবস্থা আছে সে রকম ট্যাঙ্কও ব্যবহার করা যেতে পারে। তলায় লোহার চাদরটী বসার মান নির্ণয়ের জন্য লেভেল যন্ত্র ব্যবহার করাই সমীচীন। যে ভারে তার চাদরটী আধ ইঞ্চি বস্‌বে তার অর্ধেক ভূমির নিরাপদ ভারবাহী ক্ষমতা ব'লে নেওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় পরীক্ষা :

পরীক্ষাটী একটু উন্নত ধরণের করতে গেলে এক বর্গ ফুট মাপের চাদর নিতে হবে ও চৌকো চাদরটী ঘিরে একটী তলা ও-উপর-ফাঁপা চৌকো বাক্স বসিয়ে তার চারদিকে মাটী ভর্ত্তি করে নিয়ে পরীক্ষা করতে হ'বে। এখানে ভূমির নিরাপদ ভারবাহী ক্ষমতা অনুমান করে তার দ্বিগুণ ভার চড়াতে হ'বে ও দেখতে হবে যেন ½ ইঞ্চির বেশী না বসে। যদি বেশী বসে যায় তো আবার নতুন জায়গায় নতুন ক'রে আরও কম ভার দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

এমনি ভাবে পরীক্ষা করার পদ্ধতিই সাধারণতঃ চালু। বিভিন্ন মাটীর বিভিন্ন নিরাপদ ভারবাহী ক্ষমতা আছে। তার একটী তালিকা শেষে দেওয়া হ'ল।

স্ক্রু পাইল

ভূমিবলবিদ্যার পরীক্ষাগারে মাটীর প্রকৃতি ও গুণাবলী পরীক্ষার জন্য নানা রকম যন্ত্রের ও নানা রকম পরীক্ষার উদ্ভব হয়েছে। যে-গভীরে ভিতের পত্তন হ'বে সেই গভীর থেকে মাটীর নমুনা গ্রহণ করার বিশেষ প্রয়োজন। তারও বিশেষ যন্ত্র আছে।

মাটী পরীক্ষার জন্য সাধারণ চোখে দেখে এগুলি করার প্রয়োজন। ১। রং ২। গন্ধ ৩। গঠন (Texture) ৪। বিস্তারতা (Dialatancy) ৫। সংবদ্ধ করার গুণ ৬। কাঠিন্য (হাতে গুঁড়িয়ে) তা ছাড়া অনালোড়িত (Undisturbed) মাটী সংগ্রহ ক'রে নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা যেতে পারে।

১। সান্দ্রতায় প্রাকৃতিক অনুপাত (Natural void ratio)

২। প্রাকৃতিক আর্দ্রতার মান (Natural water content)

৩। নৈসর্গিক অবস্থায় একক ওজন (Unit weight for natural sample)

৪। উনুনে শুকানো মাটীর একক ওজন (Unit weight for oven dried sample)

৫। চাপ গ্রহণ ক্ষমতা (Bearing power)

৬। সুগ্রাহিতা (Sensitivity)

আলোড়িত মাটী সংগ্রহের পর নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা যেতে পারে।

১। সর্বাধিক সান্দ্রতার অনুপাত (Max-void Ratio)

২। সর্বনিম্ন সান্দ্রতার অনুপাত (Minimum void Ratio)

৩। তারল্যের সীমা (Liquid limit)

৪। নমনীয়তার সীমা (Plastic limit)

৫। উনুনে শুকানো মাটীর একক ওজন (Unit weight, oven-dried)

৬। যান্ত্রিক বিশ্লেষণ (Mechanical Analysis)

৭। কারবনেট উপস্থিতির ভাগ (Carbonet contents)

ভূমির নিরাপদ ভারবাহিকা ক্ষমতা ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব

ক্রমিক সংখ্যা	ভূমির বিবরণ	প্রতি বর্গফুটে নিরাপদ ভার-বাহিকা ক্ষমতা (টনে)	বিরাম কোণ	ওজন প্রতি ঘনফুটে	মন্তব্য
১।	মাটী				
	(ক) পলিমাটী	১/২			
	(খ) ভরাট মাটী	১/২			
২।	কাদা মাটী				
	(ক) নরম	১	১০° থেকে ২০°		
	(খ) মাঝামাঝি শুক্‌নো	২	৩০°	২০।৩০	
	(গ) বালি মেশা	২	৩৫°	২০	
	(ঘ) কঠিন ও শুক্‌নো	৩	৪৫°	১৯	
৩।	বেলে মাটী				
	(ক) ঘন	৪			
	(খ) মিহি ও মাঝারি শুক্‌নো	২	৩৫°	২৪	
	(গ) আলগা	১		২০	
	(ঘ) ভিজে	১	২৫°	১৯	
	(ঙ) অতি ভিজে	১/২			
৪।	নুড়িভরা মাটী				
	(ক) শুক্‌নো		৩৫°	২২-৫	
	(খ) ঘন	৪	৩৫°		
৫।	পাথুরে জমি		৯০°		
	(ক) নরম পাথর	১০			
	(খ) শক্ত পাথর	২০	„	২০-২৩	
	(গ) চূণা পাথর		„	২২-২৪	
	(ঘ) বেলে পাথর		„	২৪-৩০	

পদাবলী-সাহিত্যে বাঙালী বিদ্যাপতি

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

বেশ কয়েকজন বৈষ্ণব কবির জীবৎকাল ও অস্তিত্ব নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে মতভেদের অন্ত নেই; বৈষ্ণব-পদসাহিত্যের বাঙালী বিদ্যাপতিও এই মতভেদের আবর্তলীলা থেকে আজও পর্যন্ত মুক্তি পান নি। কিন্তু তা' হ'লেও পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে বিতর্কের ঘূর্ণিজাল সৃষ্টি হয়েছে অনেক, কিন্তু তাঁর প্রকৃত নাম সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেন নি। কবিরঞ্জন ভণিতায় তিনি তাঁর পদগুলি লিখেছেন; এই ভণিতাই কবির নিজস্ব পরিচয়কে তর্কসংকুল হওয়ার মতো অবকাশ সৃষ্টি করেছে। মৈথিল কবি বিদ্যাপতিও 'কবিরঞ্জন' ভণিতায় অনেক পদ রচনা করেছেন ব'লে একটি বহু প্রচলিত কথা আছে। কিন্তু কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে এমন কোনো উল্লেখ-যোগ্য পুঁথি নেই যাতে বিদ্যাপতির নামের সঙ্গে 'কবি-রঞ্জন', 'কবিশেখর' বা 'শেখর' উপাধিযুক্ত দেখা যায়।[১] কিন্তু তা' হ'লেও মৈথিল বিদ্যাপতি ও বাঙালী বিদ্যাপতির পদ-নির্ণয় ব্যাপারে যথেষ্ট সমস্যা দেখা দিয়েছে।

পদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহোদয় বাঙালী পদকর্তাদের মধ্যে 'কবিরঞ্জন' ব'লে কারুর কোনো উপাধি বা নাম ছিল কিনা সেই সম্বন্ধেই কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন; অধিকন্তু মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে অনেকটা এক ক'রেই দেখতে চেয়েছেন। অর্থাৎ "বিদ্যাপতির রচনার সৌসাদৃশ্য" বাঙালী বিদ্যাপতির পদের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন। তা' ছাড়া, পদকল্পতরুর তেইশো নব্বই সংখ্যক পদে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মিলন-সূচক কথা লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং মৈথিল কবি বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসকে সমসাময়িক কবি মনে ক'রে কবিরঞ্জন বা বাঙালী বিদ্যাপতিকে একেবারে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে পদকর্তা হিসাবে তাঁর যে একটি অস্তিত্ব আছে তাই যেন মেনে নিতে কুণ্ঠিত মনের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারা যায়, যে সহজিয়া রসতত্ত্ব এবং রাগানুগা সাধনার দিক ঐ পদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা' প্রাক্‌চৈতন্য যুগে কিছুতেই হ'তে পারে না। রাগানুগা ভক্তি ব্যাখ্যাত হয়েছে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে, বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার ধারা বিশ্লেষণের যুগে। সুতরাং বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের মধ্যে যদি কোনো সাক্ষাৎ হয়েই থাকে, তবে সেই সাক্ষাৎ যে প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বিদ্যাপতি এবং বড়ু চণ্ডীদাসের নয়, সে-সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হ'তে পারি। এই বাঙালী বিদ্যা-পতি এবং অন্য কোনো চণ্ডীদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লেও হ'তে পারে। ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেব তো এই পদটিকেই জাল মনে করেছেন।

এখন আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে, এই বিদ্যা-পতি যদি মৈথিল বিদ্যাপতি না হইয়া থাকেন, তবে নিশ্চয় অন্য একজন বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি ভণিতায় পদ রচনা করতেন। কিংবা তাঁর পদাবলীর রসসৌকর্যে মুগ্ধ হ'য়ে তৎকালীন রসজ্ঞ বাঙালীগণ তাঁকে বিদ্যাপতি নামে অভিহিত করতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামগোপাল দাস তাঁর

১। বিদ্যাপতি: ভূমিকা—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার। পৃঃ ৫।৶৹ এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনও বলেন,—"বিদ্যা-পতির এই দুই উপাধি (কবিরঞ্জন ও কবিশেখর) ছিল, এই মনে করিয়া ইঁহাদের ভালো পদগুলির গতি করা হইয়াছে। কিন্তু 'কবিরঞ্জন' নাম বা উপাধি কোন কোন মৈথিল কবি ব্যবহার করিয়া থাকিবেন ইহা মানিয়া লইলেও বিদ্যাপতির অধিকার স্বীকৃত হয় না।" বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—পূর্বার্ধ; পৃঃ ৪২৪

'রসকল্পবল্লী'তে দুটি জায়গায় কবিরঞ্জনের নামোল্লেখ করেছেন। প্রথম, 'রসকল্পবল্লী'র দ্বাদশ কোরকে নামটি উল্লিখিত হয়েছে এইভাবে—

যশরাজ খান দামোদর মহাকবি।
কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবি॥

আর দ্বিতীয়বার উল্লেখ করেছেন রঘুনন্দন ঠাকুরের শাখা নির্ণয়ে। এখানকার উল্লেখ একটু বিস্তৃতভাবে হয়েছে। এখানে আছে—

কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিলা খণ্ডবাসী।
যাহার কবিত্বাগীত ত্রিভুবন ভাসি॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দন ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনাপদ করিলেন দঢ়॥

এইটুকু বলার পরে কবিরঞ্জনের 'শ্যাম গৌরবরণ এক দেহ' বিখ্যাত পদটিরও উল্লেখ করেছেন। ঠিক এর পরেই রামগোপাল দাস স্বরচিত একটি শ্লোকে কবিরঞ্জনের বিশেষ বিশেষ গুণ ও রূপের অভিব্যক্তি দান করেছেন। শ্লোকটি এই—

গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্ বিলাসঃ
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবি কালিদাসঃ
রূপেষু নির্ভৎসিতপঞ্চবাণঃ
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্বকলানিধানঃ॥

বিদ্যাপতির মতো যাঁর গীত রচনার বিলাস, শ্লোক রচনার ক্ষেত্রে যিনি সাক্ষাৎ কবি কালিদাসের মতো, যাঁর রূপের কাছে মদনও পরাজিত হন, তিনিই সর্বকলাকুশল শ্রীরঞ্জন। শ্লোকটির পরে এই কবির পরিচয় আরও পরিস্ফুট হয়েছে।

ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতাগানে ঘুচায় দুর্গতি॥

'রসকল্পবল্লী'তে রামগোপাল দাসের এই উক্তি এবং বর্ণনায় কবিরঞ্জনের পরিচয় আমরা যে-ভাবে পাই, তাতে তাঁর সময় এবং কবিকীর্তির বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ থাকে না। তিনি যে 'ছোট বিদ্যাপতি' ব'লে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, এবং তাঁর কবিতা গানে লোকের দুর্গতি ঘুচতো অর্থাৎ পদাবলী পাঠকেরা ভক্তির সঙ্গে তাঁর পদ পাঠ করতেন এইটুকু সংবাদ আমরা পাই। শ্লোকটিতেও তিনি যে সংগীত-রচনায় বিদ্যাপতির মতোই প্রতিভাশালী এই সত্যটিই ব্যঞ্জিত হয়েছে। তিনি রঘুনন্দনের শিষ্য, এবং গুরুর প্রতি তিনি বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন। রামগোপাল দাস এই কবিরঞ্জনের যে পরিচয়টি রেখে গিয়েছেন, সেটুকু অবলম্বন করেই আমাদের বাঙালী বিদ্যাপতির কবিকর্মকে শ্রদ্ধানতচিত্তে গ্রহণ করতে হ'বে। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনও বলেন,—"রামগোপাল দাসের কথা সব অগ্রাহ্য করা যায় না। তিনি হয়তো জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। কিন্তু যেখানে কোন বিপরীত তথ্য নাই, সেখানে ষোড়শ শতাব্দের কবিদের বিষয়ে সপ্তদশ শতাব্দের স্থানীয় জনশ্রুতির মূল্য অবশ্যই দিতে হইবে—তবে যথাযোগ্য বাট্টা দিয়া।"২ তাই একজন বাঙালী বিদ্যাপতির অস্তিত্বের গৌরবকে আমাদের স্বীকার ক'রে নিতেই হ'বে।

তা' ছাড়া বিদ্যাপতির ভণিতায় বেশ কিছু পদ বাঙলা দেশে সংকলিত বৈষ্ণবপদ সংগ্রহে পাওয়া যায়। এগুলি যে মৈথিলকবি বিদ্যাপতি রচনা করেন নি, তা' নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ মৈথিলকবি কখনো নিজ মাতৃভাষায় পদ রচনা না ক'রে বাঙলা ভাষায় রচনা করেছেন, এ বিশ্বাসযোগ্য নয়। যেমন—

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ-কাজ করিলা কি॥
বেলি অবসান কালে।
গিয়াছিলা না কি জলে।
তাহারে হেরিয়া মুচকি হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে॥

[শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ২১৫নং পদ]

এই পদের ভণিতায় আছে—

বিদ্যাপতি কহ শুনলো সুন্দরি
কানু জিয়ায়বি মোর॥

এ তো একেবারে নিছক বাঙলা পদ। বিদ্যাপতি-ভণিতায় এরূপ আরও অনেক পদ আছে, এবং সেই পদগুলিতে কবিত্বও প্রচুর। কবিরঞ্জন ভণিতায় আর একটি উল্লেখযোগ্য পদ হচ্ছে—

আরে সখি কবে হাম সো ব্রজে যায়ব
কবে পিতা নন্দ যশোদা মায়ের স্থানে
ক্ষীর সর মাখন খায়ব॥
কবে প্রিয় ধবলী শাঙলী সুরভি সব
সখা সঙ্গে দোহি দোহায়ব॥

---

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পূর্বার্ধ) : পৃঃ ৪২৪

কবে প্রিয় শ্রীদাম সুবল সখা মেলি
কাননে ধেনু চরায়ব ॥

এই পদটি বিশেষভাবে বাঙালী বিদ্যাপতির অস্তিত্বকে স্পষ্ট ক'রে ঘোষণা করেছে। কারণ এই পদটিতে শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার যে-সখাসখীগণের নাম উল্লিখিত হয়েছে তা' বিশেষ ভাবে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক রূপ গোস্বামীর দ্বারা উদ্ভাবিত। প্রাকচৈতন্য যুগে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার বিশেষ বিশেষ নামসংযুক্ত সখাসখীর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সমস্ত দিকগুলি বিচার ক'রে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডবাসী কবিরঞ্জন বিদ্যাপতিকে আমাদের বাঙালী কবি ব'লে মেনে নিতে কারো দ্বিধা হওয়া উচিত নয়। ডঃ সুকুমার সেনও কবিরঞ্জনের বিভিন্ন দিক আলোচনা ক'রে বলেছেন,—"so we are forced to assume the existence of a second vidyapati who was bengali vaisnava of the school of chaitanya-deva.[৩] এই বাঙালী বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ মৈথিল বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, কিন্তু সেগুলি বেছে নেওয়া খুব কঠিন নয়। বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয় তাঁর বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে বিদ্যাপতির পদসংগ্রহ পর্যায়ে আটাত্তরটি পদ বাঙালী বিদ্যাপতি ব'লে চিহ্নিত করেছেন। অনেকেই সাহিত্যরত্ন মহোদয়ের সঙ্গে এই ব্যাপারে হয় তো একমত হ'তে পারবেন না, কিন্তু অনেকগুলি পদ যে বাঙালী বিদ্যাপতির সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশেষ ক'রে একটি পদ সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে। সন্ন্যাস গ্রহণের ঠিক পরেই শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত-অঙ্গনে বিদ্যাপতির সে-প্রসিদ্ধ পদটি গাওয়া হয়েছিল ব'লে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে, সেই 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর' গানটি বাঙালী বিদ্যাপতির ব'লে তিনি অভিহিত করেছেন। কবিরঞ্জনের জীবৎকালের দিক দিয়ে আলোচনা করলে এই অনুমান কতটা সত্য সে-বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। কারণ, কবিরঞ্জন রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। 'গৌরপদ তরঙ্গিনী'তে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় রঘুনন্দন ঠাকুরের জন্মসময় দিয়েছেন ১৪৩২ শক বা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ; অর্থাৎ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের বৎসরে তাঁর জন্ম।[৪] ভদ্র মহাশয় তাঁর মৃত্যুকাল নির্ধারণ করেছেন ১৪৫৫ শক বা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। সেই বৎসরেই শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে। কিন্তু তাঁর এই নির্ধারণের পিছনে কোনো তথ্যের ভিত্তি আছে কি না, সে-সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি। ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া যায়, রঘুনন্দন ঠাকুর খেতুরী উৎসবে (আনুমানিক ১৫৮২-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) উপস্থিত ছিলেন। কবিরঞ্জন একটু বেশি বয়সেই যদি রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে থাকেন, তা' হ'লেও চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের বৎসর পর্যন্ত এতটা খ্যাতিলাভ নিশ্চয়ই করেন নি, যাতে তাঁর পদ অদ্বৈত আচার্যের বাড়ীতে চৈতন্যদেবের সম্মুখে গাওয়া হ'তে পারে। তা' ছাড়াও, কবিরঞ্জনের আর একটি পদের দিকে দৃষ্টি দিলে আমাদের বক্তব্য আরও একটু সুদৃঢ় ভিত্তি পাবে ব'লে মনে করি। পদটি এই,—

শ্যামরু শোকে সিন্ধু নিরমাওল
তথিপর আনল ডারি
সব গুণে হারল যো কছু রহি গেল
হৃদি কম্পিত অনিবারি ॥
সখি হে অব নাহি মীলব কান।
গোপতি তনয় সো কাহে মারব
আপ হি তেজব পরাণ ॥
গিরিতনয়াধব কতহি নাম লব
জপি জপি জীবন শেষ।
নিজ বসন লাগে আগি সব রজনী
দশমী দশা পরবেশ ॥
অমরাবতি-পতি ঘরণী গুণদ্বয়
যদি মঝু হোয়ত মাই
বিদ্যাপতি কহে ভাবি মরব কাহে
না মিলল নিঠুর মাধাই ॥

অর্থাৎ শ্যাম-বিরহের বেদনা সাগরের মতো; তাঁর বহু স্মৃতি তাতে বাড়বানলের মতো জ্বলে উঠলো। সেই আগুনে আমার লজ্জা ধৈর্য প্রভৃতি সব গুণ হারিয়ে ফেললাম। আর

৩ HBBL, P. 144

৪ গৌরপদ তরঙ্গিণী—জগদ্বন্ধু ভদ্র: উপক্রমণিকা; ১ম সংস্করণ; পৃ: ৬৯

যা' রইল, সেই প্রাণ বের হ'য়ে আমার জন্য বিপুলবেগে আমার হৃদয়কে আলোড়িত করছে। সখি, আর কানুর সঙ্গে আমার মিলনের সম্ভাবনা নেই। সেই পশুপতি-তনয়ের হাতে কেন মরবো, নিজেই প্রাণ-ত্যাগ করবো। গিরিতনয়ার বর অর্থাৎ শিবের নাম আর কতো নেব, জপ করতে করতেই জীবন শেষ হ'য়ে গেল। কৃষ্ণের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে কতো সাধ ক'রে নীল শাড়ি পরেছিলাম, এখন সেই শাড়িটিকেই সারারাত আমার আগুনের মতো মনে হয়। এখন আমি দশমী দশায় প্রবেশ করছি (মৃত্যু আমার অত্যন্ত নিকটে)। অমরাবতীর অধীশ্বর ইন্দ্রের ঘরণী শচী, তাঁর দ্বিতীয় গুণ জাত (প্রথম গুণ সত্ত্ব, দ্বিতীয় গুণ রজঃ) গৌরাঙ্গদেব যদি আমার হন, তবে হৃদয়হীন মাধবকে পেলাম না ব'লে কেন এত ভেবে মরবো ?

এই পদটির ভণিতা দিতে গিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখার জন্য একটি উদগ্র আকাঙ্ক্ষা কবি প্রকাশ করেছেন। এতেই মনে হয়, গৌরাঙ্গদেবের লোকোত্তর মহিমা চতুর্দিকে বিস্তৃত হওয়ার পরেই তাঁকে পাওয়ার জন্য কবি-হৃদয়ে এই কামনা জেগেছে, চৈতন্য ধর্মের প্রতিও তিনি অনুরাগী হ'য়ে উঠেছেন। সুতরাং তা' যে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের বেশ কিছুদিন পরে এ আমরা স্বীকার ক'রে নিতে পারি। এই পদরচনার সময়ে হয়তো বাঙালী-বিদ্যাপতির কবিখ্যাতিও প্রসার লাভ করেছিল। কারণ বিদ্যাপতি ভণিতাতেই কবি এখানে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এই ধরণের পদ শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবনের প্রভাবজাত, তা, নিঃসংকোচে বলা চলে। তখনও যে কবি চৈতন্যদেবকে দেখেন নি, তাও অনুমান করা যায়। সুতরাং 'কি কহব রে সখি' পদটি যে বাঙালী বিদ্যাপতির হ'তে পারে না, তা' নিঃসন্দেহ। এ ছাড়াও চৈতন্যচরিতামৃতে যে-বিদ্যাপতির পদ শ্রীচৈতন্যদেবকে আনন্দদান করতো ব'লে উল্লিখিত আছে, তা' যে মৈথিল বিদ্যাপতির পদ সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং মিত্র-মজুমদার ও নগেন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে যে আকারে পদটি পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় পদটি মৈথিল বিদ্যাপতির।

পূর্বেই আমরা দেখেছি, রাজসেবী যশোরাজ খাঁন, দামোদর প্রভৃতির সঙ্গে 'রসকল্পবল্লী' রচয়িতা কবিরঞ্জনেরও নাম করেছেন। 'এক পয়োধর চন্দন লেপিত' পদটির রচয়িতা যশোরাজ খাঁন হুসেন শা'র রাজকর্মচারী ছিলেন, এ-কথা সর্বাদী-সম্মত। কবিরঞ্জনও ঐ হুসেন শা'র রাজদরবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এ-কথাও কেউ কেউ স্বীকার করেছেন। বাঙলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসকার ডঃ সুকুমার সেনও বলেন,—'কবিরঞ্জন ষোড়শ শতাব্দের প্রথমার্ধের লোক এবং চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।'[৫] কবিরঞ্জন কবির নাম বলেই মনে হয়। ভণিতা দেওয়ার বেলায় রঞ্জন নামের সঙ্গে কবি শব্দটি হয়তো যোগ ক'রে দিতেন। মনে হয়, রসজ্ঞ ব্যক্তিগণের দেওয়া উপাধি ছিল বিদ্যাপতি। এই 'বিদ্যাপতি' ভণিতাতেও তিনি বহু পদ রচনা করেছিলেন, এবং এই জন্যই মৈথিল বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে তাঁর পদের সংমিশ্রণ ঘটার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছিল; আর আমাদের সম্মুখে তাঁর নামকে জড়িয়ে অতীত কালের একটি সংশয়ভূমি রচিত হ'য়ে আছে।

কবিরঞ্জনের কবিকীর্তি কেবল মৈথিল বিদ্যাপতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েই শেষ হ'য়ে যায় নি, পদকার রায়শেখর ও কবিশেখরের সঙ্গে তাঁর নামকে মিশিয়ে কেউ কেউ এক ব্যক্তি ব'লেও নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ রায়শেখর ও কবিরঞ্জনকে পৃথক ব্যক্তি বলেই মনে করেন। সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয় বর্তমান লেখককে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,—"রায়শেখর বা কবিশেখর একই ব্যক্তি। কবিরঞ্জন পৃথক লোক। তাঁহারই 'ছোট বিদ্যাপতি' উপাধি ছিল।" কিন্তু রায়শেখর ও কবিশেখর এক ব্যক্তি কি না, সে-বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বর্তমানে অনেকটা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, 'গোপাল বিজয়ে'র কবিশেখর ভিন্ন ব্যক্তি কিন্তু তা' আমাদের আলোচনার বিষয়-বস্তু নয়। কবিরঞ্জন ও রায়শেখর যে পৃথক ব্যক্তি সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ আছে ব'লে মনে করি না। কারণ রঘুনন্দন ঠাকুরের শাখানির্ণয়ে রামগোপাল দাস 'রসকল্পবল্লী'তে কবিরঞ্জনের নামোল্লেখের কিছু আগেই এক স্থানে বলেছেন,—

৫ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড; পূর্বার্ধ: ৪র্থ সংস্করণ। পৃঃ ৪২৬

আর এক শাখা হয় কবিশেখর রায়।
যাঁর গ্রন্থপদ অনেক বিদিত সভায়॥

'যাঁর গ্রন্থ পদ অনেক' আছে ব'লে তিনি উল্লেখ করেছেন, তিনি যে পদাবলী রচয়িতা একজন কবিশেখর রায় এব পৃথক ব্যক্তি তা' আমরা মেনে নিতে পারি। 'গোপাল-বিজয়ে'র কবিশেখর ইনি না হ'তেও পারেন।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন হোসেন শা'র পুত্র নসরৎ শাহের নাম কবিশেখর ও বিদ্যাপতি ভণিতায় যথাক্রমে গুপ্ত মহাশয়ের ৩৪ নং পদ (রাগতরঙ্গিণী থেকে উদ্ধৃত, পৃ: ৪৫) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৫৩ নং পুঁথির পদে আছে।৬ গুপ্ত মহাশয়ের ৪৪নং পদ (কীর্তনানন্দ থেকে উদ্ধৃত) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৪৮ নং পুঁথিতেও বিদ্যাপতি-ভণিতায় আছে। এই বিদ্যাপতি যে বাঙালী বিদ্যাপতি সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এখন কথা হলো নসরৎ শাহের নামের সঙ্গে কবিশেখর ভণিতা নিয়ে। ভণিতাটি দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

কবিশেখর ভন অপরূপ রূপ দেখি।
রাএ নসরৎসাহ ভজলি কমলমুখী॥
[গুপ্ত মহাশয়ের ৪৪ নং পদ]

আর কীর্তনানন্দের (গুপ্ত মহাশয়ের ৪৪ নং পদ) ভণিতাটির রূপ এই—

নসীর শাহ্ ভানে
মুঝে হানল নয়ন বাণে
চীরে জীব রহু পচ গৌড়েসর
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

এখন আমাদের দেখতে হবে এই কবিশেখর ও বিদ্যাপতি এক ব্যক্তি কিনা। কবিরঞ্জনের বিদ্যাপতি উপাধি ছিল এ আমরা রামগোপাল দাসের শ্লোকে দেখেছি। আবার এও দেখেছি কবিশেখর ব'লে রঘুনন্দন শাখাভুক্ত অন্য এক-জন পদকার ছিলেন। এই কবিশেখরের হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের রাজসরকারে কাজ খুবই সম্ভব যেমন সম্ভব কবিরঞ্জনের পক্ষে। হুসেন শাহের রাজসরকারে কাজে প্রবেশ ক'রে নসরৎ শাহের আমলেও কাজ করা কোনো দিক দিয়েই অসম্ভব নয়। কাজেই কবিশেখর ও কবিরঞ্জন এই ভণিতার বলেই এক ব্যক্তি হবেন এমন কোনো যুক্তি স্বীকার করা কঠিন। আমাদের মনে হয়, তাঁরা দুজন পৃথক ব্যক্তিই ছিলেন। রায়শেখর, কবি-শেখর, কবিরঞ্জন, বিদ্যাপতি এতগুলি উপাধি একজন কবি লাভ করবেন এবং পদ-রচনার বেলায় খেয়াল খুশী মতো বিভিন্ন উপাধি ভণিতায় যুক্ত ক'রে দেবেন তা' খুব যুক্তিসহ নয়। রায়শেখর এবং শেখর এক ব্যক্তি হতে পারেন, কিন্তু কবিশেখর পৃথক ব্যক্তি।

কবিরঞ্জন যে রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য এবং তাঁর প্রতি বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন তা' তাঁর একাধিক পদের ভণিতাতেই অভিব্যক্তি লাভ করেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে একটি পদের ভণিতায় তিনি বলেছেন,—

নাই পরমায় দীন অধম জন
ধনি ধনি কলিযুগ বন্দে।
কবিরঞ্জন ভণ ঐছে নিবেদন
রঘুনন্দন ভণ পদ দ্বন্দ্বে॥

শ্রীচৈতন্যের পদধূলিপূত কলিযুগকে বন্দনা করতে গিয়ে নিজের গুরুদেবের চরণোদ্দেশেও ভক্তিপ্লুত অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন কবি। তিনি বোধহয় ত্রিপুরাসুন্দরীরও পূজা করতেন। তান্ত্রিক সাধনায় এই দেবীর নাম পাওয়া যায়। ত্রিপুরীসুন্দরী যোগমায়ারও অপর একটি নাম; ইনি বৈষ্ণবদেরও উপাস্য দেবী। ইনি শ্রীবিদ্যা, এবং তারকব্রহ্ম নাম মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ডঃ সুকুমার সেন এই দেবীকে গৃহদেবী ব'লে মনে করেন। কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির বেলায় এই অনুমানই যথার্থ ব'লে মনে হয়।

একটি উল্লেখযোগ্য পদের ভণিতায় আছে—

ত্রিপুরা চরণ কমল মধু পান।
সরস-সংগীত কবিরঞ্জন ভাণ॥

ভণিতায় ত্রিপুরাচরণের উল্লেখ থাকলেও মূল পদটিতে কিন্তু গৌরাঙ্গ পারম্যবাদের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে। মূলপদটি আরম্ভ হয়েছে এই ভাবে—

শ্যামের গৌরবরণ একুদেহ।
পামরজন ইথে করয়ে সন্দেহ॥
সৌরভে আগর মুরতি রসসার।
পাকল ভেল জনু ফল সহকার॥

---

৬ বিদ্যাপতি-শতকের ভূমিকা: ডঃ শহীদুল্লাহ্

শ্যামবর্ণ (কৃষ্ণ) ও গৌরবর্ণ (শ্রীচৈতন্যদেব) যে একই দেহে এসে উদিত হয়েছেন, এ কথা নিঃসংশয় হ'য়ে ব'লে সৌরভপূর্ণ রসের সারমূর্তিরূপে গৌরাঙ্গদেবকে তিনি বর্ণনা করেছেন। কাঁচা আমের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ও পাকা আমের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের দেহবর্ণের তুলনাটির মধ্যে রূপ বর্ণনার দিক দিয়ে একটি গভীর মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে। অল্প কথার মধ্যে এমনভাবে শ্রীচৈতন্যের দেহবর্ণের তুলনা কোনো কবি করেছেন বলে জানা নেই। কবিরঞ্জনের রসোদ্গার পর্যায়ের আর একটি সুন্দর পদ আছে। পদটি আরম্ভই হয়েছে হৃদয়ের একটি গভীর প্রেমানুভূতির প্রকাশ দিয়ে,—

কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ।
এক জিউ বিহি যে গঢ়ল তিন দেহ॥
কহিল সে কাহিনি পুছে কত বেরি।
না জানি কি পায়ই মধুমুখে হেরি॥

শুধু তাই নয়, শ্রীরাধার 'দরশ' এবং 'পরশ' ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ জীবিত থাকতে পারেন না, পিপাসার্ত হ'য়ে শ্রীরাধার প্রেম ছাড়া আর কিছু পান করেন না, রাধার বুক ছাড়া আর কোনো শয্যার স্পর্শ তিনি পান না, রাধাপ্রেমের চর্বণ ব্যতীত আর কোনো তাম্বূলও তিনি চর্বণ করেন না। এভাবে রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমানুভবের যে অতলান্ত মাধুর্য পদটির বাচন ভঙ্গীতে প্রকাশলাভ করেছে তার তুলনা হয় না। রসোদ্গারের পর্যায়ভুক্ত 'কি কহব রে সখি আজুক বিচার' এবং বিপরীত সম্ভোগের অন্তর্গত'উদসল কুন্তলভারা' মুরতি শিঙ্গার লখিমি অবতারা' পদ দু'টিও কবিত্বসম্পদের দিক দিয়ে অতি উচ্চাঙ্গের। দ্বিতীয় পদটির উপমা প্রয়োগ প্রথম শ্রেণীর কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। কিন্তু কোনো কোনো সমালোচক পদ দু'টিকে প্রকাশরীতি ও ভাষা ভঙ্গির দিক দিয়ে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ব'লেও মনে করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বাঙলা দেশের ছোট বিদ্যাপতি এই ধরণের পদ রচনা করবার মতো কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত অভিসার-পর্যায়ের তিনটি পদকে রামগোপাল দাস 'রস-কল্পবল্লী'র অষ্টম কোরকে এবং পীতাম্বর দাস তাঁর 'রস-মঞ্জরী'তে উদ্ধৃত ক'রে গিয়েছেন। তিনটি পদই কল্পনা ও রসসৃষ্টির দিক দিয়ে উচ্চাঙ্গের কবি-প্রতিভার অবদান বলেই মেনে নিতে হয়। বিশেষ ক'রে নৈশাভিসারের 'পন্থ পিছর নিশি কাজর কাঁতি, পাঁতরে ভৈগেল দীগ্ ভরাতি', —পদটি যিনি রচনা করতে পারেন, তাঁর লেখনী থেকে যে 'উদসল কুন্তলভারা'র মতো পদও বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ নৈশাভিসারের পদটি আমরা সম্পূর্ণ তুলে দিলাম:

পন্থ পিছর নিশি কাজর কাঁতি।
পাঁতরৈ ভৈ গেল দীগ ভরাতি॥
চরণে বেঢ়ল অহি তাহে নাহি শঙ্ক।
সুন্দরি হৃদয়ে নূপুর পরি পঙ্ক॥
কি কহ মাধব পিরীতি তুহারি।
তুয়া অভিসারে না জিয়ে বরনারী॥
বরাহ-মহিষ-মৃগ-পালে পলায়।
দেখি অনুরাগিণী বাঘ ডরায়॥
ফণী মণিদীপ ভরমে দেই ফুক।
কত বেরি লাগিলা নাগিনী মুখে মুখ॥
কহে কবিরঞ্জন করহ সন্তোষ।
আজুকার বিলম্ব-গমনে নাহি দোষ॥

পথ পিছল ও কাজল কালো রাত্রিতে অভিসারের উদ্দেশে প্রান্তরে চলতে গিয়ে রাধা দিগভ্রান্ত হ'য়ে পড়েন। পায়ে যদি সাপ জড়িয়ে ধরে, তবু রাধার মনে কোনো ভয় জাগে না, তাঁর মনে হয় তাঁর নূপুরে বুঝি কাদা লেগেছে। মাধবের প্রেমমত্তা রাধা অভিসারিণী হ'য়ে প্রাণ পণ করে-ছেন। তাঁকে দেখে বরাহ মহিষ-মৃগ পালিয়ে যায়, এমন কি বাঘও ভয় পায়। সাপকে মণিদীপ ভ্রমে সে ফুঁ দেয়; কতোবার সেই নাগিনীর মুখে মুখ লেগে যায়। কবি-রঞ্জনের রাধার অভিসারের এই চিত্র দেখে মনে হয়, গোবিন্দদাস কবিরাজ হয়তো 'ভীতক চীত ভুজগ হেরি লো ধনি' পদটি রচনার প্রেরণা এই পদটি থেকে লাভ করে-ছিলেন।

ড: বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, মৈথিল বিদ্যা-পতির পদে কখনো কৃষ্ণের শ্যাম নাম ব্যবহৃত হয় নি। সেইজন্য পদকল্পতরুর ৭২১,৫২৮, ২০৩৮, ১৯৫২ ও ১১০৭ সংখ্যক পদগুলি তিনি বাঙালী বিদ্যাপতির বলে চিহ্নিত করেছেন।৭ এই চিহ্নিত করণ রসজ্ঞ সমালোচকের পরিচয়ই বহন করে। ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেই সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যথার্থই এই পদগুলি বাঙালী বিদ্যাপতির।

বহু সংশয়ের আবরণ কবিরঞ্জনের কবিজীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখলেও তাঁর কবিপ্রতিভার জ্যোতি উত্তরকালের রসজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সত্যনির্ণয়ে প্রবুদ্ধ করেছে। সত্যের কষ্টিপাথরে তাঁর কবিব্যক্তিত্বের স্বর্ণরেখা চিরকালের জন্য ধরা পড়েছে, এই আমাদের তৃপ্তি।

৭ বিদ্যাপতি মিত্র-মজুমদার সম্পাদিত। পৃঃ ৬৭,
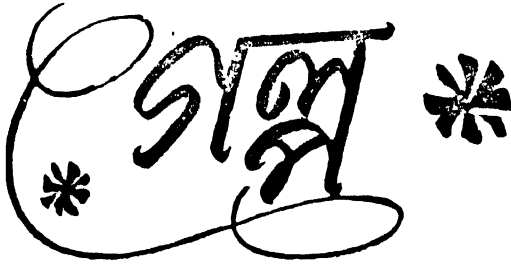
দুই জন্ম

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

ইংরাজী আমলের ঘটনা, মহাযুদ্ধের সময় ঘটিয়াছিল। রায় বাহাদুর অটলবাবুর হাসপাতালের কাজকর্ম্ম সারিয়া আহারাদি করিতে অপরাহ্ণ বেলা হইয়া যায়। খাওয়া দাওয়া সারিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন এমন সময় বেহারী চাপরাসী আসিয়া খবর দিল যে মহিম চাষা এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসিয়াছে। সে তাহার রোগ শয্যায় উঠিয়া বসিতে পারিয়াই সে তাহার বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখিবার ব্যগ্রতা জানায়। তারপর চিঠির কাগজ প্রভৃতি হাতে পাইয়া জমিদার গৃহিণীর নামে সে চিঠি লিখিয়াছে। তাহাই বেহারী ডাক্তারসাহেবের কাছে দেখাইতে আসিয়াছে।

অটলবাবু ব্যাপারটা অনুসন্ধান করিবার জন্য বলিলেন চশমাটা আন্ দেখি। চাষাবেটার সাহস ত কম নয়। একেবারে রানী মার কাছে পত্র লেখা হয়েছে। একবার দেখি ত ব্যাটা কত বড় "জজ্"।

বেহারী চশমা আনিয়া দিতেই অটলবাবু চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়িতে লাগিলেন। চিঠি খানি এইরূপ :—

প্রিয়তমা, তুমি কি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ? আমি হাসপাতালে এত কষ্টের পর একটু ভাল হয়েছি। কিন্তু তোমার জন্য সব সময়ে মন কেমন করে। তুমি আমাকে কবে দেখিতে আসিবে?"

তোমারই সুধীর।

শ্রীমতী সুরমা দাসী।
সুধীর ভবন
পোষ্ট আফিস সিংহগ্রাম
জেলা হুগলী।

ঠিকানা :—

অটলবাবু চিঠিখানি বারবার পড়িলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। "সুধীর সিংহ" জমিদারের নাম বটে। অটলবাবু যতদূর অবগত আছেন প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে শিকার খেলিতে গিয়া, ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া, তিনি জখম হ'ন ও শেষে এই হাসপাতালে আসিয়া মারা যা'ন। কিন্তু সে সব পুরাতন কথা মহিমচাষা লিখে কেন?

অটলবাবু গম্ভীরভাবে বেহারীকে বল্লেন, "বেহারী, তুই নিজের কাজ করগে যা'। আর মহিম জিজ্ঞাসা করলে বল্‌বি, চিঠিটা ডাকে পাঠানো হয়েছে"।

অটলবাবুর পেনসনের মাত্র দুইবৎসর বাকি। কিন্তু এরূপ ব্যাপার তাঁর জীবনে তিনি দেখেন নাই। সন্ধ্যাবেলা রাউণ্ড (round) দিতে গিয়া, তিনি মহিমের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

"কিরে মহিম, কেমন আছিস্?"

মহিম কোন উত্তর দিল না। অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

অটলবাবু একটু রহস্য করে বল্লেন, "সুধীরবাবু, আপনার শরীরটা কেমন বোধ হচ্ছে? কোন কষ্ট নাই ত?

অমনই মহিম পাশ ফিরিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, ডাক্তার সাহেব, আমি ত ভালই আছি। আপনার ঋণ ত কোন দিন শোধ করতে পারব না। তবে আমার স্ত্রীকে পত্র দিয়েছি। তিনি এলেই ও আপনার অনুমতি পেলেই আমি বাড়ী ফিরে যেতে চাই"।

অটলবাবু পূর্ব্বের মত বিনয়ের সঙ্গেই বল্লেন, "যে আজ্ঞে, ঐ রূপই হবে।"

অটলবাবু দেখিলেন, ব্যাপারটা সুবিধার নয়। মহিম যে সুধীর সিংহ নহে একথা মহিমকে জানাইলে তাহাকে বাঁচানো শক্ত হবে। আর তাহার মনে কি করিয়া এইরূপ ধারণা জন্মিল তাহা বোঝা যাইতেছে না। বেচারা মহিম! সামান্য লেখাপড়া জানা চাষা বই ত নয়! চালাঘরের মেরামত করিতে গিয়া কমন করিয়া নীচে মাটিতে পড়িয়া যায় ও মাথায় ভীষণ আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর তাহাকে হাসপাতালে আনা হয়। অনেক তদ্বীরের পর রক্ত পড়া বন্ধ হয়। এখনও মাথায় সেলাই মাঝে মাঝে ব্যথা দেয়। তবে আর কিছু দিনের মধ্যে মহিম ভাল হইলে অটলবাবুর অন্তরে খুব বড় রকমের একটা তৃপ্তি হবে। কিন্তু একি বিপদ? মহিম দেখায়, সে আর মহিম নহে, এখন থেকে সে সুধীরবাবু জমিদার!

অটলবাবু রোগীকে একেবারে সুস্থ করিবার আর কোন উপায় না দেখিয়া অগত্যা চিঠিখানি নিজেই ডাক যোগে পাঠাইলেন ও সেই সঙ্গে তিনি রানী মা'র কাছে

নিবেদন জানালেন যে তিনি যদি রোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অটলবাবুর সঙ্গে যেন প্রথমে দেখা করেন।

২

সুরমা চিঠিখানি পাইয়া আশ্চর্য্য হইল। প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল তাহার স্বামী মারা গেছেন। যে শ্মশানঘাটে তাঁকে দাহ করা হয়েছিল, সেখানে সে আত্মীয় স্বজনের মানা সত্ত্বেও নিজে কিছুক্ষণ উপস্থিত ছিল। স্বামী মারা যাইবার পর তাহার একটি কন্যা হয়। যতদিন না সে কন্যা বড় হইয়া শ্বশুরবাড়ী গেল, ততদিন তাহার এক রকমে কাটিয়াছিল। তারপর, যে অন্ধকারের সূচনা সে পূর্ব্বেই জানিয়াছিল, তাহাই নিবিড়ভাবে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার জীবনে অন্ধকার আর কাটিতে চাহে না। কিন্তু অন্ধকার বরং ভালো। এতো নিরাকার মধ্যেও এক ফোঁটা মিথ্যা আশার মত, এই চিঠির তাহার জীবনে কিসের প্রয়োজন ছিল? সে ত জানে, তার স্বামী মারা গেছেন বহুকাল। তবে আজ হাসপাতালে যাবার আবার আহ্বান কেন?

সুরমা কাহাকে সব কথা জানাবে? বিষয় সম্পত্তি সমস্তই সরকারের হাতে। সরকারী আমলারা কেহই তাহার পরোয়া করে না। মাস গেলে দু'টি হাজার টাকা তাহার খরচের জন্য পৌঁছাইয়া দিয়া তাহারা খালাস। তার জীবনের মূল্য ঐটুকু মাত্র। সবাই তাহা জানে। গরীব দুঃখীদের সে কোনদিনই দেখিতে পারিত না। কত বার তার স্বামী বেঁচে থাকতে বলতেন, দুঃখী কাঙালদের যা কিছু আদর পূর্ব্বক দিবে তাহা স্বয়ং নারায়ণ গ্রহণ করেন। কিন্তু সে এ সব কথা বিশ্বাস করিত না। গরীব দুঃখীরা যেমন ভাগ্য আনিয়াছে তাহাদের ত সেই মতই হইবে? তাহার স্বামী বলতেন—"দেখ, আমি জমিদার বটে কিন্তু আমার সব বিষয় সম্পত্তি তোমাকে দানপত্র করে, আমার ইচ্ছা হয় ঐ নিঃস্ব চাষার জীবন যাপন করি, খেটে খাই, দিনমজুরী করে, যেমন করে হোক্! কিন্তু এই যে বসে বসে সোনার থালে মাছের মুড়ো খাওয়া, আর স্বচক্ষে দেখা হাজার হাজার কৃষক নিঃস্ব অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, এ আর আমার সহ্য হয় না।" তারপর মাঝে মাঝে কি যেন হিংস্রবৃত্তি চাপত, বন্দুক ঘাড়ে লইয়া বাহির হইতেন, বনের পশু হত্যা করতে! এই রকম করিয়াই তাহার কপাল পুড়িল। একদিন যখম জখম শরীর লইয়া স্বামী শয্যা লইলেন, আর উঠিলেন না। বিষয় সম্পত্তি সবই ত তিনি তাহাকেই দিয়া গেলেন। কিন্তু সে পাইল কোথায়? সরকারের বিচার অনুসারে যতদিন না তাহার স্বামীর দৌহিত্র-সন্তান জন্মায় ও সাবালক হয়, সমস্ত জমিদারী সরকারের হাতে থাকিবে। তাহার ভরণ-পোষণের জন্য নামমাত্র ব্যবস্থা হইল। এ সবই ভাল। তার যেমন কর্ম্মফল।

কিন্তু এক্ষণে সুরমা ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মেয়েকে, তার শ্বশুর বাড়ীতে, কথাটা চুপি চুপি না জানাইয়া থাকিতে পারিল না। তারপর মোটর চালককে বলিল, তাহাকে লইয়া জেলার সহরে অটলবাবুর বাসায় লইয়া যাইতে। অটলবাবু ডাক্তার হিসাবে তাহার পরিচিত। তাঁর কাছে যেতে তার কোন আপত্তি ছিল না। বিশেষ, পত্রে তিনি যখন সেইমত নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

ষোলো মাইল পথ অতিক্রম করিতে বেশীক্ষণ লাগিল না। তাহার মনে পড়িয়া গেল, এই পথে, একদিন, সে স্বামীর সাথে বিবাহের পরেই কত আনন্দে শ্বশুরঘরে প্রথম আসিয়াছিল। তখন তাহার বয়স ছিল মাত্র এগারো ও তার স্বামীর পনেরো। তারপর দশটি বৎসর যাইতে না যাইতেই স্বামী মারা যা'ন। সহর আসিতেছে বুঝিয়া সুরমা বস্ত্রাদি গুছাইয়া বসিল। বয়স হইলেও সে শরীরটাকে ভালোই রাখিয়াছে ও সেইজন্য সে লোকের দৃষ্টি হইতে নিজেকে বাঁচাইতে চায়।

অটলবাবুর অনুমতি লইয়া যখন সে বেহারীর সহিত মহিমের রোগশয্যার পাশে গিয়া দাঁড়াইল তখন হাস-পাতালে একটা কানাঘুষা চলিতেছিল। অটলবাবু কথাটাকে যতদূর সম্ভব গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। সেইজন্য মহিমকে প্রাইভেট ওয়ার্ডে একখানি ভাল কামরায় স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

মহিম সুরমাকে দেখিয়াই একমুখ হাসিল। ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া কতকটা আপন মনে বলিতে লাগিল "তাই ত, চেহারা অনেক বদলে গেছে। কত সুন্দর রঙ ছিল, মাথায় চুল ঘন ছিল, আর কত চুল। তাই ত, এখন ত সে সব নাই। তবে কি আমিও বুড়ো হয়ে গেছি?" বলেই মাথায় হাত দিয়া যন্ত্রণা বোধ করিল ও তৎক্ষণাৎ শুইয়া পড়িল।

সুরমা স্থির থাকিতে পারিল না। মাথার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, কপালের উপর যে ব্যাণ্ডেজটা আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা নিজের হাতেই ঠিক করিয়া দিল। বেহারী চাকর সঙ্গেই ছিল। সে পাশ করা অনেক নূতন ডাক্তারের চেয়েও বেশী বিদ্যা রাখে। তার উপর যেমন

আদেশ ছিল সে সেইমত সেবা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মহিম সুস্থ বোধ করিল। বেহারী একটা কি কাজে অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে গেল।

সুরমা স্থির করিয়াছিল, সে স্বাভাবিকভাবেই হাসি-মুখে কথাবার্ত্তা কহিবে। হাজার হোক্ রোগী ত? তার অপরাধ কি? সেইভাবে সুরমা বলিল, "তুমি অমন করছ কেন? তুমি আছ, আমি আছি, আমাদের কি নেই? তুমি ভাল হয়ে উঠলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মহিম বলিল, "সুরমা, তোমার কাছে আমি অনেক অপরাধ করেছি। কতদিন তোমার কাছে যেতে পারি নাই। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।"

সুরমা হাসিতে গিয়া চক্ষের জল অঞ্চলে মুছিল।

মহিম বলিল, "সুরমা, মনে পড়ে ফুলশয্যার রাত্রে তুমি আমাকে প্রথম কথা কি বলেছিলে? সেদিনও আমি লজ্জায় তোমার সামনে চোখ তুলে কথা বলতে পারি নি। তুমিই আমার লজ্জা ভেঙ্গেছিলে। আমার সকল লজ্জা তুমিই চিরদিন বজায় রাখলে।"

সুরমা কথা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বলিল, "আচ্ছা কি বলেছিলাম, বল ত?"

মহিম সুরমার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যাহা বলিল তাহাতে সুরমার কাণ দুইটি রাঙা হইয়া উঠিল। কত বৎসরের পুরাতন একটি সামান্য কথা, স্মৃতির পথ বেয়ে, সমগ্র শরীরের রক্তে প্রবাহিত হয়ে, ফিরে এসে দাঁড়াল, আজ জীবনের শেষ প্রান্তের আকাশটুকুকে রঙীণ করে! মহিমচাষা এ কথা কেমন করিয়া জানিল? এবারে সুরমার হাত পা যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। গতিক সুবিধার নয় দেখিয়া বেহারী কার্য্যান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সুরমাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল।

৩

সুরমা অটলবাবুর কোন মানা না শুনিয়া মহিমকে নিজ আলয়ে আনিয়াছে। বেহারী সেবার জন্য সঙ্গেই আসিয়াছে। সুরমার আত্মীয়স্বজন তাহার এই কার্য্যে বিরক্ত হইয়াছেন। সুরমার কন্যা লিখিয়াছে যে মা যে কত বড় ভুল করেছেন তার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। কে এক সন্ন্যাসীর কথা উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছে যে কোন দৈবশক্তির দ্বারা চাষাব্যাটা কোন যাদু বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে ও তাহার দ্বারা সে এক্ষণে সুরমাকে হাত করিতে চ[...]

সুরমা হাসে আর ভাবে, এ জীবনের কর্ম্মফল সব য[...] জীবনেই শেষ হইয়া যায় তবে মন্দ কি? সে ত মহি[...] আরোগ্য করিয়া, সুস্থ করিতেই নিযুক্ত। তাহ[...] অপরের বলিবার কি আছে?

মহিম বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুইয়া বাগানে পুষ্করিণীর দৃশ্য দেখে। মালী ফুলের তোড়া সম্মুখে মে[...] উপর রাখিয়া যায়। চাকররা তাহাকে সেলাম ক[...] যায়। সুরমা সবাইকে এইমত আদেশ দিয়াছে। অটলবাবুর ইঙ্গিত মত মহিমকে কোন মতে মনে কর[...] দিতে চাহে না যে সে মহিমচাষা। কারণ তাহা হই[...] মহিমের স্বাস্থ্যের বিপত্তি ঘটিতে পারে। শুধু সুরমা নি[...] যতদূর সম্ভব দূরেই রাখে। সেবা দ্বারা সে এ[...] মহিমকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে বেশ করিয়া চিনিয়া ল[...] চায়।

কিন্তু মহিম যতই আরোগ্যের মুখে অগ্রসর হয় [...] বেশী করিয়া অতীতের খুঁটিনাটি কথাগুলি সুর[...] জানায়। বড় বড় ঘটনা তার তেমন মনে নাই। গুলে স্মরণে এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সামান্য কথা, তুচ্ছ ঘটনাগুলি সে যখন অপলক[...] বর্ণনা করে তখন এই চাষার ছেলেকে আর চাষা[...] সুরমার মনে হয় না। তখন মনে হয়, সে সত্যই [...] সিংহ জমিদার। অথবা সুরমা ভাবে, জীবননাট্যের করি একজন নাট্যকার অদৃশ্যে বসে আছেন, যিনি ব্যক্তিকে কখনও বা রাজা কখনও বা প্রজারূপে সং[...] রঙ্গমঞ্চে পাঠাইতেছেন ও নিজে আড়াল থেকে দে[...] দেখিতেছেন। সুরমার সমস্ত ব্যাপারটা অদ্ভুত ল[...] মহিমের মাথার যন্ত্রণা ভাল হইতেছে। কিন্তু সু[...] মাথাটা যেন ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে।

৪

মহিমের খোড়ো ঘরে বসিয়া তাহার স্ত্রী সুশীলা দিন ত কেটে যাচ্ছে, ডাক্তারবাবু ত কোন খবর দেন তবে কি তার স্বামী আর ইহজগতে নাই? বেচারী একদম একা। গরু বাছুর সামান্য ক্ষেতখামার ঘর কাহার কাছে রাখিয়া সে বার বার তার স্বামীর লইতে যাইবে? সে গরীব; তাই কি ডাক্তার

ার খবর ল'ন না ? তাহার দেড় বৎসরের খোকাকে চেপে ধরে সুশীলা কাঁদে আর ভাবে, তাহার মাত্র ারো বৎসরের জীবনে বিধাতা কত সুখই দিলেন, াই তাহাকে এই বিপদের হাত হইতে উদ্ধার বেন। আবার হাসিমুখে দেয়ালে আঁটা রাখাল-ের ছবিতে মাথা ঠেকায়। কিন্তু প্রতিদিনই ভাবে, ত বেশীদিন এমন করে চুপ করে থাকা যায় না।

প্রতিবেশী বলাই চাঁদ ও তাহার স্ত্রীর জিম্মায় গরু বাছুর য়া সে চলিল, জেলার বড় হাসপাতালে তার স্বামীর লইতে। সেখানে যাইতে সেখানকার চাপরাসীরা ই ভাঙ্গিল না। বলিল ডাক্তার সাহেব অটলবাবু মহিমের খবর আর কেহ বলিতে পারিবে না।

অপরাহ্নে অটলবাবু তাঁর বাসায় ইজি চেয়ারে বসিয়া াকু সেবন করিতেছিলেন। সুশীলা পাগলের মত ানে গিয়া, তাঁর পায়ে হাত রাখিয়া চীৎকার করিয়া য়া ফেলিল।

অটলবাবু বল্লেন, "কি হয়েছে ? হয়েছে কি ?"

সুশীলার কান্নায় তাহার কোলের খোকা কাঁদিয়া ল দেখিয়া সে তখনই চুপ করিল। তারপর বলিল, ারবাবু, আমি চাষার মেয়ে। অতি দুঃখী। আমার র খবরও কি আমাকে জানাতে হয় না ?

অটলবাবু বল্লেন, "তুমি কোন গ্রামে থাক ?"

সুশীলা বলিল, "ঝামাইগাছা গ্রামে আমার স্বামী ঘরের তৈরী করতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল, তেনারে আপনা-ার হাসপাতালে আনা হয়। সব আপনি ভুলে গেছ, ারবাবু ?"

অটলবাবুর চমক ভাঙ্গিল। তিনি যে নিজেই অপরাধী এক নিমেষে জানতে পেরে বল্লেন, "ওঃ, বুঝেছি, মহিম চাষার স্ত্রী। তা' তার খবর পাস্‌নি বুঝি ?"

সুশীলা বলিল, "আপনি বাবা হয়ে যদি খবর না দেন, র আর কে আছে এই দুধের খোকা ছাড়া !"

অটলবাবু বল্লেন, "হাঁ, আমার অন্যায় হয়েছে।"

তারপর ধীরে ধীরে তিনি সব খবর সুশীলাকে লেন।

শুনিয়া ত সুশীলার চক্ষু স্থির ! খোকাকে বুকে য়া সে বলিল, "বাবা, সে মোটরে চোড়ে জমিদার বাড়ী চলে গেল ? একবার আমার কথা, যাক্ গে আমার কথা, একবার তেনার এত আদরের খোকাধনের মুখ খানাও ভাবল না ?"

অটলবাবু এ কথার কি উত্তর দিবেন ?

সুশীলা বলিল, "না বাবু, তোমাদের ইংরেজী ওষুধে বিশ্বেস নেই। কি যাদু করলে ডাক্তারবাবু ? আমার স্বামী গেল। এ'র বাবাকেও আর এ পাবে না ! জমিদার বাড়ীর বউ এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ? আর সেই বা কেমন মাগী ? বুড়ী মাগীর লজ্জা সরম নেই, তার মেয়ের চেয়ে ছোট আমি, আর আমার স্বামীকে সোয়ামী বলে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলল ?"

অটলবাবু কি উত্তর দিবেন ?

সুশীলা বলিল, "বাবু, গরীবের কেউ নেই, এক গোবিন্দ ছাড়া। যাই, তাঁর কাছেই যাই। কিন্তু বাবু, একবার তুমি চলো না ! তোমার সঙ্গে আমাকে জমিদার বাড়ী নিয়ে চল। একটিবার দেখে আসি। সে আমাকে ভুলে গেছে, কিন্তু আমি ত আর তাকে ভুলি নি। বাবু, তুমি সঙ্গে চলো। আমি একলা গেলে চাকর দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দেবে। চলো না বাবু।"

অটলবাবু বল্লেন, "দেখ মা, তুমি সুস্থ হও। আজকের রাতটা তুমি এখানে থাকো। কাল সকালে যা' হয় একটা ব্যবস্থা হবে।"

সুশীলা হাসপাতালের একটি খালি কামরায় শুইয়া রহিল। রাত্রে তাহার চিন্তার বিরাম নাই। গোবিন্দ ত ভালই করেছেন। তাহার স্বামীকে নিরাময় করে দিয়েছেন। এ'র বেশী ত সে কোনদিন গোবিন্দের কাছে চাহে নাই। নিজের জন্য কোন সুখই ত সে গোবিন্দের কাছে চাহে নাই, শুধু চরণের দাসী হয়ে থাকতে চায়, জন্ম জন্মান্তর ধরে। তবু ত তিনি মহিমের মত স্বামী দিয়েছেন, সোনার চাঁদ খোকা দিয়েছেন, আর যা' খাবার পরবার দিয়েছেন তা'তে ত কোনমতে দিন কেটেই যায়। তার চেয়েও আরও কত গরীব দুঃখী এই সংসারে রয়েছে তাদের দুঃখের ত সীমা নাই। সুশীলা ভাবে, আর গোবিন্দের কাছে কৃতজ্ঞতা জানায়।

সকাল হতেই সে ডাক্তারসাহেবের বাসায় গিয়া অটল-বাবুকে জানাইল, "বাবা, তুমি বড় ভাল লোক। আমার

সোয়ামীকে ভাল করে দিয়েছ। তোমাকে যদি শক্ত কথা বলে থাকি অপরাধ নিও না। আমার স্বামী যদি আমাকে ভুলে যায়, তুমি তার কি করবে? আর সে যেখানে থাকুক, ভাল থাকুক, সুখে থাকুক। এইটুকু গোবিন্দের কাছে চাই। আর তুমি বাবা আশীর্বাদ কর যে এই ছেলেটা বড় হয়ে যেন এই রকম করে ফেলে না যায়।"

এইভাবে পাগলিনীর মত নিজের ছেলের সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে অটলবাবুর উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই সুশীলা সে স্থান ত্যাগ করিয়া নিজগ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

৫

সুশীলা গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার কোন কাজেই মন লাগে না। উৎসাহ সে আর খুজেই পায় না। ছেলেটাকে প্রাণপণে ভালবাসে কিন্তু যেখান থেকে ভালবাসার উৎস বহিতে থাকিত সে পথটি ত তাহার কাছে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বলাইচাঁদ ও তাহার স্ত্রী ও পাড়ার অন্যান্য লোকেরা তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, সে কোন কথারই উত্তর দেয় না। অথচ হাতের নোয়া ও শাঁখা সে খুলে নাই। পূর্ব্বে যেমন থাকত এখনও সেই মত থাকে। সারাদিন নিজের কাজে ও মহিমের কাজে ব্যস্ত থাকে। রাত্রে অনেক সময়ে কাঁদে খুব বেশী যাতনা বোধ করিলে দেয়ালে গোবিন্দের ছবির তলায় মাথা ঠুকে সান্ত্বনা খোঁজে। আবার সকাল হয়। আবার চক্ষু মুছিয়া নিজের কাজে চলিয়া যায়।

কিন্তু সেবারে ক্ষেতের ধান বিক্রী করিতে পাঠাইয়া সে তেমন কিছুই মূল্য পাইল না। যুদ্ধের সময় মূল্য বেশী পাবার লোভে সে প্রায় সমস্ত ধান এক কিস্তিতে হাটে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে যে মূল্যে ধান বিক্রী হইত সেই মূল্যেই তাহার সমস্ত ধান বিক্রী ধার্য্য হইয়া গেল। যে অর্থ হাতে আসিল তাহাতে লড়াইএর বাজারে সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। গরুকে খাওয়াইবে কি, নিজেই বা কি খাবে? সুশীলা বুঝিল, তাহার স্বামী জীবিত থাকিলেও এবারে তাহাদের অনাহারে মরিতে হইবে। দেশের দুর্দ্দিনে তার মত অনাথা স্ত্রীলোকের মুখের পানে কেই বা চাহিবে? বলাইচাঁদ ও অন্যান্য গ্রামের লোকেরা বুদ্ধিমানের মত যুদ্ধ চাকরী লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহাদের স্ত্রী-পুত্রের খরচের জন্য প্রতি মাসে সরকার হইতে টাকা আসিত। এক্ষণে আর তাহারা তেমন করিয়া সুশীলার খবর লয় না। সুশীলা ভাবে, গোবিন্দ যখন তাহাকে পুরুষের দায়িত্ব সবই দিলেন, তখন সংসারে স্ত্রীলোক করিয়া কেন পাঠাইলেন? আবার এক এক সময়ে হাসে ও আপন মনে বলে, "ভালই হোল, যার সোয়ামী থেকেও নাই তার বেঁচে থাকাই বা কেন? খোকার মা বলিয়া তাহার অভিমান কিসের?

মাত্র চার মাইল দূরে, জমিদারবাড়ীতে মহিম রাজার মত যত্নে ও সেবায় দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতেছে। বেহারীর হাসপাতালে ফিরিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু সুরমা আজকাল বড়ই অন্যমনস্ক থাকে। সে একটা অনর্থের আশঙ্কা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। আজকাল খাবার ঠাঁই হইলে, সুরমা যখন মহিমকে পরিপাটি করে খাওয়াইতে চায়, মহিম হাত গুটাইয়া লয়। তাহার চক্ষু যেন কেমন অস্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহাকে ধরিয়া কোনমতে বেহারী শয়ন কক্ষে লইয়া গিয়া শোওয়াইয়া দেয়। একটু সুস্থ হইলে সুরমা জিজ্ঞাসা করে, "তুমি খেতে বসে অমন কর কেন? খেতে ইচ্ছা হয় না? কি খেতে চাও বল।"

মহিম বলে, "কি করে বলব! তুমি ত সবই জান। চারিদিকে কত দুঃখী প্রজা অনাহারে মরছে। আমি ভাতের থালার সামনে বসলেই—" বলিয়াই মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করিয়া চুপ করিয়া যায়।

আবার কিছুক্ষণ পরে সময় ও সুযোগ পাইয়া সুরমা বলে, "আচ্ছা, তুমি খাবার সময় কি দ্যাখো, কি ভাবো, আমাকে একটু বলবে না?

মহিম সুস্থবোধ করে বলে, "আমি দেখি, জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার শাঁখা পরা হাত, না একটা হাত নয়, বোধ হয়, হাজার হাজার হাত আমার থালার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, আর আমার কাছে চায় দুটি চারটি অন্নের কণা সন্তানের জন্য। তুমিই বল, আমি কি করে ভাত মুখে দিই?"

মহিম মাথায় হাত দিয়া বসে। সুরমা আর একবার উল্লেখ করিতে চাহে না।

মহিমের পরিবর্ত্তন দেখিয়া সুরমা ভাবে, তাহার স্বামী যখন শিকার থেকে ফিরিয়া আসিতেন, এমনই কত দুঃখের কাহিনী তাহাকে শুনাইতেন। সে তখন গ্রাহ্যই করিত না। তাহার স্বামী বলিতেন, "দেখ সুরমা, তুমি মেয়ে হয়েও এতো পাষাণ হৃদয় হতে পারো? জমিদার বাড়ীর সব মেয়েরাই কি তোমার মত?" তারপর গুণ গুণ করে সেই চির পরিচিত গানটি তিনি আপন মনে গাইতেন :—

"স্বদেশ স্বদেশ করিস্ বটে,
এ দেশ তোদের নয়,
তোরা শুধু চাষের মালিক
গ্রাসের মালিক নয়।"

সুরমা স্বামীর সেই কণ্ঠস্বর যেন শুনিতে পায় ও সম্মুখে দেখে মহিম মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। বিধাতার এ কি নিদারুণ পরিহাস!

৬

বেহারী সুরমাকে খবর দিল যে মহিমের মাথার সেলাই দিয়া রক্ত পড়িতেছে ও তাহাকে শীঘ্র করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাওয়াই সুবুদ্ধির কাজ হইবে। আর উপায় নাই দেখিয়া সুরমা তাহাই করিল। আবার সেই পথ দিয়া মোটরে করিয়া মহিমকে লইয়া সে চলিল যে পথ দিয়া মাত্র কয়েকমাস হইল সে মহিমকে লইয়া আসিয়াছিল। এই কয় মাসে মহিমের উপর কেমন যেন মায়া পড়িয়া গিয়াছে।

সুরমা অবাক্ হইয়া এই কথাই ভাবিতেছিল।

হাসপাতালে লইয়া যাইবামাত্র অটলবাবু দেখিলেন যে ষ্টিচটা খুলিয়া ফেলিতে হইবে। মাথার ভিতরে কোন হাড় বা মাংসের টুকরা হয়ত পচিতেছে, তাহা হইলে তাহাও সরানো কর্ত্তব্য। অগত্যা আবার পূর্ব্বের মত ক্লোরোফরম করা হইল। অটলবাবু দেখিলেন, কোথাও কিছু বিকৃত পদার্থ নাই, পূর্ব্বের সেলাই ঠিকমত করা হয় নাই বলিয়া শোণিতপাত আরম্ভ হয়। সে কার্য্য যথাযথ ভাবে নিষ্পন্ন করিয়া, মাথাটা যেমন ছিল আবার সেলাই করা হইল। তারপর কয়েকদিনের ভিতরই মহিম বেশ সুস্থ বোধ করিতে লাগিল।

কিন্তু এবারে সুস্থ হইয়া সে আরও গোল বাধাইল। সুরমাকে সে কোনমতেই চিনিতে পারিল না। সে জানাইল ঝামাইগাছা গ্রামে তার আঠারো বৎসর বয়সের স্ত্রী সুশীলা দাসী বাস করে। তাহাকে খবর দিয়া আনা হউক। সে তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য উৎসুক।

সুরমা দেখিল, মহিম আর তাহার স্বামী সুধীর সিংহ নহে। এখন সে চাষার ছেলে মহিম ও সুশীলার স্বামী। একটাই জীবনে তার স্মৃতির গোলমাল কেমন করিয়া হয়?

ডাক্তার অটলবাবু তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "মা, প্রথমে আমিই বুঝিতে পারি নাই। সমস্তই ওর নষ্টামী বলে মনে করেছিলাম। ইংরাজী ডাক্তারী পুস্তকে এ বিষয়ে কিছুই লিখে না। শেষে ভারতবর্ষের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র খুলে দেখলাম, ঋষিরা বলেছেন যে মানুষের মাথার মধ্যে জন্মজন্মান্তরের কত স্মৃতি, কত সংস্কার ভাঁজ করে, স্তরে স্তরে, গোছানো থাকে। সে সব কিছুই নষ্ট হবার নয়। সামান্য অসুখে বা শিক্ষায় বা গুরুকৃপায় কখন কোন্ সংস্কার বা স্মৃতি যে জেগে উঠে তা বলা যায় না। একবার কোন মতে উপরে ভেসে উঠলেই হোল। আমরা যতই বলি না কেন যে মানুষ বুদ্ধিমান জীব, আসলে তার যাহা কিছু মূলধন আছে তাহার সমস্ত সে নিজেই অনেক সময়ে জানে না।"

সুশীলা খবর পাইয়া আসিয়া উপস্থিত। এবারে সে গোবিন্দের ছবিখানি আঁচলে বেঁধে এনেছিল। যদি কোন অনর্থপাত ঘটে সে ছবিশুদ্ধ নদীর জলে ঝাঁপ দিবে এই ছিল তার সঙ্কল্প। তাহার দারুণ দুঃখের দিনে, খোকার অসুখের মধ্যে, ডাক্তার অটলবাবু খবর পাইয়া, নিজে-গিয়া, ঔষধ দিয়া পথ্যের জন্য অর্থ দিয়া, খোকার প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। খোকাকে সে অটলবাবুর চরণে সমর্পণ করবে। স্বামীকে যখন তিনি পরের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন তখন খোকাধনেরও একটা ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হইবে।

কিন্তু হাসপাতালের ঘরে আসিয়াই মহিমকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া সে অবাক্!

মহিম বলিল, 'তুই এসেছিস্? আর আমি এখানে এক মুহূর্ত্তও থাকব না! ঘরে নিয়ে গিয়ে যদি চুনজল দিয়েও আমাকে রাখিস্ আমি ভাল হয়ে উঠব।'

সুশীলা বলিল, চুনজল কেন দিব? যতদিন গতর আছে, তোমাকে শালগ্রাম ঠাকুরটির মত সেবা করব। তারপর খোকাকে একবার বড় করে ফেলতে পারলে—"

সুশীলা কথা বন্ধ করিল। খোকার কথা বলিতে য়া সুরমার মুখের উপর একটা কালো ছায়া দেখিয়া সে া করিল।

সুশীলা বলিল, "মা, তুমি কে?"

সুরমা বলিল. "আমি সিংহগ্রামের জমিদারের স্ত্রী।"

সুশীলা বলিল, "ও: তুমিই," বলেই স্বামীর দিকে হিল। তারপর স্বামীর দিকেই চাহিয়া বলিল, "বল. র সাথে তুমি যাবে? ওনার বাড়ীতে ধুমধাম, কত জোপার্জ্জন কত যত্ন সেবা। আর আমার কাছে? খী কাঙালের বুকভরা হাসি সোয়ামীকে পেয়ে। দেবার ১ গোবিন্দ আমাকে কিছুই দেয় নাই। কেবল নিজকে ড়া। কাকে তুমি চাও?"

মহিম বলিল. "ধোৎ, তোর মাথা খারাপ হয়েছে। নীমা'র সঙ্গে তুই কথা কইতে জানিস্ না।"

অটলবাবু সুশীলাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কি বলিলেন। তারপর সুশীলা ভয়ে আর কোন কথার উল্লেখ করিল না।

মহিমকে লইয়া যাইবার সময় সুশীলা সুরমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ, দয়া করে দুঃখী বলে আমাকে ক্ষমা করবেন। নিজের স্বামী হলে কি হয়, ফিরে পাবার চিন্তায় যদি কোনসময়ে দোষ করে থাকি আপনার কাছে, তুমি ত বড় লোকের মেয়ে, আমাকে তোমার কৃপা দিও।"

যতদিন না মহিম সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়, সুরমা প্রতি মাসে কিছু সাহায্য করিতে চাহিল। কিন্তু সুশীলা তাহা লইতে কোনমতেই রাজি হইল না। সে গোবিন্দের ছবিকে মুঠার মধ্যে ধরিয়া বলিল, "মা, জন্ম জন্মান্তর ধরে যেন চ ণের দাসী হয়ে থাকতে পারি। আর কোন আশ্রয় গরীবের দরকার কি মা?"

একটি কি দুটি মৌমাছি

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

ল আকাশের তলে অন্তহীন সবুজের মাঠ,
রি পাশে আছে এক নিঃঝুম পুকুরের সিঁড়ি বাঁধা ঘাট,
ক সেইখানে,
ব্যক্ত বেদনা নিয়ে প্রাণে—
নমনে আমি বসে আছি।
কটি কি দুটি মৌমাছি
দূর হতে যেন উড়ে উড়ে এসে
ন-কালো পুকুরের কিনারাতে শেষে
জে পেল শান্তির ঠাঁই;
মি ছাড়া সে ঘাটের কোন খানে অন্য কেহ নাই।
কটি কি দুটি মৌমাছি,
সে তারা ঘন হয়ে আরো কাছাকাছি।
নে হলো কোন মৌচোর,
ত্রি বুঝি না হতেই ভোর,
পথে বার হয়েছিল মধুর সন্ধানে;
হয়তো বা কোনখানে
খুঁজে পেয়ে একখানি ছোট মৌচাক,
যত পরিশ্রম লব্ধ মৌমাছিদের মধু থাক
তবু তারা ভেঙ্গে নিল কঠিন আঘাতে।
পরিত্যক্ত পুকুরের নিরালাতে
একটি কি দুটি মাছি তাই,
উড়ে এসে খুঁজে পেল এতটুকু শান্তির ঠাঁই।
ওরা তো আমারই মত,
মধু নয়—বয়ে নিয়ে অন্তরের দুঃখরাশি যত
এতবড় পৃথিবীর এইখানে এসে
আমার মতই দীন বেশে
আকাশ-ঝড়ের পাখি যেন এসে দাঁড়িয়েছে নীড়ে;
আমিও এসেছি তাই পরিত্যক্ত পুকুরের তীরে।

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(১) কেল্‌তিক শাখার ভাষাভাষীদের অবস্থান আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্ এবং উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ব্রিটানি বা ব্রেতাঞ্ প্রদেশে। এই শাখার উল্লেখযোগ্য ভাষা আইরিশ, স্কটিশ, ওয়েল্‌চ্ এবং ব্রেতন। আইরিশ ভাষা সমস্ত আয়ারল্যাণ্ড দ্বীপের ভাষা। স্কটল্যাণ্ডে স্কটিশ ভাষা ঘরোয়া ভাবে ব্যবহৃত হয়। সরকারি ও প্রকাশ্য কাজে-কর্মে সেখানে ইংরেজি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওয়েল্‌স্ প্রদেশে ওয়েল্‌চ্ ভাষায় ঘর-সংসারের কাজকর্ম চললেও সরকারি কাজে একই রকম ভাবে একমাত্র ইংরেজির ব্যবহার আছে। ফ্রান্সের ব্রিটানি প্রদেশে ব্রিটন বা ব্রেতনদের বাস, সেখানেও সরকারি কাজে ব্রেতনের ব্যবহার নেই, ফরাসি-ভাষারই পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত।

কেল্‌তিক শাখার ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র আইরিশ-ভাষীরা নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। আয়ারল্যাণ্ডের বৃহত্তর অংশে ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে রোমান ক্যাথলিক আইরিশরা নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র আইরিশ ফ্রি স্টেট বা এইরে গঠন করেছে। আয়ারল্যাণ্ডের ক্ষুদ্রতর অংশ উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্—এই তিনটি কেল্‌টিক রাজ্য আর ইংরেজি-ভাষী ইংল্যাণ্ড নিয়ে চারটি রাজ্যের সমাবেশে যুক্তরাজ্য বা ইউনাইটেড কিংডম—সংক্ষেপে U. K. রাষ্ট্র গঠিত। এর থেকেই কেল্‌তিক জাতিগুলির রাজনৈতিক সামর্থ্য কতটা, তার ধারণা হয়। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রোটেস্টান্ট আইরিশরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেনি বটে, কিন্তু ইংরেজদের সহযোগিতায় নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিজ্ঞাপক একটি অঙ্গরাজ্য গঠন ক'রে রেখেছে। স্কটরা দীর্ঘকাল যাবৎ ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের পৃথক্ সত্তা বজায় রাখ্‌ছে। মাঝে মাঝে পূর্ণ স্বাধীন স্কট্‌ল্যাণ্ডের দাবিও শোনা যায়। গুপ্ত বেতার-কেন্দ্র থেকে Radio Scotland বা স্কটিশ বেতার-কেন্দ্র নামে ঘোষণা প্রচার করাও হয়। ওয়েল্‌সের লোকেরাও ইংরেজপ্রাধান্য মেনে নিলেও নিজেদের একেবারে জাতীয় সত্তাবিহীন ক'রে তোলে নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও কমনওয়েল্‌থের বিরাট অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সুখ-সুবিধার প্রলোভন প্রোটেস্টান্ট আইরিশ, স্কটিশ আর ওয়েল্‌চ্ জাতি তিনটিকে ইংলিশদের সঙ্গে সুদৃঢ় বন্ধনে বেঁধেছিল। ধর্মগত সাদৃশ্যও একটা কারণ; ইমন ডি ভ্যালেরার আইরিশ রাষ্ট্র রোমান ক্যাথলিক; কিন্তু যুক্ত-রাজ্যের চারটি অঙ্গরাজ্যই প্রোটেস্টান্ট। মুখ্যত ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক স্বার্থের তাগিদে একভাষী হয়েও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড বা আলস্টার অবশিষ্ট এলাকা নিয়ে গঠিত এইরে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে সম্মত হয় নি। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, একভাষী আয়ারল্যাণ্ড ভাষাব্যতিরিক্ত দুই শক্তির—ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক—চাপে দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। অবশ্য দুই আয়ারল্যাণ্ডের একীকরণের চেষ্টা অব্যাহত আছে। এক দিন এইরে একটি অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে সমগ্র দ্বীপময় বিস্তৃতি লাভ করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বাধীনতা লাভের জন্যে ক্ষুদ্র আইরিশ জাতি যে-দুঃখ বরণ করেছে, তার কোন তুলনা নেই। এখন আইরিশভাষীদের সংখ্যা মাত্র চার মিলিঅন। এইরে-তে বাস করে মাত্র তিন মিলিঅন। মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ভারতে সব চেয়ে কম, এইরে-তে সবচেয়ে বেশি। এর দ্বারা ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বশক্তি বোঝা যায়। তুলনায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতা কলঙ্কময়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দ্রুত সঙ্কুচিত হয়ে আসার ফলে অন্যান্য অগ্রসর আধুনিক জাতির তুলনায় ইংরেজদের অর্থনৈতিক অধোগতি সুরু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শোষণক্ষেত্র হয়ে আসছে সঙ্কীর্ণতর ও ভিন্ন

রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কণ্টকাকীর্ণ। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, তার ফলে স্কটল্যাণ্ড আর ওয়েল্‌স্ দেশ দুটিও ইংল্যাণ্ডের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্যে আন্দোলন করছে। স্বনামধন্য কবি বিষ্ণু দে তাঁর "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ" কবিতায় এ-প্রসঙ্গে সকৌতুকে লিখেছেন :—

"কল্পতরু আজ শুকনো, তাই ইংলণ্ডের উত্তরে পশ্চিমে স্বায়ত্তশাসন চায়!"

কেল্‌তিক ভাষা এক সময় মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে বিশেষ প্রবল ছিল। ইতালিক ভাষাগুলির সঙ্গে এই শাখার ভাষাদের সাদৃশ্য এত গভীর যে, অনেক পণ্ডিত দুটি শাখাকে একত্র ইতালো-কেল্‌তিক শাখা বলে বর্ণনা করেন। সম্ভবত এই দুই শাখা একত্র ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে আসে এবং পরে আলাদা হয়ে বিবর্তিত হয়। তা ছাড়া রোমক সাম্রাজ্যের বিস্তারের যুগে ইতালিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব এই কেল্‌তিক শাখার ওপর বিশেষ ক'রে পড়েছিল। ইউরোপে কেল্‌তিক শাখার ভাষাগুলোর বর্তমান অবস্থা শোচনীয়। ইতালিক ও টিউটনিক বা জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠীর চাপে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপ থেকে এই ভাষাগুলো লুপ্ত হয়ে গেছে। ইউরোপের মহাদেশীয় অংশে একমাত্র ব্রেতাঞ্‌ অঞ্চলে এর অবস্থান।

মহাদেশের বাইরে দ্বীপময় অঞ্চলেও স্কটিশ আর ওয়েল্‌চ্ ভাষা ইংরেজির বশ্যতা স্বীকার করেছে। আইরিশ ভাষা বরাবর বিদ্রোহ ক'রে এসে সম্প্রতি তার স্বাধীন আত্মার পুনঃপ্রকাশে কৃতকার্য। কিন্তু এখন আইরিশ-ভাষীদের একাংশ ইংরেজি ভাষার দাসত্ব করছে। তা ছাড়া আধুনিক কেলতিক ভাষাগুলিতে কোন বড় সাহিত্য নেই। ইদানীং আইরিশ ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির উন্নতি হচ্ছে বটে, কিন্তু তেমন লক্ষণীয় কিছু হয় নি। অথচ ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকে আইরিশ। মাতৃভাষায় সুবিধে করতে না পারলেও ইংরেজিতে তাঁরা জগৎকে মুগ্ধ করার মতো রচনা করেছেন। তবে আইরিশ ভাষা যে ভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এইরে নামক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হয়ে উঠেছে তাতে মনে হয়, কেল্‌তিক শাখা অন্তত এই ভাষাটির দ্বারা জীবিত থাকবে।

জার্মান সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক-দার্শনিক হার্ডার ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের যে-আদর্শ প্রচার করেন, সে-আদর্শ ইউরোপে তথা ভারত-ইউরোপীয় জগতে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। যদিও হার্ডারের মতবাদ এখনও সর্বত্র গৃহীত হয় নি, তবু পৃথিবীর মধ্যে ইউরোপে ও সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্রগুলি যথাসম্ভব ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রায়ই ভাষা ও রাষ্ট্রের নাম একই। ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে যখন ভারতে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হয়, তখন ভারতেও মোটামুটি ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠিত হয়। এর ফলে আসাম থেকে আইসল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারত-ইউরোপীয় জগৎ ভাষার ভিত্তিতে যতটা সুগঠিত, এমন আর কোন ভাষাগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা নয়। ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র, অঙ্গরাজ্য বা বা প্রদেশ, স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল বা জেলা-মহকুমা ইত্যাদি গঠনের প্রবণতা ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের বিশেষত্ব যা পূর্ব গোলার্ধের ভারত-ইউরোপীয় জগতে আসাম থেকে আইসল্যাণ্ড পর্যন্ত অঞ্চলে প্রত্যক্ষ। পশ্চিম গোলার্ধ প্রায় সম্পূর্ণ-রূপে এই গোষ্ঠীর ভাষাভাষী; পূর্ব গোলার্ধের উরাল থেকে বেরিং পর্যন্ত অঞ্চলেও এই ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা উপনিবিষ্ট। এদের দ্বারা শাসিত পৃথিবীর অন্যান্য এলাকাকেও এরা অন্য ভাষাগোষ্ঠীর লোকদেরও যথাসম্ভব ভাষার ভিত্তিতে সুবিন্যস্ত প্রশাসনিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছে। তার দ্বারা হার্ডারের রাষ্ট্রদর্শনই জয়যুক্ত হচ্ছে।

২) ইতালিক শাখার ভাষা হ'ল স্পেনীয়, ফরাসি, পোর্তুগিস, ইতালীয়, রুমানীয়, প্রভাঁসাল, কাতালান ও রেতো রোমান। রুশরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে খানিকটা রুমানীয় এলাকা দখল ক'রে সেখানে মোল্‌দাভীয় প্রজাতন্ত্র গঠন ক'রে সেই রুমানীয়ভাষী এলাকার স্থানীয় ভাষার নাম দিয়েছে মোল্‌দাভীয় ভাষা, যা এখন রোমক লিপির বদলে রুশীয় লিপিতে লেখানো হচ্ছে। রুশ বর্ণমালা ও লিপি মোল্‌দাভিয়ায় ব্যবহার করানো অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। রুশ লিপি ও বর্ণমালা প্রাচীন গ্রিক লিপি ও বর্ণমালার বংশধর—ঠিক লাতিন বা রোমক লিপি ও বর্ণমালার মতো নয়।

ফরাসি ভাষার ভিত্তিতে ইউরোপে ফ্রান্স আর উত্তর

আমেরিকা মহাদেশের নিগ্রো রাষ্ট্র হাইতি গঠিত। স্পেনীয়, পোর্তুগিস আর ইতালীয় ভাষা যথাক্রমে ইউরোপের স্পেন, পোর্তুগাল আর ইতালির রাষ্ট্রভাষা। রুমানীয় ভাষা রুমানিয়ার রাষ্ট্রভাষা তো বটেই, সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্য মোলদাভিয়ারও সরকারি ভাষা, অবশ্য ভিন্ন নামে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রুমানিয়া রুশের বিরোধিতা করায় রুশরা রুমানিয়াকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে এই ভাবে শাস্তি দিয়েছে। এর অনুরূপ কাজ তারা ফিন্‌ল্যাণ্ডেও করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর নবগঠিত ফিন্‌ল্যাণ্ড রাষ্ট্রের একটা বড় অংশ রুশরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কেড়ে নিয়ে প্রথমে সোভিয়েট যুক্তরাজ্যের মধ্যেই অন্যতম অঙ্গরাজ্য হিসেবে কারেলো-ফিন প্রজাতন্ত্র গঠন করে। তারপর সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রসঙ্ঘের এই ষোড়শ প্রজাতন্ত্রটিকে খাস রুশ প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বা পূর্ণাঙ্গ প্রজাতন্ত্ররূপে এর বিলোপ সাধন ক'রে একে এখন একটি তথাকথিত "স্বায়ত্ত শাসিত প্রজাতন্ত্র" রূপে গণ্য করা হচ্ছে। এর বর্তমান নাম দেওয়া হয়েছে কারেলীয় প্রজাতন্ত্র, যাতে ফিন জাতির নামগন্ধটুকুও না থাকে। এই সব কু-কাজের প্রতিক্রিয়ায় এখন ইউরোপে ফিন্‌ল্যাণ্ড আর রুমানিয়া দুটি রাষ্ট্রই রুশদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছে।

স্পেনীয় ভাষা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় আরো ১৮টি স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা। তা ছাড়া ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিঅম, ডেনমার্ক ও পোর্তুগালের মতো স্পেনেরও সাম্রাজ্য আছে যেখানে স্পেনীয় ভাষা চলে। পশ্চিম ইউরোপের এই সাতটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের ভাষার প্রচলন তাদের নিজেদের নাগরিকদের মধ্যে ছাড়াও তাদের পৃথিবীব্যাপী বহু বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে। পোর্তুগিস ভাষা দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাসিল বা ব্রাজিল রাষ্ট্রেরও ভাষা। ফরাসি ভাষা ফ্রান্স ও হাইতির রাষ্ট্রভাষা হওয়া ছাড়াও কানাডার দ্বিতীয় এবং যুগ্ম রাষ্ট্রভাষা। অবশ্য কানাডায় রাষ্ট্রভাষা রূপে ইংরাজির স্থান প্রথম এবং প্রধান।

প্রচার বা লোকসংখ্যার দিক থেকে স্পেনীয় জগতের তৃতীয় বৃহত্তম মাতৃভাষা। প্রায় ষোলকোটি লোক এই ভাষাকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে। এর সাহিত্যগৌরবও শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের। স্পেনীয় ভাষীরা অত্যন্ত সজীব নরগোষ্ঠী। ইতালিক শাখার ভাষাগুলির মধ্যে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহারকারীর সংখ্যাবিচারে পোর্তুগিস ভাষার স্থান দ্বিতীয়। মাতৃভাষার লোক সংখ্যার বিচারে পোর্তুগিস পৃথিবীর নবম ভাষা। প্রায় আট কোটি লোক এই ভাষা প্রয়োগ করে। আরবি-র পরেই এর স্থান, আরবি-র চেয়ে সামান্য কিছু কম এর লোকসংখ্যা।

প্রচারের দিক থেকে যত না হোক, সংস্কৃতি গৌরবে ইতালিক বা লাতিনজ শাখার শ্রেষ্ঠ ভাষা ফরাসী। ফরাসি পৃথিবীর দশম বৃহত্তম মাতৃভাষা—প্রায় সাড়ে সাতকোটি লোকের। কিন্তু সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের জন্যে একে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ভাষা বলা যায়। ইংরেজি জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষা হতে পারে কিন্তু ফরাসিও কম যায় না। ইংরেজি ভাষার প্রচারব্যাপ্তি সাম্রাজ্যিক ও বাণিজ্যিক কারণে যতটা, সাংস্কৃতিক কারণে ততটা নয়। কিন্তু ফরাসির প্রসার মুখ্যত সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের জন্যে। এই ভাষাকে অ-ফরাসি জগৎবাসীর দ্বিতীয় মাতৃভাষাও বলা চলে। ইংরেজির পরেই ফরাসির স্থান বললে অত্যুক্তি করা হবে না সাংস্কৃতিক প্রসারের দিক থেকে। ফরাসি-সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যের সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। এ-পর্যন্ত লোকসংখ্যায় অনেক বেশি হয়েও ইংরেজি ভাষীরা ১৩বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আর ফরাসীরা পেয়েছেন ১১ বার।

উৎকর্ষের বিচারে ইতালিক শাখার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ভাষা ইতালীয়। প্রায় ছ কোটি লোকের মাতৃভাষা ইতালীয়তে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত। সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিচারে পৃথিবীর প্রথম সাতটি আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে ইতালীয়ের স্থানলাভ অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজি-ফরাসি-জার্মান-ইতালীয়-স্পেনীয়-রুশ-বাংলা, এই সাতটিই ভারত-ইউরোপীয় জগতের তথা সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। বলা বাহুল্য, প্রাচীন ভাষাগুলির সাহিত্যের কথা এখানে বাদ দেওয়া হ'ল।

রুমানীয় প্রায় দু কোটি লোকের মাতৃভাষা; এ-ভাষাতেও উৎকৃষ্ট সাহিত্য আছে। প্রভাঁসাল ভাষার সাহিত্যও একবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সের দক্ষিণে প্রভাঁস প্রদেশে প্রচলিত এই ভাষার

লোকদের নিজস্ব রাষ্ট্র নেই। কাতালান স্পেনের একাংশে কাতালোনিয়া এলাকায় বলা হয়। এই ভাষাভাষীদেরও নিজস্ব রাষ্ট্র নেই। রেতো-রোমান দক্ষিণ সুইৎসার্ল্যাণ্ডের ক্ষুদ্র একাংশে অতি অল্প লোকের দ্বারা কথিত। কাতালানে ভালো সাহিত্য আছে। প্রভাঁস আর কাতালোনিয়া রাষ্ট্র দুটি যাতে গ'ড়ে উঠতে না পারে, তার জন্যে ফ্রান্স আর স্পেন অতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। প্রভাঁসাল আশি লাখ, কাতালান পঞ্চাশ লাখ লোকের ভাষা। সুতরাং দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ঐ দুই ভাষার লোকেরা অবশ্য গঠন করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বে ইতালিক ভাষাগুলির মোট লোক সংখ্যা প্রায় চল্লিশ কোটি। এই শাখা ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম শাখা।

(৩) গ্রিক শাখার ভাষা প্রাচীন গ্রিক জগতের এক সেরা সাহিত্য গড়ে ছিল। কিন্তু তার দুর্বল বংশধর আধুনিক গ্রিক ভাষার তত গৌরব নেই। অবশ্য আধুনিক গ্রিক ভাষার সাহিত্যও নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে। এই ভাষা ক্ষুদ্র গ্রিস ও সাইপ্রাস রাজ্য দুটিতে সীমাবদ্ধ। এর লোকসংখ্যা এক কোটির কিছু কম। আগে এশিয়া মাইনরে বহু গ্রিক বাস করত। তুর্কিদের অত্যাচারে তারা অপসারিত হয়েছে।

(৪) আর্মেনীয় শাখার ভাষা অতি প্রাচীন ও সাহিত্য গৌরবে সমৃদ্ধ। প্রাচীন কালে এক বিস্তৃত এলাকায় এর প্রচলন ছিল। তুরস্কের অত্যাচারে আর্মেনীয় ভাষার প্রভূত লোকক্ষয় ও ভৌগোলিক প্রসার সঙ্কুচিত হয়। আধুনিক আর্মেনীয় ভাষা সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্মিলনের অন্তর্গত একটি প্রজাতন্ত্র আর্মেনিয়ার রাষ্ট্রভাষা। পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র এই ভাষাভাষীদের এখন আর নেই। তবে রুশদের আশ্রয়ে এরা নিরাপদে আছে। তুর্কিরা এদেরকেও এশিয়া মাইনর থেকে লুপ্ত করেছে। এই ভাষার লোক-সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ। কলিকাতাবাসীর কাছে আর্মেনীয়রা সুপরিচিত।

(৫) আলবানীয় শাখার ভাষা আধুনিক আলবানীয় মাত্র সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সাহিত্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। সমস্ত ভারত ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এটি সবচেয়ে বিকৃতিপ্রাপ্ত ভাষা। তুর্কি ভাষার প্রভাবে এর বিশুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এ-ভাষার লোকসংখ্যা বিশ লাখের মতো।

(৬) বাল্‌তিক শাখার ভাষা দুটি: লিথুআনীয় আর লেট্। ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সমস্ত ভাষার মধ্যে লিথুআনীয় সব চেয়ে অপরিবর্তিত ও অবিকৃত আছে। আর কোন আধুনিক ভাষা এত প্রাচীনপন্থী নয়। লিথুআনীয় ভাষার প্রাচীনতাময় বিশেষত্বগুলো বিচার করলে মনে হয়, সম্ভবত লিথুআনিআ বা তার নিকটবর্তী কোন স্থান মূল ভারত-ইউরোপীয় ভাষার আদি বাসভূমি ছিল। প্রাচীনকালে এই ভাষা এক বৃহৎ এলাকায় প্রসারিত ছিল। কিন্তু এখন এর প্রচলন সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত ক্ষুদ্র লিথুআনিআ রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ। লিথুআনিআর বর্তমান ভাষা মূল ভারত ইউরোপীয় ভাষার আনুমানিক রূপের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। এর লোকসংখ্যা গত কয়েক শতাব্দীতে খুব কমে গেছে। এখন মাত্র তিন মিলিঅন লোক এই বাল্‌টিক সাগর-তীরবর্তী ভাষায় কথা বলে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগেও লিথুআনিআ রুশসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই দেশ লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ার সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। মধ্যবর্তী মাত্র ২০।২৫ বছর সময় এই ছোট দেশ তিনটি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পেরেছিল। লেট্ ভাষা লাট্‌ভিয়ায় প্রচলিত—মাত্র দু মিলিঅন লোকের ভাষা।

(৭) লোকসংখ্যার দিক থেকে ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর চতুর্থ বৃহত্তম শাখা হ'ল স্লাভিক। আত্লান্তিক সমুদ্রতীর থেকে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এই ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের অবস্থিতি। স্লাভ নরগোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠী এখন পৃথিবীর সর্বাধিক সম্প্রসারণশীল শক্তি; এ-ব্যাপারে চৈনিক ও ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এদের দুটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। উরাল-আলতীয়, ফিন্-উগ্রীয়, আর্মেনীয়, ককেশীয়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত, বাল্‌তিক প্রভৃতি নানা ভাষাগোষ্ঠীর এমন-কি ইতালিক ও দুর্ধর্ষ টিউটনিক গোষ্ঠীর ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতি আত্মসাৎ ক'রে স্লাভিক শাখার রুশ উপশাখা এখন বার্লিন থেকে বেরিং প্রণালী, চেলিউস্কিন্ অন্তরীপ থেকে পামির মালভূমি পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বাধিক বৃহৎ এলাকায় পৃথিবীর সর্বাধিক বৃহৎ রাষ্ট্র স্থাপন

করেছে। নিখিল স্লাভবাদ বা প্যান্‌-স্লাভিস্‌ম্‌ এখন নিখিল ইস্‌লামবাদ বা প্যান-ইস্‌লামিস্‌মের মতো প্রবল একটি শক্তি। এই শক্তির তাড়নায় আদ্রিআতিক সাগরের তীরে কয়েকটি স্লাভ জাতির মিলিত রাষ্ট্র ইউগোস্লাভিয়া গ'ড়ে উঠেছে। স্লাভ শক্তি কমিউনিস্‌মের গোঁড়া সমর্থক।

স্লাভিক ভাষাগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত :—

(১) পশ্চিম স্লাভিক (২) পূর্ব স্লাভিক (৩) দক্ষিণ স্লাভিক।

পশ্চিম স্লাভিক বিভাগের ভাষা তিনটি :—

(১) পোল (২) চেক (৩) স্লোভাক।

এই ভাষা তিনটির লোকেরা কিছু জার্মানভাষী এলাকা প্রথম মহাযুদ্ধের পর অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ ক'রে রাখায় ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এরা আরো বেশি জার্মান এলাকা অধিকার ক'রে রেখেছে।

পোলভাষীরা নিজেরাও একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্র পায় নি। রুশ উপশাখার লোকেরা তাদের রাজ্যাংশ হরণ ক'রে নিয়েছে। পোল ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য আছে যার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বিখ্যাত ভাষাবিৎ সুসাহিত্যিক হিরণ্ময় ঘোষাল। পোল ভাষীদের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটির মতো। জার্মানদের চেয়ে রুশরা পোল্যাণ্ডের ভাষা ও জনসংখ্যার বেশি ক্ষতি ক'রছে তার ভৌগোলিক আয়তন কমিয়ে দিয়ে। পোল্যাণ্ড পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র।

চেক ও স্লোভাক খুব কম লোকের ভাষা। প্রায় এক কোটি লোক চেক ভাষায় কথা বলে। স্লোভাকভাষীরা সংখ্যায় ৩৫ লক্ষের মতো। এরা দ্বিভাষীরাষ্ট্র চেকোস্লোভাকিয়া গঠন করেছে। কিন্তু এদের মধ্যে বিচ্ছেদপ্রবণতা আছে যার জন্যে অনেকগুলি সর্তানুসারে এই রাষ্ট্রযুগ্মকের কাজ চলছে। হিট্‌লার এদের চেকিয়া ও স্লোভাকিয়া নামে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। এখন অবশ্য এটি মিলিত স্বাধীন রাষ্ট্র।

পূর্ব স্লাভিক বিভাগের তিনটি ভাষা উল্লেখযোগ্য :—

(১) বৃহৎ রুশ বা রুশ (২) সাদা রুশ বা বিয়েলো-রুশ (৩) লাল রুশ বা রুথেনীয় বা উক্রেনীয় বা ছোট রুশ। রুশ ভাষা রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের ভাষা, সাদা রুশ বিয়েলো-রুশিয়া বা হোয়াইট রুশিয়ার ভাষা, রুথেনীয় বা লাল রুশ ইউক্রেন বা লিট্‌ল রুশিয়া বা উক্‌রাইনে প্রজাতন্ত্রের ভাষা।

রুশ উপশাখার ভাষা পুরাতন রুশভাষা থেকে বর্তমানে তিনটি আধুনিক রুশ ভাষা গড়ে উঠেছে। রুশ, সাদা রুশ আর উক্রেনীয়—এই তিনটি সংক্ষিপ্ত নামে এদের অভিহিত করা হবে। তিন' রুশজাতীয় ভাষার মধ্যে বৃহৎ রুশ ভাষীরা সবচেয়ে প্রতাপশালী। জারের আমলের মতো আজও এরা অন্য ভাষাভাষীদের দাবিয়ে রেখেছে। হিটলারের চেষ্টায় বিয়েলো-রুশিয়া আর উক্‌রাইনে রাষ্ট্র দুটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মস্কোর কবলমুক্ত হয়ে গঠিত হয়, যুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে রুশিয়ার সঙ্গে এ-দুটি রাষ্ট্রকেও সদস্যপদ দেওয়া হয় যার জন্যে উনো বা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে সোভিয়েট ইউনিঅনের ৩টি ভোট। U. N. O বা উনো-তে উক্‌রাইনে আর বিয়েলো-রুশিয়ার মর্যাদা যাই হোক, প্রকৃত পক্ষে তারা এখনও মস্কোর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র সমষ্টির অন্তর্গত অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের সামিল হয়ে আছে। রুশ জাতির মাতৃভাষা রুশের যে-প্রাধান্য সোভিয়েট ইউনিঅনে আছে, সাদা রুশ বা উক্রেনীয় ভাষার সে-মর্যাদা অবশ্যই নেই। তবে তারা নিজস্ব প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্য বা সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন ক'রে পররাষ্ট্র দপ্তরেও কতকটা স্বাধীনতা ভোগ করছে, যে সুবিধা বাকি ১২টি প্রজাতন্ত্র এখনও পায় নি।

রুশ ভাষার সাহিত্য অত্যন্ত জোরালো আর এর প্রসারও অতি ব্যাপক। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে রুশ ভাষার খাতির খুব বেশী। বৃহত্তম মাতৃভাষা হিসেবে বিশ্বে রুশের স্থান পঞ্চম। তা ছাড়া এরা সংহতভাবে একটি মাত্র রাষ্ট্রে একসঙ্গে বাস করে, যে-সৌভাগ্য ইংরেজি, স্পেনীয় ও জার্মান ভাষাভাষীদের নেই। সে-দিক থেকে উত্তর চৈনিক ও মার্কিনদেশীয় ইংরেজি ভাষীদের পরেই সংখ্যায় রুশভাষীদের স্থান।

তিনশো বছর আগে রুশ উপশাখা যখন ত্রিধাবিভক্ত হয়নি, তখন তাতে মাত্র ত্রিশ লক্ষ লোক কথা বলত; এখন রুশে দশকোটির কিছু বেশি, সাদা রুশে এক কোটির কিছু কম আর লাল রুশে চার কোটি বিশ

লক্ষ—মোট ষোল কোটি লোক কথা বলে। রিগা থেকে ভ্লাদিভস্তক পর্যন্ত দীর্ঘ ছ হাজার মাইল ভূখণ্ডের প্রসার বড় রুশ ভাষার। কিন্তু কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বাইরে রুশের তেমন প্রসার নেই, যেটা ইংরেজির আছে। রুশদের প্রজা বৃদ্ধি বিস্ময়কর। স্লাভ জাতিগুলির অফুরন্ত প্রাণশক্তির জন্যে এমন হতে পারে। বাধা না পেলে এক শতাব্দীর মধ্যে রুশরা দ্বিগুণ হতে পারবে।

দক্ষিণ স্লাভিক ভাষাগুলি মুখ্যত সংখ্যায় এই ক'টি :

(১) সার্ব (২) ক্রোট্ (৩) মাকেদোনীয় বা ম্যাসিডোনীয় (৪) স্লোভিন (৫) বুলগার।

সার্ব, ক্রোট্, মাকেদোনীয় ও স্লোভেনীয় ভাষা চারটি ইউগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রে ব্যবহৃত। ঐ রাষ্ট্রের সার্ব-ক্রোট প্রজাতন্ত্রের সার্বিআ প্রদেশে সার্ব, ক্রো... প্রদেশে ক্রোট, স্লোভেনিয়া প্রজাতন্ত্র স্লোভিন, মাকেদোনিআ প্রজাতন্ত্রে মাকেদোনীয় ভাষাগুলি ব্যবহৃত হয়, সার্ব ও ক্রোট প্রায় একই ভাষা; কিন্তু ক্রোট্ ভাষা রোমক লিপি ও বর্ণমালা ব্যবহার করে এবং ক্রোআশীয় বা ক্রোআশিআন জাতি ধর্মে রোমান ক্যাথলিক। হিটলার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ক্রোআশিআ প্রজাতন্ত্রকে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেন। যুদ্ধের পর গ্রিক লিপি ও বর্ণমালা ব্যবহারকারী গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের মতাবলম্বী সার্ব জাতি ক্রোটদের বাধ্য করে সার্বো-ক্রোআশীয় প্রজাতন্ত্রে যোগ দিয়ে ইউগোস্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে। মার্শাল তিতোর নেতৃত্বে গঠিত ইউগোস্লাভিয়া এখন একটি ত্রিভাষিক রাষ্ট্র. সার্ব-ক্রোট, মাকেদোনীয় আর স্লোভেনীয়, তিনটি (বা চারটি) ভাষাই এখন দক্ষিণ স্লাভদের এই রাষ্ট্রের সরাসরি ভাষা।

বুলগার ভাষা বুলগারিয়ার রাষ্ট্রভাষা। একদা বুলগারিয়া ও ইউগোস্লাভিয়াকে সম্মিলিত রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এখন আর সে-সম্ভাবনা নেই ; বরং তিতোর মৃত্যুর পর ইউগোস্লাভিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেও পারে যেমন ক্রোশিয়া আগে হয়েছিল। বুলগারদের সংখ্যা আট মিলিঅন। সার্ব ও ক্রোটভাষীদের সংখ্যা ষোল মিলিঅন। শ্লোভিনরা মাত্র দু মিলিঅন এবং ম্যাসিডোনিয়ানরা এক মিলিঅন।

ইতালিক ও টিউটনিক শাখার ভাষাগুলির মতো আন্তর্জাতিক প্রসার স্লাভিক ভাষাগুলোর নেই। স্লাভগোষ্ঠীর ভাষা হ'ল স্থলভাগে পাশাপাশিভাবে অবস্থিত অঞ্চলের ভাষা। সাগর পার হয়ে নতুন ভূখণ্ডে বসতিবিস্তারে এরা পারদর্শী নয়। এ-ব্যাপারে এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি ও লাতিনজ জাতিসমূহ অত্যন্ত বেশি কর্মতৎপর।

সাদৃশ্যের জন্যে অনেকে বাল্টিক ও স্লাভিক শাখা দুটিকে একত্র ক'রে বাল্টোস্লাভিক শাখারূপে বর্ণনা করেন।

(৮) টিউটনিক বা জার্মানিক শাখা ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বৃহত্তম শাখা। প্রায় ৫৫ কোটি লোকের মাতৃভাষা এই শাখার ভাষাগুলো।

টিউটনিক শাখার সর্ববৃহৎ ভাষা ইংরেজি। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মাতৃভাষা ইংরেজি। কিন্তু বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত ভাষা ইংরেজিই বটে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য বা ইউ, এস, এ, (U. S. A.) ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের যুক্তরাজ্য বা ইউ, কে, (U, K,), অষ্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যাণ্ড, লাইবেরিয়া, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত খাস শাসনাধীন বসতিগুলি—এই সব রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক এলাকা সমূহের প্রত্যেকটির প্রায় সমস্ত লোকের মাতৃভাষা ইংরেজি এবং এদের প্রত্যেকটির সরকারি ভাষা ইংরেজি। নিউজিল্যাণ্ডে মাওরি ভাষা অবশ্য স্বীকৃত ভাষা। কিন্তু অন্য এলাকাগুলিতে একমাত্র ইংরেজি রাষ্ট্রভাষা। কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে ইংরেজি অন্যতর সরকারী ভাষা; কানাডায় ইংরেজি প্রধান রাষ্ট্রভাষা এবং বেশির ভাগ লোক ইংরেজিভাষী; দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রেও ইংরেজি অন্যতর সরকারি ভাষা এবং ইংরেজরা সংখ্যায় বহু। তা ছাড়া ব্রিটিশ কমনওয়েল্থের অন্তর্গত প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্র অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ ইত্যাদি ডোমিনিঅন বা তথাকথিত প্রজাতন্ত্র সবগুলিতেই অন্যতম বা একমাত্র সরকারি ভাষা এখনও ইংরেজি। ইংরেজি প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের মাতৃভাষা।

এই শাখার দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ ভাষা জার্মান প্রায় বারো কোটি লোকের মাতৃভাষা। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম

মাতৃভাষা জার্মান। সংস্কৃতি গৌরবে ইংরেজি ও ফরাসীর পরেই জার্মানের স্থান। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, সুইটসারল্যাণ্ড ও লিখ্‌টেনস্টাইন রাষ্ট্রগুলির সরকারি ভাষা জার্মান। এই সব রাষ্ট্রে আট কোটিরও বেশি জার্মানের পাশাপাশি বাস। বাদ বাকি জার্মান আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের একটা খুব বড় অংশ এখন দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করে।

বর্তমানে তেউতোনিক বা জার্মানিক শাখার ভাষাগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় :—

(১) উত্তর জার্মানিক (২) পশ্চিম জর্মানিক।

উত্তর জার্মানিক উপশাখায় চারটি ভাষা :

(১) আইসল্যাণ্ডিক (২) নরওয়েজীয় (৩) ডেন বা দিনেমার (৪) সুইড।

পূর্ব গোলার্ধে আইসল্যাণ্ডের ভাষা ভারত-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের পশ্চিমতম অবস্থান সীমা নির্দেশ করে, যেমন অসমিয়া ভাষা করে পূর্বতম প্রান্ত নির্দেশ। আইসল্যাণ্ডিক ভাষার সাহিত্য একবার নোবেল পুরস্কার পেলেও এর লোকসংখ্যা দুলাখেরও কম। একটি দ্বীপে আবদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন ব'লে এর বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য গৌরবের খাতিরে এর নাম উল্লেখ করা গেল। উত্তর জার্মানিক উপশাখার চারটি ভাষার কোনটিরই বাইরের জগতে প্রচার নেই। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ভাষা তিনটির অর্থাৎ নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের ভাষার সাহিত্য গৌরব থাকলেও লোকসংখ্যা কম। নরওয়েজীয় ভাষায় চার মিলিঅন, দিনেমার ভাষায় পাঁচ মিলিঅন আর সোয়েডিশ ভাষায় আট মিলিঅন লোক কথা বলে।

পশ্চিম জার্মানিক উপশাখার দুটি বিভাগ আছে :—

(১) উচ্চ (২) নিম্ন। [ক্রমশঃ

অবিনশ্বর

কুমারী গীতা মুখোপাধ্যায়

জড় জগতের কালিমা ঘুচাতে
বিধাতা সৃজিল জীবে
জীবের মাঝারে আত্মা আসন
পাতিল সগৌরবে॥
জগতের হেতু বিশ্বস্রষ্টা
তিনিই পরম আত্মা
যুক্ত করিয়া অণু-পরমাণু
দিলেন যে সজীবতা॥
অন্ধ জগৎ চেতনা লভিল
বোধনের উৎসবে
পরম কারণ পুরুষ প্রকৃতি
দুই রূপে এ'ল ভবে॥
জীবের ভিতরে শিবের আলয়ে
সত্ত্ব রজঃ তম রয়।
মিলিত শক্তি এক করে দিল
জীবালয় শিবালয়।
যবে জীব তার কাজ শেষ করে
চলে যাবে ভবপারে
জয়-গৌরবে আত্মা রাজিবে
এ বিশ্ব পরাবারে॥

শান্তিনিকেতনের উৎসব ও ৭ই পৌষ

ডক্টর শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উপনিষদ বলেছেন, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।' আনন্দ থেকেই জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই জীবনের প্রকাশ, আবার আনন্দ নিয়েই জীবের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বের চতুর্দিকে দেখা যায়, আনন্দের লীলা চলছে সর্বত্রই। মানুষও যদি তার জীবনকে এই আনন্দস্রোতে সিক্ত করতে পারে, তবে আনন্দরসাস্বাদনই শুধু হবেনা হবে পরিণামে আনন্দময় পরম ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন। জীবন তখন হয়ে উঠবে প্রফুল্ল ও সার্থক। রবীন্দ্রনাথ এই আনন্দের সদা-জাগ্রত ভাব জাগিয়ে রেখে গেছেন শান্তিনিকেতনে উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশে উৎসব-অনুষ্ঠান তো বরাবরই ছিল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে একটি নূতন রূপ দিয়ে গেছেন ঋতু-উৎসবের মাধ্যমে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, শরৎকালে শারদীয়া পূজা, শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা, বসন্তকালে বাসন্তী পূজা ইত্যাদি পূজানুষ্ঠানের মধ্যে ঋতু-উৎসবই মুখ্য। শ্রীপঞ্চমী বা বাসন্তী পঞ্চমীতে বসন্ত ঋতুর যে-আবাহন জানানো হয় তারই শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করা হয় দোলপূর্ণিমায়। শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ঋতু-উৎসবের প্রবর্তন করায় উৎসবগুলি হয়ে উঠেছে সার্বজনীন ও স্বতন্ত্র মর্যাদা সম্পন্ন। একদিকে এতে যেমন ভাবরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে রচিত হয়েছে অজস্র গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি। নাটকাশ্রিত নানা রস-ব্যঞ্জনা উৎসবগুলিকে করে তুলেছে অতি অপূর্ব। কবিগুরু ছিলেন প্রকৃতির পূজারী; এই পূজোর অর্ঘ্য তিনি নিবেদন করেছেন নানাভাবে; মনের কথা অকপটে বলতে পেরেছেন এই সুযোগে। বিবিধ নৃত্যের মধ্য দিয়ে ঋতু পূজোর অন্তর্নিহিত ভাব হয়েছে অভিব্যক্ত; আর এই সুরুচি সমৃদ্ধ নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা। অভিনয়ে মেয়েদের যোগদানে উৎসব হয়ে উঠেছে অকৃত্রিম। বাইরে থেকে এ-বিষয়ে নানা বিরূপ সমালোচনা, বিরুদ্ধতা ইত্যাদি হলেও কবিগুরু তাতে কোনো কর্ণপাত করেন নি; কারণ তিনি জানতেন, কোনো বিষয়ে অন্তঃস্থলে প্রবেশাধিকার না জন্মালে কেবল বাইরে থেকে তার সমালোচনা করা নিরর্থক। সেজন্য তিনি নানা বিরুদ্ধাচরণ উপেক্ষা করে মনোমত কাজ চালিয়ে গেছেন। ঋতু-উৎসব কেবল নিছক আমোদ-আহ্লাদের মধ্যেই সীমায়িত নয়, তার স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি বসন্তের দক্ষিণ বাতাসকে মনে করতেন ঊর্ধ্বলোকের দৈববাণী, শালবীথিকায় শাখার আন্দোলনকে তিনি মনে করতেন সেই চিরন্তনের অনাহত বীণার অশ্রুত গানের সুর।

রবীন্দ্রনাথের মনে পৌরাণিক ঋতু-উৎসবের কথাও জাগরূক ছিল। এ-সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা হয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সঙ্গে। একবার রবীন্দ্রনাথ বর্ষার সময় আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না; তখন ক্ষিতিবাবু পৌরাণিক ধারা অনুসরণ করে বর্ষা-উৎসব করলেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে বিধুশেখর শাস্ত্রী, দীনুবাবু প্রভৃতি আশ্রম-বাসীরা সকলে একসঙ্গে বসে বর্ষার শ্লোক, কবিতা, গান ইত্যাদি নির্বাচন করলেন। মহাসমারোহে উৎসব সুসম্পন্ন হল।

আশ্রমের মুখ্য ঋতু-উৎসব হল বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব ও বসন্তোৎসব। বর্ষামঙ্গলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও দুটি উৎসব পরে যোগ করে দিয়েছিলেন ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে—তাদের মধ্যে অন্যতর বৃক্ষরোপণ। এর প্রয়োজনীয়তা কবিগুরু অনুভব করেছিলেন বহু আগের থেকে। তিনি বলেছেন, 'পৃথিবীর দান গ্রহণ করার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্রকে সে জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে

তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটির উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের আশ্রয়হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ।'

বাংলাদেশের চাষ-আবাদ বর্ষার উপরই নির্ভরশীল। বর্ষাগমের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের মনে যে আনন্দ ও প্রফুল্লতা দেখা যায় তা রবীন্দ্রনাথের চোখে উৎসবের রূপ ধারণ করে বলে তিনি এই সময় 'হলকর্ষণ' উৎসবের সূচনা করেন। উত্তরবঙ্গে অনুষ্ঠিত 'সীতা-উৎসব' এই হলকর্ষণেরই রূপান্তর।

পৌষ-উৎসব কিন্তু ঋতু-উৎসবের সঙ্গে যুক্ত নয়। পৌষ মাসের সাতই তারিখ শান্তিনিকেতনের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে আছে নানা কারণে। ১২৫০ সালের ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ব্রাহ্মধর্মব্রত গ্রহণ করেন; শান্তিনিকেতন আশ্রম-মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়েছিল ১২৯৮ সালের ৭ই পৌষ, রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিদেবের অনুমতি নিয়ে শান্তিনিকেতনে যে-দিন ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপন করেন সে-দিনটি ছিল ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ; মহর্ষিকৃত শান্তিনিকেতনের ট্রাষ্ট-ডিডে বৎসরে একটি মেলা বসানর কথা আছে, সেই মেলার উদ্বোধন হয় ৭ই পৌষ। সুতরাং আশ্রমজীবনের সঙ্গে এই দিনটি ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে আছে। সাতই পৌষের মেলায় যে-কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুপুরুষ এসে মেলাতে ধর্ম বিচার ও ধর্মালাপন করতে পারেন। এই উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, পৌত্তলিক আরাধনা, কুৎসিত আমোদ-প্রমোদ, মদ্যমাংস ব্যবহার ইত্যাদি নিষিদ্ধ। আশ্রমের ভাবের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ঘটানোও এই উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য। শান্তিনিকেতনের প্রথম সাংবাৎসরিক উৎসবের বিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল,—

"রাত্রি প্রভাত না হইতেই ব্রহ্মনামগানে গগন পরিপূরিত হইতে লাগিল। প্রাতে আট ঘটিকার পূর্বে সমাগত সাধু-সজ্জন-সকল মঠের অভিমুখে কীর্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চারিদিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। রক্তবর্ণ কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া দিনমণি সবেমাত্র আকাশে উদিত হইয়াছেন। এই সকল অনুকূল অবস্থায় সহজেই ত ঈশ্বরে মন সমাহিত হয়। তাহার উপরে 'চলো ভাই সবে মিলে যাই সবে পিতার ভবনে' এই সংকীর্তনের প্রত্যেক শব্দ যেন মর্মদেশ স্পর্শ করিতে লাগিল। বোধ হইল অসার সংসার ছাড়িয়া সত্য সত্যই আমরা সকলে প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যের যাত্রী হইয়াছি।... শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপবাবু উদ্বোধন উপাসনা ও বক্তৃতা করিলেন। অনাথ অন্ধ খঞ্জদিগকে দিবার জন্য এবৎসর পাঁচশত বস্ত্র, পর্যাপ্ত তণ্ডুল ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে মন্দিরের চারিদিকে সোপান শ্রেণীর উপর সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উপাসনা ভঙ্গ হইবার পরেই সকলে কীর্তন করিতে করিতে সপ্তচ্ছদ (ছাতিম) বৃক্ষের নিম্নে মহর্ষির সাধনা বেদীর দিকে চলিলেন। সেখানে বাবু কুঞ্জবিহারী দেব প্রমুখ কয়েকজন অনেকক্ষণ ধরিয়া সঙ্গীত ও সংকীর্তন করিতে লাগিলেন।...মধ্যাহ্নের পর মঠের ভিতরে রাজকুমারবাবুর সংকীর্তন আরম্ভ হইল।...সংকীর্তন শেষ হইতে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল।...সন্ধ্যার সময় আগন্তুক লোকসংখ্যার ইয়ত্তা রহিল না।...সন্ধ্যা ৬টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল। ভক্তিভাজন আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রদ্ধাস্পদ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ একত্রে বেদী গ্রহণ করেন। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন ও উপাসনা করিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপদেশ দিলেন ও পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ হিন্দিতে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করিলেন। বেদীর পার্শ্বদেশ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম কি বুঝাইয়া দেন। পরিশেষে বন্দনগীতি হইয়া উপাসনা ভঙ্গ হইল।"

(১৮১৪ শকের ৭ই পৌষ বুধবার)

এই সাতই পৌষ রবীন্দ্রনাথের কাছে যে কত মহিমময় ছিল তা জানা যায় তাঁর লেখা একাধিক চিঠিতে। এ বিষয়ে শ্রদ্ধাবান পাঠকের উপরই অনুসন্ধানের ভার রইল।

।।। নিরুদ্দেশ ।।।

[বড় গল্প]

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই ভাবেই সুখে দুঃখে দিন মাস এবং বছরও কেটে গেল বেশ কয়েকটা। মোট ক'বছর যে কেটেছিল তা রেণুর ঠিক খেয়াল নেই। নির্জ্জন নিস্তরঙ্গ জীবনে রেণু ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

বাবুদের বাড়ীতে ঢাকী ঢাক বাজাচ্ছে, রেণুর কানে এল সেই শব্দ। বর্ষা শেষ হয়ে এসেছে সেটা রেণু জানে, কিন্তু এবার পূজো কি এতই তাড়াতাড়ি!

রাত্রে শ্রীপতিকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বল্লেন, তাও জান না, কাল যে মহালয়া। আমি রোজ কুয়াতলায় দাঁড়িয়ে তর্পন করি দেখতে পাও না?

রেণু বলেছিল, তা বোধ হয় হবে।

সত্যি কথা বলতে কি, এতদিন এইভাবে বাস করে রেণুর কোন কিছু দেখা বা কোন কিছুর সম্বন্ধে কৌতুহলবোধটাও যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিল। চারখানা দেওয়াল ঘেরা বাড়ীর মধ্যে সে যেন এক মাটীর প্রতিমা, ভালবেসে এক একদিন শ্রীপতি বলত, গৃহলক্ষ্মী।

পূজোর ষষ্ঠীতে অন্যান্য বছরের মত শ্রীপতি একখানা শাড়ী নিয়ে দুপুরে এসেছিল। রেণু একবার বলেছিল, বিকেলে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাবে কি?

কি আর দেখবে, নতুন করে দেখার কি আছে? রেণু চুপ করে গিয়েছিল।

বিজয়ার পর একাদশীর দিন বিকালে শ্রীপতি বল্লে, কাপড় চোপড় পরে নাও, বড়বাবুকে নমস্কার করতে যেতে হবে।

প্রতি বছর এটাই হয়। একাদশীর দিন বিকালে রেণু বছরের মধ্যে এই একদিন সদর দরজার বাইরে যেতে পায়।

একগলা ঘোমটা দিয়ে রেণু পায়ে-পায়ে জড়াতে-জড়াতে শ্রীপতির পেছন-পেছন জমিদার বাড়ীতে গিয়েছিল। চেয়ারে-বসা একটা লোকের পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করতেই লোকটা বলেছিল, নারায়ণ নারায়ণ! প্রতি বছরেই এটা হয়ে থাকে।

গিন্নী এসে রেণুর হাত ধরে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। মিহিদানা, দরবেশ, পান্তুয়া খাইয়েছিল, রেণু কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে ও এখনও কনে-বউ সেজে ঘরের কোণে আত্মগোপন করে কেন থাকে সেই নিয়ে বাৎসল্যের সুরে অভিযোগ করেছিল এবং শেষকালে সেই গিন্নীই বলেছিল যে, মুহুরী মশাই মেলামেশা পছন্দ করেন না জানি কিন্তু তুমিও ত মানুষ—

রেণু অনেক চেষ্টা করে উত্তর দিয়েছিল, কি করব বলুন, উনি পছন্দ করেন না—

বছর পনের বয়সের এক সুন্দরী ফুটফুটে মেয়ে সেই ঘরেই তখন ছিল। সে বল্লে, উনি আসবেন কি করে দিদিমা, মুহুরী মশাই যে সারাদিন বাড়ীতে তালাবন্ধ করে রাখেন। আমি এ বাড়ীতে এসেই ওঁর কাছে যাবার চেষ্টা করেছিলুম যে।

মেয়েটির কথার কোন উত্তর না দিয়ে গিন্নী একটু বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, এখনও সেই ছবি? বুড়ো বয়সে বিয়ে করে বুড়োর নিশ্চয় ভীমরতি হয়েছে? রেণুকে লক্ষ্য করে গিন্নী বলেছিলেন, তুমি আপত্তি কর না কেন?

রেণু ধীরে ধীরে বলেছিল, উনি অসন্তুষ্ট হন—

সেই মেয়েটা প্রতিবাদের সুরে বলে উঠল, তা বলে কয়েদী না কি? জেলখানায় চাবিবন্ধ থাকবে?

গিন্নী নাত্নীকে বলেছিলেন, দেখ, দেখে শেখ্। 'পতি পরম গুরু' কথাটা মুখে বল্লেই শুধু হয় না, আমার এই মেয়ের মত স্বামীর কথা মনে প্রাণে পালন করে চল্তে হয়। ধৃতরাষ্ট্রের বউ গান্ধারী—

রাখ তোমার গান্ধারী, দাদামশাই তোমাকে যদি চাবি বন্ধ রাখে, তা হলে?

তাহলে তাই থাকব। ওরে এ জন্মে ত কোন সাধ-আহ্লাদই ওর হোল না, তবু যদি ধর্ম্মপথে থাকে তা হলে—

তাহলে পরজন্মে রাজা হবে, মেয়েটা শ্লেষ দিয়ে উত্তর কাট্‌লে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই যা, তোকে বেশী মোড়লী করতে হবে না, দিদিমা নাত্নীকে তাড়া দিলে। সে ঘরের বাইরে চলে গেল।

রেণুর খাওয়া হয়ে গেল। গিন্নী রেণুর মুখের দিকে, দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে বল্লেন, এবারে যেন ফ্যাকাশে-ফ্যাকাশে, কাহিল কাহিল দেখছি বউমা। তুমি কি, তুমি কি পোয়াতি না কি?

রেণু চুপ করেই ছিল। কোন উত্তর দেয় নি।

বহুক্ষণ ধরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানা প্রশ্ন করে গিন্নী বল্লেন, তাই ত বলি, আমি দেখেই ধরেছি। আহা ছেলে-মানুষ, গিন্নী-বান্নী বাড়ীতে কেউ নেই, তুমি আর জানবে কি?

আজ যেন রেণুর মনে জাগল এক নতুন অনুভূতি। সে মা হবে।

শুয়ে বসে সব সময় কেবলই মনে হয়, ছেলে কি রকম হবে। সুন্দর? কালো? মাথায় এক-মাথা চুল থাকবে, না ন্যাড়া-ওল হবে। মাগো মা সে কি বিচ্ছিরী! আচ্ছা ছেলে হবে, না মেয়ে হবে? মেয়ে বিচ্ছিরী, ছেলে চাই। মা দুর্গা, মা-কালী, আমার যেন ছেলে হয় মা। বেশ সুন্দর, ফুট্‌ফুটে, নরম তুলতুলে হাত-পা, ফোলা-ফোলা গাল, ভোমর-কালো চোখ—

অবসর বুঝে শ্রীপতিকে জানালো এই খবর। শ্রীপতি গম্ভীর কণ্ঠে বল্লে, হুঁ, আর একটা শত্রুর আসছে।

রেণু গুম্ হয়ে গেল।

শেষটা সেই ছেলেই হোল।

উঠানের ওপাশে পায়খানার গায়ে হোগ্‌লা দিয়ে ছাওয়া একটা অস্থায়ী কুঁড়ে ঘরে ছেলে প্রসব করিয়ে হাড়িনী দাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এক মুখ হেসে হাত ধুতে ধুতে বল্লে, কই গো মুহুরী বাবু, ভাল শাড়ী চাই, এক থালা রসগোল্লা চাই—

প্রহ্লাদের যে মেয়েটাকে আজ থেকে শ্রীপতির বাড়ী কাজ করার জন্য বহাল করা হয়েছিল সে তখন শাঁখে ফুঁ দিচ্ছিল।

আঁতুড়ের একুশটা দিন শ্রীপতি নিজেই ভাত ফুটিয়ে খেয়েছিল এবং ঐ ভাতই এক কাঁসি করে দূর থেকে আল-গোছে আঁতুড়ের দরজায় ফেলে দিয়ে আস্‌ত। তাতে ঘি-মরিচ কাঁচকলা ভাজাও থাকত। একাদশীর দিন মাছ দিতেও শ্রীপতি ভুলত না।

আঁতুড় শেষ হবার পর প্রহ্লাদের মেয়েটা আর দিন-রাত থাকত না, তবে রোজই সকাল বিকাল এসে কুয়া থেকে জল তুলে, বাসন মেজে, কাপড় কেচে দিয়ে যেত। রোদ্দুরে বসে বাচ্চাকে তেল মাখাত, রেণু শুধু রান্না করে নিত। সেই সঙ্গে আরও পরিবর্ত্তন হোল। সদরের দরজায় সারাদিনের তালাচাবি খুলে গেল এবং শ্রীপতির ঘরের মেঝের রেণু ও তার ছেলের বিছানার জন্য মাদুরের ওপোর তোষক পড়ল, একটা লেপও এসেছিল, তবে লেপখানা শ্রীপতি নিজে নিয়ে নিজেদের মোটা কাঁথাখানা মা ও ছেলেকে দিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে কেনা হোল একখান নতুন ডুরে-কাটা মশারী।

সেদিন শ্রীপতি বিকেলেই বাড়ী ফিরলেন। রেণু এখন খানিকটা চনমনে হয়ে উঠেছে। ছেলে হবার পর থেকেই সে যেন মনে মনে কথঞ্চিৎ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। শ্রীপতিকে সকাল সকাল বাড়ী ফিরে জামাপরা অবস্থাতেই বিছানায় শুয়ে পড়তে দেখে সে তক্তপোষের ধারে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছিল, এর মধ্যে শুলে কেন? কি হোল?

শ্রীপতি বলেছিল, জ্বর, ভয়ানক জ্বর হয়েছে।

সে কি গো? সভীত চিত্তে রেণু শ্রীপতির কপালে হাত দিয়ে দেখেছিল, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

শ্রীপতির অসুস্থতা রেণুর জীবনে এই প্রথম। এত-দিনের মধ্যে একবারও ওর শারীরিক অসুস্থতা দেখে নি।

চিন্তিত মুখে রেণু বল্লে, ডাক্তার ডাকতে পাঠাই। ঐ মেয়েটাকে দিয়ে—

শ্রীপতি বলেছিল না, এখনই একটা টাকা দিতে হবে, তারপর কি ছাইভস্ম ওষুধ দেবে, তার জন্যেও কিছু না হলে অন্ততঃ ছ'গণ্ডা পয়সা—

কিন্তু—

ও এমনিই সেরে যাবে। শ্রীপতি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিল।

একটু দুধ, বার্লি-টার্লি আনাই, রেণু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল।

শ্রীপতি খিঁচিয়ে উঠ্‌ল। না, না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু আনতে হবে না। তুমি যাও দিকি, নিজের কাজ কর গে—

চিন্তিত মুখে, ধীর পদে রেণু ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

এবং তিন দিন পরে শ্রীপতিকেও ঘর থেকে বার করতে হয়েছিল, দড়ির খাটিয়ায় শুইয়ে।

সেরেস্তার বাবুরাই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বড়বাবু ছোটবাবু দুজনেই এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হরিবোল দিয়ে শ্রীপতিকে নিয়ে ওরা যখন বেরিয়ে গিয়েছিল তখনই যেন রেণু প্রথম উপলব্ধি করেছিল, এই জনবহুল মানবসমাজে ওর কেউ নেই, কিছু নেই। দেড় মাসের কচি বাচ্চাকে কোলের ভিতর নিয়ে প্রায়-অন্ধকার দাওয়ায় উপুড় হয়ে বসে বসে হাপুস নয়নে কেঁদে কেঁদেও রেণু কোন কূল কিনারা পায় নি। থাকবে কোথায়, খাবে কি, কে দেখবে, ছেলে মানুষ হবে কি করে এই সব প্রাথমিক চিন্তার কোন মীমাংসাই সে পায় নি। খালি কেঁদেছে আর কেঁদেছে।

সেরেস্তা থেকেই বড় ছেলেকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল; সে কোন উত্তর দেয় নি। মামাকে জোড়া পোষ্টকার্ড পাঠিয়ে খবর এল, মামা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী, অর্থাভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না। আশার ক্ষীণতম আলোক-বিন্দু যেখানে যা ছিল সমস্তই শেষ, রেণুর সর্ব্বদিকে গভীর অন্ধকার।

শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থা বাবুরাই করে দিলে, তারাই এ ক'দিন হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপর? প্রজাদের মেয়েটা এ ক'দিন রাত্তিরে রোজই এ বাড়ীতে থাকত, কিন্তু সে যে ব্যস্ত হয়ে উঠছে, তা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। শ্রাদ্ধ চুকে যাবার দু'দিন পরে বাবুদের ঝি এসে রেণুর খবরাখবর নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, হ্যাঁ গা দিদি, আমাদের মুহুরী বাবু টাকা কড়ি কি রকম রেখে গেছেন?

ফ্যাকাশে চোখ তুলে রেণু বলেছিল. জানি না. বাড়ীতে কিছুই পাই নি।

গয়না গাঁটি?

হাত তুলে রেণু দেখিয়েছিল, দু হাতে দু'গাছা রুলি ছাড়া আর কিছুই নেই।

আর কিছু নেই?

না।

ওমা সেকি? বুড়ো বয়সে দোজবরের মাগ. হাড় কিপ্টে সুদখোর বুড়ো কিছু দেয় নি। তুমিই বা কি রকম মেয়েমানুষ, কিচ্ছুটি আদায় কর নি?

রেণু হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়ে, না।

তবে এখন মর।

রেণু নিরুত্তরে ঘাড় হেঁট করে বসেছিল।

ঝি বল্লে, মুহুরীবাবুর টাকা কিন্তু অনেক ছিল। বহু লোককে ধার দিত চড়া সুদে, কিন্তু সেই সমস্ত খত, হাতচিঠা, বন্ধকী গয়না সে সব কোথায়?

জানি না ত, রেণু উত্তর দিয়েছিল।

গলা নামিয়ে ঝি বল্লে, আমি জানি। সে সমস্ত আছে ঐ নায়েব বুড়োর কাছে, কিন্তু ঐ চশমখোর বুড়োর কাছ থেকে তুমি কি আদায় করতে পারবে? এদিক ওদিকে চেয়ে আরও গলা নামিয়ে বল্লে, ও বুড়ো ভারী শয়তান।

রেণু চুপ করে বসেই রইল, যেন শুনতেই পায় নি।

কিছুক্ষণ পরে ঝি বল্লে, আচ্ছা দেখি তোমার ব্যবস্থা কি করতে পারি। একটা ছেলে নিয়ে এভাবে ত দিন কাটবে না। নিজেকে বাঁচতে হবে, ছেলেকে মানুষ করতে হবে—ঝি ধীর পায়ে উঠে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

নীরন্ধ্র অন্ধকারে হতাশ পথিকের চোখের ওপোর বুঝি কোন্ দূরের অজ্ঞাত কুটীর থেকে ক্ষীণ এক আলোক শিখার হাত ছানি কেঁপে কেঁপে অল্পে অল্পে এসেছিল।

দু' দিন পরের সকালে রাজবাড়ীর বৃদ্ধ চাকরটা কিছু চাল ও তরকারী এনে রেণুর দাওয়ায় নামিয়ে দিয়ে বল্লে, বড়বাবু তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান গো, আজ বিকেলে যেতে পারবে?

আজ সকালে প্রজাদের মেয়েটা সেই যে বেরিয়ে গেছে, এখনও আসে নি। ছেলে কোলে নিয়ে রেণু বসে

বসে ভাবছিল, রান্না বাড়া কখনই বা করব, কাপড় চোপড় কাচা, জল তোলা, যাক্ গে, থাক্, আজ আর কিছু হবে না বোধহয়। ওর চোখ ঝেপে জল এসে পড়েছিল।

চাকরটা সদর ঠেলে উঠানে আসতেই ওর মনে হোল, যে-দরজা সব সময় চাবিবন্ধ থাকত, এখন সেই দরজা আর ভেতর থেকে বন্ধই হয় না। কি জন্য বন্ধ হবে, কার জন্যই বা বন্ধ হবে!

চাকরটা আর একবার বল্লে, আজ বিকেলে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে গো, বড়বাবু বলে দিয়েছে।

এতক্ষণে কথাগুলো বোধ হয় রেণুর কানে গেল। মুখ তুলে চেয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, করব।

তা হলে আমি কি লক্ষ্মীর মা যে হোক এসে তোমাকে নিয়ে যাব, তৈরী থেকো।

আচ্ছা।

বেলা তিনটে নাগাদ এসেছিল সেই লক্ষ্মীর মা। রেণুকে নিয়ে যাবার সময় ফিস্ ফিস্ করে বল্লে বড় বাবুকে ভাল করে বোলো দিদিমণি যে, মুহুরী বাবুর কাছে তুমি যেন শুনেছিলে যে, ওঁর অনেক টাকা নায়েব মশাইয়ের কাছে জমা আছে, সেই টাকায় তেজরাতি চলে। বুঝলে, বলতে ভুলো না, কিন্তু খবর্দার আমার নামও যেন কোরো না ভাই, তা হলে কিন্তু আমি তোমার শত্রুতা করব এটা মনে রেখ।

কাঁথা মোড়া শিশুটিকে বুকের ওপোর চেপে ধরে পায়ে চলা বাগানের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে রেণু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল, আচ্ছা।

সব শুনে বড়বাবু বলেছিলেন, নায়েব মশাইকে ডাক্ত রে—

নায়েব এসে সমস্ত কথা একেবারে উড়িয়ে দিলে। বল্লে, জমা দূরস্তর আমার কাছে শ্রীপতির ধার আছে বত্রিশ টাকা, আগুকার বার টাকা, আর ছেলে হবার সময় কুড়ি টাকা। আপনিই বলুন না বড়বাবু কটা টাকাই বা মাইনে সে পেত যে এখনকার এই লড়াইয়ের বাজারে মাগ্‌গি-গণ্ডার দিনে সংসার চালিয়ে টাকা জমাবে আবার ধার দেবে? এ কি সম্ভব?

বড়বাবু নায়েবের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলেন, কোন উত্তর দেন নি।

মুখে হাসি টেনে নায়েব বলেছিল, শ্রীপতি হয়ত দ্বিতীয় পক্ষের বউয়ের কাছে এইভাবেই নিজের ঐশ্বর্য্য দেখিয়েছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বড়বাবু বল্লেন, আচ্ছা বউমা, তুমি এখন যাও, দেখি তোমার কি ব্যবস্থা আমি করতে পারি। ব্রাহ্মণের মেয়ে, একটা শিশু নিয়ে—বড়বাবু চুপ করে গেলেন।

নায়েব বল্লে, ঘরখানার কথাও ওঁকে জানিয়ে দেওয়া উচিত ত বড়বাবু। শ্রীপতির জায়গায় যাকে নেওয়া হচ্ছে সেও যে ছেলে পরিবার নিয়ে এখানে থাকতে চাইছে।

বড়বাবু বল্লেন, জানি। কিন্তু বউমারও ত দাঁড়াবার জায়গা কোথাও নেই। আচ্ছা বউমা তুমি চাল ডাল ঠিক পাচ্ছ ত।

রেণু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

বড়বাবু বল্লেন, তা হলে তুমি এখন এস।

রেণু পায়ে পায়ে চলে এল। গিন্নীমার সঙ্গে সেদিন দেখা হয় নি।

পরের দিন বিকেলে লক্ষ্মীর মা এসে বল্লে, দিদিমণি, আজ থেকে রাত্তিরে আমি তোমার ঘরে এসে থাকব, গিন্নীমার হুকুম হয়েছে। ঐ মেয়েটা আর ক'দিন তোমার কাছে থাকবে বল, তাই গিন্নীমা আমাকে হুকুম দিয়েছে—

মেয়েটা চলে গেল। কিন্তু মেয়েটা রেণুর কাজকর্ম্ম যা করত, লক্ষ্মীর মা ত আর সে সব করবে না, দিনের বেলাও থাকবে না। জল তোলা, উঠান ঝাঁট দেওয়া এ সমস্তই রেণুকে করতে হবে, হয় বাচ্ছাকে ঘুম পাড়িয়ে, না হয়ত কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।

এইভাবে কাটল আরও বেশ কিছুদিন। পনর দিন, কুড়ি দিন একমাস, বেশীও হতে পারে। একটা দিনের সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের এমন কোন প্রভেদ নেই যে, রেণু মনে রাখতে পারবে কতগুলো দিন পার হল। রেণুর মন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল, শুধু এক একবার মনের দরজা খুলত, যখন ছেলেটি রেণুর কোলে চিৎ হয়ে শুয়ে হাত-পা নেড়ে খেলা করত। কিন্তু যেমনই মনে হোত বাচ্ছাটাকে একটা জামা পরালে ভাল হয় তখনই রেণুর দু'চোখ ভরে জল আসত। চার আনা পাঁচ আনার কমে একটা জামা

হবে না, কে তার ছেলেকে জামা দেবে? কোথায় পাবে পয়সা। শ্রীপতিবাবু বাড়ীতে যে কিছু রাখত না, এবং শেষ দিন সেরেস্তা থেকে বাড়ী ফিরে সেই যে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিল, তারপর আর জ্ঞান হয় নি। ওর জামার পকেটে ছিল এক বাণ্ডিল বিড়ি, একটা দেশলাই, আর নগদ সাড়ে তের আনা। সেই সাড়ে তের আনার সাড়ে বারো আনা কবেই শেষ হয়ে গেছে, কেবল স্বামীর পয়সা হিসাবে কি মনে করে রেণু শেষ আনিটি সিঁদুর কৌটার মধ্যে তুলে রেখেছিল, স্বামীর শেষ দানের স্মৃতিচিহ্ন রূপেই। বিড়িগুলো শ্রাদ্ধের পরে যে পুরোহিত শ্রাদ্ধ করেছিলেন রেণু তাকেই অর্পণ করেছিল, স্বামীর আত্মা যদি তাইতেই তৃপ্তি পায়।

সেদিন রাত্রে লক্ষ্মীর মা ঘরে শুতে এসে বল্লে, দিদিমণি, বড় বাবু বোধ হয় তোমার একটা ব্যবস্থা করেছেন। সত্যি, বড়বাবু মানুষ নন, দেবতা; আমাদের সকলেরই ওপোর ওঁর নজর আছে খুব!

কথাটা শুনে রেণুর প্রথমেই বেশ আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু সবটা শোনার পর কেমন যেন দমে গেল। কথায় কথায় লক্ষ্মীর মা বল্লে, বাবু আজ সদরে গিয়েছিলেন, সেখানে মুন্সেফবাবুর সঙ্গে তোমার বিষয়ে আলাপ হয়েছে। মুন্সেফবাবুরও তোমার মত একটি বাচ্ছা হয়েছে, কিন্তু মুন্সেফবাবুর বউ-এর নাকি ভয়ানক অসুখ। তিনি চান এমন একজন মেয়েছেলে যে তার বাচ্ছাকে বুকের দুধ দিতে পারবে। তা তুমি যদি সে বাড়ীতে যাও তাহলে খাওয়া পরা, মাইনে সবই পাবে, বাড়ীর লোকের মত থাকবে, মুন্সেফবাবুর ছেলেকে দুধ দেবে আর তোমার ছেলেও মানুষ হবে।

রেণুকে নিরুত্তর দেখে লক্ষ্মীর মা বলেছিল, কেমন? ভাল না? তোমার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। তা ছাড়া তোমার বুকে দুধ ত কম নেই, খোকাটা একা খেয়ে উঠতে পারে না। কি বল?

রেণু ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, তারা কি?

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ না হলে বড়বাবু তোমাকে দেবে কেন? ব্রাহ্মণ ছাড়া তারাই বা রাখবে কেন?

কিন্তু সে বাড়ীর লোক সব কেমন, কি রকম ব্যবহার করবে—

ভাল গো ভাল। শিক্ষিত ভদ্দরলোক সব, অত বড় মুন্সেফ, মানে হাকিম, সেখানে কোন অসুবিধা হবে না। আর তুমিও ভাই এমন সুন্দরী নও যে, তেনারা তোমাকে দেখে একেবারে হামলে পড়বে। আর যদি পড়েই—লক্ষ্মীর মা ওর দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাস্‌তে লাগল।

লজ্জায় রাঙা হয়ে রেণু বল্লে, তা বলছি না, মানে আর সমস্ত কাজও করতে হবে ত। রান্না করা, বাসন মাজা, এই সব? রেণুর মনে পড়ল মামার বাড়ীর দেশে ঘোষেদের বাড়ীর কথা। ঘোষেরা ছিল মামার যজমান, সে বাড়ীতে মামার সঙ্গে রেণু আর রেণুর মামাতো বোন দুটো একসঙ্গে তিনজনে দু'তিন দফে গিয়েছিল 'কুমারী' হবার জন্য। সেই ঘোষেদের বাড়ীতে এক বুড়ী ছিল, বামুন দিদি। একটু কুঁজো হয়ে গেলেও বুড়ী একা-হাতে মুখ-রগড়ে সমস্ত কাজ করত। ধান সিদ্ধ করা, ধান ভানা, গরুর জাব দেওয়া থেকে অতগুলি লোকের যাবতীয় রান্না, পরিবেশন করা সমস্তই সেই বামুন দিদি। কেবল এঁটো বাসন মাজা এবং ছাড়া কাপড় কাচা এই দুটো কাজ সে বামুন বলে তাকে দিয়ে করানো হোত না। এখানে মুন্সেফবাবু যখন বামুন তখন হয়ত ঐ সব কাজও তাকেই করতে হবে। তা হলে রেণুকে এবার ঝি খাটতেই বেরুতে হোল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে শিশুটিকে কোলের ভেতর নিয়ে রেণু গেল রাজবাড়ী। বড়বাবুর কথায় সায় দিয়ে ফিরে এল। বড়বাবু বল্লেন শুভস্য শীঘ্রম, তুমি তাহলে আজই দুপুরে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া শেষ করে বেরিয়ে পড়বে, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

সুখে দুঃখে মেশানো এতদিনের বাড়ীখানি ছেড়ে যেতে রেণুর চোখ ভরে জল এল। গত কয়েকটা বছর ধরে এই বাড়ীর প্রত্যেকখানি ইট, কাঠ, জানলা, দরজা, কুলুঙ্গী, পাতকুয়া, তক্তপোষ, জলচৌকী, সবের সঙ্গে তার যে এত অন্তরঙ্গতা হয়েছে তা সে আজ প্রথম উপলব্ধি করলে। ঐ কলাগাছ, লঙ্কাগাছটা পর্য্যন্ত যে তাকে এত ভালবাসে, এত আকর্ষণ করে তা সে একঘণ্টা আগেও এমন ভাবে জানতে পারে নি। একটু আগে বড়বাবুর চাকর এসে তোষক লেপ মশারী কাঁথা বালিশ

বাসনপত্র সমস্ত দিয়ে এক বড় বিছানা বেঁধে দিয়েছে, দেওয়ালের ছবিগুলো খুলে আর একটা পুঁটলি করে দিয়েছে এবং পোটমাণ্টো দু'টো গুছিয়ে নিয়েছে রেণু নিজে। কি আর আছে পোটমাণ্টোয়! গোটাকতক পুরানো কাপড় জামা, কয়েকটা ছেঁড়া ছেঁড়া বই, চাট্টিখানি কাগজ যেগুলো শ্রীপতির মৃত্যুর পর বড়বাবুর কাছে নিয়ে গিয়ে রেণু দেখিয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন, ওগুলো কিছু নয়, দেশের জমি জায়গার কাগজ, কিন্তু ও নিয়ে সতীনপো'দের সঙ্গে বিবাদ কলহ করে রেণু কিছুই করতে পারবে না। কাগজগুলো বড়বাবু ফেরৎ দিয়েছিলেন, রেণু কিন্তু সেগুলো প্রাণ ধরে ফেলতে পারে নি। বাক্সতেই রেখে দিয়েছিল।

খাবার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই লক্ষ্মীর মা এ বাড়ীতে এসে ছেলে কোলে নিয়ে তদারক করছিল আর রেণু যতটা পারে গুছিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ লক্ষ্মীর মা বল্লে, দিদি—

কি?

একটা কথা বলব?

রেণু ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এত সমীহ, এত ভণিতা কিসের?

লক্ষ্মীর মা বল্লে, দুটো পোটম্যাণ্টো নিয়ে কি করবে তুমি, একটা আমাকে দিয়ে যাও। তোমার কথা আমার মনে থাকবে।

আচ্ছা নাও, রেণু ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলে।

ঐ পুরাণোটাই দিও দিদি, নতুনটা তোমার থাক।

কি যেন ভেবে রেণু বল্লে, না দিদি, নতুনটাই তুমি রাখ।

রাগ হোল বুঝি? লক্ষ্মীর মা ক্ষুণ্ণ মনে জিজ্ঞাসা করলে।

না দিদি, রাগ করব কেন? নতুনটা আমার জিনিষ, বিয়ের সময় উনি আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু পুরানোটা ওঁর। আমার জিনিষ আমি যাকে ইচ্ছে দিতে পারি, কিন্তু ওঁর জিনিষটা থাক, যদি ঐ গুড়োটুকু বেচে বর্তে থাকে তাহলে বাপের জিনিষ বলে আর কিছুই ত পাবে না, ঐ পোটমাণ্টোটা—বলতে বলতে রেণুর চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে এল।

লক্ষ্মীর মার নতুন পোটম্যাণ্টোর ওপোরই লোভ ছিল বেশী, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে তার বাধছিল। খুসি মনে বল্লে, যা ভাল বোঝ দিদি।

রেণু নিজের তোরঙ্গর জিনিষগুলো বার করে শ্রীপতির তোরঙ্গয় ঠেসে ঠেসে পুরে নিলে। লক্ষ্মীর মা বল্লে, ঐ ছেঁড়া কাগজের পুটলীটা তোমার কি হবে, ওগুলোকে—

রেণু বল্লে, যার জিনিষ সে বড় হয়ে ওগুলোকে নিয়ে যা হয় করবে, আমি কেন ওগুলো নষ্ট করে দোষী হব ভাই।

বড়বাবু গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করেছিলেন। এখান থেকে ষ্টেশন প্রায় তিন মাইল। বাবুদের চাকরই বাক্স, বিছানা, পুঁটলী সমস্তই গাড়ীতে চাপিয়ে দিলে। এক গলা ঘোমটা দিয়ে রেণু বড়বাবুর চেয়ারের কাছে এগিয়ে গিয়ে ন্যাকড়া-জড়ানো ছেলেটাকে বড়বাবুর পায়ের কাছে শুইয়ে দিতেই ছেলেটা কেঁদে উঠেছিল। বড়বাবু ব্যস্ত হয়ে পা গুটিয়ে নিয়ে আর্ত্তকণ্ঠে বল্লেন, ছি ছি ছি, বালক নারায়ণ, ওকে পায়ের কাছে ঐ ভাবে শোয়াচ্ছ তুমি?—নারায়ণ, নারায়ণ—

গিন্নীমা নিজে হেঁট হয়ে তাড়াতাড়ি শিশুকে কোলে তুলে নিল, বল্লে, এ কি আমাদের কম আদরের জিনিষ বউমা, আমাদের শ্রীপতির ছেলে. কিন্তু কি করবে মা, রাখতে ত পারব না।

উপুড় হয়ে বড়বাবু ও গিন্নীমাকে রেণু প্রণাম করলে। বড়বাবু বল্লেন, হাঁারে, আমাদের নতুন মুহুরী কোথায়?

মুহুরী ছিল বারাণ্ডায়। সে ঘরে আসতেই বড়বাবু বল্লেন, শ্রীপতির তক্তপোষটা কি তুমি নেবে?

সে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

বড়বাবু বল্লেন, ওটা শ্রীপতির নিজের পয়সায় কেনা। বউমাকে তুমি ওর দামটা দিয়ে দাও।

সে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

কত দেবে? বড়বাবু প্রশ্ন করলেন।

সে জিজ্ঞাসুনেত্রে বড়বাবুর দিকেই চেয়ে রইল।

বড়বাবু বল্লেন, শ্রীপতির কাছে যেন শুনেছিলুম ওটা তৈরী করতে তিনটাকা খরচ পড়েছিল। তা পুরানো হয়ে গেছে ত? তবে আজকাল মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারে ঐ রকম একটা তৈরী করতে পাঁচ টাকার কম হবে না। তা তুমি বউমাকে আড়াই টাকা, আচ্ছা দু'টাকাই দিয়ে দাও।

চাকরের দিকে চেয়ে বল্লেন, হ্যাঁরে, ও ঘরে আর কিছু জিনিষ রইল কি ?

চাকর বল্লে, না। জল-চৌকীটা চাকরের নজরে বোধ হয় পড়ে নি, কিম্বা সেটা হয়ত তারই নেওয়ার ইচ্ছে ছিল।

নতুন মুহুরীর দিকে চেয়ে বড়বাবু বল্লেন, হাতে না থাকলে সেরেস্তা থেকে দু'টাকা ধার করে বউমাকে এখনই দিয়ে দাও, আর নায়েব মশাইকে বল, শ্রীপতির শেষ পাওনা যা ছিল তা যেন বউমাকে এখনই আমার সামনে দিয়ে যায়।

মুহুরী চলে গেল।

সেই তখন থেকে ঠায় বাচ্চাকে কোলে নিয়ে গিন্নীমা দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছেলেটাও গিন্নীমার কোলে পরম আরামে যেন ঘুমিয়েই পড়েছিল। রেণু হাত বাড়াতে গিন্নীমা বল্লেন,চল না,একে গাড়ী অবদি তুলে দিয়ে আসব।

মুহুরী এবং নায়েব দু'জনেই ঘরে এসে ঢুকল। মুহুরী দু'টি টাকা আলগোছে রেণুর হাতে দিয়ে দিলে। নায়েব রেণুকে লক্ষ্য করে বললে, শ্রীপতির পাওনা ছিল হিসেব মত আট টাকা সাড়ে সাত আনা, তা বড়বাবুর কথামত আমি এই পুরো দশ টাকাই দিচ্চি। নিয়ে নাও মা।

রেণুর হাতে মুহুরীর দেওয়া টাকা দুটো ছিল। সেই সমেত হাতটা বাড়িয়ে দিলে নায়েবের দিকে। ওর হাতটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। সেই কাঁপুনি ও চেষ্টা করেও থামাতে পারলে না।

বড়বাবু বললেন, দিনকাল বড়ই খারাপ বউমা, ভাল করে পেট কাপড়ে বেঁধে নাও টাকাগুলো। আর তোমার সঙ্গে আমাদের লোক দিচ্চি, সে তোমাকে মুন্সেফ সরোজ-বাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। গাড়ীভাড়া-টাড়া যা কিছু সেই সমস্ত দেবে, তোমাকে কিছু খরচ করতে হবে না। সেখানে গিয়ে তাদের মন যুগিয়ে থেক! আর কি বলব বল, বরাতে যা ছিল তা ত হয়েই গেল, এখন ছেলেটাকে মানুষ করার চেষ্টা কর এবং শেষ কথা.— সৎ পথে, ধর্ম্মপথে থাকবে।

এই যাবার সময় রেণু বড়বাবুর সামনে জীবনের মত প্রথম কথা বলেছিল। শ্লেষ্মাজড়িত বিকৃতকণ্ঠে রেণু বলে-ছিল, সেই আশীর্ব্বাদই করুন বাবা, যেন—সে আর কিছুই বলতে পারে নি।

বড়বাবু কোন আশীর্ব্বাদই করেন নি অভ্যাসমত বলে-ছিলেন, নারায়ণ, নারায়ণ।

গরুর গাড়ীতে রেণুর কোলে বাচ্চাকে দিয়ে গিন্নীমা নিজের আঁচল খুলে পাঁচটি টাকা নিয়ে রেণুর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, বলার কিছু নেই বউমা, অন্নপ্রাশনের সময় ছেলের গায়ের জামা কিনে দিও।

গিন্নীমার নাতিটা বরাবর ঠাকুরমার পাশে পাশেই ছিল। সে বললে, ঠাকুরমা, সবাই সব কিছু দিলে, আমি কি দেব, বলেই এক দৌড়ে বাড়ীতে গিয়ে ঢুকল।

গাড়ী ছেড়ে দিলে। রেণু চোখে আঁচল চাপা দিয়ে অঝোরে কাঁদছে এমন সময় গিন্নীমার নাতি একটা কাঁচের হাতি নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে বললে, গাড়োয়ান দাঁড়াও, দাঁড়াও।

গাড়োয়ান গাড়ী রুখলে। ছেলেটা পেছন থেকে রেণুকে লক্ষ্য করে বল্লে, ওগো, ওগো, এই হাতিটা খোকাকে দাও —এই হাতিটা। ছোট্ট ফরসা হাতখানি তুলে সে হাতিটা এগিয়ে ধরলে রেণু হাত বাড়িয়ে পুতুলটা নিলে। হাতিটা কালই সদর থেকে বড়বাবু নাতির জন্য এনেছিলেন। হাতিটা নাতির দারুণ পছন্দও হয়েছিল। খুড়তুত বোনেরও ঐ হাতিটা পছন্দ হয়েছিল। ঐ হাতির আধিকার নিয়ে গত সন্ধ্যেয় ভাই-বোনে ভীষণ মারামারিও হয়ে গেছে। কিন্তু আজ সেই অত সাধের হাতিটা স্বেচ্ছায় হাতছাড়া করে খোকা যেন মনে প্রাণে তৃপ্তি অনুভব করে ঠাকুরমার পাশে এসে দাঁড়াল। ঠাকুরমা ওর একমাথা চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে যতক্ষণ দেখা যায় চলন্ত গাড়ীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ীটা পথের বাঁকে অদৃশ্য হলে নাতির হাত ধরে বাড়ীতে ঢুকলেন। কেমন যেন অজান্তেই তাঁর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল।

ষ্টেশনে এসে রেলে উঠে বর্দ্ধমানে নেমে মুন্সেফ সরোজ গাঙ্গুলীর বাড়ী খোঁজ করে সেখানে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। বড়বাবুর চাকর বরাবরই সঙ্গে ছিল।

বড়বাবুর লেখা চিঠিখানা চাকরের হাত থেকে নিয়ে মুন্সেফবাবু পড়ে গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা দেওয়া জড়সড় রেণুর দিকে চেয়ে বল্লেন, তোমার নাম কি ?

ঘোমটার ভেতর থেকেই উত্তর এল,—রেণু।

রেণু। আচ্ছা আমার এখানে কি কাজ সব শুনেছ ত ?

রেণু ঘাড় নাড়লে।

কে আছে তোমার ?

রেণু চুপ করে রইল। বড়বাবুর চাকর উত্তর দিলে, বল্লে, আছে অনেকেই, কিন্তু আপন বলতে কেউ নেই।

মুন্সেফবাবু ঘাড় নাড়লেন, বল্লেন, মন টিকিয়ে থাকতে পারবে ত ?

রেণু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

সরোজ বল্লে, খাওয়া-পরা যা কিছু দরকার সমস্তই পাবে, ছেলেকেও মানুষ করে তুলবে, এর ওপোর মাইনে কি চাও বল।

রেণু ছেলেকে বুকের ওপোর টিপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। কোন উত্তর দিলে না।

কই রেণু, মাইনের কথা বল্লে না ?

রেণু নিরুত্তর। বড়বাবুর চাকর বল্লে, উনি আর কি বলবেন, আপনি যা ঠিক করবেন, তাই হবে।

সরোজবাবু চাকরের দিকে চেয়ে বল্লে, ও, আচ্ছা ঠিক আছে।

গাড়োয়ান বাইরে থেকে ডাক দিলে। সরোজ বল্লে, কে ওখানে, ডাকে কে ?

চাকরটা ব্যস্ত হয়ে বল্লে, গাড়োয়ান। আমি যাচ্ছি।

মালপত্র দেখে সরোজের একটু শ্রদ্ধা হোল। যাক্, রেণু তাহলে একেবারে রাস্তায় পড়ে-থাকা মেয়ে মানুষ নয়।

রেণুকে দেখে মুন্সেফ গৃহিণীর পছন্দও হোল, আবার বিরক্তিও হোল। দেখতে কালো-কালো হলেও বয়েসটা নেহাতই কম। আর একটু বেশী বয়স হলেই যেন ভাল হোত।

হ্যারিকেনের আলোয় ওর দিকে দেখতে দেখতে বিছানায় শুয়ে-থাকা মহিলাটি প্রশ্ন করেছিল, এই কি তোমার প্রথম ছেলে বুঝি ?

রেণু সায় দিয়েছিল, হ্যাঁ।

ক'মাস হোল ?

আড়াই মাস, না বোধহয় তিন মাস।

স্বামী গেছে কতদিন ?

দু'মাস হবে।

আহা।

রুগ্ন শরীরে আর বেশী কথা সে কইতে পারলে না। চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে রইল।

রেণু দেখলে সাত আট বছরের একটি ছেলে ও বছর চারেকের একটি মেয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক বুড়ী ঝি আছে এ বাড়ীতে, রান্নাঘরে একটা রাঁধুনীও আছে বুড়ো গোছের। বাবুর ঘরের পাশের ঘরখানায় ঝি থাকে, দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজাও আছে। সেই ঝিয়ের ঘরে রেণুর জিনিষপত্র তোলা হোল।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার রোগিনীকে দেখে চলে যাওয়ার পর সরোজবাবু রেণুকে ডেকে বল্লেন, স্নান-টান সেরে নিয়েছ, জল খাওয়া হয়েছে ?

রেণু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সরোজ বললে, দেখ রেণু, ঐ সব অত করে ঘোমটা দেওয়া আমরা পছন্দ করি না। যখন যা জিজ্ঞাসা করব চট্‌পট্ উত্তর দেবে, কাজ-কর্ম্ম যা থাকবে সাঁ সাঁ করে হাত চালিয়ে করে নেবে। মনে করবে এটা তোমার নিজের বাড়ী, এইভাবে চল্‌বে, বুঝলে।

রেণু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চান-টান হয়নি তোমার, না কি ?

রেণু অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিলে, না।

সরোজ বললে, না কেন ? বিছানা-টিছানা খুলে ঐ ঘরের মেঝেয় পেতে ফেল। তোমার ছেলেকে ধুইয়ে মুছিয়ে বেশ করে খাইয়ে শুইয়ে দাও। তারপর নিজে চান করে কাচা কাপড় পরে রান্নাঘরে যাও, যেয়ে কিছু খেয়ে নাও। নিয়ে তোমার নতুন ছেলেটিকে দেখ। আজ থেকে তুমি আমাদের বাড়ীর মেয়ে, বুঝলে। এবং তোমার ঐ একটি ছেলে যে আছে, মনে কোরো ও আর একটি নয়, এবার তোমার দু'টি ছেলে হোল। এই ভাবে মিলে মিশে থাক, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ যে তোমাকে ডেকে খাতির করবে তা মনে কোরো না।

কথাগুলো বলেই সরোজ বাইরের ঘরে চলে গিয়েছিল।

রেণুর ছেলে খোকা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সরোজের ছেলেকে কোলে নিয়ে রেণু এসে রোগিনীর শয্যাপ্রান্তে বসে বুকের দুধ দিচ্ছিল। ছেলেটা পরম আনন্দে সরু সরু পা দুটো নাড়তে নাড়তে যেন অমৃতবোধে

বক্ষদুগ্ধ পান করছিল। রোগিণী তৃপ্তিসুখে হ্যারিকেনের আলোয় ঐ দৃশ্য দেখছিল।

কিছুক্ষণ পরে রোগিনী বল্লে, কবে যে সেরে উঠব জানি না। কিন্তু আজ থেকে ঐ ছেলেটা তোম রই হয়ে গেল। তুমি ওর নতুন মা হলে। একটু চুপ করে থেকে বল্লে,না রেণু, তুমি ওর বড় দিদি। আমাকে মা বলে ডেক, আর—আর ওঁকে বাবা বোলো, কেমন?

শীর্ণ মুখের ওপোর দুটি মাত্র বড় চোখই ওর সম্বল। সেই চোখ দুটি নিঃস্ব রেণুর দিকে তুলে ধরে মুন্সেফ গৃহিণী যেন ওর কাছে দীনাতিদীন এক প্রার্থী মাত্র।

রেণু বলেছিল, আচ্ছা মা, তাই হবে?

এবং তাই হয়েছিল। কিন্তু একমাস ধরে যমে মানুষে টানাটানি করেও মানুষ জয়লাভ করতে পারে নি। তিনটি ছেলে ও স্বামীকে রেণুর হাতে ছেড়ে দিয়ে মুন্সেফ-গৃহিণী সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন।

মৃতার মুক্তকল্পে যৎসামান্য শ্রাদ্ধও হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে সরোজের বোন ভগ্নীপতি এবং তাদের আধ ডজন ছেলেমেয়ে এল। সরোজের শ্বশুর বাড়ী থেকে শালা শালীরাও এসেছিল। কয়েকদিন থেকে তারা চলেও গেল। বাড়ীতে রইল রেণু, ঝি এবং রাঁধুনী। সরোজের সংসার এখন থেকে নিস্পর নিয়ে সুরু হোল।

এই এক মাসের বিপদ এবং পরের দিনের ঝামেলায় রেণু এ বাড়ীর প্রায় সকল সমস্যার সঙ্গেই বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গিয়েছিল। যদিও সরোজের দিদি রেণুকে ভাল চোখে দেখে নি এবং প্রকাশ্যেই সরোজকে বলেছিল, ওটাকে আর কেন, বাচ্চাটা বরং আমি নিয়ে যাই। আমার ত এতগুলো রয়েছে, এটাও ওদের সঙ্গে মানুষ হবে। তাতে তোমার খরচও কম হবে, আর—

সরোজ বলেছিল, আর কি?

দিদি বললেন, আর সবই ত বোঝ। বাড়ীতে কোন মেয়েলোক রইল না, অথচ একটা বাইরের সোমত্ত মেয়েমানুষ রইল, এতে পাঁচজনে পাঁচ রকম কথা বলতে সুবিধে পাবে। সেটা হতে দেবে কেন?

সরোজ বলেছিল, ভেবে দেখি, তাই যা হয় করা যাবে।

সরোজের শালা শালীরা এসব কথায় ছিল না।

এর পর সরোজের দিদি কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রেণুকেও বলেছিল। রেণু এই দেড় মাসে অনেকটা সপ্রতিভ হয়ে উঠেছিল। আগে হলে এরকম কথায় সে চুপ করেই থাকত, এখন বললে, ঠিক আছে, আপনাদের অসুবিধা হলে বলে দেবেন,অন্য কোথাও কাজ দেখে নেব।

কিন্তু সরোজ তাকে কিছুই বলে নি। নিয়মভঙ্গের তিন দিন পরে দিদি খাবার সময় রেণুকে শুনিয়ে শুনিয়েই সরোজকে বল্লেন, যা হয় তুই তা হলে আমাকে খবর দিস্, আমি এসে খোকাকে নিয়ে যাব। মিছামিছি একটা বাচ্ছার জন্য এই খরচ করে একটা বাইরের লোক পোষবার দরকার কি?

সরোজ বলেছিল, আচ্ছা।

সন্ধ্যের সময় সরোজ ছেলেমেয়ে নিয়ে খেতে বসেছিল, ঠাকুর ভাত তরকারী দিয়ে রান্নাঘরে গেছে। সরোজের মেয়েটা ভাতে হাত দিয়ে চুপ করে বসেই রইল।

সরোজের নজর পড়তেই সে বল্লে, বসে আছিস্ কেন রে, খা। চুপ করে হাত গুটিয়ে বসলি কেন, ঘুম পেয়েছে?

সে কোন কথাই কইলে না।

সরোজের বড়ছেলে অলক বল্লে, বাবা-বাবা, বলব? ও রাণী ভিক্টোরিয়া হয়েছে। ওকে খাইয়ে না দিলে খেতে পারে না।

পুরানো কথা সরোজের মনে পড়ে গেল। ওর মা যখন ভালো ছিল সেই তখনই তিনি মেয়ের এই বদ্ অভ্যাসটি করিয়েছিলেন। হতাশ হয়ে সরোজ বললে, এখন আর কে খাওয়াবে বল? পিসিও চলে গেল। নিজে নিজেই—

বাধা দিয়ে অলক বললে, কেন বাবা, দিদি ওকে দু' একদিন খাইয়ে দিয়েছে। দিদিকে ডাকব?

দিদি? কে রেণু? সে বুঝি ওকে খাইয়ে দেয়।

অলক বললে, হ্যাঁ বাবা। বলেই বাবার অপেক্ষা না রেখে হাঁক দিলে, দিদি, অপুকে খাইয়ে দাও।

রেণু বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওর এখন হাত খালি, দুটো বাচ্ছাই ঘুমিয়েছে। অলক পুনরায় ডাক দিলে, দিদি।

পায়ে-পায়ে রেণু ঘরে ঢুকল।

সরোজ বল্লে, তুমি ওকে খাইয়ে দাও বুঝি?

কি করব! না হলে ও মোটেই খায় না যে। তাই মা বলেছিলেন—

তা হলে তাই বসে খাইয়ে দাও।

সরোজের ডান পাশে ছেলে বাঁ পাশে মেয়ে খেতে বসেছিল। রেণু মেয়ের বাঁ পাশে বসে খাওয়াতে পারে না, তাহলে উল্টো হয়। অথচ মেয়ের ডান দিকে বসে খাওয়াতে হলে সরোজের একেবারে পাশেই বসতে হয়। ইতস্তত করে অপর্ণার থালাখানা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে সে বিরক্ত হয়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

সরোজ বল্লে, কি হোল ? চট্‌ছে কেন ?

রেণু বল্লে, থালা সরাতে দেবে না, এই আর কি ?

সরোজ বল্লে, ছি অপু, ওরকম করতে নেই। দিদি খাইয়ে দেবে, তুমি তার কথা শোন, অবাধ্য হোয়ো না।

অপু কিন্তু গোঁজ হয়ে বসে রইল।

অগত্যা সরোজ বসে বসেই নিজের আসনখানা খানিকটা ঠেলে অলকের দিকে সরে এসে রেণুর বসার জায়গা করে দিলে। রেণু জড়সড় হয়ে সরোজের পাশে বসে অপুকে খাইয়ে দিতে লাগল। এবার শ্রীমতী অপর্ণার আর কোন অভিযোগ নেই; বড় বড় হাঁ করে ভাত খেতে লাগল। সে দিকে চেয়ে চেয়ে সরোজের আনন্দও হোল, চাপা একটা দীর্ঘ নিশ্বাসও পড়ল।

খাওয়া প্রায় শেষ হোল। ঠাকুর তিনজনকেই দুধ দিয়ে গেছে। দুধ মেখে ভাত খেতে খেতে সরোজ বল্লে, তোমার হাতটা দেখি রেণু।

রেণু ভয়ে ভয়ে দুধ-ভাত-মাখা হাতখানা তুলে ধরলে।

সরোজ বল্লে, তুমি ক'দিন অন্তর নখ কাটো ?

ঠিক নেই।

শেষ কেটেছ কবে ?

শেষ ? এই মাসের কামানোর দিন।

সরোজ বল্লে, শোন। হপ্তায় দু'দিন করে নখ কাটবে, এই ধর রবিবার ও বুধবার। না হলে নখের ভেতর ময়লা থাকে, সেই ময়লা খাবারের সঙ্গে পেটে যায়।

রেণু ঘাড় হেঁট রেখেই বল্লে, রবিবার আমার ছেলের জন্মদিন।

ও, আচ্ছা তাহলে সোমবার আর শুক্রবার নখ কেটো।

রেণু ঘাড় নাড়লে।

সরোজ বললে, নরুণ আছে।

রেণু বল্‌লে না।

সরোজ বল্‌লে এনে দেব। নিয়মিত নখ কেটো।

খাওয়া প্রায় শেষ করে সরোজ বল্লে, তোমার সাবান মাথার অভ্যাস আছে ?

রেণু যেন কেমন শিউরে উঠল। ঘাড় নেড়ে বল্লে, না।

সরোজ বল্লে, সাবান মাখবে, মাথার চুল পরিষ্কার রাখবে, ময়লা কাপড় পরবে না, নিয়মিত ভাবে ধোপার বাড়ী থেকে কাপড় কাচিয়ে নেবে। মনে রেখ, তোমার কাজ রাতদিন ছেলে নিয়ে থাকা, তোমার গায়ে নোংরা ময়লা কিছু থাকলে সেগুলো সব ছেলের গায়ে এমন কি পেটেও যেতে পারে। আচ্ছা, তোমার কাপড় ক'খানা আছে ?

দু'খানা, রেণু উত্তর দিলে।

মোটে দু'খানা, আচ্ছা এক জোড়া শাড়ীও এনে দেব। সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

ধীরে ধীরে রেণু বল্লে, কাপড় যদি আনেন, তাহলে শাড়ী আনবেন না, থান দেবেন।

থান ? থান বড় বিশ্রী, সরোজ মন্তব্য করলে।

আমার কি শাড়ী পরা উচিত, রেণু ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে।

একটু ভেবে নিয়ে সরোজ বল্লে, আচ্ছা, তাই হবে।

খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে সরোজ বল্লে, তোমার খাওয়া-দাওয়া ঠিক হচ্ছে ত ?

রেণু ঘাড় নাড়লে, হ্যাঁ।

রাত্রিরে কি খাও ? আজ কি খাবে ?

রেণু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোন উত্তর দিলে না।

এমন সময় ঠাকুর এসে ঘরে ঢুকল। সরোজ বল্লে, ঠাকুর, তোমার রেণু দিদিমণির রাত্তিরের খাবার কি আছে ?

ঠাকুর বল্লে, আজ একাদশী।

আজ একাদশী ? ও ! বিস্মিতভাবে সরোজ রেণুকে প্রশ্ন করলে, আজ কি পুরো উপোষ না কি, নির্জলা ?

রেণু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

সরোজ এঁটো হাতেই আসনের ওপোর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে, না না রেণু, এ বয়স থেকে ও সব চল্‌বে না। মনে রেখ, দু'দুটো ছেলের জীবন নির্ভর করছে তোমার ওপোর। তুমি আজ উপোষ করেছ, তোমার ঐ পিত্তি-

পড়া দুধ খেয়ে ছেলেদের স্বাস্থ্য খারাপ হবে। তুমি এখন অবশ্যই কিছু খাবে। আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে বাবা বল্‌ছ, আমি তোমাকে বিধান দিচ্ছি, তুমি এখনই কিছু খাও, এ জন্য যদি কিছু পাপ হয়, সে আমার হবে, তোমার নয়। বুঝলে?

রেণু স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

অলক বল্লে, চল দিদি, হাত ধুইয়ে দেবে।

অলক ও অপুকে নিয়ে রেণু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হাত ধুয়ে লবঙ্গ এলাচ মুখে দিয়ে সরোজ নিজের ঘরে না গিয়ে রান্না ঘরে এসে ঠাকুরকে বল্লে, ময়দা আছে না?

ঠাকুর বল্লে, আছে।

সরোজ বল্লে, পরটা এবং আলু ভাজা কর রেণু দিদি-মণি খাবে।

বুড়ি ঝি আর থাকতে পারলে না বলে, দাদাবাবুর যেমন কথা, বামুনের ঘরের বিধবা, আজ একাদশী—

তুমি থামো ত, সরোজ তাকে ধমক দিলে।

সরোজ বল্লে, রেণু, আমি বলছি, তুমি খাবে। খাবার সময় আমাকে ডাকবে, আমি দেখতে চাই যে, তুমি খাচ্ছ।

সে রাত্রে সরোজ রেণুকে পরটা খাইয়ে তবে ছেড়েছিল।

পরের দিন সকালে গোয়ালা যখন গরু নিয়ে এল, তখন সরোজ দাঁতে বাস ঘষছে। দুধ দোয়া হোল, এবং এ বাড়ীর রোজানে দুধ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরোজ বল্লে, শোন গোয়ালা, আজ থেকে তুমি সকালে এক পোয়া এবং বিকালে আধ সের হিসাবে বেশী দুধ দেবে। এখন এক পোয়া আরো বেশী দাও।

ঝি দুধ নিতে এসেছিল। দুধ নিতে নিতে সে বল্লে, আজ কেউ আসবে বুঝি দাদাবাবু?

সরোজ বল্লে, না। সকালে এক পো এবং বিকেলে আধসের করে বাড়তি দুধ নেব রেণুর জন্য। ওকে দুটো ছেলে টানতে হয়। মাছ মাংস খাবে না, জুঝবে কি করে?

ঝি দুধ নিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, মাছ মাংস খাওয়ালেই ত পারেন, ও-ও বেঁচে যায়।

ঝিয়ের কথায় তীব্র শ্লেষ ফুটে উঠেছিল, সেটা সরোজের কানে বাজল বড় রূক্ষভাবে। দাঁত মাজ্‌তে মাজ্‌তে রান্নাঘরের দিকে এসে গম্ভীর কণ্ঠে সরোজ বল্লে, ইচ্ছে হয় এ বাড়ীতে থাক, না হয়ত কাজ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও, কিন্তু আমার কথার ওপোর কথা কইতে যেও না।

চোখে আঁচল-চাপা দিয়ে ঝি তখন মৃতা দিদিমণির জন্য কান্না জুড়ে দিয়েছে।

ক'দিন পরে এক সন্ধ্যায় অপু ঝোঁক ধরলে, রাত্রে দিদির কাছে শোবে। কাঁদতে লাগল। সরোজ বলে ছিঃ, কেঁদো না, কাঁদতে নেই। ঐ দুটো বাচ্চা দিদির দুপাশে শোয়। ওরা সারা রাত ধরে বিছানা ভিজিয়ে ফেলে, তুমি ওখানে কোথায় শোবে? তার চেয়ে তুমি আর তোমার দাদা তোমরা দুজনে খাটের বিছানায় আমার দু'পাশে যেমন শুচ্চো তেমনই শুয়ো। কেমন? এই ত বেশ হোল! ওখানে রেণুদিদির কাছে বিচ্ছিরী।

অপু গোঁজ হয়ে রইল।

সরোজ বল্‌লে, আচ্ছা বেশ, আমি সারারাত তোমার দিকেই পাশ ফিরে শুয়ে থাকব, তোমার দাদার দিকে একবারও ফির্‌ব না।

অলক ফোঁস্ করে উঠল, বা রে, আমি কি দোষ করলুম যে আমার দিকে—

সরোজ ছেলের দিকে চেয়ে চোখ টিপলে।

অলক হাত তালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ও, বুঝেছি। অপু খুকুকেই তুমি আমার দিকে পাশ ফিরে শোবে, না বাবা?

বেচারী সরোজ একজোড়া অবোধ শিশু নিয়ে সামলাতে পারে না। কপট ক্রোধ দেখিয়ে অলককে বল্‌লে, না, তোমার দিকে পাশ ফিরে মোটেই শোব না।

এ্যাঁ, তাহলে—তাহলে আমি খাবও না, স্কুলেও যাব না, কিচ্ছু করব না, অলক রাগ করে দূরে সরে গেল।

অপু রেণুর কাছে এসে জেদ ধরলে সে রেণুর কাছেই শোবে।

শেষে সরোজকেই হার মানতে হোল। বল্লে, তা হলে রেণু, তোমার বিছানাটা আরও বাড়িয়ে নাও, কি আর করবে বল?

রেণু সায় দিয়ে বলেছিল, আচ্ছা।

কিন্তু মশারী? মশারীতে কুলোবে?

রেণু বলেছিল, আমার একটা বড় মশারী আছে বাবা, সেইটে বার করে নিই।

ও, আছে বুঝি? সরোজ একটু বিস্মিত হোল। যে-মেয়ের দুখানি মাত্র শাড়ী, তার মশারী আছে দুটো!

দুদিন পরে অপুর হোল' সর্দ্দি কাশি। এখনও ঠাণ্ডাটা বেশ আছে। সরোজের মনে হোল, অপু বোধ হয় রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মেঝেয় গিয়ে পড়েছিল, সেইজন্যেই ওর সর্দ্দি হয়েছে। মেঝেয় শোয়া ত ওর কখনও অভ্যাস নেই। বাচ্ছাটাও মেঝেয় থাকে, সেটা ভাল কথা নয়। ভেবেচিন্তে সরোজ ফতোয়া দিলে, সরোজের বড় খাটে আজ থেকে রেণু অপু ও দুটো বাচ্ছা নিয়ে থাকবে, আর সরোজ মেঝেয় বিছানা করে অলককে নিয়ে শোবে। অলকের এতে কোন আপত্তি নেই যে এখন বাবাকে একলা ভোগ করছে এই আনন্দেই সে মশগুল হয়ে আছে।

কিন্তু আপত্তি করলে ঝি। এটা সে পুরানো আমলের লোক হয়ে চখে দেখবে কেমন করে!

সরোজ বল্লে, শোন, যা বলি তাই করতে হবে। আমার খাটে রেণু ছেলেদের নিয়ে শোবে, এবং তুমি শোবে আমার ঐ ঘরের মেঝেয় এবং তোমাদের ঘরের মেঝেয় আমার বিছানা হবে, আমি ও অলক ঐ খানেই শোবে।

বাড়ীতে তিনখানাই ভাল ঘর, এই হোল দু'খানা, আর উঠানের ওধারে একখানা আছে, সেটা বাইরের ঘর বা অফিস ঘররূপে চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজানো আছে। রান্নার পাশে ভাঁড়ার বলে যে এক চিলতে ঘর ছিল সেখানায় ঠাকুর শোয়। বাড়ীখানা পুরানো আমলের বাড়ী, সরোজ ভাড়া নিয়ে বাস করে।

বুড়ী ঝি মুখ গোঁজ করে রইল। সরোজের মুন্সেফী চাকরী পাওয়ার পর সরোজের সঙ্গে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াবার জন্য সরোজের শ্বশুরবাড়ী থেকে এই পুরানো লোকটাকে সরোজের শাশুড়ী পাঠিয়েছিলেন তিনি এবং তাঁর মেয়ে দু'জনেই এখন পরলোকে, কিন্তু ঝি-ও • মানুষ, বেঁচে থেকে সে এই সব অনাচার মানুষের চোখ নিয়ে দেখে কি করে?

কিন্তু উপায় নেই। দাদাবাবুর হুকুম, মানতেই হবে।

এবং এই সব ব্যাপারের পরোক্ষ চাপ রেণুর ওপোরই পড়তে লাগল। তিন পোয়া হিসাবে রোজানে দুধ, খাটে শুয়ে রাত্রে নবাবী করা, দিনের বেলা শুধু মাত্র ছেলে রাখা আর কোন কাজ না করা সব সময় ধোপদুরস্ত কাপড় পরে ফিট ফাট হয়ে পটের বিবি সেজে বেড়ানো, বুড়ী ঝি-য়ের মনঃক্ষোভ সরোজের আড়ালে উগ্রভাবে ফেটে পড়ত। অবস্থা খারাপ বুঝে রেণু বুড়ীর সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিলে।

কিন্তু বুড়ী পরিষ্কার উপলব্ধি করলে যে, সেই ক্রমে ক্রমে একঘরে হয়ে যাচ্ছে। ভাতারখাকী ছুঁড়িটা ছেলে-মেয়ে, দাদাবাবু সকলকেই বশ করে ফেলেছে। না হলে দাদাবাবু রেণুর জন্য যে রকম ভাল কাপড় এনে দিয়েছে, সে রকম কাপড় • কৈ এতকালের মধ্যে তা'র জন্য আনে নি। অবশ্য থান কাপড়ই এনেছে, কিন্তু এরকম পরিষ্কার মোলায়েম থান বুড়ো কি পরতে পারত না! ঠাকুরটা পর্য্যন্ত বুড়ীকে আর বিশেষ আমল দেয় না, তার যত কথা ঐ ওর সঙ্গে। বুড়ীর ধারণা বয়েস কম বলেই সকলে রেণুকে অত যত্ন করে, ভালবাসে।

আগুন কখনও চাপা থাকে না, এমন কি মনের আগুনও। বিকৃতরূপ নিয়ে সেই আগুনই একদিন জ্বলে উঠল। সরোজ বল্লে, দেখ বাপু, তুমি গোড়া থেকেই আছ, তোমাকে আমি কড়া কথা বলতে চাই না, কিন্তু তোমাকে আমি অশান্তি করতেও দেব না। তুমি তোমার হিসেব পত্র চুকিয়ে নিয়ে বাড়ী যাও।

ঝি তার দিদিমণির উল্লেখ করে করে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। ছেলে মেয়েরা বিমর্ষ হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ছেলেমেয়ের যে-দুঃখ ভুলিয়ে রাখার জন্য সরোজ নিজের সমস্ত শক্তি, অর্থ ও স্বার্থ অকাতরে ব্যয় করতে বদ্ধ পরিকর, সেই ছেলেমেয়ের ভিজে চোখ দেখে সরোজ যেন পাগল হয়ে গেল। গর্জ্জে উঠে বল্লে, চুপ, এখনই তোমার জিনিষ পত্র গুছিয়ে পাওনা গণ্ডা নিয়ে দূর হয়ে যাও। দিন-দুপুরে অশান্তি করা চলবে না।

ঝি কিন্তু শোনে না, ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতেই থাকে।

ধমক দিয়ে সরোজ বল্লে, এখনই যদি বিদেয় না হও, তা হলে পুলিশ ডেকে চোর বলে থানায় পাঠাব। ভাল চাও ত মুখ বুজে বাড়ী থেকে বার হয়ে যাবে।

পুলিশের কথায় ঝিটা বোধ হয় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আঁচলে চোখ মুছে নীরবে নিজের জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে মাইনের টাকাটা আঁচলে বেঁধে ঠাকুরের দেওয়া গরম গরম ফ্যানভাত বাবুর আগেই খেয়ে নিয়ে বাবুর কাছারী যাবার পূর্ব্বেই বাবুর নির্দ্দেশমত বেরিয়ে গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সরোজ স্নান করতে গেল।

খেয়ে উঠে সরোজ ঠাকুরকে ডেকে বল্লে, ঠাকুর বিকেলের মধ্যে একটা বাসন মাজার ঠিকে ঝি নিয়ে এসো।

সেদিন দুপুরে বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে রেণুই বাসনগুলো মেজে ফেললে। ঠাকুরকে বল্লে ঝি আনতে হবে না ঠাকুর, এবার থেকে আমিই বাসন মাজব।

সন্ধ্যার সময় সরোজ ঠাকুরকে ঝি-এর কথা বলতে ঠাকুর বল্লে, রেণু দিদিমণি বারণ করেছে, ঝি আনতে হবেনা দিদিমণি নিজেই বাসন মেজে নেবে।

সরোজের মনটা সারাদিনই খিচড়ে ছিল। বুড়িটা চলে যাবার পর থেকে তার কেবলই মনে হচ্ছিল, স্ত্রীর শেষ চিহ্নটাও চলে গেল। তা ছাড়া বুড়ী চেঁচামেচি বকাবকি যাই করুক, সরোজের স্ত্রীকে যে খুবই ভালবাসত সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। এ-বাড়ীতে আসার পর সরোজের স্ত্রীই বুড়ীকে পাশের ভাল ঘরখানা আগ্রহ করে দিয়েছিল। বুড়ীও ভালবাসার মান রেখেছে। সন্তান প্রসবের আগে থেকেই গৃহিণী শয্যাশায়ী। সেই থেকেই দুটো ঘরের মাঝখানের দরজাটা দিনরাত খোলা থাকত। বুড়ী যে কত রাত না ঘুমিয়ে রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে নীরবে পাখা-হাতে কাটিয়েছে তার কোন হিসেবই নেই। তারপর আঁতুড়ের ছেলেকে বুকের দুধ দেবার জন্য এখানকার সিভিল সার্জ্জেন যে ওয়েট নার্স পাঠিয়েছিলেন, তার কি দাপট্। পঁচিশ টাকা মাইনে, দুবেলা চর্ব্যচোষ্য খাওয়া, কিন্তু তাতেও তিনি রাত্রিরে থাকবেন না, তারপর মাঝে মাঝেই কামাই। সে ত বুড়ীকে তার নিজের ঝিয়ের অধম করেই খাটাতো, বুড়ী ঐ এক রত্তি বাচ্চার মুখ চেয়ে সমস্ত নীরবে সহ্য করেছিল। শেষে সেই নার্সের ব্যক্তিগত ব্যবহার, বিশেষত সরোজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা যখন সহ্যসীমার বাইরে চলে গেল, তখন গৃহিণীই সরোজকে বলেছিলেন, ঐ নার্সকে জবাব দিয়ে পল্লীগ্রামের কোন একটি সৎ প্রকৃতির দুঃস্থ মেয়েকে এনে কাজে লাগাতে। সরোজ প্রথমে রাজী হয় নি, কিন্তু স্ত্রীর উগ্রমূর্ত্তি এবং নার্সের বেপরোয়া হ্যাংলামিতে সেই রবিবারেই নার্সকে জবাব দিয়ে বাজার থেকে দুধের বোতল ও বেবি-ফুড কিনে এনেছিল। কিন্তু খোকাটা কিছুতেই দুধের বোতল নিলে না। তারপর সরোজ যে কতলোককে দুধ খাওয়াবার ঝিয়ের জন্য বলেছিল তার ঠিক নেই। এসেও ছিল একজন, কিন্তু তার রুগ্ণ চেহারা এবং হাতে পায়ে ঘা দেখে সরোজ তাকে রাখে নি। শেষে রেণু এল বড়বাবুর চিঠি নিয়ে। সরোজ যেন বেঁচে গেল। কিন্তু অশান্তির কপালে সুখ হয় না। এতদিনের পুরাণো ঝি হয়ে এমন অসভ্যতাই সুরু করলে যে, আর ওকে সহ্য করা গেল না, তাই ত ওকে জবাব দিতে হোল, না হলে—এই সব পাঁচ-সাত এলোমেলো চিন্তায় সারাটা দিন ওর মেজাজটা খিচড়েই ছিল। এখন ঠাকুরের কাছে বাসন মাজার ঝি আনতে হবে না শুনে তেলে বেগুন জলে উঠে সরোজ বল্লে, তোমার মনিব হচ্ছি আমি, তোমার দিদিমণি না। আমি বলছি লোক চাই, তুমি সেই লোক খুঁজে আনবে, সেই লোকের মাইনে আমি দেব, তোমার দিদিমণি দেবে না। কাল দুপুরে যেখান থেকে পার লোক খুঁজে এনো, আমি বিকেলে দেখতে চাই যে সেই লোক কাজ করছে।

পরের দিন এল এক ঠিকে ঝি। দু বেলা এসে বাসন মাজবে, ঘর মুছবে, কাপড় কাচার সমস্ত কাজই সে করবে, —তিন টাকা মাইনেয় সে বহাল হয়ে গেল। রেণু কোন-রকম উচ্চবাচ্য করতে আর সাহস পায় নি।

একদিন দুপুরে এল এক পোষ্টকার্ড। ঠাকুর সেই চিঠিখানা হাতে নিয়ে রেণুর কাছে পড়াতে এল। রেণু বেশ লজ্জা পেল। বল্লে, আমি ত পড়তে জানি না।

ঠাকুর ওর মুখের দিকে চেয়ে কি ভেবে বেরিয়ে গেল।

খানিক পরেই চিঠিখানা হাতে নিয়ে ফিরে এসে রেণুকে জানাল, তার বড় বিপদ। দেশ থেকে খবর দিয়েছে ওদের পাড়ায় আগুন লেগে গোটা গ্রামকে গ্রাম পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ওর ছেলে, মেয়ে, বউ, বুড়ো মা সকলেই গৃহহীন, এমন কি ধানের গোলাটা পর্য্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। ওকে এখনই দেশে যেতে হবে।

কিন্তু বাবু না এলে ত হয় না।

রাত্রে ঠিক হোল, ঠাকুর কাল সকাল-সকাল রান্না সেরে ভাত খেয়ে টাকা কড়ি নিয়ে ন'টা আটত্রিশের গাড়ীতে হাওড়া যাবে, তারপর শিয়ালদহ থেকে বিকেলের গাড়ীতে দেশে রওনা দেবে। ওর দেশ ছিল, রাজশাহীতে। সরোজবাবু বর্দ্ধমানের পূর্ব্বে রাজশাহীতে ছিলেন, সেখান থেকেই ঠাকুরটিকে সংগ্রহ করেছিলেন।

কিন্তু যে কদিন ঠাকুর না থাকে সেই কদিন কে রাঁধবে।

রেণু বল্লে, বাবা, আপনি যদি রাগ না করেন, তাহলে বলি, নতুন লোকের কোন দরকার নেই, এ ক'দিন আমি চালিয়ে দিতে পারি। আমি ত ব্রাহ্মণের মেয়ে।

সরোজ বল্লে, তুমি পারবে? বাচ্চা দু'টোর কি হবে?

রেণু বল্লে, ওদের সকালে খাইয়ে ধুইয়ে শুইয়ে দিয়ে রান্নাঘরে যাব। আবার দরকার হলেই এসে দেখব। মোটে ত কটা দিন। ঠাকুর ত বলেছে আট-দশ দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।

সেই ব্যবস্থাই ঠিক হোল।

কিন্তু ঠাকুর চলে যাবার পরদিন সকালে সরোজ ভাঁড়ার ঘর থেকে গোল একটা টিন বার করে রেণুকে ডেকে বল্লে, এইটে শিখে নাও রেণু, খুব সহজে রান্না হয়ে যাবে।

কুকারের দুটো বাটীতে ভাত একটা বাটীতে ডাল এবং ওপোরেরটাতে তরকারী সাজিয়ে সরোজ নিজে কুকারটা উনুনে বসিয়ে রেণুকে ঘড়ি ধরে শিখিয়ে দিলে কি ভাবে কতক্ষণ পরে ওটা নামাতে হবে। সেদিন রেণু কুকারের রান্না দেখে বড়ই বিস্মিত হয়েছিল, কিন্তু মাত্র কুকারের ওপোর নির্ভর করে নি, আরও দু'তিনটে তরকারী উনুনে তৈরী করে নিয়েছিল।

খেতে বসে সরোজ অবাক! ছেলে মেয়ে দুটোও ভারী খুসি! চমৎকার রান্না। তৃপ্তি-সুখে আহার শেষ করে সরোজ বল্লে, রেণু, তুমি ত চমৎকার রান্না কর। মা যাবার পর এমন রান্না আর কখনও খেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

স্মিত মুখে রেণু বলেছিল, কেন বাবা, মাও কি এ রকম রাঁধতে পারতেন না।

ম্লান মুখ সঙ্কোচন করে সরোজ বলেছিল, না। আর তা ছাড়া সে এ সব কাজে ঘেঁষতেই চাইত না। বাপের আদুরে ছোট মেয়ে ছিল, এ সব কাজে সে হাতই দিত না।

অলক বল্লে, বাবা, ঠাকুর যতদিন না আসে ততদিন দিদির রান্নাই খাব, হ্যাঁ।

সরোজ বল্লে, তা ত খাবই, কিন্তু বাচ্চা দুটোর অসুবিধে হবে এই আর কি!

রেণু বল্লে, না বাবা, ওরা দুজনেই খুব আরামে শুয়ে হাত পা নেড়ে খেলা করছিল।

সন্ধ্যার পর সরোজ বাজার থেকে মুটের মাথায় এক মোট বাজার এবং বড় একটা রুই মাছ এনে হাজির করলে। মুটেটা রোয়াকের ওপোর সমস্ত নামিয়ে দিলে।

এত বাজার যে মানুষ এক সঙ্গে করতে পারে তা রেণু কখনও দেখে নি। বল্লে, বাবা, এত বাজার কি হবে? কে খাবে এত?

সরোজ বল্লে, যতদিন পার চালাও, রোজ রোজ কে বাজার যাবে? [ক্রমশঃ

"প্রাচ্যবাণী"র সাংস্কৃতিক সফর

পণ্ডিত শ্রীঅনাথশরণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

আমাদের শাস্ত্রানুসারে, মহাপুরুষগণ মৃত্যুঞ্জয়ী। কারণ, তাঁহাদের ভব-ধারণা, আদর্শ লক্ষ্য প্রভৃতি তাঁহাদের পার্থিব দেহ বিনাশের পরেও পরিপূর্ণভাবে জীবিত থাকিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ করে, এবং এইভাবে, তাঁহাদের অমর করিয়া রাখে।

সর্বজনপ্রিয়, সর্বজনবরেণ্য, অকালে মাতৃক্রোড়প্রাপ্ত ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ছিলেন এইরূপ একটী মহান্ জন, যিনি তাঁহার প্রাণপ্রিয় সংস্কৃত জননীর সেবায় জীবনোৎসর্গ করিয়া অকালে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেও রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার মহান্ আদর্শ যাহা আমাদের সকলকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে পূর্ণতম গৌরবে। সেইজন্যই, তাঁহার অপূরণীয় অভাবে আমরা নিজেদের নিতান্তই অসহায় বোধ করিলেও, তাঁহার মৃত্যুঞ্জয়ী আশীর্বাদের ফলেই তাঁহার প্রাণপ্রতিম "প্রাচ্যবাণী"র সর্বদিকেই বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইতেছে। বিশেষ করিয়া, সংস্কৃতকে জনপ্রিয়, সর্বজনবোধ্য করিয়া তুলিবার জন্য তিনি যে দেশে বিদেশে আধুনিক সংস্কৃত নাটকের সুষ্ঠু-সুন্দর অভিনয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সংপ্রসারণ বিশেষ লক্ষণীয়। এই সম্বন্ধে আমাদের সাম্প্রতিক সফরগুলি হইতে সামান্য দু' একটা কথা আমি আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।

সর্বভারতীয় স্বামী বিবেকানন্দ শিলাস্মারক সমিতির উদ্যোগে সফর

সর্বভারতীয় স্বামী বিবেকানন্দ শিলান্যাস সমিতি বা Rock Memorial Committeeর নাম আজ সর্বজনবিদিত। ভারতবর্ষের শেষ প্রান্ত কন্যাকুমারিকাতে একটা উত্তুঙ্গ প্রস্তর খণ্ডে বসিয়া সম্মুখের দিগন্তপ্রসারী সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ এক অপূর্ব দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন, এবং মাতৃভূমির সেবায়, দীনহীন দরিদ্র জনগণের সেবার মহাব্রত নূতন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে স্বামীজীর উপযুক্ত একটা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য।

এই সমিতির কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বিগত জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদে পূর্ণকুম্ভযোগ উপলক্ষ্যে আহূত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে পঁচিশ হাজার তৃপ্ত দর্শকের সম্মুখে অভিনীত আমাদের "ভারত-বিবেকম্" নামক জনপ্রিয় সংস্কৃত নাটকটী দর্শন করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহারাই উদ্যোগী হইয়া ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর অমর সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্"র লক্ষ্ণৌ-কানপুর-আগ্রায় পাঁচবার অভিনয়ের সুবন্দোবস্ত করেন, অর্থ সংগ্রহের জন্য।

লক্ষ্ণৌতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

এরূপে উত্তরপ্রদেশের "স্বামী বিবেকানন্দ শিলাস্মারক সমিতির" সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণলাল সেথি মহাশয়ের সাদর আহ্বানে, আমরা বিগত ৩রা আগষ্ট, ১৯৬৬, মাতৃসমা অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরীর সস্নেহ তত্ত্বাবধানে, দলবলসহ লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পরের দিন সকালে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি এক আশ্চর্য ব্যাপার—নগর ভাঙ্গিয়া গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সানুগ্রহে ষ্টেশনে আসিয়াছেন আমাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে। কাঁহার সম্মানে আমাদের এই আশাতীত সম্মান—তাহা চিন্তা করিয়াই আমাদের সকলের চক্ষুই জলসিক্ত হইয়া উঠিল।

তাহার পর, আমরা সাদরে নীত হইলাম, লক্ষ্ণৌয়ের প্রাসাদোপম, সুবৃহৎ সুসজ্জিত "রবীন্দ্রালয়ে"। ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের পুণ্য নামাঙ্কিত অত্যন্ত মনোহর এই ভবনটী। তাহার সর্বোচ্চ তলায় আমাদের থাকিবার সুবন্দোবস্ত হইল। সর্বদিক হইতে ইঁহাদের স্নেহযত্নের সীমা পরিসীমা নাই।

লক্ষ্ণৌতে আমাদের "ভারত-বিবেকম্" সংস্কৃত নাটক এই অতি সুন্দর প্রাসাদোপম "রবীন্দ্রালয়ে" ৪ঠা ও ৫ই আগষ্ট, ১৯৬৬ পর পর দুইদিন অভিনীত হয়। পরমা জননীর অশেষ কৃপায় দুইদিনের অভিনয়ই অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রথমদিন সভাপতিত্ব করেন উত্তরপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকৈলাসপ্রসাদ মহাশয় এবং দ্বিতীয়দিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্ত মহাশয়। তাঁহারা উভয়েই বহুক্ষণ বসিয়া আমাদের অভিনয়ের অনেকাংশ দর্শন করেন, এবং অভিনয়াদির উচ্চ প্রশংসা করেন। ইহাতে আমরা বিশেষভাবে কৃতার্থ বোধ করিলাম। উভয় দিনই বহু জ্ঞানিগুণিসমাবেশে সভাস্থলে তিলধারণের স্থান ছিলনা; এবং সকলেই শেষের দিকে আসিয়া আমাদের সাগ্রহে অভিনন্দিত করেন। ইহাতে আমরা নিজেদের পরম ধন্য বলিয়া মনে করিলাম।

লক্ষ্ণৌতে আমাদের অভিনয়াদির সুবন্দোবস্ত করেন "বিবেকানন্দ শিলাস্মারক সমিতির" উত্তর প্রদেশ শাখার সুযোগ্য যুগ্ম সম্পাদক শ্রীসামসের সিং।

লক্ষ্ণৌ রামকৃষ্ণ মিশনের সুযোগ্য, জনপ্রিয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গৌরীশ্বরানন্দের স্নেহ ভালবাসার কথাও চিরস্মরণীয়। তাঁহার আদর যত্নের তুলনা নাই। তাঁহাদের আরব্ধ সুবৃহৎ Poly clinic ভবনটী দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম।

লক্ষ্ণৌ আকাশবাণীর শ্রীগোরা সেন ও সম্প্রদায় লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে আমাদের অভিনয়ের সঙ্গে অতিসুন্দর বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

কাণপুরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

কাণপুরের সুবিখ্যাত মেডিক্যাল কলেজ হলে ৬ই এবং ৭ই আগষ্ট ১৯৬৬ আমাদের "ভারত-বিবেকম্" সংস্কৃত নাটক পূর্ববৎ সমান সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। প্রথম দিন সভানেত্রীত্ব করেন উত্তর প্রদেশের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী। তিনি বহুক্ষণ বসিয়া আমাদের অভিনয় দর্শনকরেন এবং প্রশংসাবাক্যে আমাদের উৎসাহিত করেন।

কাণপুরেও উভয় দিনই সুবৃহৎ প্রেক্ষাগৃহটীতে তিল ধারণের স্থান ছিল না; এবং ঈশ্বর কৃপায়, আমাদের অভিনয়ে সকলেই পরমতৃপ্ত হন।

কাণপুরে আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয় অতি সুন্দর "সরস্বতী-শিশু মন্দিরে"। এই বিদ্যামন্দিরের কর্মিবৃন্দের আদর যত্নের কথা জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে।

কাণপুরে আমাদের অভিনয়াদির সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করেন "বিবেকানন্দ-শিলা স্মারক সমিতির" অতি উৎসাহী ও কর্মকুশল সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণলাল সেথি, এবং তাঁহার সুযোগ্য সহায়ক শ্রীঅশোক সুনগল্। ইঁহাদের নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

কাণপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সুযোগ্য, সর্বজনপ্রিয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দের নিকটও আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা নাই। তাহার পরিচালিত অতি সুন্দর বিদ্যালয়টী দর্শন করিয়া আমরা পরম তৃপ্ত হইলাম। এই বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীশশীরাম ভানের পরিচালনা অতি প্রশংসনীয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী শ্রীমতী সুশীলা শ্রীবাস্তব আমাদের চা-পানে আপ্যায়িত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ডাঃ সেন ও শ্রীমতী মুক্তা সেনের নিকটও আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি নাই। আমাদের নাট্যদলের ২১ জনের সাময়িক অসুস্থতার সময়ে তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়া আমাদের সর্ববিধ সাহায্য করেন; এমন কি নিজেরা রন্ধন করিয়া খাদ্য পাঠাইয়া দেন। তঁাহাদের স্নেহের ঋণ সত্যই অপরিশোধ্য।

আগ্রাতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

আগ্রাতে সুবিখ্যাত আগ্রা কলেজের সুন্দর প্রেক্ষাগৃহে আমাদের "ভারত-বিবেকম্" নাটকটী পুনরায় সমান সাফল্যের সহিত অভিনীত হয় ৮ই আগষ্ট, ১৯৬৬। পৌরোহিত্য করেন আগ্রা কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ-মহাশয়। তিনি সস্ত্রীক সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকিয়া আমাদের উৎসাহ বর্ধন করেন, এবং প্রশংসাবাক্যে আমাদের কৃতার্থ করেন।

এস্থলেও সুবৃহৎ প্রেক্ষাগৃহটীতে তিলধারণেরও স্থান ছিলনা; এবং ঈশ্বর কৃপায় সেদিনের অভিনয়ও উৎকৃষ্ট হয়। আগ্রাতে আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয় সুবিখ্যাত আগ্রা হোটেলে। এই হোটেলের সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী শ্রীমোহিত দত্তের আদর যত্নের কথা চিরস্মরণীয়।

ঈশ্বর কৃপায় এবং ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের অমর আশীর্বাদে আমাদের লক্ষ্ণৌ-কানপুর-আগ্রা সফর পরিপূর্ণভাবে

সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং অভিনয় ও সঙ্গীত সকলেরই উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। সাধারণতঃ বাংলা-দেশের বাহিরে বাঙালীদের সংস্কৃত উচ্চারণ সম্বন্ধে মন্দধারণা আছে। কিন্তু আমাদের নাট্য দলের প্রত্যেকেরই বিশুদ্ধ সুস্পষ্ট উচ্চারণ এবং অভিনয় নৈপুণ্যে সকলেই পরমতৃপ্ত হন। ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার কথা, সন্দেহ নাই।

এবারের নাট্যদলে ছিলেন পণ্ডিত অনাথ শরণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সর্বশ্রী সুনীলদাস, অরূপ দাসগুপ্ত, অর্দেন্দু ঘোষ, অলকা বসু ও সুজাতা ঘোষ। সঙ্গীতে ছিলেন শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য, শ্রীঅরূপ দাসগুপ্ত ও শ্রীমতী সুজাতা ঘোষ, রূপসজ্জায় শ্রীদিলীপ ঘোষ; এবং ছায়া আলোক সম্পাতে শ্রীচিনু ঘোষ ও শ্রীজিতেন পাল।

কালকাতার সুবিখ্যাত লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের সুযোগ্যা, সর্বজনপ্রিয় অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরীর সুমিষ্ট ইংরাজী ভাষণও সকলকে তৃপ্তিদান করে; এবং তিনি তাঁহার পতিদেবতার আরব্ধ কার্য সমাপ্ত করিবার যে মহৎ ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেশ-বিদেশের সকল পণ্ডিতেরই বিশেষ আশীর্বাদ ও সাধুবাদ লাভ করেন।

দুর্গাপুরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

ইহা দুর্গাপুরে আমাদের দ্বিতীয়বার সংস্কৃত নাট্যাভিনয়। এবারের সাদর আমন্ত্রণ জানান দুর্গাপুর প্রোজেক্টসের ইলেকট্রিক্যাল ডিভিসনের "ঘরোয়া" ক্লাবের সুযোগ্য সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুভাষচন্দ্র ভট্টাচার্য। অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরী বিরচিত দেশাত্মবোধক সংস্কৃত নাটক "দেশ-দীপম্" অভিনীত হয় ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ সুসজ্জিত মডেল লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টার হলে। সহস্রাধিক উৎসুক দর্শক আড়াই ঘণ্টা ধরিয়া বসিয়া সাগ্রহে আমাদের অভিনয় দর্শন করেন, এবং উচ্চ প্রশংসা বাক্যে আমাদের কৃতার্থ করেন।

আমাদের সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিল ইহাই যে, এই অনুষ্ঠানের সর্ববিধ সুবন্দোবস্ত করেন স্থানীয় তরুণবৃন্দ। তরুণগণ সংস্কৃতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রায়শঃই প্রদর্শন করেন না। কিন্তু তরুণ-বয়স্ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার সহকর্মীগণের অতুল আদরযত্ন, অনলস প্রচেষ্টা ও আগ্রহের কথা কোনোদিনও ভুলিবার নহে। তাঁহারা আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

পূজার বন্ধের সফর

১৯৬৬ সালের পূজার বন্ধে আমাদের একটী অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সফর অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে আমরা বিভিন্ন স্থানে নয়টী সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিয়া সকলের নিকট হইতে বিশেষ সম্মান সমাদর লাভে ধন্য হই। ইহা আমাদের অশেষ সৌভাগ্যের ফল।

দেওঘরে সংস্কৃত নাট্যানুষ্ঠান

দেওঘরে "দেব-সঙ্ঘ" একটী সুন্দর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার প্রাণস্বরূপ পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর স্নেহ ও মঙ্গলের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। তাঁহারই সানুগ্রহ আদেশানুসারে আমাদের সাদর আহ্বান জানান দেবসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তরুণ বয়স্ক শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁহার কর্মক্ষমতা অপরিসীম; এবং তিনি ও তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মীবৃন্দ আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়। তাঁহাদেরই সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে ২৮শে এবং ২৫শে অক্টোবর, ১৯৬৬ সুপবিত্র মন্দির প্রাঙ্গণে আমাদের ডাঃ যতীন্দ্রবিমল বিরচিত সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্" এবং ডাঃ রমা চৌধুরী বিরচিত, বহুবার অভিনীত, জনপ্রিয় অদ্বৈত বেদান্তাচার্য শ্রীশঙ্করের পুণ্যজীবনীমূলক সংস্কৃত নাটক "শঙ্কর-শঙ্করম্" অতি সুন্দর ভাবগত পরিবেশের মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হয়। স্বয়ং শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর উভয়দিনই সর্বক্ষণ সানুগ্রহে বসিয়া আমাদের অভিনয় দর্শন করিয়া আমাদের কৃতার্থ করেন, এবং শেষদিনে আশীর্বাদস্বরূপ স্বহস্তে সকলকে বহুমূল্য উপহার দান করিয়া ধন্য করেন। ডাঃ রমার "বেদান্ত-ভক্তিবাদ" মূলক সুমধুর ভাষণ সকলকেই তৃপ্ত করে। "দেবসঙ্ঘের" সকলের সঙ্গেই আমাদের যে প্রাণের সম্পর্ক স্থাপিত হইল, তাহা কোনদিনও ছিন্ন হইবার নহে।

আলিগড়ে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

এ বৎসর আলিগড়ে অল-ইণ্ডিয়া-ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় সহস্রজন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনের সুযোগ্য

সাধারণ সম্পাদক, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধানাধ্যাপক ডাঃ সূর্যকান্তের সাদর আহ্বানে আমরা আলিগড়ে অধিবেশনের প্রথম দিনে ২৭শে অক্টোবর, ১৯৬৬, ডাঃ রমার সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটক "শঙ্কর-শঙ্করম্" সহস্রাধিক বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর উপস্থিতিতে মঞ্চস্থ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া নিজেদের বিশেষ সম্মানিত বোধ করিলাম।

আমাদের পরমতম সৌভাগ্য এই যে, আমাদের সংস্কৃত অভিনয় সকলেরই মনোহরণ করে।

নিউদিল্লীতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

রাষ্ট্রপতি ভবনে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের অনুগ্রহের সীমা পরিসীমা নাই। ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে এবং ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে আমরা ডাঃ যতীন্দ্রবিমল বিরচিত সর্বজনপ্রিয় সংস্কৃত নাটক "অমর-মারম" ও "ভারত-বিবেকম্" রাষ্ট্রপতি-ভবনে তাঁহার পুণ্য উপস্থিতিতে অভিনয় করিয়া ধন্য হই এবং দ্বিতীয়বার তিনি আমাদের সানুগ্রহে পাঁচশত টাকা আশীর্বাদ স্বরূপ দান করেন।

এবারও তৃতীয়বার তিনি তাঁহার প্রিয় ছাত্রী ডাঃ রমা বিরচিত স্বীয় পুণ্যজীবনীমূলক অভিনব সংস্কৃত নাটক "ভারতাচার্যম্" অভিনয় সানন্দে রাষ্ট্রপতি ভবনে আদ্যোপান্ত দুইঘণ্টা ধরিয়া দর্শন করেন বিগত ২৯শে অক্টোবর, ১৯৬৬। অতি সুন্দর এই নাটকটী; এবং তাহার অভিনয় ও সঙ্গীতও অতি উচ্চাঙ্গের হয়। পরমশ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি মহাশয় এবারে আশীর্বাদস্বরূপ প্রাচ্যবাণীকে দেড় হাজার টাকা দান করেন, সকলের সঙ্গে একত্রে ছবি তোলেন এবং সকলকে চা পানে আপ্যায়িত করেন। "প্রাচ্যবাণী নাট্যসঙ্ঘ" ব্যতীত অপর কোন সংস্থাই রাষ্ট্রপতিভবনে সংস্কৃত অভিনয় করেন নাই; এবং পর পর তিনবার এই সুযোগ লাভ করিয়া আমরা বিশেষ কৃতার্থ হইলাম।

দিল্লীস্থ আকাশবাণী হইতে "ভারতাচার্যম্" সংস্কৃত নাটকটীকে ৪৫ মিনিট ধরিয়া রেকর্ড করা হয় পরে প্রচারের জন্য।

প্রাচ্যবাণী শাখার বার্ষিক সম্মেলনে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

প্রাচ্যবাণীর নিউদিল্লী শাখার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমধুসূদন নন্দীর তত্ত্বাবধানে এই শাখাটীর অল্পদিনের মধ্যেই উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইতেছে। প্রতি মাসে একটী করিয়া "ডাঃ যতীন্দ্রবিমল-স্মৃতি সভায়" নানাবিধ বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া এবং "ডাঃ যতীন্দ্রবিমল স্মৃতি-প্রবন্ধ প্রতিযোগিতারও" সুষ্ঠু আয়োজন করিয়া তিনি সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এবারের ঐ শাখার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে সুন্দর, অভিজাত Y. W. C. A. Hallএ ৩০শে ও ৩১শে অক্টোবর, ১৯৬৬, আমাদের সংস্কৃত নাটক "ভারতাচার্যম্" ও "শঙ্কর-শঙ্করম্" বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। উভয়দিনই সভাপতিত্ব করেন পূর্বতন তথ্য ও আকাশবাণী-মন্ত্রী সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ গোপাল রেড্ডী। তিনি আমাদের প্রাচ্যবাণীর নিউদিল্লী শাখারও স্থায়ী সভাপতি। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সানুগ্রহে উপস্থিত ছিলেন।

বারাণসীতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

আমাদের এই অতি সুন্দর, অতি সফল, অতি মঙ্গল-জনক, অতি সম্মান-সমাদরবহুল, অতি আনন্দদায়ক সাংস্কৃতিক সফরের শেষ তিনটী ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান হয় বারাণসীতে। পুণ্যধাম বারাণসী সংস্কৃত ও পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র; এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের প্রাণের ইচ্ছা ছিল যে, এই পবিত্র, পণ্ডিতপাদরেণুপূত সুন্দরস্থানে তাঁহার সংস্কৃত নাটক অভিনীত হয়। কিন্তু নানাকারণে তাঁহার সেই ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আজ ডঃ রমা তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া সকলের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

২রা এবং ৩রা নভেম্বর, ১৯৬৬, বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুযোগ্য, সুপণ্ডিত সর্বজনপ্রিয় উপাচার্য ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাদর আহ্বানে, বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দর, সুবিস্তৃত Queen's Collage Hallএ সহস্রাধিক অধ্যাপক, ছাত্র, পণ্ডিত মহাশয় ও স্বামিজীগণের পুণ্য উপস্থিতিতে আমাদেরসু-বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্" ও "শঙ্কর-শঙ্করম্" বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। শ্রদ্ধেয় উপাচার্য

মহাশয় সানুগ্রহে একদিনের মধ্যে স্বরচিত সংস্কৃত কবিতা ছাপাইয়া ডাঃ রমাকে অভিনন্দন দান করেন; কেবল তাহাই নহে, ষ্টেজের উপর দাঁড়াইয়া মুখে মুখে তৎক্ষণাৎ বহু সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া ডঃ রমাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং পরিশেষে ২৫১৲ প্রাচ্যবাণীকে আশীর্বাদ-স্বরূপ দান করিলেন।

আমাদের শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান হয় ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬৬, রামকৃষ্ণ মিশন অদ্বৈতাশ্রমের বিস্তৃত পুণ্যপ্রাঙ্গণে। সভায় পাঁচশতাধিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু ব্রহ্মচারীগণ, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্বামীজী, ভক্ত, পণ্ডিতগণসহ ত্রি-সহস্রাধিক বিদগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর সম্মেলন হয়। অভিনীত হয় ডাঃ রমা বিরচিত নবতম সংস্কৃত নাটক "অভেদানন্দম্"। এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর উচ্চাঙ্গের অভিনয় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়—এই সস্নেহ বাণী দ্বারা সকলে আমাদের অভিনন্দিত করিয়া কৃতার্থ করেন।

স্বামী অপূর্বানন্দের স্নেহ মমতার তুলনা নাই। তাঁহার ঋণ কোনোদিন পরিশোধযোগ্য নহে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন পণ্ডিত শ্রীঅনাথশরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ, সর্বশ্রী সুনীল দাস (নাম ভূমিকায়), অরূপ দাসগুপ্ত, নিরাপদ বাকুলি, শ্রীমতী শান্তি চক্রবর্তী ও শ্রীমতী ঊর্মি চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীতাংশে ছিলেন শ্রীপূর্ণেন্দু রায়, শ্রীঅরূপ দাসগুপ্ত; রূপসজ্জায় শ্রীদিলীপ দাসগুপ্ত।

উপসংহার

কি সর্বদিক হইতেই অপূর্ব আমাদের এবারের এই সাংস্কৃতিক সফর! শ্রীভগবৎ কৃপায় নয়টীর মধ্যে প্রত্যেকটী অভিনয়ই যেরূপ সকলকে তৃপ্তিদান করিতে পারিয়াছে, সেরূপ সকলের স্নেহ ভালবাসা, আদরযত্ন, সম্মান-সমাদরও যেন সীমা ছাড়াইয়া গেল।

আমাদের কৃতিত্ব আর এতে কোথায়? সবই ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের আশীর্বাদ। তাঁহার প্রাণপ্রিয় "প্রাচ্য-বাণীকে" যেন চিরকাল সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে পারি, তাঁরই জীবনসম সংস্কৃত ভাষাকে যেন চিরকাল সেবা করিয়া যাইতে পারি, এই প্রার্থনা।

আজকের আশা

শ্যাম রায়

অরণ্য নির্জনতায় কেয়াফুলের ঝাড়ে
কেটেছিল সোনদের স্নিগ্ধ বিস্ময়ের ক্ষণ
এবার বিপুল ধস নেমেছে দেহ রন্ধ্রে।
মেরুদণ্ড জমে গেছে পাথরের মতো
বরফের চাপ যেন এনেছে জমাট শীতল দিন
উন্মত্ত শোণিতের প্রবাহ নিঃশেষ—
রক্ত নেই আর।
নির্বিরোধ আকুতিতে তাহাকেই পেয়েছি—
যিনি চিকিৎসক, কিন্তু কোনো ফল হয়নি।
মেরুদণ্ড জমে যায় পাথরের মতো।

হাতে কালো ব্যাগ, স্টেথোটা কাঁধে ঝুলিয়ে
আশা নিয়ে এলো চিকিৎসক—
জীবনের চিকিৎসায় দেহের মুক্তি দিতে হবে।
এবারে শিথিল করে দাও বজ্রআঁটা হাত,
মেরুদণ্ডে অস্ত্রোপচার করো।
দুরন্ত হাওয়ায় ওড়া
নারিকেল পাতার মতো মনটা মুক্ত হতে চায়।
আর যে দেরি সইছে না, চিকিৎসা আর কতদূর?
মেরুদণ্ড অনমনীয় হতে চায় বেতের মতো,
তোমার কল্পনার স্বপ্নে—লোহের মতো দৃঢ়।

মাসিক রাশিফল

শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য

পৌষ মাসের ফল

এবার আমরা ফলিত জ্যোতিষ আলোচনার পুনরাবৃত্তি করছি। গত কার্ত্তিক সংখ্যায় আমরা মঙ্গল সম্পর্কে বাকী আলোচনা শেষ করেছিলাম। এবারে মঙ্গল সম্পর্কে আরো গোটা কয়েক কথা বলে বুধ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম।

অশুভ মঙ্গল নাস্তিক ও ধর্মবিদ্বেষী। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না। পাপ পুণ্যের ভয় তার মধ্যে নেই। ধর্ম কর্মে তিনি আস্থাহীন। পরধর্মের প্রতি তিনি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। ধর্মানুষ্ঠানকারীগণকে দেখে তিনি নাসিকাকুঞ্চন করে থাকেন। সুতরাং অশুভ মঙ্গলের প্রভাবে জাতক ধর্মদ্রোহী হয়ে দেবালয় বা আরাধনার পবিত্র স্থান কলুষিত করতে পারেন, এমন কি বিগ্রহাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করতে পারেন।

কু-মঙ্গল অর্থাৎ অশুভ মঙ্গলের ভালবাসা স্বার্থের ভালবাসা এবং দৈহিক আকর্ষণ হেতু ভালবাসা। যদি অশুভ মঙ্গলের জাতক ভালবাসার ক্ষেত্রে বাধা পান, কিংবা প্রেমে যদি তাঁর ঈর্ষা জাগে, তা হলে তিনি প্রেয়সীকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে পারেন এবং নিজেও আত্মহত্যা করে থাকেন।

দুর্বল মঙ্গল যদি জাতকের জন্ম কুণ্ডলীতে অবস্থান করেন অর্থাৎ জন্ম পত্রিকায় যদি মঙ্গল বলহীন হন, তা হলে মঙ্গলের প্রভাবে জাতক বাল্যকাল থেকে অতি হীন ও বদর্য চরিত্রের ছেলেদের সঙ্গে মিশবেন। তিনি বাল্যকালে এমন সব অনিষ্ট মূলক ও অপরাধ মূলক কার্যে বুদ্ধির পরিচয় দেবেন যে অল্পকালের মধ্যে দলের সর্দারের স্থান লাভ করবেন। তিনি বাল্যকালেই অন্যায় কাজে হাত বাড়ী থেকে পাকান—ভাইকে ঠেঙ্গিয়ে, বোনকে আঘাত করে বয়সে ছোট বড় কোন কিছু বাদ-বিচার করেন না।

মঙ্গলের প্রভাব বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি নীচতা দান করেন। ফলে মঙ্গলের জাতক বিবেকশূন্য গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও অভদ্র আচরণশীল হয়ে পড়েন। সত্যের প্রতি তাঁর আর অনুরাগ থাকে না। সহানুভূতি ও উদারতা তাঁর মন থেকে লোপ পেয়ে যায়।

বুধের প্রভাব পরোক্ষভাবে প্রতীয়মান। বুধ বিকাশ পান গ্রহ-সংযোগ হেতু। সুতরাং তিনি যখন যে গ্রহের সহিত যুক্ত হন বা সম্বন্ধ করেন, তখন তিনি তারই স্বভাব, প্রকৃতি ও কার্যকারিতা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। বুধের মধ্যে ব্যক্তিত্ব কম। তার নিজের সত্তা বলে কিছু নেই। কাজেই কেবলমাত্র বুধ হতে যশলাভ বা যশোহানি, জয়-পরাজয় ও বুৎপত্তি অনুমান করা যায় না।

বুধের শক্তি ধ্বংসাত্মক স্ফুলিঙ্গ সদৃশ। রবি বুধের শক্তিকে শুধু সীমিত ও সংযত করলেন না; তাকে নিজের এলাকার মধ্যে বেড়াজাল দ্বারা সীমাবদ্ধ করে রাখলেন—যাতে অন্যান্য গ্রহগণ তার ওপর ক্রিয়া করতে পারেন। বুধের

রবির গতিকে অতিক্রম করবার কোন ক্ষমতা নেই। সুতরাং বুধকে রবির পার্শ্বচর বলা যেতে পারে আবার চন্দ্র চেতন-শক্তি দ্বারা বুধের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে প্রকটিত করলেন। সেজন্য বুধকে চন্দ্র-পুত্র বলা হয়। এ-বিষয় পুরাণে রূপকভাবে বর্ণিত আছে।

বুধ পরাশ্রয়ী গ্রহ। সুতরাং বুধের মধ্যে পরানুকরণ-স্পৃহা প্রবল। কাজেই যে সকল গায়কের বিদ্যা নকল করা গান, যে সকল জ্যোতির্বিদের জ্ঞান-সমষ্টি গুরুর দেওয়া বিষয়টির সংকেত, যে সব ডাক্তারের চিকিৎসার মূল মুখস্থ করা বিদ্যা, এসকল বুধের অধিকারে জন্মে থাকে। বুধ বাহিরে যেমনটি দেখেন, অবিকল তেমনটি শেখেন; অন্য কোন গ্রহের এরূপ ক্ষমতা নেই। অতএব যাঁদের জন্ম সময়ে বুধগ্রহ বলবান, তাদের মুখস্থ করার ক্ষমতা অতিশয় প্রবল, তাদের জ্ঞান অর্জন করবার এবং নিজেকে প্রকাশ করবার আকাঙ্ক্ষা প্রচুর। তাদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর এবং তাঁরা লেখপড়ার কাজে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন। তাঁরা পরিষ্কারভাবে লিখতে ও বলতে পারেন, অর্থাৎ নকল করতে পারেন। তাঁরা হাতের কাজেও সাফল্যলাভ করেন। বুধ বলহীন হলে জাতক নীচমনা ও সঙ্কীর্ণবুদ্ধি বিশিষ্ট হয়। তাঁর মধ্যে স্মরণশক্তি অত্যন্ত কম এবং জ্ঞানলাভ করবার অথবা নিজেকে প্রকাশ করবার শক্তি অতি সামান্য।

বুধগ্রহের দ্বারা বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেচনা শক্তি ও বিদ্যা-বুদ্ধি জনিত নানা প্রকার সুখ বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা যে কোন বিষয়ের জটিল সমস্যায় বুধ পরামর্শদাতা। সুতরাং বুধ হতে বন্ধু, লেখক, গ্রন্থকার, কবিত্ব শক্তি, গণিত ও অর্থ-বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও ভৈষজ-বিদ্যা, অন্তর্ভাবণ-বিদ্যা, আইন-বিদ্যা, লোক-ব্যবহারবিদ্যা, বাজীকরের মত চাতুর্য বা হস্তকৌশল এবং আরো অনেক প্রকার অর্থকরী বিদ্যা অনুমান করা যায়। আবার বুধ লেখাপড়ার জ্ঞান ও পরের কাজ করা নির্দেশ করেন।

বুধের কারকতার কিছু আলোচনা করা হল। যাক, এবারে জন্মরাশি অনুসারে ব্যক্তিগত মাসিক শুভাশুভ ফলের আভাস দিচ্ছি।

মেষ—কর্মক্ষেত্রে ও পারিবারিক ক্ষেত্রে মতবিরোধ হতে পারে। সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। আপনার এখন বাক্ সংযম ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা দরকার। আপনার স্বাস্থ্য কিছু উৎপাত করবে। গুরুজন হানির যোগ দেখা যায়। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল নয়। ভ্রমণে বাধা আসতে পারে। মহিলাদের সময়টা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল।

বৃষ—অপরের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। আশ্রিত ব্যক্তির দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে। শরীর সম্বন্ধে সাবধান। গুরুজনের পীড়াদিতে মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। পরীক্ষার্থীদের সময়টা ভাল। মহিলাদের পক্ষে সময়টা অত্যন্ত গোলমেলে।

মিথুন—সন্দেহ ও সংশয় ত্যাগ করুন। কর্মে উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। সন্তানদের ব্যাপারে মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বাইরে যাবার যোগ রয়েছে। মহিলাদের কাছ হতে দূরে থাকবেন। বিদ্যার্থীরা পরীক্ষায় মনোমত ফল লাভ করবেন না। আপনার স্বাস্থ্য প্রায়ই উৎপাত করবে। মহিলাদের সময়টা মোটামুটি ভাল।

কর্কট—মনোমত কার্যে বাধা পড়বে। ভাবপ্রবণতা ও খেয়ালী মনোভাব ত্যাগ করুন। উন্নতির আভাস রয়েছে। আর্থিক দিকটা অত্যন্ত ভাল। স্বাস্থ্য মোটা-মুটি ভাল যাবে। ছোটখাট ভ্রমণ হতে পারে। গুরুজন হানি হতে পারে। বিদ্যার্থীদের সময়টা অত্যন্ত ভাল। পারিবারিক ক্ষেত্রে মতবিরোধ হতে পারে। মহিলাদের সময়টা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ।

সিংহ—প্রয়োজনে মাথা নীচু করা অন্যায় হবে না। তাতে আপনার লাভই হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পত্নীর দ্বারা উপকৃত হবেন। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। উদর-সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পেতে পারেন। কষ্টকর ভ্রমণ হতে পারে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল নয়। মহিলাদের সময়টা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল।

কন্যা—ভাল এবং মন্দ দু'রকম ফলই পাবেন। কর্ম-ক্ষেত্রে শত্রুতার আভাস পাওয়া যায়। তবুও উন্নতি হবে। শরীর কিন্তু ভাল যাবে না। সন্তানদের জন্য দুশ্চিন্তা ভোগ

করতে হবে। দূর ভ্রমণ হতে পারে। গুরুজনদের পীড়া হতে পারে। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় শুভ ফল আশা করতে পারেন। মহিলাদের সময়টা ভাল নয়।

তুলা—অশান্তি বাড়বে এ-মাসে। বন্ধু দ্বারা উপকার পেতে পারেন। আঘাত-প্রাপ্তি হতে পারে। কোন জিনিষ চুরি যেতে পারে। কাউকে কথা দেবেন না। শরীর ভাল যাবে না। সন্তানদের জন্য দুশ্চিন্তা ভোগের লক্ষণ আছে। গুরুজনদের পীড়া হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা আছে। লটারীর টিকেট কাটুন, টাকা পাবেন। মহিলাদের সময়টা ভাল।

বৃশ্চিক—হতাশ হবেন না। ধৈর্য ধরুন। উন্নতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। চাকুরীজীবীদের সময়টা ভাল। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল বলা চলে না। আপনার মাঝে মাঝে শরীর খারাপ করতে পারে। পিতার পূর্বের কোন রোগ বেড়ে যেতে পারে। বিদ্যার্থীদের সময়টা গোলমেলে। মহিলাদের সময়টা অত্যন্ত ভাল।

ধনু—গুরুজন হানির যোগ রয়েছে। অর্থ খরচের ঝামেলায় পড়তে পারেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। দুশ্চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত করবেন না। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি বিলম্বিত হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। নতুন বন্ধু লাভ হবে। ছেলেমেয়েদের কারো কৃতিত্বে আনন্দ বৃদ্ধি পাবে। পরীক্ষার্থীদের সময়টা প্রতিকূল। মহিলাদের সময়টা অত্যন্ত গোলমেলে।

মকর—নৈরাশ্য কেটে যাবে। আর্থিক উন্নতি হবে। কর্মক্ষেত্রে প্রতাপ ও প্রতিপত্তি বাড়বে। শরীর মোটামুটি ভাল থাকবে। দূরে যাবার যোগাযোগ হতে পারে। বন্ধু দ্বারা উপকার পাবেন। পিতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। সন্তানদের ব্যাপারে মনঃকষ্ট পেতে পারেন। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। মহিলাদের কোন জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারে।

কুম্ভ—আপনার সময়টা জটিল। তবু মর্যাদা বাড়বে, আর্থিক উন্নতি হবে এবং অশান্তি কেটে যাবে। মামলা মোকদ্দমা এড়িয়ে চলা উচিত। স্বাস্থ্য প্রায়ই উৎপাত করবে। কষ্টকর ভ্রমণ হতে পারে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। বিদ্যার্থীদের সময়টা অত্যন্ত গোলমেলে। মহিলারা কর্মে সুনাম পাবেন। আর্থিক উন্নতিও হতে পারে।

মীন—গুরুজন হানির যোগ দেখা যায়। ভ্রমণে বাধা আসতে পারে। সন্তানদের জন্য দুশ্চিন্তা ভোগের লক্ষণ দেখা যায়। পারিবারিক কলহ হতে পারে। সামান্য ভুলে বিশেষ ক্ষতি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আর্থিক উন্নতি হবে। বিদ্যার্থীদের সময়টা ভাল। মহিলাদের সময়টা অত্যন্ত গোলমেলে।

এস মঙ্গল

শ্রীরবি গুপ্ত

এসো মঙ্গল, প্রাণ মহীয়ান—
নিখিল ভুবন পথ চাহিয়া,
দুঃখহরণ জ্বালি' দীপ-শিখা
স্বর্ণ কিরণে এসো নাহিয়া।
প্রমূর্ত আশা এসো নির্ভয়
পৃথিবীর বুকে আনো তব জয়,
তিমির-আঁধার হোক হোক লয়—
দীর্ঘ সংগী এসো বাহিয়া,
এসো মঙ্গল, প্রাণ মহীয়ান—
নিখিল ভুবন পথ চাহিয়া।

দুঃস্বপ্নের হোক অবসান
সুচির স্বর্গ আনো গগনে,
জীবন তন্ত্রে নব ঝংকার
অধিরাজ, সাধো, মহালগনে !
সর্বধ্বংসী যাক মেঘ উড়ে—
বিদ্যুৎ-হীনা নিদ্রিত পুরে
জীবনে জীবনে জাগে এক সুরে—
চল বন্দনা-গীত গাহিয়া।
এসো মঙ্গল, প্রাণ মহীয়ান
নিখিল ভুবন পথ চাহিয়া।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নীলকান্ত ব'ললেন, 'আমার বর্তমান অবস্থার কথা বলতে গেলে আমার জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস বলতে হবে। অত শোনার ধৈর্য কি তোমার শেষ পর্যন্ত থাকবে?'

সাগ্রহে দীপেন বলল; 'নিশ্চয়ই থাকবে। আপনি বলুন।'

'তবে শোন।'

দীপেন আর কিছু বলল না। সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ সূচী-মুখে নিয়ে এসে উন্মুখ হয়ে বসে রইল।

নীলকান্ত কিন্তু তৎক্ষণাৎ শুরু করলেন না। হাত দু'টি শরীরের পিছন দিকে মুষ্টিবদ্ধ করে লম্বা পায়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। অনুমান করা যায়, বিচিত্র এক অস্থিরতা চলছে তাঁর মধ্যে। সত্তার অ-দেখা অতল স্তরে কোথাও কি আলোড়ন শুরু হয়েছে? কপালের গভীর রেখাগুলিতে এবং চোখের কুঞ্চনে যা মুদ্রিত তার নাম তো আলোড়নই। নাকি উত্তেজনা, বিক্ষোভ অথবা আর কিছু এমন কিছু যার নাম দীপেনের অজানা।

দীর্ঘ পদচারণার পর নীলকান্ত হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। দীপেনের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে খুব আস্ত অনুচ্চ ধীর স্বরে শুরু করলেন, 'আমার দেশ এই মারাঠা-ওয়াড়াতেই; সাতারা জেলায়। বাবা ছিলেন বোম্বাই য়ুনিভার্সিটির প্রথম আমলের গ্রাজুয়েট; বাল গঙ্গাধর তিলকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে আমলে একজন গ্রাজুয়েটের পক্ষে লোভনীয় সরকারী চাকরি পাওয়া খুব একটা কঠিন ছিল না। সুযোগ এসেছিল অসংখ্য কিন্তু সেগুলোকে কাজে লাগানোর কোন ইচ্ছা বাবার ছিল না; মোহও না। তিলকের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন; এই আদর্শবাদী মানুষটি বাবার প্রাণে যে আলো জ্বেলে থাকবেন তার ভেতর আশ্চর্যের কিছু নেই।'

দীপেন শুনে যাচ্ছিল। আস্তে বলল, 'তারপর—'

'বাবা কিন্তু লোকমান্যের মত রাজনীতির উচ্চকিত কোলাহলের মাঝখানে যাননি। রাজনীতি করার মত মানসিক গঠনই তাঁর ছিল না। বোম্বাই থেকে পাশ করে তিনি সোজা চলে এসেছিলেন গ্রামে। গ্রাম সেবাকে জীবনের ব্রত হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, শহর নয় গ্রামগুলোই হচ্ছে ভারত-বর্ষের হৃৎপিণ্ড, তার শক্তির বনিয়াদ। গ্রামকে বিকশিত করার অর্থই হচ্ছে সারা দেশকে সজীব করা; তার শক্তির উৎসকে সঞ্জীবিত করা।'

বলতে বলতে একটু থেমে নতুন উদ্যমে আবার আরম্ভ করলেন নীলকান্ত, 'সাতারা জেলায় আমাদের বেশ কিছু জমিজমা ছিল। বাবা কৃষাণ নিয়ে নিজের হাতে চাষবাস শুরু করে দিলেন। একে ব্রাহ্মণ, তার ওপর বাবা বোম্বাই থেকে অনেক লেখাপড়া শিখে এসেছেন। তাঁকে চাষবাস

করতে দেখে দেশের লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল। শুধু চাষবাসই না। রাস্তাঘাট ছিল না গ্রামে, লোকদের নিয়ে রাস্তা তৈরি করেছিলেন, পুকুর কাটিয়েছিলেন, কুয়ো কাটিয়েছিলেন। ছেলেদের জন্যে পাঠশালা খুলেছিলেন; বয়স্ক শিক্ষাদীক্ষাহীন চাষীদের জন্য নাইট ক্লাস। দশ বছরের ভেতর ছোট্ট গেঁয়ো পাঠশালা হাই স্কুল হয়ে গিয়েছিল। একটা নয় দু দুটো হাই স্কুল। একটা ছেলেদের, অন্যটা মেয়েদের। পনের বছরের ভেতর একটা কলেজও সেখানে খোলা হয়েছিল।

এতক্ষণ আপন মনে ঘোরের মধ্যেই যেন বলে যাচ্ছিলেন নীলকান্ত। দীপেনের উপস্থিতি খেয়াল হতে হঠাৎ মুখ তুলে ঈষৎ হাসলেন, 'নিজের কথা বলতে গিয়ে বাবার কথা বলছি। তোমার নিশ্চয়ই 'ডাল' লাগছে।'

দীপেন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না না, খুব ইন্টারেস্টিং। আপনি বলে যান।'

নীলকান্ত বলতে লাগলেন, 'বাবার কথা এত করে বলতে হচ্ছে কেননা তাঁর কথা না বললে আমাকে সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। প্রতিমার চালচিত্র দেখেছ তো?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'আমার বাবা হচ্ছেন আমার জীবনের চালচিত্র।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর নীলকান্তই আবার বললেন, 'এ সব এই শতাব্দীর কথা নয়। নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির শেষ দিকের কথা। বাবা শুধু নিজের গ্রামখানাকেই আলোকিত করেন নি; আশেপাশের বিরাট অঞ্চলে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা সে আমলের পক্ষে কি রকম প্রোগ্রেসিভ ছিলেন শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে মিস্টার লাহিড়ী। নিষ্ঠাবান আচারিয়া ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে হয়েও জাতিভেদ মানতেন না। জাতিগত সমস্ত বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর তীব্রতম সংগ্রাম। অস্পৃশ্যতা তিনি গ্রাহ্য করতেন না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে যে জাতই হোক তার হাতে খেতেন। তথাকথিত নীচু শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে যাত্রা করতেন, গণেশ পুজোয় সং সাজতেন। নিজেকে গণদেবতার সেবায় তিনি উৎসর্গ করেছিলেন।

'আজকাল তেভাগা আন্দোলন বলে একটা কথা শোনা যায়। বাবা সেই আমলেই নিজের জমির অর্ধেক ধান কৃষাণদের দিতেন, বাকি অর্ধেক নিজে নিতেন। নিজে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হয়েও 'ঘাটি'দের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন।'

দীপেন কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। বলল, 'ঘাটি কি?'

'তথাকথিত নীচু জাত।' নীলকান্ত বলতে লাগলেন, 'তোমরা একালের ছেলে। বুঝতেই পারবে না সে আমলের পক্ষে এ সব কি নিদারুণ দুঃসাহসের কাজ। তখন সমাজের চারদিকে অসংখ্য নিষেধ, অগণিত অচলায়তন। এগুলোকে উপেক্ষা করতে হলে কি মারাত্মক মনোবলের প্রয়োজন হতে পারে উনিশ শ তেষট্টি সালে দাঁড়িয়ে তা কল্পনাও করা যায় না।'

দীপেন হঠাৎ বলে উঠল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'স্বচ্ছন্দে।'

'আপনার বাবাকে এই রেভলিউশনারি স্পিরিটের জন্যে লাঞ্ছিত হতে হয় নি?'

'নিশ্চয়ই হয়েছে। চাষাভুষা জাতীয় সমাজের নিচু তলার লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যে তথাকথিত নাক উঁচুদের ক্ষোভ তো ছিলই; তার ওপর বাবা জমির অর্ধেক ধান কৃষাণকে দিয়ে দেওয়ায় ক্ষোভটা রাগে পরিণত হয়েছিল।'

'কেন?'

'কেন আবার, আমাদের এখানে রেওয়াজ ছিল কৃষাণরা জমিদারের জমি আবাদ করলে চারভাগের একভাগ ফসল পাবে। বাবা মনে করতেন এ নিয়ম আদৌ ন্যায়সঙ্গত নয়। যারা রক্ত আর ঘামের বিনিময়ে মাটিকে ফসলবতী করে তোলে তারাই আসল জমির মালিক। দলিল-পত্রে নাম থাকার সুযোগ নিয়ে যারা মালিকানা ভোগ করে, চাষীদের পরিশ্রমের ফল বারো আনা আত্মসাৎ করে তারা ক্রিমিনাল। এই ভয়াবহ রক্তশোষণের নীতি বহুজনের হিতে বহুজনের কল্যাণে যেভাবেই হোক বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। তখন তো একালের মত রাজনৈতিক সচেতনতা আসে নি; এত কৃষক সংগঠন বা ইউনিয়নও তৈরি হয় নি। চ্যারিটি বিগিনস্ এ্যাট হোমের মত বাবা একেবারে মূল থেকে শুরু করেছিলেন। নিজের জমির ধান সমানভাগে ভাগ করে কৃষাণদের দিচ্ছিলেন। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া খুব ভাল হয় নি।'

'কেন?'

'দেশের সমস্ত জমির মালিক তো আর আমার বাবা নন। সব কৃষককেও তিনি চাষের কাজ দিতে পারেন না। যারা অন্যের জমিতে কাজ করত, বাবার দৃষ্টান্ত অনুসারে অর্ধেক ফসল দাবী করত। কিন্তু অন্য জমির মালিকরা তো আর বাবার মত সহৃদয় নয়। অর্ধেক ফসল দিয়ে বাবা যে উৎপাত বাধিয়ে ছিলেন তাতে অন্য জমির মালিকরা তাঁর ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন। বাবাকে তাঁরা চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে বাবা অর্ধেক ফসল না দিয়ে চিরাচরিত প্রথাই মেনে নেন। কিন্তু বাবা অন্য ধাতুর মানুষ। একবার যা ন্যায়সঙ্গত মনে করেছেন তা থেকে তাঁকে নড়ানো অসাধ্য। অতএব এক শ্রেণীর মানুষের বিদ্বেষ এবং শত্রুতা তাঁর বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়েছিল।

একটু থেমে জানালার বাইরে তাকালেন নীলকান্ত। বাইরে আরব সাগর থেকে শরতের এলোমেলো বাতাস উদাসী বাউলের মত ঠিকানাহীন নিরুদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে। সামনের বাগানটা অন্ধকার, সেখানে ঝাউ-গাছের চিরুণী চিরুণী পাতার ফাঁকে ক'টা জোনাকি আলোর সূঁচের মত অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে খেলা করে চলেছে। বাগান পেরিয়ে ঘোড়বন্দর রোডে বাস-ট্রাক —লরীর অশ্রান্ত স্রোত। সারা দিনরাত ওখানে শুধু জোয়ার; মুহূর্তের জন্যও ভাটার টান চোখে পড়ে না।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন নীলকান্ত। সম্ভবত স্মৃতিকে অধ্যায়ে অধ্যায়ে মনের ভেতর সাজিয়ে নিলেন। অবশেষে দীপেনের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'বাবার বিরুদ্ধে শত্রুতা, বিদ্বেষ—এসব তো জমা হচ্ছিলই। সেটা ফেটে পড়ল যখন বাবা ঘাটিদের মেয়ে বিয়ে করে বসলেন। আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজ বাবাকে একঘরে করে দিলে। তাদের সঙ্গে বাবার আর কোন সম্পর্ক রইল না।'

'তারপর—'

'তারপর কী হল তুমিই বল না?' নীলকান্ত হাসলেন।

দীপেন বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল। কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

নীলকান্ত একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার ধারণা হতে পারে, সবাই সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বলে বাবা হয়ত লজ্জায় পরাজয়ের গ্লানিতে দেশান্তরী হয়ে গেলেন। কিন্তু ত তিনি করেন নি। যা সত্য যা ন্যায় তার জন্য যুদ্ধ করার মত চারিত্রিক দৃঢ়তা আর মানসিক সবলতা তাঁর ছিল। সমস্ত বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করে গ্রামেই তিনি থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর সান্ত্বনা ছিল, আত্মীয়-স্বজন আর স্বজাতির ক'টি লোক বিপক্ষে গেলেও দেশের অগণিত মানুষ ছিল তাঁর পাশে। বাবা তাদের হৃদয় জয় করে নিতে পেরেছিলেন।'

একটু থামলেন নীলকান্ত। বললেন, 'মোটামুটি এই হচ্ছেন আমার বাবা। চরিত্রটি কেমন মনে হল তোমার?'

দীপেন কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়েছিল। নিষ্ঠুর, অনুদার আর হৃদয়বর্জিত সমাজের পটে বিজয়ী বীরের মত এক দুঃসাহসী বিদ্রোহীর ছবি বার বার তার চোখের সামনে ফুটে উঠছে। শ্রদ্ধায়, আবেগে তার প্রাণ এই মুহূর্ত পরিপূর্ণ। আপ্লুত স্বরে দীপেন বলল, 'অসাধারণ!'

নীলকান্তর চোখ এমনিতেই দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল। সে দু'টি এই মুহূর্তে যেন আরো আলোকিত হয়ে উঠল। দীপেনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে তিনি বললেন, 'বুঝতেই পারছ জন্মানর পর আমি কোন আবহাওয়ায় চোখ মেলেছিলাম, ফুসফুসে কোন বাতাস টেনেছিলাম, কোন মাটি থেকে প্রাণরস নিয়েছিলাম। বুঝতেই পারছ বাবা আমার জন্যে কোন পরিবেশ কোন পৃথিবী সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। বড় হয়ে গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে আমি এসেছিলাম বোম্বাইতে। এই যে বাড়িটায় বসে আছ এটা সেই সময় বাবা তৈরি করিয়ে-ছিলেন। আমি যখন বি-এ ক্লাসের ছাত্র গান্ধীজী নন-কো-অপারেশনের ডাক দিয়েছেন। ১৯০১ সালে টলষ্টয় ইতালীয় অ্যানার্কিস্টদের যে পরামর্শ দিয়েছিলেন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন হুবহু তারই প্রতিচ্ছবি। যাই হোক নন-কো-অপারেশনের ডাকে জনচিত্ত তখন উদ্বেল; সারা ভারতবর্ষ ঢেউএর মাথায় দোল খাচ্ছে। তার কিছু-দিনের মধ্যে প্রিন্স অব ওয়েলস্ এসেছিলেন এদেশে। মনে পড়ছে, দেশের যে প্রান্তেই তিনি গেছেন উপেক্ষা ছাড়া আর কিছু পান নি। দেশের মানুষ চরম উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে থেকেছে। এইভাবে ভারতবর্ষ সেদিন তার

অপমানিত, লাঞ্ছিত, পরাধীন প্রাণের বিক্ষোভ আর যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছে।

'আমি তখন যুবক। যৌবন হচ্ছে সেই কাল যা পুরোপুরি আবেগের দখলে। লক্ষ্য করেছি, দলে দলে মানুষ সরকারী চাকরী ছেড়ে দিচ্ছে, ছেলেরা ইংরেজের স্কুল-কলেজ ছাড়ছে। সে একদিনই এসেছিল ভারতবর্ষে। আমি অবশ্য কলেজ ছাড়িনি। কিন্তু তরঙ্গিত উন্মেষিত দেশ আমার পায়ের সামনে দুর্বার এক স্রোতকে এনে দিয়েছিল। সেই স্রোতে নিজেকে ছুঁড়ে না দিয়ে পারি নি।

'অসহযোগ আন্দোলনে সেই যে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম, আমার নিয়তি বোধহয় তাতেই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারপর একে একে লবণ সত্যাগ্রহ এসেছে। বিদেশী জিনিস বর্জন এসেছে, আইন অমান্য আন্দোলন এসেছে। পুরোভাগে না থাকলেও মাঝখানে থেকে বার বার আমি জেলখানায় গেছি।

'বাবা গ্রাম সংগঠন নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর সংগ্রাম। কিন্তু রাজনীতির উচ্চকিত জটিলতা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। আমি কিন্তু পুরোপুরি রাজনীতিকেই আঁকড়ে ধরেছিলাম। বাবার চরিত্রের সবলতা এবং দৃঢ়তা উত্তরাধিকার সূত্রে আমার মধ্যে ছিল। তা ছাড়া আদর্শবাদী বিভিন্ন নেতার সংস্পর্শে আসারও সুযোগ ঘটেছিল। সে সময়টাই ছিল বোধহয় সম্পূর্ণ আদর্শবাদের। এমন মানুষও আমি দেখেছি, সত্যের জন্য, আদর্শের জন্য অক্লেশে তাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করতে পারতেন। তাঁদের কাছে গেলেই অনুভব করা যেত, নিজের সমস্ত খাদ পুড়ে পাকা সোনা হয়ে উঠলাম। আজকাল তেমন একটি মানুষ সারা দেশ খুঁজে বেড়ালেও বোধহয় পাওয়া যাবে না।

'যাই হোক, সমস্ত দেশের সামনে তখন একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা। তার নাম স্বাধীনতা। যে কোন মূল্যে—প্রাণই হোক, বন্দিত্বই হোক, নিগ্রহই হোক—যে কোন মূল্যেতেই সেই পরম কাঙ্ক্ষিতকে আমাদের লাভ করতে হবে। বাবা বহুজনের হিতে বহুজনের সুখে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু ঐ ভাবে ক'টা মানুষের কল্যাণই বা করা সম্ভব? আর তার পরিমাণই বা কতটুকু? ইচ্ছা যত বড়ই থাক না কেন, দেশ যেখানে গোলামখানামাত্র সেখানে দেশের মানুষের কল্যাণ খুব বড় মাপে করা যায় না। অতএব প্রথম কর্তব্য হচ্ছে শৃঙ্খলিত দেশের বন্ধন মোচন।'

বলতে বলতে হঠাৎ থামলেন নীলকান্ত। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরময় পায়চারি শুরু করলেন।

কয়েকদিনের যাতায়াতে দীপেন লক্ষ্য করেছে, অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারেন না নীলকান্ত। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে পদচারণা আরম্ভ করেন। খুব সম্ভব যখন তিনি কথা বলেন সেই সময় তাঁর মনে অন্য ভাবনার স্রোত বয়। ভেতরকার সেই স্রোতটা যখন প্রবল হয়ে ওঠে হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ান এবং অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। সে সময় তাঁর সামনে যেন আর কিছুই থাকে না, থাকলেও কিছুই তিনি দেখতে পান না, শুনতে পান না। সব অশ্রুত আর নিরবয়ব হয়ে যায়। নীলকান্তর উন্মুখ অস্থির সত্ত তখন কান পেতে আপন ভাবনার প্রতিধ্বনি শোনে, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সম্ভবত বোঝাপড়াও করে।

খানিকটা হাঁটার পর স্থির হলেন নীলকান্ত। দীপেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু কফি হলে মন্দ হত না, কি বল?'

'হ্যাঁ' এবং 'না'—দুয়ের মাঝামাঝি একটা রফা করে মাথা নাড়ল দীপেন। অর্থাৎ হলে ভালই, না হলেও আপত্তি নেই।

নীলকান্ত এবার কফি তৈরিতে মন দিলেন। দুধ, চিনি ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্টোভে জল বসালেন। দীপেন উঠে এসে তাঁকে সাহায্য করতে লাগল।

কফি তৈরি হলে দু-জনে দু-পেয়ালা নিয়ে আবার মুখোমুখি বসল। আয়েস করে দীর্ঘ একটি চুমুক দিতেই নীলকান্তর গলা থেকে আরামের অব্যয় বেরিয়ে এল, 'আঃ!'

আরব সাগরের কূলে এই শহরে শরৎ-বাতাসের মতি-গতি বোঝা দায়। খানিক আগেও সে ছিল উদাসী বাউল; হঠাৎ তার পাগলামি ভর করে বসেছে। ফলে সামনের বাগানে ঝাউগাছগুলো দোল খেয়ে চলেছে। ঘোড়বন্দর রোডের ওপর দিয়ে বাতাস সাঁই সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

এক সময় নীলকান্ত বললেন, 'তা হলে আবার শুরু করা যাক।'

দীপেন তাড়াতাড়ি এক চুমুকে বাকি কফিটুকু নিঃশেষ করে উদ্‌গ্রীব হল।

[ক্রমশঃ
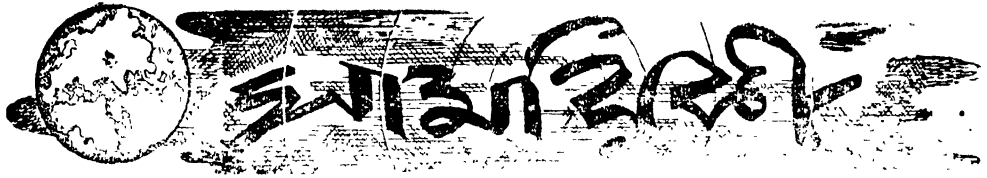
পৃথিবীময় অশান্তি—

শুধু বাংলাদেশে নয় বা শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে সকল দেশেই অশান্তির আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে। শান্তিপূর্ণ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জেও নানারূপ গোলমাল চলিতেছে। রুশদেশ কিছুদিন পূর্বে শান্তিপূর্ণ ছিল। এখানেও রাজনৈতিক অশান্তি ঘোরালো হইয়াছে। চীনে ধীরে ধীরে তীব্র অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়িতেছে। তিব্বত লইয়া চীনে বিষম সমস্যা উপস্থিত। তিব্বত দখল রাখিতে গিয়া চীনকে বহু লোকক্ষয় করিতে হইতেছে। ভারতবর্ষের তো কথাই নাই। খাদ্যাভাব অর্থাভাব তো আছেই তাহার ওপর পাকিস্তান ও চীনের বার বার আক্রমণের হুমকি ভারতবর্ষকে সর্বদাই শুটস্থ করিয়া রাখিয়াছে। আভ্যন্তরীন সঙ্কট দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমান শাসকের দল তাহার কোন সুরাহা করিতে পারিতেছেন না। এই অবস্থার কথা দেশের জনসাধারণকে ধীর ও স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া কর্তব্য পালন করিতে হইবে। ভারতে একদল রাজনীতিক জনগণকে সর্বদা উত্তেজিত করিয়া থাকে। তাহাদের জন্য ভারতের অশান্তি আরও বাড়িয়া চলিয়াছে।

উ-থাণ্ট বহাল—

শ্রীউ-থাণ্ট ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের প্রধান কর্মকর্তার কাজ করেন। তিনি গত ২রা ডিসেম্বর পুনরায় পরিষদ কর্তৃক আবার প্রধান কর্মকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রপুঞ্জের সর্বপ্রধান কার্য্য। উ থাণ্ট এ বিষয়ে কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা জানা যায় না। তাঁহাকে পুনরায় নির্বাচিত করিয়া সারা পৃথিবীর লোক শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্য্যকে সমর্থন করিয়াছেন।

চীন ও রাষ্ট্রপুঞ্জ—

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য করা হয় নাই। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের এক সভায় চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য করার প্রস্তাব হইয়াছিল। আমেরিকা চীন সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করিলে পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য প্রস্তাব সমর্থন না করায় প্রস্তাবটি ভোটে বাতিল হইয়া যায়।

চীন বহুবার চেষ্টা করিয়াও রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হইতে পারিল না;—দেখা যাইতেছে যে, এখনও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ চীনের নীতি সমর্থন করেন না।

পার্বত্যজাতি সমস্যা—

গত ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতায় ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পার্ব্বত্যজাতি সমূহের সমস্যা সমাধানের জন্য এক সম্মেলন হইয়াছিল। উহা রাজনীতিক দলের সম্মেলন না হইলেও সমস্যাগুলি ধীর ও স্থিরভাবে পণ্ডিত-ব্যক্তিগণ আলোচনা করিয়াছিলেন। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য পাবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পক্ষে অধিকার দাবী করা স্বাভাবিক। দার্জিলিং অঞ্চলের পার্বত্য অধিবাসীরা বহুদিন হইতে উত্তরবঙ্গে তাহাদের একটি স্বতন্ত্র রাজ্যগঠনের জন্য উৎসুক হইয়াছে। অবশ্য এতদিন পর্য্যন্ত দেশের শাসন ব্যবস্থায় তাহাদের অধিক যোগদানের সুযোগ ছিল না, এবং স্বাধীনতার পূর্বেও তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থাও কম ছিল। সে জন্য তাহাদের মধ্যে রাজনীতিক চেতনাও অধিক হয় নাই। আসামের উত্তরাঞ্চলের একটি বড় স্থান লইয়া উত্তরপূর্ব-সীমান্ত রাজ্য বা "নেফা" গঠিত হইয়াছে। মিজো পাহাড় অঞ্চলের লোকরাও ঐরূপ একটি অঞ্চল গঠন করিয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করিতেছে। পাহাড় জঙ্গল ও নদী পরিপূর্ণ বিরাট অঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা কম হইলেও

সমস্যা বহুবিধ এবং তাহার সমাধানের জন্য বহু অর্থব্যয় প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্য বিষয়ে খরচ কমাইয়া পার্বত্য জাতি সমূহের উন্নতি বিধানের জন্য অর্থ ব্যয় করিতেই হইবে। আসামের পার্শ্বে মণিপুর ও ত্রিপুরা দুইটি ছোট রাজ্য গঠিত হইয়াছে। আরও কয়েকটি ছোট রাজ্য গঠিত হইলে প্রশাসনিক ব্যয় খুবই বাড়িয়া যাইবে। এইরূপ বহু সমস্যার কথা কলিকাতার সম্মেলনে আলোচিত হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সকল কথা বিবেচনা করিয়া পার্বত্য-জাতিদের সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইবেন।

নিবারক নিরোধ আইন—

দেশে অস্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হইলে যখন সাধারণ আইনে কাজ হয় না তখন বিশেষ আইন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। বিশেষ প্রয়োজনের জন্য এই নিবারণ নিরোধ আইন সৃষ্ট হইয়াছিল। আজ ভারতের অবস্থা অস্বাভাবিক না হইলেও একদল ব্যক্তি ভ্রান্ত পথে চলিয়া সর্ব্বদা দেশে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের অন্যায় কার্য্য দমন করিবার জন্য গত ২৯শে নভেম্বর দিল্লীর লোকসভায় নিবারণ নিরোধ আইনটির মেয়াদ তিন বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাহ্যতঃ বিষয়টি কঠোর হইলেও প্রয়োজন বোধে বেশ অধিক সংখ্যক সদস্য আইনের পক্ষে ভোট দিয়াছেন।

দেশের খাদ্যাভাব—

বহুদিন হইতে আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের অভাব চলিতেছে, স্বাধীনতা লাভের পর তাহা আরও প্রবল হইয়াছে। গত ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের লোক গণনার হিসাবে দেখা যায় যে মানুষের সংখ্যা অতি দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। সেই জন্য সরকারপক্ষ পরিবার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচার করিলেও তাহার কোন সুফল দেখা যায় নাই। শিক্ষা বিস্তারের ফলে মানুষ ক্রমশ বিলাসী ও কৃষিবিমুখ হইয়াছে। যাহাদের পূর্ব পুরুষরা শুধু চাষের কাজ লইয়া গ্রামে বাস করিত তাহারা সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া কৃষি কার্য্যের প্রতি উদাসীন হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে জামা কাপড় পরিতে অধিক অভ্যস্ত করিয়াছে। এবং যাহারা বেশী জামা কাপড় পরে আমরা তাহাদিগকে বেশী সম্মান দিতে শিখিয়াছি। তাহার ফলে যাহারা ছোট কাপড় পরিয়া ও খালি গায়ে থাকিয়া আমাদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে আমরা তাহাদের 'চাষা' বলিয়া অনাদর করি এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা জামা কাপড় পরিয়া কারখানায় কাজ করে তাহাদিগকে 'বাবু' বলিয়া বেশী আদর করি। স্বাধীনতা লাভের পর ২০ বৎসর চলিয়া গেলেও আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি আমরা এমনভাবে পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই, যাহাতে আমাদের মন হইতে এই কু-অভ্যাস দূরীভূত হয়। তাহা ছাড়া চাষের কাজে হাজা বা শুকা হইলে উৎপাদন কম হয়, কৃষককে কষ্ট পাইতে হয়, কারখানার কাজে সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা কম। কৃষককে চাষের সময় জলে ভিজিয়া ও রৌদ্রে পুড়িয়া ২৪ ঘটা পরিশ্রম করিতে হয়। কারখানার কাজের সময় বাঁধাধরা থাকে। অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে অধিক অর্থ পাওয়া যায়। সেই জন্য লোক চাষের কাজ ছাড়িয়া দেয়, এইরূপ বহুবিধ কারণে দেশে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া গিয়াছে, এবং বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে চাল ও গম আমদানী না করিলে আমরা খাইতে পাই না। বর্ত্তমান বৎসরে বিহার ও উত্তর প্রদেশে অনাবৃষ্টিতে বহু স্থানে শস্য উৎপন্ন হয় নাই, পশ্চিমবঙ্গেও ছয়টি জেলায় অনাবৃষ্টির জন্য কম শস্য উৎপন্ন হইয়াছে, সেজন্য গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সর্বত্র হাহাকার দেখা দিয়াছে। সরকারপক্ষ বিদেশ হইতে ও পশ্চিমবঙ্গের যে সকল জেলায় বেশী শস্য হইয়াছে সেখান হইতে চাউল সংগ্রহ করিয়া কোন রকমে এখনও মানুষকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এইভাবে খাদ্য সরবরাহ কতদিন সম্ভব হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। কলিকাতা ও সহর অঞ্চলে রেশনে যে চাউল দেওয়া হইতেছে তাহা অনেক সময় মানুষের খাওয়ার অনুপযুক্ত, খোলা বাজারে যে চাউল গত পূজার পূর্বে একটাকা কিলো দরে পাওয়া যাইত ডিসেম্বরের মধ্যভাগে তাহার দাম দুই টাকা কিলো হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বহু অবাঙ্গালীর বাস তাহারা দুইবেলা রুটী খাইতে ভালবাসে সেজন্য তাহারা তাহাদের প্রাপ্য চাউল কিছু বেশী দামে বাঙ্গালীদিগকে বিক্রয় করিত। সম্প্রতি স্থির হইয়াছে তাহাদিগকে চাউল দেওয়া বন্ধ করিয়া বেশী পরিমাণ গম দেওয়া হইবে। ফলে বাঙ্গালীরা সেদিক দিয়া বেশী চাউল সংগ্রহ করিতে পারিবে না। ভবিষ্যতে

দেশের খাদ্যের অবস্থা কি হইবে তাহা চিন্তা করিয়া শুধু সরকার নহে দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি শংকিত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু তথাপি প্রতিকারের জন্য মানুষ অধিক উৎপাদনের চেষ্টায় মনোযোগী হয় নাই, তাহার বহু কারণ বর্ত্তমান। সরকার কৃষিবিভাগে বহু অধিক বেতনের কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন—যাহারা মন দিয়া কাজ না করার ফলে প্রকৃত কৃষকের কোন উপকার হইতেছে না। সেচের ব্যবস্থা কোথাও আশানুরূপ সফল হয় নাই। বহু স্থানে খাল কাটা হইলেও চাষের সময় তাহাতে জল পাওয়া যায় না। মাঠে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নলকূপ খনন করা হইতেছে। কিন্তু বিদ্যুতের অভাবে বা উপযুক্ত দেখা-শোনার অভাবে তাহা হইতে প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যায় না।

নির্বাচনে দলাদলি—

গত ১৫ বৎসর সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল জয়ী হইয়া প্রায় সকল রাজ্যে এবং কেন্দ্রেও মন্ত্রীসভা গঠন করিতেছে। সেই জন্য কংগ্রেস বিরোধী দল সর্ব্বদা কংগ্রেসকে হারাইয়া দিবার জন্য কথা বলিয়া থাকেন। আগামী নির্ব্বাচনে সেইজন্য সকল বিরোধীদল এক যোগে মিলিত হইয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী স্থির করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই মাস চেষ্টার ফলেও বিরোধী-দলের মিলনের চেষ্টা সফল হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে বহুসংখ্যক বিরোধীদলের মধ্যে ৭টি দল একদিকে ও তিনটি দল একদিকে মিলিত হইয়া জোট বাঁধিয়াছে।

শিক্ষা সংকট—

১৯৬৬ সালের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সারা বছরই পশ্চিমবাংলায় স্কুল-কলেজগুলি অধিকাংশ দিন বন্ধ হইয়া রহিল। নানারূপ বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া ছাত্রদিগকে এই একবৎসর কাটাইতে হইয়াছে এবং তাহাদের শিক্ষা কোনদিক দিয়া অগ্রসর হয় নাই। অথচ স্কুলগুলিতে যথারীতি বার্ষিক পরীক্ষা হইবে ও সেই পরীক্ষার ফল দেখিয়া তাহাদের বিচার করা হইবে। শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবক তিন শ্রেণীর চেষ্টা ও সহযোগিতার উপর শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু অধুনা দেখা যাইতেছে ছাত্ররা সকল সময়েই ফাঁকি দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, শিক্ষকরাও বর্ত্তমান যুগে প্রায় সকলে সেই পথের পথিক হইতেছেন। অভিভাবকগণ নির্ব্বিকার ও নিশ্চেষ্ট—শুধু দর্শকের ভূমিকায় কাজ করেন। কাজেই সমগ্র দেশের অবনতি ঘটিলে কাহারও কিছু বলিবার নাই। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আজ দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

গত পূজার ছুটির পর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর খোলে নাই। কয়েকজন ছাত্রের হাঙ্গামা করার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ হইয়া যাওয়া অতীব দুঃখের বিষয়। নবেম্বর মাস হইতে যে সকল পরীক্ষা হওয়ার কথা সে সকল পরীক্ষা ত হইলই না, তাহাছাড়া ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে যে সকল পরীক্ষা হইত সেগুলিরও উদ্যোগ আয়োজন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সে সকল পরীক্ষা কবে হইবে তাহা বুঝা যাইতেছেনা। ইহার ফলে বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন বিপন্ন হইবে, এবং কি পরিমাণ অর্থ প্রত্যেককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে তাহার হিসাব করা সম্ভব নহে। বয়স বাড়িয়া যাওয়ার ফলে অনেক ছাত্রের চাকুরী প্রাপ্তির আশা চলিয়া যাইবে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিবার লোক নাই। যাঁহারা নিজেদিগকে শিক্ষাবিদ্ বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহারাও এসম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করিতেছেন না। দেশের প্রবীণ শিক্ষা-বিদরা যদি এক যোগে এই দুরবস্থার প্রতিকারে অগ্রসর হইতেন তাহা হইলে হয়ত কোন সুরাহা হইত। কিন্তু তাহারও কোন চেষ্টা এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলরগণ কেন সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় হইতেন তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্ণধারগণ সকলেই সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন। কাহাকেও কোন কথা বলিতে শুনা যায় না।

কলিকাতায় হাঙ্গামা—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী হাঙ্গামার পর গত ৮ই ডিসেম্বর হইতে কয়েক দিন সে অবস্থা চরম হইয়াছে। শান্তিকামী নাগ-রিকেরা কলিকাতার পথে বাহির হইতে পারেনা। এজন্য কে বা কাহারা অপরাধী তাহার বিচার না করিয়াও বলা যায় যে দুর্ব্বল সরকার যে ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তাহা

কেহই অস্বীকার করিবেন না। এইভাবে ছাত্রগণকে গোলমাল করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়ায় সারাদেশের ছাত্র সম্প্রদায়ের শিক্ষার গতি ব্যাহত হইয়েছে এবং দেশের সাধারণ নাগরিকগণও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থা আর বেশীদিন না চলাই দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গলের কথা। উভয় পক্ষের সম্মান বজায় রাখিয়া কেহ কি একটা মীমাংসার সূত্র বাহির করিতে পারেন না?

ছাত্র চাঞ্চল্য—

গত ৩।৪ মাস সারা ভারতে নানা কারণে ছাত্রদের মধ্যে ধর্মঘট প্রভৃতির ফলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় অচল হইয়াছে। অন্ধ্রাজ্যে পঞ্চম ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবে কিনা এই প্রশ্নে ওই রাজ্যে এত অধিক ছাত্র ধর্মঘট হইয়াছে যে বিদ্যালয়গুলি কয়েক সপ্তাহ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ছাত্ররা স্কুল কলেজের বাড়ী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, রেল স্টেশন আক্রমণ ও লুট করিয়াছে, রেলের লাইন উপড়াইয়া দিয়াছে ও বহু সরকারী অফিস আদালতের ক্ষতি করিয়াছে, তাহার ফলে পুলিশ লাঠি, গুলি, ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করিয়াছে। এই সকল হাঙ্গামায় বহু ছাত্র, পুলিশ ও সাধারণ মানুষ আহত ও নিহত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র, দিল্লী, ও উত্তর প্রদেশে ছাত্রচাঞ্চল্য কম হয় নাই। উত্তর প্রদেশে এই হাঙ্গামার ফলে কয়েক মাস ৩।৪টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল; কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে ছাত্র ধর্মঘট এখনও চলিতেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ গত অক্টোবর মাসে কয়েকদিন ধরিয়া সত্যাগ্রহ করার ফলে পূজার পূর্ব্বেই তাহাদের বিশেষ অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে এবং দীর্ঘ দিন ছাত্রদের লেখাপড়া বন্ধ ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সী কলেজ, মৌলানা আজাদ কলেজ, মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ প্রভৃতিতে ছাত্র হাঙ্গামার ফলে বহুদিন লেখাপড়া বন্ধ ছিল। এমনি বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ছাত্রদের ভাল করিয়া শিক্ষাদানের সুযোগ নাই। তাহার উপর এই সকল হাঙ্গামা ছাত্রদিগকে আরও বেশী বিপথগামী করিতেছে। দীর্ঘদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি যে কবে হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। যাহারা ভাল করিয়া লেখাপড়া করে তাহাদের অবস্থাও সংকটজনক হইয়াছে। দেখা যাইতেছে অরাজকতা ক্রমে দেশের সকল স্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এক শ্রেণীর লোকেরা এই অরাজকতা সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতেছেন বলিয়া শুনা যায়। সরকার তাহাদেরও দমন করিতে পারেন নাই। অধিক সংখ্যক দেশবাসীর মধ্যে নানারূপ অসন্তোষ পুঞ্জীভূত থাকায় কেহ অগ্রণী হইয়া এই সকল অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হন না। ফলে অনাচার দিন দিন বাড়িয়া যায়। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন, কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ প্রভৃতি সকলেই এই অনাচারের নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু ইহার প্রতিকারের কোন সুব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা তাহার কার্য্যকালে অনেক কঠোর ব্যবস্থার কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু তিনি অন্য বিভাগে বদলী হওয়ায় নূতন শিক্ষামন্ত্রী ফকরুদ্দীন সাহেব সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টি—

১৩৭১ সালে দারুণ অনাবৃষ্টির ফলে সারা পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য উৎপাদন অত্যন্ত কম হইয়াছে। বিশেষ করিয়া চারটি জেলার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন বলিয়া জানা গিয়াছে। একদিকে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর এবং অন্যদিকে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া এই চারটি জেলাতে অতি অল্প পরিমাণ ফসল হওয়ায় বাহির হইতে শস্য আনিয়া ঐ সকল জেলার অধিবাসীদের বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। পূর্বে মালদহ ছাড়া বাকি তিনটি জেলা উদ্বৃত্ত বলিয়া জানা যাইত। এবার ঐ চারটি জেলায় অনাবৃষ্টি সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়াছে। গত ২৯শে নভেম্বর কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসএ মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ঐ চারটি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যেন ঐ সকল জেলার কৃষকগণের খাজনা মকুব করা হয়। তাহা ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী ঐ সকল জেলার অধিবাসীর সাহায্যের জন্য নানাস্থানে ঘুরিয়া তাহাদের জন্য খাদ্য ও অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে এখন হইতে অবহিত হইয়া দুর্গতদের সাহায্যের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন তাহাতে মনে হয় তাঁহার চেষ্টায় এবার ঐ চারটি জেলায় অনাহারে

কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না। কিন্তু দায়িত্ব শুধু মুখ্যমন্ত্রীর একার নহে। প্রত্যেক দেশবাসীকেই এই সাহায্য-দান কার্য্যে মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে হইবে। আমরা আশা করি, সকলে মুখ্যমন্ত্রীর এই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্যদান করিতে অগ্রসর হইবেন।

চিড়ে ও মুড়ি—

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের ভাত রুটী ছাড়া প্রধান জলখাবার চিড়ে ও মুড়ি। পূর্ব্বে দেশে প্রচুর ধান হইত বলিয়া সর্বস্তরের লোকই এই জলখাবার ব্যবহার করিত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতিদিগকে এই জলখাবার দিয়া আদর করা হইত। গ্রামাঞ্চলে এমন কি সহরাঞ্চলেও মুড়ির ব্যবহার এক সময়ে খুব বেশী ছিল। শ্বেতাঙ্গদিগের অনুকরণে শহরের লোক মুড়ির বদলে বিস্কুট খাইতে আরম্ভ করায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঋষিকল্প আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দেশবাসীকে বিস্কুট ছাড়িয়া মুড়ি খাইতে আবেদন জানাইয়াছিলেন। অবশ্য কালের প্রভাবে অধিক লোক তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। বিস্কুটের প্রচলন দেশে খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। এমন কি সুদূর পল্লীগ্রামেও সুলভ বিস্কুটের কারখানা হইয়াছে এবং স্কুল পাঠশালার ছেলেরা টিফিনে বিস্কুট ব্যবহার করিয়া থাকে। সে যাহা হউক চাউলের অভাব দেখিয়া বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদেশে চিড়া ও মুড়ির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ফলে দেশের লোক প্রয়োজন মত চিড়া ও মুড়ি না পাইয়া বিশেষ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিয়াছে। সম্প্রতি গত ২২শে নভেম্বর চিড়া ও মুড়ির নিয়ন্ত্রণ আদেশ তুলিয়া দিয়াছেন ইহার ফলে যদি দেশে পাউরুটী বিস্কুটের ব্যবহার কমিয়া চিড়া ও মুড়ির ব্যবহার বৃদ্ধি পায় তবে তাহা দেশের পক্ষে অবশ্যই মঙ্গলদায়ক হইবে। শুনা যায় বর্ত্তমানে বহু স্থানে যন্ত্রের সাহায্যে চিড়া তৈয়ার হইতেছে। চিড়া বাঙ্গালীর শুধু উপাদেয় খাদ্য নহে—উপকারী খাদ্য, তাহার ব্যবহার যত বাড়িবে দেশবাসীর মধ্যে ব্যাধি তত কম হইবে। আমরা উৎকৃষ্ট বিস্কুটের নিন্দা করি না, কিন্তু উৎকৃষ্ট বিস্কুটের মূল্য এত অধিক যে দরিদ্রের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। কাজেই সস্তায় বিস্কুট ক্রয় বন্ধ করিয়া দরিদ্র ব্যক্তিরা যদি তাহার পরিবর্ত্তে মুড়ি ব্যবহার করে তবে তাহারা অনেক ব্যাধির হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিবে। চিড়া মুড়ির নিয়ন্ত্রণের আদেশ বাতিলের ফলে দেশবাসী যদি নূতন করিয়া ইহাদের ব্যবহারে মনোযোগী হয় তবেই এই আদেশ প্রবর্ত্তন সার্থক হইবে।

কলিকাতার যানবাহন—

পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাঙালীদের বেকার সমস্যা দূর করিবার জন্য কলিকাতায় ষ্টেট বাস চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, শহর হইতে ক্রমে সকল বেসরকারী বাস সরাইয়া দিয়া শুধু সরকারী বাস চালানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি লক্ষ্য করিয়া ছিলেন বেসরকারী বাসগুলি ক্রমে ক্রমে শুধু অবাঙ্গালীদের হাতেই চলিয়া যাইতেছে। অবাঙালীরা তাহাদের বাসে বাঙালী শ্রমিককেও স্থান দেয়না। কিন্তু বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে সরকারী বাস সংস্থায় যোগ্য কর্ম্মীর অভাবে গত কয় বৎসরেও লাভ না হইয়া ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। বাসের কর্ম্মীরা পর্য্যাপ্ত বেতন পান না একথা সত্য। কিন্তু চুরি ও অব্যবস্থার ফলে ব্যয়ের পরিমাণও কম হয় না। সরকারী বাস মেরামতের জন্য কটি বিরাট কারখানা নির্ম্মিত হইলেও প্রতিদিন দেখা যায় ১৩০০ বাসের মধ্যে ৬০০-র অধিক বাস রাস্তায় বাহির হয়না। বাকীগুলি অচল অবস্থায় কারখানায় পড়িয়া থাকে। গত দুই মাস হইতে কলিকাতায় বাসের অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। বাসযাত্রীদের দুর্ভোগের অন্ত নাই। বাসের সংখ্যা কম বলিয়া যাত্রীদিগকে বহুস্থানে পথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় অথচ সরকারী বাস সংস্থায় মোটা বেতনের কর্মচারীর অভাব নাই। পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন মন্ত্রী কি এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে কোন চেষ্টা করিবেন না?

আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন—

আগামী ১৫ই হইতে ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারতের সর্ব্বত্র সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী একই দিনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। সারা ভারতে ভোটদাতার সংখ্যা ২৪ কোটি, এবং ভোট গ্রহণ ব্যাপারে মোট ৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ৮ কোটি টাকা ত সরকার ব্যয় করিবেন। যাহারা ভোটে

দাঁড়াইবেন তাঁহাদের সকলের মোট কত কোটি টাকা খরচ হইবে তাহার হিসাব কখনও পাওয়া যায় না। ভোটাভুটি নাকি গণতন্ত্রের লক্ষণ। কিন্তু এই দরিদ্র দেশে এরূপ বিপুল অর্থব্যয় কি ভাবে সমর্থন করা যায়?

ঘরেই আগুন—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান কর্মকেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিংসে সেদিন সরকারী কর্মচারীরা আইন অমান্য ও ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। যাহারা সর্ব্বদা মন্ত্রীদের নিকট যাইয়া নিজেদের অভাব অভিযোগ জানাইবার সুবিধা রাখে তাহাদের কেন আইন অমান্য বা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে হইবে তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। মন্ত্রীরা কি তাঁহাদের নিজ নিজ বিভাগের কর্মীদিগকে বুঝাইতে সমর্থ হন না? আমরা জানি সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ খুব বাড়িয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া দরিদ্র কর্মীদের সম্বন্ধেও কর্মকর্তাদের সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করা উচিত।

দেবজ্যোতি বর্ম্মণ—

খ্যাতনামা অধ্যাপক ও সাংবাদিক দেবজ্যোতি বর্ম্মন গত ৮ই ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে তাঁহার মধ্যমগ্রামস্থ বাসভবনে মাত্র ৬২ বৎসর বয়সে হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দশটি বিষয়ে এম-এ পাশ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু কালে সিটি কলেজের অন্তর্গত আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। সারা জীবন তিনি লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন এবং কলিকাতার বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় লিখিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। তিনি নিজে "যুগবাণী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতেন এবং তাহাতে নির্ভীকভাবে ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলের কাজের সমালোচনা প্রকাশিত হইত। তাঁহার লিখিত "বিড়লা বাড়ীর রহস্য" নামক পুস্তক একসময় খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল। শক্তিশালী ও পরিশ্রমী হইয়াও তিনি কোন স্থায়ী সাহিত্য রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—

সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা এ যুগের অনেকেই জানে না। বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহার জন্মের শতবার্ষিক উৎসব পালন করা হইবে। আমরা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশের বহু মনীষীর জন্ম শতবার্ষিক পালন করিয়াছি। এমন একটা যুগ আসিয়াছিল যে সময় বাঙালীর সৌভাগ্য বশতঃ বহু মনীষীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। পাঁচকড়িবাবু ২৪পরগণা জেলার হালিশহরের অধিবাসী ছিলেন। সেই যুগে বি, এ পাশ করিলেও, তিনি সরকারী চাকুরীর প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। আমরা যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি তখন তিনি কলিকাতা সার্পেনটাইন লেনে বাস করিতেন। সকালে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে "নায়ক" নামক একখানি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে সম্পাদকের কাজ করিতেন, এবং সন্ধ্যায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "বাঙালী" নামক দৈনিক সংবাদপত্রের বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ কার্যালয়ে আসিয়া সহকারী সম্পাদকের কাজ করিতেন। সেই সময় "নায়ক" কার্যালয় হইতে "অবতার" নামক একখানি বাংলা সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশিত হইত। তিনি তাহারও সম্পাদক ছিলেন। পাঁচকড়িবাবু অসাধারণ মনীষা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাধীনচিত্ততা তাঁহাকে অধিক অর্থার্জ্জন করিতে বাধা দিয়াছিল। তিনি এক সময়ে "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রে তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে কতকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই যুগ কলিকাতা বহুবাজারে বৎসরে একদিন জেলেপাড়ার সং বাহির হইত। সং-এর অভিনয়ের জন্য তিনি বহু বৎসর ছড়া ও গান লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল, এবং ইংরেজী এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজ নীতি সম্বন্ধে সর্ব্বত্র বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। আমরা যৌবনে পাণিহাটিতে বৈষ্ণবসভায় তাঁহার ভাষণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন রচনাই তাঁহাকে অমরত্ব দান করিতে পারে নাই। জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশে তাঁহার কথা অধিক আলোচিত হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবে। আমরা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি আজ তাহার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই।

ডাকবিভাগে অসুবিধা—

পোষ্টঅফিস অর্থাৎ ডাকবিভাগ হইতে সরকার বহু

টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সে বিভাগও ঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। অধিকাংশ দিন ডাকঘরে যাইয়া, পোষ্টকার্ড, খাম প্রভৃতি কিনিতে পাওয়া যায় না, বিশেষ বিশেষ মূল্যের টিকিটের ত কথাই নাই। কোন কোন দিন রসিদের টিকিট অর্থাৎ "রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প" অদৃশ্য হইয়া যায়, লোককে দিনের পর দিন এইজন্য ডাকঘরে যাইয়া হয়রাণ হইতে হয়। এই সকল অব্যবস্থার জন্য দায়ী কাহারা সে বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া উচিত এবং একটি অত্যাবশ্যক বিভাগের কাজ যাহাতে ত্রুটিপূর্ণ না থাকে সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

বারাকপুর মহকুমায় অশান্তি—

গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বারাকপুর মহকুমায় নানা স্থানে দারুণ অশান্তি দেখা দিয়াছিল। জগদ্দল অঞ্চলে বহু অবাঙ্গালীর বাস। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের ফলে কর্মীদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি হইয়া থাকে, তাহা ছাড়া পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যেও নানা অভাব অভিযোগের জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামা লাগিয়া থাকে। দক্ষিণে বেলঘরিয়া অঞ্চলে এই হাঙ্গামা আরও বেশী হয়। ধর্মঘট প্রভৃতির সময় বেলঘরিয়াতে মারামারি ও খুনাখুনি প্রায়ই লাগিয়া থাকে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহারা এ সকল ব্যাপারে উপযুক্ত হস্তক্ষেপ করে না। বেলঘরিয়া রেল ষ্টেশনের নিকট সম্প্রতি রাজনৈতিক মতভেদের ফলে কয়েকটি খুন হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীরা ভয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ী হইতে বাহিরে যাইতে সাহস করিত না। সেইজন্য বারাকপুরে একটি উচ্চ পর্য্যায়ের পুলিশ-কর্ম্মীদের সম্মেলনে বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং তাহার পর পুলিশ ব্যবস্থা কঠোরতর হওয়ায় দাঙ্গাহাঙ্গামা অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। কলিকাতা সহরের এত নিকটে ও জনবহুল স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা সত্যই দুঃখের বিষয়। এখানে অসংখ্য পুলিশ ডাকিলেই পাওয়া যায় তথাপি কেন দৃঢ়ভাবে দুর্বৃত্তদের দমন করা হয় না তাহা বলা কঠিন। অনাচার শুধু গুণ্ডা প্রকৃতির লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই, তাহাদের পৃষ্ঠপোষক একশ্রেণীর লোক অবৈধ উপায়ে পুলিশকে হাত করিয়া এই গুণ্ডাবাজী বহাল রাখিয়া থাকেন। কিন্তু মারামারি করিয়া যদি কোন দল নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে তবে তাহা পুলিশ কঠোর হস্তে দমন করিবে না কেন? আজ সকলের মনে এই সমস্যাই জাগিয়া উঠিয়াছে। আমরা পুলিশের কর্মদক্ষতার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাহি না। তবে এ-কথাও সত্য যে পুলিশের মধ্যেও দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। তাহার ফলে পুলিশ একদলকে সমর্থন করিবার জন্য অপর দলের অপরাধ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া থাকেন। উর্দ্ধতন পুলিশ কর্মচারীদের বর্ত্তমানে এ বিষয়ে সজাগ হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।

সুধাময় ফ্রি রিডিং লাইব্রেরী-প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন—

৪৪ ১, গ্রে ষ্ট্রীটস্থ "সুধাময় ফ্রী রিডিং লাইব্রেরী" (কেবল মাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য) এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আগামী জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতাস্থ কোন এক বিশেষ প্রেক্ষাগৃহে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উৎসবে শিক্ষামূলক শিশু-চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ছাড়াও কয়েকজন দেশী ও বিদেশী শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ও সমাজসেবীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্বনামধন্য কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এই অনুষ্ঠানে তাঁদের অমূল্য বক্তৃতা দিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।
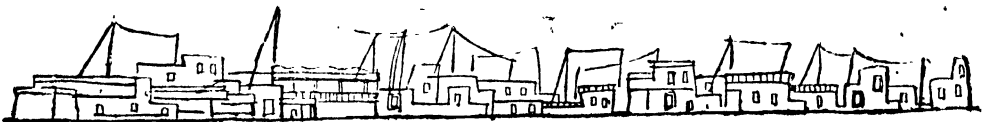
স্ত্রীয়াং চরিত্রম্‌

সচকিত-প্রতিবেশী : ব্যাপার কি দাদা ?···সকালবেলা বার-দালানে এমন গুম্‌-মেজাজে একা বসে !···সর্ব্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ, পলস্তারা, চোট-জখমের চিহ্ন ! ··সারাটা বাড়ি লণ্ড-ভণ্ড···তছনছ···সব যেন কুরুক্ষেত্রের লড়াই হয়ে গেছে !···কাছে-পিঠে বৌঠানকেও দেখছিনে কোথাও !···

বিধ্বস্ত-গৃহস্বামী : হুঁ:, বৌঠান !···তিনি যে কি জীব, তা আজও ঠাওর করতে পারলুম না, ভায়া !···একটানা তেত্রিশ বছর একত্রে ঘর করেও এখনো অবধি তাঁর মন-মর্জ্জির কোনো কূল-কিনারাই বুঝে উঠতে পারিনি !···কথায় বলে, দেবা: ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যা: !···কথাটা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি আজ, ওঁর সঙ্গে এতকাল ঘর করে !···

শিল্পী : পৃথ্ব দেবশর্ম্মা

নিবেদিতা নির্ম্মাল্য

শ্রীপুষ্পলতা দেবী

Truth is beauty, beauth is truth. সত্য, সুন্দর, শিব। ঋগ্বেদের মহাবাণী সত্য সর্ব্বত্র বিরাজিত। প্রতিটী বস্তুর মাঝে যিনি এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। তিনি মহাযোগী। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই মহাবাণীর রসাস্বাদ করলেন। ঋগ্বেদের বাণীমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ সরল কণ্ঠে বললেন, সব পথ সত্য। সব ভগবান এক, জীবের সেবা, নারায়নের সেবা। "শিবজ্ঞানে জীব-সেবা।" অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে।

ধর্ম্মের নামে সম্প্রদায়-সৃষ্টির নেশায় সত্য দৃষ্টি হয় অবরোধ। চিত্ত হয় বিকৃত।

"কলুষ, কল্মষ, বিরোধ, বিদ্বেষ, হোক অপগত নিত্য কল্যাণ কাজে।"

এই নিত্য কল্যাণ কাজে গুরু কর্ত্তৃক উৎসর্গিতা হলেন, মিস্ মার্গারেট নোবল্, ভগ্নী নিবেদিতা নামে।

'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।'

আচার্য্য বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, যদি আমি আমার নিজের কোন কাজ সিদ্ধির জন্য তোমাকে বলিরূপে গ্রহণ করে থাকি, তবে সে বলি বৃথা হোক। আর যদি ইহার মূলে সেই পরমাশক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে সার্থক হও তুমি, তোমার জয় হোক।

সত্তার শিখর হতে এমন মহাবাণী কবারই বা উচ্চারিত হয়েছে এই পৃথিবীতে? কজন শিষ্য এই সুদুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছে? গুরুর মুখ হতে শিষ্যকে বিশ্বকল্যাণে অর্ঘ্য দেবার এই মহাবাণী।

আচার্য্যের বিরাট কর্ম্মযজ্ঞ ভগিনী নিবেদিতা পূত হোমাগ্নি। নিবেদিতার ভিতর যে সত্য সূর্য্য প্রজ্জ্বলিত, স্বামী বিবেকানন্দের অন্তর্দৃষ্টি তা প্রত্যক্ষ করেছিল। যেমন ভগবান রামকৃষ্ণ দেখেছিলেন, নরেনের ভিতর আঠারটী সূর্য্য জ্বলছে। তেমনি বিবেকানন্দ দেখেছিলেন নিবেদিতা আধারে গার্গী, মৈত্রী, সঙ্ঘমিত্রা, সুপ্রিয়াকে। স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতীয় নারী জাগরণে নিবেদিতা হবে পুরোধা। নিবেদিতার শিক্ষায় সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তীর ঘটবে পুনরাবির্ভাব। তাই স্বামীজির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে।

"Nivedita is the bigest flower of my worl in England."

নিবেদিতার বয়স তখন মাত্র উনত্রিশ বৎসর। ১৮৬৭ সালে ২৮শে অক্টোবরের শীত অধ্যুষিত আয়ারল্যাণ্ডের কোলে মিস্ মার্গারেটের জন্ম। আর ১৮৯৮ সালে ২৮শে জানুয়ারী ভারতের শীতোষ্ণ কোমল মাটিতে নিবেদিতা পুষ্প প্রস্ফুটিত হলো; স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ।

নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের স্বহস্ত প্রজ্জ্বলিত দীপ্তিময়ী অগ্নিশিখা।

জ্ঞানের শুভ্র শতদল হাতে ভক্তি নম্রা অপরূপ-মাধুর্য্যময়ী নিবেদিতা আপনাকে সমর্পণ করলেন শ্রীগুরুর পাদপদ্মে। অন্তরে ঝঙ্কৃত হলো, ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভারত কল্যাণ, ভারত সেবা। তাতেই হলো নিবেদিতার ইষ্ট ভারত সেবায় গুরুর পূজা, গুরুর সেবা করা হয় আচার্য্যের শিক্ষার মাঝে নিবেদিতা পাইয়াছিলেন ভারতকে। দেখেছিলেন, প্রাচীন ভারতকে। ভারত প্রাণা নিবেদিতাকে স্বামীজি আশীর্ব্বাদ করেছিলেন,—

জননী হৃদয় আর সংকল্প বীরের,
মধুময় সুখস্পর্শ মৃদু মলয়ের,
দীপ্তশিখা বাধাহীন আর্য্যাবেদী মাঝে,
যে পুণ্য মাধুর্য্য রাজে যে শক্তি বিরাজে,
ভাষাতীত স্বপ্নাতীত যাহা আছে আর,
তোমাতে বিলীন হোক, হউক তোমার।
ভবিষ্য ভারত যেন তোমামাঝে পায়,
একাধারে শিক্ষা-গুরু সেবক সখায়।

স্বামী বিবেকানন্দের ভারতমন্ত্রে নিবেদিতা দীক্ষিতা গৈরিকধারিণী, মহাতপস্বনী, বীর্য্যময়ী নিবেদিতা—কর্ম্ম

অক্ষমালা, শিব শিব উচ্চারিত ওষ্ঠে। জীবন্ত বেদান্ত নিবেদিতা।

মিস্ মার্গারেট অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্না, উচ্চ-হৃদয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তেজস্বিনী মহিলা। পাশ্চাত্য ভাবধারা, চিন্তা, দর্শন, ও ধর্মশাস্ত্রের গভীরতা, উত্তমরূপে অবগতা। প্রগাঢ় অধ্যয়নশীলা, শিক্ষয়িত্রী।

কিন্তু সত্যের জাতির ভেদ নাই। দেশ ভেদে সত্য বিকৃত হয় না। সত্য অবিনশ্বর! চিরসুন্দর! চির সমুজ্জ্বল। সত্যের অমোঘ দ্যুতি যে মুহূর্তে হৃদয়ে আলোকিত হয়, দেশ-কাল, পাত্রের ব্যবধান তুচ্ছ হয়ে পড়ে। সত্যের তীব্রচ্ছটায় নিমেষেই সব বন্ধন ছিন্ন হয়। এই সুতীব্র আলোক আকর্ষণে সিদ্ধার্থ ছেড়ে ছিল রাজপুরী, শ্রীচৈতন্য ত্যাগ করেছিল, শচীমাতার স্নেহক্রোড়। এটর্নী বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে পরিত্যাগ করলো গৌর মুখুয্যের লেনের বাস্তু-ভিটা, মিস মার্গারেট নোবল মুছে দিলে, তার পাশ্চাত্য জীবনের সকল বন্ধন, স্বজন, মাতৃভূমি। সত্য উপলব্ধির অনির্বচনীয় আনন্দ প্লাবনে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় একটি পরমাশ্চর্য্য মুহূর্তে। মানুষ সম্পূর্ণরূপে হয় রূপান্তরিত।

নিবেদিতার যেন তৃতীয় নেত্র উন্মীলন হলো। তিনি দেখতে পেলেন দীন দরিদ্র পরাধীন ভারত জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য প্রাচীন জাতি বলে এ ভারতকে অবজ্ঞা করা যায় না। এর অভ্যন্তরে এমন এক বিরাট শক্তি প্রবাহ প্রোতশালে প্রবহমান, এমন এক সূক্ষ্ম বিশিষ্টতা এর শিরায় শিরায় বিজড়িত যার অবক্ষয় নেই, অবলুপ্তি নেই। এই দরিদ্র দেশের অভ্যন্তর নির্মল পবিত্রতামণ্ডিত। দরিদ্রতা এখানে কদাচারী, হিংস্র মানুষকে করে না। দরিদ্রতার মাঝেও এখানে আছে পুণ্য প্রবাহ। পর্ণকুটীরে তাই না পণ্ডিত ঋষি করেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের চর্চা। এ এক অদ্ভুত জাতি। শীর্ণতার মাঝেও দৃঢ়তা। নগ্নতার মাঝে, বিরাট নগ্নতার মাঝেও বিরাট শীলতা বিদ্যমান। এদের ইষ্টদেবী মা কালী, উপাস্য শ্মশানবাসী ভুবনভাবন দিগম্বর।

ভারতীয়দের প্রতিটি আচার, নিষ্ঠা, অনুরাগ, আসক্তি প্রতিটি খুঁটিনাটী নিবেদিতা তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখলেন। এদের অসভ্য বলে অভিহিত করা সহজে চলে না। বর্বর প্রথা বলে ঘৃণা করা যায় না। যাদের ধর্মের অঙ্গীভূত অঙ্গ শৌচাচার প্রভৃতি, স্নান, ঘর-দুয়ার, বস্ত্র হাঁড়ি তৈজসপত্রাদি নিত্য মার্জনা, নিত্য প্রক্ষালন আবক্ষ বারিগর্ভে নিমজ্জন প্রভাত-সূর্য্য প্রণাম, প্রভাতি দেবনাম এ যেন সুচারু ছন্দে জীবনের মাধুর্য্য বিকাশ।

তথাপি স্বীকার্য্য শত শত বছরের কুসংস্কার, দারিদ্র্যতা পরাধীনতা, ভারতীয় দেহমনকে আবিল করেছে, পঙ্ করেছে। কিন্তু মাটির তলায় রক্ষিত বীজের মত মৃত্যুঞ্জয়ী জাতিটি নিঃশেষ হয় নি। জলসিঞ্চনে মাটি সরসতায় বীজ অঙ্কুর উদ্গমে শস্য শ্যামলতায় দাবদা জুড়াইয়া দিবে।

গুরু তাঁকেই সেই মহাকাজের ভার অর্পণ করেছেন আচার্য্য ওজস্বী কণ্ঠে বার বার বলেছেন, ভারতকে ভালবা নিবেদিতা।

বিবেকানন্দের জ্বলন্ত স্বদেশ প্রেম পরাধীনতার ম যাতনা শিষ্যা নিবেদিতা সমগ্র অন্তর দিয়ে উপলব্ করেছেন, অনুভব করেছেন দেশের প্রতিটি শিরায় র রন্ধ্রে। তাই ভগিনী নিবেদিতাকে তোমার কাজ কি জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তর হত, শিক্ষা দেওয়া।

বাস্তবিক, ভারতের সবচেয়ে বড় অভাব, শিক্ষা অভাব। বর্তমান ভারত সবচেয়ে বড় দৈন্য শিক্ষা দৈন্য। শিক্ষা যেখানে বুদ্ধিকে উর্বর করে না, হৃদয়ে প্রশস্ত করে না অন্তরকে করে না অনুভূতিময়, মেধাকে কর না শুদ্ধ, শিক্ষা সেখানে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত। আজ প পদে সেই শিক্ষা-বিভ্রাট উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

নিবেদিতা চাইতেন, ভালবাসার মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে প্রাণের মন্ত্রে উর্বর করতে, সম্প্রসারণ করতে। শিক্ষা মাঝে গুরু শিষ্যের নিবিড় স্নেহের সম্বন্ধ স্থাপন করতে কেবল সনাতন বলে প্রাচীনকে তিনি ধরে থাকত চাইতেন না শুধু প্রাচীনের মাধুর্য্যে নবীনের ঐশ্বর্য্যকে স করবার রূপকার ছিলেন নিবেদিতা। ভারতীয় ভাবধারাক শিক্ষার মাঝে নূতন ছন্দে সুবিন্যস্ত করতে নিবেদিতা ছিলেন অদ্ভুত শিল্পী। তাঁর স্নেহমন্দাকিনীর গভীরতা সুস্প হয়, আত্মোৎসর্গ প্রজ্জ্বল হয় একটি দৃষ্টান্তে,—প্লেগের বছ নিবেদিতা ঝাড়ু হস্তে বাগবাজারের রাস্তা পরিষ্কার করত অবতীর্ণ হলেন। সঙ্গে গুরুভ্রাতৃগণ, পল্লীবাসীগণ। উদ্দে ত্রাসিত মানুষকে অভয় দান। ভীত নরনারীর বু সাহস সঞ্চার।

এই পল্লী সংস্কার কাজে অর্থের অনটন সম্ভবনার কথা উঠলে, স্বামী বিবেকানন্দ দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন—প্রয়োজন হলে মঠের জমি বেচে দেব। আমরা তো ফকির, গাছতলা আশ্রয়।

সন্ন্যাসীর গৈরিক বসনান্তরালে মানব সেবক দেশপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দের ওজস্বী রূপটি নিবেদিতার চোখের সামনে দেদীপ্যমান হয়ে উঠল। নিবেদিতা অন্তরে অন্তরে হয়ে উঠলেন মহাবিপ্লবী, তেজোময়ী।

ভারত সেবা, জনগণের সেবা গুরুর সেবার প্রভেদ তিনি দেখতে পাননি। নিবেদিতার বিদ্যুৎবর্ষী লেখনী মুখে অগ্নিকণার মত নিঝ্‌র্রিত হলো, "আমি বিশ্বাস করি, ভারত এক, অখণ্ড এবং অবিনশ্বর। এক আবাস, এক আকৃত, আর এক সম্প্রীতি হইতেই জাতীয় ঐক্যের উদ্ভব হয়। বেদ, উপনিষদের মন্ত্র বাণীতে যে শক্তির লীলা, বিশ্বের ধর্মে ও রাষ্ট্রে যাহার খেলা, বিদ্বানের বিদ্যা, এবং ঋষির ধ্যানে যাহার প্রকাশ, আমি বিশ্বাস করি সেই শক্তি আজ আমাদের বক্ষে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার নাম জাতীয়তা। আমি বিশ্বাস করি বর্ত্তমান ভারতের মূল রহিয়াছে প্রাচীন ভারতের গভীরে। সম্মুখে তার গৌরব উজ্জল ভাবী কাল। হে জাতীয়তা, সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান, যে মূর্ত্তিতে ইচ্ছা দেখা দাও। আমাকে তোমার করিয়া লও।

ওজস্বিনী লেখনী মুখে বীণার ঝঙ্কার, গাণ্ডীবের টঙ্কার। নিবেদিতার ভারত আত্মার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি। ভারত আত্মা নিবেদিতার মাঝে প্রকাশে, আকাঙ্ক্ষায় মাতোয়ারা। অগ্নিবীণা হাতে রক্তকমল আসনে আসীনা ভারতী নিবেদিতা। সিংহারূঢ়া দশপ্রহরণধারিণী দুর্দ্দম অসুরনাশিনী নিবেদিতা দুর্গা! ক্ষিরোদ উত্থিতা ভারতলক্ষ্মী! মহাকল্যাণী, মহাতাপসী নিবেদিতা।

বিপ্লবিনী নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণমিশনের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হলো, সংবাদ পত্রে প্রকাশ হলো, কিন্তু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পদাশ্রিতা নিবেদিতা। নিবেদিতা নাম স্বাক্ষর করতেন,—এন, অফ্ আর. কে. ভি।

রামকৃষ্ণ দর্শনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের চিন্তা ধ্যান, ও দর্শনের উত্তরাধিকারী গুরুগতপ্রাণা মানসকন্যা নিবেদিতা। নিবেদিতার উত্তর সাধিকা কে?

আচার্য্য বলেছিলেন, নিবেদিতা মনে রেখ—"চরৈবেতি"। ভারতের সাধনায় একদিন পরা শান্তি, পরা মুক্তি হবে।

১৮০০ শতাব্দীর সমস্ত মনীষী মণ্ডলী চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ্, রাষ্ট্রনেতা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি, সকলের সংস্পর্শে নিবেদিতা এসেছেন। মাত্র গুরুকে উপলব্ধিতে। ভারতসেবার নিমিত্ত, বসুবিজ্ঞান মন্দিরে প্রদীপ হস্তে যে নারী মূর্ত্তি খোদিত; সেও নিবেদিতা স্মরণে। নিবেদিতার অবদান স্বীকৃতিতে।

তাপসী নিবেদিতার যোদ্ধৃ-অন্তর কোন সমস্যার কাছে, কোন প্রবল্যের কাছে, প্রচণ্ডতার সম্মুখে নমিত হয়নি।

সেটা কার্জ্জেনী যুগ। বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন সভা ১৯০২ সাল, চান্সেলার লর্ড কর্জ্জন অভিভাষণ দিচ্ছেন ইংরাজ রাজপুরুষের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং রাজনৈতিক কূটতায় প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় নৈতিক চরিত্রে কটাক্ষ করলেন,— "প্রাচ্য দেশবাসীগণ অত্যুক্তিবাদী অতিরঞ্জন প্রিয়।"

সমাগত গণ্যমান্য মনস্বীমণ্ডলী, ছাত্র সমাজ, সুধী, পদস্থ, উচ্চবিত্ত, খ্যাতনামা মধ্যবিত্ত, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, সকলেই নিমন্ত্রিত, সকলেই উপস্থিত, সকলেই নীরব।

স্যার গুরুদাসের পার্শ্বোপবিষ্টা নিবেদিতার যোদ্ধৃ-অন্তর গর্জ্জে উঠল। চোখে দেখা দিল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

সভা শেষে স্যার গুরুদাসকে নিবেদিতা এক প্রকার জবরদস্তিতে নিয়ে এলেন ইম্পিরেল লাইব্রেরীতে।

স্যার গুরুদাসের হাতে ভারত আত্মা নিবেদিতা যে গ্রন্থখানি তুলে দিলেন, তার লেখক লর্ড কর্জ্জন,—

The problom of the East'

গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট প্যারাটি পড়ে, স্যার, গুরুদাস হতবাক। সত্যপরায়ণ বশিষ্ঠের বংশধর বিচারপতি স্যার গুরুদাস দেখলেন বিশুদ্ধ ইংরাজ আভিজাত্য রক্তধারা যার শিরায় প্রবাহিত সেই রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী দাম্ভিক। শুধু কেবল কূটকৌশলী বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ! শ্রেষ্ঠচক্রী। তাঁর ইউনির্ভাসিটি বিলের আসল উদ্দেশ্য দেশের উচ্চ শিক্ষার গতিরোধ। বাংলার জনমতে যে প্রবল আলোড়ন সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল তার পিছনে ছিল, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিবেদিতা।

নিবেদিতারই প্রভাবে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন, শাসন

সংস্কারের ছায়ায় যে ভেদনীতির বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছে, লর্ড সেনী তা রোপণ করেছে। দেশ হিতৈষী গোখলে মহাশয় জল সিঞ্চনে সযত্নে পালন করেছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়কে ছলনা করা হয়েছে। এই সংস্কারে বাংলার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই।

নিবেদিতার দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়ে স্যার গুরুদাস লর্ড কর্জ্জনের উক্তির প্রতিবাদ লিখেছিলেন। কিন্তু বিচারকের নামে কোন প্রবন্ধপ্রকাশ আইন নিষিদ্ধ। প্রবন্ধ বাহিকা নিবেদিতা বৈষ্ণব চূড়ামণি ঘোষভ্রাতৃদ্বয় অমৃতবাজার পত্রিকায়, সম্পাদকীয় কলমে তাকে প্রকাশ করেছিলেন। বৈষ্ণববাদীর সহিত অদ্বৈতবাদীর নিবিড় সংমিলন ঘটে।

পুরুষোত্তম স্বামী বিবেকানন্দের স্বহস্তসৃষ্ট কন্যা নিবেদিতা। নিবেদিতার জীবনরাগিণীতে কেবল ঝঙ্কৃত হত,—

"অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়॥"

শাশ্বত লোকমাতা সারদা দেবীর সংস্পর্শে ভাগিনী নিবেদিতা এসেছেন, সান্নিধ্যলাভ করেছেন। বিধবা দুঃখিনী গোপালের মাকে দেখেছেন, সংস্রব এসেছেন, নিবেদিতা দেখেছেন, ভারতীয় ভক্তি প্রেমের অপূর্ব্বরূপ। লোকমাতা সারদার অভ্যন্তরে দেখেছেন, বাৎসল্যের সহস্রদল কমল দলের পর দল মেলে বিকশিত। "মৃদুনি কুসুমাদপি বজ্রাদপি কঠোরাণি।" যেন সিংহারূঢ়া জগদ্ধাত্রী! নিবেদিতার অন্তর ভক্তিতে আপ্লুত হয়েছে। আনন্দে হয়েছে অধীর।

ভগ্নী নিবেদিতার মহাজীবনে তিনজন মনস্বী বাঙালী নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় নিকটস্থ হয়েছিলেন। বিজ্ঞানে স্যার জগদীশ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, ও কর্ম্মযোগী শ্রীঅরবিন্দ। কিন্তু পরমাশ্চর্য্য ভগ্নী নিবেদিতাকে কেহ প্রভাবিত করতে পারেন নি। ভারতে বৌদ্ধকে পুর্ণজাগরণ করেছিলেন নিবেদিতা। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে ভারতীয় ভাবধারা বীজাঙ্কুত করেছেন নিবেবিতা। নিবেদিতা চাইতেন, পরানু করণ শিক্ষার বিলুপ্তি। ভারতীয় শিক্ষার বিজ্ঞপ্তি। বিশ্বের যেখানে যা শুভ চিন্তা আপনার মধ্যে বিলীন কর। আপন করে নাও। কিন্তু পরের কাছে মর্য্যাদাকে বিনষ্ট করো না। জাতীয়তাকে রক্ষা কর বিশিষ্টতার ছাপে। নিবেদিতা-দর্শনের মূলনীতি এই। স্যার যদুনাথকে নিবেদিতা বলেছেন,—

Never lower your flage to a foreign.

শিক্ষায় জ্ঞানে, আদর্শে, চরিত্রে নিবেদিতার জীবনী বিশ্লেষণে দেখা যায়, ধৈর্য্যে হিমালয়, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র, প্রিয় দর্শনে চন্দ্র, ক্রোধে প্রলয় অগ্নি, পরাক্রমে দুর্গা। মহীয়সী নিবেদিতা,—মহাভারতের জীবন্ত বিগ্রহ। ভারতের যুগ-যুগ সাধনায় মূর্ত্ত প্রতীক। বিশ্বশিল্প, মহতী কীর্ত্তি নিবেদিতা প্রতিমা। স্বামী বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ নিবেদিতা নির্ম্মাল্য।

দুই কবি

শ্রীবিমলজ্যোতি দাস

চক্ষুর সম্মুখে ভাসে অনেক দূরের এক ছবি—
মুখোমুখি আছে বসি প্রবীণ নবীন দুই কবি
ভাবের সাগরে মগ্ন। কারো মুখে নাই কোনো কথা,
আবেশ-বিহ্বল দৃষ্টি অখণ্ড আনন্দ-তন্ময়তা
প্রকাশ করিছে শুধু। আত্মা সাথে আত্মার মিলনে
জাগিয়া উঠেছে প্রেম, চিত্ততলে বিশ্রাম-শয়নে
ঘুমায়ে পড়েছে ভাষা। অন্তহীন যে অনাদি সুর
এ বিশ্বের তন্ত্রীপরে বাজিতেছে বিচিত্র মধুর
অবিশ্রান্ত রাত্রিদিন, সে-ই যেন দোঁহাকার হিয়া
অদৃশ্য চিণ্ময় সূত্রে অকস্মাৎ দিয়াছে বাঁধিয়া।
ভিন্নমুখী দুটি যাত্রী মিলিয়াছে ঘাটের কিনারে;
দুই যুগ মূর্ত যেন হইয়াছে দোঁহার মাঝারে॥

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৬

জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে স্কুল ছুটি। সকালবেলাটা শুভ্রা বাড়িতেই রইল। কিছুক্ষণ মাকে সংসারের কাজে সাহায্য করল। ভাইবোনদের সঙ্গে গল্পটল্প করে আরো খানিকক্ষণ কাটল। খাওয়া দাওয়া সেরে দুপুরের পর শুভ্রা বলল, 'মা, যাই, কেতকীর একটা খোঁজ নিয়ে আসি। অনেকদিন ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। এদিকে আসেও না আজকাল। দেখে আসি ওর কী হল।'

কোথাও যাওয়ার কথা উঠলেই নলিনীর মুখ ভার হয়। তাঁর ইচ্ছা করে না মেয়েরা তাঁর চোখের আড়ালে কোথাও যায়। ঘরের বাইরে যেন সব চোর ডাকাত দুর্বৃত্তদের আড্ডা। অশুভ সম্ভাবনার আশঙ্কায় ভরা। তাই ছেলেমেয়েরা বাইরে কোথাও যেতে চাইলে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন।

নলিনী বললেন, 'সবদিনই তো বাইরে বাইরে কাটাস শুভ্রা। বুঝি, কাজের জন্যেই বাইরে যাস। কিন্তু আজ যখন ছুটি, আজ না হয় ঘরেই রইলি। ট্রামবাসে উঠতে না পারলে তোদের যেন ভালো লাগে না।'

শিপ্রা দিদির পক্ষ নিল। সে বলল, 'কী যে বল মা। ওর নিজের কি কোন সাধআহ্লাদ নেই? কাজের দিনে চাকরি করবে আর ছুটির দিনে ঘরে বসে থাকবে? যেতে চাইছে যাক না। আসুক না একটু ঘুরে। দিন দুপুরে তোমার মেয়ের জন্যে ভূত প্রেত ওঁৎ পেতে বসে নেই তো।'

নলিনী পুরোপুরি প্রসন্ন হলেন না। শেষ পর্যন্ত বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে আয় ঘুরে। বেশি দেরি করিসনে যেন। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসিস।'

শুভ্রা হেসে বলল, 'সন্ধ্যার অনেক দেরি আছে মা। তুমি ভেব না আমি খানিক বাদেই ফিরে আসব।'

শীত এখনো পড়েনি, কিন্তু গ্রীষ্মের সেই তাপও আর নেই। বাসের জানলার ধারে বসে আবহাওয়াটা বেশ উপভোগ করতে করতে চলল। কলকাতাকে যেন সে নতুন দেখছে। রাস্তার দুদিকের এই দোকানপাট যানবাহন লোকজনের চলাচল সবই শুভ্রার কাছে উপভোগ্য মনে হতে লাগল।

বিচিত্র ধরণ এই মনের। অকারণে কি সামান্য কারণে তার দুঃখের শেষ থাকে না। আবার হয়তো বিনা কারণেই সেই মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। প্রসন্ন জগতের সঙ্গে তার মুখোমুখি হয়।

মাণিকতলা অঞ্চলে কেতকীদের বাড়ি। অনেকদিন পর এ পাড়ায় এল শুভ্রা। মাঝে মাঝে এমন হয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়।

সরু গলির মধ্যে পুরোন দোতলা বাড়ি। কলেজে পড়বার সময় এ বাড়িতে প্রায়ই আসত শুভ্রা। এখন আর আসা হয় না। এরই মধ্যে অভ্যাস বদলে গেছে। অভ্যাস ছাড়া কি। আত্মীয়-বন্ধু কারো বাড়িতে যাওয়া না যাওয়া অভ্যাস ছাড়া কি? ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে যে সব আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে শুভ্রারা যেত তাদের অনেক বাড়িতেই যাতায়াত এখন বন্ধ হয়ে গেছে। শুভ্রারাও যায় না, তারাও কেউ আর এখন আসে না। তার জন্যে কোন দুঃখও কারো মনে নেই।

কড়া নেড়ে কেতকীর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল শুভ্রা। কে জানে বাড়িতে আছে কি নেই। কোন খবর দিয়ে তো আসে নি।

একটু বাদেই দোর খুলে কেতকী এসে সামনে দাঁড়াল। শুভ্রাকে দেখে খুসি হয়ে বলল, 'আরে তুই যে। কী ব্যাপার।'

শুভ্রা বলল, 'ব্যাপার আবার কি। তুই তো আমার খোঁজখবর নেওয়া ছেড়েই দিয়েছিল।'

কেতকী বলল, 'আর তুই বুঝি খুব খোঁজ নিচ্ছিস আমার?'

শুভ্রা হেসে বলল, 'তোর কোঁদল আর গেল না। খোঁজ নিতে আমিই তো এলাম রে।'

ভাড়াটে বাড়ির দোতলায় থাকে কেতকীরা। সিড়ির মুখেই কেতকীর ঘর। একার ঘর নয়। ছোট দুটি বোন-ঝিও তার সঙ্গে থাকে। ওদের মা নেই। মামা বাড়ীতেই ওরা আছে।

আর একখানা ঘরে বাবা মা থাকেন। আরো এক-খানায় দাদারা।

বন্ধুকে নিজের ঘরে এনে বসাল কেতকী। গা ঘেষে এসে বসে বলল, 'কতদিন পরে এলি বল তো।'

শুভ্রা একটু অভিমানের সুরে বলল, 'যাক যাক, এলাম তাই তোর এত সোহাগ দেখা যাচ্ছে। একবার তো খোঁজও নিসনে। আছি কি নেই।'

কেতকী বলল, 'যা বলেছিস। আমি তো ভেবেছিলাম তুই সত্যিই কলকাতায় নেই।'

শুভ্রা অবাক হয়ে বলল, 'ওমা কলকাতায় থাকব না তো যাব কোথায়?'

কেতকী বলল, 'আহাহা, তোর যাওয়ার জায়গার কি অভাব আছে নাকি? আর কোন জায়গা না থাকুক সেই গাঁয়ের স্কুল—কী যেন গ্রামখানির নাম?'

শুভ্রা বলল, 'এরই মধ্যে নামটা পর্যন্ত ভুলে গেছিস? 'কুমারপুর।'

কেতকী বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ কুমারপুর। আর সেই কুমারপুর স্কুলের সেক্রেটারী—রামনারায়ণ বসাক তাই না? দেখ, আসল নামটা কিন্তু ঠিকই মনে রেখেছি।'

মুখ টিপে হাসতে লাগল কেতকী।

শুভ্রা বলল, 'ফাজিল কোথাকার। মনে রেখেছিস তো কী হয়েছে?'

কেতকী বলল, 'না কিছু হয়নি। তবে আমি ভেবে-ছিলাম এতদিনে তোর একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হষ্টেল খুলে তার সুপারিনটেনডেন্ট করে দিয়েছেন তোকে। তুই সেই কুমারপুরের সর্বেশ্বরী হয়ে আছিস।'

শুভ্রা বলল, 'তুই কি নেশাটেশা করছিস নাকি আজ-কাল? যত সব গাঁজাখুরি স্বপ্ন।'

দুই বন্ধুর মধ্যে গল্প চলতে লাগল। কথা যেন আর ফুরোতে চায়না। শুধু কথা বলেই আনন্দ। সব কথাই অবশ্য মুখের কথা নয়। কিছু কিছু পারিবারিক খবরও শোনা গেল কেতকীদের। ওর বাবা বাতে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। কাজকর্ম দূরে থাক নড়াচড়া করাই তাঁর পক্ষে কঠিন। মার শরীরও ভালো যাচ্ছেনা। তাছাড়া মান-সিক অশান্তি লেগেই আছে। কেতকীর দাদা বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছেন। ছেলের বউয়ের সঙ্গে কিছুতেই মার বনিবনাও হল না। কেতকীর দাদা নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। আগে থেকেই ওদের মধ্যে জানাশোনা হয়েছিল। এমন তো আজকাল প্রায়ই হয়। কিন্তু কেতকীর মা কিছুতেই তা মেনে নিতে পারেন নি। পুত্র

বধূকে সুনজরে দেখতে পারেন নি। তার ফলে গোটা পরিবারকে অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছে। কেতকীর আরো দুই ভাই অবশ্য আছে। কিন্তু তাদের রোজগার সামান্য। কেতকীও মাষ্টারী ক'রে যা পায় সবই সংসারে ধরে দেয়। কিন্তু তাতেও কুলোয় না। প্রতি মাসেই টানাটানি পড়ে।

এসব সত্ত্বেও শুভ্রা জিজ্ঞাসা করে বসল, 'তা হলে বিয়ের কথা এখন আর কিছু ভাবছিস না।'

কেতকী হেসে বলল, 'বিয়ের কথা। ভাবছিনা মানে? দিনরাত এই ভাবনাতেই তো ডুবে আছি শুভ্রা। তবে তোর সেই বসাক মশাই ছাড়া অতল সমুদ্র থেকে কে আর আমাকে টেনে তুলবে বল?'

এত অভাব অনটন অশান্তির মধ্যেও ওর মনে এমন কৌতুকবোধ কী করে থাকে ভেবে পায়না শুভ্রা। মাঝে মাঝে তার সন্দেহ হয় কেতকী কি গোপনে গোপনে কারো ভালোবাসা পেয়েছে। সেই অপরূপ সম্পদই কি তার বাইরের সব দারিদ্র্য ঢেকে দিয়েছে?

কেতকীর মা এলেন চা আর দুটি মিষ্টি নিয়ে। হেসে বললেন, 'এতদিন পরে মনে পড়ল বুঝি? মেয়েরা আজকাল এমনিই হয়।'

শুভ্রা বলল, 'সময় পেয়ে উঠিনে মাসীমা। স্কুলে যাতায়াত করতেই সারাদিন কেটে যায়। আপনি কেমন আছেন বলুন।'

কেতকীর মা বললেন, 'আমি? আমি বেশ আছি মা। আমি ভালো না থাকলে চলবে কেন!'

একটু যেন অভিমানের সুর ফুটে উঠল ওঁর গলায়। শুভ্রা লক্ষ্য করল সত্যিই ওঁর শরীর খারাপ হয়ে গেছে। পাতলা হয়ে গেছে চুল। অনেক পেকেও গেছে।

একটু বাদে তিনি নিজেই সরে গেলেন, 'তোমরা বসে গল্প করো মা। আমি যাই।'

কিন্তু ছুটির দিনে ঘরের মধ্যে গল্প করতে কি আর সব সময় ভালো লাগে।

শুভ্রা কেতকীকে বলল, 'চল বেরিয়ে পড়ি। একটু হৈ হৈ করে আসা যাক।'

কেতকী বলল, 'একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে? চিরকালের শান্তশিষ্ট ঘরকুনো মেয়ে তুই। তোর যে আজ এত হৈ চৈ করবার সখ হল?'

'আচ্ছা স্বভাব টভাব তো বদলাতেও পারে। চিরকালই যে মানুষের এক রকম কাটবে তার কোন কথা আছে নাকি?'

কেতকী বলল 'কোথায় যাবি বল?'

শুভ্রা বলল, 'বাইরে গিয়ে তা ঠিক করা যাবে। একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা।'

কেতকী হেসে বলল, 'ওরে বাবাঃ অবস্থাতো তেমন ভালো মনে হচ্ছে না।'

তৈরি হতে বেশি সময় নিলনা কেতকী। পনের-বিশ মিনিটের মধ্যেই শাড়ি-টাড়ি সব বদলে এল। মাকে বলল, 'শুভ্রাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

এই বিপুলা মহানগরী যেন অফুরন্ত রহস্যের ভাণ্ডার তাদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে। [ক্রমশঃ

অজন্তা ইলোরা

শ্রীমতী কল্যাণী দত্ত এম-এ

অজন্তা আমার মনে কত রঙ তোমারি যে দেওয়া
ভুলিনি তোমারে তাই, এ আমার অন্তিম স্বীকৃতি।
বিপুলা পৃথ্বীর বুকে যদি কিছু ঝরে গিয়ে থাকে
পদ্মের বিশুদ্ধ তবু, পদ্মপাণি বুদ্ধকে প্রণাম।

রাবণের মত যারা তুলেছে এ বিশাল কৈলাস,
পাথরে পুষ্পিত অভিলাষ
ফাঁকে ফাঁকে রেখেছে স্বাক্ষর—
রূপদক্ষ যেবনর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর।
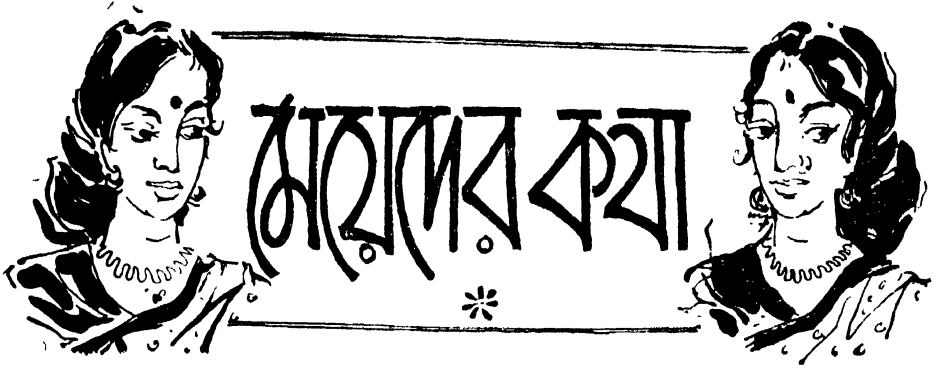
অপরাধ জগতে নারী

জয়শ্রী চক্রবর্তী

মন্দির-বাড়ির রহস্য

মন্দির বাড়ীর রহস্য, ইতিহাসের অতলান্তে ডুবে আছে বলে অনেকেই মনে করে। কিন্তু লোকমুখে বিশেষতঃ সেকেলে আদি গ্রামবাসীদের মুখে মুখে ফিরছে—একটি রহস্যঘন চমকপ্রদ অপরাধ কাহিনী।

বাংলার উত্তরাঞ্চলে, কোন একটি অখ্যাত রেলওয়ে ষ্টেশনের ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যালের আলোটাকে লক্ষ্য করে, ছোট একটি আত্মগোপনকারীদল, নিঃশব্দে পথ হাঁটছিল।

রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। দূরের আকাশে ভোরের মৃদু আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। আশপাশের বিস্তীর্ণ জনশূন্য মাঠগুলো, বেশ দূরের গ্রামগুলো নিশুতির নিদ্রালুতায় মগ্ন তখনও।

ইতিমধ্যে লাইনের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে একটি ট্রেন চলে গেছে। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য, সেই যন্ত্রদানবের সুবিশাল গর্জন গগনভেদী হয়ে উঠেছিল। ওরা সচকিত হয়ে চেয়েছিল সেই দিকে।

ভোরের আলো ফোটবার আগেই, ওদের পায়ে হেঁটে আস্তানায় ফিরতে হবে। নইলে দলশুদ্ধ ধরা পড়বার একটা থমথমে আশঙ্কা সকলের মুখে-চোখে ফুটে উঠেছিল। যদিও তারা জনপদগুলো পেরিয়ে এসেছে, কিছু কৌতূহলী লোকের চোখে ধুলো দিতে পেরেছে বলে, স্বস্তিতে কেউ কেউ মুখে বিড়ি ধরিয়েছিল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী, ভোর রাত্রের ধূসর আকাশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। তবু কারো মুখে এতক্ষণ কথা ছিল না।

নাথু সর্দারের চোখে, আরো একটা বিস্ময়কর ভয়, তাকে বোবা পাথর করে তুলছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বের ব্যাপার! পাথরগাছি গ্রামের ধনী বোধন বড়ালের বাড়ী থেকে ডাকাতি সেরে কোনক্রমে পালিয়ে এসে ওরা ঢুকেছিল—পোড়ো ভাঙা মন্দির বাড়ীটায়।

পাথরগাছি গ্রাম থেকে পোড়ো মন্দির বাড়ীর তফাৎ মাত্র মাইল দু'য়েক। মন্দির বাড়ীর ধারে কাছে এখন কোন লোকালয় নেই। জনবসতিহীন নিথর নিস্তব্ধ তিনটে শূন্য মাঠ—মন্দির বাড়ীর ভগ্ন শরীরটাকে জড়িয়ে মৃতের মত পড়ে আছে। এমন কি দিনমানেও—সেখানে আশ্চর্য নীরবতা!

সরু দু' একটা আলপথ আছে। কখনো কোন দিনমানে, হাটুরে বাটুরেদের দেখা যায়—পণ্যের বোঝাই নিয়ে যেতে। তবে মন্দির বাড়ীর সামনের চৌহদ্দির মধ্যে, গণ্ডী টানার মত যে পথ রেখাটা চক্রাকারে ঘুরে গেছে কোন অচেনা পথিক ছাড়া—চেনা মানুষ সেখানে ভুল করেও প্রবেশ করেনা।

মন্দির বাড়ীর আদি রহস্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আদি গ্রামবাসী বৃদ্ধ বৃদ্ধারা বলে, এখন যেমন জনশূন্য মাঠ চারদিকে—এক সময় তা ছিলনা। বেশ কিছু লোকের স্থায়ী

বসতি ছিল। সাধারণতঃ চাষ আবাদ করে খাওয়া মানুষের দল ছিল বেশী। তার মধ্যে গোনা যায়—দু একটা শিক্ষিত ধনী পরিবারও ছিল। তার ভেতর উল্লেখযোগ্য মন্দির বাড়ীটা ছিল। ইঁটের গাথুনিতে বড় বড় খিলানে তৈরী বৃহৎ দালান বাড়ীটি—মন্দির বাড়ী নামেই একদিন পরিচিত ছিল। বাড়ীর দুটো মহল ছিল। অন্দর আর বার মহল। বার মহলে খুব সুসজ্জিত একটি দেবালয় ছিল। সেখানে জাগ্রত দেবতার অধিষ্ঠান হয়েছিল বলে, বাড়ীটার নাম হয় 'মন্দির বাড়ী।'

গ্রামের অনেকে এখানে পুজো দিত, মানৎ করতো। উপাসনা, প্রার্থনা সবই করতো এখানে।

সে সময়ের একটি রহস্যপূর্ণ কাহিনী সুরু হয়েছিল মন্দির বাড়ীটাকে কেন্দ্র করে,কোন একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে, ক্ষুধার্ত দীনবেশী এক ভিক্ষুক অত্যন্ত ক্লান্ত, বিশীর্ণ হয়ে মন্দির বাড়ীর দেবালয় প্রাঙ্গণে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সহসা সেই সময় বাড়ীর গৃহিণী, তখনকার গোঁড়া পরিবারের গিন্নীমা যিনি অসূর্যম্পশ্যা নারী, তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এলেন বার বাড়ীতে।

এদিকের উঁচু দালানে বসে কর্তামশাই—গ্রামের সজ্জনদের নিয়ে মজলিশ বসিয়েছিলেন। সহসা শিথিল-বেশবাসে আলুলায়িত কেশে স্বয়ং অন্তঃপুরচারিণী, লাজ-বরণী কুলবধূ দৌড়ে এসে সেই বিশ্রামরত ভিক্ষুকের পায়ের তলায় এসে আছড়ে পড়লেন, এবং কাঁদতে লাগলেন উচ্চস্বরে। সকলে তো হতভম্ভ! কাঁদতে কাঁদতে তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন—আমি তোমায় এবার চিনতে পেরেছি গো, আর তোমায় ছাড়ছিনে। বল, তুমি আমাকে ফেলে রেখে কোথায় পালিয়েছিলে?

ভিক্ষুকটি হঠাৎ রুদ্ধবাক বিমূঢ় হয়ে রইলো। এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখতে লাগলো বোবার মতন। তারপর সম্বিৎ পেয়ে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে, দু' হাত জোড় করে বলে ওঠে—'ছিঃ ছিঃ মা, একি করছেন? আমার পায়ে হাত দেবেন না। আপনি হ'লেন গিয়ে এক কুল-শ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণী, কি ভ্রমবশে এমন দশা হোল—তা তো আমি জানতে পারছিনা। কিন্তু আমাকে আর পাপের ভাগী করবেন না।'

ইতিমধ্যে ধর্মভীরু কর্তামশাই ভেবেছিলেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের জাগ্রত দেবতা, ভিক্ষুক বে[শে] আবির্ভূত হয়ে ধর্মশীলা গিন্নীমাকে দৈববলে টেনেছেন।

কিন্তু পরমুহূর্তে এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হোল[।] গিন্নীমা তখন কাঁদছেন। এই বলে—'হাঁ গো বলছো কি তুমি? আমাকে তুমি চিনতে পারছনা? আমি যে গো তোমার যামিনী, তুমি আমার সেই পতিদেবতা। এতদি[ন] নিরুদ্দেশ হয়ে পালিয়েছিলে, ভেবেছিলে আমি মরে গেছি কিন্তু এয়োস্তির মরণ কি সহজে হয়? হয়তো তোমা[র] সংগে আমার আবার মিলন হবে বলে আমি বেঁচে আছি কিন্তু আর ছাড়ছিনে তোমায়' বলে গিন্নীমা ভিক্ষুকে[র] পদযুগল সবলে আঁকড়ে ধরলেন। আর তেমনিভাবে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

হতবাক, বিস্মিত শিহরিত দর্শকের দল ভেঙে পড়ে[ছে] দেবালয়ে। মন্দির বাড়ীর সমস্ত চত্বরটা জুড়ে কাতারে কাতারে লোক। কর্তামশাই তো এবার সব বুঝে মাথা[য়] হাত দিয়ে বসেছেন। কি সর্বনাশ! এ' স্বপ্ন না সত্য[?] কিছুই তখন হৃদয়ঙ্গম হচ্ছিল না। বিশ বছরের জীবন সঙ্গিনী, সহধর্মিণী—যামিনীর হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গে[ল] কিনা, এই কথা ভাবতে ভাবতে যখন তিনি দেবালয়ে[র] অভ্যন্তরে দৃষ্টি ফেললেন, তখন সহসা বিদ্যুতের ন্যায় এ[ক] তীব্র সচকিত আলোকদ্যুতি ঠিকরে এলো তাঁর চোখে[র] ওপর। তিনি প্রায় আচ্ছন্নের মত দেখলেন—জাগ্র[ত] দেবতা আসন ব'স টলছেন—সমস্ত দেবালয়-স্তম্ভগুলো থরথর করে কাঁপছে। গোটা মন্দির বাড়ীটার নীচের মাটিট সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

'ওই—ওই দেখো দেবতার আলো—আসছে—মন্দি[র] কাঁপছে—ভূমি টলছে—তোমরা আমাকে ধর—ধর' বলতে বলতে কর্তামশাই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সংগে সংগে দাওয়া থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন—বজ্রাহ[তের] মতন।

ব্যস্, তারপর কর্তামশাই আর চোখ খুললেন না। অত্যাশ্চর্য সেই নাটকীয় ঘটনাটি তাঁর মুদিত নয়নের পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল ধীরে···ধীরে··· ইহলীলা সাঙ্গ হো[ল] তাঁর। কিন্তু এত বড় কাণ্ডেও গিন্নীমার সেই পাগলা[মি] তখনও চলছিল। ভিক্ষুকও আর নাকি পালাতে পার[ল] না। বোধকরি গিন্নীমার সবল আকর্ষণে পলায়নপ্রবৃ[ত্তি]

প্রতিহত হোল। তাই কিছু করার ছিলনা নাকি বেচারার (?)

এর পরের কাহিনী, আরো চমকপ্রদ! কর্তামশাই মারা যাবার পর, নিঃসন্তানা গিন্নীমা, সেই ভিক্ষুককে স্বামীরূপে জ্ঞান করে—তাকে মন্দির বাড়ীতে রেখে দিলেন নিজের কাছে। তখনকার অশিক্ষিত ধর্ম ভীরু নিরীহ গ্রামবাসীরা এটাকে দৈব সত্য ব'লে মেনে নিয়েছিল। জাগ্রত দেবতার এটা লীলাপ্রসঙ্গ বলে ধরেছিল।

কিন্তু কিছু বছর পরে জানা যায় নাকি ভিক্ষুকটা আসলে দেবতার প্রতিনিধি নয়—আসলে সুচতুর একজন তন্ত্র সাধক। ছদ্মবেশে মন্দির বাড়ীতে এসে মন্ত্রবলে গিন্নী-মাকে বশীভূত করে এই নাটকীয় কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। অবশ্য তাঁর কি ধরণের উদ্দেশ্য ছিল তার সঠিক তত্ত্ব জানা যায়নি।

কিছু বছর ওরা স্বামী স্ত্রীরূপে বসবাস করবার পর, হঠাৎ এক মধ্যরাত্রে মন্দির বাড়ীর অন্দর থেকে নারীকণ্ঠের ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা গেল। বার মহলে—দেবালয়ের সামনে দু'জন মন্দির বাড়ীর পুরোণ প্রহরী শুয়ে থাকতো। তারা আর্তরব শুনে মন্দির বাড়ীর অন্দরের দিকে দৌড়ে গেল।

যদিও তাদের অনুমতি ছিলনা খাস অন্দরে প্রবেশ করবার কিন্তু অর্ধপ্রবেশেই তাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। ওপরতলায় গিন্নীমার শয়ন ঘর থেকে আর্ত-বিলাপ ভেসে আসছে। একটা অশুভ কিছু চিন্তা করে তারা নিঃশব্দে উঠে গেল ওপরে। সিঁড়ির মুখোমুখি টানা বড় একটা বারান্দা। বারান্দার শেষ প্রান্তে গিন্নীমার শোবার ঘর। অর্গলবদ্ধ ঘরের ছিদ্র পথ দিয়ে আলোর বিন্দু দেখা গেল। দেখা গেল গিন্নীমার ঘরের হাজার বাতির ঝাড় লণ্ঠন জলছে। এদিকে বাইরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। প্রহরী দুজন এগিয়ে অন্ধকারে উৎকর্ণ হয়ে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অলিন্দের গাঢ় আঁধারে ওরা ছায়ার মত মিশে থাকলো।

গিন্নীমার ক্রন্দনময় গলা শোনা গেল—'তুই একটা মহাপাপী সাংঘাতিক পিশাচ, মন্ত্রবলে আমার সব কেড়ে নিয়েছিস। আমার অমন স্বামী (পরলোকগত কর্তা মশাই), অমন সোনার সংসার, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে আমাকে মায়া বশে, দেবালয়ের সব ধন রত্ন কেড়ে নিবি বলে, কত কাণ্ডই না করলি! এখন তো সব কারসাজি বুঝেছি, আমার সংগে তোর তন্ত্রলীলা ফুরিয়েছে। এখন ওই বদী দাসীটাকে নিয়ে মেতেছিস। ওই বিধবাটারও সর্বনাশ করছিস, যা হোক দুটো করে খেতো—আমার বাড়ীতে দাসী বৃত্তি করে, তাও আর তোর প্রাণে সইল না। উঃ, রাক্ষস কোথাকার! রক্ত খেকো পশু! তোর মরণ হয় না?'

—'এ্যাঁ, কি বললি? দেখবি শয়তানী এই মন্দির বাড়ী থেকে তোকে কি করে তাড়িয়ে দিই—দেখবি আমার মায়াবল...ভারী উত্তেজিত কণ্ঠ; গিন্নীমার নতুন স্বামীর, অর্থাৎ সেই একদা ভিক্ষু বেশী তন্ত্রসাধকের।'

গিন্নীমা কাঁদতে লাগলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সর্বহারার সুরে বলতে লাগলেন—"তা তুই করবি তো মায়া বলে। সে কি আর জানিনে? কামিখ্যে থেকে শিখে পড়ে, শ্মশানের মড়া ঘেঁটে—মন্ত্রশক্তি পেয়ে—এমনি কত মেয়ের সর্বনাশ করবি—তা আর বুঝি নে আমি।" আবার উচ্ছ্বসিত কান্নায়, গিন্নীমা ভেঙে পড়লেন।

এই হোল প্রহরীদের শোনা, প্রথম রাত্রির সংলাপ দ্বিতীয় রাত্রিতেও ওই ধরণের বচসা—বাক বিতণ্ডা তৃতীয় রাত্রিতে ধস্তা-ধস্তিও আওয়াজ শোনা গেল এদের মধ্যে—পরিচারিকা বদী দাসী ধরা ধরা গলা ককিয়ে উঠতো—'আগো, সন্ন্যাসী বাবা, মাকে আমা অমনি কষ্টটা দিওনি বাবা! আমার সমুখে যন্ত্রণা দিও না দোহাই তোমার গা, বাবা ঠাকুর! চরণে পা তোমার। আবাগী বেধবার কতাখান রাখো!' বলে বদী দাসীও ভগ্ন সুরে কাঁদতো!

বলে নেওয়া ভাল, প্রহরী দু'জন ঐ ব্যাপারে আশঙ্কি না হয়ে মজা পাচ্ছিল বেশ! তার কারণ, মন্দির বাড়ী আগাগোড়া রহস্য নাটকটির সুরু থেকে তারা বিস্ম দর্শক। তাই নাটকের শেষ অঙ্কে—বেশ কৌতুক র সৃষ্টি করেছিল বলে, তারা বেশ একটু উপভোগ আনন্দ পাচ্ছিল। ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়া কোথাকার জল কোথায় গিয়ে ঠেকে, এমনি এক রু শ্বাস থমথমে কৌতূহলে বেচারাদের দম বন্ধ

আসছিল। তাই, অন্দর থেকে আর্তরব ভেসে এলেই তারা পা টিপে টিপে—ঘটনাস্থলের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াতো। উৎকর্ণ হয়ে থাকতো মন্দির বাড়ীর মধ্যরাতের সংলাপ শোনবার জন্যে।

গিন্নীমার আর্ত বিলাপ, অভিসম্পাতের শব্দলহরী, আর তন্ত্র বাবাজীর গুরুগর্জন, শাসানী, ঝাঁপানী, লাফানী, কিছুই কম হোত না। আবার ওদের মাঝে সহ-নায়িকা, বদী দাসী অনুনয় বিনয়, আবেদন নিবেদনে সন্ন্যাসী বাবার প্রাণ গলাতে—আকুলতায় ভেঙে পড়তো।

নিদারুণ এই করুণ রসের মধ্যেও প্রচুর হাস্যরস ছিল বলে, প্রহরী দুজন নিশ্চুপ—হয়ে থাকতো। অর্থাৎ গিন্নি-মার সাহায্যার্থে, কারোরই এগিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ হোত না।

কিন্তু অনতিকালের মধ্যে, হাসিকান্নার এই বিচিত্র সংলাপময়—অভিনব নাটকটি—ভয়ঙ্কর পৈশাচিক বর্বরতায় পরিসমাপ্ত হবে ঘটনার কিছু পূর্বেও কেউ কল্পনা করেনি।

এমনি আরো একটা রাত্রি। মধ্য রাতে, মন্দির বাড়ীর পরিচিত আর্তবিলাপ আবার শোনা গেল। পা টিপে টিপে সেই ভাবে অন্দরের ওপরে উঠে এলো প্রহরী দু'জন। নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালো, অলিন্দের অন্ধকারে। কিন্তু ওদের আগমন মুহূর্তের বেশ পূর্বেই নাকি ঘটনাটি ঘটে গেছে। আশ্চর্য, নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে উঠেছিল সেই ভয়ার্ত অন্ধকার রাতে। গিন্নীমার সারা ঘরে—কি ভয়ঙ্কর একটা নিশুতি স্তব্ধতা থমথম করছিল।

অন্ধকারে ওরা দাঁড়িয়ে—পরস্পরের দিকে ওরা চেয়ে রইল। অস্ফুটভাবে দুজনেই যেন কি বলতে গেল ঠিক সেই মুহূর্তে বদী দাসীর করুণ কণ্ঠের কান্না শোনা গেল। কাঁদতে কাঁদতে বললো—হায়! মা ঠান, একি কেচ্ছা তুমি করলে? দারোগা এলে যে তোমায় ধরে নিয়ে যাবে। আর রক্ষেণটুকু পাবেনা' বলে, আবার কাঁদতে লাগলো বদী।

সহসা—সহসা সমস্ত মন্দির বাড়ীর মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে বিকট শব্দে পৈশাচিক হাসিতে—একটি নারীকণ্ঠ উদ্বেল হয়ে উঠলো, হাঃ···হাঃ···হাঃ···হাঃ···হাঃ···

বুক ফাটিয়ে, সর্বশক্তি দিয়ে হাসছেন গিন্নীমা। আকাশ বাতাস ত্রিভুবন কাঁপিয়ে গিন্নীমা হাসতে লাগলেন। সমস্ত মন্দির বাড়ীটা যেন কেঁপে উঠতে লাগলো। ইট, কাঠ, পাথর সব বুঝি খসে খসে পড়তে লাগলো। প্রহরী দু'জন এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেল—এক অশরীরী আতঙ্কে! চলৎশক্তি রহিত হয়ে—ওরা অন্ধকারে মিশে রইলো জড়ের মতন। আর শুনতে লাগলো—এক পিশাচিনীর বিকৃত স্বরের বীভৎস হাস্যরব। হাঃ হাঃ হাঃ···হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ ··

সহসা রুদ্ধদ্বার খুলে গেল। মন্দির বাড়ীর মধ্যরাতের দমকা বাতাসে, বোধহয় বদ্ধদ্বারের ভেজানো দুটি কপাট উন্মুক্ত হয়ে গেল···।

চোখের সামনেই এক ভয়াবহ দৃশ্য ঝলসে উঠলো। ঝাড় লণ্ঠনের হাজার বাতির আলোয় যেন ঝলকাচ্ছে—মাটিতে গড়ানো একটি রক্তাক্ত মৃতদেহ। চারিদিকে রক্ত! রক্ত! রক্ত! লাল নদী যেন তরতরিয়ে বয়ে যাচ্ছে··· সেদিকে চেয়ে গিন্নীমা তখনও হাসছেন—হাঃ হাঃ করে। হাতে ধরা তাঁর ছাগবলির রক্তময় খাঁড়া। লাল আগুনে গিন্নীমার দুটি চোখ বীভৎস—রক্তলোলুপ দৃষ্টি! কবরী খসে গুচ্ছ গুচ্ছ চুলে—পিঠ, কাঁধ—বুক সব ঢাকা পড়ে গেছে। হাসতে হাসতে সবগুলা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। বুকচিতিয়ে বীরাঙ্গণার মত দাঁড়িয়ে তিনি। এক পা তুলে দিয়েছেন মৃতদেহটার বুকে। ভয়ঙ্কর এক বিজয় উল্লাসে গিন্নীমা হাসছিলেন—হাঃ হাঃ হাঃ!

এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখবার শক্তি বোধহয় আর ছিল না প্রহরী দু'জনের। কোনক্রমে তারা আত্মগোপন করে পালিয়ে গেল—মন্দির বাড়ীর বার মহলে। কিন্তু সেখানে গিয়েও ওদের ভয় গেল না। সেই পিশাচিনীর জিঘাংসা মূর্তি, অশরীরী প্রেতাত্মার মত হাসি, ওদের হৃদপিণ্ডকে ঠাণ্ডা বরফের মত জমিয়ে দিল।

ওরা আর সেখানে এক মুহূর্ত দাড়ালো না। দৌড়ে গেল গ্রামবাসীদের বাড়ীর দিকে। সকলকে মধ্য রাতে ডাকাডাকি করে তুলে এই অভিনব কাণ্ডটি জানালো।

অন্ধকার রাতেই মন্দির বাড়ীতে এসে হাজির হোল কাতারে কাতারে লোক; সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে অনেকেই মূর্ছা গেল। আবার অনেকে সাহসে সাহস ভরে ব্যাপারটাকে অনুধাবন করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে হাসির দমকে গিন্নীমা নিজেকে সামলাতে পারেননি। খাঁড়া হাতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মূর্ছা

গেলেন। অবশ্য এখানেই তাঁর সব শেষ। ভদ্রবাবাজীর মৃতদেহের পাশেই—গিন্নীমার ইহলীলা সাঙ্গ হোল। মন্দির বাড়ীর মধ্যরাতের রক্ত উৎসব—এবং রহস্যঘন নাটকটির এইভাবে পরিসমাপ্তি হোল।

তারপর অভিশপ্ত মন্দির বাড়ী ধীরে ধীরে ভেঙে যায়। বড় বড় থিলানের সুবৃহৎ সব অলিন্দের নাতি বৃহৎ স্তম্ভগুলির ইট কাঠ পাথর খসে খসে পড়ে যায়। মন্দির বাড়ী এক কঙ্কালের রূপ ধারণ করে। শেষকালে মন্দির বাড়ীর জাগ্রত বিগ্রহশালাটা—হঠাৎ একদিন ভীষণ ভূমিকম্পনের মত ভেঙে চৌচির হয়ে মিশে গেল মাটির সংগে। আর তারপরেই মন্দির বাড়ীর আশপাশের সব ভীত মানুষরা দলে দলে, তাদের স্থায়ী বাসভূমি ছেড়ে পালিয়ে গেল। সমস্ত জায়গাটা জনশূন্য ফাঁকা হয়ে গেল।

সে আজ অনেকদিনের কথা। মন্দির বাড়ীর রহস্যজনক নাটকটি কবে সুরু এবং পরে শেষ হয়, তার সঠিক খবরের আগেই, আমরা আরো একটি বিস্ময়কর আলোচনায় ফিরে আসছি।

তার অনেকদিন পরই বোধহয়—এই গল্পের প্রথম আখ্যানপর্বটা সুরু। এখন সেটাই সুরু করছি।··

হ্যাঃ, যে আত্মগোপনকারী ডাকাত দলটি, পাথরগাছি গাঁ থেকে ডাকাতি সেরে যখন মাইল দুয়েক পথ অতিক্রম করেছে—তখন দলের সর্দার নাথু বললো—এই আঁধার পথ আর পায়ে হাঁটা যাবে না। শুনেছি, মন্দির বাড়ীর পোড়ো দালানটা ফাঁকা পড়ে থাকে। সেখানে ধারে কাছে কোন মানুষও থাকে না। আর একটু এগোলেই পাব। ওখানেই রাতটুকুন কাটিয়ে—ভাগ বখড়া সব বুঝে নিয়ে ভোরের দিকে আস্তানায় ফিরবো।

এই উত্তম প্রস্তাবে সকলেই সায় দিল।

শেষ পর্যন্ত ওরা গিয়ে উঠলো মন্দির বাড়ীর পোড়ো অন্ধকার দালানে। একটা ঢাকা চত্বরের ওপর গিয়ে ওরা বসেছিল। নাথু সর্দার দেশলাইব কাঠি জ্বালিয়ে একটা বিড়ি ধরালো। পর পর ঘুরিয়ে নিল সেটা সাকরেদদের দিকে। ওরা সকলে একটা অবাক রাতের গুপ্ত ছায়ার জোটবদ্ধ হয়ে সব বসেছিল।

ওদিকে পূর্ণিমার আলো ধুয়ে দিচ্ছিল—সামনের শূন্য মাঠগুলোকে। সুন্দর বাতাস বইছিল! আশ্চর্য এক মাদকতা এনেছিল নাথু সর্দারের চোখে। ভাগ বখড়ার কথা ভুলে গিয়ে সবাই যেন সহসা আনমনা হয়ে গেল এই অভিনব মায়া রাত্রিতে। হয়তো জীবনের কোন অমলিন অতীতের কথা ভাবছিল নাথু সর্দার।

যখন নাথু সর্দার হয়নি। তার ছিলনা এই সব সাঙ্গপাঙ্গরা। নাথুর প্রথম জীবনের সুরুতে ছিল কারা যেন! তারা হারিয়ে গেল একে একে···

নাথু পড়ে গেল তখন একা। যখন তার চোখে দেখা দুনিয়াটাকে—একটা শয়তান মনে হচ্ছিল। হ্যাঁ, ঠিক সময় কে যেন তাকে নিয়ে চলে গেল এক ভয়ঙ্কর জায়গায়, সেখান থেকে আর নাথু কোনদিনই পালাতে পারেনি। ওখানে থাকতে থাকতে সে ছিঁচকে থেকে সর্দারী 'মানটা' পায়। বিরাট একটা আজব দলের দলপতি হয়ে দুনিয়াটাকে ভেল্কী দেখিয়েছে। হ্যাঁ, সেই নাথু পূর্ণিমার আলো বাতাসময়—বনরাজির গন্ধে, উদাস হয়ে কি দেখছিল—জীবনের কোন পুরোণ পৃষ্ঠা খুলে?

সহসা সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ঢুলে আসছিল চোখ দুটো। হ্যাঁ, ঠিক সেই সময় একটা বিকট হাসির শব্দ শোনা গেল। দলের সকলে এক সংগে চমকে উঠলো। এক নারীকণ্ঠের পৈশাচিক হাসি—মধ্যরাতের নিস্তব্ধ প্রহরকে সচকিত করে তুললো। দুর্দান্ত নাস্তিক পুরুষগুলো প্রথমে ভয় না পেয়ে ভাবলো নিশ্চয়ই এই ভাঙা অলিন্দে কোন পাগোল টাগোল লুকিয়ে আছে।

কিন্তু···ওকি?···ও ওকি? ··ওকি?

সহসা পোড়ো মন্দির বাড়ীর বুক চিরে বাজের মত আলো পড়লো। এক সংগে অনেকগুলো সার্চ লাইট যেন জ্বলে উঠলো। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য।

সচকিত হয়ে সকলেই চেয়ে দেখলো—তাদের সকলের মাথার ওপর একটা চকচকে খাঁড়া ঘুরছে চক্রাকারে। যেন এক সংগে সকলের গলায় কোপ বসাবে। কিন্তু আশ্চর্য, খাঁড়াটাই ঘুরছে! কোন মানুষকে দেখা যাচ্ছে না।

এই দৃশ্যের পর সকলেই ভয় পেয়ে গেল। নাথু ফিসফিসিয়ে বললো—এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। চল সব।

দ্রুতগতিতে সবাই এসে মাঠে নামলো। মাঠের ওপর মাঠ পেরিয়ে ওরা ষ্টেশনের দিকে এগোতে থাকলো।

এই গল্পের প্রথমেই আছে—ছোট একটি আত্মগোপনকারীদল ষ্টেশন পেরিয়ে গেছে। ভোরের আলো ফুটে উঠছে চারপাশে। কিন্তু নাথু বিড়ি ধরিয়েও স্বস্তি পাচ্ছিল না। সেই শূন্যেঘোরা খাঁড়াটা যেন তখনও তার মাথার ওপর দুলছিল।

নাথুর তখন সহসা মনে হোল নিশ্চয় ওটা দেবীর খাঁড়া। তারই আরাধ্য দেবী কালীমায়ের খাঁড়া। পাথরগাছি গাঁয়ে যে ভয়ঙ্কর পাপ সে করে এসেছে—তারই প্রতিশোধ নিতে চাইছেন দেবী।

কালীভক্ত নাথু আর নিজেকে সামলাতে পারল না। মনে মনে বললো—অদৃশ্য দেবীর উদ্দেশ্যে—আমার পাপ তুমি ক্ষমা কর—আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। এই বলে, সে দলের সবাইকে এক অদ্ভুত কথা শোনালো—'ভাই সব, দেবী আমাদের ওপর রুষ্ট হয়েছেন। যদি না পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি—তাহলে আরো ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটবে। আমরা সকলে এখন থানায় ধরা দিয়ে দারোগার হাতে ডাকাতির ধন তুলে শাস্তি নিই যদি, তাহলে দেবী আমাদের ক্ষমা করবেন।'

এই বলে ওরা নিজেরা সবাই মিলে—পুলিশের হাতে ধরা দিয়ে মাথা পেতে শাস্তি নিল—এবং এর মূলে সেই অলৌকিক রহস্যসূত্রটাও তারা জানায় থানায়। শুনে সকলেই চমকে উঠে।

অথ গৃহপরিচারিকা সংবাদ

রিট. রায়

'হ্যালো ডার্লিং গ্যাংগুলি'—বলেই জড়িয়ে ধরলেন বেবী গাংগুলীকে মিসেস শ্যামা চ্যাটার্জি। বেবীর বাল্য বন্ধু শ্যামা। বি-এ পাশ করার পর বেবীর বিয়ে হয়ে যায়। এখন সে ছেলেপুলের মা। আর শ্যামা স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর বিয়ে করেছিলেন পতাকীচরণ চ্যাটার্জিকে প্রেমে পড়ে। পতাকী শ্যামার গৃহ শিক্ষক ছিলেন। এম-এ পাশ। স্কুলে পড়ান। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগী। বিয়ের পরে শ্যামাকে তিনি পড়িয়ে এম-এ পাশ করিয়েছেন। তারপর শ্যামার ভাগ্য খুলে গেল। অ্যামেরিকান এক বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেলেন তিনি। পতাকীচরণকে ভাবতে ফেলে তিনি নাচতে নাচতে সিকাগো চলে গেলেন। পতাকীচরণ কেমন ইতস্তত: করছিলেন—তেমন তেমন সাহেব ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করা ইত্যাদি ভাবতে-না-ভাবতেই একটা মধুর কুহুধ্বনি করে, "ডোণ্ট বি জেলাস, মাই বয়—সতীর ভাগ্যে পতির ভাগ্য মনে রাখবে" বলে তাঁকে একদম বসিয়ে দিয়ে তিনি উড়ে চলে গেলেন। ফিরে এলেন। একদম খালি হাতে নয়—কি যেন একটা শিশু শিক্ষার ডিপ্লোমা নিয়ে।

"কবে এলি চ্যাটার্নি?" বেবী 'চ্যাটার্জি' বলেন না 'চ্যাটার্নি' বলেন। তাতে শ্যামা রাগ করেন না।

"ঐ তো সেই গত শনিবার। দমদমে নামলুম। ডেপুটি মিনিষ্টারের ছেলে, ক্যাপটেন সৌরভন, আই-আর-এস অফসর ধীলন ওরা আমায় পোর্টে রিসিভ করলেন। তোরা তো আমার খবর রাখবি নে?

'কি করে রাখব বল। তুমি ছেঁড়া সুতোর ঘুড়ি—যেথা সেথায় উড়ছ?'

'এই নিউ মার্কেটে তো খুব ঘুরতে পারছো?'

'ঘুরছি সাধে? প্রাণের দায়ে। এই তো সুরেন বাঁড়ুজ্যে রোডে গিয়েছিলাম ঝি এর সন্ধানে। যা ঝি—আর যা তার প্রশ্ন, শুনলে তোর পিত্ত জলে যাবে।

'বল, কেমন?

"প্রথমত সে সাবিত্রী ঝি। অনেক মেসে কাজ করেছে। গৃহবধূদের শাসন তার ভালো লাগে না। কি প্রশ্ন করলো শুনবি?

'বল।'

'বলল ঘরে কটি ছেলেমেয়ে? দুটি। বেশ তাদের স্বাস্থ্য ভাল তো? অর্থাৎ প্রায়ই রোগে ভুগে জ্বালাবে না তো? শনিবার রাতে কিন্তু বাড়ী থাকতে পারবো না। রবিবার সকালে চার্চে যাব। বিকালেও নিজের লোক এসে গেলে ছুটি দিতে হবে। সব শুনলুম—বললুম, আচ্ছা বুঝে শুনে পরে জানাব।

'কত পরে? আমি অনেক অফার পেয়েছি। আপনাদের মতামত কাল সকাল আটটার মধ্যে জানাবেন। নইলে বুঝব আমাকে আপনারা চান না। আপনার

সঙ্গে আলাপ হলো তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখলুম। 'বাই বাই' বলে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

'এদেশও তাহলে খুব এগিয়ে গেছে। আয় ওখানে দাঁড়াবি' বলে লাইট হাউসের পর্টিকোর নীচে বেবীকে টেনে নিয়ে দাঁড়ালো শ্যামা। 'শোন্ তবে অ্যামেরিকান্ পরিচারিকাদের কথা। তাদের সমান হতে তোমার সাবিত্রীঝির অনেক—অনেক দেরী। আমি যে বাড়ীতে গেষ্ট হয়ে ছিলাম সেখানকার হোষ্টেস মিসেস্ জর্ডন বলেছেন গল্পটা। গল্প নয় একেবারে সত্য ঘটনা।

মিসেস জর্ডন নিউইয়র্ক সহরের বাইরে একটা নিরি-বিলি ফ্ল্যাট নিয়েছেন। স্বামী ডেইলী প্যাসেঞ্জারী করে নিউ ইয়র্কে কাজ করেন। ছেলেমেয়ে দুটি নিয়ে মিসেস জর্ডন কিছুতেই চালাতে পারছেন না। পত্রিকায় দেখলেন এক শ্বেতাঙ্গিনী বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কোন বিত্ত-শালিনী কুলবধূর গৃহকর্মে সাহায্য করতে রাজী আছেন তিনি। নাম তাঁর মিস্ শিলা স্যাবারস্। টেলিফোন নম্বরও দেওয়া আছে। সেই দেখে ফোন্ করে মিসেস জর্ডন সাতবারের চেষ্টায় পেলেন মিস স্যাবারসকে।

তারপর কথাবার্তা হল এই রকম—

মিস স্যাবারস্—আপনার নাম?

মিসেস জর্ডন—মিসেস গ্রেস জর্ডন। আমি আপনার সহায়তা প্রার্থিনী।

মিস স্যাবারস্—তা বেশ চমৎকার নাম তো? কতদূরে থাকেন শহর থেকে?

মিসেস জর্ড—মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে!

মিস্ স্যাবারস্—ওরে বাবা! এত দূরে? আমায় যে রোজ রাতে আসতে হবে—'সেভয়' হোটেলে নাচতে হচ্ছে। নূতন চাকুরী পেয়েছি ছাড়তে পারছি না।

মিসেস্ জর্ডন—তবে আবার এই বিজ্ঞাপন কেন?

মিস্ স্যাবারস্—টাকায় কুলুচ্ছেনা—চালাতে পারছিনা কিছুতেই—আরও টাকা চাই—অনেক টাকা। আচ্ছা আপনার বাড়ীতে ঘর কখানা?—ছেলে মেয়ে কটি?—রান্নাঘরে আধুনিক সাজ সরঞ্জাম আছে তো? ফ্রিজি-ডেয়ার? আমার শোবার ঘর—বাথরুম, সব আলাদা তো—এয়ার কণ্ডিশান্ড তো? হিটার, টেলিভিসান সেট আছে তো?—সেপারেট বন্দোবস্ত?

মিসেস জর্ডন—আমাদের কিছু কিছু সব রকমই আছে, আপনি এলে আমরা সবাই মিলে ওসব ব্যবহার করব? শেয়ার করব।

মিস স্যাবারস্—আচ্ছা, আপনারা কি খুব অতিথি বৎসল? অর্থাৎ অতিথি কেমন আসে? ক'জন আসে? সপ্তাহে কতবার আসে?

মিসেস জর্ডন—আমরা খুব নিরিবিল। তাইতো সহরের বাড়ী ভাড়া দিয়ে দূরে চলে এসেছি। লোক খুব কম আসে, তার জন্যে কিছু ভাববার নেই।

মিস স্যাবারস্—ও তাহলে খুব ধনবান তরুণ ছেলের সঙ্গে ভাব হবার কোন সম্ভাবনা নেই আপনার বাড়ীতে থেকে? আচ্ছা আপনি কি খুব জেলাস্? অর্থাৎ আপনার স্বামীর সঙ্গে হেসে কথা বললে রাগ করেন?

মিসেস জর্ডন—ওঃ—নো—নো! তবে আমাদের বাড়ী কবে আসছেন বলুন।

মিস স্যাবারস্—আসব ভাই, আসব, এই ক'মিনিটের আলাপেই বুঝেছি তুমি আমার বোনের মত। তোমাকে বলতে বাধা নেই। এ ব্যাপারে একটু সময় দরকার। তোমার নাম ঠিকানা লিখে রেখেছি। পেনেলে তোমার নম্বর হয়েছে ত্রিশ। মনে রেখো। বুঝতেই তো পারছ আজকাল খোঁজখবর না নিয়ে কারো বাড়ীতে কাজ করতে যাওয়া যায় না। কত বাড়ীতে কর্তাগিন্নীতে ভাব থাকে না। পরিচারিকা তাদের মধ্যে গিয়ে বিপদে পড়ে—নয়ত কর্তাকে বা গিন্নাকে বিপদে ফেলে। সে-সব ঝঞ্ঝাটে আমি যেতে চাইনে। তা ছাড়া দেখেছো তো বাড়ীতে চুরি-ডাকাতি হলে পরিচারিকাকে নিয়ে বড় গোলমাল করে লোকেরা—অর্থাৎ কর্তা-গিন্নী-পুলিশ। তাই কোন পরি-বারের কি ইতিহাস তা আগে ইনকোয়ারি করে জানতে হবে। পুলিশে আমার লোক আছে তারা খোঁজ নেবে। তারপর তোমাকে জানাব। তোমার নম্বর ত্রিশ। মনে থাকবে? কেমন?

'থ্যাঙ্-কি উ' বলে টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে হাফ ছেড়ে বঁচলেন মিসেস জর্ডন।

আর সব শুনে হাঁ করে তাকিয়ে রইল বেবী গাংগুলী শ্যামা চ্যাটার্জ্জীর দিকে।

স্থপর্ণা দেবী

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বিলাসী সৌখিন নর-নারীদের মধ্যে অঙ্গরাগ প্রসাধনের বিশিষ্ট আরেকটি রীতি ছিল—বিচিত্র মনোরম নানান ছাঁদে তিলক রচনা করা। পৌরাণিক যুগে তিলক রচনার অভিনব রীতিটি সৌখিন বিলাসের পর্য্যায় থেকে ক্রমশঃ ধর্ম্ম বিশেষের জ্ঞাপক ও প্রতীক-চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিভেদে তখনকার আমলে তিলক রচনারও সবিশেষ তারতম্য ঘটতো। তবে পৌরাণিক যুগের আগেকার আমলে তিলক রচনার এই রীতিটি সৌখিন বিলাস ও প্রসাধনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল এবং সৌখিন-সুন্দর ছাঁদে তিলক-রচনা রীতিকে সেকালের সমাজে 'পত্র-রচনা' নামে অভিহিত করা হতো। প্রাচীনকালে তিলকাঙ্কন বা 'পত্র-রচনার' বিশিষ্ট রীতিকে ভারতের চৌষট্টি-কলারও অন্তর্গত করা হয়েছিল। সেকালে তিলক বা 'পত্র-রচনার' এই অভিনব-রীতির নাম ছিল—"বিশেষকচ্ছেদ্য"। তখনকার আমলে ললাটে এবং কপোলে বিচিত্র-অভিনব ছাঁদে তিলক বা 'পত্র-রচনার' রীতি বিলাসী-সৌখিন সমাজে নর-নারী-নির্ব্বিশেষে প্রচলিত ছিল। চন্দন, হরিতাল মনঃশিলা, গোরোচনা প্রভৃতি ছিল তখনকার আমলে তিলক-রচনার বিভিন্ন উপকরণ। প্রসঙ্গক্রমে, দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রাচীনকালের ভারতীয়, মহাকবি কালিদাসের রচিত 'কুমারসম্ভব' কাব্যের 'পত্র-রচনার' বর্ণনাটির উল্লেখ করা যায়। যথা—

"অথাঙ্গুলিভ্যাং হরিতালমার্দ্রং
মাঙ্গল্যমাদায় মনঃশিলাং চ।"
কুমার-সম্ভব (৭,২৩)

"বিন্যস্তশুক্লাগুরু চক্রুঃঙ্গং গোরোচনাপত্রবিভক্তমস্যাঃ।
—কুমার-সম্ভব (৫, ১৫)

উপরোক্ত এ দুটি দৃষ্টান্ত ছাড়াও মহাকবি কালিদাস রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'রঘু-বংশ' কাব্য-গ্রন্থের ১৭শ সর্গে অতিথির গোরোচনা দ্বারা 'পত্র-রচনার' বর্ণনাটিরও উল্লেখ করা চলে।

সিন্দুরের সাহায্যে নারীর ললাটে তিলক-চিহ্ন রচনার রীতিও ভারতীয় হিন্দু সমাজে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সুপ্রচলিত আছে। কারণ, সিন্দুর-তিলকই হিন্দু-নারীর সধবার লক্ষণ—পরম সৌভাগ্যের ও বিশেষ-গৌরবের প্রতীক-চিহ্ন এবং সেই হিসাবেই বৈদিক যুগ থেকে সুরু করে অধুনাকাল পর্য্যন্ত আসমুদ্র-হিমালয় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই হিন্দু-সমাজে সিন্দুর-চিহ্নের ব্যাপক প্রচলন। তাছাড়া হিন্দুদের পূজা-আরাধনা, বিবাহ প্রভৃতি সকল শুভানুষ্ঠানেরই বিশেষ উপকরণ হিসাবে সিন্দুরের সমাদর ও ব্যবহার রীতিমত প্রসারতা লাভ করেছে।

সিঁদুরের তিলক-রচনা ছাড়াও, খয়েরের ও কাজলের টিপও প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় নারীদের সীমন্ত-ললাটের যথেষ্ট শোভাবর্দ্ধন করে আসছে। পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব সমাজে বৈষ্ণবীদের 'রসকলি'—তিলক-রচনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে বাঙলাদেশের মধ্যযুগের বিশিষ্ট বৈষ্ণব-কবি রচিত "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু" গ্রন্থের কয়েক ছত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা—

"কণ্ঠে পরায়ল মণিময় হার।
অঙ্গে বিলেপন কুঙ্কুম ভার॥
বসন পরায়ল করি কত ছন্দ।
কিঙ্কিনী জালহি নীবি নিবন্ধ॥
নিজ করপল্লবে মঝু মুখ মাজ।
নয়নহি কয়ল সুকাজর সাজ॥

অলকা তিলকা দেই চৌরি নেহারি।
কহে কবিশেখর যাঁউ বলিহারি॥"
—শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

উপরোক্ত বর্ণনাটি থেকে সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যে সেকালের সৌখিন-মহিলাদের সমাজে চন্দন, কুঙ্কুম ও অলকা-তিলকা দিয়ে অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধনের রীতি সুপ্রচলিত ছিল।

তিলক-রচনার মতোই, সেকালের বিলাসী-সৌখিন নরনারীদের সমাজে নেত্রশোভা বর্দ্ধনের জন্য—'অঞ্জন ধারণ' বা 'কাজলরেখায়' আঁখিপল্লব চিত্রণের রীতির সবিশেষ সমাদর ও ব্যাপক প্রচলন ছিল। কারণ, 'অঞ্জন ধারণের' ফলে, শুধু যে নেত্রশোভা বৃদ্ধি পেতো তাই নয়, নিয়মিত কাজল ব্যবহারে চোখের জ্যোতিও সুদীর্ঘকাল সুস্থ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হতো। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীনগ্রন্থ 'রাজবল্লভেও' অঞ্জনধারণের বিশিষ্ট গুণাবলী সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে। যথা—

"তারানৈর্ম্মল্য কারিত্বম্।
নির্ম্মল চন্দ্রতুল্য নিরাকুল দৃষ্টিকারিত্বঞ্চ॥"
—রাজবল্লভ

প্রাচীন যুগের ভারতীয় শাস্ত্রকার সুপ্রসিদ্ধ সুশ্রুত নানা ধরণের অঞ্জন এবং সেগুলি প্রস্তুত করবার বিবিধ উপায় ও উপকরণাদির বর্ণনা করেছেন। সুশ্রুতের বর্ণনা থেকেই সুস্পষ্ট আভাস মেলে যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে 'অঞ্জন ধারণ' রীতি নিছক সৌখিন প্রসাধন সামগ্রীই ছিল না, বরং নিয়মিত এ রীতি অনুসরণে, জনসাধারণের হিতসাধনের ব্যবস্থা হতো অনেকখানি। অধুনা আমাদের দেশে এ রীতির তেমন প্রচলন নেই বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে 'অঞ্জন ধারণ' ছিল—নর-নারীনির্ব্বিশেষে নিত্যনৈমিত্তিক প্রসাধনের একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য অঙ্গ। এমন কি, 'স্মৃতি' এবং 'পুরাণেও', অবশ্যকর্ত্তব্য দৈনন্দিন প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে 'অঞ্জনধারণ' রীতিটি বিশেষ-ভাবে উল্লিখিত আছে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকার সুপ্রসিদ্ধ বাৎসায়নও 'অঞ্জনধারণ' রীতিটিকে তৎকালীন বিলাসী সৌখিন সমাজের নরনারীদের একান্তপালনীয় প্রাতঃপ্রসাধনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং মহাকবি কালিদাসও স্ত্রীনেত্রের অঞ্জন শোভায় বিমুগ্ধ হয়ে তাঁর অমরলেখনীতে সরস বর্ণনা দিয়ে গেছেন সুললিত কাব্যের ছন্দে।

—

কাঁথা-সেলাইয়ের নক্সা নমুনা

শোভনা রায়

সৌখিন-সুন্দর বিচিত্র-নক্সাদার কাঁথা-সেলাইয়ের রীতি—বাঙলাদেশের গ্রামীন ও নাগরিক মহিলা-সমাজে বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিশেষ সমাদর ও রীতিমত জনপ্রিয়তা লাভ করে আসছে। বাস্তবিকই, নানা ছাঁদে, নানান্ রঙে সূক্ষ্ম সুন্দর সৌখিন সূচীশিল্পের অপরূপ নক্সাদার কাঁথা রচনায় বাঙলাদেশের মহিলাদের অভিনব রুচিজ্ঞান ও কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তার তুলনা সহজে বড় একটা মেলে না। তাই কাঁথা সেলাইয়ের এই রীতিটিকে একালের দেশী বিদেশী বহু বিশিষ্ট কলাবিদ-সুধী পণ্ডিত বাঙলাদেশের একান্ত নিজস্ব ও অনন্য-সাধারণ শিল্প নিদর্শন হিসাবে সবিশেষ গৌরবের আসন প্রদান করে থাকেন। তবে দুঃখের বিষয়, বিবিধ সমস্যা সঙ্কুল বর্তমান জীবন-ধারার বিক্ষুব্ধ আলোড়নের সংঘাতে, বাঙলার অভিনব অপরূপ এই চিরন্তন শিল্পকলাটি আজ নিতান্তই অবহেলিত। তাই অধুনাকালের সূচীশিল্পানুরাগিণী মহিলাদের মনে বাঙলার বিশিষ্ট লোককলা বিচিত্র মনোহর কাঁথা রচনার প্রতি অনুরাগ প্রসারকল্পে

এবারে সহজ সরল এবং সৌখিন সুন্দর ছাঁদের একটি নক্সা নমুনা উপহার দেওয়া হলো।

উপরের ছবিতে ঢাল-বল্লম হাতে যে ঘোড়সওয়ার সেপাইয়ের নক্সাটি দেখানো হয়েছে, বিভিন্ন রঙের সুতোর সাহায্যে নিপুণ-ছাঁদে কাঁথার গায়ে ছুঁচের ফোঁড় তুলে, সে নক্সাটিকে রূপ দান করা বিশেষ কঠিন কাজ নয়।

আলোচনার সুবিধার্থে, মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যাক যে—কাঁথাটি সেলাই করা হবে শাদা রঙের কাপড়ের উপর। কাঁথার জমির কাপড়ের রঙ যদি শাদা হয়, তাহলে ঘোড়ার দেহাংশ রেখা রচনা করবেন—গাঢ় বাদামী রঙের সুতোয়। ঘোড়ার নাক, চোখ, পায়ের ক্ষুর, ঘাড়ের কেশর এবং ল্যাজ রচনার জন্য, কালো রঙের সুতো ব্যবহার করাই বোধহয় অনেক বেশী মানান-সই হবে। ঘোড়ার লাগাম, জীন, বগলশ্‌ প্রভৃতির জন্য বেছে নেবেন টুকটুকে লাল রঙের সুতো। ঘোড়সওয়ার সেপাইয়ের পাগড়ীর কালো তাজ বানানোর জন্য মানান-সই ধরণের গাঢ় লাল, বেগুনী, বা নীল রঙের সুতোই বেছে নেওয়া ভালো। সেপাইয়ের পাগড়ীর বাকী অংশ-টুকু, দেহের উপরার্দ্ধের অঙ্গরাখা পোষাক, ধুতি রচনা করবেন গাঢ় হলুদ বা কমলা রঙের সুতোয়; জামার বোতামগুলি বানাবেন লাল রঙের সুতোর সাহায্যে এবং বল্লম ঝুলিয়ে রাখার বন্ধনী রচনা করবেন গাঢ় লাল রঙের সুতো দিয়ে। সেপাইয়ের ধুতির পাড়, নাগরা জুতো এবং দেহের নিম্নার্দ্ধের পরিচ্ছদ বানানোর জন্য মানানসই ধরণের গাঢ় লাল অথবা বেগুনী রঙের সুতো বেছে নেওয়াই বোধহয় ভালো হবে। এবং জামা ধুতি জুতোর মাঝখানে যে সব নক্সাদার বিন্দু ও রেখা রয়েছে সে-গুলি রচনা করবেন মানানসই ধরণের হলুদ, কমলা বা শাদা রঙের সুতোয়। ঘোড়সওয়ারের মুখ, নাক, চোখ, চুল, গোঁফ, হাত ও পায়ের রেখাংশ রচনা করবেন কালো রঙের সুতোয়। সেপাইয়ের হাতের ঢাল এবং পিঠে ঝোলানো বল্লম সেলাই করবেন গাঢ় সবুজ রঙের সুতো দিয়ে। ঢালের মধ্যভাগের গোলাকার শাদা অংশ-গুলি রচনা করবেন ফিকে হলুদ রঙের সুতোয় এবং বল্লমের ফলাটি সেলাই করবেন ফিকে ছাই রঙের সুতো দিয়ে। পথের ধারের ঘাসের শীষগুলির জন্য বেছে নেবেন মানান-সই ধরণের ফিকে অথবা গাঢ় সবুজ রঙের সুতো।

এই হলো, এবারকার ঘোড়সওয়ারের নক্সাটি কাঁথার উপরে রূপদান করার মোটামুটি হদিশ।

—
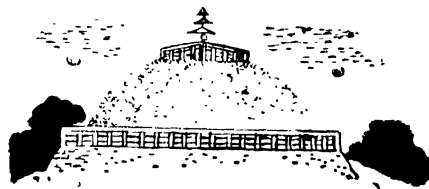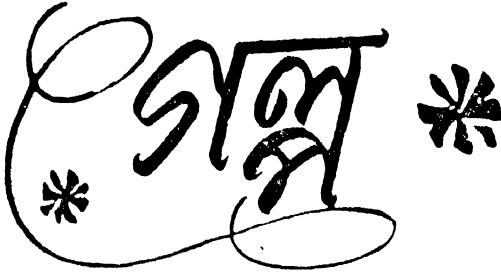
পরিবৃত্ত

অরুণ দে

বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ প্রায়। কিন্তু কনেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সে সেজেগুজে একঘর লোকের সামনে কিছুক্ষণ আগেই বসেছিল। কনের বন্ধুরা হাসিতামাসা করছিল। ওদিকে কর্মকর্তারা বর আর বরযাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত। এরই মধ্যে মেয়েটা হঠাৎ যে কোথায় কর্পূরের মত উবে গেল, কিছুই বোঝা গেল না।

কনের বাবা শ্রীকান্তবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। শুভলগ্নের আর দেরী নেই। একবাড়ী লোকের মধ্যে অপমানের চূড়ান্ত হতে হবে।

কনের ঘরের মেয়েরা জানাল যে "আসছি" বলে ছাদের দিকে গিয়েছিল মিনতি—তারপরে আর ফেরেনি। ছাদে খোঁজা হল, সেখানে মিনতি নেই। প্রতি ঘরে খোঁজা হল, কোথাও নেই। ওদিকে বরপক্ষ তাড়া দিচ্ছে—কই মশায়, কনে নিয়ে আসুন—লগ্ন যে বয়ে যায়।

কোন উপায় না দেখে ক্ষমা চাইবার জন্য বরের ঘরের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলেন শ্রীকান্তবাবু। এমন সময় হৈ চৈ শোনা গেল—পাওয়া গেছে—পাওয়া গেছে।

কনের মামা জানালেন সিঁড়ির নীচে যে ছোট ঘরটা আছে তারই মধ্যে খিল দিয়ে একা মিনতি শুয়ে আছে। অনেক ডাকাডাকি সত্ত্বেও কোন সাড়া দিচ্ছে না, দরজাও খুলছে না।

সিঁড়ি দিয়ে ছুটে গেলেন শ্রীকান্তবাবু। বার কয়েক দরজায় ধাক্কা দিয়েও যখন কোন উত্তর পেলেন না তখন দরজায় কপাল ঠুকে চীৎকার করে বললেন, "দরজা না খুললে আমি এখানে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব। বাপের মরা-মুখ দেখতে না চাস তো দরজা খোল।"

বার কয়েক কপাল ঠুকতেই দরজা খুলে গেল। মেয়ের দিকে তাকালেন শ্রীকান্তবাবু। কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। মাথার চুল এলোমেলো। চোখের জলে মুখের চন্দনের রেখাগুলি ধুয়ে গেছে।

মেয়ের হাতটা শক্ত মুঠিতে ধরে শ্রীকান্তবাবু বললেন, "আমার নাক কাটাবার জন্যই কি তোর জন্ম হয়েছিল? ছিঃ। চল।"

"আমাকে ক্ষমা কর বাবা" ছোট করে জবাব দিল মিনতি।

—"আর সময় নেই। কেন, কি হয়েছে? বিয়ে করবি না কেন?"

—"তুমি তো সব জান বাবা। এ অবস্থায় কি বিয়ে করা উচিত?"

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন শ্রীকান্তবাবু। হ্যাঁ, তিনি সবই জানেন। ডাক্তারের শেষ রিপোর্ট দিন কয়েক আগেই এসেছে। মিনতির যক্ষ্মা হয়েছে। বুকের ফটো থেকে প্রমাণ হয়েছে যক্ষ্মার বীজাণু মিনতির বুকের ভিতরে আক্রমণ করেছে। আর সে জন্যেই মিনতির তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন শ্রীকান্তবাবু। কারণ দশজনে যদি একবার জেনে যায় তবে মেয়ের বিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে।

মিনতির কিন্তু প্রথম থেকেই বিয়েতে আপত্তি ছিল। তার এই অসুখ নিয়ে সে আর একটা মানুষের সর্বনাশ করতে চায় নি। তাছাড়া তার এ আশঙ্কাও হয়েছে যে ভবিষ্যতে তার অসুখের কথা জানতে পারলে হয়ত শ্বশুরবাড়ার লোক তাকে তাড়িয়ে দেবে। বাবাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে মিনতি কিন্তু শ্রীকান্ত-বাবু কোন কথা কানে তোলেন নি। চিরকালই তিনি নিজে যা ভাল বোঝেন তাই করেন। আজও কারও কথা

শুনলেন না। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন মিনতিকে। বসিয়ে দিলেন বিয়ের পিড়িতে।

* * *

দুরু দুরু বক্ষে শ্বশুরবাড়ী রওনা হল মিনতি। ভবিষ্যতের ভয়ে ভাবনায় তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। বাবাকে ছেড়ে আসার জন্য কষ্টও কম হচ্ছিল না। নিজের অজ্ঞাতেই কখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল।

"ছি, কেঁদো না। সব মেয়েকেই তো শ্বশুরবাড়ী যেতে হয়। শুভ যাত্রার সময় চোখের জল ফেলতে নেই,"—গাড়ীর মধ্যে মিনতির চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলল মিনতির স্বামী সুধীর।

চোখ মুছে তাকাল মিনতি। তার স্বামী সত্যি সুপুরুষ, সুন্দর। স্নেহকোমল মুখশ্রী।

একটু সরে বসল মিনতি। তার চোখে আবার জল এল। সুধীর আর একটু এগিয়ে এসে মিনতির ফুলের পাপড়ির মত গালে হাত রেখে বলল, "লক্ষ্মীটি, কাঁদতে নেই। তোমার চোখে জল দেখলে আমার যে কষ্ট হয় তা কি তুমি বোঝ না? এই।"

লোকটার উপর বড় মায়া হল মিনতির। ইচ্ছে হল বলে—অত কাছে এসো না, আমার নিশ্বাসে বিষ আছে—কিন্তু সেকথা বলা হল না। বরং কাপড়ের মধ্যে মুখ গুজে চোখ আড়াল করে সে বলল, "বাবার জন্য বড় মন কেমন করছে।

শ্বশুরবাড়ীতে সকলে সানন্দে বরণ করল নববধূকে। সকলে একবাক্যে স্বীকার করল এ তল্লাটে এমন লক্ষ্মী প্রতিমার মত বৌ এর আগে আর কারো ঘরে আসে নি। নববধূর অসামান্য রূপের খ্যাতিতে সুধীরও কম গৌরবান্বিত বোধ করল না। আর শুধু রূপই তো নয়, দিনকয়েকের মধ্যে শ্বশুর-শাশুড়ীকে এমন আপন করে নিল মিনতি যেন সে তাদের জন্মজন্মান্তরের আপনজন।

মিনতির প্রথম দিকের ভয় কিছুকালের মধ্যে অনেকটা কেটে গেল। মনে হল তার অসুখটাও বুঝি সেরে গেছে। দেহমনে কোথাও কোন ক্লান্তি সে কখনও বোধ করে না। পাখীর মত নতুন নীড় গড়ার আনন্দে কল্পনার ডানা মেলে ভাবের আকাশে সে উড়ে চলে।

কিছুকাল স্বামীর ঘরে কাটিয়ে বিজয়িনীর মত বাপের বাড়ী ফিরে এল মিনতি। সঙ্গে এল সুধীর। জামাইকে যথাসাধ্য আদর যত্ন করলেন শ্রীকান্তবাবু। মেয়ের মুখে খুশী-খুশী ভাব দেখে আনন্দিত হলেন। ভাবলেন জীবনের জুয়া খেলায় তিনি জয়ী হয়েছেন। মিনতির রূপে জামাই ভুলেছে কিন্তু তার ভেতরে যে একটা কুৎসিত রোগ আছে তা মোটেই টের পায় নি। পরে যদি বুঝতেও পারে তবে তিনি বলতে পারবেন যে বিয়ের আগে মেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল।

সুধীর বিদায় নেবার দিনে মিনতিকে বলল, "কতদিন বাবার কাছে থাকবে? আজই চল না।"

হাসল মিনতি—"যাও। তা কি হয়? সবাই কি ভাববে।"

—"হয় না। তবে আমি আর যদি না আসি?"

—"অমন কথা বোল না। আমার ভয় করে।"

—"তবে মাস দুই থেকেই যাও—কেমন?"

—"এতকাল তোমায় ছেড়ে থাকা যায় কি?"

—"থাকা যায় না? সত্যি?"

—"এই শোন, মাসখানেক পরে হঠাৎ চলে এস। একটা কিছু বলে আমায় জোর করে নিয়ে যেও। আমি কিন্তু সে সময় যেতে চাইব না, কাঁদব কিন্তু তুমি আমায় জোর করে নিয়ে যাবে—বুঝলে?"

—"ওরে দুষ্টু। কাছে এস।"

—"এই ছাড়—বাবা আসছে।"

সরে দাঁড়াল সুধীর। শ্রীকান্তবাবু সত্যি আসছেন।

সুধীর চলে যাবার পর শ্রীকান্তবাবু মেয়েকে বললেন, "কি, এখন ভয় গেছে তো। তখন তো বলেছিলাম কিছুই তোর হয় নি। তুই তো ভয়ে বিয়ে করবি না ঠিক করেছিলি। ভাগ্যিস জোর করে বিয়ে দিলুম। আমি লেখাপড়া শিখি নি তবে মুখ্যু নই।"

মাথা নীচু করে মিনতি বলল, "বাবা, তোমার খাবার নিয়ে আসি, বেলা অনেক হল।"

"না তোর আমার খাবারে হাতে দিয়ে কাজ নেই। কি জানি যদি"—বলে একটু থেমে শ্রীকান্তবাবু যোগ করলেন, "এখানে যখন এসেছিস তখন একবার না হয় বুকের এক্সরে করিয়ে নে।"

—"ও। আচ্ছা," বলল মিনতি।

সেদিন বিকেলেই মিনতি তাদের বাড়ীর ডাক্তারের কাছে গেল এবং বুকের ফটোও তুলে এল।

দিনকয়েক পরে এক্সরে-র ফটো নিয়ে ডাক্তার নিজেই এলেন এবং জানিয়ে গেলেন যে যক্ষ্মার বীজাণুগুলি মিনতির বুকের ভেতরে আরও কয়েকটা ছিদ্র করেছে, অসুখ বেড়েছে। সব কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মিনতি।

সেবার সুধীর যখন তাকে নিতে এল তখন মিনতি আন্তরিকভাবেই তার সঙ্গে যাবার অনিচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু তার কান্না ও অনিচ্ছাকে পূর্ব-পরিকল্পিত অভিনয় মনে করে সুধীর তাকে জোর করেই নিয়ে গেল। শ্রীকান্তবাবুও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

সেরাত্রে বিছানায় শুতে গিয়ে বিস্মিত হল সুধীর। খাটের উপর শুধু তার মাথার বালিশটা রয়েছে, মিনতির শয্যার কোন চিহ্ন নেই।

মিনতিকে ডেকে সে বলল, "এর মানে? তুমি কোথায় শোবে?" কিছুক্ষণ নীরবে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে রইল মিনতি। কিছুতেই বলতে পারল না যে ডাক্তার তাকে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হতে নিষেধ করেছে।

মিনতি বলল, "আমি বারান্দায় শোব।"

—"কেন?"

—"ঘরে আমার গরম লাগে।"

—"তোমার কি হয়েছে বলত? সকাল থেকেই কেমন যেন অদ্ভুত ব্যবহার করছে। আমার কাছে ঘেষতেই চাইছ না। কি হয়েছে?"

—"কিছু না।"

"দুষ্টুমি কোর না। কাছে এস লক্ষ্মীটি।"

—"তুমি আমায় ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না," বলে দুপা পিছিয়ে গেল মিনতি। তার চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া দেখে অবাক হল সুধীর। ভেবে পেল না মিনতি বাপের বাড়ী থেকে এমন বদলে এল কেন?

"আমাকে কালকেই বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও," বলল মিনতি।

—"তার মানে? কোনো পুরাণ প্রেমিককে ফেলে এসে মন খারাপ লাগছে বুঝি?"

—"যাও। কি যে বল।"

—"তবে?"

—"এমনি।"

—"এসো, একটু আদর করি।"

সুধীর দু'পা এগোতেই মিনতি ভেজা গলায় বলল, "ওগো, আমার কাছে এসো না। আমি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে আর পারছি না।" তারপরে ছুটে পালাল।

* * *

পরদিন অফিস থেকে বাড়ী ফিরে বিরক্ত হল সুধীর। অফিস থেকে সে বাড়ী ফিরতেই মিনতি আগে তার জলখাবার নিয়ে আসত। কাছে বসে হাসিমুখে কথা বলত। আজ তার কোথাও চিহ্ন পাওয়া গেল না।

মার কাছে সে যা শুনল তা'তেও কম বিস্মিত হল না। মিনতি নাকি রান্নাঘরে আজ একেবারেই যায় নি, বুড়ী মাকেই হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হয়েছে। অথচ প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে এসে মিনতি শাশুড়ীর হাত থেকে রান্নার ভার নিজেই জোর করে তুলে নিয়েছিল। আরও শুনল মিনতি নাকি দুপুরে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় ফিরে ছাদের চিলে কোঠায় একা শুয়ে আছে।

ছাদে উঠে গেল সুধীর।

মিনতি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল সে কি করবে। যক্ষ্মা তো আজকাল এমন কিছু দুরারোগ্য রোগ নয়। সে শুনেছে, অপারেশন করে অনেকেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে।...মিনতি ভাবল সে বাপের বাড়ী গিয়ে অপারেশন করিয়ে সুস্থ হয়ে আবার স্বামীর ঘরে ফিরে আসবে। তার অনুপস্থিতিতে স্বামীর খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হবে কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি। একবার তার ইচ্ছা হল স্বামীকে সব কথা খুলে জানায়। পরক্ষণেই মনে হল, জানিয়ে কিছু লাভ নেই—মিছিমিছি বেচারা দুর্ভাবনায় কষ্ট পাবে। যে স্বামী এত ভালবাসে তার চিন্তা বাড়িয়ে কি লাভ। বরং সে একাই নিজের দুর্ভাগ্য বহন করবে। স্বামীর মত করিয়ে বাপের বাড়ী যাবে তারপর যদি কোনদিন সুস্থ হয়ে ফিরতে পারে তখন সব কথা জানাবে।...

মিনতির চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। পায়ের শব্দে চমক ভাঙল। সে ফিরে দেখল সুধীর দাঁড়িয়ে আছে।

—"মহারাণী কি ছাদে বসে আকাশের তারা গুণছেন?" বলল সুধীর।

—"তার মানে ?"—তাকাল মিনতি।

—"বলি, ঘরের কাজকর্মে হাত দাও নি কেন ? বড়-লোকের মেয়ের কি স্বামীর রান্নাটুকুও করতে ভাল লাগে না।"

—"আমি কারো কেনা বাঁদী নই যে রোজ রাঁধতে হবে।"

—"আমাদের বাড়ীতে থাকলে আমাদের মতেই চলতে হবে।"

—"আমাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

—"তোমাকে তোমার বড়লোক বাবার কাছে রাখবার জন্য বিয়ে করে আনি নি।"

—"তবে কি জন্যে এনেছ ?"

—"তোমার রূপের খুব দেমাক হয়েছে দেখছি।"

—"এর মধ্যে রূপের কথা কি হল। একি! না—কাছে এসো না।"

মিনতি সুধীরকে এগোতে দেখে তাড়াতাড়ি চিলে কোঠায় ঢুকে দরজায় খিল দিল।

সুধীর বাইরে থেকে বলল, "কাছে এলে পালিয়ে যাও কেন। তুমি কি আমায় ঘৃণা কর মিনতি ?"

"হ্যাঁ, ঘৃণাই করি।" বলে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল মিনতি।

মিনতি স্বামীর সঙ্গে কোনদিন কর্কশ কথা বলে নি। আজ তার মুখ দিয়ে কি করে যে কতগুলো শক্ত কথা বেরিয়ে গেল তা সে নিজেই বুঝতে পারল না।

—"দরজা খোল মিনতি। খোল বলছি, না হলে এর পরিণতি ভাল হবে না।"

—"আমি তো আমার ভাল চাই না।"

—"কি বাজে বকছ। দরজা খোল।"

—"না।"

কিছুক্ষণ অনুরোধের পর বিরক্ত হয়ে সুধীর নীচে চলে গেল।

* * *

পরদিন ধরা পড়ে গেল মিনতি। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে সে কলতলার দিকে এগেছিল। পেছন থেকে চুপি চুপি এসে সুধীর তার হাত চেপে ধরল।

—"ছাড়। ছেড়ে দাও।"—চীৎকার করে উঠল মিনতি।

—"তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি—কি হয়েছে ?" বলল সুধীর।

—"পাগল হই নি তবে হয়ত হতে পারি।"

—"তোমার পাগলামি সারিয়ে দিচ্ছি" বলে নিজের ঠোঁটটা মিনতির মুখের দিকে এগিয়ে দিল সুধীর।

"না—ওগো না," বলে ছিটকে সরে গেল মিনতি, তারপর উত্তেজনায় কাশতে লাগল আর কাশতে কাশতে গল গল করে মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ল।

সভয়ে তাকিয়ে রইল সুধীর। "সরে যাও—চলে যাও" —চীৎকার করে উঠল মিনতি।

গোলমাল শুনে শ্বশুর শাশুড়ী হাজির হলেন। মিনতি নিজ মুখে তার সব ইতিহাস বলল। জানাল বিয়ের আগেই তার এ রোগ ধরেছিল, তার বাবা সব গোপন রেখেই বিয়ে দিয়েছেন।

সুধীরের বাবা-মা সভয়ে ছেলেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

সে রাত্রেই মিনতিকে তার শ্বশুর শাশুড়ী বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিল।

মিনতি যাবার সময় শ্বশুর বাড়ীর সমস্ত অলঙ্কার নিজেই খুলে রাখল, শুধু বিয়ের রাত্রে স্বামী তাকে যে হারটা গোপনে গলায় পরিয়ে দিয়েছিল সেটা সঙ্গে নিল। দূর থেকে প্রণাম করল স্বামীর উদ্দেশ্যে।

শীতের দিনে

শ্রীজ্ঞান

সব ঋতুর মধ্যে শীতকালটাকেই যেন কিশোরেরা বেশী পছন্দ করে বলে মনে হয়। কারণ শীতের সময় ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় শারীরিক পরিশ্রম করবার শক্তি বৃদ্ধি পায় বলে সারাদিন ঘুরে বেড়ানো বা খেলাধূলা করলেও সহজে ক্লান্তি আসে না। 'পিক্‌নিক্‌' বা বনভোজন করা, নানা স্থানে ভ্রমণ, নানা দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন প্রভৃতির জন্য এবং সর্ব্বোপরি খেলাধূলার নানারূপ সুযোগ সুবিধা থাকার জন্যও এই শীতকালটাকেই ছেলেমেয়েরা বিশেষ করে পছন্দ করে। তার ওপর নানারূপ আন্তর্জাতিক খেলাধূলার আসরও এই শীতকালেই বসে থাকে। যেমন এবারে টেনিস খেলায় আন্তর্জাতিক খেলা, ডেভিস্‌ কাপের সেমিফাইনালের খেলা কলিকাতার সাউথ ক্লাবের লনে অনুষ্ঠিত হল। ভারত এই খেলায় দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রামানাথন কৃষ্ণাণের কৃতিত্বে জয়লাভ করে ফাইনালে গত কয়েক বছরের বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সুযোগ পেল। এর আগেও ভারত তিনবার সেমিফাইনালে উঠেছিল, কিন্তু কোনবারই ফাইনালে যাবার সুযোগ পাই নি। সে দিক থেকে এবারে ভারতের কৃতিত্ব যথেষ্ট বলা চলে এবং রামানাথন কৃষ্ণণ ও ভারতের দুই নম্বর খেলোয়াড় বাংলার ছেলে জয়দীপ মুখার্জ্জির অনবদ্য ক্রীড়াকৌশলই টেনিস খেলায় জগতে ভারতের স্থান এত উর্দ্ধে তুলেছে বলে এঁরা দু'জন আজ ক্রীড়াবিদ মাত্রেরই প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র হয়ে উঠেছেন। ফাইনালে হয়ত ভারতকে পরাজিত হতে হবে কারণ টেনিস জগতে অষ্ট্রেলিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী দেশ এবং ঐ দেশের টেনিস খেলোয়াড়েরা আজ বিশ্বশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত। কিন্তু তবুও 'রাণার্স-আপ'রূপে ভারতের কৃতিত্বও বড় কম হবে না।

এর পর আসছে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দেশের সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দেশ এখন ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি সকল দেশকে পরাজিত করে বিশ্বশ্রেষ্ঠ আখ্যা লাভ করেছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স আজ ক্রিকেটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড় রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং-এ তাঁর অসামান্য দক্ষতা আজ সকলকে চমৎকৃত করেছে। অবশ্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পূর্ব্বতন অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল এবং অষ্ট্রেলিয়ার কিথ্‌ মিলার এবং তার আগে আরও অনেকেরই ক্রিকেট খেলার এই তিন বিভাগে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে এবং তাঁরাও শ্রেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু গারফিল্ড সোবার্সের আর একটি বিশেষ কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি টেষ্ট খেলার ব্যাটিং-এ বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারীও! ইংলণ্ডের ওপনিং ব্যাট্‌ ব্যাটসম্যান্‌ লেন্‌

হাটন্ (সার লিওনার্ড হাটন)-এর ৩৬৪ রানের বিশ্ব-রেকর্ড পাকিস্তানের বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় তিনি ভঙ্গ করে দেন। এখনও পর্য্যন্ত সোবার্স-এ এই বিশ্ব-রেকর্ড অক্ষুন্ন রয়েছে। সোবার্স ছাড়াও ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলে বিশেষ শক্তিশালী খেলোয়াড়রা রয়েছেন। বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ দ্রুতগামী বোলার ওয়েস হল ও চার্লি গ্রিফিথ এবং বিখ্যাত ব্যাটসম্যান্ রোহান কানাই, কন্‌রাড হাণ্ট প্রভৃতি এই দলে রয়েছেন। এইরূপ শক্তিশালী দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বড় সহজ কথা নয় এবং বোম্বাই-এ প্রথম টেষ্টে ভারত পরাজিতও হয়েছে। তবে পরাজিত হলেও ভারত খারাপ খেলে নি—রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তবেই পরাজয় বরণ করেছে। এখন আসন্ন কলিকাতার দ্বিতীয় টেষ্ট খেলার দিকেই সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছেন।

এরপর জানুয়ারী মাসে রাশিয়ান টেবল টেনিস দল ভারতে খেলতে আসছেন। কলিকাতায় তাঁরা একটি টেষ্ট ম্যাচ্ খেলবেন। টেবল টেনিস অনুরাগীরা রাশিয়ানদের খেলা দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। রাশিয়ান টেবল টেনিস খেলোয়াড়রা যদিও বিশ্ব শ্রেষ্ঠের মধ্যে পড়েন না তবুও খেলাধূলার জগতে তাঁদের কৃতিত্বের জন্য তাঁরা বিশেষ জনপ্রিয়। আশা করা যায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাঁদের সঙ্গে ভাল রকমই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

সুতরাং এবারের শীতের মরশুমে খেলাধূলার আসর যেমন জমজমাট হয়ে উঠেছে তাতে তোমাদের এই সময়টা বেশ ভালই কাটবে। তাই না?

***

বুদ্ধিই বল

কালু পাল

সম্রাট আকবর জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের অত্যন্ত সমাদর করতেন। তাঁর রাজসভায় নানা বিষয়ক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। বিদ্বান থেকে শুরু করে গায়ক বাদ্যকার এমন কি রসিক ব্যক্তিরও সেখানে অভাব ছিল না।

এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে বীরবলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একাদিক্রমে কবি, যোদ্ধা ও হাস্য-রসিক ছিলেন। সর্বোপরি তাঁর বুদ্ধি ছিল অসাধারণ।

তিনি আকবরের সভাকে সদা-সর্বদা আনন্দমুখর করে রাখতেন। যখনই সম্রাট কোন কারণবশতঃ বিমর্ষ হয়ে পড়তেন তখনই তিনি তাঁকে মজার মজার গল্প কিংবা কথা বলে হাসিয়ে তাঁর বিমর্ষতা দূর করে তাঁকে খুশী করে তুলতেন।

আবার রাজসভায় যখনই কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে রাজসভার আবহাওয়াকে তেতো করে তুলত, সেখানকার কাজকর্ম অচলাবস্থা ধারণ করত তখনই তিনি তাঁর বুদ্ধিবলে সেই তেতো আবহাওয়াকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সকলকে হাসিয়ে সভার কাজকর্মকে স্বাভাবিক করে তুলতেন।

শুধু তাই নয় সম্রাটকে আপদে বিপদে বুদ্ধি-পরামর্শ দেওয়াও তাঁর কাজ ছিল।

এই সকল কারণে সম্রাট আকবর তাঁকে অত্যন্ত ভাল বাসতেন।

একদিন সম্রাট তাঁর সভাসদবর্গের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে করতে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, আচ্ছা, বলুন ত দেখি; আপনাদের মধ্যে কে আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয়?

সকলেই নিজেকে সম্রাটের সবচেয়ে বেশী প্রিয় বলে জানালেন। একমাত্র বীরবলই চুপ করে রইলেন। কোন কথা বললেন না।

তাঁদের প্রত্যেকের মনোভাব জানার পর সম্রাট বললেন, আমার সবচেয়ে প্রিয় কে জানেন?

সকলেই সকলের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। সম্রাটের মুখ থেকে কে তাঁর সবচেয়ে বেশী প্রিয় সে-কথা জানার জন্তে ব্যগ্র হয়ে পড়লেন।

সম্রাট বললেন, সে-ই আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয় যাঁর বুদ্ধি সকলের চেয়ে বেশী।

সকলেই তখন স্ব-স্ব গুণ প্রকাশ করে তাঁর বুদ্ধি যে অন্তের অপেক্ষা বেশী তা বলাবলি করতে লাগলেন। এবারও বীরবল কোন কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন।

আকবর বললেন, বেশ, আমি পরীক্ষা করে জানতে চাই যে, কার বুদ্ধি আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী।

আকবর সিংহাসন ছেড়ে উঠে, হাতে একখণ্ড চক্ (খড়িমাটি) নিয়ে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলেন। তারপর ভূমিতে একটি লম্বা রেখা টেনে বললেন, আমার এই রেখাটি দেখছেন ত? এটি স্পর্শ না করে ছোট করুন ত দেখি? যে এ কাজ করতে পারবেন তিনিই সকলের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান বলে প্রমাণিত হবেন। আর তিনিই আমার সকলের চেয়ে বেশী প্রিয় হবেন।

সম্রাটের কথা শুনে সকলেই এটাকে অসম্ভব বলে মনে করলেন। সকলেই তাঁকে জানালেন, মহারাজ, রেখাটি স্পর্শ না করে 'ছোট' করা ত সম্ভব নয়। এটা ত একটা অসম্ভব, অবাস্তব প্রস্তাব।

বীরবলও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি কিন্তু এ-যাবৎ একটিও কথা বলেন নি।

অন্য সকলের কথা শোনার পর আকবর বীরবলের দিকে তাকিয়ে বললেন, বীরবল, আপনি ত কোন কথা বললেন না? তবে কি আমাকে এ-কথাই মেনে নিতে হবে যে রেখাটিকে স্পর্শ না করে ছোট করা সম্ভব নয়? আমি কি তাহলে একটা অসম্ভব অবাস্তব প্রস্তাব করলাম?

এতক্ষণে বীরবল মৃদু হেসে বললেন, তা কেন হবে, জাঁহাপনা! রেখাটি স্পর্শ না করেও ছোট, এমন কি যত খুশি তত ছোট করা সম্ভব।

অন্যান্য সভাসদেরা বীরবলের কথা শুনে অবাক হলেন। তাঁরা এই মুহূর্ত বীরবলের মাথার ঠিক নেই বলে মনে করলেন। কিংবা কথার দ্বারা মহারাজকে তুষ্ট করে তাঁর সবচেয়ে বেশী প্রিয় হবার বীরবলের এটা একটা চাল বলে মনে করলেন।

তাঁরা সকলে প্রমাণ চাইলেন।

সম্রাট বীরবলকে প্রমাণ করতে বললেন।

বীরবল স্বীকার হলেন। তিনি বিনীতভাবে সম্রাটের কাছে তাঁর হাতের খড়িটি চাইলেন।

সম্রাটের হাতের খড়িটি নিজের হাতে নিয়ে বীরবল সম্রাটের টানা রেখাটির পাশে, তাঁর টানা রেখাটি অপেক্ষা একটু বড় করে একটা রেখা টানলেন। তারপর বললেন, মহারাজ দেখুন ত। আপনার রেখাটি এখন আমার রেখার অপেক্ষা ছোট বলে মনে হচ্ছে কিনা? আর যদি আপনার রেখাটি আরো ছোট করা দরকার বলে মনে করেন তবে আমি আপনার রেখার পাশে আরো বড় বড় রেখা টেনে আপনার রেখাকে আরো যত খুশি ছোট করে দিতে পারি। এতে করে আপনার রেখাটিকে যত খুশি তত ছোট করা যাবে।

সম্রাটের টানা রেখাটি স্পর্শ না করেও যে ছোট করা যায়, এখন সেকথা সকলকেই স্বীকার করতে হল। কারোরই আর অস্বীকার করার উপায় রইল না

সম্রাট আকবর তখন তাঁর সভাসদদের বললেন, এখন বলুন, আপনাদের মধ্যে আর কার বুদ্ধি বীরবলের সমান? আপনারা যেটাকে অসম্ভব অবাস্তব বলে মনে করেছিলেন, বীরবল সেটাকে সম্ভব ও বাস্তব করে তুললেন। এর থেকেই প্রমাণিত হল যে, বীরবলের বুদ্ধি আপনাদের সকলের চেয়ে বেশী। সুতরাং তিনিই সবার চেয়ে আমার প্রিয়।

——
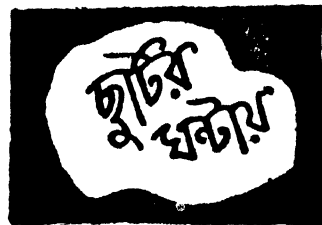
চিত্রগুপ্ত

এবারে শোনো—আরেকটি আজব মজার খেলার কলা-কৌশলের কথা। ছুটির দিনে আত্মীয়-বন্ধুদের মজলিসে ও

খেলার বিচিত্র কশরৎ দেখিয়ে তোমরা অনায়াসেই তাঁদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিয়ে প্রচুর তারিফ আদায় করতে পারবে।
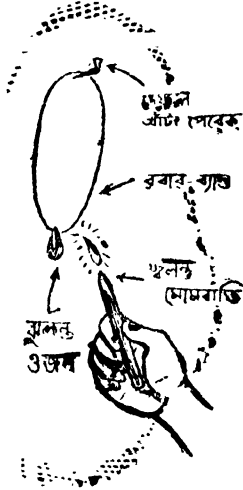
... ছবিতে যেমন নমুনা দেওয়া হয়েছে, তেমনি ধরণের গোলাকার একটি রবারের 'ব্যাণ্ড্' (round shaped rubber band) বা 'গার্টার' (garter), এক বাক্স দেশলাই, একটি মোমবাতি, ছোট একটি লোহার পেরেক, হাতুড়ি এবং ঐ রবারের 'ব্যাণ্ড্' বা গার্টার' থেকে শূন্যে ঝুলিয়ে-রাখার উপযোগী প্রয়োজনমতো ঈষৎ-ভারী ওজনের কোনো একটি সামগ্রী।

ফর্দ্দমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ করার পর আসরে দর্শকদের সামনে খেলার কশরৎ দেখানোর সময়, উপরের ছবির ভঙ্গীতে দেয়ালের গায়ে হাতুড়ি ঠুকে পেরেকটিকে এঁটে বসিয়ে সেই পেরেকে ঝুলিয়ে দাও গোলাকার ঐ রবারের 'ব্যাণ্ড' বা 'গার্টার'টিকে। এবারে ঐ ঝুলন্ত 'ব্যাণ্ড' বা 'গার্টারের' নীচের অংশে ঝুলিয়ে রাখো ঈষৎ ভারী ওজনের সামগ্রীটিকে।

উদ্যোগপর্ব্বের এ আয়োজনটুকু সারা হলে উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে দেশলাই কাঠির সাহায্যে মোমবাতিটিকে জ্বেলে খুব সন্তর্পণে কিছুক্ষণ ধরে রাখো ঐ পেরেকে ঝোলানো গোলাকার রবারের 'ব্যাণ্ড্' বা 'গার্টারে'র নীচে। তবে হুশিয়ার...এ কাজ করবার সময় সর্ব্বদা নজর রেখো অসাবধানতার ফলে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখা যেন আ... রবারের 'ব্যাণ্ড্' বা 'গার্টারের' কোনো অংশ স্পর্শও করে। কারণ, আগুনের তাপটুকু ছাড়া জ্বলন্তমোমবাতি... শিখার সামান্য ছোঁয়াচ লাগলেই রবারের 'ব্যাণ্ড্' 'গার্টার'টি পুড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে—তাই এ বিষয়ে বিশেষ সজাগদৃষ্টি রাখা দরকার।

যাই হোক, এভাবে কিছুক্ষণ জ্বলন্ত মোমবাতির শিখা... তাপে রাখার ফলে, রবারের 'ব্যাণ্ড' বা 'গার্টার'টি গ... উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে—রবারের ঐ 'ব্যা... বা 'গার্টার'টি সঙ্কুচিত এবং মাপেও আগের চেয়ে বে... খানিকটা খাটো হয়ে, 'গার্টার' বা 'ব্যাণ্ড' থেকে ঝোলানো ঈষৎভারী সামগ্রীটিকে ক্রমেই উপরের দিকে টে... তুলবে।

এই হলো—এ খেলাটির আজব কেরামতী। অর্থাৎ এ খেলা দেখে তোমরা এবং তোমাদের আত্মীয়বন্ধু... স্পষ্টই বুঝতে পারবে যে—গরমতাপ পেলে অন্যান্য জিনি... যেমন আকারে ফেঁপে বেড়ে ওঠে, রবারের বেলায় কি... ঘটে তার বিপরীত রীতি। গরমতাপ পেলে রবারে... সামগ্রী বাড়ে না...বরং কমে যায়।

—

মনোহর মৈত্র

১। সংখ্যা-সাজানোর হেঁয়ালি:

৭০৭পৃঃ যে চতুষ্কোণ ছকটি দেখবে, সেটির মধ্যে রয়েছে মোট ২৫টি ঘর। এই ২৫টি ঘরের মধ্যে ১২টি ঘরে কয়েকটি সংখ্যা সাজানো আছে। বাকী যে ১৩টি ঘর ফাঁকা রয়েছে, সেই ১৩টি ঘরে ১, ২, ৩, ৪, ৮, ১২, ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫—এই ১৩টি সংখ্যা থেকে বেছে এমন এক-একটি সংখ্যা সাজিয়ে বসাও, যাতে করে প্রতি সারির সংখ্যার

	৬	৫		
			১৬	১০
১১	২০			
৯			১৫	১৮
	১৩	১৯	৭	

যোগফল হয়—মোট ৬৫। দ্যাখো তো চেষ্টা করে, এই আজব হেঁয়ালির সঠিক উত্তর দিতে পারো কিনা?

বৈকুণ্ঠ দেবশর্ম্মা

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা:

২। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাটদের মধ্যে এমন একজনের নাম করো, যাঁর নামের মধ্যেই রয়েছে—তাঁর অন্তিম-শান্তির আশ্রয়টুকুর উল্লেখ।

রচনা: শ্যামাপ্রসাদ দাস (কয়াপাট)

৩। আকাশের গায়ে তোমরা দেখ মোর পাবে;
প্রথমার্দ্ধ বনবাসে গেল ঋষির শাপে,
শেষার্দ্ধ শেষে তাঁর পত্নীলাভ হলো,
চার অক্ষরে নাম মোর, পারো যদি বলো!

রচনা। বিজনকুমার ঘোষ (জগৎবল্লভপুর)
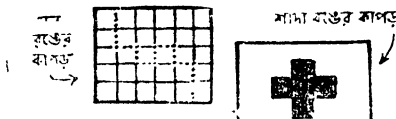
গত মাসের 'ধাঁধা ও হেঁয়ালীর' উত্তর:

উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনিভাবে 'বিন্দু-চিহ্ন' অংশে সাদা-রঙের কাপড়টিকে টুকরো করে ছেটে নিয়ে লাল-রঙের কাপড়ের উপর জোড়া দিলেই 'রেড-ক্রশ' পতাকা বানানো যাবে।

২। আদাম

৩। তুবড়ি=২ হাউই, চকি=পটকা+ছুচোবাজি+রংমশালের দাম=½ তুবড়ি এ থেকে হিসাব পাচ্ছি—বাজির মোট দাম=৩॥০ টাকা। তুবড়ির দাম ১॥০ টাকা। তুবড়ি=১॥০ টাকা; হাউই=৸০ আনা; চকি=।৵০ আনা; ছুচো এবং রং মশাল=।৵০ আনা।

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

ব্রজনাথ ও শান্তশীল রায়চৌধুরী (জামশেদপুর), প্রতুলচন্দ্র ও মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘাটশীলা), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), বিংহেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র সিংহ (হাজারীবাগ), পুস্থ, জগা, নেড়ু, কলু, ও কালিন্দী গুপ্ত (গোয়ালিয়র), বিজয়া ও সৌরাংশু আচার্য্য (কলিঃ), স্বরূ ও দেবু বন্দ্যোপাধ্যায় (দিল্লী), সুপর্ণা, সুলতা ও জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), বাপি, বুতাম, পিণ্টু, অশোক ও সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), বুবু ও মিন্টু গুপ্ত (কলিকাতা), সঞ্জয়, সত্যেন্দ্র লক্ষ্মী, মুরারি, অমিয় সুনীল ও নমিতা (ভিলাই), শর্ম্মিলা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো)।

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

অশোক, অনাদিনাথ, সন্তোষ, সুনীল, রঞ্জিত, নিরাপদ, অজয়, রবি, সুবোধ, জনরঞ্জন ও কানু (গৌরীপুর) বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), পিণ্টু, ফণী ও খুকু (কলিকাতা), অধীশ, অমিতাভ ও কবি (লক্ষ্ণৌ), কেতকী, হাবুল, মটরু, পালোয়ান, সনাতন ও বুলটু (পাটনা), অমিয়, কৃষ্ণলাল অভি, প্রশান্ত অমৃত, স্বপন, ভাস্কর, মদন, মনি, সুনীত, তিনকড়ি ও রাণা (গড়িয়া) শিবাজী ও তিলক রায় (কৃষ্ণনগর)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে

পার্থ, গৌতম, ইন্দ্রাণী, উত্তরা, উদয়ন, কল্যাণ, দীপা, বেলা, মিনতি, বাপি, রুনি, ঋতা, শীলা, পল্টু ও অমিত (কলিকাতা), সজনী, প্রণব, সমরেশ, নারায়ণ, নরেন্দ্র, সুধীর, তুষার, চারু, শৈলেন, হাসি, হাসান, হিমাংশু, সুধাংশু ও সীতাংশু (শিলিগুড়ি), মনতোষ, পৃথ্বীশ, নীলমণি, নির্ম্মল, কালিদাস, রণজিৎ, আশুতোষ ও সুমাহেন্দ্র সেনগুপ্ত (কলিকাতা), ধীরেন, হরিদাস, সুমিত্রা, অচলা, মণিকা, ফণী, লীলা ও লিলি (বর্দ্ধমান)।

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষ ঃ

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের পঞ্চম টেষ্ট সিরিজের (১৯৬৬-৬৭ সালের) প্রথম টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৬ উইকেটে জয়ী হলে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২১টি টেস্ট খেলায় ১১টিতে জয়লাভের গৌরব লাভ করে। বাকি ১০টি খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বোম্বাইয়ে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের আগের দুটি টেস্ট সিরিজের (১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালের) দুটি টেষ্ট খেলাই ড্র ছিল।

পাতৌদির নবাব টসে জয়ী হলে ভারতবর্ষ প্রথম ব্যাট করার দান হাতে নেয়। কিন্তু প্রথম ব্যাট করার যে সুযোগ তার সদ্ব্যবহার হয়নি। দলের মাত্র ১৪ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট পড়ে। এই সঙ্কট সময়ে বোরদের চতুর্থ উইকেটের জুটি হন অধিনায়ক পাতৌদি। তাঁর নির্ভীক খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দুই দুর্দ্ধর্ষ ফাস্ট বোলার হল এবং গ্রিফিথ সম্পর্কে ভয় অনেকটা দূর হয়। দলের ১০৪ রানের মাথায় পাতৌদি নিজস্ব ৪৪ রাণ করে খেলা থেকে বিদায় নেন। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে পাতৌদি এবং বোরদে ৯০ রান সংগ্রহ করেন। চা পানের সময় ভারতবর্ষের জমার ঘরে ছিল ১৭৫ রান (৫ উইকেটে)। তখন বোরদের ছিল ৯১ রান এবং দুরাণীর ১৯ রান। ২২০ মিনিটের খেলায় বোরদের শতরান পূর্ণ হয়, বাউণ্ডারী করেন ১৩টা। সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে বোরদের এই নিয়ে চতুর্থ সেঞ্চুরী এবং

গারফিল্ড সোবার্স—অধিনায়ক ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। সরকারী টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসের খেলায় বোরদের সর্ব্বোচ্চ রান হ'ল নট আউট ১৭৭ (বিপক্ষে পাকিস্তান, মাদ্রাজ, ১৯৬০)। ভারতবর্ষের ২৪০ রানের মাথায় দুরানী তাঁর নিজস্ব ৫৫ রান করে আউট হন। খেলার ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দুরাণী এবং বোরদে মূল্যবান ১০২ রান তুলে দেন। দুরাণীর আকর্ষণীয় খেলায় ৮টা বাউণ্ডারী এবং

একটা ওভার বাউণ্ডারী ছিল। প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ৬টা উইকেট পড়ে ২৪১ রান দাঁড়ায়। খেলায় অপরাজিত থাকেন বোরদে (১২০ রান) এবং নাদকার্ণী। নাদকার্ণীর রাণের ঘর তখনও শূন্য ছিল।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২৯৬ রানের মাথায় শেষ হয়। তারা এইদিনের খেলায় তাদের বাকি ৪ উইকেটে প্রথম দিনের ২৪১ রানের (৬ উইকেটে) সঙ্গে ৫৫ রান যোগ করে। দ্বিতীয় দিনের খেলার প্রথম দিকে মাত্র ১৯ রানের মধ্যে ভারতবর্ষের তিনটি উইকেট পড়ে যায়। তখন দলের রান দাঁড়ায় ২৬০ (৯ উইকেটে)। শেষ ১০ম উইকেটের জুটিতে দুই বোলার ভেঙ্কটরাঘবন (নট আউট ৩৬ রান) এবং চন্দ্রশেখর দলের মূল্যবান ৩৬ রান যোগ করেন। রানের চেহারা অনেকটা ভদ্র হয়। এই দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস দেড় ঘণ্টা স্থায়ী ছিল।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ চারটে উইকেট খুইয়ে ২০৮ রান সংগ্রহ করে। তাদেরও খেলার আরম্ভ ভাল হয়নি। দলের ৮২ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট পড়ে যায়।

চতুর্থ উইকেটের জুটিতে লয়েড এবং হান্ট দলের অতি মূল্যবান ১১০ রান তুলেছেন। ন্যাটা এবং চশমাধারী খেলোয়াড় ক্লাইভ লয়েড তাঁর খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলতে নেমে ৮২ রান করেন। তাঁর এই রানে ছিল চোদ্দটা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার বাউণ্ডারী। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের হাতে জমা ৬টা উইকেট এবং ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ২৯৬ রানের থেকে তারা ৮৮ রানের পিছনে।

খেলার তৃতীয় দিনে ৪২১ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হলে তারা ১২৫ রানে অগ্রগামী হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ তৃতীয় দিনের খেলায় তাদের বাকি ৬টা উইকেটে ২১৩ রান যোগ করে। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে হান্ট এবং সোবার্স ৫০ রান, ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে হলফোর্ড এবং সোবার্স ৫৩ রান এবং ৭ম উইকেটের জুটিতে হলফোর্ড এবং হোল্ডার্কস ৮৩ রান যোগ করেন। হান্ট ২৭৭ মিনিট খেলে ১০১ রান করেন, বাউণ্ডারী করেন ১৬টা। টেষ্ট ক্রিকেটে তাঁর

ওয়েসলী হল

এই ৮ম সেঞ্চুরী এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে প্রথম। এই খেলায় তাঁর সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত ৩০০০ রান পূর্ণ হয়। এই প্রথম ইনিংস খেলার পর ৪২টি টেস্ট খেলায় তাঁর ৩০৮৭ রান (৪ ইনিংসে) দাঁড়ায়। তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ভারতবর্ষ কোন উইকেট না খুইয়ে ৪৪ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিনে খেলার ৩১৬ রানের মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে ভারতবর্ষ ১৯২ রানে অগ্রগামী হয়। এই দিনে মোট ১২টা উইকেট পড়ে—ভারতবর্ষের ১০টা এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দুটো। এক সময়ে ভারতবর্ষের উইকেট পড়ার বহর দেখে দর্শকদের চোখ ছানাবড়া হয়েছিল। ১৯২৩ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম এবং ২১৭ রানের মাথায় ৮ম উইকেট পড়ে যায়। ভারতবর্ষের

চন্দ্রশেখর

রানের কি করুণ চেহারা! শেষ পর্যান্ত ৯ম উইকেটের জুটিতে কুন্দরন এবং ভেঙ্কটরাঘবন দলের ৯৫ রান তুলে দিয়ে ভারতবর্ষের মুখ রাখেন। তাঁদের এই ৯৫ রান—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের ৯ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান। পূর্ব্বের রেকর্ড ৯৩ রান (উমরীগড় এবং নাদকার্ণী, পোর্ট অব স্পেন, ১৯৬২)। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ১৩১ (৪ উইকেটে)। তখন খেলায় অপরাজিত ছিলেন বেগ (৩৪ রান) এবং পাতৌদি (৫ রান)। পাতৌদি ৫১ রান ক'রে আউট হন। চা পানের সময় রান দাঁড়ায় ৮ উইকেট পড়ে ২৮১। উইকেটে অপরাজিত কুন্দরণ (৫১ রান) এবং ভেঙ্কটরাঘবন (২৩ রান)। কুন্দরণ ৯৭ মিনিটের খেলায় তাঁর ৭৯ রানে ১৫টা বাউণ্ডারী করেন। তাঁর মারের বহরে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খ্যাতনামা বোলাররা জব্দ হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ৩১৬ রানের মাথায় দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলায় জয় লাভের জন্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ১৯২ রানের প্রয়োজন হয়। চতুর্থ দিনের শেষ ৫৫ মিনিটের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল দুটো উইকেট খুইয়ে মাত্র ২৫ রান সংগ্রহ করে।

পঞ্চম দিনের ১টা ৫৫ মিনিটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৯২ রান উঠে যায় (৪ উইকেটে)। এই খেলার জয়সূচক রানটি সংগ্রহ করেন অধিনায়ক গারফিলড সোবার্স। উভয় দলের পক্ষে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন চন্দ্রশেখর (২৩৫ রানে ১১টা উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ২৯৬ রান (বোরদে ১২১, দুরানী ৫৫, পাতৌদি ৪৪ এবং ভেঙ্কটরাঘবন নট আউট ৩৬ রান। গ্রিফিথ ৬৩ রানে ৩, সোবার্স ৪৬ রানে ৩, হল ৫৪ রানে ২ এবং হলফোর্ড ৬৮ রানে ২ উইকেট)।

ও ৩১৬ রান (কুন্দরন ৭৯, পাতৌদি ৫১, জয়সীমা ৪৪, বেগ ৪২, সারদেশাই ২৬ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ২৬ রান। গিবস ৬৭ রানে ৪, হলফোর্ড ৯৪ রানে ৩ এবং সোবার্স ৭৯ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৪২১ রান (হাণ্ট ১০১, লয়েড ৮২, সোবার্স ৫০, হলফোর্ড ৮০ এবং হেণ্ড্রিকস্ ৪৮ রান। চন্দ্রশেখর ১৫৭ রানে ৭, ভেঙ্কটরাঘবন ১২০ রানে ২ এবং দুরানী ৮৩ রানে ১ উইকেট।

ও ১৯২ রান (৪ উইকেটে। লয়েড নট আউট ৭৮, সোবার্স নট আউট ৫৩ এবং হাণ্ট ৪০ রান। চন্দ্রশেখর ৭৮ রানে ৪ উইকেট)।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ৪।১।৬৭ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।